(সচিত্র মাসিক যুবদর্পণ)

ষষ্ঠ সংখ্যা ॥ জুন, ১৯৭৮

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

কান্তি বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক

বনভূষণ নায়ক

যুবকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ)
কলিকাতা-৭০০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাঁদ দে কর্তৃক তরুণ প্রেস, ১১ অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

সূচী

লেখা পাঠাতে হলে ঃ

- ☐ ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিস্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
- ☐ সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।
- ☐ কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পান্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
- ☐ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ২০০০ শব্দের বেশি হলে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।
- ☐ যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকগণ তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

☐

নিজ এলাকায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা ও গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব থাকলে পাঠকবর্গের কাছে তার আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। এই প্রস্তাব বিশদ বিবরণসহ বিভাগীয় যুগ্ম-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, ৩২/১, বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

☐

গ্রামবাংলার চিন্তাশীল তরুণ লেখকগণ নিজ নিজ লেখা পাঠান। যুবমানসের সমালোচনা আহ্বান করি।

সম্পাদক ঃ যুবমানস

সম্পাদকীয়

গত ৪ঠা জুন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রন্টকে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করে বামপন্থী ফ্রন্টের প্রতি আস্থা পুনর্ঘোষণা করার জন্য পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষকে অভিনন্দন। ঐদিন দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পরে গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা গঠনের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই ঐতিহাসিক রায় দিলেন। ইতিহাস যেন এই রায় দেবার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল গ্রামের শোষিত-নিপীড়িত মানুষের উপর। তারা এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তাই ৪ঠা জুন পশ্চিমবাংলার মেহনতী জনগণের গর্বের দিন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের এই ফলাফল গ্রামাঞ্চলের মানুষের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক। এই নির্বাচন ছিল গ্রামের কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদের বিরুদ্ধে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রাম। যুগ যুগ ধরে যারা শোষিত, নির্যাতিত তারা অভূতপূর্ব দৃঢ়তা নিয়ে এই রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা গত বিধানসভা নির্বাচনের থেকেও ছিল অনেক বেশী উন্নত। বিরাট জাগরণ দেখা দিয়েছিল গ্রামাঞ্চলের মেহনতী মানুষের মধ্যে বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে। যুব শক্তির কাছে এই নির্বাচন ছিল এক চ্যালেঞ্জ। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অমোঘ নিয়মে কর্মহীনতা, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অভিশাপে জর্জরিত যুবশক্তি বিপুল বাধার পাহাড় ভেঙে গ্রামের কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের যাত্রা পথে এই প্রাথমিক বিজয় অর্জন করলো। গত বছরের জুন মাসের বিধানসভা নির্বাচনের পর গত এক বছরে গ্রামে-গঞ্জে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি যে আরো বিকশিত ও সচেতন হয়ে উঠেছে এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই কথাই ঘোষিত হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রন্টের বিরাট সাফল্যের মধ্য দিয়ে।

গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষের বামপন্থী ফ্রন্টের পক্ষে এই জাগরণ কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ এবং তাদের বশংবদ ভৃত্যদের শঙ্কিত করেছিল। বামপন্থী ফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিশেষ করে বামপন্থী ফ্রন্টের প্রধান শরিক এবং রাজ্যের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে কুৎসায় মুখর হয়ে উঠেছিল এক শ্রেণীর সংবাদপত্র। বামফ্রন্টের পরাজয়ের সম্ভাবনার কথা তারা প্রচার করেছিল। কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম; কায়েমী স্বার্থবাদীদের মনোরঞ্জনকারী সেই সব সংবাদপত্রের কুৎসার বেড়াজালকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে জনগণের অগ্রগতির রথ তার চলার পথ করে নিল।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যের সর্বত্র যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার একটি সার্থক অভিব্যক্তি ছিল এই নির্বাচন। সারা ভারতে এই নির্বাচন ছিল বৃহত্তম নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচনী পরিবেশ ছিল শান্ত। এটা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এর পূর্বে রাজ্যে যতগুলি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সবগুলিই ছিল রাজ্যের কংগ্রেসী সরকারের তত্ত্বাবধানে নতুবা রাজ্যপালের শাসনাধীনে। এই প্রথমে রাজ্যের বামপন্থী দলগুলির দ্বারা পরিচালিত সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। এর পূর্বে রাজ্যে কংগ্রেস দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনে যতগুলি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সমস্ত নির্বাচনেই নির্বাচনী প্রচারের সময় ও নির্বাচনের দিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে; ভীতি প্রদর্শন, হামলা প্রভৃতি ঘটেছে। এমন কি রাজনৈতিক কর্মীরা নিহত হয়েছেন। কিন্তু এই প্রথম পশ্চিমবাংলায় শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের প্রতি সজাগ প্রহরায় নিযুক্ত থেকেও কায়েমী স্বার্থবাদীদের সমস্ত চক্রান্ত ও প্ররোচনা

ব্যর্থ করে দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ যেভাবে নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন তা অভূতপূর্ব।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রন্টের এই বিরাট সাফল্যে শুধু গ্রামাঞ্চলের নয়, শহরাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদীরাও যে শঙ্কিত হয়ে উঠবে—তা স্বাভাবিক। কেন না তারা এটা বোঝে যে, পশ্চিমবঙ্গের এই হাওয়া যদি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে তবে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। জন্মের মুহূর্ত থেকেই বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত মোকাবিলা করে অগ্রসর হতে হচ্ছে। আগামী দিনে তাই এই চক্রান্ত জালের আরো বিস্তার ঘটবে। তাই এই বিরাট সাফল্যে আত্মহারা হবার কোন অবকাশ নেই। মেহনতী জনগণকে বিশেষ করে যুবসমাজকে আরো বেশী সজাগ, সংগঠিত ও সচেতন হতে হবে যাতে সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়।

একেবারে নীচের স্তরের গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ করার বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতিবন্ধ। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত—এই ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কি করে কোন পথে ও কি উপায়ে প্রাণবন্ত এবং সক্রিয় করা যায়, যার মধ্য দিয়ে ব্যাপকতম জনগণ দেশের প্রশাসনের সঙ্গে বিশেষ করে উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পারে তা দেখতে হবে। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের পরিবর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় গড়ে তোলার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণের পথ ও উপায় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য নির্দিষ্টভাবে বিষদ পরিকল্পনা রচনার আগে কেন্দ্র কর্তৃক নিয়োজিত অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশের জন্য বামফ্রন্ট সরকার অপেক্ষা করছেন। তবে পঞ্চায়েত রাজ্যের সর্বনিম্ন স্তর গ্রাম পঞ্চায়েত তার এলাকার মধ্যে রাস্তা-ঘাট, জলনিকাশী-জলসেচ, পানীয়জল সরবরাহ, জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য, ত্রাণ, শিক্ষাবিস্তার, কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প, শস্য গোলা গঠন, প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব এখনই নেবে। পঞ্চায়েত প্রকল্প রূপায়ণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। সিদ্ধান্ত করে সরকারী মঞ্জুরীকৃত অর্থ তুলবে, কাজ করবে। ব্লক পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তারা এই পঞ্চায়েত-গুলিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন। তাদের মধ্যে অসহযোগিতামূলক মনোভাব দেখা দিলে পঞ্চায়েতগুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। এই ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা পঞ্চায়েতগুলির থাকবে।

পঞ্চায়েত সম্বন্ধে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতির মধ্যেই গ্রামের মানুষের স্বার্থে গ্রামোন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হবার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। তবে একথা মনে করা মারাত্মক ভুল হবে যে, গ্রামাঞ্চলের মেহনতী জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হলেই গ্রামোন্নয়নের সব কাজ অবাধে চলতে থাকবে ও "গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ" প্রতিষ্ঠিত হবে। মনে রাখতে হবে যে, গ্রামের কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা কখনোই তা সহজে হতে দেবে না। এদের চক্রান্তের পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাজে অগ্রসর হওয়ার পথে বহুবিধ বাধার সৃষ্টি করবে। তাই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের সাথে ছাত্র-যুব-মহিলা-কৃষক ইত্যাদি বিভিন্ন বেসরকারী স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকে পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং বিধিসম্মত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের সাথে জনগণের ঐসব স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকে যুক্ত করতে হবে।

একাজ পশ্চিম বাঙলার মানুষের কাছে অসম্ভব নয়। দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী পশ্চিম বাঙলার যুবশক্তিকেই এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। পশ্চিম বাঙলার যুবসমাজ তা পারবে—এই আত্মবিশ্বাস হোক আমাদের পাথেয়। সব শেষে অভিনন্দন জানাই সেই সকল যুবকদের যারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে শহর থেকে গ্রামে ছুটে গিয়েছিলেন বামফ্রন্টের পক্ষে বিজয়মালা ছিনিয়ে নিতে।

ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা / শ্যামল চক্রবর্তী

মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার দাবী আজ জাতীয় দাবীতে পরিণত হয়েছে। ভারতের মত বিশাল দেশ, ষাট কোটি যার অধিবাসী অথচ দারিদ্র্য আর অশিক্ষায় যে দেশের চল্লিশ কোটি মানুষ নিরন্তর ধুঁকছে সেই দেশে অশিক্ষা, নিরক্ষরতা ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জরুরী কর্তব্য হিসাবে সমস্ত প্রকৃত দেশপ্রেমিক মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এই কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি। "সকলের জন্য শিক্ষা" ও "জীবনের উপযোগী শিক্ষা" যে শিক্ষানীতির মৌলিক রণধ্বনি হিসাবে উপস্থিত হওয়া উচিত, মাতৃভাষাই হতো সেই শিক্ষার বাহন।

স্বাধীনতার পর মূল্যবান তিরিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির মর্মবস্তুর মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। "সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।" অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে, কমিশনের পর কমিশন বসিয়ে, বক্তৃতায় তুবড়ি ছুটিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা মন্থনের নামে প্রাক্ স্বাধীনতার অবস্থাকেই প্রায় বহাল রাখা হয়েছে। এই মন্থনের অমৃতটুকু পেয়েছেন যথা-পূর্বং মুষ্টিমেয় অভিজাত কুলোদ্ভবরা, আর বিপুল জনসমাজ নিরক্ষরতা, অশিক্ষার বিষ ধারণ করেই নীলকণ্ঠ হয়ে আছেন।

দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করা হবে কি না নির্ভর করে শাসকগোষ্ঠী কোন শ্রেণীর স্বার্থে দেশ পরিচালনা করছে তার উপর। যেহেতু আমাদের দেশের শাসক পার্টি ধনিক-জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত তাই শিক্ষা-নীতিও পরিচালিত হচ্ছে সেই শ্রেণীর স্বার্থে। "জনসাধারণকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখ" এই হচ্ছে শিক্ষানীতির মূল কথা। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে শোষক শয়তানের দিন ফুরিয়ে যাবে। তাই স্বাধীনতার ২৫ বৎসর পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, "আপনারা নিরক্ষরতা নিয়ে এত মাথা ঘামান কেন?" (বিজ্ঞান কংগ্রেসে বক্তৃতা, ১৯৭৩) •

আর গণতান্ত্রিক ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠার (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫) ছয় দিন পর প্রেসিডেন্ট হো-চি-মিন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযান গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রত্যেকটি ভিয়েতনামীকে মাতৃভাষায় লিখতে ও পড়তে সক্ষম হতে হবে এই ছিল অভিযানের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তার সরকার গণশিক্ষা বিভাগ স্থাপন করেন। ফ্যাসিস্ট জাপানকে নিরস্ত্রীকরণ করবার নামে আমেরিকা, ব্রিটিশ এবং ফ্রান্স যখন নিজেদের এবং চিয়াং কাইশেকের সৈন্য প্রেরণ করবার চক্রান্ত করছিল, বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে রক্ষা করবার সেই সংকটময় দিনগুলিতেও প্রেসিডেন্ট হো-চিন-মিন তিনটি শত্রুর বিরুদ্ধে গোটা জাতির দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেন; শত্রু তিনটি—বিদেশী আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ এবং নিরক্ষরতা। ভিয়েতনামের সরকার জনগণের সরকার, মুষ্টিমেয় শোষকের স্বার্থে নয়, শোষিত মানুষের স্বার্থে তারা সরকার পরিচালনা করেন—শিক্ষা-নীতি সেই কার্যক্রমেরই প্রতিফলন। তাই ভারতবর্ষে শতকরা সত্তর ভাগ মানুষের কাছে জ্ঞান বৃক্ষের ফল নিষিদ্ধ, আর ভিয়েতনামের সরকার ফল তুলে দিয়েছেন জনগণের হাতে।

মাতৃভাষা উপেক্ষিত:

মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার প্রশ্নটিও শিক্ষানীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত জনশিক্ষা হতে পারে না। আমাদের দেশের সরকার এবং তাদের ভাড়াটে প্রচারকেরা এ কথাই সগর্বে বলতে অভ্যস্ত যে, পৃথিবীর বর্তমান অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে গেলে ইংরাজী ছাড়া ভারতে বিকল্প নেই। ভারতীয় কোন কোন ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পদশালী হলেও (যদিও একথা স্বীকার করতে অনেকের কুণ্ঠা—নেহাত রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে) জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহন হতে ভাষাগুলি অক্ষম। তাই সাহিত্য নিজেদের ভাষাতে পড়া যেতে পারে কিন্তু বিজ্ঞান, কারিগরি, মেডিকেল? নৈব নৈব চ। তা হলে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ কদাচ সম্ভব না। বিনীতভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে: স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে, এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেল, ইংরাজীর মাধ্যমে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, অথচ আমরা কোথায় আছি? আপনাদের "অগ্রগতির মেল" অচল, অনড় কেন?

আসল প্রশ্ন শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী:

আসলে সমস্যা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীর—শ্রেণী দৃষ্টি-ভঙ্গীর। সমাজ পরিবর্তনের নিয়মগুলি সম্পর্কে ভিয়েত-নামের সরকার অত্যন্ত সচেতন। তারা জানেন যে, শ্রম ও ভাষা উভয়েরই সাহায্যে মানুষ পশুর স্তর থেকে উন্নীত হয়েছে। নিজেদের ভাষাকে ভালোবাসা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দেশের আপামর জনসাধারণের চেতনা ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত করবার ক্ষেত্রে ভাষার অবদান অপরিসীম। ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন এবং শোষণের একটি অন্যতম কৌশলই হ'ল পদানত জাতির ভাষাকেও পদানত করে রাখা। শোষণকে বজায় রাখবার জন্য তার সামান্য কিছু শিক্ষিত লোক প্রয়োজন। সমাজের উঁচুতলার সুবিধা-ভোগী অংশের কিছু লোককে এই কাজে ঔপনিবেশিক শক্তি ব্যবহার করে। দেশের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরোধী এবং ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ধ্যানধারণা, আদব-কায়দায় এদের তৈরী করবার চেষ্টা চলে। ভারতবর্ষে যেমন

ইংরাজীতে, ভিয়েতনামে ঠিক তেমনই ফরাসী ভাষার মাধ্যমে সামান্য কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

ফলে ফরাসী শাসিত ভিয়েতনামী সমাজজীবনে এর কুফলগুলি ফলতে শুরু করে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের ফরাসী শিখতে হতো। (ভারতবর্ষে কি এখনও এর ব্যতিক্রম আছে?) মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে সপ্তাহে প্রায় দশ ঘণ্টা ফরাসী সাহিত্য পড়তে হতো। (আমাদের এখনকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এগার-বার ঘণ্টা ইংরাজী পড়ান হয়।) মাধ্যমিক স্তর পার হয়ে আরও উচ্চস্তরের শিক্ষার ফরাসীই ছিল একমাত্র মাধ্যম। (আমাদের দেশে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রদের মেডিকেল, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, বাণিজ্য, বিজ্ঞান সমস্ত বিষয়ই ইংরাজীর মাধ্যমে এখনও পড়তে হয়।) স্বভাবতই শিক্ষা জীবন থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে সমাজজীবনে ভিয়েতনামী ভাষা অবজ্ঞাত হয়েই পড়েছিল। সমাজে একে অশিক্ষিত অমার্জিত লোকদের ভাষা হিসাবেই গণ্য করা হ'ত। ফরাসী ভাষায় কথা বলা ছিল সভ্যতা ও উন্নততর সংস্কৃতির পরিচায়ক। সমাজের উচ্চস্তরে ক্রমশঃ ফরাসী ভাষাই কথ্য ভাষা হিসাবে স্থান লাভ করে। এমনকি উচ্চবিত্তদের নিজেদের পরিবারে দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনাও ফরাসী ও ভিয়েতনামী ভাষার অভিনব মিশ্রণে পর্যবসিত হয়েছিল। (আমাদের দেশের সমাজজীবনের প্রায় আর একটি সংস্করণ নয় কি?) গণতান্ত্রিক ভিয়েতনামের সরকার তার প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই এই অবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। দেশের সমস্ত মানুষের সাহায্য তারা গ্রহণ করলেন; বুদ্ধিজীবীদের (যারা ফরাসী মাধ্যমেই শিক্ষিত) আহ্বান করলেন এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে নীতি স্থিরীকৃত হ'ল, মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রচলিত হবে। পিতৃভূমি মুক্ত হয়েছে। এখন ভাষাকেও মুক্ত কর দাসত্ব থেকে।

মুক্তি পেল ভাষা শুরু হ'ল আমূল পরিবর্তন:

যদি কোনও পদানত জাতি তার ভাষাকে রক্ষা করতে পারে তাহলে তার নিজের কাছেই রয়েছে মুক্তির চাবিকাঠি। প্রকৃত পক্ষে ভিয়েতনামী ভাষায় কথা বলা ও শিক্ষা পাবার আন্দোলন দেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। সর্বপ্রকার বিদেশী আক্রমণ ও পরি-চালনার মধ্যে থেকেও ভিয়েতনামী ভাষাকে ভিয়েতনামের বেশীর ভাগ মানুষ রক্ষা করবার, বিকাশ করবার সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভিয়েতনাম ছিল চীনা রাজন্যবর্গের শাসনাধীনে। সমস্ত প্রকার প্রশাসনিক দলিলপত্র, পুস্তক সব কিছুই চীনা ভাষায় প্রকাশিত হ'ত। অথচ মুষ্টিমেয় কিছু লোক তখন চীনা ভাষা জানতেন। চীনা ভাষা থেকে অনেক প্রয়োজনীয় ভাষা আহরণ করে ভিয়েতনামী ভাষা প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। দশম শতকে যদিও ভিয়েতনাম স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিল কিন্তু ভিয়েতনামী সামন্ততান্ত্রিক শাসকবর্গ চীনা ভাষাকে অধিকতর পছন্দ করতেন। প্রশাসনিক কাজকর্ম-দলিল-দস্তাবেজ, বিদ্যালয়ে পড়াশুনা, সাহিত্য সমস্ত কিছুই চীনা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এদেরই মধ্যে কয়েকজন রাজন্যের প্রচেষ্টায় ভিয়েতনামী ভাষা বিকাশলাভ করে। "নম" হরফে অনেক মূল্যবান সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু এগুলি ছিল সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য ও অপ্রতুল। প্রকৃতপক্ষে জনগণই ভিয়েতনামী ভাষাকে রক্ষা ও বিকাশের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভিয়েতনামের সংগ্রাম, বিদেশী শাসকদের প্রতি ঘৃণা, উচ্চতর ও সমৃদ্ধতর সমাজ ও জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এ সমস্তই জনগণের মধ্যকার তথাকথিত "গেঁয়ো" লোকদের দ্বারা রচিত কাব্যে, গানে, গল্পে, উপকথায় প্রকাশিত হ'ত। এরাই ছিলেন জনগণের সাহিত্যিক এবং শিল্পী। ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর চীনা ভাষার স্থান দখল করে ফরাসী ভাষা— ভিয়েতনামী ভাষাকে নতুন দাসত্বের সম্মুখীন হতে হয়।

আগষ্ট বিপ্লবের পর স্বাধীন ভিয়েতনামে ভিয়েত-নামী ভাষাকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বাদিন স্কোয়ারে প্রেসিডেণ্ট হো-চি-মিন ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন ভিয়েতনামী ভাষায়।

ভিয়েতনামের মানুষ যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষ তার চিন্তা-ভাবনাগুলিকে নির্দিষ্টভাবে আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে। ভাষা শুধুমাত্র পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম নয়, চিন্তা ও অনুভূতিগুলিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশের মাধ্যম। মাতৃভাষা নয় এমন কোন ভাষার মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে কি বিজ্ঞানমুখী করে গড়ে তোলা যায়? ফরাসীরা আশি বৎসরে পাঁচ শতাংশ মানুষকে মাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করেছিল। আর ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃত্বে তার এক চতুর্থাংশেরও কম সময়ে শুধুমাত্র নিরক্ষরতাকেই বিদায় করা হয়নি—শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনকে অনেক উন্নত স্তরে উপনীত করা হয়েছে। ভিয়েতনামী ভাষাকে সমাজের প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে। ব্যকরণ করা হয়েছে নমনীয় ও সংক্ষিপ্ত (আমাদের ব্যকরণ এখনও অভিশ্রুতি, বিপ্রকর্ষ কণ্টকিত। হিন্দী ভাষাতে বস্তু চলমান হলে তার লিঙ্গ পরিবর্তন হয়ে যায়। ব্যকরণ ভাষাকে অনর্থক দুর্বোধ্য করে তুলেছে।)

১৯৪৫ সালে আগষ্ট বিপ্লবের পর থেকেই ভিয়েত-নামের সমস্ত স্কুল-কলেজে ভিয়েতনামী ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের চাহিদা পূরণ করবার উপযোগী করে ভাষাকে গড়ে তোলা হচ্ছে। ১৯৫০-৫১ সালে শিক্ষা সংস্কারে পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই শিক্ষা নীতির তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল—জাতীয়, বৈজ্ঞানিক ও জনপ্রিয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা

হয়। শিক্ষার সমস্ত স্তর ও বিভাগেই ইতিমধ্যে মাতৃভাষা নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞান, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল প্রভৃতি বিভাগে ভিয়েতনামী ভাষার প্রয়োগ করতে প্রথম দিকে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেকেরই ধারণা ছিল, ভিয়েতনামী ভাষায় সাহিত্য রচনা করা সম্ভব কিন্তু বিজ্ঞানে একে প্রয়োগ করা যায় না। ফরাসী বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার সকলেই ফরাসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত ও দক্ষ। তারা কিভাবে ভিয়েতনামী ভাষায় অন্যদের শিক্ষিত করেন? ভিয়েতনামী ভাষাতে এত শব্দ সম্ভার কোথায়? কিন্তু পিছিয়ে আসবার অবকাশ নেই। প্রত্যেক শিক্ষক তাদের পাঠ্য বিষয়গুলি অনুবাদ করে পড়াতে শুরু করলেন। বৈজ্ঞানিক কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত সোস্যাল সায়েন্স কমিটি পরিশ্রম করে প্রকাশ করলেন ২,৫০,০০০ শব্দ সমন্বিত পনের খণ্ড বই। প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কৃত নতুন নতুন শব্দ, নতুন প্রকাশ ভঙ্গী, কিছু পুরনো শব্দ ভেঙেচুরে সৃষ্টি হ'ল নতুন নতুন শব্দ। কত সহজে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যবস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তার জন্য চলল নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই কর্মযজ্ঞে বিধ্বংসী যুদ্ধ, বীভৎসতম আক্রমণের মোকাবিলা করেও রক্তস্নাত ভিয়েতনাম গড়ে উঠল নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে, সাধারণ শিক্ষার মানদণ্ডে অনেক অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশকেও অনেক পিছনে ফেলে।

শিক্ষা ও গবেষণার কয়েকটি বিভাগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি :

মৌল বিজ্ঞান—হ্যানয় কলেজ অফ বেসিক সায়েন্সের ডিরেক্টর অধ্যাপক নুগুয়েন নু কোনটুম-এর মতে, মৌল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ বৎসর ধরে মাতৃভাষায় চর্চার ফলে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক কার্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ভিয়েতনামী ভাষাতে পাঠ্যসূচী তৈরী করা ছিল আমাদের প্রথম কাজ। বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ তার পরবর্তী কাজ হিসাবে আমরা গ্রহণ করি। বাস্তব অভিজ্ঞতা হ'ল, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আমাদের ছাত্রদের পক্ষে অনেক সহজে আধুনিক বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে, খেটে খাওয়া মানুষের মনেও বিজ্ঞান বিকশিত হয়েছে। আমরা কোনও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ থেকে ভিয়েতনামী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিনি; কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে কত দ্রুত একটি ভাষা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

চিকিৎসা বিভাগে :

চিকিৎসা বিভাগেরও সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। অনেকের ধারণা ছিল চিকিৎসা শাস্ত্র বিদেশী ভাষাতেই শিখতে হবে। শুধুমাত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভিয়েতনামী ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু ভিয়েতনামী সরকার এ তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মেডিকেল ওয়ার্কার্স জেনারেল এ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ট্রান হু টাউক নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আমি পনের বৎসর বিদেশে থেকে ফরাসী ভাষায় চিকিৎসার বিষয় পড়েছি এবং পড়িয়েছি। ১৯৪৬ সালে দেশে ফিরি, আমি চোখ কান নাক বিভাগের অধ্যাপকের দায়িত্ব পাই। আমার প্রথম বক্তৃতা আমি ভিয়েতনামী ভাষাতেই দেব মনস্থ করি। যদিও অনর্গল ভিয়েতনামী বলতে পারিনি তবুও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পেরেছি। মুক্ত, স্বাধীন ভিয়েতনামের একজন নাগরিক হিসাবে এদিন আমার একান্ত গর্বের বিষয়।" বর্তমানে চিকিৎসা বিভাগের অনেক মূল্যবান আবিষ্কার ও গবেষণার কাজ চলছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জিত হয়েছে, আর এ সমস্তই হয়েছে ভিয়েতনামী ভাষার মাধ্যমে। এই দেশ থেকে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, সিফিলিস প্রভৃতি রোগকে চিরতরে বিদায় দেওয়া হচ্ছে।

পলিটেকনিক :

ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতির অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই ভিয়েতনামে পলিটেকনিক শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের ছিল। কিন্তু ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টি সঠিক ভাবেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা মুষ্টিমেয় লোকের সম্পত্তি হয়ে থাকতে পারে না। একে জনগণের দৈনন্দিনের কার্যকলাপের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। প্রায় অসাধ্য সাধনের উপযোগী পরিশ্রম করে এই বিষয়ের উপর ভিয়েতনামী শব্দসম্ভার প্রস্তুত করা হয়। এর মধ্যে এমন কিছু শব্দ ছিল যেগুলি কর্মরত শ্রমিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না, সেগুলি বাতিল করা যায়। শ্রমিকরাই তাদের উপযোগী শব্দ তৈরী করে দেন। পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োগের মধ্য থেকে কারিগরি বিভাগে ভিয়েতনামী ভাষা সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে হবে না কেন ?

ভিয়েতনামের মতো ছোট্ট দেশ, সামান্য ছিল যার সম্বল। বিদেশী লুঠেরাদের থাবায় যার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা বীভৎস আক্রমণের যে সম্মুখীন, সেই ভিয়েতনাম যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারে তবে আমাদের দেশে কেন সম্ভব নয়? আসল সমস্যা হ'ল আমাদের দেশের শাসকদল শিক্ষা বিস্তার আদৌ পছন্দ করেন না। অশিক্ষার অন্ধকারে দেশের মানুষ নিমজ্জিত থাকুক, বিজ্ঞান আটকে থাকুক গবেষণাগারের মধ্যে, শাসন-শোষণ চলুক নির্বিবাদে, বিনা প্রতিরোধে—এই তাদের উদ্দেশ্য।

এই দুঃসহ অবস্থার অবসান করতে হবে। আমরা ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির পরিবর্তন চাই। শিক্ষা হোক সর্বসাধারণের জন্য, জীবনের সঙ্গে শিক্ষা সংগতিপূর্ণ হয়ে গড়ে উঠুক। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অফুরন্ত কর্মোদ্যোগের উৎসমুখ অবারিত করে দেওয়া হোক। এর

জন্য চাই সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি। মাতৃভাষা হবে সে শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যম। একটি মাত্র ভাষাই হবে ছাত্রদের শিক্ষণীয়। সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালিত হবে একটি ভাষার উপর ভিত্তি করে। সে ভাষা মাতৃভাষা। ত্রিভাষা সূত্র সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। অহেতুক বোঝা ছাত্রদের উপর কেন? শিক্ষাকে যদি সামাজিক করতে হয়, ৪০ কোটি নিরক্ষর মানুষকে যদি শিক্ষার পাদপীঠে নিয়ে আসতে হয় তবে মাতৃভাষার মাধ্যমে এই দুরূহ কর্তব্য সমাধান করা সম্ভব। পরিস্থিতি আজ তাই দাবী করে। আমরা দেশের শাসকদলের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত। সুতরাং এই সংগ্রাম একটি দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। অশিক্ষার অন্ধকারে যারা দিন অতিবাহিত করেন—দেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক, শ্রমিক, কৃষক এদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে, ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে এই আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। ভিয়েতনামের মানুষের অভিজ্ঞতা আমাদের পথ নির্দেশ করছে। আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করছে। তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের মধ্য থেকেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

"প্রকৃত গণতন্ত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, মাতৃভূমির ইতিহাস পাঠ ইত্যাদি সব কিছুই সম্ভব।

—লেনিন

গণটোকাটুকি : একটি রাজনৈতিক ব্যাধি / সাইফুদ্দীন চৌধুরী

ভারতের জনগণ আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে প্রগতির পথটি খুবই দুর্গম, কিন্তু অধঃপতনে যাওয়ার রাস্তাটি খুব উল্লেখযোগ্য ভাবেই চওড়া ও সোজা। স্বাধীনতার পরের তিরিশ বছরে এই অধঃপতনের রাস্তাটির রক্ষণা-বেক্ষনের দায়িত্ব নিয়েছিল কংগ্রেস সরকার। তারা যোগ্যতার সংগে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। শেষের ক'বছরে, বিশেষ করে শ্রীমতি গান্ধীর রাজত্বের বছরগুলিতে তারা অভুতপূর্ব তৎপরতা ও পারদর্শিতা দেখিয়েছে।

সমাজ জীবনের অন্য অন্য ক্ষেত্রগুলি বাদ দিলেও শিক্ষাক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকার অধঃপতনের যে সড়কটি নির্মাণ করেছে তার কোন তুলনা মেলে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকারের কৃতিত্বটি সবচেয়ে সেরা। শিক্ষা মানুষকে সভ্য করে-এরকম একটা দীর্ঘদিনের প্রবাদকে তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিজেদের ক্ষেত্রে একেবারে মিথ্যা প্রমাণ করে ছেড়েছে। অবাক বিস্ময়ে আমরা শিক্ষা জগতে নীতিহীনতার প্রাবল্য ও অপরাধের পোয়াবারো অবস্থাটা দেখেছি মোটামুটি একটা যুগ ধরে। এসব কিছুর বিরুদ্ধেই জোরালো প্রতিবাদ, দৃঢ় প্রতিরোধ ছিল, তাই এখনো বেঁচে আছে শিক্ষা নামক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উপাদানটির কিছ অবশেষ। শিক্ষা জগতে বর্তমানে চলছে উপরোক্ত দুই শক্তি,—অধঃপতনের শক্তি, শিক্ষা ধ্বংসের শক্তি বনাম প্রগতির শক্তির মধ্যে মরণপন লড়াই— **কংগ্রেস সরকার যা চেয়েছিল।**

কংগ্রেস সরকারের উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার। খুব সোজাসুজি তারা ছাত্র সমাজের ভিতর থেকে স্বৈরাচারের একটি জবরদস্ত বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিল। অন্য উন্নত আদর্শ ও নৈতিক বিষয়গুলি ছেড়ে দিলেও, এমনকি—বুর্জোয়া সমাজের গণতান্ত্রিক ও নৈতিক মূল্য-বোধগুলির উপর ভিত্তি করেও এই বাহিনী গড়ে তোলা যেত না। তাই প্রচলিত মূল্যবোধ ও সামাজিক নিয়ম-কানুনকে বেপরোয়া ঔদ্ধত্যে পদদলিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে যারা প্রবেশ করতেন, সমাজের সাধারণ গণতান্ত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার অবকাশ তাদের ছিল। আর যাই হোক, শিক্ষা জগতে প্রবেশ করছে এবং তত্ত্বে ও কর্মে গুন্ডামী রপ্ত করে কেউ বের হচ্ছে অবস্থা এরকম ছিল না। শিক্ষা পদ্ধতিটিরও নিজস্ব কিছু নিয়ম ছিল। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে, পরীক্ষার ক্ষেত্রে এসব নিয়ম শিক্ষক ছাত্র সকলকেই মেনে চলতে হ'ত। একটি শৃংখলাও ছিল। শিক্ষা তখনও আমাদের দেশে সভ্যতার (নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক) সপক্ষে দাঁড়াতে পারত।

এই নিয়ম-কানুন মূল্যবোধগুলি ভেঙ্গে না দিয়ে স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারছিল না। স্বৈরাচারের প্রয়োজন ছিল শিক্ষাকে সভ্যতার, প্রগতির বিপক্ষে দাঁড় করানো। শিক্ষার পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে যেমন পড়াশুনো করে পরীক্ষা দেওয়া, স্কুলে কলেজে ঠিকমত পড়াশুনা ইত্যাদির পরিবর্তন তো হ'লই, বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হ'ল কংগ্রেস সরকার। ছাত্র সমাজ যাতে স্বৈরাচারকে আদর্শ করে তুলতে পারে তার জন্য জরুরী অবস্থার প্রশংসামূলক পাঠ নিতে ছাত্রকে বাধ্য করা হ'ল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে মহান নেত্রী হিসেবে চিত্রিত করা হ'ল। অন্ধ ধর্মবিদ্বেষ এবং যা কিছু স্বৈরাচারের সহায়ক তা জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা হ'ল। ইতিহাসকে বিকৃত করা হ'ল। অর্থাৎ কংগ্রেস সরকার স্বৈরাচারের উপযোগী করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ নিল।

প্রস্তুতি পর্ব :

এই যে ঢেলে সাজানোর কাজ তার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে কংগ্রেস সরকারকে অনেক কসরৎ করতে হয়েছে। প্রথমতঃ ছাত্র সমাজের গণতন্ত্র ধ্বংস করতে হয়েছে। স্বৈরতন্ত্রের নায়কদের এটাই ছিল প্রথম কর্মসূচী। ১৯৭১ সালের ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলির কথা স্মরণ করা যায়। প্রায় প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাজের ওপর হামলা চালিয়েছিল ইন্দিরা সরকারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। এবং ছাত্র সংসদগুলিকে ওরা গায়ের জোরে (পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য অবশ্যই নিয়ে) দখল করেছিল। সংসদগুলি দখল না করে ওরা কিচ্ছুই করতে পারত না। কারণ সংসদগুলির মাধ্যমে ছাত্র সমাজের গণতন্ত্র বাস্তব কর্মকান্ডে রূপ নিত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই কর্মকান্ড ছিল শিক্ষার রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য ছাত্র সমাজের আন্দোলন ও সংগ্রামসমূহ।

শাসকশ্রেণীর কাছে প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছিল এই ভাবে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের অধিষ্ঠিত থাকার ক্ষেত্রে সমাজের উপরি কাঠামোটিকে পরিবর্তিত ভূমিকা পালন করানো। শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতকে তাই কুৎসিত ভাবে নগ্ন করা হ'ল। টেনে নামানো হ'ল পচাগলা নর্দমার মধ্যে। যে কেউ মনে করতে পারবেন ১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনে ছাত্র-পরিষদ যুব কংগ্রেসের ভূমিকা। ছাত্রসমাজের একটা অংশ খুন, গুন্ডামী ও গণতন্ত্র হত্যায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। একটি বৃহত্তম রাজনৈতিক চুরি সংগঠিত হয়েছিল সেবার সাধারণ নির্বাচনে। যারা ঐ চুরির সংগঠক ছিলো সমাজের সাধারণ নিয়মে তাদের অপরাধীর কঠোর সাজা পাওয়া উচিত ছিল। তা হ'ল না। উল্টো এরা লজ্জা সরমের বিন্দুমাত্র বালাই না রেখে বুক ফুলিয়ে পাঁচ বছর রাজত্ব চালালো। কিছু ছাত্র যারা এদের কাজের সংগে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তারা মনে

করলেন সমাজের আগের নিয়ম কানুনগুলো ফালতু হয়ে গেছে। এখন চুরি, গুণ্ডামী ইত্যাদির মধ্যেই সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা নিহিত। কেউ কেউ তাই এসবকেই যে জীবনে আদর্শ করে তুললেন এতে এই ছাত্রদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

যুক্তিসম্মত পরিণতি :

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈরাচারের কর্মসূচীকে একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার হিসেবে দেখলে ভুল হবে। ১৯৪৭ সাল থেকে দেশকে যে পথে কংগ্রেস পরিচালিত করতে চেয়েছে, যে ভাবে অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছে তার যুক্তিসম্মত পরিণতি হিসেবেই—শিক্ষাক্ষেত্রে কংগ্রেসী তিরিশ বছরের ধারাবাহিকতা টানতে হবে।

কংগ্রেস শাসনের প্রথম যুগে তাদের ধনতান্ত্রিক পথে চলার ক্ষেত্রে সংকট এত তীব্র হয়ে ফুটে ওঠেনি। তখনও এগিয়ে চলার, অর্থনৈতিক কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়িত করার অবস্থা ছিল। নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠার এই যুগে শিক্ষারও একটি খোলামেলা বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। এত বড় দেশটার পরিচালনায় মাথার কাজ করতে পারা মানুষেরও প্রয়োজন ছিল অজস্র। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি তরতর করে এগিয়ে চললেই আসে তালে তাল রেখে শিক্ষার এগিয়ে চলার প্রশ্নটি। কিন্তু ধনতান্ত্রিক পথে ভারতের এগিয়ে চলার ব্যাপারটি গোড়া থেকেই ছিল অসম্ভব। প্রথমতঃ ভারত যখন স্বাধীন হ'ল তখন বিশ্ব ধনতন্ত্র দ্রুত ভাঙ্গছে। একটা বিরাট এলাকা জুড়ে ধনতন্ত্র উৎখাত হয়েছে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের বাজার সংকুচিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার প্রসারিত ক্ষেত্রটি নেই। অল্প এলাকা নিয়ে নিজেরা মারপিট করছে এবং হীনবল হচ্ছে। বাইরে পা রাখার মাটি সরে যাওয়ার ফলে যে সংকট তা আভ্যন্তরীণ বাজারে বীভৎস চেহারা নিয়ে আছড়ে পড়ছে। আভ্যন্তরীণ বজারের বিকাশের শর্ত হচ্ছে জনগণের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া, জনগণের অবস্থা ভাল হওয়া। একই সংগে এটাও হবে আবার ধনতন্ত্র ফুলে ফেঁপে উঠবে—তা হয় না। জনগণকে নিঃশেষ করেই মুনাফা লোভী, সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদ এগোতে চাইছে। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ মুক্তি পেতে সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। পুঁজিবাদ বনাম শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণের দ্বন্দ্বটি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। ইতিহাসের নির্দেশে শ্রমিকশ্রেণী জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, পুঁজিবাদ মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এই যখন অবস্থা তখন ভারতে পুঁজিবাদের গলায় মালা দিলেন কংগ্রেস সরকার। তাও কিছু উন্নতি হতে পারত। কিন্তু কংগ্রেসের মুরোদ ছিল না। যদি পারত সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অবশেষ করতে, যদি পারত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করতে এবং পুঁজিবাদ বিকাশের অপরিহার্য যে শর্ত—সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে কৃষকের হাতে যদি জমি দিতে পারত তবে কিছুটা ভাল অবস্থা হতে পারত। কংগ্রেস সরকার এসব কিছুই করেনি। কারণ বিশ্ব পরিস্থিতির নতুন অবস্থায় যখন শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল বাস্তবে রূপ পেয়েছে এবং কৃষক সমাজ বুর্জোয়ার ছল-চাতুরীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, বুর্জোয়ার মিত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকছে না, শ্রমিকশ্রেণীর সংগে মিত্রতায় আবদ্ধ হচ্ছে, তখন বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদীদের ও সামন্ত প্রভুদের বন্ধু হিসেবেই বহাল রাখছে। এসবের ফলে ভারতের বুর্জোয়া বিকাশের প্রাথমিক শর্তগুলি গুরুতর ভাবে লংঘিত হয়েছে এবং ভয়ংকর সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে ভারতীয় অর্থনীতি। অর্থনীতির হাত ধরে চলে যে রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাও স্বভাবতঃই এই সংকট থেকে বাদ পড়েনি।

এটা খুবই সহজ কথা যে সংকটের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে, জনগণের আন্দোলন সংগ্রামগুলিকে দমন করতে উদ্ভব হয়েছিল স্বৈরতন্ত্রের। গণতন্ত্রের দ্বারা শাসনের বুর্জোয়া যুগটি অসম্ভব সংকটে পড়েছিল। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। গণতন্ত্রের মুখোশটি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। স্বৈরাচার আত্মপ্রকাশ করেছিল। এসব কিছুই একটি যুক্তিসম্মত পরিণতিকে নির্দেশ করেছিল।

গণতন্ত্রের 'এ্যানিমিয়া' ও শিক্ষা :

স্বাধীনতার পর কংগ্রেস যে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি হাজির করল তা জন্ম থেকেই রক্তশূন্যতায় ভুগছিল। এটা আমরা ওপরে আলোচনা করেছি। আমরা যে গণতন্ত্র পেলাম তার মধ্যে পূর্ণ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তেজ ও জোর ছিল না। দুর্বল ও খর্বিত ছিল এই গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রে শিক্ষার হাল যা হবার তাই হ'ল। প্রথমতঃ শিক্ষায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। শিক্ষা হ'ল মুষ্টিমেয়ের সম্পদ। অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকারের সংগে শিক্ষার গাঁটছড়াটি দিনের পর দিন শক্ত হ'ল।

যেহেতু শোষণ, ছল-চাতুরী, অন্যায় ও অপরাধের উপর গড়ে উঠেছিল শোষকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা তাই শিক্ষার বিষয়বস্তুতে এই সব কিছুর বিরুদ্ধে কোন মনোভাব যাতে জাগ্রত হতে না পারে তার ব্যবস্থা হ'ল। প্রকৃতপক্ষে এর সপক্ষেই শিক্ষার দর্শনটি রচনা করা হ'ল।

(যে কিশোর ছাত্রদের দুধে জল মিশিয়ে লাভ ক্ষতির অংক শিখতে হয়—ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে যুবকে পরিণত এই ছাত্র বেপরোয়া টোকাটুকি করেও যখন এতটুকু লজ্জিত হয় না তখন খুব বেশী আশ্চর্য হওয়া যায় কি ?)

শিক্ষা জগতে নৈতিক অপরাধের যে বিষয়গুলি বর্তমানে আমাদের চিন্তিত করে তুলেছে তা আলোচনা করতে গেলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দর্শনগত ভিত্তিটিকে অবশ্যই সব সময় মনে রাখতে হবে।

সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি আমাদের শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রতিক্রিয়াশীল। পিছিয়ে পড়া চিন্তা চেতনায় পূর্ণ। প্রকৃত জ্ঞানের পথটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিশ্ব ও সমাজকে বোঝার এবং নিজের প্রয়োজনীয় ভূমিকাটি ধরতে পারার মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে ছাত্রকে সজ্জিত করা হয় না। আমাদের শিক্ষা জগতটি সমাজজীবন থেকে গুরুতর ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সামাজিক কর্ম-

কাণ্ডের সংগে নিজেকে যুক্ত করার তাগিদ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রকে দেয় না। (শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে ছাত্রের সম্পর্কটিও এই নীতিতে গড়ে ওঠে। শিক্ষা ব্যবস্থার ভালমন্দ নিয়ে ছাত্ররা ভাবতে চাইলেও তাকে উপেক্ষা করা হয়। দীর্ঘ দিন ধরে কংগ্রেস সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ছাত্র প্রতিনিধিত্বের দাবী যে অস্বীকার করেছিল তার একটিই কারণ ছাত্রের উপর বিচ্ছিন্নতাবাদ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। আশার কথা বাম সরকার এই দাবী মেনে নিয়েছেন, ও কার্যকরী করছেন।) শিক্ষা ও প্রচলিত দর্শন সমাজের কর্মময় জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেতনাকেই পুষ্ট করে। আত্মসর্বস্ব করে তুলতেই বেশী কার্যকরী হয়। আমি শিক্ষিত, আমার শিক্ষা-সম্পদ নিয়ে আমি যা করব তা আমার জন্যই করব—শেষ মেষ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বহু ছাত্রের জীবন চিন্তায় এই পরিণতি নিয়ে আসে। এটা একটা ভয়ংকর অবস্থা। এই বিচ্ছিন্নতাবাদ পতনের প্রাথমিক ভিতটি তৈরী করে। সমাজের প্রতি কোন দায় না থাকলে, যা কিছু শুধু নিজের জন্যই করার হলে নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক নিয়ম -কানুনগুলি সম্পর্কেও কোন অনুভূতি থাকে না। যারা এই সব মেনে চলেন তাদের অনেকে বোঝেন না কেন মেনে চলেন। যিনি ভাঙেন তারও অপরাধ বোধ জাগে না কারণ নিজেকে ধার্য লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই তার কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

যাই হোক যারা শেষ পর্যন্ত এই ভাঙার পথটি ধরেন তারা প্রথমেই তা করেন এমন নয়। এখানে হাতছানি দেয় এই একই ব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটিগুলি। প্রথমতঃ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, মোদ্দা কথা খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য একটি চাকরী পাওয়ার তাড়না। কাজ করার ক্ষমতার ওপর চাকরী (স্বাধীন ভারতে এ অবস্থা কোনদিনই ছিল না।)।

অবস্থাটা দাঁড়ায় ডিগ্রীর বহরে চাকরীতে। যে সমাজ, যে সরকার চাকরীর অধিকারটিকে শেষ পর্যন্ত এই ডিগ্রীর সীমানায় বেঁধে দেয়, সেই সরকার, সেই সমাজ অনিবার্যভাবেই গায়ে গতরে খাটার লক্ষ জনকে ডিগ্রী রাজত্বের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয় না। এবং এই ভাবে শিক্ষাহীনতাকে এদের চাকরী না দেওয়ার একটা অজুহাত হিসাবে খাড়া করে। বড় ডিগ্রী ছাড়া হেঁজি পেঁজি কোন চাকরীর জন্যই যখন দরবার করা যায় না তখন সহজেই বোঝা যায় আসলে চাকরী দেওয়ার অবস্থাটি ফুরিয়ে যাচ্ছে। চাকরী থাকলে, প্রয়োজন থাকলে—ধরে ধরে লোক জোগাড় হ'ত। শিক্ষা দেওয়ার, ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করতেও বিলম্ব হ'ত না। আসল সংকট চাকরী নেই। তাই সংকট সমাধানের বিষয়টি ডিগ্রী পর্যন্ত চলে আসে আসলে আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার জন্য। সেটা হ'ল ডিগ্রী দেওয়ার জগতটাকেই ধ্বংস করা। প্রথমে ডিগ্রী পাওয়াকে সব রকম উপায়ে অসম্ভব করে তোলা হ'ল। ছাত্রের ঘাড়ে চাপান হ'ল পর্বতপ্রমাণ সিলেবাসের বোঝা। তিনটে ভাষা পড়। এক একটি বিষয়ের দরকারী অদরকারী সব পড়। প্রতিটি বিষয়ের অদরকারী অংশগুলি বাদ দিয়ে সিলেবাসের বপু সহজেই কমান যায়। তা করা হ'ল না। তাও কোন রকমে চলে যেত। কিন্তু ক্লাশে পাঠ নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। শত শত ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক। যান্ত্রিকতার চূড়ান্ত। ছাত্র বিধ্বস্ত। শিক্ষকদের পক্ষেও এই পরিবেশ অনুকূল নয়। অর্থনৈতিক ভাবনা-চিন্তায় শিক্ষক জর্জরিত। সরকার ও সমাজের দায়িত্বহীনতা তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই স্রেফ ব্যবসায়ী হতে বাধ্য করে। শিক্ষক রুটিন মাফিক কাজ করেন। ছাত্র শিখল কি শিখল না এজন্য তার সামাজিক কোন দায় নেই। 'মানুষের প্রতি সমতাই হোক জীবিকার প্রতি ভালবাসার উৎস' এই সূত্রটি নির্মমভাবে হারিয়ে যায়।

গণফেলের মহামারী:

শিক্ষা সংকোচনের প্রসংগে বহু কথা আমরা শুনেছি। কংগ্রেস সরকার এই নীতি চালু করেছে, অর্থনৈতিক বরাদ্দ ছাঁটাই ইত্যাদি তো আছেই। ছাত্রস্ফীতি রোধ করার হীনতম প্রচেষ্টাগুলি এর অন্যতম। এর জঘন্যতম প্রকাশটি হয়েছে গণফেলের ঘটনায়। পরীক্ষার্থী ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন ৯০ জন পর্যন্ত ফেল এমনও হয়েছে আমাদের দেশে। কর্তাব্যক্তিরা নির্বিকার। কেন এত ফেল? তাদের উত্তর, ছাত্র পড়াশুনো করে না তাই। কেন করে না? কার দায়িত্ব? কি পরিবেশ? প্রতিকারের পথ কি? কোন উত্তর নেই। কোন সভ্য দেশে এরকম দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কর্তৃপক্ষ নিয়ে কি করে চলতে পারে তাই ভাববার বিষয়। আরও ভাববার, যে সমাজ ব্যবস্থা এই কর্তৃপক্ষগুলিকে জন্ম দেয় তাকে আর কতদিন সহ্য করতে হবে? সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রকে মুক্ত করে, উন্নত করে। আর আমাদের পরীক্ষা ছাত্রের সামনে বিভীষিকা। পড়াশুনো না হওয়ার যে কথাগুলি উপরে আলোচিত হয়েছে তার শিকার ছাত্র সমাজ পরীক্ষার সময় অসহায় হয়ে পড়ে। অথচ এই পরীক্ষাই পারে একটি ডিগ্রী দিতে। পারে মানসিক যন্ত্রণা অবসানের ছাড়পত্র দিতে। ছাত্রের এই যখন মানসিক অবস্থা তখন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মত প্রায়ই ঘটে সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন আসার ঘটনা। প্রশ্নপত্রের অবৈজ্ঞানিক গঠন। ধার্য সময়ের সংগে সামঞ্জস্যহীনতা।

স্বৈরাচার তার বিকট চেহারাটি দেখাবার আগে পর্যন্ত এই অসহায় ছাত্রদের অনেকে চুরি করত। অনেক ভয়ে, অনেক লুকিয়ে, লজ্জার মাথা খেয়ে—ছোট কাগজ, খাতা ইত্যাদি নিয়ে নকল করত। একটা অপরাধবোধ ছিল। এতদসত্ত্বেও ছাত্রদের একটা বড় অংশ কখনই নীতিহীন হতে পারত না। এদের কারও ভাগ্যে বিড়ালের সিকে ছিঁড়ত। যে সব প্রশ্ন পড়ে এসেছে তা পেয়ে যেত ইত্যাদি। ইতিমধ্যে বাজারে শর্টকাট পদ্ধতি অনেক বের হয়েছিল। লাস্ট মিনিটস্ সাজেশন ধরনের বইয়ে কি প্রশ্ন আসবে তার গ্যারাণ্টী দেওয়া হ'ত। পরীক্ষায় তার হুবহু প্রশ্ন আসতো বহু ক্ষেত্রে। কি করে এসব হ'ত কেউ কিছু অনুমান করতে পারেন। কিন্তু একটা ভাল ব্যবসা

যে চালু হয়ে আজও বহালতবিয়তে চলছে সেটা খুবই সত্যি। এই ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি তুলনাহীন। কত টিউটোরিয়াল কলেজ গড়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মত। এখানে কিন্তুর মাইনে পত্তরের ঠেলাঠেলি। তেমনি ভীড়েরও বহর। এরা সত্যি সত্যি পাশের কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয় করতে পারে নইলে এত ভীড় হবে কেন? কিন্তু কি করে ওরা তা পারে? সেটাই রহস্য।

এসব কিছুর মধ্যেও বহু ছাত্র শুধু নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এরা নিজেরা আপ্রাণ পড়াশুনো করে, পরীক্ষা দেয়। আশ্চর্য কি সম্ভবতঃ এরাই বেশী ফেল করে! নিশ্চিত বলা যায় কংগ্রেসের তরফ থেকে টোকাটুকিতে প্রত্যক্ষ মদত্ দেওয়ার যুগে, পড়াশুনো করলে ফেল, টোকাটুকি করলে পাশ এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় ভাল ছেলেদের ফেল হওয়াটা খুবই প্রয়োজন ছিল। অন্ততঃ একবার এটা হ'ল যে ব্যাপক গণটোকাটুকির সংগে ভাল হ'ল পাশের হার। বলা যায় এর মধ্য দিয়ে একটা ইন্সেনটিভ্ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গণটোকাটুকি আসলে শিক্ষা-সংকোচনের এবং শিক্ষা-ধ্বংসের একটি হাতিয়ার। তাই বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে টোকাটুকি যত বেড়েছে, ফেল ততই জাঁকিয়ে বসেছে। শিক্ষা ধ্বংসের কর্তারা আর একটি অজুহাত দাঁড় করিয়ে ছিলেন তা সবারই জানা। ব্যাপক ফেলের এরপর ব্যাখ্যাটা তারা দিয়েছিলেন, 'টোকাটুকি করবে, ফেল তো হবেই।'

গণটোকাটুকির রাজনৈতিক অপরাধী:

গণটোকাটুকির রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দায়ী কংগ্রেস। এই কংগ্রেস ১৯৭২-এ একেবারে বুক ফুলিয়ে রাজনৈতিক গণটোকাটুকি শুরু করেছিল। ৭২এ কত মানুষ ভোট দিতে যেয়ে ফিরে এসেছিলে তার ইয়ত্তা নেই। সহৃদয় কংগ্রেসীরা এদের ভোটগুলি দিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঐতিহ্য গত ৮ বছরে কংগ্রেসী নেতারা তাদের কর্মীদের দান করতে ভোলেননি। তাই কংগ্রেস কর্মীরা তাদের কোন কোন নেতার পরীক্ষার কষ্টটুকু নিজরাই বহন করেছিলেন। একটি ক্ষেত্রে এই কেস্ ধরা পড়েছিল, (মনে আছে হাওড়ার জনৈক কংগ্রেস নেতার হয়ে অন্য একজনের পরীক্ষা দেওয়ার কথা।) এসবের জন্য ওদের কোন অপরাধ বোধ ছিল না। শিক্ষা জগতে দুর্নীতির স্লুইস্ গেট খুলে দেওয়ার কর্তব্যটা ওদের ছিল রাজনৈতিক। কারণ ওরা স্বৈরাচারের বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিল ছাত্র সমাজের মধ্য থেকে। প্রথমে এই কাজে খুব বেশী একটা ছাত্র পাওয়া যায়নি। যাদের পাওয়া গেল তারাও কাঁচা। তাই সমাজ বিরোধীদের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হ'ল। অসুবিধা ছিল না। সাথে সরকার। আর কর্তৃপক্ষের কিছু দুর্নীতি-পরায়ণ লোক। ভয় দেখিয়েও অনেক ক্ষেত্রে কাজ হাসিল করা হ'ল। শিক্ষা সুস্থভাবে বেঁচে থাকলে এই আমদানী করা নেতাদের তত্ত্ব কথাই কে শুনবে, কেই বা স্বৈরাচারের পথ নেবে। তাই এদের দ্বিতীয় কাজ হ'ল শিক্ষার সুস্থ অবস্থাটি ধ্বংস করা। অসততা ও অন্যায়ের প্লাবন বইয়ে দেওয়া হ'ল।

শিক্ষার পরিবেশ, আমরা আগেই দেখেছি, ছিল ছাত্রের পক্ষে অসহনীয়। পরীক্ষার সময় অসহায় ছাত্রের হ'ত হাঁড়ি কাঠে বলির পাঁঠার মত অবস্থা। এর ফলে যারা লুকিয়ে চুরি করত, নতুন অবস্থা তাদের খুবই উৎসাহিত করল। এরা নিজেরা অপরাধবোধে সংকুচিত হয়ে ছিল, টোকাটুকিকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে এরা মুক্তি পেল। অনেকে উল্লাসে মেতে উঠল। এমনও অবস্থা হ'ল যে টোকাটুকি না করার অপরাধে ছাত্র নির্যাতিত হলেন। অবস্থাটা কি রকম উল্টে গেল। আগে যারা টুকতো তারা মুখ দেখাত না, এখন যারা টোকে না তারা নির্যাতনের ভয়ে লুকিয়ে রইল। গত কয়েকটি কংগ্রেসী বছরে এই রকম একটি ভয়ংকর ব্যবস্থা চালু হ'ল। সৎ হয়ে থাকা চলবে না এই ব্যবস্থার মূল কথাটি ছিল এই।

নৈরাজ্যের অবদান:

আমরা দেখেছি ধনতন্ত্রের, শাসকশ্রেণীর সংকট যত বাড়ে ততই নৈরাজ্যের ছায়াটি বিস্তৃততর হয়। যে সাধারণ নিয়ম কানুন দিয়ে সমাজকে বেঁধে রাখা হয় তা ঢিলে ঢালা হয়ে যায়। কারণ এই অবস্থায় সব কিছু এলোমেলো করে দেওয়ার মধ্যে শাসকশ্রেণীর লুটে পুটে খাওয়ার সুবিধা হয়। শাসকশ্রেণীই চায় নৈরাজ্যের বিস্তার। জনগণ নৈরাজ্যে মেতে উঠুক সংকটের নির্দিষ্ট পর্যায়ে শাসকশ্রেণীর এছাড়া দ্বিতীয় কোন কাম্য থাকে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের ঘটনাগুলি বিচার করলে আমরা দেখব ছাত্রসমাজকে অধঃপতিত করার চক্রান্তের এগুলি বেশ শক্ত সমর্থ খুঁটি। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা না হওয়া, বারে বারে পরীক্ষা পেছানো, ফল প্রকাশে বিপজ্জনক বিলম্ব, হাজার হাজার খাতা হারিয়ে যাওয়া, কিংবা উত্তরপত্রের ঠোঙায় পরিণত হওয়া ইত্যাদি বহুবিধ ঘটনা বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজের সামনে নৈরাজ্যের পথ গ্রহণে চূড়ান্ত ভাবেই হাতছানি দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের প্রতি ছাত্রসমাজ দিনে দিনে বিশ্বাস হারিয়েছে। কর্তৃপক্ষও আগের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসবের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের সুনির্দিষ্ট বক্তব্যগুলি ধৈর্য দিয়ে শোনেননি। বহুক্ষেত্রেই ছাত্রসমাজের সঙ্গে শত্রুর মত আচরণ করেছেন। এসব কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটেছে, তা ভাবার কোন কারণ নেই। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ছাত্রসমাজকে উত্তেজিত করার জন্যই পরিচালিত হয়েছে।

নৈরাজ্য কায়েমের একটি প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে দুর্নীতি। বিগত ক'বছরে শিক্ষা জগতে দুর্নীতির জোয়ার বয়ে গেছে। আমরা জানি দুর্নীতি ছাড়া শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা বাঁচতে পারে না। কারণ জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে, সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে

দুর্নীতি তাদের প্রধান অবলম্বন। আর এই দুর্নীতির বিষয়গুলি নৈরাজ্য সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ডাক্তারী পরীক্ষায় 'ক্যাচ' ব্যবস্থার কথা অহরহ শোনা যায়। এটা হচ্ছে পরীক্ষা ক্ষেত্রে একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা। মুরুব্বী ধরে পাশের এই ব্যবস্থা ছাত্রসমাজকে কখনই শান্ত থাকতে দিতে পার না। আরও অনেক কিছুই এরকম আছে। কিছু শিক্ষক কিছু ছাত্রকে পরীক্ষায় আগেই প্রশ্ন বলে দেন। উল্টো দিকে কিছু ছাত্র দুর্নীতিপরায়ণ কর্তৃপক্ষগুলির সাহায্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে। এসব কিছুই একটা সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছিল বেশ ক'বছর ধরে।

গণটোকাটুকির গণতন্ত্র :

'ইংলন্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' বইয়ে এঙ্গেলস এরকম একটা কথা লিখেছিলেন যে জল যেমন উত্তাপের একটি মাত্রা অতিক্রম করলেই বাষ্পে পরিণত হয় তেমনি ধনতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট অবস্থা অবশ্যম্ভাবী ভাবেই সমাজের একাংশকে সমাজ বিরোধীতে পরিণত করে। ধনতন্ত্রের প্রচন্ড নিষ্পেষণ এই পরিণতিতে এদের নিয়ে পৌঁছয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংকটের যে আলোচনা আমরা করেছি তারই ফলশ্রুতি গণটোকাটুকি। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ছাত্র-সমাজের একাংশের অধঃপতন।

সম্প্রতি গণটোকাটুকির অভিযোগে আইন পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। ভাল কথা। বলিষ্ঠ পদক্ষেপ. সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্তৃপক্ষকেও জবাব দিতে হবে দীর্ঘদিন ধরে এই গণটোকাটুকি চলতে পারল কি করে।

আমরা যা শুনলাম তা ভয়ংকর। পড়াশুনার কোন ব্যবস্থাই আইন কলেজে সিদ্ধার্থ রায়ের রাজত্বে ছিল না। স্থায়ী শিক্ষক মাত্র কয়েকজন। বাকী শিক্ষকেরা পার্ট টাইম। তারা প্রাকটিশ করে তারপরে শিক্ষাদাতা। ৮টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তিন ঘণ্টায়। বড় বড় প্রশ্ন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কেউই যা মেনে নিতে পারেন না। সিলেবাসের অসহনীয় বোঝা। বিগত দিনে এ সবের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বরগুলিকে রুদ্ধ করা হয়েছিল। বিগত কালের রাজনৈতিক নেতারা এসব চলুক তা চেয়েছিলেন। এবং টোকাটুকির সপক্ষে এই বাস্তব অবস্থার জয়গান করেছিলেন। এক্ষেত্রে সরকারী মনোভাব কর্তৃপক্ষের অজানা ছিল না। শোনা যায় তারা তাদের কর্তব্য সমাপন করেছিলেন প্রতি বছর পরীক্ষার আগে একটি সাহায্য পুস্তক প্রকাশ করে। অনেক পরীক্ষার্থী এই নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করত। এখন প্রশ্নটি নিশ্চয়ই এভাবে তোলা যায় যে গত ৮-১০ বছর ধরে আইন কলেজের কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা কি করছিলেন? বোঝা গেল ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করেনি, অবস্থাটা কেমন সয়ে গেছিল। কিন্তু তারা কী করে নীরবে সব দেখলেন? রাজনৈতিক চাপ ছিল? অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তাদেরও তো মেরুদণ্ড ছিল। সোজা করে বেরিয়ে এলে সমাজ তাদের সেলাম জানাত। পরিহাস হচ্ছে এই যে বিগত দিন-গুলিতে এর কোন কিছুই হয়নি। কারণ তখন স্বৈরতন্ত্রের গণতন্ত্রটি ছিল গণটোকাটুকির জন্য। অধঃপতনের জন্য।

নৈরাজ্যবাদীদের বাহানা :

নৈরাজ্যবাদীদের চেহারা বেশ ক'বছর আমরা দেখেছি। পরীক্ষার উপর আক্রমণ যারা চালিয়েছিল, যারা বুর্জোয়া শিক্ষা ধ্বংসের জন্য জেহাদী হয়েছিল তারা যেমন ছিল নৈরাজ্যবাদী তেমনি আইন পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে নানান অসুবিধার অজুহাতে যারা টোকাটুকির সমর্থনে সোচ্চার হচ্ছেন—বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙছেন—তারাও নৈরাজ্যবাদী। উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য মিল একটু চেষ্টা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়।

নৈরাজ্যবাদীরা দাবী তুলেছে আগে ব্যবস্থা ঠিক কর—তবে টোকাটুকি বন্ধ হবে। এটা একটা অসম্ভব রকমের পাগলামী। বিষয়টিকে এইভাবে শর্তবন্ধ করা হলে—ব্যবস্থা ঠিক করার প্রশ্নটি আর থাকে না। আসলে ওরা অব্যবস্থা গুলিকে জীইয়ে রাখতে চায়। প্রতি পরীক্ষায় এই কারণ দেখিয়ে টোকাটুকি চালিয়ে যাবে বলে। নৈরাজ্যবাদীদের ন্যায় নীতির কোন বালাই নেই। এরা যখন অতিবিপ্লবী হয় তখনও তাই। ওদের কর্মসূচী শিক্ষাব্যবস্থা ভাঙ্গা। তাই টোকাটুকির দাবীতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙ্গা হয় তখন এরা উল্লসিত হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের রঙটি চেনার তাদের প্রয়োজন হয় না। ভাঙ্গা হচ্ছে এতেই ওরা খুশী। ভাঙ্গা হচ্ছে জনগণের সর্বনাশ করার জন্য এটা বোঝবার তাদের কোন প্রয়োজন নেই।

নতুন পরিস্থিতি :

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুস্থ ও উন্নত করার জন্য তার সরকারের জেহাদ যেমন ঘোষণা করেছেন, তেমনি গণ-টোকাটুকি প্রতিরোধের জন্য ছাত্র সমাজের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, তার সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। এই প্রথম একটি সরকার ছাত্র সমাজের ভালর জন্য চিন্তিত এবং কর্মসূচী গ্রহণে তৎপর। বামফ্রন্ট সরকার সমগ্রভাবে প্রগতিশীল গণআন্দোলন জোরদার করতে চায়, টোকাটুকি প্রতিরোধ করতে চায়। কিন্তু কেন? কারণ নৈরাজ্য কায়েম করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তারা নতুন দেশ গড়ার সংগ্রামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তরুণ যুব সমাজকে টোকাটুকির জোয়ারে ভাসিয়ে দিলে এই সংগ্রাম অনিবার্য ক্ষতির সম্মুখীন হবে। উজ্জ্বল যৌবন শক্তি দেশ গড়ার সবচেয়ে মূল্যবান অবদান। সংগ্রামের সেরা সৈনিক। এরা ব্যবহারিক জীবনে অসৎ হলে কাম্য সংগ্রাম গুলিতে কখনই সৎ ও বিশ্বস্ত থাকতে পারবে না। তাই ক্ষুদ্র হলেও ছাত্রদের যে অংশ টোকাটুকি করে তাদের তা থেকে ফিরিয়ে আনা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য। নৈতিক কর্তব্য বটেই। ইন্দিরা স্বৈরশাসনের যুগে শিক্ষা

ধ্বংসের চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, আজ এই কাজে তারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। প্রগতিশীল আন্দোলন শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাল করতে চায়, উন্নত করতে চায়। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলনের প্রগতিশীল ধারাটি বিগত দিনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে আজ শিক্ষাব্যবস্থার কিছুই অবশেষ থাকত না। 'বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গ' বিপ্লবী বুলি আউড়িয়ে কোন লাভ নেই। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা এখন বুর্জোয়ারাই ভাঙ্গছে। অতএব আমাদের বিপ্লবীরা কার স্বার্থ রক্ষা করছেন তা তাদের ভেবে দেখা দরকার।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো বেঁচে আছে কারণ জনগণ বুক দিয়ে একে রক্ষা করেছেন। শাসকশ্রেণীর চক্রান্তগুলিকে ব্যর্থ করেছেন। শিক্ষার অঙ্গনে গণসমাবেশ ঘটতে দিতে শাসকশ্রেণী চায়নি। জনগণ সংগ্রাম করেই এক্ষেত্রে কিছু অধিকার আদায় করেছেন। সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখব ভালর পক্ষে সব ভূমিকাটুকু আমাদের জনগণ ও প্রগতিশীল ছাত্র সমাজের।

সিলেবাসের প্রতিক্রিয়াশীলতা রক্ষণশীলতা অবৈজ্ঞানিকতার অভিযোগ যখন প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলন তোলে তখন তারাই বিকল্প প্রস্তাবের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালান করে। পড়াশুনো ধ্বংস করে দেয় না। এতে শাসকশ্রেণী যা চায় তাই করা হয়।'

বর্তমান অবস্থায় বাম ছাত্র আন্দোলন প্রস্তাবিত সংস্কারের দাবীগুলি নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক চরিত্রের। শুধু বিদ্রোহের চমকে, ভাঙ্গার জেহাদেই এর শেষ নেই। আছে গড়ার আহ্বান।

উচ্ছৃংখল ভাঙ্গচুরের সমর্থনে না দাঁড়িয়েও একথা বলা যায় ছাত্রদের যে অংশ টোকাটুকির সপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙ্গচুর করলেন, কয়েক মাস আগে তারাই যদি অব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে বিকল্প সুব্যবস্থার দাবীতে সংগ্রামের রাস্তায় সামিল হতেন তাহলে চেহারাটাই পাল্টে যেত। এক্ষেত্রে বিশৃংখলার ঘটনা ঘটার উপায় ছিল না। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই যা হয়। কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্ররোচনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ কোন উত্তেজিত আচরণ করলেও তা এত নিন্দার হ'ত না। মানুষ তাদের অভিনন্দিত করতেন কারণ ভাল কিছুর জন্য তারা এগিয়ে এসেছেন। চলার পথে ভুল ত্রুটিকে কেউই বড় করে দেখতেন না। আমরা এখন একটি তাৎপর্যপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। শিক্ষার রক্ষা ও সম্প্রসারণের আন্দোলনগুলি এখন জোরদার করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও অব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে, দুর্নীতি ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। বিগত দিনে আমরা অনেক কঠিন সংগ্রাম করেছি, অনেক দুঃখ কষ্ট আমাদের ছাত্রসমাজ সহ্য করেছেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য, সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহার্য তাগিদে আরও কষ্ট আমাদের সহ্য করতে হবে। সাময়িক সুবিধার পথ বর্জন করতে হবে। প্রগতির অনেক কিছুই আমাদের উপর নির্ভর করছে।

আমাদের চোখের সামনেই—ধনতন্ত্রের নিদারুণ অবক্ষয় ফুটে উঠেছে। সমাজতন্ত্রের দুনিয়া আমাদের ভবিষ্যতের উপর বেশী বেশী করে আধিপত্য বিস্তার করছে। ধনতন্ত্রের পচনের হাত থেকে সমাজ সভ্যতা ও শিক্ষাকে রক্ষা করে—সুখী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলা ছাড়া আমাদের ছাত্রসমাজের সামনে অন্য কোন পথ নেই।

"আমরা শুরু করে দিয়েছি। কখন, কোন তারিখে এবং কোন সময়ে কোন দেশের সর্বহারা এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করবে তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—বরফ ভাঙ্গা হয়েছে, রাস্তা খোলা হয়েছে, এবং পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

—লেনিন

খেলাধুলা সম্পর্কে কয়েকটি কথা / অধ্যাপক অশোক দাশগুপ্ত

খেলাধুলো করা বা খেলা দেখতে যাওয়া এসব চুকিয়ে দিয়েছি অনেকদিন। কিন্তু কেন জানি না সকালে খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে অন্য পাতার খবরগুলির মত খেলার পাতার খবরের দিকে আমার মন আজও আকৃষ্ট হয়। সেদিন কাগজের পাতায় দেখলাম আর্জেন্টিনার বুয়েনার্স এয়ারসে ১৯৭৮ সালের বিশ্ব কাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায়ের আসর বসছে। বিশ্বের ছোট বড় কয়েকটি দেশ এতে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু ষাট কোটি মানুষের দেশ ভারত থেকে বিশ্ব কাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায়ে দল পাঠানো ত' দূরের কথা প্রাথমিক পর্যায়ের খেলাতেই অংশগ্রহণ করার অধিকার আমাদের দেশ অর্জন করতে পারেনি। একজন ভারতবাসী হিসাবে ভাবতে খুব লজ্জা লাগছিল যে খেলাধুলোয় আমরা কোথায় আছি?

সেদিনই অফিসে যাব বলে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎই দেখা হয়ে গেল ছেলেটির সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন্ ক্লাবে খেলছ?" মুচকি হেসে ছেলেটি জবাব দিল, "কোনও ক্লাবেই খেলছি না। তিন বছর আগে বাবার চাকরীটা চলে যাবার পর এক বছর নানা গঞ্জনা সহ্য করেও খেলেছি। তারপর আর পারলাম না। সারাদিন কাজকর্ম করার পর খেলা ত' দূরের কথা খেলার মাঠের ধারেকাছেও যাবার সময় পাই না।" এই কথা শোনার পর কোনও কথাই বলতে পারলাম না। ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে খুব অল্প বয়স থেকেই ছেলেটি পাড়ার সকলের নজর কেড়েছিল। সকলে বলত সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে ছেলেটি একজন পাকা খেলোয়াড় হবে। একজন উদীয়মান খেলোয়াড়ের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের আগেই ঝরে পড়ার খবর স্বভাবতই আমাকে গভীরভাবে পীড়া দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যে আমাদের দেশে এরকম কত সম্ভাবনাময় প্রতিভাই ত' এইভাবে অসময়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই কথা ভাবতে ভাবতে বাস কখন বৌবাজার ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে ধর্মতলার কাছাকাছি চলে এসেছে তা টেরই পাইনি। বাস থেকে নেমেই ভীড়ের মধ্যে পড়লাম। এত লোক এখানে ভীড় করেছে কেন? অবশ্য এ প্রশ্নের জবাব পেতে খুব সময় লাগল না। নানা চীৎকার চেঁচামেচিতে বুঝতে অসুবিধে হ'ল না কলকাতা ফুটবল লীগে দল বদলের পালার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতেই খেলাপাগল ছেলেগুলি ভীড় করেছে। ফুটবল লীগের তিন প্রধান দল ছাড়া অন্য ক্লাবগুলিতে কোন খেলোয়াড় এলেন বা কে চলে গেলেন সে সম্পর্কে তাদের কোনও কৌতূহলই দেখলাম না। এদের সব আকর্ষণই ছিল তিন প্রধান দলকে কেন্দ্র করেই। সমস্ত ব্যাপারটা কিছুটা অদ্ভুত ঠেকলেও অল্প বয়সী ক্রীড়ামোদীদের উৎসাহকে নিশ্চয়ই ছোট করে দেখতে পারিনি।

সেদিনই বিকেলে অফিস থেকে বাড়ী ফিরবার সময় পাড়ায় অন্য দিনের মতই দেখলাম অল্পবয়সী ছেলেরা রাস্তার মোড়ে বা রকে বা চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে। অধিকাংশেরই আলোচনার বিষয়বস্তু খেলাধুলো। এদের কাউকে যদি প্রশ্ন করা যেত যে সে সারাদিন কতটুকু সময় কোনও না কোনও খেলাধুলো করেছে তাহলে উত্তর পাওয়া যেত—সুযোগ কোথায়, সময় কোথায়, খেলার মাঠ কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাবতে খুবই খারাপ লাগল যে আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা সারাদিন কিছুটা সময় কোনও না কোনও খেলাধুলো না করাটাকে লজ্জার বিষয় বলে কখনই মনে করতে পারে না। অথচ, এই পৃথিবীতেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্পর্কে শুনেছি যে সেখানে ছেলেমেয়েরা কোনও না কোনও খেলাধুলো না করার কথা ভাবতেই পারে না।

একদিনের কিছু অভিজ্ঞতা হিসাবে যা তুলে ধরা হ'ল তা খেলাধুলোর প্রশ্নে আমাদের দেশে বাস্তব চিত্রের কয়েকটি দিক মাত্র। আমাদের দেশে উৎসাহী ক্রীড়ামোদীর অভাব নেই, সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়ের অভাব নেই, খেলোয়াড়দের নিষ্ঠাতে ঘাটতি নেই তা সত্বেও এটাই বাস্তব সত্য যে খেলাধুলোর প্রশ্নে আমাদের দেশের মান লজ্জাজনকভাবে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু কেন এই অবস্থা? এই অবস্থা সৃষ্টি করলই বা কারা?

যে কোনও দেশের অগ্রগতির জন্য সেই দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য গঠনের প্রশ্নটি একান্ত অপরিহার্য। খেলাধুলো দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য গঠনে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে গড়ে তোলে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও শৃংখলাবোধ। যে কোনও জাতির পক্ষে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য এই খেলাধুলোর বিষয়টি আমাদের দেশে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হচ্ছে।

চোখ কান খোলা রেখে সমস্ত কিছু বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে একটি দেশের খেলাধুলোর বিষয়টি সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যেতে পারে না।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে ও সঙ্গে সঙ্গে শাসন ক্ষমতাকে যারা কব্জা করে রেখেছে তারা হ'ল দেশের মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজিপতির নেতৃত্বে পুঁজিপতি ও জমিদার জোতদারেরা। এরা নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার লালসা চরিতার্থ করতে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মধ্যে সংহতি, শৃংখলা ও ঐক্য মুষ্টিমেয় এই মানুষদের কাছে কখনই কাম্য নয়। স্বভাবতই সমগ্র জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতির স্বার্থে দেশের অগণিত মানুষের মধ্যে ঐক্য

ও শৃংখলা গড়ে উঠবার সহায়ক কোনও নীতিই এরা অনিবার্য কারণে গ্রহণ করতে পারে না। খেলাধূলার প্রশ্নে দেশের শাসকেরা যে নীতি গ্রহণ করেছে তা তাদের সামগ্রিক চিন্তার দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। সমাজ জীবনের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধূলার ক্ষেত্রে তাদের নীতি অনিবার্যভাবেই খেলাধূলার প্রসার ও উন্নতি ঘটানোর সহায়ক কিছুতেই হতে পারেনি।

আমাদের দেশে গত তিরিশ বছর ধরে নানা অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা হয়েছে আর পাশাপাশি গ্রামের শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ মানুষ যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল সেই কৃষকদের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ কৃষক তাদের একমাত্র সম্বল জমিটুকু হারিয়েছে, সারা বছর তাদের কাজের ব্যবস্থা নেই। নিঃস্ব ও সম্বলহীন কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা আশংকাজনকভাবে কমেছে। লক্ষ লক্ষ কৃষক দিন কাটাচ্ছে অর্দ্ধাহারে, অনা-হারে। আমাদের দেশের গ্রামগুলিতে এই ভয়ংকর চিত্রের পাশাপাশি প্রাচুর্য ও বিলাসিতার চিত্রও চোখে পড়বে। প্রাচুর্য ও বিলাসিতার মধ্যে রয়েছে গ্রামের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। এদের হাতেই দেশের জমি ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এরা প্রতি বছরই ফুলে ফেঁপে উঠছে। এরা হ'ল গ্রামের জমিদার, জোতদার, মহাজন, ফসলের একচেটিয়া কারবারী। দেশের গ্রামীণ জীবনে এই অবস্থার মধ্যে গ্রামে খেলাধুলো প্রসারিত হবে এই কথা কিভাবে কল্পনা করা যায়? দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক ও তাদের ছেলেমেয়েরা সারাদিন পেটের চিন্তা করবে, না খেলাধুলো করবে। কৃষকদের কাছে খেলাধুলো বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রামীণ অর্থনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেখানকার খেলাধুলোও নিয়ন্ত্রণ করে তারাই। ফলে গ্রামে অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে খেলাধুলো সীমাবদ্ধ থাকছে। গ্রামীণ খেলাধূলার পরিচালকদের মুনাফা করার মনোবৃত্তি খেলাধুলোকে নিছক পণ্যে পরিণত করেছে। এই অবস্থায় অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে যে খেলাধুলো সীমাবদ্ধ আছে তার মানেরও অবনতি ঘটছে।

গ্রামে কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনে চরম দুরবস্থা শহর ও শিল্পাঞ্চলের মানুষদের অর্থনৈতিক জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলি বেকারীতে ছেয়ে গেছে। বেকারী আজ ঘরে ঘরে। কৃষকদের অর্থ-নৈতিক জীবনে দুরবস্থার ফলে শিল্প ক্ষেত্রে গভীর সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই সংকটের বোঝা বইছে কারা? ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থায় শিল্প মালিক এই সংকটের বোঝা শ্রমিক কর্মচারীদের কাঁধেই বেশী বেশী করে চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে ছাটাই, লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজার। কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা এর শিকার হচ্ছে—বেকারের তালিকায় নাম লেখাতে বাধ্য হচ্ছে। এই অবস্থায় আজ ঘরে ঘরে সমস্যা। এর মধ্যে শহরে খেলাধূলার অবস্থা কি হবে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। শহরেও অধিকাংশ ছেলেমেয়েই খেলাধুলো করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। ফলে শহরেও খুব সামান্য সংখ্যক ছেলেমেয়ের মধ্যে খেলাধুলো সীমাবদ্ধ থাকছে।

যে সমস্ত ছেলেমেয়ে খেলাধুলো করতে আগ্রহী তারা খেলাধুলো করার সুযোগ কোথায় পেতে পারে? স্কুলে, কলেজে বা ছোট বড় বিভিন্ন ক্লাবে এদের এই সুযোগ হতে পারে। কিন্তু স্কুলে বা কলেজে যে সুযোগটুকু পাওয়া যায় তা অত্যন্ত সীমিত। স্কুলে বা কলেজে খেলাধুলো বাধ্যতামূলক নয়, সকল ছাত্রছাত্রীর খেলাধূলার ব্যবস্থা করার আর্থিক সঙ্গতি কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা অধিকাংশ স্কুলে বা কলেজে খেলার মাঠ নেই। এই অবস্থায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সারা বছর খেলাধুলো একেবারেই হয় না, আর যেখানে কিছুটা নিয়মরক্ষা করার জন্য হয় সেখানে খুব সামান্য সংখ্যক ছেলেমেয়েকেই খেলায় পাওয়া যায়। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার জন্য কোনও রকমে একটা দল গড়ে তোলা হয়। কিন্তু অধি-কাংশ ক্ষেত্রে খেলাধুলোয় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে খেলানোর, অনুশীলন করানোর ও ট্রেনিং দেবার কোনও সুযোগ বা ব্যবস্থা না থাকায় খেলোয়াড়দের মধ্যে পার-স্পরিক বোঝাপড়া ও দলগত সংহতি গড়ে উঠতে পারে না। সমস্ত স্কুলে বা কলেজে প্রতি বছরে একদিন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে। সারা বছরে যেখানে খেলাধূলার নামগন্ধ নেই সেখানে এই অনুষ্ঠানে প্রতি-যোগীদের মান কি রকম হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। সব রকম অব্যবস্থার মধ্যে স্কুলে বা কলেজে খেলা-ধুলো নিছক প্রহসনে পরিণত হয়।

শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে ছোট বড় বহু ক্লাব দেখতে পাওয়া যাবে। ছোট ক্লাবগুলি গড়ে উঠেছে মূলতঃ কিছু উৎসাহী ক্রীড়ামোদীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। ক্লাবের সামান্য কিছু সদস্য কিছু কিছু চাঁদা দিয়ে এই ক্লাবগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থাকে। এই সমস্ত ক্লাবে উঠতি খেলোয়াড়দের সাধ্যমত খেলানো হয়, অঞ্চলের তরুণ ক্রীড়াবিদরা এই সমস্ত ছোট ক্লাবের মধ্য দিয়েই খেলাধুলোয় প্রাথমিক পাঠ গ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু নানা কারণে এই সমস্ত ক্লাব বেশীদিন টিকে থাকতে পারছে না। ব্যক্তি-গত উদ্যোগে যারা ক্লাব গড়ে তুলেছিল তারা সংসারের সমস্যাগুলির সঙ্গে যতবেশী জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে ততই ক্লাবের জন্য তারা সময় দিতে পারছে না। এছাড়াও খেলার মাঠের অভাব, খেলাধূলার সাজ-সরঞ্জামের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা কারণে বহু ছোট ক্লাব উঠে যাচ্ছে। বড় বড় ক্লাব যেগুলি আছে তার মধ্যে অধি-কাংশই পরিচালিত হয় মূলতঃ খেলাধূলার সঙ্গে সম্পর্ক-হীন কিছু বিত্তবান লোকের দ্বারা। খেলাধূলার উন্নতি ঘটানো, তরুণ ক্রীড়াবিদদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় ক্লাবগুলির পরি-চালকদের কোনও নজরই থাকে না। বিভিন্ন ছোট ছোট ক্লাব থেকে উদীয়মান খেলোয়াড়দের টেনে এনে একটি

দল গড়ে তুলবার দিকেই এই সমস্ত ক্লাবের কর্মকর্তাদের চেষ্টা থাকে। এমনও দৃষ্টান্ত আছে যে একটি ছোট ক্লাব থেকে একজন সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়কে দলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু সারা বছর তাকে একটি খেলারও সুযোগ দেওয়া হয়নি।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে ফুটবল খেলা ও অন্যান্য খেলা যে সমস্ত সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সকল সংস্থার কর্মকর্তাদের এই সমস্ত ব্যাপার অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু তারা প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। এই সকল সংস্থার কর্মকর্তারা খেলাধুলার উন্নতি ও ব্যাপক ছেলেমেয়েদের মধ্যে খেলাধুলা প্রসার করার জন্য কোনও রকম চিন্তা ভাবনা করেন বলে মনে হয় না। ছোট ছোট ক্লাবগুলিকে সবরকমভাবে সাহায্য করা, বিভিন্ন দলের মধ্যে ও খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা, ভাল খেলোয়াড়কে হিংসার চোখে না দেখে তার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে খেলার কৌশলকে উন্নত করতে অন্য খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করা, ছেলেমেয়ে ও তাদের অভিভাবকদের খেলাধুলার আবশ্যিকতা সম্পর্কে উপলব্ধি করানো, সকলের মধ্যে খেলাধুলা সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি করা, ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে একটি বিশেষ দলের প্রতি অন্ধ ভালবাসা ও তাদের মধ্যে উগ্র উৎসাহ যাতে দেখা না দেয় তার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করা—যারা খেলাধুলা পরিচালনা করছেন এই সমস্ত বিষয়ে তাদের নিশ্চয়ই কিছু দায়িত্ব থাকা উচিৎ। কিন্তু আমাদের দেশে খেলাধুলার পরিচালক সংস্থাগুলি এই দায়িত্বগুলি আদৌ পালন করছে কি? যারা আমাদের দেশে সকল অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে তারা বা তাদের প্রতিনিধিরা এই সকল সংস্থাকে কব্জা করে রেখেছে বলে এই সংস্থাগুলি যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করুক না কেন তা মূলতঃ মুনাফা করার লক্ষ্য নিয়েই তৈরী হয়।

প্রতি বছর কলকাতায় যে ফুটবল লীগের খেলা অনুষ্ঠিত হয় তা ফুটবল খেলার উন্নতি বা প্রসারের ব্যাপারে কতটা সাহায্য করছে? প্রতি বছর লীগের খেলা শেষ হবার পর যদি ব্যালান্স শীট তৈরী করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে সামগ্রিকভাবে ফুটবল খেলার উন্নতির প্রশ্নে লাভের অংক শূন্য। পরিচালক সংস্থার কর্মকর্তাদের সমস্ত পরিকল্পনাই যেন তিন প্রধান দলকে কেন্দ্র করেই। কর্মকর্তারা ভালভাবেই জানেন যে তিনটি প্রধান দল যেরকম খেলাই খেলুক না কেন তাদের খেলার দিন মাঠে ভীড় হবেই। তিনটি প্রধান দলের প্রত্যেকটি দলকে মাঠে বেশ কয়েকটি খেলায় নামাতে পারলে প্রতিটি খেলায় প্রচুর টাকার টিকিট বিক্রী হবেই। এ জন্যই যেন কলকাতা সিনিয়র ফুটবল লীগে দলের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তিন প্রধান দলের যে কোনও একটি দলের খেলার দিন কর্মকর্তাদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা যায় ছোট দুটি ক্লাবের মধ্যে খেলার সময় সেই উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় না। এমন কি ছোট দুটি ক্লাবের মধ্যে খেলার সময় কর্মকর্তাদের মধ্যে অধিকাংশই মাঠে উপস্থিত থাকেন না। ক্রীড়ামোদী দর্শকদের মধ্যে খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব ও উৎসাহ গড়ে তোলার দায়িত্ব যাদের তাদের এই ধরনের মনোভাব দর্শকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে—এটা আর আশ্চর্যের কি? কলকাতা ফুটবল লীগকে কেন্দ্র করে ক্রীড়ামোদীরা ভাগ হয়ে গেছেন তিনটি অংশে। তারা অধিকাংশই খেলা দেখতে যান যেমনভাবে হোক তার প্রিয় দলের জয় দেখতে। প্রিয় দলের সঙ্গে অন্য একটি দলের খেলার সময় অন্য দলের বা সেই দলের কোনও খেলোয়াড়ের ভাল খেলা তারিফ করার মত মানসিকতা অনেক দর্শকের মধ্যে দেখা যায় না। বরং সেক্ষেত্রে ছোট ক্লাবটির খেলোয়াড়দের উপর নেমে আসে অশ্লীল গালিগালাজ, এমন কি ইটপাটকেল ইত্যাদির যথেচ্ছ বর্ষণ। সিনিয়র ফুটবল লীগে এরকম ঘটনার অভাব নেই। খেলার মাঠে এই অসুস্থ পরিবেশের জন্য পরিচালক সংস্থার দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। পরিচালক সংস্থার কর্মকর্তারা এর জন্য আদৌ চিন্তিত কি? তারা ময়দানের এই অসুস্থ পরিবেশকে কি চোখে দেখেন জানি না কিন্তু ময়দানে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে তাদের কোনও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে কখনও দেখা যায়নি।

আমাদের দেশে বিভিন্ন খেলাধুলায় যে প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয় সেই প্রতিযোগিতাগুলিতে শুধুমাত্র অপেশাদার খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকে। কিন্তু পর্দার অন্তরালে লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা চলে এমন কথা বিভিন্ন সময় শুনতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত খেলোয়াড় কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলেন নানা অসুবিধার মধ্যে তাদের মধ্যে ক'জনই বা ভাল খেলোয়াড় হতে পারেন। এদের মধ্যে যারা একটু ভাল খেলা দেখাতে পারেন তাদের নিয়ে একটা আলাদা জগৎ তৈরী করার চেষ্টা চলে। অলক্ষ্যে তাদের নিয়ে চলে অঢেল টাকার খেলা। চল্লিশ পঞ্চাশ দশকের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ভেঙ্কটেশের জীবনাবসানের পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সাংবাদিক অজয় বসু লিখেছেন 'বছর কুড়ি পঁচিশ পরে জন্মালে ভেঙ্কটেশ শুধু ফুটবল ভাঙিয়েই লক্ষপতি বনে যেতে পারতো। যেমন যাচ্ছেন আজকালকার অনেক খেলোয়াড়।' (যুগান্তর, ২.৬.৭৮) কাদের টাকায় আজকালকার এই অনেক খেলোয়াড় লক্ষপতি বনে যাচ্ছেন? যারা খেলাধুলাকে নিছক পণ্য হিসাবে দেখে, যারা খেলাধুলাকে নিছক পণ্যে পরিণত করতে চায় সেই মুষ্টিমেয় কিছু টাকার কুমীর এই টাকা ছড়াচ্ছে। কলকাতা খেলার মাঠে কয়েকজন খেলোয়াড়ের জীবনে এই চিত্রের পাশাপাশি এদের বাইরে অসংখ্য খেলোয়াড়ের চিত্র কি? খেলাধুলা চালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এদের সংসারের আর্থিক সমস্যা ও আর্থিক অনটনের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। সংসারের আর্থিক দায়িত্ব পালন করার জন্য কিছু টাকার বিনিময়ে তারা সপ্তাহে প্রত্যেকদিনই বিভিন্ন জার্সি গায়ে দিয়ে মাঠে নামছেন। কোনও কোনও দিন তাদের দুটি বা তার

বেশী খেলা খেলতে হয়। এই অবস্থায় সারা সপ্তাহে একদিনও অনুশীলন করার সুযোগ তাদের থাকে না। সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলার সময় অন্য খেলোয়াড়দের মান ও তাদের ক্রীড়াপদ্ধতি সম্পূর্ণ অজানা থাকায় এই সমস্ত খেলায় তারা একা একা খেলার চেষ্টা করে। এর ফলে এই সমস্ত খেলোয়াড় যেমন তাদের খেলার মান আরও উন্নত করতে পারেন না তেমনই তাদের মধ্যে দলগত সংহতিবোধও সৃষ্টি হতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা প্রত্যেকদিন খেলার ফলে অত্যধিক পরিশ্রম ও সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাবারের অভাবে তাদের শরীর স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়তে বাধ্য। বাস্তব এই অবস্থার মধ্যে বহু খেলোয়াড়ের খেলোয়াড় জীবনের অপমৃত্যু ঘটছে। এইভাবে আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চেষ্টায় কিছুদিন খেলা চালিয়ে যাবার পর বহু ক্রীড়াবিদের খেলোয়াড়জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে খেলাধুলার জগতে এই চিত্রেরই পাশাপাশি বিভিন্ন পরিচালক সংস্থাগুলির মধ্যে দুর্নীতির কথা প্রায়ই শোনা যায়। জাতীয় দল গঠনকে কেন্দ্র করে নানারকম দুর্নীতি ও ঘৃণ্য স্বজনপোষণনীতির কথা শোনা যায়। অনেক সময় কর্মকর্তাদের মধ্যে ঘৃণ্য রেষা-রেষির শিকার হতে হয় কোনও বিশেষ বিশেষ খেলো-য়াড়কে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও শোনা গেছে যে পরিচালক সংস্থার অধিকাংশ কর্মকর্তার সুনজরে না থাকায় সর্বদিক থেকে যোগ্যতা থাকা সত্বেও জাতীয় দলে ঠাঁই হয়নি। বুয়েনার্স এয়ারসে আয়োজিত এবারকার বিশ্ব-কাপ হকিকে কেন্দ্র করে ভারতের দলগঠনের প্রশ্নে কর্মকর্তা-দের ভূমিকা এবং বিশ্বকাপ চলাকালীন সময়ে কর্মকর্তা-দের ভূমিকার মধ্য দিয়ে পরিচালক সংস্থার দুর্নীতি নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় হকি ক্ষেত্রে বিষাদময় অবস্থা এবং প্রশাসনিক কোঁদলে গভীর দুঃখপ্রকাশ করে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের সভাপতি রেণে ফ্রাংক বলেছেন, 'যতক্ষণ না আস্তাবল সাফ করা হবে ততক্ষণ ভারত আবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১,৫,৭৮) রেণে ফ্রাংকের মতে ভারতে অসাধারণ সব খেলোয়াড় আছেন আন্তর্জাতিক হকিতে যাদের জুড়ি কম। যেভাবে ভারতীয় হকি পরিচালিত হচ্ছে তা তাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে।

বিশ্বকাপ হকিতে আমাদের দেশের হতাশজনক ফলে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ধান্না সিং গুলসান সম্প্রতি বলেছেন, 'জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলির কাছে আমার আন্তরিক আবেদন তারা যেন জাতিধর্ম ও আঞ্চলিকতার প্রশ্রয় না দেন এবং শুধু খেলোয়াড় নির্বাচনেই নয়, ম্যানেজার ও কোচ নির্বাচনে ক্ষুদ্র স্বার্থের উপরে ওঠেন। কর্মকর্তারাই দলে একতা এনে দলটিকে উজ্জীবিত করতে পারেন, সফরকে প্রমোদ-ভ্রমণ এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার না করে নিজেদের সুআচরণ ও নিয়ম নিষ্ঠায় আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০,৫,৭৮)

সর্বদিক থেকে এক অসুস্থ ও ক্লেদময় পরিবেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের জাতীয় দল ভাল খেলবে আর খেলাধুলার আসরে ভারতকে বিশ্বের সকল ক্রীড়ামোদীর সামনে প্রতিষ্ঠিত করবে—এমন আশা করাটাই নিরর্থক।

সমগ্র জাতির স্বার্থেই আমাদের দেশে খেলাধুলার প্রশ্নে এই অবস্থাকে পরিবর্তন করতে হবে। এর জন্য স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে খেলাধুলা পরিচালিত হয়েছে তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দেশের বৃহত্তম অংশের জন-সমষ্টির অর্থনৈতিক সমস্যাকে দূর করতে না পারলে খেলাধুলার প্রশ্নে বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন কিছুতেই সম্ভব নয়। দেশের মানুষের আর্থিক সমস্যা মিটিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল ছেলেমেয়ের জন্য খেলা-ধুলার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে খেলাধুলার ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি ঘটানো সম্ভব। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিতে হবে—পরি-কল্পনাকে যথাযথভাবে তাদের রূপ দিতে হবে। দেশের কোটি কোটি কৃষকের তথা সমগ্র জাতির স্বার্থে আমূল ভূমিসংস্কার করে এবং সকলরকম অর্থনৈতিক শোষণ থেকে কৃষকদের মুক্ত করে তাদের ও সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথকে উন্মুক্ত করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কোটি কোটি কৃষক ও গরীব মানুষ সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজজীবনের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধুলা প্রসারের পথকে উন্মুক্ত করতে হবে—এই দাবীতে সকল স্তরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়ামোদীদের সোচ্চার হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে আজ সাধারণ মানুষের প্রিয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামোদীরা এই সরকারের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। সংবিধান-প্রদত্ত সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সকল সমস্যার মৌলিক সমাধান করতে না পারলেও জনগণের দুঃখদুর্দশা খানিকটা লাঘব করতে বামফ্রন্টের সকল কার্যকর পদ-ক্ষেপের পিছনে জনগণের যেমন অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহ-যোগিতার মনোভাব আছে তেমনি সমাজজীবনের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধুলা প্রসারের জন্য সকল পরিকল্পনাকেও জনগণ সাদরে গ্রহণ করবে। পশ্চিম বাঙলার গ্রামে গ্রামে গরীব মানুষদের মধ্যে খেলাধুলাকে প্রসারিত করতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গে খেলাধুলা সম্পর্কিত যে কোনও পরিকল্পনাই নিরর্থক হবে। এই পথে অন্যতম প্রধান বাধা গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্থিক দুরবস্থা। বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যেই গ্রামের গরীব মানুষদের খানিকটা রিলিফ দেবার জন্য এবং গ্রামের সমস্ত বিষয় যারা কুক্ষিগত করে রেখেছে ও গ্রামের গরীব মানুষদের

সবদিক থেকে যারা দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে গরীব মানুষদের মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করতে যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছে তাতে পশ্চিম বাঙলার গ্রামে গ্রামে আজ নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছে। গ্রামের গরীব মানুষদের উৎসাহকে ভিত্তি করে এবং জনগণের সহযোগিতা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে সমস্ত মানুষের মধ্যে খেলাধুলার আবশ্যিকতা সম্পর্কে উপলব্ধি সৃষ্টি করার জন্য ও সংগে সংগে শহরে, শিল্পাঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ছেলেমেয়েদের জন্য যথাসম্ভব খেলাধুলার ব্যবস্থা করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছেন যে খেলাধুলার প্রশ্নেও বামফ্রন্ট সরকারের কোনও পরিকল্পনা কায়েমী স্বার্থ ও খেলাধুলাকে যারা নিছক পণ্যে পরিণত করে রাখতে চায় তাদের বিরোধীতার সম্মুখীন হবে। এমন কি তারা সরকারের যে কোনও উদ্যোগকে সর্বতোভাবে বাধা দেবারও চেষ্টা করবে। সেই কারণে বামফ্রণ্টের খেলাধুলা সম্পর্কিত পরিকল্পনাকেও বাস্তবে রূপ দিতে জনগণকেই সক্রিয় সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সংগে সংগে সমাজজীবনের মূল সমস্যাগুলি থেকে খেলাধুলার সমস্যা যে বিচ্ছিন্ন নয় একথা মনে রেখে দেশের মূল শ্রেণীসংগ্রামগুলির সংগে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রেখে খেলাধুলার সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। সকলরকম অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রমিক, কৃষক ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের সংগ্রাম সমাজের যে শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে খেলাধুলার সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সেই একই শত্রুর বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজ আজ আরও সচেতন হয়ে উঠছে; শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের সংগ্রামের পাশাপাশি তারাও আজ সেই সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসবে।

"হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার গলানো উত্তাপ।
টুকরো টুকরো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।"

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

॥ শাশ্বত ॥

প্রণবকান্তি দত্ত মজুমদার

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী
কবিতা

ফুল গাছটা
ঠাণ্ডা-কফিনে
চলে যাবে কিছু পরেই।
তার হিমেল-নিঃশ্বাসে
বাতাস ভীত;
কম্পন তার নিথর হয়ে গেছে।
বসন্তকাল,
দুকূল ছাপানো ভরা যৌবন
ফুলে ফুলে সৌরভ!
কিন্তু এবার
যৌবন-সুষমা
ওর জীবনে আর এল না।
বিদায়ের পথে
তার পথ পরিক্রমা।
তবুও
মৃত্যুর সীমানা থেকে
স্বপ্নালু পৃথিবীকে
ছুঁয়ে থাকার দুরন্ত বাসনা।
মুমূর্ষু জঠরে তাই
একটা আশ্চর্য ফুল!

॥ মানসপ্রতিমা ॥

পীযূষ মিত্র

সর্বসাধারণ বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্ত দ্বিতীয় স্থানাধিকারী
কবিতা

বৃক্ষের বিপুলে অগ্নি ফুল ফোটায়,
পাতা আনে দীপ্ত উল্লাসে;
জীবন উপলব্ধি, ম্লান,—তবু নিরুদ্ধ প্রাণের বহতায়
তুমিও প্রাণিত হও, ব্যক্ত হও, জীবনের সবল প্রশ্বাসে;
অন্ধকার ভেঙে আলো আসে উপ্ত ধরিত্রীর সহজ প্রজ্ঞায়।

মানুষ একদা তার সব শক্তি সংহতির অমোঘ সন্ধানে
এক ব্যথাহীন দেশে চলে যাবে, সেইখানে আমিও নিঃশেষে
উৎসারিত হব নদী আলো গান মানুষের প্রাধ্ব কল্যাণে;
আজ অন্ধকার ভাঙি মানুষের পাশাপাশি থেকে,
ভালোবেসে ॥

জর্জি ডিমিট্রভ : একটি সংগ্রামী জীবন / অমিতাভ রায়

জার্মানী, ১৯৩৩ সাল। ২০শে জানুয়ারী ক্ষমতাসীন হয়েছে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী দল। গোটা জার্মানী জুড়ে শুরু হয়ে গেছে শাসক দলের তান্ডব-লীলা। নাৎসী ঝটিকাবাহিনীর দাপটে সমস্ত জার্মানী ভীত, সন্ত্রস্ত, বিশেষ করে ইহুদী এবং কমিউনিষ্টরা। এর মধ্যে ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাইখষ্ট্যাগ ভবনে লাগল আগুন। চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী এই অগ্নিকান্ডর দায়ভাগ চাপিয়ে দেওয়া হ'ল কমিউনিষ্টদের কাঁধে, যথারীতি শুরু হ'ল প্রচন্ড ধরপাকড় এবং কমিউনিষ্ট নিধনযজ্ঞ। পরবর্তী-কালে যে অত্যাচার এবং নিপীড়ন চলেছিল সমগ্র জার্মানীর ওপর তার সূত্রপাত হ'ল এইখানে। ৩রা মার্চ গ্রেপ্তার করা হ'ল জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আর্নষ্ট থলম্যান'কে। আর ৯ই মার্চ গ্রেপ্তার হলেন তিনজন প্রবাসী বুলগেরীয়, বার্লিনের এক হোটেল থেকে। খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে এরা কারা, কেনই বা হিটলারের জল্লাদবাহিনী এদের গ্রেপ্তার করল? এই প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে খুঁজে পাবার জন্য আমাদের পৌঁছে যেতে হয় জার্মানীর লিপ্‌জিগ্ শহরে।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। লিপ্‌জিগের আদালতে বসেছে বিচার সভা, অভিযুক্ত তিনজন প্রবাসী বুলগেরীয় ছাড়াও আরও একজন, তিনি হলেন জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির সংসদীয় নেতা আর্নষ্ট টর্গলার। অভিযোগ, পুরানো—এই চারজন রাইখষ্ট্যাগ ভবনে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করেছে। এই অভিযোগের উত্তরে, "ব্যক্তিগত ভাবে আমি এবং বুলগেরীয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি এই অগ্নি-কান্ডর তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা বারবার করেছি, আমরা কমিউনিষ্ট, সন্ত্রাসবাদী নই। আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছে এই যে, রাইখষ্ট্যাগের অগ্নিকান্ডর ঘটনা হয় কোন উন্মাদের কাজ, নয় তো, জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে এবং জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে এটা কোন কমিউনিষ্ট বিরোধীদের চক্রান্তে। যাই হোক আমি কিন্তু পাগলও নই কিংবা কমিউনিষ্ট বিরোধীও নই।

হঠকারিতা নয়, গণ-সংগঠন, গণ-উদ্যোগ এবং যুক্তফ্রন্ট এটাই হচ্ছে কমিউনিষ্টদের প্রকাশ্য কর্মকৌশল।

আমি নীতিগতভাবে সমস্ত প্রকার ব্যক্তি-সন্ত্রাসের বিরোধী। কারণ, এই ধরণের কাজ অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক গণ-আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গণভিত্তিক কমিউনিষ্ট মতাদর্শ ও কর্মকৌশলের পরিপন্থী। কমিউনিষ্ট লক্ষ্যের পথে পরিচালিত সর্বহারার মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে এটা ক্ষতিকারক।

আমি আমার কমিউনিষ্ট মতাদর্শের সপক্ষে আত্ম-সমর্পণ করতে দাঁড়িয়েছি, আমি আমার সমগ্র জীবনের মর্মবস্তুর সপক্ষে আত্মসমর্পণ করতে দাঁড়িয়েছি।"

এই দৃঢ় এবং আত্মপ্রত্যয়ে উদীপ্ত কথাগুলি যিনি শোনালেন তাঁর নাম জর্জি ডিমিট্রভ, সঙ্গের অন্য দুজন প্রবাসী বুলগেরীয়র নাম যথাক্রমে পোপোও এবং টেনেভ। জর্জি ডিমিট্রভের মত এরাও ছিলেন বুলগেরীয় কমিউ-নিষ্ট পার্টির সদস্য। হিটলারের জার্মানীতে যেখানে কমিউনিষ্ট নাম উচ্চারণ করাটাও ছিল অন্যায় কাজ সেখানে দৃঢ় সংকল্প কঠোর এই ভাষণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল হিটলারের মন্ত্রণাদাতা গোয়েরিং, অশ্রাব্য মন্তব্য করতে করতে আদালত গৃহ ছেড়ে চলে গেছিল সেদিন গোয়েরিং।

এই হলেন জর্জি ডিমিট্রভ, বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মহান যোদ্ধা।

একটানা পাঁচশো বছর ধরে শোষণ চালাবার পর তুর্কীরা বুলগেরিয়া থেকে হাত ওঠাল ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে। নিঃস্ব, রিক্ত বুলগেরিয়া তখন ইউরোপের গরীব দেশগুলোর অন্যতম। বুলগেরিয়ার দারিদ্র্যের চরমতম সময়ে এক দরিদ্র পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর অন্যতম পথিকৃৎ জর্জি ডিমিট্রভ। তারিখটা ছিল ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুন, অর্থাৎ আজ থেকে ছিয়ানব্বই বছর আগে। বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার কাছাকাছি রাডিমার জেলার কোভাসিভিসিতে তখন বাস ছিল ডিমিট্রভ পরিবারের। বাবা মিখাইলভ, মা পেরেসকোভা ডোসিভা আর চার ভাই দুই বোনকে নিয়ে ছিল ডিমিট্রভদের সংসার। দারিদ্র্য যে পরিবারের চিরসঙ্গী সেই পরিবারের সন্তানের পক্ষে বিদ্যালয় গমন বাতুলতা মাত্র। বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না পাওয়ার জন্য মোটেই দুঃখিত ছিলেন না জর্জি, তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে পরবর্তী কালে তিনি বলেছেন, "আমার গ্র্যাজুয়েট পদবী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেয়নি, সংগ্রামের ময়দান থেকেই তা আমি সংগ্রহ করেছি। সব সময়, সব জায়গায় আমি নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার কাজ করে গিয়েছি, শিখেছি ছাপাখানার শ্রমিক হিসাবে কাজের মধ্যে, শিখেছি জেলের বদ্ধ জেলে বসে, শিখেছি লিপ্‌জিগ্ বিচারের পর্ব থেকে পর্বান্তরে।" মাত্র বারো বছর বয়সেই জর্জিকে গ্রহণ করতে হয় ছাপাখানার কাজ। কম্পোজিটরের শিক্ষণবীশ হিসাবে শুরু হল কর্মজীবন।

এদিকে এক ভাই তখন ট্রেড ইউনিয়নের কাজে ব্যস্ত। ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধে তার মৃত্যু হ'ল। মেজো ভাই ওডেশায় বলশেভিক সংগঠনের কাজে নিযুক্ত। সে মারা যায় ১৯১৫ সালে। সেজ ভাইও বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সে মারা গেল ১৯২৫ সালে

বুলগেরীয় পুলিশের হাতে। এই সময়ের সরকার বিরোধী এপ্রিল অভ্যুত্থানে তার অবদান অনস্বীকার্য। ভায়েদের মত জর্জির দুই বোনও ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। অন্যায়, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এবং সততা ও মানবিকতার সপক্ষে সংগ্রামে শিক্ষা ডিমিট্রভ ও তার ভাইবোনেরা লাভ করেন তাদের মা বাবার কাছ থেকেই। পরবর্তীকালে এই পারিবরিক শিক্ষাই তাদের সহজাত শিক্ষা এবং শক্তি হিসাবে বিপ্লবী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাবা, মিখাইলভ মারা যান ১৯১৩ সালে। মা, পেরেসকোভা ডোসিভা নিজেকে মিশিয়ে দিলেন ছেলে-মেয়ের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে।

জর্জি ডিমিট্রভ তাঁর ছাপাখানা-শ্রমিক জীবন শুরু করেন বুলগেরীয় লিব্যারাল পার্টির পত্রিকার প্রেসে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ঐ প্রেসেরই মালিক আইন-জীবি রাডিস্লাভফ্। ১৮৯৮ সালের মে দিবসের শ্রমিকদের মিছিল উপলক্ষে ঐ পত্রিকার জন্য যে সম্পাদকীয় লেখা হয়, তাই নিয়ে পত্রিকা মালিক রাডিস্লাভফ্-এর সঙ্গে বিতর্ক হয়—জর্জি ডিমিট্রভের মতে এটাই ছিল তাঁর জীবনের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ নিয়ে প্রথম প্রতিবাদ, অর্থাৎ মাত্র ১৬ বছর বয়সেই জর্জি ডিমিট্রভ লড়তে শিখেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে। আর কুড়ি বছর বয়সে তো তিনি রীতিমত শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। ছাপাখানার শ্রমিকের কাজও চলছে সমান তালে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে জর্জি অর্জন করলেন বুলগেরীয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্যপদ, এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রখ্যাত বুলগেরীয়ান মার্কসবাদী ডিমিটার বজাগুয়েভ্। এই সময় থেকে সোফিয়ার পার্টি অফিসই হল জর্জির দ্বিতীয় বাসগৃহ।

বুলগেরিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা এই সময় বুর্জোয়া মতাদর্শ ও সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে রাজ-নৈতিক সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। জর্জি ডিমিট্রভের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটল এই মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে। অভিজ্ঞতা, সংগ্রামী মানসিকতা ও রাজনৈতিক জ্ঞান তাঁকে সোশ্যাল ডেমো-ক্র্যাটদের বামপন্থী শিবিরে সামিল করল। ইতিমধ্যে ছাপাখানার শ্রমিকদের সংগঠনের একজন সুদৃঢ় সংগঠক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর সংগ্রামী কর্মতৎপরতা ছাপাখানা শ্রমিকদের নেতৃত্বের স্বীকৃতি এনে দিল। মাত্র তেরো বৎসর বয়সে জর্জি ছাপাখানা শ্রমিকদের ধর্মঘটের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে নিজেকে তৈরী করার যে প্রেরণা পেয়েছিলেন, সেই অনুপ্রেরণায় তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিলেন শ্রমিক আন্দোলনে। শীঘ্রই তিনি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ছাপাখানা শ্রমিক সোসাইটির অন্যতম নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁরই নেতৃত্বে শ্রমিকরা সংগঠন ও আন্দোলনের জোরে আদায় করে নিল ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার; তাঁরই প্রচেষ্টায় ছাপাখানা শ্রমিক সোসাইটি আন্তর্জাতিক ছাপাখানা শ্রমিক ইউনিয়ন-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯০৯ সাল। এই বছরটি জর্জি ডিমিট্রভের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছর তিনি "বুলগেরীয়ান ওয়ার্কাস সিন্ডিকেলেলিস্ট ইউনিয়নের" সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এই বছরই তিনি নির্বাচিত হলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯১৫ সালে জর্জি ডিমিট্রভ বুলগেরীয়ার পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হলেন। এই বছরই সেন্সর আইনের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, "শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও মর্যাদা বিরোধী এই সেন্সর আইনের বিরুদ্ধে আমার কণ্ঠ কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না।" তখন বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাডিস্লাভফ্—মাত্র বারো বছর বয়সে জর্জি যার ছাপাখানায় নিজের কর্মজীবন শুরু করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলগেরিয়ার যোগদানের বিরুদ্ধে জর্জি হয়ে উঠলেন মুখর। পার্লামেণ্টে, সোফিয়া মিউ-নিসিপ্যাল কাউন্সিলের সভায় এবং অসংখ্য সভা-সমিতিতে তিনি যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য রেখে জনমত সংগ্রহ অভিযান শুরু করলেন। মহান অক্টোবর বিপ্লব এক নতুন যুগের আলো বয়ে আনলো বুলগেরিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির জীবনে। পার্টির বামপন্থী অংশ অভিনন্দন জানালো লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি পরিচালিত মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে, রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টিও এই সময় বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের নিয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগ শুরু করল। স্ট্যালিনের উপর দায়িত্ব পড়ল ইউরোপের বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে মিলিত হবার। সাড়া মিলল বুলগেরিয়া থেকে। বুলগেরিয়ার বামপন্থী সোশ্যালিস্টরা ছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই বামপন্থী সোশ্যালিস্টরাই পরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করে। জর্জি ডিমিট্রভ তাঁর সমস্ত শক্তি, উৎসাহ, ও প্রতিভার সাহায্যে বুলগেরিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র পার্টি বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হলেন। মার্কসবাদের তত্ত্বগত পড়াশোনা শুরু করলেন "কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্তেহার" এবং "ক্যাপিট্যালের" সহজ সংস্করণ বই দুটি পড়ার মাধ্যমে।

মার্কসবাদ আয়ত্ত করার সাথে সাথে তিনি গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চাও শুরু করলেন। আবার তাঁর স্ত্রী মার্কসবাদী সাংবাদিক ও কবি লিউক ইভাসিভিচ্-এর উৎসাহে জার্মান ও রুশ ভাষা শিক্ষা শুরু করেন। ১৯০৬ সালে তিনি লিউক ইভাসিভিচ্‌কে বিবাহ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর জর্জির কঠোর সংগ্রামী জীবনের সহ-কর্মিণী ছিলেন লিউক ইভাসিভিচ্। ১৯৩৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ বুলগেরিয়ার সামাজিক জীবনে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয় টেনে আনলো, তার ফলে ক্ষুধা আর অনাচারের পটভূমিকায় "দি এগ্রেরিয়ান লীগের" নেতৃত্বে দেখা দিল কৃষক বিদ্রোহ। পার্টি এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে গুরুত্ব দিল না। এমন কি যখন জাতীয় জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সৈনিকরা পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করল, সেই সময়েও ১৯১৮ সালে পার্টির মনোভাবে দেখা গেল নিষ্ক্রিয়তা ও নেতিবাচক মনোভাব। জর্জি তখন জেলে। জেলের ভিতর থেকে জর্জি ডিমিট্রভ বিদ্রোহী "কৃষিলীগ" ও সৈনিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। কিন্তু বাইরের পার্টি নেতৃত্ব বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক যোগাযোগের ব্যাপারে ডিমিট্রভের পরামর্শ ও নির্দেশকে অগ্রাহ্য করলো। কারামুক্ত হলেন ডিমিট্রভ, সারা দেশে শুরু হল রেল ধর্মঘট, নেতৃত্ব দিলেন ডিমিট্রভ। রেল ধর্মঘটের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটে গোটা দেশ হয়ে উঠল উত্তাল।

বিপ্লবী আন্দোলনের মুখে বেসামাল সরকার যে কোন মূল্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকট-এর মোকাবিলার জন্য হিংসাশ্রয়ী ষড়যন্ত্র আঁটলো। ধর্মঘটী রেল কর্মীদের অতি প্রিয় ও অবিসম্বাদী নেতা ডিমিট্রভ করলেন আত্মগোপন।

আত্মগোপন অবস্থায় তিনি যাত্রা করলেন "তৃতীয় আন্তর্জাতিকের" দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যে। মাছ ধরা নৌকায় ব্ল্যাক সী পার হবার সময় ধরা পড়ে গেলেন রুমানিয়ার জল পুলিশের হাতে। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এবং সোভিয়েত সরকারের প্রচন্ড প্রতিবাদে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হ'ল রুমানিয়ার শাসক শ্রেণী।

১৯২১ সালে ডিমিট্রভ গেলেন মস্কোয়, মিলিত হলেন লেনিনের সঙ্গে। এই সাক্ষাতকার তাঁর এবং বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এক নূতন যুগের সূচনা ঘটালো। ১৯২২ সালে ঘোষিত লেনিনের "যুক্তফ্রন্ট রণকৌশল"-এর তত্ত্ব গৃহীত হ'ল বুলগেরীয়ার কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে। বুলগেরীয়ায় ১৯২৩ সালে বৃহৎ বুর্জোয়া গোষ্ঠী সামরিক চক্রের সাহায্যে কায়েম করলো স্বৈরাচারী শাসন, যদিও আঞ্চলিকভাবে "এগ্রেরিয়ান লীগ" এবং কমিউনিস্টরা এর বিরুদ্ধে শুরু করলো সশস্ত্র প্রতিরোধ তবুও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করলো। এইভাবে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ হাতছাড়া হ'ল। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টি এই ভুল কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলো। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির সম্পাদক বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট ভেসিল কোলার স্বদেশে ফিরে এলে আলোচনার মাধ্যমে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিক-কৃষকের যুক্তফ্রন্ট গড়া এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে সেই যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে সামিল করার আশু কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। সেটা ছিল আগস্ট ১৯২৩। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গণ-অভ্যুত্থানের দিন ঘোষণা করলেন ১৯২৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর। নবগঠিত বিপ্লবী সামরিক কমিটিতে পার্টির তরফে নির্বাচিত হলেন কোলারভ ও ডিমিট্রভ। অভ্যুত্থানের প্রাক্‌কালে চব্বিশ ঘন্টাব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হ'ল রাজধানী সোফিয়ায়। কিন্তু ব্যাপক গ্রেপ্তারের ফলে শিল্পগুলিতে এই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে পারলো না। ফলশ্রুতি, সামগ্রিকভাবে এই অভ্যুত্থান সংঘটিত হতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থান পরাস্ত হলো। অবশেষে মৃত্যুদন্ডাদেশ মাথায় নিয়ে ডিমিট্রভ দেশত্যাগ করলেন। দেশত্যাগের আগে "বুলগেরিয়ার শ্রমিক-কৃষকের প্রতি খোলা চিঠিতে" অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবার কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করে "বিপ্লবের মতাদর্শের প্রতি অনুগত ও বিপ্লবের পতাকা ঊর্ধে তুলে ধরার" আবেদন জানালেন ডিমিট্রভ।

দেশত্যাগের প্রথমদিকে ডিমিট্রভ বিভিন্ন ছদ্মনামে ঘন ঘন আশ্রয়স্থান পাল্টিয়ে এলেন ভিয়েনায়। ১৯২৩ সালে ভিয়েনায় গঠন করলেন বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রবাসী কমিটি।

প্রবাসী জীবনে ডিমিট্রভ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন নেতা হিসাবে পরিচিত হলেন। ভিয়েনায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বলকান কমিউনিস্ট ফেডারেশনের সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এই সময় তিনি লেনিনবাদ বিরোধীদের সঙ্গে এবং ট্রটস্কীপন্থীদের সঙ্গে মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯২৯ সালে তিনি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পশ্চিম ইউরোপীয় ব্যুরোর কার্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে বার্লিন যাত্রা করলেন।

"রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকান্ড" জনিত মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর নিজস্ব দৃঢ়তা ও বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনে তিনি ১৯৩৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মুক্ত হন। মুক্তি পাবার পর তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় চলে যান। নাৎসী কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি স্ট্যালিন প্রদত্ত সোভিয়েট নাগরিকত্বের অধিকার অর্জন করেন। ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত হ'ল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস। এই কংগ্রেসের সামনে তিনি উপস্থাপিত করলেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিশ্ববিখ্যাত রিপোর্ট "শ্রমিক ঐক্য—ফ্যাসিবাদ বিরোধী দুর্গ।" যাতে তিনি ঘোষণা করলেন **"ফ্যাসিজম হ'ল শ্রমজীবি জনতার উপর লগ্নী পুঁজির হিংস্রতম আক্রমণ; ফ্যাসিজম—নিরঙ্কুশ সংকীর্ণতাবাদ আর পররাজ্য হরণের যুদ্ধ; ফ্যাসিজম—জঘন্যতম প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লব; ফ্যাসিজম হ'ল—শ্রমিকশ্রেণী ও প্রত্যেকটি মেহনতকারী মানুষের ক্রূরতম শত্রু।"**

১৯৩৭ সালে তিনি সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্য নির্বাচিত হলেন।

আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের কঠিন ও জটিল দায়িত্ব

পালনের সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও কিন্তু ডিমিট্রভ স্বদেশ বুলগেরিয়াকে ভুলে যাননি। সব সময় তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন বুলগেরিয়ার সংগ্রামী জনগণের সাথে। ১৯৪৩ সাল থেকে বুলগেরিয়ার জনগণের উপর কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৪৪ সালের ২৭শে আগষ্ট বুলগেরিয়ার বেআইনী কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ডিমিট্রভ তাঁর ঐতিহাসিক নির্দেশ পাঠান। একুশ বছর আগে যাকে বিফল গণ-অভ্যুত্থানের নেতা হিসাবে শত্রুর মৃত্যুদণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল সেই ডিমিট্রভ দেশে ফিরলেন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪। নাৎসী বিজয়ী স্তালিনের লাল ফৌজের সক্রিয় সহযোগিতায়, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি এবং বুলগেরীয় সৈন্যবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের যৌথ আক্রমণে চুরমার হল ফ্যাসিস্ট শাসনের তাসের প্রাসাদ।

জর্জি ডিমিট্রভ নির্বাচিত হলেন জনগণতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

অবশেষে ১৯৪৯ সালের ২রা জুলাই জনগণতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী, বুলগেরীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম মহান সংগ্রামী নেতা এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক জর্জি ডিমিট্রভ-এর জীবনাবসান ঘটল। বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণী আজও তাদের এই সংগ্রামী বন্ধুকে শ্রদ্ধা জানায়।

"একধারেই সব কিছু থাকে, আর একধারে কোন কিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়। ...এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে, তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে—কেন না, শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে।"

—রবীন্দ্রনাথ

বিচারের নামে যা' ছিল প্রহসন / সুকুমার দাস

রোজেনবার্গ দম্পতি—জুলিয়াস রোজেনবার্গ আর তার স্ত্রী এথেল রোজেনবার্গ তথা কথিত গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে বসে প্রাণ দিয়েছিলো আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। ওরা নাকি পারমাণবিক বোমার ব্যাপারে গুপ্তচর বৃত্তিতে নিযুক্ত থেকে আমেরিকার ক্ষতি সাধনে রত ছিল। ওরা নাকি ছিল কমিউনিষ্ট এবং আমেরিকায় "লাল" মতবাদ প্রচারের মুখপাত্র ছিলো। ওদের নিয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল--কারণ যে বিচারের প্রহসন করে মার্কিন বিচার বিভাগ ওদের সেদিন হত্যা করেছিল তাতে সারা বিশ্বের শান্তিকামী, স্বাধীনচেতা মানুষগুলি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। যে সময় সকল মানুষই চাইছিল শান্তি, ভালবাসা আর যুদ্ধের ভয় থেকে মুক্তি ঠিক সেই সময়েই একমাত্র ভিন্নমত প্রকাশের জন্য ওদের প্রাণ দিতে হ'ল নির্দয়-ভাবে। দীর্ঘ তিন বছরের বেশী সময় ওদের দুই ছেলে মাইকেল ও রবার্টের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে মৃত্যুপুরীতে নিয়ে আটকে রেখে ওদের ওপর অমানুষিক মানসিক পীড়ন চালানো হ'ল। শিশু পুত্র দুইটি পিতৃ-মাতৃ সান্নিধ্য ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে অসহায় অবস্থায় অপরের কাছে পড়ে রইল। অথচ জুলিয়াস ও এথেল এরাও পৃথিবীতে বাঁচতে চেয়েছিল—চেয়েছিল শান্তি, স্বাধীনতা আর আপন মর্যাদায় বেঁচে থাকতে।

অথচ এদের প্রতি কোন সুবিচার করা হয়নি। এ মৃত্যুদণ্ড রাজনৈতিক। গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে উৎপীড়কের দল সেদিন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য আর মার্কিন মুলুকের ভিন্ন মত পোষণকারীদের ভীত সন্ত্রস্ত করে দেবার জন্য জোর করেই এই ইহুদী দম্পতির প্রাণ নিয়েছিল। এর মধ্যে ছিল এক বিরাট চক্রান্ত। সে চক্রান্তে জড়িত ছিল মার্কিন পরমাণু সংস্থা, মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ, মার্কিন সরকারের বিচার বিভাগ, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পররাষ্ট্র দপ্তর, এথেলের পরি-বারের কিছু লোক এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। এরাই সেদিন এই মামলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তাই এদের সম্মিলিত প্রয়াসে রোজেনবার্গদের মরতেই হ'ল। ওদের মারবার ষড়যন্ত্রই ওরা করেছিল। মামলাটা ছিল নেহাৎ একটা অছিলা মাত্র এবং বিচার হ'ল শুধু প্রহসন; যুক্ত-রাষ্ট্রের উচ্চ আদালতও ওদের কোন কথা শুনবার জন্য বিন্দুমাত্র সময় দেয়নি। অথচ ইঁটের দেওয়াল আর লোহার গরাদে ঢাকা জেলখানায় বসেও এথেল ও জুলিয়াস চেয়েছিল ছেলেদের সঙ্গে ছোট্ট বাসায় একসঙ্গে মানুষের গর্বভরা অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে। যে সার্থক সুন্দর জীবন ওরা যাপন করে এসেছিল সেই জীবনেই আবার ফিরে যেতে চেয়েছিল। ছেলে দুটোকে দেখার জন্য দারুণ দুরপণেয় বাসনা তাদের পাগল করে তুলেছিল। কিন্তু সে আশা আর পূর্ণ হলো না—সাজানো আজগুবি মামলায় ফাঁসিয়ে নোংরামি, মিথ্যে আর কুৎসায় ওদের জীবন দিতে হ'ল। অথচ ওরা এর মধ্যে জড়াতেই চায়নি। ওরা চেয়েছিল নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে। অথচ বিচার দপ্তর ওদেরই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ওদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ওরা ঘোষণা করে গেল তারা ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং এটা অতি ধ্রুব সত্য। আর বলে গেল রোজেনবার্গদের মামলায় রাজনৈতিক মতলব হাসিল করবার জন্য এক ভয়ঙ্কর চক্রান্তের জাল পাতা হয়েছিল। জজ্ সাহেব এবং ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণী মামলার সূত্রপাত থেকেই কমিউনিজম এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কিত অবান্তর প্রশ্নের আমদানী করে আসল ব্যাপারটা ঘুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জুরীদের বিরূপ করে তোলার জন্যই এসব করা হয়েছিল। মামলা যখনই বিবাদীপক্ষের দিকে মোড় নিয়েছে তখনই মামলায় সমানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে। বিচারকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের দোষী সাব্যস্ত করে জুরীদের কাছ থেকে রায় আদায় করে নেয়া। বিচারক আরভিং এবং কাউফ্‌ম্যান তাদের প্রতি কোন অনুকম্পা দেখায়নি। এ এক বিরাট প্রবঞ্চনা, বিরাট অসাধুতা আর তাদের রায় ছিল সাংঘাতিক ভুলে ভরা। তিনি নিজেকে বিজ্ঞ প্রতিপন্ন করার জন্য যে কোন পন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি ছিলেন মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের প্রিয় পাত্র।

এই মামলায় হ্যারি গোল্ড আর ডেভিড গ্রীন গ্লাসের মধ্যে যোগসূত্র দেখানোর জন্য সরকার পক্ষ থেকে দুটি জাল কার্ড আদালতে পেশ করা হয়েছিল- তাও পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

কেমিস্ট হ্যারি গোল্ড সাক্ষ্যতে বলেছিল, বৃটিশ গুপ্তচর ক্লাউস ফুক্‌সের সঙ্গে তার যোগ ছিল। কিন্তু বহু বছর পর ছাড়া পেয়ে ফুক্‌স বলেছে এটা ছিল ডাহা মিথ্যা—গোল্ডকে তিনি আদৌ চিনতেন না। পাশপোর্ট ফটোগ্রাফার স্পাইডার এ মামলায় যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল—সে তা পরে স্বীকার করে। মার্কিন ব্যক্তি স্বাধীনতা সমিতি দাবি জানিয়েছে রোজেনবার্গ মামলায় বিচারপতি কাউফ্‌ম্যানের সঙ্গে সরকারের যোগসাজসের তদন্ত হোক। কাউফ্‌ম্যান এ মামলা চলার সময় বার বার গৃহীত শপথ ভঙ্গ করেছে। সরকারী উকিল জুরীদের মনে বর্ণবৈষম্য জাগিয়ে তুলতে সর্বদা চেষ্টা চালিয়েছে।

গ্রীন গ্লাস ছিল এথেল রোজেনবার্গের ভাই। আসলে গুপ্তচর বৃত্তির সঙ্গে তারই সম্পর্ক ছিল। তিনি

নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ জুলিয়াসকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে তার বোনও জড়িয়ে পড়েছিল।

আশ্চর্যের বিষয় এদের এমন সময় হত্যা করা হ'ল ঠিক যে সময় সমস্ত সভ্য মানুষের কাছে যারা নৃশংস নির্বিকার খুনী হিসাবে দায়ী হয়ে আছে, সেই নাৎসী যুদ্ধাপরাধীরাও কিন্তু ক্ষমা ও ছাড়া পেয়ে যাচ্ছিলো। অথচ তখনই সারা আমেরিকাবাসীর কাছে জুলিয়াস আবেদন জানিয়েছিল, "আমি বিশ্বাস করি, দেশের লোক সত্যি ঘটনাগুলো জেনে বুঝে নিয়ে আমাদের জীবনগুলো রক্ষা করবে। আমরা যাতে মহান আমেরিকার ঐতিহ্যের চিরাচরিত ধারায় সুবিচার পেতে পারি তার জন্য তারা আদালতকে বাধ্য করবে—আমাদের মৃত্যুদণ্ডকে ঠেকিয়ে রাখতে। আমেরিকা এর কি উত্তর দেবে? আমাদের দেশের সুনাম বজায় থাকবে, আমরা বাঁচবো- এ ভরসা এখনও আমাদের আছে।" জনসাধারণের শক্তিকেই জুলিয়াস বড় করে দেখেছিল এবং তার উপরেই নির্ভর করেছিল। অথচ কোর্ট-কাছারিগুলো যা ওদের অঙ্গুলী হেলনেই চলে। জনসাধারণ ভয়ে এগিয়ে আসবে না বা আন্দোলনে উত্তাল হবে না এ ধারণা সেদিন জুলিয়াসের হয়নি। তাই তার আবেদনে মানুষের অন্তর সাড়া দিলেও আন্দোলনের দুর্বার স্রোত বহাতে পারেনি।

শেষ মুহূর্তে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইজেন-হাওয়ারের কাছেও এথেল রোজেনবার্গ মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারটা একবার মানবতার দিক দিয়ে ভাবতে আবেদন জানিয়েছিল। সে লিখেছিলো, "আজ যখন ভয়ঙ্কর গলা-কাটা পাইকারী খুনীর দল উদার অনুকম্পা পাচ্ছে, বহু ক্ষেত্রে সরকারী পদে পুনর্বহাল হচ্ছে—ঠিক তখনই প্রবল গণতন্ত্রী মার্কিন আমেরিকা বন্য বর্বরের মত ধ্বংস করতে চাইছে একটি নির্বিরোধী ক্ষুদ্র ইহুদী পরিবারকে। যাদের অপরাধ সম্পর্কে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই দেশ যে ধর্মসম্মত ও গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী—আমার স্বামীকে এবং আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে- সে কথা প্রমাণ করবার এমন একটি সুযোগ আর কিসে মিলবে? শুনুন, আপনার একমাত্র পুত্রের জননীর হৃদয় কি বলে! তাঁর হৃদয় আমাদের দুঃখ বুঝবে। ওর পুত্রের মতই আমার ছেলেরাও মানুষ হয়ে উঠুক। আমি চাই আপনি যেমন ওর পাশে পাশে আছেন, তেমনি আমার স্বামীকেও আমি নিজের কাছে পেতে চাই।"

স্বামী পুত্র স্নেহ কাতরা এথেলের এবং জুলিয়াসের কোন আবেদনই কার্যকরী হয়নি। প্রেসিডেন্ট আইজেন-হাওয়ারও সেদিন বিচার বিভাগের কারসাজিকেই অভ্রান্ত বলে অন্ধের মত মেনে নিয়েছিলেন। জুলিয়াস ও এথেলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার আদেশ দেয়া হ'ল এমনি একটি দিনে যেদিন ছিল ওদের চতুর্দশ বিবাহ বার্ষিকী।

১৮ই জুন রাত এগারটা—যেদিন ওদের বিয়ে হয়েছিল, যেদিন তাদের বিয়ের চৌদ্দ বছর পূর্ণ হবে, ঠিক সেই বিয়ের তিথিতেই মৃত্যুর সাথে সাংঘাতিক ভাবে ওদের মিলতে হ'ল। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! সে সময় ওদের বড় ছেলে মাইকেলের বয়স দশ আর ছোট ছেলে রবার্টের ছয়। বড় ছেলেটি কিছু বুঝলো কিন্তু ছোট ছেলে রবার্ট কিছুই বুঝতে পারলো না। কত বড় সর্বনাশ ওর হয়ে গেল। বাবা মা'র স্নেহ থেকে ওরা বঞ্চিত হ'ল সারা জীবনের মত। বিচারের নামে একটা প্রহসন ঘটে গেল গণতন্ত্রের মুখোসধারী ঐ ফ্যাসিস্ট মার্কিন সরকারের বিচারালয়ে। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্রে যদিও বক্তৃতার স্বাধীনতা, সংবাদপত্র আর ধর্মের স্বাধীনতার কথা স্বীকৃত তবুও সেখানে চলছে তখন স্বৈরাচার। ঐ সব অধিকারগুলোকেই কেড়ে নেবার জন্য সরকার তখন বদ্ধপরিকর। তাই রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়ছিল দিন দিন।

স্নায়বিক উত্তেজনাকে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল সারা দেশ জুড়ে। রোজেনবার্গরা চাইছিলো নিজেদের অধিকারকে বুক দিয়ে রক্ষা করতে। তাই স্বাধীনতা, শান্তি ও ন্যায় বিচারের জন্য এবং পৃথিবীর বুক থেকে যুদ্ধের ক্রম-বর্ধমান আতঙ্ককে মুছে দেবার জন্য ওরা ছিলো অঙ্গীকারবদ্ধ। ওদের মতের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর মতের মিল ছিল না। তাই তাদের জীবন বলি দিতে হ'ল। আইনের নামে ওটা নরবলি ছাড়া আর কিছু না। সাধারণ মানুষের কাছে ওদের ব্যাপারটার সত্যতা ওরা বেশী দিন লুকিয়ে রাখতে পারেনি। কদিন পরেই লোকে টের পেয়েছে ঐ শয়তানীর কথা। রাজনৈতিক কারসাজি সেদিন ফাঁস হয়ে গেছে। লোকে বুঝেছে ওরা ছিল নির্দোষ—নইলে ওদের দলিল বিচার বিভাগ সরিয়ে ফেলতে চাইবে কেন? কেন ওদের বিচারের নথিপত্র প্রচার করতে সরকারের এত টালবাহানা? যদি প্রমাণ ওদের হাতে থাকবেই তবে সে গুপ্তচর বৃত্তির গোপন তথ্যটি প্রকাশ করতে ওদের মৃত্যুর পরেও সরকারের এত গড়িমসী ভাব কেন?

আসলে রোজেনবার্গরা ছিল দুরভিসন্ধিপূর্ণ রাজ-নৈতিক শিকার। তাই পক্ষপাতদুষ্ট বিচারে ওদের প্রাণ দিতে হ'ল। ওদের শত্রুপক্ষরা নিজেদের গা বাঁচাতে ওদের এই মামলায় জড়িয়ে ছিলো। কারণ ওরা ছিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শান্তিকামী নাগরিক। তাই নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত ওদের কথা কানেই তোলেনি। সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করার কোন সুযোগই ওদের দেওয়া হয়নি। আপীলেও তথ্য প্রমাণ খাড়া করবার সুযোগ দেয়া হয়নি। বিচারক কাউফম্যান ছিল সরকারের হাতের পুতুল। অতএব হুকুম তামিল করা ছাড়া তার আর করণীয় কিছু ছিল না। অপরদিকে সরকার বিশ্বের মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলিকে নিজের কব্জায় রেখে ইচ্ছেমত ওদের বিরুদ্ধে যায় এমন মতামতগুলিকেই প্রচার করার চেষ্টা করে। ওদের বদ্ধ ঘরে রেখে কাগজে, রেডিওতে দিনের পর দিন ওদের সম্বন্ধে নানা মিথ্যা খবর

রটানো হয়েছিল, এতে জনসাধারণ ওদের নির্দোষীতা সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। প্রচারযন্ত্র এমনভাবে সচল রাখা হয়েছিল—যে প্রতিটি লোক বলতে বাধ্য হয় যে, "কমিউনিষ্ট সমর্থক হওয়ার অপরাধে অভিযুক্তদের মেরে ফেলাই যুক্তিযুক্ত।" এর পেছনে ছিল দেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের কারসাজি এবং স্বরাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগের উস্কানি। যে কোন প্রতিবাদের আন্দোলনের টুঁটি ওরা এভাবেই টিপে ধরতে চেয়েছিল।

রোজেনবার্গ দম্পতির মামলা চলাকালে ওদের বিরুদ্ধে সরকারের অঙ্গুলী হেলনে সংবাদপত্র যে নক্কারজনক ভূমিকা নিয়েছিল তা ভাবলে যে কোন সাংবাদিকই লজ্জা পাবেন। ১৯৫১ সালে ৪ঠা জুলাই নিউইয়র্ক ডেইলী মিরর পত্রিকায় খবর বেরোয়ঃ বর্তমানে মৃত্যু-পুরীতে বন্দী পারমাণবিক গুপ্তচর জুলিয়াস রোজেনবার্গ নাকি জেলের সেপাইকে বলেছে, "যদি আর দু তিন বছর এমনি করে টিঁকে থাকতে পারি, তাহলে সোভিয়েটের বৈমানিকেরা আমাকে একদিন উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।" অথচ এ একেবারে ডাহা মিথ্যা কারণ জেলের ওয়ার্ডেন বা অফিস এ খবর অস্বীকার করে এবং কোন সাংবাদিককেই এ কথা বলা হয়নি—তাও বলা হয়।

১৯৫৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী "নিউইয়র্ক বেষ্ট" পত্রিকায় প্রচার হয়, "যুক্ত রাষ্ট্রের মার্শাল উইলিয়াম ক্যারল অন্তিমকালীন ব্যবস্থাদির জন্য মৃত্যুপুরীতে (ফাঁসীর সেল) গেলে আণবিক বোমার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত গুপ্তচর জুলিয়াস ও এথেল রোজেনবার্গ তাঁকে বলে যে, ইহুদী ধর্ম যাজকের উপস্থিতি তারা চায় না। কারণ ইহুদী ধর্ম যাজকেরা পুঁজিবাদীদের হাতের যন্ত্র বিশেষ।" এও এক জঘন্য অপপ্রচার কারণ পরে জানা গিয়েছিল এমন কথা কোন ধর্মযাজককেই ওরা সেদিন বলেনি। এর দ্বারা ওরা মানুষের মন ওদের সম্বন্ধে বিষিয়ে দিতে চেয়েছিল, যাতে কোন মানুষের মনে এতটুকু দয়ামায়া ওদের জন্য না থাকে।

মহামান্য পোপও সেদিন রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণ রক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু "টাইমস" পত্রিকা সেই আবেদনও এমনভাবে বিকৃত করেছিল যার অর্থ দাঁড়ায় অন্যরূপ। অর্থাৎ মহামান্য পোপ ওদের জন্য প্রাণ ভিক্ষার কোন আবেদনই করেননি। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের একান্ত সচিব জেম্স হেগার্টিও সেদিন ওদের বিরুদ্ধে প্রচারে মুখর ছিল। আর একটি সংবাদপত্র প্রচার করে ব্রুকলিন-এর ইহুদী ধর্মযাজক মেয়ার শার্ফ নাকি বলেছিলেন যে, তিনি রোজেনবার্গ সম্পর্কিত কোন সমাবেশে যোগ দেবেন না—কারণ ঐ সব সমাবেশগুলি নাকি কমিউনিষ্ট পরিচালিত। কিছুদিন পরেই ফাঁস হয়ে গেল খবরটা—একদম মিথ্যা এবং মেয়ার শার্ফ নিজেই সে কথা প্রকাশ করে দেন। ১৯৫৩ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী, নিউইয়র্ক টাইম্স পত্রিকায় এক নিবন্ধে বলা হয় যে, বেলমন্ট প্লাজা হোটেলে লায়ন্স ক্লাবের ভোজসভায় রোজেনবার্গদের মামলার সরকারপক্ষের সহকারী উকিল মাইলস জে, লেন বলেছিলেন, "কমিউনিষ্টরা যখন আমাদের প্রাণ নেবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে, তখন আসুন আমরাই ওদের সাবাড় করি।" সংবাদপত্রের এই নক্কারজনক ভূমিকা এবং বিচার বিভাগের অসহযোগী মনোভাবের জন্য এবং সর্বোচ্চ আদালতের এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের নীরবতার জন্য রোজেনবার্গ দম্পতিকে সেদিন প্রাণ দিতে হয়েছিল। সংবাদপত্রের প্রতিদিনকার বিরুদ্ধ প্রচার এবং এ মামলার সাথে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আমদানী করে জুরীদের প্রভাবিত করা হয়েছিল। এতে জুরীরা রায় দানের অনেক আগেই রোজেনবার্গ দম্পতির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। তখনকার আমেরিকার রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল ভয় দিয়ে ঠাসা। যারাই একটু ভিন্ন মত পোষণ করেছে, তাদেরই বিরুদ্ধে সরকারের ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়েছে। রোজেনবার্গরাও ছিল তাদের বিষনজরে কারণ ওরা ছিল প্রগতিশীল। নিয়মমাফিক বিচার পাবার সুযোগ সুবিধা থেকে সেদিন ওরা ওদের বঞ্চিত করেছিল। অবশ্য এর বিরুদ্ধেও ছিল অনেকে। সর্বোচ্চ আদালত এই মামলা পুর্ণবিচার করতে অস্বীকার করায় বিচারপতি ব্ল্যাক বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। এবং সহযোগী বিচারক ফ্রাঙ্কফুর্টারও এ ব্যাপারে বিচারক ব্ল্যাকের সঙ্গে সহমত হন।

জুলিয়াসের মতে "আমেরিকা সরকারের আসল চেহারা যে কি তা ওয়াশিংটনের সরকারী প্রচার শুনেই বোঝা যায় না, আমাদের মামলার ব্যাপারে আদালতের আচরণ থেকে সরকারের আসল চেহারা নগ্নভাবে ধরা পড়ে। জনমতের আদালত পাছে এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তাল হয়—সেই ভয়েই যত তাড়াতাড়ি পারে—ওরা আমাদের দুজনকে মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিতে চায়।"

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারও সেদিন ওদের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করেছিলেন। মোট কথা এই দম্পতির জীবন মরণের সঙ্গে জড়িত এ মামলাটির নথিপত্রগুলোও তিনি একবার ভালভাবে পড়ে দেখেননি। বিবাদীপক্ষের কোন আবেদনেও তিনি কর্ণপাত করেননি। বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের ওপরেই অন্ধভাবে সই করে দিয়েছিলেন। নইলে অ্যাটর্ণী জেনারেল তাঁর কাছে নথিপত্রগুলি পৌঁছে দেবার ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই কি করে তাঁর লিখিত বিবৃতি বেরিয়ে গেল? এতে ধরে নেয়া যায় এসব ছিল পূর্ব পরিকল্পিত—অতএব বিচার-বিবেচনার অবকাশ সেখানে একেবারেই ছিল না। দেশে এমনভাবে বিচার প্রহসন চললেও বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে যেখানেই এই মামলার সংবাদ বিন্দুমাত্র পৌঁছেছে সেখান থেকেই উঠেছে প্রতিবাদের প্রবল ঝড়।

সারা দুনিয়ার মানুষ ওদের অপরাধ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। স্বদেশ ও বিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এ সম্পর্কে ওদের প্রাণভিক্ষার জন্য আবেদন জানান। বেন্‌জামিন ফ্যারিংটন রোজেনবার্গদের মুক্তি চেয়ে

প্রেসিডেণ্টের কাছে আবেদন জানান। তিনি বলেছিলেন যে, রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণদণ্ডের ব্যাপারটা অবাঞ্ছিত ঘটনা হবে এবং মার্কিন ন্যায় বিচার সম্পর্কে আমাদের ধারণা খারাপ হবে। রোজেনবার্গদের অমানুষিক দণ্ড দেওয়ার জন্য এবং বিচারের ব্যর্থতার জন্য সেদিন শুভ-বুদ্ধি সম্পন্ন বহু আমেরিকাবাসীও নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। অবশ্য এর আগেও ওরা বার বার এর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করেছিল। ১৯৫২ সালের ১২ই মার্চ রোজেনবার্গ মামলা পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে নিউইয়র্ক শহরের পিথিয়ান টেম্পলে অনুষ্ঠিত হয় এক বিরাট জনসভা। আমেরিকার হাজার হাজার মানুষ চেয়েছিল রোজেনবার্গ দম্পতি বাঁচুক- তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে হাজার খানেক মানুষ ১৯৫২ সালের ২১শে ডিসেম্বর সাহসে ভর করে মিছিল করে এগিয়ে এসেছিল জেলখানায় রোজেনবার্গদের অভিনন্দন জানাতে। পুলিশ সেদিন এই প্রতিনিধি দলকে জেলখানার ধারে ঘেঁষতে দেয়নি। ওরা তাই রেল স্টেশন থেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোজেনবার্গদের প্রতি দৃঢ় সমর্থনের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাহলে কি হবে--স্বদেশের বিদেশের বহু আবেদন-নিবেদনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মার্কিন সরকার ওদের প্রাণ নিয়ে জঘন্য জিঘাংসা চরিতার্থ করলেন।

দোষ ওরা করেনি এবং গুপ্তচর বৃত্তির সঙ্গে একেবারেই জড়িত ওরা ছিল না তবু মৃত্যুপুরীতে মাথার ওপরে মৃত্যুর খড়্গ তুলে ওদের দিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করে নেবার জন্য কি চেষ্টাই না করে-ছিলেন মার্কিন সরকার। কিন্তু অন্যায়ের কাছে, মিথ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করে ওরা বাঁচতে চায়নি। প্রতিবারই রোজেনবার্গরা বলেছে যে তারা নিরপরাধ। স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ তারা করবে কিন্তু নিজেদের মিথ্যে অপরাধী করে বেঁচে থাকার হীন প্রবৃত্তি ওদের বিন্দুমাত্র নেই। "কারো সাধ্য নেই রোজেনবার্গদের কান ধরে চালনা করে। রোজেনবার্গ দম্পতি শুধু একটি নির্দেশই মেনে চলে--সে নির্দেশ আসে অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে। সে নির্দেশ বিবেকের অলঙ্ঘ্য নির্দেশ। মানুষকে তারা ভালবাসে—সেই ভালবাসাই তাদের চালনা করে।"

মৃত্যুপুরীতে যখন একান্তে মিঃ বেকেট এথেলকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করলে এবং গুপ্তচর বৃত্তির কথা প্রকাশ করে দিলে তিনি হয়তো এথেলের প্রাণ ভিক্ষায় প্রেসিডেণ্টকে রাজী করাতে পারেন। এ শুধু এথেল পাবে "মা" হিসাবে। এথেল বুঝেছিল এ প্রস্তাব কি মারাত্মক। তাছাড়া যে বিষয়ে তারা জড়িত নয় সে বিষয়ে কি স্বীকারোক্তি সে দেবে। তবে তো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। সে বুঝেছিল সরকার পক্ষের এটা একটা টোপ যাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরে। ঘৃণাভরে এথেল ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, "আমার স্বামী নির্দোষ, যেমন নির্দোষ আমি নিজে। দুনিয়ার কারো ক্ষমতা নেই জীবনে কিম্বা মরণে আমাদের আলাদা করে।"

রোজেনবার্গরা এই আশা রেখে প্রাণ দিয়েছিল, "আমাদের বিরুদ্ধে আজ রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক এই যে মামলা আনা হয়েছে, সেটা একদিন দেশের মানুষ, বিদেশের মানুষ বুঝবে। আমরা ছিলাম সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ—আজ হোক আর কাল হোক এ সত্য সকলে জানবেই। আমাদের ছেলেরা যখন বড় হবে, বুঝতে শিখবে তখন ওরা ওদের বাবা-মা'র জন্য গর্ববোধ করবে এবং মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াবে। আইনের তুলাদণ্ডে পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করলে আমরা নির্দোষ তা প্রমাণিত হবেই।" জুলিয়াস মৃত্যুর আগে বলেছিল, "আমরা বিশ্বাস করি, দেশের মানুষ রোজেনবার্গদের রক্তে আমেরিকার ন্যায়ের দণ্ডকে কখনই এমনভাবে কলঙ্কিত হতে দেবে না। সে কলঙ্ক কোন দিনই মুছবে না।"

না, সে কলঙ্ক মোছেনি। সে দুরপণেয় কলঙ্ক আজও আমেরিকা শুধু নয়—সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের মনকে নাড়া দেয়। রোজেনবার্গদের সেই দুই ছেলে আজ যুবক। রোজেনবার্গদের ঐ দুই পুত্রের পদবী এখন মারোপোল। যাদের স্নেহদয়ায় থেকে ওরা বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে ওরা স্বেচ্ছায় ওদের পদবীকেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু এজন্য গর্বভরা বাবা-মা'র কথা ওরা এতটুকু ভোলেনি। ওরা দুজনে একটা বইও লিখেছে। বইটির নাম, "আমরা তোমাদের ছেলে—এথেল আর জুলিয়াস রোজেনবার্গের উত্তরাধিকারী।"

তারাই আজ মাথা উঁচু করে তাদের মা-বাবার সেই মিথ্যা মামলাকে আবার আদালতে বিচারের জন্য আনতে চাইছে। এর ফলে ওরা ওদের বাবা-মা'কে ফিরে পাবে না ঠিকই কিন্তু তাদের ওপর যে ঘোর অসত্য'কে চাপান হয়েছিল তার সত্যতা উদ্‌ঘাটিত হবে। বিশ্বের মানুষ জানতে পারবে প্রতিহিংসা পরায়ণ কোন ফ্যাসিস্ট সরকার কত দূর নীচে নামতে পারে—কত ছল-চাতুরী করে অপরের স্বাধীন মতামত ও চিন্তাধারার টুঁটি টিপে ধরতে পারে। রোজেনবার্গদের ছেলেদের এই প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে সারা বিশ্বের স্বাধীন ও শান্তিকামী মানুষের অন্তরের শুভেচ্ছা--ওরা জয়ী হোক।

ইন্দিরা গান্ধীর নারকীয় অভিযানের প্রেক্ষাপট / অনিল বিশ্বাস

১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন ভারতের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করে। ভারতের জনগণ শাসকদল সেদিন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালায় তা কোনদিন ভুলতে পারবেন না। ইন্দিরা গান্ধী দেশে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে দেশে সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দেন। একমাত্র তদানীন্তন শাসক কংগ্রেসের, তাও আবার ঐ দলের একমাত্র নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক ভাষণ দেবার অথবা জনগণের কাছে বক্তব্য পেশ করার অধিকার ছিলো। আর কারুরই কোন অধিকার ছিল না। সকলকেই ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্যের সমর্থনে কথা বলতে হবে, তাঁর পক্ষ অবলম্বন না করলে কারুরই বাক্ স্বাধীনতা থাকবে না—এই ছিলো আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার বাস্তব পরিস্থিতি।

নতুন করে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, সমস্ত প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকারের অবলুপ্তি ঘটিয়ে এবং জঘন্যতম প্রেস সেন্সারশিপ চালু করে কংগ্রেস দল কার্যতঃ দেশে একদলীয় স্বৈরতন্ত্রই কায়েম করেছিল। ৩৯ জন সংসদ সদস্যকে কারারুদ্ধ করে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর এই স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপকে সংসদের অনুমোদন পাইয়ে দেন। এই সময় ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় দম্ভভরে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "আমি ও আমার পার্টি ছাড়া আর কে দেশ শাসন করতে পারে? কোন পার্টিই পারে না। সব পার্টিরই পরীক্ষা হয়ে গেছে।" তারপর প্রতিনিয়ত ভারতবাসীকে শোনানো হয় ঃ "আমি ছাড়া দেশের ও জনগণের স্বার্থরক্ষার আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই। আমার মতই, আমার পথই দেশকে গঠন করার একমাত্র মত ও পথ; আমার বিরুদ্ধে যারা তারা সবাই দেশের শত্রু, আমার নিজের দলের ভিতরে যারা আমার মতের বিরুদ্ধে তারাও দেশের শত্রু।" কেবল ইন্দিরা গান্ধী নন, তাঁর বশংবদেরাও এই একই ধরনের কথা বলতে থাকেন। তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট দেবকান্ত বড়ুয়া তো বলেই বসলেন ঃ ইন্দিরাই ভারত।

তাঁদের এই সমস্ত বক্তব্য ইতিহাসের কয়েকজন ডিক্টেটরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই বলেছিলেন ঃ রাষ্ট্র? আমিই রাষ্ট্র। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার জার বলেছিলেন ঃ আমার সাম্রাজ্য আমার মতেই চলবে।

একদলীয় স্বৈর শাসনের পথে পা বাড়াতে গিয়ে ইন্দিরা সরকার সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্ত রীতি-নীতিই লঙ্ঘন করতে থাকে। ঐ সময় সমস্ত বিরোধী দলকে নিষিদ্ধ করা হয় না সত্য। কিন্তু সমস্ত বিরোধী, কি বাম আর কি দক্ষিণপন্থী দলের কাজ-কর্মকে ইন্দিরা সরকার স্তব্ধ করে দেয়। "বিরোধীদের বিরোধিতা করা চলবে না," "বিরোধীরা আমায় সমর্থন করুক"—এটাই ছিলো ইন্দিরা গান্ধীর নীতি, ইন্দিরা গান্ধীর শ্লোগান।

বিধানসভার অধ্যক্ষ ও চেয়ারম্যানদের সম্মেলনে তদানীন্তন লোকসভার অধ্যক্ষ বলেছিলেন ঃ "বর্তমানে সমস্ত বিধানসভায় একমত হয়ে সরকারী সিদ্ধান্তগুলি পাস করতে হবে, সরকারী কাজ-কর্মে বিধানসভায় যেন কোনরূপ বাধা না দেওয়া হয়।" বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের কোন নিয়মেই এই ধরনের মন্তব্য করা চলে না। বিরোধীদের মতামত, অভিমত নিয়েই বুর্জোয়া গণতন্ত্র নিজেকে সমৃদ্ধ করে এটা সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের নিজেদের সংজ্ঞা। বিরোধীদের মতামত না নিয়ে সংসদ বা বিধানসভা পরিচালনা করলে সেটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংসদীয় প্রথা হয় না। সেটা একটা একদলীয় এক নেতার স্বৈরশাসনের রূপ নেয়। ইন্দিরা গান্ধী এ পথই গ্রহণ করেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। বিরোধীদের অভিমত, মতামত, বক্তব্য জনগণের কাছে যাতে না পৌঁছুতে পারে তার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়। কোর্টের অধিকার হরণ করা হয়। বিচার বিভাগকে প্রসাশন বিভাগের অধীনে আনা হয়। বিচার সম্পর্কে সমস্ত বুর্জোয়া পদ্ধতির অবসান ঘটানো হয়। সংবাদপত্রের অধিকার হরণ করা হয়। বিরোধী দল নেতাদের এমন কি সংসদে বিরোধী দলের সদস্যদের কোন বক্তব্যও সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পায় না। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেন ঃ যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করছে সেই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে কোন কথা বলব না। এই বলে কেন্দ্রীয় সরকার বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা পর্যন্ত বন্ধ করেছেন। সংবিধানের মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা হয়। হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়। প্রসাশনিক স্বেচ্ছাচারিতায় কোন নাগরিক যদি নিহতও হন, তবুও নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের কোন অধিকার ছিল না আদালতে বিচার প্রার্থনা করার।

আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার আর একটি বিষময় পরিণতি হলো, একের পর এক মিসা সংশোধন। ১৯৭১ সালে এই আইন যখন চালু হয় তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিলো সরকার রাজনৈতিক কারণে এই আইন ব্যবহার করবে না। কিন্তু তখন থেকেই এই আইন পদে পদে লঙ্ঘিত হতে থাকে। আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থায় সরকার নিজেদের সুবিধামত এই আইনের চার চারটি সংশোধন করায়। কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কর হলে বিচার বিভাগও জানতে পারে না কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো? কুলদীপ নায়ার মামলায় বিচারপতি রঙ্গরাজন মন্তব্য করেছিলেন ঃ "আমি জানতে চাই, সংবিধানকে তুলে

ধরতে আমি যে শপথ নিয়েছি তাতে বিচারক হিসাবে আমি জানতে বাধ্য, তাঁর আটকের পক্ষে কোন তথ্য বা কারণ কিছু আছে কিনা। আমি জানি না আমাদের ক'জন এখানে অবগত আছেন যে সরকার তার শপথনামায় বলেছে যে, কুলদীপ নায়ার যে একজন সাংবাদিক সে খবর তারা রাখে না। কুলদীপ নায়ার তাঁর দরখাস্তেই জানিয়েছেন, তিনি একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। সাংবাদিকতাই তাঁর একমাত্র পেশা এবং তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন।

কিন্তু অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খোঁজই রাখেন না যে তিনি একজন সাংবাদিক। মনে হয়, তিনি খবরের কাগজই পড়েন না। কুলদীপ নায়ারের মত একজন সাংবাদিকের ক্ষেত্রেই যদি এমন হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের বেলায় কি হতে পারে?" বিচারপতি রঙ্গরাজনের রায়ের শেষ বাক্যটি হল : "আমরা যেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি তা হলো, আইনের শাসন কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী কাজ বরদাস্ত করবে না।"

একটি হেবিয়াস কর্পাস মামলার রায় দান প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি খান্না মন্তব্য করেছিলেন: "আদালতগুলির হেবিয়াস কর্পাসের রিট জারি করার অধিকারকে আইনের শাসনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। আইনের অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না—এই নীতি জীবন ও স্বাধীনতা যে মূল্যবান সম্পদ, এই বিচার বিবেচনার গভীরেই দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল।"

সংবিধান প্রদত্ত ব্যাপক জরুরী অবস্থাকালীন ক্ষমতার জোরে হাজার হাজার রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষের ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বা সুস্পষ্ট অভিযোগ ছাড়াই জেলে পুরবার সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণকে আইন সম্মত বলে আবার তিন জন বিচারপতি যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে বিচারপতি খান্না মন্তব্য করেছিলেন: "বলতে গেলে আনুষ্ঠানিক অর্থে নাৎসী আমলের সংগঠিত গণ-হত্যাকেও পর্যন্ত আইন সম্মত বলা চলে।"

বিচারপতি খান্না এবং বিচারপতি রঙ্গরাজনের মন্তব্যই প্রমাণ করে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থায় দেশের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। প্রমাণ করে নাগরিক স্বাধীনতা কিভাবে বিপন্ন হয়েছিলো।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল গণতন্ত্র হত্যার এই জঘন্যতম পথ গ্রহণ করেছিলো? কেন দেশকে স্বৈরশাসনের পথে ঠেলে দিয়েছিলো? যদিও ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা জারির কারণ হিসাবে তখন যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যই তিনি আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারি করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শাহ্ কমিশনের রিপোর্টে যে তথ্য প্রকাশ পায় তাতে জানা যায়, এলাহাবাদ হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে প্রতিকূল রায়দানের পর, গুজরাটের নির্বাচনে প্রতিকূল রায়ের পর ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতাচ্যুত হবার আশঙ্কা প্রকট হয়ে ওঠে। তখন তিনি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্যই এই আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। একটি চক্রের স্বার্থেই এই জঘন্যতম কাজ করা হয়েছিলো। জনগণের স্বার্থে এটা করা হয়নি। গণতন্ত্র থেকে একনায়কত্বে হঠাৎ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিলো, সংকট থেকে শাসক দল ও তাদের শ্রেণীকে ক্ষমতায় রাখার পথ বের করা। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণী যে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে আসছিলেন শাসকদলের শাসনের প্রতি তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তদানীন্তন শাসকদলের স্বৈরতান্ত্রিক ও একদলীয় একনায়কত্বের পথে যাবার সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ। সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর আঘাত আসে গভীরতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণসমূহের প্রেক্ষাপটে। ঘনায়মান অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা পরিস্থিতির মোকাবিলায় শাসকদলের ব্যর্থতা এই দানবীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করে। জরুরী অবস্থা জারির প্রকৃত অর্থ ছিল জনগণের উপর নতুন করে সংকটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, অর্থনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করা। জনগণকে হয় দাসত্বের শৃঙ্খল পরতে হবে নতুবা তাঁদের জেলে যেতে হবে—এটাই ছিল আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার বাস্তব পরিস্থিতি। তাই দখা যায় আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণার অব্যবহিত পরেই তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক বিশেষ বেতার ভাষণে দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এই আশ্বাস দেন যে, আর শিল্প জাতীয়করণ হবে না। ১৯৭১ সালে নির্বাচনের সময় "গরিবী হটাও" শ্লোগান দিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সীমাবদ্ধকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের যে সমস্ত লম্বা-চওড়া কথা বলা হয়েছিলো সেগুলোকে সুন্দরভাবে কবরস্থ করা হলো। একদিকে যেমন বৃহৎ পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকা কনসেশন দেওয়া হলো, অপর দিকে বোনাস অর্ডিন্যান্স জারি করে শ্রমিকশ্রেণীর বোনাসের অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হলো।

গভীর অর্থনৈতিক সংকট তদানীন্তন শাসকদলকে আতঙ্কিত করে তুলেছিলো। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সংকট মোকাবিলা না করে ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরশাসনের পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন--গণতন্ত্রকে খতম করেছিলেন। তাই তিনি যে অপরাধ করেছিলেন সেই অপরাধ হলো গণতন্ত্র হত্যার অপরাধ, সংবিধান ধ্বংসের অপরাধ। এজন্যই আজ দেশব্যাপী দাবি উঠেছে: গণতন্ত্র হত্যার অপরাধে ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ আদালতে বিচার হোক। এ দাবি এজন্যই উঠেছে, ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সংকট অনিবার্যভাবেই গভীর থেকে গভীরতর হবে। আর এই সংকটের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে কোন প্রধানমন্ত্রী যেন ইন্দিরা গান্ধীর পথে পা না বাড়াতে পারেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ও যুব সমাজ / অমিতাভ বসু

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যুবকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রার্থীপদে এবং প্রার্থীকে জয়যুক্ত করাতে উভয় ক্ষেত্রেই যুবকদের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। সমস্ত সংগ্রামেই, বিশেষতঃ নির্বাচনী সংগ্রামে যুবকরা সামনের সারিতে এগিয়ে আসেন ঠিকই। কিন্তু এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক এবং মাঝারি কৃষক ঘরের যুবকদের মধ্যে সাড়া অভূতপূর্ব। নিড়েনের ভুঁই থেকে শুরু করে হাটে, বাজারে, গঞ্জে, যানবাহনে অর্থাৎ গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই নির্বাচনী সংগ্রামের আওয়াজকে প্রধানত গ্রামের যুবকরাই পৌঁছে দিয়েছেন। আহার-নিদ্রাহীন, ক্লান্তিহীন পদক্ষেপে বীরদর্পে যুবকরা এগিয়ে গেছেন। অর্থলোভ, সাময়িক স্বার্থ, হুমকি, জুলুম, ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে, গ্রামের কায়েমী স্বার্থবাদী, মোড়ল, মাতব্বর, প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখের উপর তুড়ি মেরে যুবকরা এগিয়ে গেছেন। ক্ষেতমজুর যেমন তার জমি ফিরে পাওয়ার পথকে আঁকড়ে ধরেন, কৃষক যেমন তার ফসল রক্ষার পথকে আঁকড়ে ধরেন বুক দিয়ে তেমনি এবার গ্রামের যুবকেরা বুক দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনী সংগ্রামকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। এযেন ছিল তাদের বাঁচা মরার সংগ্রাম। শত্রুর বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষের ঐক্যটাও ছিল তাই অত্যন্ত আঁটো-সাঁটো। সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবৈষম্য ইত্যাদি বিভেদমূলক প্রচারের বান ডাকিয়ে দিয়েছে কিন্তু ঐক্যের বাঁধকে ভাঙতে পারেনি। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, দামামা বাজিয়ে পঞ্চায়েত ক্ষমতা থেকে কায়েমীস্বার্থবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল বাস্তু-ঘুঘুদের বিতাড়িত করেছে, বিচ্ছিন্ন করেছে, জয়ের ফসল বামফ্রন্টের ঘরে তুলেছে গ্রামের যুবকরা তথা সাধারণ মানুষ।

কিন্তু গ্রামের যুবকদের মধ্যে এই সংগ্রামী জাগরণের উৎস কোথায়? এটাই ইতিহাসের মহৎ শিক্ষা যে চেতনার বিকাশ আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সহায়তায় হয় না, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চেতনার বিকাশ ঘটে। যতটা চেতনার বিকাশ ঘটে বন্ধ্যা পুরাতন ব্যবস্থাকে ততটাই ভেঙে সে বেরিয়ে আসতে চায়। হাতিয়ার ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত শক্তি। যুবকরা সমাজের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, সংবেদনশীল, গতিশীল অংশ। দেশের অধিকাংশ যুবক কৃষিজীবী, গ্রামে বাস করে। শিক্ষার অভাবে পশ্চাতপদতা এদের মধ্যে বেশী। তাই নগ্ন সামন্তযুগীয় শোষণের ছোবল এদের উপরই বেশী। বিগত ৩০ বৎসরের কংগ্রেসী আমলে গ্রামীণ যুবকরা ত' চোখ বুজে থাকেননি, চোখ খুলেই তারা চলেছেন। দেখেছেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের আকাশছোঁয়া দর। ফসলের দাম নেই। ঋণের বোঝা বাড়ছে। জমি চলে যাচ্ছে। কৃষক ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। নিজের জমিতেই জন খেটে খেতে হচ্ছে। তারই কোনো যুবক ছেলে বাবার কাছ থেকে জেনেছে, তার বাবা যে জমিটায় খাটে সেই জমিটা একদিন তাদেরই ছিল। বাবা হয়ত বলবেন নসিব, যুবক বলবে, না, এ অত্যাচার। বর্তমানে গ্রামে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেতমজুর। বছরে ১৫০ থেকে ১৮০ দিন এদের কাজ থাকে। তারপর বেকার। তখন এদের কাজ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, জেলা থেকে জেলান্তরে, শহরের পথে পথে—চাই কাজ আর কাজ। এছাড়া আছে স্থায়ী বেকার বাহিনী, যার মধ্যে ১টা/২টা পাশ করা যুবকও আছে। প্রশ্ন করবেন কেন এমন হলো? গ্রামের বৃদ্ধ যে তিনি হয়ত বলবেন–নসিব, যুবক বলবে—না, এ শোষণ। যতই বেকারী বাড়বে ততই মজুরী কমবে। ধনীদের মুনাফা বাড়বে। অর্ধাহার, অনাহার, নগ্নতা, আচ্ছাদহীনতা গ্রামের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের নিত্য সঙ্গী। এর পরেও দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কোথা থেকে হবে? শিল্পের প্রসারই বা কি করে হবে? বিগত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস বলে এসেছে, দেশের কল্যাণ হচ্ছে। স্বাধীনতার প্রায় ১০০ বছর আগে সাহিত্য সম্রাটের সেই উক্তিটি স্মরণে আসে—"বল দেখি চশমা নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?...দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।" একথা স্মরণে আসে তখন, যখন গ্রামের যুবকরা দেখেন দেশের মুষ্টিমেয় লোক যাদের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত সেই জোতদার—জমিদারদের পেলব পৌষমাস আর গ্রামের অধিকাংশ মানুষের সর্বনাশ। গ্রামের যুবকরা ধিক্কার দেবে কাকে, নসিবকে? না, কংগ্রেস সরকারকে? মানব-ইতিহাসে ভণ্ডামীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব যারা করে এসেছেন। প্রতিদিন মিথ্যা প্রচার করে অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে, 'কল্যাণের' গলাবাজি করে, নিজেদের স্বার্থের তাগিদে। গ্রামের গরীব মানুষ, কৃষক সমাজকে নিঃস্ব, পঙ্গু করে দিতে চেয়েছে কংগ্রেস সরকার। পঙ্গু করে দিতে চেয়েছে দেশের অধিকাংশ লোক, জাতির মেরুদণ্ডকে।

এই অবস্থার দৃশ্যপটেই ১৪ বছর আগে গ্রামোন্নয়নকল্পে প্রতিষ্ঠিত হলো গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতরাজ। পঞ্চায়েত ক্ষমতায় তারাই এতদিন থেকে এসেছে জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার, নির্বাচনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে, যারা গ্রামাঞ্চলে কায়েমীস্বার্থবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, জোতদার-জমিদার, মহাজন, সুদখোরদের প্রতিনিধি। এরাই আবার প্রধানত গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের

বাহন। তাই পঞ্চায়েত গ্রামাঞ্চলে শোষণ, অত্যাচারের পক্ষেই থেকেছে। তৃষ্ণার জল থেকে বঞ্চিত হয়েছে, পায়ে চলার রাস্তার সংখ্যা নগণ্য মাত্র। গ্রামর চিকিৎসা কেন্দ্র অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। রোগের উপশমের পরিবর্তে রোগ বৃদ্ধির স্থল। একটুকু কারমেটিভ মিকচার আর সালফা-গুইনাডাইনের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় রোগীকে। বহু গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র হয় না, ছাত্র বাবার সংগে অর্ধ মজুরীতে মাঠের কাজে যায়। পঞ্চায়েত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ট্যাক্স বসানো আর ট্যাক্স আদায়ের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পঞ্চায়েতের কাছে বিচার চাইতে গেলে, বিচারের পরিবর্ত নেমে এসেছে অত্যাচার। গ্রামে যখন ক্ষেতমজুর, কৃষক আন্দোলন করেছে পঞ্চায়েত তখন পুলিশের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এমনকি গ্রামের দুঃস্থ, অনাহারগ্রস্ত মানুষের ত্রাণকার্যের টাকা, গম আত্মসাৎ করতেও পিছপাও হয়নি এরা।

বিগত ছয় বছর পশ্চিমবঙ্গ ছিল 'জরুরী অবস্থার' কবলে; আনুষ্ঠানিকভাবে যে জরুরী অবস্থা গোটা দেশে কায়েম করে ডান্ডাবাজী মস্তানবাজী আর শোষণের এক উন্মত্ত চেহারা দিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল ওরা। এরই নাম স্বৈরতন্ত্র। সে অন্ধকারময় যুগের অবসান ঘটাতে গ্রামের যুবকরা পিছিয়ে থাকেনি। গোটা দেশে কংগ্রেসের পরাজয়, স্বৈরতন্ত্রের পরাজয়, এক বিরাট পরিবর্তনে পশ্চিমবাংলার জনগণ প্রতিষ্ঠা করলেন বামফ্রন্ট সরকার।

গত এক বছরে বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও যে কাজ করেছেন গ্রামের গরীব মানুষের স্বার্থে, যুবকদের স্বার্থে এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে এই সরকার কাজের স্বার্থে কাজ করতে চায়। বামফ্রন্ট শুধু বক্তৃতাই দেয়নি, সরকারে গিয়ে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে এ কাদের সরকার। আরো ক্ষমতা থাকলে আরো বেশী জনগণের স্বার্থেই তা এই সরকার প্রয়োগ করবে এতে আর সন্দেহ কি। প্রমাণিত হচ্ছে একটা সরকারের গণমুখীন নীতি জনস্বার্থে তার কর্মসূচীকে রূপায়ণ করতে, কার্যকরী করতে সাহায্য করে, দেশের মানুষের কল্যাণের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। গ্রামের যুবকরা তাদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক নতুন চেতনায়, আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে এগিয়ে এসেছেন।

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা;
...........মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

বামফ্রন্ট সরকার কবির এই বিপ্লবী বাণীকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছেন। তাই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি গ্রামের যুবকদের শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা এত গভীর।

পঞ্চায়েতের কাজে যুবকরা যুক্ত হবে, অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, নতুন চেতনায়, নতুন ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে যেখানে বাধা পাবে সেই বাধা অতিক্রম করার ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠবে গ্রামের যুবকরা। শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়নের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যেই যুবকরা অগ্রসর হবে এটাই যুব-জীবনের বর্তমান যুগ ভাবনা।

"আমার কাছে মানুষের বাইরে কোন ভাবের অস্তিত্ব নেই। কেন না আমার মতে একমাত্র মানুষই সমস্ত কিছুর এবং সমস্ত ভাবের সৃষ্টিকর্তা; এবং এক মহান কর্মী। আমাদের এই পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর সে সমস্তই মানুষের শ্রম দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে; তা তার কুশলী হাতের স্পর্শেই সৃষ্টি হয়েছে।"

—ম্যাক্সিম গোর্কি

(সচিত্র মাসিক যুবদর্পণ)

সপ্তম সংখ্যা ॥ জুলাই ১৯৭৮

যুবকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ)
কলিকাতা-৭০০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাঁদ দে কর্তৃক তরুণ প্রেস, ১১ অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

সূচী

লেখা পাঠাতে হলে :

- ☐ ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিস্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
- ☐ সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।
- ☐ কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
- ☐ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ২০০০ শব্দের বেশি হলে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।
- ☐ যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকগণ তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

☐

নিজ এলাকায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা ও গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব থাকলে পাঠকবর্গের কাছে তার আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। এই প্রস্তাব বিশদ বিবরণসহ বিভাগীয় যুগ্ম-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, ৩২/১, বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

☐

গ্রামবাংলার চিন্তাশীল তরুণ লেখকগণ নিজ নিজ লেখা পাঠান। যুবমানসের সমালোচনা আহ্বান করি।

সম্পাদক : যুবমানস

সম্পাদকীয়

জনগণের শত্রু আর নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে বামফ্রণ্ট সরকারের প্রথম বছর সাফল্যের সংগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই এক বছরেই সারা দেশের দৃষ্টি কেড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। জনসাধারণের বিপুল সমর্থন এবং সহযোগিতাই বামফ্রণ্ট সরকারের শক্তির উৎস। সরকারের প্রতিটি কর্মের পিছনে রয়েছে সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ফলে শত বাধা-সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সারা রাজ্য জুড়ে এক নতুন উদ্যোগ, কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। মানুষ নতুন আশায় বুক বেধেছেন। মূল্যবোধ, মর্যাদাবোধ আর আস্থা ফিরে এসেছে তাদের মধ্যে।

সমাজ-সভ্যতার শত্রু, মানুষের রক্ত শোষণকারী অন্ধকারের জীবদের সগর্ব প্রকাশ্য দাপাদাপি এখন অনেকাংশে স্তিমিত। অন্তত মন্ত্রীসভা এবং তার পরিচালক বামপন্থী দলগুলি এদের মদত যোগায় না। বিগত বছরগুলোতে জনসমর্থনহীন, কায়েমী স্বার্থবাদী নৈতিকতাহীন লোকজনেরা মন্ত্রীসভা থেকে শুরু করে রাজ্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিল। সারা রাজ্যে আবাধে চলছিল নৈরাজ্য, অত্যাচার আর দুর্নীতির জোয়ার। যুব-ছাত্র সমাজকে নৈতিকতাহীন, স্বার্থপর ক্লীবে পরিণত করার অপপ্রয়াস চলছিল। কলেজ ছাত্র সংসদগুলো হয়ে উঠেছিল যথেচ্ছাচার, তহবিল তছরূপ, সন্ত্রাস সৃষ্টি আর নানা অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়া। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রথা উঠে গিয়েছিল সারা দেশ থেকে। অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ, খুন, সন্ত্রাস, ডাকাতি রাহাজানি ছিল অতি সাধারণ চিত্র। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বলতে কিছুই ছিল না।

পশ্চিম বাংলার মানুষ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাদেরই বিপুল সমর্থনে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন। মন্ত্রীসভাও দেশের সাধারণ গরিব মানুষের আস্থা, আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যথাসাধ্য করবার চেষ্টা করছেন। যদিও করণীয় অনেক কিছুই এখনও করা যায়নি, যা করা গেছে প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্যই। সরকারের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবার সাথে সাথেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, বামফ্রণ্ট শুধু মহাকরণে বসে রাজ্য শাসন করবে না—রাজ্যের সাধারণ মানুষের সমর্থন, সহযোগিতা, পরামর্শ এবং তদারকিতে রাজ্য শাসন চলবে। জনসাধারণ রাজ্য শাসনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবোধ এবং আস্থার জন্ম হয়েছে। এই আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবোধ এবং আস্থা তাদের পৌঁছে দেবে ঈপ্সিত সমাজ পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত সংগ্রামের পথে। এটিই হ'ল বামফ্রণ্ট সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য। গ্রাম-শহরের লক্ষ কোটি নুব্জ, অর্ধনগ্ন ম্রিয়মান মানুষগুলো সোজা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের অভূতপূর্ব সাফল্য তাদের মনোবল আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রধান সাফল্যের সাথে সাথে উন্নয়নমূলক কাজ কর্মেরও কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে গত এক বছরে। যদিও এই অগ্রগতিতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেশের ধনতান্ত্রিক আর্থ-ব্যবস্থা আর রাজ্যের অতি সীমিত সহায়-সম্পদ-ক্ষমতা। আজকের দিনে সমাজের অগ্রগতির প্রধান শর্তই হল ধনতন্ত্রের অবসান ঘটান। পৃথিবীর কোন দেশই আর ধনতান্ত্রিক পথে নতুন করে অগ্রগতি ঘটাতে পারছে না। খোদ আমেরিকাতে বেকারের সংখ্যা ১ কোটির ওপর এবং নিরক্ষর ২ কোটি। ভারতের মত দুর্বল ধনতান্ত্রিক দেশের কথা সহজেই অনুমেয়। এখানে অগ্রগতির প্রধান শর্ত হ'ল, জমিতে জোতদারী, জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন, একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবসান এবং

বিদেশী পুঁজির বাজেয়াপ্তকরণ। অবশ্যই এগুলি হতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে। অথচ এ সমস্ত করার কোন ক্ষমতাই রাজ্য সরকারের নেই। আর দেশী সম্পদের অধিকাংশটাই নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। এমত একটি অবস্থার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করছে। পদে পদে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সরকার ও জনসাধারণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কিছু কাজ করা সম্ভব হয়েছে। শুধু যুব-ছাত্র সম্পর্কিত কয়েকটির উল্লেখ করব।

সরকার ইতিমধ্যেই ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছেন। ৭৯' সাল থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্তও শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। ২০ লক্ষ প্রাথমিক ছাত্রদের মধ্যে ডে-মিলের প্রসার ঘটান হয়েছে। প্রতি বছর ১০০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। অপদার্থ অযোগ্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে পর্ষদে নতুন প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দুর্নীতি মুক্ত কর্মদক্ষ করে তোলার জন্য বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত অকর্মণ্য সিনেট, সিণ্ডিকেট বাতিল করে কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। এক বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন হবে।

যুবসমাজের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী সরকার বেকার যুবকদের জন্য মাসিক ৫০ টাকা করে ভাতা প্রবর্তন করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি বছর নতুন ৪০০০ শিক্ষক এবং মাদ্রাসাগুলিতে ১০০০ নতুন শিক্ষক নিয়োগ সরকার মঞ্জুর করেছেন। আদিবাসী, সংখ্যালঘু এবং অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন ৯১৮ 'বুক ব্যাঙ্ক' খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নানা স্তরে পাঠ্যসূচীরও পরিবর্তন ঘটান হচ্ছে। ইতিমধ্যেই উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীর বোঝা কমান হয়েছে। মেদিনীপুরে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই পাকা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসানকল্পে পূর্ব নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা এবং দ্রুত ফল প্রকাশের জন্য সর্বতো প্রচেষ্টা চলছে। দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার এবং অযোগ্যতার অভিযোগে সরকার ইতিমধ্যেই কয়েকটি কলেজ অধিগ্রহণ করেছেন। যুবকল্যাণ দপ্তর তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অসামাজিক জীবদের নয়, সামাজিক দায়িত্বসম্পন্ন যুবকদের শিক্ষিত ও সংগঠিত করার কর্মসূচী নিয়েছে যুব-কল্যাণ দপ্তর। এ বছরই প্রথম এই দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক বছরের মধ্যেই নতুন ৫০টি ব্লক যুবকেন্দ্র খোলা হয়েছে। আরও ১০০টি খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। এছাড়াও ৩৪টি নতুন মহকুমা যুবকেন্দ্র খোলা হচ্ছে। পূর্বের তুলনায় বাজেট বরাদ্দ তিনগুণ বেড়েছে। নতুন ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে মোট ৫,৬৬৩জন শিক্ষা নিচ্ছেন। ৫৩টি বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১,৪২৫জন শিক্ষা নেন। ৫৪টি বিদ্যালয় সমবায় খোলা হয়েছে।

খেলাধূলার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পেও সরকার বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন। শিক্ষার প্রসার, সংস্কার ও উন্নতি এবং যুবজীবনের সমস্যাগুলির সমাধান-কল্পে নানা কর্মসূচী অর্থের অভাবে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। রাজ্যের হাতে অধিক অর্থ এবং ক্ষমতা ছাড়া সে সব সম্ভব নয়। আর শিক্ষাকেও সংবিধানে রাজ্য তালিকাভুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। এ সমস্ত নিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলো-চনা করছেন। যুব-ছাত্র সমাজকেও রাজ্যের হাতে অধিক অর্থও ক্ষমতার দাবিতে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

স্নাতক পর্যায়ে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা / ডঃ রমেন্দ্র কুমার পোদ্দার

(সহ উপাচার্য (শিক্ষা), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন যে আমাদের বাংলা ভাষা শুধু ভাবের ভাষা হয়েই রইল—ভাবনার ভাষা হলো না। যে কোন বিষয়েই একটু গভীরভাবে জানতে হলে, বুঝতে হলে আমাদের ইংরাজী ভাষার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সর্বাধুনিক অগ্রগতির খবর পেতে হলে, সত্যি বলতে কি, বাংলাভাষা না জানলেও চলে। মাতৃভাষার এই দৈন্যদশা আমাদের সবাইকেই পীড়িত করে। এ নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক কান্নাকাটি হয়েছে কিন্তু তাতে অবস্থার খুব বেশী হেরফের হয়নি। তাই অনেকেই বলছেন, উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের ইংরাজী ছাড়া চলবে না। ইংরাজী সকলকেই বাধ্যতামূলক ভাবে শিখতে হবে।

আমার মতে এটা সম্পূর্ণভাবে পরাজিতের মনোভাব। নর্ম্যান রাজত্বে ইংলণ্ডে ও প্রাক্-বিপ্লবকালীন রুশদেশেও ঠিক আমাদের মতই মাতৃভাষার বদলে ফরাসী ভাষা ছিল উচ্চশিক্ষার এবং উচ্চকোটীর ভাষা। কিন্তু ইংলণ্ডে ও রুশদেশে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের পর তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষা, ইংরাজী ও রাশিয়ান ভাষায় সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ও কাজকর্মের প্রচলন হয়। তার সুফল আজ এতই প্রকট যে তা আর কারো বুঝিয়ে বলার অবকাশ রাখে না। এই একই ইতিহাস-প্রমাণিত পথ নিয়েছে জাপান, চীন, ভিয়েৎনাম এমনকি থাইল্যাণ্ড-ও। শুধু আমরা বাঙালী বা ভারতীয়রাই বা কেন পিছিয়ে থাকব?

এটা বললে অবশ্যই সত্যের অপলাপ হবে যে, আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার কোন প্রচেষ্টাই করিনি। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র—এরা সকলেই বিজ্ঞানকে জনগণের কাছে মাতৃভাষার মাধ্যমে নিয়ে যাওয়ার জন্য সক্রিয় ও নিরলসভাবে কাজ করেছেন। "শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রেই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যপ্ত করে দেওয়ার" উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে "লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা" সিরিজের প্রকাশনা শুরু করেন ১৩৪৬ সালে বিশ্বভারতীর মাধ্যমে। এই উদ্যমের প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "গল্প ও কবিতা বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অল্প শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের জন্য সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিবাৎ অত্যাবশ্যক। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার।"

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারা আমাদের দেশের বিজ্ঞানী সমাজকে পুরোপুরি অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। তার কারণ হিসাবে তিনি নিজেই মন্তব্য করেন, "আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ"। যাহোক, রবীন্দ্রনাথের এই প্রেরণা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তীকালে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নেতৃত্বে একদল কৃতবিদ্য বিজ্ঞানী "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করেন ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁদের এই উদ্যোগ এখনো অব্যাহত ও তাঁদের পরিচালিত মাসিক পত্রিকা "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" একটা মোটামুটি জনপ্রিয় এবং প্রায় একমাত্র পত্রিকা যা বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনসধারণের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। এই দীর্ঘকালের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে আজ স্কুল পর্যায়ে বাংলায় বিজ্ঞান পড়ানো-শোনানো প্রায় সার্বজনীন হয়েছে।

দুঃখের বিষয়, প্রয়োজনের তুলনায় এই অগ্রগতি প্রায় নগণ্য বললেই চলে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা ভাষায় পঠনপাঠন বলতে গেলে এখনো শুরুই হয়নি। অথচ এই স্তরে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা না হলে সার্বজনীনভাবে বিজ্ঞান মনস্কতার সৃষ্টিই হবে না। স্কুল পর্যায়ে যে বিজ্ঞান শেখানো হয় সেটা মোটামুটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মূলকথাগুলো প্রায় আপ্তবাক্যের মতো শিখিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ধরুন, পরমাণুর গঠনশৈলীর বিষয়। পরমাণুর নিউট্রন ও প্রোটনে ঠাসা একটা ছোট কেন্দ্রক আছে, তার চারদিকে তুলনামূলকভাবে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে ইলেকট্রনগুলো। স্কুলপর্যায়ে এই জ্ঞানটুকুই বলে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু কোন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা যুক্তির উপরে এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা স্নাতক স্তরে ছাড়া বোঝানো যাবে না। অর্থাৎ কিনা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গভীর ভাবনা চিন্তা, যুক্তি-সিদ্ধ আলোচনা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়েই সম্ভব। আর এইখানেই আমদের বাংলা সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলো প্রায় অপাংক্তেয়।

বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার এই দুরবস্থার জন্য এককভাবে বিজ্ঞানী ও ছাত্রসমাজের অনীহা বা উন্নাসিকতাকে দায়ী করা অযৌক্তিক হবে। ১৯৬৪—৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ডঃ ডি, এস, কোঠারীর নেতৃত্বে যে

"এড়ুকেশন কমিশন" নিয়োগ করেছিলেন, তার রিপোর্টে এই বিষয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ "It must be remembered that the hold of English as a medium in the universities is linked with the use of regional languages as the languages of administration in the states. So long as the prize posts in administration go to students who have good command over English, it will not be surprising if a substantial proportion of students continue to prefer education given through it." অর্থাৎ সোজাসুজি বলতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মাতৃভাষায় পঠনপাঠন সর্বজনগ্রাহ্য করতে হলে, যে সব স্নাতক মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে তাদের "বাজারদর" বাড়াতে হবে। এবং সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন এই সব স্নাতক দেখবে যে, দেশের আইন-আদালত, সরকারী কাজকর্ম, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য সবই মাতৃভাষার মাধ্যমে হচ্ছে। এই প্রথম কাজটা প্রথমে না করার যে কি পরিণাম সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুস্তক পর্ষদ ইতিমধ্যে বাংলাভাষায় স্নাতক পর্যায়ে কিছু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে ১ কোটি টাকার অনুদান দেওয়ার কথা বলেছেন। তারমধ্যে এরা প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু গত বছরে বোধ হয় মাত্র ৭৫০০০ টাকার বই বিক্রী করতে এরা সমর্থ হয়েছেন। অতএব মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বাংলাভাষায় যারা লেখাপড়া করে স্নাতক হবেন, তাদের যতদিন পর্যন্ত না ইংরাজী জানা স্নাতকদের মত কর্মজীবনে অন্তত সমান সুযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন স্নাতক পর্যায়ে বাংলায় পঠনপাঠন জনপ্রিয় করে তোলা যাবে বলে মনে হয় না। এই কাজ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারী বেসরকারী সংগঠনের পক্ষে এককভাবে করা সম্ভব নয়। দেশের জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকারকে দোদুল্যমানতা ত্যাগ করে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং দৃঢ় পদক্ষেপে তাকে কার্যকর করার জন্য নেতৃত্ব দিতে হবে।

রাজ্য যুব উৎসবে নির্বাচিত কবিতা গুচ্ছ ঃ

আমার মাটির পৃথ্বী / বাসুদেব গাঙ্গা

(কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ/তৃতীয়)

আমার মাটির পৃথ্বী এই ভালো স্বর্গের থেকেও
পুরানো স্বর্গের দেনা চুকিয়েই এসেছি এখানে।
নাই থাক পারিজাত, আম-বট-অশথের নন্দনকাননে
বেঁধেছি কুটীরখানি, কেউ বলে ঘেরাটোপে পড়ে গেছি ধরা,
বিধাতার রেশমী রুমালে পূর্ণিমার চাঁদ কথা বলে
আমার দুঃখেও ঝরে ঘাসের উপরে তাঁর অশ্রুজল
মধ্যরাতাবধি-জাগা চোখের তারায় প্রেম আছে।
বার বার শুনি তবু ওপারের সাইরেন বাজে
পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে ক্রেনওলা জাহাজগুলোতে,
সব স্বপ্ন মিথ্যা হয় ঘোলাটে চোখের তারা আহত বন্দীর
ভিতরের মনস্তত্ত্ববিদের জঠরে মৃত্যু করে তোলপাড়
যেতে হবে নাকি কোন ইনফার্নো পারগেটোরিও
প্যারাডিসো।

বুকের মধ্যে / রঞ্জিত কুমার সরকার

(সর্বসাধারণ বিভাগ/তৃতীয়)

বুকের মধ্যে জ্বলতে-থাকা আগুনে
চলতে হবে অনেকটা পথ পা গুণে,
পথের শেষের রক্ততোরণ সিঁড়িতে
নতুন প্রভাত বসবে বুকের পিঁড়িতে,
শস্য শোষণ, অত্যাচারীর চাবুকে
পরোয়া নেই—এসব দেখে কাবু কে ?
ঘাম ঝরানোর দিন আমাদের পেশীতে
নতুন জীবন আনবে মেশামেশিতে,
বাধার আঁধার মুখ লুকোলো লজ্জাতে
ফুল ফোটানোর স্বপ্ন এখন মজ্জাতে—
বুকের মধ্যে ঝলসে-ওঠা আগুনে
ফুল ফোটাবো এই মোহিনী ফাগুনে॥

ডিগ্রী কোর্স সমূহের প্রস্তাবিত নূতন ধাঁচ

পুরাতন ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটি বিগত কয়েক বৎসর ধরে অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন কাউন্সিল গঠিত হওয়া মাত্র এই বিষয়টি আন্তরিকতার সংগে গ্রহণ করেছে। উপযুক্ত চিন্তাভাবনার পর কাউন্সিল দ্বি-বার্ষিক পাশ এবং ত্রি-বার্ষিক অনার্স ডিগ্রী কোর্সের নীতি গ্রহণ করেছে এবং এই নূতন ধাঁচের শিক্ষার কাঠামো ও নিয়মকানুন বিস্তারিতভাবে তৈরী করার জন্য কাউন্সিল একটি শিক্ষা বিষয়ক উপ-সমিতি গঠন করেছে। উপ-সমিতি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার সভায় মিলিত হয়েছে এবং কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। শীঘ্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের নিকট তারা চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করবে। আকার এবং ঐতিহ্যের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি পশ্চিমবাংলার উচ্চ শিক্ষাকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের শিক্ষা বিষয়ক উপ-সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত ডিগ্রী কোর্সের নূতন পাঠ্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির খোলাখুলি আলোচনা যথোপযুক্ত বলে আমরা মনে করি। **যুব মানস পত্রিকার পক্ষ থেকেও আমরা এই বিষয়ে মতামত আহ্বান করছি—সঃ যুঃ মাঃ**

ব্যাপকতর পছন্দ

প্রস্তাবিত নূতন বি-এ এবং বি. এস, সি, ডিগ্রী কোর্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ন্যূনতম বাধ্যবাধকতার বিষয়সমূহ নির্বাচনের অধিকতর ব্যাপক সুযোগ উপস্থিত করেছে। তারা এখন জ্ঞানের শুধুমাত্র সেই সমস্ত শাখাসমূহে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবে যার প্রতি তাদের সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহ আছে। আন্তর্বিষয়মুখী ও কর্মমুখী শিক্ষাক্রমের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে কঠোর সীমারেখা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় শিথিল হবে। শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে তিনটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। হিউম্যানিটিস্ ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় থাকবে। প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, আণুবীক্ষনিক জীববিদ্যা (Microbiology), ভূতত্ত্ব, জীব রসায়ন (Bio-Chemistry), জীব পদার্থবিদ্যা (Bio-Physics) ইত্যাদি এবং পেশাভিত্তিক শিক্ষাবিভাগের অধীনে কম্পিউটার পরিকল্পনা (Computer Programming), ফলিত ইলেকট্রনিক্স, শিল্প পদার্থবিদ্যা (Industrial Physics), বিশ্লেষ রসায়ন (Analytical Chemistry), ব্যবসায়িক প্রশাসন (Business Administration), সমষ্টি উন্নয়ন, ক্ষেত পরিচালনা (Firm Management) ইত্যাদি বিষয় থাকবে। তা ছাড়াও কেবলমাত্র ছাত্রীদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগ নামে অপর একটি বিভাগ থাকবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতক ডিগ্রী লাভের জন্য তিনটি বিষয় পড়তে হবে। বি, এ, ডিগ্রী লাভের জন্য হিউম্যানিটিস্ ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ হতে যে কোন দুইটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে অথবা বি. এস, সি, ডিগ্রী লাভের জন্য প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগ হতে যে কোন দুইটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে এবং এই দুইটি বিষয়ের যে-কোন একটিতে অনার্স পাঠক্রমে পড়া যাবে। উপরে উল্লিখিত বিভাগগুলির যে কোন একটির মধ্য হতে তৃতীয় বিষয়টি নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা থাকবে। এইভাবে তারা ডিগ্রী কোর্সের নূতন কাঠামোতে পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে অধিকতর স্বাধীনতা পাবে যা পুরাতন পদ্ধতিতে অনুমোদিত ছিল না। চিরাচরিত পাঠ্যবিষয়গুলি ছাড়াও অনেক নূতন ও অপ্রচলিত কিন্তু বহুবিষয়মুখী পাঠক্রমের সুযোগ থাকবে। এখন কোন ছাত্র-ছাত্রী নিম্নলিখিত ভাবে বিষয়গলি নির্বাচন করতে পারবে--যেমন বাংলা, ইংরাজী, সাংবাদিকতা/ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি/অর্থনীতি, ব্যবসায়িক প্রশাসন, বাংলা/পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কম্পিউটার পরিকল্পনা/পদার্থবিদ্যা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান; এইভাবে।

ভাষাসমূহ ঐচ্ছিক হবে

এই নূতন পরিকল্পনায় বি এ, বি এস সি বা বি কম ডিগ্রী লাভের জন্য কোন ভাষা আবশ্যিক নয়। জনগণ ও শিক্ষাবিদদের বিশেষ একাংশের মধ্যে এ ব্যাপারে কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে একশ পূর্ণমানের ইংরাজী বা বাংলা বা হিন্দী বা উর্দু বা নেপালী ভাষা নিতে পারবে অবশ্য যদি ঐ ভাষা ইলেক্টিভ (Elective) হিসাবে না নিয়ে থাকে। ঐ বিষয়ে ৩০ এর উর্ধ্বে প্রাপ্ত নম্বর তাদের বিভাগ নির্ণয়ের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বরের সংগে যোগ করা হবে। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পুরাতন পদ্ধতিতে (যা এখনও প্রচলিত আছে) বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা কোন ভাষা নিতে অনুমোদিত বা বাধ্য নয়। কিন্তু কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তা বাধ্যতামূলক এবং তাদের পছন্দ না হলেও তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। যা আমরা করবার প্রস্তাব করছি তাতে যে কোন ভাষা নির্বাচন করা বা না করার ব্যাপারে কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সমান মাত্রায় স্বাধীনতা থাকবে।

আমরা এটা করতে চাই এই কারণে যে, আগত ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিমধ্যেই ১২ বৎসর ধরে ভাষা বিষয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিয়েছে। এখন যদি তাদের ইচ্ছা না থাকে তা

সত্ত্বেও ভাষা পড়তে বাধ্য করাকে আমরা যুক্তিযুক্ত কিংবা পরিণামদর্শী হবে বলে মনে করি না। অবশ্য যারা ভাষা ও সাহিত্যকে ভালোবাসে, তাদের জন্য এই নতুন পদ্ধতিতে আরও অনেক গভীরতর শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী/ইংরাজী, বাংলা, ফরাসী এই ধরণের বিষয়গোষ্ঠী নির্বাচন করতে পারবে যা পুরাতন পদ্ধতিতে সম্ভব ছিল না। অনুরূপভাবে নতুন পদ্ধতিতে যদি কেউ অর্থনীতিবিদ হতে চায় তা হলে সে ভাষার অতিরিক্ত বোঝা গ্রহণ করতে বাধ্য না হওয়ার ফলে ইতিহাস এবং দর্শনকে তার সহ বিষয় হিসাবে আরও অনেক লাভজনকভাবে নির্বাচন করতে পারবে। বাস্তবিক পৃথিবীর কোন উন্নত দেশে স্নাতক হবার জন্য কলেজ স্তরে এইভাবে ভাষা শিক্ষা বিশেষ করে মাতৃভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়।

বিগত কয়েক বৎসরের পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আমাদের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ভাষা শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার নীতি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে আমরা প্রচুর পরিমাণে মানবিকশক্তি এবং সম্পদ বৃথা ব্যয় করছি। স্পষ্টতঃই তারা অনিচ্ছুকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ ইংরাজী/বাংলায় অকৃতকার্যের সংখ্যা কখনও কখনও ৮০ - ৯০% এর মতো উচ্চে ওঠে অথচ এই একই ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাস, অর্থনীতি, বাণিজ্যিক ভুগোল ইত্যাদির মতো অন্যান্য বিষয়ে অকৃতকার্যের হার ৩০—৪০% অথবা আরও কম। এইভাবে ইংরাজী/বাংলাকে বাধ্যতামূলক করে আমরা সত্য সত্যই ছাত্র-ছাত্রীদের গণফেলে সামিল করছি। তা কেবলমাত্র কলা/বাণিজ্য স্নাতক শিক্ষা কর্মসূচীকে উপহাসমূলক অপব্যয়ে পরিণত করেনি উপরন্তু আমাদের ছাত্র সমাজের বৃহৎ অংশকে চরম অবমাননাকর বদনাম দিয়েছে। ভাষাসমূহকে ঐচ্ছিক করার সিদ্ধান্ত বি, এ/বি, কম ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের শতকরা হার নিশ্চিতভাবে বাড়াবে। এবং এই ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চিতভাবে তাদের বিশ্বাস ও আত্মসম্মান অনেকাংশে ফিরে পাবে। ছাত্র-ছাত্রীরা ও তাদের অভিভাবকেরা—বিশেষ করে আমাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত প্রথম শিক্ষার্থীদের দল যদি সাফল্যের সঙ্গে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের একবার সুযোগ পায় যা তাদের কাছে আগ্রহজনক ও কার্যকরী হবে, তাহলে জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি প্রকৃত ও যথার্থ অনুরাগ জন্মাবে। সম্ভবতঃ একমাত্র তখনই আমাদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রভূত জাতীয় ব্যয় যুক্তিযুক্ত হবে।

সরলীকৃত নিয়মাবলী

ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্স চালু করবার পর আমরা অতীতে আপাতভাবে দয়ালুর ভূমিকা পালন করেছিলাম। অনগ্রসর ছাত্রদের সাময়িক উপকারার্থে "ক্রেডিট" এবং "চান্সের" নামে প্রচুর সুবিধা চালু করা হয়েছিল। তা সেইসমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিথিলতার ভাব বৃদ্ধি করেছিল যারা বাড়ীতে নিয়মিত পড়াশুনা, তত্ত্বমূলক ও ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করে না। প্রচুর সংখ্যক অসফল পরীক্ষার্থী এমনকি আট বৎসর ধরে বারে বারে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ডিগ্রীলাভের চেষ্টা করছে। সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী ও তার সংশোধনীসমূহ এক দুর্বোধ্য আকার ধারণ করেছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে বিশেষতঃ পরীক্ষাসমূহের নিয়ামকের বিভাগে এক অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের সৃষ্টি করেছে: কারণ বহু শত-সহস্র ছাত্র-ছাত্রীর বছরের পর বছর ধারাবাহিক নথিপত্র লিপিবদ্ধ করে রাখতে হচ্ছে। দুর্নীতি ও কলুষতা সহ মানবিক বিচ্যুতি বৃদ্ধির সুযোগ ক্রমাগত হারে বেড়েছে।

এইজন্য আমরা নূতন ডিগ্রী কোর্সের নিয়মাবলী যতটা সম্ভব সরলীকৃত করার প্রস্তাব করছি। তথাকথিত গ্রেস নম্বর বা সুযোগ ছাড়াই দুই বৎসরের শেষে একটিমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। কোন পরীক্ষার্থী যদি কেবলমাত্র একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয় এবং সমষ্টিতে কমপক্ষে ৪০% পায় তবে সে একটি "কম্পার্টমেণ্টাল" পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ পাবে। ত্রি-বার্ষিক অনার্স কোর্সের পাঠ্যসূচীকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম দুই বৎসরে পার্ট ওয়ান পড়ানো হবে এবং তৃতীয় বৎসরে পড়ানো হবে পার্ট টু—পূর্ণমান দুইটি ভাগে সমানভাবে বিভক্ত থাকবে। যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা সমষ্টিগতভাবে কমপক্ষে ৪০% নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক (১০+২) অথবা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কেবলমাত্র তারাই অনার্স কোর্স নিতে অনুমতি পাবে। অনার্স বিষয় সহ বা ছাড়া সমস্ত পরীক্ষার্থীকেই দ্বিতীয় বর্ষের শেষে একটি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং সফল পরীক্ষার্থীকে পাশ স্নাতক ডিগ্রী Pass Graduate Degree প্রদান করা হবে। সমস্ত বিষয়েই উত্তীর্ণ হবার জন্য কমপক্ষে ৩০% নম্বর পেতে হবে এবং পৃথকভাবে বিষয়গুলিতে এগ্রিগেটে উত্তীর্ণ হবার প্রয়োজন হবে না। পাশ কোর্সের ('P' Course) পাঠে অধিক মনোযোগী হতে উৎসাহদানের জন্য বিভাগ প্রদান করা হবে—৬০% বা তার বেশী নম্বর প্রাপ্তির জন্য প্রথম বিভাগ, ৪৫—৬০% নম্বরের জন্য দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৩০—৪৫% নম্বরের জন্য পাশ ডিভিসন ('P' Division) দেওয়া হবে। অনার্স পরীক্ষার্থীদের জন্য পার্ট-ওয়ান ও পার্ট-টু-এর নম্বর যোগ করা হবে। ৬০% বা তার উর্ধ্বে প্রাপ্ত নম্বরের জন্য পরীক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণী সহ অনার্স পাবে যেখানে ৪০—৬০% নম্বর পেলে দ্বিতীয় শ্রেণীসহ অনার্স দেওয়া হবে। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে অনার্স পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় যে সমস্ত অনার্স পরীক্ষার্থীরা একটি ন্যূনতম শতাংশ নম্বর পাবে তারা তৃতীয় বৎসরে পার্ট-টু অনার্স কোর্স পড়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। পাশ কোর্সে পড়া ভালো ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারার্থে, কোন বিষয়ে ৫৫% বা তার উর্ধ্বে নম্বর পাওয়া দ্বি-বার্ষিক পাশ স্নাতকেরা যাতে অনুরূপ বিষয়ে পরের বৎসর অনার্স পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে এবং তারপর অনার্স পার্ট-টু কোর্স সম্পূর্ণ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে।

বাম সরকারের এক বছর ঃ ছাত্র-যুবরা কি পেলেন? / সাইফুদ্দীন চৌধুরী

২১শে জুন বামফ্রন্ট সরকারের এক বছর পূর্ণ হল। এই বছরটি অনন্য।

ইতিহাস তার চলার পথে এক একটি সময়কে, কোন একটি নির্দিষ্ট বছরকে জয়যাত্রার স্মারক হিসেবে কালের বুকে খোদাই করে যায়। শত সহস্র ঝড় ঝাপ্‌টাতেও অক্ষত উজ্জ্বল থাকে তা। ভারতীয় জনগণের জীবন জয়ের পথে এমনি ভাস্বর হয়ে থাকবে বিগত বছরটি। কালজয়ী বৈশিষ্ট্যের দ্যোতনায় ভরা পশ্চিমবংগের বিগত বছরটি সুনিশ্চিতভাবেই ভারতের আগত ইতিহাসের দিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য আমাদের আনন্দ আরো বেশী।

যৌবনের শাপ মোচন ঃ—

একটি ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থা, একটি বন্ধ্যা শাসকশ্রেণী যৌবনের জন্য কি ভয়াবহ অভিশাপ নামিয়ে আনতে পারে কংগ্রেস রাজত্বের তিরিশ বছর আমাদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়েছে। উজ্জ্বল যৌবন, সজীব যুবশক্তি কখনও বন্ধন মানে না। স্বাধীনতার পরের তিরিশ বছরে এই বন্ধন মানানোর কাজে যুবশক্তির বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণী মরীয়া হয়ে উঠেছিল। যৌবনের প্রতিষ্ঠা দিতে, যুবশক্তিকে কর্মমুখর জগতে নিয়োজিত করতে শাসকশ্রেণীর অর্থনীতি ও রাজনীতির সীমাহীন অক্ষমতা তিরিশ বছরের প্রতিটি দিনে যুব সমাজকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। ক্রমশঃ শানিত হয়ে ওঠা শ্রেণী সংগ্রামে উদ্দামতায় ভরা অংশটি যুব শক্তির সহজ স্বচ্ছন্দ রূপটিকে প্রকাশ করেছিল। অর্থনৈতিক উৎপাদনের জগতে, জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা সংস্কৃতির জগতে প্রবেশ লাভের জন্মগত অধিকার থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত যুব সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক পথটি খুঁজে পেয়েছিলেন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে। এই পথ তাদের মানসিক সংকট ও নৈরাজ্যের হাত থেকে, হতাশা ও হীনমন্যতার হাত থেকে রেহাই দিয়েছিল।

বিগত প্রতিটি বছরে—উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রেণী ও জন সমাজের উপর পরজীবি মালিকদের বর্বরতম শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেহাদে অগ্রসর হয়ে উঠেছিল নিপীড়িত শ্রেণী শক্তির সজীব ও প্রাণবন্ত যুব অংশটি। সংগ্রামের ময়দানে অগ্রণী সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যুব আন্দোলন, যুব সংগ্রাম বিগত দিনগুলিতে নিজেকে সংহত করেছিল, গতিময় করেছিল।

যুবশক্তির সচেতন ও সংগঠিত হয়ে ওঠার এই ঘটনাটি শাসকশ্রেণীর ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। দৃপ্ত যৌবনকে তারা ভয় পেতে শুরু করেছিল। জীবনশক্তির অমিত ক্ষমতাশালী এই অংশটির বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিল ভীষণতম জেহাদ। পরিচালিত করেছিল হিংস্রতম বেপরোয়া আক্রমণ। রক্তদানের, জীবনদানের সবচেয়ে বড় ও শৌর্যমণ্ডিত কাহিনীগুলি বিগত ইতিহাস যে যুব সমাজের কাছ থেকেই লিখিয়ে নিয়েছে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। পশ্চিমবংগের কারাগারগুলি তাজা প্রাণের সমাবেশে সজীব মুখের ভীড়ে উপচে পড়েছিল। আজ এই সমাবেশ কারাগারের বাইরে, ওই মুখ আবার মিছিলে সামিল। জনসমাজ তার সেরা অংশটিকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। কিন্তু অসম্মানের, নির্যাতনের, প্রতিহিংসার স্মৃতিগুলি ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মত এখনও যুব সমাজকেই যে সবচেয়ে বেশী আতংক ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ করে রেখেছে তা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু আক্রমণ ও নির্যাতনের ঘটনাগুলি তিনটি দশক ধরে যুবশক্তিকে যন্ত্রণা দিলেও যুব সমাজ এর থেকে গর্ব করার মত অনেক কিছুই সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। শাসকশ্রেণীর প্রতিটি আক্রমণ ও হামলার বিপরীতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল যুব সমাজের বীরত্ব ও অসীম সাহসিকতা। এ সবই যুব সমাজের মূল্যবান সম্পদ। জনমানসে যুব সমাজের মর্যাদা যে এত বেড়েছে তার কারণ এই। যুব সমাজের প্রতি জনসাধারণের অন্যান্য অংশের গভীর ভালবাসার মূলে আছে এই একই ঘটনা। যুবশক্তির উপর আমাদের জনগণ যে আস্থা রাখতে পারেন, বিশ্বাস অর্পণ করতে পারেন তা অনেক কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এই সব কিছু যুব সমাজের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনাটি অন্য। সংগ্রামী যুবশক্তি এই ঘটনাটির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন, লজ্জা অনুভব করেন তা তাদের মহত্ত্ব। এই ঘটনা হল যুব সমাজের একটি ক্ষুদ্রতম অংশের অধঃপতনের ঘটনা। যুব আন্দোলনে শাসকশ্রেণীর বিপথগামী ধারাটির শরিক কিছু যুবকের উম্মত্ততা সমাজকে কালিমা লিপ্ত করেছিল।

সংগ্রামী যুব সমাজ তাদের জগৎ থেকে এদের বহিষ্কার করেছেন এটা খুবই সংগত। এই বহিস্কৃতরা নিজেদের যুবক বলে যখন পরিচয় দেয় তখন সমগ্র যুব সমাজের মাথা হেঁট হয়, এটাও সহজবোধ্য। কারণ এই যুবকেরা যে আচরণ বিগত বছরগুলিতে করেছে তা যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মের বিরুদ্ধে। প্রগতির বিরুদ্ধ ভূমিকা পালনকে যুব সমাজ আমাদের দেশে অপরাধ বলেই গণ্য করেন। ওরা যা করেছিল তার কোন ক্ষমা নেই। ওরা খুনে মেতে উঠেছিলো, বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত করেছিলো। ন্যায় নীতি মূল্যবোধকে ধ্বংস করেছিলো। স্বৈরাচারের ঘৃণ্য বাহিনীতে নিজেদের নাম লিখিয়েছিলো। স্বভাবতঃই এদের কোন অপরাধবোধ ছিল না। যাদের ছিল, তারা ভুল বুঝে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু

প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে কারা এই যুবকদের এত ভয়ানক সর্বনাশ করেছিল। কংগ্রেস দল এবং সরকার এই জঘন্যতম অপরাধের জন্য দায়ী। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার জন্য এসব কিছুই ছিল অপরিহার্য উপাদান। স্বৈরশাসনে যে এই অধঃপতন চরমে উঠেছিল—অতএব তা এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবংগের যুব সমাজ যখন যুব জীবনে কলংকজনক অধ্যায়ের স্রষ্টা হিসেবে স্বৈরশক্তিকে দায়ী করেন, বিপথগামীদের ভাল হয়ে ওঠার সুযোগ দেন ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন তখন তারা অত্যন্ত রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় দেন ও খুব ঠিক কাজই করেন। বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর অনুগামী হওয়া কোন যুবকের উচিত নয় এর মধ্য দিয়ে একথা তারা ঘোষণা করেন। যুব সমাজের শত্রু, যুব জীবনে অভিশাপ। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামে তারা শ্রমিকশ্রেণীর পতাকা তলে সমবেত হতে সমগ্র যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করেন। এবং যুবজীবনকে সংকটমুক্ত করার জন্য সংগ্রাম পরিচালনার তাগিদে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের অপরিহার্যতা বুঝিয়ে দেন।

পশ্চিমবংগে বামফ্রন্ট সরকারের এক বছরের সাফল্য হচ্ছে এই যে একটি ভয়ংকর শাপমোচন হয়েছে। স্বৈরাচারের নাগপাশমুক্ত হয়েছেন যুব সমাজ। অত্যাচার ও নিপীড়নের, অসম্মান ও অমর্যাদার, নীতিহীনতার ও উচ্ছৃংখলতার দিনগুলি আর নেই। যুবজীবনের মৌলিক সংকটগুলির কোন সমাধানের সুযোগ না থাকলেও যেহেতু আন্দোলন সংগ্রামের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে তাই যুব সমাজ সংকটমোচনের স্বাভাবিক পথটি খুঁজে পেয়ে তৃপ্ত হয়ে উঠেছিল।

আলোকের ঝর্ণাধারা :—

অহিংসাকে স্বৈরাচার তার সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করে। অশিক্ষার অন্ধকার তিরিশ বছরে সাধারণভাবে গ্রাম বাংলায় ও শহরের শ্রমজীবি এলাকাগুলিতে জমাট বেধে উঠেছিল। আলোকের উৎসমুখটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। এই রকম একটি ভয়ংকর অবস্থা এম্নি হয়নি। যে কেউ একটু চোখ মেললেই দেখতে পাবেন শিক্ষার অধিকার তারাই পান না যারা লক্ষ কোটি শ্রমজীবি গ্রামে কিংবা শহরে থাকেন। সম্পদের অধিকার যাদের নেই শিক্ষা নিজের থেকে তাদের দোরগোড়ায় যায়নি। আর কর্তারা তা ভুল করেও পাঠাননি। মুষ্টিমেয়ের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থাটি আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল তা যে চেহারায় বড় হল এর কারণ বঞ্চিত জনগণের সংগ্রাম। শিক্ষার প্রতি জনগণের ভালবাসা, শিক্ষার নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশের জন্য জনগণের অসম্ভব জেহাদ শাসকশ্রেণীর বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তাও এমন কিছু বেশী নয়। জনসংখ্যার ৭০ ভাগ কিছুতেই আলোর মুখ দেখতে পেল না—এই হল কংগ্রেসের তিরিশ বছর। যারা লড়াই করে আলোর অধিকার ছিনিয়ে এনেছিলেন, তারা এই অধিকার ধরে রাখতে পারলেন না। এই মানুষদের, শিক্ষা জগতে অবাঞ্ছিত এবং অবশেষে বিতাড়িত সহস্র তরুণের অসহায় করুণ, ও ব্যাথাকাতর মুখগুলি সমাজ পরিচালকদের বিবেক দংশনের কোন কারণ তো হয়ই নি বরং তাদের উল্লসিত করেছিল। যে সমাজ যুবশক্তিকে উৎপাদনে নিয়োজিত করতে পারে না, যে উৎপাদন ব্যবস্থা গভীর সংকটে নাভিশ্বাস তোলে সেই ব্যবস্থা শিক্ষার মৃত্যু দেখার জন্য ছটফট করে এ তো সহজ সত্য। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এই মৃত্যুকে সব দিক থেকে ঘনিয়ে আনা হয়েছিল। শিক্ষা জগতে ঐ সময়ে যা হয়েছিল তাতে যে কেউই শিউরে উঠবেন। শাসকশ্রেণীর এমন প্রতিহিংসা খুব কমই দেখা গেছে। জনগণের মধ্যে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে যে কারণে শাসকশ্রেণী চূড়ান্ত ভাবে অপারগ হয়েছিল সেই একই কারণে শিক্ষার চলতি ব্যবস্থাটিকে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত করা হয়েছিল। শাসকশ্রেণী খুব ভেবে চিন্তে হিসেব করে দেখেছিল যে শিক্ষাপ্রাপ্তদের অর্থনৈতিক উৎপাদনে নিয়োগ করতে তারা পারবে না। সেই হেতু পারবে না এদের জীবনে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দিতে। তাহলে আলোকপ্রাপ্তরা কি করবে? এরা কি আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠবে না? জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে এরা কি লব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহার করবে না? সংগ্রামের কর্ম কৌশল রচনার প্রচলিত ব্যবস্থার সপক্ষের দার্শনিক ও মানসিক কান্ডকারখানাগুলির কুৎসিৎ চেহারাটি কী উন্মোচিত করে দেবে না? এটাই শাসকশ্রেণীকে সবচেয়ে ভীত করে তুলেছিল। তা নাহলে শিক্ষা যা দেওয়া হয় তাতে জীবন সংগ্রামের কণা শিক্ষাও থাকে না। অতএব নিশ্চিন্ত না হওয়ার কোন কারণ ওদের ছিল না। কিন্তু যুগে যুগে অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে বাস্তব জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে প্রয়োজনের তাগাদায় চিন্তার বিষয়বস্তুতে বড় বড় পরিবর্তনগুলি আলোকপ্রাপ্তরা সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। এটা এমন কিছু কঠিন অভিজ্ঞতা নয় যে শাসকশ্রেণীর লোকজনেরা ভোঁতা হলেও তা তারা বুঝতে পারবে না। আসলে খুব ভালভাবেই ওরা তা পেরেছিল, তাই জনশিক্ষার জন্য কিছু ওরা করেনি। কয়েক হাজার গ্রামে তিরিশ বছর ধরে একটি প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত হয়নি। শহরের বস্তি অঞ্চলে এই একই চেহারা কুৎসিৎ ভাবে ফুটে উঠেছিল।

একটু শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার পরে কাজের ব্যবস্থা নেই তাহলে যুবশক্তি কি করবে। শৈশবে, কৈশোরে একটু ভাল কিছু তাদের জন্য করা হল না, উল্টো যা কিছু খারাপ তাদের সামনে হাজির করা হল। আমরা ভাবি—তিরিশ বছর ধরে কংগ্রেস কি সাঙ্ঘাতিক অপরাধই না করেছে। জীবিকার কোন সুস্থ পথ সমাজকে কংগ্রেস দেখাতে পারেনি। বস্তি এলাকাগুলিতে যুবকদের চুরি, ছিনতাই, ওয়াগন ভাঙ্গার পথ গ্রহণে মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাপ দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতির নামে নোংরামির প্লাবন বইয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব কিছুই

মধ্যবিত্ত যুবকদের উপর, সামগ্রিকভাবে যুব সমাজের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যাকেই সামাজিক কোন অপরাধে ওরা জড়িয়ে দিতে পেরেছে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির জন্য তাকে একটি অনিবার্য দায়িত্ব সহজে চাপিয়ে দিতে স্বৈরাচারী সরকারের খুবই সুবিধা হয়েছে।

যুব সমাজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণের এইরকম একটি দুঃসময়ে বামফ্রন্ট সরকার সৎ ও সুস্থ প্রতিশ্রুতি নিয়ে ক্ষমতাসীন হলেন। বাম সরকার অনুভব করলেন সমাজের জন্য কিছু ভাল করতে হলে শিক্ষাকে বাঁচাতে হবে। বাম সরকারের সামাজিক দৃষ্টিভংগী অন্য, তাই তারা গরীব শ্রমজীবি জনগণের মধ্যে শিক্ষাকে প্রসারিত করতে উদ্যোগ নিলেন। শিক্ষাকে রক্ষা ও বিস্তৃত করার জন্য বাম সরকারের জেহাদটি গত এক বছরের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। সরকার মনে করেন—স্বৈরাচারের ভিত্তি ভূমিটি বরবাদ করতে হলে অন্ধকার দূর করতে হবে, আলোকের ঝর্ণাধারায় সমাজ, জীবনকে ধুইয়ে দিতে হবে। তাই শিক্ষার বন্ধ হয়ে যাওয়া উৎস মুখটি খুলে দিতে প্রথমেই তৎপর হয়ে উঠলেন বাম সরকার। বর্তমান বছরে এক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচী কার্যকরী হোল। ১৯৭৯ সালের জন্য নেওয়া হল আরো এক হাজারের কর্মসূচী। ১৯৭৮-এর জানুয়ারী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের শিক্ষা অবৈতনিক করে দেওয়া হল আর এসব যাতে কাগজে-কলমে না থাকে তার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হল সেটাই আমাদের সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলিকে আতংকিত করে তুলেছে। প্রাথমিক ছাত্রদের দুপুরে টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করলেন। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলি সরকার আনলেন তার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য শিক্ষার উপর খুব সরাসরি পড়বে এবং শিক্ষা মোটামুটি সহজভাবে এগোতে পারবে।

শিক্ষা জগতের পরিচালন কর্তৃপক্ষগুলি এতদিন ধরে ছিল শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। শিক্ষা জগতে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও নৈরাজ্যের যে বিষয়গুলি বেশ কয়েক যুগ ধরে আমাদের লজ্জা দেবে তা সংগঠিত করার হোতা ছিলেন এই কর্তৃপক্ষগুলি। ছাত্র পরিষদ, পরিচালিত ছাত্র সংসদগুলির মধ্যে এদের মিনি সংস্করণ গড়ে উঠেছিল। স্বভাবতঃই গণতন্ত্রকে জলাঞ্জলি দিয়ে এসব কাজ ওদের করতে হয়েছিল। কারণ গণতান্ত্রিক মতামতের প্রতিফলন ঘটলে এইসব লোকেরা শিক্ষা জগতে এতটুকু ঠাঁই পেতেন না। বাম সরকার প্রথমেই এদের তাড়ালেন। এর বিরুদ্ধে কেউ কেউ চিৎকার করলেন। কিন্তু শিক্ষার মঙ্গলের জন্য, শিক্ষাজগতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এর ফল ভালই হয়েছে। নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকার শুধু তার পরিবেশ রচনা করেছেন তাই নয়। ছাত্র সমাজের গণতান্ত্রিক দাবীগুলি কার্যকরী করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। সরকার সিনেট সিণ্ডিকেট ভেঙ্গে দিলেন। কাউন্সিল গঠন করলেন। কাউন্সিল অনেক ভালো কাজ করেছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ যার অন্যতম। পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগের দুর্নীতি উম্মোচনে ও অপরাধীদের শাস্তি দানে কাউন্সিলের বলিষ্ঠ ভূমিকা আমাদের জনগণ অনেকদিন মনে রাখবেন। ছাত্রদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাউন্সিলের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আট বছর পর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। গণটোকাটুকি বন্ধে সরকারের প্রচেষ্টার সংগে একাত্ম হয়ে কাউন্সিল বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় চত্বর থেকে সেই সামাজিক ব্যাধিটি অপসারিত হল। বাম সরকার—ছাড়া একি ভাবা যেত যে হার্ডিঞ্জ এখন পুরনো স্মৃতি। ছাত্রদের পক্ষে, শিক্ষার পক্ষে বাম সরকার অতুলনীয় ভাল কাজগুলি গত এক বছরে করেছেন। আমাদের শিক্ষা জগত পুরানো সম্মান মর্যাদা যেটুকু পেয়েছে তা ঐ এক বছরে।

ছাত্রজীবনকে সহজ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে সরকার তৎপর। সবক্ষেত্রেই পাঠক্রম পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। গণফেলের রাজনৈতিক অর্থ-নৈতিক ও শিক্ষাগত কারণগুলি অপসারিত করতে সরকার তৎপর। (সমাজের মৌলিক পরিবর্তন না হওয়ার দরুণ সরকারী উদ্যোগ যে অনিবার্য বাধাগুলির সম্মুখীন হবে তাকে চিনে নিয়ে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ছাত্রসমাজকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে) মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাস্তবে চালু করতে সরকার আগ্রহী। বাংলার উন্নতি ও বিকাশে সরকারের চেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের আর একটি ব্যবস্থা ছিল শিক্ষকদের আর্থিক অনিশ্চয়তা। অধ্যাপকদের বেতনের দায়িত্ব সরকার সরাসরি বহন করেছেন। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও এই কর্মসূচী সম্পূর্ণ হওয়ার মুখে। এটা বোঝা সহজ শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের মনোভাবটি হল—'আমরা সাধ্যমত করব। ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী জনগণ সবাই মিলে শিক্ষার রক্ষা ও বিস্তারের জন্য কাজ চালিয়ে যান।'

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রামবাংলায় শিক্ষার বিস্তৃতি জনগণের উদ্যোগে যে ঘটবেই তা সহজে অনুমেয়।

তবুও অনেক কিছুই হয়নি। বাকী আছে আরো অনেক। কিন্তু মাত্র একটি বছরে যা হয়েছে তাকে মূলধন করেই আমাদের এগোতে হবে। আজ আর ছাত্র সমাজ সরকারের শত্রু নয়। ছাত্র যুবশক্তিকে সরকার সম্মান দেন, ভালবাসেন—এটা সবচেয়ে বড় কথা।

শিক্ষা জগতের পরিচালক সংস্থাগুলিতে ছাত্র প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকৃত ও কার্যকরী হওয়ার মধ্যে ঘটেছে এর আন্তরিক প্রকাশ। ছাত্রজীবনের, শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি সমস্যা সরকার ছাত্রদের সংগে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করছেন। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক মতামতকে উপেক্ষা করছেন না,—এসব তিরিশ বছরে হয়নি।

সেই মূল কথাটিঃ—

শিক্ষার জন্য সরকার অনেক ভাল কাজ করেছেন ও

করবেন। নিরক্ষর মানুষ স্বাক্ষর হয়ে উঠলে এই সরকারের সুবিধা, কিন্তু অসুবিধা যাদের—শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা কিন্তু চুপ করে বসে নেই। তারা ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী-দের মধ্যে তাদের লোক খুঁজে বের করতে মরীয়া হয়ে উঠেছে। ও সাবোতেজ চালাতে চাইছে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এরা সহজে সব কিছু মেনে নেবে তা আমরা কখনোই ভাবতে পারি না। সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদটি এদের কব্জায়। এবং এসব ক্ষেত্রে আমুল কোন পরিবর্তন হয়নি। হয়নি রাষ্ট্র কাঠামোয়, স্বভাবতঃই এই শত্রুরা সুনির্দিষ্ট শ্রেণী দৃষ্টিভংগীতেই শিক্ষার বিস্তার সহ্য করবে না। ছাত্র-যুব সমাজকেও ওদের বিপরীত শ্রেণী দৃষ্টিতে সব বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে হবে।

বাম সরকার শ্রমজীবি, মধ্যবিত্ত মেহনতী জন-সাধারণের সরকার। তারা ইতিমধ্যেই এই মানুষদের জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছেন শিক্ষা জগতের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে তা সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ সহায়কের ভূমিকা নেবে।

কৃষি সমস্যাটি হচ্ছে আমাদের সমাজ, সভ্যতা ও শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে কৃষক সমাজ তথা জনসাধারণকে সরকার সচেতন করে তুলছেন তাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে। রাজ্যের চাষ জমির কমপক্ষে ৬৬ ভাগ মাত্র ৯ জন জমিদারের কুক্ষিগত। এই কেন্দ্রীভূত সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা ভাঙ্গতে সরকার আইনগত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এর সংগে গণআন্দোলন সফলতার সংগে যুক্ত হলে অর্থ-নীতির বিকাশের বন্ধ মুখটি খুলে যাবে। ভাগচাষীদের নাম রেজিষ্ট্রি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার একদিকে যেমন জমি মালিকদের আইনের সুযোগটি কেড়ে নিয়েছেন তেমনি লক্ষ লক্ষ কৃষককে উদ্দীপ্ত করেছেন।

সেচ এলাকায় ৪ একর ও অসেচ এলাকায় ৬ একর পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব করা হয়েছে। এতে গরীব ও মাঝারি চাষীরা লাভবান হবেন। মহাজনী ঋণের কবল থেকে কৃষকদের রেহাই দিয়েছেন সরকার। সরকার খেতমজুরদের ন্যায্য মজুরীর সপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। শস্য সংগ্রহে কংগ্রেসী লেভী ব্যবস্থাটি এতদিন ছিল—মালিকদের ছাড় দিয়ে গরীব-মাঝারিদের ওপর জবরদস্তী চালানো। এবারে তার বিপরীত ব্যবস্থা হয়েছে।

১৯৭৭ সালের আগষ্ট মাস থেকে লুকানো উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধারের অভিযান চালিয়ে সরকার আরো ২২,৬০০ একর জমি উদ্ধার করেছেন। ১৯৭৭ সালে ৬,২৭,০০০ একর কৃষি জমি ৯,৮৬,০০০ ভূমিহীনের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। এসবই হচ্ছে এমন ব্যবস্থা যাতে লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষকের হাতে পয়সা আসবে, বন্ধ্যা বাজার খুলে যাবে। শিল্প বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। শিক্ষার সুযোগ কিছুটা বাড়বে, সংকট মুক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। শিল্প ক্ষেত্রে ২৪৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাবের মধ্যে ৩৪·১৫ কোটি টাকার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়েছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে সরকার হলদিয়া পেট্রো কেমিকেল কমপ্লেক্স আদায় করেছেন। মালিকদের পক্ষে সরকার নেই। তাই মালিকদের স্বেচ্ছাচারের জন্য উদ্ভুত শিল্পে অশান্তির ঘটনাগুলি এবারে অনেক কম। শ্রমিকেরা জীবন মান উন্নয়নের সংগ্রামে সামিল, বোনাসের অধিকার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর্থিক অন্যান্য দাবী-দাওয়ার সংগ্রাম অগ্রমুখী। এর অর্থ একটাই। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের আর্থিক মান উন্মত হবে। স্বভাবতঃই বহু ছাত্রের শিক্ষার আর্থিক নিশ্চয়তা খানিকটা সৃষ্টি হবে।

এই বিষয়গুলি উল্লেখের অর্থ একটাই। মৌলিক যে পথে ছাত্র-যুব জীবনের সংকট মুক্তি সম্ভব, সেই পথ প্রশস্ত হচ্ছে সরকারী কর্মকাণ্ডে। এই পথে সব বাধা হঠিয়ে দেওয়ার জন্য ছাত্র-যুব সমাজের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শপথটি বিগত বছর হাজির করেছে।

শেষ কথা :—

গত এক বছরে ছাত্র-যুব সমাজ হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পেয়েছেন, সুস্থ সংস্কৃতির পতাকা উ'চুতে তুলে ধরেছেন। সরকার ছাত্র-যুব শক্তিকে মুল্যবান সম্পদ বলে মনে করছেন। বর্জনীয় বোঝা বলে মনে করেননি। অবহেলা করেননি, বেকার ভাতার কর্মসূচীর মধ্যে যুব শক্তিকে কর্মে নিয়োজিত করার দায় যে সমাজের দায় তারই উল্লেখ করা হয়েছে। এতদিন ব্যাপারটা ছিল উল্টো। অবাঞ্ছিতের, নির্বাসিতের দুর্বিসহ জীবন কাটাতে হয়েছে ছাত্র-যুব সমাজকে। গত এক বছরে বাম সরকার ছাত্র-যুব শক্তিকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তুলেছেন। সংঘবদ্ধ সচেতন হয়ে ওঠার প্রেরণা যুগিয়েছেন। যুগব্যাপী মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছেন। চলার সঠিক পথটি আলোকিত করেছেন। আগামী সুখী জীবন গড়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে এসবই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ও জরুরী কথা। গত এক বছরের হিসেব নিকেশ ছাত্র-যুব সমাজের পাওনায় নিঃসন্দেহে শেষ কথা।

সাঁওতাল বিদ্রোহ / অমিত সরকার

"এবার জাগো, বীর কিষাণ ভাই জাগো,
কৃষ্ণ যে পথ১ দেখিয়েছেন সেই পথে চলো।
আমাদের ঘরে ঘরে চোর আর ডাকাত ঢুকেছে।
তুমি কিন্তু ঘুমিও না কিষাণ ভাই।
এবার জাগো, নির্ভীক কিষাণরা জাগো, কৃষ্ণের পথে চলো।
বৈশাখে মাঠে মাঠে চাষী ভাইরা যখন ফসল কাটে, ফসল তোলে, সে-ফসল/কেড়ে নেয় জমিদার আর সেই ফসলের জমি বেদখল করে বোঢ়ুরে।২
শান্তি? একটি দিনের তরেও আমাদের শান্তি নেই ভাই।
তোমারই চোখের উপর দিয়ে তোমারই মেহনতের ফল তারা ছলে বলে কেড়ে নেয়/তোমার জন্যে এক মুঠো শষ্যও তারা ফেলে রেখে যায় না!
তবে জাগো বীর কিষাণ, এবার জাগো,
জেগে উঠে এগিয়ে চলো শ্রীকৃষ্ণের পথে।"
(সাতকি শর্ম্মা৩)

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর থেকে ইংরাজ শাসনের হাত ধরে নতুনরূপে জমিদার মহাজনদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে যে সীমাহীন শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ভারতবর্ষের কৃষক সহ জনসাধারণকে অন্ধকারময় জীবনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করেছিল তার বিরুদ্ধে 'প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা' বাজিয়ে 'মুক্তির শ্যামল তীরে' পৌঁছিবার আকাঙ্খা নিয়ে ভারতবর্ষের কৃষক বারবার বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিলেন। তাই আপোষ-আত্মসমর্পণহীন অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহের অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত কাহিনীতে ভারতবর্ষের ইতিহাস মহিমান্বিত হয়ে আছে। এই সমস্ত অনন্য কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫—১৮৫৭) অন্যতম।

সাঁওতাল বিদ্রোহ যে অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল সেই অঞ্চল ছিল তদানীন্তন বাংলার অন্তর্গত। বর্তমানে যাকে আমরা সাঁওতাল পরগণা বলি সেই অঞ্চল, বর্তমান বীরভূম জেলাস্থিত কোন কোন অঞ্চল, ভাগলপুর জেলাস্থিত অঞ্চল ও মুর্শিদাবাদের একাংশ—এই বিস্তৃত স্থান জুড়ে এই বিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কলকাতা থেকে একশো মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল এই বিদ্রোহের ঘটনাস্থল। রাজভয়, মৃত্যুভয় সবকিছু উপেক্ষা করে হাজার হাজার উপজাতীয় সাঁওতাল এই বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কম পক্ষে ত্রিশ হাজার সাঁওতাল উপজাতীয় নরনারী এবং সমাজের নীচুতলার অন্যান্য অংশের মানুষের জীবনের বিনিময়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের এই অমর কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর নৃশংস প্রত্যাভিযানের রথচক্রে শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা সকলেই পিষ্ট হয়েছিলেন। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী জনপদকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। ঘরছাড়া হয়ে হাজার হাজার মানুষ অরণ্য ও পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবু এই বিদ্রোহী মানুষেরা মাথা নত করেননি। আমৃত্যু লড়েছেন—বার বার বিদ্রোহের পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরে ভবিষ্যতের জন্য রেখে গেছেন মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা।

বিদ্রোহের পটভূমি ঃ—

১৮৫৫-৫৭ সালের মহান সাঁওতাল বিদ্রোহ সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষকদের কোন আকস্মিক বিস্ফোরণ ছিল না। এই বিদ্রোহের ভিত্তি তৈরী হয়েছিল ধীরে ধীরে। এই বিদ্রোহের পটভূমি উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে ইংরাজ শাসকদের ছত্রচ্ছায়ায় অর্থলোভী জমিদার-মহাজনদের নির্ম্মম শোষণ-অত্যাচারের কলঙ্কময় কাহিনীর মধ্যে। ভারতবর্ষের মাটিতে ১৭৫৭ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নেতৃত্বে বণিকের মানদণ্ড রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বিহার প্রদেশে বসবাসকারী সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষকদের বিনিময় প্রথামূলক কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রায় অভাব থাকলেও ঐক্য ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এদের জীবন ছিল বিচ্ছিন্ন; জমিতে সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষকদের পুরুষানুক্রমিক অধিকার ছিল। কিন্তু বিহার প্রদেশ ইংরাজ বণিকদের করতলগত হওয়ার পর শোষণ-উৎপীড়নের চাপে ও ইংরাজ প্রবর্তিত মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির আক্রমণে সাঁওতাল উপজাতীয় মানুষদের কৃষিভিত্তিক ও বিনিময় প্রথামূলক বহু সহস্র বৎসরের প্রায় বিচ্ছিন্ন সমাজজীবনে বিপর্যয় দেখা দিল। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাঁওতাল কৃষকদের জমিচ্যুত করে জমিতে তাদের পুরুষানুক্রমিক অধিকার কেড়ে নিল। পূর্বের সমাজ-জীবনের স্মৃতি ও জমি হারার বেদনা বুকে নিয়ে বহু সহস্র বৎসরের বাসস্থানের গণ্ডী থেকে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এসে সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষকেরা ছড়িয়ে পড়ল বঙ্গদেশ ও বঙ্গ-বিহার সীমান্তে। পাহাড়-নদীনালা বেষ্টিত ও অরণ্য সংকুল বর্তমান সাঁওতাল পরগণার কুমারী মাটিতে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে সোনার ফসল ফলাবার জন্য ইংরাজ শাসকও ঐ অঞ্চলের জমিদারদের আহ্বানে বাধ্য হয়ে সাড়া দিয়ে সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষকেরা শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে চলে আসে। ভাগলপুরের 'দামন-ই-কো' (অর্থাৎ 'পাহাড়ের ওড়না') নামক অরণ্যসংকুল ও পাহাড় এলাকা ক্রমশঃ হয়ে উঠল সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান বাসস্থান। কুমারী মাটির বুক চিরে ফলতে শুরু করল সোনার ফসল।

কিন্তু এই সোনার ফসল সাঁওতালদের দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটাতে পারলো না। কারণ ইতিমধ্যেই

ফসলের লোভে ও দরিদ্র-সরলমতি সাঁওতালদের শোষণ করবার জন্য দামন-ই-কো-র তৎকালীন শাসনকেন্দ্র 'বারহাইতে' এবং অন্যান্য গঞ্জে বাঙালী, পাঞ্জাবী, ভোজপুরী, ভাটিয়া প্রভৃতি মহাজনেরা উপস্থিত হয়েছিল। এরা ব্যবসার নামে শুরু করল লুণ্ঠন ও প্রবঞ্চনা। সাঁওতালদের দ্বারা উৎপাদিত ফসল সামান্য লবণ, কাপড়, তামাক, কাঁচের চুড়ি, কাঁসার বাসন ইত্যাদির বিনিময়ে তারা কিনে নিত। আবার কখনো কখনো সামান্য নগদ পয়সাতেও এই বিনিময় হত। এই রক্তচোষা মহাজনেরা হিসাবের ব্যাপারে চরম দুর্নীতির আশ্রয় নিত। দুই ধরণের বাটখারা এই মহাজনেরা ব্যবহার করত। সাঁওতালদের তারা যখন 'ধান-চাল ধার দিত তখন ওজনে কম দিত এবং এইজন্য যে বাটখারা তারা ব্যবহার করত তার নাম ছিল 'বেচারাম' বা 'ছোট বৌ'। আর সাঁওতালরা যখন ধান চাল শোধ দিতে আসত তখন মহাজনেরা ওজনে বেশী নিত এবং এইজন্য যে বাটখারা ব্যবহার করা হত তার নাম ছিল 'কেনারাম' বা 'বড় বৌ।' বাটখারার কারসাজির মধ্য দিয়ে চলত চরম লুণ্ঠন। আর ধারের জন্য সুদের হারের কোন সীমা ছিল না; শতকরা পাঁচশত টাকাও সুদ নেওয়া হত। ফসলের মরশুমে ফসল দিয়ে সুদ ও আসল সাঁওতালদের শোধ করতে হত। সাধারণত এই দেনা সারা জীবনেও তারা শোধ করতে পারত না। স্থানীয় ভাষায় তারা হয়ে পড়ত 'কামিয়া' বা ক্রীতদাস। যে ধার নিত তাকে এবং তার বংশধরদের সারা জীবন মহাজনের কাছে বাঁধা পড়তে হত। এই প্রথাকে সাঁওতালরা বলত কামিওতি। মহাজনেদের নির্মম শোষণের পাশাপাশি জমিদারদের শোষণের কার্য অবাধে চলেছিল। খাজনার হার ছিল অত্যধিক এবং তা বছর বছর বাড়ত। রাজস্ব আদায়কারীদের (নায়েব সাজোয়াল) খাজনা আদয়ের সমপরিমাণ দস্তুরি দিতে সাঁওতালদের বাধ্য করত। জমিদারী-কর্মচারীবৃন্দ ও দারোগাদের নির্মম অত্যাচার যেমন বলপূর্বক সম্পত্তি হস্তগত করা, অপমানিত করা, প্রহার ও অন্যান্য উৎপীড়ন ছিল সাঁওতালদের নিত্যসাথী। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল কোম্পানীর সাহেব, নীলকুঠির সাহেব, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ঠিকাদারদের নিত্য নতুন জুলুম যা সাঁওতাল রমণীদেরও কলঙ্কিত করত।

গভীর অর্থনৈতিক বিক্ষোভের পটভূমিকায় সাঁও-তালদের উপর এই অকথ্য অত্যাচারে সাঁওতালদের জীবন ক্রমশঃই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল—অথচ বাসস্থান থেকে বহুদূরে অবস্থিত আদালতে গিয়ে সুবিচার প্রার্থনা করার সামর্থ তাদের ছিল না। কারণ সেখানে চলত আমলাদের সীমাহীন প্রবঞ্চনা। শোষণ ও অত্যাচারের এই সমগ্র প্রক্রিয়াটা ছিল ইংরাজ শাসনের অনিবার্য ফসল এবং ইহাই বিদ্রোহের ক্ষেত্রকে উর্বর করে তুলেছিল।

বিদ্রোহের পথে :—

"আমরা প্রজা, সাহেব রাজা, দুঃখ দেবার যম
তাদের ভয়ে হটবো মোরা এমনি নরাধম?
মোরা শুধু ভুখবো?
না, না মোরা রুখবো।"

শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের মনের ধূমায়িত বিক্ষোভ, বিদ্রোহের আহ্বান নিয়ে গানের মধ্য দিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৫৪ সাল থেকেই বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠতে শুরু করে এবং পরবর্তী-কালে তা চতুর্দিকে দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলেন ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক চার ভাই—সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব।

প্রথম দিকে সাঁওতালদের একটা অংশ ডাকাতের দল গঠন করে প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহাজনদের বাড়ী ডাকাতি শুরু করে। শিবের থানে পুজা দেবার নাম করে এরা রাত্রে বিভিন্ন জয়গায় সভা করত এবং মহাজনদের বাড়ী ডাকাতি করত। ফলে অঞ্চলের জমিদার মহাজন ও পাকুরের জমিদার বাড়ীর নির্দেশে দিঘী থানার কুখ্যাত দারোগা মহেশলাল দত্ত সাঁওতালদের উপর ভয়ংকর নির্যা-তন-অপমান শুরু করে। ডাকাত থেকে শুরু করে নিরীহ সাঁওতাল- কেউ-ই এই অত্যাচারের হাত থেকে বাদ যায় না। এই অত্যাচারই ক্রোধের আগুণে ঘৃতাহুতির কাজ করে। সাঁওতাল অধ্যুষিত সমগ্র অঞ্চল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ১৮৫৫ সালের প্রথম দিকে প্রায় সাত হাজার সাঁওতালের এক সমাবেশ থেকে আওয়াজ ওঠে : শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোন পথ না পেয়ে ডাকাতি করার জন্য যদি সাঁওতালদের অপরাধী হিসাবে ধরা হয়, তবে সাঁওতালদের যথা সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী মহাজন ও জমিদারদের অপরাধের বিচার হবে না কেন?

১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন আবার প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল 'বারহাইত' থেকে দুই মাইল দূরবর্তী ভগ্নাডিহি নামক গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক প্রাচীন বটগাছের তলায় সমবেত হলেন। ইংরাজ শাসনের ছত্র-চ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে জমিদার-মহাজন-দারোগার নির্মম শোষণ-অত্যাচার—সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব এই চার ভাইকে সংগ্রামের পুরোভাগে এনে দাঁড় করিয়েছিল। এই সমাবেশে মূল নেতৃত্ব দিলেন সিধু ও কানু। এই সমাবেশ থেকে দশ সহস্র সাঁওতাল গর্জে উঠল : "তারা আর জমিদার মহাজনের, ইংরাজ শাসকদের, পুলিশ-পাইক- পেয়াদার, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে নিপীড়ন সহ্য করবে না, কারো দাসত্ব স্বীকার করবে না। তারা সাঁওতাল পরগণা থেকে সকল শোষক-উৎপীড়ককে বিতাড়িত করে সমস্ত জমি দখল করবে এবং সাঁওতালদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে।" সাঁওতালদের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্যে কি ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে তাও তারা ঘোষণা করল :—"তাদের রাজ্যে কাউকে খাজনা দিতে হবে না। প্রত্যেকের সাধ্যমত জমি চাষ করার অধিকার থাকবে।

অতীতের সমস্ত ঋণ মকুব করে দেওয়া হবে। বলদ চালিত লাঙগলের উপর বার্ষিক দু পয়সা আর মহিষ চালিত লাঙগলের উপর বার্ষিক দু আনা খাজনা দিতে হবে। প্রতি টাকার সুদ হবে বার্ষিক এক পয়সা। আর তাদের রাজা হবে সিধু, সে হবে 'সুবা' বা 'সুবাদার'।" সমাবেশের সিম্ধান্ত মতো সাঁওতালেরা তাদের এই সমস্ত বক্তব্য চরম পত্রের মাধ্যমে দরোগা, স্থানীয় জমিদার ও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জানিয়ে দিল। বলা হল --একপক্ষ কালের মধ্যে জবাব দিতে। কিন্তু জবাব সাঁওতালেরা পায়নি।

সিধু কানু জানতেন যে পশ্চাতপদ সাঁওতালদের কাছে ধর্মের ধ্বনি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হবে। তাই সাঁওতালদের উদ্দেশ্যে সিধু ও কানুর স্বাক্ষরযুক্ত "সমস্ত গরীব জনসাধারণের কাছে" নামক ইস্তাহারে বলা হলঃ যুবা ঠাকুর নিজে যুদ্ধ করবে, কেষ্ট ঠাকুর ও রামচন্দ্র সহযোগী হবে। ঠাকুরের নির্দেশে কৃষকেরা ভেরী বাজাবে এবং ঠাকুর ইউরোপীয় সৈনিক ও ফিরিঙ্গীদের মস্তক ছেদন করবে। সাহেবেরা যদি বন্দুক ও বুলেট নিয়ে যুদ্ধ করে, তাহলে সেই বন্দুক ও বুলেট ঠাকুরের ইচ্ছায় নিষ্ফল হবে।

৭ই জুলাই—বিদ্রোহ শুরুর দিনঃ—

৩০শে জুনের সমাবেশের পর গ্রাম্যদেবতা রক্ষাকালীর থানে জমায়েত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে হাজার হাজার সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষক 'বারহাইত' থেকে মাইলখানেক দূরবর্তী পাঁচকেঠিয়া বাজারের দিকে এগিয়ে যায়। তখন মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্রোহের গান ঃ

"ও শিধো, শিধো ভাই, তোর কিসের তরে রক্ত ঝরে
কি কথা রইল গাঁথা, ও কান্হু তোর হুল হুল স্বরে,
দেশের লেগে অঙ্গে মোদের রক্তে রাঙা বেশ
জান না কি দস্যু বণিক লুটলো সোনার দেশ।"

বিদ্রোহী বাহিনী পাঁচকেঠিয়া বাজারে উপস্থিত হয়ে মাণিক চৌধুরী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত ও হিরু দত্ত নামক পাঁচজন কুখ্যাত মহাজনকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। পাঁচকেঠিয়া গ্রামের এক বটতলায় গ্রাম্য রক্ষাকালীর থানে এদের বলি দেওয়া হয়।

বিদ্রোহী সাঁওতালদের মোকাবিলা করার জন্য দিঘী থানার অত্যাচারী দারোগা মহেশলাল দত্ত সদলবলে এগিয়ে এলেন। ৭ই জুলাই (১৮৫৫) পথে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। সিধু ও কানুকে তিনি গ্রেপ্তার করলেন। ক্রোধে সাঁওতালেরা অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। বহু অত্যাচারের নায়ক ছিল এই মহেশলাল দত্ত। সাঁওতালদের টাঙ্গির আঘাতে তিনি নিহত হলেন; মুন্ডুচ্ছেদ করে সাঁওতালেরা প্রতিশোধ গ্রহণ করল। দারোগা হত্যার মধ্য দিয়ে ৭ই জুলাই শুরু হল ঐতিহাসিক 'সাঁওতাল হুল' বা সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই ঘটনার পর সাঁওতালেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে এগিয়ে যায়। ফলে ক্রমশঃ বিদ্রোহের লেলিহান শিখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহ যতই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, ততই হাজার হাজার (কখনও ১০ হাজার, কখনও ৩০ হাজার) সাঁওতাল তাতে যোগ দিয়েছে। প্রথমে 'বারহাইত' বাজার বিদ্রোহীদের দখলে আসে। তিনদিন অবরুদ্ধ থাকার পর পাকুরও তাদের দখলে আসে। ভাগলপুর থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত ডাক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের বিভিন্ন অংশেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্রোহীরা একের পর এক জমিদার, মহাজন, নীলকুঠির সাহেব ও দারোগাদের হত্যা করে। সাঁওতালদের 'লোহু' (রক্ত) শোষণকারী জমিদার, মহাজন, নায়েব, গোমস্তারা আতঙ্কিত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে যত্রতত্র পালিয়ে যায়। কম্পিত হয়ে ওঠে ইংরাজ শাসনের ভিত্তি।

গণসমর্থনঃ—

সাঁওতাল উপজাতি সামগ্রিকভাবে এই বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ শোষণ-উৎপীড়নে যে ক্রোধের বারুদ তাদের বুকের মধ্যে জমে উঠেছিল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তাই যেন জ্বলে উঠেছিল। শুধুমাত্র সাঁওতাল উপজাতি নয়, এই বিদ্রোহের শরিক ছিল সমাজের নীচুতলার সমস্ত গরীব মানুষ--কামার, কুমোর, জোলা, গয়লা, লোহার, তাঁতী, তেলী, চামার, ডোম প্রভৃতি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলের সৃষ্ট অভিনব শোষণ-নির্যাতন ব্যবস্থাই সমস্ত গরীব মানুষের মধ্যে শ্রেণীগত ঐক্য গড়ার পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছিল—দূর করে দিয়েছিল সম্প্রদায়গত বিভেদ।

বিদ্রোহ দমনের অভিযানঃ—

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ও ঐ শাসনের স্তম্ভ জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরাজ সরকারের নারকীয় অভিযান একটি দিনের জন্যও থেমে থাকেনি। বিদ্রোহের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য ইংরাজ সরকার ৭ম, ১৩, ৪০, ৪২, ৩১শ ও ৩৭শ রেজিমেণ্ট এবং হিল রেঞ্জার্স প্রভৃতিকে নিয়োগ করে। জমিদারেরাও হাতী, ঘোড়া, বরকন্দাজ, ও সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য দিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। গড়ে ওঠে শ্রেণী শত্রুদের ঐক্য।

আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত হাজার হাজার ইংরাজ সৈন্য গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করে সাঁওতাল এলাকাগুলিতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। আগুন জ্বলে উঠেছিল সাঁওসালদের ঘরবাড়ীতে। ঘরছাড়া সর্বহারার বেদনা বুকে নিয়ে তীর-ধনুক, বর্শা, কুড়ুল, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্রের সাহায্যে সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষক ও সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও অভূতপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। প্রকাশ্যে যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ এই উভয় কৌশলের সাহায্যে বহুবার তারা ইংরাজ সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৮৫৫ সালের ১৯শে জুলাই ইংরাজ সরকার বিদ্রোহের প্রধান নেতাদের ধরিয়ে

দেবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১৮৫৫ সালের ১৭ই আগস্ট ইংরাজ সরকার এক চরমপত্রে ঘোষণা করেন যে দশদিনের মধ্যে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে হবে—অন্যথায় কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ সাঁওতালদের যেন অজানা ছিল। তাই এই সমস্ত ঘোষণা বিদ্রোহের অগ্নিশিখাকে নিভাতে পারেনি। পূর্বের মতোই বিদ্রোহের আগুণ লেলিহান শিখা নিয়ে জ্বলতে থাকল।

নিরুপায় হয়ে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ১৮৫৫ সালের ১০ই নভেম্বর বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক আইন জারী করলেন। নভেম্বর মাসের শেষভাগে সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক কানু গ্রেপ্তার হন। কানু ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে যান। ইতিপূর্বেই সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিধু আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর জন্মভূমি ভগ্‌নাডিহি গ্রামে গ্রেপ্তারের পর দ্রুততার সঙ্গে নিয়ে এসে ইংরাজ বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। বিদ্রোহের অপর দুই শ্রেষ্ঠ নায়ক চাঁদ ও ভৈরব এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে বীরের মতন প্রাণ বিসর্জন দেন। বিদ্রোহের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও গ্রেপ্তার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এইভাবে জীবনদানের মধ্য দিয়ে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদের অন্যতম হিসাবে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ নিজেদের অমর করে গেলেন। ১৮৫৬ সালের ৩রা জানুয়ারী সামরিক আইনের মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু নেতৃত্বহীন ও বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহের আগুন যেন নিভতে চাইছিল না। বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহীরা তাদের অস্তিত্ব তখনও ঘোষণা করছিল অবশেষে নিরঙ্কুশ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ইংরাজ সরকার শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়।

হাজার হাজার সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষক মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে, অজস্র ধারায় বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে বিদ্রোহের যে আগুন জ্বেলেছিলেন তা ছিল ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষের যুগান্তকারী মহাবিদ্রোহের অগ্রদূত ও প্রেরণা। চল্লিশ বছরব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্থান। সঠিক রাজনৈতিক জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব তৎকালীন সময়ে স্বাভাবিক কারণে না থাকার জন্য এই সাঁওতাল বিদ্রোহ চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু তবু এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়নি। ১৮৭১ এবং ১৮৮০-৮১ সালে একই স্বপ্ন নিয়ে আবার সাঁওতাল বিদ্রোহের মাদল বেজে উঠেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের শিক্ষার আলোকে আলোকিত পথ ধরে ভারতবর্ষের কৃষক জীবনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য পরাধীন ভারতবর্ষে বার বার বিদ্রোহ করেছে। আজও সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতবর্ষের মানুষের কাছে বিশেষ ভাবে কৃষক সমাজের কাছে যেন এক অনির্বাণ দীপশিখা। পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, বিনা ক্ষতি পূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বণ্টন, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন—এই দাবীগুলির সমাধানের মধ্য দিয়ে যেদিন ভারতবর্ষের সমাজে বিকাশের ধারা উন্মুক্ত হবে সেইদিন সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষকদের স্বপ্ন সার্থক হয়ে ভারত দিগন্তে নতুন সূর্যের উদয় হবে। সাঁওতাল বিদ্রোহ সহ অসংখ্য বিদ্রোহের মহান ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য বুকে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষ এই সূর্যোদয়কে ত্বরান্বিত করার পথে রক্তাক্ত হয়েও মৃত্যুভয়হীন পদক্ষেপে অগ্রসর হবেই—এই হোক আমাদের শপথ।

টীকা

(১) মহাভারতের রণক্ষেত্রে অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। অর্জুন তাঁর খুল্লতাত ও আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করতে পরাঙ্মুখ হলে কৃষ্ণ যুদ্ধের দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তাঁকে যুদ্ধের জন্য আবার উৎসাহিত করে তোলেন।

(২) গ্রাম্য পুঁজিপতি।

(৩) সাতাকি শর্মা—মথুরা জেলার ভূমিহীন কিষাণ কবি।

"লেখক হল একজন সর্বসাধারণের লোক।...সে একজন সর্বসাধারণের লোক, কারণ তার শিল্পকর্ম শিল্পাগারের চার দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকার জন্য নয়। বরং তা সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে পড়বে। নিজেদের ঠকানোর অধিকার লেখকদের থাকতে পারে না, কারণ নিজেকে ঠকাতে গিয়ে সে অন্যদের ঠকায়..."

আঁরি বারবুস

এ শিরোচ্ছেদ কার ? / সুকুমার দাস

মাথা কাটা গেল। ৭ই জুন, ১৯৭৮-এ আবার কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে স্থাপিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিটির মাথাটা কে বা কারা কেটে গোলদীঘির জলে ফেলে দিয়ে গেল। কুৎসিৎ অপকর্মের এ' খবরটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়লো কলকাতায়—তথা সারা বাংলাদেশে। খবরটি শোনার পর থেকেই মনের মধ্যে একটি ভাবনাই শুধু ঘুরপাক খেতে লাগলো কারা এবং কেন এই মনীষীর মর্মর মূর্তির ওপর আক্রমণ চালালো? এ দুষ্কার্য কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ঐ অবোধেরা করলো? তাঁর মাথা কেটে নিয়ে ঐ বিবেকহীনরা কার মাথায় কলঙ্কের কালিমা লেপে দিলো? আসলে মাথা কাটা গেল কার? মনে হয় আমার, আপনার—সমগ্র জাতির। সারা জীবন দেশবাসীকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে যে মনীষী নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন আজ কোন অপরাধে তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ পরেও তাঁকে এমন-ভাবে নিগৃহীত হ'তে হ'ল? তিনি নিজেও কি কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, শতবর্ষ পরে এদেশের এক শ্রেণীর উদ্‌ভ্রান্ত যুবক তাঁর সমস্ত জীবনের কর্ম ও ত্যাগের এইভাবে মূল্যায়ণ করবে? এ' যেন,

"অপরাধী নিজে জানিল না
কিবা অপরাধ তাহার,
বিচার হইয়া গেল।"

হ্যাঁ, স্বদেশের ইতিহাস বোধহীন কতিপয় অর্বাচীন যুবকের বিচারে তিনি অপরাধী বলেই সাব্যস্ত হলেন। আর এইসব অপরিনামদর্শী যুবকের একতরফা বিচারের চরম দণ্ডই তাঁকে আজ মাথা দিয়ে গ্রহণ করতে হ'ল। আর তার লজ্জা এবং গ্লানিকে মাথা পেতে নিতে হ'ল সমগ্রজাতিকে। তাই ভাবছিলাম, শুধু কি বিদ্যাসাগরের মাথাটাই আজ কাটা গেল?

ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে বেশ কিছুদিন আগের ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা বারবার মনে হ'তে লাগলো। বছর কয়েক আগে পুজোর ঠিক আগে বিকেল বেলার শেষে ঐ কলেজ স্ট্রীট দিয়েই কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। পোষাকের দোকানগুলি তখন সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল পসরা দিয়ে, নানা রঙের আলো দিয়ে। পুজোর কেনাকাটা চলছে তখন পুরোদমে। এই ভীড়ের মধ্যে একটা পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে একজন মধ্য বয়স্ক লোককে দেখলাম ভিক্ষা করতে। লোকটি কিন্তু আসলে জাত ভিখারী নয়, সে ছিল সুন্দরবন অঞ্চলের ক্ষেত মজুর। ঐ সময়ে গ্রামে কাজ থাকে না, নিশ্চিত অনাহার থেকে বাঁচবার জন্য অন্য সকলের সাথে লোকটিও ভিক্ষে করতে চলে এসেছিল কলকাতায়—সঙ্গে ছেলেটিও। একটা বড় পোষাকের দোকানের 'শো কেসে' সাজানো একটা লাল জমা দেখে ছেলেটি বাবাকে ডেকে বলে উঠলো, "আব্বা, ঐ লাল জামা।" বাবা বললে, "চ' চ' সামনে চ'—ওদিক পানে"। ছেলে বায়না ধরে, "আশ, ঐ জামা কিনি দিবি?" নিরুপায় বাবা বলে, "ওদিক পানে চ', তোকে মুড়ি কিনে দেব।" ছেলে নাছোড়বান্দা, সে বললে, "মুড়ি চাই না—জামা চাই।" এর পর কথোপকথন আর বেশী দূর এগোয়নি। দেখলাম, হঠাৎ ছেলেটার গালে পড়লো বাবার প্রচণ্ড এক চড়। ঐ প্রচণ্ড চড় খেয়েও ছেলেটি কিন্তু একটুও কাঁদলো না—হতবাক হয়ে নিজের গালে হাত বোলালো বার কয়েক।

সেদিনও ভেবেছিলাম ঐ চড়টি কি সত্যই ঐ দুগ্ধ-পোষ্য শিশুটির গালেই পড়েছিল? নাকি সে চড়টি

খেয়েছিলাম প্রত্যক্ষদর্শী আমি? মনে হয় সে চড় সেদিন শিশুটির গালে পড়েনি—পড়েছিল আমরা যে সমাজে বাস করি তারই মূলে। শিশুটি কিন্তু সেদিন কিছুই বুঝতে পারেনি কেন তাকে হঠাৎ মার খেতে হ'ল—কি তার অপরাধ। আর তার অক্ষম বাবা, সেও কি দোষী? তাই বা বলি কেমন করে? ভাবছিলাম, কোন অবস্থায় এসে পেঁৗছালে ঐটুকু শিশুর সামান্য একটা বায়নার জন্য শিশুর গালে বাবা সজোরে চড় মারতে পারে। জামার বায়না করে ঐ শিশুটি যেমন অপরাধী বনেছিল, ভাবছি

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবনপণ করে কঠোর সংগ্রাম করে সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতী হ'বার মত গর্হিত কাজ করেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগরকেও আজ তেমনি শাস্তি পেতে হ'ল। নইলে এমন অঘটন আজও ঘটে কেমন করে? যারা এটা করলো তারা কি বিদ্যাসাগর মশায়ের সমগ্র জীবনের মূল্যায়ণ বর্তমানের "ইজমের" রাজনীতির যূপকাষ্ঠে ফেলেই করতে চায়? সেদিনের পরাধীন দেশের প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির কথা কি তারা একবারও বিচারের মধ্যে আনলো না? সেদিনের মূল সমস্যা ও আজকের সমস্যার মধ্যে তফাৎটা যে কি—তাও কি তারা বুঝতে চেষ্টা করলো না?

ওদের কি ধারণা ইতিহাসে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যা লেখা আছে তা' সঠিক নয়? শ্রেণী স্বার্থেই শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল মহল তাঁকে অযৌক্তিকভাবে বড় করে দেখাবার প্রয়াস চালাচ্ছে। তা' কি সত্যি? একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসন ও শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করে। এটা তারা করবেই। কারণ জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম যদি প্রকৃত ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয় তবে তাদের বিপদ অনিবার্য। সে কারণেই আমরা সকলেই একমত যে, জনস্বার্থেই দেশের ইতিহাসের সঠিক উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। সেই বিশ্লেষণ করতে গিয়েই বর্তমানে দেশের একদল যুবক এই ইতিহাসকে এমন এক "স্থিরীকৃত" দৃষ্টিকোণ ও মানসিকতা থেকে বিচার করছে, যার ফলে এক জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এর নব মূল্যায়ণ করতে গিয়ে এরা দেশের তৎকালীন যুগের পরাধীনতার কথা, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের কথা একবারও ভাবতে চায় না। স্বাধীনতার পরবর্তী সংগ্রামকে ওরা সেদিনের ভিন্ন ধর্মী সংগ্রামের সাথে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছে এবং একই দৃষ্টিতে বিচার করছে। তাই এরা আজ রামমোহন রায় ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার প্রশ্ন তুলেছে—প্রশ্ন তুলেছে বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক কাজের এবং বিবেকানন্দের সাম্যবাদী মানসিকতার ব্যাপারে। পরাধীন যুগে সমাজদেহ থেকে কুসংস্কারের কাঁটাগুলি তুলে ফেলা যে কি কঠিন কাজ এরা আজ তা কিছুতেই অনুধাবন করতে পারবে না। এরা সব কিছুকেই বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চাইছে, তাই অনেক ক্ষেত্রেই এরা তাঁদের সংস্কারমূলক কাজের যথাযথ মূল্য দিতে অস্বীকার করছে। মূল সত্যকে বেমালুম অস্বীকার করাও যে ইতিহাসের যথাযথ মূল্যায়ণ নয় এবং তাও যে ইতিহাসের বিকৃতি—একথাটা ওরা ভুলছে কেমন করে? আসলে এ'দের অনেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে যা' কিছু সুন্দর আহরণ করে দেশকে সংস্কার মুক্ত করবার জন্য—যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন, এদের মতে সেগুলি মোটেই বৈপ্লবিক নয়। এবং এসব সংস্কারের সুফল ভোগ করেছে কেবল তাদের স্ব-শ্রেণী। অপরদিকে তাঁদের কর্মকাণ্ডের ফলে নাকি সাম্রাজ্যবাদীরা দেশ শাসনে ও শোষণে উৎসাহ পেয়েছে। এ'দের দ্বারা নাকি আদৌ শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষ, শাসক ও জমিদার গোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়নি। এমন কি এখনও শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে এ'দের প্রভাব বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করে না। তাই এ'দের স্মৃতিচিহ্নগুলি জিইয়ে রাখবার কোন প্রয়োজনই আজ আর এরা অনুভব করে না।

অপর সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথাতেই আসি। সত্যিই কি এইসব যুবকেরা তাঁর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী অবদানের কথা একবারও ভাবতে চেষ্টা করেছে? জড় চিন্তা, অভ্যাস আর সংস্কারের অন্ধ কারাগারে আবদ্ধ মানুষকে যিনি মুক্তির আলোতে আনবার জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়ে নির্যাতিত হয়েছেন, তার কি কোন মূল্যই তারা দেবে না? দিলে শতাব্দীর পথ অতিক্রম করে যাঁর নাম আজ প্রগতি, ব্যক্তিত্ব, উদারতা ও করুণার প্রতীক হয়ে উঠেছে—তাঁকেই তারা "ইজমের" নামে এমন নগ্নভাবে আক্রমণ করবে কেন?

তাই মানবদরদী বিদ্যাসাগরের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের কিছু কথা ওদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বিদ্যাসাগর কোনদিনই রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলতঃ সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ্। সমাজে একদল লোক যখন সনাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে নতুন সবকিছু প্রগতির পথকে রুদ্ধ করেছিল এবং আর একদল যখন সংস্কার মুক্তির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করছিলো, বিদ্যাসাগর সে সময়েই জন্ম গ্রহণ করেন। এই সনাতন পন্থীদের ধর্মীয় গোঁড়ামীর দুর্গ তখন ছিল ভীড়ে ঠাসা এবং মজবুত। দৃঢ়চিত্ত বিদ্যাসাগর দেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য সেই দুর্গেই চরম আঘাত হেনেছিলেন। সংস্কারবদ্ধ, গতিহীন সেই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করা যে কি কঠিন কাজ—আজকের যুগে তা কল্পনাও করা যাবে না। অকুতোভয় বিদ্যাসাগর সেই দুঃসাহসিক পথেরই পথিক হয়েছিলেন এবং সে কঠিন কাজে অবশেষে জয়ীও হয়েছিলেন। তাই তো দেশের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর ঐ অপরাজেয় সংগ্রাম অবিনশ্বর এক যুগ-সূচনার স্বাক্ষর হয়ে আছে। তিনি চেয়েছিলেন পশ্চিমের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটাতে এবং প্রাচ্য শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা জগতের মিলন ঘটাতে। কর্মজীবনের শুরুতে শিক্ষার আলোকে দেশবাসীর নৈতিক উন্নতি সাধন করার সংগ্রামেই লিপ্ত ছিলেন তিনি। শুধু পুরুষদের জন্য শিক্ষা প্রসারেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন না, সে যুগে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেও তিনি অকল্পনীয় দুঃসাহসের পরিচয় দেন। এ ব্যাপারে তাঁকে কঠিন বিরোধীতার ও সমালোচনার মুখোমুখী হ'তে হয়েছিল। বহু যুগের সঞ্চিত কুসংস্কার স্ত্রী শিক্ষাকে তখন যুক্তিহীনভাবে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। অশিক্ষার অন্ধকারে কেবলমাত্র গৃহস্থালীর কাজ নিয়ে স্ত্রীলোকেরা

সেদিন জীবন কাটাতে বাধ্য হতেন। সেদিনের সেই সমাজ ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকদের হীন বলে মনে করা হতো। ঐ বদ্ধমূল কুসংস্কারের মূলে বিদ্যাসাগর আঘাত হেনেছিলেন। তিনি মনে করতেন সমাজের অগ্রগতির জন্য স্ত্রী শিক্ষা অপরিহার্য। গোঁড়া পন্থীরা তাঁর এই প্রচেষ্টাকে "নারীত্বের অবমাননা" বলে প্রচার করে তাঁর নিন্দা ও সমালোচনায় মেতে ওঠে। অপরদিকে বন্দী নারী সমাজও শিক্ষার-আলোক স্পর্শে আলোকিত হবার সুযোগ পেয়ে বিদ্যাসাগরের দিকেই আকৃষ্ট হয়। বহুদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি এ ব্যাপারে জয়ী হন। একদিন সত্য সত্যই গৃহ কোণের অশিক্ষার বন্দীদশা থেকে নারী জাতিকে টেনে আনলেন শিক্ষার আঙিনায়। বিদ্যাসাগর বিরোধীদের প্রবল যুক্তিতর্ককে খণ্ডন করে মনুসংহিতার বিধান বলে প্রমাণ করে দিলেন, "পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া মাতাপিতার কর্তব্য এবং তারাও শিক্ষার অধিকারী।"

শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনকে প্রসারিত করে বিদ্যাসাগর এগিয়ে আসেন সমাজের একের পর এক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের মূলে আঘাত হানতে। বিধবা বিবাহ আইন চালু করার জন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথাগুলিকে সমাজদেহ থেকে উৎপাটিত করবার জন্য তিনি নিজেকে সঁপে দেন। আজকের বিভ্রান্ত এসব যুবকেরা তাঁর কাজের কোন মূল্য দিতে না চাইলেও, তারা একথা জেনে রাখুক যে, একমাত্র বিধবা-বিবাহ আইন চালু করার জন্য সে যুগে তিনি যে কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন—শুধুমাত্র তার জন্যই তিনি অক্ষয় হয়ে থাকবেন। এ' ব্যাপারে তাঁর অসীম লাঞ্ছনা ভোগ জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে চিরকাল।

আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হ'বার ফলে এবং কৌলিন্য প্রথার কুফলে এদেশে তখন তরুণী বিধবার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। ঐ কৌলিন্য প্রথাই নিষ্ঠুর নারী নির্যাতনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বিবেকহীন কুলীনেরা এ প্রথাকে লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত করেছিল। কেবলমাত্র অর্থের লোভে তারা অতি বৃদ্ধ বয়সেও একের পর এক বিয়ে করতো এবং অল্পদিনের মধ্যে তারা মারা গেলে ঐ সব তরুণীরা একসাথে বৈধব্যকে বরণ করে নিয়ে সারাজীবন দুঃখ ক্লেশের মধ্যে থাকতে বাধ্য হতো।

ঐ সব কুলীনরা এদের বিয়ে করতো বটে কিন্তু স্ত্রীদের আশ্রয় বা ভরণ পোষণের কোন দায়িত্বই তারা গ্রহণ করতো না। এদের এক এক জন এত সংখ্যক বিয়ে করতো যে সকল স্ত্রীকে তারা চিনতোই না। এমনকি কয়েক বছরের মধ্যেও তাদের সকলের সঙ্গে একবার দেখা করবার সুযোগ পর্যন্ত পেতো না। এ ছিল তরুণীদের বাধ্যতামূলক বৈধব্যবরণ—যা ছিল অতি নিষ্ঠুর, অতি করুণ। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যে, যুক্তিহীন অন্ধ সামাজিক প্রথা ধর্মের প্রকৃত অর্থকেই মুছে দিয়েছে। তাই ধর্মের নামে এ নারী নির্যাতন আইন করে বন্ধ করে দিতে হবে। তাছাড়া রক্তমাংসের মানবীর দেহ কখনই স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাষাণের মতো হয়ে যায় না বা তার কামনারও শেষ হয়ে যায় না। তাই এ নির্মম প্রথাকে তুলে দেবার জন্য তিনি সেদিন সংস্কার বাদের তরঙ্গ ও সনাতন পন্থীদের মুখোমুখী হলেন। "গেল, সমাজ গেল" বলে সাড়া পড়ে গেল রক্ষণশীল সমাজে। তারা শুধু তাঁর নিন্দাবাদেই মুখর হলো না, তাঁকে দৈহিক নির্যাতনেও এগিয়ে এল। এদের ক্রিয়াকলাপ দেখে বিদ্যাসাগর এক সময়ে ক্ষোভে বলেছিলেন, "দেশাচার শাস্ত্রের মাথার উপর পা রেখেছে, ধর্মের মর্মমূলকে বিদ্ধ করেছে, ভাল ও মন্দের বিবেচনা শক্তি নষ্ট করেছে, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বিচারের পথকে রুদ্ধ করেছে, তাই তাদের কঠিন অন্তর হতভাগিনী বিধবাদের দুর্দশার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ অনুভব করে না।" প্রবল বিরোধীপক্ষ যখন তাঁকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছিল তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, "যে দেশের পুরুষজাতির অন্তরে দয়া নেই, যেখানে ধর্ম নেই, কেবল লৌকিক প্রথা অনুসরণ করাই যেখানে পরমধর্ম বলে মনে করা হয়, সে দেশে যেন হতভাগ্য অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।" সমসাময়িক সমাজের কথা ভেবেই তিনি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে হিন্দু শাস্ত্রের মতবাদের গণ্ডীতে থেকেই "পরাশর সংহিতা" থেকে শ্লোকের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন বিধবার পুনর্বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। ১৮৫৬ সালের এই জুলাই মাসের ২৬ তারিখেই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল। ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে সে হ'ল এক স্মরণীয় দিন।

আজকের বিভ্রান্ত যুবকেরা জেনে রাখুক বিদ্যাসাগর অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য সেদিন শুধু স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও বিধবা বিবাহ আইন চালু করার সংগ্রামেই জয়ী হ'ননি, জয়ী হয়েছিলেন বহু বিবাহ, বাল বিবাহ, যৌতুক নামক কুপ্রথাগুলিকে সমাজ দেহ থেকে তুলে ফেলবার আন্দোলনেও। বিদ্যাসাগর সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন যে, বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ সাধন ছাড়া শুধু বিধবা বিবাহ আইন দ্বারা সমাজ উপকৃত হবে না। কারণ বিপুল সংখ্যক বৈধব্যের মূল কারণই ঐ বহুবিবাহ নামক কুপ্রথা। মনের বিধানকে অপব্যাখ্যা করে কৌলিন্য প্রথার সুযোগ নিয়ে চলছিল তখন ভণ্ডামী। মনুর বিধান মতে, "অনুপযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দান অনুচিত। এতে যদি কন্যাকে সারা জীবন অবিবাহিত থাকতে হয়, তবুও না।" এতে কুলীন বৃদ্ধেরাও অসংখ্য বিয়ে করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। অপর দিকে মা-বাবারাও সমাজের ভয়ে ঐ সব বৃদ্ধদের সঙ্গেই কোন রকমে "কন্যার বিবাহ" নামক অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করিয়ে নিয়ে নিরপরাধ নাবালিকা মেয়েদের নিষ্ঠুরভাবে বিসর্জন দিতেন। আজকের তথা কথিত এই সব বিপ্লবীরা কি ঐসব প্রথাগুলি চালু রাথারই পক্ষপাতী? তারা জানুক, 'ধুতি, চাদর ও চটি' পরিহিত এ সরল মানুষটি ছিলেন

ইস্পাতের মত অনমনীয় এবং স্বীয় সংকল্পসাধনে অটল। একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য কাজকেই তিনি গ্রহণ করতেন এবং তা সফলকাম করতে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকতেন। পরাধীন ভারতে জন্মে ছিলেন বলেই অনেক ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের কাজে শাসকগোষ্ঠীর সাহায্য তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল; কিন্তু সেটা কোন মতেই স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের বিনিময়ে নয়। এ ধরনের সাহায্য গ্রহণ ও দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করার অপরাধেই কি আজ তিনি সাম্রাজ্যবাদের দালাল? তিনি যে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরোধীতা করে ভবিষ্যতের নতুন অলোকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন—সেটাই কি তাঁর বড় অপরাধ? এরই জন্য কি আজ তাঁর শিরোচ্ছেদ হলো?

১৯৭০—'৭১ সালেও বাংলার বুকে ঘটে যাচ্ছিলো এ' ধরণের একের পর এক অপকর্ম। এতে তিনিও রেহাই পাননি। সেদিনও মার্কস ও লেলিনেব নামেই এসব করা হচ্ছিল। একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সকলেরই খেয়াল রাখা উচিৎ যে এসব কাজগুলি সংগঠিত হচ্ছে কেবল তখনই, যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আসে কোন পরিবর্তন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের শেষের দিকে যা' হয়েছিল আজ আবার বামফ্রন্টের গদীতে আসীন হবার পর তারই সূচনা। অতএব সন্দেহ অমূলক নয় যে, আসলে যারা মার্কসবাদ লেনিনবাদের নামে কোন কিছু পরিবর্তনে প্রয়াসী, প্রকৃতপক্ষে তারাই এটা করছে কি না। এ' জঘন্য কাজের পেছনে পর্দার আড়াল থেকে অন্য কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের উস্কানি নেই তো? রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরোদ্ধারের জন্য "ইজমের" নামে সমস্যা ক্লান্ত যুবকদের দিয়ে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা নয় তো? প্রথম যুক্তফ্রন্টের আগে এ'সব বিপ্লবীরা ছিল কোথায়? সে সময় পর্যন্তও তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসকবর্গের প্রতিমূর্তিগুলি বহাল তবিয়তেই বর্তমান ছিলো কলকাতার ময়দান আলো করে। সেগুলিকে সেদিন যুক্তফ্রন্ট সরকারই সরিয়ে ফেলেছিল। আশ্চর্যের বিষয় ওরা সেদিন পর্যন্ত সেগুলিকে ভেঙ্গে দেবার তাগিদ মোটেই অনুভব করেনি।

অতএব স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় রাজনৈতিক কারণে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় ওদের জন্ম। আর একটা প্রশ্ন করি, সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতায় আসার জন্য মার্কস লেনিন কি এ পথেরই নির্দেশ দিয়ে গেছেন? রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কি এ'ভাবেই সম্ভব হয়েছিল? কোন পুঁজিবাদী দেশেই জনসমর্থনহীন এসব ঘটনা কোন পরিবর্তন আনতে পারে না, বরং সেই প্রচেষ্টার মূলেই বুমেরাং হয়ে আঘাত হানে।

ওদের মানসিকতা যদি এই হয় যে, এ পুঁজিবাদী দেশে সমাজ সংস্কারের চেয়ে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন সর্বাগ্রে, তবে সেটা মেনে নিয়ে আমিও বলি—তাহলে সে চেষ্টাই চলুক না। তবে অসংগঠিত—এভাবে নয়, বিদ্যাসাগরের শিরোচ্ছেদ করেও নয়। মার্কস ও লেনিনের শিক্ষার আলোকে, তাঁদের নির্দেশিত পথেই তা' করতে হবে এবং তা' করতে গিয়ে অতীতের নিরলস এই সমাজ সংস্কারকের প্রতি এতটা অকৃতজ্ঞই বা হ'তে হবে কেন?

"এসো ভেঙে ফেলি দাসত্ব
গোলামীর লজ্জা ভেঙে ফেলি
হে মুক্তি, তুমি আমাদের দাও
পৃথিবী আর স্বাধীনতা!"

—লেনিন

ছাত্র আন্দোলন ও 'অরাজনীতি' / মৃণাল দাস

প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত। অতি পরিচিত শ্লোগান ইদানিং নতুনের মুখে নতুন ভঙ্গিতে প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু ছাত্র দাবী করছে 'নির্দলীয়', 'অরাজনীতি' ও "নিরপেক্ষতাই" তাদের জীবনের আদর্শ। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস ও আদর্শ সমষ্টির মধ্যে পরিকল্পিতভাবে প্রচারের মাধ্যমে জনমত সংগ্রহ বা সেই আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা হলে অবশ্যই ভবিষ্যৎ বা অদূর ভবিষ্যৎ-এ নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী বা দলের উদ্ভব হয়ে থাকে। বিশেষতঃ গত বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবাংলার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন সংগঠিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্বাধীনতার প্রথম দুটি দশক দেশের তথাকথিত পণ্ডিত এবং শাসক ও শাসকশ্রেণীর পার্টি ছাত্রদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে সযত্নে দূরে থাকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ (?) উপদেশ দিয়েছে যদিও এরা স্বাধীনতার যুগে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশকে মুক্ত করার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানিয়েছিল। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৩০ সালে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনে ভারতের ছাত্রসমাজ গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—পুঁজিপতি ও জমিদারশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসের রাষ্ট্র যন্ত্রকে করায়ত্ত করা এবং অপরদিকে ছাত্রসহ দেশের ব্যাপক সাধারণ মানুষের লক্ষ্য ছিল শোষণ নিপীড়নের অবসান, মহামারি দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, মনুষ্যত্বের অবমাননা থেকে মুক্তি, অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্তি। অর্থাৎ একটি শক্তিশালী অর্থনীতি ও দেশ গঠনই ছিল মানুষের মূল প্রেরণা। রাষ্ট্রযন্ত্র হস্তান্তরের মাধ্যমে একটি শ্রেণীর ঈপ্সিত লক্ষ্য পূরণ হলো। কিন্তু স্বাধীনতার পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি দেশের মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয় বুর্জোয়াদের সামন্ততন্ত্রের সাথে মিতালী করে দেশকে ধনতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং সাধারণ মানুষের আন্দোলন ও সংগ্রামের উপাদানগুলিও অক্ষতই আছে। দেশের শতকরা নব্বইজন মানুষের ঈপ্সিত লক্ষ্য স্বাধীন ভারতে শাসকশ্রেণী কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যে পূরণ হতে পারবে না তা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও শাসকশ্রেণীর চেতনার মধ্যে অবশ্যই ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের একটি ইতিবাচক ভূমিকা থাকে দেশ গঠনের কাজে। স্বাধীনতার পরে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী ও শাসকগোষ্ঠী কার্যতঃ বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের এই ইতিবাচক ভূমিকাকে অস্বীকার করলো। বার বার ছাত্রসমাজের প্রতি উপদেশ বর্ষিত হয়েছে, তাদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিৎ। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে বুদ্ধিজীবিদের একটি বড় অংশ ছাত্রসমাজকে উদাসীন রাখা। একটি বিশেষ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই তারা একাজ করেছে। মূলতঃ স্বাধীনতার দুই দশকে শাসকশ্রেণী কর্তৃক প্রভাবিত ছাত্ররা পশ্চিমবাংলার কলেজ বিশ্ববিদ্যালগুলিতে 'রাজনীতি পরিত্যাগের' দর্শন প্রচার করেছে এবং 'নির্দলীয় ছাত্র সংস্থা' 'জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংস্থা' ইত্যাদি নামে কলেজ ভিত্তিক ছাত্রসংগঠনগুলি ছিলো এই দর্শন প্রচারের হাতিয়ার। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল সারা দেশব্যাপী খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গণআন্দোলনের পাশাপাশি তীব্র ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র সংগ্রাম গড়ে ওঠে। 'শিক্ষাজগতে বিশৃঙ্খলার মড়ক' বলে শাসকশ্রেণী নিন্দা করলেও খাদ্য ও শিক্ষার দাবীতে এবং শাসকশ্রেণী কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন উত্তরোত্তর তীব্রতা লাভ করেছিল। ১৯৬৭ সালে নয়টি রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয়, শাসকশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব,—নব কংগ্রেসের জন্ম। ইন্দিরা গান্ধীর জনগণকে প্রতারণা করার কৌশল ভালভাবেই আয়ত্ব করা ছিল। সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের শ্লোগান তোলা হলো। মহিলা কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি গণসংগঠনগুলি গড়ে তোলা বা পুনরুজ্জীবিত করা হলো, বামপন্থীদের শ্লোগানগুলিকে ভিত্তি করে। 'রাজনীতি থেকে দূরে থাকো' পরিত্যক্ত হলো এই অতীত আদর্শ। ছাত্র পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাসকশ্রেণীর রাজনীতি আমদানি করল। কিন্তু পরাজিত হলো। পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজ ওদের প্রত্যাখ্যান করলো। গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। ইদানিং বহু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি পরিচিত ছাত্রপরিষদ সংগঠক ও সমর্থকরা 'রাজনীতি' পরিত্যাগের সপক্ষে মতামত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকছে না কার্যকরী সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং নক্সালপন্থী ছাত্রগ্রুপগুলির একাংশ ছাত্র পরিষদের সাথে যুক্ত হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে ছাত্রপরিষদ নক্সালপন্থী গ্রুপগুলির শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। গত ছয় বছর পশ্চিমবাংলায় ছাত্রপরিষদ ও তার রাজনৈতিক শক্তির সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে গণতান্ত্রিক মানুষ পরাজিত করেছে। সুতরাং নতুন পরিস্থিতি। নতুন রণকৌশলও অনিবার্য। নির্বাসন থেকে নক্সালপন্থীরা ফিরে এসেছে। বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এরা ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (D S.A.), স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশন, (S.A.) ছাত্র ঐক্য কমিটি, যুক্ত ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্ট ফ্রন্ট (D.S.F.) প্যাট্রিয়টিক এণ্ড

ডেমোক্রা।টক স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (P.D.S.U.) প্যাট্রিয়টিক এন্ড ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস এন্ড ইউথ অরগানাইজেশন (P.D.S.Y.O.) ইত্যাদি সংগঠনের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করছে, তাদের সমস্যা সমাধান বা ছাত্রস্বার্থেই তাদের সংগঠন, এবং মূল আদর্শ হচ্ছে 'অরাজনীতি'। এই সংগঠনগুলির নামের দিকে তাকালে বোঝা যাবে অরাজ নীতির নামে একটি রাজনীতি অবশ্যই আছে।

'গণতন্ত্র' কথাটি একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ হয়ে থাকে। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র না গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্র। 'ছাত্র ঐক্য' বা 'যুক্ত ছাত্র সংগ্রাম' কিসের ভিত্তিতে, কেন এবং কার বিরুদ্ধে ঐক্য বা সংগ্রাম। অনন্তকাল থেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। এমন সমাজ ছিল যা রাষ্ট্র ছাড়াই চলত, যার রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোন ধ্যান ধারণাই ছিল না। মানব সমাজের এমন এক স্তরে উৎপাদন ছিল মূলতঃ সমষ্টিগত এবং ভোগদখলও হত সাম্যতান্ত্রিক ছোট বড় গোষ্ঠীর মধ্যে। কিন্তু ধীরে ধীরে উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমবিভাগ ঢুকে পড়ল। উৎপাদন ও দখলির সমষ্টিগত প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হল। ব্যক্তিগত দখলই প্রাধান্য পেল এবং এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের উদ্ভব হল। যখন অর্থ ও তার সঙ্গে বণিক এসে উৎপাদকের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করে তখন থেকে বিনিময়ের প্রক্রিয়া অধিকতর জটিল হয়েছে। পণ্য এখন শুধু হাত থেকে হাতেই ফেরে না অধিকন্তু এক বাজার থেকে অন্য বাজারেও। পণ্য উৎপাদনের যে স্তরে সভ্যতার সূত্রপাত সে স্তরটির অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল (১) ধাতব মুদ্রা, সুদ ও তেজারতি (২) বণিকের অভ্যুদয় (৩) জমির ব্যক্তিগত মালিকানা (৪) দাস-শ্রমের প্রচলন। সভ্য সমাজে রাষ্ট্রই সমাজকে একত্রে ধরে রাখে এবং প্রত্যেকটি বিশিষ্ট পর্বেই এ রাষ্ট্র হলো একমাত্র শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্র এবং সকল ক্ষেত্রেই এটি হলো মূলতঃ শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণীকে দমন করার যন্ত্র। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে নাগরিকদের অধিকার স্থির হয় ধনসম্পত্তির অনুপাতে এবং প্রত্যক্ষভাবে এই তথ্য প্রকাশ পায় যে রাষ্ট্র হচ্ছে বিত্তহীন শ্রেণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিত্তশীল শ্রেণীর একটি সংগঠন। সুতরাং রাষ্ট্রের আবির্ভাব শ্রেণী বিরোধকে সংযত করার প্রয়োজনে। প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল ক্রীতদাসের দমনের জন্য দাস-মালিকদের রাষ্ট্র, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার জন্য অভিজাতদের রাষ্ট্র এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার। যেহেতু এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তি সেই জন্য এর সমগ্র বিকাশ চলছে অবিরাম বিরোধের মধ্যে। একজনের পক্ষে যা আশীর্বাদ তাই অপরের পক্ষে অনিবার্যভাবে অভিশাপ। মহান শিক্ষক এঙ্গেলস আমাদের আরও শিখিয়েছেন, শ্রেণী সংঘাতকে প্রশমিত করার জন্য শৃঙ্খলার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখাই হচ্ছে এই শক্তির উদ্দেশ্য। এই রাষ্ট্রশক্তি সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েও নিজেকে সমাজের উর্ধ্বে স্থাপন করে এবং ক্রমশঃ সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। সভ্যতা সম্পর্কে মর্গান বলেছেন—'সভ্যতার উদ্ভবের সময় থেকে সম্পত্তির অতিবৃদ্ধি এত বিপুল, এর রূপগুলি এত বিচিত্র ধরণের, এর ব্যবহার এতই প্রসারশীল এবং মালিকদের স্বার্থে এর পরিচালনা এতখানি বুদ্ধিদীপ্ত যে, জনগণের পক্ষে এটা হয়ে উঠেছে এক অবাধ্য শক্তি। মানবচিত্ত তার নিজ সৃষ্টির সামনে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাহলেও এমন সময় আসবে যখন মানুষের বুদ্ধি এই সম্পত্তির উপর আধিপত্য করার পর্যায়ে উঠবে।'

উৎপাদনের জন্য সমাজে যেসব সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার সব কিছু নিয়েই সমাজের আর্থিক কাঠামো। এই আর্থিক কাঠামোর উপরই গড়ে ওঠে সেই সমাজের উপরিসৌধ—শিক্ষা-সংস্কৃতি, আইন-কানুন, সরকার, রাজনীতি, ধর্ম, শিল্প-সাহিত্য দর্শন। এঙ্গেলস বলেছেন 'আর্থিক ব্যবস্থাটা হচ্ছে ভিত্তি, এই ভিত্তির উপর যে উপরিসৌধ গড়ে ওঠে তার প্রভাব অবিরাম কাজ করতে থাকে। এরা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে। এদের প্রভাব আবার গিয়ে পড়ে সমাজের আর্থিক ভিতের উপর। আর্থিক ভিত সব কিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার সেগুলিও আর্থিক ভিতের উপর কাজ করে।' জমিদার আর ভূমিদাস নিয়ে সামন্ত প্রথা, তার নিজস্ব উপরিসৌধ ছিল—সামন্ত প্রথাকে সাহায্য করে এমন রাজনৈতিক আদর্শ, আইনকানুন ইত্যাদি। পুঁজিবাদী সমাজে তার ভিত অনুসারে উপরিসৌধ গড়ে ওঠে। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের পরে সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার নতুন অর্থনৈতিক ভিতের উপর নতুন উপরিসৌধ বা নতুন শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য গড়ে ওঠে। সুতরাং রাজনীতি নিরপেক্ষ শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য হতে পারে না।

বৃটিশ ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা অর্পনের পর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি জাতীয়করণের পরিবর্তে অক্ষতই রইল। পরিকল্পনাগুলির জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যের উপর দেশ নির্ভরশীল হলো এবং দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণী দেশকে উন্মুক্ত করেছিল বিদেশী শোষকদের নিকট। বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের সংকট। কিন্তু ভারতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর নিজ স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে দেশে ধনতন্ত্র গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মাশুল আজ ভারতীয় জনগণকে দিতে হচ্ছে। সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদের পরিবর্তে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করা হলো। ফলে স্বাধীনতার তিরিশ বছরে জমি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অপর দিকে ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষির সঙ্গে যুক্ত কোটি কোটি মানুষের অবস্থা আজ দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। ভারতীয় জনগণের শতকরা ৮০ ভাগ দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বাস করছে। এবং শতকরা ৭০ ভাগ আজও নিরক্ষর। গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রী [এবং ইদানিং সমাজতান্ত্রিক (?)] ভারতের জনসাধারণের

জীবনের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সংকটের ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এঙ্গেলস্ বলেছেন, 'বুর্জোয়াজী যেহেতু শ্রমিকের ততটুকুই জীবনধারণের স্বীকৃতি দেয় যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন, সুতরাং আশ্চর্য হবার কিছু নয় যে তারা শ্রমিককে ততটুকু শিক্ষার সুযোগ দেয় যতটুকু তাদের (বুর্জোয়াদের) নিজের স্বার্থে প্রয়োজন।' ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে পি সি মহলানবীশ বলেছেন, "এক কথায় বলা যায় ধনী ব্যক্তিরাই তাদের ছেলেমেয়েদের সেই ধরণের শিক্ষা দিতে পারছে যাতে করে সরকারের মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী পদগুলিকে তারা অধিকার করতে পরে।" ১৯৬৬ সালে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, 'ধনী এবং দরিদ্র, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে বিরাট সামাজিক ব্যবধান রয়েছে এবং তা বিস্তৃত হচ্ছে...শিক্ষা নিজেই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং শ্রেণীবিভেদকে বাড়িয়ে তুলছে।' ১৯৭৬ সালে ২৭শে ও ২৮শে মার্চ মহারাষ্ট্রে পুনে শহরে এ্যাকাডেমী ও পলিটিকাল এন্ড সোস্যাল সায়েন্সের উদ্যোগে সাধারণভাবে শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় জে পি নায়েক বলেন, 'শিক্ষা ব্যবস্থা একটি উপ-ব্যবস্থা (Sub-System) —অন্যান্য সামাজিক উপব্যবস্থার অন্যতম। যেহেতু সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া কলাপ রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা অন্যতম উপব্যবস্থা হিসাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ হতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা যে সামাজিক উপ-গোষ্ঠীর দখলে থাকে তারা তাদের বিশেষ সুবিধা সুযোগকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এমনই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ প্রচার করা হয় যা সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় সহায়ক হয়।'

সুতরাং একটি কিশোরও বুঝতে পারে ন্যূনতম শিক্ষা সংস্কারের দাবী, শিক্ষান্তে চাকুরীর দাবী, পৌর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রত্যেকটি শ্লোগান এবং যে কোন অন্যায় বা নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি প্রতিবাদ বা বক্তব্যই রাষ্ট্র ও সরকারের কর্মনীতির সাথে অনিবার্য-ভাবে জড়িত। স্বভাবতই একটি রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করে। এই বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে 'অ-রাজ-নৈতিক শিক্ষা' এবং 'ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরাপ-সারণ'-এর কথা বলা নিছক ভন্ডামী। এই ধরণের বিভ্রান্তি-মূলক শ্লোগান ও অভিপ্রায়ের পিছনে রাজনীতি আছে—। সে রাজনীতি হচ্ছে (ক) বুর্জোয়া জমিদারদের আর্থিক ভিতকে অক্ষত রাখা (খ) উপরিসৌধের এই আর্থিক ভিতের উপর আঘাত না করা (গ) শ্রেণী-বিরোধকে সংযত করতে সাহায্য করা (ঘ) পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রমকে অবাধে লুণ্ঠন করতে সাহায্য করা এবং (ঙ) শোষিত-নিপীড়িত শ্রেণীকে দমন করার যন্ত্রকে অক্ষত রাখা। সুতরাং অরাজনীতির মুখোশের আড়ালে যারা বলে তাদের সংগঠন, 'For the student, of the student, by the student' প্রগতিশীল ছাত্ররা অবশ্যই বলতে পারে ঐ সংগঠন For the ruling class, of the ruling class, by the ruling class.'

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বুর্জোয়া, সামন্ত, পেটি-বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব দল গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। প্রত্যেক শ্রেণীরই মূল লক্ষ্য সমাজে তার শ্রেণীর স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখা অথবা শ্রেণী স্বার্থে রাষ্ট্র-যন্ত্রকে অধিকার করা। ভারতীয় প্রগতিশীল শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ছাত্রসমাজ বিশেষ কোন দলীয় রাজনীতির প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করেও একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতি অবশ্যই আস্থা স্থাপন করতে পারে। যে শ্রেণী সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত ও সবচেয়ে বিপ্লবী তা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ। সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রামগুলিকে যদি কোন বিশেষ দল ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অগ্রসর করে নিয়ে যায় এবং নেতৃত্ব দেয় তাহলে নিশ্চয়ই সেই দলকে সমর্থন করাটা নির্বুদ্ধিতা নয়। বর্তমানে অরাজনীতির ফেরিওয়ালারা ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করছে, ভারতবর্ষের কোন দলই জনগণের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কোন দলের একটি সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল নেই। এই বক্তব্য থেকে বলা যায় কি (ক) জয়প্রকাশ নারায়ণের দলহীন গণতন্ত্রের তত্ত্বকে সমর্থন করা হচ্ছে। (খ) 'সব ভুল আমরাই সঠিক' পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতি মানসিকতা দৃঢ় করা হচ্ছে (গ) শ্রেণী সংগ্রাম বা শ্রেণী চেতনার দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করতে সাহায্য করা হচ্ছে। কোন একটি বিশেষ দলের রণনীতি ও রণকৌশল জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী সেটা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় এবং যদি শুধু বলা হয় 'দলীয় রাজনীতি নয়', 'রাজনীতি পরিত্যাগ করো' এই বক্তব্যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত না হলেও ছাত্র সমাজের কাছ থেকে ক্ষয়িষ্ণু ধনিক-জমিদারী সমাজ ব্যবস্থার দুষ্ট ক্ষত গোপন করার প্রতি-ক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের প্রয়াস অবশ্যই সার্থকতা লাভ করতে পারে। যেটা কিনা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রসমাজের চিন্তার পরিপন্থী।

১৯৬৭ সালে মধ্যবিত্ত পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবীয়ানা থেকে নক্সাল মতবাদের উৎস। আজ এক দশকে এ মতবাদ ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যে ভুলগুলি (?) সম্পর্কে বিপ্লবী ছাত্র জনগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তা হচ্ছে. (ক) শ্রমিকশ্রেণী প্রধান বিপ্লবী নয় সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিরও প্রয়োজন নেই; (খ) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রধান বিপ্লবী অংশ কৃষক সমাজ; (গ) শহরের বুদ্ধিজীবি গ্রামে গিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করবে; (ঘ) গণসংগ্রাম পরিত্যাগ করে গ্রামে মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলা এবং শ্রেণী শত্রু বা এই মতবাদের বিরোধীদের খতম করা; (ঙ) এবার স্কুল কলেজ ছেড়ে দাও—বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড় (দেশব্রতী ৫ই মার্চ '৭০) সুতরাং বুর্জোয়া 'শিক্ষা-সংস্কৃতি' ধ্বংস করো; (চ) চীনের পথ আমাদের পথ,

চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান ইত্যাদি।

ইতিহাসে যে মতবাদগুলির সাথে নক্সাল মতবাদের সাদৃশ্য আছে তা হল, ব্ল্যাঙ্কিবাদ (ফরাসী দেশে): বিপ্লবী পরিস্থিতি বিচার না করে অল্প কয়েকজনের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বিপ্লব সমাধান করা, অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণীর উপর নির্ভর না করে অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবির উপর নির্ভর করে রাতারাতি বিপ্লব সংগঠিত করা, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি গড়ে না তোলাই হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কিবাদের মূলকথা। এঙ্গেলসের কথায়, "ব্ল্যাঙ্কিবাদ হচ্ছে অল্প কয়েকজনের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করার আজগুবি ধারণা।" নারদিজম (রুশ দেশে): বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে অগ্রগামী শ্রেণী মনে করত না। বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের পরিচালনায় কৃষক সমাজই ছিল প্রধান বিপ্লবী শক্তি। 'জনগণের বন্ধুরা কি ধরণের' এই বইয়ে লেনিন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার সন্ত্রাসবাদী পথের তীব্র সমালোচনা করেন এবং এই বইয়ে তিনি প্রথম ঘোষণা করেন, রুশ শ্রমিকশ্রেণীই কৃষক সমাজের সাথে মৈত্রীবন্ধ হয়ে জারের শাসনকে উচ্ছেদ করবে। পরবর্তীকালে রুশ দেশে নারদনিকদের উত্তরাধিকারী সোসালিস্ট রেভলুশনারিরা রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রায় একই পদ্ধতি গ্রহণ করে। গণসংগ্রামের পরিবর্তে ব্যক্তিগত মহারথীদের সংগ্রামে স্থান দেওয়া আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর বলে লেনিন তীব্র সমালোচনা করেন।

নক্সালপন্থীরা সমাজের শ্রেণী দ্বন্দ্বগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে যান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। সুতরাং রণনীতি ও রণকৌশলও যান্ত্রিকতা মুক্ত হতে পারে না। ভাবপ্রবন কল্পনাবিলাসী পেটিবুর্জোয়া চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে লেনিন বিপ্লবীদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণই হচ্ছে মার্কসবাদের প্রাণ। নক্সালমতবাদ সমর্থিত ছাত্রদের একটি অংশ অতীত ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে বলে মনে হয় না। পুরান অবস্তাব শ্লোগানগুলি 'অরাজনীতি', 'নির্দলীয়', 'নিরপেক্ষ' ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেই তারা ছাত্রদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে। মেডিক্যাল কলেজগুলি, প্রেসিডেন্সী কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ, শিবপুর বি-ই কলেজ, স্কটিশচার্চ কলেজে প্রধানতঃ উচ্চমধ্যবিত্ত পেটিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে আগত ছাত্রদের প্রাধান্য থাকাই স্বাভাবিক। এবং এই কলেজগুলির ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে অতীত নক্সাল ও ইদানিং 'অরাজনীতি' মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রকাশ্যে অরাজনীতি ও অপ্রকাশ্যে নক্সাল রাজনীতির এক অদ্ভুত অপূর্ব সংমিশ্রণ। নতুন জারে পুরান ঘি। লেনিন বলেছেন, "সকল মতধারার পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীই বুর্জোয়া প্রভাব দিয়ে শ্রমিকদের অধঃপতিত করতে চান—মার্ক্সবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন! 'অদলীয়' এই নির্বোধ শব্দটি শিক্ষায় ও চিন্তায় অক্ষম মানুষকে মোহগ্রস্ত করতে পারে, তাই এই অর্বাচীনদের একটি লাগসই ও পছন্দসই শব্দ!" (সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে, ১৭৫ পৃঃ)।

যে সমাজে উৎপাদনের উপকরণগুলি ব্যক্তি মালিকানায় থাকে সে সমাজে শোষক ও শোষিতের মধ্যে অনিবার্যভাবে বিরোধও থাকে। মালিকের মুনাফার সৌধ রচনার উগ্র আকাঙ্ক্ষা ও সর্বহারার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মধ্যে চলে অবিরাম সংগ্রাম। রাষ্ট্রের জন্মের প্রথম লগ্ন থেকে আজ অবধি এই সংগ্রাম বিভিন্ন গতিধারায় অগ্রসর হয়ে আসছে এবং দুটি দর্শনের ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষও বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি দর্শন মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থকেই সংরক্ষিত করছে এবং অপরটি অর্থাৎ সমাজের নব্বই ভাগ মানুষের স্বার্থেই অগ্রসর হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন উৎপীড়কের কদর্য চেহারা তাদের শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির অবগুণ্ঠনে ঢেকে রাখতে নিরলস ব্যর্থ প্রচেষ্টার অন্ত থাকে না। তাই দেশে দেশে যুগে যুগে উৎপীড়িতের সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। আজও এ সংগ্রাম অবিরাম গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রাম ও প্রগতির সপক্ষে সংগ্রামে ছাত্র-যুব সমাজের অবশ্যই একটি ইতিবাচক ভূমিকা থাকে—ছাত্ররা হয় বিপ্লবের বাণীবাহক, এবং যুবকেরা থাকে সমস্ত সংগ্রামের পুরোভাগে। ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজ আগামী দিনে সংগ্রামের নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে ইতিহাস নির্ধারিত ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে আরও অগ্রসর হবে —এই হচ্ছে জনগণের আশা।

খেলাধূলায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি কেন? / রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

খেলাধূলা নিয়ে এর আগে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। আমরা সকলেই জানি খেলাধূলায় ভারত বেশ পিছিয়ে পড়েছে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখে কি ভাবে খেলাধূলার উন্নতি করা যায় এ বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী দিক থেকে চিন্তা করা হচ্ছে। গত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতের কপালে জুটেছে মাত্র একটি ব্রোঞ্জ মেডেল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র ২ জন তাদের জাতীয় রেকর্ডের উন্নতি করেছে। ৮ জন কুস্তিগীরের মধ্যে ২ জন নিজ নিজ বিভাগে ৪র্থ স্থান পেয়েছে। ২৩ জন ভারোত্তোলন প্রতিযোগীর মধ্যে ভারতের অনিল মণ্ডল দ্বাদশ স্থান লাভ করেছে। ষাট কোটি লোকের দেশ ভারত তেহরাণে অনুষ্ঠিত সপ্তম এশিয়ান গেমসে সাকুল্যে পদক পেয়েছে ২৮টি। এই সামগ্রিক ফলাফল মোটেই সম্মানজনক নয়। জাপানের মত আয়তনে ক্ষুদ্র দেশ পেয়েছে ৭৫টি সোনা সমেত ১৭৬টি পদক। স্বভাবতই প্রশ্ন হচ্ছে এই ষাট কোটি লোকের দেশ কেন খেলাধূলায় পিছিয়ে যাচ্ছে?

জনসাধারণের মনে প্রথমেই এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলির প্রতিযোগীদের স্বাস্থ্য আমাদের দেশের প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেক উচ্চ মানের। তাহলে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কি ধরণের দেহের পটুতার প্রয়োজন। দেহের পটুতা ও শারীরিক যোগ্যতা নিরূপণে যা সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় তাদের মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে—১। শরীর পরিচালন করবার সময় প্রতি মিনিটে সর্বাপেক্ষা বাতাস নেবার ক্ষমতা

২। ফুসফুস থেকে রক্তে অক্সিজেন দেবার এবং রক্ত থেকে ফুসফুসে কার্বনডাইঅক্সাইড দেবার ক্ষমতা

৩। রক্তের হেমোগ্লোবিনের অংশ ও তার পরিমাপ

৪। হৃৎপিণ্ডে প্রতি বিটে বেশী পরিমাণ রক্ত পাঠানোর ক্ষমতা

৫। হৃৎপিণ্ডের প্রতি মিনিটের বিটের সংখ্যা

সমস্ত বিষয়েই ভারতের ক্রীড়াবিদের ক্ষমতা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়াবিদের ক্ষমতার চেয়ে কম। কেবলমাত্র বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়াবিদ ও ভারতের ক্রীড়াবিদদের মধ্যে হৃৎপিণ্ডে বিটের সর্বাপেক্ষা সংখ্যা মোটামুটি এক। শারীরিক যোগ্যতায় এই দেশগত পার্থক্য থাকলে প্রশ্ন উঠবে—সত্যই কি অধ্যবসায় ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়াবিদদের সমকক্ষ হতে পারবে? এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত হচ্ছে যে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা, পুষ্টিকর খাদ্য, প্রশিক্ষণ ও খেলাধূলার নিয়মিত মূল্যায়ণের মাধমে এই যোগ্যতা অর্জন করা মোটেই অসম্ভব নয়।

তাহলে আমাদের দেশের খেলাধূলার আসল চিত্রটি কি—এটা ভেবে দেখা দরকার। খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে এটা বলা ছাড়া উপায় নেই যে এখানে খেলাধূলায় নজর দেওয়া হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শহরে। কিন্তু লক্ষ-লক্ষ ছেলে যেখানে গ্রামে বাস করছে—শারীরিক পটুতা থাকলেও তাদের সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কোথায়? গ্রামের সম্ভাবনাপূর্ণ ছেলেদের কথা বলতে গেলে মনে পড়ে মেদিনীপুরের কার্তিক পোলই-এর কথা। কার্তিক পোলই-এর বাবা দুলালবাবু সামান্য একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। তার প্রবল ইচ্ছা ছেলের খেলাধূলায় সব রকম সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা করে দেওয়া—কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন রকম আর্থিক সামর্থ তার নেই। সাধারণ একটি সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করাই তার পক্ষে অসম্ভব। তার বাড়ীতে ঢুকতে গেলে কুটীরের মত একটি ছোট আস্তানায় ঢুকতে হবে। ছেলেটি পেয়েছে অনেক মেডেল যা দিয়ে একটি ছোট মেডেলের দোকান করা যাবে —কিন্তু কোথায় তার সুযোগ-সুবিধা? প্রাণ ধারণ করাই তার কাছে একটি সমস্যা।

এ রকম উদাহরণ অনেক আছে। আদিবাসী ছেলেদের মধ্যেও খেলাধূলায় যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ঝাড়গ্রামের তরতাজা আদিবাসী তরুণ রবীন্দ্রনাথ সরেন ব্লকের প্রতিযোগীদের মধ্যে উচ্চ লম্ফনে প্রায় ৬ ফুট লাফিয়ে শুধু যে প্রথমই হয়েছে তা না মহকুমায় নজীর স্থাপন করেছে। দীর্ঘ লম্ফনে ২০ ফুটের বেশি লাফিয়ে হয় প্রথম ও ট্রিপিল জাম্পেও ৪৩ ফুট অতিক্রম করে প্রথম স্থান অধিকার করে। রবীন পর পর দু বছর শুধু জেলা স্কুলের মধ্যে সেরা প্রতিযোগী হিসেবেই চিহ্নিত হয়নি প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ উন্নতি করার ব্যাপারে তার বাধা কোথায়? বলা যেতে পারে আর্থিক অসচ্ছলতা ও সুযোগ-সুবিধার অভাব। আমাদের সুযোগ-সুবিধার এমনই অভাব যে যদিও লক্ষ্য করে দেখা গেছে দৈহিক পটুতার ক্ষেত্রে যাঁরা আদিবাসী বংশোদ্ভূত তাঁদের মধ্যে কয়েকটি স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ মেলে তবুও এ সব নিয়ে সত্যিকার যত্নবান সে রকম কোন গবেষণা করা বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ঠিক মত বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পেলে আদিবাসী ক্রীড়াবিদরা ক্রমে ক্রমে প্রথমের সারিতে গিয়ে যে পৌঁছতে পারেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কথা বলা এখানে হয় ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে কার্তিক পোলই সর্বভারতীয় ২০ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। এই প্রতি-যোগিতায় ভারতের সকল রাজ্যই যোগদান করে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে আমদের দেশে খেলোয়াড়দের কোন অভাব নেই। অভাব কেবল প্রতিভা অন্বেষণ করার প্রচেষ্টার আর খেলাধূলার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার। তাই খেলাধূলার উন্নতি করতে গেলে প্রথম দরকার প্রতি গ্রামে খেলাধূলার ব্যবস্থা করা। এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার যাতে গ্রামের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে খেলার মাঠে আসবে এবং খেলাধূলায় যোগদান করবে। এইজন্য গ্রামীণ খেলাধূলার প্রসার করতে হবে। তাতে প্রথম প্রতিবন্ধক হচ্ছে খেলাধূলার মাঠের অভাব। যথেষ্ট সংখ্যক খেলাধূলার মাঠ কিভাবে সৃষ্টি করা যায় তার চিন্তা করতে হবে।

এই সঙ্গে দরকার প্রশিক্ষণ। কি ভাবে ছেলেদের বিভিন্ন খেলাধূলায় পারদর্শী করা যায় তার চিন্তা করতে হবে ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণের পর মাঝে মাঝে মূল্যায়ণের প্রয়োজন। এর ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সাধারণভাবে খেলাধূলা কিভাবে আকৃষ্ট করে দেখতে গেলে আমরা দেখবো কিছু সংখ্যক যুবক-যুবতী খেলাধূলাকে জীবনের সব মনে করে। আবার কেউ কেউ খেলাধূলা থেকে উৎসাহ ও আনন্দ পায় আবার কেউ কেউ কেবলমাত্র সময় কাটাবার জন্য খেলাধূলা করে। যে যে-ভাবেই খেলাধূলা করুক না কেন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে দেশের যুবক-যুবতীর বহু সংখ্যককে খেলাধূলায় অংশ-গ্রহণ করানো এবং এর জন্য গ্রামীণ খেলাধূলার ব্যাপক উন্নতি করা।

আগেই বলা হয়েছে খেলাধূলার উন্নতির পথে প্রথম বাধা খেলার মাঠের অভাব। ভারত সরকারের একটি প্রকল্প আছে যাতে রাজ্য সরকার জমি ও ৫০,০০০ টাকা দিলে বাকী ৫০,০০০ টাকা ভারত সরকার দেবে যাতে সেখানে একটি খেলার মাঠ তৈরী করা যায়।

এই প্রকল্প কার্যকরী করা খুব কঠিন হয়ে উঠে। খুব সহজভাবে কি করে গ্রামে গ্রামে খেলার মাঠ তৈরী করা যাবে—সে বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। খেলাধূলার সাজ-সরঞ্জাম বেশী পরিমাণে সরবরাহ করা দরকার। যেমন গ্রামের ছেলেদের বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গতি এমনই যে তারা

(শেষাংশ ২৬৪ পৃষ্ঠায়)

বাম হতে : সুপ্রিয় বক্সী (মেদিনীপুর), রতন সেনগুপ্ত (মুর্শিদাবাদ), কার্নাইল সিং (কোচ), হেমন্ত ঘোষ (মুর্শিদাবাদ) ও কার্তিক পোলই (মেদিনীপুর)।

চিত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব / ১৯৭৮

রণজি স্টেডিয়ামে রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত জনসাধারণের একাংশ।
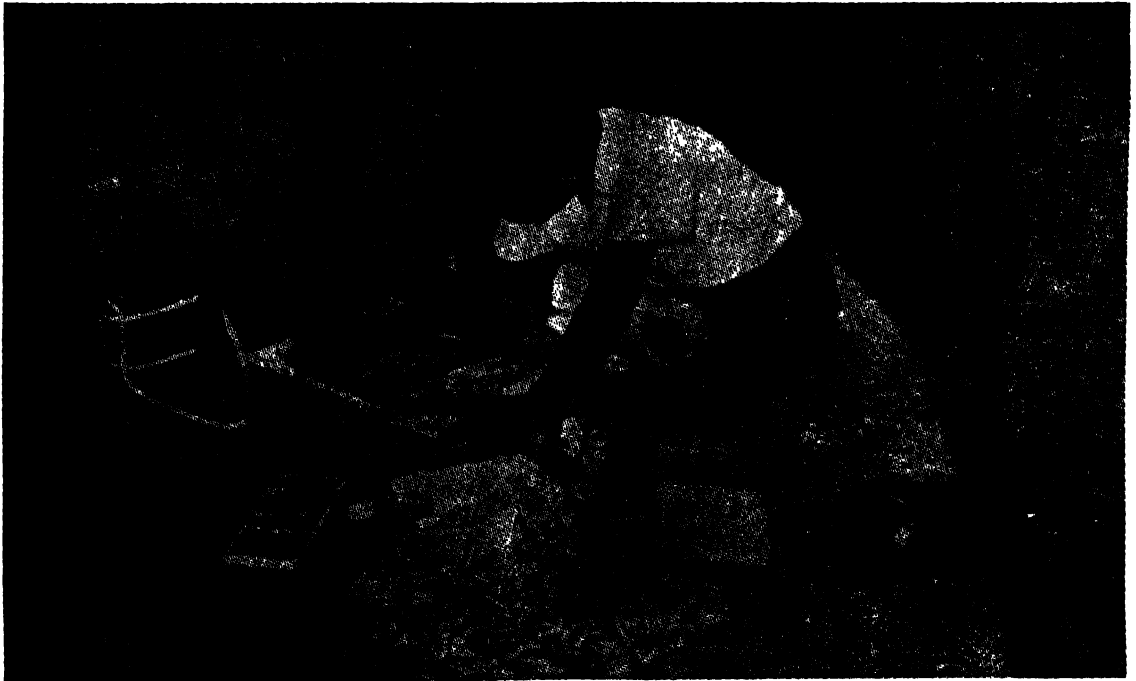
আপাতত বিরক্ত করা চলবে না। 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় মহাব্যস্ত এক শিশু চিত্রশিল্পী।
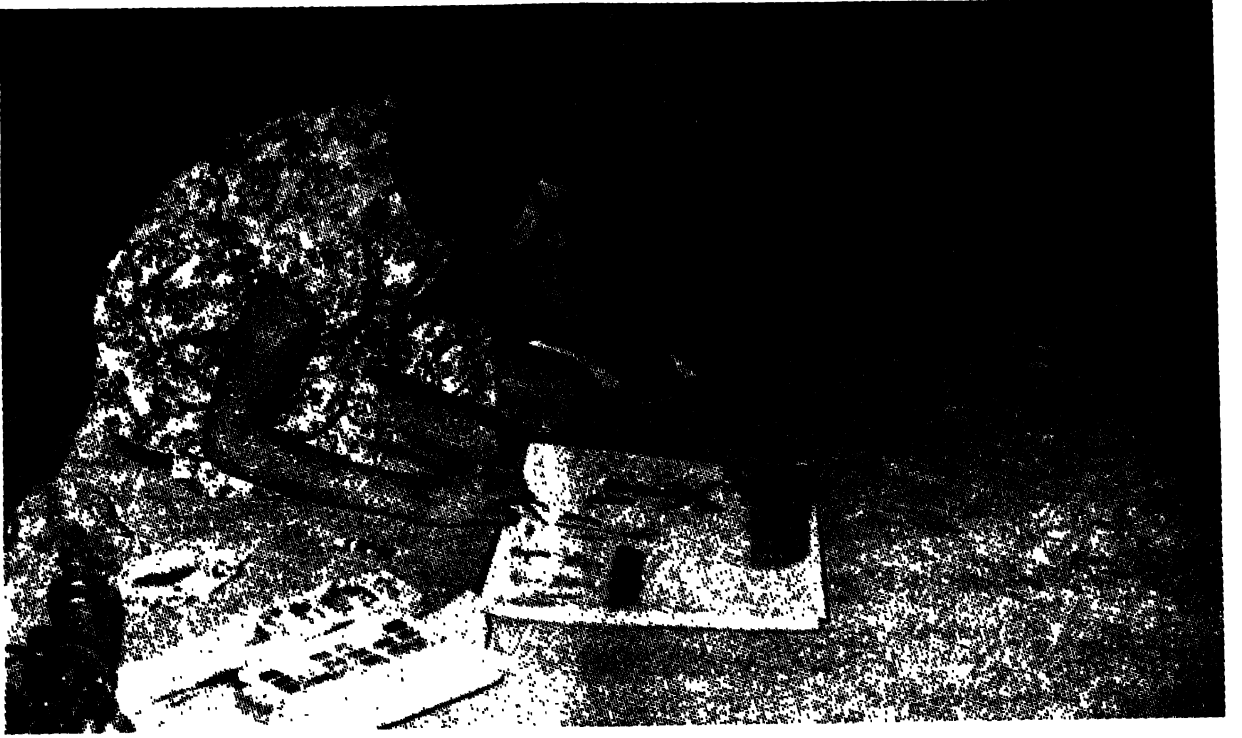
স্কেচ-এর পালা শেষ- এবার রঙের কাজ সারতে তুলি বোলানোর মুন্সীয়ানা শুরু। 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার আসরে ইনিও কম ব্যস্ত নন!

পুরস্কার জেতা কি চাট্টিখানি কথা! শ্রীকান্তি বিশ্বাস জনৈক শিশু প্রতিযোগীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন।

যুবকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাসের হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় শ্রীমান প্রতিযোগী হয়ত ভাবছেন—শেষ পর্যন্ত তাহলে পারলাম!

সোজাসুজি বলাই ভাল—কি বলেন? হোল তো? কি রকম টুক করে পুরস্কারটি বাগিয়ে নিলাম দেখলেন!

শুভ এবং ওর স্বপ্নের ঢেউ / প্রদোষ মিত্র

বিকেলের কাঁঠালীচাঁপা রঙের রোদ্দুরটাকে গায়ে মাখতে মাখতে হেঁটে যেত ও। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা যেন বন্ধু, সর্বক্ষণের সঙ্গী ওর। ক্লান্ত পায়ে বাড়ী ফিরত। ওর নাম—

ওসব পরে। তার আগে একটা উপস্থাপনা দরকার। কিছুটা বা ভূমিকাও। কারণ প্রত্যেকেরই একটা ভূমিকা আছে। যত নগণ্যই হোক না কেন—একটা সামান্য অংশও বিরাট হয়ে দেখা দেয় আকাশের মত। ওর ভূমিকা সামান্যই। সামান্য বললে ভুল হবে, কারো চোখে একেবারেই নগণ্য। বইয়ের পাতার একটা লাইনের মত। নগণ্য অথচ অসামান্য, কারণ সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে হয়ত ঐ একটি লাইন। ও-ও ঠিক তাই। সাধারণভাবে কিছুই না। অথচ অসামান্য ওর ভূমিকা। ওকে আমরা বুঝতে পারিনি। নাকি বুঝতে চাইনি? কি বলা ঠিক হবে? ওর কথার মধ্যে অসঙ্গতি, ওর ভাবনার মধ্যে তারতম্যটা—আমাদের চোখে ফুটে উঠেছিল বার বার অথচ ওর চিন্তা ভাবনার মধ্যেও যে একটা সুতোর মত যোগসূত্র ছিল ওর মনের সঙ্গে—একথাটাই আমরা বুঝতে চাইনি। আমরা হেসেছি, ব্যঙ্গ করেছি। নিজেকে বিরাট ভেবে আত্মপ্রতারণা করেছি। একবারও বলিনি, 'শুভ, তুই বিরাট, অসাধারণ।'

নামটা—শুভ। শুভ না হলেও ক্ষতি ছিল না। অন্য কোন নামে ডাকলেও ও বিরাট হয়েই থাকবে। কিন্তু ও ছিল আমাদের চোখে আর পাঁচজন সাধারণের মত। তাই আমাদের চোখে ওর ভাবনার নদীটাও ছিল অতি সাধারণ। অথচ ওই একদিন—

সেদিন কফি হাউসের কফির পেয়ালায়—না তুফান তুলছিলাম না। সাধারণ গল্প করছিলাম আমি, বিজন, শিশির, বনানী এবং আরও কয়েকজন। এমন সময় শুভ এল। আমাদের মধ্যে বসেই একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'তোরা বিশ্বাস করিস পৃথিবী রক্তশূন্যতায় ভুগছে?' ওসব ভাবার সময় নেই আমাদের, শুভরও নেই বলেই জানতাম। অথচ ও ভাবল এমন কিছু যা আমরা আশা করিনি।' তাই সেদিন উত্তর দিয়েছিলাম, 'তুই ট্রিটমেন্ট করছিস না কি?'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল—ভুল বললাম, একজন ছাড়া। সে বনানী। বাই ফোকাল লেনসের মধ্যে দিয়ে শুভর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ওর প্রশ্নটার অর্থ অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিল। ও ডাক দিল, 'এই শোন।'

শুভ এগিয়ে গেল ওর দিকে।

এই মুহূর্তে একটা ব্যবচ্ছেদ দরকার। বনানীর মনের ব্যবচ্ছেদ; ব্যবচ্ছেদের মোট ফল।

'এই শোন।' শুভকে ডাকল বনানী।

শুভ কাছে গেল, বলল, 'কিছু বলবে বনানী?'

'হ্যাঁ চলতো একটু ওদিকে।'

কোণের দিকে একটা টেবিলের দুটো চেয়ারে বসল মুখোমুখি।

'তুমি এরকম হয়ে যাচ্ছ কেন শুভ?'

'কি রকম?'

'ঠিক জানি না কি রকম তবুও তোমাকে যেন অনেক দূরের ব'লে মাঝে মাঝে মনে হয় আজকাল। তুমি কি কিছু ভাবছ?'

শুভর মুখের ওপর একটা মৃদু পরিবর্তনের আঁচড় পড়ল, চোখ দুটোতে যেন দিন শেষের বিষণ্নতা। একটু ভেবে ও বলল, 'বনানী, তুমি বলতে পারো পৃথিবী রক্তশূন্যতায় ভুগছে কি না?'

'জানি না।'

'আমিও জানি না। তবে কয়েকদিন ধরে আমি একটা স্বপ্ন দেখছি। আমি দেখতে পাই, আমি একটা রুক্ষ বালিয়াড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি; আমার সামনে সমুদ্রের ঢেউ এসে বালিয়াড়িকে গ্রাস করতে চাইছে। এক সময় দেখলাম, একটা বিশাল ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আরও দেখলাম ঢেউটা সমুদ্রের জলের নয়; হাজার হাজার মানুষের ঢেউ। আমি চীৎকার করে উঠলাম। চীৎকারের মধ্যে আমার ঘুমটা ভেঙে যায়।'

বনানী লক্ষ্য করে শুভ বাঁশপাতার মত কাঁপছে। ওর চোখের মণি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে সূর্যের মত। এই শুভকে বনানী চেনে না। একটা নিদারুণ আশঙ্কায়, একটা অনাস্বাদিত সুখে বনানীর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। শুভর জন্য সহানুভূতি জানাল মনে মনে।

'মাঝে মাঝে দুঃখ হয় নিজের জন্য।'

'কেন? কিসের দুঃখ তোমার?' বনানী প্রশ্ন করে।

'কিছু জানলাম না, কিছু করতে পারলাম না। মনে হচ্ছে শুধু শুধু এতগুলো বছর কেটে গেল। অথচ আমারও একটা দায়িত্ব ছিল পৃথিবীর কাছে। কিছু না

করতে পারার বেদনায় আমি জর্জরিত বনানী, তুমি বিশ্বাস করো।'

'আমি বিশ্বাস করি।' বনানী আরও পিপাসা নিয়ে তাকাল শুভর দিকে। ও দেখতে পাচ্ছে শুভর মৃতপ্রায় প্রেম, আনন্দ, সুখ বেদনাগুলো সজীব হচ্ছে। ও উপলব্ধি করল শুভর মধ্যে নতুন একটা শুভ জন্ম নিচ্ছে। শুভর মধ্যে মমত্ববোধ জেগে উঠছে মানুষের জন্য। এরকম শুভকেই তো চেয়েছিল বনানী।

তবুও বনানীর দুঃখ হল শুভ দূরে সরে যাচ্ছে বলে। অথচ বাধা দিল না, শুধু বলল, 'শুভ আমি কি তোমায় হারাচ্ছি?'

'হয়ত না, হয়ত বা আমাকে আরও বেশীকরে পাচ্ছ।' কথাটা দারুণভাবে আনন্দের লহরী তুলে বনানীর সুপ্ত মনের কোটরে গিয়ে লাগল। অসীম তৃপ্তিতে শুভকে বলল 'আমাকে ঢেউ দেখাবে?'

(এই ঢেউয়ের কথা শুভ আমাদেরও বলেছিল। আমরা বোঝবার চেষ্টা করিনি। চোরের মত নিজেদের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছি। বুঝতে না পেরেও নিজেদের ধরা দিই নি। অথচ সেদিন বনানী ধরা দিয়েছিল। আমি জানি বনানী কি বলেছিল।)

'আমাকে ঢেউ দেখাবে?'

শুভ ওর দিকে তাকাল একটা মোমবাতির মত নরম নিয়ে। তারপর বনানীকে বলল, 'বনানী, আমাকে তোমার সবকিছু দাও। তোমার প্রেম, ভালবাসা, সান্ত্বনা, প্রেরণা সব—সবকিছু।'

বনানী দুঃখিত হ'য়ে বলল, 'এখনও সন্দেহ?'

শুভর মনে হল ও পাহাড় ভাঙছে, সেই ক্লান্তি নিয়ে উত্তর দিল, 'না সন্দেহ নয়। আসলে তুমি জানো না তুমি কি চাও, আমিও জানি না আমি কি চাই। আমরা কেউই জানি না, আমরা কি চাই। তাই বোধহয় এত অবিশ্বাস সন্দেহ আর হানাহানির মিছিল। আমরা প্রত্যেকে চলছি অথচ আমরা নিজেরাই জানি না আমাদের অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই। একটা সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে চলছি। চারিদিকে চোখের মণির মত নিকষ কালো অন্ধকার। এক কথায় আমরা বোধহয় মেরুদণ্ডহীন।' শুভ দম নিল। বনানী ওকে দেখছে। অনেক অনেক দূরে সরে যাচ্ছে শুভ। কোথায়? কত-দূরে? ওর চোখের সামনে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। শুভ ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। বনানী সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে যেন চীৎকার করে উঠল, 'শুভ তুমি কোথায়? কতদূরে?' শুভর কণ্ঠস্বর যেন অনেক অ-নে-ক দূর থেকে উত্তর দিল, 'আমি তোমাদের মাঝে বনানী, মানুষের মাঝে।'

এইভাবে শুভ নামের সাধারণ ছেলেটি অসাধারণ হতে শুরু করল আমাদের অজান্তে। আমরা ওকে সাধারণ বলেই চিনতাম। শুধুমাত্র বনানীর কাছেই ও ছিল অসাধারণ। বনানীর যেখানে শেষ, বলা যেতে পারে শুভর সেখান থেকে শুরু। সেই শুরু যে কি প্রচণ্ড, কি দারুণ তার গতি—আমরা বুঝতে পারি নি। ওর স্বপ্নের ঢেউ-ই ওকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল বিশাল কর্ম-যজ্ঞে। স্বার্থহীন কর্মযজ্ঞে। ও ছুটে বেড়াতে লাগল প্রচণ্ড শক্তিতে গ্রামে, গঞ্জে হাটে। তাই ও আরও সাধারণ হয়ে যেতে শুরু করল। শুরু হল, কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে ওর পরিক্রমণ। কি বলা যায়? পরিক্রমণ? না পরিভ্রমণ? যাই বলা হোক না কেন, একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই—ওর নরম কচি আমপাতার মত মনটাতে আঁচড় পড়ল মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য এবং লাঞ্ছনার। তবুও থেমে রইল না ও। দেখল, জানল, বুঝল।

এমন কিছু দেখল যা ওর তন্ত্রীতে নাড়া দেয়। এমন কিছু জানল যা ওর মনকে পীড়া দেয়। এমন কিছু বুঝল যার জন্য ওর বুকের মধ্যে প্রতিবাদ গর্জে ওঠে।

অথচ কতটুকু ক্ষমতা ওর? ও জানে একা একা যুদ্ধে জেতা যায় না। চাই আরও বড় আঘাত আরও বড় ঢেউ। ওর স্বপ্নের মত। মানুষ, মানুষ আর মানুষের ঢেউ। ও দেখতে পায় সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় সমস্ত পাপ, অন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে শুধুমাত্র পৃথিবীর আনন্দ, সুখ, আশাগুলো হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। এগিয়ে যাচ্ছে উজ্জ্বলতার ধ্রুবতারার দিকে হাসতে হাসতে।

এই ঢেউয়ের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে ও আরও হাজার হাজার শুভকে আহ্বান জানাল। নির্জন প্রান্তরে নতজানু হয়ে মানুষের জন্য ও সূর্যের কাছে চাইল—শক্তি, আকাশের কাছে চাইল—ধৈর্য, চাঁদের কাছে চাইল—স্বপ্ন। এবং সমুদ্রের কাছে চাইল—সম্মিলিত মানুষের প্রলয়ঙ্কর ঢেউ।

শুভকে আমরা হারালাম। ভুল বললাম। শুভকে আবার আমরা পেলাম আমাদের মধ্যে। অবশ্য জীবিত নয় মৃত। মাথার পেছনে বুলেট লাগানো অবস্থায়। ওটা ওর উপহার। মানুষের জন্য মমত্ববোধের ওর বখশিস্। কে যে এই বখশিস্ দিয়েছে তা আজও অজ্ঞাত। এটাই না কি ওর প্রাপ্য। কারণ? কারণ কিছুই নয়। ওর স্বপ্নটাকে থামাতে হবে তো? সেই যে হাজার হাজার মানুষের ঢেউ। যে ঢেউয়ের আঘাতে একটা পুরোন দিনের নোনাধরা দেয়াল ভেঙে চেতনার আলো ঢোকবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। তাই স্বপ্নটাকে ভেঙে গুড়িয়ে ফেলতে হবে না?

মনে আছে সেদিন আমরা সবাই কেঁদেছিলাম। একজন ছাড়া—সে বনানী। ও বোধহয় দুঃখ শোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। তাছাড়া ওর চোখের পাতা দুটো কেঁপে উঠল না কেন? দূরে দাঁড়িয়ে দু চোখ ভরে শুভকে দেখছিল, ওর অসাধারণ শুভ। হয়ত বা ভাবছিল—এরকম আরও কোটি কোটি শুভ হয়না কেন যারা সত্যিকারের ঢেউ তৈরী করবে—শুভর সেই স্বপ্নের ঢেউ। হয়ত বা ভাবছিল, শুভকে দেওয়া ওর প্রেম, ভালবাসা প্রেরণাগুলো কার দোকানে চলে গেল? কার দোকানে?

শুভ নামের সাধারণ একটা ছেলের গল্প এখানেই শেষ।

নাকি শুরু?

পুনশ্চঃ—দুর্জনেরা বলে শুভকে নাকি খুন করেছে আসলে—। না থাক্‌। আমরা কিন্তু বিশ্বাস করি—শুভ মারা যায়নি। তাছাড়া আমরাও কেন এরকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি, হাজার হাজার মানুষের মুখ নিয়ে একটা বিশাল ঢেউ আসছে...আসছে...আসছে...ঢেউয়ের পর ঢেউ...ঢেউয়ের পর ঢেউ...ঢেউয়ের পর......?

(২৫৮ পৃষ্ঠার পর)

ফুটবল, ভলিবল, খো খো খেলার সরঞ্জাম কিনতে পারে না। বিভিন্ন ব্লকে প্রত্যেক ক্লাবে যদি একটা করে ফুটবল কিনে দেওয়া যায় তা হলেও ছেলেদের যথেষ্ট উপকার হবে।

এ ছাড়া দরকার মোটামুটি একটি সুষম খাদ্য। খাদ্যের অভাব যেখানে সেখানে হয়ত পুষ্টিকর খাদ্যের কথা বললে হাসির উদ্রেক করবে—তবুও এ বিষয়ে কিছু ভাবা দরকার। গ্রামের দু-একটা ক্লাবে দেখেছি--তারা জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে হয়ত এক বস্তা ছোলা কিনেছে এবং সেই ছোলা প্রতিদিন ভিজিয়ে ছেলেদের দিয়েছে। আমাদের বাজে খরচের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ রকম কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। এ রকম না করলে কার্তিক পোলই বা রবীন্দ্রনাথ সরেনের মত প্রতিভাবান ছেলেরা শুধু পুষ্টির অভাবেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে। একথা ভাবলে শুধু অবাকই হতে হয় যে প্রতিদিন এক মুঠো ছোলা ও একটি কলার অভাবেই এই সব প্রতিভা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের দেশে গ্রামের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগের পক্ষেই এটি নির্মম সত্য। গ্রামের ক্রীড়াবিদরা অবশ্যই উন্নতি করতে চায়। এর জন্য তাদের যা উপকরণ দরকার তাও খুবই সামান্য। কিন্তু সেই ব্যবস্থা গ্রামে নেই।

তাই পিছিয়ে আমরা পড়ছি ঠিকই এবং তার জন্য দায়ী খেলার মাঠের অভাব, সাজ-সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত মূল্যায়ণের অভাব। সঙ্গে সঙ্গে আছে মোটামুটিভাবে সুষম খাদ্যের অভাব। এইগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে যদি হাজার হাজার গ্রামের ছেলেকে খেলায় অংশ গ্রহণ করানো যায় তবে নিশ্চিতই একদিন আমাদের দেশ বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলির সমকক্ষ হতে পারবে।

"আজ নিখিলের বেদনার্ত
পীড়িতের মাখি খুন
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন
প্রভাতের নবারুণ!"

—নজরুল
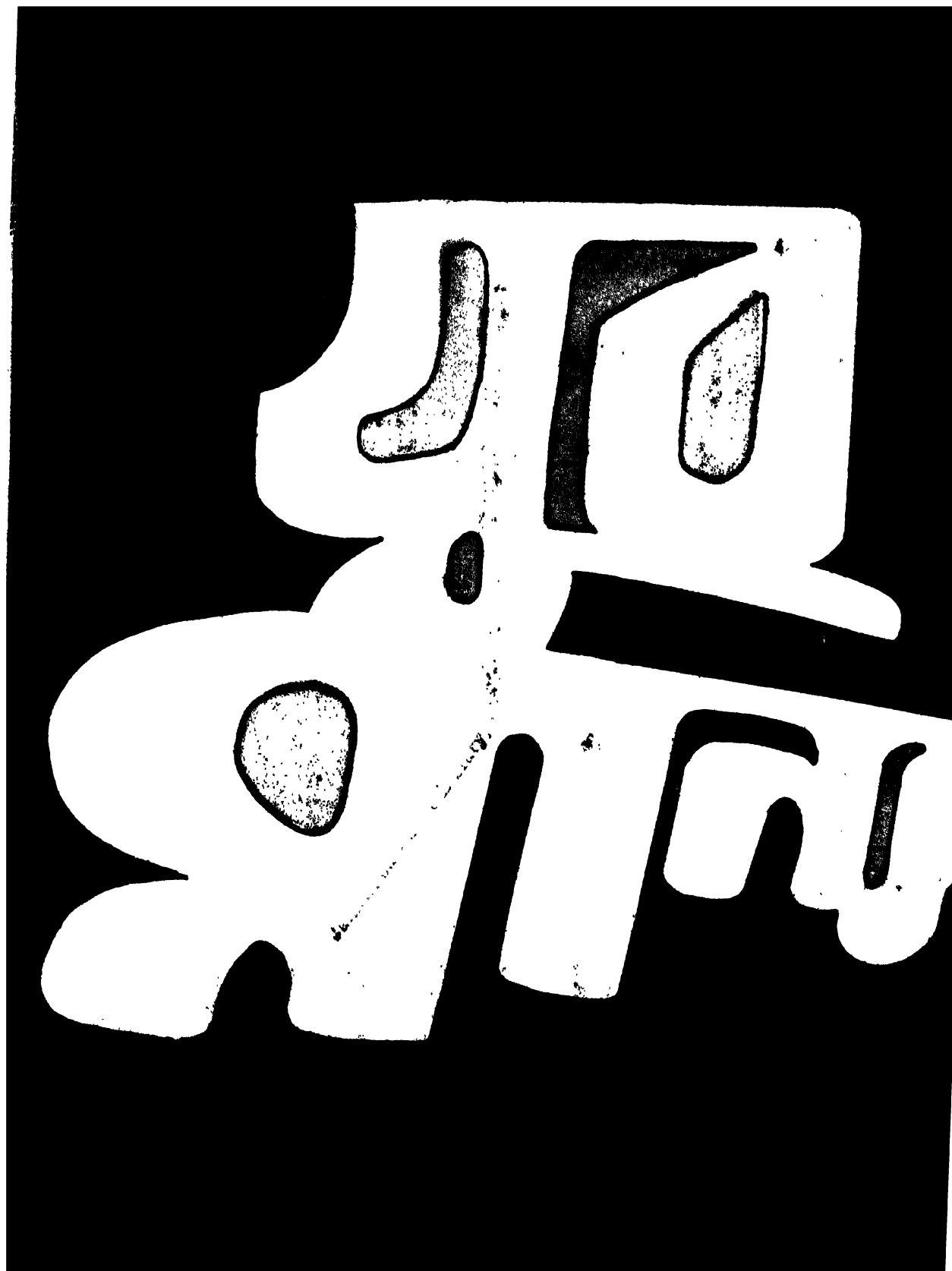
(সচিত্র মাসিক যুবদর্পণ)

অষ্টম সংখ্যা ।। আগস্ট ১৯৭৮

যুবকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ)
কলিকাতা-৭০০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাঁদ দে কর্তৃক তরুণ প্রেস, ১১ অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

সূচী

লেখা পাঠাতে হলে :

- ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিস্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
- সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।
- কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
- বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ২০০০ শব্দের বেশি হলে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকগণ তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

☐

নিজ এলাকায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা ও গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব থাকলে পাঠকবর্গের কাছে তার আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। এই প্রস্তাব বিশদ বিবরণসহ বিভাগীয় যুগ্ম-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, ৩২/১, বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

☐

গ্রামবাংলার চিন্তাশীল তরুণ লেখকগণ নিজ নিজ লেখা পাঠান। যুবমানসের সমালোচনা আহ্বান করি।

সম্পাদক : যুবমানস

সম্পাদকীয়

স্বাগত জানাই ভারতের ৩১তম স্বাধীনতা দিবসকে। প্রায় সোয়া দুই শত বৎসর পূর্বে এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের সকল আশা-ভরসাকে চূর্ণ করে দিয়ে, মীরমদন, মোহনলাল, সিরাজদ্দৌলা প্রমুখ বীর সন্তানদের জ্বলন্ত দেশ প্রেমকে ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়ে—ধনকুবের জগৎ শেঠ, রাজা রায় দুর্লভ, ইয়ারলতিফ, মীরজাফরের বিশ্বাস ঘাতকতার গুপ্ত পথে ধুরন্ধর বণিক ইংরাজ এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিল।

তার পরের প্রায় দুই শত বৎসরের ভারতের ইতিহাস আঁকা-বাঁকা পথে চলেছে। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এবং পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করার চমৎকার জনবহুল বাজার—ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ স্বীয় শাসন এবং তার ছায়াতলে বিবেকহীন শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য একটার পর একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করে চলেছিল। প্রলোভন, নিষ্পেষণ, জেল, লাঠি, গুলি থেকে শুরু করে এই দেশের মানুষের মধ্য থেকে তার সমর্থক শ্রেণী সৃষ্টি করে তার সাহায্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে অটুট রাখার চেষ্টা করেছিল। আর অন্যদিকে এই পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত হওয়ার জন্য দেশের অগণিত কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ছাত্র, যুব এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর এক অংশ বারে বারে সংগঠিত হয়েছে—সংগ্রাম করেছে, বিদ্রোহ করেছে। জানা-অজানা অসংখ্য বীর শহীদের রক্তে রাঙা পথে, শোষিত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত মানুষের গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্তকে সাক্ষী করে অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত মুক্ত হলো।

যে কোন জাতির আত্ম-বিকাশের জন্য, তার নিজস্ব সম্পদের সাহায্যে দেশের অগ্রগতি সাধন করা এবং দেশের মানুষের জীবন ধারণের মানকে উন্নত করার জন্য একান্ত ভাবে দরকার তার স্বাধীনতা। স্বাধীনতা আবশ্যক দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, চিন্তা, চেতনার স্তরকে উন্নত করতে। সেইজন্যই তো পৃথিবীর দেশে দেশে যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র থাবা থেকে দেশকে মুক্ত করতে অগণিত মানুষ জীবন দিয়েছে, রক্ত ঢেলেছে, অত্যাচার সহ্য করেছে এবং পরাধীনতার 'অন্ধকারের বৃন্ত থেকে' স্বাধীনতার 'ফুটন্ত সকাল'কে ছিনিয়ে এনেছে।

আজকের এই জাতীয়-দিবসে আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করব আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরীদের। সাথে সাথে স্মরণ করতে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা রক্ষা অথবা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করার জন্য যারা অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত হয়েছেন। 'ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান' গেয়ে গেছেন।

আজকের এই দিনে উল্লেখ করতে চাই—স্বাধীনতা কোন কল্পনা বিলাস নয়। এটা কোন বিমূর্ত বিষয় নয়। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির অপর নাম স্বাধীনতা এটা বললে বোধ করি স্বাধীনতা শব্দের অর্থকে বিকৃত করা হবে। স্বাধীনতা কথার সাথে আবশ্যিক ভাবে জড়িয়ে রয়েছে দারিদ্র্যের বন্ধন থেকে মুক্তির প্রশ্ন, জড়িয়ে রয়েছে মানুষ হিসাবে বসবাস করার সুযোগের প্রশ্ন। উপযুক্ত শিক্ষা সংস্কৃতির আলোকে জন জীবনকে আলোকিত করা, বেকারত্বের তীব্র দংশনের জ্বালা থেকে যুব সমাজকে মুক্তি দেওয়া এসবই স্বাধীনতা কথার সঙ্গে যুক্ত। অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতা নামক সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের ব্যবস্থা ছাড়া স্বাধীনতা কখনই পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না।

১৫ই আগস্ট তারিখে শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের স্মরণ করে আমাদের কর্তব্য শেষ করতে পারি না। আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে জীবনের শেষ

রক্ত বিন্দু দিয়ে রক্ষা করার একমাত্র সংকল্প ঘোষণার মধ্য দিয়েই আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি না। আজকে আমাদের আত্ম-সমীক্ষারও প্রয়োজন আছে।

কে না জানে এদেশে ইংরাজ শাসনকে দীর্ঘতর করার জন্য এদেশের মানুষের মধ্যে একটি স্তাবক শ্রেণী সৃষ্টি করার অন্যতম উদ্দেশ্যে কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে একটি স্থায়ী জমিদার শ্রেণী তৈরী করেছিলেন। দেশে কোটি কোটি রায়ত কৃষক যারা ছিলেন বস্তুতঃ জমির উপর তাদের কোন স্থিতিবান সত্ব ছিল না। জমিদার যে কোন সময় কৃষকের জমি নীলাম করে কেড়ে নিতে পারতেন। দেশের লক্ষ লক্ষ ভাগচাষীর ভবিষ্যত ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। আইনতঃ জমিদারী না থাকলেও স্বাধীনতা লাভের তিন দশক পরে আমরা কি বলতে পারি প্রাক্তন জমিদারদের সমস্ত জমি ন্যস্ত করে ভূমিহীন কৃষক কিংবা স্বল্প জমির মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে? জমিদার তন্ত্রকে কি প্রকৃত পক্ষে সমাজ থেকে বিদায় দেওয়া সম্ভব হয়েছে? এখনও দেশের চাষ যোগ্য জমির শতকরা চল্লিশ ভাগ গ্রামাঞ্চলের শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ উপরতলার মানুষের করতলগত। কৃষকের স্বার্থে তথা সমগ্র দেশের স্বার্থে কি আমূল ভূমি সংস্কার করে কৃষককে জমির মালিক করা গেছে? ক্রমবর্ধমান দিনমজুর—ক্ষেত-মজুরের জীবন যন্ত্রণা, তার জঠরের জ্বালা কমানো যায়নি বরং তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যোৎপাদন বেশি হওয়া সত্বেও দুর্ভিক্ষের করাল-গ্রাস থেকে আমরা কি দেশের পিছনে পড়া মানুষকে রক্ষা করতে পারছি? বিশ্ব যুদ্ধের ঔরসজাত মজুতদার মুনাফাখোরদের সর্বগ্রাসী লালসা থেকে আমরা কি ভারতীয় জন-গণকে রক্ষা করতে পারছি? কর্মক্ষম কর্মহীন যুবকের সংখ্যা হুহু করে বেড়ে চলেছে। তাদের সামনে পূর্ণ কর্ম সংস্থানের আমরা কি কোন বাস্তব কর্মসূচী হাজির করতে পেরেছি?

স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে যত ভারতীয় নিরক্ষতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন আজকে কি অধিক সংখ্যক ভারতীয়ের নিরক্ষতার অভিশাপ গোটা জাতীয় জীবনকে কলুষিত করছে না?

দেশে কলকারখানা অনেক বেড়েছে, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, রাস্তা ঘাট, রেললাইন অনেক হয়েছে, চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হয়েছে। দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে? ছাঁটাই, লে-অফ, লক আউটের আক্রমণ কতটুকু কমেছে? তার জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরীর কি কোন ব্যবস্থা হয়েছে? বস্তির ক্লেদাক্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে? কতটুকু চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ তার সামনে খোলা আছে? বোনাসসহ অন্যান্য ন্যায্য পাওনা সে কতটুকু পাচ্ছে?

ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের সামনে আমরা কি কোন আশার আলো রাখতে পেরেছি? জীবন যাত্রার মান উন্নতি করার কথা দূরে থাক দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতির দাপটে আমরা তা কতটুকু বজায় রাখতে পারছি?

খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি করা বিশেষ করে গ্রামীণ খেলা ধূলার প্রসার ঘটানোর কি কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা এ যাবৎ গৃহীত এবং অনুসৃত হয়েছে? খেলার জগত থেকে নৈরাজ্য ও অসততার দৌরাত্ম দিন দিন কমছে না বাড়ছে—এটা কি গভীর ভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে?

এ জাতীয় অনন্ত সমস্যার সুরাহার কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ আমাদের সামনে আছে কি? আজকে ভাবতে হবে আমাদের দেশ যে ঘুন ধরা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে—যেখানে বৃহৎ পুঁজিপতি, জমিদার এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির শোষণ ও প্রভাব বিদ্যমান—তার উপর দাঁড়িয়ে এই সমস্যাবলীর কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব কি না? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফরাসী, জাপান প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যাবে সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্বেও সাধারণ মানুষ বহুবিধ সংকটে জর্জরিত—বেকার যুবককে কর্মের জন্য হন্যে হয়ে ছুটতে হয়, আন্দোলন করতে হয়।

অপসংস্কৃতির প্রতাপ কত বেশি এবং জীবনের মূল্যবোধ সেখানে কত বিকৃত। পাশা পাশি বিশ্বের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নিজেদের দেশে কায়েম করেছেন—তারা এ জাতীয় সংকট থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তার মধ্যে কোন কোন দেশ আমাদের থেকে পরে স্বাধীনতা পাওয়া সত্বেও সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে এ অসাধ্য সাধন করেছে।

তাই বলছিলাম, শুধু অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করার ব্যবস্থা করলে ভুল হবে। এরই সাথে আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-সমালোচনার আলোকে লক্ষ্যকে স্থির রেখে চলার পথ ঠিক করে নিতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে স্বাধীনতা দিবস এই আবেদন নিয়েই উপস্থিত।

আর এরই সাথে আমাদের সহমর্মিতা এবং একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে সেই সকল স্বাধীনতা প্রেমী মানুষ এবং যোদ্ধাদের প্রতি যারা দেশে দেশে বিশেষ করে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যে রাজ্যে সাম্রাজ্যবাদের শিকল ছেঁড়ার জন্য দাঁতে দাঁত দিয়ে মরণজয়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই আন্তর্জাতিক সংহতির মধ্য দিয়ে আমরা সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাভূত করতে পারবো এবং আমাদের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে পারব।

সমাজ চেতনায় দৃপ্ত সুকান্ত / অমিত সরকার

সর্বহারা শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীতে বিস্ময়কর ছন্দ নৈপুণ্য ও ভাষা মাধুর্যের মাধ্যমে কাব্যকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে যিনি শোষিত-নির্যাতিত মানুষের মনের মণিকোঠায় নিজের স্থানকে অক্ষয় করে রেখে গেছেন তিনি হলেন কমিউনিস্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। বাংলা কাব্যে সমাজ চেতনার কাব্যধারায় সুকান্ত একটা 'উজ্জ্বল উপস্থিতি'।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী নিরপেক্ষ সাহিত্য, শ্রেণী উত্তীর্ণ প্রেম থাকতে পারে না। সবকিছু নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বচন, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির পেছনে কোন না কোন শ্রেণীর স্বার্থ থাকে। শোষণকে চিরস্থায়ী করবার পরিপূরক ভাবজগত গড়ে তোলবার জন্য জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আত্মমুখীনতায় অন্ধ, মেরুদন্ডহীন ও পৌরুষবর্জিত কবি-সাহিত্যিকদের মতো সুকান্ত প্রিয়া, ফুল, বিশ্বজনীন প্রেম ও কুমারী নারীর যৌবনের মধ্যে তাঁর কাব্যের সৌন্দর্যলোক খুঁজতে চেষ্টা করেননি। বরং 'লোভের মাথায় পদাঘাত' হেনে সৃজনশীল সাহিত্যের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অফুরন্ত উৎস খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনে জীবন যোগ করে তিনি তাঁর সৌন্দর্যবোধকে নিয়োজিত করেছিলেন শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষ ও বিপ্লবী সমাজকর্মীদের মহিমাস্ফুটনে। 'প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত' সুকান্ত তাদেরই কবি। একদিকে তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার কথা তিনি যেমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় তাঁর কাব্যে ব্যক্ত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি 'শাসক ও শোষকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে', 'আদিম হিংস্র মানবিকতার' একজন হিসাবে 'প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা' বাজিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের মশালকে তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীর একজন মৃত্যুভয়হীন সৈনিক হিসাবে—শোষিত মানুষের মধ্যে নিহিত বিপ্লবের বীজকে লালন করে তুলে জাতীয় মুক্তির মহান সংগ্রামে যোগ দিতে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি তাঁর কাব্যকে ব্যবহার করেছিলেন। অতীন্দ্রিয় দার্শনিকতাবাদের মোহ থেকে মুক্ত থেকে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন ছিল তাঁর কবিতা।

জনসাধারণের জীবন যেভাবে মানুষের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত ও রূপায়িত হয়, তাই শিল্পরূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। সুকান্তের কবিতা তাঁর মনে প্রতিফলিত ও রূপায়িত জনজীবনেরই প্রকাশ। বাংলা তথা ভারত তথা পৃথিবীর এক যুগসন্ধিক্ষণে সুকান্তের সাহিত্য জীবনের শুরু। তাঁর কবিতাগুলি ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকের মধ্যে লেখা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের

জন্ম: ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৩ মৃত্যু: ২৯শে বৈশাখ ১৩৫৪

পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বাধীনে সমাজতন্ত্রের বিপুল অগ্রগতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ, ১৯৪১ সাল থেকে জাপানী বোমারু বিমানের আক্রমণের আশঙ্কায় ভয়ার্ত মানুষের কলকাতা শহর ছেড়ে পলায়ন, ১৯৪২ সালের ঐতিহাসিক আগস্ট সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণীর বীরত্ব ও ইংরাজ সরকারের বর্বর অত্যাচারের ভয়াবহ রূপ, ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট মহাদুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত শিশু ও যন্ত্রণাকাতর মায়েদের বুক ফাটা কান্নার আওয়াজ ও লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ের পর বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের ঢেউ-এর পটভূমিকায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী মুক্তির দাবীতে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামকে দমন করবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রেরণের বিরুদ্ধে কলকাতার পথে পথে সংগ্রাম, ১৯৪৬ সালে আন্দামানে অগ্নিযুগের বন্দী যাঁরা ছিলেন তাঁদের মুক্তির দাবীতে সংগ্রাম, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে

শিল্পী ও কর্মীদের ধর্মঘট, সর্বভারতীয় ডাক ও তার ধর্মঘট, নৌ-সেনাবিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—মাত্র ষোলো বৎসর বয়সেই সুকান্তকে সংগ্রামের ময়দানে টেনে এনে তাঁর জীবন ও কবিমনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেই তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে শাণিত করে নিয়েছিলেন নিজের চেতনাকে। সমাজ ও শ্রেণী চেতনাই তাঁর কাব্যের আঙ্গিক ও বিষয়-বস্তুকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগামী শক্তির গর্ভে থেকেই কবি সুকান্তের জন্ম। ৪২-এর শেষে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসেই সুকান্তের কবিমন নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছিল। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে 'এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ'। 'প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত' তখন তারা ছিল শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে 'সবেগে সমুদ্যত'। সংগ্রামের জোয়ারের সাথে সুকান্তের কবিতা রচনা দানা বেঁধেছিল। ১৯৫৬ সালে কনস্টান্টিন ফেডিন জার্মান কবি ও নাট্য শিল্পী বের্টোল্ড ব্রেখ্‌ট স্মরণে এক নিবন্ধে বলেছেনঃ 'তিনি কখনোই শিল্পকে রাজনৈতিক চরিত্র দিতে ভয় পাননি; বরং রাজনীতিকে তিনি তাঁর শিল্পের স্বাভাবিক বিষয় হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। তিনি জানতেন, রাজনীতি ছাড়া শিল্প কখনোই সমাজ ও গণমানসের প্রতিফলন ঘটাতে পারে না।' এইভাবে আমরা দেখেছি শুধু লেখনী রঙ্-তুলি-ছেনী-বাটালী দিয়েই নয়,—লেখক শিল্পীরা সামরিক শিক্ষা নিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পেনের রণাঙ্গণে যুদ্ধ করতে ছুটেছেন। দীর্ঘ আড়াই বৎসর ধরে অপূর্ব বীরত্বের সাথে লড়াই-এর মধ্য দিয়ে কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্স, ফেলিসিয়া ব্রাউন, লোরকার-এর মত বীর লেখক শিল্পী সেই যুদ্ধে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। এইভাবে আমরা দেখেছি মার্কিন সহ বিশ্ব-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী গণশিল্পী পল রবসনকে এই ঘোষণা করতে—

"Every artist, every scientist must decide now where he stands ; he has no altenative. There is no standing above this conflict on Olympian heights, there are no impartial observers ...the artist must elect to fight for freedom or for slavery, I have my choice. I had no alternative.... not through blind faith or coercion, but through consciousness of course, I take my place with you, my beloved people of spain."
(Here I stand, P-60-61)

তাই রুশ বিপ্লবকে বাদ দিয়ে যেমন গোর্কীকে ভাবা যায় না তেমনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বাদ দিয়ে সুকান্তকেও ভাবা যায় না, যেতে পারে না।

Critical Realist কবিদের মতো সুকান্ত সমাজকে আংশিকভাবে দেখেননি। শুধুমাত্র সমাজের অপদার্থতা, সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতাই তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। উপরন্তু এইগুলির পাশাপাশি Socialist কবিদের মতো সমাজের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন শক্তির সংঘাতের ফলে যে অগ্রগতি সূচিত হচ্ছে, সেখানে আগামী দিনের বিকাশোন্মুখ শক্তি তাঁর সত্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল এবং তৎকালীন সামাজিক স্তরে ক্ষয়ে যাওয়া অসম্পূর্ণ অবক্ষয়ী সমাজের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন। তাই এই পৃথিবীর রূঢ় সত্যকে গ্রহণ করে তার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত স্ফুটনোন্মুখ সত্যের সঙ্গে কাব্যের সত্যের যোগসাধন তিনি করতে পেরেছিলেন।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজের প্রকৃত চরিত্র উদ্‌ঘাটনে ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে তার বিশ্লেষণে সুকান্তের কাব্য অনন্য। শোষণ ভিত্তিক সমাজে নিয়তই 'দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল' চলে। 'দেশে অন্ন নেইকো কারো' ও 'মৃত্যুরই কারবার' তিনি দেখেছিলেন। শোষিত মানুষের দুঃখ-কষ্ট হৃদয়ের উত্তাপের প্রতিটি ধারায় ও শিরা-উপশিরায় অনুভব করেই সুকান্ত লিখেছিলেনঃ—

"মজুরেরা দ্রুত খেটেই চলেছে—
খেটে খেটে হল হন্যে;
ধনদৌলত বাড়িয়ে তুলছে
মোটা প্রভুটির জন্যে।

তবুও ভাঁড়ার শূন্যই থাকে,
থাকে বাড়ন্ত ঘরে চাল,
বাচ্চা ছেলেরা উপবাস করে
এমনি ক'রেই কাটে কাল।"

(পৃথিবীর দিকে তাকাও)

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার এই নগ্ন বাস্তব চিত্র সুকান্তের জীবনদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মালিক ও শ্রমিক, ধনী ও দরিদ্রের সম্পর্ক সহজ ছড়ায় ও প্রতীকধর্মী কবিতায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেনঃ—

"বলতে পারো বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?

বলতে পারো ধনীর বাড়ি তৈরি যারা করছে,
কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে?

বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য?"

(পুরানো ধাঁধা)

সুকান্ত ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। তিনি তাঁর মেজবৌদিকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "...আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হব, আমি কি সেই ধরণের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়েও বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ কারবার—সব

জনতা নিয়েই।" কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করে সুকান্তের কাছে ভবিষ্যৎ হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। কমিউনিস্ট হিসাবে শ্রেণী সংগ্রামের আলোতেই তিনি দেখেছিলেন সমাজকে, কবিতার প্রাণকে। বুর্জোয়া শ্রেণী ছলে-বলে-কৌশলে যতই চেষ্টা করুক 'চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে চাপা থাকবে না' মেহনতী মানুষের 'দেহে' তাদের 'পদাঘাত'। তিনি আশা করেছিলেন শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'শহরে, গঞ্জে, গ্রামে—দিগন্ত থেকে দিগন্তে' শোষিত মানুষ জেগে উঠবে। মেহনতী মানুষের মধ্যে নিহিত অপরাজেয় শক্তির কথা 'দেশলাই কাঠি' ও 'সিগারেট', এই দুইটি প্রতীকধর্মী কবিতায় সুকান্ত অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সুকান্তের কাছে 'মৃত্যুর সমুদ্র' শেষ কথা ছিল না —'মুক্তির শ্যামল তীর' তাঁর চোখে স্পষ্টই প্রতীয়মান। তাঁর স্বপ্নই ছিল পৃথিবীব্যাপী সীমান্তহীন এক শোষণ-মুক্ত সমাজব্যবস্থা। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে 'পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী' হবেই এই আত্মবিশ্বাস ও সমাজচেতনা সুকান্তের কাব্যের প্রাণস্বরূপ। তাঁর কাব্য এই পরিবর্তনের সংগীতে মুখরিত। 'বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট' ভারতবর্ষে 'কমরেড লেনিন'কে মুক্তির বাণী বহন করে আনতে তিনি দেখেছিলেন। 'যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন' শোষিত-নির্যাতিত মানুষের প্রেরণাদাতা। এই প্রেরণাতেই তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

"চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

(ছাড়পত্র)

সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে সুকান্তের কাব্যদর্শন সঞ্জীবিত। সমাজ পরিবর্তন যে শান্তিপূর্ণ পথে হতে পারে না, 'এগিয়ে চলার প্রত্যেক উৎসবে' যে রক্ত ঝরবে—তা তাঁর চেতনায় ধরা পড়েছিল। তাঁর কাছে 'মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য।' 'রক্তমূল্যে' তা কিনতে হয়। এরজন্য প্রয়োজন 'প্রতিজ্ঞা ও প্রতীক্ষা'। 'মুখে মৃদু হাসি অহিংস বুদ্ধের ভূমিকা' সুকান্ত তাই চায়নি। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন ঃ

"পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙব মুক্তির শেষ দ্বার।"

সুকান্ত আন্তর্জাতিকতার আধার থেকে জাতীয়তার আধেয়কে কখনো বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। তিনি ছিলেন সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে দেশপ্রেমের মিলনের এক সাক্ষাৎ আত্মা। শাসক ও শোষকের নিষ্ঠুর বর্বরতাই সুকান্তকে যেন বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তিনি আশা করেছিলেন ঃ

"শাসক ও শোষকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।" (বোধন)

সমাজ সচেতন কবি হিসাবে সুকান্ত তৎকালীন প্রতিটি ঘটনায় সাড়া দিয়েছিলেন। তৎকালীন, সামাজিক দ্বন্দ্বগুলো তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছিল। খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়, সাইরেন ডাকা বিনিদ্র রাতে, নিষ্ঠুর রক্তপাতের রোমাঞ্চে, শৃঙ্খলিত দুই হাতে জীবন জিজ্ঞাসা শুরু করে সুকান্ত শোষিত মানুষকে নিয়ে কবিতা লিখেছে, শোষিত মানুষের নামে কবিতা লিখেছে, শোষিত মানুষের জন্য কবিতা লিখেছে। যদি তাঁর কাব্যের অক্ষরে অক্ষরে শোষক আর শাসকের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুণ ছড়ানো না থাকতো, তবে তথাকথিত বিদগ্ধ সমাজে সুকান্তের সমাদর হতো। কিন্তু তিনি শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে গেছেন। রাজনৈতিক সত্ত্বা ও কবি সত্ত্বা পরস্পরের পরিপূরক ছিল বলেই সুকান্ত তা পেরেছিলেন। তাঁর জীবনের দর্শনবোধ যে প্রচণ্ড সমাজ চেতনার কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে বাঁধা তা তাঁর পরিমিত পথসঞ্চারী ছন্দের মধ্যেই ধরা পড়ে।

লেনিন সুকান্তের রক্তে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বলে তিনি দেখেছিলেন বাঁচার গৌরব এদেশে আসছে কী করে। অঙ্কুরিত বীজের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন বটবৃক্ষের গৌরব, ছোট ছোট চারাগাছের মধ্যে দেখেছিলেন বিদ্রোহের দূতকে। প্রভাতের খবর তিনি পেয়েছেন রাত্রিতে, তাই কলমকে তিনি ডাক দিয়েছেন বিদ্রোহ করতে। পনের বছর বয়সেই আঠারো বছর বয়সের স্বপ্ন দেখে তিনি চেয়েছিলেন 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'। অর্থাৎ যৌবনচঞ্চল হোক ভারতবর্ষ। আর এই যৌবনশক্তিই সেদিন জেগেছিল রাশিয়ায়, জেগেছিল চীনে। সুকান্ত অপূর্ব দৃঢ়তায় যুগের Revolutionary spirit কে প্রকাশ করে গেছেন। সমকালীন বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের মুক্তি-সংগ্রাম ও তার বিজয় সাফল্য তাঁর কবিতায় স্মরণীয় ও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো কবিতার বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যখন কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখনই মাত্র একুশ বছর বয়সে স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্বে তার জীবনদীপ নির্বাপিত হল। জীবনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য শোষিত মানুষের জয়গান যে গায় তাঁর মৃত্যু কোনদিন হতে পারে না। সুকান্তকে শোষিত মানুষ কোনদিন ভোলেনি, ভুলবে না, ভুলতে পারে না। কবিতার মধ্যে যে মনোদীপ তিনি জ্বালিয়ে রেখে গেছেন, সেই আলোয় আজও আরতি হচ্ছে। আজও মিছিলে, সভায়, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে শোষিত মানুষের মুখে থাকে সুকান্তের কবিতা—যেন এক মৃত্যুহীন বিদ্রোহী নিশান।

স্নাতক চিন্তায় নতুন দিক / সাইফুদ্দীন চৌধুরী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সাব কমিটি স্নাতক শিক্ষার যে নতুন কাঠামো প্রস্তাব করেছেন তা নিয়ে বেশ হৈচৈ শুরু হয়েছে। প্রস্তাবটি যাদের, তারা চেয়েছিলেন এই শিক্ষাবর্ষ থেকে একে কার্যকরী করতে। শেষ পর্যন্ত তা হ'ল না। কারণ বিতর্কটি বেশ বড় হয়ে উঠেছে এবং কিছু মানুষ তাদের অনুভূতি ও আবেগের সবটুকু নিয়ে এর বিরোধিতা করেছেন। যুক্তির সঙ্গে যুক্তির লড়াই-এর মধ্যে বিষয়টি আর সীমাবদ্ধ নেই। তাহলে, যারা এর সপক্ষে দাঁড়িয়েছেন তাদের অনেক সুবিধা হ'ত।

একটি ভুল ধারণার অবসান :—

বামফ্রন্ট এবং সরকার চেয়েছিলেন নতন প্রস্তাবকে নিয়ে বিতর্ক হোক। সর্বস্তরের জনগণ এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করুক। তারা খোলাখুলি একথা ঘোষণা করেছিলেন। কারণ জনমতের মূল্য তাদের কাছে অপরিসীম। সন্দেহবাদীরা কিন্তু ভেবেছিলেন এসবই লোক দেখানো। আসলে যা হবার তা হবেই। বিতর্ক আর জনমতের ভড়ং করে সময়মতো প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে নেওয়া হবে। এটা বলতে সবচেয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন কংগ্রেসীরা। এরা নিজেদের রাজত্ব কালে তিন বছরের স্নাতক শিক্ষাকে অসভ্যের মত তাড়াতাড়িতে চালু করেছিলেন। আর এইসব বিষয়ে সত্যিকারের কথা যারা বলতে পারেন তাদের কোন পাত্তাই এরা দেননি। এরা নিজেদের আয়নায় অন্যদের দেখতে অভ্যস্ত। তাই বিতর্কের পুরো সময়টা জুড়ে এরা যুক্তির ধার বড একটা ধারেননি। শুধু চিৎকার করেছিলেন এই বলে যে বিশ্ববিদ্যালয় স্বেচ্ছাচারীতা করছে, জনমতকে মূল্য দিচ্ছে না। আর সরকারের মদতেই এসব হচ্ছে। ওদের এই কথায় কেউ যে ভুল বোঝেননি তা বলা ঠিক হবে না। আমরা আনন্দিত প্রস্তাবটির প্রয়োগ এক বছর স্থগিত থাকছে। এবং এই পুরো বছরটা ধরে আমরা নতুন প্রস্তাবের ভাল মন্দ নিয়ে আলোচনা করতে পারব। অতঃপর কোন ভুল বোঝাবুঝি আর থাকবে না এবং সকলেই যুক্তির সীমানায় ফিরবেন এটা আশা করা বোধহয় অসংগত হবে না।

উপায় ছিল না :—

স্কুল শিক্ষার বার বছর পার হওয়া প্রথম ছাত্রদল এ বছর স্নাতক শিক্ষায় প্রবেশ করবে। অতএব স্নাতক শিক্ষায় পরিবর্তনের প্রস্তাব না এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপায় ছিল না। এতদিনকার তিন বছরের স্নাতক কাঠামো, তার অজস্র সমালোচনা নিয়ে এগারো বছরের স্কুল কিংবা কলেজ পূর্ব শিক্ষার সামঞ্জস্যে গড়ে উঠেছিল। এখন তা আর চলতে পারছিল না। বারোর সঙ্গে তাল রেখে স্নাতক শিক্ষা, নতুন প্রস্তাব রচনার পিছনের কথা হচ্ছে এই।

স্নাতক শিক্ষার আসল কথা কি ?

"The main purpose of the first degree should be to bring students to the frontiers of knowledge and to the threshold of the world of research; and that of the second degree to provide a high level of specialization or to initiate the student in research itself."

Kothari Commission

অর্থাৎ স্নাতক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে গবেষণার জগতে প্রবেশের ভিত্তি তৈরী করা। স্নাতকত্তোর পর্যায়ে যা উচ্চ পর্যায়ের বিশেষীকরণে রসদ যোগাবে এমন কি রিসার্চেই নামিয়ে দেবে।

আমাদের স্নাতক শিক্ষা, এতদিন যা চালু ছিল, এই বিষয়ে কতটা কি করতে পেরেছে তা কোঠারী কমিশনই দু কান কাটার মত বলে দিয়েছে। কমিশন বলেছে—"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই কাজ খুবই ভাল করে যা সত্যি করে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির করা উচিত।"

কমিশন বলেছে :—"It is our second degree in arts, commerce and science that introduces the student to the world of research and is comparable to the first degree in the educationally advanced Countries."

সোজা কথায় আমরা বি এ বি এস সি-তে যা পড়ি তা স্কুলের পড়াশুনো, আর এম, এ, এম এস সি-তে আমরা অন্য অগ্রসর দেশের স্নাতক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করি। অতএব এটা বোঝা সহজ যে শেখবার বিষয়বস্তুতে আর শেখানোর কাঠামোয় আমরা বেশ কবছর ধরে বহু মূল্যবান সময়, জাতীয় মূলধন এবং মানসিক শ্রমের অপচয় করেছি।

নতুন প্রস্তাবের নতুন কথা :—

নতুন প্রস্তাবে এই দিক থেকে অপচয় রোধের কথা নেই। কিন্তু একটি নতুন কথা আছে। তা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে স্কুল স্তর থেকে টেনে তোলার কথা। কোঠারী কমিশন যা বলেছিলেন—সেই স্তরে ছাত্রকে নিয়ে আসা যা—

—adequate in relation to the tasks for which they are intended.

—dynamic and keep on rising with the demands for the higher levels of knowledge, skills or character which a modernising society makes and

—Internationally comparable, at least in those key sectors where such comparison is important.

অর্থাৎ কর্মমুখর জগতে সবচেয়ে বড় কথা যে কাজের জ্ঞান সেই জ্ঞান পাবার সুযোগ ছাত্রের সামনে খুলে দেওয়া হচ্ছে।

এই সুযোগ আগে ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। যা স্কুলে শেখার মধ্যেই সাধারণভাবে শেষ হওয়ার কথা সেই ভাষা শিক্ষার নামে একটি বিশেষ শিক্ষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হত বি এ বি কমের ছাত্রদের ওপর। এর ফলে বিষয় নির্বাচনে সুযোগ ছিল সংকুচিত হয়ে। কলা এবং বিজ্ঞানের মধ্যে—পাঁচিলটাও তোলা হয়েছিল খুব উঁচু করে। উভয় জমিদারীর সীমান্তে বসানো হয়েছিল কড়া পাহারা।

নতুন প্রস্তাবে বিষয় নির্বাচনে জবরদস্তী যেমন থাকবে না, তেমনি উঠে যাবে সীমান্তের কড়াকড়ি। বুদ্ধি-বৃত্তির জগত স্বভাবতই হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। এবার যা নিয়ে তরতর করে এগিয়ে যাওয়া যাবে. ইচ্ছে করে পছন্দ করে ছাত্ররা তাকেই নেবে। আঠারো বছর বয়সের স্বাধীন নির্বাচনে ভুলচুকের কথা স্বভাবতই উঠবে না।

ভাষা শিক্ষার নামেঃ—

বি এ বি কমে কেউ চান না চান ভাষা শিক্ষার নামে যে ব্যবস্থা চালু আছে তা তাকে পড়তেই হবে। নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "গত কয়েক বছরের পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কলা ও বাণিজ্যের ছাত্রদের উপর ভাষা-পত্র চাপিয়ে দেবার ফলে আমরা বিশাল পরিমাণ মানবিক শক্তি ও পার্থিব সম্পদের অপচয় করছি। ছাত্ররা স্পষ্টতঃই এই প্রথার অনিচ্ছুক বলি, কারণ কখনো কখনো ইংরেজী, বাংলায় অনুত্তীর্ণের হার ৮০-৯০ পার্সেণ্ট—আবার ইতিহাস, অর্থনীতি, বাণিজ্যিক ভূগোল প্রভৃতিতে অনুত্তীর্ণের হার ৩০-৪০ পার্সেণ্ট বা তার চেয়ে কম। এইভাবে ইংরেজি বাংলাকে আবশ্যিক করে ছাত্রদের মাথার উপর গণফেলের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি। এর ফলে আমাদের আর্টস-কমার্স গ্রাজুয়েট কর্মসূচী কেবল অপচয়ধর্মী পরিহাসে পর্যবসিত হয়নি, সেই সংগে আমাদের ছাত্র সমাজের এক বিরাট অংশ বিপুল অবমাননায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।"

প্রথমতঃ ছাত্রদের সাফল্যের জন্য ভাবা এবং তাদের সম্মানে ফিরিয়ে আনার এই যে কথা তা কিছু বড় বড় কাগজে ও অনেকের দ্বারা যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে। ছাত্রদের জন্য কি দরদ ইত্যাদি বলে ব্যাঙ্গ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—ফেল করছে বলেই কি সবজেক্ট তুলে দিতে হবে। ব্যাপারটা যেরকম সোজাসুজি বলা হয়েছে আসলে তা নয়। এটা বোঝা সহজ যে সমালোচকেরা ছাত্রদের গণফেলের পক্ষে। এবং পাশ-ফেলের সংগে বিষয় নির্বাচনের যে যোগাযোগ অবশ্যই আছে তা তারা ভুলে যান। যে ছাত্র নিজে পছন্দ ক'রে বা প্রয়োজনে ফরাসী ভাষা পড়ে তার অসাফল্য স্বভাবতঃই কম হয়। কিন্তু যদি সবাইকে জোর করে ফরাসী পড়তে বাধ্য করা হয় তবে ফেলের সংখ্যা যে বাড়বেই তা সহজবোধ্য। আর এই যে ছাত্ররা স্নাতক শিক্ষায় আসেন এরা তো স্কুল পর্যায়ে ভাষা শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই আসেন। হঠাৎ এরা ব্যাপক সংখ্যায় ভাষা বিষয়গুলিতে ফেল করেন কেন? কারণ ব্যাপক সংখ্যকের কাছে ভাষা নামক স্নাতক পর্যায়ের বিশেষ শিক্ষাটির কোন রকম আকর্ষণ বা আগ্রহ বা প্রয়োজন থাকে না। যদিও কেউ অস্বীকার করবে না যে সাহিত্য শিক্ষার হাত ধরে চলে ভাষা শিক্ষা তবুও স্নাতক পর্যায়ে সাহিত্য শিক্ষায় আগ্রহী যারা তারা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে শুধুই ভাষা শিক্ষা নামের এই শিক্ষায় সময়ের অপব্যয় হয় এবং অন্য মূল বিষয়গুলির প্রতি গুরুতর অবিচার করা হয়। তারা কিন্ত সফল হয় যারা আগ্রহ নিয়ে পড়ে। সাহিত্য সম্পর্কে, ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে এরা পড়াশুনা করতে চায়। এরা পাশ করে। অনেকে অনার্স নেয়। তারপর এম এ পড়ে। এদের ক্ষেত্রে অসাফল্যের দোহাই পেড়ে আলোচ্য বিষয়টি তুলে দেওয়ার কথা কেউ বলে না।

আসলে বিষয়টি হচ্ছে—শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিচালিত নীতিগুলির দৃষ্টিভঙ্গী কি? সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থে গড়ে ওঠা, সংকট জর্জরিত অর্থনীতির ওপর নড়বড়ে পায়ে দাঁড়ানো শিক্ষা অনিবার্য সংকোচনের দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগে! এখানেই আসে জবরদস্তি। এখানেই আসে স্বাধীন নির্বাচনে বাধা। আমি নিশ্চিত যে আমাদের দেশে আমরা সবাই ইংরেজ হলে আমাদের তিরিশ বছরের সরকারী নেতারা আমাদের ফেল করানোর জন্য বাধ্যতা-মূলকভাবে হিব্রু শেখাতেন। আর এতে পাশ না করলে কখনই ওপরে ওঠা যেত না।

এটা কি ভালো নয়ঃ—

শিক্ষা একটি সুষম ব্যবস্থা। নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা। জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রতিটি শাখায় এত বিভিন্নমুখী উপশাখার এত বিপুলভাবে এগিয়ে চলার আজকের সময়ে এটাই কি ভাল নয় যে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটি আমরা স্কুল স্তরেই শেষ করে ফেলব। তারপর স্নাতক পর্যায়ে একটি সুনির্দিষ্ট জ্ঞানকে অক্ষরেখা করে তার সহযোগী জ্ঞানসমূহকে আয়ত্ত করে এগিয়ে চলব। কেউ কেউ যে বলছিলেন ভাষা শিক্ষা উঠে যাচ্ছে। আদপেই সত্য নয়। প্রস্তাব যা বলেছে তাতে ভাষা শিক্ষাও আরো বিস্তৃত পরিসর পেয়ে যাবে। অর্থনীতির ছাত্র যেমন অর্থনীতির ইতিহাস কিংবা সমাজ বিকাশের ইতিহাস প্রভৃতিকে আলাদা আলাদা পূর্ণাংগ বিষয় হিসেবে পেতে পারলে খুশী হবেন, তেমনি—বাংলার ছাত্র উচ্চতর সংস্কৃতকে পাশে নিয়ে ভাষা শিক্ষায় দুর্বার বেগে এগিয়ে চলবেন। অতএব, নতুন প্রস্তাবে পুরানো কোন বিষয় উঠে যাওয়ার কথা তো নেইই, আছে আরো অনেক নতুন বিষয় যুক্ত করার কথা। এবং একটি নির্দিষ্ট সমতা রেখে, যা য

নিয়ে পড়া উচিত ছাত্রকে তা বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া। প্রস্তাবের মূল কথা শিক্ষাক্রমের (কারিকুলাম) পরিবর্তন। বিতর্কের বিরোধীপক্ষ এই সব ব্যাপারে একটিও কথা বলেননি। এত কিছুর পরেও কিন্তু সুযোগ ছিল। যদি এমন হত যে অর্থনীতির একজন ছাত্র তার মূল বিষয় এবং সহযোগী বিষয়গুলি নিয়ে পড়তে পড়তেই মনে করলেন একটু ইংরাজী আরো ভালো করে শিখবেন। নতুন প্রস্তাব তারও সুযোগ এনে দিয়েছিল। ১০০ নম্বরের একটি পেপার তিনি নিতে পারতেন। এতে ফেল করলে ফেল নেই, কিন্তু তিরিশের বেশী এগ্রিগেটে যোগ হওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

আর বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা কি আমাদের এটা ভাবতে বলছে না যে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং অংক নিয়ে যদি বি এস সি হওয়া যায় তবে অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব আর দর্শন নিয়ে কেন বি এ হওয়া যাবে না?

জয় করে তবু ভয়ঃ—

নতুন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে খারাপ ও মিথ্যে প্রচারটি করা হয়েছিল এইভাবে যে আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এদের পরিকল্পনা বাঙালী জাগো। সব কিছু বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যুক্তির জয় এখানেই ভয় পেয়েছে বলে মনে হয়। মানুষের কিছু কিছু অনুভূতি আহত হয় খুব সহজেই। ওরা এই সুযোগ নিতে চাইছেন। বাংলা যে উঠে যাচ্ছে না এটা কেন কেউ বুঝবেন না তা বোঝা খুব কষ্টকর। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত বাম সরকারের শিক্ষানীতি দাঁড়াতে চাইছে—মাতৃভাষার উপর ভিত্তি করে। প্রাথমিক স্তরে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শুধু মাতৃভাষায় শিক্ষা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ৬ থেকে ১২ পর্যন্ত প্রথম ভাষা মাতৃভাষা, দ্বিতীয় ভাষা বাংলাভাষীদের জন্য ইংরেজী বাধ্যতামূলক। বিষয় শিক্ষার জন্য ভাষা শিক্ষা, ১২ বছর ধরে যা প্রথম ভাষা, অর্থাৎ মাতৃভাষা শিক্ষা, তা কি যথেষ্ট নয়। এর পরে যে ভাষা শিক্ষা তা বিশেষের জন্য, সবার জন্য নয়। সবাই তো আর সাহিত্যবিদ কিংবা ভাষাবিদ হবে না। বাংলা উঠে গেল বলে যারা রব তুলছেন তারা কেউ কিন্তু স্নাতক শিক্ষাসহ বাকী শিক্ষা মাতৃভাষায়, বাংলায় চালু করার জন্য একটিও কথা বলেননি। বাংলার মর্যাদা তো এতেই বাড়বে। আমরা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অর্থনীতি সব কিছু বাংলাতে পড়ব। শুধু সাহিত্যের ভাষা হিসেবে আজ বাংলার যে মর্যাদা তা তখন বহুগুণে বেড়ে যাবে। এজন্য স্কুল স্তরে বাংলা শিক্ষাকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার সংগে যুক্ত করার পরিকল্পনা নিতে হবে। না হলে বাংলায় জ্ঞান বিজ্ঞানকে নিয়ে আসা কোনদিনই হবে না। যা হবে তা যান্ত্রিক। প্রাণ থাকবে না। এই প্রসংগে আর একদলের কথা বলতেই হয়। বাংলা নিয়ে এদের মাথাব্যাথার শেষ নেই। অথচ প্রাইমারী স্তরে ইংরাজী তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে এদের চিৎকার কোনদিন থামবে বলে মনে হয় না। এদের অভিমত ইংরাজী উচ্চ চিন্তার বাহন। আমাদের ভাষাগুলির প্রতি এত বড় অসম্মান সাম্রাজ্যবাদীরাও সম্ভবতঃ এখন করতে এরকম সাহস পাবে না,—এরা যা করেছে।

ইংরাজীর মর্যাদা সকলেই বুঝি। ইংরাজীর থেকে অনেক কিছুই আমাদের নিতে হবে। ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের রাখতেই হবে। কিন্তু আমরা তো দাস নই। আমরা নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারি এ তো প্রমাণিত সত্য। অতএব আমাদের ভাষাগুলিকে যোগ্য স্থান দেওয়ার জন্য ইংরাজীকে সসম্মানে বন্ধুর মত আমরা পাশে রাখব। ইংরাজীর সুবিধাভোগীতা আমরা নিজগুণে খর্ব করব। ইংরাজী স্কুল তুলে দেওয়ার দাবী সোচ্চারে জানাব। প্রশাসনে মাতৃভাষা চালুর দাবী করব। (পশ্চিমবংগের বাম সরকার ইতিমধ্যেই সরকারী কাজকর্মে বাংলা চালু করেছেন।) সর্বভারতীয় পরীক্ষায় আঞ্চলিক ভাষায় অংশ নেওয়ার দাবীতে সংগ্রাম করব। (এটাও কেন্দ্র সরকার মেনে নিয়েছেন।)

এ সবের মধ্যেই আমরা শিক্ষাকে প্রসারিত করতে পারব। প্রাথমিক স্তরে শুধু মাতৃভাষায় শিক্ষার অর্থ সহস্র জনগণের অধিকারকে কেবলমাত্র স্বীকার করে নেওয়া নয়, বাস্তবায়িত করার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া। এই পথেই ঘটবে আমাদের মনন ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর এতদিন ধরে চলে আসা হীনতম অপরাধের চিরতরে অবসান। আমাদের দুর্ভাগ্য এতে কেউ কেউ খুশী নয়।

এই সব আজকের কথা নাঃ— ...

বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রস্তাব করেছেন তা কি একেবারে আজকের কথা? না। ১৯৬৪-৬৬ সালের কোঠারী কমিশন বলেছিলেন, "at the university stage no Language should be made a compulsory subject of study but the classical and modern Languages of India and important foreign Languages should be provided as elective subjects....The compulsory study of a language is likely to make some useful combination of subjects impracticable by placing too heavy burden on the students."

পৃথিবীর কোন ভদ্র সভ্য দেশে ছাত্রদের ওপর এত পীড়ন নেই যা আমাদের দেশে হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা বাদই দিলাম। সেখানে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার রয়েছে বাস্তব অধিকার। এই সব দেশে ইংরাজী চর্চার যুক্তি যারা দিয়েছেন তারা সযত্নেই এটা বলেননি যে এই চর্চা এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক না। ঐচ্ছিক।

এমন কি সিংহলে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা শুধু মাতৃভাষায়, তামিল কিংবা সিংহলী, যার যা তাতে। বাধ্যতামূলক ইংরাজী পড়ানো শুরু হয় ৪র্থ শ্রেণী থেকে। চলে স্কুল শিক্ষার শেষ পর্যন্ত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রস্তাবে অতএব এমন কিছু ছিল না—যা অভাবনীয়, অকল্পনীয়। সোজাসুজি এতে যা চাওয়া হয়েছিল তাতে বিস্তৃত কর্মময় জ্ঞানের জগতে ছাত্রের বিজ্ঞানসম্মত অধিকার কিছু পরিমাণে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

চারটুক্‌রা / প্রবীর নন্দী

(১)

(মিছিলে যাচ্ছি)

মাথার উপর খাড়া ঝুলছে জেনেও
আমি যাচ্ছি

মিছিলে।

পায়ে আমার কুঠার পড়বে জেনেও
আমি যাচ্ছি

মিছিলে।

আমি আর কোনমতে ফিরব না জেনেও
আমি যাচ্ছি

মিছিলে।

(২)

(প্রিয়তমাসু; বাইলাডিলার অব্যবহিত পরে)

প্রিয়ে আমি যদি যাই জেলে
তুমি যেও তখন মিছিলে;
তুমি মারা গেলে যাবে ছেলে;

প্রিয়ে আমি যদি যাই জেলে।

(৩)

(এসো পল্টন গড়ি)

এসো পল্টন গড়ি, গড়ি ব্যারাক;
বীরবাহুরা সামনে দাঁড়াক;
কুরুক্ষেত্রে পা বাড়াক;
দুঃশাসনেরা নিপাত যাক।

(৪)

(রকমফের)

মনে রেখো
একটা বুলেট মানে একটা জীবন।

মনে রেখো
একটা যুদ্ধ মানে একটা দেশ।

মনে রেখো
একটা বিপ্লব মানে গোটা পৃথিবী।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ছাত্র সংসদের কাছে যুব মানসের কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকাশযোগ্য লেখা যুব মানসে মুদ্রণের ব্যাপারে বিবেচনা করা হবে। সঃ যুঃ মাঃ

ভ্রম সংশোধনঃ গত জুলাই সংখ্যা যুব মানসে প্রকাশিত সাইফুদ্দীন চৌধুরীর 'বাম সরকারের এক বছরঃ ছাত্র-যুবরা কি পেলেন ?' লেখার ২৪২ পৃষ্ঠায় **আলোকের ঝর্ণাধারা** শীর্ষক সাব হেডিং'এর শুরুতে 'অহিংসাকে'র জায়গায় 'অশিক্ষাকে' পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। সঃ যুঃ মাঃ

সমাজবাদ কেন—অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের অভিমত / সুব্রত পাল

বেশীদিন হয়নি যখন আমাদের দেশের এক স্বৈরাচারী নায়িকা গণতান্ত্রিক 'সমাজবাদের' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিলেন। তার 'সমাজবাদ' কি আমরা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষ চরম ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তার ভুয়া 'সমাজবাদ'। তাতে কিন্তু প্রকৃত সমাজতন্ত্রের কোন রকম উৎকর্ষতা হানি হয়নি। বরং একটা সত্য আমাদের সামনে আরও পরিষ্কার হয়েছে।

যদিও পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ বা তার কিছু বেশী মানুষ সমাজতান্ত্রিক সমাজে বাস করে সমগ্র বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের মনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা আজ অনস্বীকার্য। তাই চরম স্বৈরাচারী শাসকের পক্ষেও আগের মত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি জেহাদ্ ঘোষণা করা সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রের নামে এবং সমাজতন্ত্রকে মিথ্যা ও বিকৃতরূপে পরিবেশন করেই তারা তাদের শাসন ও শোষণ টিকিয়ে রাখতে চান।

দেশপ্রেমিক, শান্তিবাদী, মানবতাবাদী প্রভৃতি অনেক ধরনের মানুষের মনে সমাজতন্ত্র কমবেশী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। তাদের মুখে সমাজতন্ত্রের প্রশস্তি প্রায়ই শোনা যায়। তবে সবাই যে এটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে করেন একথা ভাববাব কোন কাবণ নেই। আবার সকলেই যে একে এক বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে মেনে নিয়ে এর সমস্ত দিক্ গুলো গ্রহণ করতে পেরেছে তাও নয়। এদের অনেকের কাছেই হয়ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের বৈপ্লবিক পদ্ধতি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু একটা বিষয়ে তারা সকলেই প্রায় সন্দেহ মুক্ত যে ব্যাপক জনসাধারণের পক্ষে ধনতন্ত্রের চাইতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক গুণ বেশী সুখকর। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সাহিত্যে এবং শিল্পীদের শিল্প কর্মে এ বিশ্বাসের অভিব্যক্তি দেখা যায়—কিছু কিছু বিজ্ঞানীও তাদের বিভিন্ন প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানী বিশেষতঃ প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের এক ভিন্ন জগতের মানুষ বলে মনে করে। এরকম ধারণার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অধিকাংশ বিজ্ঞানীই সাধারণত নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ল্যাবরেটরীর চার দেয়ালের মধ্যেই বিজ্ঞান সাধনায় নিবিষ্ট রাখতে পছন্দ করেন। কিন্তু ধনতন্ত্রের সংকট কিংবা মুক্তি আন্দোলনের তরঙ্গ যখন সেই প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করে তখন বোধহয় সেই ধ্যানমগ্ন মানুষগুলোর অনেকেই আর নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না। ফ্রেডরিক জোলিও কুরীর মত অনেকে সরাসরি
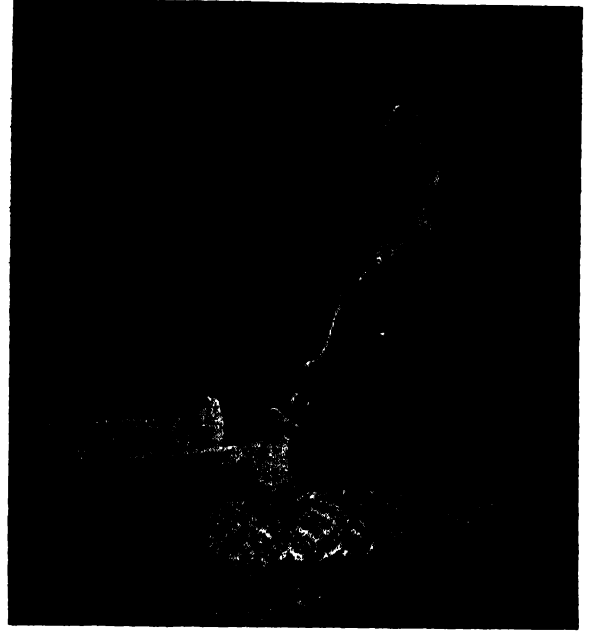
সংগ্রামের ময়দানে নেমে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন নাৎসী বাহিনী প্যারিস দখল করে জোলিও কুরী 'had himself taken part in the last few days of street fighting for the liberation of the city. The man who discovered, through his studies of neutron emission and chain reaction, some of the most important of the necessary pre-conditions for construction of the atom bomb used the most primitive form of bomb imaginable in defence of the barricades—ordinary beer bottles filled with gasoline and fitted with fuses.' (Robert Jungk, Brighter Than a Thousand Suns, P.147)

অনেকে মার্কসবাদের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের যুক্ত করেন। আবার কেউ কেউ যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলেও নিজেদের মানবতাবাদী অনুভূতির দ্বারা চালিত হয়ে সরবে মতামত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেন না। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নিজেরই ভাষায় 'যখন আমার মনে হয়েছে যে এখনও নীরব থাকার অর্থ হচ্ছে দুষ্কর্মের পাপের ভাগী হওয়া, তখনই মাত্র আমি মুখ খুলেছি।' (পৃঃ ৪৩)*

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সরব

হন হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষী নীতির শিকার হয়ে জার্মানী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে। এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সংকট তাকে সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'মুখ খুলতে' বাধ্য করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মার্কিন পুঁজিপতিদের প্রচুর মুনাফা এনে দেয়। যুদ্ধসৃষ্ট চাহিদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন আড়াই গুণ বাড়িয়ে তোলে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও কিন্তু তার অস্ত্র নির্মাণের উন্মত্ততার অবসান হয়নি। সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ভীত হয়ে মার্কিন সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' বা শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা সন্ত্রস্ত করে রাখার নীতি গ্রহণ করে। এরজন্য অঢেল অর্থ ও দেশের বৈজ্ঞানিক সম্পদের সিংহভাগ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কাজে লাগানো হয়।

এ সত্ত্বেও মার্কিন পুঁজি তার সংকট এড়াতে পারেনি। বাজারের চাহিদা পড়ে যাওয়ায় আমেরিকার শিল্প অত্যুৎপাদনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। ১৯৪৮ সালে দেশের শিল্প উৎপাদন আট শতাংশ হ্রাস পায়। বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৯৪৮-৪৯ এ মার্কিন অর্থনীতিতে চরম মন্দা দেখা দেয় যদিও এর তীব্রতা ১৯২৯-এর তুলনায় কমই ছিল। সংকটের ঢেউ বৈজ্ঞানিক প্রগতির ওপরেও এসে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, একচেটিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী (জি, ই, সি)র স্বার্থে এবং সক্রিয় প্রচেষ্টায় (বা চক্রান্তে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন প্রকল্প নির্মাণের বিল মার্কিন সেনেটে প্রায় সাত বছর আটকে থাকে।

স্বভাবতই সংকটের প্রভাব থেকে আমেরিকার বিজ্ঞানী সমাজও নিষ্কৃতি পায়নি। তাদের মধ্যে অনেকে অবশ্যই এই পার্থিব 'অসুখ' থেকে মুক্তির জন্য অতীন্দ্রিয় জগতের আশ্রয় খোঁজেন। কিন্তু ভবিষ্যত সম্বন্ধে যারা আশাবাদী ছিলেন এবং মানুষের শক্তিতে যাদের আস্থা ছিল তারা নৈরাশ্যের পাঁকে ডুবে গেলেন না।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়েকজন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ গ্রহণ করে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সাথে নিজেদের যুক্ত করলেন। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসীবাদকে পরাস্ত করতে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের গৌরবময় ভূমিকা এবং তার সংকটমুক্ত অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তাদের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে।

অন্যদিকে সোভিয়েতের শাসন ব্যবস্থাকে যারা সন্দেহের চোখে দেখতেন, এমনকি যারা প্রাথমিকভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমর্থক ছিলেন, মার্কিন সরকারের বর্ণবৈষম্য, উপনিবেশবাদী ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে বিপুল সম্পদ অপচয়ের নীতির ফলে তারাও বিক্ষুব্ধ হন। এবং অনেকে মার্কিন সরকারের এমনকি মার্কিন সমাজব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হন।

কোরিয়ায় হস্তক্ষেপ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের চেষ্টা করে। কিন্তু এর ফলে নিজের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং কোরিয়া থেকে হটে আসতে বাধ্য হলে সংকট আবার ঘনীভূত হয়।

মার্কিন পুঁজিবাদের এই সংকটকালে মানবতাবাদী আইনস্টাইনও অচঞ্চল থাকতে পারেননি। ১৯৩৯ সালে আইনস্টাইনের নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে মার্কিন সরকারকে পারমানবিক বোমা নির্মাণের পরামর্শ দেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম লগ্নে তিনি যখন বুঝতে পারেন যে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে এক ভয়াবহ পরিস্থিত সৃষ্টি কবতে চলেছে তিনি বিজ্ঞানী জিলার্ডের সাথে যুক্তভাবে মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে এর বিরুদ্ধে এক সতর্কতামূলক পত্র লেখেন। তাঁদের আবেদন উপেক্ষিত হয়। বোধহয় মার্কিন রাষ্ট্রের কাছে থেকে এই তার প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা। অতঃপর তিনি যুদ্ধ বিরোধী প্রচারে অবতীর্ণ হন।

এছাড়া তিনি সাধারণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শ্রমজীবী জনগণ বা সাধারণ মানুষের কোন মঙ্গল করতে পারে না। তিনি ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হন এবং এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করেন। ১৯৪৯ সালে 'সমাজবাদ কেন' নামে এক প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে সমাজতন্ত্রই পুঁজিবাদী সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ।

পদার্থবিদ্যা বা প্রকৃতি বিজ্ঞান আইনস্টাইন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে তার আগ্রহ বা জ্ঞান ছিল সীমিত। সেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তার ধারণা কতটা স্বচ্ছ বা বৈজ্ঞানিক হতে পারে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। প্রশ্ন তুলেছেন অবশ্য আইনস্টাইন নিজেই তার প্রবন্ধের শুরুতে— 'আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে যে বিশেষজ্ঞ নয়, তার পক্ষে সমাজবাদ সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করা কি যুক্তিযুক্ত?' (পৃঃ ২৩) তথাপি তিনি তার মতামত প্রকাশ করেছেন। এবং যৌক্তিকতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে না গিয়েও একথা বলা যায় যে এতে সমাজতন্ত্রের কোন মর্যাদাহানি তো হয়ইনি। বরং তার মত প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর সমর্থন পেয়ে—সে সমর্থন যতই ক্ষীণ এবং অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত হোক না কেন—সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত মানুষ উৎসাহিত বোধ করেছে।

আমরা জানি যে সমাজতন্ত্র মনীষিদের চিন্তাপ্রসূত কোন কাল্পনিক বস্তু নয়। সমাজবিজ্ঞান বা ইতিহাসের নিয়মেই মানব সমাজের বিকল্প ঘটে এবং এক বিশেষ পর্যায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হয়। পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যে নিহিত থাকে সমাজতন্ত্রের বীজ। ধনতন্ত্রের নিজস্ব নিয়মেই পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব বা পুঁজিপতি ও শ্রমিকের

শ্রেণী সংগ্রামের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে এক রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের অবসান ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

বেশ কিছু মানবতাবাদী ব্যক্তি আছেন যারা সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করেন কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীপুষ্ট হয়ে নয়। অবশ্য সমাজবাদের পক্ষে তাদের বক্তব্য সর্বক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাববার কোন কারণ নেই। তাদের কাছে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিজয় কোন ইতিহাস নির্ধারিত ঘটনা নয় বরং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায় ও যুক্তি প্রতিষ্ঠা, অশুভ উদ্দেশ্যের ওপর মানুষের শুভবুদ্ধির বিজয়। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আইনস্টাইনের ধারণা অনেকটা, এই ধরনেরই ছিল।

আইনস্টাইন অর্থনৈতিক নিয়মকে সমাজবিকাশের মৌলিক নিয়ম হিসাবে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারেননি। তার মতে ইতিহাসের প্রধান-প্রধান রাষ্ট্রগুলির 'অস্তিত্ব প্রধানত সামরিক বিজয়াভিযানের ফলে সম্ভব হয়েছে' যা কোনমতেই অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মের ওপর নির্ভরশীল নয়।

এ সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করেছেন 'পুঁজিবাদী সমাজের বর্তমান আর্থিক অরাজকতাই অনর্থের মূল উৎস।' (পৃঃ ২৮)

পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। 'উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহার করে শ্রমিক নুতন নুতন পণ্য উৎপন্ন করে এবং এইগুলি পুঁজিপতির সম্পত্তি হয়।' (পৃঃ ২৮)

পুঁজিবাদের প্রবক্তারা জোরগলায় জাহির করার চেষ্টা করেন যে এ ব্যবস্থায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় 'স্বাধীন শ্রমচুক্তির' মাধ্যমে—এব্যবস্থায় শ্রমিকও তার নিজের পছন্দমত কাজ বেছে নেওয়ার 'স্বাধীনতা' ভোগ করে। কিন্তু আসল কথাটা তারা আড়াল করার চেষ্টা করেন যে শ্রমিক কোন উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ভোগ করে না। স্বভাবতই নিজের শ্রমশক্তি ছাড়া বিক্রী করার মত তার কাছে আর কিছু থাকে না। সুতরাং 'স্বাধীন শ্রমচুক্তি' মেনে নিতে অস্বীকার করলে তার কাছে একমাত্র অনাহারে মরার স্বাধীনতা থাকে।

আইনস্টাইন পুঁজিপতিদের এই 'স্বাধীন শ্রমচুক্তি'র প্রবঞ্চনা ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন—'শ্রমের "স্বাধীন চুক্তি"র ক্ষেত্রে শ্রমিক যা পায়, তা উৎপন্ন পণ্যের যথার্থ মূল্যের দ্বারা নিরূপিত হয় না। শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজন এবং কর্মপ্রাপ্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতারও শ্রমিকদের যোগান অনুযায়ী পুঁজিপতির চাহিদার অনুপাতে শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়।' (পৃঃ ২৮)

শ্রমিকের শ্রমের সাহায্যে উৎপাদিত মূল্য এবং তার পারিশ্রমিক বা শ্রমশক্তির মূল্যের পার্থক্যই বের করে আনে 'উদ্বৃত্ত মূল্য'। উৎপাদন যন্ত্রের মালিক এই উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে এবং এ থেকে সৃষ্টি হয় তার মুনাফা। ধনতান্ত্রিক সমাজে 'উৎপাদন উপভোগের জন্য হয় না, হয় মুনাফার জন্য'—একথা আইনস্টাইনও উপলব্ধি করেছেন।

আইনস্টাইন ব্যক্তিগতভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজের সংকট প্রত্যক্ষ করেন। ধনতন্ত্রের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী এ সংকট বা 'আর্থিক অরাজকতা'র বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এ সমাজে 'এমন কোন ব্যবস্থা নেই যাতে কর্মকরণক্ষম তথা কর্মকরণেচ্ছুক প্রতিটি ব্যক্তি সর্বদা কাজ পেতে পারে। প্রায় সর্বদাই এক বিশাল "কর্মহীনের বাহিনী" পরিদৃষ্ট হয়। শ্রমিক সর্বদাই কর্মচ্যুতির আশঙ্কায় বিবশ থাকে। কর্মহীন ও স্বল্প পারিশ্রমিকে কর্মরত শ্রমিকদল লাভজনক বাজার বিবেচিত হয় না বলে উপভোগ্য উপকরণের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ফলে প্রচণ্ড দুরাবস্থা দেখা দেয়। যন্ত্রকৌশলের প্রগতি সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে প্রায়ই অধিকতর মাত্রায় বেকার সৃষ্টি করে। পুঁজিপতিদের মুনাফার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুনাফাবৃত্তি পুঁজির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়। অনিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শ্রমশক্তির বিপুল অপচয়ের কারণ হয় এবং অবশেষে ব্যক্তি মানবের সামাজিক চেতনাকে পঙ্গু করে দেয়...।' (পৃঃ ২৯)

এ থেকে আইনস্টাইন সিদ্ধান্তে আসেন 'এইসব ভীষণ বিপত্তি পরিহারের **একটি মাত্র** পন্থা বিদ্যমান। এর জন্য সমাজবাদী অর্থনীতি ও তৎসহিত সামাজিক মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে চালিত নবীন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করতে হবে। এবংবিধ অর্থনীতিতে উৎপাদনের সাধনের কর্তৃত্ব থাকবে স্বয়ং সমাজের উপর এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এর প্রয়োগ হবে। সুপরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে উৎপাদন ব্যবস্থার সংগতি বিধান করে প্রয়োজনীয় কার্য প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির ভিতর বিভাজন করে দেবে এবং প্রত্যেকটি নর-নারী ও শিশুকে জীবিকানির্বাহের নিশ্চয়তা দেবে।' (পৃঃ ৩০)

কোন পদ্ধতিতে এই ঈপ্সিত সমাজবাদ কায়েম করা উচিত এ সম্বন্ধে আইনস্টাইন কোন ইঙ্গিত দিতে পারেননি। মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমেই পুঁজিপতি শ্রেণীকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। উৎপাদনে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা কায়েম করার মধ্য দিয়েই শোষণ মুক্তি হতে পারে। কিন্তু শান্তিবাদী আইনস্টাইন বোধহয় রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ অনুমোদন করতে পারেননি। হয়ত একথা তিনি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি যে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীই নিজের শ্রেণী শাসন ও শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শ্রমিক

শ্রেণীর ওপর রক্তাক্ত হিংসা চাপিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে পাল্টা বলপ্রয়োগ ছাড়া মুক্তির অন্য কোন বিকল্প পথ শ্রমিক শ্রেণীর কাছে খোলা থাকে না। গান্ধীবাদের আদর্শে প্রভাবিত আইনস্টাইন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংসা অসহযোগের মধ্যেই নিষ্কৃতির পথ হাতড়েছেন।

সমাজবাদী অর্থনীতির সমর্থক হলেও সমাজবাদী রাষ্ট্র কাঠামো সম্বন্ধে বোধহয় তার কিছু ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তাই তিনি মনে করতেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়নে সংখ্যালঘুদের রাজত্ব চলছে।' (পৃঃ ১০৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যাপক অপপ্রচার ও কুৎসা চালানো হত। এই পরিপ্রেক্ষিতে তার কিছুটা বিভ্রান্তি অস্বাভাবিক নয়। আর যাই হোক মার্কসবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, তিনি সমাজবাদকে সমর্থন করেছেন নিছক তার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

সমাজবাদী রাষ্ট্র কাঠামো তার কাছে অনুমোদনযোগ্য না হলেও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ তিনি কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। '...ব্যক্তিগত পুঁজির স্বৈরতন্ত্র এবং এর প্রচণ্ড শক্তিকে এমনকি গণতান্ত্রিক (বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক—লেখক) পদ্ধতিতে সুসংগঠিত রাজনৈতিক সমাজের পক্ষেও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এর কারণ হচ্ছে এই যে, বিধান পরিষদের সদস্যগণ মূলতঃ পুঁজিপতিদের অর্থানুকূল্যে পুষ্ট বা তাঁদের দ্বারা অন্যভাবে প্রভাবিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হন এবং এইসব পুঁজিপতি কার্যতঃ বিধান পরিষদ থেকে নির্বাচনকারীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। এর পরিণামে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা জনগণের অনগ্রসর অংশের স্বার্থ বাস্তব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে রক্ষা করেন না। উপরন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিপতিরা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবাদ প্রাপ্তির সূত্রসমূহ (সংবাদপত্র, বেতার ও শিক্ষা ব্যবস্থা) নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে কোন নাগরিকের পক্ষে কোন বিষয়ে বিষয়মুখ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে নিজ রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করা দুষ্কর, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে।' (পৃঃ ২৮-২৯)

প্রকৃতি বিজ্ঞানে আইনস্টাইনের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রশ্নাতীত। তিনি তার তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার সাহায্যে আপেক্ষিকতাবাদের জটিল সমস্যা সমাধান করতে পেরেছিলেন। একই ধরনের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা দিয়ে যদি তিনি সমাজের গতিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতেন তবে এটা তিনি নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারতেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র আদৌ সংখ্যালঘুদের শাসন নয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রকৃত পক্ষে ব্যাপক জনগণের ওপর মুষ্টিমেয়র কর্তৃত্ব। অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হচ্ছে মুষ্টিমেয়র ওপর ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য। তাই শ্রমিক শ্রেণীর গণতন্ত্র অবশ্যই গণতন্ত্রের উচ্চতর রূপ। এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের পথে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে হয়।

---

*প্রবন্ধে আইনস্টাইনের সমস্ত উক্তি শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও অনূদিত আইনস্টাইনের 'জীবন-জিজ্ঞাসা' থেকে উদ্ধৃত ।

"এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর শষ্য শ্যামল মাঠ—
আপনারা কৃষাণ ভাইরা ছাড়া তাহার অন্য অধিকারী কেহ নাই...এই মাঠকে জিজ্ঞাসা
কর—মাঠে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে; এ মাঠ চাষীর, এ ফুল-ফল কৃষক বধূর।"

—কাজী নজরুল ইসলাম

জোয়ার / জয়কৃষ্ণ কয়াল

রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

হঠাৎ হাটে রব উঠে গেল মাটি-কাটা লোকে প্রধান বাবুকে পেটাচ্ছে।

যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল। সংগে সংগে সারা হাটের লোক হুমড়ি খেয়ে ছুটল অঞ্চল-প্রধানের অফিসের দিকে। হাটেরই এক ধারে অফিস। মাঝারি সাইজের একখানা পাকা ঘর। সামনে এক ফালি ফাঁকা মাঠ, সেখানে একটা টিউব-অয়েল। মুহূর্তে সেই মাঠ ভর্তি হয়ে লোক ঠেসে গেল ঘরের বারান্দায়। দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জোড়া জোড়া কৌতূহলী চোখ।

চক্ষুস্থির হয়ে যায় প্রধান সখারাম বাবুর। সামান্য একজন মাটি-কাটা মজুর নিরাপদর জেরার সামনে তাল হারিয়ে ফেলেন তিনি। যখন তাল খুঁজে পান তখন আর গালাগালির ভাষা জোটে না। প্রচণ্ড ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে শুধু গর্জন করে ওঠেন—"আঃ, কি হচ্ছে কি নিরাপদ! এখানে কি হাট বসাবে নাকি?"

নিরাপদ গায়ে মাখে না সে ধমক। আগের মত স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করে—"আংগার (আমাদের) মাটি-কাটার টাকা তুমি এনেছ কি-না তাই বলো না!"

ক্রুদ্ধ সখারাম আর একবার তাকালেন বাইরের দিকে। ঘরের সামনে তখন রীতিমত ভিড়। অসংখ্য মাথা কৌতূহলী চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে। ওরা শুধু নিরাপদর দলবল নয়, চৈত্রের বর্শা ফলা রোদ উপেক্ষা করে ছুটে এসেছে হাটের হাটুরে, দোকান ফেলে রেখে দোকানী। শরীর নিংড়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে—তবুও ঠায় দাঁড়িয়ে সবাই। জলের নীচে মুখ ডুবিয়ে নিঃশ্বাস ফেলার মত করে কেউ কেউ ভিড়ে মুখ লুকিয়ে চটুল মন্তব্য ছড়াচ্ছে। কেউ কেউ বা দরাজ গলায় উষ্মা ছড়াচ্ছেঃ

"দেনা, শালাকে খতম করে দেনা!"

"বাইরি একবার টেনে বার করে আন নিরাপদ...টাকা পাই আর না পাই, হাতটা গরম করে নিই!"

"চোর, শালা চোর, তিন পুরুষের ধাড়ী চোর!"

সখারামের খুব ইচ্ছে করছিল লোকগুলোকে একটু চিনে রাখেন ভালো করে। কিন্তু মাথা উঁচিয়ে দেখতে গিয়ে আবার নুন ছোঁয়া জোঁকের মত গুটিয়ে নিতে হলো নিজেকে। ওদিকে তাঁর ছেলের শ্বশুর সনাতন...এদিকে জামাই রামকান্ত...। আত্মীয় পরিজনের চোখের সামনে এইভাবে অপমান...! প্রচণ্ড ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন তিনি। নিরাপদকে ধমক দিয়ে বলেন—"টাকার খবর নেবার তুই কে রে ছোট লোক! বের হ'—বেরিয়ে যা বলছি আমার ঘর থেকে...নাহলে ঘাড় ধরে...!"

বলতে বলতে থমকে গেলেন তিনি। নিরাপদর চোখের স্ফুলিঙ্গ। তাঁর কথার প্রতিবাদে সে স্ফুলিঙ্গ চমকে ওঠে—ভদ্রভাবে কথা বলো বলছি...মাটি কেটেছি আমরা আর টাকার হিসেব আমরা নিবুনি তো নেবে কে, নিধিরাম?"

স্তব্ধ হয়ে গেলেন সখারাম। ছোটলোকের মুখ দিয়ে এত বড় ধমক এই বোধহয় তাঁর জীবনে প্রথম। প্রচণ্ড ক্রোধ থাকলেও ভেতরে ভেতরে কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি। চুপ করে যান নিজে থেকে। কিন্তু তাঁর ক্রূর দৃষ্টি স্থির বিঁধে থাকে নিরাপদর মুখে।

নিরাপদ আবার জেরা করে—"কি? জবাব দিচ্ছনা কেন? বি ডি ও থেকে তুমি আংগার মজুরীর টাকা আনোনি?"

বাইরের লোকও বোধহয় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। নিরাপদকে উদ্দেশ্য করে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—"টাকা থাক্ নিরাপদ...ওই শালার একবার ঘাড়টা ধরে বাইরি বার করে দে...টাকা এনেছে কি-না আমরা জিগ্যেস করতিছি!"

উত্তেজিত জনতা। কৌতূহলী হাটুরে। সবার মুখেই বিস্ময়। বিস্ময় সখারামের মুখে, সেই সঙ্গে লজ্জা, আর ভয় আর সীমাহীন ক্রোধ। বড় অসহায় বোধ করেন নিজেকে। পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ দমন করে তিনি নিরাপদকে জিগ্যেস করেন—"সবার মজুরীর টাকা তোর কাছে দিলি হবে?"

—"হ্যাঁ, হবে। টাকা এনেছ কি-না তাই বলোনা তুমি?"

—"হ্যাঁ, এনেছি!" যেন ব্যর্থ আক্রোশে তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে পরাজয়ের স্বীকৃতি। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ আর বিদ্রূপে সরব হয়ে ওঠে বাইরের জনতা—"তবে শালা, এতদিন বলিস্‌নি কেন, পকেট খরচা করবো বলে বুঝি?"

নিজের মনে দাঁত কড়মড় করেন সখারাম। এত বড় অপমানের প্রতিশোধ হাতে হাতে নিতে না পারার যন্ত্রণায় ভেতরে ভেতরে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠেন তিনি। সমানের জবাব সমানে দেওয়া তাঁর ধর্ম। কিন্তু—। একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে তাঁর। কাল তিনি ভুল করেছিলেন নিরাপদর কাছে স্বীকার করে। আজ সে স্বীকৃতির গ্লানি, জনতার মাত্রা ছাড়ানো কথাবার্তা, নিরাপদর বেপরোয়া ব্যবহার—সব যেন তাঁর প্রতিষ্ঠার ভিতে একটার পর একটা আঘাত দিয়ে যায়।

কিন্তু ভাবনার অবকাশ তাঁকে দেয় না নিরাপদ। ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করে—"তাহলে আংগার মজুরীর টাকাটা এবার দিয়ে দাও তুমি!"

জবাব দিতে এবার একটু বিলম্ব হলো সখারামের। ঠাণ্ডা কথার জবাবটাও তিনি দিতে পারলেন না ঠাণ্ডা ভাবে। বাইরের লোকগুলোর হাসি আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল তাঁর মনে। সে আগুন তিনি উৎক্ষেপ করলেন নিরাপদর উপর—"টাকা যদি তোকে দিলে হয় তবে ওগুলো ওখানে হল্লা পাকাচ্ছে কেন? বল্—সবাইকে চলে যেতে বল্।" সামনের ভিড়ের দিকে আঙুল বাড়ালেন তিনি।

নিরাপদ উপলব্ধি করতে পারে তার অবস্থাটা। সখারামের ওপর একটু মমতাও হয় তার। নিজের দলবল-দের দিকে ফিরে বলে—"আচ্ছা, তোরা এখন একটু যা তো দেখি!"

কিন্তু এক কথায় সরেনা সবাই। কেউ বা ইতস্ততঃ করে। কেউ বা নিরাপদর সঙ্গে জেরা করে—কেন যাবো কেন, টাকা নিয়ে তবে যাবো!" নিরাপদ ধমক লাগায় তাদেরকে—"বলছি এখন যা না তোরা...টাকা তো দেবে বলতেছে!"

ভিড় হাল্কা হয় আস্তে আস্তে। যারা শুধু হাত গরম করতে এসেছিল তারা ক্ষুণ্ণ হলো ব্যাপারটা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায়। তবে সখারামের মুখোমুখি এমন সব কথা বলতে পেরে তারা নিজেদের আক্রোশটা কিছু হাল্কা অনুভব কর। আস্তে আস্তে সরে দাঁড়ায় সবাই এক-পা দু-পা করে। সখারাম বাবুর চোখের সামনে এভাবে বেশীক্ষণ হল্লা করাটাও নিরাপদ নয়। অভাব সবার হাঁড়িতেই।

সব লোক চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি বসে থাকলেন স্থির ও নির্বাক। নিরাপদ তখনও তাঁর সামনে তেমনি দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাঁর চোখ তখন আর তার ওপর আগুন ছড়াচ্ছিল না। বাইরের টিউব-ওয়েলটার দিকে নিরলস দৃষ্টি ছড়িয়ে তিনি যেন কি ভাবছিলেন নিজের মনে। মাথার চুলের ভেতর থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল কপাল বেয়ে। পাতলা সাদা পাঞ্জাবীটা ভিজে সপ্‌সপে-গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। তবুও ভিড় কমে যেতে তিনি বেহারীকে আদেশ দিলেন—"এ্যাই! সামনের দিকের জানালা দরজাগুলো সব বন্ধ করে দেতো। আর এক গ্লাস জল দে...খাওয়ার...।

কয়েক মাস আগে এই অঞ্চলের রাস্তায় নতুন মাটি পড়ে। তখন লোকের মজুরী দেওয়া হয় প্রধান সখারাম বাবুর হাত দিয়ে। শেষের দিকে বেশ কিছু করে মজুরী সবারই বাকি পড়ে যায়। আজ যারা এসেছিল তারা তাদেরই কয়েকজন, আর নিরাপদ—সেও তাদেরই একজন।

যখন মজুরী দিতে পারেননি তখন সখারাম বলে-ছিলেন—"টাকা ফুরিয়ে গেছে। সরকার থেকে দিলে আবার দেওয়া হবে।"

সরকার থেকে টাকা এসেছিল অল্পদিন পরেই। প্রধান সখারাম বাবু নিজেই সে টাকা বি ডি ও অফিস থেকে তুলে আনেন। কিন্তু মজুরদের হাতে আর সে টাকা পড়েনি। সে টাকা তিনি নিজের পকেটেই রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা তিন পুরুষের। বাবা ও ঠাকুর্দা ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট; আবার অঞ্চল-পঞ্চায়েতী ভোটে জিতে তিনি হয়েছেন প্রধান। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিশ্বাসে তিনি টাকা পকেটস্থ করেই চেপে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা ওখানেই মিটে যাবে।

সাধারণতঃ যায়ও তাই। এবারেও গিয়েছিল। মজুর-গুলো প্রথম প্রথম আশা নিয়ে আসতো আর নিরাশ হয়ে ফিরে যেত। প্রধানবাবুও প্রথমে ভদ্র ও পরে উগ্র ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন—"টাকা এলে খবর দেওয়া হবে; কারও আসার দরকার নেই।"

কাল নিরাপদ গিয়েছিল বি ডি ও'তে। সেখানে কোন রকমে আসল খবরটা চাউর হয়ে যায় তার কাছে। তারপর তার থেকে আরও সাতজনের কাছে। কাল অবশ্য বি ডি ও থেকে ফিরেই নিরাপদ এসেছিল, সখারাম বাবুর কাছে। সখারাম প্রথমে অস্বীকার করেন। কিন্তু যখন বুঝলেন নিরাপদ-ই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা তখন তাকে কিছু টাকা দিয়ে নিজে নিরাপদ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজী হলো না নিরাপদ; তারপর আজ হাটে এই অবস্থা।

সখারাম ভাবতেও পারেননি যে সামান্য মাটি কাটা মজুরগুলো এসে হাটের মাঝখানে এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে। এখন তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে নিরাপদর ওপর। ওদেরকে দল বেঁধে ডেকে সেই-ই যে এখানে এনেছে এ ব্যাপারে তাঁর আর কোন সন্দেহ থাকে না। ইচ্ছে করছিল একা নিরাপদকে এইভাবে ঘরের মধ্যে পেয়ে সমস্ত রাগ মিটিয়ে নেন। কিন্তু সাহস হয় না। শান্ত গলায় তিনি নিরাপদকে প্রশ্ন করেন—"তোমার কত টাকা পাওনা আছে?"

"সাতচল্লিশ টাকা বারো আনা।"

"হুঁ! আর তোর দলের সবার?"

—"সে তো তোমার খাতায় আছে।"

"আমার খাতা কেন? তোদের হিসেব নেই?"

—"আছে। দরকার হলে আন্‌বো।...তবে কম কারও নয়...ওই রকমই পাবে সবাই। তবে কারও দু' একটাকা কম আর...।"

—"থাম্। খাতা এনেছিস্ সঙ্গে করে?"

—"না। আজ আনিনি!"

মুহূর্তের মধ্যে আবার ক্রোধে ফেটে পড়েন সখারাম। অনেকক্ষণ পরে যেন তিনি নিরাপদর ওপর ঝাল ঝাড়ার একটা সুযোগ পেয়েছেন, সে যত সামান্যই হোক্। ক্রুদ্ধ গর্জনে ঘর কাঁপিয়ে তুললেন তিনি—"কেন, খাতাটা

আনিসানি কেনরে শা—শুয়োরের বাচ্চা! খাতা না নিয়ে কি খেলা করতে এসেছিস্!"

নিরাপদর চোখ দুটো জলে উঠল একবার; কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কেউটের কোমরে বাড়ি মেরে তার ক্রুদ্ধ অসহায় গর্জন দেখে লোকের যেমন পরিতৃপ্তি হয় সেই তৃপ্তি পেয়ে বসল তাকে। ঠাণ্ডাভাবে জবাব দিল—"কাল সকালে না হয় খাতাটা দেখানো যাবে!"

—"তবে কাল সকালেই এসে টাকা নিয়ে যাবি। আজ বেরিয়ে যা এখন!"

—"বেশ! কাল সকালেই আসবো। তুমি এসো অফিসে!"

সখারাম সাড়া দেয় না সে আহ্বানে। নিরাপদ একটু দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ, তারপর বন্ধ দরজা হাট করে খুলে দিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। তার সবল দৃপ্ত পা ফেলার ভংগী দেখে মনে তীব্র জ্বালা অনুভব করেন সখারাম। তাঁর ভাবতেও কষ্ট হয় এই হাঁটুর ওপর তুলে কাপড় পরা, কালো প্যাকাটির মত লোকটা এইমাত্র অপমান করে গেল তাঁকে। কিন্তু সে তা করেছে, সত্যি সত্যিই—চরম অপমান। আজকের হাট ভরা লোক তার সাক্ষী। সখারাম ভাষা খুঁজে পায় না নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার। নিজের শক্তির ওপর তাঁর আস্থা আছে। তাই এ পরাজয়কে তিনি মুহূর্তের দুর্বলতার সুযোগ বৈ অন্য কিছু ভাবতে পারেন না। মনে মনে প্রস্তুতি নেন পরবর্তী অধ্যায়ের।

এমনিতে শুয়ে থাকে যেন হাড়-পাকানো কুমারী মেয়ে। কিন্তু কোটাল এলেই তখন খালটার বিক্রম যায় বেড়ে। এই যেমন আজ—অমাবস্যায়। অনুচ্চ পাড়ির বাঁধে ওর লোনা জলের যৌবন-উচ্ছ্বাস বাধা মানে না। উদ্বেল হয়ে ছোটে ছল্ ছল্ ছলাৎ ছলাৎ। যেন কূল ভাঙার জন্যেই ও আজ বেপরোয়া।

কিন্তু সখারাম জানেন কূল ও ভাঙে না। সে সাহস ওর নেই। এ ওর মুহূর্তের যৌবন—একপক্ষ পরে একদিন—অমাবস্যা আর পূর্ণিমায়। তারপর আবার যে কে সেই।

আজ হাট থেকে সখারাম ফিরছিলেন একটু রাত বাধিয়ে। পেছনে বেহারী। বেহারী বুঝতে পারে বাবুর মনটা আজ বড্ড খারাপ। ভাবনায় ভারি হয়ে পড়ছে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ। গিন্নী মায়ের বারণ আছে। তাই বাবু এমনিতে এত রাত পর্যন্ত আর কোথাও থাকেন না। কিন্তু আজ হাটের হাটুরে সব চলে গেছে, চলে গেছে দোকানী-পশারী। তবুও বাবু খাতায় মুখ গুঁজে চুপচাপ বসেছিলেন। সবশেষে উঠেছেন তিনি। তারপর এই চলেছেন বাড়ির দিকে। লোকচক্ষুকে এড়ানোর জন্যে বাবু যে আজ খালপাড়ের রাস্তা ধরেছেন সেকথা বুঝতে অসুবিধা হয় না বেহারীর। তাঁর হাঁটুনির ধরণটাও আজ বদলে গেছে। যেন হাঁটার ইচ্ছে নেই—এক পা হাঁটেন, এক-পা থামেন। কি যেন এক অসহ্য জ্বালা আস্তে আস্তে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে তাঁকে।

সখারামের নিজেরও তাই মনে হচ্ছে এখন। যে দিকে তাকান সবকিছু যেন তাঁকে বিদ্রূপ করার জন্যেই মুখিয়ে আছে। এই জন্যে আজ হ্যারিকেনের আলোটাও আর সঙ্গে নেননি। কিন্তু অন্ধকার রাতটাও যেন তাকে বিদ্রূপ করছে। এই যে লোনা খাল—এও যেন হিস্‌হিসিয়ে হেসে যাচ্ছে তার ঝড়ে ভাঙা মূর্তি দেখে। থমকে তাকান তিনি খালের দিকে চেয়ে।

বেহারীও দাঁড়িয়ে পড়ে একটু ইতস্ততঃ করে। তারপর আস্তে আস্তে সাড়া দেয়—"বাবু!"

—"কি বেহারী!"

—"অনেক রাত হলো...গিন্নী মা—!"

—"হ্যাঁ, চল্!"

আবার পা চালান তিনি। কিন্তু তাঁর নিবদ্ধ থাকে ছুটে যাওয়া খালের দিকে। পা ভারি হয়ে থাকে আগের মতই। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থবির হয়ে যান আরও কটা পা এগিয়ে এসে।

এই খালেরই পাড়ের গায়ে কাঠা পাঁচেক জায়গা জুড়ে একটা ছোট্ট সবুজ ক্ষেত। এমন অসময়ে এই অঞ্চলে এই প্রথম। লোনাটে জায়গা, তার ওপর গ্রীষ্মকাল। এমনিতে কেউ সাহস করে না। কিন্তু দুঃসাহস হয়েছিল নিরাপদর। সবার 'না'-কে 'হ্যাঁ' করার জন্যেই এ যেন তাঁর চ্যালেঞ্জ। পৌষ-ধান উঠে যেতেই সে শুরু করল 'তাইচুন' চাষ। নিজের জমি ছিল না। নিবারণকে বলে এই ক'কাঠা নিয়েছে এই ক'মাসের জন্যে। পাশা-পাশি কয়েকটা পুকুরও সে ঠিক করে নিয়েছে বলে কয়ে।

প্রথম প্রথম লোকে হেসেছিল তার পাগলামি দেখে। হেসেছিলেন সখারামও। কিন্তু আজ আর তিনি হাসতে পারলেন না। সহজ না হলেও সম্ভব করেছে নিরাপদ। লক্ষ্মী সদয়া তার। সবুজ কলির জঠরে জঠরে সাড়া দিয়েছেন তিনি—ধানে 'থোড়' এসেছে। গর্ভের সেই সম্ভাবনাময় আনন্দে হাসিতে খুশীতে ডগমগ করছে এই ছোট্ট খেতটা।

সখারামের কেন যেন মনে হলো ওই ছুটন্ত খালটার নিরাপদর এ ক্ষেতটাও ব্যঙ্গ করছে তাঁকে। প্রতিশোধ স্পৃহা এমনিতে জ্বালিয়ে মারছিল তাঁকে। এই মুহূর্তে তা আরও দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। আর পা উঠল না তাঁর। পেরেক-পোঁতা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন খালের পাড়ে।

ওপারে বয়ে যাচ্ছে খাল আর এপারে তার নিজস্ব তালে মাথা দোলাচ্ছে ধানের খেত। খালে যৌবন, যৌবন এই খেতে। মাঝখানে খালের পাড়ের শুধু একটু সামান্য ব্যবধান। আর ব্যবধান লোনা আর মিঠের। খালে বয়ে যাচ্ছে ঘন লোনা জল, আর খেতের বুকে পুকুরের মিঠে

জল। আজ দুপুরেই সেচুনী ধরে নিরাপদ আর তার বৌ বোঝাই করে দিয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে হাসি ফোটে সখারামের মুখে। তাঁর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে প্রশান্তির একটা চাপা দীর্ঘ-শ্বাস। তারপর ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাক দেন—"বেহারী!"

—"কি বাবু? চলুন।"

—"যাবো!...হ্যাঁ যাবো রে যাবো...তুই এক কাজ করতে পারিস্‌!"

—"কি কাজ বাবু?"

আবার এক মুহূর্তে কি যেন ভেবে নিলেন সখারাম; একটু যেন ইতস্ততঃ করেন ক্ষেতটার দিকে তাকিয়ে। তারপর মরীয়া হয়ে বলে ওঠেন—"তুই এক ছুটে একটু বাড়ি যাতো বেহারী!"

—"বাড়ি! আর আপনি?"

"আমিও যাবো। তুই আগে গিয়ে একটা কোদাল আনতো দেখি।"

—"কোদাল!" বিস্মিত হয় বেহারী।

—"হ্যাঁ রে কোদাল! আস্তে করে নিয়ে আসবি। কেউ যেন জানতে না পারে।"

—"কেন, কোদাল কি হবে বাবু?"

—"বলছি যা না। এলে তখন বুঝতে পারবি... যা ছুটে যা, বেশী দেরী করিস না বাবা।...আর হ্যাঁ, তোর গিন্নী মা যেন জানতে না পারে...যা বাবা যা।"

বাবুর তাড়ার সামনে তাল হারিয়ে ফেলে বেহারী। এ আবার কি বিচিত্র খেয়াল! মাঝরাতে কোদাল দিয়ে কি হবে? তবুও অমান্য করতে পারেনা বেহারী তার বাবুর আদেশ। তাছাড়া আজ বাবুর অবস্থা দেখে তার কেমন একটু দয়াও হয়।

উত্তেজনায় রাতে ঘুম হয়না নিরাপদর। আর ঘুম এলেও তা ভেঙে যায় প্রচণ্ড উত্তেজনায়। সকাল হওয়ার আগেই হেঁকে ডেকে নিরাপদ পাড়া মাথায় করে তোলে।

সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে নিরাপদ ছুটে আসে তার ক্ষেতটার দিকে। মাস খানেক হলো, এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সকাল হলেই ক্ষেতটার আকর্ষণে একবার সে এসে দাঁড়ায় এর পাশে। নিবিড় দরদ ঝরে পড়ে ওর চোখের দৃষ্টিতে। তাতেই যেন ক্ষেতটার সান্ত্বনা। দুলে দুলে বাতাসে ফুলে ফুলে ওঠে ওর তাজা সবুজ পাতা।

এমনিতে ওর গতর সম্বল। কিনে খেতে হয় সারাটা বছর। এ বছর তার অনেক আশা—চাষের ধানের চালে ভাত খেতে পারবে কিছুদিন। এ ব্যাপারে অবশ্য তার বৌ-এর উৎসাহ তার চেয়ে অনেক বেশী। সে চাষী—তার আনন্দ চাষে। এতদিন সে চাষ করেছে অন্যের ক্ষেতে। ফসলও উঠেছে অন্যের ঘরে। তার আস্বাদন পায়নি তার ঘরের বৌ। কিন্তু স্বামীর চাষের ধান নিজের হাতে চাল করে সেই চালে ভাত রেঁধে স্বামী পুত্রের কোলে ভাতের থালা ধরে দিতে কি যে আনন্দ—সে শুধু বোধহয় বৌরাই বোঝে।

নিরাপদ ভাবে অন্যভাবে। পাঁচ কাঠা জমি। কিন্তু ঠিকমত ফললে পাঁচ মণ ধান বাঁধা। পাঁচটা লোকের সংসার। গত বছর কিছু দেনা হয়েছিল। এ বছর সেটা শোধ হবে, নতুন করে দেনাও হয়তো আর এ বছর করতে হবে না।

কিন্তু আজ ক্ষেতের পাশে এসে অবাক হয়ে যায় নিরাপদ। ক্ষেত ছাপিয়ে জল বাইরে বেরিয়ে এসেছে রাতে। কিন্তু ক্ষেতে তো জল কানায় কানায়। তবে এ বাড়তি জল এলো কোথা থেকে? এক ছুটে সে উঠে আসে খালের পাড়ে।

এখন খালে ভাটির টান। কিন্তু তার আগেই সে সর্বনাশ করে গেছে যেটুকু করার। এখন কাল নাগিনী ফিরে চলেছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, তার বিষগ্রন্থি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ওই সবুজ ক্ষেতটার বুকে।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে নিরাপদর। বুকের মধ্যেও অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। একটু এগিয়ে এসে সে বুঝতে পারে কে ফাঁক করে কেটে দিয়ে গেছে খালের পাড়। কালনাগিনীকে কে যেন ডেকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে তার ক্ষেতে। তার নোনা বিষে ঝিমিয়ে পড়েছে আসন্ন প্রসবা সবুজ ক্ষেত।

মাথায় হাত দিয়ে খালের পাড়ে বসে পড়ে নিরাপদ। গোটা হৃৎপিণ্ডটা তার যেন দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। বুঝতে পারে না সে কি করবে এখন। কাঁদতে গিয়েও যেন কোথায় ধাক্কা খায় সে। হাসতে চেষ্টা করেও সে হাসতে পারে না। খালপাড়ের নোনা মাটিতে তার সেই ছোটবেলার ধুলো খেলার ভংগীতে বসে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে ক্ষেতটার দিকে। অনেকক্ষণ পরে তার খেয়াল হলো তার দৃষ্টিটা কেমন যেন ঝাপ্‌সা হয়ে উঠেছে। তারপর দর দর করে জল গড়িয়ে পড়ে তার কোলে, হাঁটুতে। বুঝতে পারেনা সে হঠাৎ তার চোখের জলে এমন জোয়ার এলো কোথা থেকে!

এমন সময় কে একজন তাকে ডাক দেয় তার বাড়ির দিক থেকে। সম্বিত ফিরে পায় নিরাপদ। এতক্ষণে চৈতী রোদ ধারাল হয়ে উঠেছে। সেই রোদের স্পর্শে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায় সে। তাকিয়ে দেখে তার গ্রামের দিক থেকে সবাই বেরিয়ে পড়েছে দল বেঁধে। ছোট বড় সবাই আজ বেরিয়ে পড়েছে মজা দেখার জন্যে—প্রধান বাবুর অফিসে আজ কি হয়।

আর চুপ করে থাকতে পারেনা নিরাপদ। আস্তে আস্তে উঠে ওই দলের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার জন্যে তৈরী হয় সে।

আগষ্ট বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে / সুকুমার দাস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৪২-এর ৯ই আগষ্ট তারিখটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। কেন না পরাধীন ভারতে এদিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়নের জন্য সারা ভারতব্যাপী সুরু হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত এক মরণপণ সংগ্রাম। এর আগের দিন অর্থাৎ ৮ই আগষ্ট কংগ্রেসের বোম্বাই শহরের অধিবেশনে অনিবার্য কারণেই গান্ধীজী পাশ করালেন "ভারত ছাড়" প্রস্তাব। সারা ভারতে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী এই পরম মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করে বসেছিল। ইংরাজ শাসনে, শোষণে ও অন্যায়ে তাদের অন্তরে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিলো, এ প্রস্তাব পাশের পরদিনই তা' প্রজ্বলিত হ'ল বিদ্রোহের লেলিহান শিখায়। "ইংরাজ ভারত ছাড়" এবং "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"—এই দুই শ্লোগানে আলোড়িত হ'ল ভারতের আসমুদ্র হিমাচল, অভাবনীয় এ আন্দোলনের ভয়াবহ পরিণাম অনুমান করে আশঙ্কিত ইংরাজ সরকার ক্ষিপ্ত পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ ও মিলিটারী নিয়ে এ ভয়ংকর আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে। এ আন্দোলন যাতে নেতৃত্ব না পায় সে জন্য প্রথমেই তারা দেশের ছোট বড় সকল নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করলো। কিন্তু আন্দোলন এতে থেমে রইলো না। এরই মধ্যে যারা বাইরে ছিলেন তারাই এর নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিনা নেতৃত্বেই এগিয়ে চললো এ আন্দোলন। ইংরাজ সরকারও এ আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে বেপরোয়াভাবে আন্দোলনকারীদের ওপর চালালো অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন। তারা মনে করলো নিপীড়নের কাঠিণ্যে ও নির্মমতায় ভয়ে পিছু হঠবে ওরা; কিন্তু ফল হলো ঠিক উল্টো। গান্ধীজী যতই নির্দেশ দিন যে এ আন্দোলন চলবে অহিংসপথে, মার খাওয়া মানুষগুলি ততই একে টেনে নিয়ে এলো হিংসার পথে—সন্ত্রাসের পথে।

শুরু হ'ল সহিংস প্রত্যাঘাত, সন্ত্রাসের কাজ। আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠলো এই সন্ত্রাসবাদের প্রচণ্ডতায়। তারা উপড়ে ফেললো রেল লাইন আর টেলিফোন খুঁটি, কেটে দিল টেলিগ্রাফের তার, ভেঙ্গে ফেলল রাস্তা, সড়ক ও পুল। আর জোর করে দখল করে নিল থানার পর থানা। নেতৃত্ববিহীন এ আন্দোলন তখন আর নিছক অসহযোগ আন্দোলন নয়, এ রূপ নিল বিপ্লবের—আর সেই বিপ্লবই "আগষ্ট বিপ্লব" নামে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে স্থান করে নিল।

এ বিপ্লবকে দমন করবার জন্য বিদেশী শাসকগোষ্ঠীও মরিয়া হয়ে জনগণের উপর চালালো লাঠি, গুলি। ওপর থেকে মেশিনগান দেগে ও বোমা ফেলেও ওরা শত শত বিপ্লবীদের নির্বিচারে হত্যা করলো। ভারতের কোন প্রদেশই সেদিন এ আন্দোলনের শরিক হতে ছাড়েনি। সিন্ধুর ছাত্র হিমু কালানি এ আন্দোলনে প্রথম শহীদ হয়ে আত্মাহুতির জন্য বিপ্লবীদের আহ্বান জানায়। একমাত্র দিল্লীতেই ১১ই ও ১২ই আগষ্ট পুলিশের ৪৭ বার গুলিবর্ষণে নিহত হলো ৭৬ জন। অনুরূপ ঘটনায় নানা অজানা শহীদের সঙ্গে বিহারে নিহত হ'ল উমাকান্ত প্রসাদ, রামানন্দ সিং, সতীশ প্রসাদ ঝা, আসামে ভোগেশ্বরী, বালুরাম, কনকলতা, মুকুন্দ, বাংলায় মাতঙ্গিনী হাজরা, রামচন্দ্র বেরা, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, বৈদ্যনাথ সেন প্রভৃতি অসংখ্য বিপ্লবী। অগ্নিঝরা এ বৈপ্লবিক কর্মধারায় গৌরবদীপ্ত মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠলো সাতরা, বালিয়া আর মেদিনীপুর। ব্রিটিশ সরকারের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো "স্বাধীন সরকার"। মেদিনীপুরের তমলুক হয়ে উঠলো বিপ্লবীদের একটি দুর্গ। একদিন ঐ অঞ্চলের বিপ্লবী জনগণ হাজারে হাজারে জড়ো হয়ে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুললো মেদিনীপুরের আকাশ-বাতাস—উদ্দেশ্য তমলুক থানা দখল। তারা অকুতোভয়ে এগিয়ে চললো থানার দিকে, চললো পুলিশের গুলি। এতেও যখন কাজ হলো না তখন ডাকা হ'ল মিলিটারী। মিলিটারীরা এবার শুরু করলো বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। হতাহত হলো অসংখ্য মানুষ; কিন্তু জনতা স্থান ত্যাগ করলো না। মিছিলের পুরোভাগে ছিলো রামচাঁদ বেরা, প্রথমেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, ওকে পড়তে দেখে এগিয়ে গেল তের বছরের বালক লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, মৃত্যু তাকেও কোলে তুলে নিলো মুহূর্তের মধ্যেই। বিভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ হ'তে না দিয়ে এগিয়ে গেলেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। তাঁর জরাজীর্ণ মুখে তখন যেন মরণজয়ী বিপ্লবীর দীপ্তি। সৈনিকের গুলিতে মাতঙ্গিনীর মাথা এ ফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেলো কিন্তু মৃত্যুর পরেও ছাড়লেন না ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা—আঁকড়ে ধরে রইলেন। তাঁর সাথে নিহত হলো পুরীমাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, জীবনচন্দ্র বেরা, আরও একচল্লিশজন। জনতা কিন্তু তবুও দমলো না, সারারাত থানা ঘিরে রইলো। সকাল বেলা জনতার সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়তেই ওরা ইংরাজ সরকারের সমস্ত প্রতিরোধকে চূর্ণ করে অধিকার করে নিল থানা—আগুন জ্বালিয়ে দিলো দারোগার বাড়ী। এই আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপুর শুধু বাংলারই নয়, সমগ্র ভারতেরই পীঠস্থানরূপে স্বীকৃতি পেল। আর বাংলার পল্লীর বৃদ্ধা জননী মাতঙ্গিনী হাজরা, বাংলার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরাঙ্গনা হিসাবে হয়ে রইলেন আমাদের চির নমস্যা।

এক বছর স্থায়ী এ বিপ্লবে কত লোক প্রাণ

দিয়েছিল, তার হিসাব আজও মেলেনি। ইংরাজ সরকার বিশ্বের কাছে নিন্দনীয় এ অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশ করেনি আর দেশের মানুষও তখন হিসাব করে উঠতে পারেনি। সরকারী হিসাব বলে সব মিলিয়ে হাজারখানেক মানুষ এ বিপ্লবে মারা যায়; কিন্তু বেসরকারী হিসাব এর পঞ্চাশগুণ। প্রায় অর্ধ লক্ষ দেশ প্রেমিককে হত্যা করে, কয়েক লক্ষ মানুষকে আহত করে এ আন্দোলন একদিন ওরা দমিত করলো। এ কিন্তু ওদের চরম নির্যাতনেই সম্ভব হয়নি—সম্ভব হয়েছিল নেতৃত্বের অভাবে, গান্ধীজীর অননুমোদনে এবং বাইরে তাঁর অনুরাগীদের বিরোধীতায় আর কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদের এ' বিপ্লবের ভ্রান্ত মূল্যায়নে। আগষ্ট বিপ্লব হয়তো ব্যর্থ হলো—কিন্তু সে শুনিয়ে গেল স্বাধীনতাকামী মানুষের কানে মুক্তির বাণী।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে এই হল আগষ্ট বিপ্লবের চেহারা। এবং অহিংসার পূজারী গান্ধীজীর ডাকেই এর সূচনা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন জাগে অহিংসার পূজারী গান্ধীজীর ঐ অহিংস আন্দোলন হঠাৎ ভিন্ন ভাবে সহিংসখাতে প্রবাহিত হলো কেন? গান্ধীজীকি নিজেও বোঝেনে নি যে, তাঁর ঐ প্রস্তাব মুক্তিকামী ভারত বাসীদের আর অহিংসার মধ্যেই বেঁধে রাখতে পারবে না? আসলে গান্ধীজীও বুঝেছিলেন—তা হ'বার নয়। এবং তিনি ঐ প্রস্তাব পাশও করেছিলেন ভারতের অপ্রতি-রোধ সংগ্রাম ধারাকে লক্ষ্য করেই—একান্ত বাধ্য হয়েই। তিনে বুঝেছিলেন মার খেতে খেতে পরাধীন ভারতবাসী একদিন বিদ্রোহে ফেটে পড়বেই এবং তখন তাঁর নেতৃত্বের তোয়াক্কা তারা করবে না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা ভারতের অবস্থা তখন অগ্নিগর্ভ। হবেই নাই বা কেন? সেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ১৯৩০-এর বাংলায় সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ধারাবাহিক ঘটনাগুলি এবং বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের একের পর এক সন্ত্রাসবাদী কর্মতৎপরতায় গান্ধীজীও বুঝেছিলেন জনসাধারণের সংগ্রামী মানসিক-তার কথা।

তাই ১৯৪২-এর ৮ই আগষ্ট কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে তাঁর "ভারত ছাড়" প্রস্তাব পাশ। লোকে জানে ওটা গান্ধীজীর বিরাট সিদ্ধান্ত। কিন্তু পূর্বাপর ঘটনা-গুলি বলবেই যে এ সিদ্ধান্তের প্রকৃত রূপকার ও পথ-স্রষ্টা হলেন ভারতের আপোষহীন সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র। তিনি এর আগেই বুঝেছিলেন যে সংগ্রাম বিমুখ তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে আগেকার পথে স্বাধীনতা আদায়ের নেশায় মেতে আছে' তা আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। এ ক্লীবপথে কোনদিনই কোন দেশে স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি—ভারতেও অসম্ভব। এ জন্য চাই কঠোর আঘাত। তাই আঘাত হানতে হবে ইংরাজ শাসনের বনিয়াদে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালেই বিপন্ন ইংরাজ সরকারকে আঘাত হানার উপযুক্ত সময় ভেবে তখনই তিনি সরকারকে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার "চরমপত্র" দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীগোষ্ঠী তা' সময়োপযোগী নয় বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করেন। ইংরাজের ঐ দুর্বল মুহূর্তে এ চরমপত্রদান অশোভন ও বিশ্বের কাছে নিন্দনীয় হবে বলেও তারা মনে করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এর মাত্র তিন বছর পরেই গান্ধীজী স্বয়ং "ভারত ছাড়" প্রস্তাব পাশ করলেন। অতএব একথা অবশ্যই অনায়াসে বলা যায় যে, এ প্রস্তাব আসলে তিন বছর আগে সুভাষচন্দ্রের আনা 'চরমপত্রে'রই নামান্তর ও স্বীকৃতি। ইংরেজ সরকারের দুর্বল মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র যা করতে চেয়েছিলেন, সেদিন গান্ধীজীও তাই করলেন, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। বিপন্নতা কাটিয়ে উঠে ইংরেজ সরকার তখন অপেক্ষাকৃত সবল। তাই ঐ আগষ্ট বিপ্লবকে দমন করবার জন্য তারা করলো বিরাট শক্তির অনায়াস প্রয়োগ। এ প্রস্তাব সুভাষচন্দ্রের কথা মত তিন বছর আগে আনলে ভারতের ইতিহাস হয়তো আজ অন্য ভাবে লেখা হয়ে যেত।

কিন্তু তা' আর হ'ল না। এখানে শত্রু পরিবেস্টিত হয়ে তা' করা সম্ভব নয় বলেই সুভাষচন্দ্র ১৯৪১-এ ভারত ছেড়ে চলে গেলেন অনক দূরে প্রথমে বার্লিন—পরে টোকিও তারপর সিঙ্গাপুরে। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'আজাদ হিন্দ সরকার।' আর সেই সরকারেরই সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ইংরেজ ও আমেরিকার মিলিত বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে। যুদ্ধ করতে করতে আজাদী সেনারা এগিয়ে এল মণিপুরে, সেখানে উড়িয়ে দিল স্বাধীন ভারতের পতাকা। কোহিমায় এসে অবরুদ্ধ হ'ল ওদের অগ্রগতি। এ চেষ্টাও ব্যর্থ করে দিল ইংরেজ শক্তি, কিন্তু তার আগেই আজাদী সেনারা আঘাত হেনে আলগা করে দিল ওদের শাসনের বনিয়াদ। ওদের মরণপণ লড়াই ইংরেজদের বুঝিয়ে দিল ভারতে বেশীদিন থাকা আর ওদের চলবে না—আজ হোক, আর কাল হোক এ দেশ ছেড়ে ওদের যেতেই হবে। অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দেশের অভ্যন্তরে একদিকে 'আগষ্ট বিপ্লব' ইংরেজ সরকারকে যেমন ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিলো, অপরদিকে আজাদী সেনার প্রচণ্ড মার ওদের শাসনের বনিয়াদটাকে আলগা করে দিয়েছিল। বাধ্য হয়েই ইংরেজ ভারতকে খণ্ডিত করে ক্ষমতা হস্তান্তর করলো। ভারত স্বাধীনতা পেল বটে কিন্তু সে খণ্ডিত স্বাধীনতার মাধ্যমেই দেশে চিরস্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান দুঃখ দুর্দশার উৎসকে বহন করে আনলো। আজ প্রশ্ন জাগে এই স্বাধীনতাই কি চেয়েছিল 'আগষ্ট বিপ্লবের' এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর ঐ সব শহীদেরা? এ জন্যই কি 'আগষ্ট বিপ্লব' বিদ্রোহ জাগিয়েছিল গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষ, নর-নারী, শ্রমিক-কৃষক ও ছাত্র-যুবকদের মধ্যে? নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ সবার প্রাণে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিল কি এরই জন্য? লজ্জার কথা, পরি-

তাপের কথা যে, আজও হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন তুলে দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা বিপ্লবের কর্মতৎপরতায় নেমেছিলেন, আগষ্ট বিপ্লবে যারা সন্ত্রাসবাদী কাজে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন—তাদের ছোট করে দেখানোর এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার প্রতিনিয়ত প্রচার চালিয়েছে যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিতাড়ন নাকি আপোষের পথে, অহিংসার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে এবং এর পিছনে আপোষ বিরোধী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামগুলির কোন মূল্যই নেই। শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে—কংগ্রেসীরাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই সে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা চলছে সুপরিকল্পিত ভাবে। নির্লজ্জের মত দেশের এসব বিপ্লবীদের অবদানের কথা একেবারে অস্বীকার করে একবার জহরলাল নেহরু বলেছিলেন,

"We belong essentially to the Gandhi Age in India. We saw India under foreign rule, we struggled against this and we truimphed under his magnificent leadership and saw the dawn of freedom."

আসলে তিনি স্বীকারই করতে চাননি যে, অহিংসার পথে নয়, দেশের এইসব সহিংস সংগ্রামই বিশ্বযুদ্ধের পর ক্যাবিনেট মিশন, মাউন্টব্যাটেন মিশনকে আপোষ আলোচনায় বসতে বাধ্য করেছিল। তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীও তাঁরই চিন্তাধারায় পুস্ট। তাই তিনিও দিল্লীর লালকেল্লার প্রাঙ্গণে প্রোথিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্বলিত 'কালাধারে'র ইতিহাসে ভারতের বিপ্লবীদের নামোল্লেখ করেননি—এমন কি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামটি পর্যন্ত ওতে রাখেননি। ভারতে আগের রাজনৈতিক অবস্থা থাকলে একথাটা আজও কেউ জনতেই পারতো না—কারণ ওটা সংরক্ষিত ছিল ভবিষ্যতে মানব জাতির (? !) অবগতির জন্য। ভারতীয় জনগণের সঙ্গে এর চেয়ে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা আর কি হতে পারে? দেশের অপর কয়েকজন নেতার সঙ্গে ভারতের একটি মাত্র পরিবার দেশের স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছে—এমন ইতিহাস তিনি লেখালেন কোন সাহসে? এ বেইমানীর জন্য জাতি তাঁকে ছেড়ে দিতে পারে না—বিচার একদিন তাঁর হবেই।

আগষ্ট বিপ্লবের ছত্রিশ বছর পরে এ বিপ্লবে নিহত জানা-অজানা অসংখ্য শহীদের কথা স্মরণ করতে গিয়ে—আজ বার বার মনে প্রশ্ন জাগে স্বাধীন ভারতে যে সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা সেদিন আত্মাহুতি দিয়েছিলেন—সে স্বপ্ন কি শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে? স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ একত্রিশ বছর পরও তাঁদের স্বপ্ন সফল হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। দেশের লোক আজও ভুগছে তীব্র বেকারী ও দুঃসহ দারিদ্র্যের জ্বালায়। দেশের অধিকাংশ মানুষই আজ পিষ্ট হচ্ছে দেশেরই মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনী পরিবারের শোষণের যাঁতাকলে। সমাজের সর্বস্তরে আজ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে সর্বনাশা এক অবক্ষয়ের চিহ্ন। সে জন্যই বলি, ওদের স্বপ্ন আজও সফল হয়নি এবং পুঁজিবাদী এ সমাজ ব্যবস্থায় তা' হওয়াও সম্ভব নয়। তাই আজ আগষ্ট বিপ্লবের সহস্র শহীদের কথা স্মরণ করে কবির ভাষাতেই দেশের যুব সমাজের কাছে প্রশ্ন তুলি,

'বীরের এ রক্ত স্রোত,
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি
ধরার ধুলায় হবে হারা?'

উত্তরে বলি না। বিলম্ব হলেও বীরের ঐ রক্তস্রোত আর মাতার অশ্রুধারা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। দেশের চেতনাসম্পন্ন যুব শ্রেণীই পারবে তাঁদের স্বপ্নকে সফল করে তুলতে। আগষ্ট বিপ্লব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই আজ তাদের প্রতিনিয়ত লড়তে হবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে।

প্রাক্ স্বাধীন যুগে ঐ সব বিপ্লবীরা লড়াই করেছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের জঞ্জালকে দেশ থেকে বিতাড়নের জন্য, আর আজ তাদেরই উত্তরসূরীদের নিরলসভাবে লড়তে হবে দেশের সকল অনর্থের মূল ঐ পুঁজিবাদের জঞ্জাল সরাবার জন্য। আর সে জন্য কবির ভাষাতেই আজ ওরা শপথ নিক,

"যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
দুই হাতে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল
তারপর হবো ইতিহাস।"

ছাত্র সংসদের কাজ / সমীর গুহঠাকুরতা

প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধিতে তৎকালীন ছাত্রসমাজের সক্রিয় ভূমিকার কথা সকলেরই স্মরণে আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র অধ্যায়েই বিক্ষিপ্তভাবে হলেও ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ধীরে ধীরে দানাবাঁধার পথে রাজনৈতিক নেতারা সমাজের শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়কে মূল সংগ্রামে সংগঠিতভাবে সামিল করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকেন।

প্রাক স্বাধীনতা যুগ থেকেই শিক্ষায়তনের অভ্যন্তরে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে সমাজের মূল রাজনৈতিক ব্যাধি দূর করার সংগ্রামেও ছাত্র সমাজ সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বেশী বেশী করে ছাত্রসমাজ সামিল হয়েছে অন্যদিকে শিক্ষায়তনের আভ্যন্তরীণ সাধারণ সমস্যাগুলি সমাধানের সংগ্রামেও ছাত্রসমাজ বেশী বেশী করে নিজেদের যুক্ত করেছে। বাইরের সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়াও শিক্ষায়তনের আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে শিক্ষায়তন পরিচালক মণ্ডলীর (যার অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশের অনুগত) বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তাও তৎকালীন ছাত্রনেতৃত্ব অনুভব করেন। সেখান থেকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত ছাত্র সংসদ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ছাত্রসমাজের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশ ঘটতে থাকে। শিক্ষায়তনের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার মঞ্চ হিসাবেও ছাত্রসংসদের প্রয়োজনীয়তার কথা ছাত্রসমাজের উপলব্ধিতে আসে। প্রাক স্বাধীনতাযুগেই ছাত্র আন্দোলনের ফলস্বরূপ ছাত্র সংসদ গঠনের অধিকার স্বীকৃত হয়। পরবর্তী সময় ছাত্র আন্দোলনের বিকাশের সাথে সাথে সংসদ গড়ার অধিকারও ক্রমশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আজকের দিনে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির স্বীকৃতিও সংগ্রামের মাধ্যমেই ছাত্রসমাজ অর্জন করেছে। বর্তমানে আমাদের রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ গড়ার ক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলীকেও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হয়। নির্দিষ্ট সংবিধানের ভিত্তিতেই সংসদ পরিচালিত হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা সবক্ষেত্রে পালন করা হলেও সাধারণভাবে ছাত্রসংসদ গঠন এবং পরিচালনার দায়িত্ব ছাত্রসমাজের—এই অধিকারও সর্বজনস্বীকৃত। ছাত্ররা প্রয়োজনে ছাত্রসংসদের সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবে—এই অধিকার সর্বজনস্বীকৃত। এই অধিকার প্রয়োগ করার মধ্য দিয়েও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়নের ভিত্তিতেই ছাত্রসংসদের ভূমিকা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ছাত্রসমাজের নিজস্ব খোরাক মেটাবার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক ছাত্রসংসদের সংবিধানেই ছাত্রসংসদের কিছু নির্দিষ্ট অধিকার স্বীকৃত আছে। ছাত্রসংসদ কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরিচালিত হবে তার উপরই নির্ভর করে সংসদের সংবিধানে স্বীকৃত অধিকারগুলি ছাত্র স্বার্থে ব্যবহার হবে কিনা। শিক্ষায়তনে প্রবেশ করার সাথে সাথেই ছাত্র-ছাত্রীরা সংসদের সভ্য হয়। এই সভ্যদের অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ আসে সংসদ নির্বাচনে। নিজস্ব পছন্দ মতো প্রার্থীদের নির্বাচিত করার মধ্য দিয়ে যে চেতনা জাগ্রত হয় তাকে সম্প্রসারিত করার দায়িত্ব ছাত্রসংসদই পালন করতে পারে। সংসদ নির্বাচন পরবর্তীকালে তার প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে বেশী বেশী সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্ত করে সংসদের প্রতিটি কার্যকলাপের প্রতি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহশীল করে তুলতে পারে। এর ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেকের একে অপরের জন্য এগিয়ে আসার মানসিকতা গড়ে উঠবে।

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই সংসদের সভ্য এবং সংসদের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদেরও দায়িত্ব আছে। এই চিন্তায় প্রত্যেকে পরিচালিত হলে সংসদের কাজও অনেক ত্রুটিমুক্ত রাখা সম্ভব। বিগত ক'বছর সংসদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুই বলার অধিকার ছিল না। এই অধিকার ছাত্রসমাজ আবার ফিরে পেয়েছে। এর সর্বাত্মক প্রয়োগে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ উভয়কেই সচেতন থাকতে হবে। ছাত্রসংসদ দুর্নীতি মুক্ত হলে শিক্ষায়তন পরিচালকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও সামাজিক দুর্নীতিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

ছাত্রসংসদ গড়ার দাবীতে ছাত্র আন্দোলন এবং আজকের দিন পর্যন্ত সংসদ গড়ার অধিকার প্রয়োগের আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখা দেবে তাহ'লো—ছাত্রসমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ জাগ্রত করার হাতিয়ার হিসাবে ছাত্রসংসদকে ব্যবহার করা। ছাত্রসমস্যা, শিক্ষা সমস্যা প্রসঙ্গে ছাত্রসমাজকে ক্রমশ বেশী বেশী করে চিন্তাশীল করে তোলার ক্ষেত্রেও ছাত্রসংসদ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের

দেশের ১৮ বছর বয়সে ভোটাধিকার সাধারণভাবে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি স্বীকার করলেও আজ পর্যন্ত সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়নি। ছাত্র জীবনেই প্রথম নিজস্ব চিন্তার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পাওয়া যায়। ছাত্রসংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন ছাত্রসংস্থাকেই নিজস্ব প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের নিজস্ব বক্তব্য নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থিত হতে হয়। সাধারণভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন আইনসভার নির্বাচনের সময় যেমন দেশের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য জানার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় তেমনি সংসদ নির্বাচনের সময়ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন ছাত্রসংস্থার বক্তব্য জানার জন্য বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষায়তনের নিজস্ব সমস্যা ছাড়াও সাধারণভাবে শিক্ষাসমস্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ছাত্রসংস্থার বক্তব্যও সংসদ নির্বাচনী প্রচারে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগায়। এর মধ্য দিয়েই শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত চিন্তা গড়ে তোলায় ছাত্রসংসদ যথেষ্ট সাহায্য করে।

নির্বাচিত ছাত্রসংসদ ছাত্রসমাজের সাংস্কৃতিক, নৈতিক মান উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান সমাজের নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার উপযোগী সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক মান গড়ে তোলার জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ছাত্রসংসদগুলি এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। পচা গলা সংস্কৃতির পরিবর্তে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করার কাজে ছাত্রসংসদ প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারলে সমাজের ভবিষ্যৎ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব। শুধুমাত্র সময় অতিবাহিত করা অথবা মানসিক খোরাক মেটানোর প্রয়োজনেই 'সংস্কৃতি' নয়— সমাজে সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জীবনকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার বিকাশের জন্য 'জনগণের জন্য শিল্প ও সংস্কৃতি'কে গ্রহণ করার মনোভাব গড়ে তুলতে ছাত্রসংসদ অগ্রণীভূমিকা পালন করতে পারে। এই ভূমিকা সফলভাবে পালন করার মধ্য দিয়েই, ছাত্রজীবন থেকেই 'জনগণের সপক্ষে' দাঁড়াবার মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রত্যেক ছাত্রসংদেরই নিজস্ব শিক্ষায়তনের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য কতগুলি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়। যতই আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকুক না কেন 'জীবনবোধ' জাগ্রত করার উপযোগী সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ পরিচালনার বিষয়টি সংসদ পরিচালকদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। ছাত্র অসন্তোষকে বিপথে পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ছাত্রসংসদ পরিচালিত হলে শিক্ষায়তনে নৈরাজ্য সৃষ্টিতেই ছাত্রসংসদ সাহায্য করবে। সেক্ষেত্রে নৈতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়টি আদৌ বিবেচনার মধ্যে থাকে না। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করার পরিবর্তে ছাত্র সমাজের দৃষ্টি প্রকৃত সমস্যা থেকে অন্যত্র নিবদ্ধ করার জন্য বর্তমান সমাজের তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি যথেষ্ট কার্যকরীভূমিকা পালন করে। ছাত্র মনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ পরিচালিত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বয়সে নবীন ছাত্রসমাজকে ছাত্রাবস্থা থেকেই 'মানুষের সপক্ষে' দাঁড়াবার মতো করে গড়ে তুলতে ছাত্রসংসদ যোগ্যভূমিকা পালন করতে পারলে ভবিষ্যত গণ-আন্দোলনই লাভবান হবে। সমাজে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার শক্তিও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গড়ে উঠবে। এই কাজ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করা সম্ভব হলে ছাত্র জীবনের সমস্যাসমূহ সমাধানের সংগ্রামে বিপুল সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের সামিল করার কাজটিও সহজ হবে।

ছাত্রমানসে সুস্থ চিন্তাভাবনা গড়ে তোলার জন্যই ছাত্রসংসদের অধীনে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে একদা ছাত্রসমাজ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চার উদ্যোগ গড়ে তোলাই ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বয়সের নিজস্ব ধর্মগুলিকে বিকশিত করে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রসংসদ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ছাত্রমনের অনুসন্ধিৎসাকে বাড়িয়ে তোলা এবং তাকে সঠিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আলোচনা সভা, বিতর্ক ইত্যাদি অনুষ্ঠানসূচী বিশেষভাবে সংগঠিত করার মাধ্যমে শিক্ষাসহ সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করা সম্ভব।

বিগত ক'বছর এ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি সংগঠিত করার পরিবর্তে শিক্ষা ধ্বংসের কাজেই ছাত্রসংসদ ব্যবহৃত হয়েছে। শিক্ষায়তনের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি থেকে ছাত্রসমাজের নজর দূরে সরিয়ে রাখার জন্য, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে গণটোকাটুকি সংগঠিত করার কাজেই সংসদকে ব্যবহার করা হয়েছে। সমস্যায় জর্জরিত ছাত্র-ছাত্রীরা যখন প্রতিনিয়তই বাঁচার তাগিদে কোনক্রমে 'স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ' সংগ্রহের জন্য শিক্ষায়তনে প্রবেশ করছে, তখন বিগত কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষাসমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা না করে শাসকদলের তথাকথিত ছাত্রবাহিনীর মাধ্যমে গায়ের জোরে দখল করা ছাত্রসংসদ মঞ্চকে অবাধে নকলের পরিবেশ তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত ছাত্র আন্দোলনের শরিক হিসাবে অতীতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদগুলি যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল '৭২-এর পরবর্তী অবস্থায় কার্যতঃ গায়ের জোরে তা স্তব্ধ করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় স্বভাবতই সেই অতীত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের প্রশ্নটি একান্ত জরুরী হিসাবে দেখা দিয়েছে।

বর্তমান অবস্থায় রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা-জগতের প্রতি বিশেষ নজর দিচ্ছেন। শিক্ষায়তনগুলোকে কায়েমীস্বার্থান্বেষীদের কবলমুক্ত করা ও শিক্ষা ধ্বংসের নায়কদের হাত থেকে শিক্ষায়তনকে বাঁচাতে রাজ্যসরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব না হলেও রাজ্য সরকার বর্তমান কাঠামোর মধ্যেও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্ত-প্রকার উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাজগতকে যথাসম্ভব দুর্নীতিমুক্ত করা এবং মাথাভারী সিলেবাসের হাত থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। শিক্ষাকে গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবেও কিছু কিছু সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাজ্যসরকার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল প্রতিনিয়তই বাধা সৃষ্টি করছে। এই বাধা মুক্ত করে সরকারকে এগিয়ে যাবার পথে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে রাজ্যের ছাত্রসমাজকে। ছাত্রসংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ছাত্রসমাজ বামপন্থী শক্তিগুলির প্রতিই তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করছেন। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের সমর্থনে গড়ে ওঠা সংসদগুলি শিক্ষা প্রসঙ্গে রাজ্যসরকারের পদক্ষেপগুলির সমর্থনে এগিয়ে না আসলে শিক্ষাজগতের কায়েমী শক্তির হাতকেই শক্তিশালী করা হবে। রাজ্যের ছাত্রসমাজই শিক্ষা সংস্কারের সপক্ষে প্রয়োজনীয় সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসার দায়িত্ব ছাত্রসংসদগুলোর উপর অর্পণ করেছেন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থনের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রসংসদের নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় প্রচার এবং আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমস্ত স্তরের শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচী পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের দাবীতে রাজ্যে ছাত্রসমাজ দীর্ঘ আন্দোলন পরিচালনা করেছে। আশার কথা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমকে নতুন করে সাজানোর জন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষা কাঠামো প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। ছাত্রসংসদগুলিকেও এ বিষয়ে আলোচনা বিতর্ক ইত্যাদি সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। সিলেবাস প্রসঙ্গে এই আলোচনায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব ছাত্রসংসদকেই গ্রহণ করতে হবে।

"স্কুল কলেজ জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও" থেকে শুরু করে উপাচার্যের ঘরে উপাচার্যের সামনেই ছাত্র খুন করার ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষা জগতে যে ধ্বংসলীলা সংগঠিত হয়েছিল তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে রাজ্যের শিক্ষা জগতে বিরাজ করছিল নৈরাজ্য। ছাত্র নামধারী এক শ্রেণীর যুবক এই সমস্ত কাজ সংগঠিত করতে গায়ের জোরে দখলকরা ছাত্রসংসদের ক্ষমতা যথেষ্টভাবে ব্যবহার করেছে। অবাধে নকল করার সুযোগ দিয়ে ছাত্র মানসিকতাহীন যুবকদের শিক্ষায়তনে ঢোকার আইনী ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। এদের অ-ছাত্রসুলভ কার্যকলাপের ফলে শিক্ষায়তনের পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রসমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়ার পথে শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে এ রাজ্যে যে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষায়তন। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ কার্যালয়গুলিকে পরিণত করা হয়েছিল সমাজবিরোধীদের আড্ডাস্থল। গণতান্ত্রিক শক্তির উপর আক্রমণ পরিচলনার কেন্দ্র হিসাবেই সংসদ দপ্তরগুলি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ছাত্রসংসদ কার্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করে নানা অসামাজিক কার্যকলাপ সংগঠিত করার মধ্যদিয়ে শিক্ষায়তনগুলিতে জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে উঠছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে জঞ্জাল জমে পাহাড় থেকে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। রাজ্যের ছাত্রসমাজ শিক্ষায়তনগুলিকে মুক্ত করায় দায়িত্বও ছাত্রসংসদের উপর অর্পণ করেছে।

এই সমস্ত কাজ সাফল্যের সংগে পরিচালনা করার উপর গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনের ভবিষ্যত অনেকটা নির্ভর করছে। নতুন নতুন ছাত্ররা প্রতিনিয়ত শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করছে। তাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছাত্রসংসদ প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারলে সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিই লাভবান হবে। স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে না পারলে, শিক্ষায়তনের অভ্যন্তরে ছাত্রসমাজের গণতান্ত্রিক অধিকারও বিপন্ন হয়ে উঠবে। সমগ্র ভারতীয় জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে যে নতুন চেতনা গড়ে উঠেছে তাকে সম্প্রসারিত করার কাজে ছাত্রসমাজেরও দায়িত্ব আছে। ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ব্যাপক অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে হলে ছাত্রসমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তার ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। ছাত্রসমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তাসম্পন্ন ছাত্র শক্তির পরিধিকে যত বিস্তৃত করা সম্ভব হবে তত ছাত্রসংসদ গঠনের নিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে। একদিকে এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা সৃষ্টি, অন্যদিকে বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে ছাত্র স্বার্থে, গণতান্ত্রিক শক্তির স্বার্থে ছাত্রসমাজকে পরিচালনা করাই ছাত্রসংসদের প্রধান কাজ।

আমেরিকার মহান স্বাধীনতা সনদের অবমাননা আমেরিকা নিজেই

অমিতাভ রায়

স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার। অথচ যুগে যুগে, কালে কালে, দেশে দেশে মানুষের সহজাত এই পবিত্র অধিকার হয়েছে লাঞ্ছিত।

যদিও, কোন দেশে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ কেন ঘটে, এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়—তবুও এই কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে তা হলে অর্থনীতির ব্যাপক বিশ্লেষণের ফলে প্রবন্ধের শিরোনামটি পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হবে। তবে ভি, আই, লেনিনের যুক্তি, তথ্য এবং বিশ্লেষণের উপর অর্থাৎ লেনিনবাদী তত্ত্বের উপর নির্ভর করে এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ হল "ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়"। সাম্রাজ্যবাদ মানেই হল অবর্ণনীয় শোষণ, অত্যাচার, লাঞ্ছনা।

কিন্তু এই শোষণ, অত্যাচার, অবমাননা তো আর চিরদিন মানুষ মেনে নিতে পারে না। তাই যে কোন উপনিবেশের শোষিত মানুষ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে চায়। ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোন মানুষই শান্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায় না। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঘটেছে স্বাধীনতা আন্দোলন। উপনিবেশের নিপীড়িত মানুষের ক্রমাগত সংগ্রামের ধাক্কায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অবিশ্যি, একথা অত্যন্ত সঠিক যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের পরাজয়ের শেষদিন পর্যন্ত চালিয়ে যায় তার পৈশাচিক আক্রমণ, এমনকি অনেক সময় পরাজয়ের পরও বিভিন্ন কৌশলে তার শোষণ অব্যাহত রাখে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র একযোগে প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি দেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করছে ঠিক তখনও চলছে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রকে শোষণের অদ্ভুত খেলা। পাশাপাশি বিপরীত চিত্রও বর্তমান। মাত্র কিছুদিন আগে মুক্ত হয়েছে ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া (কাম্বোডিয়া) অ্যাঙ্গোলা। এমনকি আমাদের দেশও আমাদের দেশের লোকের শাসনাধীনে এসেছে মাত্র একত্রিশ বছর আগে। সুসংগঠিত আন্দোলন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা যায় না।

বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট মানুষ-নিধন যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হল আমেরিকা। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে রয়েছে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ। আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ আমেরিকার কাজকর্ম দেখে আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে যে এই আমেরিকাই আধুনিক পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদী শোষণ মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু হায়! আজ আমেরিকার ইতিহাস আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করছে।

অবিশ্বাস হলেও এটাই বাস্তব সত্য যে বর্তমান পৃথিবীতে আমেরিকাই সর্বপ্রথম সফল হয়েছে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল মুক্ত করতে। সেই ইতিহাস স্মরণ করতে গিয়ে সবার আগে আমেরিকা সম্বন্ধে কতকগুলো কথা জেনে নেওয়া দরকার।

আমেরিকা—প্রাক কথাঃ—

ইউরোপীয় নাবিক ক্রীস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২ খৃীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর পদার্পণ করলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—(পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ)-এর কোন একটি দ্বীপে। পৃথিবী গোলাকার এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করে তিনি পশ্চিম দিক দিয়ে পৌঁছতে চেয়েছিলেন ইউরোপীয়দের স্বপ্নের দেশ ভারতবর্ষে। কিন্তু পৌঁছলেন তখনও পর্যন্ত ইউরোপবাসীর অজানা নতুন এক দেশে। তাঁর পথ অনুসরণ করে ইটালীর আমেরিগো ভেসপুচি পৌঁছলেন মূল মহাদেশে ১৫০৭ খৃীষ্টাব্দে। তাঁর নামানুসারেই ইউরোপবাসীদের কাছে নবপরিচিত মহাদেশটির নাম হল আমেরিকা। ইউরোপীয়দের পদার্পণের আগেও এই ভূখণ্ডটির অবস্থিতি ভূখণ্ডে ছিল। বর্তমানে রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত ২০ লক্ষাধিক মানুষ সেখানে বসবাস করতেন। আদিম হলেও এই সম্প্রদায়ের মানুষের ছিল একটি নিজস্ব ভাবধারায় গঠিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তৎকালীন ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা স্বাধীনতার অধিকার রক্ষায় স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকেই ইউরোপীয়রা শিখেছিল ভুট্টা, টম্যাটো, নীল, তামাক, আলু প্রভৃতির চাষের পদ্ধতি। এদিকে ইউরোপের বণিকশ্রেণী সেই সময় নতুন নতুন সাম্রাজ্য দখলে ব্যস্ত। অতএব সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটল।

আমেরিকায় প্রথম অনুপ্রবেশ করল স্পেনীয়রা সেটা ছিল ষোড়শ শতকের প্রথম দিককার ঘটনা। নতুন পরিচিত দেশটির প্রতি নজর ছিল অনেকেরই। কিন্তু কেউ ঠিক মত ঘাঁটি খুব তাড়াতাড়ি গড়তে পারল না। চেষ্টা করছিল পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সবাই। কিন্তু স্বাধীনচেতা রেড ইণ্ডিয়ানদের সক্রিয় প্রতিরোধে তা খুব সহজে সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৬০৭ খৃীষ্টাব্দে ইংরেজ নিজেকে আমেরিকা মহাদেশে প্রতিষ্ঠিত করল।

ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতি হিসাবে

যা সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয় তা হল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সমস্ত উপনিবেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়তে লাগল। ইংল্যাণ্ডে ততদিনে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে গেছে, রাজতন্ত্রের সমর্থকরা দলে দলে ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে আসতে লাগল আমেরিকায়। পরবর্তীকালে 'রেস্টোরেশনে'র সময় ক্রমওয়েল পন্থীরা আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করল। তাছাড়া প্রথম দিক থেকেই ইংরেজ উপনিবেশগুলিতে জেল পালানো কয়েদী, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, কৃষক, ভাগ্যসন্ধানী, ভবঘুরে, স্বর্ণ সন্ধানীর ভীড় লেগেই ছিল।

এদিকে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় আফ্রিকা থেকে প্রথম চার-জন নিগ্রোর দলকে আনা হয়। পরবর্তীকালে নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকে। উপনিবেশগুলিকে শ্রীমণ্ডিত এবং উপনিবেশগুলির সম্পদের প্রাচুর্যকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকাকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলার কাজে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেয় নিগ্রোরা। এদের শ্রমকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা চলত, এবং নিগ্রোদের কেনা বেচার সুবিধাও ছিল। মধ্যযুগের পরবর্তীকালে কেবলমাত্র আমেরিকাতেই দাস ব্যবসায় চালু ছিল। এই লাভজনক এবং সবচেয়ে প্রচলিত ব্যাবসায়ে মানুষ চালান যেত মূলতঃ আফ্রিকা থেকে। একথা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এই ক্রীতদাসদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল ভারতীয়। এইভাবে বেড়ে চলল আমেরিকার জনসংখ্যা, এদিকে আমেরিকার পুরানো বাসিন্দা রেড ইণ্ডিয়ানরা ক্রমশঃ কোনঠাসা অবস্থায় পৌঁছে গেছে। ইউরোপীয়দের প্রচণ্ড অত্যাচার এবং লাঞ্ছনায় তারা আশ্রয় নিতে লাগল মনুষ্যবাসহীন এলাকাগুলিতে।

ইতিমধ্যে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। কাঁচামাল, এবং বাজারের প্রয়োজনে আমেরিকা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল।

প্রাথমিক অবস্থায় স্পেনীয়দের আমেরিকা অভিযানের ফলে স্থানীয় জনসাধারণ অর্থাৎ রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার প্রণালী পাল্টিয়ে গিয়েছিল। তারই সাথে ধনতন্ত্রের ক্ষুধা বৃদ্ধি পেয়ে একদিন গ্রাস করে নিল গোটা মহাদেশটাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম—পটভূমিঃ—

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজ ভারতবর্ষে তার আধিপত্য তথা শোষণের দুর্গকে প্রতিষ্ঠা করল, পলাশী যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর অপরদিকে মানে আমেরিকায় কিন্তু ততদিনে তার আধিপত্য স্বীকৃত; শুধু স্বীকৃতই নয়, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তার উপনিবেশগুলিতে শোষণ এবং অত্যাচারের নগ্ন চেহারাটা বিশেষ করে ততদিনে আমেরিকায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত করেছে।

এই চেহারার একটা পরিস্কার ছবি পাওয়া গেল ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে রচিত আইনের মধ্যে। আইনটিতে বলা হয়েছিল যে উত্তর আমেরিকার তেরটি উপনিবেশে ব্লাস্ট ফার্ণেস্, রোলিং মিল, গড়া যাবে না। অর্থাৎ কোন প্রকার লৌহশিল্প প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, তৈরী করা যাবে না পালকের টুপী, চর্মদ্রব্য ও উলের পোশাক। নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল ইংল্যাণ্ড ছাড়া অন্য কোন দেশের সাথে আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্ক অর্থাৎ, আমেরিকাকে কিছু আমদানী করতে হলে তা করতে হবে ইংল্যাণ্ড থেকে এবং রপ্তানীও করতে হবে শুধু ইংল্যাণ্ডেই। ইংল্যাণ্ড তার কোষাগারকে "তেজী" রাখার জন্যই নাকি এই আইন রচনা করেছিল। আবার এই বছরই শুরু হয় ইতিহাস বিখ্যাত "সেভেন ইয়ার্স ওয়ার"—যাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাযুদ্ধও বলা যেতে পারে; কারণ এই যুদ্ধ শুধু ইউরোপেই নয়, উপনিবেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে।

ইংল্যাণ্ড এই আইনটির যতই সুন্দর নাম দিক না কেন অথবা যত সুন্দর সুন্দর ভাষা দিয়ে এই আইনের ব্যাখ্যা করুক না কেন—আসলে এই আইনের মধ্যে দিয়ে ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভূমিকাটা পরিস্কার হয়ে উঠল।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হল "সেভেন ইয়ার্স ওয়ার"। ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতি পুরোপুরি বিপর্যস্ত, আর সেই মুহূর্তে ইংল্যাণ্ড আবার আক্রমণ হানল তার উপনিবেশ আমেরিকার উপর। কার্যতঃ, সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকালই তাদের অর্থনৈতিক সংকটের দায়িত্ব উপনিবেশগুলির উপর চাপিয়ে দেয়—এটা ছিল সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বের পুনঃপ্রকাশ। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন করে আমেরিকার উত্তরের অধিবাসীদের "আপালেশিয়ান পর্বত" অতিক্রম করে বসতি স্থাপন বন্ধ করে দিল। এটা ছিল আমেরিকাবাসীর অন্ন সংস্থানের উপর সরাসরি আঘাত। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে আবার নতুন আইন করে আমেরিকাজাত দ্রব্যসামগ্রীর উপর বসান হল প্রচুর ট্যাক্স। প্রতিবাদের ঝড় উঠল আমেরিকায়—"প্রতিনিধিত্ব (পার্লামেণ্টে) ছাড়া ট্যাক্স নয়"; ইংল্যাণ্ড এর উত্তর দিল নতুন আইন "বিলেটিং অ্যাক্ট" (Billeting Act) চালু করে। এই আইন অনুযায়ী ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় যে সৈন্য পাঠাবে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে আমেরিকাকে। এই আইনকে কার্যকরী করার জন্য প্রথম দফায় দশ হাজার সৈন্যকে আমেরিকায় পাঠানও হল।

জর্জ গ্রেনভিল নামে একজনকে ইংল্যাণ্ড ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। তিনি আমেরিকার অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, "আমেরিকা ইংল্যাণ্ডকে সরাসরি কোন কর দেয় না; এটা ঠিক নয়।" কিছুদিনের মধ্যেই বৃটিশ পার্লামেন্টে "স্ট্যাম্প অ্যাক্ট" (Stamp Act) নামে নতুন এক আইন পাশ হল। এই আইন অনুযায়ী সরকারী, ব্যাবসায়িক ও আইনগত প্রভৃতি কাজে

আমেরিকার জনগণের উপর করের বোঝা চাপান হল। সেটা ছিল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। এবার প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারিত হল সম্মিলিত ভাবে। তেরটি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন নিউইয়র্কে—আমেরিকার ইতিহাসে এই সভা "স্ট্যাম্প অ্যাক্ট কংগ্রেস" নামে পরিচিত। "স্ট্যাম্প অ্যাক্ট কংগ্রেস" পরবর্তীকালে এক সংগঠনে রূপান্তরিত হয়—এটাই ছিল উপনিবেশবাদ-বিরোধী প্রথম সংগঠন, ম্যাসাচুসেট্‌স্-এর জেমস্ ওটিস্ নামে এক ভদ্রলোক এর আগেই Rights of the British Colony Asserted and Proved নামক এক পুস্তিকা ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ার প্যাট্রিক্ হেনরী নামক জনৈক আইনজীবী ঘোষণা করলেন "That the General Assembly of this colony have the only and sole exclusive right and power to lay taxes and impositions upon the inhabitants of this colony."

প্যাট্রিক্ হেনরী ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জকে "স্বৈরাচারী" বলে ঘোষণা করলেন। তৃতীয় জর্জকে তিনি জুলিয়াস সীজার, টারকুরিন, এবং প্রথম চার্লসের সঙ্গে তুলনা করে যে ভাষণ দেন, তা আমেরিকার বাগ্মীতার ইতিহাসে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

অবস্থার চাপে এবং ব্রিটিশ ব্যাবসায়ীদের প্রতিবাদে বছরের শেষে "স্ট্যাম্প অ্যাক্ট" উঠে গেল ঠিকই, কিন্তু পরের বছরই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক নতুন আইন রচনা করে ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় রপ্তানী করা কাগজ, চা, কাঁচদ্রব্য, রং প্রভৃতির উপর বিপুল শুল্ক ধার্য করলো। "স্ট্যাম্প অ্যাক্ট" কংগ্রেসের নেতৃত্বে সারা আমেরিকা জুড়ে শুরু হল লাগাতার বয়কট অভিযান। ইতিমধ্যে শ্রমিক, কারিগর এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ গড়ে তুলল তাদের নিজেদের সংগঠন—"স্বাধীনতার সন্তান" (Sons of Liberty)। "স্ট্যাম্প অ্যাক্ট কংগ্রেস" মূলতঃ ধনিকশ্রেণীর সংগঠন ছিল। তাদের ধারণা ছিল—ইংল্যাণ্ডের রাজা এবং পার্লামেন্টের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে নেওয়া যাবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ধারণা পোষণ করতে পারে না। তারা এগিয়ে চলল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ বোস্টন শহরে উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এক মিছিল বেরোল। জনগণের এই মিছিলে গুলী চালায় ইংরেজ বাহিনী। নিহত হলেন পাঁচজন—আহত হলেন অসংখ্য মানুষ। এরাই হলেন বর্তমান পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রথম শহীদ। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের এই প্রথম পাঁচজন শহীদের একজন ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস—ক্রিসপাস অটাক। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেড ইণ্ডিয়ানদের বেশে বোস্টন জাহাজঘাটায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজে উঠে একদল আমেরিকান সমস্ত চায়ের বাক্স সমুদ্রে ফেলে দিয়ে প্রতিশোধাত্মক প্রতিরোধ শুরু করে।

ব্রিটিশ সরকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দমনপীড়নের মাত্রা দিল বাড়িয়ে। পাশাপাশি আমেরিকার জনগণ নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করল। ম্যাসাচুসেট্‌সে জন্ম নিল বিপ্লবী পরিষদ। এই পরিষদের পরামর্শে আহূত হল কণ্টিনেণ্টাল কংগ্রেস। প্রাথমিকভাবে অনেক বিপ্লবী আলোচনা এবং সভা করার পর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বরে কণ্টিনেণ্টাল কংগ্রেস বিপ্লবী কার্যক্রম গ্রহণের পরিবর্তে ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে এক আবেদনপত্র পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১২টি উপনিবেশের ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। (ত্রয়োদশ উপনিবেশের প্রতিনিধি তখন ব্রিটিশ জেলে কারাবন্দী) ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দেই শুরু হল জনগণের মধ্যে থেকে সেনাবাহিনী তৈরীর কাজ। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল গণবাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ হল। একটি ছোট গণবাহিনী অনেক উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সমন্বিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে লেকসিংটন নামে এক গ্রামে দারুণভাবে বিপর্যস্ত করল। অবশেষে ১০ই মে ১৭৭৫'এ ফিলাডেলফিয়াতে কণ্টিনেণ্টাল কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনেই জর্জ ওয়াশিংটনকে সশস্ত্র গণবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। ১০ই জুন ১৭৭৬এ অনুষ্ঠিত হল কণ্টিনেণ্টাল কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন। এই অধিবেশনে স্বাধীনতার সনদ রচনার সিদ্ধান্ত হয়। স্বাধীনতার সনদ রচনার দায়িত্ব দেওয়া হল—টমাস জেফারসন, জন এ্যাডামস্, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, রোজার সোরম্যান্ ও রবার্ট আর লিভিংস্টোনের উপর।

সশস্ত্র যুদ্ধ কিন্তু অব্যাহত রয়েছে। তেরটি উপনিবেশ জুড়েই চলছে এই যুদ্ধ। প্রতিটি যুদ্ধেই ব্রিটিশ বাহিনী হচ্ছে পরাস্ত।

স্বাধীনতা—সনদ :—

৪ঠা জুলাই ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। ফিলাডেলফিয়াতে অনুষ্ঠিত হল কংগ্রেসের অধিবেশন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জন হ্যানক্‌ক্। কংগ্রেস এই দিন আনুষ্ঠানিকভাবে "স্বাধীনতার সনদ" (Declaration of Independence) গ্রহণ করল। তেরটি উপনিবেশের ৫০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই ঐতিহাসিক সনদ গৃহীত হয়। সনদে দেশের লক্ষ্য সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করার সাথে ইংল্যাণ্ডের রাজার এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তথা উপনিবেশবাদের কলঙ্কময় অধ্যায়ের অত্যাচার ও শোষণের দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষিত হল ইংল্যাণ্ডের সাথে সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রত্যয়। এইভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হল আমেরিকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। সনদের স্রষ্টাদের "Founding Father" নামে অভিহিত করা হল। (বর্তমানে শব্দটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সংবিধান রচয়িতাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে)। এই সনদ রচনার মধ্য দিয়ে ফরাসী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার আগেই

ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম উদ্যোক্তা রুশোর এক মন্ত্রশিষ্য টমাস্ জেফারসন্ আমেরিকান স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক ঘোষণাপত্রে রুশোর সাম্যর বক্তব্যকে ধ্বনিত করলেন।

মুখ্যতঃ টমাস জেফারসন রচিত ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সনদে ঘোষণা করা হলঃ—

". . we hold these truths to be self-evident, that all men are created, equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish t, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transit causes; and accordingly all experience hath shown, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurptions, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw of such Government, and to provide new Guards for their future security—such has been the patient sufference of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government."

আজকের যুগে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে এই ছিল বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সনদ। এই ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তের সাথে সাথে আজ থেকে দুশো বছর আগেই একটি প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনাও অনুষ্ঠিত হল। প্রচলিত ইতিহাস এবং মার্কিন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা যে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের এই কংগ্রেসেই আমেরিকার প্রতিক্রিয়ার পক্ষে দক্ষিণের বাগিচা মালিকেরা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিনিধিত্ব করল। আমেরিকার দক্ষিণাংশের এই প্রতিনিধিরা ক্রীতদাসত্ব সম্পর্কিত টমাস জেফারসনের একটি অসাধারণ বৈপ্লবিক বক্তব্যকে "স্বাধীনতার সনদ" থেকে বাদ দিতে বাধ্য করল। ইংল্যাণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি যেখানে বর্তমানে বিবৃত আছে সেখানেই যুক্ত ছিল—".........

"...He (King of England) waged cruel war against **human nature itself, violating its most sacred rights of life and liberty in the persons of a distant people who never offended him, captivating and carrying them into slavery in another hemisphere, or to incur miserable death in their transportation thither. This piratical warfare, the approbrium of infidel powers is the warfare of this Christian King of Great Britain determined to keep open a market where MEN should be brought and sold.**

[Jefferson Farm Book—by Thomas Jefferson]

দাসত্ব মুক্তির সংগ্রামঃ—

পরাধীনতা তথা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তির বিষয়টি স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণেই তৎকালীন আমেরিকার জাতীয় জীবনে প্রধান সংগ্রাম-এর রূপ ধারণ করলেও, পাশাপাশি আর একটি সংগ্রামও দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েও আমেরিকার গণতান্ত্রিক চেতনার বিপুল স্ফুরণ লক্ষণীয়। নিগ্রোদের দাসত্বমুক্তির এই সংগ্রাম বলিষ্ঠ করে তোলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে।

আমেরিকার ধারাগুলির অন্যতম "কোয়েকার"-দের মধ্যে বিলোপবাদীদের কড়া সমর্থকরা সর্বপ্রথম দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত দলিল অনুযায়ী ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁরা দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে "জেরিটাউন"-এ এক আবেদন প্রচার করেন। তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে স্যামুয়েল সিউয়্যাল নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ বিচারক "বাইবেল"-কে দাসপ্রথার পক্ষে ব্যবহারের বিরুদ্ধে (Freedom of Life) নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এবং তার প্রাক্‌মুহূর্তে "স্বাধীনতা সনদ"-এর অন্যতম রচয়িতা বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন্ সহ এ্যাণ্টনি বেনেজেট্ ও বেঞ্জামিন রাস নিগ্রোদের আন্দোলনের পক্ষে সামনের সারিতে এসে দাঁড়ান। এ প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত জেমস্ ওটিস্ রচিত পুস্তিকাটিও স্মরণযোগ্য। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্ লিখলেন "Information to those who would remove America" ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী এই পুস্তকটি পরবর্তীকালে কার্ল মার্ক্স কর্তৃক উচ্চ

প্রশংসিত হয়। ১৭৭২ সালে রেভারেন্ড আইজ্যাক্ স্কিলম্যান্ কর্তৃক রচিত "Oration upon the Beauties of Liberty" —র বক্তব্যও এই আন্দোলনকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে। নিগ্রো দাসরাও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৭৭৩ থেকে ১৭৯৯ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলনগুলি প্রথমদিকে সংস্কারমূলক হলেও পরিশেষে পূর্ণ দাসত্বমুক্তির দাবী করে। এই সমস্ত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৭৪ খৃীষ্টাব্দে কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস এক সিদ্ধান্ত নেয়। The Continental Association of 1974 নামক বিখ্যাত এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ বছর ১লা ডিসেম্বর থেকে দাস ব্যবসা ও আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৭৭৫ খৃীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রথম দাসত্ব প্রথা বিরোধী সংগঠন। এই সংগঠন পরবর্তী-কালে সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রথম থেকে দাসপ্রথার পক্ষে দাসত্ব মুক্তি আন্দোলনগুলির উপর আক্রমণ হানতে থাকে। এই প্রতিকিয়ার শক্তি পরবর্তী শতকের গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত শক্তিশালী ছিল। দাসত্বমুক্তির প্রশ্নটিকে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা নানাভাবে খারিজ করে রেখেছিল। কিন্ত তাতেও ধ্বংস করা যায়নি দাসপ্রথা বিরোধী গণ-আন্দোলনকে—যা কখনো কখনো সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। যার ফলে সনাতনপন্থী জর্জ ওয়াশিংটনকেও বলতে হয়েছিল "There is not a man living who wishes more sincerely than I do to see some plan adopted for the abolition of slavery. স্বাধীনতা সংগ্রামে নিগ্রো দাসত্বমুক্তির সংগ্রামের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও নিগ্রো ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘটে আরও প্রায় একশ বছর পরে।

জয়প্রাপ্তি :—

১৯শে অক্টোবর ১৭৮১, ইয়র্ক টাউনের কাছে আমেরিকান বাহিনীর কাছে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল ব্রিটিশ সৈন্যদলের, তারও দু'বছর পরে ১৭৮৩ খৃীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর "ভার্সেলিস-চুক্তি" অনুযায়ী ইংল্যান্ড আমেরিকাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। শেষ হল আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম। পরবর্তীকালে এই সংগ্রামকে **গণতান্ত্রিক বিপ্লব** বলে অভিহিত করা হয়েছে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে গণ্য করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই সংগ্রামে শ্রমিক, কৃষিমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত, চুক্তিবদ্ধ চাকুরিয়া, নিগ্রো দাস প্রভৃতি অংশের জনগণ অংশগ্রহণ করলেও মূল নেতৃত্ব ছিল ধনিকশ্রেণীর হাতে। ইংরেজ উপনিবেশিক শক্তির সামন্ততান্ত্রিক উদ্দেশ্য ও সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এই গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের আগেই আমেরিকায় শিল্পবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর ফলে শিল্পপতিগোষ্ঠীর শুধু আবির্ভাব নয় আমেরিকার উত্তরাংশে তাদের সংশয়াতীত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশীয় বাজারে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সাথে জাতীয় ধনিকশ্রেণীর সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতই স্বাধীনতা সংগ্রামে এর প্রতিফলন ঘটে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কারণেই বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে এই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই সংগ্রাম রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনলো এবং দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারান্টি সৃষ্টি করলো কিন্তু নিগ্রো দাসদের মুক্তি দিল না, সুতরাং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের চরিত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র পুরোপুরি মেনে চলে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্য চরিত্রও বর্তমান ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে। যে শ্রমিক-কৃষক বাহিনীকে নিয়ে ইংল্যান্ডে অলিভার ক্রমওয়েল ঘটালেন গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরবর্তীকালে এই শ্রমিক-কৃষক বাহিনী তাদের অধি-কারের প্রশ্ন তুলে আক্রান্ত হলেন ক্রমওয়েলের হাতে। একই ঘটনা ফরাসী বিপ্লবের অন্তিম পরিণতিতে। একই ঘটনা পরিলক্ষিত হল আমেরিকান বিপ্লবে।

আমেরিকান বিপ্লব এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দিল বিশ্বের জনগণকে। আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের প্রথম প্রকাশ দেখা গেল আমেরিকান বিপ্লবে। ইউরোপের বহু প্রগতিশীল মানুষ আমেরিকার 'Freedom Boy' দের যুদ্ধে যোগ দেন। যাদের মধ্যে সেন্ট সিমন্ ও পোল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ও বিখ্যাত "ইউরোপীয় সোস্যালিষ্ট" ট্যাডিউজ্ কসিউস্‌জোকো-র নাম উল্লেখ-যোগ্য। পৃথিবীর মানুষ দেখল এমন একটি সংবিধান যার মধ্যে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি ছিল স্বীকৃত। যে সংবিধান সম্বন্ধে পরবর্তীকালে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্ বলেছেন—

"The American Constitution—the first to recognise the rights of man, in the same breath confirms the slavery of the coloured races existing in America : class privileges are prescribed, race privileges sanctioned."

আমেরিকান বিপ্লব আর একবার প্রমাণ করল বুর্জোয়া-শ্রেণী পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উদারনীতিবাদ এবং গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থই সর্বদা সংরক্ষিত হয়। টমাস জেফারসন নিজে নিগ্রো দাসত্বের বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রামী হওয়া সত্ত্বেও, কার্যকালে তাকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা এক ব্যক্তি হিসাবে নয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দাবিকেই রক্ষা করতে হয়েছিল। এমনকি জেফারসন নিজে যখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি (১৮০১-১৮০৮) হন তখনও এই ঘটনার পরিবর্তন হয়নি।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন-গুলিতে আমেরিকার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভূমিকা অসামান্য। আমেরিকার গণতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণীকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। ১৮৮৫ খৃীষ্টাব্দে গঠিত প্রথম ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন

"ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" নামটি আমেরিকার বিপ্লবের "কংগ্রেস" থেকেই গৃহীত হয়। "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে"র নেতৃবৃন্দ বহুদিন ধরেই আমেরিকার বিপ্লবে দর্পণে নিজেদের স্বার্থের ও লক্ষ্যর সার্থকতাকে অনুধাবন করে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, সরোজিনী নাইডু প্রমুখরা ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে আমেরিকা সফর করেন। পরবর্তীকালে জওহলাল নেহরু আমেরিকার জনমানসে ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন রজার বলডুইন, রিচার্ড বি, গ্রেগ, পল রোবসন প্রমুখদের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জওহরলাল নেহরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে মধ্যস্থ মেনেছিলেন। অন্যদিকে ভারতের কিছু কিছু বিপ্লবী সংগঠন আমেরিকাকেই ভারতের বাইরে থেকে কাজ চালাবার শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করেন (গদর পার্টির নাম উল্লেখযোগ্য)।

শেষ কথা :—

প্রায় দুশো বছর আগেকার আমেরিকার গণতান্ত্রিক বিপ্লব আজ শুধু অতীতই নয়, বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে এমন বিপ্লব আজ পরিত্যক্তও বটে। বিপ্লবের জন্য জনগণের সাহায্যের প্রয়োজন মিটতেই, বুর্জোয়া শ্রেণী জনগণকে নতুন উদ্যমে শোষণ শুরু করেছিল। এই তথ্য আজ প্রমাণিত সত্য যে বিপ্লবের কাজে যারা প্রধানতঃ অংশগ্রহণ করেছিলেন আমেরিকার সেই মহান জনগণ আজও শোষিত। **সমানাধিকার**-এর প্রথম ঘোষণাকারী রাষ্ট্রটি আজ নিজে তার সনদের সবচেয়ে বড় শত্রু, **উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রামকারী রাষ্ট্রটি বর্তমান দুনিয়ার সর্ববৃহৎ উপনিবেশবাদী। গণতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তার আজ একমাত্র কাজ দেশে দেশে গণতন্ত্র হত্যা করা। একদা প্রগতির প্রতীক রাষ্ট্রটি আজ প্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার চাকাকে ঘোরাতেই সদাব্যস্ত। শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে, সদ্যস্বাধীন দেশগুলির আত্মনির্ভরতার বিরুদ্ধে এমনকি নিজের দেশের গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই দেশটি আজ প্রধান চক্রান্তকারী।**

তা সত্বেও আমেরিকার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎপর্য আজও বিপ্লবকামী গণতান্ত্রিক মানুষ বিশেষতঃ শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে অস্পৃশ্য নয়। বরং ধনিকশ্রেণী পরিচালিত রাষ্ট্রব্যাবস্থায় প্রতিশ্রুত অধিকার কিভাবে ভঙ্গ হয় তার শিক্ষা দেয়। শিক্ষা দেয় সমাজবিজ্ঞানের তাৎপর্যপূর্ণ স্তরগুলি সম্পর্কে কারণ ইতিহাসের সঠিক বিশ্লেষণ করে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক পথে এগোতে না পারলে উদ্দেশ্যে উত্তরণ সম্ভব নয়। ...

প্রবন্ধ—সূত্র :—

1. An Outline History of the World —H. G. Wells.
2. The American Revolution —H. Aptheker.
3. The Negro-People in American History —W. Z. Foster.
4. The Declaration of Independence —C. Becker.
5. A People's History of England —A. L. Morton.
6. An Outline of Social Development (Vol-II) Edited by Y.D.Kuznetsov.
7. The American Revolution & War of Independence by—Van Jyne.
8. Jefferson Farm Book —Thomas Jefferson.
9. Anti-Duhring—F. Engels.
10. A Contribution to the Critique of Political Economy —K. Marn.
11. Collected. Works (Voll-V)—V.I.Lenin.
12. Profile of America—Edited by E.Davie.
13. Political and Social Growth of the American People 1492-1865 —H. C. Hockett.
14. The History of Indian National Congres —P. Sitaramaya.
15. Letters from a Father to a Daughter —J. L. Nehru.

(সচিত্র মাসিক যুবদর্পণ)

নবম সংখ্যা ॥ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

কান্তি বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক

বনভূষণ নায়ক

যুবকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ)
কলিকাতা-৭০০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাঁদ দে কর্তৃক তরুণ প্রেস, ১১ অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

সূচী

যুবসমাজের প্রতি :-

অশুভ ও অসুন্দরকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারে যুবসমাজ-

শান্তিপ্রিয় মানুষের আশা ভরসার মূর্ত্ত প্রতীক যুবসমাজ—

* বারোয়ারী পুজোগুলিকে কেন্দ্র করে জোর-জুলুম ও জবরদস্তি কি অসঙ্গত ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে মঞ্চ তৈরী করে যোগা-যোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত করা কি অশোভন ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* সারারাত্রিব্যাপী মাইক্রোফোন বাজিয়ে শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে বাধ্য করা কি অশালীন ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* নির্দিষ্ট দিনে প্রতিমা নিরঞ্জন না দিয়ে পুজোর সময়কে অহেতুক দীর্ঘায়িত করে অনর্থ সৃষ্টি করা কি অন্যায় ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবস্থা উপলব্ধি করে আলোকসজ্জায় পরিমিতি বোধের পরিচয় দেওয়া কি সুষ্ঠু ও সুন্দর নয় ?

কান্তি বিশ্বাস

সম্পাদকীয়

'অপারেশন' শব্দটি ইংরেজী হলেও এমন বঙ্গ-সন্তান সম্ভবতঃ কম আছেন যিনি শব্দটির সাথে পরিচিত নন। সাধারণ মানুষের কাছে কথাটির ব্যাপক প্রচলন আছে চিকিৎসা বিষয়ে। যখন কোন রুগীর গায়ে চিকিৎসকেরা রোগ নিরাময়ের জন্য অস্ত্র প্রয়োগ করেন—তাকেই সাধারণ কথায় 'অপারেশন' বলা হয়। শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় সামরিক বাহিনীতেও। যখন সেনাবাহিনী অস্ত্র হাতে শত্রুকে মোকাবিলা করেন—তাকেও 'অপারেশন' বলে লোকে জানে। ১৯৭১ সাল হতে ৭৭ পর্যন্ত এ রাজ্যের মানুষ আরও একটি ক্ষেত্রে 'অপারেশনের' দাপট দেখতে পেয়েছেন—এর নাম 'কুম্বিং অপারেশন'। সামরিক কায়দায় অতর্কিতে এক একটা এলাকা সি. আর. পি, অথবা পুলিশ বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলে তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হয়েছে এমন সব যুবকদের শাসক শ্রেণীর কাছে যারা শুধু অবাঞ্ছিত নয়—যাদের অবস্থান শাসক শ্রেণীর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তাদের এই 'অপারেশন'-এর মধ্য দিয়ে ধরা হয়েছে, পিটিয়ে-লাশ করা হয়েছে—ঘর ছাড়া করা হয়েছে—গুণ্ডা দিয়ে খুন করা হয়েছে। এই ভাবে শব্দটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে হাজির হয়। অর্থের এই দীর্ঘ তালিকার সাথে বোধ করি আর একটি নয়া সংযোজন যুক্ত করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এটির নাম 'বর্গা অপারেশন'।

বর্গাদার কথাটি কুচবিহার জেলা সহ কয়েকটি জেলায় আধিয়ার নামে পরিচিত। এরাও কৃষক। অন্য কৃষক থেকে এদের পার্থক্য এই এরা পরের জমিতে চাষ করে। নিজের মেহনত এবং কোথাও কোথাও নিজের বীজ-সার ইত্যাদি ব্যবহার করে ফসল ফলায়। এক অংশ নিজে পায়—অন্য অংশ জমির মালিককে দিতে হয়। দিতে হয় এই জন্য যে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে একবার যদি জমির মালিক হওয়া যায় তা হলে চাষ-বাস করাক বা না করাক জমি থেকে অধিকার যায় না—মালিকানা যায় না। যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ চলছে তার অনিবার্য ফল হিসাবে এক অংশের লোক কৃষি কাজ না করলেও জমির মালিকানা রাখার সুযোগ পাচ্ছে এবং জমি রাখছে আর অন্যদিকে সমাজের আর এক অংশের মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে জমি না থাকা সত্বেও কৃষি কাজ করছে নিজের জমিতে নয়—অপরের জমিতে। এদেরই নাম বর্গাদার।

যতদিন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলতে থাকবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার রেশটুকু যতদিন বজায় থাকবে ততদিন এই বর্গাদারী ব্যবস্থাও চলতে থাকবে। সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা পত্তন করার দ্বারাই একমাত্র ভূমিহীন কৃষককে জমির মালিক করা যায়—বর্গাদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যায়। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদই একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে অকৃষক জমির-মালিক জমি হারা হয়েও সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার পায়—বিকল্প জীবিকার সুনিশ্চিত সুযোগ পায়। আর কোন কৃষককেই নিজের পরিশ্রমে উৎপাদন করা ফসলের একটা সিংহ ভাগ জমির মালিক বলে কথিত কাউকে দিতে হয় না—নিজেই ভোগ করতে পারে এবং বর্গাদার শব্দটি অভিধান থেকে লুপ্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

সে কথা থাক। আমাদের দেশে দীর্ঘ কাল ধরে এই বর্গাদারী প্রথা চলে আসছে এবং বর্গাদার তার তৈরী ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য আবদন-নিবেদন করেছেন, দাবী তুলেছেন। সংগঠিত হয়েছেন। লড়াই করেছেন। কখনও কখনও রক্ত দিয়েছেন, শহীদের মৃত্যুও বরণ করেছেন। সেই সংগ্রাম গ্রাম বাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও অব্যাহত রয়েছে।

অর্থ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত রক্ষণশীল রিকার্ডো সাহেব থেকে শুরু করে আধুনিক কালের অর্থনীতির অনেক বড় বড় তাত্ত্বিক অনেক গবেষণা করেছেন—মতামত প্রকাশ করেছেন জমিতে উৎপাদিত ফসলের মালিকের ন্যায্য অংশ নির্ধারণ করার জন্য। বিশ্বের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্ক্সও উৎপাদনে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করার জন্য শ্রমের ভূমিকা ও অবদান নিরূপণের জন্য তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের মত সামন্ততান্ত্রিক অথবা আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশে ভূমিহীন বর্গাদারের ভাগ্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

কিন্তু ভূমিকে আশ্রয় করে যে শোষণ সমাজের বুকে দীর্ঘকাল ধরে জগদ্দল পাথরের মত চেপে রয়েছে—কৃষক তাকে সরিয়ে ফেলার জন্য আমাদের দেশে বারে বারে লড়াইয়ের ময়দানে সংগঠিত হয়েছেন। কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বিভিন্ন সময় রচিত হয়েছে। বর্গাদারের স্বার্থে তেজোদীপ্ত এ ধরনের একটি সংগ্রামের নাম তে-ভাগা আন্দোলন। বর্গাদার তার ঘামে ভেজা ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ দাবী করে এ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। জোতদার বা স্বীকার করেননি। ভূ-স্বামীদের স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে তে-ভাগা আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য সে সময়ের বৃটিশ সরকার এগিয়ে এসেছিল। বৃটিশ রাজত্বের সশস্ত্র বাহিনীর বুট, বুলেট ও বেয়নেটের বেপরোয়া আক্রমণে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বাহাদুর কৃষক পরাজয় বরণ করেননি। শেষ পর্যন্ত তে-ভাগা আইন বিধিবদ্ধ হয়—পরবর্তী কালে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে চার-ভাগা আইন পাশ হয় অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের তিন চতুর্থাংশ বর্গাদারের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

আইন পাশ হওয়া এক জিনিষ আর তার সুবিধা পাওয়া ভিন্ন জিনিষ বর্গাদার হিসাবে আইনে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত সে তার ন্যায্য পাওনা পেতে পারবে না। বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্তি করার জন্য বিধান তৈরী হোল, ভাগচাষী কোর্ট বসলো। বর্গাদারকে জমির মালিকের বিরুদ্ধে মোকর্দমা করার সুযোগ করে দেওয়া হোল। বর্গাদার উচ্ছেদ রোধ করার আইনগত ব্যবস্থা তৈরী হোল। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও বর্গাদার তার ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার নিদিষ্ট অধিকার পেল না। জমি থেকে উচ্ছেদের বিড়ম্বনা থেকে সে মুক্তি পেল না। এ রাজ্যের প্রায় ৩৮ লক্ষ বর্গাদারের মধ্যে গত বৎসর পর্যন্ত মাত্র ৮ লক্ষ বর্গাদারের নাম বর্গাদার হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হয়েছিল। স্বভাবতঃই বর্গাদার যদি রেকর্ডভুক্ত না হন তা হলে ফসলের আইনগত অংশ পাওয়া সুনিশ্চিত হতে পারে না—জমি থেকে উচ্ছেদের বিপদ থেকেও মুক্তি পেতে পারেন না। আইন যতটুকু আছে তাকেও বৃদ্ধাংগুষ্ঠি দেখিয়ে এ যাবৎ বর্গাদারকে বঞ্চনা করা হয়েছে—শোষণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের অধীন একটি কমিটি (Task Force) রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবই ভূমি সংক্রান্ত আইনের দুঃখজনক পরিণতির প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

লক্ষ লক্ষ বর্গাদারকে কারচুপির হাত থেকে—জোতদারের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য আইনগত যতটুকু সুযোগ আছে তাকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বর্গা অপারেশন' নামে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করেছেন। এই অভিযানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল বিপুল সংখ্যক বর্গাদার অধ্যুষিত ছোট ছোট এলাকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে, ছোট ছোট স্কোয়াড গঠন করে, তার সাহায্যে বর্গাদারের সাথে জোতদারের বাড়ীতে নয়—বর্গাদারদের পক্ষে সুবিধাজনক কোন জায়গায় সান্ধ্য বৈঠক এবং পর্যবেক্ষণ ও সরেজমিনে যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত রেকর্ডভুক্তি করা। এ ব্যাপারে কৃষক সংগঠনগুলির সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এবং রেকর্ডভুক্ত বর্গাদারেরা সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ঋণ পাওয়ারও সুযোগ পাবেন।

লোক দেখানো আইন থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগ পদ্ধতির ত্রুটী এবং সদিচ্ছার অভাবে যে বিরাট সংখ্যক বর্গাদার এতদিন পর্যন্ত রেকর্ডভুক্ত হতে পারেননি এবং আইনের বিন্দুমাত্র সুযোগ ভোগ করতে পারেননি আমরা বিশ্বাস করি সরকারের এই অভিনব উদ্যোগের ফলে তারা রেকর্ডভুক্ত হতে পারবেন এবং আইনগত যতটুকু সুযোগ বিদ্যমান তা লাভ করতে পারবেন।

গ্রাম বাংলায় যে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী যুব মানস রয়েছেন তার এক বিশাল অংশ এই বর্গা চাষের সাথে যুক্ত। বর্গা অপারেশনের সাফল্যের ফল হিসাবে সমগ্র বর্গাদারের সাথে এই অংশের যুব সাম্প্রদায়েরও জীবন-যন্ত্রণা একটু হ্রাস পাবে। সেই জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই 'বর্গা অপারেশন'কে স্বাগত জানাই—এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিশ্বের যুব সমাজের কাছে আহবান
(একাদশ বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসবের ঘোষণাপত্র)

বিশ্বের যুব ও ছাত্রবৃন্দ

বিশ্ব যুব ছাত্র আন্দোলনের আরও একটি বৃহৎ ঘটনা—একাদশ বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসব সফল ভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

আমরা, ১৪৫ দেশের দুইশত সংগঠনের ১৮৫০০ জন প্রতিনিধি ১৯৭৮-এর গ্রীষ্মে কিউবার হাভানা শহরে মিলিত হয়েছি। মিলিত হয়েছি রাজনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতা নিয়ে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি, শান্তি ও মৈত্রীর পতাকা ঊর্ধে তুলে ধরে, কিউবান জনতা ও যুব সমাজের আতিথ্য ও জয়োল্লাস পরিবৃত হয়ে। মিলিত হয়েছি আমাদেরই সমস্যা নিয়ে প্রকাশ্যে ও খোলামনে আলোচনা করতে, একে অপরকে উপলব্ধি করতে, আমাদের সাফল্য ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করতে, আমাদের জনগণের সাংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আমাদের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে।

আজকের বিশ্বে যুব সমাজ যে মহান ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে আমরা তাকে আর একবার স্বীকৃতি দিচ্ছি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশাল বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। আন্তর্জাতিক দাঁতাতের দিকে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আরও ব্যাপকতর ভিত্তির দিকে, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদার দিকে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্নতা নিয়েই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমান অধিকারের দিকে উল্লেখযোগ্য দিক পরিবর্তনের নিদর্শন মিলেছে; পুণঃমিলিত ভিয়েতনাম, ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়, পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অবসান, বিজয়ী এঙ্গোলা, ইথিওপিয়ার সামন্ত রাজত্বের অবসান—এ সবই হলো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত পরিবর্তন জনগণের ন্যায্য আসা-আকাংখা পূরণের জন্য গড়ে ওঠা আন্দোলনকেই সাহায্য করছে।

আমরা উৎসবে অংশ গ্রহণকারীরা, নূতন সমাজ তৈরীতে বিরাট সাফল্য অর্জনকারী সমাজতান্ত্রিক দেশ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন উন্নয়নশীল জোট নিরপেক্ষ দেশ ও ধণতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি সমূহের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমরা, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতিকে ব্যর্থ করে দিয়েও তার কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে অর্জিত বিজয়কে অভিবাদন জানাচ্ছি। তবুও সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বগুলিকে তীক্ষ্ণ করছে, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, শান্তি ও সামাজিক প্রগতির দিকে জনগণের অপরিহার্য অভিযানকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং তারা আজও প্রধান শত্রু। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ও তাকে পরাস্ত করতে হবে।

আমরা ভালভাবেই উপলব্ধি করি যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির দিকে এই পরিবর্তন স্থায়ী করবার জন্য, আন্তর্জাতিক দাঁতাতকে ঐতিহাসিকভাবে অপরিবর্তনীয় চরিত্রের ও সার্বজনীন করে তোলার প্রক্রিয়ার জন্য এখন প্রয়োজন, যা পূর্বে কখনই ছিল না, সাম্রাজ্যবাদের সেই আধিপত্য ও শক্তি প্রয়োগের নীতির অবসান, অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে, পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী নরহত্যাকারী অস্ত্র উৎপাদনের বিরুদ্ধে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা তৈরী এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সহ সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী করার কাজ শুরু করা।

এই বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যুবক ও ছাত্রদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধির জন্য আমরা তাদের সহযোগিতা ও কাজের ক্ষেত্রে ঐক্য শক্তিশালী করবার জন্য কঠোর সংকল্পবদ্ধ।

কিউবা থেকে আমরা বিশ্বের যুবকদের আহবান জানাচ্ছি। বিশ্বশান্তি, দাঁতাত, নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী যুদ্ধের পরিসমাপ্তির জন্য সংগ্রাম আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন। নিউট্রন অস্ত্রের মত ব্যাপক ধ্বংসকারী অস্ত্রের উৎপাদন আবিষ্কারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দুনিয়াব্যাপী প্রতিবাদ সংগঠিত করুন।

সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ, নয়া-উপনিবেশিকতাবাদ, জাতি বৈষম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য, প্রতিটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উদ্ধার ও রক্ষার জন্য, অর্থনৈতিক সম্পর্কের ন্যায্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্য ও একটি নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্য ও কাজকে দ্বিগুণ করুন।

- ধণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শোষণ, অত্যাচার, বৈষম্য, বেকারী, সংকট ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা ও বিকাশের জন্য, এবং গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামকে তীব্র করুন।

সংগ্রাম করুন যুব সমাজ যেন তাদের কাজের অধিকার

ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ, সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে।

যুব সমাজের মধ্যে আরও বেশী সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব

এই মহান লক্ষ্যের প্রতি অনুপ্রেরিত হয়ে জাতীয় স্বাধীনতার স্বপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের বিরুদ্ধে এবং বর্ণবৈষম্যবাদী রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসানের জন্য নাম্বিয়া, জিম্বাবউ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ ও যুবকদের সংগ্রামের প্রতি সংহতিকে শক্তিশালী করুন। একইভাবে সাহারার জনগণের স্বাধীনতার জন্য ন্যায্য আকাংখার প্রতি এবং নয়া-উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী হস্ত-ক্ষেপের বিরুদ্ধে আফ্রিকার জনগণের সংগ্রামের প্রতি তাহাদের সাহায্যকে দৃঢ়তর করুন।

আরব জনগণের সংগ্রাম, বিশেষতঃ পি এল ও-র নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের সংগ্রাম এবং লেবানন ও গণতান্ত্রিক ইয়েমেনের জনগণের সংগ্রামে আমাদের সংহতি আরও শক্তিশালী করতে হবে। এরা হল মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ, জিনোইজম ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য ও চিরস্থায়ী শান্তির পক্ষে। আবার এরাই সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের শিকার।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতির স্বপক্ষে চিলির জনগণ ও যুবকদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জোরদার করুন!

ফ্যাসিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে

উরুগুয়ে, নিকারাগুয়ে প্যারাগুয়ে, ব্রাজিল, বলিভিয়া ও অন্যান্য দেশের মানুষের সংগ্রামের প্রতি সংহতি শক্তিশালী করুন। শক্তিশালী করুন পোয়োর্টো-রিকোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ও ফ্যাসিবাদের বিপদের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত আর্জেন্টিনার যুবক ও জনগণের সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ও পূর্ণ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতির জন্য লাতিন আমেরিকার ও ক্যারিবিয়ান জনগণের সংগ্রাম। দেশের শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের জন্য এবং জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সীমানাগত অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভিয়েতনামের জনগণের প্রতি সংহতিকে জোরদার করুন।

নূতন সমাজ গঠনরত কিউবার মহান জনগণের বিরুদ্ধে অবৈধ জঘন্যতম অবরোধের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা উপচে পড়ুক। গুয়ানতানামোয় সামরিক ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে নিঃসর্ত প্রত্যার্পণ কবতে হবে এই ন্যায্য দাবীর সমর্থনে আমাদের সংহতিকে দৃঢ়তর করুন।

বিশ্ব উৎসব আন্দোলনের ইতিহাসে একাদশ উৎসব সুদৃঢ় স্তম্ভের মত বিরাজ করুক এবং এই উৎসবের অর্জিত সাফল্যগুলি বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল যুব সমাজের কার্যক্ষেত্রে ঐক্য ও সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন।

স্বাধীনতা ও মর্যাদার জন্য সংগ্রামরত সমস্ত জন-গণের প্রতিই আমাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংহতি শক্তি-শালী হোক। শান্তি ও সামাজিক প্রগতির পথের যাত্রীদের প্রতি প্রেরণা ও সাহায্যের হাত আরও প্রসারিত করুন।

আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ ঐক্যবদ্ধ হোক:—

—জনগণের আরও বিজয় অর্জনের জন্য
—আন্তর্জাতিক বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের আরও সাফল্যের জন্য
—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি, শান্তি ও মৈত্রীব জন্য বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসব দীর্ঘজীবী হোক।

হাভানা—৫ই আগষ্ট, ১৯৭৮

বাঙলা সাহিত্যে ছন্দপতন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় / ডঃ সরোজমোহন মিত্র

'ছন্দপতন' মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই লেখা একটি উপন্যাস। নবকুমার নামে এক তরুণ কবির আত্মকাহিনী। এই কবি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে—"অল্প-বয়সী কবি সম্পর্কে একটা চলতি ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে—অনেক বদ্ধমূল সংস্কারের মতই সেটা জোরালো। তরুণ কবি বলতে লোকে ধরে নেয় কমবেশী স্নায়ুপ্রবণ, ভাবপ্রবণ পরম বোহিসেবী অকেজো অভিমানী একটা জীব—জীবন ও জগৎটা যার কাছে নিছক স্বপ্নাদ্য ব্যাপার।

আমার সম্বন্ধে এরকম একটা ধারণা নিয়ে এ কাহিনী পড়তে বসলে আমার অনেক কথা আর কাজের ঠিক ঠিক মানেটি বুঝতে অসুবিধা হবে—অসুবিধা কেন, মানে বোঝা সম্ভব হবে না। কারণ, আমি ঠিক বিপরীত রকম কবি এবং মানুষ।

আমি বস্তুবাদী কবি।

শুধু কবিতায় নয় সব বিষয়েই বস্তুবাদী।

বস্তুবাদী কবি কি?

যে সত্যবাদী কবি। দুটো একই কথা। বস্তুই সত্য, সত্যই বস্তু।

আমি কবিতা লিখি, শব্দমদ চোলাই করি না। আকাশ চষে আমি কাব্যফুলের চাষ করি না, মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই। জীবন্ত মানুষের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবস্তু জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব-চিন্তা আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে পুষ্ট।

ছেলেবেলা থেকেই কবিতায় খোকামি আর ন্যাকামি আমার পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে পনের বছর বয়সে লিখেছিলাম—

শব্দ মদ বেচা শুঁড়িগুলো
কাব্যলক্ষীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।

শুঁড়িগুলো সব মরে যাক,
কাব্যলক্ষীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।

ইচ্ছারূপিনী কাব্যলক্ষীর সব বয়সের বিচিত্ররূপের সঙ্গে তখনও অবশ্য আমার পরিচয় ঘটেনি, কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে সতেজ প্রাণবন্ত কবিতার দিকে ওই বয়সেই আমার কেমন পক্ষপাতিত্ব ছিল।

শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বস্তুবাদী।

কবি তার কবিতায় একরকম, জীবনে অন্যরকম—এটা আমার উদ্ভট ব্যাপার মনে হয়। এ যেন ব্রহ্মচারীর নারী অঙ্গ স্পর্শ না করেও শুধু ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে পুত্রোৎপাদন।

বাইশ বছর বয়সে আমি প্রথম স্থির করি এবার আমার কবিতা বাজারে ছাড়া দরকার।

তার আগে কোথাও একটি কবিতাও আমি প্রকাশ করিনি।

এই বয়সের কবির কবিতা ছাপাবার প্রথম প্রচেষ্টায় কত কুণ্ঠা কত ভীরুতা থাকে কারো অজানা নেই,—কবিতা লিখে সে যেন মস্ত অপরাধ করেছে, কবিতা ছাপাতে চেয়ে অপরাধ করতে চলেছে তার চেয়েও মারাত্মক!

ভীরু লাজুক কবিকে সহজে কেউ পাত্তা দেয় না, চারিদিক থেকে তার ভাগ্যে জোটে শুধু অনাদর, উদাসীনতা ছেলেমানুষ কবি হতাশা ও অভিমানে জর্জরিত হয়ে যায়।

আমি এ হতাশা ও অভিমানকে প্রশ্রয় দিইনি।

নতুন কবির উপর জগৎ অকথ্যরকম নিষ্ঠুর, নতুন কবিকে সবাই গায়ের জোরে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে—এটাকে খাঁটি নির্জলা সত্য বলে মানতে আমি প্রথম থেকে অস্বীকার করেছি।"...

এ সবই কবি নবকুমারের কথা। তার আরও কথা আছে। তাও উল্লেখিত হবে ক্রমশঃ। কিন্তু নবকুমারের কাহিনীর এ ভূমিকা পড়তে পড়তে মনে হবে এ যেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের সাহিত্য-জীবনের কাহিনী।

বাঙলা সাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ আবির্ভাব বাংলা ১৩৩৫ সালে। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় গল্প ছাপানোর জন্য লিখে-ছিলেন 'অতসীমামী'। অবশ্য মাণিক এ গল্প সম্পর্কে নিজেই তাঁর 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে লিখেছিলেন "রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী"। কিন্তু এ গল্প তো তিনি প্রকৃত অর্থে সাহিত্য করার জন্য লেখেননি—লিখে-ছিলেন 'বিখ্যাত মাসিকে গল্প ছাপান নিয়ে তর্কে জিতবার জন্য।' সেজন্য এ গল্পে নিজের আসল নাম 'প্রবোধকুমার' না দিয়ে দিয়েছিলেন ডাক নাম "মাণিক"।

মানিকের 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায়। তার পূর্বে এই পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', তার পূর্ব থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন'। তখন বাঙলা সাহিত্যে 'আধুনিকতা' নিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় এবং বিতর্ক দেখা দিয়েছিল বাঙলা সাহিত্যের এই দুটি উপন্যাসে তার সার্থক প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু তার বছর দুই আগেই বাঙলা দেশে এবং বাঙলা সাহিত্যে আরেকটি প্রবণতা খুব জোরালো হয়ে উঠেছিল—তা রাজনীতি। ১৯২৬ সালে পুস্তকা-কারে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'

ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এবং তার সমকালেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা সহ লেখা হোল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন তখন মনে হয় রাজনৈতিক উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত। সেজন্য মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পর্বের লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায় না। সাহিত্যে আধুনিকতাই ছিল তখন প্রধান আলোচ্য। মানিক তাঁর তৎকালীন মানসিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমার সাহিত্য করার আগের দিনগুলি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে প্রথম এক বছর কি দু'বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেঁটেছি এবং তারপর কতদিন খুব সোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে 'আধুনিক' সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হ্যামশুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ-র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।" (সাহিত্য করার আগে)

তারপর নিজের ব্যক্তি মানস, বাস্তব জীবনে সংঘাত এবং সাহিত্যে অভাববোধ সম্পর্কে লিখেছেন, "ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্প বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরাল হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরাল করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটিয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকায়, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মানুষের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে।

গরীবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত --জিজ্ঞাসা জাগত, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?

ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা—বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবন দর্শন খোঁজার মত সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশ্যই তখন ছিল না।

সাহিত্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত পেতাম জবাবের। বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সাহিত্য আবার জাগাত নতুন নতুন জিজ্ঞাসা। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তাম গল্প উপন্যাস। গল্প উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাস করতাম বাস্তব জীবন।

......আমার জিজ্ঞাসা ছিল প্রেম আর দেহ সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে, সাহিত্যের প্রেম আর বাস্তব জীবনের প্রেম নিয়ে। সাহিত্যের ফাঁকা প্রেম খুঁজে পেতাম না মধ্যবিত্তের জীবনে অথবা নিচের তলায়। মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবনের প্রেমে যেটুকু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সন্ধান পেতাম না নিচের তলার জীবনে। আবার নিচের তলার প্রেমে ঐশ্বর্যের রিক্ততা সত্ত্বেও যে সহজ বলিষ্ঠ উন্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জীবনে তার অভাব ধরা পড়ত।"

"যাই হোক, ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? মানুষ যে ভাল, নয় মন্দ হয়, ভাল-মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্তের হৃদয়।

ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার বিকার-গ্রস্ততা, সংস্কার প্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যায় কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্র জীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ? ভদ্র সমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর, মাঝি-মাল্লা, হাড়ি-বাগ্দিদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা—যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে - সাহিত্যে দেখা যায় না?

ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা, বাস্তব জীবন ও সাধারণ বাস্তব মানুষের অভাব বড়ই পীড়ন করত। সংঘাতের পীড়ন।

আমার নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরাল হয়ে উঠছিল, সাহিত্য নিয়েও ক্রমে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম।

ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় আর মা, অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে! আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্র জীবনকে ভালবাসা, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোস-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভূষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছন্দপতনের কবি নবকুমারের

মতই বস্তুবাদী বা সত্যবাদী লেখক। মধ্যবিত্তসুলভ ভাবপ্রবণতাকে কাটিয়ে মাটির পৃথিবীর মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্যের ফসল ফলাতে চেয়েছেন। তাঁর আগে বাঙলা সাহিত্যে অনেক নামী-দামী সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম শরৎচন্দ্রই সাহিত্যে বাস্তবতাকে স্বীকৃতি জানালেন। সমাজ জীবনে আপত নিস্তরঙ্গতার অন্তরালে যে ক্লান্ত যন্ত্রণা এবং বেদনাবোধ লুকিয়ে ছিল শরৎচন্দ্রই প্রথম আমাদের কাছে তা উপস্থিত করেছেন। তিনিই প্রথম অনেক অন্যায় আর গোঁড়ামিকে নির্মম আঘাত করেছেন। শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে পতিতা আর অসতীরা চরিত্র হয়েছে। বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব। তখনকার অন্য কোন লেখক এটা পারেননি। তবে শরৎ-চন্দ্রের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল মূলত মধ্যবিত্ত নারীত্বের ক্ষেত্রে। মাঝে মাঝে তার সাহিত্যে সমাজজীবনের মূল সমস্যা দেখা দিলেও সামাজিকভাবে তাকে তিনি আঘাত করতে পারেননি। বিষয়ী সামন্তবাদী মানসিকতা এবং সমাজব্যবস্থার আমূল উচ্ছেদ করতে না পারলে কেবল ভাবপ্রবণতার দ্বারা অন্যের হৃদয়কে সিক্ত করা যায়, মূল সমস্যার কোন সমাধান করা যায় না।

মাণিকের সমকালে বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন অভিযান দেখা দেয়। এই অভিযাত্রীরা ছিলেন হামশুন-লরেন্স-হাক্সলি-গোর্কীর ভাবশিষ্য। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রচন্ড ভাঙনের পরে এদের মধ্যেও ভাঙনের প্রবল নেশা এবং পরিণামে হতাশা আর নৈরাশ্যই দেখা দিল। এই অভিযানের যুগকে সংক্ষেপে বলা হয় 'কল্লোল যুগ'। এদের বয়সে ছিল তারুণ্য, ভাবে ছিল রবীন্দ্র বিরোধিতা। এদের ভাষার তীব্রতা, ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানি ও নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা বাঙলা সাহিত্যে এক আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু এদের বিদ্রোহে যতটা ফেনা ছিল ততটা বাস্তবতা ছিল না। আসলে এরা ছিলেন মূলত রবীন্দ্রভক্ত এবং রোমান্টিক ভাববিলাসী। তবু এই সময়ে বাঙলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের বাঙলা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ছিলেন প্রধানত সমাজের উপরতলার মানুষ। শরৎচন্দ্র সেখানে পতিতাদের ভীড় জমালেন। আকবর লাঠিয়ালরা সেখানে প্রবেশ পেল। কল্লোল যুগের লেখকদের রচনায় এল খাঁটি গ্রামের মানুষ আর কয়লাখনির কুলি-কামিনরা। এঁদের হাতে আমরা পেয়েছি খাঁটি গ্রাম্যজীবনের আর কয়লাখনির ছবি। ছবিগুলো ঠিক বাস্তবতা লাভ করতে পারেনি। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে বাস্তব সংঘাত আসেনি! মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ব্যক্তি জীবন এসেছে কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি—বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবস্তাব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয়নি, ওই একই রোমাঞ্চ শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যে সেই বাস্তবতার অভাব পূরণ করেছেন। তিনি শৈশব থেকে সারা বাঙলার গ্রামে শহরে ঘুরে ঘুরে যে জীবন দেখেছেন, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছেন, সেই সাধারণ বাস্তব মানুষের জীবনকেই সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে বাস্তবতার আমদানি বাঙলা সাহিত্যে মাণিকের অন্যতম অবদান।

মাণিক ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানীর মতই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জীবনকে দেখা ছিল তাঁর অভ্যাস। বিজ্ঞানীর মত নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়েই মাণিক বাঙলা উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন একের পর এক অনন্যসাধারণ চরিত্র—শ্যামা, শশী, যশোদা, সত্যপ্রিয়, বন্ধা, রাঘব মালাকার প্রভৃতি। বাঙলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখা ছিল মাণিকের আরেকটি অবদান।

সে জন্যই তো 'ছন্দপতন' উপন্যাসের কবি নব-কুমারের মত মাণিকও বলতে পারেন, 'শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বাস্তববাদী।' হতাশা আর অভিমানকে মাণিকও প্রশ্রয় দেননি। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জননী'র শ্যামার জীবনে এসেছে আঘাতের পর আঘাত। নানা বিপর্যয়ে জীবন তার ক্ষতবিক্ষত, তবু হতাশায় না ভেঙে পড়ে সে তার ছেলেদের নিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যই সংগ্রাম করেছে। তাঁর গল্পে উপন্যাসে এর অজস্র উদাহরণ আছে।

সেজন্যই বন্ধুরা যখন বলে পত্রিকার সম্পাদকরা গায়ের জোরে নতুন লেখককে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে তখন সে কথা কবি নবকুমারও স্বীকার করে না, মাণিকও প্রতিবাদ করে লিখে ফেলেন প্রথম গল্প 'অতসীমামী' এবং তা অচিরে প্রকাশিতও হয়।

মাণিকের জীবনে একটা প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অদ্ভুত দৃঢ়তা। নবকুমারকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বললে সে অনায়াসে দৃপ্ত ভঙ্গিতে নিজের কবিতাই আবৃত্তি করে শোনায়, তার স্বকীয়তা প্রচার করে। মাণিকও বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃঢ়তা নিয়ে উপস্থিত। নবকুমারের মত তিনিও বলতে পারেন, "আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন রূপায়িত করছি আমার কবিতায়।"

জীবন বিচিত্র। ভয় লোভ হিংসা আর মিথ্যার চাপে বিকারগ্রস্ত জীবন। আপাতদৃষ্টিতে যাকে চরিত্রের দৃঢ়তা মনে হয় আসলে তাও যে নিছক প্রাণশক্তির একটা বিকার। সামঞ্জস্যবিহীন জীবনযাত্রা। ঘরের কোণে সংসারের কাজে আটক তৃপ্তি আর আধুনিক মধ্যবিত্ত শিক্ষিতা মেয়ে মানসীর মধ্যে সামাজিক নিয়মে কোন তারতম্য নেই। সে জন্য মানসীদের মধ্যেও দেখা যায় সুনির্দিষ্ট মানসিক গঠনের অভাব। "তৃপ্তিদের জীবন হয় পঙ্গু, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে অগভীর কৃত্রিম সুখ-দুঃখের কারবার।" আর "মানসীদের জীবন হয় আরও খানিকটা

এলোমেলো বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিশেহারা আর ... রোধে জটিল। সেও প্রতা সত্যিকারের মুক্তি পায় না। তৃপ্তি আর মানসীর জীবন সেই একই পরাধীনতার এপিঠ আর ওপিঠ। বাইরে খানিকটা চলাফেরা, অনেকের সঙ্গে মেলামেশা, খানিকটা বাঁধাধরা বিদ্যা আর ছাঁচে ঢালা অভিজ্ঞতা—মানসীদের আসল পাওনা এইটুকুই। সংঘাতময় বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তারও আত্মীয়তা নিষিদ্ধ—দু একটি ঢেউ শুধু গায়ে লাগতে পারে। তারই মারাত্মক ফল হয় সংগতিহীন স্বকীয়তাহীন বিচিত্র কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অনৈক্যময় চেতনার বিকাশ। আজ যা চরম সত্য, কাল তা সত্য কুৎসিৎ মিথ্যা মনে হয়। অজ যা জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা, কাল তার মূল্য খুঁজে পায় না।"

সংসারের ধরাবাঁধা নিয়মনীতিগুলো আজকাল আর চলে না। খাটো কাপড়ের মত নীতির আঁচল এদিকে টানলে ওদিকে কুলোয় না। মধ্যবিত্ত সমাজ-সংসার একটা প্রচণ্ড ভাঙনের মুখে। পুরানো রীতিনীতি মেনে আর চলছে না। আর্থিক অনটন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য তাদের জীবন সংগ্রাম তীব্রাকার ধারণ করেছে। পেটের দায়ে সারাদিন চানাচুর বিক্রী করেও বাড়িতে চাকরি বলে তাকে চালিয়ে যেতে হয়। অর্থের জন্য কিশোরী মেয়েকেও অন্যের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে হয়। পুরানো মূল্যবোধ আর নেই অথচ তাকে অস্বীকার করে এমন মানসিক দৃঢ়তাও নেই।

সংঘাতময় এ জীবনে নবকুমারের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে "কবিতা লিখি কেন?" আর্টের অনেক বই পড়ে, অনেক তর্ক সভায় হাজির হয়েও কবি নবকুমার সঠিক বলতে পারে না কেন সে কবিতা লেখে? এ নিয়ে চলে অনেক চিন্তা, অনেক অস্থিরতা। রাজপথে মানুষের ভিড়ের সঙ্গে মিশে কবি একাকার হয়ে যায়। বিচিত্র বেশ আর বিচিত্র বয়সের পথ-চলা ব্যস্ত মানুষগুলো এক সমগ্রতার ঐক্য জানিয়ে দেয় কবির মনে। কবি অনুভব করে "পথে-হাঁটা মানুষ পথে দুদিকেই হাঁটে, পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যায় বিপরীত দিকে কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার পথ শুধু পিছন থেকে সামনের দিকে, পাথেয় শুধু জীবনকে এগিয়ে নেবার সংগ্রাম।"

কবি উপলব্ধি করেন, "মানুষের সংগ্রামী জীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই আমার কবি হওয়ার সাধ।" এই শহরের পাকা দালান থেকে বস্তির খোলার ঘর থেকে গ্রামের ওই খড়ের ঘরের অগণিত মানুষ আমার পথ চেয়ে আছে, উৎকর্ণ হয়ে আছে ছন্দে ও সুরে আমার আহবান শোনার জন্য। এ মিথ্যা কথা নয়, অলীক কল্পনা নয়। দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু দিয়ে আমি লক্ষ কোটি মানুষের এই অসীম ধৈর্যের প্রতীক্ষা অনুভব করি।" তারা যেন কবিকে আহবান করে বলছে—"হে আমাদের কবি, হে আমাদের নবজন্মের নবজীবনের নববসন্তের মুখর প্রতীক, আমরা তোমায় বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে এস।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তার "কেন লিখি" প্রবন্ধে লিখেছেন, "জীবনকে আমি যে ভাবে ও যত ভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে—আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারী যা কোনদিন পেতো না।"

চলার পথে একদিন নবকুমার দেখল কলোনীর ধারে তমালকে। ছেঁড়া একটা ডুরে কাপড় পরে কলে কলসী ভরছিল। "রাস্তায় গাড়ী চলছে তার খেয়াল নেই কিন্তু প্রত্যেকটি লোকের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। যেন জিজ্ঞেস করছে, আমি কে জানো? আমি মেয়ে নই, আমি একটা মানুষ।" "এ তার নারীত্বের মনুষ্যত্ব চাওয়া নয়। মানুষ বলেই মনুষ্যত্ব দাবী করা। সে মেয়ে না পুরুষ সেটা বড় কথা নয়, সে মানুষ। মেয়েলি সমস্যা তার আসল সমস্যা নয়, তার একেবারে গোড়ার সমস্যা। বঞ্চিতদের অধিকার নিয়ে অনেক মেয়ে লড়াই করেছে, এখনো করছে। কিন্তু ওই বয়সের ওরকম একটি সাধারণ মেয়ের কাছে এই দাবী ছাড়া আর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যাওয়া সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার।" মানুষের মত বাঁচার জন্য ও অনায়াসে নারীত্বের মর্যাদা চুলোয় দিতে পারে আবার দরকার হলে সেজন্য অনায়াসে গুলির সামনে বুক পেতেও দিতে পারে। ওর এই কথাটা কবির কাছে ভাষা দাবী

আরেকদিন চলতে চলতে কবি গিয়ে হাজির হয় মনুমেণ্টের নীচে—হাজার ত্রিশেক জনসমাবেশে। চারিদিকে যে অসহ্য অবস্থা তার প্রতিকারের দাবিতে এই সমাবেশ। কবি এই সমাবেশের জন্য একটা কবিতা লিখে এনেছেন তার নাম 'প্রতিকার চাই'। কবিতাটা কিশোর অধীরের ভালো লাগে। কারণ এতে সত্যি প্রাণ আছে। এক সভায় কবিতাটা বেশ নাড়া দেয়। কবি উপলব্ধি করে এতদিনে সে কবিতা লেখার মর্ম উপলব্ধি করেছে—কবিতার ধরণই বদলে গেছে তার।

নানা মানুষের কাছে সে তার কবিতাকে নিয়ে যায়। তারা শোনে। গভীরভাবে তাদের নাড়া দেয় কিন্তু সমাজের নীচুতলায় যারা আছে, চানাচুর বিক্রীওয়ালা নিখিল, আলেয়া প্রভৃতি সন্তুষ্ট হয় না। তাদের দাবী তারা বুঝতে পারে এমন কবিতা চাই।

কবি নবকুমার সেখানে নামে না। কারণ শুধু বন্ধুমহলে তারিফ পাওয়ার জন্য তো সে কবিতা লেখে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা আর প্রতিকার নামে যে কোন অসংযম আর উশৃঙ্খলতাকেও প্রশ্রয় দেয় না, কোন স্বার্থের খাতিরে সজ্ঞানে সচেতনভাবে নিজের বিবেককেও বিলিয়ে দেয় না। যে জন্য সে যায় একটি সাধারণ মেয়ে তমালের কাছে কিংবা মহিমের বিড়ির দোকানে কবিতা শোনাতে। কারণ তার কবিতা যদি এদের নাড়া না দেয় তাহলে ব্যর্থ হবে তার নতুন যুগের কবিতা লেখা।

'প্রতিভা' সম্পর্কে সাধারণ ধারণার প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই। কারণ সে জানে, "প্রতিভা কোন আকাশ থেকে পড়া গুণ কিংবা ছাঁকা কোন গুণ নয়। অনেক কিছু জড়িয়ে এই গুণ—কোন বিষয়ে সাধনা করার বিশেষ ক্ষমতা আর আগ্রহই আসল কথা। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভা আসলে এক—দু'জনের মধ্যে তফাৎ শুধু ঝোঁকের। মনের গড়ন, পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা অনেক কিছু মিলে ঝোঁকটা ঠিক করে।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'প্রতিভা' শীর্ষক রচনায়ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "প্রতিভা ওই দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা। আর কিছুই নয়। কোন বিশেষ প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মায় না।" আসলে এটা একটা মিথ্যা অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার লেখক কবিকে ছাড়তে হবে। তাদের ভাবতে হবে "আমি দশজনের একজন।" "জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনই তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়।"

কবি নবকুমার উপলব্ধি করে তার কবিতা সাধারণ মানুষের ঐতিহ্যগত কাব্যবোধকে নাড়া দিতে পারলেও তাতে তাদের প্রাণের ভাষা আসেনি। তার কবিতায় নতুন ভাব, নতুন যুগের নতুন সত্য এলেও যেন তা সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না। সেজন্য এক ভীষণ অস্থিরতায় সে ছুটে যায় সবরকম মানুষের কাছে। মিলেমিশে তাদের আপন হবার চেষ্টা করে।

অবশেষে সে উপলব্ধি করে তার মধ্যে সংগ্রামী মানুষের মর্মবেদনাকে রূপ ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু তাদে... নেই। সে যেন যন্ত্রের মত অস্থি... শেষ পর্যন্ত নবকুমার হারাে... উপলব্ধি করল, "ভালবাসা ছাড়া ভালবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না। বাসায় মানুষের আপন না হয়ে কি করে ... ভাষা—যে ভাষায় ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।"

এই উপলব্ধির মধ্যেই নবকুমারের কাহিনী শেষ কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধায়ের এখানেই শুরু। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে অনেক বিখ্যাত লেখক ছিলেন। নানা আদর্শ, চিন্তা এবং রূপায়ণের জন্য তাদের শ্রেষ্ঠত্বও অনস্বীকার্য, কিন্তু শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা দিয়ে সমাজের সংগ্রামী মানুষের মর্মবেদনাকে ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্ব বোধ হয় একমাত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার পূর্বে সাধারণের প্রতি যথার্থ ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র শরৎচন্দ্রের মধ্যে কিন্তু তাঁর ক্ষেত্র সীমিত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র লেখক যিনি সংগ্রামী মানুষের জীবন সমস্যাকে, সমাজের শ্রেণী সংঘাতকে, নতুন যুগের নতুন সত্যকে তীব্রভাবে রূপায়িত করেছেন। গতানুগতিক ভাবধারাকে ভেঙেচুরে তিনি সম্পূর্ণ নতুন খাতে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন সেজন্য একদিকে তিনি যেমন বাঙলা সাহিত্যের ছন্দপতন অন্যদিকে তেমনি তিনি নতুন যুগের পথিকৃৎ।

"কোন দেশের অধিবাসীদিগকে সাময়িককালের জন্য নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়া অপমানের বোঝা বহিতে বাধ্য করা যায় বটে কিন্তু তাহাদিগকে চিরতরে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায় না।"

—রবীন্দ্রনাথ

ফাঁসীর মঞ্চে শৃঙ্খলিতের এই প্রহরে ॥

মূল রচনা—ফায়েজ আহ্‌মদ ফয়েজ (উর্দু)
অনুবাদ—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ফায়েজ আহ্‌মদ ফায়েজ পাকিস্তানের কবি। শিক্ষালাভ লাহোরে ১৯৫১-৫৫ মণ্টগোমারী জেলে বন্দীবাসে ছিলেন। ভারত-পাকিস্তান মৈত্রীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী কর্মী। ১৯৫১ সালের ৫ মার্চ 'অবজার্ভার' এই মন্তব্য করেছিল: 'ভারত-পাকিস্তান জুড়ে ঘৃণার আবহাওয়া যখন তুঙ্গে, তখন তিনি অসম সাহসিকতায় মহাত্মা গান্ধীর শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেন। মুসলীম-লীগ-পন্থীরা তাঁকে যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বিষে জর্জরিত করেছিলেন, তা তাঁর কম্যুনিষ্ট মনোভাবের জন্য নয়—লীগপন্থীদের বন্ধ্যা ও অসার নীতিসমূহের নির্ভিক ও কঠোর সমালোচনার জন্য।' ইনি লাহোর থেকে প্রকাশিত 'পাকিস্তান টাইমস'-এর সম্পাদক। ইকবালের পর ফায়েজ সাহেবকেই উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি রূপে গণ্য করা হয়।

প্রতীক্ষার এমনতর সংশয়াকুল অন্তিম প্রহর
মূর্ত হয়,
সমস্ত চলার পথেই, জীবনের পথে পথে, ।
আকাঙ্ক্ষিত বসন্তদিন ব্যতিক্রম শুধু,
উৎকণ্ঠাহীনতায় নির্মলিন দিন;
প্রতীক্ষার এমনতর অন্তিম প্রহরে
উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের চেনা-দিনলিপি
বোধিমূলে গড়ে দেয় দুর্বহ ভাব—
পরীক্ষার এই হ'ল মাহেন্দ্রক্ষণ,
পরীক্ষা: অনশ্বর প্রেমের।
দৃশ্যের গোচরে আসে প্রিয় মুখচ্ছবি
এই শুভক্ষণে,
শান্ত-সমাহিত হয় অস্থির হৃদয় এই শুভক্ষণে।
অর্থহীন সে-নন্দিত প্রহর,
পাশে যদি না-ই থাকে অংশভাগী সহযোদ্ধার মুখ,
যখন ছায়ামালা নৃত্যপরা,
অথবা যখন ঠান্ডা মেঘ ভেসে যায়
পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে,
ছুঁয়ে যায় চেনার বা সাইপ্রেস গাছের পাতা
অর্থহীন সে-নন্দিত প্রহর,
সুরাহীন সুরাপাত্রের মত।
অসামান্যে-প্রতীকিত এইসব চিহ্নরাজি অনিঃশেষ হয়ে আছে
বহুকাল ধরে,
যেমন এখন, বর্তমান এই প্রহর, দৃষ্টির আড়ালে রাখে
প্রিয়সাথীমুখ
শৃংখলিত ফাঁসীমঞ্চে আনন্দিত উল্লাসের বর্তমান ক্ষণ
প্রয়োজন ও প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষণ—যেমন এখন।
রক্তগোলাপ—উন্মীলনে শ্রেষ্ঠ-প্রকাশ
বাগানে যখন,
তুমি তার কেউ নও
অথচ
ফাঁসীমঞ্চে তুমিই সম্রাট;
কে আছে এমন শক্তি, বন্দী করে ধরে রাখে
উষার সমীরের পদ-সঞ্চরণ?
সুপ্রকাশ বসন্ত-মাধুরী সে তো সদাই ধরা।
সেই প্রহর
নাইটিঙ্গেল পাখির গান, বাহারী রঙিন ফুলসাজে
নন্দিত ছন্দিত সে-প্রহর
আমি যদি না দেখি,
অন্যেরা দেখবে দু' চোখ ভরে।

মধ্যপ্রদেশের প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র / সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৩ সাল। মধ্যপ্রদেশের বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ বিষ্ণুশ্রীধরবাকঙ্কর ফিরছিলেন মান্দাসর জেলা থেকে। ভনপুরে পৌঁছে নদী পার হওয়ার জন্যে তীরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। বালির মধ্যে পড়ে রয়েছে দুটি পাথরের কুঠার। তাঁর মনে হল ঐ গুলি যারা তৈরি করেছিল নিশ্চয় তারা কাছাকাছি গুহাগুলিতেই থাকত।

কিছুদিন পরেই ডঃ বাকঙ্কর সেখানে শুরু করলেন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ। কাজ শুরু করার পর তৃতীয় দিনেই এক বিশাল গুহার মধ্যে পাওয়া গেল নানা ধরণের প্রত্নবস্তু। ডঃ বাকঙ্কর গুহাটির ভিতরের চারদিকে চোখ বোলাতে গিয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর নাড়ির গতি দ্রুত হয়ে গেল—গুহাটির দেওয়ালে, ছাদে আঁকা রয়েছে অজস্র ছবি, প্রায় হাজার দুয়েক! ডঃ বাকঙ্করের চোখের সামনে ভেসে উঠল ফ্রান্স ও স্পেনের বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রগুলি, মনে পড়ে গেল বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন সাহেবের কথা—ভারতে কোন গুহাচিত্র নেই। সুপণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ বাকঙ্কর তাঁর স্কেচ বই নিয়ে ছবিগুলি আঁকতে বসে গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ভনপুর থেকে মাইল ছয়েক দূরে মোদিতে ডঃ বাকঙ্কর আবিষ্কার করলেন আরও কুড়িটি গুহা। সেগুলিতেও ছিল নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগের বহু গুহাচিত্র।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ডঃ বাকঙ্কর মালব উপত্যকার প্রায় ছাব্বিশটি অঞ্চলে তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। দেখা গেল ঐসব অঞ্চলের মৃৎপাত্রগুলির গায়ে যে সব জীবজন্তুর ছবি আঁকা রয়েছে তাদের সঙ্গে কাছাকাছি নরসিংহবাদ ও ভনপুরের গুহাচিত্রগুলির রয়েছে অদ্ভুত সাদৃশ্য। আরও দেখা গেল ঐ সব মৃৎপাত্রগুলি মধ্যপ্রদেশের মহেশ্বর ও নবদাতোলি অঞ্চলের মৃৎপাত্রের সমসাময়িক। এদের বয়স হল—২১০০—১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। অর্থাৎ নরসিংহবাদ ও ভনপুরের গুহাচিত্রগুলিও ঐ সময়েই আঁকা হয়েছিল। সেই প্রথম ভারতে গুহাচিত্রের বয়সকাল নির্ধারণ করা সম্ভব হল। এদেশে প্রথম গুহাচিত্র আবিষ্কার করেছিলেন আর্চিবল্ড কার্লাইল ও জে ককবার্ণ বারানসী ও এলাহাবাদের মাঝামাঝি মীরজাপুর জেলার গুহায় সেই ১৮৮০ সালে। পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশের মহাদেব পর্বতমালার গুহাগুলিতে যে সব গুহাচিত্রগুলি তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলিকে শুধুমাত্র শিল্প-আঙ্গিকের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যস্ত করার চেষ্টা করার ফলে তাঁরা খুব আশাপ্রদ ফললাভ করতে পারেননি। যাই হোক, নরসিংহবাদ ও ভনপুরের গুহাচিত্রগুলির সঙ্গে মালব উপত্যকার মৃৎপাত্রগুলির গায়ে আঁকা ছবিগুলির মিল দেখে মনে হয় তাম্রপ্রস্তর যুগে ঐসব গুহাগুলিতে যারা বাস করত তারা কাছাকাছি কৃষিজীবী সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। এই অনুমানের পক্ষে প্রমাণও পাওয়া গেল ঐ গুহাগুলিতে প্রাথমিক খনন কাজ চালিয়ে। সে গুলিতে গুহাবাসীদের শিকার করার হাতিয়ারগুলির সঙ্গে পাওয়া গেল কাছাকাছি কৃষিজীবী সভ্যতার মৃৎপাত্র, তামার তৈরী তৈজসপত্র। অনুমান করা যেতে পারে গুহাবাসীরা শিকার সংগ্রহ ক'রে যে সব জিনিসপত্র জোগাড় করত (যেমন, পশুর চামড়া, মধু, ফলমূল ইত্যাদি) তারই কিছুটা অংশ তারা বিনিময় করত নিকটবর্তী কৃষিজীবীদের মৃৎপাত্র ও তৈজসপত্রের সঙ্গে। ঐসব মৃৎপাত্রে যে সব ছবি এবং কৃষিজীবীদের যে সব আচার-অনুষ্ঠান তারা দেখত সেগুলিকে এঁকে রাখত গুহার দেওয়ালে।

কিন্তু ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটতে তখনও বাকি ছিল। সেটি ঘটল ১৯৭৫ সালে। ঐ বছর মধ্যপ্রদেশেরই ভিমবেতকায় ডঃ বাকঙ্কর আবিষ্কার করলেন সাতশটিরও বেশী প্রাকৃতিক গুহা যাদের মধ্যে প্রায় পাঁচশটিতে রয়েছে অসংখ্য প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র। ইতোপূর্বে পৃথিবীর আর কোন দেশে এত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের সমাবেশ দেখা যায়নি। এ ছাড়াও ভিমবেতকায় রয়েছে আরও দুটি বৈশিষ্ট্য। এখানে একটি গুহায় পাওয়া গিয়েছে শেষ পুরা প্রস্তর যুগের ১ (প্রায় বিশ হাজার বছর আগের) মানুষের মাথার খুলি। ভারতে এটিই ফসিল মানুষের প্রথম নিদর্শন। এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে 'হোমো স্যাপিয়েনস ভিমবেতিয়ান'। এখানকার দ্বিতীয় বৈশিষ্টটি হল গুহাগুলিতে আদি পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির ধারা দেখতে পাওয়া যায়। তবে ভিমবেতকার গুহাচিত্রগুলির কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশই পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ ভাগের শুরুতে অর্থাৎ ত্রিশ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আঁকা এবং এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর গুহাগুলিতে আর মানুষ বাস করত না।

ভিমবেতকার গুহাচিত্রগুলির বিষয়বস্তু কি ছিল সেই আলোচনা করার আগে ইওরোপীয় উচ্চ প্রত্নপ্রস্তর যুগের Upper Palaeolithic age গুহাচিত্র সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা সেরে নিলে বিষয়টি বোঝার পক্ষে সুবিধা হবে।

ইওরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্স ও স্পেনে ঐ যুগের যে সব গুহাচিত্রগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেগুলির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ছিল শিকারমূলক জাদুবিদ্যা (History of Mankind, Cultural and Scientific Development, Vol. 1. Unesco Publication

পৃঃ ২০৫, The Old Stone Age, Mfles Burkitt, পৃঃ ১৮৪ দ্রষ্টব্য)।

সে যুগে মানুষ বাস করত ছোট ছোট উপজাতিতে (tribe) ভাগ হয়ে। কয়েকটি কোম (Clan) মিলে গড়ে উঠত এক একটি উপজাতি। প্রতিটি উপজাতি থাকত যৌথভাবে। তাদের জীবিকা প্রধানতঃ ছিল শিকার করা। উপজাতির প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব স্বার্থ বলতে কিছু ছিল না, ব্যক্তি সত্তা বিলীন হয়ে থাকত যৌথ সত্তার মধ্যে। দলবদ্ধ শিকার থেকে পাওয়া খাদ্য তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিত ২। স্বাভাবিকভাবেই শিকার সুলভ হওয়া এবং পশুর বংশ বৃদ্ধির ওপরই নির্ভর করত উপজাতিগুলির জীবনধারণের প্রশ্ন।

কিন্তু সেই যুগে আদিম মানুষের কলাকৌশল (technique) ছিল নিতান্তই অনুন্নত, প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানও ছিল খুবই সামান্য। তাই শিকারে সফল হওয়ার জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল কোন অতিরিক্ত উদ্দীপনার, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্যে অর্থাৎ পশুর বংশবৃদ্ধি ঘটাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল কোন এক ধরণের কাল্পনিক কলাকৌশলের। অর্থাৎ বাস্তব কলাকৌশলের ঘাটতি পূরণের জন্যে তারা কাল্পনিক কলাকৌশলের আশ্রয় নিত। এই কাল্পনিক কলাকৌশলই হল জাদু। এই জাদু ঐসব ছবি দেখে শিকারীরা নিজেদের শিকারে উৎসাহিত করত। সেই আদিম যুগেও মানুষের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু সেই অলৌকিক শক্তি ছিল পশু ও মানুষের সম্মিলিত গুন-সম্পন্ন এবং আদিম মানুষেরা ভাবত ঐ অলৌকিক শক্তিও জাদু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পশুর প্রজনন বাড়াবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা

চিত্র (ক)
ফ্রান্সের নিঅস্ক গুহায় বাইসনের ছবিতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে: চোখে ফুটেছে যন্ত্রণার অনুভূতি

চিত্র (খ)
ফ্রান্সের লেট্রফ্রেরে গুহার অলৌকিক শক্তির চিত্র।

অনুষ্ঠান ছিল অনুকরণমূলক আদিম মানুষেরা ভাবত কোন একটি অনুষ্ঠানকে সঠিকভাবে অনুকরণ করতে পারলেই প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের অধীন হবে। শিকারে যাবার আগে দলবদ্ধ শিকার নৃত্যের মাধ্যমে তারা অতিরিক্ত উদ্দীপনা সংগ্রহ করত, বৃষ্টি না হলে মেঘের ডাকের নকল করে, আকাশে জল ছিটিয়ে তারা প্রকৃতিকে বৃষ্টি দিতে বাধ্য করবে বলে মনে করত। এইসব উদ্দেশ্য নিয়েই সে যুগের শিল্পীরা আঁকত তীরবিদ্ধ পশুর ছবি। কখনও তারা পশুর ছবিতে আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি করত (চিত্র ক)। অলৌকিক শক্তির ছবিও আঁকত (চিত্র খ)। অর্থাৎ আদিম সমাজে ছবি আঁকার একটা সামাজিক উপযোগিতা ছিল। সে যুগে তাই শিল্পীরা প্রকৃত অর্থে শিল্পী হলেও ছবি আঁকার পিছনে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণার থেকে তাদের কাছে সামাজিক দায়িত্বই ছিল প্রধান। প্রতিটি শিল্পীই ছিল কোন না কোন উপজাতির সদস্য।

ছবি আঁকার জন্যে নিশ্চয় তারা শিকার করা অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিল তা না হলে ছবি আঁকার পিছনে তাদের পক্ষে অত সময় ব্যয় করা

সম্ভব হত না। অতএব অনুমান করা চলে যে ছবি আঁকার জন্যে শিল্পীদের খাদ্য সংগ্রহের মত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হত সে ছবির সামাজিক উপযোগিতা ছিল অপরিসীম। অর্থাৎ ছবি আঁকাই ছিল শিল্পীর সামাজিক অর্থনৈতিক দায়িত্ব এবং উপজাতীয় সমাজের সদস্য হিসেবে শিল্পীকে সে দায়িত্ব পালন করতে হত।

ইওরোপীয় প্রত্নপ্রস্তর যুগের ছবিগুলির আঙ্গিক এবং ছবি আঁকার জন্যে স্থান নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গিকে একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে উপরোক্ত ধারণাই আরও দৃঢ় হয়। ঐ সব ছবিগুলিতে জীবজন্তু ও মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকেই আঁকা হয়েছে, শিল্পী তার দেখা জন্তু বা মানুষের রেখাচিত্রই হাজির করতে চেয়েছেন, কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁকে শিল্পসুষমা সৃষ্টি করতে চাননি।

স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ গুহাগুলিতেই প্রবেশ করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং কোন কোন গুহায় (যেমন, ফ্রান্সের ফঁদ্যাগ, লাপাজিয়েগা প্রভৃতি) এত উঁচুতে ছবি আঁকা হয়েছে যে শিল্পীকে নিশ্চয় কোন সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। ফ্রান্সের নিঅক্স দেখা যায় গুহার প্রবেশ পথ থেকে প্রায় আটশ গজ দূরে ছবি আঁকার জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল, অথচ কাছাকাছি ছবি আঁকার উপযোগী অনেক দেওয়াল ছিল। এইসব দেখে মনে হয় সাধারণ মানুষকে দেখাবার জন্যে ঐ সব ছবি আঁকা হয়নি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধারণের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই ছবিগুলি অত দুর্গম স্থানে আঁকা হয়েছিল। এই গোপনীয়তার পিছনে জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত অলৌকিকত্বের ধারণা থাকাটাই সম্ভব।

এবার ভিমবেতকার গুহাচিত্র প্রসঙ্গে আসা যাক। ভিমবেতকার গুহাগুলিতে দলবদ্ধ শিকারের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। দেখা যায় দলবদ্ধ নৃত্যের দৃশ্য। এগুলি গুহাবাসীদের যৌথ জীবনের পরিচয় দেয়। এই ধরণের নৃত্য এখনও আধুনিক ভারতের বহু উপজাতির মধ্যে দেখা যায়।

ভিমবেতকার গুহাবাসীদের জীবনে অলৌকিক জাদুশক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ছবি আঁকার জন্যে স্থান নির্বাচন এবং ছবিগুলির আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে। বহু গুহায় ছবিগুলি আঁকা হয়েছে অত্যন্ত দুর্গম স্থানে, ছবিগুলি প্রধানতঃই রেখাচিত্র এবং কোন কোন জীবজন্তুর ছবি বিশাল আকারে আঁকা হয়েছে (কোন কোনটি ৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু)। ঐ সব জীবজন্তুর ছবির মধ্যে কোন একধরণের অলৌকিক বিশেষত্ব সৃষ্টি করার জন্যেই ঐগুলি সাধারণ আকারের চেয়ে অত বড় করে আঁকা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ভিমবেতকার গুহাচিত্রগুলি অলৌকিক জাদুশক্তিকেই প্রকাশ করেছে। চিত্র (গ)তে দেখা যাচ্ছে অলৌকিক জাদুশক্তিকে আহ্বান করে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। চিত্র (ঘ)তে তিনটি অলৌকিক জাদুশক্তির প্রতীকদের ছবি আঁকা হয়েছে। চিত্র (ঙ)তে আঁকা হয়েছে একটি জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানের দৃশ্য। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি মানুষ পরস্পরের হাত ধরে নাচছে এবং একজন পুরোহিত জাদুকর তার দুপাশে দুটি জাদুশক্তির প্রতীককে জাগ্রত করছে। ঐ প্রতীক দুটির মধ্যে পরোহিতের ডানদিকেরটি নিঃসন্দেহে কৃষিমূলক জাদুশক্তির প্রতীক। ঐ ছবিটি দেখে মনে হয় ভিমবেতকার গুহাবাসীরা তাদের কাছাকাছি সমতলবাসী কোন উপজাতির মধ্যে ঐ রকম জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠান দেখেছিল এবং ঐ উপজাতিটি অন্ততঃ প্রাথমিক ধরনের কৃষি কাজ করত। আধুনিক ভারতে এখনও অনেক উপজাতি ঐ ধরণের কৃষিমূলক জাদুবিদ্যার অনুষ্ঠান করে এবং পরস্পরের হাত ধরে নৃত্য করা ঐ রকম অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ।।

চিত্র (গ)
ভিমবেতকায় ৬০,০০০-৩০,০০০ বছর আগে আঁকা মধ্য পুরাপ্রস্তর যুগের গুহাচিত্র।

চিত্র(ঘ)
ভিমবেতকায় ৩০,০০০-১০,০০০ বছর আগে আঁকা শেষ পুরাপ্রস্তর যুগের গুহাচিত্রঃ প্রত্যেকটিই অলৌকিক শক্তির প্রতীক।

ভিমবেতকার সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক গুহাচিত্রটির (চিত্র চ) কথা এখনও বলা হয়নি। এই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একটি অশ্বের ওপর বসে রয়েছে একজন পুরোহিত। অশ্বটির সামনে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুহাতে অস্ত্রধারী একটি মানুষ। এরা দুজনেই

চিত্র (ঙ)
ভিমবেতকায় ১০,০০০-৫০০০ বছর আগে আঁকা গুহাচিত্র।

চিত্র (চ)
ভিমবেতকায় তাম্রপ্রস্তর যুগের (৫,০০০-২,৫০০ বছর আগে) আঁকা গুহাচিত্রঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের (?)

নিঃসন্দেহে আর্য-পূর্ব কোন গোষ্ঠীর লোক ৩। অস্ত্রধারী মানুষটির ডানদিকে আঁকা রয়েছে স্বস্তিকা চিহ্ন। এই চিহ্নটি আজও হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। মানুষটির বাঁদিকে আঁকা রয়েছে পর্বতের প্রতীক। সবকিছু মিলিয়ে মনে হয় এটি সম্ভবতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের চিত্র।

এরকম একটি সিদ্ধান্তের কথা শুনে অনেকেরই হয়ত ভুরু কুঁচকে উঠতে পারে। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ বৈদিক আর্যদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু ঋগ্বেদের সাক্ষ্য (১/১৬২ ও ১/১৬৩) থেকেই দেখা যায় যে ঋগ্বেদের যুগেই অশ্বমেধযজ্ঞকে অতীত যুগের অনুষ্ঠান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া অশ্বমেধ ও অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে আদিম জাদু অনুষ্ঠানের অনেক স্মারকচিহ্ন টিঁকে ছিল এ মন্তব্য করেছেন কীথ তাঁর The Veda of the Black Yajus School (CXXXV, CXXXVI) এবং Religion and Philosophy of the Veda and Upanisads (পৃঃ ২৫৮-২৫৯) বই দুটিতে। ম্যাকডোনেলও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন Encyclopaedia of Religion and Ethics (8.312) বইটিতে।

অশ্বমেধযজ্ঞের সময় রাজার প্রধানা মহিষী যজ্ঞে বলি প্রদত্ত অশ্বটির পাশে শুয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতেন। সেই সময় হোত্রি ও প্রধানা মহিষীর মধ্যে, অন্যান্য মহিষী, তাদের পরিচারিকা ও অন্যান্য পুরোহিতদের মধ্যে অশ্লীল বাক্য বিনিময় হত। ঐ অশ্লীল বাক্যগুলি ছিল প্রধানতঃ বাজসনেয়ী সংহিতার বাইশ ও তেইশ অধ্যায়ের মন্ত্র। পৃথিবীর অন্যান্য আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও জাদুমূলক অনুষ্ঠানের সময় ঐরকম অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময় 'ব্রহ্মোদয়' নামে যে এক ধরণের হেঁয়ালী কাটা হত পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম উপজাতির মধ্যে জাদুমূলক অনুষ্ঠানের সময় ঐ ধরণের হেঁয়ালী কাটার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন ফ্রেজার তাঁর The Scapegoat (পৃঃ 208ff) বইটিতে। অর্থাৎ অশ্বমেধযজ্ঞের আদি রূপটি ছিল জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠান। আর্যদের আদিম সমাজেও অশ্ব ছিল গতি ও বীর্যের প্রতীক। সেই সমাজে আর্যনারী অশ্বের মত বীর্যবান সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষায় জাদু অনুষ্ঠানে নিহত অশ্বের সঙ্গে মিলিত হত। এটি স্পষ্টতই ছিল এক ধরণের উর্বরতামূলক জাদুবিদ্যা। পরবর্তীকালে ঋগ্বেদের যুগে রাজকীয় অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্যেও সেই আদিম জাদু অনুষ্ঠানের রেশ টিঁকে ছিল। বৈদিক আর্যরা মূলতঃ ছিল পশুপালক উপজাতি। পৃথিবীর অন্যান্য পশুপালক উপজাতির মধ্যেও এই রকম বা অন্য ধরণের উর্বরতামূলক জাদুবিদ্যার নিদর্শন পাওয়া যায় ৪। ভারতেও ভিমবেতকা গুহার কাছাকাছি সমতলবাসী কোন আর্য-পূর্ব পশুপালক উপজাতির সমাজে গুহাবাসী শিল্পী সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ করেছিল অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর তাকেই সে গুহার দেওয়ালে অমর করে রেখে গিয়েছে।

১ ইওরোপীয় প্রত্নপ্রস্তর পুরা প্রস্তর যুগকে (Palaeolithic or Old Stone Age) নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু ভারতীয় ও ইওরোপীয় প্রত্নপ্রস্তর যুগের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য থাকায় ১৯৬১ সালে দিল্লীতে এশীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় সেখানে ভারতীয় প্রত্নপ্রস্তর যুগকে আদি, মধ্য ও শেষ প্রস্তর যুগে ভাগ করা হয়েছে।

২ চার্লস ডারউইন তাঁর
A Naturalist's Voyage Round the World
(পৃঃ ২৪২) বইটিতে ফুজি দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে এক অমোঘ সমবণ্টনের নিয়মের কথা লিখেছেন।
ব্রিফল্ট তাঁর The Mothers-এ (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪) বেইলি, পামার, ম্যাথুজ, রিডলি প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে সিংহলের আদিবাসী এবং অষ্ট্রেলিয়ার শিকারজীবীদের মধ্যেও সমবণ্টনের নিয়ম ছিল। অষ্ট্রেলিয়ার একদল শিকারজীবীর মধ্যে দেখা গেছে যে শুধু শিকার থেকে পাওয়া খাদাই নয়, উপহার হিসাবে পাওয়া সামান্যতম জিনিসও তারা সমান ভাগে ভাগ করে নিত।

৩ এই ছবিটি তাম্রপ্রস্তর যুগে আঁকা হয়েছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ ভারততত্ত্ববিদই মন্তব্য করেছেন যে আর্যরা ভারতে বহিরাগত এবং আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে এদেশে তারা ১৭৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের আগে আসেনি।

৪ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ষ্টুয়ার্ট পিগট তাঁর Pre-Historic India বইটিতে (পৃঃ ২৪৭) বলেছেন যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও আয়ার্ল্যান্ডের Altai-Turk দের মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। এরা অতীতে পশুপালক উপজাতি ছিল।

দরদী কথাশিল্পী ও দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র / সুকুমার দাস

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না। নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিনই ভেবে পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—ওরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।" মানবদরদী অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কোন কিছু ভাবতে গেলেই সবার আগে মনে হয় সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর এ সমবেদনার কথা। সমাজের অবিচার, অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেই তিনি যেন তাঁর লেখনীকে সচল করে রেখেছিলেন আজীবন। সাধারণ মানুষের অতি কাছ থেকে, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখকে সহানুভূতির সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেই তিনি তাদের কথা লিখেছিলেন। এতটুকু আতিশয্য ছিল না তাঁর ঐসব লেখার মধ্যে। সমাজের তথাকথিত নীচুস্তরের মানুষগুলির সাথে অকপটে মিশে যেতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সেকালের সমাজের ও ধর্মের কুসংস্কারের ভয়াবহ রূপকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। সমাজ ও ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামির উর্ধ্বে থেকে শুধুমাত্র মানুষকেই তিনি বড় করে দেখেছিলেন--উপলব্ধি করেছিলেন তাদের অন্তরাত্মার আশা আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ বেদনাকে। তাই অদৃষ্ট ও মূঢ়তার নাগপাশে বদ্ধ মানুষগুলিকে তিনি সচেতন ও মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তখনকার সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা, "সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি; কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নর-নারীর বহু চিন্তা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে।" তিনি তাঁর নানা উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধে সমাজের ঐ উপদ্রবের বিরুদ্ধে নিরলস নালিশ জানিয়ে গেছেন বলেই সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আজ এত প্রিয়, এত মহান হয়ে উঠেছেন।

শরৎ সাহিত্যে সেকালের বাংলার সমাজের যে ছবি নিখুঁত ভাবে ফুটে ওঠে তাতে দেখা যায় অসহায় গরীব সাধারণ মানুষগুলি সমাজের বহু অন্যায়, অবিচার আর নিষ্ঠুর বিধানের কাছে মাথা নত করে দুঃখকষ্টকে অদৃষ্টের বিধান বলে মেনে নিয়ে ক্লেশ ভোগ করতো—অথচ এগুলির অধিকাংশই মানুষের স্ব-স্বার্থে গড়া, একথা তারা একবারও বুঝতে চাইতো না বা বুঝলেও লাঞ্ছনার ভয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস করতো না। অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করেও ওরা ছিল জড় পুতুলের মত নীরব। অকুতোভয় শরৎচন্দ্র তাই তাদের মুখপাত্র হয়ে সেদিন সমাজের দরবারে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে নালিশ পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন মানুষকে সুখী করতে হলে, সমাজকে সুন্দর করতে হলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ, স্বার্থ প্রণোদিত জাতি-কুল-মান'এর বেড়াজালকে সমাজ দেহ থেকে অপসারিত করতেই হবে। এ কাজে কে তাঁকে সাহায্য করবে, কে করবে না—এ কথা না ভেবে একাই সে কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি একথা সঠিকভাবেই জানতেন, "পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না--একাকীই দাঁড়াতে

জন্ম : ১৫-৯-১৮৭৬ মৃত্যু : ১৬-১-১৯৩৮

হয়। এর জন্য দুঃখ আছে। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ একদিন সংঘবদ্ধ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়।...পাঁচজনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়—তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? আজ লোকে কথা শুনিতে না পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই।" মানব সমাজের কল্যাণে অপ্রিয় সত্যকে অকপটে প্রচার করেছিলেন বলেই শরৎচন্দ্র সেদিনকার বেদনাহত মূক মানুষগুলির অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন আর আজ আমাদের হয়ে আছেন বহু প্রেরণার উৎস।

শরৎ সাহিত্য চিরকাল পাঠক সমাজকে অভিভূত করবে, কারণ তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ভাবের সাথে পাঠক এক বিচিত্র অন্তরঙ্গতা অনুভব করে। এর কারণ এসব তাঁর স্ব-নির্ভর অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালা থেকে গ্রহণ করা। মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভিজ্ঞতার

আলোকেই সৃষ্ট তাঁর এসব গল্প উপন্যাসগুলি। তাই এগুলি অতি সহজেই মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। বহুর সাহচর্যেই মানুষের ভিতরকার আসল সত্তাটাকে জানা যায়, চেনা যায়—এটা তিনি ভোলেননি। তাঁর মতে, "জীবনে যে ভালবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকারের অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের মুখে ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে? নিজের জীবনটাই হল যার নীরস, বাংলাদেশে বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম জীবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দুদিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে।" শরৎচন্দ্র মানুষের হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন, তাই মানব জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর গল্প উপন্যাসে বিমূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে সংসারের নোংরা জিনিষটাকে এড়িয়ে বাস্তবের অভিজ্ঞতার সাথে আদর্শের মিলন ঘটিয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে রত ছিলেন বলেই শরৎ সাহিত্য শৈলী আজ এত প্রাণ স্পর্শী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বলতে দ্বিধা নেই যে শরৎচন্দ্রের চোখের পিছনে ছিল একটা দরদী হৃদয়, তাই যা তিনি দেখতেন তা' শুধু বুদ্ধির দেখা নয়, বুকের দরদ দিয়ে দেখা। সেই চোখ দিয়েই তিনি বাঙ্গলার নারী সমাজকে দেখেছিলেন--এবং অনায়াসে তাদের হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। তিনি নারীজাতিকে নারীত্বের ন্যায্য মর্য্যাদা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজ যাদের কলঙ্কিনী বলে অপাংক্তেয় করে দিয়েছে, হৃদয়ের শুচিতায়, অনুভূতির গৌরবে তারাও অনন্য-সাধারণ হতে পারে। তিনি বলতে চেয়েছেন মেয়েরা যে শুধু সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে তাই নয় তাদের জীবনকে আরও বেশী বিড়ম্বিত ও দুর্বিসহ করেছে সমাজের চাপানো যুক্তিহীন নিস্করুণ সংস্কার। শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে লেখনীর সাহায্যে এর বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হেনেছেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মেয়েদের আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মেয়েদেরও যে একটা স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকতে পারে, তারাও যে মানুষ, শুধু মেয়ে নয়—ঐ কথা সেদিনের পুরুষ শাসিত সমাজ কোনদিনই ভাবতে পারেনি। শরৎ-চন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে যে নারী চরিত্রগলি সৃষ্টি করেছেন, তাতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন সমাজে মেয়েদেরও একটা পৃথক অস্তিত্ব ও অধিকার আছে—তাদেরও আছে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অরুচি। পুরুষের নির্দয় ব্যবহারে সমাজ পরিত্যক্ত লাঞ্ছিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমত্ব ও করুণা। তাঁর কাছে নারীর নারীত্বই বড়—সতীত্বই সবকিছু নয়। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির মধ্যে তাই তিনি দেখিয়েছেন অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব সতীত্বে ও নারীত্বের, ন্যায়-অন্যায়ের, ধর্ম ও অধর্মের। তাঁর সৃষ্ট অচলা, সবিতা, অন্নদাদিদি, নিরুদিদি, মাধবী, কমল, নীলিমা, রমা, কিরণময়ী ও সুরমা—এরা কেউ কোন না কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নয়। মেয়েদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল শরৎচন্দ্রের সহজাত। তাই তাঁর কোমল অন্তর সর্বদাই তাদের বিড়ম্বিত জীবনের জন্য মমতায় ছটফট করতো।

মানুষের মধ্যে তিনি দেবতার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন বলেই তিনি পাপীকে নয় পাপকেই ঘৃণা করেছেন। শরৎচন্দ্রের চরিত্রের অভিজ্ঞ উদার অন্তরে পদস্খলিত উদ্‌ভ্রান্ত নর-নারীর জন্য ছিল তাঁর অসীম সহানুভূতি। চরিত্রহীনের মধ্যেও যে মহত্ব থাকা সম্ভব তিনি তাই বারবার তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবন স্থায়ী হয়েছিল পঁচিশ বছর। এর যখন শুরু তখন বাঙ্গলার সাহিত্যা-কাশে রবি সূর্য মধ্যপথে। সেই প্রখর রবি কিরণছটার মধ্যেই শরৎচন্দ্র যেন ছিটকিয়ে এলেন অত্যুজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্কের মত এবং অনায়াসেই জয় করে নিলেন বাঙ্গলার হৃদয়। সে যে কত কঠিন কাজ--তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁর প্রথম উপনাস "বড়দিদি" যখন ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল সেদিনই বাঙ্গলার পাঠক সমাজ তাঁকে এক বিরাট প্রতিভাবান লেখক বলে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। "বড়দিদি" উপন্যাসটি পড়ে রবীন্দ্রনাথও সেদিন তাঁর তারিফ করে তাঁকে একজন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অসামান্য লেখক বলেই মন্তব্য করেছিলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হ'ল তাঁর অন্যান্য উপনাস বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, দেবদাস, চরিত্রহীন, দত্তা, গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, দেনা পাওনা, নববিধান, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন, বিপ্রদাস, শুভদা ও শেষের পরিচয় (অসম্পূর্ণ)। এরই সাথে সাথে তিনি লিখলেন বিখ্যাত গল্পগুলি যেমন বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, মেজদিদি, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, নিস্কৃতি, কাশীনাথ, স্বামী, ছবি, হরিলক্ষ্মী, অনুরাধা ও সতী। বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশে স্ব-প্রতিভায় শরৎচন্দ্র তখন এক অসাধারণ কথাশিল্পী। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে তাঁর গল্প উপন্যাসের কি সমাদর ও প্রশংসা।

রবীন্দ্রনাথের যুগেও শরৎসাহিত্য এত সহজেই পাঠক চিত্ত জয় করে নিলো কেমন করে? কেন সমাদৃত হল তাঁর গল্প উপন্যাস বাঙ্গলার ঘরে ঘরে? এর উত্তরে বলা যায় যে শরৎসাহিত্যে ছিল এক অদৃশ্য যাদুর আকর্ষণ--যা পাঠক সমাজকে সেদিন সহজেই প্রভাবিত করেছিল। শরৎচন্দ্রের দরদী লেখনীর যাদু স্পর্শেই তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী। আসলে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি জীবনে একটা বেদনাসিক্ত অভিমান সতত প্রবহমান ছিল, এ বেদনা বা অভিমান তাঁর একান্তই নিজস্ব ছিল। এখানে তিনি কাউকে প্রবেশ করতে দেন নি, অংশ দিতে চাননি। আপন জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত এই বেদনাই তাঁর সাহিত্যকে মর্মস্পর্শী করে তুলতে সাহায্য করেছে। অল্প বয়স থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বনায় নানা কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে এক অনিশ্চিত জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল তাঁকে—আর সেই চলারপথের বিচিত্র সঞ্চয়ই কালক্রমে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে সাহিত্যের অমূল্য রত্ন হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্র আপন সাধনার প্রভাবেই মানবজীবনের গহন

গভীরের অজ্ঞাত জিনিষগুলিকে আহরণ করে এনে সাহিত্য ভান্ডারে সঞ্চিত করেছিলেন। ছেলেবেলা থেকে নানা দিক দিয়ে বঞ্চিত না হলে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনায় জর্জরিত না হলে আমরা তাঁর কাছ থেকে এ হার্দ্য-সাহিত্য পেতাম কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিন্তু শরৎসাহিত্য কি 'বাস্তব' সাহিত্য, না ওটা 'রোমান্টিক' সাহিত্য? সাহিত্য সমালোচকেরা আজ তার জাত বিচারে হাবুডুবু খাচ্ছে। এর কোনটাই কিন্তু আসলে এককভাবে ঠিক নয়, কারণ শুধু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সত্যানুসরণে সাহিত্য রচিত হলেই তা' বাস্তব সাহিত্য হয় না। হতে পারে সেটা মানব জীবনের ও সমাজের একটা নিখুঁত 'স্থিরছবি' মাত্র। আবার নর-নারীর পূর্ব রাগ-প্রেম-বিরহ মিলনাদি হৃদয় ঘটিত কারবার নিযে রম্য রচনা, সেটাও বাস্তবিক পক্ষে রোমান্টিক সাহিত্য হতে পারে না। তাই বস্তু তান্ত্রিকেরা তাঁর সাহিত্যকে বলছে 'বাস্তব সাহিত্য' আর কল্পনাপ্রবণ পাঠকেরা এর মধ্যে রোমান্সের আস্বাদ পেয়ে একে বলছে 'রোমান্টিক সাহিত্য'। দ্বন্দ্বের শেষ এখানেই নয়। কেউ কেউ তাঁর বিভিন্নমুখী রচনার জন্য তাঁকে বলতে চেয়েছেন বিপ্লবী সাহিত্যিক। কেউবা বিদ্রোহী সমাজ সংস্কারক, আবার বিকৃতরুচির সমালোচকেরা—যারা শরৎ সাহিত্যের ভেতরই প্রবেশের চেষ্টা করেনি, তারা একে দুর্নীতির সহায়ক অশ্লীল সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। ওদের মতে এঁর সাহিত্যে কোন আদর্শ ও মতবাদ নেই। এতে সমস্যা আছে, অথচ সমাধানের সূত্র নেই। আসলে শরৎচন্দ্র যে সেকালের রক্ষণশীলতাকে কাটিয়ে সমাজের সমস্যা সমাধানর সঠিক পথকে নির্দেশ করতে পারেনি—একথা অনেকাংশে সত্য। পুরুষ চরিত্রের দুর্বলতার সমালোচনায় তিনি যতটা সোচ্চার ছিলেন, মেয়েদের আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেও তাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হতে অনুপ্রাণিত করেননি। তবে আর যে যাই বলুক না কেন একথা একমাত্র অর্বাচীনই বলবে যে তাঁর সাহিত্য-দুর্নীতির সহায়ক এবং অশ্লীল। সমালোচকেরা তাঁর সাহিত্যকে যে ভাবেই গ্রহণ করুক, পাঠক সমাজের কাছে তাঁর লেখা মনোগ্রাহী অভিনব সৃষ্টি হয়েই অক্ষয় সমাদর লাভ করবে—এবং তা করবে এই জন্য যে শরৎসাহিত্যের চরিত্রগুলির মধ্যে তারা তাদের নিজেদের প্রাণস্পন্দন অনুভব করে। ওদের সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, প্রেম-বিরহ তাদের মনকেও আলোড়িত করে।

শরৎসাহিত্য নিয়ে আজকালকার সমালোচকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে শরৎ সংবর্ধনার এক সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কিছু বক্তব্য এখানে উধৃত করা উচিত বলে মনে করি। শরৎ সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেছিলেন, "সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মম, তার কাল যা' পেয়েছে, তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্বে যা ভোগ করেছে, তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দান কেটে নেয়, আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রস তৃপ্তির প্রমাণ ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে। নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, সুস্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে, তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী, এক যা তাও অনেক। ...জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া নানা কক্ষপথে যেগুলি নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙ্গালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙ্গালী আপনাকে যাতে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তাদের অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরাও অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষা-ভাজন। ..সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে চিন্তা শক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনা শক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মালাদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করুণ—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখাতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুণ।"

দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাঙলা সাহিত্য এই অক্ষয় অবদানই কেবল তাঁর জীবন-পরিচয় নয়। তিনি শুধু একজন লেখকই ছিলেন না, জীবনে নানা বিচিত্র ও দুর্গম পথের তিনি পথিক ছিলেন। অতি সহজ ও সাধারণভাবেই জীবন যাপন করতেন তিনি। কথাবার্তায় আচার-আচরণে কৃত্রিম গাম্ভীর্য তো তাঁর ছিলই না এবং সর্বদা মানুষ শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন ঢিলেঢালা পরিহাস প্রিয় উদার-মানুষ। তাঁর সান্নিধ্যে যবাই এসেছিলেন তারাই বুঝেছিলেন তাঁর কোমল চরিত্র মাধুর্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন দয়ালু। মানুষের দুঃখেই শুধু নয় ইতরপ্রাণীর কষ্টেও তাঁর প্রাণ কাঁদতো – ওদের তিনি ভালবাসতেন সেবা করতেন। অমিত পতিতোদ্ধার এ কথা শিল্পীর কর্মবহুল জীবনের সমগ্র দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে করা যাবে না এবং করার ইচ্ছেও আমার নেই। আজকের এই প্রবন্ধে তাঁর বহুমুখী জীবনধারার একটি উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে আর একটু আলোকপাত করেই এর সমাপ্তি টানবো।

সে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল যে, শরৎচন্দ্র সাহিত্য-আঙিনার বাহিরে ছিলেন একজন যথার্থ দেশ প্রেমিক। পরাধীন ভারতের মুক্তিচিন্তা তাঁর লেখনীকে বারবার থামিয়ে দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী যখন অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়, শরৎচন্দ্র তখন কলম ছেড়ে সেই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে মতের মিল তাঁর বেশী দিন ছিল না।

তিনি বুঝেছিলেন 'চরকা' আর অহিংসাই শৃঙ্খল মুক্তির পথ নয়। কিন্তু সেজন্যে মহাত্মাজীর প্রতি তিনি কোনদিনই শ্রদ্ধা হারাননি। তিনি দেশবন্ধুর রাজনৈতিক পরিকল্পনার ছিলেন প্রবল সমর্থক। সর্বত্যাগী এই মানুষটির প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অপরিসীম সহানুভূতি। কংগ্রেসের একটা বিরাট অংশ যখন দেশবন্ধুর বিরোধী, শরৎচন্দ্র তখন ছিলেন তাঁরই পাশে। তিনি তাঁকে সাহস দিয়েছেন—দিয়েছেন কর্তব্য সাধনে একলা চলার প্রেরণা। ১৯২৫ সালের ১১ই মে যখন দেশবন্ধু দার্জিলিঙে দেহ রাখেন, দেশবাসীর সেদিনের কান্না দেখে তিনি পরে লিখেছিলেন, "মনে হয় পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি সংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াই-এর প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু শেষ হইল না। দেশবন্ধু দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে-বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না। আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এতবড় কান্নারই প্রয়োজন ছিল।"

১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র জেল থেকে মুক্তি পেলেন। কিছুদিন পরেই বাঙলায় কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিল দলাদলি। দুটি দলে বিভক্ত হলেন দলের সকলে। এক দলের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অপর দলের নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র রইলেন সুভাষচন্দ্রের দলে শরৎচন্দ্র চিরদিন হৃদয় দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে ভাল বেসেছিলেন। তিনি বলতেন, "সবাইকে ছাড়তে পারি, সুভাষকে না।" তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন কয়েক বছর। দলের মধ্যে বিবাদের জন্য একবার হাওড়া জেলার এক কর্মী সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি জেনে শরৎচন্দ্র উদ্যোক্তাদের সরাসরি বলেছিলেন, "যেখানে সুভাষ আমন্ত্রিত নয়, সে শিবহীন যজ্ঞে আমি যাবো না।"

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হলেও শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের যথেষ্ট স্নেহ করতেন। এমনকি দেশের মুক্তির জন্য সহিংস সংগ্রামকে সমর্থন করতেন। বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এলেই তিনি তাদের বিপ্লবের কাহিনী মন দিয়ে শুনতেন। একদিন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের কাছে অবাক বিস্ময়ে বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের কথা শুনে এবং পেডি হত্যার কথা শুনে তিনি তাঁকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র বলেছিলেন, "ইংরেজ নিধনের ব্যাপারে টাকার তেমন দরকারই হয় না। যেটুকু হয়, তা' আমরা নিজেরাই চালিয়ে নি।" একথা শুনে খুসী হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। এরপর তিনি তাঁকে তাঁর রিভালবারটি দিতে চাইলেন। হেমচন্দ্র বলেছিলেন, "দাদা, রিভালবার আমাদের অনেক আছে—আমাদের অভাব গুলির। কিছু গুলি দিন।" শুনে শরৎচন্দ্র বেশ কিছু গুলি তখন তাঁকে দিয়ে দিলেন। পরে আরো অনেকবার ঐ রকম গুলি তিনি বিপ্লবীদের দিয়েছিলেন এবং ইংরেজ নিধনে তার ব্যবহারও হয়েছিল। এইসব বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেই শরৎচন্দ্র "পথের দাবী" লিখেছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের রোষানলে তা' সেদিন বাজেয়াপ্তও হয়েছিল। সেদিন তাঁর নির্ঘাৎ কয়েদ বাস হতো যদি না পাবলিক প্রসিকিউটার স্যার তারকনাথ সাধু তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যেতেন। বিপ্লবীদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "ওদের সঙ্গে আমার রক্তের পরিচয়, জন্মান্তরের আত্মীয়তা—ওদের সাহায্য করেই আমি ধন্য হতে চাই, কিন্তু তা' পারি কই ?"

মহান এ কথা শিল্পীর জন্ম হয়েছিল ১৮৭৬-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলীর দেবানন্দপুরে। ৬১ বছরের কিছু বেশী কাল জীবিত থেকে ১৯৩৮-এর ১৬ই জানুয়ারী কলকাতায় দুরারোগ্য ক্যান্সারে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।

খুব সংক্ষেপে এই তো দরদী কথাশিল্পীর জীবন-কথা। সাহিত্য জীবনে তিনি যেমন অর্জন করেছিলেন আপামর জনগণের অসীম শ্রদ্ধা আর ব্যক্তিজীবনে পেয়েছিলেন বহু জ্ঞানীগুণীর সাহচর্য ও ভালবাসা। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন,

> "যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
> ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
> দেশের মাটির থেকে নিল তারে হরি
> দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে মহান নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "যতদিন বাঙলা ভাষা থাকিবে, ততদিন বাঙালির সুখ-দুঃখের সাথী শরৎচন্দ্রকে কেহ ভুলিতে পারিবে না। সাহিত্য জগতে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় কল্প কথার মতই বিস্ময়কর।"

তাঁর মহাপ্রয়াণে ব্যাথাহত চিত্তে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্য গগন হতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়লো। যদিও বহু বর্ষ তাঁর নাম বাঙলার ঘরে ঘরেই শুধু পরিচিত ছিল, তথাপি ভারতের সাহিত্য জগতেও তিনি কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়।"

জুলিয়াস ফুচিক / প্রবীর মিত্র

স্বৈরাচারী জল্লাদের হাতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে মানুষ মাথা উঁচু করে বলতে পারে—বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। আমরা মরবো কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারীরা এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের অসমাপ্ত কাজ। যে মানুষ মৃত্যু দন্ডাদেশ শোনার পর সকলের সাথে গান গায়, মুক্তির গান—তারই নাম জুলিয়াস ফুচিক। খেটে খাওয়া মানুষ, বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রামের প্রতীক জুলিয়াস ফুচিক। ফুচিক জন্ম গ্রহণ করেন ১৯০৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী, চেকোশ্লাভাকিয়ার স্মিচিভে। বাবা ছিলেন শ্রমিক। ফুচিক আঠার বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন। চার বছর আগে রুশ দেশে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিপ্লব হয়ে গেছে। শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটেছে। শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র, প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ জন্ম লাভ করেছে। দেশে দেশে শাসক শোষক-শ্রেণীর ভীষণ-অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানা পথে রুষ বিপ্লবের কথা পেঁাছে যায় পৃথিবীর নানা প্রান্তে সারা পৃথিবী জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে, শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। চেক দেশেও গণ-আন্দোলনে, ছাত্র আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করল রুশ বিপ্লবের বার্তা। রুশ বিপ্লবের এক বছরের মধ্যেই চেক আর শ্লোভাক জনগণের শতাব্দী-ব্যাপী আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির সংগ্রামের ফসল ফলল। জন্ম নিল চেকোশ্লাভাকিয়া। জাতীয় সরকার দায়িত্ব নিল কিন্তু মানুষের দুঃখ-অবমাননার অবসান ঘটল না। রুশ বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহী খেটে-খাওয়া মানুষ নতুনতর স্তরে সংগ্রাম শুরু করল। ১৯২১ সালে জন্ম নিল চেকোশ্লাভাকিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি। ঠিক এমনি সময়ে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফুচিক রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের একটি বড় কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হবার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জুলিয়াস ফুচিক হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয় ছাত্র নেতা—জুলা। এ সময়ে অনুষ্ঠিত সবকটি ছাত্র আন্দোলনে ফুচিক ছিলেন প্রথম সারিতে। তখনকার দিনে রুশ বিপ্লবের কথা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা ইউ-রোপের অন্য দেশগুলিতে প্রচার করতে দেওয়া হত না। এতদসত্ত্বেও তিনি দুর্লভ বইপত্র সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পড়াশুনা করতে লাগলেন। যতই পড়েন ততই পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—সোভিয়েত রাশিয়া, সে দেশের আদর্শ আর রুশ বিপ্লবের মহান নেতৃত্ব বিশেষ করে লেনিনের প্রতি তার শ্রদ্ধা, ভালবাসা আগ্রহ বাড়তে থাকল। এই ভাবেই জুলিয়াস ফুচিক হয়ে উঠলেন একজন খাঁটি কমিউনিস্ট।

তখনকার রুশ দেশ—সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর, খেটে-খাওয়া মানুষের পিতৃভূমি, মুক্তির দেশ। অনেকদিন ধরেই সে দেশ দেখার সাধ ছিল ফুচিকের। ১৯৩০ সালে বহু আকাঙ্খিত সে সুযোগ এল। পেশায় তিনি তখন ছিলেন শ্রমিক। রুশ দেশের কিরঘিজ শ্রমিক ইউনিয়ন তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল চেক সরকারের পুলিশ। ফলে ভিন্ন কৌশলে তিনি রুশ দেশে পেঁাছলেন। অভূতপূর্ব সে দেশ—ফুচিকের স্বপ্ন! অপূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সে দেশের সাধারণ মানুষ। তিনি অভিভূত হলেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন।

ছোট বেলা থেকেই ফুচিক ছিলেন শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে অনুরাগী। তাঁর পরিবারেও এ সবের চর্চা ছিল, তাঁর বাবা কারখানায় কাজ করার সাথে সাথে অভিনয় ও সঙ্গীতকেও জীবনের অঙ্গ হিসাবে নিয়েছিলেন। অল্প বয়সেই ফুচিক সুলেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তাঁর বহু লেখা বামপন্থী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৯ সালে তিনি 'ভোরবা' নামে একটি পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। ৩০ সালে রুশ দেশ থেকে ফিরে আসার পর তিনি চেক কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'রুদে প্রভো'র প্রধান সম্পাদক হন। বিপ্লবী সাংবাদিকতাই হয়ে উঠল তার জীবনের মূল পেশা, এক বছরের মধ্যে লিখলেন অসংখ্য সম্পাদকীয়। বক্তৃতা দিলেন সারা দেশ জুড়ে। দেশের মানুষের কাছে বর্ণনা করলেন রুশ দেশের সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

তৎকালীন বুর্জোয়া চেক সরকারের বিষ নজরে পড়লেন ফুচিক। ৩১ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। জেলে বসে তিনি লিখলেন রুশ দেশ সম্পর্কে এক অপূর্ব গ্রন্থ—'সেই দেশ যেখানে আমাদের আগামী কাল ইতিমধ্যে বিগত।' চার মাস পরে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। ৩৪ সালে ফুচিক আরও একবার রাশিয়া ভ্রমণ করেন। এবারও তিনি রাশিয়া সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে ইউরোপে। স্পেনে গণতান্ত্রী সর-কারের অন্যায় ভাবে পতন ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ত-স্বৈরাচারী ফ্রাঙ্কো ক্ষমতা দখল করেছে। ইটালী, জার্মানীতে ফ্যাসিস্ত সরকার। হিটলারের জার্মান নাৎসী বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করেছে। থাবা বাড়াচ্ছে চেকোশ্লাভাকিয়ার সুদেতিনল্যান্ডের দিকে। হিটলার প্রচার করতে শুরু করল—প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর শান্তি চুক্তির কৃত্রিম সৃষ্টি নাকি চেকো-শ্লাভাকিয়া। আসলে এখানে জার্মান জনগণই নাকি বেশী। ৩৮ সালে সম্পাদিত হল ভয়ঙ্কর মিউনিখ চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমেই হিটলার সুদেতিনল্যান্ড, প্রাগ এবং অবশিষ্ট চেক ভূমি দখল করল।

এই নির্লজ্জ চুক্তির বিরুদ্ধে সারা ইউরোপের মানুষ ঘৃণায় ফেটে পড়েছিল। ফুচিক এই চুক্তির বিরুদ্ধে লিখেছিলেন: আমাদের জনগণকে বিক্রি করে দেওয়া হলেও তাদের আত্মচেতনাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া এত সহজ নয়। বৈধভাবে সংবাদপত্রে এটাই তাঁর শেষ লেখা। এরপর সমস্ত কমিউনিস্ট পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করা হল। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নেমে আসে প্রচণ্ডতম আক্রমণ। পার্টি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

৩৯ সালে হিটলার কর্তৃক চেক ভূমি দখলের পর সারা দেশে বুদ্ধিজীবীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ফ্যাসীবাদের সপক্ষে টানার চেষ্টা চলে। ফুচিকের কাছেও এল এমন এক প্রস্তাব। হিটলারের সমর্থক 'চেস্কি দেলনিক' পত্রিকার পক্ষ থেকে 'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিভাগের দায়িত্ব নেবার জন্য ফুচিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক চিঠি এল। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে ফুচিক উত্তর দিলেন: আমি যা লিখতে চাই, তা আপনার পত্রিকায় ছাপা সম্ভব নয়, আর আপনি যা ছাপতে চান তা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।

গেস্টাপো বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় হানা দিল। কিন্তু পেল না। আত্মগোপন করে পার্টির কাজ আর লেখা চালাতে লাগলেন। তখন পার্টির সামনে প্রধান কাজ ছিল ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলা। ৪১ সালে আত্মগোপন অবস্থাতেই তিনি পার্টির সর্বোচ্চ সম্মান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় তাঁর লেখাগুলি গোপন পত্রপত্রিকা মারফৎ শুধু চেকোশ্লাভাকিয়া নয় তুরস্ক, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, রুমানিয়া এমন কি শত্রু শিবিরের মধ্যে পর্যন্ত প্রচারিত হত। ৪১ সালের ২২ জুন হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করল। সন্ধ্যা বেলাতেই ইস্তাহার প্রচার করলেন ফুচিক—'চেকবাসীকে হুসিয়ার।'

এইভাবেই জুলিয়াস ফুচিক আর তার পার্টি দেশের মানুষকে ফ্যাসী বিরোধী, স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করতে, নেতৃত্ব দিতে আত্মগোপন করে কাজ চালাতে থাকেন। গোপন ভাবেই প্রকাশিত হতে থাকল 'রুদে প্রভো'। এই সময় তিনি একটি বই লেখেন নাম—'ঘানাভেসেক' (খুদে বাঁশী)। এই বইতে চেক কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তার গর্ববোধ, শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। সাথে সাথে তীব্র ঘৃণা আর বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে শত্রুদের প্রতি।

৪২ সালে ২৯ এপ্রিল ফুচিক গেস্টাপোদের হাতে ধরা পড়লেন। চারশ এগারদিন প্রাগের প্যানক্রাটস গেস্টাপো বন্দী শালায় বন্দী থাকার পর তাঁকে আনা হয় বার্লিনের নাৎসী বিচারালয়ে। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল ৪৩ সালের ২৫ আগস্ট। ফাঁসী হল ৮ সেপ্টেম্বরের বিষণ্ণ সকালে। কিন্তু সেই বিরাট হৃদয়ের স্পন্দন ফ্যাসিস্তরা বন্ধ করতে পারল না। ছড়িয়ে পড়ল কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে।

গেস্টাপোরা ফুচিকের স্ত্রী অগাস্তিনাকেও রেহাই দেয়নি। তাঁকেও গেস্টাপোদের কারাগারে ভোগ করতে হয় অকথ্য নির্যাতন। ৪৫ সালে হিটলার পরাজয়ের পর তিনি মুক্তি পান। তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের কাছে লেখা চিঠি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

জুলিয়াস ফুচিক ছিলেন একজন খাঁটি কমিউনিস্ট। চল্লিশ বছরের জীবনে কখনও মাথা নত করেননি। মানুষের প্রতি এক বুক ভালবাসা, বিশ্বাস আর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান মানুষটি জীবনে কখনো হতাশ হয়নি। জীবনের শেষ ক'দিন একজন সহৃদয় জেলরক্ষীর সহায়তায় কিছু কাগজ আর পেন্সিল জোগাড় করে লেখেন নানা অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার কথা। আত্মবিশ্বাস আর আশায় ভরা সে সমস্ত লেখা। তিনি বিশ্বাস করতেন ফ্যাসীবাদ একদিন পরাজিত হবেই। তাঁর সে অমূল্য সম্পদ লেখাগুলো সংগৃহ করে তার মৃত্যুর পর 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' নামে একটি বই বার করা হয়। বইটির শেষ লাইন হল—বন্ধুগণ, তোমাদের আমি ভালবাসতাম। হুসিয়ার থেক। এই বইটি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ এই বইটি এবং তার লেখক সম্পর্কে পরিচিত।

অফুরন্ত প্রাণের জোয়ার, এই মানুষটির জীবনের শেষ কদিনের কথা তার সহবন্দীদের কাছ থেকে জানা যায়। মৃত্যু আদেশ পাবার পর আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: 'আমি জানতাম আমাকে অভিযুক্ত করা হবে। কিন্ত আমাদের জয়ের সপক্ষে যা কিছু করণীয় তা আমি সম্পন্ন করেছি এবং বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। আমরা মরবো কিন্ত আমাদের উত্তরাধিকারীরা চালিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের অসমাপ্ত কাজ।' আদালত থেকে কারাকক্ষে ফিরে লিডা প্লাচাকে বলেছিলেন একটা গান শোনাতে। মুক্তির গান, সংগ্রামের গান—সব বন্দীরা তাতে সুর মেলাল। ফুচিকের বন্দী অবস্থায় রুশ লাল ফৌজের হাতে ফ্যাসিস্ত হিটলারের পরাজয়ের পালা শুরু হয়েছে। ফাঁসির কিছুদিন আগে জেলের চারিপাশে প্রচণ্ড বোমার শব্দে বিমর্ষ বন্দীদের উদ্দেশ্যে ফুচিক বলেছিলেন: 'সোভিয়েত জনগণ, তার মুক্তিবাহিনী কেমন করে মস্কো আর লেনিনগ্রাদের নাৎসীদের পরাজিত করলো, কি অসীম তাদের মনোবল। এখন আমরা যদি নিশ্চিহ্ন হয়েও যাই তবু বিশ্বস্ততায় থাকবো অকৃত্রিম এবং সেটাই হবে আমাদের প্রকৃত জয়।'

ফুচিকের ফাঁসির দু' বছর পর ফ্যাসীবাদ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হল রুশ লাল ফৌজের হাতে। ফুচিকের স্বপ্নের দেশ জন্ম নিল চেকোশ্লাভাকিয়ায়। সারা বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের কাছে জুলিয়াস ফুচিক হয়ে উঠলেন সংগ্রামের প্রতীক, পরম আত্মীয়। আর আত্মবিক্রয়কারী সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত।

নারীপ্রগতি-অর্থনীতি ও সমাজনীতি / মন্দিরা ঘোষাল

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষকে পিছনে ফেলে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি ৭৮-এর শেষ সীমায়। 'মহান নেত্রী' ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের 'সুমহান ঐতিহ্য' আমাদের স্মরণসিন্ধুকে আজও পীড়িত করছে। আর মেয়েরা তাদের বোরখা আর ঘোমটার আবরণ ছিঁড়ে ট্রামে-বাসে পথে-ঘাটে সর্বত্র 'নারী প্রগতি'-র বিজ্ঞাপন রূপে বিরাজমান। এ হেন অবস্থায় নারীপ্রগতির প্রশ্নটা নতুন করে উঠছে কেন, কেনই বা অর্থনীতি আর সমাজনীতির নিরিখে তার নতুন মূল্যায়ণের প্রয়োজন ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে গণ আন্দোলনের গণ্ডীর মধ্যে নারীসমাজের দিকে একবার চোখ ফেরানো দরকার। আদমসুমারির হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলেন নারী। কিন্তু গণ-আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেই মেয়েরা, আন্দোলনের সামনের সারিতে আসে খুবই কম। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এটাই, বিগত কয়েক বছরে রাজনীতির নামে তাণ্ডব ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের এগিয়ে আসায় বিরাট বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরোনো ক' বছরের গ্লানিকে মুছে ফেলে ট্রেড-ইউনিয়ন ও মহিলা আন্দোলনে মেয়েরা কিছু কিছু এগিয়ে আসছেন। কিন্তু শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা মেয়েদের এই অনীহা আর জড়তা কাটিয়ে ওঠাটা একটা বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

কেন এই সমস্যা, কোথায় এর সমাধান—তা খুঁজতে গিয়েই অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে নারী প্রগতির সমস্যাটা মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ সমাজ বিকাশের কোন স্তর পার হয়ে, সমাজের কোন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মেয়েরা এই জাতীয় ভাবনায়, অনীহায় ভুগছে তা স্পষ্টভাবে না জানলে সত্যিই এ রোগের চিকিৎসা অসম্ভব।

'নারী প্রগতি'র প্রশ্নটা আমাদের কাছে অনেকখানি শিক্ষার সুযোগ, ঘরের গন্ডী ছেড়ে বাইরে আসার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। যে দেশে নারীসমাজের ৮৫ ভাগ নিরক্ষর, ঘরের কোণে খুন্তি নাড়া ছাড়া অন্য কাজ যে দেশে অপরাধের সমতুল্য সে দেশে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া, বাইরের মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করার অধিকার পাওয়া 'প্রগতি'-র লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের কাছে, অর্থাৎ আমরা যারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলি, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলি, তাদের কাছে 'নারী প্রগতি'-র প্রশ্নটা ঠিক ঐটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 'নারী প্রগতি'-র প্রশ্নে আমরা আরও অনেক কিছু বুঝি, যা অর্থনীতির সঙ্গে, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সমাজকে বিচার-বিশ্লেষণ করেল, সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীসমাজের অবস্থিতি অনুধাবণ করলে, এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভূমিকা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। 'নারীমুক্তি' বা 'নারীপ্রগতি' তাই সমাজ-অর্থনীতিতে তার সমানাধিকারের প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল।

সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের ভূমিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করলে বিষয়টি সহজতর হবে। পৃথিবীর আদি-ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আদিম যুগের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। আরও লক্ষ্য করা যায়, আদিম সাম্যবাদের যুগে মেয়েরা কিন্তু গৃহাশ্রয়ী ছিলেন না। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই খাদ্য সংগ্রহের জন্য শিকার-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতেন। সে যুগে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে খাদ্য সংগ্রহ করাই ছিল কঠিন ব্যাপার। এক-একটি গোষ্ঠীতে যে জনবল তা সেই গোষ্ঠীর খাদ্য-সংগ্রহে নিয়োজন করা ছিল একান্ত-প্রয়োজন। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে উৎপাদনে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে নারী-পুরুষ উভয়েই ছিল সমাজের সম্পদের সমান অধিকারী। সামাজিক দায়-দায়িত্বের সমান অংশীদার। কিন্তু সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ মেয়েরা বিশেষ কিছু সম্মান মর্যাদা সমাজের কাছে লাভ করতেন। কারণ, উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা ছাড়া তাদের আরেকটি বিশেষ ভূমিকাও সে যুগের সমাজ লক্ষ্য করেছিল। তা হলো সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা। এই জনসম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতাই তাকে সমাজে বিশেষ অধিকার দিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইতিহাসের বিকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে জনোৎপাদন ক্ষমতা একযুগে নারীকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল সেই জনোৎপাদন ক্ষমতাই পরবর্তী যুগে তার সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছনার কারণ হয়ে ।

সমাজবিকাশের গতিপথে মানুষ ক্রমশ কৃষিকাজ শিখল। মেয়েরাও কৃষিতে অংশগ্রহণ করল। ফলে, একটা বৃহত্তর শ্রমবিভাগ হল। পুরুষেরা মূলত শিকারের কাজ ও মেয়েরা কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করতে লাগল। আগের যুগে যেটুকু খাদ্য সংগৃহীত হত, তার সবটাই সমাজের প্রয়োজনে লেগে যেত। কিন্তু কৃষিকার্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত কিছু সম্পদ সৃষ্টি হতে লাগল। একদিকে এই সম্পদের মালিকানা ও উত্তরাধিকার, অন্যদিকে দুটি নারীপুরুষের পরস্পরকে ভালোবেসে ঘর বাঁধার প্রেরণা থেকে পরিবারের সৃষ্টি হল। ধীরে ধীরে নারীর আর পুরুষের সমান শ্রম করার প্রয়োজন থাকল না। নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতা ও মানসিক প্রবণতার দিক থেকে মেয়েরা ক্রমশঃ সন্তানপালন, কৃষি ও সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয়যুক্ত কাজকেই বেশী বেশী করে পছন্দ করতে লাগল। গৃহাশ্রয়ী হয়ে উঠতে লাগল।

এরপর এল দাস যুগ। আরও উদ্বৃত্ত শ্রম সৃষ্টি হতে লাগল। দাসের শ্রমকে ব্যবহার করে প্রভু আরও ধনী হয়ে উঠতে লাগল। এই দাস-ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ উভয়েই তার শ্রমদান করত। এছাড়া সে যুগে নিয়ম ছিল, দাসের সন্তানও প্রভুর অধীনে দাস হবে। অর্থাৎ, দাস বংশপরম্পরায় প্রভুকে সেবা করবে। অর্থাৎ, যতবেশী দাস-সন্তান উৎপাদন করা যাবে ততই প্রভুর লাভ। দাস নারী এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আরও বেশী নির্যাতিত আর শোষিত হতে লাগল। দাস উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। পৃথক সত্তা স্বীকার না করে, তার মনকে মর্যাদা না দিয়ে এই যুগ থেকেই তাকে শ্রমিক উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগল। দাস-নারীর বহুগামিতাকে নিয়ম করে তোলা হল। এই অবস্থার একটা নির্মম প্রতিফলন আছে গিনি-বিসাউ-এর একটি দ্বীপে। এখানে বসবাসকারী মানুষের পিতৃ-পরিচয় নেই, পরিবার নেই, শুধু মাতৃপরিচয় আছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই দ্বীপে বসবাসকারী দাসদের বিবাহের অধিকার ছিল না, যে কেউ যে কোন দাসনারীর সঙ্গে মিলিত হতে পারত। এর ফলে সন্তান উৎপাদন হত বেশী। দাস-মালিকও অনেক বেশী দাস-শ্রমিক পেতো। এই সময় থেকেই নারীর মর্যাদাহীনতার যুগ শুরু হল। নারীও শ্রমিকের মত মানুষ হিসেবে নয়, বস্তু হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল। দাস-যুগের বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মন্তব্য উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। অ্যারিস্টটলের মতে, দাস-দাসী সম্পদ, স্ত্রী এই সমস্ত কিছুর মালিক হল পরিবারের কর্তা। স্ত্রী এখানে পরিবারের কর্ত্রী নয়। পরিবারের কর্তার সম্পদের তালিকায় একটি সংযোজনমাত্র। উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি হল। মেয়েদের সমাজের উপর কর্তৃত্ব হ্রাস পেল।

সামন্ত যুগে মেয়েদের অবস্থা আরও করুণ হয়ে উঠল। উদ্বৃত্ত শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর মানুষের বিলাসিতাও বৃদ্ধি পেল। মেয়েদের উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। তাদের একমাত্র কাজ হল সন্তান-উৎপাদন, ক্রমশ নারীদেহ ভোগের সম্পদ হয়ে উঠল। সুন্দর ফুল-ফল হাজারটা বিলাসিতার জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেহও হয়ে উঠল ভোগের পণ্য। নারীদেহ নিয়ে চলল অবাধ বিকিকিনি। সুন্দর জিনিস মাত্রে পাওয়ার অধিকার সামন্ত প্রভুর। সেই হিসেবে সুন্দরী নারীও তাই তার ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে বিক্রীত হতে লাগল। 'উদার মহানহৃদয় সৌন্দর্যপ্রিয়' বাদশাদ আকবর তার বিলাসের প্রাসাদ ফতেপুরে তার ছবি রেখে গেছেন। সেখানে সুন্দরী নারী ছিল দাবার গুটিমাত্র। সামন্ত ব্যবস্থার অত্যাচার এমন চরম পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছিল, যে, গাছের প্রথম ফলের মত কুমারী নারীকে তার প্রথম যৌবন উপহার দিতে হত সামন্ত প্রভুকে। শুনেছি, এখনও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও নাকি এই প্রথা চালু আছে। বিয়ের প্রথম রাতে জমিদার-জোতদার নববধূকে উপভোগ করার মহান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সামন্ত যুগ থেকেই উৎপাদন থেকে নারী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল। সন্তান উৎপাদন ও গৃহস্থালী হল তার ভূমিকা। গৃহের এই কাজ, নারীর এই সেবাকে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকা বলে স্বীকার করা হল না। নারীকে দাসীতে পরিণত করা হল। ঘোমটার আবরণে তাকে ঢেকে রূপোপজীবির ভূমিকা দেওয়া হল।

সামন্ত যুগের পথ পার হয়ে ধনতন্ত্রের যুগে এসে নারীকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু সে স্বাধীনতা দেওয়া হল শ্রমের প্রয়োজনে। কৃষককে যেমন জমি থেকে মুক্ত করে, সামন্ত প্রভুদের অধীনতা মুক্ত করে, তথাকথিত 'স্বাধীন শ্রমিক'-এ পরিণত করা হল, মেয়েদেরও তেমনি স্বাধীনতা দেওয়া হল, ঘোমটার আবরণ ছিঁড়ে তাকে শ্রমের বাজারে নিয়ে আসা হল। তাকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হল, তাকে 'প্রগতিশীল' করে তোলা হল, নারীসমাজকে উন্নতি করার জন্য নয়, তার শ্রমকে প্রয়োজনীয় করে তোলার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে নারী সম্পর্কে মূলগত ধারণার কোন পরিবর্তন ঘটল না। বুর্জোয়া যুগে দাঁড়িয়ে নারীদেহ পণ্যে পরিণত হল। অন্যান্য পণ্যের মত তাকেও প্রতিযোগিতার বাজারে নামিয়ে দেওয়া হল নগ্নভাবে।

বুর্জোয়া ব্যবস্থা যেহেতু সামন্ত ব্যবস্থা থেকে এক ধাপ অগ্রসর একটা ব্যবস্থা সেহেতু এই ব্যবস্থা প্রথম যুগে নারীসমাজের ক্ষেত্রেও কিছু প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে এনে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এই কাজের পিছনে তাদের স্বার্থ ছিল দুধরনের—এক, শিল্পের শ্রমিক যোগান দেওয়া; দুই, নারীর শারীরিক অপটুত্বের অজুহাত দেখিয়ে একই পরিমাণে শ্রম অনেক কম দামে কেনা। এখনও, ভারতের বিভিন্ন শিল্পে এই মেয়েদের পুরুষের তুলনায় কম মজুরী দেওয়ার অবস্থাটা বজায় আছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বুর্জোয়ারা শ্রমের ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থে কিছুটা স্বাধীনতা দিলেও শেষ পর্যন্ত পুরুষকে আনন্দ দেওয়াই যে তার একমাত্র লক্ষ্য। পুরুষের উপর নির্ভর করা ছাড়া মেয়েদের গত্যন্তর নেই—এই ভাবনাটা বজায় রেখেছে।

বিশেষত, বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবক্ষয়ের যুগে, এই বিষয়টা আরও রূঢ়ভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুর্জোয়ারা এখন আর তাদের ব্যবস্থাকে বিকশিত করতে পারছে না। তাদের ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ছে। শ্রমের সুযোগ ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। ফলে, পুরুষ-শ্রমিকের সঙ্গে সঙ্গে নারী-শ্রমিকও উদ্বৃত্ত হচ্ছে। তারা সংগঠিত হয়ে এই ভেঙে পড়া পচা-গলা ব্যবস্থাটাকে চুরমার করে দিয়ে নতুন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছে। এই সংগ্রামী মানুষকে বিভ্রান্ত করার, সংগ্রামবিমুখ করার অপচেষ্টাও তার পাশাপাশি চলেছে। এই যুগে তাই

(শেষাংশ ৩২৮ পৃষ্ঠায়)

ব্লক যুবকেন্দ্র সমাচার

(ক) বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাচক্র :—

আগস্ট মাসে যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বি আই টি এম-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন ব্লক যুব কেন্দ্রে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীর সংগে সাযুজ্য রেখে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কর্মবহুল জীবনকে স্মরণ করে আলোচনাচক্রের বিষয়সূচীতে ছিল— আইনস্টাইন : তাঁর জীবন ও কর্ম।

ব্লক পর্যায়ে এই সব মনোগ্রাহী আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীরা। জটিল তত্ত্বগত আলোচনাকে যতদূর সম্ভব জীবনধর্মী করায় ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করে। গত ২৮শে আগস্ট এই আলোচনাচক্র শেষ হয়।

ব্লক পর্যায়ের আলোচনাচক্রের পর জেলান্তরে আলোচনাচক্রের আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এই আলোচনা আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। জেলান্তরের সফল ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্যান্তরে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।

(খ) পর্বতাভিযানে আর্থিক অনুদান :—

এই বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে তরুণ যুবক-যুবতীদের পর্বতাভিযানে আগ্রহী করে তোলার জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা আছে। এ বছরে এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন শৃংগে আরোহণ করাতে সাহায্য করার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। এ বাবদ এ পর্যন্ত আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর হয়েছে।

(গ) ব্লক যুব কেন্দ্র সমাচার :—

যুব কল্যাণ বিভাগের পরিধি বা কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার জন্য ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের ৩৩৫টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে একটি করে ব্লক যুব কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৯০টি ব্লকে ব্লক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং এই সব অফিসের কাজকর্মও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

সম্প্রতি আরও ১০০টি ব্লকে ব্লক যুব কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক কাজকর্ম দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই এই ১০০টি যুব কেন্দ্রের কাজকর্মও পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে।

(ঘ) শিক্ষা মূলক ভ্রমণের জন্য অনুদান :—

সম্প্রতি যুব কল্যাণ দপ্তর বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত আবেদনপত্র আহ্বান করে। বিশেষ করে অনুন্নত এলাকার দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যুব কল্যাণ দপ্তর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আবেদনপত্র দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৩১শে আগস্ট। সুদূর পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিও এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখায়। ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত যে সমস্ত আবেদনপত্রগুলি দপ্তরে এসে পৌঁছেছে সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উপযুক্ত বিদ্যালয়গুলি এ বাবদ আর্থিক অনুদান পাবে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এ বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে যে অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে তা বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের গতিকে যে আরও বাড়াতে সাহায্য করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

(ঙ) অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প :—

এই প্রকল্পে যুব কল্যাণ বিভাগ আগস্ট মাস পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬ হাজার ৫৬৬ টাকা প্রান্তিক ঋণ প্রদান করে। এর ফলে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার বিনিয়োগ সম্ভব হয়েছে এবং ৪৭টি প্রকল্প রূপায়ণের পথে এগিয়ে চলেছে। এর দ্বারা ২০০ জন বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

হাবিবপুর ও বামনগোলা ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী (পুরস্কারপ্রাপ্ত) ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ :— বাঁদিক থেকে—দিলীপকুমার সরকার, প্রদীপ সিনহা, শ্রীমতী নিস্কৃতি সাহা, শ্রীমতী লাভলি বসু ঠাকুর, স্বপ্না ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র সরকার, অমলকুমার দাস।

হাঁসখালি ব্লক যুবকেন্দ্র আয়োজিত বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের
সফল প্রতিযোগিরা (দণ্ডায়মান)।

জামুরিয়া ১নং ব্লকের বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে একজন ছাত্র-প্রতিযোগী বক্তব্য রাখছে।

আমাদের চোখে আমাদের দেশ / অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

(রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে বিদ্যালয় বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ— এই ঋষিবাক্য। ভারতের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। এক মহাতীর্থ আমার দেশ।" আমার চোখে আমার জন্মভূমি দশপ্রহরণধারিণী। আমার দেশ প্রকৃতির স্বাভাবিক আয়ুধে সুসজ্জিত। উত্তরে তুষার মৌলী হিমাচল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রূপে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে। পূর্ব, পশ্চিমে ও দক্ষিণে যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর, ভারত মহাসাগর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আমার চোখে, আমার দেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার আমাদের দেশের ভারতবর্ষ বা India নামকরণ হ'ল কেন?

নামকরণ

কিংবদন্তি আছে, ভরত নামে এক রাজা এদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁহারই নাম অনুসারে এই নামকরণ হয়েছে। প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থেও এই দেশকে ভারতবর্ষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন আর্যগণ অবশ্য এদেশে তাঁদের বাসভূমিকে 'সপ্তসিন্ধ' নামে অভিহিত করতেন; এই সিন্ধু শব্দই প্রাচীন পারসিকগণের উচ্চারণে হিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। এর থেকেই ক্রমে ভারতীয়গণ 'হিন্দু' বলে পরিচিত হলেন এবং তাঁদের বাসস্থান 'হিন্দুস্থান' নামে খ্যাত হ'ল। এই হিন্দু শব্দ পুনরায় গ্রীক ও রোমক লেখকদের লেখা 'ইন্দুশ' Indus রূপ গ্রহণ করে, এবং এই 'ইন্দুশ' থেকে 'ইণ্ডিয়া" নামের উৎপত্তি।

আমার চোখে আমার দেশবাসী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয় সে চিন্ময়...দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষের তৈরী।" তাই আমার চোখে আমার দেশ সম্পর্কে লিখতে গেলে জানতে হবে ভারতীয় জনতত্ত্ব।

অনাদি অতীত কাল থেকে কত জাতি, কত বর্ণের লোক যে এই ভারতভূমিতে আগমন করল তার ইয়ত্তা নেই। বহু জাতির আগমনে ভারতবর্ষ এক মহামানবের মিলনতীর্থে পরিণত হয়েছে।

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত বর্ণনা শুধুমাত্র কবি কল্পনা নয়, ঐতিহাসিক সত্যের বহিঃপ্রকাশ।

বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর জনসাধারণের দেহ গঠনের, বিশেষ করে কেশ বৈশিষ্ট্য, চোখ ও চামড়ার রং, নাসিকা, কপাল ও নরমুণ্ডের আকৃতি ইত্যাদির পরিমিতি গ্রহণ করে, নৃবিজ্ঞানীগণ ভারত-বাসীর জনতত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। সকলের পরিমিতি একই মানদণ্ড অনুসারে গৃহীত হয়নি; ফলে মত পার্থক্য রয়েছে। বিখ্যাত আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ ডঃ বিরজা শঙ্কর গুহের মতে ভারতবাসী মোট ছয়টি শাখা ও নয়টি উপশাখায় বিভক্ত।

(১) নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু (The Negrito)

(২) আদি অস্ট্রেলিয় (Proto-Austroloid)

(৩) মোঙ্গলীয় (Mongoloid) এরা আবার তিনটি শাখায় (১) দীর্ঘমুণ্ড প্রাচীন মোঙ্গলীয় (২) গোলমুণ্ড প্রাচীন মোঙ্গলীয় (৩) তিব্বতী মোঙ্গলীয়।

(৪) ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean) এরা আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত (১) প্রাচীন ভূমধ্য সাগরীয় (Palaeo-Mediterranean) (২) ভূমধ্যসাগরীয় Mediterranean) ৩)প্রাচ্য(Oriental type)(৫) পশ্চিমী প্রশস্তশির জাতি (Western Brachycephalo) এরাও আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত (১) আলপাইন (The Alpiniod' (২) দীনারীয় (The Dinaric) (৩) আর্মানীয় (The Armenioid) (৬) নর্ডিক (Nordic)

আমার চোখে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা সম্পর্কে বিশ্বের মেহনতী মানুষের নেতা স্বনামধন্য মার্কস ও এঙ্গেল বলেছেন—"শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি তিনটি দিক প্রথমত মানসিক শিক্ষা, দ্বিতীয়ত শারীরিক শিক্ষা, যেমন শিক্ষা জিমনাসটিকস ও সামরিক বিদ্যালয়ে দেয়া হয়, তৃতীয়ত কারিগরী শিক্ষা যে শিক্ষা সমস্ত রকম উৎপাদন পদ্ধতিতে সাধারণভাবে কাজে লাগে এবং সাথে সাথে শিশু ও তরুণদের সমস্ত বিষয়ের সাধারণ যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে ও ব্যবহার করতে উৎসাহ দেয়।" (মার্কস এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড) কিন্তু আমার চোখে আমাদের দেশে তৃতীয় ধরণের কোন ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। কারণ আমাদের দেশটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক দেশ। এই ধরণের দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে পুঁজিপতিরা, বুর্জোয়াশ্রেণী। এরা মুনাফার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না, এমনকি তারা যে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে তাও মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে। তাদের কল-কারখানা অফিস চালানর জন্য যে পরিমাণ শিক্ষিত শ্রমিক বা কর্মচারীর প্রয়োজন শুধু-মাত্র সেই সংখ্যক মানুষের জন্য তারা শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

ভারতবর্ষের ৭০% লোকই কৃষিজীবী। পুরান আমলের যন্ত্রপাতি হাল-বলদ ব্যবহারের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির দরকার হয় না। তাই আমার দেশের ৪০ কোটি মানুষকে শাসকশ্রেণী শিক্ষিত করার কোন প্রয়োজনই মনে

করেনি। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর লোকের ৫০% বাস করে ভারতবর্ষে যেটা স্বাধীনতার সময়ে ছিল ১০% বা ১২% এর মত।

১৯৪০ সালে সোভিয়েত দেশের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা এম, আই, কালিনিন শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেন "Education is definite, purposeful and systemetic influencing of the mind of the person being educated in order to imbue him with the qualities desired by the educator.'
আমার চোখে আমার দেশের শাসকশ্রেণী এটাই চেয়েছিলেন। এখন দেশ জোড়া গভীর সংকট। একচেটিয়া পুঁজিপতি, জমিদার ও জোতদারদের স্বার্থরক্ষায় সদা চঞ্চল এ সরকার। ধনতন্ত্র বিকশিত হতে পারলেও (আজকের যুগে যা অসম্ভব) শিক্ষাক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রগতি ঘটতে পারত, আমাদের দেশে সেটুকুও হতে পারেনি। এবং আমার চোখে আমাদের শাসকশ্রেণীই তা হতে দেয়নি। কেননা "In a class society, there never has been nor there can be, education outside or above the classes"
সুতরাং আমার চোখে আজকের শিক্ষা জগতের এ পরিস্থিতি শাসকশ্রেণীর স্বার্থকেই সযত্নে রক্ষা করে চলেছে।

ভারত সরকার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাবেও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত প্রস্তাবই বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চবিত্তদের মধ্য থেকে কিছুকে বেছে নিয়ে সুযোগ সুবিধা দানের পুরানো নীতিই বহাল রেখেছিলেন। সাত বছর আগে ২ বছর ধরে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ৩২০০ কোটি টাকা দেবার বাগাড়ম্বর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ১৭২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, অথচ এই সময়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল ৪০%।

আমার চোখে ১৯৭৯ সালের মধ্যেও সমস্ত শিশু ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অন্তত পাঁচ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশা নেই, কারণ এমন কি পরিকল্পনায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাত্র ৮২ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী (৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত) স্কুলে নাম লেখাবে এবং নাম লেখান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ৪০% পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করবে। অপর সকলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। ৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত ৮ বছরের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা দূরে রাখা হয়েছে। ১০+২+৩ বছরের শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ের অর্থাৎ ১০ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয় ২৬%-এর বালক-বালিকার জন্য। এটা ৭০ সালের ২২%-এর চেয়ে কোনক্রমে ৪% বেশী। ৭ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন বালক-বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঢোকার সুযোগ পায়। কিন্তু তবুও পরিকল্পনা বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বালক-বালিকাদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

আমার চোখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, নেহরু-যুব কেন্দ্র, হোস্টেলের সুযোগ বৃদ্ধি, ডে-স্টুডেন্টস হোম, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভোজনালয়, বই ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক ছাত্র যুবকে প্রলুব্ধ করতে চায়; কিন্তু ছাত্রদের গণতান্ত্রিক দাবী, ছাত্র-সংসদ গঠনের অধিকার, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও পরিচালন ব্যবস্থায় ছাত্র প্রতিনিধিত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থা রূপায়ণে ও পরিচালনায় ছাত্রদের অংশ গ্রহণের অধিকারের কথা উচ্চারণ করে না।

আমার চোখে জমিদার তন্ত্রের সংগে আপোষের ফলে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। ভারত সরকার প্রকাশিত 'India-74' এ প্রচারিত তথ্য থেকে দেখা যায় ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫ কোটি ৯৩·৫ লক্ষ এবং ১৯৭১ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা ২ কোটি ৭·২ লক্ষ। তাহলে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষা নিতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল অথচ শিক্ষা জীবন পরিচালনা করতে পারল না এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ। এরা হচ্ছে সেই হতভাগ্যের দল যাদের পিতামাতা ভূমিহীন অথবা অত্যন্ত অল্প জমির মালিক। এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজের শিকার—জোতদার ও মহাজনী শিকারে পিষ্ট। এরা শুধু ৮/১০ বছরে পদার্পণ করার পূর্বেই অন্যের বাড়ীর রাখালি শুরু করে আর স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে চেয়ে বাতাস ভারী করে তোলে, পরণে কাপড় নেই, গাছের পাতা যাদের খাদ্যতালিকার শীর্ষস্থানে—বিদ্যালয় তদের কাছে বিলাসিতা।

তবু এদেরই বিরাট অংশ দুঃসাহসে ভর করে পাঠশালায় ভর্তি হয়। শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় আর অভুক্ত শরীরে গা মেলায় স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর মিছিলে। তারপর শুরু হয় মিছিল ভাঙ্গার পালা। স্কুলের মিছিল ভেঙ্গে এক একটি অংশ চলে যায় জীবীকার সন্ধানে। উচ্চতর ক্লাসে পড়াশুনা করার নিশ্চয়তা নির্ভর করে অভিভাবকদের আয়ের ওপর। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যার বিভাজন থেকে জানা যায় ১ম শ্রেণী থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার পূর্বেই কি পরিমাণ drop-out হয়—প্রথম শ্রেণী ৪০·৩৬% দ্বিতীয় শ্রেণী ১৬·৯৪% তৃতীয় শ্রেণী ১৬·২৫% চতুর্থ শ্রেণী ১২·৭৭% পঞ্চম শ্রেণী ৯·৬৮৭% নিজের সন্তান সন্ততিকে বিদ্যালয় প্রেরণ করার জন্য কৃষক পিতা-মাতার আগ্রহে যে অপরিসীমতা পূর্বোক্ত বাক্য থেকেই জানা যাবে। এখান থেকে বোঝা যাবে শিক্ষা লাভের জন্য প্রথম শ্রেণীর ৪০% ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে কমে গিয়ে হয় ১৬%। অর্থাৎ শিক্ষা লাভের আশা নিয়ে যারা প্রথম

শ্রেণীতে ভর্তি হয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার আগেই শতকরা ৬০% ছাত্র বিদ্যালয়কে চিরবিদায় দিয়ে কঠিনতর ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়। গত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনীতে নতুন নতুন অধ্যায় যুক্ত করে।সার্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক শিক্ষার, গালভরা প্রতিশ্রুতি পরিণত হয় নিদারুণ পরিহাসে।
আমার চোখে

আমার চোখে কৃষি বিজ্ঞানে আমাদের দেশ :—

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় কিছু গম, বার্লি, ধান ও শাকসব্জীর বীজ পান। এর থেকে উনি ধারণা করেন যে সেই যুগেও ভারতীয়রা এই সমস্ত চাষের কথা জানতেন। প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগ থেকেই যতদূর জানা যায় ভারতীয় কৃষি ছিল উন্নত ও সমৃদ্ধ। তাই আমার চোখে কৃষি-বিজ্ঞানে আমাদের দেশের অগ্রগতি আমাদের ঐতিহ্য। আধুনিক কালের অগ্রগতিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়কে দুভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা উচিত। প্রথম অংশে ১৯৪৭--১৯৬০ সাল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু ১৯৬১ সালে। প্রথম পর্যায়ে আমাদের যা অগ্রগতি তা আমার চোখে মূলত আরো বেশী জমি চাষের আওতায় আসা এবং সেচের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু প্রকৃত অগ্রগতি বলতে যা বোঝায় তার সূত্রপাত হয় ১৯৬১ সালে। খাদ্য উৎপাদনের সূচকটা একটু দেখলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা বোঝা যাবে। ১৯৬০ কে ১০০ ধরলে এই সূচক ১৯৭০ সালে সারা পৃথিবীর খাদ্যোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়ায় ১২০তে আর ভারতের সূচক দাঁড়ায় ১৫৪তে। সত্যিই! শুধু আমার কেন? সবার চোখেই বিস্ময়কর অগ্রগতি নয় কি? আর এই অগ্রগতির পেছনে আছে উচ্চফলনশীল প্রজাতি ও উন্নত কলাকৌশল।

কৃষির মূল উপাদ্য তিনটি--কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ। ১৯০৬ সালে পুণাতে প্রথম কৃষি কলেজ স্থাপিত হ'লেও ষাটের দশকের আগে কৃষি-শিক্ষা ছিল অবহেলিত। ১৭ই নভেম্বর, ১৯৬০এ পন্থ নগরে ১৭০০০ হেক্টর জমি নিয়ে ভারতের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে কৃষি শিক্ষার এক নতুন যুগের সূচনা হ'ল। পরবর্তী সময়ে এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো ১২টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে আমাদের পশ্চিম বাংলার 'বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' সর্ব কনিষ্ঠ। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরন্তর প্রয়াসে প্রতি বছর প্রায় ৮০০ ছাত্রছাত্রী স্নাতক, স্নাতোকোত্তর ও পি এইচ ডি ডিগ্রী পাচ্ছেন। কেবলমাত্র সাধারণ পঠন-পাঠনের এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের সীমায়িত করে রাখেননি। এরা কৃষকদের কৃষির নানান কলাকৌশল, মাটি ও সার ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গাছের রোগ ও পোকাকে চেনা ও তার হাত থেকে ফসল বাঁচানোর উন্নত কলাকৌশল শেখন।

১৯৬৬ সালের আগে আমাদের মোট খাদ্যোৎপাদন ছিল ৪৪ মিলিয়ন টন। আর গত বছরে ছিল ১১৫ মিলিয়ন টন। খাদ্যশস্যের বিপুল বৃদ্ধির জন্য যাঁরা সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন, আমার চোখে তাঁরা কৃষি বিজ্ঞানী। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় আমাদের কৃষিতে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক কম, তবু যে কটি দেশ কৃষি সম্পর্কিত গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ করে সর্বাধিক ফল পেয়েছে তার মধ্যে ভারত অগ্রগণ্য।

এই শতকেরই গোড়ায় উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবনের তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়ে প্রথম প্রায়োগিক সাফল্য আসে নরম্যান বোরল্যাগের উচ্চফলনশীল গমের 'Norion-10B' বংশানু আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এর অল্প পরে ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে বার করা হয় 'IR-8' ধান। ভারতবর্ষেও এই জোয়ার এসে লাগে। এর আগেও অবশ্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পাট, ভুট্টা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছিলেন। এবার তারা স্ব পরাগ যোগী গম, বাজরা জোয়ার ও অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও এগিয়ে এলেন। আমরা পেলাম জয়া, পদ্মা, সোনালীকা, কল্যাণসোনা ইত্যাদি জাতগুলি।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় নানান অঞ্চলের উপযুক্ত জাত আমরা পেয়েছি। মহারাষ্ট্রে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শঙ্কর জাতের নিবিড় তুলা চাষ, যা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ভারতেই শুরু হয়, পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরায় গমের চাষ, পাঞ্জাব ও হরিয়াণায় ধানের চাষ, উত্তর বাংলার সমৃদ্ধতার প্রতীক আনারসের চাষ, উত্তর ভারতে আমের চাষের কথা আমার চোখে এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ পি কে দে নীলসবুজ শ্যাওলা আবিষ্কার করেন ডঃ দে ও ডঃ এল এন মণ্ডলের প্রচেষ্টায় আমরা জানতে পারি কিভাবে এরা বায়ুর থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে তা মাটিতে বন্ধন করে। তাঁদের এই গবেষণার কল্যাণে ধানের চাষের খরচ আজ গেছে অনেক কমে। আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ এস পি রায়চৌধুরী নাইট্রোজেনের ওপর গবেষণা করে ভারতীয় কৃষি গবেষণার মানকে পৃথিবীর চোখে সম্মানীয় করে তোলেন। আজকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানীদের (ভারতীয়) মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন। Plant-Breeding এর উপর বোরল্যাগ এ্যাওয়ার্ড সবচেয়ে বেশী বার যে দেশ জয় করেছে, সে হল --ভারত।

স্বাধীনতার সময়ও একই জমিতে একটির বেশী ফসলের কথা ভাবা যেত না, আজ আমরা এক জমি থেকে বছরে চারটি ফসল তুলছি। আগে জলকে কৃষির মুখ্য প্রয়োজনীয় মনে করা হত। এখন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অজল চাষ গবেষণার নানান পর্যায়ে যে তথ্য পেয়েছেন তার থেকে এখন আর জলকে বাধা মনে হয় না।

মিশ্র মাছ চাষ, সাগর জলে মাছ চাষ, শঙ্কর জাতের গরু, মহিষ পালন, তাদের দেশজ খাদ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আমার চোখে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রভূত অবদান আছে।

ভারতবর্ষের কৃষি গবেষণার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণাকে নিয়োজিত করা। কিন্তু এখনও আমরা হেক্টর প্রতি উন্নয়নে উন্নত দেশগুলি থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। এর জন্য আমার চোখে মূলত দায়ী লাগে ভূমি ও জল ব্যবহারে আমাদের ব্যর্থতা ও নিরক্ষরতা। গ্রামাঞ্চলে কৃষির প্রায়োগিত সাফল্য তখনই আসতে পারে যখন কৃষকদের উন্নত কলাকৌশলগুলি ঠিকমত রপ্ত করান যাবে। কিন্তু সম্প্রসারণে আমাদের অনিহার জন্য আমরা এই বিষয়ে খুব বেশী এগোতে পারিনি। দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে কৃষির প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফল কেবল মাত্র সম্পন্ন চাষীরাই পেয়েছেন। উপরন্তু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ওঝা, দান্ডেকর, বৰ্দ্ধন, মিনহাস, রথ সকলেই স্বীকার করেছেন ১৯৬০ সালে গ্রামাঞ্চলে যত লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করতেন ১৯৭০ সালে তাদের সংখ্যা ১½ গুণেরও বেশী হয়েছে। দান্ডেকর ও রথের হিসাব অনুযায়ী ৬৭-৬৮ সালেও আমাদের দেশের মোট জনসমষ্টির ৪১% দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে ছিলেন। কৃষি বিজ্ঞানে উৎপাদন বাড়াই অগ্রগতির পরিচয় বহন কর না, প্রকৃত অগ্রগতি বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। আমার চোখে কৃষির প্রকৃত অগ্রগতি নির্ভর করছে, কৃষি ক্ষেত্রে এখনও যে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক রয়েছে, তার অবসান করার উপর। প্রকৃত ভূমি সংস্কারকে এড়িয়ে উন্নত চাষ পদ্ধতি, অধিক ফলনশীল বীজ সার, সেচ প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষির উন্নতির যে সব চেষ্টা গত ৩০/৩৫ বছরে ধরে চালান হয়েছে তার ফলে মুষ্টিমেয় কৃষক আরোধনী হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কৃষির এমন কিছু উন্নতি হয়নি যাতে জাতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে অগ্রগতির পথে এগোতে পারে। 'অধিক ফসল ফলাও কমিউনিটি ডেভেলেপমেন্ট প্রজেক্ট', আই এ ডি পি, সি এ ডি পি প্রভৃতি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কৃষির উন্নতির প্রচেষ্টা নিতান্তই সীমাবদ্ধ ফল লাভ করেছে। ৫% ধনী কৃষক এতে লাভবান হয়েছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনীতির বিকাশ তেমন প্রভাব পায়নি। এবং ভূমি সংস্কার ভিন্ন তা সম্ভবও নয়।

আমার চোখে আমাদের দেশের স্বাধীনতা:—

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishnsss, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we have nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way."

(Charles Dickens, A Tale of Two Cities)

ফরাসী বিপ্লবের দুর্যোগময় দিনগুলির এই বর্ণনার সংগে অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার ঘটনাটির। এই রকমই ছিল নতুন ভারতের জন্মলগ্ন—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। আমার চোখে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে স্বাধীনতার যে স্বাদ আমরা পেলাম, সেই স্বাদ যেমনি গৌরবের তেমনি কলঙ্কেরও। ত্রিশ বছর আগে সেই ১৫ই আগস্টের পশ্চাদপটভূমি হিসাবে যে ইতিহাস ছিল দেশের জনগণের তার জন্য আমার চোখে আমরা সবাই নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারি। হাজার হাজার মানুষের স্বার্থত্যাগ, কারাবরণ, মৃত্যু ও রক্তদানের পথ ধরে এসেছিল এই স্বাধীনতা।

অন্যদিকে আর একটি ইতিহাস ছিল স্বাধীনতার। দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে এল না। সেদিন রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বনাম সারা দেশের জনগণ মুখোমুখি দাঁড়ালেও নেপথ্যে আর একটি দৃশ্য অভিনীত হচ্ছিল। ভারতবর্ষের উঠতি পুঁজিবাদীগোষ্ঠী সামন্ত প্রভু, জমিদার, দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রভৃতি তাবৎ শোষক শ্রেণীগুলি প্রমাদ গুনছিল এই স্বাধীনতার স্বাদ কারা উপভোগ করবে। যদি দেশের জনগণের হাতে ক্ষমতা যায় তাহলে মুষ্ঠিমেয় সম্পত্তিবানদের হাতে আর সম্পত্তি প্রতিপত্তি থাকবে না। তাই স্বাধীনতার মধ্য রাত্রিতে সমঝোতা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের। দেশ স্বাধীন হবে, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থও থাকবে, এই পুঁজিপতি সম্পত্তিবানরাই হবে দেশের মালিক তারাই দেশ পরিচালনার ভার হাতে পাবে. আমার চোখে এই শ্রেণীগুলির নেতৃত্ব করছিল সেদিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, আজ জনতা পার্টি—ভারতের শোষক শ্রেণীর সংগঠিত রাজনৈতিক দল।

আমার চোখে আমার দেশের জাতীয় সংহতি:—

বৈচিত্র্যময় এই ভারতবর্ষ। এই বৈচিত্র্য জাতি, ভাষা, আচার, আচরণের মধ্যে যেমন তেমনই প্রাকৃতিক, ভৌগলিক ক্ষেত্রেও পরিদৃশ্যমান। কিন্তু নানা প্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক গভীর ঐক্যবোধ চিরকালই বিরাজিত। প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা ভারতবাসীর চিরন্তন সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা।" আমার চোখে এমন দেশে একমাত্র সচেতন স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই জাতীয় সংহতি অর্জন করা যেতে পারে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিভেদমূলক প্রবণতাকে না বাড়িয়ে বরং তাকে প্রতিহত করতেই সাহায্য করবে। বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বাতন্ত্রকে ঘৃণার

দৃষ্টিতে না দেখে তাকে শ্রদ্ধা জানালেই তবে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হবে। আমার চোখে মোট রাজস্বের ২৫% রাজ্যকে দিলে কোন দিনই জাতীয় সংহতি গড়বে না। ৭৫% রাজস্ব রাজ্যগুলিকে দিলেই শক্তিশালী ভারত গড়ে উঠবে। কারণ এখন প্রত্যেক রাজ্যই বেশী টাকা চায়, কারণ রাজ্যগুলি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প টাকা পায়; এমন একটা রাজ্য অন্য রাজ্যকে বঞ্চিত করলেই তবে বেশী টাকা পেতে পারে, তাই যে রাজ্য বেশী টাকা পায় আর যে রাজ্য বঞ্চিত হয় তাদের মধ্যে একটা খারাপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বঞ্চিত রাজ্য কেন্দ্রর ওপর রেগে যায়—যা কখনোই শক্তিশালী দেশ গড়তে পারে না। আবার শিল্পোন্নত রাজ্যগুলি আর শিল্প অনুন্নত রাজ্যগুলি উভয়েই নিজেদের প্রয়োজন দেখিয়ে বেশী টাকা দাবী করে কারণ তারা যা টাকা পায় তাতে তাদের কলোয় না ফলে একটা অসুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠে যা জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

আমার চোখে আমার দেশের আইন শৃঙ্খলা :—

ভারতবর্ষের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। "হে মহামানব, একবার এসো ফিরে/শুধু, একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরে ভিড়,/এখানে মৃত্যুর হানা দেয় বারবার..." একথা কমিউনিষ্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্বাধীনতার আগে বলেছিলেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে শাসক পার্টির পরিবর্তন হয়েছে কিন্ত সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য খাদ্যের জন্য সংগ্রাম মানুষ করতে পারে না। এখনও মানুষ খাদ্যের দাবী করলে বুলেট পায়—কানপুরের শ্রমিকেরা মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত দেড় মাসের বকেয়া মাহিনা দাবী করে পেল—১১ জন শ্রমিকের মৃতদেহ। উত্তর প্রদেশের কলেজ শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হল। সারা ভারতে গত বছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জমিদার, জোতদারদের হাতে হরিজন নিহত হয়েছে ৫৩৮ জন। নিহতের সর্বোচ্চ সংখ্যা জনতা শাসিত উত্তর প্রদেশ, তার পরের স্থান বিহার। আর পশ্চিমবাংলায় এই সংখ্যা শূন্য। পন্থনগরের নিরস্ত্র শ্রমিকেরা আন্দোলন করে পেলেন—নৃশংস ভাবে নিজেদের মৃত্যু। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানলাম আন্দোলনকারী শ্রমিকদের PAC বর্বর ভাবে গুলী চালায়, তখন তারা আত্মরক্ষার্থে আখের ক্ষেতে আশ্রয় নেয়। PAC এটাই চাইছিল; তখন তারা আখের ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দেয়; ফলে বহু শ্রমিক জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। স্থানীয় জনসাধারণ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২০ জন শ্রমিককে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। PAC -র লোকেরা আবার রাতে তাদের হাসপাতাল থেকে বের করে গুলী করে; শ্রমিকদের ঝুপড়ীগুলিও অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। PAC র অত্যাচারে প্রাণ হারায় দুটি শিশু, একজনের বয়স ২ বছর। ভারতের অনেক জায়গাতেই এরকম ঘটনা প্রায় নিত্যসঙ্গী।

আমার চোখে অলসতা নয়, দারিদ্র্যতাই ভারতবাসীর জীবনের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক :—

মানুষের জীবনের উন্নতি, নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরিত্র ও সেই উন্নয়নের পটভূমিকায় ব্যক্তি মানুষের শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর। আর অর্থনৈতিক অগ্রসরতা (?)র এমন এক পদে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি যেখানে জীবনের সার্থকতা, জীবনের উন্নতি নির্ভর করে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর। তাই স্বাধীনতার পর ১৯৬৪ সালে ভারতবর্ষের জনপ্রতি উন্নয়নের হার ছিল ৩% যেখানে এই হার টাটার ছিল ৩২%, বিড়লার ৭৮%, মফৎলালের ১২০%; তার কারণ কি? ভারতবর্ষের টাটা, বিড়লা, মফৎলালরাই শুধু অলস নয়, আর বাদ বাকি সকলেই অলস? তাতো নয়! আর তা যদি হতো তাহলে টাটা-বিড়লার কি এত বৃদ্ধি হ'ত? কারণ টাটা, বিড়লারা কয়েকজন মিলেই তো আর কারখানা চালায় না, যারা চালায় তারা সাধারণ মানুষ। এদেরই পরিশ্রমের ফলশ্রুতি এই অন্যায্য বৃদ্ধির হার। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে পড়লাম জাতীয় আয় ২·৯৫% বেড়েছে, অথচ টাটা-বিড়লার বৃদ্ধি নিচের পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাবে।

শোষণকারীর নাম	সাল	মূলধন	মুনাফা	সাল	মূলধন	মুনাফা
টাটা	১৯৭২—	৬৮৯·৯১ কোঃ টাঃ	৪৮·৮৩ কোঃ টাঃ	১৯৭৫—	১০৬০·০৪ কোঃ টাঃ	৭৪·৪৫ কোঃ টাঃ
বিড়লা	„	৫৫৩·৪৬	৪৪·২৮	„	৯৩৬·১১	[illegible]৩·৯৯
মফৎলাল	„	১৯০·৬৬	১৪·৬৫	„	৩৩৭·১৯	২২·১৬
সিংহানিয়া	„	১০৩·৬৫	৫·৯২	„	১৯৮·৮৭	১৬·৩৮

ভারতবর্ষে বর্তমানে শোষণের ফলে গরীব ক্রমে আরো গরীব হচ্ছে আর ধনী আরও স্ফীতকায় হচ্ছে। কিছু দিন আগে Survey of India র এক রিপোর্টে জানা যায় ২% লোকের হাতে ৪৬% জমি কেন্দ্রীভূত আছে। অপর দিকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আদমসুমারীর রিপোর্টে জানা যায় ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সালে, এই ১০ বছরে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ৩১৫১৯৪১- জন থেকে ৪৭৩০৪৮০৮তে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫৭৮৫৩৯৭ জন।

এই ভারতবর্ষেরই কোটি কোটি মানুষ ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে চলে—সামান্য দুমুঠো খাদ্যের জন্য। ওই টাটা

বিড়লারা যা পরিশ্রম করে এরা তার চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম করে। জীবনের আনন্দ এদের কাছে অজ্ঞাত। জীবনে উন্নতির স্বপ্ন দেখতে এরা ভুলে গেছে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই এরা এদের রক্তের বিনিময়ে গড়ে তোলে স্ফীতকায় ধনীদের আলস্যের সৌধ। বরং এই শোষিতদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একথা সকল উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সত্য। এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই দারিদ্রের চিত্র ভয়ঙ্কর। আগের পরিসংখ্যানে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বেকারীর সংখ্যা দেখলেই বোঝা যাবে আমার বক্তব্যের সত্যতা।

দেশ	বেকার সংখ্যা
১। ভারত	১ কোটি ৯ লাখ ২৪ হাজার
২। আমেরিকা	১ কোটি
৩। জাপান	৫০ লক্ষ
৪। পশ্চিম জার্মানী	১৩ লক্ষ ৫১ হাজার
৫। বৃটেন	১৫
৬। ফ্রান্স	১৪ লক্ষ

এই সমস্ত দেশেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফলটুকু ভোগ করেন কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ধনীরা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি—ভয়াবহ ধনতান্ত্রিক সংকট, ভয়াবহ দারিদ্র, শিল্প সংকট, ব্যবসা সংকট, তীব্রতম সমস্যার মুখোমুখি হয়ে। আর এই সমস্যাগুলিই পুনঃ পৌনিকভাবে সৃষ্টি করে চলেছে আরো দারিদ্র। এই পরিস্থিতিতেই উপদেশ দেওয়া হয় কঠোর শ্রম করার,—বলা হচ্ছে তাই অলসতাই জীবনের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক—দারিদ্র নয়। আর এই বিশ্বাসের স্পেনীয় দাঁতগুলি রুদ্ধশ্বাস মুমূর্ষের কণ্ঠনালীতে ডুবিয়ে দিয়ে ধনিক শ্রেণী তাদের পকেট ভরে তুলছে স্বর্ণ মুদ্রায়। তাই পরিশেষে আমি ডাক দিয়ে যাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্য।

নারীপ্রগতি—অর্থনীতি ও সমাজনীতি

(৩২০ পৃষ্ঠার পর)

প্রগতির নামে নারীকে আদিম প্রবৃত্তি জাগানোর হাতিয়ার করে তোলা হচ্ছে। নারীদেহকে লোভনীয় করে তোলা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসেবে মেয়েদের মর্যাদাকে তিল তিল করে হত্যা করা হচ্ছে। শিক্ষার মধ্যে, সমাজ জীবনের মধ্যে নারীর ঐ লোভনীয় ভোগের বস্তু হয়ে ওঠার, পুরুষের মনে মোহসৃষ্টি করার আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই বাইরের জগতে পণ্য হয়ে ওঠাটুকুই প্রগতির চরমসীমা বলে প্রতিপন্ন করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস চলেছে। প্রয়াস চলেছে ব্যক্তিত্ব ও সত্তাকে অস্বীকার করার।

কিন্তু এই পণ্য হয়ে ওঠাটুকুই কি প্রগতি। না, এই অবস্থাটাকে শ্রমজীবী নারীসমাজ মেনে নিতে নারাজ। তাঁরা নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে আরও বেশী বেশী সজাগ হয়ে উঠছেন। সমানাধিকারের দাবী করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া আর কোথাও তাঁদের অধিকার স্বীকৃত নয়। সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই মেয়েদের মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না। আবার, একমাত্র সমাজতন্ত্রেই মেয়েরা তাদের জনবল সৃষ্টির বিশেষ ভূমিকার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাই তাঁদের অধিকারের দাবীতেই সমাজতন্ত্রের সপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলছেন। আমাদের মত দেশেও গণ-আন্দোলনগুলিতে আরও বেশী বেশী করে সামিল হচ্ছেন। সমবেত, সংগঠিত হচ্ছেন মহিলারাও। কারণ, তাঁরাও তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রগতির, অগ্রগতির সঠিক পথটি চিনতে পেরেছেন। ছাত্রীদের কাছে আজও সেই পথটি বিশেষ স্পষ্ট নয়। 'বুর্জোয়া প্রগতি'-র বিষফলটি তাদের সামনে আজও 'সোনালী মোড়কে মোড়া'। যেখানে 'আনন্দলোক' পত্রিকার মাধ্যমে রঙীন বম্বে ফিল্মকে আদর্শ করে তোলা হয়। মার্কিনী রুচি, বিকৃত ভাবনাকে সভ্যতার চরমতম নিদর্শন বলে বর্ণনা করা হয়। কিছু স্বাধীনতা দেওয়ার নাম করে তার স্বাধীন বিকাশের পথরোধ করার চক্রান্তকে যতদিন না ছাত্রীরা অনুভব করবে ততদিনই গণ-আন্দোলন সম্পর্কে তাদের অনীহা থাকবে। নারী প্রগতির প্রশ্নটা যে বাস্তবে উৎপাদনে তার ভূমিকার সঙ্গে, অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গেই যে তার মর্যাদাহানি ঘটে। সমাজের অগ্রগতি না ঘটলে যে তারও অগ্রগতি ঘটে না। এই বিষয়টা সম্যক উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তারাও বাস্তবে সচেতন, সংগঠিত ও আন্দোলনমুখী হয়ে উঠবে না। একমাত্রই এই সমাজ চেতনার প্রসারই তাকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

(সচিত্র মাসিক যুবদর্পণ)

নবম সংখ্যা ॥ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

কান্তি বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক

বনভূষণ নায়ক

যুবকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ)
কলিকাতা-৭০০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাঁদ দে কর্তৃক তরুণ প্রেস, ১১ অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

সূচী

যুবসমাজের প্রতি :-

অশুভ ও অসুন্দরকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারে যুবসমাজ——

শান্তিপ্রিয় মানুষের আশা ভরসার মূর্ত প্রতীক যুবসমাজ——

* বারোয়ারী পূজোগুলিকে কেন্দ্র করে জোর-জুলুম ও জবরদস্তি কি অসঙ্গত ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে মঞ্চ তৈরী করে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত করা কি অশোভন ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* সারারাত্রিব্যাপী মাইক্রোফোন বাজিয়ে শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে বাধ্য করা কি অশালীন ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* নির্দিষ্ট দিনে প্রতিমা নিরঞ্জন না দিয়ে পূজোর সময়কে অহেতুক দীর্ঘায়িত করে অনর্থ সৃষ্টি করা কি অন্যায় ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবস্থা উপলব্ধি করে আলোকসজ্জায় পরিমিতি বোধের পরিচয় দেওয়া কি সুষ্ঠু ও সুন্দর নয় ?

কান্তি বিশ্বাস

সম্পাদকীয়

'অপারেশন' শব্দটি ইংরেজী হলেও এমন বঙ্গ-সন্তান সম্ভবতঃ কম আছেন যিনি শব্দটির সাথে পরিচিত নন। সাধারণ মানুষের কাছে কথাটির ব্যাপক প্রচলন আছে চিকিৎসা বিষয়ে। যখন কোন রুগীর গায়ে চিকিৎসকেরা রোগ নিরাময়ের জন্য অস্ত্র প্রয়োগ করেন—তাকেই সাধারণ কথায় 'অপারেশন' বলা হয়। শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় সামরিক বাহিনীতেও। যখন সেনাবাহিনী অস্ত্র হাতে শত্রুকে মোকাবিলা করেন—তাকেও 'অপারেশন' বলে লোকে জানে। ১৯৭১ সাল হতে ৭৭ পর্যন্ত এ রাজ্যের মানুষ আরও একটি ক্ষেত্রে 'অপারেশনের' দাপট দেখতে পেয়েছেন—এর নাম 'কুম্বিং অপারেশন'। সামরিক কায়দায় অতর্কিতে এক একটা এলাকা সি. আর. পি, অথবা পুলিশ বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলে তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হয়েছে এমন সব যুবকদের শাসক শ্রেণীর কাছে যারা শুধু অবাঞ্চিত নয়—যাদের অবস্থান শাসক শ্রেণীর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তাদের এই 'অপারেশন'-এর মধ্য দিয়ে ধরা হয়েছে, পিটিয়ে-লাশ করা হয়েছে—ঘর ছাড়া করা হয়েছে—গুন্ডা দিয়ে খুন করা হয়েছে। এই ভাবে শব্দটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে হাজির হয়। অর্থের এই দীর্ঘ তালিকার সাথে বোধ করি আর একটি নয়া সংযোজন যুক্ত করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এটির নাম 'বর্গা অপারেশন'।

বর্গাদার কথাটি কুচবিহার জেলা সহ কয়েকটি জেলায় আধিয়ার নামে পরিচিত। এরাও কৃষক। অন্য কৃষক থেকে এদের পার্থক্য এই এরা পরের জমিতে চাষ করে। নিজের মেহনত এবং কোথাও কোথাও নিজের বীজ-সার ইত্যাদি ব্যবহার করে ফসল ফলায়। এক অংশ নিজে পায়—অন্য অংশ জমির মালিককে দিতে হয়। দিতে হয় এই জন্য যে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে একবার যদি জমির মালিক হওয়া যায় তা হলে চাষ-বাস করাক বা না করাক জমি থেকে অধিকার যায় না—মালিকানা যায় না। যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ চলছে তার অনিবার্য ফল হিসাবে এক অংশের লোক কৃষি কাজ না করলেও জমির মালিকানা রাখার সুযোগ পাচ্ছে এবং জমি রাখছে আর অন্যদিকে সমাজের আর এক অংশের মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে জমি না থাকা সত্বেও কৃষি কাজ করছে নিজের জমিতে নয়—অপরের জমিতে। এদেরই নাম বর্গাদার।

যতদিন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলতে থাকবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার রেশটুকু যতদিন বজায় থাকবে ততদিন এই বর্গাদারী ব্যবস্থাও চলতে থাকবে। সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা পত্তন করার দ্বারাই একমাত্র ভূমিহীন কৃষককে জমির মালিক করা যায়—বর্গাদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যায়। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদই একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে অকৃষক জমির-মালিক জমি হারা হয়েও সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার পায়—বিকল্প জীবিকার সুনিশ্চিত সুযোগ পায়। আর কোন কৃষককেই নিজের পরিশ্রমে উৎপাদন করা ফসলের একটা সিংহ ভাগ জমির মালিক বলে কথিত কাউকে দিতে হয় না—নিজেই ভোগ করতে পারে এবং বর্গাদার শব্দটি অভিধান থেকে লুপ্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

সে কথা থাক। আমাদের দেশে দীর্ঘ কাল ধরে এই বর্গাদারী প্রথা চলে আসছে এবং বর্গাদার তার তৈরী ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য আবদন-নিবেদন করেছেন, দাবী তুলেছেন। সংগঠিত হয়েছেন। লড়াই করেছেন। কখনও কখনও রক্ত দিয়েছেন, শহীদের মৃত্যুও বরণ করেছেন। সেই সংগ্রাম গ্রাম বাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও অব্যাহত রয়েছে।

অর্থ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত রক্ষণশীল রিকার্ডো সাহেব থেকে শুরু করে আধুনিক কালের অর্থনীতির অনেক বড় বড় তাত্ত্বিক অনেক গবেষণা করেছেন—মতামত প্রকাশ করেছেন জমিতে উৎপাদিত ফসলের মালিকের ন্যায্য অংশ নির্ধারণ করার জন্য। বিশ্বের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্ক্সও উৎপাদনে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করার জন্য শ্রমের ভূমিকা ও অবদান নিরূপণের জন্য তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের মত সামন্ততান্ত্রিক অথবা আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশে ভূমিহীন বর্গাদারের ভাগ্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

কিন্তু ভূমিকে আশ্রয় করে যে শোষণ সমাজের বুকে দীর্ঘকাল ধরে জগদ্দল পাথরের মত চেপে রয়েছে—কৃষক তাকে সরিয়ে ফেলার জন্য আমাদের দেশে বারে বারে লড়াইয়ের ময়দানে সংগঠিত হয়েছেন। কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বিভিন্ন সময় রচিত হয়েছে। বর্গাদারের স্বার্থে তেজোদীপ্ত এ ধরনের একটি সংগ্রামের নাম তে-ভাগা আন্দোলন। বর্গাদার তার ঘামে ভেজা ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ দাবী করে এ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। জোতদার বা স্বীকার করেননি। ভূ-স্বামীদের স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে তে-ভাগা আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য সে সময়ের বৃটিশ সরকার এগিয়ে এসেছিল। বৃটিশ রাজত্বের সশস্ত্র বাহিনীর বুট, বুলেট ও বেয়নেটের বেপরোয়া আক্রমণে আক্রান্ত হওয়া সত্বেও বাহাদুর কৃষক পরাজয় বরণ করেননি। শেষ পর্যন্ত তে-ভাগা আইন বিধিবদ্ধ হয়—পরবর্তী কালে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে চার-ভাগা আইন পাশ হয় অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের তিন চতুর্থাংশ বর্গাদারের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

আইন পাশ হওয়া এক জিনিষ আর তার সুবিধা পাওয়া ভিন্ন জিনিষ বর্গাদার হিসাবে আইনে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত সে তার ন্যায্য পাওনা পেতে পারে না। বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্ত করার জন্য বিধান তৈরী হোল, ভাগচাষী কোর্ট বসলো। বর্গাদারকে জমির মালিকের বিরুদ্ধে মোকর্দমা করার সুযোগ করে দেওয়া হোল। বর্গাদার উচ্ছেদ রোধ করার আইনগত ব্যবস্থা তৈরী হোল। কিন্তু এতৎ সত্বেও বর্গাদার তার ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার নির্দিষ্ট অধিকার পেল না। জমি থেকে উচ্ছেদের বিড়ম্বনা থেকে সে মুক্তি পেল না। এ রাজ্যের প্রায় ৩৮ লক্ষ বর্গাদারের মধ্যে গত বৎসর পর্যন্ত মাত্র ৮ লক্ষ বর্গাদারের নাম বর্গাদার হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হয়েছিল। স্বভাবতঃই বর্গাদার যদি রেকর্ডভুক্ত না হন তা হলে ফসলের আইনগত অংশ পাওয়া সুনিশ্চিত হতে পারে না—জমি থেকে উচ্ছেদের বিপদ থেকেও মুক্তি পেতে পারেন না। আইন যতটুকু আছে তাকেও বৃদ্ধাংগুষ্ঠি দেখিয়ে এ যাবৎ বর্গাদারকে বঞ্চনা করা হয়েছে—শোষণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের অধীন একটি কমিটি (Task Force) রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবই ভূমি সংক্রান্ত আইনের দুঃখজনক পরিণতির প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

লক্ষ লক্ষ বর্গাদারকে কারচুপির হাত থেকে—জোতদারের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য আইনগত যতটুকু সুযোগ আছে তাকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বর্গা অপারেশন' নামে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করেছেন। এই অভিযানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল বিপুল সংখ্যক বর্গাদার অধ্যুষিত ছোট ছোট এলাকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে, ছোট ছোট স্কোয়াড গঠন করে, তার সাহায্যে বর্গাদারের সাথে—জোতদারের বাড়ীতে নয়—বর্গাদারদের পক্ষে সুবিধাজনক কোন জায়গায় সান্ধ্য বৈঠক এবং পর্যবেক্ষণ ও সরেজমিনে যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত রেকর্ডভুক্তি করা। এ ব্যাপারে কৃষক সংগঠনগুলির সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এবং রেকর্ডভুক্ত বর্গাদারেরা সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ঋণ পাওয়ারও সুযোগ পাবেন।

লোক দেখানো আইন থাকা সত্বেও প্রয়োগ পদ্ধতির ত্রুটী এবং সদিচ্ছার অভাবে যে বিরাট সংখ্যক বর্গাদার এতদিন পর্যন্ত রেকর্ডভুক্ত হতে পারেননি এবং আইনের বিন্দুমাত্র সুযোগ ভোগ করতে পারেননি আমরা বিশ্বাস করি সরকারের এই অভিনব উদ্যোগের ফলে তারা রেকর্ডভুক্ত হতে পারবেন এবং আইনগত যতটুকু সুযোগ বিদ্যমান তা লাভ করতে পারবেন।

গ্রাম বাংলায় যে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী যুব মানস রয়েছেন তার এক বিশাল অংশ এই বর্গা চাষের সাথে যুক্ত। বর্গা অপারেশনের সাফল্যের ফল হিসাবে সমগ্র বর্গাদারের সাথে এই অংশের যুব সাম্প্রদায়েরও জীবন-যন্ত্রণা একটু হ্রাস পাবে। সেই জনাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই 'বর্গা অপারেশন'কে স্বাগত জানাই—এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিশ্বের যুব সমাজের কাছে আহ্বান

(একাদশ বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসবের ঘোষণাপত্র)

বিশ্বের যুব ও ছাত্রবৃন্দ

বিশ্ব যুব ছাত্র আন্দোলনের আরও একটি বৃহৎ ঘটনা—একাদশ বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসব সফল ভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

আমরা, ১৪৫ দেশের দুইশত সংগঠনের ১৮৫০০ জন প্রতিনিধি ১৯৭৮-এর গ্রীষ্মে কিউবার হাভানা শহরে মিলিত হয়েছি। মিলিত হয়েছি রাজনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতা নিয়ে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি, শান্তি ও মৈত্রীর পতাকা উর্ধে তুলে ধরে, কিউবান জনতা ও যুব সমাজের আতিথ্য ও জয়োল্লাস পরিবৃত হয়ে। মিলিত হয়েছি আমাদেরই সমস্যা নিয়ে প্রকাশ্যে ও খোলামনে আলোচনা করতে, একে অপরকে উপলব্ধি করতে, আমাদের সাফল্য ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করতে, আমাদের জনগণের সাংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আমাদের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে।

আজকের বিশ্বে যুব সমাজ যে মহান ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে আমরা তাকে আর একবার স্বীকৃতি দিচ্ছি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশাল বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। আন্তর্জাতিক দাঁতাতের দিকে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আরও ব্যাপকতর ভিত্তির দিকে, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদার দিকে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্নতা নিয়েই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমান অধিকারের দিকে উল্লেখযোগ্য দিক পরিবর্তনের নিদর্শন মিলেছে; পুনঃমিলিত ভিয়েতনাম, ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়, পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অবসান, বিজয়ী এঙ্গোলা, ইথিওপিয়ার সামন্ত রাজত্বের অবসান—এ সবই হলো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত পরিবর্তন জনগণের ন্যায্য আসা-আকাংখা পূরণের জন্য গড়ে ওঠা আন্দোলনকেই সাহায্য করছে।

আমরা উৎসবে অংশ গ্রহণকারীরা, নূতন সমাজ তৈরীতে বিরাট সাফল্য অর্জনকারী সমাজতান্ত্রিক দেশ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন উন্নয়নশীল জোট নিরপেক্ষ দেশ ও ধণতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি সমূহের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমরা, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতিকে ব্যর্থ কর দিয়েও তার কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে অর্জিত বিজয়কে অভিবাদন জানাচ্ছি। তবুও সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বগুলিকে তীক্ষ্ম করছে, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, শান্তি ও সামাজিক প্রগতির দিকে জনগণের অপরিহার্য অভিযানকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং তারা আজও প্রধান শত্রু। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ও তাকে পরাস্ত করতে হবে।

আমরা ভালভাবেই উপলব্ধি করি যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির দিকে এই পরিবর্তন স্থায়ী করবার জন্য, আন্তর্জাতিক দাঁতাতকে ঐতিহাসিকভাবে অপরিবর্তনীয় চরিত্রের ও সার্বজনীন করে তোলার প্রক্রিয়ার জন্য এখন প্রয়োজন, যা পূর্বে কখনই ছিল না, সাম্রাজ্যবাদের সেই আধিপত্য ও শক্তি প্রয়োগের নীতির অবসান, অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে, পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী নরহত্যাকারী অস্ত্র উৎপাদনের বিরুদ্ধে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা তৈরী এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সহ সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী করার কাজ শুরু করা।

এই বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যুবক ও ছাত্রদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধির জন্য আমরা তাদের সহযোগিতা ও কাজের ক্ষেত্রে ঐক্য শক্তিশালী করবার জন্য কঠোর সংকল্পবদ্ধ।

কিউবা থেকে আমরা বিশ্বের যুবকদের আহ্বান জানাচ্ছি। বিশ্বশান্তি, দাঁতাত, নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী যুদ্ধের পরিসমাপ্তির জন্য সংগ্রাম আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন। নিউট্রন অস্ত্রের মত ব্যাপক ধ্বংসকারী অস্ত্রের উৎপাদন আবিষ্কারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দুনিয়াব্যাপী প্রতিবাদ সংগঠিত করুন।

সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ, নয়া-উপনিবেশিকতাবাদ, জাতি বৈষম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য, প্রতিটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উদ্ধার ও রক্ষার জন্য, অর্থনৈতিক সম্পর্কের ন্যায্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্য ও একটি নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্য ও কাজকে দ্বিগুণ করুন।

ধণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শোষণ, অত্যাচার, বৈষম্য, বেকারী, সংকট ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা ও বিকাশের জন্য, এবং গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামকে তীব্র করুন।

সংগ্রাম করুন যুব সমাজ যেন তাদের কাজের অধিকার

ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে. সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ, সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে।

যুব সমাজের মধ্যে আরও বেশী সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব

এই মহান লক্ষ্যের প্রতি অনুপ্রেরিত হয়ে জাতীয় স্বাধীনতার স্বপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের বিরুদ্ধে এবং বর্ণবৈষম্যবাদী রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসানের জন্য নাম্বিয়া, জিম্বাবউ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ ও যুবকদের সংগ্রামের প্রতি সংহতিকে শক্তিশালী করুন। একইভাবে সাহারার জনগণের স্বাধীনতার জন্য ন্যায্য আকাংখার প্রতি এবং নয়া-উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আফ্রিকার জনগণের সংগ্রামের প্রতি তাহাদের সাহায্যকে দৃঢ়তর করুন।

আরব জনগণের সংগ্রাম, বিশেষতঃ পি এল ও-র নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের সংগ্রাম এবং লেবানন ও গণতান্ত্রিক ইয়েমেনের জনগণের সংগ্রামে আমাদের সংহতি আরও শক্তিশালী করতে হবে। এরা হল মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ, জিনোইজম ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য ও চিরস্থায়ী শান্তির পক্ষে। আবার এরাই সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের শিকার।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতির স্বপক্ষে চিলির জনগণ ও যুবকদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জোরদার করুন!

ফ্যাসিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে

উরুগুয়ে, নিকারাগুয়ে প্যারাগুয়ে, ব্রাজিল, বলিভিয়া ও অন্যান্য দেশের মানুষের সংগ্রামের প্রতি সংহতি শক্তিশালী করুন। শক্তিশালী করুন পোয়োর্টোরিকোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ও ফ্যাসিবাদের বিপদের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত আর্জেণ্টিনার যুবক ও জনগণের সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ও পূর্ণ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতির জন্য লাতিন আমেরিকার ও ক্যারিবিয়ান জনগণের সংগ্রাম। দেশের শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের জন্য এবং জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সীমানাগত অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভিয়েতনামের জনগণের প্রতি সংহতিকে জোরদার করুন।

নূতন সমাজ গঠনরত কিউবার মহান জনগণের বিরুদ্ধে অবৈধ জঘন্যতম অবরোধের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা উপচে পড়ুক। গুয়ানতানামোয় সামরিক ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে নিঃসর্ত প্রত্যার্পণ করতে হবে এই ন্যায্য দাবীর সমর্থনে আমাদের সংহতিকে দৃঢ়তর করুন।

বিশ্ব উৎসব আন্দোলনের ইতিহাসে একাদশ উৎসব সুদৃঢ় স্তম্ভের মত বিরাজ করুক এবং এই উৎসবের অর্জিত সাফল্যগুলি বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল যুব সমাজের কার্যক্ষেত্রে ঐক্য ও সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন।

স্বাধীনতা ও মর্যাদার জন্য সংগ্রামরত সমস্ত জনগণের প্রতিই আমাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংহতি শক্তিশালী হোক। শান্তি ও সামাজিক প্রগতির পথের যাত্রীদের প্রতি প্রেরণা ও সাহায্যের হাত আরও প্রসারিত করুন।

আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ ঐক্যবদ্ধ হোক:—

—জনগণের আরও বিজয় অর্জনের জন্য
—আন্তর্জাতিক বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের আরও সাফল্যের জন্য
—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি, শান্তি ও মৈত্রীর জন্য বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসব দীর্ঘজীবী হোক।

হাভানা—৫ই আগস্ট, ১৯৭৮

বাঙলা সাহিত্যে ছন্দপতন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় / ডঃ সরোজমোহন মিত্র

'ছন্দপতন' মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই লেখা একটি উপন্যাস। নবকুমার নামে এক তরুণ কবির আত্মকাহিনী। এই কবি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে—"অল্প-বয়সী কবি সম্পর্কে একটা চলতি ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে—অনেক বদ্ধমূল সংস্কারের মতই সেটা জোরালো। তরুণ কবি বলতে লোকে ধরে নেয় কমবেশী স্নায়ুপ্রবণ, ভাবপ্রবণ পরম বোহিসেবী অকেজো অভিমানী একটা জীব—জীবন ও জগৎটা যার কাছে নিছক স্বপ্নাদ্য ব্যাপার।

আমার সম্বন্ধে এরকম একটা ধারণা নিয়ে এ কাহিনী পড়তে বসলে আমার অনেক কথা আর কাজের ঠিক ঠিক মানেটি বুঝতে অসুবিধা হবে—অসুবিধা কেন, মানে বোঝা সম্ভব হবে না। কারণ, আমি ঠিক বিপরীত রকম কবি এবং মানুষ।

আমি বস্তুবাদী কবি।

শুধু কবিতায় নয় সব বিষয়েই বস্তুবাদী।

বস্তুবাদী কবি কি?

যে সত্যবাদী কবি। দুটো একই কথা। বস্তুই সত্য, সত্যই বস্তু।

আমি কবিতা লিখি, শব্দমদ চোলাই করি না। আকাশ চষে আমি কাব্যফুলের চাষ করি না, মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই। জীবন্ত মানুষের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবস্তু জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব-চিন্তা আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে পুষ্ট।

ছেলেবেলা থেকেই কবিতায় খোকামি আর ন্যাকামি আমার পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে পনের বছর বয়সে লিখেছিলাম—

শব্দ মদ বেচা শুঁড়িগুলো
কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।

শুঁড়িগুলো সব মরে যাক,
কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।

ইচ্ছারূপিনী কাব্যলক্ষ্মীর সব বয়সের বিচিত্ররূপের সঙ্গে তখনও অবশ্য আমার পরিচয় ঘটেনি, কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে সতেজ প্রাণবন্ত কবিতার দিকে ওই বয়সেই আমার কেমন পক্ষপাতিত্ব ছিল।

শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বস্তুবাদী।

কবি তার কবিতায় একরকম, জীবনে অন্যরকম—এটা আমার উদ্ভট ব্যাপার মনে হয়। এ যেন ব্রহ্মচারীর নারী অঙ্গ স্পর্শ না করেও শুধু ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে পুত্রোৎপাদন।

বাইশ বছর বয়সে আমি প্রথম স্থির করি এবার আমার কবিতা বাজারে ছাড়া দরকার।

তার আগে কোথাও একটি কবিতাও আমি প্রকাশ করিনি।

এই বয়সের কবির কবিতা ছাপাবার প্রথম প্রচেষ্টায় কত কুণ্ঠা কত ভীরুতা থাকে কারো অজানা নেই,—কবিতা লিখে সে যেন মস্ত অপরাধ করেছে, কবিতা ছাপাতে চেয়ে অপরাধ করতে চলেছে তার চেয়েও মারাত্মক!

ভীরু লাজুক কবিকে সহজে কেউ পাত্তা দেয় না, চারিদিক থেকে তার ভাগ্যে জোটে শুধু অনাদর, উদাসীনতা ছেলেমানুষ কবি হতাশা ও অভিমানে জর্জরিত হয়ে যায়।

আমি এ হতাশা ও অভিমানকে প্রশ্রয় দিইনি।

নতুন কবির উপর জগৎ অকথ্যরকম নিষ্ঠুর, নতুন কবিকে সবাই গায়ের জোরে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে—এটাকে খাঁটি নির্জলা সত্য বলে মানতে আমি প্রথম থেকে অস্বীকার করেছি।"...

এ সবই কবি নবকুমারের কথা। তার আরও কথা আছে। তাও উল্লেখিত হবে ক্রমশঃ। কিন্তু নবকুমারের কাহিনীর এ ভূমিকা পড়তে পড়তে মনে হবে এ যেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের সাহিত্য-জীবনের কাহিনী।

বাঙলা সাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ আবির্ভাব বাংলা ১৩৩৫ সালে। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় গল্প ছাপানোর জন্য লিখে-ছিলেন 'অতসীমামী'। অবশ্য মাণিক এ গল্প সম্পর্কে নিজেই তাঁর 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে লিখেছিলেন "রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী"। কিন্তু এ গল্প তো তিনি প্রকৃত অর্থে সাহিত্য করার জন্য লেখেননি—লিখে-ছিলেন 'বিখ্যাত মাসিকে গল্প ছাপান নিয়ে তর্কে জিতবার জন্য।' সেজন্য এ গল্পে নিজের আসল নাম 'প্রবোধকুমার' না দিয়ে দিয়েছিলেন ডাক নাম "মাণিক"।

মানিকের 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায়। তার পূর্বে এই পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', তার পূর্ব থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন'। তখন বাঙলা সাহিত্যে 'আধুনিকতা' নিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় এবং বিতর্ক দেখা দিয়েছিল বাঙলা সাহিত্যের এই দুটি উপন্যাসে তার সার্থক প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু তার বছর দুই আগেই বাঙলা দেশে এবং বাঙলা সাহিত্যে আরেকটি প্রবণতা খুব জোরালো হয়ে উঠেছিল—তা রাজনীতি। ১৯২৬ সালে পুস্তকা-কারে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'

ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এবং তার সমকালেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা সহ লেখা হোল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন তখন মনে হয় রাজনৈতিক উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত। সেজন্য মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পর্বের লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায় না। সাহিত্যে আধুনিকতাই ছিল তখন প্রধান আলোচ্য। মানিক তাঁর তৎকালীন মানসিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমার সাহিত্য করার আগের দিনগুলি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে প্রথম এক বছর কি দু'বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেঁটেছি এবং তারপর কতদিন খুব সোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে 'আধুনিক' সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হ্যামশুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ-র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।" (সাহিত্য করার আগে)

তারপর নিজের ব্যক্তি মানস, বাস্তব জীবনে সংঘাত এবং সাহিত্যে অভাববোধ সম্পর্কে লিখেছেন, "ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্প বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরাল হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরাল করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটিয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকায়, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মানুষের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে।

গরীবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত —জিজ্ঞাসা জাগত, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?

ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা—বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবন দর্শন খোঁজার মত সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশ্যই তখন ছিল না।

সাহিত্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত পেতাম জবাবের। বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সাহিত্য আবার জাগাত নতুন নতুন জিজ্ঞাসা। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তাম গল্প উপন্যাস। গল্প উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাস করতাম বাস্তব জীবন।

.....আমার জিজ্ঞাসা ছিল প্রেম আর দেহ সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে, সাহিত্যের প্রেম আর বাস্তব জীবনের প্রেম নিয়ে। সাহিত্যের ফাঁকা প্রেম খুঁজে পেতাম না মধ্যবিত্তের জীবনে অথবা নিচের তলায়। মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবনের প্রেমে যেটুকু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সন্ধান পেতাম না নিচের তলার জীবনে। আবার নিচের তলার প্রেমে ঐশ্বর্যের রিক্ততা সত্ত্বেও যে সহজ বলিষ্ঠ উন্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জীবনে তার অভাব ধরা পড়ত।"

"যাই হোক, ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? মানুষ যে ভাল, নয় মন্দ হয়, ভাল-মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্তের হৃদয়।

ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার বিকার-গ্রস্ততা, সংস্কার প্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যায় কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্র জীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ? ভদ্র সমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর, মাঝি-মাল্লা, হাড়ি-বাগ্দিদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা—যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে-- সাহিত্যে দেখা যায় না?

ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা, বাস্তব জীবন ও সাধারণ বাস্তব মানুষের অভাব বড়ই পীড়ন করত। সংঘাতের পীড়ন।

আমার নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরাল হয়ে উঠছিল, সাহিত্য নিয়েও ক্রমে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম।

ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় আর মা, অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে! আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্র জীবনকে ভালবাসা, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোস-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভুষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছন্দপতনের কবি নবকুমারের

মতই বস্তুবাদী বা সত্যবাদী লেখক। মধ্যবিত্তসুলভ ভাবপ্রবণতাকে কাটিয়ে মাটির পৃথিবীর মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্যের ফসল ফলাতে চেয়েছেন। তাঁর আগে বাঙলা সাহিত্যে অনেক নামী-দামী সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম শরৎচন্দ্রই সাহিত্যে বাস্তবতাকে স্বীকৃতি জানালেন। সমাজ জীবনে আপত নিস্তরঙ্গতার অন্তরালে যে কত যন্ত্রণা এবং বেদনাবোধ লুকিয়ে ছিল শরৎচন্দ্রই প্রথম আমাদের কাছে তা উপস্থিত করেছেন। তিনিই প্রথম অনেক অন্যায় আর গোঁড়ামিকে নির্মম আঘাত করেছেন। শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে পতিতা আর অসতীরা চরিত্র হয়েছে। বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব। তখনকার অন্য কোন লেখক এটা পারেননি। তবে শরৎ-চন্দ্রের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল মূলত মধ্যবিত্ত নারীত্বের ক্ষেত্রে। মাঝে মাঝে তার সাহিত্যে সমাজজীবনের মূল সমস্যা দেখা দিলেও সামাজিকভাবে তাকে তিনি আঘাত করতে পারেননি। বিষয়ী সামন্তবাদী মানসিকতা এবং সমাজব্যবস্থার আমূল উচ্ছেদ করতে না পারলে কেবল ভাবপ্রবণতার দ্বারা অন্যের হৃদয়কে সিক্ত করা যায়, মূল সমস্যার কোন সমাধান করা যায় না।

মাণিকের সমকালে বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন অভিযান দেখা দেয়। এই অভিযাত্রীরা ছিলেন হামশুন-লরেন্স-হাক্সলি-গোর্কীর ভাবশিষ্য। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রচন্ড ভাঙনের পরে এদের মধ্যেও ভাঙনের প্রবল নেশা এবং পরিণামে হতাশা আর নৈরাশ্যই দেখা দিল। এই অভিযানের যুগকে সংক্ষেপে বলা হয় 'কল্লোল যুগ'। এদের বয়সে ছিল তারুণ্য, ভাবে ছিল রবীন্দ্র বিরোধিতা। এদের ভাষার তীব্রতা, ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানি ও নরনারীর রোমাণ্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা বাঙলা সাহিত্যে এক আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু এদের বিদ্রোহে যতটা ফেনা ছিল ততটা বাস্তবতা ছিল না। আসলে এরা ছিলেন মূলত রবীন্দ্রভক্ত এবং রোমাণ্টিক ভাববিলাসী। তবু এই সময়ে বাঙলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের বাঙলা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ছিলেন প্রধানত সমাজের উপরতলার মানুষ। শরৎচন্দ্র সেখানে পতিতাদের ভীড় জমালেন। আকবর লাঠিয়ালরা সেখানে প্রবেশ পেল। কল্লোল যুগের লেখকদের রচনায় এল খাঁটি গ্রামের মানুষ আর কয়লাখনির কুলি-কামিনরা। এঁদের হাতে আমরা পেয়েছি খাঁটি গ্রাম্যজীবনের আর কয়লাখনির ছবি। ছবিগুলো ঠিক বাস্তবতা লাভ করতে পারেনি। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে বাস্তব সংঘাত আসেনি! মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ব্যক্তি জীবন এসেছে কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি—বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমাণ্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমাণ্টিক প্রেম বাতিল হয়নি, ওই একই রোমাঞ্চ শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যে সেই বাস্তবতার অভাব পূরণ করেছেন। তিনি শৈশব থেকে সারা বাঙলার গ্রামে শহরে ঘুরে ঘুরে যে জীবন দেখেছেন, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছেন, সেই সাধারণ বাস্তব মানুষের জীবনকেই সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে বাস্তবতার আমদানি বাঙলা সাহিত্যে মাণিকের অন্যতম অবদান।

মাণিক ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানীর মতই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জীবনকে দেখা ছিল তাঁর অভ্যাস। বিজ্ঞানীর মত নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়েই মাণিক বাঙলা উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন একের পর এক অনন্যসাধারণ চরিত্র—শ্যামা, শশী, যশোদা, সত্যপ্রিয়, বন্ডা, রাঘব মালাকার প্রভৃতি। বাঙলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখা ছিল মাণিকের আরেকটি অবদান।

সে জন্যই তো 'ছন্দপতন' উপন্যাসের কবি নব-কুমারের মত মাণিকও বলতে পারেন, 'শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বাস্তববাদী।' হতাশা আর অভিমানকে মাণিকও প্রশ্রয় দেননি। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জননী'র শ্যামার জীবনে এসেছে আঘাতের পর আঘাত। নানা বিপর্যয়ে জীবন তার ক্ষতবিক্ষত, তবু হতাশায় না ভেঙে পড়ে সে অর ছেলেদের নিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যই সংগ্রাম করেছে। তাঁর গল্পে উপন্যাসে এর অজস্র উদাহরণ আছে।

সেজন্যই বন্ধুরা যখন বলে পত্রিকার সম্পাদকরা গায়ের জোরে নতুন লেখককে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে তখন সে কথা কবি নবকুমারও স্বীকার করে না, মাণিকও প্রতিবাদ করে লিখে ফেলেন প্রথম গল্প 'অতসীমামী' এবং তা অচিরে প্রকাশিতও হয়।

মাণিকের জীবনে একটা প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অদ্ভুত দৃঢ়তা। নবকুমারকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বললে সে অনায়াসে দৃপ্ত ভঙ্গিতে নিজের কবিতাই আবৃত্তি করে শোনায়, তার স্বকীয়তা প্রচার করে। মাণিকও বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃঢ়তা নিয়ে উপস্থিত। নবকুমারের মত তিনিও বলতে পারেন, "আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন রূপায়িত করছি আমার কবিতায়।"

জীবন বিচিত্র। ভয় লোভ হিংসা আর মিথ্যার চাপে বিকারগ্রস্ত জীবন। আপাতদৃষ্টিতে যাকে চরিত্রের দৃঢ়তা মনে হয় আসলে তাও যে নিছক প্রাণশক্তির একটা বিকার। সামঞ্জস্যবিহীন জীবনযাত্রা। ঘরের কোণে সংসারের কাজে আটক তৃপ্তি আর আধুনিক মধ্যবিত্ত শিক্ষিতা মেয়ে মানসীর মধ্যে সামাজিক নিয়মে কোন তারতম্য নেই। সে জন্য মানসীদের মধ্যেও দেখা যায় সুনির্দিষ্ট মানসিক গঠনের অভাব। "তৃপ্তিদের জীবন হয় পঙ্গু, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে অগভীর কৃত্রিম সুখ-দুঃখের কারবার।" আর "মানসীদের জীবন হয় আরও খানিকটা

ছড়ানো এলোমেলো বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিশেহারা আর আত্মবিরোধে জটিল। সেও প্রতা সত্যিকারের মুক্তি পায় না। তৃপ্তি আর মানসীর জীবন সেই একই পরাধীনতার এপিঠ আর ওপিঠ। বাইরে খানিকটা চলাফেরা, অনেকের সঙ্গে মেলামেশা, খানিকটা বাঁধাধরা বিদ্যা আর ছাঁচে ঢালা অভিজ্ঞতা—মানসীদের আসল পাওনা এইটুকুই। সংঘাতময় বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তারও আত্মীয়তা নিষিদ্ধ—দু একটি ঢেউ শুধু গায়ে লাগতে পারে। তারই মারাত্মক ফল হয় সঙ্গতিহীন স্বকীয়তাহীন বিচিত্র কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অনৈক্যময় চেতনার বিকাশ। আজ যা চরম সত্য, কাল তা সত্য কুৎসিৎ মিথ্যা মনে হয়। অজ যা জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা, কাল তার মূল্য খুঁজে পায় না।"

সংসারের ধরাবাঁধা নিয়মনীতিগুলো আজকাল আর চলে না। খাটো কাপড়ের মত নীতির আঁচল এদিকে টানলে ওদিকে কুলোয় না। মধ্যবিত্ত সমাজ-সংসার একটা প্রচণ্ড ভাঙনের মুখে। পুরানো রীতিনীতি মেনে আর চলছে না। আর্থিক অনটন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য তাদের জীবন সংগ্রাম তীব্রাকার ধারণ করেছে। পেটের দায়ে সারাদিন চানাচুর বিক্রী করেও বাড়িতে চাকরি বলে তাকে চালিয়ে যেতে হয়। অর্থের জন্য কিশোরী মেয়েকেও অন্যের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে হয়। পুরানো মূল্যবোধ আর নেই অথচ তাকে অস্বীকার করে এমন মানসিক দৃঢ়তাও নেই।

সংঘাতময় এ জীবনে নবকুমারের মনে স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশ্ন জাগে "কবিতা লিখি কেন?" আর্টের অনেক বই পড়ে, অনেক তর্ক সভায় হাজির হয়েও কবি নবকুমার সঠিক বলতে পারে না কেন সে কবিতা লেখে? এ নিয়ে চলে অনেক চিন্তা, অনেক অস্থিরতা। রাজপথে মানুষের ভিড়ের সঙ্গে মিশে কবি একাকার হয়ে যায়। বিচিত্র বেশ আর বিচিত্র বয়সের পথ-চলা ব্যস্ত মানুষগুলো এক সমগ্রতার ঐক্য জানিয়ে দেয় কবির মনে। কবি অনুভব করে "পথে-হাঁটা মানুষ পথে দুদিকেই হাঁটে, পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যায় বিপরীত দিকে কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার পথ শুধু পিছন থেকে সামনের দিকে, পাথেয় শুধু জীবনকে এগিয়ে নেবার সংগ্রাম।"

কবি উপলব্ধি করেন, "মানুষের সংগ্রামী জীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই আমার কবি হওয়ার সাধ।" এই শহরের পাকা দালান থেকে বস্তির খোলার ঘর থেকে গ্রামের ওই খড়ের ঘরের অগণিত মানুষ আমার পথ চেয়ে আছে, উৎকর্ণ হয়ে আছে ছন্দে ও সুরে আমার আহ্বান শোনার জন্য। এ মিথ্যা কথা নয়, অলীক কল্পনা নয়। দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু দিয়ে আমি লক্ষ কোটি মানুষের এই অসীম ধৈর্যের প্রতীক্ষা অনুভব করি।" তারা যেন কবিকে আহ্বান করে বলছে—"হে আমাদের কবি, হে আমাদের নবজন্মের নবজীবনের নববসন্তের মুখর প্রতীক, আমরা তোমায় বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে এস।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তার "কেন লিখি" প্রবন্ধে লিখেছেন, "জীবনকে আমি যে ভাবে ও যত ভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে—আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারী যা কোনদিন পেতো না।"

চলার পথে একদিন নবকুমার দেখল কলোনীর ধারে তমালকে। ছেঁড়া একটা ডুরে কাপড় পরে কলে কলসী ভরছিল। "রাস্তায় গাড়ী চলছে তার খেয়াল নেই কিন্তু প্রত্যেকটি লোকের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। যেন জিজ্ঞেস করছে, আমি কে জানো? আমি মেয়ে নই, আমি একটা মানুষ।" "এ তার নারীত্বের মনুষ্যত্ব চাওয়া নয়। মানুষ বলেই মনুষ্যত্ব দাবী করা। সে মেয়ে না পুরুষ সেটা বড় কথা নয়, সে মানুষ। মেয়েলি সমস্যা তার আসল সমস্যা নয়, তার একেবারে গোড়ার সমস্যা। বঞ্চিতদের অধিকার নিয়ে অনেক মেয়ে লড়াই করেছে, এখনো করছে। কিন্তু ওই বয়সের ওরকম একটি সাধারণ মেয়ের কাছে এই দাবী ছাড়া আর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যাওয়া সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার।" মানুষের মত বাঁচার জন্য ও অনায়াসে নারীত্বের মর্যাদা চুলোয় দিতে পারে আবার দরকার হলে সেজন্য অনায়াসে গুলির সামনে বুক পেতেও দিতে পারে। ওর এই কথাটা কবির কাছে ভাষা দাবী

আরেকদিন চলতে চলতে কবি গিয়ে হাজির হয় মনুমেণ্টের নীচে—হাজার ত্রিশেক জনসমাবেশে। চারিদিকে যে অসহ্য অবস্থা তার প্রতিকারের দাবিতে এই সমাবেশ। কবি এই সমাবেশের জন্য একটা কবিতা লিখে এনেছেন তার নাম 'প্রতিকার চাই'। কবিতাটা কিশোর অধীরের ভালো লাগে। কারণ এতে সত্যি প্রাণ আছে। এক সভায় কবিতাটা বেশ নাড়া দেয়। কবি উপলব্ধি করে এতদিনে সে কবিতা লেখার মর্ম উপলব্ধি করেছে—কবিতার ধরণই বদলে গেছে তার।

নানা মানুষের কাছে সে তার কবিতাকে নিয়ে যায়। তারা শোনে। গভীরভাবে তাদের নাড়া দেয় কিন্তু সমাজের নীচুতলায় যারা আছে, চানাচুর বিক্রীওয়ালা নিখিল, আলেয়া প্রভৃতি সন্তুষ্ট হয় না। তাদের দাবী তারা বুঝতে পারে এমন কবিতা চাই।

কবি নবকুমার সেখানে নামে না। কারণ শুধু বন্ধু মহলে তারিফ পাওয়ার জন্য তো সে কবিতা লেখে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা আর প্রতিকার নামে যে কোন অসংযম আর উশৃঙ্খলতাকেও প্রশ্রয় দেয় না, কোন স্বার্থের খাতিরে সজ্ঞানে সচেতনভাবে নিজের বিবেককেও বিলিয়ে দেয় না। যে জন্য সে যায় একটি সাধারণ মেয়ে তমালের কাছে কিংবা মহিমের বিড়ির দোকানে কবিতা শোনাতে। কারণ তার কবিতা যদি এদের নাড়া না দেয় তাহলে ব্যর্থ হবে তার নতুন যুগের কবিতা লেখা।

'প্রতিভা' সম্পর্কে সাধারণ ধারণার প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই। কারণ সে জানে, "প্রতিভা কোন আকাশ থেকে পড়া গুণ কিংবা ছাঁকা কোন গুণ নয়। অনেক কিছু জড়িয়ে এই গুণ—কোন বিষয়ে সাধনা করার বিশেষ ক্ষমতা আর আগ্রহই আসল কথা। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভা আসলে এক—দুজনের মধ্যে তফাৎ শুধু ঝোঁকের। মনের গড়ন, পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা অনেক কিছু মিলে ঝোঁকটা ঠিক করে।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'প্রতিভা' শীর্ষক রচনায়ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "প্রতিভা ওই দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা। আর কিছুই নয়। কোন বিশেষ প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মায় না।" আসলে এটা একটা মিথ্যা অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার লেখক কবিকে ছাড়তে হবে। তাদের ভাবতে হবে "আমি দশজনের একজন।" "জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনই তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়।"

কবি নবকুমার উপলব্ধি করে তার কবিতা সাধারণ মানুষের ঐতিহ্যগত কাব্যবোধকে নাড়া দিতে পারলেও তাতে তাদের প্রাণের ভাষা আসেনি। তার কবিতায় নতুন ভাব, নতুন যুগের নতুন সত্য এলেও যেন তা সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না। সেজন্য এক ভীষণ অস্থিরতায় সে ছুটে যায় সবরকম মানুষের কাছে। মিলেমিশে তাদের আপন হবার চেষ্টা করে।

অবশেষে সে উপলব্ধি করে তার মধ্যে সংগ্রামী মানুষের মর্মবেদনাকে রূপ দেওয়ার জন্য এক বিরাট ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু তাদের প্রতি যথার্থ ভালবাসা নেই। সে যেন যন্ত্রের মত অস্থির হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত নবকুমার হারানো খেই পেল। যথার্থ উপলব্ধি করল, "ভালবাসা ছাড়া শ্রদ্ধা নেই—শ্রদ্ধা ভালবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না। শ্রদ্ধায় ভালবাসায় মানুষের আপন না হয়ে কি করে জানব সেই প্রাণের ভাষা—যে ভাষায় ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।"

এই উপলব্ধির মধ্যেই নবকুমারের কাহিনী শেষ কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধায়ের এখানেই শুরু। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে অনেক বিখ্যাত লেখক ছিলেন। নানা আদর্শ, চিন্তা এবং রূপায়ণের জন্য তাদের শ্রেষ্ঠত্বও অনস্বীকার্য, কিন্তু শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা দিয়ে সমাজের সংগ্রামী মানুষের মর্মবেদনাকে ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্ব বোধ হয় একমাত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার পূর্বে সাধারণের প্রতি যথার্থ ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র শরৎচন্দ্রের মধ্যে কিন্তু তাঁর ক্ষেত্র সীমিত।

মাণিক বন্দ্যোপাধায়ই একমাত্র লেখক যিনি সংগ্রামী মানুষের জীবন সমস্যাকে, সমাজের শ্রেণী সংঘাতকে, নতুন যুগের নতুন সত্যকে তীব্রভাবে রূপায়িত করেছেন। গতানুগতিক ভাবধারাকে ভেঙেচুরে তিনি সম্পূর্ণ নতুন খাতে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন সেজন্য একদিকে তিনি যেমন বাঙলা সাহিত্যের ছন্দপতন অন্যদিকে তেমনি তিনি নতুন যুগের পথিকৃৎ।

"কোন দেশের অধিবাসীদিগকে সাময়িককালের জন্য নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়া অপমানের বোঝা বহিতে বাধ্য করা যায় বটে কিন্তু তাহাদিগকে চিরতরে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায় না।"

—রবীন্দ্রনাথ

॥ ফাঁসীর মঞ্চে শৃঙ্খলিতের এই প্রহরে

মূল রচনা—ফায়েজ আহ্‌মদ ফায়েজ (উর্দু)
অনুবাদ—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ফায়েজ আহ্‌মদ ফায়েজ পাকিস্তানের কবি। শিক্ষালাভ লাহোরে ১৯৫১-৫৫ মণ্টগোমারী জেলে বন্দীবাসে ছিলেন। ভারত-পাকিস্তান মৈত্রীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী কর্মী। ১৯৫১ সালের ৫ মার্চ 'অবজার্ভার' এই মন্তব্য করেছিল: 'ভারত-পাকিস্তান জুড়ে ঘৃণার আবহাওয়া যখন তুঙ্গে, তখন তিনি অসম সাহসিকতায় মহাত্মা গান্ধীর শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেন। মুসলীম-লীগ-পন্থীরা তাঁকে যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বিষে জর্জরিত করেছিলেন, তা তাঁর কম্যুনিষ্ট মনোভাবের জন্য নয়—লীগপন্থীদের বন্ধ্যা ও অসার নীতিসমূহের নির্ভিক ও কঠোর সমালোচনার জন্য।' ইনি লাহোর থেকে প্রকাশিত 'পাকিস্তান টাইমস'-এর সম্পাদক। ইকবালের পর ফায়েজ সাহেবকেই উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি রূপে গণ্য করা হয়।

প্রতীক্ষার এমনতর সংশয়াকুল অন্তিম প্রহর
মূর্ত হয়,
সমস্ত চলার পথেই, জীবনের পথে পথে.
আকাঙ্ক্ষিত বসন্তদিন ব্যতিক্রম শুধু,
উৎকণ্ঠাহীনতায় নির্মলিন দিন;
প্রতীক্ষার এমনতর অন্তিম প্রহরে
উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের চেনা-দিনলিপি
বোধিমূলে গড়ে দেয় দুর্বহ ভাব—
পরীক্ষার এই হ'ল মাহেন্দ্রক্ষণ,
পরীক্ষাঃ অনশ্বর প্রেমের।
দৃশ্যের গোচরে আসে প্রিয় মুখচ্ছবি
এই শুভক্ষণে,
শান্ত-সমাহিত হয় অস্থির হৃদয় এই শুভক্ষণে।
অর্থহীন সে-নন্দিত প্রহর,
পাশে যদি না-ই থাকে অংশভাগী সহযোদ্ধার মুখ.
যখন ছায়ামালা নৃত্যপরা,
অথবা যখন ঠাণ্ডা মেঘ ভেসে যায়
পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে,
ছুঁয়ে যায় চেনার বা সাইপ্রেস গাছের পাতা
অর্থহীন সে-নন্দিত প্রহর,
সুরাহীন সুরাপাত্রের মত।
অসামান্যে-প্রতীকিত এইসব চিহ্নরাজি অনিঃশেষ হয়ে আছে
বহুকাল ধরে.
যেমন এখন, বর্তমান এই প্রহর, দৃষ্টির আড়ালে রাখে
প্রিয়সাথীমুখ
শৃংখলিত ফাঁসীমঞ্চে আনন্দিত উল্লাসের বর্তমান ক্ষণ
প্রয়োজন ও প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষণ—যেমন এখন।
রক্তগোলাপ—উন্মীলনে শ্রেষ্ঠ-প্রকাশ
বাগানে যখন.
তুমি তার কেউ নও
অথচ
ফাঁসীমঞ্চে তুমিই সম্রাট;
কে আছে এমন শক্তি, বন্দী করে ধরে রাখে
উষার সমীরের পদ-সঞ্চরণ?
সুপ্রকাশ বসন্ত-মাধুরী সে তো সদাই ধরা।
সেই প্রহর
নাইটিংগেল পাখির গান, বাহারী রঙিন ফুলসাজে
নন্দিত ছন্দিত সে-প্রহর
আমি যদি না দেখি,
অন্যেরা দেখবে দু' চোখ ভরে।

মধ্যপ্রদেশের প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র / সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৩ সাল। মধ্যপ্রদেশের বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ বিষ্ণুশ্রীধরবাকঙ্কর ফিরছিলেন মান্দাসর জেলা থেকে। ভনপুরে পৌঁছে নদী পার হওয়ার জন্যে তীরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। বালির মধ্যে পড়ে রয়েছে দুটি পাথরের কুঠার। তাঁর মনে হল ঐ গুলি যারা তৈরি করেছিল নিশ্চয় তারা কাছাকাছি গুহাগুলিতেই থাকত।

কিছুদিন পরেই ডঃ বাকঙ্কর সেখানে শুরু করলেন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ। কাজ শুরু করার পর তৃতীয় দিনেই এক বিশাল গুহার মধ্যে পাওয়া গেল নানা ধরণের প্রত্নবস্তু। ডঃ বাকঙ্কর গুহাটির ভিতরের চারদিকে চোখ বোলাতে গিয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর নাড়ির গতি দ্রুত হয়ে গেল—গুহাটির দেওয়ালে, ছাদে আঁকা রয়েছে অজস্র ছবি, প্রায় হাজার দুয়েক! ডঃ বাকঙ্করের চোখের সামনে ভেসে উঠল ফ্রান্স ও স্পেনের বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রগুলি. মনে পড়ে গেল বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন সাহেবের কথা—ভারতে কোন গুহাচিত্র নেই। সুপণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ বাকঙ্কর তাঁর স্কেচ বই নিয়ে ছবিগুলি আঁকতে বসে গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ভনপুর থেকে মাইল ছয়েক দূরে মোদিতে ডঃ বাকঙ্কর আবিষ্কার করলেন আরও কুড়িটি গুহা। সেগুলিতেও ছিল নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগের বহু গুহাচিত্র।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ডঃ বাকংকর মালব উপত্যকার প্রায় ছাব্বিশটি অঞ্চলে তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। দেখা গেল ঐসব অঞ্চলের মৃৎপাত্রগুলির গায়ে যে সব জীবজন্তুর ছবি আঁকা রয়েছে তাদের সঙ্গে কাছাকাছি নরসিংহবাদ ও ভনপুরের গুহাচিত্রগুলির রয়েছে অন্তত সাদৃশ্য। আরও দেখা গেল ঐ সব মৃৎপাত্রগুলি মধ্যপ্রদেশের মহেশ্বর ও নবদাতোলি অঞ্চলের মৃৎপাত্রের সমসাময়িক। এদের বয়স হল—২১০০—১৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। অর্থাৎ নরসিংহবাদ ও ভনপুরের গুহাচিত্রগুলিও ঐ সময়েই আঁকা হয়েছিল। সেই প্রথম ভারতে গুহাচিত্রের বয়সকাল নির্ধারণ করা সম্ভব হল। এদেশে প্রথম গুহাচিত্র আবিষ্কার করেছিলেন আর্চিবল্ড কার্লাইল ও জে ককবার্ণ বারানসী ও এলাহাবাদের মাঝামাঝি মীরজাপুর জেলার গুহায় সেই ১৮৮০ সালে। পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশের মহাদেব পর্বতমালার গুহাগুলিতে যে সব গুহাচিত্রগুলি তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলিকে শুধুমাত্র শিল্প-আঙ্গিকের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যস্ত করার চেষ্টা করার ফলে তাঁরা খুব আশাপ্রদ ফললাভ করতে পারেননি। যাই হোক, নরসিংহবাদ ও ভনপুরের গুহাচিত্রগুলির সঙ্গে মালব উপত্যকার মৃৎপাত্রগুলির গায়ে আঁকা ছবিগুলির মিল দেখে মনে হয় তাম্রপ্রস্তর যুগে ঐসব গুহাগুলিতে যারা বাস করত তারা কাছাকাছি কৃষিজীবী সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। এই অনুমানের পক্ষে প্রমাণও পাওয়া গেল ঐ গুহাগুলিতে প্রাথমিক খনন কাজ চালিয়ে। সে গুলিতে গুহাবাসীদের শিকার করার হাতিয়ারগুলির সঙ্গে পাওয়া গেল কাছাকাছি কৃষিজীবী সভ্যতার মৃৎপাত্র, তামার তৈরী তৈজসপত্র। অনুমান করা যেতে পারে গুহাবাসীরা শিকার সংগ্রহ ক'রে যে সব জিনিসপত্র জোগাড় করত (যেমন, পশুর চামড়া, মধু, ফলমূল ইত্যাদি) তারই কিছুটা অংশ তারা বিনিময় করত নিকটবর্তী কৃষিজীবীদের মৃৎপাত্র ও তৈজসপত্রের সঙ্গে। ঐসব মৃৎপাত্রে যে সব ছবি এবং কৃষিজীবীদের যে সব আচার-অনুষ্ঠান তারা দেখত সেগুলিকে এঁকে রাখত গুহার দেওয়ালে।

কিন্তু ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটতে তখনও বাকি ছিল। সেটি ঘটল ১৯৭৫ সালে। ঐ বছর মধ্যপ্রদেশেরই ভিমবেতকায় ডঃ বাকঙ্কর আবিষ্কার করলেন সাতশটিরও বেশী প্রাকৃতিক গুহা যাদের মধ্যে প্রায় পাঁচশটিতে রয়েছে অসংখ্য প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র। ইতোপূর্বে পৃথিবীর আর কোন দেশে এত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের সমাবেশ দেখা যায়নি। এ ছাড়াও ভিমবেতকায় রয়েছে আরও দুটি বৈশিষ্ট্য। এখানে একটি গুহায় পাওয়া গিয়েছে শেষ পুরা প্রস্তর যুগের ১ (প্রায় বিশ হাজার বছর আগের) মানুষের মাথার খুলি। ভারতে এটিই ফসিল মানুষের প্রথম নিদর্শন। এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে 'হোমো স্যাপিয়েন্স ভিমবেতিয়ান'। এখানকার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল গুহাগুলিতে আদি পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির ধারা দেখতে পাওয়া যায়। তবে ভিমবেতকার গুহাচিত্রগুলির কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশই পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ ভাগের শুরুতে অর্থাৎ ত্রিশ হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে আঁকা এবং এক হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দের পর গুহাগুলিতে আর মানুষ বাস করত না।

ভিমবেতকার গুহাচিত্রগুলির বিষয়বস্তু কি ছিল সেই আলোচনা করার আগে ইওরোপীয় উচ্চ প্রত্নপ্রস্তর যুগের Upper Palaeolithic age গুহাচিত্র সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা সেরে নিলে বিষয়টি বোঝার পক্ষে সুবিধা হবে।

ইওরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্স ও স্পেনে ঐ যুগের যে সব গুহাচিত্রগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেগুলির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ছিল শিকারমূলক জাদুবিদ্যা (History of Mankind, Cultural and Scientific Development, Vol. 1. Unesco Publication

পৃঃ ২০৫, The Old Stone Age, Mfles Burkitt, পৃঃ ১৮৪ দ্রষ্টব্য)।

সে যুগে মানুষ বাস করত ছোট ছোট উপজাতিতে (tribe) ভাগ হয়ে। কয়েকটি কোম (Clan) মিলে গড়ে উঠত এক একটি উপজাতি। প্রতিটি উপজাতি থাকত যৌথভাবে। তাদের জীবিকা প্রধানতঃ ছিল শিকার করা। উপজাতির প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব স্বার্থ বলতে কিছু ছিল না, ব্যক্তি সত্বা বিলীন হয়ে থাকত যৌথ সত্বার মধ্যে। দলবদ্ধ শিকার থেকে পাওয়া খাদ্য তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিত ২। স্বাভাবিকভাবেই শিকার সুলভ হওয়া এবং পশুর বংশ বৃদ্ধির ওপরই নির্ভর করত উপজাতিগুলির জীবনধারণের প্রশ্ন।

কিন্তু সেই যুগে আদিম মানুষের কলাকৌশল (technique) ছিল নিতান্তই অনুন্নত, প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানও ছিল খুবই সামান্য। তাই শিকারে সফল হওয়ার জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল কোন অতিরিক্ত উদ্দীপনার. প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্যে অর্থাৎ পশুর বংশবৃদ্ধি ঘটাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল কোন এক ধবণের কাল্পনিক কলাকৌশলের। অর্থাৎ বাস্তব কলাকৌশলের ঘাটতি পূরণের জন্যে তারা কাল্পনিক কলাকৌশলের আশ্রয় নিত। এই কাল্পনিক কলাকৌশলই হল জাদু। এই জাদু ঐসব ছবি দেখে শিকারীরা নিজেদের শিকারে উৎসাহিত করত। সেই আদিম যুগেও মানুষের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু সেই অলৌকিক শক্তি ছিল পশু ও মানুষের সম্মিলিত গুন-সম্পন্ন এবং আদিম মানুষেরা ভাবত ঐ অলৌকিক শক্তিও জাদু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পশুর প্রজনন বাড়াবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা

চিত্র (ক)
ফ্রান্সের নিঅস্ক গুহায় বাইসনের ছবিতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছেঃ চোখে ফুটেছে যন্ত্রণার অনুভূতি

চিত্র (খ)
ফ্রান্সের লেট্রফ্রেরে গুহার অলৌকিক শক্তির চিত্র।

অনুষ্ঠান ছিল অনুকরণমূলক আদিম মানুষেরা ভাবত কোন একটি অনুষ্ঠানকে সঠিকভাবে অনুকরণ করতে পারলেই প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের অধীন হবে। শিকারে যাবার আগে দলবদ্ধ শিকার নৃত্যের মাধ্যমে তারা অতিরিক্ত উদ্দীপনা সংগ্রহ করত, বৃষ্টি না হলে মেঘের ডাকের নকল করে, আকাশে জল ছিটিয়ে তারা প্রকৃতিকে বৃষ্টি দিতে বাধ্য করবে বলে মনে করত। এইসব উদ্দেশ্য নিয়েই সে যুগের শিল্পীরা আঁকত তীরবিদ্ধ পশুর ছবি। কখনও তারা পশুর ছবিতে আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি করত (চিত্র ক)। অলৌকিক শক্তির ছবিও আঁকত (চিত্র খ)। অর্থাৎ আদিম সমাজে ছবি আঁকার একটা সামাজিক উপযোগিতা ছিল। সে যুগে তাই শিল্পীরা প্রকৃত অর্থে শিল্পী হলেও ছবি আঁকার পিছনে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণার থেকে তাদের কাছে সামাজিক দায়িত্বই ছিল প্রধান। প্রতিটি শিল্পীই ছিল কোন না কোন উপজাতির সদস্য। কিন্তু ছবি আঁকার জন্যে নিশ্চয় তারা শিকার করা অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিল তা না হলে ছবি আঁকার পিছনে তাদের পক্ষে অত সময় ব্যয় করা

সম্ভব হত না। অতএব অনুমান করা চলে যে ছবি আঁকার জন্যে শিল্পীদের খাদ্য সংগ্রহের মত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হত সে ছবির সামাজিক উপযোগিতা ছিল অপরিসীম। অর্থাৎ ছবি আঁকাই ছিল শিল্পীর সামাজিক অর্থনৈতিক দায়িত্ব এবং উপজাতীয় সমাজের সদস্য হিসেবে শিল্পীকে সে দায়িত্ব পালন করতে হত।

ইওরোপীয় প্রত্নপ্রস্তর যুগের ছবিগুলির আঙ্গিক এবং ছবি আঁকার জন্যে স্থান নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গিকে একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে উপরোক্ত ধারণাই আরও দৃঢ় হয়। ঐ সব ছবিগুলিতে জীবজন্তু ও মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকেই আঁকা হয়েছে, শিল্পী তার দেখা জন্তু বা মানুষের রেখাচিত্রই হাজির করতে চেয়েছেন, কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁকে শিল্পসুষমা সৃষ্টি করতে চাননি।

স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ গুহাগুলিতেই প্রবেশ করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং কোন কোন গুহায় (যেমন, ফ্রান্সের ফ'দ্যাগ', লাপাজিয়েগো প্রভৃতি) এত উঁচুতে ছবি আঁকা হয়েছে যে শিল্পীকে নিশ্চয় কোন সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। ফ্রান্সের নিঅক্স দেখা যায় গুহার প্রবেশ পথ থেকে প্রায় আটশ গজ দূরে ছবি আঁকার জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল, অথচ কাছাকাছি ছবি আঁকার উপযোগী অনেক দেওয়াল ছিল। এইসব দেখে মনে হয় সাধারণ মানুষকে দেখাবার জন্যে ঐ সব ছবি আঁকা হয়নি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধারণের সৃষ্টিসীমার বাইরে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই ছবিগুলি অত দুর্গম স্থানে আঁকা হয়েছিল। এই গোপনীয়তার পিছনে জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত অলৌকিকত্বের ধারণা থাকাটাই সম্ভব।

এবার ভিমবেতকার গুহাচিত্র প্রসঙ্গে আসা যাক। ভিমবেতকার গুহাগুলিতে দলবদ্ধ শিকারের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। দেখা যায় দলবদ্ধ নৃত্যের দৃশ্য। এগুলি গুহাবাসীদের যৌথ জীবনের পরিচয় দেয়। এই ধরণের নৃত্য এখনও আধুনিক ভারতের বহু উপজাতির মধ্যে দেখা যায়।

ভিমবেতকার গুহাবাসীদের জীবনে অলৌকিক জাদুশক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ছবি আঁকার জন্যে স্থান নির্বাচন এবং ছবিগুলির আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে। বহু গুহায় ছবিগুলি আঁকা হয়েছে অত্যন্ত দুর্গম স্থানে, ছবিগুলি প্রধানতঃই রেখাচিত্র এবং কোন কোন জীবজন্তুর ছবি বিশাল আকারে আঁকা হয়েছে (কোন কোনটি ৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু)। ঐ সব জীবজন্তুর ছবির মধ্যে কোন একধরণের অলৌকিক বিশেষত্ব সৃষ্টি করার জন্যেই ঐগুলি সাধারণ আকারের চেয়ে অত বড় করে আঁকা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ভিমবেতকার গুহাচিত্রগুলি অলৌকিক জাদুশক্তিকেই প্রকাশ করেছে। চিত্র (গ)তে দেখা যাচ্ছে অলৌকিক জাদুশক্তিকে আহ্বান করে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। চিত্র (ঘ)তে তিনটি অলৌকিক জাদুশক্তির প্রতীকদের ছবি আঁকা হয়েছে। চিত্র (ঙ)তে আঁকা হয়েছে একটি জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানের দৃশ্য। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি মানুষ পরস্পরের হাত ধরে নাচছে এবং একজন পুরোহিত জাদুকর তার দুপাশে দুটি জাদুশক্তির প্রতীককে জাগ্রত করছে। ঐ প্রতীক দুটির মধ্যে পরোহিতের ডানদিকেরটি নিঃসন্দেহে কৃষিমূলক জাদুশক্তির প্রতীক। ঐ ছবিটি দেখে মনে হয় ভিমবেতকার গুহাবাসীরা তাদের কাছাকাছি সমতলবাসী কোন উপজাতির মধ্যে ঐ রকম জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠান দেখেছিল এবং ঐ উপজাতিটি অন্ততঃ প্রাথমিক ধরনের কৃষি কাজ করত। আধুনিক ভারতে এখনও অনেক উপজাতি ঐ ধরণের কৃষিমূলক জাদুবিদ্যার অনুষ্ঠান করে এবং পরস্পরের হাত ধরে নৃত্য করা ঐ রকম অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ।।

চিত্র (গ)
ভিমবেতকায়
৬০,০০০-৩০,০০০ বছর আগে আঁকা মধ্য পুরা-প্রস্তর যুগের গুহাচিত্র।

চিত্র(ঘ)
ভিমবেতকায়
৩০,০০০-১০,০০০ বছর আগে আঁকা শেষ পুরা-প্রস্তর যুগের গুহাচিত্রঃ প্রত্যেকটিই অলৌকিক শক্তির প্রতীক।

ভিমবেতকার সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক গুহাচিত্রটির (চিত্র চ) কথা এখনও বলা হয়নি। এই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একটি অশ্বের ওপর বসে রয়েছে একজন পুরোহিত। অশ্বটির সামনে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুহাতে অস্ত্রধারী একটি মানুষ। এরা দুজনেই

চিত্র (ঙ)
ভিমবেতকায়
১০,০০০-৫০০০ বছর আগে আঁকা গুহাচিত্র।

চিত্র (চ)
ভিমবেতকায় তাম্রপ্রস্তর যুগের (৫,০০০-২,৫০০ বছর আগে) আঁকা গুহাচিত্রঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের (?)

নিঃসন্দেহে আর্য-পূর্ব কোন গোষ্ঠীর লোক ৩। অস্ত্রধারী মানুষটির ডানদিকে আঁকা রয়েছে স্বস্তিকা চিহ্ন। এই চিহ্নটি আজও হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। মানুষটির বাঁদিকে আঁকা রয়েছে পর্বতের প্রতীক। সবকিছু মিলিয়ে মনে হয় এটি সম্ভবতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের চিত্র।

এরকম একটি সিদ্ধান্তের কথা শুনে অনেকেরই হয়ত ভুরু কুঁচকে উঠতে পারে। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ বৈদিক আর্যদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু ঋগ্বেদের সাক্ষ্য (১/১৬২ ও ১/১৬৩) থেকেই দেখা যায় যে ঋগ্বেদের যুগেই অশ্বমেধযজ্ঞকে অতীত যুগের অনুষ্ঠান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া অশ্বমেধ ও অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে আদিম জাদু অনুষ্ঠানের অনেক স্মারকচিহ্ন টিঁকে ছিল এ মন্তব্য করেছেন কীথ তাঁর The Veda of the Black Yajus School (CXXXV, CXXXVI) এবং Religion and Philosophy of the Veda and Upanisads (পৃঃ ২৫৮-২৫৯) বই দুটিতে। ম্যাকডোনেলও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন Encyclopaedia of Religion and Ethics (8.312) বইটিতে।

অশ্বমেধযজ্ঞের সময় রাজার প্রধানা মহিষী যজ্ঞে বলি প্রদত্ত অশ্বটির পাশে শুয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতেন। সেই সময় হোত্রি ও প্রধানা মহিষীর মধ্যে, অন্যান্য মহিষী, তাদের পরিচারিকা ও অন্যান্য পুরোহিতদের মধ্যে অশ্লীল বাক্য বিনিময় হত। ঐ অশ্লীল বাক্যগুলি ছিল প্রধানতঃ বাজসনেয়ী সংহিতার বাইশ ও তেইশ অধ্যায়ের মন্ত্র। পৃথিবীর অন্যান্য আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও জাদুমূলক অনুষ্ঠানের সময় ঐরকম অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময় 'ব্রহ্মোদয়' নামে যে এক ধরণের হেঁয়ালী কাটা হত পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম উপজাতির মধ্যে জাদুমূলক অনুষ্ঠানের সময় ঐ ধরণের হেঁয়ালী কাটার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন ফ্রেজার তাঁর The Scapegoat (পৃঃ 208ff) বইটিতে। অর্থাৎ অশ্বমেধযজ্ঞের আদি রূপটি ছিল জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠান। আর্যদের আদিম সমাজেও অশ্ব ছিল গতি ও বীর্যের প্রতীক। সেই সমাজে আর্যনারী অশ্বের মত বীর্যবান সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষায় জাদু অনুষ্ঠানে নিহত অশ্বের সঙ্গে মিলিত হত। এটি স্পষ্টতই ছিল এক ধরণের উর্বরতামূলক জাদুবিদ্যা। পরবর্তীকালে ঋগ্বেদের যুগে রাজকীয় অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্যেও সেই আদিম জাদু অনুষ্ঠানের রেশ টিঁকে ছিল। বৈদিক আর্যরা মূলতঃ ছিল পশুপালক উপজাতি। পৃথিবীর অন্যান্য পশুপালক উপজাতির মধ্যেও এই রকম বা অন্য ধরণের উর্বরতামূলক জাদুবিদ্যার নিদর্শন পাওয়া যায় ৪। ভারতেও ভিমবেতকা গুহার কাছাকাছি সমতলবাসী কোনি আর্য-পূর্ব পশুপালক উপজাতির সমাজে গুহাবাসী শিল্পী সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ করেছিল অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর তাকেই সে গুহার দেওয়ালে অমর ক'রে রেখে গিয়েছে।

১ ইওরোপীয় প্রত্নপ্রস্তর পুরা প্রস্তর যুগকে (Palaeolithic or Old Stone Age) নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু ভারতীয় ও ইওরোপীয় প্রত্নপ্রস্তর যুগের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য থাকায় ১৯৬১ সালে দিল্লীতে এশীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় সেখানে ভারতীয় প্রত্নপ্রস্তর যুগকে আদি, মধ্য ও শেষ প্রস্তর যুগে ভাগ করা হয়েছে।

২ চার্লস ডারউইন তাঁর A Naturalist's Voyage Round the World (পৃঃ ২৪২) বইটিতে ফুজি দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে এক অমোঘ সমবণ্টনের নিয়মের কথা লিখেছেন। ব্রিফল্ট তাঁর The Mothers-এ (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪) বেইলি, পামার, ম্যাথুজ, রিডলি প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে সিংহলের আদিবাসী এবং অস্ট্রেলিয়ার শিকারজীবীদের মধ্যেও সমবণ্টনের নিয়ম ছিল। অস্ট্রেলিয়ার একদল শিকারজীবীর মধ্যে দেখা গেছে যে শুধু শিকার থেকে পাওয়া খাদ্যই নয়, উপহার হিসাবে পাওয়া সামান্যতম জিনিসও তারা সমান ভাগে ভাগ করে নিত।

৩ এই ছবিটি তাম্রপ্রস্তর যুগে আঁকা হয়েছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ ভারততত্ত্ববিদই মন্তব্য করেছেন যে আর্যরা ভারতে বহিরাগত এবং আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে এদেশে তারা ১৭৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের আগে আসেনি।

৪ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ষ্টুয়ার্ট পিগট তাঁর Pre-Historic India বইটিতে (পৃঃ ২৪৭) বলেছেন যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও আয়ার্ল্যাণ্ডের Altai-Turk দের মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। এরা অতীতে পশুপালক উপজাতি ছিল।

দরদী কথাশিল্পী ও দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র / সুকুমার দাস

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না। নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিনই ভেবে পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—ওরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।" মানবদরদী অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কোন কিছু ভাবতে গেলেই সবার আগে মনে হয় সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর এ সমবেদনার কথা। সমাজের অবিচার, অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেই তিনি যেন তাঁর লেখনীকে সচল করে রেখেছিলেন আজীবন। সাধারণ মানুষের অতি কাছ থেকে, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখকে সহানুভূতির সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেই তিনি তাদের কথা লিখেছিলেন। এতটুকু আতিশয্য ছিল না তাঁর ঐসব লেখার মধ্যে। সমাজের তথাকথিত নীচুস্তরের মানুষগুলির সাথে অকপটে মিশে যেতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সেকালের সমাজের ও ধর্মের কুসংস্কারের ভয়াবহ রূপকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। সমাজ ও ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামির উর্দ্ধে থেকে শুধুমাত্র মানুষকেই তিনি বড় করে দেখেছিলেন—উপলব্ধি করেছিলেন তাদের অন্তরাত্মার আশা আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ বেদনাকে। তাই অদৃষ্ট ও মূঢ়তার নাগপাশে বন্ধ মানুষগুলিকে তিনি সচেতন ও মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তখনকার সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা, "সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি; কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নর-নারীর বহু চিন্তা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে।" তিনি তাঁর নানা উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধে সমাজের ঐ উপদ্রবের বিরুদ্ধে নিরলস নালিশ জানিয়ে গেছেন বলেই সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আজ এত প্রিয়, এত মহান হয়ে উঠেছেন।

শরৎ সাহিত্যে সেকালের বাঙলার সমাজের যে ছবি নিখুঁত ভাবে ফুটে ওঠে তাতে দেখা যায় অসহায় গরীব সাধারণ মানুষগুলি সমাজের বহু অন্যায়, অবিচার আর নিষ্ঠুর বিধানের কাছে মাথা নত করে দুঃখকষ্টকে অদৃষ্টের বিধান বলে মেনে নিয়ে ক্লেশ ভোগ করতো—অথচ এগুলির অধিকাংশই মানুষের স্ব-স্বার্থে গড়া, একথা তারা একবারও বুঝতে চাইতো না বা বুঝলেও লাঞ্ছনার ভয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস করতো না। অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করেও ওরা ছিল জড় পুতুলের মত নীরব। অকুতোভয় শরৎচন্দ্র তাই তাদের মুখপাত্র হয়ে সেদিন সমাজের দরবারে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে নালিশ পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন মানুষকে সুখী করতে হলে, সমাজকে সুন্দর করতে হলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ, স্বার্থ প্রণোদিত জাতি-কুল-মান'এর বেড়াজালকে সমাজ দেহ থেকে অপসারিত করতেই হবে। এ কাজে কে তাঁকে সাহায্য করবে, কে করবে না—এ কথা না ভেবে একাই সে কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি একথা সঠিকভাবেই জানতেন, "পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না—একাকীই দাঁড়াতে

জন্ম : ১৫-৯-১৮৭৬ মৃত্যু : ১৬-১-১৯৩৮

হয়। এর জন্য দুঃখ আছে। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ একদিন সংঘবদ্ধ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়।...পাঁচজনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়—তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? আজ লোকে কথা শুনিতে না পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই।" মানব সমাজের কল্যাণে অপ্রিয় সত্যকে অকপটে প্রচার করেছিলেন বলেই শরৎচন্দ্র সেদিনকার বেদনাহত মূক মানুষগুলির অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন আর আজ আমাদের হয়ে আছেন বহু প্রেরণার উৎস।

শরৎ সাহিত্য চিরকাল পাঠক সমাজকে অভিভূত করবে, কারণ তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ভাবের সাথে পাঠক এক বিচিত্র অন্তরঙ্গতা অনুভব করে। এর কারণ এসব তাঁর স্ব-নির্ভর অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালা থেকে গ্রহণ করা। মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভিজ্ঞতার

আলোকেই সৃষ্ট তাঁর এসব গল্প উপন্যাসগুলি। তাই এগুলি অতি সহজেই মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। বহুর সাহচর্যেই মানুষের ভিতরকার আসল সত্তাটাকে জানা যায়, চেনা যায়—এটা তিনি ভোলেননি। তাঁর মতে, "জীবনে যে ভালবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকারের অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের মুখে ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে? নিজের জীবনটাই হল যার নীরস, বাংলাদেশে বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম জীবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দুদিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে।" শরৎচন্দ্র মানুষের হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন, তাই মানব জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর গল্প উপন্যাসে বিমূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে সংসারের নোংরা জিনিষটাকে এড়িয়ে বাস্তবের অভিজ্ঞতার সাথে আদর্শের মিলন ঘটিয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে রত ছিলেন বলেই শরৎ সাহিত্য শৈলী আজ এত প্রাণ স্পর্শী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বলতে দ্বিধা নেই যে শরৎচন্দ্রের চোখের পিছনে ছিল একটা দরদী হৃদয়, তাই যা তিনি দেখতেন তা' শুধু বুদ্ধির দেখা নয়, বুকের দরদ দিয়ে দেখা। সেই চোখ দিয়েই তিনি বাঙলার নারী সমাজকে দেখেছিলেন—এবং অনায়াসে তাদের হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। তিনি নারীজাতিকে নারীত্বের ন্যায্য মর্য্যাদা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজ যাদের কলঙ্কিনী বলে অপাংক্তেয় করে দিয়েছে, হৃদয়ের শুচিতায়, অনুভূতির গৌরবে তারাও অনন্য-সাধারণ হতে পারে। তিনি বলতে চেয়েছেন মেয়েরা যে শুধু সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে তাই নয় তাদের জীবনকে আরও বেশী বিড়ম্বিত ও দুর্বিসহ করেছে সমাজের চাপানো যুক্তিহীন নিস্করুণ সংস্কার। শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে লেখনীর সাহায্যে এর বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হেনেছেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মেয়েদের আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মেয়েদেরও যে একটা স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকতে পারে, তারাও যে মানুষ, শুধু মেয়ে নয়—ঐ কথা সেদিনের পুরুষ শাসিত সমাজ কোনদিনই ভাবতে পারেনি। শরৎ-চন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে যে নারী চরিত্রগলি সৃষ্টি করেছেন, তাতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন সমাজে মেয়েদেরও একটা পৃথক অস্তিত্ব ও অধিকার আছে—তাদেরও আছে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অরুচি। পুরুষের নির্দয় ব্যবহারে সমাজ পরিত্যক্ত লাঞ্ছিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমত্ব ও করুণা। তাঁর কাছে নারীর নারীত্বই বড়—সতীত্বই সবকিছু নয়। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির মধ্যে তাই তিনি দেখিয়েছেন অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব সতীত্বে ও নারীত্বের, ন্যায়-অন্যায়ের, ধর্ম ও অধর্মের। তাঁর সৃষ্ট অচলা, সবিতা, অন্নদাদিদি, নিরুদিদি, মাধবী, কমল, নীলিমা, রমা, কিরণময়ী ও সুরমা—এরা কেউ কোন না কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নয়। মেয়েদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল শরৎচন্দ্রের সহজাত। তাই তাঁর কোমল অন্তর সর্বদাই তাদের বিড়ম্বিত জীবনের জন্য মমতায় ছটফট করতো।

মানুষের মধ্যে তিনি দেবতার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন বলেই তিনি পাপীকে নয় পাপকেই ঘৃণা করেছেন। শরৎচন্দ্রের চরিত্রের অভিজ্ঞ উদার অন্তরে পদস্খলিত উদ্‌ভ্রান্ত নর-নারীর জন্য ছিল তাঁর অসীম সহানুভূতি। চরিত্রহীনের মধ্যেও যে মহত্ব থাকা সম্ভব তিনি তাই বারবার তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবন স্থায়ী হয়েছিল পঁচিশ বছর। এর যখন শুরু তখন বাঙলার সাহিত্যা-কাশে রবি সূর্য মধ্যপথে। সেই প্রখর রবি কিরণছটার মধ্যেই শরৎচন্দ্র যেন ছিটকিয়ে এলন অত্যুজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্কের মত এবং অনায়াসেই জয় করে নিলেন বাঙলার হৃদয়। সে যে কত কঠিন কাজ—তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁর প্রথম উপনাস "বড়দিদি" যখন ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল সেদিনই বাঙলার পাঠক সমাজ তাঁকে এক বিরাট প্রতিভাবান লেখক বলে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। "বড়দিদি" উপন্যাসটি পড়ে রবীন্দ্রনাথও সেদিন তাঁর তারিফ করে তাঁকে একজন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অসামান্য লেখক বলেই মন্তব্য করেছিলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হ'ল তাঁর অন্যান্য উপন্যাস বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, দেবদাস, চরিত্রহীন, দত্তা, গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, দেনা পাওনা, নববিধান, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন, বিপ্রদাস, শুভদা ও শেষের পরিচয় (অসম্পূর্ণ)। এরই সাথে সাথে তিনি লিখলেন বিখ্যাত গল্পগুলি যেমন বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, মেজদিদি, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, নিস্কৃতি, কাশীনাথ, স্বামী, ছবি, হরিলক্ষ্মী, অনুরাধা ও সতী। বাঙলার সাহিত্যাকাশে স্ব-প্রতিভায় শরৎচন্দ্র তখন এক অসাধারণ কথাশিল্পী। বাঙলার ঘরে ঘরে তাঁর গল্প উপন্যাসের কি সমাদর ও প্রশংসা।

রবীন্দ্রনাথের যুগেও শরৎসাহিত্য এত সহজেই পাঠক চিত্ত জয় করে নিলো কেমন করে? কেন সমাদৃত হল তাঁর গল্প উপন্যাস বাঙলার ঘরে ঘরে? এর উত্তরে বলা যায় যে শরৎসাহিত্যে ছিল এক অদৃশ্য যাদুর আকর্ষণ—যা পাঠক সমাজকে সেদিন সহজেই প্রভাবিত করেছিল। শরৎচন্দ্রের দরদী লেখনীর যাদু স্পর্শেই তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী। আসলে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি জীবনে একটা বেদনাসিক্ত অভিমান সতত প্রবহমান ছিল, এ বেদনা বা অভিমান তাঁর একান্তই নিজস্ব ছিল। এখানে তিনি কাউকে প্রবেশ করতে দেন নি, অংশ দিতে চাননি। আপন জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত এই বেদনাই তাঁর সাহিত্যকে মর্মস্পর্শী করে তুলতে সাহায্য করেছে। অল্প বয়স থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বনায় নানা কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে এক অনিশ্চিত জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল তাঁকে—আর সেই চলারপথের বিচিত্র সঞ্চয়ই কালক্রমে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে সাহিত্যের অমূল্য রত্ন হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্র আপন সাধনার প্রভাবেই মানবজীবনের গহন

গভীরের অজ্ঞাত জিনিষগুলিকে আহরণ করে এনে সাহিত্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত করেছিলেন। ছেলেবেলা থেকে নানা দিক দিয়ে বঞ্চিত না হলে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনায় জর্জরিত না হলে আমরা তাঁর কাছ থেকে এ হার্দ্য-সাহিত্য পেতাম কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিন্তু শরৎসাহিত্য কি 'বাস্তব' সাহিত্য, না ওটা 'রোমাণ্টিক' সাহিত্য? সাহিত্য সমালোচকেরা আজ তার জাত বিচারে হাবুডুবু খাচ্ছে। এর কোনটাই কিন্তু আসলে এককভাবে ঠিক নয়, কারণ শুধু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সত্যানুসরণে সাহিত্য রচিত হলেই তা' বাস্তব সাহিত্য হয় না। হতে পারে সেটা মানব জীবনের ও সমাজের একটা নিখুঁত 'স্থিরছবি' মাত্র। আবার নর-নারীর পূর্ব রাগ-প্রেম-বিরহ মিলনাদি হৃদয় ঘটিত কারবার নিয়ে রম্য রচনা, সেটাও বাস্তবিক পক্ষে রোমাণ্টিক সাহিত্য হতে পারে না। তাই বস্ত তান্ত্রিকেরা তাঁর সাহিত্যকে বলছে 'বাস্তব সাহিত্য' আর কল্পনাপ্রবণ পাঠকেরা এর মধ্যে রোমান্সের আস্বাদ পেয়ে একে বলছে 'রোমাণ্টিক সাহিত্য'। দ্বন্দ্বের শেষ এখানেই নয়। কেউ কেউ তাঁর বিভিন্নমুখী রচনার জন্য তাঁকে বলতে চেয়েছেন বিপ্লবী সাহিত্যিক। কেউবা বিদ্রোহী সমাজ সংস্কারক. আবার বিকৃতরুচির সমালোচকেরা—যারা শরৎ সাহিত্যের ভেতরই প্রবেশের চেষ্টা করেনি, তারা একে দুর্নীতির সহায়ক অশ্লীল সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। ওদের মতে এঁর সাহিত্যে কোন আদর্শ ও মতবাদ নেই। এতে সমস্যা আছে, অথচ সমাধানের সূত্র নেই। আসলে শরৎচন্দ্র যে সেকালের রক্ষণশীলতাকে কাটিয়ে সমাজের সমস্যা সমাধানর সঠিক পথকে নির্দেশ করতে পারেনি—একথা অনেকাংশে সত্য। পুরুষ চরিত্রের দুর্বলতার সমালোচনায় তিনি যতটা সোচ্চার ছিলেন, মেয়েদের আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেও তাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হতে অনুপ্রাণিত করেননি। তবে আর যে যাই বলুক না কেন একথা একমাত্র অর্বাচীনেই বলবে যে তাঁর সাহিত্য-দুর্নীতির সহায়ক এবং অশ্লীল। সমালোচকেরা তাঁর সাহিত্যকে যে ভাবেই গ্রহণ করুক, পাঠক সমাজের কাছে তাঁর লেখা মনোগ্রাহী অভিনব সৃষ্টি হয়েই অক্ষয় সমাদর লাভ করবে—এবং তা করবে এই জন্য যে শরৎসাহিত্যের চরিত্রগুলির মধ্যে তারা তাদের নিজেদের প্রাণস্পন্দন অনুভব করে। ওদের সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, প্রেম-বিরহ তাদের মনকেও আলোড়িত করে।

শরৎসাহিত্য নিয়ে আজকালকার সমালোচকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে শরৎ সংবর্ধনার এক সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কিছু বক্তব্য এখানে উধৃত করা উচিত বলে মনে করি। শরৎ সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেছিলেন, "সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মম, তার কাছ যা' পেয়েছে, তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্বে যা ভোগ করেছে, তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দান কেটে নেয়, আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রস তৃপ্তির প্রমাণ ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে। নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, সুখস্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে, তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী, এক যা তাও অনেক। ...জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া নানা কক্ষপথে যেগুলি নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙ্গালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙ্গালী আপনাকে যাতে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তাদের অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরাও অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষা-ভাজন।...সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তা শক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনা শক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করুন—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন।"

দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাঙ্গলা সাহিত্যে এই অক্ষয় অবদানই কেবল তাঁর জীবন-পরিচয় নয়। তিনি শুধু একজন লেখকই ছিলেন না, জীবনে নানা বিচিত্র ও দুর্গম পথের তিনি পথিক ছিলেন। অতি সহজ ও সাধারণভাবেই জীবন যাপন করতেন তিনি। কথাবার্তায় আচার-আচরণে কৃত্রিম গাম্ভীর্য তো তাঁর ছিলই না বরং সর্বদা মানুষ শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন ঢিলেঢালা পরিহাস প্রিয় উদার-মানুষ। তাঁর সান্নিধ্যে যারাই এসেছিলেন তারাই বুঝেছিলেন তাঁর কোমল চরিত্র মাধুর্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন দয়ালু। মানুষের দুঃখেই শুধু নয় ইতরপ্রাণীর কষ্টেও তাঁর প্রাণ কাঁদতো—ওদের তিনি ভালবাসতেন, সেবা করতেন। অমিত প্রতিভাধর এ কথা শিল্পীর কর্মবহুল জীবনের সমগ্র দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে করা যাবে না এবং করার ইচ্ছেও আমার নেই। আজকের এই প্রবন্ধে তাঁর বহুমুখী জীবনধারার একটি উল্লেখ-যোগ্য দিক সম্পর্কে আর একটু আলোকপাত করেই এর সমাপ্তি টানবো।

সে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল যে, শরৎচন্দ্র সাহিত্য-অঙ্গিনার বাহিরে ছিলেন একজন যথার্থ দেশ প্রেমিক। পরাধীন ভারতের মুক্তিচিন্তা তাঁর লেখনীকে বারবার থামিয়ে দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী যখন অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়, শরৎচন্দ্র তখন কলম ছেড়ে সেই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে মতের মিল তাঁর বেশী দিন ছিল না।

তিনি বুঝেছিলেন 'চরকা' আর অহিংসাই শৃঙ্খল মুক্তির পথ নয়। কিন্তু সেজন্যে মহাত্মাজীর প্রতি তিনি কোনদিনই শ্রদ্ধা হারাননি। তিনি দেশবন্ধুর রাজনৈতিক পরিকল্পনার ছিলেন প্রবল সমর্থক। সর্বত্যাগী এই মানুষটির প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অপরিসীম সহানুভূতি। কংগ্রেসের একটা বিরাট অংশ যখন দেশবন্ধুর বিরোধী, শরৎচন্দ্র তখন ছিলেন তাঁরই পাশে। তিনি তাঁকে সাহস দিয়েছেন—দিয়েছেন কর্তব্য সাধনে একলা চলার প্রেরণা। ১৯২৫ সালের ১৬ই মে যখন দেশবন্ধু দার্জিলিঙে দেহ রাখেন, দেশবাসীর সেদিনের কান্না দেখে তিনি পরে লিখেছিলেন, "মনে হয় পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি সংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াই-এর প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু শেষ হইল না। দেশবন্ধু দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে-বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না। আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এতবড় কান্নারই প্রয়োজন ছিল।"

১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র জেল থেকে মুক্তি পেলেন। কিছুদিন পরেই বাঙলায় কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিল দলাদলি। দুটি দলে বিভক্ত হলেন দলের সকলে। এক দলের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অপর দলের নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র রইলেন সুভাষচন্দ্রের দলে শরৎচন্দ্র চিরদিন হৃদয় দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে ভাল বেসেছিলেন। তিনি বলতেন, "সবাইকে ছাড়তে পারি, সুভাষকে না।" তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন কয়েক বছর। দলের মধ্যে বিবাদের জন্য একবার হাওড়া জেলার এক কর্মী সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি জেনে শরৎচন্দ্র উদ্যোক্তাদের সরাসরি বলেছিলেন, "যেখানে সুভাষ আমন্ত্রিত নয়, সে শিবহীন যজ্ঞে আমি যাবো না।"

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হলেও শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের যথেষ্ট স্নেহ করতেন। এমনকি দেশের মুক্তির জন্য সহিংস সংগ্রামকে সমর্থন করতেন। বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এলেই তিনি তাদের বিপ্লবের কাহিনী মন দিয়ে শুনতেন। একদিন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের কাছে অবাক বিস্ময়ে বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের কথা শুনে এবং পেডি হত্যার কথা শুনে তিনি তাঁকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র বলেছিলেন, "ইংরেজ নিধনের ব্যাপারে টাকার তেমন দরকারই হয় না। যেটুকু হয়, তা' আমরা নিজেরাই চালিয়ে নি।" একথা শুনে খুসী হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। এরপর তিনি তাঁকে তাঁর রিভালবারটি দিতে চাইলেন। হেমচন্দ্র বলেছিলেন, "দাদা, রিভালবার আমাদের অনেক আছে—আমাদের অভাব গুলির। কিছু গুলি দিন।" শুনে শরৎচন্দ্র বেশ কিছু গুলি তখন তাঁকে দিয়ে দিলেন। পরে আরো অনেকবার ঐ রকম গুলি তিনি বিপ্লবীদের দিয়েছিলেন এবং ইংরেজ নিধনে তার ব্যবহারও হয়েছিল। এইসব বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেই শরৎচন্দ্র "পথের দাবী" লিখেছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের রোষানলে তা' সেদিন বাজেয়াপ্তও হয়েছিল। সেদিন তাঁর নির্ঘাৎ কয়েদ বাস হতো যদি না পাবলিক প্রসিকিউটার স্যার তারকনাথ সাধু তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যেতেন। বিপ্লবীদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "ওদের সঙ্গে আমার রক্তের পরিচয়, জন্মান্তরের আত্মীয়তা—ওদের সাহায্য করেই আমি ধন্য হতে চাই, কিন্তু তা' পারি কই?"

মহান এ কথা শিল্পীর জন্ম হয়েছিল ১৮৭৬-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলীর দেবানন্দপুরে। ৬১ বছরের কিছু বেশী কাল জীবিত থেকে ১৯৩৮-এর ১৬ই জানুয়ারী কলকাতায় দুরারোগ্য ক্যান্সারে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।

খুব সংক্ষেপে এই তো দরদী কথাশিল্পীর জীবন-কথা। সাহিত্য জীবনে তিনি যেমন অর্জন করেছিলেন আপামর জনগণের অসীম শ্রদ্ধা আর ব্যক্তিজীবনে পেয়েছিলেন বহু জ্ঞানীগুণীর সাহচর্য ও ভালবাসা। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন,

> "যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
> ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
> দেশের মাটির থেকে নিল তারে হরি
> দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে মহান নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "যতদিন বাঙ্গলা ভাষা থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালির সুখ-দুঃখের সাথী শরৎচন্দ্রকে কেহ ভুলিতে পারিবে না। সাহিত্য জগতে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় কল্প কথার মতই বিস্ময়কর।"

তাঁর মহাপ্রয়াণে ব্যাথাহত চিত্তে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্য গগন হতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়লো। যদিও বহু বর্ষ তাঁর নাম বাঙ্গলার ঘরে ঘরেই শুধু পরিচিত ছিল, তথাপি ভারতের সাহিত্য জগতেও তিনি কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়।"

জুলিয়াস ফুচিক / প্রবীর মিত্র

স্বৈরাচারী জল্লাদের হাতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে মানুষ মাথা উঁচু করে বলতে পারে—বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। আমরা মরবো কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারীরা এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের অসমাপ্ত কাজ। যে মানুষ মৃত্যু দন্ডাদেশ শোনার পর সকলের সাথে গান গায়, মুক্তির গান—তারই নাম জুলিয়াস ফুচিক। খেটে খাওয়া মানুষ, বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রামের প্রতীক জুলিয়াস ফুচিক। ফুচিক জন্ম গ্রহণ করেন ১৯০৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী, চেকোশ্লাভাকিয়ার স্মিচিভে। বাবা ছিলেন শ্রমিক। ফুচিক আঠার বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন। চার বছর আগে রুশ দেশে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিপ্লব হয়ে গেছে। শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটেছে। শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র, প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ জন্ম লাভ করেছে। দেশে দেশে শাসক শোষক-শ্রেণীর ভীষণ-অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানা পথে রুষ বিপ্লবের কথা পেঁাছে যায় পৃথিবীর নানা প্রান্তে সারা পৃথিবী জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে, শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। চেক দেশেও গণ-আন্দোলনে, ছাত্র আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করল রুশ বিপ্লবের বার্তা। রুশ বিপ্লবের এক বছরের মধ্যেই চেক আর শ্লোভাক জনগণের শতাব্দী-ব্যাপী আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির সংগ্রামের ফসল ফলল। জন্ম নিল চেকোশ্লাভাকিয়া। জাতীয় সরকার দায়িত্ব নিল কিন্তু মানুষের দুঃখ-অবমাননার অবসান ঘটল না। রুশ বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহী খেটে-খাওয়া মানুষ নতুনতর স্তরে সংগ্রাম শুরু করল। ১৯২১ সালে জন্ম নিল চেকোশ্লাভাকিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি। ঠিক এমনি সময়ে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফুচিক রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের একটি বড় কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জুলিয়াস ফুচিক হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয় ছাত্র নেতা—জুলা। এ সময়ে অনুষ্ঠিত সবকটি ছাত্র আন্দোলনে ফুচিক ছিলেন প্রথম সারিতে। তখনকার দিনে রুশ বিপ্লবের কথা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা ইউরোপের অন্য দেশগুলিতে প্রচার করতে দেওয়া হত না। এতদসত্ত্বেও তিনি দুর্লভ বইপত্র সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পড়াশুনা করতে লাগলেন। যতই পড়েন ততই পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—সোভিয়েত রাশিয়া, সে দেশের আদর্শ আর রুশ বিপ্লবের মহান নেতৃত্ব বিশেষ করে লেনিনের প্রতি তার শ্রদ্ধা, ভালবাসা আগ্রহ বাড়তে থাকল। এই ভাবেই জুলিয়াস ফুচিক হয়ে উঠলেন একজন খাঁটি কমিউনিস্ট।

তখনকার রুশ দেশ—সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর, খেটে-খাওয়া মানুষের পিতৃভূমি, মুক্তির দেশ। অনেকদিন ধরেই সে দেশ দেখার সাধ ছিল ফুচিকের। ১৯৩০ সালে বহু আকাঙ্খিত সে সুযোগ এল। পেশায় তিনি তখন ছিলেন শ্রমিক। রুশ দেশের কিরঘিজ শ্রমিক ইউনিয়ন তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল চেক সরকারের পুলিশ। ফলে ভিন্ন কৌশলে তিনি রুশ দেশে পেঁাছলেন। অভূতপূর্ব সে দেশ—ফুচিকের স্বপ্ন! অপূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সে দেশের সাধারণ মানুষ। তিনি অভিভূত হলেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন।

ছোট বেলা থেকেই ফুচিক ছিলেন শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে অনুরাগী। তাঁর পরিবারেও এ সবের চর্চা ছিল, তাঁর বাবা কারখানায় কাজ করার সাথে সাথে অভিনয় ও সঙ্গীতকেও জীবনের অঙ্গ হিসাবে নিয়েছিলেন। অল্প বয়সেই ফুচিক সুলেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তাঁর বহু লেখা বামপন্থী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৯ সালে তিনি 'ভোরবা' নামে একটি পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। ৩০ সালে রুশ দেশ থেকে ফিরে আসার পর তিনি চেক কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'রুদে প্রভো'র প্রধান সম্পাদক হন। বিপ্লবী সাংবাদিকতাই হয়ে উঠল তার জীবনের মূল পেশা, এক বছরের মধ্যে লিখলেন অসংখ্য সম্পাদকীয়। বক্তৃতা দিলেন সারা দেশ জুড়ে। দেশের মানুষের কাছে বর্ণনা করলেন রুশ দেশের সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

তৎকালীন বুর্জোয়া চেক সরকারের বিষ নজরে পড়লেন ফুচিক। ৩১ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। জেলে বসে তিনি লিখলেন রুশ দেশ সম্পর্কে এক অপূর্ব গ্রন্থ—'সেই দেশ যেখানে আমাদের আগামী কাল ইতিমধ্যে বিগত।' চার মাস পরে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। ৩৪ সালে ফুচিক আরও একবার রাশিয়া ভ্রমণ করেন। এবারও তিনি রাশিয়া সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে ইউরোপে। স্পেনে গণতান্ত্রী সরকারের অন্যায় ভাবে পতন ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ত-স্বৈরাচারী ফ্রাঙ্কো ক্ষমতা দখল করেছে। ইটালী, জার্মানীতে ফ্যাসিস্ত সরকার। হিটলারের জার্মান নাৎসী বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করেছে। থাবা বাড়াচ্ছে চেকোশ্লাভাকিয়ার সুদেতিনল্যাণ্ডের দিকে। হিটলার প্রচার করতে শুরু করল—প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর শান্তি চুক্তির কৃত্রিম সৃষ্টি নাকি চেকো-শ্লাভাকিয়া। আসলে এখানে জার্মান জনগণই নাকি বেশী। ৩৮ সালে সম্পাদিত হল ভয়ঙ্কর মিউনিখ চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমেই হিটলার সুদেতিনল্যাণ্ড, প্রাগ এবং অবশিষ্ট চেক ভূমি দখল করল।

এই নির্লজ্জ চুক্তির বিরুদ্ধে সারা ইউরোপের মানুষ ঘৃণায় ফেটে পড়েছিল। ফুচিক এই চুক্তির বিরুদ্ধে লিখেছিলেনঃ আমাদের জনগণকে বিক্রি করে দেওয়া হলেও তাদের আত্মচেতনাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া এত সহজ নয়। বৈধভাবে সংবাদপত্রে এটাই তাঁর শেষ লেখা। এরপর সমস্ত কমিউনিস্ট পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করা হল। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নেমে আসে প্রচণ্ডতম আক্রমণ। পার্টি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

৩৯ সালে হিটলার কর্তৃক চেক ভূমি দখলের পর সারা দেশে বুদ্ধিজীবীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ফ্যাসীবাদের সপক্ষে টানার চেষ্টা চলে। ফুচিকের কাছেও এল এমন এক প্রস্তাব। হিটলারের সমর্থক 'চেস্কি দেলনিক' পত্রিকার পক্ষ থেকে 'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিভাগের দায়িত্ব নেবার জন্য ফুচিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক চিঠি এল। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে ফুচিক উত্তর দিলেনঃ আমি যা লিখতে চাই, তা আপনার পত্রিকায় ছাপা সম্ভব নয়, আর আপনি যা ছাপতে চান তা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।

গেস্টাপো বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় হানা দিল। কিন্তু পেল না। আত্মগোপন করে পার্টির কাজ আর লেখা চালাতে লাগলেন। তখন পার্টির সামনে প্রধান কাজ ছিল ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলা। ৪১ সালে আত্মগোপন অবস্থাতেই তিনি পার্টির সর্বোচ্চ সম্মান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় তাঁর লেখাগুলি গোপন পত্রপত্রিকা মারফৎ শুধু চেকোশ্লাভাকিয়া নয় তুরস্ক, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, রুমানিয়া এমন কি শত্রু শিবিরের মধ্যে পর্যন্ত প্রচারিত হত। ৪১ সালের ২২ জুন হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করল। সন্ধ্যা বেলাতেই ইস্তাহার প্রচার করলেন ফুচিক—'চেকবাসীকে হুসিয়ার।'

এইভাবেই জুলিয়াস ফুচিক আর তাঁর পার্টি দেশের মানুষকে ফ্যাসী বিরোধী, স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করতে, নেতৃত্ব দিতে আত্মগোপন করে কাজ চালাতে থাকেন। গোপন ভাবেই প্রকাশিত হতে থাকল 'রুদে প্রভো'। এই সময় তিনি একটি বই লেখেন নাম—'গ্রানাডেসেক' (খুদে বাঁশী)। এই বইতে চেক কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তার গর্ববোধ, শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। সাথে সাথে তীব্র ঘৃণা আর বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে শত্রুদের প্রতি।

৪২ সালে ২৯ এপ্রিল ফুচিক গেস্টাপোদের হাতে ধরা পড়লেন। চারশ এগারদিন প্রাগের প্যানক্রাটস গেস্টাপো বন্দী শালায় বন্দী থাকার পর তাঁকে আনা হয় বার্লিনের নাৎসী বিচারালয়ে। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল ৪৩ সালের ২৫ আগস্ট। ফাঁসী হল ৮ সেপ্টেম্বরের বিষণ্ণ সকালে। কিন্তু সেই বিরাট হৃদয়ের স্পন্দন ফ্যাসিস্তরা বন্ধ করতে পারল না। ছড়িয়ে পড়ল কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে।

গেস্টাপোরা ফুচিকের স্ত্রী অগাস্তিনাকেও রেহাই দেয়নি। তাঁকেও গেস্টাপোদের কারাগারে ভোগ করতে হয় অকথ্য নির্যাতন। ৪৫ সালে হিটলার পরাজয়ের পর তিনি মুক্তি পান। তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের কাছে লেখা চিঠি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

জুলিয়াস ফুচিক ছিলেন একজন খাঁটি কমিউনিস্ট। চল্লিশ বছরের জীবনে কখনও মাথা নত করেননি। মানুষের প্রতি এক বুক ভালবাসা, বিশ্বাস আর স্বদেশের প্রতি নিষ্ঠাবান মানুষটি জীবনে কখনো হতাশ হয়নি। জীবনের শেষ ক'দিন একজন সহৃদয় জেলরক্ষীর সহায়তায় কিছু কাগজ আর পেন্সিল জোগাড় করে লেখেন নানা অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার কথা। আত্মবিশ্বাস আর আশায় ভরা সে সমস্ত লেখা। তিনি বিশ্বাস করতেন ফ্যাসীবাদ একদিন পরাজিত হবেই। তাঁর সে অমূল্য সম্পদ লেখাগুলো সংগ্রহ করে তার মৃত্যুর পর 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' নামে একটি বই বার করা হয়। বইটির শেষ লাইন হল—সম্প্রগণ, তোমাদের আমি ভালবাসতাম। হুঁসিয়ার থেকো। এই বইটি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ এই বইটি এবং তার লেখক সম্পর্কে পরিচিত।

অফুরন্ত প্রাণের জোয়ার, এই মানুষটির জীবনের শেষ কদিনের কথা তার সহবন্দীদের কাছ থেকে জানা যায়। মৃত্যু আদেশ পাবার পর আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেনঃ 'আমি জানতাম আমাকে অভিযুক্ত করা হবে। কিন্তু আমাদের জয়ের সপক্ষে যা কিছু করণীয় তা আমি সম্পন্ন করেছি এবং বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। আমরা মরবো কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারীরা চালিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের অসমাপ্ত কাজ।' আদালত থেকে কারাকক্ষে ফিরে লিডা প্লাচাকে বলেছিলেন একটা গান শোনাতে। মুক্তির গান, সংগ্রামের গান—সব বন্দীরা তাতে সুর মেলাল। ফুচিকের বন্দী অবস্থায় রুশ লাল ফৌজের হাতে ফ্যাসিস্ত হিটলারের পরাজয়ের পালা শুরু হয়েছে। ফাঁসির কিছুদিন আগে জেলের চারিপাশে প্রচণ্ড বোমার শব্দে বিমর্ষ বন্দীদের উদ্দেশ্যে ফুচিক বলেছিলেনঃ 'সোভিয়েত জনগণ, তার মুক্তিবাহিনী কেমন করে মস্কো আর লেনিনগ্রাদের নাৎসীদের পরাজিত করলো, কি অসীম তাদের মনোবল। এখন আমরা যদি নিশ্চিহ্ন হয়েও যাই তবু বিশ্বস্ততায় থাকবো অকৃত্রিম এবং সেটাই হবে আমাদের প্রকৃত জয়।'

ফুচিকের ফাঁসির দু' বছর পর ফ্যাসীবাদ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হল রুশ লাল ফৌজের হাতে। ফুচিকের স্বপ্নের দেশ জন্ম নিল চেকোশ্লোভাকিয়ায়। সারা বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের কাছে জুলিয়াস ফুচিক হয়ে উঠলেন সংগ্রামের প্রতীক, পরম আত্মীয়। আর আত্মবিক্রয়কারী সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত।

নারীপ্রগতি—অর্থনীতি ও সমাজনীতি / মন্দিরা ঘোষাল

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষকে পিছনে ফেলে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি ৭৮-এর শেষ সীমায়। 'মহান নেত্রী' ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের 'সুমহান ঐতিহ্য' আমাদের স্মরণসিন্ধুকে আজও পীড়িত করছে। আর মেয়েরা তাদের বোরখা আর ঘোমটার আবরণ ছিঁড়ে ট্রামে-বাসে পথে-ঘাটে সর্বত্র 'নারী প্রগতি'-র বিজ্ঞাপন রূপে বিরাজমান। এ হেন অবস্থায় নারীপ্রগতির প্রশ্নটা নতুন করে উঠছে কেন, কেনই বা অর্থনীতি আর সমাজনীতির নিরিখে তার নতুন মূল্যায়নের প্রয়োজন?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে গণ আন্দোলনের গণ্ডীর মধ্যে নারীসমাজের দিকে একবার চোখ ফেরানো দরকার। আদমসুমারির হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলেন নারী। কিন্তু গণ-আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেই মেয়েরা, আন্দোলনের সামনের সারিতে আসে খুবই কম। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এটাই, বিগত কয়েক বছরে রাজনীতির নামে তাণ্ডব ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের এগিয়ে আসায় বিরাট বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরোনো ক' বছরের গ্লানিকে মুছে ফেলে ট্রেড-ইউনিয়ন ও মহিলা আন্দোলনে মেয়েরা কিছু কিছু এগিয়ে আসছেন। কিন্তু শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা মেয়েদের এই অনীহা আর জড়তা কাটিয়ে ওঠাটা একটা বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

কেন এই সমস্যা, কোথায় এর সমাধান—তা খুঁজতে গিয়েই অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে নারী প্রগতির সমস্যাটা মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ সমাজ বিকাশের কোন স্তর পার হয়ে, সমাজের কোন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মেয়েরা এই জাতীয় ভাবনায়, অনীহায় ভুগছে তা স্পষ্টভাবে না জানলে সত্যিই এ রোগের চিকিৎসা অসম্ভব।

'নারী প্রগতি'র প্রশ্নটা আমাদের কাছে অনেকখানি শিক্ষার সুযোগ, ঘরের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে আসার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। যে দেশে নারীসমাজের ৮৫ ভাগ নিরক্ষর, ঘরের কোণে খুন্তি নাড়া ছাড়া অন্য কাজ যে দেশে অপরাধের সমতুল্য সে দেশে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া, বাইরের মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করার অধিকার পাওয়া 'প্রগতি'-র লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের কাছে, অর্থাৎ আমরা যারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলি, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলি, তাদের কাছে 'নারী প্রগতি'-র প্রশ্নটা ঠিক ঐটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 'নারী প্রগতি'-র প্রশ্নে আমরা আরও অনেক কিছু বুঝি, যা অর্থনীতির সঙ্গে, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সমাজকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে, সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীসমাজের অবস্থিতি অনুধাবন করলে, এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভূমিকা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। 'নারীমুক্তি' বা 'নারীপ্রগতি' তাই সমাজ-অর্থনীতিতে তার সমানাধিকারের প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল।

সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের ভূমিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করলে বিষয়টি সহজতর হবে। পৃথিবীর আদি-ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আদিম যুগের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। আরও লক্ষ্য করা যায়, আদিম সাম্যবাদের যুগে মেয়েরা কিন্তু গৃহাশ্রয়ী ছিলেন না। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই খাদ্য সংগ্রহের জন্য শিকার-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতেন। সে যুগে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে খাদ্য সংগ্রহ করাই ছিল কঠিন ব্যাপার। এক-একটি গোষ্ঠীতে যে জনবল তা সেই গোষ্ঠীর খাদ্য-সংগ্রহে নিয়োজন করা ছিল একান্ত-প্রয়োজন। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে উৎপাদনে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে নারী-পুরুষ উভয়েই ছিল সমাজের সম্পদের সমান অধিকারী। সামাজিক দায়-দায়িত্বের সমান অংশীদার। কিন্তু সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ মেয়েরা বিশেষ কিছু সম্মান মর্যাদা সমাজের কাছে লাভ করতেন। কারণ, উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা ছাড়া তাদের আরেকটি বিশেষ ভূমিকাও সে যুগের সমাজ লক্ষ্য করেছিল। তা হলো সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা। এই জনসম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতাই তাকে সমাজে বিশেষ অধিকার দিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইতিহাসের বিকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে জনোৎপাদন ক্ষমতা একযুগে নারীকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল সেই জনোৎপাদন ক্ষমতাই পরবর্তী যুগে তার সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাজবিকাশের গতিপথে মানুষ ক্রমশ কৃষিকাজ শিখল। মেয়েরাও কৃষিতে অংশগ্রহণ করল। ফলে, একটা বৃহত্তর শ্রমবিভাগ হল। পুরুষেরা মূলত শিকারের কাজ ও মেয়েরা কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করতে লাগল। আগের যুগে যেটুকু খাদ্য সংগৃহীত হত, তার সবটাই সমাজের প্রয়োজনে লেগে যেত। কিন্তু কৃষিকার্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত কিছু সম্পদ সৃষ্টি হতে লাগল। একদিকে এই সম্পদের মালিকানা ও উত্তরাধিকার, অন্যদিকে দুটি নারীপুরুষের পরস্পরকে ভালোবেসে ঘর বাঁধার প্রেরণা থেকে পরিবারের সৃষ্টি হল। ধীরে ধীরে নারীর আর পুরুষের সমান শ্রম করার প্রয়োজন থাকল না। নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতা ও মানসিক প্রবণতার দিক থেকে মেয়েরা ক্রমশঃ সন্তানপালন, কৃষি ও সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয়যুক্ত কাজকেই বেশী বেশী করে পছন্দ করতে লাগল। গৃহাশ্রয়ী হয়ে উঠতে লাগল।

এরপর এল দাস যুগ। আরও উদ্বৃত্ত শ্রম সৃষ্টি হতে লাগল। দাসের শ্রমকে ব্যবহার করে প্রভু আরও ধনী হয়ে উঠতে লাগল। এই দাস-ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ উভয়েই তার শ্রমদান করত। এছাড়া সে যুগে নিয়ম ছিল, দাসের সন্তানও প্রভুর অধীনে দাস হবে। অর্থাৎ, দাস বংশপরম্পরায় প্রভুকে সেবা করবে। অর্থাৎ, যতবেশী দাস-সন্তান উৎপাদন করা যাবে ততই প্রভুর লাভ। দাস নারী এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আরও বেশী নির্যাতিত আর শোষিত হতে লাগল। দাস উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। পৃথক সত্ত্বা স্বীকার না করে, তার মনকে মর্যাদা না দিয়ে এই যুগ থেকেই তাকে শ্রমিক উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগল। দাস-নারীর বহুগামিতাকে নিয়ম করে তোলা হল। এই অবস্থার একটা নির্মম প্রতিফলন আছে গিনি-বিসাউ-এর একটি দ্বীপে। এখানে বসবাসকারী মানুষের পিতৃ-পরিচয় নেই, পরিবার নেই, শুধু মাতৃপরিচয় আছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই দ্বীপে বসবাসকারী দাসদের বিবাহের অধিকার ছিল না, যে কেউ যে কোন দাসনারীর সঙ্গে মিলিত হতে পারত। এর ফলে সন্তান উৎপাদন হত বেশী। দাস-মালিকও অনেক বেশী দাস-শ্রমিক পেতো। এই সময় থেকেই নারীর মর্যাদাহীনতার যুগ শুরু হল। নারীও শ্রমিকের মত মানুষ হিসেবে নয়, বস্তু হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল। দাস-যুগের বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মন্তব্য উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। অ্যারিস্টটলের মতে, দাস-দাসী সম্পদ, স্ত্রী এই সমস্ত কিছুর মালিক হল পরিবারের কর্তা। স্ত্রী এখানে পরিবারের কর্ত্রী নয়। পরিবারের কর্তার সম্পদের তালিকায় একটি সংযোজনমাত্র। উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি হল। মেয়েদের সমাজের উপর কর্তৃত্ব হ্রাস পেল।

সামন্ত যুগে মেয়েদের অবস্থা আরও করুণ হয়ে উঠল। উদ্বৃত্ত শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর মানুষের বিলাসিতাও বৃদ্ধি পেল। মেয়েদের উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। তাদের একমাত্র কাজ হল সন্তান-উৎপাদন, ক্রমশ নারীদেহ ভোগের সম্পদ হয়ে উঠল। সুন্দর ফুল-ফল হাজারটা বিলাসিতার জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেহও হয়ে উঠল ভোগের পণ্য। নারীদেহ নিয়ে চলল অবাধ বিকিকিনি। সুন্দর জিনিস মাত্রে পাওয়ার অধিকার সামন্ত প্রভুর। সেই হিসেবে সুন্দরী নারীও তাই তার ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে বিক্রীত হতে লাগল। 'উদার মহানহৃদয় সৌন্দর্যপ্রিয়' বাদশাদ আকবর তার বিলাসের প্রাসাদ ফতেপুরে তার ছবি রেখে গেছেন। সেখানে সুন্দরী নারী ছিল দাবার গুটিমাত্র। সামন্ত ব্যবস্থার অত্যাচার এমন চরম পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছিল, যে, গাছের প্রথম ফলের মত কুমারী নারীকে তার প্রথম যৌবন উপহার দিতে হত সামন্ত প্রভুকে। শুনেছি, এখনও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও নাকি এই প্রথা চালু আছে। বিয়ের প্রথম রাতে জমিদার-জোতদার নববধূকে উপভোগ করার মহান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সামন্ত যুগ থেকেই উৎপাদন থেকে নারী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল। সন্তান উৎপাদন ও গৃহস্থালী হল তার ভূমিকা। গৃহের এই কাজ, নারীর এই সেবাকে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকা বলে স্বীকার করা হল না। নারীকে দাসীতে পরিণত করা হল। ঘোমটার আবরণে তাকে ঢেকে রূপোপজীবির ভূমিকা দেওয়া হল।

সামন্ত যুগের পথ পার হয়ে ধনতন্ত্রের যুগে এসে নারীকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু সে স্বাধীনতা দেওয়া হল শ্রমের প্রয়োজনে। কৃষককে যেমন জমি থেকে মুক্ত করে, সামন্ত প্রভুদের অধীনতা মুক্ত করে, তথাকথিত 'স্বাধীন শ্রমিক'-এ পরিণত করা হল, মেয়েদেরও তেমনি স্বাধীনতা দেওয়া হল, ঘোমটার আবরণ ছিঁড়ে তাকে শ্রমের বাজারে নিয়ে আসা হল। তাকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হল, তাকে 'প্রগতিশীল' করে তোলা হল, নারীসমাজকে উন্নতি করার জন্য নয়, তার শ্রমকে প্রয়োজনীয় করে তোলার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে নারী সম্পর্কে মূলগত ধারণার কোন পরিবর্তন ঘটল না। বুর্জোয়া যুগে দাঁড়িয়ে নারীদেহ পণ্যে পরিণত হল। অন্যান্য পণ্যের মত তাকেও প্রতিযোগিতার বাজারে নামিয়ে দেওয়া হল নগ্নভাবে।

বুর্জোয়া ব্যবস্থা যেহেতু সামন্ত ব্যবস্থা থেকে এক ধাপ অগ্রসর একটা ব্যবস্থা সেহেতু এই ব্যবস্থা প্রথম যুগে নারীসমাজের ক্ষেত্রেও কিছু প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে এনে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এই কাজের পিছনে তাদের স্বার্থ ছিল দু'ধরনের—এক, শিল্পের শ্রমিক যোগান দেওয়া; দুই, নারীর শারীরিক অপটুত্বের অজুহাত দেখিয়ে একই পরিমাণে শ্রম অনেক কম দামে কেনা। এখনও, ভারতের বিভিন্ন শিল্পে এই মেয়েদের পুরুষের তুলনায় কম মজুরী দেওয়ার অবস্থাটা বজায় আছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বুর্জোয়ারা শ্রমের ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থে কিছুটা স্বাধীনতা দিলেও শেষ পর্যন্ত পুরুষকে আনন্দ দেওয়াই যে তার একমাত্র লক্ষ্য। পুরুষের উপর নির্ভর করা ছাড়া মেয়েদের গত্যন্তর নেই—এই ভাবনাটা বজায় রেখেছে।

বিশেষত, বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবক্ষয়ের যুগে, এই বিষয়টা আরও দৃঢ়ভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুর্জোয়ারা এখন আর তাদের ব্যবস্থাকে বিকশিত করতে পারছে না। তাদের ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ছে। শ্রমের সুযোগ ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। ফলে, পুরুষ-শ্রমিকের সঙ্গে সঙ্গে নারী-শ্রমিকও উদ্বৃত্ত হচ্ছে। তারা সংগঠিত হয়ে এই ভেঙে পড়া পচাগলা ব্যবস্থাটাকে চুরমার করে দিয়ে নতুন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছে। এই সংগ্রামী মানুষকে বিভ্রান্ত করার, সংগ্রামবিমুখ করার অপচেষ্টাও তার পাশাপাশি চলেছে। এই যুগে তাই

(শেষাংশ ৩২৮ পৃষ্ঠায়)

ব্লক যুবকেন্দ্র সমাচার

(ক) বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাচক্র :—

আগষ্ট মাসে যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বি আই টি এম-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন ব্লক যুব কেন্দ্রে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীর সংগে সাযুজ্য রেখে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কর্মবহুল জীবনকে স্মরণ করে আলোচনাচক্রের বিষয়সূচীতে ছিল—আইনস্টাইন : তাঁর জীবন ও কর্ম।

ব্লক পর্যায়ে এই সব মনোগ্রাহী আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীরা। জটিল তত্ত্বগত আলোচনাকে যতদূর সম্ভব জীবনধর্মী করায় ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করে। গত ২৮শে আগষ্ট এই আলোচনাচক্র শেষ হয়।

ব্লক পর্যায়ের আলোচনাচক্রের পর জেলাস্তরে আলোচনাচক্রের আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এই আলোচনা আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। জেলাস্তরের সফল ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্যস্তরে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।

(খ) পর্বতাভিযানে আর্থিক অনুদান :—

এই বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে তরুণ যুবক-যুবতীদের পর্বতাভিযানে আগ্রহী করে তোলার জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা আছে। এ বছরে এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন শৃংগে আরোহণ করাতে সাহায্য করার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। এ বাবদ এ পর্যন্ত আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর হয়েছে।

(গ) ব্লক যুব কেন্দ্র সমাচার :—

যুব কল্যাণ বিভাগের পরিধি বা কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার জন্য ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের ৩৩৫টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে একটি করে ব্লক যুব কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৯০টি ব্লকে ব্লক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং এই সব অফিসের কাজকর্মও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

সম্প্রতি আরও ১০০টি ব্লকে ব্লক যুব কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক কাজকর্ম দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই এই ১০০টি যুব কেন্দ্রের কাজকর্মও পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে।

(ঘ) শিক্ষা মূলক ভ্রমণের জন্য অনুদান :—

সম্প্রতি যুব কল্যাণ দপ্তর বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত আবেদনপত্র আহ্বান করে। বিশেষ করে অনুন্নত এলাকার দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যুব কল্যাণ দপ্তর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আবেদনপত্র দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৩১শে আগষ্ট। সুদূর পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিও এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখায়। ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত যে সমস্ত আবেদনপত্রগুলি দপ্তরে এসে পৌঁছেছে সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উপযুক্ত বিদ্যালয়গুলি এ বাবদ আর্থিক অনুদান পাবে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এ বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে যে অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে তা বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের গতিকে যে আরও বাড়াতে সাহায্য করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

(ঙ) অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প :—

এই প্রকল্পে যুব কল্যাণ বিভাগ আগষ্ট মাস পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬ হাজার ৫৬৬ টাকা প্রান্তিক ঋণ প্রদান করে। এর ফলে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার বিনিয়োগ সম্ভব হয়েছে এবং ৪৭টি প্রকল্প রূপায়ণের পথে এগিয়ে চলেছে। এর দ্বারা ২০০ জন বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

হাবিবপুর ও বামুনগোলা ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী (পুরস্কারপ্রাপ্ত) ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ :—বাঁদিক থেকে—দিলীপকুমার সরকার, প্রদীপ সিনহা, শ্রীমতী নিস্কৃতি সাহা, শ্রীমতী লাভলি বসু ঠাকুর, স্বপ্না ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র সরকার, অমলকুমার দাস।

হাঁসখালি ব্লক যুবকেন্দ্র আয়োজিত বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের
সফল প্রতিযোগিরা (দণ্ডায়মান)।

জামুরিয়া ১নং ব্লকের বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে একজন ছাত্র-প্রতিযোগী বক্তব্য রাখছে।

আমাদের চোখে আমাদের দেশ / অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

(রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে বিদ্যালয় বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ— এই ঋষিবাক্য। ভারতের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। এক মহাতীর্থ আমার দেশ।" আমার চোখে আমার জন্মভূমি দশপ্রহরণধারিণী। আমার দেশ প্রকৃতির স্বাভাবিক আয়ুধে সুসজ্জিত। উত্তরে তুষার মৌলী হিমাচল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রূপে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে। পূর্ব, পশ্চিমে ও দক্ষিণে যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর, ভারত মহাসাগর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আমার চোখে, আমার দেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার আমাদের দেশের ভারতবর্ষ বা India নামকরণ হ'ল কেন?

নামকরণ

কিংবদন্তি আছে, ভরত নামে এক রাজা এদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁহারই নাম অনুসারে এই নামকরণ হয়েছে। প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থেও এই দেশকে ভারতবর্ষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন আর্যগণ অবশ্য এদেশে তাঁদের বাসভূমিকে 'সপ্তসিন্ধ' নামে অভিহিত করতেন; এই সিন্ধু শব্দই প্রাচীন পারসিকগণের উচ্চারণে হিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। এর থেকেই ক্রমে ভারতীয়গণ 'হিন্দু' বলে পরিচিত হলেন এবং তাঁদের বাসস্থান 'হিন্দুস্থান' নামে খ্যাত হ'ল। এই হিন্দু শব্দ পুনরায় গ্রীক ও রোমক লেখকদের লেখা 'ইন্দুশ' Indus রূপ গ্রহণ করে, এবং এই 'ইন্দুশ' থেকে 'ইণ্ডিয়া" নামের উৎপত্তি।

আমার চোখে আমার দেশবাসী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয় সে চিন্ময়...দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষের তৈরী।" তাই আমার চোখে আমার দেশ সম্পর্কে লিখতে গেলে জানতে হবে ভারতীয় জনতত্ত্ব।

অনাদি অতীত কাল থেকে কত জাতি, কত বর্ণের লোক যে এই ভারতভূমিতে আগমন করল তার ইয়ত্তা নেই। বহু জাতির আগমনে ভারতবর্ষ এক মহামানবের মিলনতীর্থে পরিণত হয়েছে।

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত বর্ণনা শুধুমাত্র কবি কল্পনা নয়, ঐতিহাসিক সত্যের বহিঃপ্রকাশ।

বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর জনসাধারণের দেহ গঠনের, বিশেষ করে কেশ বৈশিষ্ট্য, চোখ ও চামড়ার রং, নাসিকা, কপাল ও নরমুণ্ডের আকৃতি ইত্যাদির পরিমিতি গ্রহণ করে, নৃবিজ্ঞানীগণ ভারত-বাসীর জনতত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। সকলের পরিমিতি একই মানদণ্ড অনুসারে গৃহীত হয়নি; ফলে মত পার্থক্য রয়েছে। বিখ্যাত আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ ডঃ বিরজা শঙ্কর গুহের মতে ভারতবাসী মোট ছয়টি শাখা ও নয়টি উপশাখায় বিভক্ত।

(১) নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু (The Negrito)

(২) আদি অস্ট্রেলিয় (Proto-Austroloid)

(৩) মোঙ্গলীয় (Mongoloid) এরা আবার তিনটি শাখায় (১) দীর্ঘমুণ্ড প্রাচীন মোঙ্গলীয় (২) গোলমুণ্ড প্রাচীন মোঙ্গলীয় (৩) তিব্বতী মোঙ্গলীয়।

(৪) ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean) এরা আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত (১) প্রাচীন ভূমধ্য সাগরীয় (Palaeo-Mediterranean) (২) ভূমধ্যসাগরীয় Mediterranean) ৩)প্রাচ্য(Oriental type)(৫) পশ্চিমী প্রশস্তশির জাতি (Western Brachycephalo) এরাও আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত (১) অ্যালপাইন (The Alpiniod) (২) দীনারীয় (The Dinaric) (৩) আর্মানীয় (The Armenioid) (৬) নর্ডিক (Nordic)

আমার চোখে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা সম্পর্কে বিশ্বের মেহনতী মানুষের নেতা স্বনামধন্য মার্কস ও এঙ্গেল বলেছেন—"শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি তিনটি দিক প্রথমত মানসিক শিক্ষা, দ্বিতীয়ত শারীরিক শিক্ষা, যেমন শিক্ষা জিমন্যাসটিকস ও সামরিক বিদ্যালয়ে দেয়া হয়, তৃতীয়ত কারিগরী শিক্ষা যে শিক্ষা সমস্ত রকম উৎপাদন পদ্ধতিতে সাধারণভাবে কাজে লাগে এবং সাথে সাথে শিশু ও তরুণদের সমস্ত বিষয়ের সাধারণ যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে ও ব্যবহার করতে উৎসাহ দেয়।" (মার্কস এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড) কিন্তু আমার চোখে আমাদের দেশে তৃতীয় ধরণের কোন ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। কারণ আমাদের দেশটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক দেশ। এই ধরণের দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে পুঁজিপতিরা, বুর্জোয়াশ্রেণী। এরা মুনাফার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না, এমনকি তারা যে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে তাও মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে। তাদের কল-কারখানা অফিস চালানর জন্য যে পরিমাণ শিক্ষিত শ্রমিক বা কর্মচারীর প্রয়োজন শুধু-মাত্র সেই সংখ্যক মানুষের জন্য তারা শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

ভারতবর্ষের ৭০% লোকই কৃষিজীবী। পুরান আমলের যন্ত্রপাতি হাল-বলদ ব্যবহারের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির দরকার হয় না। তাই আমার দেশের ৪০ কোটি মানুষকে শাসকশ্রেণী শিক্ষিত করার কোন প্রয়োজনই মনে

করেনি। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর লোকের ৫০% বাস করে ভারতবর্ষে যেটা স্বাধীনতার সময়ে ছিল ১০% বা ১২% এর মত।

১৯৪০ সালে সোভিয়েত দেশের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা এম, আই, কালিনিন শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেন "Education is definite, purposeful and systematic influencing of the mind of the person being educated in order to imbue him with the qualities desired by the educator."

আমার চোখে আমার দেশের শাসকশ্রেণী এটাই চেয়েছিলেন। এখন দেশ জোড়া গভীর সংকট। একচেটিয়া পুঁজিপতি, জমিদার ও জোতদারদের স্বার্থরক্ষায় সদা চঞ্চল এ সরকার। ধনতন্ত্র বিকশিত হতে পারলেও (আজকের যুগে যা অসম্ভব) শিক্ষাক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রগতি ঘটতে পারত, আমাদের দেশে সেটুকুও হতে পারেনি। এবং আমার চোখে আমাদের শাসকশ্রেণীই তা হতে দেয়নি। কেননা "In a class society, there never has been nor there can be, education outside or above the classes"

সুতরাং আমার চোখে আজকের শিক্ষা জগতের এ পরিস্থিতি শাসকশ্রেণীর স্বার্থকেই সযত্নে রক্ষা করে চলেছে।

ভারত সরকার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাবেও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত প্রস্তাবই বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চবিত্তদের মধ্য থেকে কিছুকে বেছে নিয়ে সুযোগ সুবিধা দানের পুরানো নীতিই বহাল রেখেছিলেন। সাত বছর আগে ২ বছর ধরে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ৩২০০ কোটি টাকা দেবার বাগাড়ম্বর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ১৭২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, অথচ এই সময়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল ৪০%।

আমার চোখে ১৯৭৯ সালের মধ্যেও সমস্ত শিশু ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অন্তত পাঁচ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশা নেই, কারণ এমন কি পরিকল্পনায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাত্র ৮২ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী (৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত) স্কুলে নাম লেখাবে এবং নাম লেখান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ৪০% পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করবে। অপর সকলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। ৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত ৮ বছরের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা দূরে রাখা হয়েছে। ১০+২+৩ বছরের শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ের অর্থাৎ ১০ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয় ২৬%-এর বালক-বালিকার জন্য। এটা ৭০ সালের ২২%-এর চেয়ে কোনক্রমে ৪% বেশী। ৭ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন বালক-বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঢোকার সুযোগ পায়। কিন্তু তবুও পরিকল্পনা বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বালক-বালিকাদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

আমার চোখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলো, নেহরু-যুব কেন্দ্র, হোস্টেলের সুযোগ বৃদ্ধি, ডে-স্টুডেন্টস হোম, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভোজনালয়, বই ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক ছাত্র যুবকে প্রলুব্ধ করতে চায়; কিন্তু ছাত্রদের গণতান্ত্রিক দাবী, ছাত্র-সংসদ গঠনের অধিকার, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও পরিচালন ব্যবস্থায় ছাত্র প্রতিনিধিত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থা রূপায়ণে ও পরিচালনায় ছাত্রদের অংশ গ্রহণের অধিকারের কথা উচ্চারণ করে না।

আমার চোখে জমিদার তন্ত্রের সংগে আপোষের ফলে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। ভারত সরকার প্রকাশিত 'India-74' এ প্রচারিত তথ্য থেকে দেখা যায় ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫ কোটি ৯৩·৫ লক্ষ এবং ১৯৭১ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা ২ কোটি ৭·২ লক্ষ। তাহলে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষা নিতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল অথচ শিক্ষা জীবন পরিচালনা করতে পারল না এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ। এরা হচ্ছে সেই হতভাগ্যের দল যাদের পিতামাতা ভূমিহীন অথবা অত্যন্ত অল্প জমির মালিক। এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজের শিকার—জোতদার ও মহাজনী শিকারে পিষ্ট। এরা শুধু ৮/১০ বছরে পদার্পণ করার পূর্বেই অন্যের বাড়ীর রাখালি শুরু করে আর স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে চেয়ে বাতাস ভারী করে তোলে. পরণে কাপড় নেই, গাছের পাতা যাদের খাদ্যতালিকার শীর্ষস্থানে—বিদ্যালয় তদের কাছে বিলাসিতা।

তবু এদেরই বিরাট অংশ দুঃসাহসে ভর করে পাঠশালায় ভর্তি হয়। শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় আর অভুক্ত শরীরে গা মেলায় স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর মিছিলে। তারপর শুরু হয় মিছিল ভাঙ্গার পালা। স্কুলের মিছিল ভেঙ্গে এক একটি অংশ চলে যায় জীবীকার সন্ধানে। উচ্চতর ক্লাসে পড়াশুনা করার নিশ্চয়তা নির্ভর করে অভিভাবকদের আয়ের ওপর। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যার বিভাজন থেকে জানা যায় ১ম শ্রেণী থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার পূর্বেই কি পরিমাণ drop-out হয়—প্রথম শ্রেণী ৪০·৩৬% দ্বিতীয় শ্রেণী ১৬·১৪% তৃতীয় শ্রেণী ১৬·২৫% চতুর্থ শ্রেণী ১২·৭৭% পঞ্চম শ্রেণী ৯·৬৮৭% নিজের সন্তান সন্ততিকে বিদ্যালয় প্রেরণ করার জন্য কৃষক পিতা-মাতার আগ্রহে যে অপরিসীমতা পূর্বোক্ত বাক্য থেকেই জানা যাবে। এখান থেকে বোঝা যাবে শিক্ষা লাভের জন্য প্রথম শ্রেণীর ৪০% ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে কমে গিয়ে হয় ১৬%। অর্থাৎ শিক্ষা লাভের আশা নিয়ে যারা প্রথম

শ্রেণীতে ভর্তি হয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার আগেই শতকরা ৬০% ছাত্র বিদ্যালয়কে চিরবিদায় দিয়ে কঠিনতর ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়। গত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনীতে নতুন নতুন অধ্যায় যুক্ত করে।সার্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক শিক্ষার, গালভরা প্রতিশ্রুতি পরিণত হয় নিদারুণ পরিহাসে।

আমার চোখে

আমার চোখে কৃষি বিজ্ঞানে আমাদের দেশ :—

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় কিছু গম, বার্লি, ধান ও শাকসব্জীর বীজ পান। এর থেকে উনি ধারণা করেন যে সেই যুগেও ভারতীয়রা এই সমস্ত চাষের কথা জানতেন। প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগ থেকেই যতদূর জানা যায় ভারতীয় কৃষি ছিল উন্নত ও সমৃদ্ধ। তাই আমার চোখে কৃষি-বিজ্ঞানে আমাদের দেশের অগ্রগতি আমাদের ঐতিহ্য। আধুনিক কালের অগ্রগতিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়কে দুভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা উচিত। প্রথম অংশে ১৯৪৭—১৯৬০ সাল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু ১৯৬১ সালে। প্রথম পর্যায়ে আমাদের যা অগ্রগতি তা আমার চোখে মূলত আরো বেশী জমি চাষের আওতায় আসা এবং সেচের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু প্রকৃত অগ্রগতি বলতে যা বোঝায় তার সূত্রপাত হয় ১৯৬১ সালে। খাদ্য উৎপাদনের সূচকটা একটু দেখলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা বোঝা যাবে। ১৯৬০ কে ১০০ ধরলে এই সূচক ১৯৭০ সালে সারা পৃথিবীর খাদ্যোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়ায় ১২০তে আর ভারতের সূচক দাঁড়ায় ১৫৪তে। সত্যিই! শুধু আমার কেন? সবার চোখেই বিস্ময়কর অগ্রগতি নয় কি? আর এই অগ্রগতির পেছনে আছে উচ্চফলনশীল প্রজাতি ও উন্নত কলাকৌশল।

কৃষির মূল উপাদান তিনটি কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ। ১৯০৬ সালে পুণাতে প্রথম কৃষি কলেজ স্থাপিত হ'লেও ষাটের দশকের আগে কৃষি-শিক্ষা ছিল অবহেলিত। ১৭ই নভেম্বর, ১৯৬০এ পন্থ নগরে ১৭০০০ হেক্টর জমি নিয়ে ভারতের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে কৃষি শিক্ষার এক নতুন যুগের সূচনা হ'ল। পরবর্তী সময়ে এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো ১২টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে আমাদের পশ্চিম বাংলার 'বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' সর্ব কনিষ্ঠ। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরন্তর প্রয়াসে প্রতি বছর প্রায় ৮০০ ছাত্রছাত্রী স্নাতক, স্নাতোকোত্তর ও পি এইচ ডি ডিগ্রী পাচ্ছেন। কেবলমাত্র সাধারণ পঠন-পাঠনের এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের সীমায়িত করে রাখেননি। এরা কৃষকদের কৃষির নানান কলাকৌশল, মাটি ও সার ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গাছের রোগ ও পোকাকে চেনা ও তার হাত থেকে ফসল বাঁচানোর উন্নত কলাকৌশল শেখান।

১৯৬৬ সালের আগে আমাদের মোট খাদ্যোৎপাদন ছিল ৪৪ মিলিয়ন টন। আর গত বছরে ছিল ১১৫ মিলিয়ন টন। খাদ্যশস্যের বিপুল বৃদ্ধির জন্য যাঁরা সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন, আমার চোখে তাঁরা কৃষি বিজ্ঞানী। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় আমাদের কৃষিতে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক কম, তবু যে কটি দেশ কৃষি সম্পর্কিত গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ করে সর্বাধিক ফল পেয়েছে তার মধ্যে ভারত অগ্রগণ্য।

এই শতকেরই গোড়ায় উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবনের তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়ে প্রথম প্রায়োগিক সাফল্য আসে নরম্যান বোরল্যাগের উচ্চফলনশীল গমের 'Norion-10B' বংশানু আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এর অল্প পরে ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে বার করা হয় 'IR-8' ধান। ভারতবর্ষেও এই জোয়ার এসে লাগে। এর আগেও অবশ্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পাট, ভুট্টা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছিলেন। এবার তারা স্ব পরাগ যোগী গম, বাজরা জোয়ার ও অন্যান্য ফস'লর ক্ষেত্রেও এগিয়ে এলেন। আমরা পেলাম জয়া, পদ্মা, সোনালীকা, কল্যাণসোনা ইত্যাদি জাতগুলি।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় নানান অঞ্চলের উপযুক্ত জাত আমরা পেয়েছি। মহারাষ্ট্রে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শঙ্কর জাতের নিবিড় তুলা চাষ, যা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ভারতেই শুরু হয়, পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরায় গমের চাষ, পাঞ্জাব ও হরিয়াণায় ধানের চাষ, উত্তর বাংলার সমৃদ্ধতার প্রতীক আনারসের চাষ, উত্তর ভারতে আমের চাষের কথা আমার চোখে এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ পি কে দে নীলসবুজ শ্যাওলা করেন ডঃ দে ও ডঃ এল এন মণ্ডলের প্রচেষ্টায় আমরা জানতে পারি কিভাবে এরা বায়ুর থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে তা মাটিতে বন্ধন করে। তাঁদের এই গবেষণার কল্যাণে ধানের চাষের খরচ আজ গেছে অনেক কমে। আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ এস পি রায়চৌধুরী নাইট্রোজেনের ওপর গবেষণা করে ভারতীয় কৃষি গবেষণার মানকে পৃথিবীর চোখে সম্মানীয় করে তোলেন। আজকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানীদের (ভারতীয়) মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন। Plant-Breeding এর উপর বোরল্যাগ এ্যাওয়ার্ড সবচেয়ে বেশী বার যে দেশ জয় করেছে, সে হল—ভারত।

স্বাধীনতার সময়ও একই জমিতে একটির বেশী ফসলের কথা ভাবা যেত না, আজ আমরা এক জমি থেকে বছরে চারটি ফসল তুলছি। আগে জলকে কৃষির মুখ্য প্রয়োজনীয় মনে করা হত। এখন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অজল চাষ গবেষণার নানান পর্যায়ে যে তথ্য পেয়েছেন তার থেকে এখন আর জলকে বাধা মনে হয় না।

মিশ্র মাছ চাষ, সাগর জলে মাছ চাষ, শঙ্কর জাতের গরু, মহিষ পালন, তাদের দেশজ খাদ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আমার চোখে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রভূত অবদান আছে।

ভারতবর্ষের কৃষি গবেষণার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণাকে নিয়োজিত করা। কিন্তু এখনও আমরা হেক্টর প্রতি উন্নয়নে উন্নত দেশগুলি থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। এর জন্য আমার চোখে মূলত দায়ী লাগে ভূমি ও জল ব্যবহারে আমাদের ব্যর্থতা ও নিরক্ষরতা। গ্রামাঞ্চলে কৃষির প্রায়োগিত সাফল্য তখনই আসতে পারে যখন কৃষকদের উন্নত কলাকৌশলগুলি ঠিকমত রপ্ত করান যাবে। কিন্তু সম্প্রসারণে আমাদের অনিহার জন্য আমরা এই বিষয়ে খুব বেশী এগোতে পারিনি। দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে কৃষির প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফল কেবল মাত্র সম্পন্ন চাষীরাই পেয়েছেন। উপরন্তু বিশিষ্ট অর্থনীতি-বিদ ওঝা, দাণ্ডেকর, বর্দ্ধন, মিনহাস, রথ সকলেই স্বীকার করেছেন ১৯৬০ সালে গ্রামাঞ্চলে যত লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করতেন ১৯৭০ সালে তাদের সংখ্যা ১½ গুণেরও বেশী হয়েছে। দাণ্ডেকর ও রথের হিসাব অনুযায়ী ৬৭-৬৮ সালেও আমাদের দেশের মোট জন-সমষ্টির ৪১% দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে ছিলেন। কৃষি বিজ্ঞানে উৎপাদন বাড়াই অগ্রগতির পরিচয় বহন কর না, প্রকৃত অগ্রগতি বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। আমার চোখে কৃষির প্রকৃত অগ্রগতি নির্ভর করছে, কৃষি ক্ষেত্রে এখনও যে সামন্ত-তান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক রয়েছে, তার অবসান করার উপর। প্রকৃত ভূমি সংস্কারকে এড়িয়ে উন্নত চাষ পদ্ধতি, অধিক ফলনশীল বীজ সার, সেচ প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষির উন্নতির যে সব চেষ্টা গত ৩০/৩৫ বছরে ধরে চালান হয়েছে তার ফলে মুষ্টিমেয় কৃষক আরোধনী হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কৃষির এমন কিছু উন্নতি হয়নি যাতে জাতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে অগ্রগতির পথে এগোতে পারে। 'অধিক ফসল ফলাও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট', আই এ ডি পি, সি এ ডি পি প্রভৃতি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কৃষির উন্নতির প্রচেষ্টা নিতান্তই সীমাবদ্ধ ফল লাভ করেছে। ৫% ধনী কৃষক এতে লাভবান হয়েছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনীতির বিকাশ তেমন প্রভাব পায়নি। এবং ভূমি সংস্কার ভিন্ন তা সম্ভবও নয়।

আমার চোখে আমাদের দেশের স্বাধীনতাঃ—

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishnsss, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we have nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way."

(Charles Dickens, A Tale of Two Cities)

ফরাসী বিপ্লবের দুর্যোগময় দিনগুলির এই বর্ণনার সংগে অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার ঘটনাটির। এই রকমই ছিল নতুন ভারতের জন্মলগ্ন—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। আমার চোখে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে স্বাধীনতার যে স্বাদ আমরা পেলাম, সেই স্বাদ যেমনি গৌরবের তেমনি কলঙ্কেরও। ত্রিশ বছর আগে সেই ১৫ই আগস্টের পশ্চাদপটভূমি হিসাবে যে ইতিহাস ছিল দেশের জনগণের তার জন্য আমার চোখে আমরা সবাই নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারি। হাজার হাজার মানুষের স্বার্থত্যাগ, কারাবরণ, মৃত্যু ও রক্তদানের পথ ধরে এসেছিল এই স্বাধীনতা।

অন্যদিকে আর একটি ইতিহাস ছিল স্বাধীনতার। দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে এল না। সেদিন রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বনাম সারা দেশের জনগণ মুখোমুখি দাঁড়ালেও নেপথ্যে আর একটি দৃশ্য অভিনীত হচ্ছিল। ভারতবর্ষের উঠতি পুঁজিবাদীগোষ্ঠী সামন্ত প্রভু। জমিদার, দেশীয় রাজন্য-বর্গ প্রভৃতি তাবৎ শোষক শ্রেণীগুলি প্রমাদ গুনছিল এই স্বাধীনতার স্বাদ কারা উপভোগ করবে। যদি দেশের জনগণের হাতে ক্ষমতা যায় তাহলে মুষ্ঠিমেয় সম্পত্তি-বানদের হাতে আর সম্পত্তি প্রতিপত্তি থাকবে না। তাই স্বাধীনতার মধ্য রাত্রিতে সমঝোতা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে তাদের। দেশ স্বাধীন হবে, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থও থাকবে, এই পুঁজিপতি সম্পত্তিবানরাই হবে দেশের মালিক তারাই দেশ পরিচালনার ভার হাতে পাবে. আমার চোখে এই শ্রেণীগুলির নেতৃত্ব করছিল সেদিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, আজ জনতা পার্টি—ভারতের শোষক শ্রেণীর সংগঠিত রাজনৈতিক দল।

আমার চোখে আমার দেশের জাতীয় সংহতিঃ—

বৈচিত্র্যময় এই ভারতবর্ষ। এই বৈচিত্র্য জাতি, ভাষা, আচার, আচরণের মধ্যে যেমন তেমনই প্রাকৃতিক, ভৌগলিক ক্ষেত্রেও পরিদৃশ্যমান। কিন্তু নানা প্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক গভীর ঐক্যবোধ চিরকালই বিরাজিত। প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা ভারতবাসীর চিরন্তন সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা।" আমার চোখে এমন দেশে একমাত্র সচেতন স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই জাতীয় সংহতি অর্জন করা যেতে পারে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিভেদমূলক প্রবণতাকে না বাড়িয়ে বরং তাকে প্রতিহত করতেই সাহায্য করবে। বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বাতন্ত্রকে ঘৃণার

দৃষ্টিতে না দেখে তাকে শ্রদ্ধা জানালেই তবে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হবে। আমার চোখে মোট রাজস্বের ২৫% রাজ্যকে দিলে কোন দিনই জাতীয় সংহতি গড়বে না। ৭৫% রাজস্ব রাজ্যগুলিকে দিলেই শক্তিশালী ভারত গড়ে উঠবে। কারণ এখন প্রত্যেক রাজ্যই বেশী টাকা চায়, কারণ রাজ্যগুলি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প টাকা পায়; এমন একটা রাজ্য অন্য রাজ্যকে বঞ্চিত করলেই তবে বেশী টাকা পেতে পারে, তাই যে রাজ্য বেশী টাকা পায় আর যে রাজ্য বঞ্চিত হয় তাদের মধ্যে একটা খারাপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বঞ্চিত রাজ্য কেন্দ্রের ওপর রেগে যায়—যা কখনোই শক্তিশালী দেশ গড়তে পারে না। আবার শিল্পোন্নত রাজ্যগুলি আর শিল্প অনুন্নত রাজ্যগুলি উভয়েই নিজেদের প্রয়োজন দেখিয়ে বেশী টাকা দাবী করে কারণ তারা যা টাকা পায় তাতে তাদের কুলোয় না ফলে একটা অসুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠে যা জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

আমার চোখে আমার দেশের আইন শৃঙ্খলা :—

ভারতবর্ষের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। "হে মহামানব, একবার এসো ফিরে/শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরে ভিড়ে/এখানে মৃত্যুর হানা দেয় বারবার..." একথা কমিউনিস্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্বাধীনতার আগে বলেছিলেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে শাসক পার্টির পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য খাদ্যের জন্য সংগ্রাম মানুষ করতে পারে না। এখনও মানুষ খাদ্যের দাবী করলে বুলেট পায়—কানপুরের শ্রমিকেরা মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত দেড় মাসের বকেয়া মাহিনা দাবী করে পেল—১১ জন শ্রমিকের মৃতদেহ। উত্তর প্রদেশের কলেজ শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হল। সারা ভারতে গত বছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জমিদার, জোতদারদের হাতে হরিজন নিহত হয়েছে ৫৩৮ জন। নিহতের সর্বোচ্চ সংখ্যা জনতা শাসিত উত্তর প্রদেশ. তার পরের স্থান বিহার। আর পশ্চিমবাংলায় এই সংখ্যা শূন্য। পন্থনগরের নিরস্ত্র শ্রমিকেরা আন্দোলন করে পেলেন—নৃশংস ভাবে নিজেদের মৃত্যু। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানলাম আন্দোলনকারী শ্রমিকদের PAC বর্বর ভাবে গুলী চালায়, তখন তারা আত্মরক্ষার্থে আখের ক্ষেতে আশ্রয় নেয়। PAC এটাই চাইছিল; তখন তারা আখের ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দেয়; ফলে বহু শ্রমিক জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। স্থানীয় জনসাধারণ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২০ জন শ্রমিককে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। PAC -র লোকেরা আবার রাতে তাদের হাসপাতাল থেকে বের করে গুলী করে; শ্রমিকদের ঝুপড়ীগুলিও অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। PAC র অত্যাচারে প্রাণ হারায় দুটি শিশু, একজনের বয়স ২ বছর। ভারতের অনেক জায়গাতেই এরকম ঘটনা প্রায় নিত্যসঙ্গী।

আমার চোখে অলসতা নয়, দারিদ্র্যতাই ভারতবাসীর জীবনের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক :—

মানুষের জীবনের উন্নতি, নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরিত্র ও সেই উন্নয়নের পটভূমিকায় ব্যক্তি মানুষের শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর। আর অর্থনৈতিক অগ্রসরতা (?)র এমন এক পদে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি যেখানে জীবনের সার্থকতা, জীবনের উন্নতি নির্ভর করে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর। তাই স্বাধীনতার পর ১৯৬৪ সালে ভারতবর্ষের জনপ্রতি উন্নয়নের হার ছিল ৩% যেখানে এই হার টাটার ছিল ৩২%, বিড়লার ৭৮%, মফৎলালের ১২০%; তার কারণ কি? ভারতবর্ষের টাটা, বিড়লা, মফৎলালরাই শুধু অলস নয়, আর বাদ বাকি সকলেই অলস? তাতো নয়! আর তা যদি হতো তাহলে টাটা-বিড়লার কি এত বৃদ্ধি হ'ত? কারণ টাটা, বিড়লারা কয়েকজন মিলেই তো আর কারখানা চালায় না, যারা চালায় তারা সাধারণ মানুষ। এদেরই পরিশ্রমের ফলশ্রুতি এই অন্যায্য বৃদ্ধির হার। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে পড়লাম জাতীয় আয় ২·৯৫% বেড়েছে, অথচ টাটা-বিড়লার বৃদ্ধি নিচের পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাবে।

শোষণকারীর নাম	সাল	মূলধন	মুনাফা	সাল	মূলধন	মুনাফা
টাটা	১৯৭২—	৬৮৯·৯১ কোঃ টাঃ	৪৮·৮৩ কোঃ টাঃ	১৯৭৫—	১০৬০·০৪ কোঃ টাঃ	৭৪·৪৫ কোঃ টাঃ
বিড়লা	"	৫৫৩·৪৬	৪৪·২৮	"	৯৩৬·১১	৫৩·৯৯
মফৎলাল	"	১৯০·৬৬	১৪·৬৫	"	৩৩৭·১৯	২২·১৬
সিংহানিয়া	"	১০৩·৬৫	৫·৯২	"	১৯৮·৮৭	১৬·৩৮

ভারতবর্ষে বর্তমানে শোষণের ফলে গরীব ক্রমে আরো গরীব হচ্ছে আর ধনী আরও স্ফীতকায় হচ্ছে। কিছু দিন আগে Survey of India র এক রিপোর্টে জানা যায় ২% লোকের হাতে ৪৬% জমি কেন্দ্রীভূত আছে। অপর দিকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আদমসুমারীর রিপোর্টে জানা যায় ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সালে, এই ১০ বছরে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ৩১৫১৯৪১০ জন থেকে ৪৭৩০৪৮০৮তে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫৭৮৫৩৯৭ জন।

এই ভারতবর্ষেরই কোটি কোটি মানুষ ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে চলে—সামান্য দুমুঠো খাদ্যের জন্য। ওই টাটা

বিড়লারা যা পরিশ্রম করে এরা তার চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম করে। জীবনের আনন্দ এদের কাছে অজ্ঞাত। জীবনে উন্নতির স্বপ্ন দেখতে এরা ভুলে গেছে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই এরা এদের রক্তের বিনিময়ে গড়ে তোলে স্ফীতকায় ধনীদের আলস্যের সৌধ। বরং এই শোষিতদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একথা সকল উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সত্য। এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই দারিদ্রের চিত্র ভয়ঙ্কর। আগের পরিসংখ্যানে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বেকারীর সংখ্যা দেখলেই বোঝা যাবে আমার বক্তব্যের সত্যতা।

দেশ	বেকার সংখ্যা
১। ভারত	১ কোটি ৯ লাখ ২৪ হাজার
২। আমেরিকা	১ কোটি
৩। জাপান	৫০ লক্ষ
৪। পশ্চিম জার্মানী	১৩ লক্ষ ৫১ হাজার
৫। বৃটেন	১৫ লক্ষ
৬। ফ্রান্স	১৪ লক্ষ

এই সমস্ত দেশেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফলটুকু ভোগ করেন কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ধনীরা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি—ভয়াবহ ধনতান্ত্রিক সংকট, ভয়াবহ দারিদ্র, শিল্প সংকট, ব্যবসা সংকট, তীব্রতম সমস্যার মুখোমুখি হয়ে। আর এই সমস্যাগুলিই পুনঃ পৌনিকভাবে সৃষ্টি করে চলেছে আরো দারিদ্র। এই পরিস্থিতিতেই উপদেশ দেওয়া হয় কঠোর শ্রম করার,—বলা হচ্ছে তাই অলসতাই জীবনের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক—দারিদ্র নয়। আর এই বিশ্বাসের স্পেনীয় দাঁতগুলি রুদ্ধশ্বাস মুমূর্ষের কণ্ঠনালীতে ডুবিয়ে দিয়ে ধনিক শ্রেণী তাদের পকেট ভরে তুলছে স্বর্ণ মুদ্রায়। তাই পরিশেষে আমি ডাক দিয়ে যাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্য।

নারীপ্রগতি—অর্থনীতি ও সমাজনীতি

(৩২০ পৃষ্ঠার পর)

প্রগতির নামে নারীকে আদিম প্রবৃত্তি জাগানোর হাতিয়ার করে তোলা হচ্ছে। নারীদেহকে লোভনীয় করে তোলা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসেবে মেয়েদের মর্যাদাকে তিল তিল করে হত্যা করা হচ্ছে। শিক্ষার মধ্যে, সমাজ জীবনের মধ্যে নারীর ঐ লোভনীয় ভোগের বস্তু হয়ে ওঠার, পুরুষের মনে মোহসৃষ্টি করার আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই বাইরের জগতে পণ্য হয়ে ওঠাটুকুই প্রগতির চরমসীমা বলে প্রতিপন্ন করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস চলেছে। প্রয়াস চলেছে ব্যক্তিত্ব ও সত্ত্বাকে অস্বীকার করার।

কিন্তু এই পণ্য হয়ে ওঠাটুকুই কি প্রগতি। না, এই অবস্থাটাকে শ্রমজীবী নারীসমাজ মেনে নিতে নারাজ। তাঁরা নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে আরও বেশী বেশী সজাগ হয়ে উঠছেন। সমানাধিকারের দাবী করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া আর কোথাও তাঁদের অধিকার স্বীকৃত নয়। সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই মেয়েদের মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না। আবার, একমাত্র সমাজতন্ত্রেই মেয়েরা তাদের জনবল সৃষ্টির বিশেষ ভূমিকার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাই তাঁদের অধিকারের দাবীতেই সমাজতন্ত্রের সপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলছেন। আমাদের মত দেশেও গণ-আন্দোলনগুলিতে আরও বেশী বেশী করে সামিল হচ্ছেন। সমবেত, সংগঠিত হচ্ছেন মহিলারাও। কারণ, তাঁরাও তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রগতির, অগ্রগতির সঠিক পথটি চিনতে পেরেছেন। ছাত্রীদের কাছে আজও সেই পথটি বিশেষ স্পষ্ট নয়। 'বুর্জোয়া প্রগতি'-র বিষফলটি তাদের সামনে আজও 'সোনালী মোড়কে মোড়া'। যেখানে 'আনন্দলোক' পত্রিকার মাধ্যমে রঙীন বম্বে ফিল্মকে আদর্শ করে তোলা হয়। মার্কিনী রুচি, বিকৃত ভাবনাকে সভ্যতার চরমতম নিদর্শন বলে বর্ণনা করা হয়। কিছু স্বাধীনতা দেওয়ার নাম করে তার স্বাধীন বিকাশের পথরোধ করার চক্রান্তকে যতদিন না ছাত্রীরা অনুভব করবে ততদিনই গণ-আন্দোলন সম্পর্কে তাদের অনীহা থাকবে। নারী প্রগতির প্রশ্নটা যে বাস্তবে উৎপাদনে তার ভূমিকার সঙ্গে, অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গেই যে তার মর্যাদাহানি ঘটে। সমাজের অগ্রগতি না ঘটলে যে তারও অগ্রগতি ঘটে না। এই বিষয়টা সম্যক উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তারাও বাস্তবে সচেতন, সংগঠিত ও আন্দোলনমুখী হয়ে উঠবে না। একমাত্রই এই সমাজ চেতনার প্রসারই তাকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

(সচিত্র মাসিক যুবদর্পণ)

নবম সংখ্যা ॥ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

কান্তি বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক

বনভূষণ নায়ক

যুবকল্যাণ বিভাগ/পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ)

কলিকাতা-৭০০০০১

প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ বিভাগের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাঁদ দে কর্তৃক তরুণ প্রেস, ১১ অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

সূচী

যুবসমাজের প্রতি :-

অশুভ ও অসুন্দরকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারে যুবসমাজ-

শান্তিপ্রিয় মানুষের আশা ভরসার মূর্ত্ত প্রতীক যুবসমাজ—

* বারোয়ারী পূজোগুলিকে কেন্দ্র করে জোর-জুলুম ও জবরদস্তি কি অসঙ্গত ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে মঞ্চ তৈরী করে যোগা-যোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত করা কি অশোভন ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* সারারাত্রিব্যাপী মাইক্রোফোন বাজিয়ে শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে বাধ্য করা কি অশালীন ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* নির্দিষ্ট দিনে প্রতিমা নিরঞ্জন না দিয়ে পূজোর সময়কে অহেতুক দীর্ঘায়িত করে অনর্থ সৃষ্টি করা কি অন্যায় ও অসুন্দর কাজ নয় ?

* বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবস্থা উপলব্ধি করে আলোকসজ্জায় পরিমিতি বোধের পরিচয় দেওয়া কি সুষ্ঠু ও সুন্দর নয় ?

কান্তি বিশ্বাস

সম্পাদকীয়

'অপারেশন' শব্দটি ইংরেজী হলেও এমন বঙ্গ-সন্তান সম্ভবতঃ কম আছেন যিনি শব্দটির সাথে পরিচিত নন। সাধারণ মানুষের কাছে কথাটির ব্যাপক প্রচলন আছে চিকিৎসা বিষয়ে। যখন কোন রুগীর গায়ে চিকিৎসকেরা রোগ নিরাময়ের জন্য অস্ত্র প্রয়োগ করেন—তাকেই সাধারণ কথায় 'অপারেশন' বলা হয়। শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় সামরিক বাহিনীতেও। যখন সেনাবাহিনী অস্ত্র হাতে শত্রুকে মোকাবিলা করেন—তাকেও 'অপারেশন' বলে লোকে জানে। ১৯৭১ সাল হতে ৭৭ পর্যন্ত এ রাজ্যের মানুষ আরও একটি ক্ষেত্রে 'অপারেশনের' দাপট দেখতে পেয়েছেন—এর নাম 'কুম্বিং অপারেশন'। সামরিক কায়দায় অতর্কিতে এক একটা এলাকা সি. আর. পি, অথবা পুলিশ বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলে তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হয়েছে এমন সব যুবকদের শাসক শ্রেণীর কাছে যারা শুধু অবাঞ্ছিত নয়—যাদের অবস্থান শাসক শ্রেণীর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তাদের এই 'অপারেশন'-এর মধ্য দিয়ে ধরা হয়েছে, পিটিয়ে-লাশ করা হয়েছে—ঘর ছাড়া করা হয়েছে—গুণ্ডা দিয়ে খুন করা হয়েছে। এই ভাবে শব্দটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে হাজির হয়। অর্থের এই দীর্ঘ তালিকার সাথে বোধ করি আর একটি নয়া সংযোজন যুক্ত করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এটির নাম 'বর্গা অপারেশন'।

বর্গাদার কথাটি কুচবিহার জেলা সহ কয়েকটি জেলায় আধিয়ার নামে পরিচিত। এরাও কৃষক। অন্য কৃষক থেকে এদের পার্থক্য এই এরা পরের জমিতে চাষ করে। নিজের মেহনত এবং কোথাও কোথাও নিজের বীজ-সার ইত্যাদি ব্যবহার করে ফসল ফলায়। এক অংশ নিজে পায়—অন্য অংশ জমির মালিককে দিতে হয়। দিতে হয় এই জন্য যে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে একবার যদি জমির মালিক হওয়া যায় তা হলে চাষ-বাস করাক বা না করাক জমি থেকে অধিকার যায় না—মালিকানা যায় না। যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ চলছে তার অনিবার্য ফল হিসাবে এক অংশের লোক কৃষি কাজ না করলেও জমির মালিকানা রাখার সুযোগ পাচ্ছে এবং জমি রাখছে আর অন্যদিকে সমাজের আর এক অংশের মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে জমি না থাকা সত্বেও কৃষি কাজ করছে নিজের জমিতে নয়—অপরের জমিতে। এদেরই নাম বর্গাদার।

যতদিন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলতে থাকবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার রেশটুকু যতদিন বজায় থাকবে ততদিন এই বর্গাদারী ব্যবস্থাও চলতে থাকবে। সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা পত্তন করার দ্বারাই একমাত্র ভূমিহীন কৃষককে জমির মালিক করা যায়—বর্গাদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যায়। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদই একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে অকৃষক জমির-মালিক জমি হারা হয়েও সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার পায়—বিকল্প জীবিকার সুনিশ্চিত সুযোগ পায়। আর কোন কৃষককেই নিজের পরিশ্রমে উৎপাদন করা ফসলের একটা সিংহ ভাগ জমির মালিক বলে কথিত কাউকে দিতে হয় না—নিজেই ভোগ করতে পারে এবং বর্গাদার শব্দটি অভিধান থেকে লুপ্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

সে কথা থাক। আমাদের দেশে দীর্ঘ কাল ধরে এই বর্গাদারী প্রথা চলে আসছে এবং বর্গাদার তার তৈরী ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য আবদন-নিবেদন করছেন, দাবী তুলেছেন। সংগঠিত হয়েছেন। লড়াই করেছেন। কখনও কখনও রক্ত দিয়েছেন, শহীদের মৃত্যুও বরণ করেছেন। সেই সংগ্রাম গ্রাম বাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও অব্যাহত রয়েছে।

অর্থ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত রক্ষণশীল রিকার্ডো সাহেব থেকে শুরু করে আধুনিক কালের অর্থনীতির অনেক বড় বড় তাত্ত্বিক অনেক গবেষণা করেছেন—মতামত প্রকাশ করেছেন জমিতে উৎপাদিত ফসলের মালিকের ন্যায্য অংশ নির্ধারণ করার জন্য। বিশ্বের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্ক্সও উৎপাদনে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করার জন্য শ্রমের ভূমিকা ও অবদান নিরূপণের জন্য তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের মত সামন্ততান্ত্রিক অথবা আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশে ভূমিহীন বর্গাদারের ভাগ্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

কিন্তু ভূমিকে আশ্রয় করে যে শোষণ সমাজের বুকে দীর্ঘকাল ধরে জগদ্দল পাথরের মত চেপে রয়েছে—কৃষক তাকে সরিয়ে ফেলার জন্য আমাদের দেশে বারে বারে লড়াইয়ের ময়দানে সংগঠিত হয়েছেন। কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনেব গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বিভিন্ন সময় রচিত হয়েছে। বর্গাদারের স্বার্থে তেজোদীপ্ত এ ধরনের একটি সংগ্রামের নাম তে-ভাগা আন্দোলন। বর্গাদার তার ঘামে ভেজা ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ দাবী করে এ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। জোতদার বা স্বীকার করেননি। ভূ-স্বামীদের স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে তে-ভাগা আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য সে সময়ের বৃটিশ সরকার এগিয়ে এসেছিল। বৃটিশ রাজত্বের সশস্ত্র বাহিনীর বুট, বুলেট ও বেয়নেটের বেপরোয়া আক্রমণে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বাহাদুর কৃষক পরাজয় বরণ করেননি। শেষ পর্যন্ত তে-ভাগা আইন বিধিবদ্ধ হয়—পরবর্তী কালে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে চার-ভাগা আইন পাশ হয় অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের তিন চতুর্থাংশ বর্গাদারের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

আইন পাশ হওয়া এক জিনিষ আর তার সুবিধা পাওয়া ভিন্ন জিনিষ বর্গাদার হিসাবে আইনে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত সে তার ন্যায্য পাওনা পেতে পারে না। বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্তি করার জন্য বিধান তৈরী হোল, ভাগচাষী কোর্ট বসলো। বর্গাদারকে জমির মালিকের বিরুদ্ধে মোকর্দমা করার সুযোগ করে দেওয়া হোল। বর্গাদার উচ্ছেদ রোধ করার আইনগত ব্যবস্থা তৈরী হোল। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও বর্গাদার তার ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার নিদিষ্ট অধিকার পেল না। জমি থেকে উচ্ছেদের বিড়ম্বনা থেকে সে মুক্তি পেল না। এ রাজ্যের প্রায় ৩৮ লক্ষ বর্গাদারের মধ্যে গত বৎসর পর্যন্ত মাত্র ৮ লক্ষ বর্গাদারের নাম বর্গাদার হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হয়েছিল। স্বভাবতঃই বর্গাদার যদি রেকর্ডভুক্ত না হন তা হলে ফসলের আইনগত অংশ পাওয়া সুনিশ্চিত হতে পারে না—জমি থেকে উচ্ছেদের বিপদ থেকেও মুক্তি পেতে পারেন না। আইন যতটুকু আছে তাকেও বৃদ্ধাংগুষ্ঠি দেখিয়ে এ যাবৎ বর্গাদারকে বঞ্চনা করা হয়েছে—শোষণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের অধীন একটি কমিটি (Task Force) রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবই ভূমি সংক্রান্ত আইনের দুঃখজনক পরিণতির প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

লক্ষ লক্ষ বর্গাদারকে কারচুপির হাত থেকে—জোতদারের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য আইনগত যতটুকু সুযোগ আছে তাকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বর্গা অপারেশন' নামে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করেছেন। এই অভিযানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল বিপুল সংখ্যক বর্গাদার অধ্যুষিত ছোট ছোট এলাকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে, ছোট ছোট স্কোয়াড গঠন করে, তার সাহায্যে বর্গাদারের সাথে—জোতদারের বাড়ীতে নয়—বর্গাদারদের পক্ষে সুবিধাজনক কোন জায়গায় সান্ধ্য বৈঠক এবং পর্যবেক্ষণ ও সরেজমিনে যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত রেকর্ডভুক্তি করা। এ ব্যাপারে কৃষক সংগঠনগুলির সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এবং রেকর্ডভুক্ত বর্গাদারেরা সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ঋণ পাওয়ারও সুযোগ পাবেন।

লোক দেখানো আইন থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগ পদ্ধতির ত্রুটী এবং সদিচ্ছার অভাবে যে বিরাট সংখ্যক বর্গাদার এতদিন পর্যন্ত রেকর্ডভুক্ত হতে পারেননি এবং আইনের বিন্দুমাত্র সুযোগ ভোগ করতে পারেননি আমরা বিশ্বাস করি সরকারের এই অভিনব উদ্যোগের ফলে তারা রেকর্ডভুক্ত হতে পারবেন এবং আইনগত যতটুকু সুযোগ বিদ্যমান তা লাভ করতে পারবেন।

গ্রাম বাংলায় যে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী যুব মানস রয়েছেন তার এক বিশাল অংশ এই বর্গা চাষের সাথে যুক্ত। বর্গা অপারেশনের সাফল্যের ফল হিসাবে সমগ্র বর্গাদারের সাথে এই অংশের যুব সাম্প্রদায়েরও জীবন-যন্ত্রণা একটু হ্রাস পাবে। সেই জনাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই 'বর্গা অপারেশন'কে স্বাগত জানাই—এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিশ্বের যুব সমাজের কাছে আহবান

(একাদশ বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসবের ঘোষণাপত্র)

বিশ্বের যুব ও ছাত্রবৃন্দ

বিশ্ব যুব ছাত্র আন্দোলনের আরও একটি বৃহৎ ঘটনা—একাদশ বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসব সফল ভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

আমরা, ১৪৫ দেশের দুইশত সংগঠনের ১৮৫০০ জন প্রতিনিধি ১৯৭৮-এর গ্রীষ্মে কিউবার হাভানা শহরে মিলিত হয়েছি। মিলিত হয়েছি রাজনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতা নিয়ে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি, শান্তি ও মৈত্রীর পতাকা উর্ধে তুলে ধরে, কিউবান জনতা ও যুব সমাজের আতিথ্য ও জয়োল্লাস পরিবৃত হয়ে। মিলিত হয়েছি আমাদেরই সমস্যা নিয়ে প্রকাশ্যে ও খোলামনে আলোচনা করতে, একে অপরকে উপলব্ধি করতে, আমাদের সাফল্য ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করতে, আমাদের জনগণের সাংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আমাদের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে।

আজকের বিশ্বে যুব সমাজ যে মহান ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে আমরা তাকে আর একবার স্বীকৃতি দিচ্ছি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশাল বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। আন্তর্জাতিক দাঁতাতের দিকে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আরও ব্যাপকতর ভিত্তির দিকে, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদার দিকে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্নতা নিয়েই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমান অধিকারের দিকে উল্লেখযোগ্য দিক পরিবর্তনের নিদর্শন মিলেছে; পুনঃমিলিত ভিয়েতনাম, ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়, পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অবসান, বিজয়ী এঙ্গোলা, ইথিওপিয়ার সামন্ত রাজত্বের অবসান—এ সবই হলো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত পরিবর্তন জনগণের ন্যায্য আসা-আকাংখা পূরণের জন্য গড়ে ওঠা আন্দোলনকেই সাহায্য করছে।

আমরা উৎসবে অংশ গ্রহণকারীরা, নূতন সমাজ তৈরীতে বিরাট সাফল্য অর্জনকারী সমাজতান্ত্রিক দেশ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন উন্নয়নশীল জোট নিরপেক্ষ দেশ ও ধণতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি সমূহের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমরা, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতিকে ব্যর্থ কর দিয়েও তার কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে অর্জিত বিজয়কে অভিবাদন জানাচ্ছি। তবুও সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বগুলিকে তীক্ষ্ম করছে, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, শান্তি ও সামাজিক প্রগতির দিকে জনগণের অপরিহার্য অভিযানকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং তারা আজও প্রধান শত্রু। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ও তাকে পরাস্ত করতে হবে।

আমরা ভালভাবেই উপলব্ধি করি যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির দিকে এই পরিবর্তন স্থায়ী করবার জন্য, আন্তর্জাতিক দাঁতাতকে ঐতিহাসিকভাবে অপরিবর্তনীয় চরিত্রের ও সার্বজনীন করে তোলার প্রক্রিয়ার জন্য এখন প্রয়োজন, যা পূর্বে কখনই ছিল না, সাম্রাজ্যবাদের সেই আধিপত্য ও শক্তি প্রয়োগের নীতির অবসান, অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে, পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী নরহত্যাকারী অস্ত্র উৎপাদনের বিরুদ্ধে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা তৈরী এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সহ সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী করার কাজ শুরু করা।

এই বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যুবক ও ছাত্রদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধির জন্য আমরা তাদের সহযোগিতা ও কাজের ক্ষেত্রে ঐক্য শক্তিশালী করবার জন্য কঠোর সংকল্পবদ্ধ।

কিউবা থেকে আমরা বিশ্বের যুবকদের আহ্বান জানাচ্ছি। বিশ্বশান্তি, দাঁতাত, নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী যুদ্ধের পরিসমাপ্তির জন্য সংগ্রাম আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন। নিউট্রন অস্ত্রের মত ব্যাপক ধ্বংসকারী অস্ত্রের উৎপাদন আবিষ্কারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দুনিয়াব্যাপী প্রতিবাদ সংগঠিত করুন।

সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ, নয়া-উপনিবেশিকতাবাদ, জাতি বৈষম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য, প্রতিটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উদ্ধার ও রক্ষার জন্য, অর্থনৈতিক সম্পর্কের ন্যায্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্য ও একটি নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্য ও কাজকে দ্বিগুণ করুন।

ধণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শোষণ, অত্যাচার, বৈষম্য, বেকারী, সংকট ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা ও বিকাশের জন্য, এবং গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামকে তীব্র করুন।

সংগ্রাম করুন যুব সমাজ যেন তাদের কাজের অধিকার

ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ, সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে।

যুব সমাজের মধ্যে আরও বেশী সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব

এই মহান লক্ষ্যের প্রতি অনুপ্রেরিত হয়ে জাতীয় স্বাধীনতার স্বপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের বিরুদ্ধে এবং বর্ণবৈষম্যবাদী রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসানের জন্য নামিবিয়া, জিম্বাবউ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ ও যুবকদের সংগ্রামের প্রতি সংহতিকে শক্তিশালী করুন। একইভাবে সাহারার জনগণের স্বাধীনতার জন্য ন্যায্য আকাংখার প্রতি এবং নয়া-উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আফ্রিকার জনগণের সংগ্রামের প্রতি তাহাদের সাহায্যকে দৃঢ়তর করুন।

আরব জনগণের সংগ্রাম, বিশেষতঃ পি এল ও-র নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের সংগ্রাম এবং লেবানন ও গণতান্ত্রিক ইয়েমেনের জনগণের সংগ্রামে আমাদের সংহতি আরও শক্তিশালী করতে হবে। এরা হল মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ, জিনোইজম ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য ও চিরস্থায়ী শান্তির পক্ষে। আবার এরাই সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের শিকার।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতির স্বপক্ষে চিলির জনগণ ও যুবকদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জোরদার করুন!

ফ্যাসিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে

উরুগুয়ে, নিকারাগুয়ে প্যারাগুয়ে, ব্রাজিল, বলিভিয়া ও অন্যান্য দেশের মানুষের সংগ্রামের প্রতি সংহতি শক্তিশালী করুন। শক্তিশালী করুন পোয়োর্টো-রিকোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ও ফ্যাসিবাদের বিপদের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত আর্জেন্টিনার যুবক ও জনগণের সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ও পূর্ণ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতির জন্য লাতিন আমেরিকার ও ক্যারিবিয়ান জনগণের সংগ্রাম। দেশের শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের জন্য এবং জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সীমানাগত অখন্ডতা রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভিয়েতনামের জনগণের প্রতি সংহতিকে জোরদার করুন।

নূতন সমাজ গঠনরত কিউবার মহান জনগণের বিরুদ্ধে অবৈধ জঘন্যতম অবরোধের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা উপচে পড়ুক। গুয়ানতানামোয় সামরিক ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে নিঃসর্ত প্রত্যার্পণ করতে হবে এই ন্যায্য দাবীর সমর্থনে আমাদের সংহতিকে দৃঢ়তর করুন।

বিশ্ব উৎসব আন্দোলনের ইতিহাসে একাদশ উৎসব সুদৃঢ় স্তম্ভের মত বিরাজ করুক এবং এই উৎসবের অর্জিত সাফল্যগুলি বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল যুব সমাজের কার্যক্ষেত্রে ঐক্য ও সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন।

স্বাধীনতা ও মর্যাদার জন্য সংগ্রামরত সমস্ত জনগণের প্রতিই আমাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংহতি শক্তিশালী হোক। শান্তি ও সামাজিক প্রগতির পথের যাত্রীদের প্রতি প্রেরণা ও সাহায্যের হাত আরও প্রসারিত করুন।

আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ ঐক্যবদ্ধ হোক:—

—জনগণের আরও বিজয় অর্জনের জন্য
—আন্তর্জাতিক বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের আরও সাফল্যের জন্য
—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি, শান্তি ও মৈত্রীর জন্য বিশ্ব যুব ছাত্র উৎসব দীর্ঘজীবী হোক।

হাভানা—৫ই আগস্ট, ১৯৭৮

বাঙলা সাহিত্যে ছন্দপতন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় / ডঃ সরোজমোহন মিত্র

'ছন্দপতন' মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই লেখা একটি উপন্যাস। নবকুমার নামে এক তরুণ কবির আত্মকাহিনী। এই কবি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে—"অল্প-বয়সী কবি সম্পর্কে একটা চলতি ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে—অনেক বদ্ধমূল সংস্কারের মতই সেটা জোরালো। তরুণ কবি বলতে লোকে ধরে নেয় কমবেশী স্নায়ুপ্রবণ, ভাবপ্রবণ পরম বোহিসেবী অকেজো অভিমানী একটা জীব—জীবন ও জগৎটা যার কাছে নিছক স্বপ্নাদ্য ব্যাপার।

আমার সম্বন্ধে এরকম একটা ধারণা নিয়ে এ কাহিনী পড়তে বসলে আমার অনেক কথা আর কাজের ঠিক ঠিক মানেটি বুঝতে অসুবিধা হবে—অসুবিধা কেন, মানে বোঝা সম্ভব হবে না। কারণ, আমি ঠিক বিপরীত রকম কবি এবং মানুষ।

আমি বস্তুবাদী কবি।

শুধু কবিতায় নয় সব বিষয়েই বস্তুবাদী।

বস্তুবাদী কবি কি?

যে সত্যবাদী কবি। দুটো একই কথা। বস্তুই সত্য, সত্যই বস্তু।

আমি কবিতা লিখি, শব্দমদ চোলাই করি না। আকাশ চষে আমি কাব্যফুলের চাষ করি না, মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই। জীবন্ত মানুষের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবস্তু জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব-চিন্তা আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে পুষ্ট।

ছেলেবেলা থেকেই কবিতায় খোকামি আর ন্যাকামি আমার পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে পনের বছর বয়সে লিখেছিলাম—

শব্দ মদ বেচা শুঁড়িগুলো
কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।

শুঁড়িগুলো সব মরে যাক,
কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।

ইচ্ছারূপিনী কাব্যলক্ষ্মীর সব বয়সের বিচিত্ররূপের সঙ্গে তখনও অবশ্য আমার পরিচয় ঘটেনি, কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে সতেজ প্রাণবন্ত কবিতার দিকে ওই বয়সেই আমার কেমন পক্ষপাতিত্ব ছিল।

শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বস্তুবাদী।

কবি তার কবিতায় একরকম, জীবনে অন্যরকম—এটা আমার উদ্ভট ব্যাপার মনে হয়। এ যেন ব্রহ্মচারীর নারী অঙ্গ স্পর্শ না করেও শুধু ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে পুত্রোৎপাদন।

বাইশ বছর বয়সে আমি প্রথম স্থির করি এবার আমার কবিতা বাজারে ছাড়া দরকার।

তার আগে কোথাও একটি কবিতাও আমি প্রকাশ করিনি।

এই বয়সের কবির কবিতা ছাপাবার প্রথম প্রচেষ্টায় কত কুণ্ঠা কত ভীরুতা থাকে কারো অজানা নেই,—কবিতা লিখে সে যেন মস্ত অপরাধ করেছে, কবিতা ছাপাতে চেয়ে অপরাধ করতে চলেছে তার চেয়েও মারাত্মক!

ভীরু লাজুক কবিকে সহজে কেউ পাত্তা দেয় না, চারিদিক থেকে তার ভাগ্যে জোটে শুধু অনাদর, উদাসীনতা ছেলেমানুষ কবি হতাশা ও অভিমানে জর্জরিত হয়ে যায়।

আমি এ হতাশা ও অভিমানকে প্রশ্রয় দিইনি।

নতুন কবির উপর জগৎ অকথ্যরকম নিষ্ঠুর, নতুন কবিকে সবাই গায়ের জোরে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে—এটাকে খাঁটি নির্জলা সত্য বলে মানতে আমি প্রথম থেকে অস্বীকার করেছি।"...

এ সবই কবি নবকুমারের কথা। তার আরও কথা আছে। তাও উল্লেখিত হবে ক্রমশঃ। কিন্তু নবকুমারের কাহিনীর এ ভূমিকা পড়তে পড়তে মনে হবে এ যেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের সাহিত্য-জীবনের কাহিনী।

বাঙলা সাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ আবির্ভাব বাংলা ১৩৩৫ সালে। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় গল্প ছাপানোর জন্য লিখে-ছিলেন 'অতসীমামী'। অবশ্য মাণিক এ গল্প সম্পর্কে নিজেই তাঁর 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধ লিখেছিলেন "রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী"। কিন্তু এ গল্প তো তিনি প্রকৃত অর্থে সাহিত্য করার জন্য লেখেননি—লিখে-ছিলেন 'বিখ্যাত মাসিকে গল্প ছাপান নিয়ে তর্কে জিতবার জন্য।' সেজন্য এ গল্পে নিজের আসল নাম 'প্রবোধকুমার' না দিয়ে দিয়েছিলেন ডাক নাম "মাণিক"।

মানিকের 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায়। তার পূর্বে এই পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', তার পূর্ব থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন'। তখন বাঙলা সাহিত্যে 'আধুনিকতা' নিয়ে যে প্রচন্ড ঝড় এবং বিতর্ক দেখা দিয়েছিল বাঙলা সাহিত্যের এই দুটি উপন্যাসে তার সার্থক প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু তার বছর দুই আগেই বাঙলা দেশে এবং বাঙলা সাহিত্যে আরেকটি প্রবণতা খুব জোরালো হয়ে উঠেছিল—তা রাজনীতি। ১৯২৬ সালে পুস্তকা-কারে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'

ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এবং তার সমকালেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা সহ লেখা হোল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন তখন মনে হয় রাজনৈতিক উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত। সেজন্য মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পর্বের লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায় না। সাহিত্যে আধুনিকতাই ছিল তখন প্রধান আলোচ্য। মানিক তাঁর তৎকালীন মানসিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমার সাহিত্য করার আগের দিনগুলি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে প্রথম এক বছর কি দু'বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেঁটেছি এবং তারপর কতদিন খুব সোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে 'আধুনিক' সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হ্যামশুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ-র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।" (সাহিত্য করার আগে)

তারপর নিজের ব্যক্তি মানস, বাস্তব জীবনে সংঘাত এবং সাহিত্যে অভাববোধ সম্পর্কে লিখেছেন, "ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্প বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরাল হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্টতা জন্মেছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরাল করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটিয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকায়, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মানুষের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে।

গরীবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত —জিজ্ঞাসা জাগত, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?

ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা—বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবন দর্শন খোঁজার মত সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশ্যই তখন ছিল না।

সাহিত্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত পেতাম জবাবের। বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সাহিত্য আবার জাগাত নতুন নতুন জিজ্ঞাসা। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তাম গল্প উপন্যাস। গল্প উপন্যাস, পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাস করতাম বাস্তব জীবন।

......আমার জিজ্ঞাসা ছিল প্রেম আর দেহ সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে, সাহিত্যের প্রেম আর বাস্তব জীবনের প্রেম নিয়ে। সাহিত্যের ফাঁকা প্রেম খুঁজে পেতাম না মধ্যবিত্তের জীবনে অথবা নিচের তলায়। মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবনের প্রেমে যেটুকু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সন্ধান পেতাম না নিচের তলার জীবনে। আবার নিচের তলার প্রেমে ঐশ্বর্যের রিক্ততা সত্ত্বেও যে সহজ বলিষ্ঠ উন্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জীবনে তার অভাব ধরা পড়ত।"

"যাই হোক, ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? মানুষ যে ভাল, নয় মন্দ হয়, ভাল-মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্তের হৃদয়।

ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার বিকার-গ্রস্ততা, সংস্কার প্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যায় কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্র জীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ? ভদ্র সমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর, মাঝি-মাল্লা, হাড়ি-বাগ্দিদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা—যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে-- সাহিত্যে দেখা যায় না?

ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা, বাস্তব জীবন ও সাধারণ বাস্তব মানুষের অভাব বড়ই পীড়ন করত। সংঘাতের পীড়ন।

আমার নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরাল হয়ে উঠছিল, সাহিত্য নিয়েও ক্রমে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম।

ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় আর মা, অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে! আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্র জীবনকে ভালবাসা, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোস-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভুষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছন্দপতনের কবি নবকুমারের

মতই বস্তুবাদী বা সত্যবাদী লেখক। মধ্যবিত্তসুলভ ভাবপ্রবণতাকে কাটিয়ে মাটির পৃথিবীর মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্যের ফসল ফলাতে চেয়েছেন। তাঁর আগে বাঙলা সাহিত্যে অনেক নামী-দামী সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম শরৎচন্দ্রই সাহিত্যে বাস্তবতাকে স্বীকৃতি জানালেন। সমাজ জীবনে আপত নিস্তরঙ্গতার অন্তরালে যে কান্ত যন্ত্রণা এবং বেদনাবোধ লুকিয়ে ছিল শরৎচন্দ্রই প্রথম আমাদের কাছে তা উপস্থিত করেছেন। তিনিই প্রথম অনেক অন্যায় আর গোঁড়ামিকে নির্মম আঘাত করেছেন। শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে পতিতা আর অসতীরা চরিত্র হয়েছে। বড় হয়ে উঠেছে অদের মনুষ্যত্ব। তখনকার অন্য কোন লেখক এটা পারেননি। তবে শরৎ-চন্দ্রের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল মূলত মধ্যবিত্ত নারীত্বের ক্ষেত্রে। মাঝে মাঝে তার সাহিত্যে সমাজজীবনের মূল সমস্যা দেখা দিলেও সামাজিকভাবে তাকে তিনি আঘাত করতে পারেননি। বিষয়ী সামন্তবাদী মানসিকতা এবং সমাজব্যবস্থার আমূল উচ্ছেদ করতে না পারলে কেবল ভাবপ্রবণতার দ্বারা অন্যের হৃদয়কে সিক্ত করা যায়, মূল সমস্যার কোন সমাধান করা যায় না।

মাণিকের সমকালে বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন অভিযান দেখা দেয়। এই অভিযাত্রীরা ছিলেন হামশুন-লরেন্স-হাক্সলি-গোর্কীর ভাবশিষ্য। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ভাঙনের পরে এদের মধ্যেও ভাঙনের প্রবল নেশা এবং পরিণামে হতাশা আর নৈরাশ্যই দেখা দিল। এই অভিযানের যুগকে সংক্ষেপে বলা হয় 'কল্লোল যুগ'। এদের বয়সে ছিল তারুণ্য, ভাবে ছিল রবীন্দ্র বিরোধিতা। এদের ভাষার তীব্রতা, ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানি ও নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা বাঙলা সাহিত্যে এক আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু এদের বিদ্রোহে যতটা ফেনা ছিল ততটা বাস্তবতা ছিল না। আসলে এরা ছিলেন মূলত রবীন্দ্রভক্ত এবং রোমান্টিক ভাববিলাসী। তবু এই সময়ে বাঙলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের বাঙলা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ছিলেন প্রধানত সমাজের উপরতলার মানুষ। শরৎচন্দ্র সেখানে পতিতাদের ভীড় জমালেন। আকবর লাঠিয়ালরা সেখানে প্রবেশ পেল। কল্লোল যুগের লেখকদের রচনায় এল খাঁটি গ্রামের মানুষ আর কয়লাখনির কুলি-কামিনরা। এঁদের হাতে আমরা পেয়েছি খাঁটি গ্রাম্যজীবনের আর কয়লাখনির ছবি। ছবিগুলো ঠিক বাস্তবতা লাভ করতে পারেনি। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে বাস্তব সংঘাত আসেনি! মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ব্যক্তি জীবন এসেছে কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি—বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবস্তাব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয়নি, ওই একই রোমাঞ্চ শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যে সেই বাস্তবতার অভাব পূরণ করেছেন। তিনি শৈশব থেকে সারা বাঙলার গ্রামে শহরে ঘুরে ঘুরে যে জীবন দেখেছেন, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছেন, সেই সাধারণ বাস্তব মানুষের জীবনকেই সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে বাস্তবতার আমদানি বাঙলা সাহিত্যে মাণিকের অন্যতম অবদান।

মাণিক ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানীর মতই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জীবনকে দেখা ছিল তাঁর অভ্যাস। বিজ্ঞানীর মত নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়েই মাণিক বাঙলা উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন একের পর এক অনন্যসাধারণ চরিত্র—শ্যামা, শশী, যশোদা, সত্যপ্রিয়, বম্ভা, রাঘব মালাকার প্রভৃতি। বাঙলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখা ছিল মাণিকের আরেকটি অবদান।

সে জন্যই তো 'ছন্দপতন' উপন্যাসের কবি নব-কুমারের মত মাণিকও বলতে পারেন, 'শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বাস্তববাদী।' হতাশা আর অভিমানকে মাণিকও প্রশ্রয় দেননি। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জননী'র শ্যামার জীবনে এসেছে আঘাতের পর আঘাত। নানা বিপর্যয়ে জীবন তার ক্ষতবিক্ষত, তবু হতাশায় না ভেঙে পড়ে সে তার ছেলেদের নিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যই সংগ্রাম করেছে। তাঁর গল্পে উপন্যাসে এর অজস্র উদাহরণ আছে।

সেজন্যই বন্ধুরা যখন বলে পত্রিকার সম্পাদকরা গায়ের জোরে নতুন লেখককে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে তখন সে কথা কবি নবকুমারও স্বীকার করে না, মাণিকও প্রতিবাদ করে লিখে ফেলেন প্রথম গল্প 'অতসীমামী' এবং তা অচিরে প্রকাশিতও হয়।

মাণিকের জীবনে একটা প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অদ্ভুত দৃঢ়তা। নবকুমারকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বললে সে অনায়াসে দৃপ্ত ভঙ্গিতে নিজের কবিতাই আবৃত্তি করে শোনায়, তার স্বকীয়তা প্রচার করে। মাণিকও বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃঢ়তা নিয়ে উপস্থিত। নবকুমারের মত তিনিও বলতে পারেন, "আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন রূপায়িত করছি আমার কবিতায়।"

জীবন বিচিত্র। ভয় লোভ হিংসা আর মিথ্যার চাপে বিকারগ্রস্ত জীবন। অপিাতদৃষ্টিতে যাকে চরিত্রের দৃঢ়তা মনে হয় আসলে তাও যে নিছক প্রাণশক্তির একটা বিকার। সামঞ্জস্যবিহীন জীবনযাত্রা। ঘরের কোণে সংসারের কাজে আটক তৃপ্তি আর আধুনিক মধ্যবিত্ত শিক্ষিতা মেয়ে মানসীর মধ্যে সামাজিক নিয়মে কোন তারতম্য নেই। সে জন্য মানসীদের মধ্যেও দেখা যায় সুনির্দিষ্ট মানসিক গঠনের অভাব। "তৃপ্তিদের জীবন হয় পঙ্গু, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে অগভীর কৃত্রিম সুখ-দুঃখের কারবার।" আর "মানসীদের জীবন্ হয় আরও খানিকটা

ছড়ানো এলোমেলো বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিশেহারা আর আত্মবিরোধে জটিল। সেও দ্রুতা সত্যিকারের মুক্তি পায় না। তৃপ্তি আর মানসীর জীবন সেই একই পরাধীনতার এপিঠ আর ওপিঠ। বাইরে খানিকটা চলাফেরা, অনেকের সঙ্গে মেলামেশা, খানিকটা বাঁধাধরা বিদ্যা আর ছাঁচে ঢালা অভিজ্ঞতা—মানসীদের আসল পাওনা এইটুকুই। সংঘাতময় বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তারও আত্মীয়তা নিষিদ্ধ—দু একটি ঢেউ শুধু গায়ে লাগতে পারে। তারই মারাত্মক ফল হয় সঙ্গতিহীন স্বকীয়তাহীন বিচিত্র কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অনৈক্যময় চেতনার বিকাশ। আজ যা চরম সত্য, কাল তা সত্য কুৎসিৎ মিথ্যা মনে হয়। অজ যা জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা, কাল তার মূল্য খুঁজে পায় না।"

সংসারের ধরাবাঁধা নিয়মনীতিগুলো আজকাল আর চলে না। খাটো কাপড়ের মত নীতির আঁচল এদিকে টানলে ওদিকে কুলোয় না। মধ্যবিত্ত সমাজ-সংসার একটা প্রচণ্ড ভাঙনের মুখে। পুরানো রীতিনীতি মেনে আর চলছে না। আর্থিক অনটন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য তাদের জীবন সংগ্রাম তীব্রাকার ধারণ করেছে। পেটের দায়ে সারাদিন চানাচুর বিক্রী করেও বাড়িতে চাকরি বলে তাকে চালিয়ে যেতে হয়। অর্থের জন্য কিশোরী মেয়েকেও অন্যের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে হয়। পুরানো মূল্যবোধ আর নেই অথচ তাকে অস্বীকার করে এমন মানসিক দৃঢ়তাও নেই।

সংঘাতময় এ জীবনে নবকুমারের মনে স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশ্ন জাগে "কবিতা লিখি কেন?" আর্টের অনেক বই পড়ে, অনেক তর্ক সভায় হাজির হয়েও কবি নবকুমার সঠিক বলতে পারে না কেন সে কবিতা লেখে? এ নিয়ে চলে অনেক চিন্তা, অনেক অস্থিরতা। রাজপথে মানুষের ভিড়ের সঙ্গে মিশে কবি একাকার হয়ে যায়। বিচিত্র বেশ আর বিচিত্র বয়সের পথ-চলা ব্যস্ত মানুষগুলো এক সমগ্রতার ঐক্য জানিয়ে দেয় কবির মনে। কবি অনুভব করে "পথে-হাঁটা মানুষ পথে দুদিকেই হাঁটে, পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যায় বিপরীত দিকে কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার পথ শুধু পিছন থেকে সামনের দিকে, পাথেয় শুধু জীবনকে এগিয়ে নেবার সংগ্রাম।"

কবি উপলব্ধি করেন, "মানুষের সংগ্রামী জীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই আমার কবি হওয়ার সাধ।" এই শহরের পাকা দালান থেকে বস্তির খোলার ঘর থেকে গ্রামের ওই খড়ের ঘরের অগণিত মানুষ আমার পথ চেয়ে আছে, উৎকর্ণ হয়ে আছে ছন্দে ও সুরে আমার আহ্বান শোনার জন্য। এ মিথ্যা কথা নয়, অলীক কল্পনা নয়। দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু দিয়ে আমি লক্ষ কোটি মানুষের এই অসীম ধৈর্যের প্রতীক্ষা অনুভব করি।" তারা যেন কবিকে আহ্বান করে বলছে—"হে আমাদের কবি, হে আমাদের নবজন্মের নবজীবনের নববসন্তের মুখর প্রতীক, আমরা তোমায় বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে এস।"

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তার "কেন লিখি" প্রবন্ধে লিখেছেন, "জীবনকে আমি যে ভাবে ও যত ভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে—আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারী যা কোনদিন পেতো না।"

চলার পথে একদিন নবকুমার দেখল কলোনীর ধারে তমালকে। ছেঁড়া একটা ডুরে কাপড় পরে কলে কলসী ভরছিল। "রাস্তায় গাড়ী চলছে তার খেয়াল নেই কিন্তু প্রত্যেকটি লোকের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। যেন জিজ্ঞেস করছে, আমি কে জানো? আমি মেয়ে নই, আমি একটা মানুষ।" "এ তার নারীত্বের মনুষ্যত্ব চাওয়া নয়। মানুষ বলেই মনুষ্যত্ব দাবী করা। সে মেয়ে না পুরুষ সেটা বড় কথা নয়, সে মানুষ। মেয়েলি সমস্যা তার আসল সমস্যা নয়, তার একেবারে গোড়ার সমস্যা। বঞ্চিতদের অধিকার নিয়ে অনেক মেয়ে লড়াই করেছে, এখনো করছে। কিন্তু ওই বয়সের ওরকম একটি সাধারণ মেয়ের কাছে এই দাবী ছাড়া আর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যাওয়া সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার।" মানুষের মত বাঁচার জন্য ও অনায়াসে নারীত্বের মর্যাদা চুলোয় দিতে পারে আবার দরকার হলে সেজন্য অনায়াসে গুলির সামনে বুক পেতেও দিতে পারে। ওর এই কথাটা কবির কাছে ভাষা দাবী

আরেকদিন চলতে চলতে কবি গিয়ে হাজির হয় মনুমেণ্টের নীচে—হাজার ত্রিশেক জনসমাবেশে। চারিদিকে যে অসহ্য অবস্থা তার প্রতিকারের দাবিতে এই সমাবেশ। কবি এই সমাবেশের জন্য একটা কবিতা লিখে এনেছেন তার নাম 'প্রতিকার চাই'। কবিতাটা কিশোর অধীরের ভালো লাগে। কারণ এতে সত্যি প্রাণ আছে। এক সভায় কবিতাটা বেশ নাড়া দেয়। কবি উপলব্ধি করে এতদিনে সে কবিতা লেখার মর্ম উপলব্ধি করেছে—কবিতার ধরণই বদলে গেছে তার।

নানা মানুষের কাছে সে তার কবিতাকে নিয়ে যায়। তারা শোনে। গভীরভাবে তাদের নাড়া দেয় কিন্তু সমাজের নীচুতলায় যারা আছে, চানাচুর বিক্রীওয়ালা নিখিল, আলেয়া প্রভৃতি সন্তুষ্ট হয় না। তাদের দাবী তারা বুঝতে পারে এমন কবিতা চাই।

কবি নবকুমার সেখানে নামে না। কারণ শুধু বন্ধু-মহলে তারিফ পাওয়ার জন্য তো সে কবিতা লেখে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা আর প্রতিকার নামে যে কোন অসংযম আর উশৃঙ্খলতাকেও প্রশ্রয় দেয় না, কোন স্বার্থের খাতিরে সজ্ঞানে সচেতনভাবে নিজের বিবেককেও বিলিয়ে দেয় না। যে জন্য সে যায় একটি সাধারণ মেয়ে তমালের কাছে কিংবা মহিমের বিড়ির দোকানে কবিতা শোনাতে। কারণ তার কবিতা যদি এদের নাড়া না দেয় তাহলে ব্যর্থ হবে তার নতুন যুগের কবিতা লেখা।

'প্রতিভা' সম্পর্কে সাধারণ ধারণার প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই। কারণ সে জানে, "প্রতিভা কোন আকাশ থেকে পড়া গুণ কিংবা ছাঁকা কোন গুণ নয়। অনেক কিছু জড়িয়ে এই গুণ—কোন বিষয়ে সাধনা করার বিশেষ ক্ষমতা আর আগ্রহই আসল কথা। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভা আসলে এক—দুজনের মধ্যে তফাৎ শুধু ঝোঁকের। মনের গড়ন, পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা অনেক কিছু মিলে ঝোঁকটা ঠিক করে।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'প্রতিভা' শীর্ষক রচনায়ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "প্রতিভা ওই দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা। আর কিছুই নয়। কোন বিশেষ প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মায় না।" আসলে এটা একটা মিথ্যা অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার লেখক কবিকে ছাড়তে হবে। তাদের ভাবতে হবে "আমি দশজনের একজন।" "জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনই তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়।"

কবি নবকুমার উপলব্ধি করে তার কবিতা সাধারণ মানুষের ঐতিহ্যগত কাব্যবোধকে নাড়া দিতে পারলেও তাতে তাদের প্রাণের ভাষা আসেনি। তার কবিতায় নতুন ভাব, নতুন যুগের নতুন সত্য এলেও যেন তা সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না। সেজন্য এক ভীষণ অস্থিরতায় সে ছুটে যায় সবরকম মানুষের কাছে। মিলেমিশে তাদের আপন হবার চেষ্টা করে।

অবশেষে সে উপলব্ধি করে তার মধ্যে সংগ্রামী মানুষের মর্মবেদনাকে রূপ দেওয়ার জন্য এক বিরাট ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু তাদের প্রতি যথার্থ ভালবাসা নেই। সে যেন যন্ত্রের মত অস্থির হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত নবকুমার হারানো খেই পেল। যথার্থ উপলব্ধি করল, "ভালবাসা ছাড়া শ্রদ্ধা নেই—শ্রদ্ধা ভালবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না। শ্রদ্ধায় ভালবাসায় মানুষের আপন না হয়ে কি করে জানব সেই প্রাণের ভাষা—যে ভাষায় ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।"

এই উপলব্ধির মধ্যেই নবকুমারের কাহিনী শেষ কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখানেই শুরু। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে অনেক বিখ্যাত লেখক ছিলেন। নানা আদর্শ, চিন্তা এবং রূপায়ণের জন্য তাদের শ্রেষ্ঠত্বও অনস্বীকার্য, কিন্তু শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা দিয়ে সমাজের সংগ্রামী মানুষের মর্মবেদনাকে ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্ব বোধ হয় একমাত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার পূর্বে সাধারণের প্রতি যথার্থ ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র শরৎচন্দ্রের মধ্যে কিন্তু তাঁর ক্ষেত্র সীমিত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র লেখক যিনি সংগ্রামী মানুষের জীবন সমস্যাকে, সমাজের শ্রেণী সংঘাতকে, নতুন যুগের নতুন সত্যকে তীব্রভাবে রূপায়িত করেছেন। গতানুগতিক ভাবধারাকে ভেঙেচুরে তিনি সম্পূর্ণ নতুন খাতে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন সেজন্য একদিকে তিনি যেমন বাঙলা সাহিত্যের ছন্দপতন অন্যদিকে তেমনি তিনি নতুন যুগের পথিকৃৎ।

"কোন দেশের অধিবাসীদিগকে সাময়িককালের জন্য নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়া অপমানের বোঝা বহিতে বাধ্য করা যায় বটে কিন্তু তাহাদিগকে চিরতরে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায় না।"

—রবীন্দ্রনাথ

ফাঁসীর মঞ্চে শৃঙ্খলিতের এই প্রহরে ॥

মূল রচনা—ফায়েজ আহ্‌মদ ফায়েজ (উর্দু)
অনুবাদ—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ফায়েজ আহ্‌মদ ফায়েজ পাকিস্তানের কবি। শিক্ষালাভ লাহোরে ১৯৫১-৫৫ মন্টগোমারী জেলে বন্দীবাসে ছিলেন। ভারত-পাকিস্তান মৈত্রীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী কর্মী। ১৯৫১ সালের ৫ মার্চ 'অবজার্ভার' এই মন্তব্য করেছিল: 'ভারত-পাকিস্তান জুড়ে ঘৃণার আবহাওয়া যখন তুঙ্গে, তখন তিনি অসম সাহসিকতায় মহাত্মা গান্ধীর শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেন। মুসলীম-লীগ-পন্থীরা তাঁকে যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বিষে জর্জরিত করেছিলেন, তা তাঁর কম্যুনিষ্ট মনোভাবের জন্য নয়—লীগ-পন্থীদের বন্ধ্যা ও অসার নীতিসমূহের নির্ভিক ও কঠোর সমালোচনার জন্য।' ইনি লাহোর থেকে প্রকাশিত 'পাকিস্তান টাইমস'-এর সম্পাদক। ইকবালের পর ফায়েজ সাহেবকেই উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি রূপে গণ্য করা হয়।

প্রতীক্ষার এমনতর সংশয়াকুল অন্তিম প্রহর
মূর্ত হয়,
সমস্ত চলার পথেই, জীবনের পথে পথে।
আকাঙ্ক্ষিত বসন্তদিন ব্যতিক্রম শুধু,
উৎকণ্ঠাহীনতায় নির্মলিন দিন;
প্রতীক্ষার এমনতর অন্তিম প্রহরে
উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের চেনা-দিনলিপি
বোধিমূলে গড়ে দেয় দুর্বহ ভাব—
পরীক্ষার এই হ'ল মাহেন্দ্রক্ষণ,
পরীক্ষাঃ অনশ্বর প্রেমের।
দৃশ্যের গোচরে আসে প্রিয় মুখচ্ছবি
এই শুভক্ষণে,
শান্ত-সমাহিত হয় অস্থির হৃদয় এই শুভক্ষণে।
অর্থহীন সে-নন্দিত প্রহর,
পাশে যদি না-ই থাকে অংশভাগী সহযোদ্ধার মুখ,
যখন ছায়ামালা নৃত্যপরা,
অথবা যখন ঠাণ্ডা মেঘ ভেসে যায়
পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে,
ছুঁয়ে যায় চেনার বা সাইপ্রেস গাছের পাতা
অর্থহীন সে-নন্দিত প্রহর,
সুরাহীন সুরাপাত্রের মত।
অসামান্যে-প্রতীকিত এইসব চিহ্নরাজি অনিঃশেষ হয়ে আছে
বহুকাল ধরে,
যেমন এখন, বর্তমান এই প্রহর, দৃষ্টির আড়ালে রাখে
প্রিয়সাথীমুখ
শৃংখলিত ফাঁসীমঞ্চে আনন্দিত উল্লাসের বর্তমান ক্ষণ
প্রয়োজন ও প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষণ—যেমন এখন।
রক্তগোলাপ—উন্মীলনে শ্রেষ্ঠ-প্রকাশ
বাগানে যখন,
তুমি তার কেউ নও
অথচ
ফাঁসীমঞ্চে তুমিই সম্রাট;
কে আছে এমন শক্তি, বন্দী করে ধরে রাখে
ঊষার সমীরের পদ-সঞ্চরণ!
সুপ্রকাশ বসন্ত-মাধুরী সে তো সদাই ধরা।
সেই প্রহর
নাইটিঙ্গেল পাখির গান, বাহারী রঙিন ফুলসাজে
নন্দিত ছন্দিত সে-প্রহর
আমি যদি না দেখি,
অন্যেরা দেখবে দু' চোখ ভরে।

মধ্যপ্রদেশের প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র / সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৩ সাল। মধ্যপ্রদেশের বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ বিষ্ণুশ্রীধরবাকঙ্কর ফিরছিলেন মান্দাসর জেলা থেকে। ভনপুরে পৌঁছে নদী পার হওয়ার জন্যে তীরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। বালির মধ্যে পড়ে রয়েছে দুটি পাথরের কুঠার। তাঁর মনে হল ঐ গুলি যারা তৈরি করেছিল নিশ্চয় তারা কাছাকাছি গুহাগুলিতেই থাকত।

কিছুদিন পরেই ডঃ বাকঙ্কর সেখানে শুরু করলেন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ। কাজ শুরু করার পর তৃতীয় দিনেই এক বিশাল গুহার মধ্যে পাওয়া গেল নানা ধরণের প্রত্নবস্তু। ডঃ বাকঙ্কর গুহাটির ভিতরের চারদিকে চোখ বোলাতে গিয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর নাড়ির গতি দ্রুত হয়ে গেল—গুহাটির দেওয়ালে, ছাদে আঁকা রয়েছে অজস্র ছবি, প্রায় হাজার দুয়েক! ডঃ বাকঙ্করের চোখের সামনে ভেসে উঠল ফ্রান্স ও স্পেনের বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রগুলি, মনে পড়ে গেল বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন সাহেবের কথা—ভারতে কোন গুহাচিত্র নেই। সুপণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ বাকঙ্কর তাঁর স্কেচ বই নিয়ে ছবিগুলি আঁকতে বসে গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ভনপুর থেকে মাইল ছয়েক দূরে মোদিতে ডঃ বাকঙ্কর আবিষ্কার করলেন আরও কুড়িটি গুহা। সেগুলিতেও ছিল নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগের বহু গুহাচিত্র।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ডঃ বাকঙ্কর মালব উপত্যকার প্রায় ছাব্বিশটি অঞ্চলে তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। দেখা গেল ঐসব অঞ্চলের মৃৎপাত্রগুলির গায়ে যে সব জীবজন্তর ছবি আঁকা রয়েছে তাদের সঙ্গে কাছাকাছি নরসিংহবাদ ও ভনপুরের গুহাচিত্রগুলির রয়েছে অদ্ভুত সাদৃশ্য। আরও দেখা গেল ঐ সব মৃৎপাত্রগুলি মধ্যপ্রদেশের মহেশ্বর ও নবদাতোলি অঞ্চলের মৃৎপাত্রের সমসাময়িক। এদের বয়স হল—২১০০—১৩০০ খৃীষ্টপূর্বাব্দ। অর্থাৎ নরসিংহবাদ ও ভনপুরের গুহাচিত্রগুলিও ঐ সময়েই আঁকা হয়েছিল। সেই প্রথম ভারতে গুহাচিত্রের বয়সকাল নির্ধারণ করা সম্ভব হল। এদেশে প্রথম গুহাচিত্র আবিষ্কার করেছিলেন আর্চিবল্ড কার্লাইল ও জে ককবার্ণ বারানসী ও এলাহাবাদের মাঝামাঝি মীরজাপুর জেলার গুহায় সেই ১৮৮০ সালে। পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশের মহাদেব পর্বতমালার গুহাগুলিতে যে সব গুহাচিত্রগুলি তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলিকে শুধুমাত্র শিল্প-আঙ্গিকের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যস্ত করার চেষ্টা করার ফলে তাঁরা খুব আশাপ্রদ ফললাভ করতে পারেননি। যাই হোক, নরসিংহবাদ ও ভনপুরের গুহাচিত্রগুলির সঙ্গে মালব উপত্যকার মৃৎপাত্রগুলির গায়ে আঁকা ছবিগুলির মিল দেখে মনে হয় তাম্রপ্রস্তর যুগে ঐসব গুহাগুলিতে যারা বাস করত তারা কাছাকাছি কৃষিজীবী সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। এই অনুমানের পক্ষে প্রমাণও পাওয়া গেল ঐ গুহাগুলিতে প্রাথমিক খনন কাজ চালিয়ে। সে গুলিতে গুহাবাসীদের শিকার করবার হাতিয়ারগুলির সঙ্গে পাওয়া গেল কাছাকাছি কৃষিজীবী সভ্যতার মৃৎপাত্র, তামার তৈরী তৈজসপত্র। অনুমান করা যেতে পারে গুহাবাসীরা শিকার সংগ্রহ ক'রে যে সব জিনিসপত্র জোগাড় করত (যেমন, পশুর চামড়া, মধু, ফলমূল ইত্যাদি) তারই কিছুটা অংশ তারা বিনিময় করত নিকটবর্তী কৃষিজীবীদের মৃৎপাত্র ও তৈজসপত্রের সঙ্গে। ঐসব মৃৎপাত্রে যে সব ছবি এবং কৃষিজীবীদের যে সব আচার-অনুষ্ঠান তারা দেখত সেগুলিকে এঁকে রাখত গুহার দেওয়ালে।

কিন্তু ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটতে তখনও বাকি ছিল। সেটি ঘটল ১৯৭৫ সালে। ঐ বছর মধ্যপ্রদেশেরই ভিমবেতকায় ডঃ বাকঙ্কর আবিষ্কার করলেন সাতশটিরও বেশী প্রাকৃতিক গুহা যাদের মধ্যে প্রায় পাঁচশটিতে রয়েছে অসংখ্য প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র। ইতোপূর্বে পৃথিবীর আর কোন দেশে এত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের সমাবেশ দেখা যায়নি। এ ছাড়াও ভিমবেতকার রয়েছে আরও দুটি বৈশিষ্ট্য। এখানে একটি গুহায় পাওয়া গিয়েছে শেষ পুরা প্রস্তর যুগের ১ (প্রায় বিশ হাজার বছর আগের) মানুষের মাথার খুলি। ভারতে এটিই ফসিল মানুষের প্রথম নিদর্শন। এবং এর নাম দেওয়া হয়েছে 'হোমো স্যাপিয়েনস ভিমবেতিয়ান'। এখানকার দ্বিতীয় বৈশিষ্টটি হল গুহাগুলিতে আদি পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির ধারা দেখতে পাওয়া যায়। তবে ভিমবেতকার গুহাচিত্রগুলির কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশই পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ ভাগের শুরুতে অর্থাৎ ত্রিশ হাজার খৃীষ্টপূর্বাব্দে আঁকা এবং এক হাজার খৃীষ্টপূর্বাব্দের পর গুহাগুলিতে আর মানুষ বাস করত না।

ভিমবেতকার গুহাচিত্রগুলির বিষয়বস্তু কি ছিল সেই আলোচনা করার আগে ইওরোপীয় উচ্চ প্রত্নপ্রস্তর যুগের Upper Palaeolithic age গুহাচিত্র সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা সেরে নিলে বিষয়টি বোঝার পক্ষে সুবিধা হবে।

ইওরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্স ও স্পেনে ঐ যুগের যে সব গুহাচিত্রগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেগুলির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ছিল শিকারমূলক জাদুবিদ্যা (History of Mankind, Cultural and Scientific Development, Vol. 1. Unesco Publication

পৃঃ ২০৫, The Old Stone Age, Miles Burkitt, পৃঃ ১৮৪ দ্রষ্টব্য)।

সে যুগে মানুষ বাস করত ছোট ছোট উপজাতিতে (tribe) ভাগ হয়ে। কয়েকটি কোম (Clan) মিলে গড়ে উঠত এক একটি উপজাতি। প্রতিটি উপজাতি থাকত যৌথভাবে। তাদের জীবিকা প্রধানতঃ ছিল শিকার করা। উপজাতির প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব স্বার্থ বলতে কিছু ছিল না, ব্যক্তি সত্তা বিলীন হয়ে থাকত যৌথ সত্তার মধ্যে। দলবদ্ধ শিকার থেকে পাওয়া খাদ্য তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিত ২। স্বাভাবিকভাবেই শিকার সুলভ হওয়া এবং পশুর বংশ বৃদ্ধির ওপরই নির্ভর করত উপজাতিগুলির জীবনধারণের প্রশ্ন।

কিন্তু সেই যুগে আদিম মানুষের কলাকৌশল (technique) ছিল নিতান্তই অনুন্নত, প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানও ছিল খুবই সামান্য। তাই শিকারে সফল হওয়ার জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল কোন অতিরিক্ত উদ্দীপনার, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্যে অর্থাৎ পশুর বংশবৃদ্ধি ঘটাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল কোন এক ধরণের কাল্পনিক কলাকৌশলের। অর্থাৎ বাস্তব কলাকৌশলের ঘাটতি পূরণের জন্যে তারা কাল্পনিক কলাকৌশলের আশ্রয় নিত। এই কাল্পনিক কলাকৌশলই হল জাদু। এই জাদু ঐসব ছবি দেখে শিকারীরা নিজেদের শিকারে উৎসাহিত করত। সেই আদিম যুগেও মানুষের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু সেই অলৌকিক শক্তি ছিল পশু ও মানুষের সম্মিলিত গুন-সম্পন্ন এবং আদিম মানুষেরা ভাবত ঐ অলৌকিক শক্তিও জাদু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পশুর প্রজনন বাড়াবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা

চিত্র (ক)
ফ্রান্সের নিঅস্ক গুহায় বাইসনের ছবিতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছেঃ চোখে ফুটেছে যন্ত্রণার অনুভূতি

চিত্র (খ)
ফ্রান্সের লেট্রেক্রেরে গুহার অলৌকিক শক্তির চিত্র।

অনুষ্ঠান ছিল অনুকরণমূলক আদিম মানুষেরা ভাবত কোন একটি অনুষ্ঠানকে সঠিকভাবে অনুকরণ করতে পারলেই প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের অধীন হবে। শিকারে যাবার আগে দলবদ্ধ শিকার নৃত্যের মাধ্যমে তারা অতিরিক্ত উদ্দীপনা সংগ্রহ করত, বৃষ্টি না হলে মেঘের ডাকের নকল করে, আকাশে জল ছিটিয়ে তারা প্রকৃতিকে বৃষ্টি দিতে বাধ্য করবে বলে মনে করত। এইসব উদ্দেশ্য নিয়েই সে যুগের শিল্পীরা আঁকত তীরবিদ্ধ পশুর ছবি। কখনও তারা পশুর ছবিতে আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি করত (চিত্র ক)। অলৌকিক শক্তির ছবিও আঁকত (চিত্র খ)। অর্থাৎ আদিম সমাজে ছবি আঁকার একটা সামাজিক উপযোগিতা ছিল। সে যুগে তাই শিল্পীরা প্রকৃত অর্থে শিল্পী হলেও ছবি আঁকার পিছনে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণার থেকে তাদের কাছে সামাজিক দায়িত্বই ছিল প্রধান। প্রতিটি শিল্পীই ছিল কোন না কোন উপজাতির সদস্য। কিন্তু ছবি আঁকার জন্যে নিশ্চয় তারা শিকার করা অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিল তা না হলে ছবি আঁকার পিছনে তাদের পক্ষে অত সময় ব্যয় করা

সম্ভব হত না। অতএব অনুমান করা চলে যে ছবি আঁকার জন্যে শিল্পীদের খাদ্য সংগ্রহের মত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হত সে ছবির সামাজিক উপযোগিতা ছিল অপরিসীম। অর্থাৎ ছবি আঁকাই ছিল শিল্পীর সামাজিক অর্থনৈতিক দায়িত্ব এবং উপজাতীয় সমাজের সদস্য হিসেবে শিল্পীকে সে দায়িত্ব পালন করতে হত।

ইওরোপীয় প্রত্নপ্রস্তর যুগের ছবিগুলির আঙ্গিক এবং ছবি আঁকার জন্যে স্থান নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গিকে একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে উপরোক্ত ধারণাই আরও দৃঢ় হয়। ঐ সব ছবিগুলিতে জীবজন্তু ও মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকেই আঁকা হয়েছে, শিল্পী তার দেখা জন্তু বা মানুষের রেখাচিত্রই হাজির করতে চেয়েছেন, কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁকে শিল্পসুষমা সৃষ্টি করতে চাননি।

স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ গুহা-গুলিতেই প্রবেশ করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং কোন কোন গুহায় (যেমন, ফ্রান্সের ফঁদ্যগ, লাপাজিয়েগা প্রভৃতি) এত উঁচুতে ছবি আঁকা হয়েছে যে শিল্পীকে নিশ্চয় কোন সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। ফ্রান্সের নিঅক্স দেখা যায় গুহার প্রবেশ পথ থেকে প্রায় আটশ গজ দূরে ছবি আঁকার জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল, অথচ কাছাকাছি ছবি আঁকার উপযোগী অনেক দেওয়াল ছিল। এইসব দেখে মনে হয় সাধারণ মানুষকে দেখাবার জন্যে ঐ সব ছবি আঁকা হয়নি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধারণের সৃষ্টিসীমার বাইরে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই ছবি-গুলি অত দুর্গম স্থানে আঁকা হয়েছিল। এই গোপনীয়-তার পিছনে জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত অলৌকিকত্বের ধারণা থাকাটাই সম্ভব।

এবার ভিমবেতকার গুহাচিত্র প্রসঙ্গে আসা যাক: ভিমবেতকার গুহাগুলিতে দলবদ্ধ শিকারের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। দেখা যায় দলবদ্ধ নৃত্যের দৃশ্য। এগুলি গুহাবাসীদের যৌথ জীবনের পরিচয় দেয়। এই ধরণের নৃত্য এখনও আধুনিক ভারতের বহু উপজাতির মধ্যে দেখা যায়।

ভিমবেতকার গুহাবাসীদের জীবনে অলৌকিক জাদু শক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ছবি আঁকার জন্যে স্থান নির্বাচন এবং ছবিগুলির আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে। বহু গুহায় ছবিগুলি আঁকা হয়েছে অত্যন্ত দুর্গম স্থানে, ছবিগুলি প্রধানতঃই রেখাচিত্র এবং কোন কোন জীবজন্তুর ছবি বিশাল আকারে আঁকা হয়েছে (কোন কোনটি ৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু)। ঐ সব জীবজন্তুর ছবির মধ্যে কোন একধরণের অলৌকিক বিশেষত্ব সৃষ্টি করার জন্যেই ঐগুলি সাধারণ আকারের চেয়ে অত বড় করে আঁকা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ভিমবেতকার গুহাচিত্র-গুলি অলৌকিক জাদুশক্তিকেই প্রকাশ করেছে। চিত্র (গ)তে দেখা যাচ্ছে অলৌকিক জাদুশক্তিকে আহ্বান করে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। চিত্র (ঘ)তে তিনটি অলৌকিক জাদু-শক্তির প্রতীকদের ছবি আঁকা হয়েছে। চিত্র (ঙ)তে আঁকা হয়েছে একটি জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠানের দৃশ্য। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি মানুষ পরস্পরের হাত ধরে নাচছে এবং একজন পুরোহিত জাদুকর তার দুপাশে দুটি জাদুশক্তির প্রতীককে জাগ্রত করছে। ঐ প্রতীক দুটির মধ্যে পুরোহিতের ডানদিকেরটি নিঃসন্দেহে কৃষি-মূলক জাদুশক্তির প্রতীক। ঐ ছবিটি দেখে মনে হয় ভিমবেতকার গুহাবাসীরা তাদের কাছাকাছি সমতলবাসী কোন উপজাতির মধ্যে ঐ রকম জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠান দেখেছিল এবং ঐ উপজাতিটি অন্ততঃ প্রাথমিক ধরনের কৃষি কাজ করত। আধুনিক ভারতে এখনও অনেক উপজাতি ঐ ধরণের কৃষিমূলক জাদুবিদ্যার অনুষ্ঠান করে এবং পরস্পরের হাত ধরে নৃত্য করা ঐ রকম অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ।।

চিত্র (গ)
ভিমবেতকায়
৬০,০০০-৩০,০০০ বছর আগে আঁকা মধ্য পুরা-প্রস্তর যুগের গুহাচিত্র।

চিত্র(ঘ)
ভিমবেতকায়
৩০,০০০-১০,০০০ বছর আগে আঁকা শেষ পুরা-প্রস্তর যুগের গুহাচিত্র: প্রত্যেকটিই অলৌকিক শক্তির প্রতীক।

ভিমবেতকার সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক গুহা-চিত্রটির (চিত্র চ) কথা এখনও বলা হয়নি। এই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একটি অশ্বের ওপর বসে রয়েছে একজন পুরোহিত। অশ্বটির সামনে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুহাতে অস্ত্রধারী একটি মানুষ। এরা দুজনেই

চিত্র (ঙ)
ভিমবেতকায়
১০,০০০-৫০০০ বছর আগে আঁকা গুহাচিত্র।

চিত্র (চ)
ভিমবেতকায় তাম্রপ্রস্তর যুগের (৫,০০০-২,৫০০ বছর আগে) আঁকা গুহা-চিত্র: অশ্বমেধ যজ্ঞের(?)

নিঃসন্দেহে আর্য-পূর্ব কোন গোষ্ঠীর লোক ৩। অস্ত্রধারী মানুষটির ডানদিকে আঁকা রয়েছে স্বস্তিকা চিহ্ন। এই চিহ্নটি আজও হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। মানুষটির বাঁদিকে আঁকা রয়েছে পর্বতের প্রতীক। সবকিছু মিলিয়ে মনে হয় এটি সম্ভবতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের চিত্র।

এরকম একটি সিদ্ধান্তের কথা শুনে অনেকেরই হয়ত ভুরু কুঁচকে উঠতে পারে। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ বৈদিক আর্যদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু ঋগ্বেদের সাক্ষ্য (১/১৬২ ও ১/১৬৩) থেকেই দেখা যায় যে ঋগ্বেদের যুগেই অশ্বমেধযজ্ঞকে অতীত যুগের অনুষ্ঠান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া অশ্বমেধ ও অন্যান্য বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে আদিম জাদু অনুষ্ঠানের অনেক স্মারকচিহ্ন টিঁকে ছিল এ মন্তব্য করেছেন কীথ তাঁর The Veda of the Black Yajus School (CXXXV, CXXXVI) এবং Religion and Philosophy of the Veda and Upanisads (পৃঃ ২৫৮-২৫৯) বই দুটিতে। ম্যাকডোনেলও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন Encyclopaedia of Religion and Ethics (8.312) বইটিতে।

অশ্বমেধযজ্ঞের সময় রাজার প্রধানা মহিষী যজ্ঞে বলি প্রদত্ত অশ্বটির পাশে শুয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতেন। সেই সময় হোত্রি ও প্রধানা মহিষীর মধ্যে, অন্যান্য মহিষী, তাদের পরিচারিকা ও অন্যান্য পুরোহিতদের মধ্যে অশ্লীল বাক্য বিনিময় হত। ঐ অশ্লীল বাক্যগুলি ছিল প্রধানতঃ বাজসনেয়ী সংহিতার বাইশ ও তেইশ অধ্যায়ের মন্ত্র। পৃথিবীর অন্যান্য আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও জাদুমূলক অনুষ্ঠানের সময় ঐরকম অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময় 'ব্রহ্মোদয়' নামে যে এক ধরণের হেঁয়ালী কাটা হত পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম উপজাতির মধ্যে জাদুমূলক অনুষ্ঠানের সময় ঐ ধরণের হেঁয়ালী কাটার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন ফ্রেজার তাঁর The Scapegoat (পৃঃ 208ff) বইটিতে। অর্থাৎ অশ্বমেধযজ্ঞের আদি রূপটি ছিল জাদুবিদ্যামূলক অনুষ্ঠান। আর্যদের আদিম সমাজেও অশ্ব ছিল গতি ও বীর্যের প্রতীক। সেই সমাজে আর্যনারী অশ্বের মত বীর্যবান সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষায় জাদু অনুষ্ঠানে নিহত অশ্বের সঙ্গে মিলিত হত। এটি স্পষ্টতই ছিল এক ধরণের উর্বরতামূলক জাদুবিদ্যা। পরবর্তীকালে ঋগ্বেদের যুগে রাজকীয় অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্যেও সেই আদিম জাদু অনুষ্ঠানের রেশ টিঁকে ছিল। বৈদিক আর্যরা মূলতঃ ছিল পশুপালক উপজাতি। পৃথিবীর অন্যান্য পশুপালক উপজাতির মধ্যেও এই রকম বা অন্য ধরণের উর্বরতামূলক জাদুবিদ্যার নিদর্শন পাওয়া যায় ৪। ভারতেও ভিমবেতকা গুহার কাছাকাছি সমতলবাসী কোনি আর্য-পূর্ব পশুপালক উপজাতির সমাজে গুহাবাসী শিল্পী সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ করেছিল অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর তাকেই সে গুহার দেওয়ালে অমর ক'রে রেখে গিয়েছে।

১ ইওরোপীয় প্রত্নপ্রস্তর পুরা প্রস্তর যুগকে (Palaeolithic or Old Stone Age) নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু ভারতীয় ও ইওরোপীয় প্রত্নপ্রস্তর যুগের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য থাকায় ১৯৬১ সালে দিল্লীতে এশীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় সেখানে ভারতীয় প্রত্নপ্রস্তর যুগকে আদি, মধ্য ও শেষ প্রস্তর যুগে ভাগ করা হয়েছে।

২ চার্লস ডারউইন তাঁর
A Naturalist's Voyage Round the World
(পৃঃ ২৪২) বইটিতে ফুজি দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে এক অমোঘ সমবণ্টনের নিয়মের কথা লিখেছেন।
ব্রিফল্ট তাঁর The Mothers-এ (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪) বেইলি, পামার, ম্যাথুজ, রিডলি প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে সিংহলের আদিবাসী এবং অস্ট্রেলিয়ার শিকারজীবীদের মধ্যেও সমবণ্টনের নিয়ম ছিল। অস্ট্রেলিয়ার একদল শিকারজীবীর মধ্যে দেখা গেছে যে শুধু শিকার থেকে পাওয়া খাদ্যই নয়, উপহার হিসাবে পাওয়া সামান্যতম জিনিসও তারা সমান ভাগে ভাগ করে নিত।

৩ এই ছবিটি তাম্রপ্রস্তর যুগে আঁকা হয়েছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ ভারততত্ত্ববিদই মন্তব্য করেছেন যে আর্যরা ভারতে বহিরাগত এবং আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে এদেশে তারা ১৭৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগে আসেনি।

৪ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্টুয়ার্ট পিগট তাঁর Pre-Historic India বইটিতে (পৃঃ ২৪৭) বলেছেন যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও আয়ার্ল্যাণ্ডের Altai-Turk দের মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। এরা অতীতে পশুপালক উপজাতি ছিল।

দরদী কথাশিল্পী ও দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র / সুকুমার দাস

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না। নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিনই ভেবে পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—ওরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।" মানবদরদী অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কোন কিছু ভাবতে গেলেই সবার আগে মনে হয় সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর এ সমবেদনার কথা। সমাজের অবিচার, অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেই তিনি যেন তাঁর লেখনীকে সচল করে রেখেছিলেন আজীবন। সাধারণ মানুষের অতি কাছ থেকে, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখকে সহানুভূতির সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেই তিনি তাদের কথা লিখেছিলেন। এতটুকু আতিশয্য ছিল না তাঁর ঐসব লেখার মধ্যে। সমাজের তথাকথিত নীচুস্তরের মানুষগুলির সাথে অকপটে মিশে যেতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সেকালের সমাজের ও ধর্মের কুসংস্কারের ভয়াবহ রূপকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। সমাজ ও ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে থেকে শুধুমাত্র মানুষকেই তিনি বড় করে দেখেছিলেন—উপলব্ধি করেছিলেন তাদের অন্তরাত্মার আশা আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ বেদনাকে। তাই অদৃষ্ট ও মূঢ়তার নাগপাশে বন্ধ মানুষগুলিকে তিনি সচেতন ও মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তখনকার সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা, "সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি; কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নর-নারীর বহু চিন্তা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে।" তিনি তাঁর নানা উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধে সমাজের ঐ উপদ্রবের বিরুদ্ধে নিরলস নালিশ জানিয়ে গেছেন বলেই সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আজ এত প্রিয়, এত মহান হয়ে উঠেছেন।

শরৎ সাহিত্যে সেকালের বাঙলার সমাজের যে ছবি নিখুঁত ভাবে ফুটে ওঠে তাতে দেখা যায় অসহায় গরীব সাধারণ মানুষগুলি সমাজের বহু অন্যায়, অবিচার আর নিষ্ঠুর বিধানের কাছে মাথা নত করে দুঃখকষ্টকে অদৃষ্টের বিধান বলে মেনে নিয়ে ক্লেশ ভোগ করতো—অথচ এগুলির অধিকাংশই মানুষের স্ব-স্বার্থে গড়া, একথা তারা একবারও বুঝতে চাইতো না, বা বুঝলেও লাঞ্ছনার ভয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস করতো না। অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করেও ওরা ছিল জড় পুতুলের মত নীরব। অকুতোভয় শরৎচন্দ্র তাই তাদের মুখপাত্র হয়ে সেদিন সমাজের দরবারে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে নালিশ পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন মানুষকে সুখী করতে হলে, সমাজকে সুন্দর করতে হলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ, স্বার্থ প্রণোদিত জাতি-কুল-মান'এর বেড়াজালকে সমাজ দেহ থেকে অপসারিত করতেই হবে। এ কাজে কে তাঁকে সাহায্য করবে, কে করবে না—এ কথা না ভেবে একাই সে কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি একথা সঠিকভাবেই জানতেন, "পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না—একাকীই দাঁড়াতে

জন্ম: ১৫-৯-১৮৭৬ মৃত্যু: ১৬-১-১৯৩৮

হয়। এর জন্য দুঃখ আছে। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ একদিন সংঘবদ্ধ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়।...পাঁচজনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়—তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? আজ লোকে কথা শুনিতে না পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই।" মানব সমাজের কল্যাণে অপ্রিয় সত্যকে অকপটে প্রচার করেছিলেন বলেই শরৎচন্দ্র সেদিনকার বেদনাহত মূক মানুষগুলির অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন আর আজ আমাদের হয়ে আছেন বহু প্রেরণার উৎস।

শরৎ সাহিত্য চিরকাল পাঠক সমাজকে অভিভূত করবে, কারণ তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ভাবের সাথে পাঠক এক বিচিত্র অন্তরঙ্গতা অনুভব করে। এর কারণ এসব তাঁর স্ব-নির্ভর অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালা থেকে গ্রহণ করা। মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভিজ্ঞতার

আলোকেই সৃষ্ট তাঁর এসব গল্প উপন্যাসগুলি। তাই এগুলি অতি সহজেই মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। বহুর সাহচর্যেই মানুষের ভিতরকার আসল সত্তাটাকে জানা যায়, চেনা যায়—এটা তিনি ভোলেননি। তাঁর মতে, "জীবনে যে ভালবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকারের অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের মুখে ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে? নিজের জীবনটাই হল যার নীরস, বাংলাদেশে বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম জীবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দুদিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে।" শরৎচন্দ্র মানুষের হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন, তাই মানব জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর গল্প উপন্যাসে বিমূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে সংসারের নোংরা জিনিষটাকে এড়িয়ে বাস্তবের অভিজ্ঞতার সাথে আদর্শের মিলন ঘটিয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে রত ছিলেন বলেই শরৎ সাহিত্য শৈলী আজ এত প্রাণ স্পর্শী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বলতে দ্বিধা নেই যে শরৎচন্দ্রের চোখের পিছনে ছিল একটা দরদী হৃদয়, তাই যা তিনি দেখতেন তা' শুধু বুদ্ধির দেখা নয়, বুকের দরদ দিয়ে দেখা। সেই চোখ দিয়েই তিনি বাঙ্গলার নারী সমাজকে দেখেছিলেন—এবং অনায়াসে তাদের হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। তিনি নারীজাতিকে নারীত্বের ন্যায্য মর্য্যাদা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজ যাদের কলঙ্কিনী বলে অপাংক্তেয় করে দিয়েছে, হৃদয়ের শুচিতায়, অনুভূতির গৌরবে তারাও অনন্য-সাধারণ হতে পারে। তিনি বলতে চেয়েছেন মেয়েরা যে শুধু সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে তাই নয় তাদের জীবনকে আরও বেশী বিড়ম্বিত ও দুর্বিসহ করেছে সমাজের চাপানো যুক্তিহীন নিস্করুণ সংস্কার। শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে লেখনীর সাহায্যে এর বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হেনেছেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মেয়েদের আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মেয়েদেরও যে একটা স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকতে পারে, তারাও যে মানুষ, শুধু মেয়ে নয়—ঐ কথা সেদিনের পুরুষ শাসিত সমাজ কোনদিনই ভাবতে পারেনি। শরৎ-চন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে যে নারী চরিত্রগলি সৃষ্টি করেছেন, তাতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন সমাজে মেয়েদেরও একটা পৃথক অস্তিত্ব ও অধিকার আছে—তাদেরও আছে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অরুচি। পুরুষের নির্দয় ব্যবহারে সমাজ পরিত্যক্ত লাঞ্ছিতা ও পতিতা নারীদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমত্ব ও করুণা। তাঁর কাছে নারীর নারীত্বই বড়—সতীত্বই সবকিছু নয়। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির মধ্যে তাই তিনি দেখিয়েছেন অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব সতীত্বে ও নারীত্বের, ন্যায়-অন্যায়ের, ধর্ম ও অধর্মের। তাঁর সৃষ্ট অচলা, সাবিত্রী, অন্নদাদিদি, নিরুদিদি, মাধবী, কমল, নীলিমা, রমা, কিরণময়ী ও সুরমা—এরা কেউ কোন না কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নয়। মেয়েদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল শরৎচন্দ্রের সহজাত। তাই তাঁর কোমল অন্তর সর্বদাই তাদের বিড়ম্বিত জীবনের জন্য মমতায় ছটফট করতো।

মানুষের মধ্যে তিনি দেবতার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন বলেই তিনি পাপীকে নয় পাপকেই ঘৃণা করেছেন। শরৎচন্দ্রের চরিত্রের অভিজ্ঞ উদার অন্তরে পদস্খলিত উদ্‌ভ্রান্ত নর-নারীর জন্য ছিল তাঁর অসীম সহানুভূতি। চরিত্রহীনের মধ্যেও যে মহত্ব থাকা সম্ভব তিনি তাই বারবার তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবন স্থায়ী হয়েছিল পঁচিশ বছর। এর যখন শুরু তখন বাঙ্গলার সাহিত্যা-কাশে রবি সূর্য মধ্যপথে। সেই প্রখর রবি কিরণছটার মধ্যেই শরৎচন্দ্র যেন ছিটকিয়ে এলেন অত্যুজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্কের মত এবং অনায়াসেই জয় করে নিলেন বাঙ্গলার হৃদয়। সে যে কত কঠিন কাজ—তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁর প্রথম উপনাস "বড়দিদি" যখন ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল সেদিনই বাঙ্গলার পাঠক সমাজ তাঁকে এক বিরাট প্রতিভাবান লেখক বলে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। "বড়দিদি" উপন্যাসটি পড়ে রবীন্দ্রনাথও সেদিন তাঁর তারিফ করে তাঁকে একজন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অসামান্য লেখক বলেই মন্তব্য করেছিলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হ'ল তাঁর অন্যান্য উপন্যাস বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, দেবদাস, চরিত্রহীন, দত্তা, গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, দেনা পাওনা, নববিধান, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন, বিপ্রদাস, শুভদা ও শেষের পরিচয় (অসম্পূর্ণ)। এরই সাথে সাথে তিনি লিখলেন বিখ্যাত গল্পগুলি যেমন বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, মেজদিদি, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, নিস্কৃতি, কাশীনাথ, স্বামী, ছবি, হরিলক্ষ্মী, অনুরাধা ও সতী। বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশে স্ব-প্রতিভায় শরৎচন্দ্র তখন এক অসাধারণ কথাশিল্পী। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে তাঁর গল্প উপন্যাসের কি সমাদর ও প্রশংসা।

রবীন্দ্রনাথের যুগেও শরৎসাহিত্য এত সহজেই পাঠক চিত্ত জয় করে নিলো কেমন করে? কেন সমাদৃত হল তাঁর গল্প উপন্যাস বাঙ্গলার ঘরে ঘরে? এর উত্তরে বলা যায় যে শরৎসাহিত্যে ছিল এক অদৃশ্য যাদুর আকর্ষণ—যা পাঠক সমাজকে সেদিন সহজেই প্রভাবিত করেছিল। শরৎচন্দ্রের দরদী লেখনীর যাদু স্পর্শেই তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী। আসলে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি জীবনে একটা বেদনাসিক্ত অভিমান সতত প্রবহমান ছিল, এ বেদনা বা অভিমান তাঁর একান্তই নিজস্ব ছিল। এখানে তিনি কাউকে প্রবেশ করতে দেন নি, অংশ দিতে চাননি। আপন জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত এই বেদনাই তাঁর সাহিত্যকে মর্মস্পর্শী করে তুলতে সাহায্য করেছে। অল্প বয়স থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বনায় নানা কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে এক অনিশ্চিত জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল তাঁকে—আর সেই চলারপথের বিচিত্র সঞ্চয়ই কালক্রমে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে সাহিত্যের অমূল্য রত্ন হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্র আপন সাধনার প্রভাবেই মানবজীবনের গহন

গভীরের অজ্ঞাত জিনিষগুলিকে আহরণ করে এনে সাহিত্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত করেছিলেন। ছেলেবেলা থেকে নানা দিক দিয়ে বঞ্চিত না হলে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনায় জর্জরিত না হলে আমরা তাঁর কাছ থেকে এ হার্দ্য-সাহিত্য পেতাম কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিন্তু শরৎসাহিত্য কি 'বাস্তব' সাহিত্য, না ওটা 'রোমাণ্টিক' সাহিত্য? সাহিত্য সমালোচকেরা আজ তার জাত বিচারে হাবুডুবু খাচ্ছে। এর কোনটাই কিন্তু আসলে এককভাবে ঠিক নয়, কারণ শুধু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সত্যানুসরণে সাহিত্য রচিত হলেই তা' বাস্তব সাহিত্য হয় না। হতে পারে সেটা মানব জীবনের ও সমাজের একটা নিখুঁত 'স্থিরছবি' মাত্র। আবার নর-নারীর পূর্ব রাগ-প্রেম-বিরহ মিলনাদি হৃদয় ঘটিত কারবার নিয়ে রম্য রচনা, সেটাও বাস্তবিক পক্ষে রোমাণ্টিক সাহিত্য হতে পারে না। তাই বস্তু তান্ত্রিকেরা তাঁর সাহিত্যকে বলছে 'বাস্তব সাহিত্য' আর কল্পনাপ্রবণ পাঠকেরা এর মধ্যে রোমান্সের আস্বাদ পেয়ে একে বলছে 'রোমাণ্টিক সাহিত্য'। দ্বন্দ্বের শেষ এখানেই নয়। কেউ কেউ তাঁর বিভিন্নমুখী রচনার জন্য তাঁকে বলতে চেয়েছেন বিপ্লবী সাহিত্যিক। কেউবা বিদ্রোহী সমাজ সংস্কারক, আবার বিকৃতরুচির সমালোচকেরা--যারা শরৎ সাহিত্যের ভেতরই প্রবেশের চেষ্টা করেনি, তারা একে দুর্নীতির সহায়ক অশ্লীল সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। ওদের মতে এঁর সাহিত্যে কোন আদর্শ ও মতবাদ নেই। এতে সমস্যা আছে, অথচ সমাধানের সূত্র নেই। আসলে শরৎচন্দ্র যে সেকালের রক্ষণশীলতাকে কাটিয়ে সমাজের সমস্যা সমাধানের সঠিক পথকে নির্দেশ করতে পারেনি—একথা অনেকাংশে সত্য। পুরুষ চরিত্রের দুর্বলতার সমালোচনায় তিনি যতটা সোচ্চার ছিলেন, মেয়েদের আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেও তাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হতে অনুপ্রাণিত করেননি। তবে আর যে যাই বলুক না কেন একথা একমাত্র অর্বাচীনই বলবে যে তাঁর সাহিত্য-দুর্নীতির সহায়ক এবং অশ্লীল। সমালোচকেরা তাঁর সাহিত্যকে যে ভাবেই গ্রহণ করুক, পাঠক সমাজের কাছে তাঁর লেখা মনোগ্রাহী অভিনব সৃষ্টি হয়েই অক্ষয় সমাদর লাভ করবে—এবং তা করবে এই জন্য যে শরৎসাহিত্যের চরিত্রগুলির মধ্যে তারা তাদের নিজেদের প্রাণস্পন্দন অনুভব করে। ওদের সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, প্রেম-বিরহ তাদের মনকেও আলোড়িত করে।

শরৎসাহিত্য নিয়ে আজকালকার সমালোচকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে শরৎ সংবর্ধনার এক সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কিছু বক্তব্য এখানে উধৃত করা উচিত বলে মনে করি। শরৎ সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেছিলেন, "সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মম, তার কাল যা' পেয়েছে, তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্বে যা ভোগ করেছে, তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দান কেটে নেয়, আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রস তৃপ্তির প্রমাণ ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে। নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, সুখস্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে, তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী, এক যা তাও অনেক। ...জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া নানা কক্ষপথে যেগুলি নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙ্গালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙ্গালী আপনাকে যাতে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তাদের অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরাও অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষা-ভাজন। ..সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে চিন্তা শক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনা শক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হ'ন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করুন—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখাতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন।"

দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাঙ্গলা সাহিত্য এই অক্ষয় অবদানই কেবল তাঁর জীবন-পরিচয় নয়। তিনি শুধু একজন লেখকই ছিলেন না, জীবনে নানা বিচিত্র ও দুর্গম পথের তিনি পথিক ছিলেন। অতি সহজ ও সাধারণভাবেই জীবন যাপন করতেন তিনি। কথাবার্তায় আচার-আচরণে কৃত্রিম গাম্ভীর্য তো তাঁর ছিলই না বরং সর্বদা মানুষ শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন ঢিলেঢালা পরিহাস প্রিয় উদার-মানুষ। তাঁর সান্নিধ্যে যারাই এসেছিলেন তারাই মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর কোমল চরিত্র মাধুর্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বে। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন দয়ালু। মানুষের দুঃখেই শুধু নয় ইতরপ্রাণীর কষ্টেও তাঁর প্রাণ কাঁদতো—ওদের তিনি ভালবাসতেন, সেবা করতেন। অমিত প্রতিভাধর এ কথা শিল্পীর কর্মবহুল জীবনের সমগ্র দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে করা যাবে না এবং করার ইচ্ছেও আমার নেই। আজকের এই প্রবন্ধে তাঁর বহুমুখী জীবনধারার একটি উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে আর একটু আলোকপাত করেই এর সমাপ্তি টানবো।

সে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল যে, শরৎচন্দ্র সাহিত্য-অঙ্গিনার বাহিরে ছিলেন একজন যথার্থ দেশ প্রেমিক। পরাধীন ভারতের মুক্তিচিন্তা তাঁর লেখনীকে বারবার থামিয়ে দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী যখন অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়, শরৎচন্দ্র তখন কলম ছেড়ে সেই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে মতের মিল তাঁর বেশী দিন ছিল না।

তিনি বুঝেছিলেন 'চরকা' আর অহিংসাই শৃঙ্খল মুক্তির পথ নয়। কিন্তু সেজন্যে মহাত্মাজীর প্রতি তিনি কোনদিনই শ্রদ্ধা হারাননি। তিনি দেশবন্ধুর রাজনৈতিক পরিকল্পনার ছিলেন প্রবল সমর্থক। সর্বত্যাগী এই মানুষটির প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অপরিসীম সহানুভূতি। কংগ্রেসের একটা বিরাট অংশ যখন দেশবন্ধুর বিরোধী, শরৎচন্দ্র তখন ছিলেন তাঁরই পাশে। তিনি তাঁকে সাহস দিয়েছেন—দিয়েছেন কর্তব্য সাধনে একলা চলার প্রেরণা। ১৯২৫ সালের ১১ই মে যখন দেশবন্ধু দার্জিলিঙে দেহ রাখেন, দেশবাসীর সেদিনের কান্না দেখে তিনি পরে লিখেছিলেন, "মনে হয় পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি সংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াই-এর প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু শেষ হইল না। দেশবন্ধু দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে-বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না। আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এতবড় কান্নারই প্রয়োজন ছিল।"

১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র জেল থেকে মুক্তি পেলেন। কিছুদিন পরেই বাঙলায় কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিল দলাদলি। দুটি দলে বিভক্ত হলেন দলের সকলে। এক দলের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অপর দলের নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র রইলেন সুভাষচন্দ্রের দলে শরৎচন্দ্র চিরদিন হৃদয় দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে ভাল বেসেছিলেন। তিনি বলতেন, "সবাইকে ছাড়তে পারি, সুভাষকে না।" তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন কয়েক বছর। দলের মধ্যে বিবাদের জন্য একবার হাওড়া জেলার এক কর্মী সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি জেনে শরৎচন্দ্র উদ্যোক্তাদের সরাসরি বলেছিলেন, "যেখানে সুভাষ আমন্ত্রিত নয়, সে শিবহীন যজ্ঞে আমি যাবো না।"

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হলেও শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের যথেষ্ট স্নেহ করতেন। এমনকি দেশের মুক্তির জন্য সহিংস সংগ্রামকে সমর্থন করতেন। বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এলেই তিনি তাদের বিপ্লবের কাহিনী মন দিয়ে শুনতেন। একদিন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের কাছে অবাক বিস্ময়ে বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের কথা শুনে এবং পেডি হত্যার কথা শুনে তিনি তাঁকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র বলেছিলেন, "ইংরেজ নিধনের ব্যাপারে টাকার তেমন দরকারই হয় না। যেটুকু হয়, তা' আমরা নিজেরাই চালিয়ে নি।" একথা শুনে খুসী হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। এরপর তিনি তাঁকে তাঁর রিভালবারটি দিতে চাইলেন। হেমচন্দ্র বলেছিলেন, "দাদা, রিভালবার আমাদের অনেক আছে—আমাদের অভাব গুলির। কিছু গুলি দিন।" শুনে শরৎচন্দ্র বেশ কিছু গুলি তখন তাঁকে দিয়ে দিলেন। পরে আরো অনেকবার ঐ রকম গুলি তিনি বিপ্লবীদের দিয়েছিলেন এবং ইংরেজ নিধনে তার ব্যবহারও হয়েছিল। এইসব বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেই শরৎচন্দ্র "পথের দাবী" লিখেছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের রোষানলে তা' সেদিন বাজেয়াপ্তও হয়েছিল। সেদিন তাঁর নির্ঘাৎ কয়েদ বাস হতো যদি না পাবলিক প্রসিকিউটার স্যার তারকনাথ সাধু তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যেতেন। বিপ্লবীদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "ওদের সঙ্গে আমার রক্তের পরিচয়, জন্মান্তরের আত্মীয়তা—ওদের সাহায্য করেই আমি ধন্য হতে চাই, কিন্তু তা' পারি কই?"

মহান এ কথা শিল্পীর জন্ম হয়েছিল ১৮৭৬-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলীর দেবানন্দপুরে। ৬১ বছরের কিছু বেশী কাল জীবিত থেকে ১৯৩৮-এর ১৬ই জানুয়ারী কলকাতায় দুরারোগ্য ক্যান্সারে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।

খুব সংক্ষেপে এই তো দরদী কথাশিল্পীর জীবন-কথা। সাহিত্য জীবনে তিনি যেমন অর্জন করেছিলেন আপামর জনগণের অসীম শ্রদ্ধা আর ব্যক্তিজীবনে পেয়েছিলেন বহু জ্ঞানীগুণীর সাহচর্য ও ভালবাসা। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন,

> "যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
> ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
> দেশের মাটির থেকে নিল তারে হরি
> দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে মহান নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "যতদিন বাঙলা ভাষা থাকিবে, ততদিন বাঙালির সুখ-দুঃখের সাথী শরৎচন্দ্রকে কেহ ভুলিতে পারিবে না। সাহিত্য জগতে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় কল্প কথার মতই বিস্ময়কর।"

তাঁর মহাপ্রয়াণে ব্যাথাহত চিত্তে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্য গগন হতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়লো। যদিও বহু বর্ষ তাঁর নাম বাঙলার ঘরে ঘরেই শুধু পরিচিত ছিল, তথাপি ভারতের সাহিত্য জগতেও তিনি কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়।"

জুলিয়াস ফুচিক / প্রবীর মিত্র

স্বৈরাচারী জল্লাদের হাতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে মানুষ মাথা উঁচু করে বলতে পারে—বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। আমরা মরবো কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারীরা এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের অসমাপ্ত কাজ। যে মানুষ মৃত্যু দন্ডাদেশ শোনার পর সকলের সাথে গান গায়, মুক্তির গান—তারই নাম জুলিয়াস ফুচিক। খেটে খাওয়া মানুষ, বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রামের প্রতীক জুলিয়াস ফুচিক। ফুচিক জন্ম গ্রহণ করেন ১৯০৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী, চেকোশ্লাভাকিয়ার স্মিচিভে। বাবা ছিলেন শ্রমিক। ফুচিক আঠার বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন। চার বছর আগে রুশ দেশে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিপ্লব হয়ে গেছে। শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটেছে। শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র, প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ জন্ম লাভ করেছে। দেশে দেশে শাসক শোষক-শ্রেণীর ভীষণ-অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানা পথে রুষ বিপ্লবের কথা পেশছে যায় পৃথিবীর নানা প্রান্তে সারা পৃথিবী জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে, শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। চেক দেশেও গণ-আন্দোলনে, ছাত্র আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করল রুশ বিপ্লবের বার্তা। রুশ বিপ্লবের এক বছরের মধ্যেই চেক আর শ্লোভাক জনগণের শতাব্দী-ব্যাপী আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির সংগ্রামের ফসল ফলল। জন্ম নিল চেকোশ্লাভাকিয়া। জাতীয় সরকার দায়িত্ব নিল কিন্তু মানুষের দুঃখ-অবমাননার অবসান ঘটল না। রুশ বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহী খেটে-খাওয়া মানুষ নতুনতর স্তরে সংগ্রাম শুরু করল। ১৯২১ সালে জন্ম নিল চেকোশ্লাভাকিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি। ঠিক এমনি সময়ে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফুচিক রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন।

প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের একটি বড় কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জুলিয়াস ফুচিক হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয় ছাত্র নেতা—জুলা। এ সময়ে অনুষ্ঠিত সবকটি ছাত্র আন্দোলনে ফুচিক ছিলেন প্রথম সারিতে। তখনকার দিনে রুশ বিপ্লবের কথা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা ইউ-রোপের অন্য দেশগুলিতে প্রচার করতে দেওয়া হত না। এতদসত্ত্বেও তিনি দুর্লভ বইপত্র সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পড়াশুনা করতে লাগলেন। যতই পড়েন ততই পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—সোভিয়েত রাশিয়া, সে দেশের আদর্শ আর রুশ বিপ্লবের মহান নেতৃত্ব বিশেষ করে লেনিনের প্রতি তার শ্রদ্ধা, ভালবাসা আগ্রহ বাড়তে থাকল। এই ভাবেই জুলিয়াস ফুচিক হয়ে উঠলেন একজন খাঁটি কমিউনিস্ট।

তখনকার রুশ দেশ—সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর, খেটে-খাওয়া মানুষের পিতৃভূমি, মুক্তির দেশ। অনেকদিন ধরেই সে দেশ দেখার সাধ ছিল ফুচিকের। ১৯৩০ সালে বহু আকাঙ্খিত সে সুযোগ এল। পেশায় তিনি তখন ছিলেন শ্রমিক। রুশ দেশের কিরঘিজ শ্রমিক ইউনিয়ন তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল চেক সরকারের পুলিশ। ফলে ভিন্ন কৌশলে তিনি রুশ দেশে পেশছলেন। অভূতপূর্ব সে দেশ—ফুচিকের স্বপ্ন! অপূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সে দেশের সাধারণ মানুষ। তিনি অভিভূত হলেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন।

ছোট বেলা থেকেই ফুচিক ছিলেন শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে অনুরাগী। তাঁর পরিবারেও এ সবের চর্চা ছিল, তাঁর বাবা কারখানায় কাজ করার সাথে সাথে অভিনয় ও সঙ্গীতকেও জীবনের অঙ্গ হিসাবে নিয়েছিলেন। অল্প বয়সেই ফুচিক সুলেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তাঁর বহু লেখা বামপন্থী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৯ সালে তিনি 'ভোরবা' নামে একটি পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। ৩০ সালে রুশ দেশ থেকে ফিরে আসার পর তিনি চেক কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'রুদে প্রভো'র প্রধান সম্পাদক হন। বিপ্লবী সাংবাদিকতাই হয়ে উঠল তার জীবনের মূল পেশা, এক বছরের মধ্যে লিখলেন অসংখ্য সম্পাদকীয়। বক্তৃতা দিলেন সারা দেশ জুড়ে। দেশের মানুষের কাছে বর্ণনা করলেন রুশ দেশের সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

তৎকালীন বুর্জোয়া চেক সরকারের বিষ নজরে পড়লেন ফুচিক। ৩১ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। জেলে বসে তিনি লিখলেন রুশ দেশ সম্পর্কে এক অপূর্ব গ্রন্থ—'সেই দেশ যেখানে আমাদের আগামী কাল ইতিমধ্যে বিগত।' চার মাস পরে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। ৩৪ সালে ফুচিক আরও একবার রাশিয়া ভ্রমণ করেন। এবারও তিনি রাশিয়া সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে ইউরোপে। স্পেনে গণতান্ত্রী সর-কারের অন্যায় ভাবে পতন ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ত-স্বৈরাচারী ফ্রাঙ্কো ক্ষমতা দখল করেছে। ইটালী, জার্মানীতে ফ্যাসিস্ত সরকার। হিটলারের জার্মান নাৎসী বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করেছে। থাবা বাড়াচ্ছে চেকোশ্লাভাকিয়ার সুদেতিনল্যান্ডের দিকে। হিটলার প্রচার করতে শুরু করল—প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর শান্তি চুক্তির কৃত্রিম সৃষ্টি নাকি চেকো-শ্লাভাকিয়া। আসলে এখানে জার্মান জনগণই নাকি বেশী। ৩৮ সালে সম্পাদিত হল ভয়ংকর মিউনিখ চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমেই হিটলার সুদেতিনল্যান্ড, প্রাগ এবং অবশিষ্ট চেক ভূমি দখল করল।

এই নির্লজ্জ চুক্তির বিরুদ্ধে সারা ইউরোপের মানুষ ঘৃণায় ফেটে পড়েছিল। ফুচিক এই চুক্তির বিরুদ্ধে লিখেছিলেনঃ আমাদের জনগণকে বিক্রি করে দেওয়া হলেও তাদের আত্মচেতনাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া এত সহজ নয়। বৈধভাবে সংবাদপত্রে এটাই তাঁর শেষ লেখা। এরপর সমস্ত কমিউনিস্ট পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করা হল। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নেমে আসে প্রচণ্ডতম আক্রমণ। পার্টি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

৩৯ সালে হিটলার কর্তৃক চেক ভূমি দখলের পর সারা দেশে বুদ্ধিজীবীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ফ্যাসীবাদের সপক্ষে টানার চেষ্টা চলে। ফুচিকের কাছেও এল এমন এক প্রস্তাব। হিটলারের সমর্থক 'চেস্কি দেলানিক' পত্রিকার পক্ষ থেকে 'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিভাগের দায়িত্ব নেবার জন্য ফুচিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক চিঠি এল। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে ফুচিক উত্তর দিলেনঃ আমি যা লিখতে চাই, তা আপনার পত্রিকায় ছাপা সম্ভব নয়, আর আপনি যা ছাপতে চান তা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।

গেস্টাপো বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় হানা দিল। কিন্তু পেল না। আত্মগোপন করে পার্টির কাজ আর লেখা চালাতে লাগলেন। তখন পার্টির সামনে প্রধান কাজ ছিল ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলা। ৪১ সালে আত্মগোপন অবস্থাতেই তিনি পার্টির সর্বোচ্চ সম্মান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় তাঁর লেখাগুলি গোপন পত্র-পত্রিকা মারফৎ শুধু চেকোশ্লাভাকিয়া নয় তুরস্ক, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, রুমানিয়া এমন কি শত্রু শিবিরের মধ্যে পর্যন্ত প্রচারিত হত। ৪১ সালের ২২ জুন হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করল। সন্ধ্যা বেলাতেই ইস্তাহার প্রচার করলেন ফুচিক—'চেকবাসীকে হুসিয়ার।'

এইভাবেই জুলিয়াস ফুচিক আর তার পার্টি দেশের মানুষকে ফ্যাসী বিরোধী, স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করতে, নেতৃত্ব দিতে আত্মগোপন করে কাজ চালাতে থাকেন। গোপন ভাবেই প্রকাশিত হতে থাকল 'রুদে প্রভো'। এই সময় তিনি একটি বই লেখেন নাম—'ঘ্রানাডেসেক' (খুদে বাঁশী)। এই বইতে চেক কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তার গর্ববোধ, শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। সাথে সাথে তীব্র ঘৃণা আর বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে শত্রুদের প্রতি।

৪২ সালে ২৯ এপ্রিল ফুচিক গেস্টাপোদের হাতে ধরা পড়লেন। চারশ এগারদিন প্রাগের প্যানক্রাটস গেস্টাপো বন্দী শালায় বন্দী থাকার পর তাঁকে আনা হয় বার্লিনের নাৎসী বিচারালয়ে। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল ৪৩ সালের ২৫ আগস্ট। ফাঁসী হল ৮ সেপ্টেম্বরের বিষণ্ণ সকালে। কিন্তু সেই বিরাট হৃদয়ের স্পন্দন ফ্যাসিস্তরা বন্ধ করতে পারল না। ছড়িয়ে পড়ল কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে।

গেস্টাপোরা ফুচিকের স্ত্রী অগাস্তিনাকেও রেহাই দেয়নি। তাঁকেও গেস্টাপোদের কারাগারে ভোগ করতে হয় অকথ্য নির্যাতন। ৪৫ সালে হিটলার পরাজয়ের পর তিনি মুক্তি পান। তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের কাছে লেখা চিঠি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

জুলিয়াস ফুচিক ছিলেন একজন খাঁটি কমিউনিস্ট। চল্লিশ বছরের জীবনে কখনও মাথা নত করেননি। মানুষের প্রতি এক বুক ভালবাসা, বিশ্বাস আর স্বদেশের প্রতি নিষ্ঠাবান মানুষটি জীবনে কখনো হতাশ হয়নি। জীবনের শেষ ক'দিন একজন সহৃদয় জেলরক্ষীর সহায়তায় কিছু কাগজ আর পেন্সিল জোগাড় করে লেখেন নানা অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার কথা। আত্মবিশ্বাস আর আশায় ভরা সে সমস্ত লেখা। তিনি বিশ্বাস করতেন ফ্যাসীবাদ একদিন পরাজিত হবেই। তাঁর সে অমূল্য সম্পদ লেখাগুলো সংগৃহ করে তার মৃত্যুর পর 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' নামে একটি বই বার করা হয়। বইটির শেষ লাইন হল—বন্ধুগণ, তোমাদের আমি ভালবাসতাম। হুঁসিয়ার থেক। এই বইটি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ এই বইটি এবং তার লেখক সম্পর্কে পরিচিত।

অফুরন্ত প্রাণের জোয়ার এই মানুষটির জীবনের শেষ কদিনের কথা তার সহবন্দীদের কাছ থেকে জানা যায়। মৃত্যু আদেশ পাবার পর আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেনঃ 'আমি জানতাম আমাকে অভিযুক্ত করা হবে। কিন্ত আমাদের জয়ের সপক্ষে যা কিছু করণীয় তা আমি সম্পন্ন করেছি এবং বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। আমরা মরবো কিন্ত আমাদের উত্তরাধিকারীরা চালিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের অসমাপ্ত কাজ।' আদালত থেকে কারাকক্ষে ফিরে লিডা প্লাচাকে বলেছিলেন একটা গান শোনাতে। মুক্তির গান, সংগ্রামের গান—সব বন্দীরা তাতে সুর মেলাল। ফুচিকের বন্দী অবস্থায় রুশ লাল ফৌজের হাতে ফ্যাসিস্ত হিটলারের পরাজয়ের পালা শুরু হয়েছে। ফাঁসির কিছুদিন আগে জেলের চারিপাশে প্রচণ্ড বোমার শব্দে বিমর্ষ বন্দীদের উদ্দেশ্যে ফুচিক বলেছিলেনঃ 'সোভিয়েত জনগণ, তার মুক্তিবাহিনী কেমন করে মস্কো আর লেনিনগ্রাদের নাৎসীদের পরাজিত করলো, কি অসীম তাদের মনোবল। এখন আমরা যদি নিশ্চিহ্ন হয়েও যাই তবু বিশ্বস্ততায় থাকবো অকৃত্রিম এবং সেটাই হবে আমাদের প্রকৃত জয়।'

ফুচিকের ফাঁসির দু' বছর পর ফ্যাসীবাদ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হল রুশ লাল ফৌজের হাতে। ফুচিকের স্বপ্নের দেশ জন্ম নিল চেকোশ্লাভাকিয়ায়। সারা বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের কাছে জুলিয়াস ফুচিক হয়ে উঠলেন সংগ্রামের প্রতীক, পরম আত্মীয়। আর আত্মবিক্রয়কারী সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত।

নারীপ্রগতি—অর্থনীতি ও সমাজনীতি / মন্দিরা ঘোষাল

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষকে পিছনে ফেলে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি ৭৮-এর শেষ সীমায়। 'মহান নেত্রী' ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের 'সুমহান ঐতিহ্য' আমাদের স্মরণসিন্ধুকে আজও পীড়িত করছে। আর মেয়েরা তাদের বোরখা আর ঘোমটার আবরণ ছিঁড়ে ট্রামে-বাসে পথে-ঘাটে সর্বত্র 'নারী প্রগতি'-র বিজ্ঞাপন রূপে বিরাজমান। এ হেন অবস্থায় নারীপ্রগতির প্রশ্নটা নতুন করে উঠছে কেন, কেনই বা অর্থনীতি আর সমাজনীতির নিরিখে তার নতুন মূল্যায়ণের প্রয়োজন?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে গণ আন্দোলনের গণ্ডীর মধ্যে নারীসমাজের দিকে একবার চোখ ফেরানো দরকার। আদমসুমারির হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলেন নারী। কিন্তু গণ-আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেই মেয়েরা, আন্দোলনের সামনের সারিতে আসে খুবই কম। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এটাই, বিগত কয়েক বছরে রাজনীতির নামে তাণ্ডব ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের এগিয়ে আসায় বিরাট বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরোনো ক' বছরের গ্লানিকে মুছে ফেলে ট্রেড-ইউনিয়ন ও মহিলা আন্দোলনে মেয়েরা কিছু কিছু এগিয়ে আসছেন। কিন্তু শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা মেয়েদের এই অনীহা আর জড়তা কাটিয়ে ওঠাটা একটা বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

কেন এই সমস্যা, কোথায় এর সমাধান—তা খুঁজতে গিয়েই অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে নারী প্রগতির সমস্যাটা মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ সমাজ বিকাশের কোন স্তর পার হয়ে, সমাজের কোন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মেয়েরা এই জাতীয় ভাবনায়, অনীহায় ভুগছে তা স্পষ্টভাবে না জানলে সত্যিই এ রোগের চিকিৎসা অসম্ভব।

'নারী প্রগতি'র প্রশ্নটা আমাদের কাছে অনেকখানি শিক্ষার সুযোগ, ঘরের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে আসার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। যে দেশে নারীসমাজের ৮৫ ভাগ নিরক্ষর, ঘরের কোণে খুন্তি নাড়া ছাড়া অন্য কাজ যে দেশে অপরাধের সমতুল্য সে দেশে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া, বাইরের মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করার অধিকার পাওয়া 'প্রগতি'-র লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের কাছে, অর্থাৎ আমরা যারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলি, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলি, তাদের কাছে 'নারী প্রগতি'-র প্রশ্নটা ঠিক ঐটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 'নারী প্রগতি'-র প্রশ্নে আমরা আরও অনেক কিছু বুঝি, যা অর্থনীতির সঙ্গে, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সমাজকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে, সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীসমাজের অবস্থিতি অনুধাবন করলে, এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভূমিকা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। 'নারীমুক্তি' বা 'নারীপ্রগতি' তাই সমাজ-অর্থনীতিতে তার সমানাধিকারের প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল।

সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের ভূমিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করলে বিষয়টি সহজতর হবে। পৃথিবীর আদি-ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আদিম যুগের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। আরও লক্ষ্য করা যায়, আদিম সাম্যবাদের যুগে মেয়েরা কিন্তু গৃহাশ্রয়ী ছিলেন না। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই খাদ্য সংগ্রহের জন্য শিকার-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতেন। সে যুগে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে খাদ্য সংগ্রহ করাই ছিল কঠিন ব্যাপার। এক-একটি গোষ্ঠীতে যে জনবল তা সেই গোষ্ঠীর খাদ্য-সংগ্রহে নিয়োজন করা ছিল একান্ত-প্রয়োজন। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে উৎপাদনে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে নারী-পুরুষ উভয়েই ছিল সমাজের সম্পদের সমান অধিকারী। সামাজিক দায়-দায়িত্বের সমান অংশীদার। কিন্তু সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ মেয়েরা বিশেষ কিছু সম্মান মর্যাদা সমাজের কাছে লাভ করতেন। কারণ, উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা ছাড়া তাদের আরেকটি বিশেষ ভূমিকাও সে যুগের সমাজ লক্ষ্য করেছিল। তা হলো সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা। এই জনসম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতাই তাকে সমাজে বিশেষ অধিকার দিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইতিহাসের বিকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে জনোৎপাদন ক্ষমতা একযুগে নারীকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল সেই জনোৎপাদন ক্ষমতাই পরবর্তী যুগে তার সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাজবিকাশের গতিপথে মানুষ ক্রমশ কৃষিকাজ শিখল। মেয়েরাও কৃষিতে অংশগ্রহণ করল। ফলে, একটা বৃহত্তর শ্রমবিভাগ হল। পুরুষেরা মূলত শিকারের কাজ ও মেয়েরা কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করতে লাগল। আগের যুগে যেটুকু খাদ্য সংগৃহীত হত, তার সবটাই সমাজের প্রয়োজনে লেগে যেত। কিন্তু কৃষিকার্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত কিছু সম্পদ সৃষ্টি হতে লাগল। একদিকে এই সম্পদের মালিকানা ও উত্তরাধিকার, অন্যদিকে দু'টি নারীপুরুষের পরস্পরকে ভালোবেসে ঘর বাঁধার প্রেরণা থেকে পরিবারের সৃষ্টি হল। ধীরে ধীরে নারীর আর পুরুষের সমান শ্রম করার প্রয়োজন থাকল না। নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতা ও মানসিক প্রবণতার দিক থেকে মেয়েরা ক্রমশঃ সন্তানপালন, কৃষি ও সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয়যুক্ত কাজকেই বেশী বেশী করে পছন্দ করতে লাগল। গৃহাশ্রয়ী হয়ে উঠতে লাগল।

এরপর এল দাস যুগ। আরও উদ্বৃত্ত শ্রম সৃষ্টি হতে লাগল। দাসের শ্রমকে ব্যবহার করে প্রভু আরও ধনী হয়ে উঠতে লাগল। এই দাস-ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ উভয়েই তার শ্রমদান করত। এছাড়া সে যুগে নিয়ম ছিল, দাসের সন্তানও প্রভুর অধীনে দাস হবে। অর্থাৎ, দাস বংশপরম্পরায় প্রভুকে সেবা করবে। অর্থাৎ, যতবেশী দাস-সন্তান উৎপাদন করা যাবে ততই প্রভুর লাভ। দাস নারী এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আরও বেশী নির্যাতিত আর শোষিত হতে লাগল। দাস উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। পৃথক সত্ত্বা স্বীকার না করে, তার মনকে মর্যাদা না দিয়ে এই যুগ থেকেই তাকে শ্রমিক উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগল। দাস-নারীর বহুগামিতাকে নিয়ম করে তোলা হল। এই অবস্থার একটা নির্মম প্রতিফলন আছে গিনি-বিসাউ-এর একটি দ্বীপে। এখানে বসবাসকারী মানুষের পিতৃ-পরিচয় নেই, পরিবার নেই, শুধু মাতৃপরিচয় আছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই দ্বীপে বসবাসকারী দাসদের বিবাহের অধিকার ছিল না, যে কেউ যে কোন দাসনারীর সঙ্গে মিলিত হতে পারত। এর ফলে সন্তান উৎপাদন হত বেশী। দাস-মালিকও অনেক বেশী দাস-শ্রমিক পেতো। এই সময় থেকেই নারীর মর্যাদাহীনতার যুগ শুরু হল। নারীও শ্রমিকের মত মানুষ হিসেবে নয়, বস্তু হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল। দাস-যুগের বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মন্তব্য উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। অ্যারিস্টটলের মতে, দাস-দাসী সম্পদ, স্ত্রী এই সমস্ত কিছুর মালিক হল পরিবারের কর্তা। স্ত্রী এখানে পরিবারের কর্ত্রী নয়। পরিবারের কর্তার সম্পদের তালিকায় একটি সংযোজনমাত্র। উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি হল। মেয়েদের সমাজের উপর কর্তৃত্ব হ্রাস পেল।

সামন্ত যুগে মেয়েদের অবস্থা আরও করুণ হয়ে উঠল। উদ্বৃত্ত শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর মানুষের বিলাসিতাও বৃদ্ধি পেল। মেয়েদের উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। তাদের একমাত্র কাজ হল সন্তান-উৎপাদন, ক্রমশ নারীদেহ ভোগের সম্পদ হয়ে উঠল। সুন্দর ফুল-ফল হাজারটা বিলাসিতার জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেহও হয়ে উঠল ভোগের পণ্য। নারীদেহ নিয়ে চলল অবাধ বিকিকিনি। সুন্দর জিনিস মাত্রে পাওয়ার অধিকার সামন্ত প্রভুর। সেই হিসেবে সুন্দরী নারীও তাই তার ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে বিক্রীত হতে লাগল। 'উদার মহানহৃদয় সৌন্দর্যপ্রিয়' বাদশাদ আকবর তার বিলাসের প্রাসাদ ফতেপুরে তার ছবি রেখে গেছেন। সেখানে সুন্দরী নারী ছিল দাবার ঘুটিমাত্র। সামন্ত ব্যবস্থার অত্যাচার এমন চরম পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছিল, যে, গাছের প্রথম ফলের মত কুমারী নারীকে তার প্রথম যৌবন উপহার দিতে হত সামন্ত প্রভুকে। শুনেছি, এখনও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও নাকি এই প্রথা চালু আছে। বিয়ের প্রথম রাতে জমিদার-জোতদার নববধূকে উপভোগ করার মহান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সামন্ত যুগ থেকেই উৎপাদন থেকে নারী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল। সন্তান উৎপাদন ও গৃহস্থালী হল তার ভূমিকা। গৃহের এই কাজ, নারীর এই সেবাকে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকা বলে স্বীকার করা হল না। নারীকে দাসীতে পরিণত করা হল। ঘোমটার আবরণে তাকে ঢেকে রূপোপজীবির ভূমিকা দেওয়া হল।

সামন্ত যুগের পথ পার হয়ে ধনতন্ত্রের যুগে এসে নারীকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু সে স্বাধীনতা দেওয়া হল শ্রমের প্রয়োজনে। কৃষককে যেমন জমি থেকে মুক্ত করে, সামন্ত প্রভুদের অধীনতা মুক্ত করে, তথাকথিত 'স্বাধীন শ্রমিক'-এ পরিণত করা হল, মেয়েদেরও তেমনি স্বাধীনতা দেওয়া হল. ঘোমটার আবরণ ছিঁড়ে তাকে শ্রমের বাজারে নিয়ে আসা হল। তাকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হল, তাকে 'প্রগতিশীল' করে তোলা হল, নারীসমাজকে উন্নতি করার জন্য নয়, তার শ্রমকে প্রয়োজনীয় করে তোলার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে নারী সম্পর্কে মূলগত ধারণার কোন পরিবর্তন ঘটল না। বুর্জোয়া যুগে দাঁড়িয়ে নারীদেহ পণ্যে পরিণত হল। অন্যান্য পণ্যের মত তাকেও প্রতিযোগিতার বাজারে নামিয়ে দেওয়া হল নগ্নভাবে।

বুর্জোয়া ব্যবস্থা যেহেতু সামন্ত ব্যবস্থা থেকে এক ধাপ অগ্রসর একটা ব্যবস্থা সেহেতু এই ব্যবস্থা প্রথম যুগে নারীসমাজের ক্ষেত্রেও কিছু প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে এনে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এই কাজের পিছনে তাদের স্বার্থ ছিল দুধরনের—এক, শিল্পের শ্রমিক যোগান দেওয়া; দুই, নারীর শারীরিক অপটুত্বের অজুহাত দেখিয়ে একই পরিমাণে শ্রম অনেক কম দামে কেনা। এখনও, ভারতের বিভিন্ন শিল্পে এই মেয়েদের পুরুষের তুলনায় কম মজুরী দেওয়ার অবস্থাটা বজায় আছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বুর্জোয়ারা শ্রমের ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থে কিছুটা স্বাধীনতা দিলেও শেষ পর্যন্ত পুরুষকে আনন্দ দেওয়াই যে তার একমাত্র লক্ষ্য। পুরুষের উপর নির্ভর করা ছাড়া মেয়েদের গত্যন্তর নেই—এই ভাবনাটা বজায় রেখেছে।

বিশেষত, বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবক্ষয়ের যুগে, এই বিষয়টা আরও রূঢ়ভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুর্জোয়ারা এখন আর তাদের ব্যবস্থাকে বিকশিত করতে পারছে না। তাদের ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ছে। শ্রমের সুযোগ ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। ফলে, পুরুষ-শ্রমিকের সঙ্গে সঙ্গে নারী-শ্রমিকও উদ্বৃত্ত হচ্ছে। তারা সংগঠিত হয়ে এই ভেঙে পড়া পচা-গলা ব্যবস্থাটাকে চুরমার করে দিয়ে নতুন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছে। এই সংগ্রামী মানুষকে বিভ্রান্ত করার, সংগ্রামবিমুখ করার অপচেষ্টাও তার পাশাপাশি চলেছে। এই যুগে তাই

(শেষাংশ ৩২৮ পৃষ্ঠায়)

ব্লক যুবকেন্দ্র সমাচার

(ক) বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাচক্র :—

আগষ্ট মাসে যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বি আই টি এম-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন ব্লক যুব কেন্দ্রে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীর সংগে সাযুজ্য রেখে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কর্মবহুল জীবনকে স্মরণ করে আলোচনাচক্রের বিষয়সূচীতে ছিল— আইনস্টাইন : তাঁর জীবন ও কর্ম।

ব্লক পর্যায়ে এই সব মনোগ্রাহী আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীরা। জটিল তত্ত্বগত আলোচনাকে যতদূর সম্ভব জীবনধর্মী করায় ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করে। গত ২৮শে আগষ্ট এই আলোচনাচক্র শেষ হয়।

ব্লক পর্যায়ের আলোচনাচক্রের পর জেলাস্তরে আলোচনাচক্রের আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এই আলোচনা আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। জেলাস্তরের সফল ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্যস্তরে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।

(খ) পর্বতাভিযানে আর্থিক অনুদান :—

এই বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে তরুণ যুবক-যুবতীদের পর্বতাভিযানে আগ্রহী করে তোলার জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা আছে। এ বছরে এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন শৃংগে আরোহণ করাতে সাহায্য করার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। এ বাবদ এ পর্যন্ত আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর হয়েছে।

(গ) ব্লক যুব কেন্দ্র সমাচার :—

যুব কল্যাণ বিভাগের পরিধি বা কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার জন্য ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের ৩৩৫টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে একটি করে ব্লক যুব কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৯০টি ব্লকে ব্লক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং এই সব অফিসের কাজকর্মও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

সম্প্রতি আরও ১০০টি ব্লকে ব্লক যুব কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক কাজকর্ম দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই এই ১০০টি যুব কেন্দ্রের কাজকর্মও পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে।

(ঘ) শিক্ষা মূলক ভ্রমণের জন্য অনুদান :—

সম্প্রতি যুব কল্যাণ দপ্তর বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত আবেদনপত্র আহ্বান করে। বিশেষ করে অনুন্নত এলাকার দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যুব কল্যাণ দপ্তর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আবেদনপত্র দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৩১শে আগষ্ট। সুদূর পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিও এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখায়। ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত যে সমস্ত আবেদনপত্রগুলি দপ্তরে এসে পৌঁছেছে সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উপযুক্ত বিদ্যালয়গুলি এ বাবদ আর্থিক অনুদান পাবে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এ বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে যে অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে তা বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের গতিকে যে আরও বাড়াতে সাহায্য করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

(ঙ) অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প :—

এই প্রকল্পে যুব কল্যাণ বিভাগ আগষ্ট মাস পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬ হাজার ৫৬৬ টাকা প্রান্তিক ঋণ প্রদান করে। এর ফলে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার বিনিয়োগ সম্ভব হয়েছে এবং ৪৭টি প্রকল্প রূপায়ণের পথে এগিয়ে চলেছে। এর দ্বারা ২০০ জন বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

হাবিবপুর ও বামুনগোলা ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী (পুরস্কারপ্রাপ্ত) ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ :— বাঁদিক থেকে—দিলীপকুমার সরকার, প্রদীপ সিনহা, শ্রীমতী নিস্কৃতি সাহা, শ্রীমতী লাভলি বসু ঠাকুর, স্বপ্না ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র সরকার, অমলকুমার দাস।

হাঁসখালি ব্লক যুবকেন্দ্র আয়োজিত বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের
সফল প্রতিযোগিরা (দণ্ডায়মান)।

জামুরিয়া ১নং ব্লকের বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে একজন ছাত্র-প্রতিযোগী বক্তব্য রাখছে।

আমাদের চোখে আমাদের দেশ / অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

(রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে বিদ্যালয় বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ—এই ঋষিবাক্য। ভারতের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। এক মহাতীর্থ আমার দেশ।" আমার চোখে আমার জন্মভূমি দশপ্রহরণধারিণী। আমার দেশ প্রকৃতির স্বাভাবিক আয়ুধে সুসজ্জিত। উত্তরে তুষার মৌলী হিমাচল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রূপে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে। পূর্ব, পশ্চিমে ও দক্ষিণে যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর, ভারত মহাসাগর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আমার চোখে, আমার দেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার আমাদের দেশের ভারতবর্ষ বা India নামকরণ হ'ল কেন?

নামকরণ

কিংবদন্তি আছে, ভরত নামে এক রাজা এদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁহারই নাম অনুসারে এই নামকরণ হয়েছে। প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থেও এই দেশকে ভারতবর্ষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন আর্যগণ অবশ্য এদেশে তাঁদের বাসভূমিকে 'সপ্তসিন্ধ' নামে অভিহিত করতেন; এই সিন্ধু শব্দই প্রাচীন পারসিকগণের উচ্চারণে হিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। এর থেকেই ক্রমে ভারতীয়গণ 'হিন্দু' বলে পরিচিত হলেন এবং তাঁদের বাসস্থান 'হিন্দুস্থান' নামে খ্যাত হ'ল। এই হিন্দু শব্দ পুনরায় গ্রীক ও রোমক লেখকদের লেখা 'ইন্দুশ' Indus রূপ গ্রহণ করে, এবং এই 'ইন্দুশ' থেকে 'ইণ্ডিয়া" নামের উৎপত্তি।

আমার চোখে আমার দেশবাসী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয় সে চিন্ময়...দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষের তৈরী।" তাই আমার চোখে আমার দেশ সম্পর্কে লিখতে গেলে জানতে হবে ভারতীয় জনতত্ত্ব।

অনাদি অতীত কাল থেকে কত জাতি, কত বর্ণের লোক যে এই ভারতভূমিতে আগমন করল তার ইয়ত্তা নেই। বহু জাতির আগমনে ভারতবর্ষ এক মহামানবের মিলনতীর্থে পরিণত হয়েছে।

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত বর্ণনা শুধুমাত্র কবি কল্পনা নয়, ঐতিহাসিক সত্যের বহিঃপ্রকাশ।

বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর জনসাধারণের দেহ গঠনের, বিশেষ করে কেশ বৈশিষ্ট্য, চোখ ও চামড়ার রং, নাসিকা, কপাল ও নরমুণ্ডের আকৃতি ইত্যাদির পরিমিতি গ্রহণ করে, নৃবিজ্ঞানীগণ ভারত-বাসীর জনতত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। সকলের পরিমিতি একই মানদণ্ড অনুসারে গৃহীত হয়নি; ফলে মত পার্থক্য রয়েছে। বিখ্যাত আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ ডঃ বিরজা শঙ্কর গুহের মতে ভারতবাসী মোট ছয়টি শাখা ও নয়টি উপশাখায় বিভক্ত।

(১) নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু (The Negrito)

(২) আদি অস্ট্রেলিয় (Proto-Austroloid)

(৩) মোঙ্গলীয় (Mongoloid) এরা আবার তিনটি শাখায় (১) দীর্ঘমুণ্ড প্রাচীন মোঙ্গলীয় (২) গোলমুণ্ড প্রাচীন মোঙ্গলীয় (৩) তিব্বতী মোঙ্গলীয়।

(৪) ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean) এরা আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত (১) প্রাচীন ভূমধ্য সাগরীয় (Palaeo-Mediterranean) (২) ভূমধ্যসাগরীয় Mediterranean ৩) প্রাচ্য (Oriental type) (৫) পশ্চিমী প্রশস্তশির জাতি (Western Brachycephalo) এরাও আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত (১) অ্যালপাইন (The Alpiniod) (২) দীনারীয় (The Dinaric) (৩) আর্মানীয় (The Armenioid) (৬) নর্ডিক (Nordic)

আমার চোখে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা সম্পর্কে বিশ্বের মেহনতী মানুষের নেতা স্বনামধন্য মার্কস ও এঙ্গেল বলেছেন—"শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি তিনটি দিক প্রথমত মানসিক শিক্ষা, দ্বিতীয়ত শারীরিক শিক্ষা, যেমন শিক্ষা জিমনাসটিকস ও সামরিক বিদ্যালয়ে দেয়া হয়, তৃতীয়ত কারিগরী শিক্ষা যে শিক্ষা সমস্ত রকম উৎপাদন পদ্ধতিতে সাধারণভাবে কাজে লাগে এবং সাথে সাথে শিশু ও তরুণদের সমস্ত বিষয়ের সাধারণ যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে ও ব্যবহার করতে উৎসাহ দেয়।" (মার্কস এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড) কিন্তু আমার চোখে আমাদের দেশে তৃতীয় ধরণের কোন ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। কারণ আমাদের দেশটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক দেশ। এই ধরণের দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে পুঁজিপতিরা, বুর্জোয়াশ্রেণী। এরা মুনাফার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না, এমনকি তারা যে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে তাও মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে। তাদের কল-কারখানা অফিস চালানর জন্য যে পরিমাণ শিক্ষিত শ্রমিক বা কর্মচারীর প্রয়োজন শুধু-মাত্র সেই সংখ্যক মানুষের জন্য তারা শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

ভারতবর্ষের ৭০% লোকই কৃষিজীবী। পুরান আমলের যন্ত্রপাতি হাল-বলদ ব্যবহারের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির দরকার হয় না। তাই আমার দেশের ৪০ কোটি মানুষকে শাসকশ্রেণী শিক্ষিত করার কোন প্রয়োজনই মনে

করেনি। পৃথিবীর মোট নিরক্ষর লোকের ৫০% বাস করে ভারতবর্ষে যেটা স্বাধীনতার সময়ে ছিল ১০% বা ১২% এর মত।

১৯৪০ সালে সোভিয়েত দেশের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা এম, আই, কালিনিন শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেন "Education is definite, purposeful and systemetic influencing of the mind of the person being educated in order to imbue him with the qualities desired by the educator.'

আমার চোখে আমার দেশের শাসকশ্রেণী এটাই চেয়েছিলেন। এখন দেশ জোড়া গভীর সংকট। একচেটিয়া পুঁজিপতি, জমিদার ও জোতদারদের স্বার্থরক্ষায় সদা চঞ্চল এ সরকার। ধনতন্ত্র বিকশিত হতে পারলেও (আজকের যুগে যা অসম্ভব) শিক্ষাক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রগতি ঘটতে পারত, আমাদের দেশে সেটুকুও হতে পারেনি। এবং আমার চোখে আমাদের শাসকশ্রেণীই তা হতে দেয়নি। কেননা "In a class society, there never has been nor there can be, education outside or above the classes"

সুতরাং আমার চোখে আজকের শিক্ষা জগতের এ পরিস্থিতি শাসকশ্রেণীর স্বার্থকেই সযত্নে রক্ষা করে চলেছে।

ভারত সরকার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাবেও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত প্রস্তাবই বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চবিত্তদের মধ্য থেকে কিছুকে বেছে নিয়ে সুযোগ সুবিধা দানের পুরানো নীতিই বহাল রেখেছিলেন। সাত বছর আগে ২ বছর ধরে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ৩২০০ কোটি টাকা দেবার বাগাড়ম্বর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ১৭২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, অথচ এই সময়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল ৪০%।

আমার চোখে ১৯৭৯ সালের মধ্যেও সমস্ত শিশু ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অন্তত পাঁচ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশা নেই, কারণ এমন কি পরিকল্পনায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাত্র ৮২ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী (৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত) স্কুলে নাম লেখাবে এবং নাম লেখান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ৪০% পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করবে। অপর সকলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। ৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত ৮ বছরের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা দূরে রাখা হয়েছে। ১০+২+৩ বছরের শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ের অর্থাৎ ১০ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয় ২৬%-এর বালক-বালিকার জন্য। এটা ৭০ সালের ২২%-এর চেয়ে কোনক্রমে ৪% বেশী। ৭ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন বালক-বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঢোকার সুযোগ পায়। কিন্তু তবুও পরিকল্পনা বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বালক-বালিকাদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

আমার চোখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলো, নেহরু-যুব কেন্দ্র, হোস্টেলের সুযোগ বৃদ্ধি, ডে-স্টুডেণ্টস হোম, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভোজনালয়, বই ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক ছাত্র যুবকে প্রলুব্ধ করতে চায়; কিন্তু ছাত্রদের গণতান্ত্রিক দাবী, ছাত্র-সংসদ গঠনের অধিকার, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও পরিচালন ব্যবস্থায় ছাত্র প্রতিনিধিত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থা রূপায়ণে ও পরিচালনায় ছাত্রদের অংশ গ্রহণের অধিকারের কথা উচ্চারণ করে না।

আমার চোখে জমিদার তন্ত্রের সংগে আপোষের ফলে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। ভারত সরকার প্রকাশিত 'India-74' এ প্রচারিত তথ্য থেকে দেখা যায় ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫ কোটি ৯৩·৫ লক্ষ এবং ১৯৭১ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা ২ কোটি ৭·২ লক্ষ। তাহলে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষা নিতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল অথচ শিক্ষা জীবন পরিচালনা করতে পারল না এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ। এরা হচ্ছে সেই হতভাগ্যের দল যাদের পিতামাতা ভূমিহীন অথবা অত্যন্ত অল্প জমির মালিক। এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজের শিকার—জোতদার ও মহাজনী শিকারে পিষ্ট। এরা শুধু ৮/১০ বছরে পদার্পণ করার পূর্বেই অন্যের বাড়ীর রাখালি শুরু করে আর স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে চেয়ে বাতাস ভারী করে তোলে, পরণে কাপড় নেই, গাছের পাতা যাদের খাদ্যতালিকার শীর্ষস্থানে—বিদ্যালয় তদের কাছে বিলাসিতা।

তবু এদেরই বিরাট অংশ দুঃসাহসে ভর করে পাঠশালায় ভর্তি হয়। শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় আর অভুক্ত শরীরে গা মেলায় স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর মিছিলে। তারপর শুরু হয় মিছিল ভাঙ্গার পালা। স্কুলের মিছিল ভেঙ্গে এক একটি অংশ চলে যায় জীবীকার সন্ধানে। উচ্চতর ক্লাসে পড়াশুনা করার নিশ্চয়তা নির্ভর করে অভিভাবকদের আয়ের ওপর। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যার বিভাজন থেকে জানা যায় ১ম শ্রেণী থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার পূর্বেই কি পরিমাণ drop-out হয়—প্রথম শ্রেণী ৪০·৩৬% দ্বিতীয় শ্রেণী ১৬·৯৪% তৃতীয় শ্রেণী ১৬·২৫% চতুর্থ শ্রেণী ১২·৭৭% পঞ্চম শ্রেণী ৯·৬৮৭% নিজের সন্তান সন্ততিকে বিদ্যালয় প্রেরণ করার জন্য কৃষক পিতা-মাতার আগ্রহে যে অপরিসীমতা পূর্বোক্ত বাক্য থেকেই জানা যাবে। এখান থেকে বোঝা যাবে শিক্ষা লাভের জন্য প্রথম শ্রেণীর ৪০% ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে কমে গিয়ে হয় ১৬%। অর্থাৎ শিক্ষা লাভের আশা নিয়ে যারা প্রথম

শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার আগেই শতকরা ৬০% ছাত্র বিদ্যালয়কে চিরবিদায় দিয়ে কঠিনতর ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়। গত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনীতে নতুন নতুন অধ্যায় যুক্ত করে।সার্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক শিক্ষার, গালভরা প্রতিশ্রুতি পরিণত হয় নিদারুণ পরিহাসে।
আমার চোখে

আমার চোখে কৃষি বিজ্ঞানে আমাদের দেশ :—

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় কিছু গম, বার্লি, ধান ও শাকসব্জীর বীজ পান। এর থেকে উনি ধারণা করেন যে সেই যুগেও ভারতীয়রা এই সমস্ত চাষের কথা জানতেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই যতদূর জানা যায় ভারতীয় কৃষি ছিল উন্নত ও সমৃদ্ধ। তাই আমার চোখে কৃষি-বিজ্ঞানে আমাদের দেশের অগ্রগতি আমাদের ঐতিহ্য। আধুনিক কালের অগ্রগতিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়কে দুভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা উচিত। প্রথম অংশে ১৯৪৭—১৯৬০ সাল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু ১৯৬১ সালে। প্রথম পর্যায়ে আমাদের যা অগ্রগতি তা আমার চোখে মূলত আরো বেশী জমি চাষের আওতায় আসা এবং সেচের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু প্রকৃত অগ্রগতি বলতে যা বোঝায় তার সূত্রপাত হয় ১৯৬১ সালে। খাদ্য উৎপাদনের সূচকটা একটু দেখলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা বোঝা যাবে। ১৯৬০ কে ১০০ ধরলে এই সূচক ১৯৭০ সালে সারা পৃথিবীর খাদ্যোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়ায় ১২০তে আর ভারতের সূচক দাঁড়ায় ১৫৪তে। সত্যিই! শুধু আমার কেন? সবার চোখেই বিস্ময়কর অগ্রগতি নয় কি? আর এই অগ্রগতির পেছনে আছে উচ্চফলনশীল প্রজাতি ও উন্নত কলাকৌশল।

কৃষির মূল উপাদ্য তিনটি -কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ। ১৯০৬ সালে পুণাতে প্রথম কৃষি কলেজ স্থাপিত হলেও ষাটের দশকের আগে কৃষি-শিক্ষা ছিল অবহেলিত। ১৭ই নভেম্বর, ১৯৬০এ পন্থ নগরে ১৭০০০ হেক্টর জমি নিয়ে ভারতের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে কৃষি শিক্ষার এক নতুন যুগের সূচনা হল। পরবর্তী সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো ১২টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে আমাদের পশ্চিম বাংলার 'বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' সর্ব কনিষ্ঠ। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরন্তর প্রয়াসে প্রতি বছর প্রায় ৮০০ ছাত্রছাত্রী স্নাতক, স্নাতোকোত্তর ও পি এইচ ডি ডিগ্রী পাচ্ছেন। কেবলমাত্র সাধারণ পঠন-পাঠনের এই বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি নিজেদের সীমায়িত করে রাখেননি। এরা কৃষকদের কৃষির নানান কলাকৌশল, মাটি ও সার ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গাছের রোগ ও পোকাকে চেনা ও তার হাত থেকে ফসল বাঁচানোর উন্নত কলাকৌশল শেখান।

১৯৬৬ সালের আগে আমাদের মোট খাদ্যোৎপাদন ছিল ৪৪ মিলিয়ন টন। আর গত বছরে ছিল ১১৫ মিলিয়ন টন। খাদ্যশস্যের বিপুল বৃদ্ধির জন্য যাঁরা সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন, আমার চোখে তাঁরা কৃষি বিজ্ঞানী। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় আমাদের কৃষিতে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক কম, তবু যে কটি দেশ কৃষি সম্পর্কিত গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ করে সর্বাধিক ফল পেয়েছে তার মধ্যে ভারত অগ্রগণ্য।

এই শতকেরই গোড়ায় উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবনের তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়ে প্রথম প্রায়োগিক সাফল্য আসে নরম্যান বোরল্যাগের উচ্চফলনশীল গমের 'Norion-10B' বংশানু আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এর অল্প পরে ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে বার করা হয় 'IR-8' ধান। ভারতবর্ষেও এই জোয়ার এসে লাগে। এর আগেও অবশ্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পাট, ভুট্টা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছিলেন। এবার তারা স্ব পরাগ যোগী গম, বাজরা জোয়ার ও অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও এগিয়ে এলেন। আমরা পেলাম জয়া, পদ্মা, সোনালীকা, কল্যাণসোনা ইত্যাদি জাতগুলি।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় নানান অঞ্চলের উপযুক্ত জাত আমরা পেয়েছি। মহারাষ্ট্রে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শঙ্কর জাতের নিবিড় তুলা চাষ, যা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ভারতেই শুরু হয়, পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরায় গমের চাষ, পাঞ্জাব ও হরিয়াণায় ধানের চাষ, উত্তর বাংলার সমৃদ্ধতার প্রতীক আনারসের চাষ, উত্তর ভারতে আমের চাষের কথা আমার চোখে এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ পি কে দে নীলসবুজ শ্যাওলা আবিষ্কার করেন ডঃ দে ও ডঃ এল এন মন্ডলের প্রচেষ্টায় আমরা জানতে পারি কিভাবে এরা বায়ুর থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে তা মাটিতে বন্ধন করে। তাঁদের এই গবেষণার কল্যাণে ধানের চাষের খরচ আজ গেছে অনেক কমে। আমাদের বিজ্ঞানী ডঃ এস পি রায়চৌধুরী নাইট্রোজেনের ওপর গবেষণা করে ভারতীয় কৃষি গবেষণার মানকে পৃথিবীর চোখে সম্মানীয় করে তোলেন। আজকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানীদের (ভারতীয়) মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন। Plant-Breeding এর উপর বোরল্যাগ এ্যাওয়ার্ড সবচেয়ে বেশী বার যে দেশ জয় করেছে, সে হল—ভারত।

স্বাধীনতার সময়ও একই জমিতে একটির বেশী ফসলের কথা ভাবা যেত না, আজ আমরা এক জমি থেকে বছরে চারটি ফসল তুলছি। আগে জলকে কৃষির মুখ্য প্রয়োজনীয় মনে করা হত। এখন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অজল চাষ গবেষণার নানান পর্যায়ে যে তথ্য পেয়েছেন তার থেকে এখন আর জলকে বাধা মনে হয় না।

মিশ্র মাছ চাষ, সাগর জলে মাছ চাষ, শঙ্কর জাতের গরু, মহিষ পালন, তাদের দেশজ খাদ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আমার চোখে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রভূত অবদান আছে।

ভারতবর্ষের কৃষি গবেষণার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণাকে নিয়োজিত করা। কিন্তু এখনও আমরা হেক্টর প্রতি উন্নয়নে উন্নত দেশগুলি থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। এর জন্য আমার চোখে মূলত দায়ী লাগে ভূমি ও জল ব্যবহারে আমাদের ব্যর্থতা ও নিরক্ষরতা। গ্রামাঞ্চলে কৃষির প্রায়োগিত সাফল্য তখনই আসতে পারে যখন কৃষকদের উন্নত কলাকৌশলগুলি ঠিকমত রপ্ত করান যাবে। কিন্তু সম্প্রসারণে আমাদের অনিহার জন্য আমরা এই বিষয়ে খুব বেশী এগোতে পারিনি। দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে কৃষির প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফল কেবল মাত্র সম্পন্ন চাষীরাই পেয়েছেন। উপরন্তু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ওঝা, দান্ডেকর, বর্দ্ধন, মিনহাস, রথ সকলেই স্বীকার করেছেন ১৯৬০ সালে গ্রামাঞ্চলে যত লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করতেন ১৯৭০ সালে তাদের সংখ্যা ১½ গুণেরও বেশী হয়েছে। দান্ডেকর ও রথের হিসাব অনুযায়ী ৬৭-৬৮ সালেও আমাদের দেশের মোট জনসমষ্টির ৪১% দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে ছিলেন। কৃষি বিজ্ঞানে উৎপাদন বাড়াই অগ্রগতির পরিচয় বহন কর না, প্রকৃত অগ্রগতি বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। আমার চোখে কৃষির প্রকৃত অগ্রগতি নির্ভর করছে, কৃষি ক্ষেত্রে এখনও যে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক রয়েছে, তার অবসান করার উপর। প্রকৃত ভূমি সংস্কারকে এড়িয়ে উন্নত চাষ পদ্ধতি, অধিক ফলনশীল বীজ সার, সেচ প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষির উন্নতির যে সব চেষ্টা গত ৩০/৩৫ বছরে ধরে চালান হয়েছে তার ফলে মুষ্টিমেয় কৃষক আরোধনী হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কৃষির এমন কিছু উন্নতি হয়নি যাতে জাতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে অগ্রগতির পথে এগোতে পারে। 'অধিক ফসল ফলাও কমিউনিটি ডেভেলেপমেণ্ট প্রজেক্ট', আই এ ডি পি, সি এ ডি পি প্রভৃতি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কৃষির উন্নতির প্রচেষ্টা নিতান্তই সীমাবদ্ধ ফল লাভ করেছে। ৫% ধনী কৃষক এতে লাভবান হয়েছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনীতির বিকাশ তেমন প্রভাব পায়নি। এবং ভূমি সংস্কার ভিন্ন তা সম্ভবও নয়।

আমার চোখে আমাদের দেশের স্বাধীনতাঃ—

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishnsss, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we have nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way."

(Charles Dickens, A Tale of Two Cities)

ফরাসী বিপ্লবের দুর্যোগময় দিনগুলির এই বর্ণনার সংগে অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার ঘটনাটির। এই রকমই ছিল নতুন ভারতের জন্মলগ্ন—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। আমার চোখে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে স্বাধীনতার যে স্বাদ আমরা পেলাম, সেই স্বাদ যেমনি গৌরবের তেমনি কলঙ্কেরও। ত্রিশ বছর আগে সেই ১৫ই আগস্টের পশ্চাদপটভূমি হিসাবে যে ইতিহাস ছিল দেশের জনগণের তার জন্য আমার চোখে আমরা সবাই নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারি। হাজার হাজার মানুষের স্বার্থত্যাগ, কারাবরণ, মৃত্যু ও রক্তদানের পথ ধরে এসেছিল এই স্বাধীনতা।

অন্যদিকে আর একটি ইতিহাস ছিল স্বাধীনতার। দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে এল না। সেদিন রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বনাম সারা দেশের জনগণ মুখোমুখি দাঁড়ালেও নেপথ্যে আর একটি দৃশ্য অভিনীত হচ্ছিল। ভারতবর্ষের উঠতি পুঁজিবাদীগোষ্ঠী সামন্ত প্রভু, জমিদার, দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রভৃতি তাবৎ শোষক শ্রেণীগুলি প্রমাদ গুনছিল এই স্বাধীনতার স্বাদ কারা উপভোগ করবে। যদি দেশের জনগণের হাতে ক্ষমতা যায় তাহলে মুষ্ঠিমেয় সম্পত্তিবানদের হাতে আর সম্পত্তি প্রতিপত্তি থাকবে না। তাই স্বাধীনতার মধ্য রাত্রিতে সমঝোতা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের। দেশ স্বাধীন হবে, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থও থাকবে, এই পুঁজিপতি সম্পত্তিবানরাই হবে দেশের মালিক তারাই দেশ পরিচালনার ভার হাতে পাবে, আমার চোখে এই শ্রেণীগুলির নেতৃত্ব করছিল সেদিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, আজ জনতা পার্টি—ভারতের শোষক শ্রেণীর সংগঠিত রাজনৈতিক দল।

আমার চোখে আমার দেশের জাতীয় সংহতিঃ—

বৈচিত্র্যময় এই ভারতবর্ষ। এই বৈচিত্র্য জাতি, ভাষা, আচার, আচরণের মধ্যে যেমন তেমনই প্রাকৃতিক, ভৌগলিক ক্ষেত্রেও পরিদৃশ্যমান। কিন্তু নানা প্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক গভীর ঐক্যবোধ চিরকালই বিরাজিত। প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা ভারতবাসীর চিরন্তন সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা।" আমার চোখে এমন দেশে একমাত্র সচেতন স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই জাতীয় সংহতি অর্জন করা যেতে পারে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিভেদমূলক প্রবণতাকে না বাড়িয়ে বরং তাকে প্রতিহত করতেই সাহায্য করবে। বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যকে ঘৃণার

দৃষ্টিতে না দেখে তাকে শ্রদ্ধা জানালেই তবে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হবে। আমার চোখে মোট রাজস্বের ২৫% রাজ্যকে দিলে কোন দিনই জাতীয় সংহতি গড়বে না। ৭৫% রাজস্ব রাজ্যগুলিকে দিলেই শক্তিশালী ভারত গড়ে উঠবে। কারণ এখন প্রত্যেক রাজ্যই বেশী টাকা চায়, কারণ রাজ্যগুলি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প টাকা পায়; এমন একটা রাজ্য অন্য রাজ্যকে বঞ্চিত করলেই তবে বেশী টাকা পেতে পারে, তাই যে রাজ্য বেশী টাকা পায় আর যে রাজ্য বঞ্চিত হয় তাদের মধ্যে একটা খারাপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে. বঞ্চিত রাজ্য কেন্দ্রর ওপর রেগে যায়—যা কখনোই শক্তিশালী দেশ গড়তে পারে না। আবার শিল্পোন্নত রাজ্যগুলি আর শিল্প অনুন্নত রাজ্যগুলি উভয়েই নিজেদের প্রয়োজন দেখিয়ে বেশী টাকা দাবী করে কারণ তারা যা টাকা পায় তাতে তাদের কুলোয় না ফলে একটা অসুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠে যা জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

আমার চোখে আমার দেশের আইন শৃংখলা :—

ভারতবর্ষের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। "হে মহামানব, একবার এসো ফিরে/শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরে ভিড়ে./এখানে মৃত্যুর হানা দেয় বারবার..." একথা কমিউনিষ্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্বাধীনতার আগে বলেছিলেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে শাসক পার্টির পরিবর্তন হয়েছে কিন্ত 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য খাদ্যের জন্য সংগ্রাম মানুষ করতে পারে না। এখনও মানুষ খাদ্যের দাবী করলে বুলেট পায়—কানপুরের শ্রমিকেরা মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত দেড় মাসের বকেয়া মাহিনা দাবী করে পেল—১১ জন শ্রমিকের মৃতদেহ। উত্তর প্রদেশের কলেজ শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হল। সারা ভারতে গত বছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জমিদার, জোতদারদের হাতে হরিজন নিহত হয়েছে ৫৩৫ জন। নিহতের সর্বোচ্চ সংখ্যা জনতা শাসিত উত্তর প্রদেশ. তার পরের স্থান বিহার। আর পশ্চিমবাংলায় এই সংখ্যা শূন্য। পন্থনগরের নিরন্ন শ্রমিকেরা আন্দোলন করে পেলেন—নৃশংস ভাবে নিজেদের মৃত্যু। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানলাম আন্দোলনকারী শ্রমিকদের PAC বর্বর ভাবে গুলী চালায়, তখন তারা আত্মরক্ষার্থে আখের ক্ষেতে আশ্রয় নেয়। PAC এটাই চাইছিল; তখন তারা আখের ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দেয়; ফলে বহু শ্রমিক জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। স্থানীয় জনসাধারণ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২০ জন শ্রমিককে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। PAC -র লোকেরা আবার রাতে তাদের হাসপাতাল থেকে বের করে গুলী করে; শ্রমিকদের ঝুপড়ীগুলিও অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। PAC র অত্যাচারে প্রাণ হারায় দুটি শিশু, একজনের বয়স ২ বছর। ভারতের অনেক জায়গাতেই এরকম ঘটনা প্রায় নিত্যসঙ্গী।

আমার চোখে অলসতা নয়, দারিদ্রতাই ভারতবাসীর জীবনের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক :—

মানুষের জীবনের উন্নতি, নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরিত্র ও সেই উন্নয়নের পটভূমিকায় ব্যক্তি মানুষের শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর। আর অর্থনৈতিক অগ্রসরতা (?)র এমন এক পদে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি যেখানে জীবনের সার্থকতা, জীবনের উন্নতি নির্ভর করে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর। তাই স্বাধীনতার পর ১৯৬৪ সালে ভারতবর্ষের জনপ্রতি উন্নয়নের হার ছিল ৩% যেখানে এই হার টাটার ছিল ৩২%, বিড়লার ৭৮%, মফৎলালের ১২০%; তার কারণ কি? ভারতবর্ষের টাটা, বিড়লা, মফৎলালরাই শুধু অলস নয়, আর বাদ বাকি সকলেই অলস? তাতো নয়! আর তা যদি হতো তাহলে টাটা-বিড়লার কি এত বৃদ্ধি হ'ত? কারণ টাটা, বিড়লারা কয়েকজন মিলেই তো আর কারখানা চালায় না, যারা চালায় তারা সাধারণ মানুষ। এদেরই পরিশ্রমের ফলশ্রুতি এই অন্যায্য বৃদ্ধির হার। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে পড়লাম জাতীয় আয় ২·৯৫% বেড়েছে, অথচ টাটা-বিড়লার বৃদ্ধি নিচের পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাবে।

শোষণকারীর নাম	সাল	মূলধন	মুনাফা	সাল	মূলধন	মুনাফা
টাটা	১৯৭২—	৬৮৯·৯১ কোঃ টাঃ	৪৮·৮৩ কোঃ টাঃ	১৯৭৫—	১০৬০·০৪ কোঃ টাঃ	৭৪·৪৫ কোঃ টাঃ
বিড়লা	"	৫৫৩·৪৬	৪৪·২৮	"	৯৩৬·১১	[illegible]৩·৯৯
মফৎলাল	"	১৯০·৬৬	১৪·৬৫	"	৩৩৭·১৯	২২·১৬
সিংহানিয়া	"	১০৩·৬৫	৫·৯২	"	১৯৮·৮৭	১৬·৩৮

ভারতবর্ষে বর্তমানে শোষণের ফলে গরীব ক্রমে আরো গরীব হচ্ছে আর ধনী আরও স্ফীতকায় হচ্ছে। কিছুদিন আগে Survey of India র এক রিপোর্টে জানা যায় ২% লোকের হাতে ৪৬% জমি কেন্দ্রীভূত আছে। অপর দিকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আদমসুমারীর রিপোর্টে জানা যায় ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সালে, এই ১০ বছরে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ৩১৫১১৯৪১ জন থেকে ৪৭৩০৪৮০৪তে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫৭৮৫৩৯৭ জন।

এই ভারতবর্ষেরই কোটি কোটি মানুষ ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে চলে—সামান্য দুমুঠো খাদ্যের জন্য। ওই টাটা

বিড়লারা যা পরিশ্রম করে এরা তার চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম করে। জীবনের আনন্দ এদের কাছে অজ্ঞাত। জীবনে উন্নতির স্বপ্ন দেখতে এরা ভুলে গেছে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই এরা এদের রক্তের বিনিময়ে গড়ে তোলে স্ফীতকায় ধনীদের আলস্যের সৌধ। বরং এই শোষিতদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একথা সকল উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সত্য। এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই দারিদ্রের চিত্র ভয়ঙ্কর। আগের পরিসংখ্যানে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বেকারীর সংখ্যা দেখলেই বোঝা যাবে আমার বক্তব্যের সত্যতা।

দেশ	বেকার সংখ্যা
১। ভারত	১ কোটি ৯ লাখ ২৪ হাজার
২। আমেরিকা	১ কোটি
৩। জাপান	৫০ লক্ষ
৪। পশ্চিম জার্মানী	১৩ লক্ষ ৫১ হাজার
৫। বৃটেন	১৫ লক্ষ
৬। ফ্রান্স	১৪ লক্ষ

এই সমস্ত দেশেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফলটুকু ভোগ করেন কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ধনীরা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি—ভয়াবহ ধনতান্ত্রিক সংকট, ভয়াবহ দারিদ্র, শিল্প সংকট, ব্যবসা সংকট, তীব্রতম সমস্যার মুখোমুখি হয়ে। আর এই সমস্যাগুলিই পুনঃ পৌনিকভাবে সৃষ্টি করে চলেছে আরো দারিদ্র। এই পরিস্থিতিতেই উপদেশ দেওয়া হয় কঠোর শ্রম করার,—বলা হচ্ছে তাই অলসতাই জীবনের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক—দারিদ্র নয়। আর এই বিশ্বাসের স্পেনীয় দাঁতগুলি রুদ্ধশ্বাস মুমূর্ষের কণ্ঠনালীতে ডুবিয়ে দিয়ে ধনিক শ্রেণী তাদের পকেট ভরে তুলছে স্বর্ণ মুদ্রায়। তাই পরিশেষে আমি ডাক দিয়ে যাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্য।

নারীপ্রগতি—অর্থনীতি ও সমাজনীতি

(৩২০ পৃষ্ঠার পর)

প্রগতির নামে নারীকে আদিম প্রবৃত্তি জাগানোর হাতিয়ার করে তোলা হচ্ছে। নারীদেহকে লোভনীয় করে তোলা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসেবে মেয়েদের মর্যাদাকে তিল তিল করে হত্যা করা হচ্ছে। শিক্ষার মধ্যে, সমাজ জীবনের মধ্যে নারীর ঐ লোভনীয় ভোগের বস্তু হয়ে ওঠার, পুরুষের মনে মোহসৃষ্টি করার আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই বাইরের জগতে পণ্য হয়ে ওঠাটুকুই প্রগতির চরমসীমা বলে প্রতিপন্ন করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস চলেছে। প্রয়াস চলেছে ব্যক্তিত্ব ও সত্ত্বাকে অস্বীকার করার।

কিন্তু এই পণ্য হয়ে ওঠাটুকুই কি প্রগতি। না, এই অবস্থাটাকে শ্রমজীবী নারীসমাজ মেনে নিতে নারাজ। তাঁরা নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে আরও বেশী বেশী সজাগ হয়ে উঠছেন। সমানাধিকারের দাবী করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া আর কোথাও তাঁদের অধিকার স্বীকৃত নয়। সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই মেয়েদের মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না। আবার, একমাত্র সমাজতন্ত্রেই মেয়েরা তাদের জনবল সৃষ্টির বিশেষ ভূমিকার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাই তাঁদের অধিকারের দাবীতেই সমাজতন্ত্রের সপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলছেন। আমাদের মত দেশেও গণ-আন্দোলনগুলিতে আরও বেশী বেশী করে সামিল হচ্ছেন। সমবেত, সংগঠিত হচ্ছেন মহিলারাও। কারণ, তাঁরাও তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রগতির, অগ্রগতির সঠিক পথটি চিনতে পেরেছেন। ছাত্রীদের কাছে আজও সেই পথটি বিশেষ স্পষ্ট নয়। 'বুর্জোয়া প্রগতি'-র বিষফলটি তাদের সামনে আজও 'সোনালী মোড়কে মোড়া'। যেখানে 'আনন্দলোক' পত্রিকার মাধ্যমে রঙীন বম্বে ফিল্মকে আদর্শ করে তোলা হয়। মার্কিনী রুচি, বিকৃত ভাবনাকে সভ্যতার চরমতম নিদর্শন বলে বর্ণনা করা হয়। কিছু স্বাধীনতা দেওয়ার নাম করে তার স্বাধীন বিকাশের পথরোধ করার চক্রান্তকে যতদিন না ছাত্রীরা অনুভব করবে ততদিনই গণ-আন্দোলন সম্পর্কে তাদের অনীহা থাকবে। নারী প্রগতির প্রশ্নটা যে বাস্তবে উৎপাদনে তার ভূমিকার সঙ্গে, অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গেই যে তার মর্যাদাহানি ঘটে। সমাজের অগ্রগতি না ঘটলে যে তারও অগ্রগতি ঘটে না। এই বিষয়টা সম্যক উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তারাও বাস্তবে সচেতন, সংগঠিত ও আন্দোলনমুখী হয়ে উঠবে না। একমাত্রই এই সমাজ চেতনার প্রসারই তাকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সাম্প্রতিক

প্লাবন

ত্রাণ

পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের মাসিক পত্রিকা
যুবমানস

দীর্ঘদিন পর যুবমানস পত্রিকার গ্রাহক হবার সুযোগ দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। গত জানুয়ারী মাস থেকে ত্রৈমাসিক যুবমানস-এর মাসিকে রূপান্তরের পর থেকেই অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা গ্রাহক হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়েছেন। অনেকে মনিঅর্ডারে টাকাও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এতদিন আমাদের পক্ষে কোন গ্রাহক করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ বিগত সরকারের সময় থেকে যুবমানস পত্রিকার অস্তিত্ব থাকলেও পত্রিকাটি রেজিস্টার্ড পত্রিকা ছিল না। তাই পত্রিকাটি গ্রাহকদের কাছে ডাকযোগে পাঠানো প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ ছিল। রাজ্যের শাসনক্ষমতায় বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হবার পর আমরা পত্রিকাটির রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রচেষ্টা চালাই। অনেক পরিশ্রমের পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অবশেষে কয়েকদিন পূর্বে পত্রিকাটির জন্য নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন নং পাওয়া যায়--পত্রিকাটি রেজিস্টার্ড হয়। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের কারণ প্রত্যেকেই অনুধাবন করতে পারবেন।

সম্পাদকমণ্ডলী
যুবমানস

—ঃ গ্রাহক হবার নিয়মাবলী ঃ—

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা।
ষান্মাসিক চাঁদা সডাক ১·৫০ টাকা।
প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা-২
যুবকল্যাণ অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩২/১, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ)
কলিকাতা-৭০০০০১

—ঃ পাঠকদের প্রতি ঃ—

যুবমানস পত্রিকা প্রসংগে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সংগে ষ্ট্যাম্প খাম পোষ্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

—ঃ এজেন্সি গ্রহণের নিয়মাবলী ঃ—

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা ক্রয় করলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর উর্দ্ধে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০-এর উর্দ্ধে	৪০%

১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না। উপরিউক্ত নিয়মাবলী আগামী ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে কার্যকরী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

সহ-অধিকর্তা-২
যুবকল্যাণ অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩২/১, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ)
৭০০০০১

লেখা পাঠাতে হলে

- ☐ ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিস্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
- ☐ সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।
- ☐ কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
- ☐ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ২০০০ শব্দের বেশি হলে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।
- ☐ যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকগণ তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

(সচিত্র মাসিক যুবদর্পণ)

একাদশ সংখ্যা ॥ নভেম্বর ১৯৭৮
(নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

কান্তি বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক

বনভূষণ নায়ক

প্রচ্ছদ: বাদশা আলম

যুবকল্যাণ অধিকার/পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩২/১ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ (দক্ষিণ)
কলিকাতা-৭০০০০১

মূল্য: পঁচিশ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীগণেশ চাঁদ দে কর্তৃক তরুণ প্রেস, ১১ অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

সূচী

সম্পাদকীয়

বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমোঁ যাকে 'ভারতের নেপোলিয়ান' আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিলেন সেই রাজা রঞ্জিৎ সিংহ একদিন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 'সব লাল হো জায়েগা'। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি দেখে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি এই ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে ভিন্ন পরিবেশে, পৃথক অর্থে তার সেই কথা সত্যে পরিণত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঔপনিবেশিক, পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে একটির পর একটি দেশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। ইউরোপ-এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। প্রশান্ত-অতলান্তিক বাধাকে অগ্রাহ্য করে দুর্ধর্ষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিজ ভূখণ্ডের দোর গোড়ায় কিউবাতে এই ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। এই ব্যবস্থার অমোঘ প্রভাব লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সুগভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। "অন্ধকারাচ্ছন্ন" মহাদেশ আফ্রিকার বনাঞ্চলে খনি-ক্ষেতে, শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নব জাগরণের প্রবাহ সঞ্চার করেছে। ১৯১৭ সালে নভেম্বর মাসে (অতীত রাশিয়ার দিনপঞ্জী অনুসারে অক্টোবর মাসে) সোভিয়েতের বলশেভিক পার্টির পরিচালনায় নবযুগ স্রষ্টা লেনিনের নেতৃত্বে মার্কস এঙ্গেলসের তত্ত্বকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করে, পরিস্থিতির সুনিপুণ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও জনগণ বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যে মশাল প্রজ্বলিত করেছিলেন তার লাল অগ্নিশিখার কিরণচ্ছটায় তামাম পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ এলাকা আজ উদ্ভাসিত, তাবৎ বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ আজ আলোকিত। আজ লাল দুনিয়ার দুর্নিবার রথচক্র দুর্দম গতিতে 'সব লাল হো জায়েগা'র দিকে ছুটে চলেছে। এই জন্যই নভেম্বর বিপ্লব এক অনন্য সাধারণ তাৎপর্য বহন করে চলেছে।

নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বে অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অনেক চমকপ্রদ চোখ ধাঁধান ঘটনা আমরা দেখেছি। আমেরিকার গৃহবিবাদ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব প্রভৃতি শত শত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। আব্রাহাম লিঙ্কন, নেপোলিয়ন, গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনী, ক্রমওয়েল সহ অনেক অনেক বীর নায়কের মনোমুগ্ধকর বীরত্বের কাহিনী যে কোন ইতিহাসের ছাত্রের অজানা নয়। নভেম্বর বিপ্লব তার পূর্বে সংঘটিত অপরাপর বিপ্লবের ন্যায় শুধু শাসক পাল্টায়নি— পাল্টিয়ে দিয়েছে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে, উৎপাদন সম্পর্ককে, ভিন্নভাবে উপলব্ধি করার ব্যবস্থা করেছে জীবনের মূল্যবোধকে।

স্বল্পস্থায়ী প্যারী কমিউনের কথা বাদ দিলে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে শোষিত, বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণী প্রথম রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল। পুঁজিপতি-জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি জারতন্ত্রের কাছ থেকে তাঁরা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল। সেই যুগের বাস্তব অবস্থার বিচারে যথার্থভাবেই মার্কস এঙ্গেলস বলেছিলেন শিল্প-সমৃদ্ধ দেশেই সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করবে। কিন্তু পরবর্তী কালে পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে যখন সাম্রাজ্যবাদে রূপ লাভ করল তখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। বুর্জোয়া জমিদার শাসন ব্যবস্থার শৃঙ্খলে একটি দুর্বলতর স্থানে শিল্পে উন্নত নয় এমন একটি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শে সংগঠিত বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে কমরেড লেনিন আঘাত হেনে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়ে প্রমাণ করলেন সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অন্তিম লগ্ন শুরু হয়েছে। নতুন আঙ্গিকে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করার কৌশলে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত ও

শিক্ষা তিনি স্থাপন করলেন। তিনি হাতে কলমে প্রমাণ করলেন মার্কসবাদ কোন আপ্তবাক্য নয় এটি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। একে আয়ত্ব করতে হয় এবং অন্ধ অনুকরণ নয়, ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ করতে হয়।

উৎপাদনের সমস্ত উপকরণগুলোর মালিকানা থাকবে মুষ্টিমেয় মানুষের দখলে, মুনাফা অর্জন করা হবে উৎপাদন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য, সম্পদের উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করার মূল শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য পাওনা দূরে থাক—টিঁকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মজুরী থেকেও হবে তারা বঞ্চিত, অভুক্ত-জীর্ণ-শীর্ণ কৃষকের ঘামে ভেজা ফসলের উপসত্ব ভোগ করবে বিলাসী কুলাক বা জমিদার শ্রেণী, সমাজের রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করার একমাত্র অধিকারী হবে সমাজের উপরতলার এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী—এই সনাতন ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে দিয়ে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম হ'লো। ব্যক্তি মালিকানা লুপ্ত করা হ'লো, উৎপাদনের উপকরণগুলিকে জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা হ'লো, সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার রীতি প্রচলিত হ'লো, শ্রমিক শ্রেণীর মেহনতের ন্যায্য পাওনা সুনিশ্চিত হ'লো, জমিদারী ব্যবস্থার অবসান হ'লো, কৃষককে জমির মালিক করা হ'লো। গোটা উৎপাদন সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন করা হ'লো। কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হ'লো। বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে সৃজনশীল যুবসমাজ চিরদিনের জন্য মুক্তি পেল। কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, ক্ষুধা বিদায় নিতে বাধ্য হ'লো। বাসস্থান, চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রতিটি মানুষের জন্য সুনিশ্চিত করা হ'লো। শোষণহীন, বঞ্চনাহীন সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে শ্রেণীহীন ব্যবস্থার ভিত স্থাপিত হ'লো।

নভেম্বর বিপ্লব শিক্ষা দিল কূপমণ্ডূকতাকে পরিহার করে, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে, নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে দায়িত্ব, কর্তব্যকে সীমাবদ্ধ না রেখে মহান আন্ত-র্জাতিকতাবোধে অনুপ্রাণিত হতে। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংহতি ও একাত্মতা কি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এবং সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য তার গুরুত্ব কি অপরিসীম তার জ্বলন্ত প্রমাণ নভেম্বর বিপ্লব স্থাপন করেছে। নভেম্বর বিপ্লব গোটা দুনিয়ার ঔপনিবেশিক শক্তিকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামে এক নতুন আবেগ ও প্রাণ সঞ্চার করেছে।

শিল্প, সাহিত্যকে অবক্ষয় রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে যুক্ত করার উৎসমুখ খুলে দিয়েছে নভেম্বর বিপ্লব।

নভেম্বর বিপ্লবের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে কমরেড লেনিন অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করলেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংসদীয় পদ্ধতিতে শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারে না। ক্ষমতা দখল করতে হ'লে চাই বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত, বিপ্লবী তত্ত্বে সমৃদ্ধ বিপ্লবী সংগঠন। চাই শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী একতা। শোষণ, বঞ্চনাকে চিরতরে বিসর্জন দেওয়ার জন্য চাই মানুষের বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা, চাই নিবেদিত প্রাণের বলিষ্ঠ ভূমিকা।

তাই নভেম্বর বিপ্লব শুধু সোভিয়েতের সম্পদ নয়—বিশ্বের সমস্ত মেহনতী মানুষের সম্পদ, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সম্পদ—এ এক উজ্জ্বল ধ্রুবনক্ষত্র যুগ যুগ ধরে যা সংগ্রামী মানুষকে, শোষিত মানুষকে নব নব পর্যায়ে নতুন ভাবে পথ খুঁজে নেওয়ার ইঙ্গিত দেবে।

আমরা যুবমানস পত্রিকার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের নিকট মহান নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে লেখা দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। আমরা আনন্দিত যে প্রমোদ দাশগুপ্ত, অশোক ঘোষ, মাখন পাল, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁদের মূল্যবান লেখা দিয়ে বর্তমান সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। আমরা তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্পাদকমণ্ডলী যুবমানস

নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ ও যুব সমাজের দায়িত্ব

প্রমোদ দাশগুপ্ত

সম্পাদক
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

এবারে মহান নভেম্বর বিপ্লবের একষট্টি বছর পূর্ণ হলো। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও দেশে দেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী। সারা বিশ্বের শোষিত মানুষের জীবনে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এই দিবস।

এখন থেকে ৬১ বছর পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) ও লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত নভেম্বর বিপ্লব খুলে দিয়েছিল শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নের দিগন্ত। সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিহত গতি রুদ্ধ করে দিয়ে নতুন সভ্যতার সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া প্রতিষ্ঠার দৃঢ়, প্রত্যয়িত সংগ্রামী অভিযানের পথে, উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির রক্তপতাকা। এই নভেম্বর বিপ্লবই মার্কসবাদী তত্ত্ব ও কর্মধারার সত্যতার বাস্তব স্বাক্ষর। শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত দুনিয়ার অনিবার্য সাফল্যের স্বাক্ষর হলো এই নভেম্বর বিপ্লব। শোষিত জনগণের অমিত বিজয়ের সূচনা এই নভেম্বর বিপ্লব সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথ প্রদর্শক। এই বিপ্লবের আদর্শে, অণুপ্রেরণায় দেশে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এসেছিল নতুন শক্তি, নতুন আত্মবিশ্বাস, নতুন স্বপ্ন।

নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সমগ্র দুনিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। নভেম্বর বিপ্লবই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় ফাটল ধরালো, দুনিয়ার ছয় ভাগের এক ভাগ ভূখণ্ড সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে গেল। নভেম্বর বিপ্লবের পর যে নতুন যুগ শুরু হল তাকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদের পতন এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ। মহান লেনিন ছিলেন এই নতুন যুগের পথ প্রদর্শক।

নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কেবল রুশ দেশের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই ঐতিহাসিক বিপ্লবের ফলাফল ছিলো সুদূরপ্রসারী। নভেম্বর বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শুরু হয় পুঁজিপতি শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত সংগ্রাম। আরো শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদ শাসিত উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন।

মহান নভেম্বর বিপ্লবই সর্বপ্রথম শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের সামনে বিপ্লব সমাধার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি তুলে ধরল। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও সর্বহারা বিপ্লবের মতাদর্শ দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হতে শুরু করল। কমিউনিস্ট ভাবধারা ও বিপ্লবী প্রেরণার অনির্বাণ দীপশিখা জেলে দিল এই নভেম্বর বিপ্লব। লেনিন-স্তালিনের কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের এক মহান আদর্শ ও শিক্ষা সেদিন নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে জনসমক্ষে উপস্থিত করল এবং তার বৈপ্লবিক আকর্ষণ বিভিন্ন ধনবাদী দেশ ও সাম্রাজ্যবাদ কবলিত উপনিবেশ দুর্বার হয়ে উঠল।

কমরেড লেনিন-স্তালিনের শিক্ষা ছিলঃ শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন ও সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ব্যতীত পরিপূর্ণ জাতীয় মুক্তি অর্জন অসম্ভব। শ্রমিক-কৃষক-মৈত্রীর ভিত্তিতে মুক্তি আন্দোলনের প্রধান শক্তি শ্রেণী সংগ্রামকে দুর্বার করতে হবে।

নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য এবং লেনিন-স্তালিনের শিক্ষাগুলি পুনরায় আমাদের স্মরণ করতে হবে, অনুশীলন করতে হবে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীকেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতৃত্বে বিপ্লব সমাধানে গুরু দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে হবে। নভেম্বর সর্বহারা বিপ্লব এবং সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্য স্থাপনের মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব করতে হবে। আর এ কাজে যুব সমাজকে অবশ্যই তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

ভারতের যুব সমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের দেশের যুবসমাজ যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা ভুলবার নয়। শত শত যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পরও বহু যুবক শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, গণতন্ত্রের সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে, ভারতের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধানে তাঁদের এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যৎ বংশধরদের নতুন নতুন প্রেরণা জোগাবে। তাঁদের এই আত্মত্যাগ তখনই সফল হবে যখন আমরা দেশের যুব সমাজের এক বড় অংশকে বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারবো, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিন্তাধারায়, সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে পারবো। একথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না. নতুন সমাজ গঠনের সংগ্রামে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় তার প্রতিটির সঙ্গে যুব জীবনের সমস্যা জড়িত। শিক্ষাগত, বৈষয়িক, সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্যার সঙ্গে যুব জীবন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁদের এই সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাই নিজেদের স্বার্থে এবং সমগ্র সমাজ-জীবনের স্বার্থেই যুবসমাজকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। আর যুব ও ছাত্র আন্দোলন অবশ্যই পরিচালিত হবে এই বৈপ্লবিক লক্ষ্য নিয়ে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্র-যুবদের এ জন্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। কেননা সমাজ জীবনের প্রতিটি সমস্যার জ্বালা তাঁদের ভোগ করতে হয়। সমাজ জীবনের প্রতিটি সমস্যা তাঁদের জীবন কলুষিত করে তোলে. এই সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় প্রতিনিয়ত।

শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব হলো, শোষণ ব্যবস্থার ভিত্তিভূমে আঘাত করে ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া। এই সংগ্রামে ছাত্র-যুব আন্দোলনের ভূমিকা কি হবে? অনেকে বলেন, ছাত্র-যুবদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি ঔদাসীন্য থাকা উচিত. অনেকে বলেন, এই আন্দোলন শিক্ষামূলক হওয়া দরকার, অনেকে বলেন. এই আন্দোলন হবে জাতীয়তাবাদী। আমরা বলি, এই আন্দোলন অবশ্যই পরিচালিত হবে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গী হবে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী। যাঁরা বলেন, ছাত্র-যুবরা আন্দোলন-সংগ্রাম সম্পর্কে উদাসীন থাকবে বা এই আন্দোলন কেবল শিক্ষামূলক হবে তাঁরা প্রকৃত পক্ষে পুরাতন চিন্তাধারাকেই জীইয়ে রাখতে চান। তাঁদের এই ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে সামন্তবাদী, ধনবাদী শাসন ব্যবস্থার স্বার্থই রক্ষা করে। এজন্যই আমরা ছাত্র-যুবদের একটি বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কথা বলি; তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের কথা বলি। ছাত্র-যুব সমাজের সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে। হয় তাঁদের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে নতুবা তাঁদের পুরানো ধ্যান ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে।

রাজনৈতিক ছাত্র-যুব সমাজের যাঁরা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংগ্রামকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে চান তাঁদের পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা থেকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পুরাতনকে ভালো করে না জানলে ভবিষ্যতের পথে সঠিকভাবে অগ্রসর হওয়া যায় না। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি, ভালো-মন্দ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে; সমাজ-জীবনের অগ্রগতির পথের বাধাগুলি সম্পর্কে তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে নিরন্তন সংগ্রাম চালাতে হবে। শিক্ষা এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাঁদের শপথ গ্রহণ করতে হবে। এই সংগ্রাম হবে কঠোর এবং কঠিন; এই সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী। এই সংগ্রাম সহজ সরল পথে চলবে না; এই সংগ্রাম চলতে থাকবে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে। ছাত্র-যুব সমাজকে তাই শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শে, সমাজতন্ত্রের আদর্শে নিজেদের সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে; সমাজের যাঁরা অনগ্রসর তাঁদের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যেহেতু ছাত্র-যুবদের উদ্যম এবং কর্মক্ষমতা বেশি তাই তাঁদের একাজ করতে হবে ধৈর্যের সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে। একাজ যত দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হবে, সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংগ্রামও তত বেশি বেশি করে সংগঠিত রূপ নেবে।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি আবেদন: নভেম্বর বিপ্লব বিশ্বের অত্যাচারিত, শোষিত জনগণের সামনে তাদের মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে। নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে আজ দুনিয়ার এক চতুর্থাংশ উদ্ভাসিত. নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে আজ দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ মানুষের জীবনযাত্রা আলোকিত। ভারতের মাটিতেও এই মুক্তি-শিখা প্রজ্বলিত করতে হবে। আর এই সংগ্রামে ছাত্র-যুব সমাজের ভূমিকা হবে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

মহান নভেম্বর বিপ্লব—কয়েকটি প্রশ্ন

অশোক ঘোষ
সম্পাদক
সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

কমরেড্ লেনিন একটি নামই শুধু নয়—একটি ইতিহাস। এক নতুন যুগের স্রষ্টা। এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তক॥

মহান নভেম্বর বিপ্লব বিশ্বে প্রথম শোষিত মানুষদের মুক্তির স্বাদ দেয়। বিশাল পৃথিবীর এক বিরাট অংশ শোষণের অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর থেকে মুক্তি পায়—প্রতিষ্ঠিত করে খেটে-খাওয়া মানুষের সরকার।

কমরেড্ লেনিন—মহান ঐ নভেম্বর বিপ্লবের সফল নায়ক।

কমরেড্ লেনিন—বিশ্ব পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের এক আতঙ্ক।

কমরেড্ লেনিন—শ্রমিক, কৃষক-ছাত্র-যুব-বুদ্ধিজীবিদের এক পরম বন্ধু।

কমরেড্ ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিনের সর্বব্যাপী রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, বিপ্লবী প্রতিভা, সফল রণকৌশল তাঁকে পৃথিবীব্যাপী কোটী কোটী মানুষের কাছের মানুষ হিসাবেই পরিচিত করেছে॥

নভেম্বর বিপ্লব আজ তাই শুধু মাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষদের কাছেই স্মরণীয় নয়—পৃথিবীর সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষদের কাছে সমানভাবে স্মরণীয়—শুধু তাই নয় পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, ফ্যাসীবাদ, সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে নিয়োজিত কোটী কোটী সাধারণ মানুষের জীবনে নভেম্বর বিপ্লব উৎসাহ, প্রেরণা দেয়।

কার্ল মার্কস-ফ্রেডারিক এ্যাংগেলস্ এর ঐতিহাসিক তত্ত্বকে সমৃদ্ধশালী করে কমরেড্ লেনিন বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষদের সংগ্রামকে আরও একধাপ এগিয়ে দেন। সময়ে সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর দল বলে পরিচিত বিভিন্ন দেশের ছোট-বড় দলগুলি যে ভুল রাজনীতির শিকার হন, নিঃসন্দেহে এটি বলা যায় কমরেড্ লেনিনের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অবস্থার নিঁখুত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ-এর সঠিক অনুধাবন হয় তারা করতে অক্ষম কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুল পথেই পা বাড়ান।

প্রশ্নটি আজকে উঠবেই।

যে দেশে কমরেড্ লেনিন বিপ্লব সফল করলেন—স্বীকার করতে হয় সেই দেশে মানুষদের জীবনে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয় সেই দেশে কমরেড্ স্তালিনের মৃত্যুর পর ঐ শোধানবাদী চক্র বুলগানিন, ক্রুশ্চভ্, ব্রেজনেভ মার্কসবাদকে নিয়ে কিভাবে ছেলেখেলা করেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির পক্ষে তারা কথা বলেন অথচ মার্কসবাদের যেটি মূল কথা অর্থাৎ "শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব" বা Dictatorship of the Proletariets এর অবলুপ্তির নয়া মতবাদের স্রষ্টা কিন্তু ঝানু ঝানু মার্কসবাদী নেতারা।

প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়—যে কমরেড্ লেনিন বিশ্বের তাবৎ শোষিত মানুষদের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের মহান তত্ত্বকেই দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বার বার বলেছেন সেই রাশিয়ার বর্তমান নেতৃবৃন্দের সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার ব্যাপারে এই নীরবতা কেন? যদিও আমরা একথা স্বীকার করি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শোষিত মানুষদের মুক্তির সংগ্রামে বিশেষ করে আফ্রিকায় কতকগুলি দেশে রাশিয়া বিপুল পরিমাণে সাহায্য করেছে। কিন্তু ঐ সাহায্য নিঃশর্ত কিনা প্রশ্ন আছে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার মানসিকতা নিয়ে রাশিয়া ঐ সাহায্য দিচ্ছে না নতুন নতুন ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে নিজের খবরদারী প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সাহায্য সেটি অবশ্যই ভাববার বিষয়।

প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়—আমাদের দেশ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে এক অত্যাশ্চর্য মূল্যায়নের প্রবক্তাদের। মার্কসবাদের কোন রচনাবলীর কোন অংশের বিপ্লবী লাইন তারা নতুন করে খুঁজে বার করলেন যার দ্বারা ভারতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে তারা বেমালুম সমর্থন করলেন? আমরা কি ভুলতে পারি আজও সেই সব অন্ধকারের দিনগুলি? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যত মানুষকে বৃটিশ সরকার ঐ ৪২ সালে গ্রেপ্তার করেছিল তার থেকেও বেশী লোককে ইন্দিরাগান্ধীর আমলে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জেলে জেলে বন্দী হত্যা এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক দল বলতে তখন শুধুমাত্র ঐ স্বৈরাচারী ইন্দিরার কংগ্রেস এবং তাদের বিশ্বস্ত সেবাদাস, উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী সারমেয় ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি বা সি পি আই। অন্য সব দলগুলির সভা, সমাবেশ, মিছিল প্রভৃতিকে বেআইনী করে দেওয়া হয়েছিল। প্রেস সেনসর ব্যবস্থা চালু হল। এমন কি রাজনৈতিক দলগুলির নিজস্ব মুখপত্রের উপরও সেনসর ব্যবস্থা কার্যকর করা হল। নারী ধর্ষন,

ঠান্ডামাথায় হত্যা, ব্যাপক সংখ্যায় গ্রেপ্তার এগুলিই ছিল জরুরী অবস্থার উপহার। উপহার পেয়েছিলাম এক বকাটে ছেলে—চুরির দায়ে ধৃত, দেশের কলঙ্ক ঐ ইন্দিরা তনয় সঞ্জয়কে যার সেবা করতে সরকারী অর্থের বিপুল অপচয় করা হয়েছিল। কিন্তু তখন কোন প্রতিবাদ হল না সি পি আই-এর কাছ থেকে বা রাশিয়ার থেকে।

প্রশ্ন করি—জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করাটা কি মার্কসবাদী নীতিকে প্রতিষ্ঠা করা না যেন তেন প্রকারে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুবিধাকে পাবার জন্য আদর্শ বিসর্জন দেওয়া ?

প্রশ্ন করি—রাশিয়ার মহান কমরেড্ ব্রেজনেভ যখন ভারতে এসে ইন্দিরার প্রশংসা করলেন এবং বললেন ভারতে ইন্দিরা বিরোধীতার প্রয়োজন নেই তখন সি পি আই বন্ধুরা তাকে প্রতিবাদ করতে পারলো না—এবং যেহেতু রাশিয়া খুশী হবেন তাই তারা বেমালুম ভাবে ইন্দিরাকে সমর্থন করলেন। এটি কোন মার্কসবাদ ?

প্রশ্ন করি—এখন কি ভুল বুঝতে পেরে ইন্দিরার নিন্দা করা হচ্ছে না আবার কিছু ক্ষমতার স্বাদ পাবার জন্য জরুরী অবস্থার ভুলগুলির কথা এরা বলছেন ?

প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়—অন্ধভাবে কোন দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা সেই দেশ (রাশিয়া) স্টালিন পরবর্তীকালে নানারকম ভুল করেছে যার মূল্যায়ন করা সব সময় সাধারণ মানুষদের বুদ্ধিতে পর্যন্ত সম্ভব নয়—সেই সমর্থনের দ্বারা তারা কি ভারতবর্ষের বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবেন যেই বিপ্লব শোষিত মানুষদের মুক্তির পথ দেখাবে—না বিপ্লবের গতিপথকে আরও ভুল দিকে নিয়ে যাবেন ?

ইতিহাসের শিক্ষা—বিপ্লব আমদানী করা যেমন যায় না বিপ্লব রপ্তানী করাও তেমনি সম্ভব নয়। বিপ্লবী তত্ত্বকে অনুসরণ করা এক জিনিস আর অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করা আর এক জিনিস। আর কাদের প্রতি অন্ধ আনুগাত্য ? যারা বহু ভুল করেই চলেছেন॥

আজকের দিনে তাই যেটা বার বার বলতে চাই—মার্কসবাদের মূল কথাটিকে ভুলে গেলে বিপ্লব তো দূরের কথা—এক প্রতি-বিপ্লবী অবস্থার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। মার্কসবাদের যেটি মূল কথা অর্থাৎ "বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ" —এটি থেকে বিচ্যুত হয়ে আমার মহান দাদারা কখন নির্দেশ দেবেন—কি নির্দেশ দেবেন তার জন্যে প্রতীক্ষা করা বা ভুল নির্দেশ আসলে তাকেই নিজেদের কর্তব্য বলে মেনে নেওয়াটা মার্কস-বাদকে ডাষ্টবিনে ফেলে দেওয়ার সামিল হবে।

বাস্তবতা বিবর্জ্জিত ধ্যান-ধারণা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দল তৈয়ারী করা সম্ভব নয়—ঐ ধ্যান-ধারণা শোষক-গোষ্ঠীর হাতকেই বরং শক্তিশালী করবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেখেছিলাম বহু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কি প্রচন্ডরকম দায়িত্ব অনেক সময় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাস্তবের আহ্বানকে অস্বীকার করে কার হাতকে শক্তিশালী করা হয় ? পাঠকবর্গ ভেবে দেখবেন।

কমরেড্ লেনিনের সুযোগ্য নেতৃত্ব নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য এনে দিয়েছিল। লেনিন শ্রদ্ধেয় বাস্তববাদী নেতা হিসাবে, কমরেড্ লেনিন স্মরণীয় তাঁর নিখুঁত দূর-দৃষ্টির জন্যে। লেনিনকে স্মরণ করি বিপ্লবের অগ্নিশিখাকে প্রজ্জ্বলিত করবার জন্য।

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা—বিপ্লব সম্পন্ন করতে গেলে যেমন দরকার বিপ্লবী পরিস্থিতি তেমনি দরকার বিপ্লবী নেতৃত্ব।

বিপ্লবী নেতৃত্ব বিপ্লবী মতবাদ ছাড়া সম্ভব নয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হল এমন এক মতবাদ যা কিনা দেশে দেশে শ্রমিক-কৃষকদের অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে।

নভেম্বর বিপ্লবের আহ্বান—মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে—তৈয়ারী করতে হবে এক সাচ্চা বিপ্লবী দল।

নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ও আমাদের কর্তব্য

মাখন পাল
সম্পাদক
বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

॥ এক ॥

১৯১৭ থেকে ১৯৭৮ সাল। রুশ দেশের সফল নভেম্বর বিপ্লবের পর একষট্টিটি বছর পার হয়ে গেল। ধনবাদী ব্যবস্থার ধ্বংস স্তূপের উপর রুশ দেশে যে নতুন সমাজবাদী রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, তারও বয়স এখন একষট্টি বছর। বিগত এই ছয়টি দশক ধরে পৃথিবীর ইতিহাস কিন্তু এক জায়গায় থেমে থাকেনি, থেমে থাকেনি নতুন সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থাও।

॥ দুই ॥

১৯৩৯—১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত, ইউরেশিয় ভূভাগের উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূখন্ড—কৃষ্ণসাগর এবং বাল্টিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এলাকা, সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার একষষ্ঠাংশ ছিল শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধোত্তর কালে রুশ রেড-আর্মির সহায়তায় পূর্ব দিকে পুরো পূর্ব এশিয়া ও চীন দেশের মূল ভূখন্ড এবং পশ্চিম দিকে গ্রীসকে বাদ দিয়ে পোলান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরী সহ সমস্ত বলকান এলাকা এবং পূর্ব জার্মানীতে, পুরনো ধরনের ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবসান ঘটে। এই সমস্ত অঞ্চলের জনগণের মোট সংখ্যা সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ। উৎপাদন যন্ত্রের রাষ্ট্রীয়করণ এবং ব্যবসা ও শিল্প ব্যবস্থার জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে এসকল রাষ্ট্র অ-ধনবাদী পথে (non-capitalist way) পরিক্রমা শুরু করে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নব গঠিত রাষ্ট্র-গুলির উপর সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব থাকার দরুন সোভিয়েট রাষ্ট্র অন্যতম প্রাগ্রসর এবং শক্তিশালী শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের স্তরে উন্নীত হয়।

॥ তিন ॥

সোভিয়েট রাষ্ট্র, জনগণতান্ত্রিক চীন এবং পূর্ব ইউরোপের নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ আদর্শ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যত দ্বন্দ্ব-কোলাহল-ই থাকুক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধোত্তর কালে যে সকল জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে, তা সম্ভব হয়েছে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের অনুপ্রেরণার ফলেই। তাছাড়া পশ্চিম গোলার্ধের বিপ্লবী কিউবার অভ্যুদয় একথাই প্রমাণ করে যে, নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শনৈতিক প্রভাব এমনকি আমেরিকার দিকেও সম্প্র-সারিত হয়েছে। মনরো-নীতির মাধ্যমে আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিবাদকে রক্ষা করার যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শনৈতিক সফল অভিযানকে ব্যাহত করা সম্ভব হয়নি।

॥ চার ॥

সমসাময়িক সমাজতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ছাত্রদের কাছে একথা অজানা নয় যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা সম্পর্কে উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে আদর্শনৈতিক ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য বিদ্যমান। তথাকথিত 'সমাজ-তান্ত্রিক শিবিরে'র দুটি প্রধান দেশ—সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং জনগণতান্ত্রিক চীন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একে অন্যের যে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী তা নয়, একে অন্যের বিরুদ্ধে সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও নভেম্বর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আদর্শ সম্পর্কে বিশ্বাস-ঘাতকতার অভিযোগ উত্থাপন করেছে।

মাও-সে-তুং এবং চীন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি সোভিয়েট ইউনিয়নকে প্রকাশ্য ভাবেই 'মুখে সমাজতন্ত্রী ও কাজে সাম্রাজ্যবাদী' (Social imperialist আখ্যায় আখ্যায়িত করেছে। অপর দিকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টিও তার উত্তরে জনগণতান্ত্রিক চীনের নেতৃত্বকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী এবং ধনবাদী পথে বিচরণকারী Chauvinist Hegemonist and capitalist deviators বলে অভিহিত করেছে।

॥ পাঁচ ॥

এই উভয় রাষ্ট্র ছাড়াও পূর্ব ইউরোপের জনগণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, যারা মূলতঃ সোভিয়েট ইউনিয়নের আদর্শনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব মেনে

নিয়েছিল, তারাও কিন্তু এখন আর সোভিয়েট ইউ-নিয়নের নেতৃত্বকে নিভুল বলে মেনে নিতে পারছে না।

স্মরণ রাখা দরকার, লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে সোভিয়েট রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এক-পাথরে এককেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে এমন ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল যে বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পরবর্তীকালে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের নেতৃত্বে ক্রুশ্চেভের আগমনের পর, এদের পারস্পরিক সম্পর্কে আরও চিড় ধরে। ফলে অন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এক-কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে বহুলাংশে বহুকেন্দ্রিকতার স্থান গ্রহণ করে; তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করতে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার অনেক জনগণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ও কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি সোভিয়েট ইউ-নিয়ন এবং জনগণতান্ত্রিক চীনের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টি এবং আন্তর্জাতিক কম্যু-নিস্ট আন্দোলনের নেতা ক্রুশ্চেভ, এ সময়ে 'সমাজতন্ত্রে পেঁছানোর বিভিন্ন রাস্তা'র (Different roads to Socialism) তত্ত্ব প্রচার করেন এবং 'শান্তি-পূর্ণ সহযোগিতা' (peaceful co existance) 'শান্তি-পূর্ণ প্রতিযোগিতা' (peaceful competition) এবং 'শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্র' (socialism through peaceful means) ইত্যাদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী তত্ত্ব গ্রহণ করেন। সম্প্রতিকালে স্পেন, ইতালী এবং ফরাসী দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও নভেম্বর-বিপ্লবের ঐতিহ্য বিরোধী যে 'ইয়েরো কম্যুনিজম' নামক নবতর তত্ত্বের জন্ম দিলেন, এটা আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভুল তত্ত্ব প্রচারেরই অনিবার্য পরিণতি।

॥ ছয় ॥

বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প-পরিসরে এসকল বিতর্কিত প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়, অবশ্য প্রাসঙ্গিকও নয়। যা প্রাসঙ্গিক তা হলো—এসব বিতর্কমূলক পরিস্থিতির উদ্ভব সত্ত্বেও নভেম্বর সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শনৈতিক তাৎপর্য এবং বর্তমান যুগেও তার উপযোগিতা এতটুকু ম্লান হয়নি। এ কারণে এবারকার নভেম্বর বিপ্লব দিবসে যা স্মরণীয় তা হলো নভেম্বর বিপ্লব সমগ্র মানবজাতির জন্য যে ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য এবং বিপ্লবী আদর্শনৈতিক ঘোষণা করে গেছে তার প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন ও দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী দেশে দেশে বিপ্লব সম্পাদনের জন্য যথোপযুক্ত রণনীতি এবং রণকৌশলের অনুসরণ।

প্রশ্ন হলো, এই বাস্তব সত্যগুলি কী? এবং নভেম্বর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা-প্রসূত শিক্ষণীয় ও অনু-করণীয় বিষয়গুলিই বা কী? সূত্রাকারে সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক:—

প্রথম বাস্তব সত্য হলো এই যে, বর্তমান যুগ সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবক্ষয়ের যুগ। সুতরাং বিপ্লব অনিবার্য। কিন্তু এই বিপ্লব সম্পন্ন হবে প্রধানতঃ সেইসব রাষ্ট্রে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-ধনবাদের শৃঙ্খল অত্যন্ত দুর্বল। শিল্পোন্নত এবং প্রধান প্রধান ধনবাদী দেশেই যে প্রথমে বিপ্লব সম্পন্ন হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ এসকল দেশের শাসকশ্রেণী অত্যন্ত সচেতন ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর একটি অংশকে নানা কৌশলে নিজের দিকে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয় বাস্তব সত্য হলো এই যে, প্রত্যেক ধনবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশেই শাসক ধনিক শ্রেণীর নানা গোষ্ঠী রয়েছে। নিজ নিজ গোষ্ঠী স্বার্থের কারণে এরা একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তাই বলে এদের কাকেও প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে বিপ্লবেরই ক্ষতি করা হয়। ধনবাদী-গোষ্ঠীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তাই বলে এদের কোন অংশকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে তার সঙ্গে হাত মেলানো সঠিক বিপ্লবী পথ নয়।

তৃতীয় বাস্তব সত্য হলো এই যে, সংসদীয় গণতন্ত্র বা বুর্জোয়া-গণতন্ত্র ধনবাদের আত্মরক্ষার মুখোস মাত্র। সংকটগ্রস্ত ধনবাদ প্রয়োজন মনে করলে অনায়াসে সং-সদীয় গণতন্ত্রের মুখোস ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ফ্যাসিবাদের পথ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। বাস্তবিক বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নেই। ('They are twins and not anti-podes')

চতুর্থ সত্য হলো এই যে, বিপ্লবের মাধ্যমে শুধুমাত্র ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করাই একমাত্র কাজ নয়। এদের উচ্ছেদ করার পর সঙ্গেই সংগেই পুরনো রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এবং তার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরাজিত শোষক শ্রেণী সম্পর্কে এক-নায়কত্ব মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আর সংখ্যালঘিষ্ঠ শোষক-ধনিক শ্রেণী বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী জনতা সম্পর্কে গ্রহণ করবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পঞ্চম সত্য হলো এই যে, ধনতন্ত্রের অসম বিকাশের কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু একদেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় কিছুতেই সম্ভব হবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না হয়। এ কারণে বিজয়ী

সমাজতান্ত্রিক দেশকে নিজ দেশে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব বিপ্লব সম্পাদনের জন্য রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করতে হবে।

॥ সাত ॥

উপরোক্ত বাস্তব সত্যগুলির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ভারতবর্ষে শ্রমজীবী জনতাকে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আর সে কাজ করার সময়ে রুশ দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতির দিনগুলির কথা স্মরণ না করে পারা যায় না।

মনে রাখতে হবে যে, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর যখন ধণিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে রুশ দেশে 'অস্থায়ী সরকার' (Provisional Govt.) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অস্থায়ী সরকারকে সমর্থনের প্রশ্নে এমন কি বলশেভিক পার্টির সদ্যমুক্ত এবং নির্বাসন থেকে প্রত্যাগত নেতাদের মধ্যেও বিভ্রান্তি দেখা দেয়। 'প্রাভ্দা' পত্রিকার মাধ্যমে এ সরকারকে সমর্থনের আওয়াজ ওঠে। কমরেড লেনিন সে সময়ে ছিলেন রুশ দেশের বাইরে নির্বাসনে। প্রাভ্দা পত্রিকার এরূপ প্রচারে তিনি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং জার্মানির মধ্য দিয়ে রুশ দেশে গিয়ে হাজির হন। সে সময় 'অস্থায়ী সরকারের' মন্ত্রীরাও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু কমরেড লেনিন সেদিকে নজর না দিয়ে কমরেড কামেনভের কাছে এসে বললেন—"প্রাভ্দা পত্রিকায় এসব আজে বাজে কি লিখছো?" ('What nuisance you are writing in the Pravda?') তারপর শ্রমিক শ্রেণীর আনীত সাঁজোয়া গড়ীর উপর দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিলেন— "No support to the provisional Government ; all power to the Soviets"

॥ আট ॥

পরবর্তী ইতিহাস আজ আর কারও অজানা নয়। কমরেড লেনিনের এই মনোভাব বলশেভিক পার্টির তদানীন্তন নেতৃত্ব মেনে নিতে পারলেন না। বলশেভিক পার্টির মধ্যে তিনি তখন একা। এরপর তিনি ধীরে ধীরে পার্টি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের জন্য যে নীতি গৃহীত হয়েছিল তা-ই লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস' নামে অভিহিত।

সেদিনও এ প্রশ্ন উঠেছিল যে, যেহেতু ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আধাখ্যাচরা ভাবে শেষ হয়েছে সেহেতু অপূর্ব সমাপ্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনা করাই প্রধান কর্তব্য, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন আসবে তার পর। কমরেড লেনিন তার বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি উত্থাপন করে বললেন— ধনিকশ্রেণী যেহেতু রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই হেতু ধণিক শ্রেণীর উচ্ছেদ তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদন করতে হবে। বাস্তবিক লেনিন এবং বলশেভিক পার্টির নীতি ও কর্ম কৌশল অনুযায়ীই ১৯১৭ সালে নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়।

॥ নয় ॥

একটি দেশের বিপ্লবের সবগুলি কর্মকৌশল অন্য দেশে অ-বিকল অনুসরণ করা চলে না। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সে কথা মোটেই অসত্য নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও কম সত্য নয় যে, ভারতের সঙ্গে রুশ দেশের প্রাক্ বিপ্লব বাস্তব পরিস্থিতির অনেক খানি মিল রয়েছে। কমরেড লেনিন রুশ দেশ সম্পর্কে সে সময়ে বলেছিলেন যে— "Russia is the most Petti-Bourgeois Country of all the Petti-Bourgeois Countries of the world". ভারতবর্ষের আজকের অবস্থাকে অবশ্যই সেই পর্যায়ে ফেলা চলে। শুধু তাও নয় এখানেও জাতীয় ধণিকশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আধাখ্যাচরা-ভাবে (Halfbaked and Trunckated) সমাপ্ত হয় এবং ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে। সুতরাং যে বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কমরেড লেনিন ও বলশেভিক পার্টি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি গ্রহণ করেছিলেন, ভারতের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই। তাছাড়া, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের প্রত্যক্ষ, সচেতন এবং সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মাধ্যমে রুশ দেশে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিলো তার সঙ্গেও ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতির অমিল হওয়ার কিছু নেই। রণ-নীতি এবং রণ-কৌশলের ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে এই যে মিল তাকে অস্বীকার করা যায় না।

তাই বলে রণকৌশলের সমস্ত ক্ষেত্রেই অবিকল মিল থাকবে এমন কোন কথা নেই। বিশেষ করে রণকৌশলের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে যে প্রচন্ড অমিল রয়েছে তা কে অস্বীকার করবে? "দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনে" রুশ দেশের বলশেভিক পার্টি যেভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল অথবা রাজধানীতে বিপ্লবী কর্মকান্ড শুরু করে গ্রামাঞ্চলে সে আগুন ছড়িয়ে দিয়ে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করেছিল, তেমন অবস্থা কিন্তু রুশ বিপ্লবের পর অন্য কোথাও ঘটেনি। চীন, কিউবা এবং ভিয়েতনামের বিপ্লবও দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। 'গেরিলা যুদ্ধ' ও 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও'-এর

যে কৌশল রুশ বিপ্লবের পর চীন, কিউবা এবং ভিয়েতনাম বিপ্লবে গৃহীত হয়েছিল, ভারতবর্ষের বিপ্লবের অনুরূপ কৌশল গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, তা-ও এক্ষুণি সঠিকভাবে বলা যায় না। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করে যা বলা যায়, তা হলো—ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনতাকে 'দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের' (Protracted Civil War) পথ ধরেই চলতে হবে। আর বিশেষ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এই গৃহযুদ্ধও শুরু হবে ভারতের 'উপেক্ষিত পূর্বাঞ্চলে')।

॥ দশ ॥

প্রশ্ন উঠবে, ধনবাদের শৃঙ্খল যেহেতু বিশ্ব জোড়া, সেই হেতু আন্তর্জাতিক কোন প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বেই সে ধনবাদের মোকাবেলা করতে হবে। এবং তেমন ধরনের কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত না থাকলে কোন বিপ্লবী দলের পক্ষেই স্বদেশে বিপ্লব সম্পাদন করা বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তথা আন্তর্জাতিকতাবাদী বলে পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়। এই তত্ত্ব যে কত বে-ঠিক, নভেম্বর বিপ্লবই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নভেম্বর বিপ্লবের কালেও অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু একথা কারও অজানা নয় যে, সংস্কারপন্থী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে এসে কমরেড লেনিন ঘোষণা করেছিলেন যে: "There is one, and only one Kind of internationalism in deed; working whole heartedly for the development of the revolutionary movement and the revolutionary Struggle in one's own Country and supporting (by propaganda sympathy and material aid) such and only such a struggle and such a line in every Country without exceptions.

Everything else is deception and manilovism (sentimental day-dreaming)"

সুতরাং আজ যখন তেমন কোন বিপ্লবী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই, সেখানে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সংগে ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তথা বিপ্লবী সমাজবাদীদের যুক্ত থাকারও কোন প্রশ্ন ওঠে না।

কমরেড লেনিন আন্তর্জাতিকতার যে সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে সে ধরনের আন্তর্জাতিকতাই একমাত্র গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা বিপ্লবী সমাজবাদের ভিত্তিতে যদি তেমন কোন বিপ্লবী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তবে তার সংগে অবশ্যই যুক্ত হতে হবে।

॥ এগার ॥

মার্কস এবং এংগেলস-এর "দুনিয়ার মজুর এক হও" ('Workers of the world unite') আওয়াজের কদর্থ করে এক সময়ে এমন কথা বলা হয়েছিল যে সারা বিশ্বে একই সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবে। মার্কস-এংগেলস-এর মৃত্যুর পর এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন মার্কসবাদের ভাষ্যকার মঃ রিয়াজনভ্। তিনি বলেছিলেন: 'This international revolution must be begun nationally (here nation means Territory)' কমরেড লেনিন এই প্রশ্নের জবাবে আরও স্পষ্ট করে বললেন যে, ধনবাদের অসম বিকাশের ফলে একই সময়ে বা একই দিনে সারা বিশ্বে বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে না। বিভিন্ন দেশের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিপ্লব সম্পন্ন হবে। শুধু তত্ত্বে নয়, বাস্তবেও তিনি তা প্রমাণ করে দিলেন, রুশ দেশে নভেম্বর বিপ্লব সম্পাদনের মধ্য দিয়ে।

॥ বার ॥

কিন্তু একটি দেশে বিপ্লব সম্পাদনের পরই কি সেই সফল বিপ্লবী দেশের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়? নভেম্বর বিপ্লবকে উপলক্ষ্য করে কমরেড লেনিন তার উত্তর দিতে গিয়ে বললেন— "The Russian Revolution is only one link in the chain of world revolution." এই কারণে ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ঘোষণা করলেন—সোভিয়েট ইউনিয়নের 'শান্তিকালীন দ্বিবাধ নীতির কথা' (two-fold peace policy (১) সোভিয়েট ইউনিয়নকে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে হাত দিতে হবে। আবার সংগে সংগে (২) অন্যান্য দেশে যাতে বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে তার জন্যও প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ ধনতন্ত্রের অসম-বিকাশের ফলে একদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে—কিন্তু 'একদেশে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয় লাভ সম্ভব হতে পারে না।'

সুতরাং সফল বিপ্লবী দেশের নিজের স্বার্থে এবং বিশ্ব ধনবাদকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজনে সফল বিপ্লবী দেশকেও বিশ্ব বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার কাজে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ হিসেবে কমরেড লেনিন বলেছেন—'সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী মহাসাগরের মধ্যে সোভিয়েট-ইউনিয়ন একটি দ্বীপ মাত্র'। যে কোন ঝড়ে এর ভিত নির্মূল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বিশ্ব-বিপ্লবের

লক্ষ্যকে সামনে রেখে সোভিয়েট ইউনিয়নকে বিশ্ব-বিপ্লব সম্পাদনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে তাতে ভয়ের কারণ রয়েছে সত্য কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তথা আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে বিচার করলে দেখা যাবে এতে ভয়ের কোন কারণ নেই। কমরেড লেনিন ১৯১৯ সালের মে মাসে সোভিয়েট কংগ্রেসের সভায় ঘোষণা করেছিলেন: 'Even if the imperialist -capitalist should overthrow the Bolshevik power tomorrow, we would not regret for a second that we took power and took our strategy for the international socialist revolution.' একদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের পর সফল বিপ্লবী দেশকে যে বিশ্ব বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলতেই হবে এবং সেকাজ করতে গিয়ে যদি বিপ্লবী রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদ-ধনবাদের হাতে সাময়িকভাবে পরাভূতও হতে হয় তবু বিশ্ব বিপ্লবের পথ ধরেই এগিয়ে চলতে হবে—এটাই ছিল কমরেড লেনিন এবং রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লবের নির্দেশ।

ভারতবর্ষের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনশক্তিকে নভেম্বর-বিপ্লব ও কমরেড লেনিনের নির্দেশ অনুযায়ী এগিয়ে চলতে হবে। নিজ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন এবং বিশ্ব বিপ্লব সম্পাদনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ—নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে ভারতবর্ষের বিপ্লবী শক্তির করণীয় কাজের মূল কথা এখানেই নিহিত।
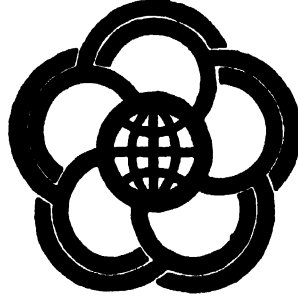
নভেম্বর বিপ্লব

প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এম, পি,
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

আজ থেকে ৬১ বছর পূর্বে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন এবং অভাবনীয় বিস্ময়কর ঘটনার ফলে সমগ্র পৃথিবী তিনদিন কেঁপে উঠেছিল তা হচ্ছে রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব। এই মহান বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন লেনিন। বিপ্লবের কয়েক মাস পূর্বেও লেনিন ফিনল্যাণ্ডে গোপনে অবস্থান ক'চ্ছিলেন—ভাবেনও নাই—এত শীগ্‌গীর ও আকস্মিকভাবে বিপ্লব ঘটবে। একশত ত্রিশ বছর পূর্বে ১৮৪৮-এ Marx ও Engels Communist Manifesto সাম্যবাদ-ইস্তাহার প্রকাশ করেন এবং তারও ৬৯ বছর পরে রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব ঘটে। Marx' এর ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এই কথাই বলে যে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি হ'চ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে। সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে ধনতান্ত্রিক ও সর্বহারার শ্রেণী সংঘর্ষে এবং ধনতন্ত্রের ফলেই সর্বহারার অভ্যুদয় এবং উভয়ের মধ্যে শ্রেণী বিবাদ আনবে সমাজতন্ত্র এবং তারপর Dictatorship of Proletariat এর দ্বারা শ্রেণীর বিলোপ সাধিত হ'লে সমাজতন্ত্র এবং সমাজ শ্রেণীহীন ও শোষণহীন হ'লে রাষ্ট্র ক্ষীণ হতে আরম্ভ করবে এবং সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র একেবারে যাবে শুকিয়ে আর ক্ষমতা যাবে সোভিয়েতে সোভিয়েতে—অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হবে সম্পূর্ণভাবে বিকেন্দ্রীকৃত। সেই অবস্থায় সত্যিকারের জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে—প্রত্যেকে সাধ্যানুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে প্রয়োজনের অনুপাতে ভোগ্যসামগ্রী পাবে। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে এই অবস্থায় পরিপূর্ণভাবে এবং শাসনের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই থাকবে না।

Marx ভাবেন নাই রাশিয়ার ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব সম্ভব হবে। কিন্তু নানা কারণে রাশিয়ার প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে থাকায় সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং অবশেষে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তদানীন্তন বিকট অবস্থায়। রাশিয়ায় বিপ্লবের পূর্বে সে রকম Industrialisation হয় নাই—সেইজন্য বিপ্লবোত্তর কালে শিল্পোন্নয়নের জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। বিপ্লবের তিন বছর পরেই ১৯২০ সালে রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ হয় এবং সেই দুর্ভিক্ষে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়—মহানুভব লেনিনের সম্মতিতে আমেরিকার Hoover 'এর নেতৃত্বে বিপুলভাবে রিলিফের ব্যবস্থা সত্ত্বেও। আবার Stalin এর আমলে ১৯৩১-৩৩ এ ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় যার ফলে এক কোটির বেশি মানুষ অনাহারে মারা যায়। এছাড়া আরো লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয় Stalin -এর শাসনকালে এবং বহু লক্ষ মানুষকে কারারুদ্ধ হয়েও নির্বাসন যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হয়। এই বিপুল মাশুল দিয়েও রাশিয়া এখন পর্যন্ত Socialism (সমাজতন্ত্রের)-এর স্তর উত্তীর্ণ হয়ে Communism (সাম্যবাদের)-এর স্তরে উঠতে পারে নাই। ধনতন্ত্র বিলুপ্ত হ'য়েছে পরিবর্তে State Capitalism (রাষ্ট্রায়ত্ত ধনতন্ত্র) প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছে।

সিলোভান ডিলোসের মতে শ্রেণীহীন রাশিয়ায় এক নূতন শ্রেণীর (New Class) আবির্ভাব হয়েছে—এই শ্রেণী হ'চ্ছে 'আমলাতন্ত্র' (Bureaucracy)—এই Bureaucracy খুব প্রভাবশালী। কবে যে রাশিয়ায় সাম্যবাদ আসবে—রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে—সত্যিকারের জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তা কেউই বলতে পারে না। হয়তো আর একটা বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদ।

নভেম্বর বিপ্লব

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ

এ বছরের ৭ই নভেম্বর সারা বিশ্বজুড়ে প্রবল সমারোহের মধ্যে নভেম্বর বিপ্লবের ৬১তম বার্ষিকী উদযাপিত হল। এই ৬১ বছরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ তাঁদের নিজ নিজ দেশে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা—এক নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো—এক নতুন মানবিক বোধ গড়ে তুলেছে যেখানে বেকারীর জ্বালায় তরুণ-তরুণীর হৃদয় গ্লানিতে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে না—যেখানে মুষ্ঠিমেয় দ্বারা শোষণের অবসান ঘটেছে—যেখানে প্রতিটি মানুষের আশা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে ওঠে। আর এই নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রুশ দেশে।

সেদিন নভেম্বর বিপ্লব সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে কি বিপুল আশা আর গভীর প্রত্যয় বয়ে এনেছিল তা উপলব্ধি করা যায় যখন ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ একে অভিহিত করেন "নবযুগের উষা সমাগমে প্রভাতী তারা।" আর নভেম্বর বিপ্লবের মহানায়ক কমরেড ভ্লাদিমির লেনিন নিজে এর মূল্যায়ন করেছেন "পুঁজিবাদ ও তার অবশেষগুলির বিলুপ্তি এবং কমিউনিস্ট ব্যবস্থার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠাই পৃথিবীর ইতিহাসে আরব্ধ নবযুগের সারবস্তু।"

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত-রূপ সাম্রাজ্যবাদ যখন জমজমাট তখন কমরেড লেনিন পুঁজিবাদী শৃঙ্খল ভেঙে মেহনতী মানুষের জয়যাত্রার জন্য যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন তার মূল কথাই ছিল "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব।" আর এই বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ায় যে পরাধীন দেশের মানুষের জাতীয়মুক্তি আন্দোলন গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তা কমরেড লেনিন তখনই ঘোষণা করেছিলেন

"The period of awakening of the East in the contemporary revolution is being succeeded by a period in which all the Eastern peoples will participate in deciding the destiny of the whole world."

[সমকালীন বিপ্লবে প্রাচ্যদেশসমূহের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা অধ্যায়ের সূচনা ঘটছে যখন প্রাচ্যদেশ-সমূহের সমস্ত মানুষ সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারণে অংশগ্রহণ করবে]।

তাই নভেম্বর বিপ্লবে গঠিত পৃথিবীর প্রথম সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলির জনগণের কাছে আহ্বান জানাল

"Lose no time, throw off the age-old invader of your lands! No longer permit them to plunder your old abodes! You yourselves must be masters of your country! You yourselves must build your life as you see fit! you have a right to do so, for your destiny is in your own hand ....with banner unfurled we bring liberation to the downtrodden peoples of the world."

[আর বিলম্ব নয়, যুগযুগব্যাপী তোমাদের মাতৃ-ভূমির দখলদারদের দূর হঠাও। তোমাদের আবাসকে আর লুণ্ঠন করতে দিও না! তোমাদের নিজেদের শাসনের কর্তৃত্ব তোমাদের নিজেদেরই গ্রহণ করতে হবে! তোমাদের অভিলাষিত পথ অনুযায়ীই তোমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। এ অধিকার তোমাদের আছে কারণ তোমাদের ভবিষ্যত তোমাদেরই হাতে। পতাকা উর্ধ্বে তুলে আমরা সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের মুক্তি আনব]

আর এই বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার মহান দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নভেম্বর বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই কমরেড লেনিন দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করলেন—

"A Socialist Soviet Republic in Russia will stand as a Living Example to the peoples All fo Countries, and the propaganda and Revolutionising Effect of the Example will be Immense."

[রুশ দেশের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সমস্ত দেশের জনগণের কাছে এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে এবং এর প্রচার ও বিপ্লবী প্রতিক্রিয়া হবে অসামান্য]।

প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার যে নীতি অনুসরণ করে আজও তা অব্যাহত। ১৯১৭ সালে কমরেড লেনিনের ঘোষণা আজ ১৯৭৮ সালেও অম্লান। সমগ্র পৃথিবীর কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর কাছেই নয় সমস্ত গণতান্ত্রিক—সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে আজও সোভিয়েত ইউ-

নিয়ন এক জীবন্ত উদাহরণ—এক সংবেদনশীল প্রেরণা।

যুগ যুগ ধরে শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষ যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়—যদি এই অবহেলিত মানুষরা তাঁদের প্রতিভা, তাঁদের সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ পায় তবে দেশে কি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জীবন্ত উদাহরণ।

'স্বাধীন দুনিয়ার' (!) স্বর্গ খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন ১৯ লক্ষাধিক বেকার তখন ভারতের মত ভয়াবহ বেকারীর দেশের তরুণ-তরুণীর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও একথা সত্য যে বিপ্লবের মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নই পৃথিবীর প্রথম দেশ যেখানে নাগরিকদের "কাজের অধিকার" সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে।

১৯১৭ সালের তুলনায় ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের (যন্ত্রপাতি) উৎপাদন বেড়েছে ৫০০ গুণ. ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বেড়েছে ৭৩ গুণ· কৃষি উৎপাদন ৪০৬ গুণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫০০ গুণ। শুধু তাই নয় উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অতিক্রম করে গিয়েছে। ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ৩৪% বেশি তেল উৎপাদিত হয়েছে, ইস্পাত বেশি উৎপাদন হয়েছে ২৬%।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়। সমাজতন্ত্রের সোনার পরশে সমাজ জীবনে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের দুয়ার সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত হয়—মানুষের জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্ভব হয় তা আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক জগতে, খেলাধুলার আসরে সমাজ-তান্ত্রিক দুনিয়ার তরুণ-তরুণীদের বিস্ময়কর সাফল্য আজ এই সত্যই প্রমাণ করেছে যে সমাজতন্ত্রই যৌবনের মুক্তি এনে দেয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব নব সাফল্য ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যে মানুষের মনোজগতেও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়—তার নৈতিক মানকেও উন্নত করে আজকের সোভিয়েত যুব-সমাজ তার নিদর্শন। হতাশা, গ্লানি আর অপসংস্কৃতি নয় সোভিয়েত যুব সমাজের কাছে জীবন মানে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, সুস্থ মানবিকবোধ রুচিশীল পরিবেশ। আর এই পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠে বলেই যখন উন্নত পুঁজিবাদী দেশে এমনকি কিছু কিছু উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশেও খুন, রাহাজানি ও অন্যান্য সামাজিক অপরাধ বেড়েই চলেছে (এই সমস্ত দেশের ঘোষিত সংখ্যাতত্ত্বেই এর স্বীকৃতি আছে) তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে এধরণের ঘটনা খুবই বিরল। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঘুরে এসে বহু কমিউনিস্ট বিদ্বেষীও একথা স্বীকার করেছে। স্বীকার করতে হয়েছে সে দেশে বহু জাতির বাস হলেও—সেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী থাকলেও সেখানে জাতিগত, সম্প্রদায়-গত কোন বিরোধ নেই—সেখানে প্রত্যেকটি ভাষাই স্বগৌরবে স্বমহিমায় বিরাজমান। বিপ্লবোত্তর যুগে সে দেশের 'জাতীয়-সমস্যা'র সফল সমাধান হয়েছে।

এর ফলে প্রয়োজনের মুহূর্তে সমগ্র দেশ এক হয়ে দাঁড়াতে পারে যাকে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, কোন ফ্যাসিস্ত শক্তি পরাস্ত করতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে বিশ্ব-ফ্যাসিবাদকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করার জন্য কমরেড্ স্তালিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ ও অমিতবিক্রমশালী লালফৌজের মরণবিজয়ী সংগ্রাম সেকথা প্রমাণ করেছে। ত্রি-শক্তির চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলতে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাদ হিটলারের সাথে যোগা-যোগের প্রচেষ্টা—সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত হীন চক্রান্ত সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন প্রেরণা, এক নতুন আত্মবিশ্বাস এনে দিল। সোভি-য়েত ইউনিয়নের প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নতুন নতুন দেশে সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ রচিত হল, নতুন নতুন দেশ তাঁদের বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করল।

সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেকগুলি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছে। এই সমস্ত বিজয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজয়ই সূচিত হয়। এইগুলি পুঁজি-তন্ত্রের অধীনস্থ সমস্ত জনগণকে পরিস্কার দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই মতবাদের বুনিয়াদের উপর গঠিত সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও সংস্কৃতির পূর্ণতম বিকাশের, উন্নত জীবনমানের ব্যবস্থার জন্য এবং জনগণের শান্তিময় ও আনন্দময় জীবনের জন্য অসীম সুযোগ অবারিত করে দেয়। সোভিয়েত বিজ্ঞান মহাশূন্যদেশ আবিষ্কারের সূচনা করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অর্থনৈতিক ও কারিগরী ক্ষমতার এক চিত্তাকর্ষক প্রমাণ তুলে ধরেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নই ইতিহাসে প্রথম দেশ-যে দেশ সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে সাম্যবাদের দিকে যাত্রাপথকে আলোকোদ্ভাসিত করেছে।

কেবলমাত্র নবজীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী সংগ্রামে জনগণ উৎসাহিত করাই নয়—প্রতিষ্ঠার দিন থেকে আজ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের প্রতিটি দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমস্ত নেতৃবৃন্দের সোভিয়েত

ইউনিয়নের অকুণ্ঠ সমর্থনের স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার মাধ্যমে।

শুধু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সহায়তাই নয়—সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসা সদ্যস্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলি যাতে স্বাধীন ও স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলে নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রাখতে পারেন তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমস্ত সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে প্রভূত পরিমাণে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য দিয়ে চলেছে। এর ফলে এই সমস্ত দেশের গণতান্ত্রিক অংশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। উপনিবেশবাদ ও বহুজাতিক করপোরেশনের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ে শ্রমিক-শ্রেণীর সপক্ষে নতুন নতুন শক্তির সমাবেশ ঘটছে।

৬১ বছরের পরিসরে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক নতুন সুহৃদ বেড়েছে একথা সত্য কিন্তু একথা ভুললে চলবে না সোভিয়েত বিরোধী কুৎসা আজও বল্গাহীন-ভাবে চলছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মলগ্ন থেকেই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা হৈ-চৈ শুরু করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে গণতন্ত্র নেই। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এইসব প্রবক্তারা এ সত্য সব সময়ই গোপন রাখেন যে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ ও ক্ষমতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। আর এইসব প্রবক্তারা একথাও বলেন না যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধির কেবলমাত্র নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন বা বাজেট রচনার অধিকারই নয় এই সমস্ত নীতি, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরে অধিকার থাকে। এ কথা হয়ত অনেকের জানা নেই ৫০ হাজার স্থানীয় সোভিয়েতে নির্বাচিত মোট ডেপুটির সংখ্যা ২৩ লক্ষ (দেশের মোট জনসংখ্যা ২৫ কোটি) আর এই নির্বাচিত ডেপুটিদের মধ্যে ৫৬·৮% পার্টি সদস্য নয়।

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশেষ করে প্রথম সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া প্রচারবিদরা যে কুৎসা করেন তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ আমাদের যুগের প্রধান মর্মবস্তু হল - পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ যার সূচনা হয়েছে মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে।

দুঃখের বিষয় হল সম্প্রতিকালে আক্রমণ শুরু হয়েছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে পৃথিবীর অন্য ৮০টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে একযোগে ঘোষণা করেছিল **"শান্তির জন্য, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য, জাতীয় মুক্তির জন্য, সামাজিক প্রগতির জন্য বিশ্ব জনগণের সংগ্রামের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বা-পেক্ষা জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুর্গ"**, সেই চীনা নেতারা ৬০ দশকেই অভিযোগ তুললেন মুক্তি সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন সহায়তা করে না—ওরা শোধনবাদী! ইতিহাস কি অন্য কথা সাক্ষ্য দেয় না? ভিয়েতনাম থেকে অ্যাংগোলা পর্যন্ত কোন দেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত হয়নি? চীনের নিজস্ব সংগ্রামের সময়ই কি সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশে এসে দাঁড়ায়নি? অপর দিকে অ্যাংগোলার মুক্তি সংগ্রামে চীনের ভূমিকা কি প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে মদৎ দেয়নি?

অভিযোগ করা হয়েছিল যে পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে। অথচ চীনসহ ৮১ পার্টির দলিলে বলা হয়েছে **"আজ কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই পুঁজি-তন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাই নয়, পরন্তু অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক দেশেও পুঁজিতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও অসম্ভব।"**

মতবিরোধ যদি কেবলমাত্র মতাদর্শের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তা হলে ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ হত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় চীনা নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের সাথে জোট বাঁধছে এমন কি ভিয়েতনামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধের প্ররোচনা চালায় এই অপবাদ দিয়ে যে ভিয়েতনাম সোভিয়েত ইউনিয়নের 'হস্তপুত্তলিকা'।

মোট কথা ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এই সত্যই বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্ব শান্তি, জাতীয় মুক্তি, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য দুনিয়াজোড়া সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নই সবচেয়ে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য অতন্দ্র প্রহরী—এটাই নভেম্বর বিপ্লবের সব-চেয়ে বড় অবদান। এবং যারাই সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুতা করে তারাই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত হাত মেলায়।

নভেম্বর বিপ্লব শুধু রুশ সাম্রাজ্যকে ভেঙে দিয়ে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে খেটে-খাওয়া মানুষদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলেছে তাই নয় নভেম্বর বিপ্লবই সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে প্রবল জোয়ার এনেছে যে জোয়ার কুটিল কঠোর সমস্ত বিপত্তি অতিক্রম করে নব নব সাফল্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

মহান নভেম্বর বিপ্লব দীর্ঘজীবি হক

লিও তলস্তয় এবং রুশ বিপ্লবের পটভূমি

প্রবীর মিত্র

নভেম্বর বিপ্লব পূর্ব রুশ দেশের কৃষক সমাজের মর্মবেদনা আর বিদ্রোহের সাহিত্য-রূপকার লিও তলস্তয়। বিশ্ব সাহিত্যের এই মহান শিল্পীর জন্ম আজ থেকে দেড়শ বছর আগে, ১৮২৮ সালের ২৮ আগস্ট মস্কো থেকে ২০০ কিলো মিটার দূরের ইয়াসনায়া পলিয়ানায়। জমিদার পরিবার উদ্ভূত 'মহান ঈশ্বর অনুসন্ধানী', 'গীর্জার সংস্কারপন্থী', 'অন্যায়ের প্রতিরোধ' না করার পক্ষপাতী মানুষটি ভাবগতভাবে ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা চৈতন্যর প্রতিভূ। অথচ এমনই এক মানুষকে লেনিন অভিহিত করেছিলেন 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ' হিসাবে। লেনিনের এই বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে হলে তাকাতে হবে তলস্তয়ের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর যুগের বৈশিষ্ট্যের দিকে।

তলস্তয়ের মহান সৃষ্টিগুলির রচনাকাল মূলত রুশ ইতিহাসের দুই বাঁকের মধ্যবর্তী সময়ে, ১৮৬১ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়ার ইতিহাস ছিল মন্থর। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের আগে পর্যন্ত রুশ দেশ ছিল প্রায় স্থবির এবং ভীষণ পশ্চাদপদ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল ভূমিদাস প্রথার উপর নির্ভরশীল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর দুর্বল জার সরকারের পক্ষে কৃষকদের ক্রমাগত বিদ্রোহ আর দমন করে রাখা সম্ভব ছিল না। ফলে ১৮৬১ সালে জার ভূমিদাস প্রথা আনুষ্ঠানিকভাবে উঠিয়ে দিতে বাধ্য হল। এরই ফলে রুশ দেশে ষষ্ঠ দশকের পর এক নতুন গতিবেগের সঞ্চার হয়। ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকল শহরাঞ্চলে। কলকারখানা গড়ে উঠল। এর ঢেউ এসে পড়ল গ্রামের জীবনেও। ভূমিদাস প্রথা উঠে গেল, কিন্তু চাষীদের উপর নির্মম শোষণের অবসান ঘটল না। ভূমিদাসদের দীর্ঘদিনের চাষ করা জমি কেড়ে নিয়ে অত্যন্ত কঠোর শর্তে নতুন করে আবার সেই জমি চাষীদের ইজারা দেওয়া হ'ল। ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তির মূল্য স্বরূপ চাষীদের কাছ থেকে ২০০ কোটি রুবল আদায় করা হ'ল। চাষের সমস্ত ব্যয় বহন ছাড়াও বিনা পারিশ্রমিকে জমিদারের জমির অংশ বিশেষে বেগার খেটে দিতে হত। খাজনা দিতে হত মোটা হারে। ব্যক্তিগত ভাবে চাষীরা স্বাধীন হলেও অবস্থা প্রায় আগের মতই থেকে গেল। জমিদারদের যথেষ্ট খাজনা, জরিমানা আর অত্যাচারে কৃষক সমাজ ক্রমশই নিঃস্বে পরিণত হ'ল। অনেকে গ্রাম ছেড়ে শহরে এল নতুন কাজের খোঁজে। পরিণত হ'ল শিল্প শ্রমিকে। গ্রামাঞ্চলে বাড়তে থাকল অসন্তোষ আর বিক্ষোভ। শহরাঞ্চলেও মালিকদের শোষণ চলতে থাকল অবাধে, নির্মমভাবে। মেহনতকারী ও শোষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে জার, পুঁজিপতি ও জমিদারদের রক্ষা করার জন্য বোরিক, ডেপুটি বোরিক, পুলিস কনস্টেবল, গ্রাম্য চৌকিদার ইত্যাদি নিয়ে যেন এক বিরাট বিহানী মজুর কৃষকদের উপর অধিষ্ঠিত ছিল। ১৯০৩ সাল পর্যন্ত দৈহিক দন্ড প্রচলিত ছিল। ভূমিদাস প্রথা রদ হওয়া সত্ত্বেও সামান্য কিংবা খাজনা না দেওয়া অভিযোগে চাষীদের চাবুক মারা হত। পুলিশ ও কসাক সৈন্যরা শ্রমিকদের মারধর করত। জারের আমলে মজুর
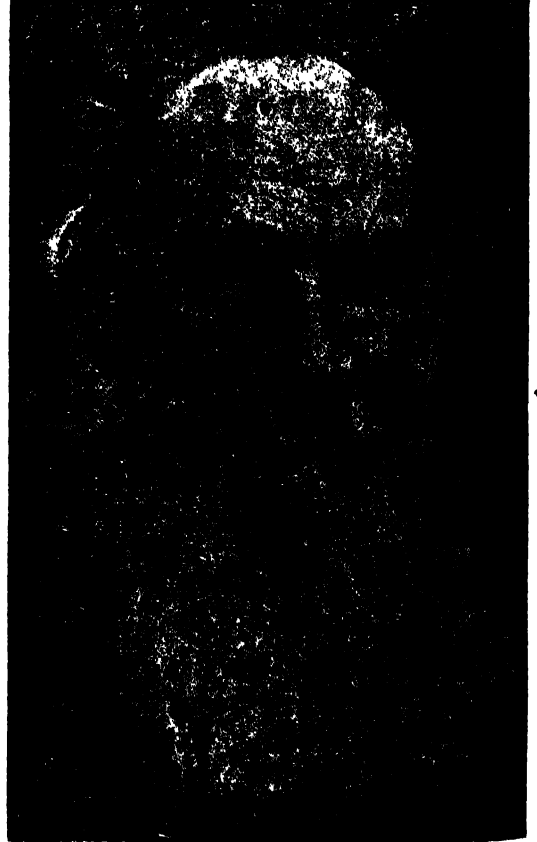
ও কৃষকদের কিছুমাত্রও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। জারের স্বৈর শাসন ছিল জনগণের সবচেয়ে বড় শত্রু। ১ এরই সংগে প্রায়ই দেখা দিত ভয়ঙ্কর অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ।

জনগণের এই শত্রুর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ দেখা দিল ১৯০৫ সালে। এই বিপ্লবে কৃষক সমাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯০৫ সালের এই প্রথম রুশ বিপ্লব হল কৃষক বুর্জোয়া বিপ্লব। এই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল বুর্জোয়ারা। জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ছিল এর লক্ষ্য।

১৮৬১ সালে যে যুগের শুরু ১৯০৫ সাল হল তার পরিণতি। এই যুগ হল ১৯১৭ সালে শ্রমিক শ্রেণীর মহান নভেম্বর বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই যুগেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি এঁকেছেন লিও তলস্তয়। তার সাহিত্য বারে বারে বিদ্রোহ করেছে রাষ্ট্র, জমিদার, গির্জা, পুলিশ ও প্রচলিত আইন কানুনের বিরুদ্ধে। অথচ কি আশ্চর্য, ১৯০৫ সালের এই বিপ্লব থেকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দূরে থাকলেন। কিন্তু তাঁরই সাহিত্য রুশ দেশের সমাজ বিবর্তনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছিল। লেনিনের মতে রুশ বিপ্লব বুঝতে হলে তলস্তয় পড়তে হবে। বিশেষ করে ১৯০৫-৭ সালের বিপ্লবের দুর্বলতা, ব্যর্থতার কারণ বুঝতে তলস্তয় একান্তই আবশ্যক।

তলস্তয় ছিলেন এক দাম্ভিক চরিত্রের মানুষ। একদিকে সামাজিক মিথ্যাচার-ভণ্ডামির বিরুদ্ধে অসাধারণ শক্তিশালী প্রতিবাদ, পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে নির্মম সমালোচনা, সরকারী অত্যাচার, বিচারের প্রহসন ও জারের প্রশাসনের স্বরূপ প্রকাশ অন্যদিকে আত্মসমর্পণের পক্ষে নির্লজ্জ প্রচার আর সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন 'আত্মার শুদ্ধি'র মধ্য দিয়ে। বলেছেন হিংসার মাধ্যমে 'অন্যায়ের প্রতিরোধ নয়'। যিনি ধর্মের নামে গির্জায় গির্জায় কপটাচারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ম সমালোচক, তিনিই আবার উপদেশ দিতেন এবং নিজেও ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করতেন—ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়া মানবাত্মার মুক্তি নেই।

তলস্তয়ের চিন্তা চৈতন্যের এই অসঙ্গতি এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন, 'বুর্জোয়া বিপ্লব যে সময়ে রুশ দেশে অগ্রসর হচ্ছিল তখন লক্ষ লক্ষ রুশ কৃষকের মধ্যে যে ধ্যান ধারণা ও অনুভূতির উদ্ভব হয়েছিল তার মুখপাত্র হিসাবে তলস্তয় মহান।...তলস্তয়ের মতামতের স্ব-বিরোধিতাগুলোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষেই প্রতিফলিত হয়েছে সেই সমস্ত স্ব-বিরোধী অবস্থা যার মধ্যে আমাদের বিপ্লবে তারা তাদের ভূমিকা পালন করেছে।'২ ঠিকই তৎকালীন রুশদেশের কৃষক সমাজ অত্যাচারিত হয়েছে, বিদ্রোহ করেছে কিন্তু মুক্তির জন্য নতুন পথ সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা ছিল পুরাণো 'গোষ্ঠীপতি' শাসনপন্থী এবং ধর্ম অনুগত। তাদের মুক্তির জন্য কি ধরণের সংগ্রাম প্রয়োজন, কাদের তারা নেতা হিসাবে পেতে পারে, তাদের সম্পর্কে বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের মনোভাবই বা কি এসব বোঝার মত অবস্থা তদের ছিল না। তারা জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের ঘৃণা করতে শিখেছিল কিন্তু শেখেনি তাদের সমস্যার সমাধান এবং জীবনের মৌলিক প্রশ্নের জবাব কোথায় খুঁজতে হবে। প্রকৃত পক্ষে কৃষক সমাজের এই ভাবধারাতেই আচ্ছন্ন ছিলেন মহান তলস্তয়।

এই আচ্ছন্নতার জন্য তার পক্ষে তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলন, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, এবং বিপ্লবের প্রকৃত তাৎপর্য ধরা সম্ভব হয়নি। অথচ তারই রচনায় অভূতপূর্ব ভাবে ফুটে উঠেছে তৎকালীন রুশ সমাজের 'অন্তরের চাহিদা'—তার 'বাস্তববাদী' দৃষ্টির জন্যই তার 'অন্তরের তাগিদ' (সচেতনভাবে না হলেও) গোটা সমাজের 'অন্তরের চাহিদার' সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর মত সমাজ জীবনের মূল লক্ষণ হল তার গতি। সামাজিক দ্বন্দ্ব সংঘাত সংগ্রাম এই জীবরান গতির উৎস। গতিই পূরণ করে সমাজ জীবনের অন্তরের নতুন নতুন চাহিদা। সংগঠিত হয় বিপ্লব। তলস্তয় তৎকালীন রুশ সমাজ জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতগুলোকে যথাযথভাবে ধরতে পেরেছিলেন এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন তার সাহিত্যে। ফলে যে মানুষটির কাছে রুশ বিপ্লবের অর্থনৈতিক দিকটি মোটেই পরিষ্কার নয় আবার তাঁর লেখনিতে ফুটে উঠেছে রুশ বিপ্লবের সম্ভাবনাময় পটভূমি। তলস্তয়ের মহত্ব এখানেই। প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা চৈতন্যের আচ্ছন্নতা তাকে রুশ জীবনের সঠিক চিত্রায়ণে বাধা দিতে পারেনি। দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি সত্বেও তিনি একাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছিলেন কারণ পুরো সমস্যাটাই তিনি দেখেছিলেন কৃষক বিদ্রোহের দৃষ্টিকোণ থেকে।

রুশ দেশের জীবন, বিশেষ করে গ্রাম্য জীবন সম্পর্কে তলস্তয়ের জ্ঞান ছিল অসাধারণ। জমিদার ও সাধারণ চাষীদের জীবনের খুঁটি-নাটি সমস্ত কিছুই তিনি জানতেন। ফলে তার রচনায় কৃত্রিমতার কোন ঠাঁই ছিল না। তিনি নিপুণ নিষ্ঠায় ১৯০৫ সালের প্রাক বিপ্লবে জনমানসের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন তার সাহিত্যে। তারই সাহিত্যে ফুটে উঠেছে রুশ বিপ্লবের শক্তি এবং দুর্বলতার দিকগুলি। সমাজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে 'বাস্তব দ্রষ্টা' এই মহান মনীষীর প্রশ্নগুলির নিজস্ব উত্তর যতই অবাস্তব হোক না কেন তার প্রশ্নগুলি ছিল গোটা সমাজের মূল প্রশ্ন। সঠিক প্রশ্ন উত্থাপনের এই ক্ষমতা তাকে প্রকৃত সমাজ বিশ্লেষকের উচ্চ আসনে বসিয়েছে।

পুরানো মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়েছে নতুন মূল্যবোধ তার স্বকীয়তা নিয়ে তখনও প্রতিষ্ঠা পায়নি। দুয়ে মিলে সমাজ জীবনে এক দড়কচা মারা অবস্থা। এরই মধ্যে নতুন বুর্জোয়া মূল্যবোধে সংকট দেখা দিতে শুরু করেছে; সঠিকভাবে ধরতে না পারলেও তলস্তয় বুঝেছিলেন একটা পরিবর্তন আসছে। তার মহান সৃষ্টি 'এ্যানা কারেনিনায়' লেভিনের উক্তি এখানে উল্লেখ্য—'কেমন করে আমাদের সবকিছু ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে...'। এই ওলোট-পালটের মধ্যে রাসটভ (যুদ্ধ ও শান্তি) শোষক হিসাবে নিজের অবস্থিতি বজায় রাখার

চেষ্টা করছে। শোষক হিসাবে তার মানসিক দ্বন্দ্ব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তলস্তয়। বুর্জোয়া সমাজের পারিবারিক জীবনের যান্ত্রিকতা এবং প্রেম, বিবাহের নানা সমস্যার সুন্দর বর্ণনা করেছেন 'এ্যানা কারানিনা' এবং পরিণত বয়সে লেখা 'ইভান ইলিচের মৃত্যু'র পাতায়। সমাজের পরগাছা অভিজাত শ্রেণীর প্রতি তলস্তয়ের ঘৃণা বয়স বাড়ার সাথে সাথে আরও তীব্র হয়ে দেখা দিল। জীবনের শেষে তিনি এদের দেখেছিলেন অপদার্থ, দুর্নীতিপরায়ণ, ইতর হিসাবে। শেষ জীবনের লেখা মহান উপন্যাস পুনারুত্থান-এ রাজপুত্র নিখল্যুদভের মানসিক দৈন্য এবং কুৎসিত চেহারার বর্ণনা হল এই রকম—'সুন্দরভাবে পাট করা এবং পরিষ্কার করা রাজপোষাক পরা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই, যে পোষাকগুলো সে নিজে নয় অন্যে তৈরী এবং পরিষ্কার করেছেন। মাথায় শিরস্ত্রাণ, কোমরে অস্ত্রবন্ধনী এগুলোও তৈরী করেছে, পরিষ্কার করেছে এবং তার হাতে তুলে দিয়েছে অপরে। যে সুন্দর যুদ্ধ ঘোড়ায় তিনি চড়ে বসলেন, সেটিকেও তৈরী করেছে, শিক্ষা দিয়েছে, লালনপালন করেছে অন্যেরা। এইভাবেই তিনি চললেন কোন সৈন্য সমাবেশে অথবা কোন পরিদর্শনে...।

●

তলস্তয় সমাজজীবনের সমস্ত সমস্যা দেখেছিলেন কৃষক বিদ্রোহের দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি নিজের মত করে বিশ্বাস করতেন 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বে। গরীব অত্যাচারিত কৃষক সমাজ এবং জমিদার শ্রেণী, এই দুই জাতি দ্বন্দ্বে তিনি সবসময়ে কৃষকের পক্ষ নিয়েছেন। নিজে জমিদার পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের প্রতি অপূর্ব ভালবাসায় তাদের দুঃখ-বেদনা-ক্ষোভ এবং জীবনের নানা সমস্যা তুলে ধরেছেন নিখুঁতভাবে। তাদের শিক্ষার জন্য গড়ে তুলেছিলেন স্কুল। দিন-রাত্রি কাটিয়ে ছিলেন দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কৃষকদের মধ্যে। তার কথায়, কাজে এবং জীবনযাত্রায় কোন বিরোধ ছিল না, এমনকি মৃত্যু শয্যায় শুয়েও তার মুমূর্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে...'...না কৃষকরা এভাবে মর না।' যাদের দুঃখ-দুর্দশায় কাতর হতেন, যাদের মুক্তির জন্য সারাজীবন উৎসর্গ করেছেন তলস্তয় সেই নিপীড়িত মানুষের মুক্তি এল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। 'জমি মুক্ত করতে, সমস্ত পুরানো ধরণের জমিদারী প্রথা ধ্বংস করতে, পুলিশ রাজের পরিবর্তে মুক্ত এবং সম-অধিকার সম্পন্ন ছোট কৃষক রাজ কায়েম করতে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত কর সরকারী গির্জা, জমিদার এবং জমিদার সরকার...'—তলস্তয়ের এই ঐকান্তিক বাসনা আজ রুশ দেশে ফুলে ফলে শোভিত।

যে যে বই-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে:

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে লেনিন

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস

এ স্টাডি ইনটু ইউরোপীয়ন রিয়ালিজম—জর্জ লুকাস

তলস্তয়—স্টিফেন জাইগ

রেমিনিসনসেস্ অব লেভ তলস্তয় বাই হিস কনটেমপোরারিস

১ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস থেকে

২ শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে লেনিন থেকে
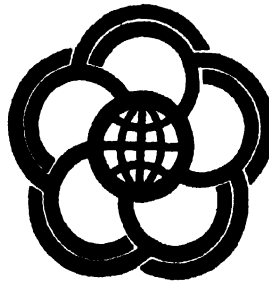
নভেম্বর বিপ্লব ও শিক্ষার কিছু কথা

সাইফুদ্দিন চৌধুরী

"শ্রমিকরা পছন্দ করে সারবস্তু সম্পন্ন শিক্ষা। যা বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষার বাগাড়ম্বর থেকে মুক্ত। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষালয়গুলিতে প্রায়ই বিজ্ঞান, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলির উপর যে বক্তৃতা দেওয়া হয় এবং যা শুনতে এই শ্রমিকরা বেশ ভীড় করে তাতেই এর প্রমাণ মেলে।

আমি প্রায়ই সেই সব শ্রমিকের বক্তৃতা শুনি যারা ভূতত্ত্ববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা কিংবা অন্যান্য বিষয়ে জার্মানির সংস্কৃতিবান বুর্জোয়াদের চাইতে অনেক বেশী জ্ঞানের গভীরতা নিয়ে বলে। আর নিজস্ব স্বাধীন শিক্ষা গড়ে তুলতে ইংরেজ সর্বহারারা কি সাফল্যই না অর্জন করেছে। প্রমাণ আধুনিক দর্শন, রাজনীতি এবং যুগান্তকারী সাহিত্যগুলি একমাত্র একান্তভাবে শ্রমিকেরাই পড়ে। সামাজিক দ্বন্দ্বের শৃংখলে বাঁধা বুর্জোয়ারা তাদের সংকীর্ণতার দরুণ যা সত্যি করেই প্রগতির পথ উন্মুক্ত করে তার সামনে ভীত হয়ে পড়ে, ঐশ্বরিক অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে শুরু করে দেয়। সর্বহারাদের চোখ এইসব কিছুর জন্যই খোলা। তারা এইসব আনন্দের সঙ্গে, সাফল্যের সঙ্গে পড়ে। এই দিক থেকে সমাজতন্ত্রীরা বিশেষতঃ শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য বিস্ময়কর কাজ করেছে। তারা ফরাসী বস্তুবাদী হেলভেটিয়াস, হোলবাক্, ডিডেরো প্রভৃতিদের রচনা অনুবাদ করেছে এবং শ্রেষ্ঠ ইংরাজী রচনাগুলির সঙ্গে সহজ সংস্করণে বীজের মত ছড়িয়ে দিয়েছে। স্ট্রাউসের 'যিশুর জীবন' এবং প্রুধোঁর 'সম্পত্তি'ও শুধুমাত্র শ্রমিকদের মধ্যেই প্রচারিত হয়। বিস্ময়কর প্রতিভা, মহাপুরুষ শেলী এবং তার উজ্জ্বল ইন্দ্রিয়বাদ ও বর্তমান সমাজের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীব্র বিদ্রূপ নিয়ে বায়রন তাদের পাঠক খুঁজে পেয়েছেন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। বুর্জোয়াদের কাছে আছে শুধুমাত্র এইসবের নিজস্ব সংস্করণ, পারিবারিক সংস্করণ আজকের ভণ্ড নৈতিকতার মাপে ছোট করে কাটা সংস্করণ। বর্তমান সময়ের দুজন বাস্তববাদী দার্শনিক বেন্থাম এবং গড উইন, বিশেষ করে গড উইন একান্তভাবেই সর্বহারার সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছেন। যদিও র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের মধ্যে বেন্থামের শিষ্যরা রয়েছেন কিন্তু সর্বহারা সমাজতন্ত্রীরাই বেন্থামের শিক্ষাকে আর এক ধাপ উন্নত করেছে। সর্বহারারা এর ভিত্তির উপর একটি সাহিত্য গড়ে তুলেছে যা মূলতঃ পত্রিকা ও ইস্তাহার দিয়ে তৈরী এবং যা প্রকৃত গভীরতর সম্পদ হিসেবে সমগ্র বুর্জোয়া সাহিত্যের চেয়ে অনেক অগ্রসর। 'ইংলন্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' নামে ১৮৪৫ সালে এঙ্গেলস যে বই লিখেছিলেন তাতে প্রকৃত জ্ঞানের পতাকাবাহী হিসেবে যে শ্রেণীটির ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে সেই শ্রমিকশ্রেণীই ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবে রুশ দেশে ক্ষমতা দখল করেছিল। সমাজের অন্য অন্য ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক এই ক্ষমতা দখলের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া যেমন কার্যকরী হতে শুরু করেছিল তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও সূচিত হয়েছিল নতুন একটি যুগের। এই যুগটি সংকীর্ণ শ্রেণী আধিপত্য থেকে মুক্ত জ্ঞানের সীমাহীন বিস্তৃতি ও অগ্রগতির যুগ। সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উৎপাদনকে দ্রুত তালে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য শিক্ষার দুর্নিবার হয়ে ওঠার যুগ।

মানুষের জ্ঞান, মানুষের সংস্কৃতি সমগ্র মানব সমাজের সাধারণ সম্পদ। মানব সভ্যতার সাধারণ বিকাশের ফলশ্রুতি। অর্থনৈতিক উৎপাদনের চাহিদা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিতে সৃজনশীলতার রসদ অবিরাম যুগিয়ে চলে। ক্রমাগতঃ এই সামাজিক তাগাদাটা ছাড়া, প্রকৃতির উপর আরও বেশী বেশী আধিপত্য খাটাবার দুরন্ত প্রেরণাটি ছাড়া মানুষের পক্ষে নতুন আবিষ্কারের পথে এগিয়ে চলার, বুদ্ধিবৃত্তির জগতে নতুন নতুন দিগন্তকে ঠাঁই করে দেওয়ার কোনই প্রয়োজন হত না। বুর্জোয়া যুগে যে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত হয়েছিল তা ঐ কারণেই। বুর্জোয়া যুগে অর্জিত জ্ঞান সমগ্র সমাজের পক্ষেই একটি বড় পাওয়া। কিন্তু বুর্জোয়া যুগে জ্ঞানের কারামুক্তি হয়নি। বন্দী রাখার খাঁচাটা আয়তনে বেশ খানিকটা বেড়েছিল। বন্দী জ্ঞানের চলাফেরায় খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল। ঐ পর্যন্তই। একটি অনিবার্য সীমাবদ্ধতা, অপরিহার্য বন্দীদশার হাত থেকে জ্ঞানের জগতকে বুর্জোয়া যুগ মুক্তি দিতে পারেনি। বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতির সংগতিতে গড়ে ওঠা জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রগুলি প্রকৃত জ্ঞানের ঠিকানা এনে দিতে পারেনি।

পারিপার্শ্বিক বস্তুময় জগতের সঙ্গে মানুষের যা কিছু সংযোগ তা সবই হয় শ্রমের মাধ্যমে। বস্তুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে শ্রম। বুদ্ধি এই শ্রমকে সংগঠিত করে, পরিচালনা করে। অতএব বুদ্ধিবৃত্তির জগতের শ্রমের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাটা গুরুতর ক্ষতিকর। এই দুইয়ের নিবিড় জীবন্ত সম্পর্কই জ্ঞানের বিকাশের একমাত্র সূত্র। তাই দেখা যায় মার্কস পূর্ব যে সব দার্শনিক তাদের লেখায় বিন্দুমাত্র বস্তুবাদের কিংবা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছেন শ্রমিকশ্রেণীই, তাদের পক্ষবলম্বী বুদ্ধিজীবিরাই উদ্দীপনার সঙ্গে তাকে গ্রহণ করেছে। এঙ্গেলসের লেখায় আমরা শ্রমিকশ্রেণীর এই জ্ঞান পিপাসা লক্ষ্য করেছি। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কিংবা এই সবের বিকাশের দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়াটির

সুসংগত মতবাদ হিসেবে মার্কসবাদের আবির্ভাব শ্রমিক-শ্রেণীর এই চাহিদারই নিখুঁত প্রতিফলন। মার্কসবাদ শ্রমিকশ্রেণীর মতবাদ কারণ জ্ঞানের জগতে যা কিছু মাথায় ভর দিয়ে চলত মার্কসবাদ তাকে সোজাসুজি পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর শাণিত হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রুশ দেশের সামাজিক ক্ষেত্রে এই মার্কসবাদের সফল প্রয়োগই হচ্ছে নভেম্বর বিপ্লব। মার্কসবাদ একটি সৃজনশীল মতবাদ। রুশ সমাজকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে, শত্রুর দুর্বলতম স্থানে আঘাত করে জয়মাল্য ছিনিয়ে আনার ক্ষেত্রে এই সৃজনশীলতার উজ্জ্বল প্রয়োগ ঘটিয়েছে নভেম্বর বিপ্লবে রুশ দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের অগ্রণী বাহিনী লেনিনের বলশেভিক পার্টি। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া, অর্থনীতিতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও, পুঁজিবাদের সর্বাত্মক বিকাশের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও রুশদেশে শ্রমিক-শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের কর্মনীতি ও কর্মকৌশল রচনা মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বুর্জোয়া আধিপত্যে জ্ঞানের পীড়ন

বুর্জোয়াদের পক্ষে জ্ঞানের চর্চা এবং বিকাশের প্রয়োজনটা একান্ত ভাবেই তাদের নিজেদের স্বার্থে। অর্থনৈতিক উৎপাদনকে বিকশিত ও উন্নত করার তাগিদ-টাও তাদের মুনাফাকে বাড়াবার জন্য। একটা পর্যায় পর্যন্ত পুঁজিবাদী উৎপাদন ও জ্ঞানের বিকাশের সাধারণ সামঞ্জস্য বজায় থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের আছে সহজাত সংকট ও নৈরাজ্য। এখনকার সময়ে একটি সাধারণ পরিকল্পনার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদনকে পরি-চালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা পুঁজিবাদী সরকার সমূহ চালালেও বিভিন্ন পুঁজিপতিদের মধ্যে বিরোধ রেষারেষি কখনই বন্ধ হওয়ার নয়। কারণ সবারই চরম লক্ষ্য নিজের মুনাফা। সরকারী নিয়ন্ত্রণে কিংবা বিভিন্ন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্মিলিত সংস্থার অধীনে, যেভাবেই উৎপাদন চলুক না কেন মানুষের শোষণের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে যে মুনাফা সেই শোষণই শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী উৎপাদনে বিপর্যয় নিয়ে আসে। মানুষ কেনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, বাজার খারাপ হয়ে গেলে উৎপাদন পড়ে সংকটে। এই সংকট তখন ছড়িয়ে পড়ে জীবনের অন্যান্য সবক্ষেত্রে। শিক্ষা এই সংকটের অন্যতম প্রধান বলিতে পরিণত হয়। ১৯৩২ সালে বিশ্ব জুড়ে ধনতন্ত্র একটি গভীর সংকটে পড়েছিল। পুঁজিবাদী বিকাশে শক্তি যুগিয়েছিল যে জ্ঞান সংকটের যুগে তার ওপর নেমে এসেছিল গুরুতর আঘাত। ফরাসী পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক মুখপাত্র যোশেফ ক্যালিআক্স ঐ বছরে প্যারিসের প্রেস এসোশিয়েসনের কাছে এবং পরবর্তীকালে লণ্ডনের কবডেন ক্লাবে বলে-ছিলেন,

"যন্ত্র মানুষকে গ্রাস করছে।"

"প্রযুক্তিবিদ্যার ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার।"

"যে সব আবিষ্কার আকস্মিকভাবে উৎপাদনে বিপর্যয় ঘটায় সেগুলিকে রোধ করা প্রয়োজন।"

"বিজ্ঞানের অঙ্গচ্ছেদ করতে হবে।"

এইভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণী। যে জ্ঞান বিজ্ঞানকে উৎ-পাদনের কাজে লাগিয়েছিল বুর্জোয়ারা শেষ পর্যন্ত নিজেরাই তার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সংকটের সমাধান বের করে উৎপাদনকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমূহ গ্রহণ করার সীমিত ও সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ করেছে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাকে। নতুন বাজার-এর জন্য দেশ দখলের যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতির কাজে কিংবা কম শ্রমিক নিয়োগ করে ব্যাপক মুনাফা লোটার জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে জ্ঞানকে ব্যবহার করছে বুর্জোয়া শ্রেণী।

জ্ঞানের উপর বুর্জোয়া আধিপত্যের সূত্রটি কি?

শ্রম বিভাগ এবং সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে এই বিভাগের সব সুযোগগুলিকে সুকৌশলে গ্রহণ করে বুর্জোয়া শ্রেণী জ্ঞানের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। জ্ঞানকে ধরে রেখেছে তাদের শ্রেণীর মুঠোর মধ্যে। পুঁজিবাদী যুগের আগে স্বাধীন কৃষক বা হস্তশিল্পী সামান্য পরিমাণে হলেও জ্ঞানকে, অন্তর্দৃষ্টিকে বিকশিত করতে পারত। যুদ্ধের কলাকৌশলের মধ্যে দাস সৈনিকের ব্যক্তিগত চাতুর্য প্রকাশ পেত। কিন্তু যন্ত্রের যুগে এইসব বিষয়গুলি সমস্ত কারখানার আয়ত্তে চলে গেল। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা অন্য সব দিক হারিয়ে ফেলল। বইতে শুরু করল একদিকে। একজন নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ শ্রমিক যা হারাল, পুঁজি তা অধিকার করল কারণ শ্রমিকদের নিয়োগ করত সে। এখন একটি ক্ষেত্রে উৎপাদনের টুকরো টুকরো কাজ জানে এক একজন শ্রমিক। একে জোড়া দিয়ে এক করার ক্ষমতাটা রইল একমাত্র পুঁজির হাতে। সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তির জগতে পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। বৃহদায়তন উৎ-পাদনের যুগে এটা সম্পন্ন হল। শ্রম থেকে বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করা হল। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র ক্ষমতা হিসেবে দাঁড় করানো হল। এবং পুঁজির সেবায় লাগিয়ে দেওয়া হল। [মার্কসের 'পুঁজি'—১ম খণ্ড ৩৮২ পাতা দ্রষ্টব্য]

জ্ঞানের জগতে বুর্জোয়াদের এই পাকাপোক্ত আধি-পত্যের বিপরীতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনের যুগে স্বাধীন কৃষক বা হস্তশিল্পীর জ্ঞানচর্চাকে সম্মানিত করার কিছু নেই। আমরা সকলেই জানি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি হচ্ছে রক্ষণশীল উৎপাদন পদ্ধতি। ওই সময় একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত একটি বিশেষ ধরনের শ্রমজীবি আজীবন একই রকম কাজ করে যেত। এই উৎপাদন পদ্ধতির সবটাই সে জানত। কিন্তু উৎ-পাদনকে উন্নত ও বিকশিত করার জন্য জ্ঞানচর্চার কোন কোন সুযোগ ও সম্ভাবনা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনে তার

ছিল না। এটা শুরু হয়েছিল বুর্জোয়াদের যুগে। এই বুর্জোয়ারা ভাবনা চিন্তার জগত থেকে শ্রমজীবিদের হটিয়ে দিয়ে সব দায়িত্ব নিজেরাই কাঁধে তুলে নিয়েছিল আর শ্রমিকদের জন্য কোন ক্ষেত্রে কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও তা হল শ্রমিকদের কাজের টেকনিকগুলি ভালভাবে রপ্ত করিয়ে দেওয়ার জন্য। কিংবা উৎপাদনে অপরিহার্য একটি যন্ত্র হিসেবে নিখুঁত করে তোলার জন্য। গোটা বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থাটাই গড়ে উঠল সংকীর্ণ শ্রেণী-স্বার্থের উপর যার ভিত্তিটাই হল দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা, অসততা এবং অক্ষমতা। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা যে বুদ্ধিজীবি তৈরী করতে শুরু করল তাদের অবস্থাটা চল করুণ। এ সম্পর্কে এটি ড্যুরিং-এ এঙ্গেলস লিখেছেন।

"শুধুমাত্র শ্রমিকেরা নয়, সেই শ্রেণীগুলিও যারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে তারাও শ্রম বিভাগের মাধ্যমে তাদের কাজের যন্ত্রে পরিণত হয়। অন্তঃসারশূন্য বুর্জোয়ারা তার নিজের পদ্ধতি ও মুনাফার জন্য উন্মত্ততার দাসে পরিণত হয়। আইনজীবি হয় তার প্রস্তরীভূত আইনী ধ্যান ধারণার দাস। যা তার উপর একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে আধিপত্য করে। সাধারণভাবে শিক্ষিত শ্রেণীগুলি আঞ্চলিক সংকীর্ণ মনোভাবের, একমুখীনতার এবং নিজেদের দৈহিক ও মানসিক অন্তদৃষ্টির স্বল্পতার কাছে এবং নিজেদের চমকপ্রদ বুদ্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ সবেরই কারণ তাদের শিক্ষাটা হচ্ছে সংকীর্ণভাবে বিশেষায়িত। এবং এই বিশেষায়িত কাজের জন্য তারা সারা জীবন শৃংখলিত থাকে। এমনকি তখনও যখন তাদের এই বিশেষায়িত কাজ আসলে কিছুই নয়।"

শ্রমিক বিপ্লবে জ্ঞানের বন্ধন মুক্তি

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র প্রগতিশীল যারা জ্ঞানকে বন্ধন মুক্ত করতে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে জ্ঞান হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার। নিখুঁত সুসংগত, পূর্ণাঙ্গ এবং ক্রমাগত ভাবে উন্নত জ্ঞানের জন্য শ্রমিকশ্রেণী লড়াই চালায়। উৎপাদনে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে, উৎপাদনী ক্ষমতার অতুলনীয় অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়ে সমাজের সকল সভ্যের জন্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতির চাহিদা মেটাতে শ্রমিকশ্রেণী ঐতিহাসিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই এই শ্রেণীর পক্ষে জ্ঞানকে শৃংখলিত করে রাখার কিছু নেই। জ্ঞান যত সুসংগত হয়ে উঠবে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষ যতবেশী নিজেকে সজ্জিত করবে, ততবেশী সম্ভব হবে বস্তুর অন্তঃসম্পর্ক ও পারস্পরিক সম্পর্কে জানা বোঝা ততবেশী নতুন আবিস্কারের দিগন্ত খুলে যাবে; আর এইসব কিছুকেই শ্রমিকশ্রেণী কাজে লাগিয়ে দেবে শ্রমকে সহজ ও সাবলীল করার জন্য উৎপাদনের সব ক্ষেত্রগুলিতে। শ্রমিকশ্রেণীই পারে যে মৌল নীতিগুলির উপর শ্রম বিভাগ শোষণমূলক সমাজের কাঠামোটি রচনা করে আছে তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে। সবচেয়ে প্রাচীন শ্রম বিভাগ—মানসিক ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে বিভাগকে শ্রমিকশ্রেণী বিলুপ্ত করে দেয়। শহর এবং গ্রামের বৈপরীত্যকে শ্রমিকশ্রেণী ধ্বংস করে। সমগ্র সামাজিক উৎপাদনকে পরিচালনা করে একটি সাধারণ শৃংখলায়। এই শৃংখলার মৌলিক জ্ঞান দিয়ে সমাজের সব সভ্যকে শ্রমিকশ্রেণী গড়ে তোলে। শ্রমিকশ্রেণী সমাজে উচ্ছিষ্টভোগীদের থাকতে দেয় না। সমাজের কর্মক্ষম সমস্ত মানুষকে শ্রম করতে হয়। শ্রমকে সম্মান করতে হয়। নভেম্বর বিপ্লব সোভি-য়েতের মানুষের জন্য—'যে কাজ করবে না সে খেতেও পাবে না' এই ঘোষণা নিয়ে হাজির হয়েছিল। এইসবই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষা নীতির ভিত্তি যার মূলকথা শ্রম ও বুদ্ধির জগতের দুস্তর ব্যবধানের অবসান।

সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর এই শিক্ষানীতি এমনিতে প্রযুক্ত হয়নি। এজন্য সর্বপ্রথমে শ্রমিকশ্রেণীকে এইসব নীতি প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্জন করতে হয়েছে। নভেম্বর বিপ্লবে রুশ দেশের শ্রমিকশ্রেণী এই ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। পুঁজিবাদী সামন্ত-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ক্ষমতা ভেঙ্গে দিয়ে শ্রমিক কৃষকের রাষ্ট্র ক্ষমতা স্থাপন করেছিল নভেম্বর বিপ্লব। নভেম্বর বিপ্লব একটি গণতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল যে গণতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীকে অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুণর্গঠনের জন্য এবং তার পরিপূরক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার একচ্ছত্র ক্ষমতা দিয়েছিল। এই ক্ষমতাটি ছাড়া জ্ঞানের সম্প্রসারণ হত না। নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠত না। নতুন সংস্কৃতির, সংস্কৃতির জগতে বিপ্লবের পুরানো আদর্শ ও চেতনার পচনকে চূড়ান্তভাবে অপসারিত করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা গণতন্ত্র জয়। নভেম্বর বিপ্লব রুশ দেশে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিল। অজ্ঞানতার অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর মশাল জ্বালিয়ে ছিল নভেম্বর বিপ্লব।

অন্ধকারের বিরুদ্ধে জেহাদ

১৯১৩ সালে গভীর ক্ষোভের সংগে লেনিন লিখে-ছিলেন 'এমন বর্বর আর কোন দেশ নেই যেখানে ভয়াবহ ভাবে জনসাধারণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত—ইউরোপে এমন দেশ আর একটাও নেই রাশিয়া ছাড়া।' বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটলেও সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কই ছিল প্রধান। জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রটি তাই ছিল সংকুচিত। এর ওপর শ্রমজীবি, জনসাধারণের কাছে জ্ঞানকে হাজির করতে রাশিয়ার শাসকেরা ভয় পেত। এঙ্গেলসের সেই কথাটি উল্লেখযোগ্য—শ্রমিকশ্রেণী চায় সারবস্তু সম্পন্ন শিক্ষা। বুর্জোয়া প্রমুখ শোষক শ্রেণীসমূহ তাদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থাটাও শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়নি কারণ শ্রমিকশ্রেণী এই শিক্ষার সুযোগকে গ্রহণ করে নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করবে—এই আশংকা

তাদের ছিল। কোন রকম শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে যাবে না—এই ছিল রাশিয়ার শাসকদের নীতি। সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন বলেছিলেন—'অজ্ঞ এবং নিরক্ষর জনসাধারণকে শাসন করা অপেক্ষাকৃত সহজ।' এই ছিল তৎকালীন শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গী। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের আগের সময়ে রাশিয়ার শতকরা ৭৩জন মানুষ ছিলেন নিরক্ষর। অরুশীয়দের ক্ষেত্রে এই হার ছিল শতকরা ৯৭-৯৮।

অজ্ঞানতা এবং অশিক্ষাকে গলাটিপে মারার রাজনৈতিক অধিকারটি নভেম্বর বিপ্লবে হাতে পেয়েই শ্রমজীবি জনসাধারণ তাদের পার্টি, বলশেভিক পার্টি ও তাদের শ্রেষ্ঠ নেতা লেনিনের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লুনাচারস্কিকে বিপ্লবের পরদিনই লেনিন ডেকে পাঠালেন। তাঁকে জনশিক্ষা কমিশার নিযুক্ত করে অজ্ঞনতা, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করার নির্দেশ দিলেন। জনশিক্ষা কমিশারিয়েট এবং রাষ্ট্রীয় কমিশন—২৭শে অক্টোবর তাদের প্রথম আবেদনে—দেশের শিক্ষিত সমাজকে এই কাজে সক্রিয় হয়ে উঠতে আহ্বান জানালেন।

লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে জনগণের কাছে শিক্ষাকে পেঁৗছে দেওয়ার একমাত্র মাধ্যমে হচ্ছে তাদের মাতৃভাষা। ২রা নভেম্বর (পুরানো মতে) সোভিয়েত সরকার জনগণের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় অরুশভাষী অঞ্চলে রুশভাষার সমমর্যাদায় আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি চালু করলেন। এতদিন মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের নীতি অস্বীকৃত ছিল ব্যাপক সংখ্যক জনসাধারণকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখার জন্য। শ্রমিকশ্রেণী এই বঞ্চনার অবসান ঘটালো।

১৯১৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর "R S F S R এর জনসাধারণের মধ্য থেকে নিরক্ষরতা বিলোপ প্রসঙ্গে" একটি ডিক্রীতে লেনিন স্বাক্ষর করলেন। এতে ৮ থেকে ৫০ বছরের লিখতে পড়তে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হল। শিক্ষার উৎসব শুরু হল সারা দেশ জুড়ে। ক্লাব, কারখানার উঠান, প্রাক্তন জমিদারদের প্রাসাদ যেখানে যা পাওয়া গেল তৈরী হল স্কুল। শ্রমিকদের শিক্ষাগ্রহণের সময়ে দু-ঘণ্টা সবেতন ছুটি ঘোষণা করলেন সরকার। ওই ডিক্রী বলে—জনশিক্ষা কমিশারিয়েট ক্ষমতা পেল সমস্ত স্বাক্ষর জনসাধারণের নাম সংগ্রহ করার এবং তাদের নিরক্ষরতা দূর করার কাজে লাগিয়ে দেওয়ার। যুদ্ধকালীন দ্রুততায় ও জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে এইসব সংগঠিত হল। শ্রমিকশ্রেণী জানত—পরাজিত শক্তিগুলি জনসাধারণের শিক্ষায় বাধা দেবে, কারণ অজ্ঞানতা ধ্বংস হলে এইসব শক্তি পা রাখার জায়গা পাবে না, তাই ডিক্রী নির্দেশ দিল—যারা বাধা দেবে—তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

চারিদিক থেকে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। যাঁরাই শিক্ষা পেয়েছেন—তিনি শিক্ষক, ডাক্তার, নানা ধরণের চাকুরিজীবী কিংবা সৈনিক যাই হোন না কেন নিরক্ষতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়লেন।

শিক্ষার সাজ-সরঞ্জাম বই-পত্র পেতে সেইসময় অনেক অসুবিধা রাশিয়ার জনসাধারণ সহ্য করেছেন। কিন্তু এই শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী যুগে শিক্ষাসামগ্রীর চড়াদামের প্রতি বিদ্রূপ করে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের জন্য সুলভ সংস্করণ, পত্রিকা ও ইস্তাহারের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল। কোন বাধাই এখন শ্রমিকশ্রেণীকে দমিয়ে রাখতে পারল না। কাঠ-কয়লা, সীসা, বীট কয়লার গুল প্রভৃতি থেকে তৈরী কালী, হাঁসের পালক, যা ব্যবহার করা যায় সবই কাজে লাগান হোল নিরক্ষরতা বিরোধী লড়াইয়ে।

লেনিন বললেন, 'আমরা গরীব এবং অশিক্ষিত। তাতে কিছু যায় আসে না, যদি আমাদের জনসাধারণ এটা উপলব্ধি করেন যে তাঁদের শিখতেই হবে এবং যদি সেই শেখার ইচ্ছাটা থাকে—এই ইচ্ছা এবং আকাঙ্খা বর্তমান, তাই আমরা শিখবই এবং শিখতে পারবই।' প্রকৃতই কোন কিছুই রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে বাধা দিতে পারেনি। ১৯২০ সালের ১৯শে জুলাই জনশিক্ষা কমিশারিয়েটের অধীনে নিরক্ষতা বিরোধী আন্দোলনকে আরো জোরের সংগে পরিচালনার জন্য 'নিখিল রাশিয়া বিশেষ কমিশন' গঠিত হল। এই কমিশনকে লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার সবরকমভাবে উপযুক্ত ও সুসজ্জিত করে তুলেছিলেন। ১৯২০ সালের অগস্টে কমিশনের কর্ম পরিষদের সভ্যরা আরো যোগ্য ব্যক্তি চেয়ে লেনিনের কাছে আবেদন করেছিলেন—লেনিন সংগে সংগে লিখেছিলেন 'যেহেতু নিরক্ষরতা বিরোধী সংগ্রাম অন্য সব কিছুর থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাই এই অনুরোধ রাখা হবে।' মনে রাখতে হবে বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই—এই সংগ্রাম পরিচালনা করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। কারণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল তার উপর ছিল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ও আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির আক্রমণ। নবজাত সোভিয়েত শক্তিকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য চক্রান্ত। এইসব কিছুকে পরাস্ত করেই শ্রমিকশ্রেণী অটুট রেখেছিল নিরক্ষরতা বিরোধী সংগ্রামকে। তরুণ কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় কংগ্রেসে (অক্টোবর ২, ১৯২০) লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন—"কমিউনিজমের অর্থ সমস্ত যুব সম্প্রদায়—তরুণ তরুণী নির্বিশেষে এই যুব কমিউনিস্ট লীগের সদস্য এসে বলবে এটা আমাদেরই কাজ, আমরা একত্র হয়ে গ্রামাঞ্চলে যাব, নিরক্ষরতা ধ্বংস করব।" যুব শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন লেনিন। প্রতিটি দিক থেকে সবরকমভাবে এই সংগ্রামের সাফল্যে প্রেরণা যুগিয়েছেন লেনিন, বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েত সরকার। কারণ শ্রমিকশ্রেণী, তার নেতা লেনিন জানতেন—"নিরক্ষর মানুষ রাজনীতির বাধা,—তাকে

প্রথমে অ আ ক খ শিখতে হবে। এছাড়া কোন রাজনীতি সম্ভব নয়।"

এই রাজনীতির প্রশ্নটি ছিল নতুন অর্থনীতি গড়ে তোলার সংগে জীবন মরণের প্রশ্ন হিসেবে যুক্ত। লেনিন নিরক্ষরতা বিরোধী সংগ্রামের এই তাৎপর্য দেখিয়ে বললেন—"সোভিয়েত অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হবে এবং এই পথে নিছক স্বাক্ষরতা আমাদের বেশীদূর এগিয়ে নিতে পারবে না—লিখতে এবং পড়তে পারার ক্ষমতাকে সাংস্কৃতিক মনোন্নয়নের কাজের সংগে যুক্ত করতে হবে।"

লিখতে এবং পড়তে পারার ক্ষমতাকে সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের কাজের সংগে যুক্ত করতে না পারাটাই বহু-সংখ্যক বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের জীবনে আবহমান কাল ধরে দুঃসহ পীড়া দিয়েছে। এইসব পুরানো দিনের বুদ্ধিজীবিরাও নতুন মনোভাব গ্রহণ করতে এগিয়ে এলেন, শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্র শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজীবনের জোয়ার নিয়ে এল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বছরগুলিতে (১৯২৮-৩২) স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হল। নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত হয়ে উঠল সোভিয়েত, সেই আগেকার রাশিয়ায় যা জন্মের পর থেকে চিরকাল অজ্ঞানতার বোঝা বয়েছে।

নভেম্বর বিপ্লব প্রথম সূর্যোদয়ের মত সারা রাশিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিল শিক্ষার উজ্জ্বল আলোক শিখা। সোভিয়েতের ঘরে ঘরে এই শিখা আজও অনির্বাণ।

অন্ধকারের বিরুদ্ধে জেহাদ এই অংশ লেখায়—সাক্ষরতা প্রকাশনের ভি, কুমানেভ রচিত লেনিন ও নিরক্ষরতা পুস্তিকার সাহায্য কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি।

প্লাবনের পরে
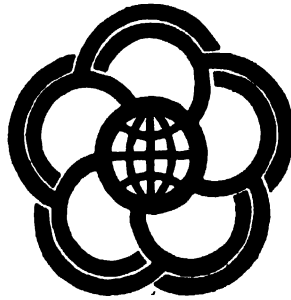
তাঁদের স্মরণ করি

যাঁরা বন্যার জলে ভেসে যাওয়া অসহায় মানুষকে রক্ষা করতে নিজেদের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই। এ মহান আত্মত্যাগ আমাদের চিরজীব প্রেরণা, পথ চলার পাথেয়।

যাঁরা বন্যার তাণ্ডবে মৃত্যু বরণ করেছেন, বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁদের স্মরণ করি আর সমবেদনা জানাই তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের।

অভিনন্দন জানাই

বন্যা-কবলিত মানুষের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের জানাই অভিনন্দন; বন্যা পরবর্তী অতি গুরুত্বপূর্ণ পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজে রাজ্য জুড়ে যে অসংখ্য যুবক-যুবতী নিজেদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়োজিত করেছেন তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই তাঁদের যাঁরা স্কুল-কলেজ ও ক্লাবে এবং অন্যান্য সংস্থায় আনন্দ অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে—এমনকি জল খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থে গ্রাম বাঙলার পুনর্গঠনে এগিয়ে এসেছেন এবং যাঁরা নিজেদের রক্তদান করে পুনর্গঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে ও প্রয়োজনীয় রক্ত ভাণ্ডার গড়ে তুলছেন। অভিনন্দন জানাই সেইসব শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি যাঁরা গ্রাম বাঙলার পুনর্গঠনে স্বেচ্ছায় শ্রমদান করছেন। একই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গের বাইরের অগণিত যুবক-যুবতী ও সাধারণ মানুষকে যাঁরা বন্যাবিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করছেন।

বন্যাত্রাণে আর্থিক সহযোগিতা

অভূতপূর্ব বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের ১২টি জেলায় জনজীবন সম্প্রতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ হেন প্রলয় স্বভাবতঃই রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক পরি-কল্পনার উপর এক অভাবনীয় আকস্মিক আঘাত হানে। এই বিপুল ক্ষতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোর কদমে পুন-র্গঠনের দায়িত্ব হাতে নেওয়া দুরূহ মনে হলেও রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা আরো সহানুভূতিশীল সুষ্ঠু সহযোগিতা ও বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গী আশা করি।

সুখের বিষয় বেশ কিছু বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থা এবং অন্যান্য রাজ্য সরকার এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ বাবদ বিশেষ নগদ টাকায় ত্রাণ সাহায্যের তালিকায় আছেন—

(১)	রাজস্থানের	মুখ্যমন্ত্রী	১,০০,০০০ টাকা
(২)	ত্রিপুরার	মুখ্যমন্ত্রী	১,০০,০০০ টাকা
(৩)	আসামের	মুখ্যমন্ত্রী	১,১৬,০৫১ টাকা
(৪)	উত্তর প্রদেশের	মুখ্যমন্ত্রী	১,০০,০০০ টাকা
(৫)	বিহারের	মুখ্যমন্ত্রী	৫০,০০০ টাকা
(৬)	কেরালা	সরকার	১,১০,০০০ টাকা
(৭)	সিকিমের	মুখ্যমন্ত্রী	১০,০০০ টাকা
(৮)	কনস্যুলেট জেনারেল অব্ ফেডারেল রিপাবলিক (কলকাতা)		২,০০,০০০ টাকা

নভেম্বর মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ-তহবিলে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯ শত ৭৫ টাকা ২৫ পয়সা জমা পড়েছে।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ মহারাষ্ট্র সরকার পশ্চিম-বঙ্গকে সাহায্য করার জন্য শ্রীরজনী প্যাটেলের সভাপতিত্বে এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছেন এবং প্রথম কিস্তিতে ২৫ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দিয়েছেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে

নন্দকুমার দাস

১৯১৭ সাল। বিশ্বের সর্বত্র যখন চলছে ধনতন্ত্রের চরম বিকাশ, চলছে সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের যুগ—সেই বছরেই নভেম্বর মাসে, মহানায়ক লেনিনের গড়া বলশেভিক দলের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সফল হয়েছিল দুনিয়ার সর্বপ্রথম সার্থক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলেই ইতিহাসে সর্বপ্রথম শোষিত শ্রমিকশ্রেণী, নির্যাতিত ও নিপীড়িত শ্রেণী পেয়েছিল শাসকশ্রেণীর মর্যাদা। তাই এই বিপ্লব হলো মানব ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ বিপ্লব সেদিন একদিকে যেমন বুর্জোয়াদের সর্বগ্রাসী শোষণের ভিতটাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো, অপরদিকে তেমনি দুনিয়ার সর্বত্র বঞ্চিত শ্রমিক ও মেহনতী জনগণকে দেখিয়েছিল অত্যাচার, অবিচার ও বঞ্চনার হাত থেকে সঠিক মুক্তির পথ। লক্ষ্য স্থির রেখে, দৃঢ় পণে লড়াই চালালে কোন অভীষ্টে পৌঁছানোই অসম্ভব নয়, কোন প্রতিকূলতাই বিশ্বের যে কোন দেশের শ্রমিক ও কৃষকের সুসংগঠিত ঐক্যবদ্ধ মুক্তি প্রয়াসকে বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যর্থ করতে পারে না—এ সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্বের শোষিত শ্রেণীদিগকে সেদিন এ শিক্ষার আলোকেই আলোকিত করেছিল। শুধু রাশিয়ার নয়, বিদেশের সমস্ত পদানত জাতির নিরাশার সীমাহীন অন্ধকারে এ বিপ্লব এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। এক কথায়, দুনিয়ার যেখানেই তখন চলছিলো শোষণ, নিপীড়ন, দাসত্ব, সেখানেই রাশিয়ার এ বিপ্লব সেখানকার নিপীড়িত শ্রেণীকে দেখিয়েছে বন্ধন মুক্তির এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা—যা তাদের মুক্তি-চেতনা সঞ্জীবনে প্রেরণা জুগিয়েছে, উৎপীড়ন অবসানের লড়াইতে করেছে উদ্দীপ্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অতীতেও অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং সেগুলিও সেখানকার চলমান অবস্থার পরিবর্তন প্রয়াসেই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সেসব বিপ্লব সংঘটিত হলেও, সাময়িক সাফল্য লাভ করলেও, তার আসল উদ্দেশ্য অসফলই থেকে গেছে। আগেকার সেসব সংঘটিত বিপ্লবে সেই দেশের একদল মানুষ বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের অত্যাচারী শাসকশ্রেণীকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আরেকদল শোষক এসে তার জায়গা জুড়ে নিয়েছিল, অর্থাৎ সেসব বিপ্লবে শোষণের, অত্যাচারের বিন্দুমাত্র অবসান হয়নি। সেদিক থেকে রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের পার্থক্যটা আকাশ পাতাল। এ বিপ্লব রুশদেশের জনগণের শোষণের ধারাটারই অবসান ঘটিয়েছিল। নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের সব অবস্থার অবসান ঘটানো এবং শোষকশ্রেণী ও তার মদতদারদের উৎখাত করে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে শাসন কর্তৃত্ব দিয়ে দেওয়া। সেদিক দিয়ে এ বিপ্লব সার্থক এবং এ জনাই এ বিপ্লব আগের সংঘটিত অপরাপর বিপ্লব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত, এই দশ দিনে নানা বিস্ময়কর ঘটনার মধ্য দিয়ে সাফল্য লাভ করেছিল এই যুগান্তকারী বিপ্লব। কিন্তু এর প্রস্তুতি পর্ব চলেছিল ঐ বছরেরই মার্চ মাসের বিপ্লবের পর থেকেই। শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করে, কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বৈপ্লবিক সচেতনতা সৃষ্টি করে মহান লেনিন বহু প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে, এ বিপ্লবকে সাফল্যের তোরণে পৌঁছে দেন। ঐ দশদিন ঘটনার তীব্র গতি প্রবাহে বিশ্বের কাছে চমক সৃষ্টি করেছিল রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি। আর সেসব ঘটনার চরমক্ষণ ছিল ৭ই নভেম্বরের শেষ রাত্রি। পেট্রোগ্রাদের স্মোলনি প্রাসাদ থেকে সেদিনই জনগণের ইচ্ছানুসারে সোভিয়েতকে রাশিয়ার সরকার হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সেদিনের সেই রোমাঞ্চকর ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তুলে ধরা অসম্ভব। তাই খুব সংক্ষেপে তার কিছুটা মাত্র এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

মার্চের বিপ্লবের পর থেকেই রাশিয়ার সোভিয়েত গুলোর প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বেড়ে উঠছিলো এবং সেগুলি জনগণের প্রতেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে আকৃষ্ট করছিলো। এগুলি ছিল জনগণের বৈপ্লবিক অংশকে ট্রেনিং দিয়ে বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তোলার বিদ্যায়তন। জনগণের বিপুল আস্থা অর্জন করে, জালের মতো বিস্তৃত স্থানীয় শ্রমিক ও সৈনিক সোভিয়েতগুলো তখন মজবুত সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছিল। সরকার হিসেবে ঘোষণার অপেক্ষা না করেই, বিপ্লবের অনেকদিন আগে থেকেই, এ সোভিয়েতগুলো সরকার হিসাবেই কাজ করে আসছিলো। তখন শুধু বাকী ছিল এগুলিকে সরকার হিসাবে স্বীকৃতিটুকু দেয়া। রাশিয়ার জনগণের গভীর থেকে তখন একটি প্রবল আওয়াজই উঠেছিল "অস্থায়ী সরকার নিপাত যাক, সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই।" সারা দেশব্যাপী এ দাবী ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানলের মতো। ক্ষেতে খামারে, কলে কারখানায় ব্যারাক আর রণাঙ্গনের গলা মিলে এ শ্লোগান প্রতি মুহূর্তে প্রবলতর হয়ে উঠছিলো। সোভিয়েতের জন্য লড়াই চালাবার জন্য, প্রাণ দেবার জন্য সেদিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ—গড়ে তুলেছিল নানা কমিটি ও সংগঠিত করেছিল সরকারের বিরুদ্ধে বিশাল বিশাল মিছিল। গরীব মানুষের তখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে, কামানের খোরাক হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় বেঁচে

থাকতে আর চাইছিলো না। ওরা হয়ে উঠেছিলো বিদ্রোহী; রাষ্ট্র নায়কদের কথার ফুলঝুরিতে ওরা আর বিভ্রান্ত হতে রাজী ছিল না—ওরা সেদিন জেগে উঠেছে। নেতাদের কাছে ওদের স্পষ্ট দাবী, "হয় বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করো—নয়তো ক্ষমতা ছাড়ো।"

সুসংগঠিত হয়ে, সচেতনভাবে রাশিয়ার দাসেরা আর শোষিতেরা নিজেদের পরিত্রাণের সঠিক মুহূর্তটিকে বেছে নিয়ে তখন দাঁড়িয়েছে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পক্ষে—পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশের শাসন ভার নিতে চাইছে একান্তভাবে নিজেদের হাতে। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে শিক্ষা-দীক্ষাহীন মানুষের পক্ষে এ এক দুঃসাহসিক আকাঙ্খা। বুর্জোয়ারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে, কিন্তু তখনো আশা পোষণ করে যে, এ বিপ্লব প্রচেষ্টাও আগের মতোই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এর কারণ শত প্ররোচনাতেও জনগণ বিশৃঙ্খলতার কোন নজীরই তাদের সামনে হাজির করে না। বিপ্লবের জন্য চাই কঠোর শৃঙ্খলা আর সংযম—এ কথাটা জাগ্রত জনতা বুঝলেও, বুর্জোয়ারা এর গুরুত্ব ও এর ভয়ংকর পরিণতির কথা অনুমানও করতে পারে না। ঘরে ঘরে বেড়ে ওঠে বিদ্রোহী মানুষ, বিপ্লবের সপক্ষে ভোট দেবার হাতে তারা তুলে নেয় বিপ্লবের হাতিয়ার—রাইফেল। যে কোন প্রতিবিপ্লবের মুখোমুখি হবার জন্য তারা সজাগ হয়ে থাকে। পেট্রোগ্রাদে, নেভার পারে বিশাল প্রাসাদ স্মোলনি হয়ে উঠলো বিপ্লবী জনগণের সাময়িক কার্যালয়। সেখান থেকেই প্রতিনিয়ত নির্দেশ আসতে থাকে তাদের উদ্দেশ্যে।

মুক্তিকামী এসব বিপ্লবীদের বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে রাশিয়ার সাময়িক সরকার। কিন্তু সোভিয়েতগুলি ও সামরিক ব্যারাকগুলির মধ্যেকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নষ্ট করবার চেষ্টা বার বার করেও লালরক্ষীদের কর্ম তৎপরতায় তা ভণ্ডুল হয়ে যায়। কেরেনস্কি জিগির তোলেন, "রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধী লেনিন লুঠতরাজে উস্কানি দিচ্ছে। উস্কানি দিচ্ছে ভয়াবহ গণহত্যার। এতে রাশিয়ার নাম চিরকলঙ্কে কালিমা লিপ্ত হয়ে যাবে।" কিন্তু জিগিরের ফল হলো উল্টো। জনগণ লেনিনকে তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরিয়ে এনে প্রত্যুত্তরে তাঁকে জানালো বিপুল অভিনন্দন। স্মোলনি প্রাসাদও রূপান্তরিত হলো বিরাট এক অস্ত্রাগারে—শুধু অস্ত্রাগারই নয়, বিপ্লবী জনগণের কাছে তখন সে প্রতিষ্ঠিত হলো বিপ্লবের মন্দির রূপে।

এই বিপ্লবী শ্রেণীর মধ্যে বিভেদের বীজ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এ বিপ্লব প্রচেষ্টাকে রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলায় ডুবিয়ে দেবার বহু চেষ্টা এর আগে করেছিলো সামরিক সরকার কিন্তু সেসব প্রচেষ্টা সহজেই ধরে ফেলেছে বিপ্লবী জনগণ। তাই পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঐক্যকে ওরা ক্ষুন্ন হতে দেয়নি কোন মতেই। এরপর ষড়যন্ত্র চললো বাইরে থেকে নির্ভরযোগ্য ফৌজ এনে এদের দমন করবার কিন্তু বৈপ্লবিক জনগণের আবেদনে এর ফল হলো বিপরীত। বাইরে থেকে আসা ফৌজেরাও বিপ্লবীদের সমর্থনেই এগিয়ে এলো। ৭ই নভেম্বর পেট্রোগ্রাদের অভ্যন্তরে তখন চলছে সংঘর্ষ। বিভিন্ন টহলদার বাহিনীর মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী মতবাদের জন্য চলছে সংঘাত। এই পরিস্থিতিতেই অসংখ্য মানুষ আসতে থাকে স্মোলনিতে, দ্বিতীয় সারা রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভায় যোগদানের জন্য। সারা রাশিয়ার মানুষ সেদিন তাকিয়ে ছিল স্মোলনির দিকে। অগণিত কোটি কোটি বঞ্চিত ও গরীব মানুষের আশা আকাঙ্খার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল ঐ স্মোলনি। যুগ-যুগান্তের দুর্দশা আর অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তারা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিল স্মোলনির দিকে। সেদিন সেখানেই হবে তাদের জীবন-মরণের প্রশ্নের সমাধান।

রাত্রিতে স্মোলনি তখন ফুসছে, গর্জাচ্ছে কামানশালার মতো। সেখানে বিভিন্ন বক্তারা জনগণকে ডাক দিচ্ছেন অস্ত্র ধারণ করবার জন্য, অন্যদিকে পরিবেশকে আরও অর্থময় করে তুলছে সমবেত কণ্ঠে বৈপ্লবিক সংগীতগুলি। দশটা চল্লিশ মিনিটে শুরু হলো সেই ঐতিহাসিক সভা। প্রথমেই কংগ্রেসের পরিচালক সংস্থা (সভাপতি মণ্ডলী) নির্বাচন হয়ে গেল। ১৪জন সদস্য নির্বাচিত হলেন বলশেভিক পার্টির এবং অন্যান্য সব দল মিলিয়ে আরও ১১জন। পুরোনো পরিচালক সংস্থা সরে গেল, আর তাদের আসন গ্রহণ করলেন, হালেও যারা ছিলেন রাশিয়ার নির্বাসিত, সমাজচ্যুত, আইনের আশ্রয় থেকে বহিস্কৃত, সেই বলশেভিক নেতারা। দক্ষিণ পন্থী পার্টিগুলির কাছে এটা হজম করা সহজসাধ্য ছিল না। তাঁরা নির্দিষ্ট কার্য বিবরণ নিয়ে নানা সমালোচনায় অধিবেশন কক্ষকে সরগরম করে তুললো। নানা বাক্যজাল সৃষ্টি করে এরা জনগণের বিপ্লবের ঐকান্তিক ইচ্ছাকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছিলো। এ সময় রাতের অন্ধকার ভেদ করে দূরে শোনা গেল একটা গর্জন। প্রতিনিধিরা চঞ্চল ও ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ওটা কামানের গর্জন। শীত প্রাসাদে গোলা বর্ষিত হচ্ছে। সে আওয়াজ যেন ক্রমশই এগিয়ে আসছে স্মোলনির দিকে। সে আওয়াজ যেন ঘোষণা করছে, পুরোনো ব্যবস্থার মৃত্যুর আর নতুনের প্রশস্তি। এ আওয়াজ হলো বঞ্চিত, শোষিত জনগণের দৃঢ় কণ্ঠস্বর, "সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই।" কংগ্রেসের সামনে তখন জনগণ শুধু একটা প্রশ্নই রাখছে যে, সোভিয়েতকে রাশিয়ার সরকার বলে ঘোষণা করে তখনই তারা নতুন কর্তৃত্বকে বিধিবদ্ধ করে দেবে কিনা।

বুদ্ধিজীবিরাও এ সময় সকলকে অবাক করে দিয়ে জনগণের বৈপ্লবিক এ কর্মধারাকে তখনই মেনে নিতে চাইলো না। জনগণকে ওরাই একদিন বাক্ চাতুর্যে বিপ্লবের দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিল। আজ যখন জনগণ

প্রস্তুত, তখন ওরাই তাদের এ কাজকে অপরিণত পন্থা ও ভয়াবহ ফলদায়ী "গৃহযুদ্ধ" বলে প্রত্যাখান করতে চাইলো। জনগণের বিদ্রোহের অধিকারকে অস্বীকার করে এই সমস্ত বুদ্ধিজীবী, বাক্সর্বস্বের দল অধিবেশন কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে গেলো। ট্রটস্কি বলে উঠলেন, "ওরা চলে যাক। চলেই যাক ওরা। ওরা কিছু জঞ্জাল মাত্র—যাবে ইতিহাসের আবর্জনার স্তূপে।" জনগণ ধিক্কার জানায় ওদের। জনগণের বৈপ্লবিক ইচ্ছা পূরণ দেখার জন্য জনতা তখন অধীর। সোভিয়েতকে সরকার বলে ঘোষণার বিরুদ্ধে যে কোন প্রচেষ্টাকে তারা খান খান করে দিতে চায়। বুদ্ধিজীবিদের এ নির্লজ্জ অস্বীকৃতিকে কিছু আমল দেয় না তারা। রাস্তায়, ট্রেঞ্চে, কলে-কারখানায়, ব্যারাকে—তখন সর্বত্র চলেছে এ বিপ্লবের প্রচণ্ড লড়াই। এ বিপ্লব প্রবেশ করেছে কংগ্রেসের অধিবেশন কক্ষেও—একে তখন অস্বীকার করাতো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকেই অস্বীকার করা। অধিবেশন কক্ষের বাইরে তখন জড়ো হচ্ছে অবিচলিত সব নতুন নতুন বাহিনী। মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, টেলিগ্রাফ স্টেশন, টেলিফোন স্টেশন, সামরিক ঘাঁটি দখল—বিপ্লবের নতুন নতুন জয়ের খবর স্মোলনিতে আসতে লাগলো প্রতি মিনিটে। পুরোনো কর্তৃত্বের সব খুঁটিগুলি উপড়ে পড়ছে তখন একের পর এক জনগণের বিদ্রোহের আগুনে। শেষে প্রচণ্ড শীতের এই রাত্রি শেষে বিভিন্ন ইচ্ছার সংঘাতের ভেতর দিয়েই বেরিয়ে এলো যুগান্তকারী সেই ঘোষণা। "সাময়িক সরকার ক্ষমতাচ্যুত। শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছায় সোভিয়েত কংগ্রেস রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে নিল। অবিলম্বে সমস্ত জাতির জন্য গণতান্ত্রিক শান্তি, সমস্ত রণাঙ্গণে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির জন্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এখনই প্রস্তাব দেবে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ নিশ্চিতভাবে, জমির উপর জমিদারী স্বত্বের অবসান ঘটাবে, আর উৎপাদনের উপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণকে প্রতিষ্ঠা করবে।" রাশিয়ার জনগণ যে অভীষ্টের জন্য এতদিন লড়েছিল, আজ তারা তাই অর্জন করলো। নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণী—শ্রমিক শ্রেণীকে আজ তারা শাসক শ্রেণীতে পরিণত করলো। সোভিয়েতই এখন সরকার। বিপ্লবী জনগণের এ ইচ্ছাপূরণে জনগণ আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। তাদের কাছে এ সামান্য ইচ্ছাপূরণ নয়, এতো মুক্তি।

৭ই নভেম্বরের সারা রাতের ঘটনার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এটা। লিখে বোঝানো দুরূহ এর গতিবেগের প্রচণ্ডতা। এর পরের দশ দিন ছিল ঐ ঐতিহাসিক ঘোষণার প্রতিক্রিয়ার লড়াই এবং বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াস—যা সোভিয়েট সরকার ও বলশেভিক দল দক্ষতার সাথে বানচাল করে দিয়ে নিজেদের অগ্রগতির পথকে কন্টকহীন করে ফেলেছিল। এমনি করেই রাশিয়ার সেদিন সফল হয়ে উঠেছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—যা মানব সভ্যতার সীমাহীন অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক অকল্পনীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছিলো। এইভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানব সভ্যতার এক ক্ষুদ্র অংশের বুদ্ধি ও শক্তির কবলে বৃহত্তম অংশের উপর অমানুষিক শোষণ ও অত্যাচারের কলঙ্কিত ইতিহাসের সার্থক অবসান ঘটিয়েছিল সর্বপ্রথম সোভিয়েত রাশিয়া—মহানায়ক লেনিনের নিখুঁত নেতৃত্বে। ঐ বিপ্লবই আজ মানব সমাজকে বহু দূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে, জেলেছে অগ্রগতির এক নতুন আলোকবর্তিকা যা কোনদিনই নিভতে পারে না। এ বিপ্লব স্থাপন করেছে মানব সমাজের নতুন সভ্যতার এক দৃঢ় ভিত্তি, যে ভিত্তি কোনদিনই আলগা হতে পারে না। এর থেকে শিক্ষালাভ করেই অগ্রসর হতে হবে বর্তমান ও আগামী প্রগতিশীল মানব সমাজকে।

যুগান্তকারী এ সাফল্য যে আকস্মিকভাবে আসেনি তা' সহজেই অনুমেয়। এর পিছনে ছিল অনেকগুলি কারণ। প্রথমেই এ বিপ্লবের সাফল্যের কারণগুলি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। একটু মনোনিবেশ করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ বিরাট সাফল্যের মূলে সেদিন তিনটি উপাদান বিশেষভাবে কাজ করেছিল। সে তিনটি উপাদান হলো, তদানীন্তন আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা, লেনিনের মতো দূরদর্শী বিপ্লবী নেতার আবির্ভাব এবং বলশেভিক পার্টির মতো কর্মদক্ষ, শৃংখলাবদ্ধ ও আদর্শনিষ্ঠ একটি রাজনৈতিক দল। এ তিনের সুন্দর সমন্বয়ই নভেম্বর বিপ্লবকে সেদিন চূড়ান্ত সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক ও দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে কোন বৈপ্লবিক সংঘটনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে তা' সাহায্য করে। নভেম্বর বিপ্লব যখন হয়, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের সংগে হানাহানি করছিলো। অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার অবসর তখন তাদের মোটেই ছিল না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়া ও জার্মানী পরস্পরের মধ্যে লড়াইয়ে উন্মত্ত। রাশিয়ায় কি ঘটছে সেদিকে দেখার অবকাশ তখন তাদের নেই। অপরদিকে রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশগুলি ও বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী তথা সমস্ত মেহনতী শ্রেণী ও জনসাধারণ এই স্থায়ী যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিলো। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বিগ্রহ খতম করার জন্য শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী বিপ্লবী অভ্যুত্থানগুলিতে দলে দলে লোক এসে তখন একত্রিত হতে শুরু করেছিলো। শুধু তাই নয়, বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মেহনতী শ্রেণীর মধ্যেও একটা নিবিড় একাত্মতা গড়ে উঠেছিল এবং তারা সবাই নভেম্বর বিপ্লবের প্রস্তুতিতে মদত জুগিয়েছিল। সুতরাং এই ধরনের আন্তর্জাতিক অবস্থার সুযোগে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে

প্রতিরোধ করবার মতো তখন কোন বহিঃশত্রু ছিল না; উপরন্তু এর প্রতি ছিল এসব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সমগ্র মেহনতী জনতার ঐকান্তিক সমর্থন।

সে সময়কার রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে তাকালেও আমরা বুঝতে পারবো ঐ বিপ্লবকে ঐ অবস্থা কিভাবে সার্থক করতে সহজ করে তুলেছিলো। সে সময়ে রাশিয়ার অধিকাংশ শ্রমিকই বিপ্লবে যোগদানের জন্য প্রস্তুত ছিল। শুধু শ্রমিকরাই নয়, সামন্ততন্ত্রের নির্মম শোষণে তখন রাশিয়ার কৃষক শ্রেণীর মধ্যেও তীব্র বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল; তারা অধিকাংশই তখন ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছিল। সেনা বাহিনীর মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল—কারণ তারাও ছিল ঐ কৃষক শ্রেণী সম্ভূত। তাছাড়া তখন লেনিন ও ট্রটস্কির নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির মতো একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক দলের কর্মধারার ওপরে আকৃষ্ট হয়েছিল দেশের অধিকাংশ মেহনতী জনতা। জনতার উপর রাজনৈতিক দলের এ গভীর প্রভাবের মূল্য অপরিসীম। দেশের মধ্যে তখন বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনে সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অপর দিকে ক্ষমতা দখলের লড়াই চালাবার জন্য রাশিয়ার অপর দুটি রাজনৈতিক দল—মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারী দল তখন পরস্পর মনোমালিন্যের জন্য জনসাধারণের ওপর হতে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল। সুবিধা আরো ছিল, তখন কেন্দ্রীয় রুশ দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি ছিল রুশ দেশের শস্য ভাণ্ডার ও জ্বালানী এবং কাঁচা মালে সমৃদ্ধ। সেইসব প্রদেশগুলির সাধারণ মানুষের সমর্থন এইসব বিপ্লবীদের পেছনে থাকায়, বিপ্লবীরা দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকলেও তাদের খাদ্য, জ্বালানী ও কাঁচা মাল প্রাপ্তির কোন অসুবিধা হবার আশঙ্কা ছিল না। শুধু তাই নয়, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের তীব্রতায় রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি যে খণ্ড খণ্ড কৃষক সংগ্রামগুলির মাধ্যমে বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক পরিবর্তন সূচনা করেছিলো, তাকে দুর্বল সোস্যালিস্ট-রেভোলিউশনারী দল নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় তাদের বৈপ্লবিক দাবীগুলি বলশেভিক দল নিজেদের দাবীর অঙ্গীভূত করে নিয়ে তাদেরও নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল। সুতরাং স্পষ্টই বলা যায় যে, উপরোক্ত আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলিও রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

অপর দিকে, আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই সময়ে লেনিনের মত বিচক্ষণ নেতার আবির্ভাব না হলে, ঐ সকল উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ বিপ্লবও সফল হতে পারতো না। লেনিনের অসামান্য নেতৃত্বই ছিল এ বিপ্লবের সকল সফলের মূলে। ব্যর্থ ফরাসী বিপ্লবের আলোকে লেনিন শিক্ষা গ্রহণ করে বুঝেছিলেন যে, ফরাসী দেশের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে কৃষক শ্রেণীকে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায়নি বলেই সেদিন প্যারিস কমিউন ব্যর্থ হয়। রাশিয়ায় বলশেভিকদের মনেও ভয় ছিল, নভেম্বর বিপ্লবেও হয়তো কৃষক শ্রেণীকে সামিল করা যাবে না। আর এটাও সত্যি যে, ১৯০৫ সালে ট্রটস্কির ভুলের জন্যই রাশিয়ার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ট্রটস্কি কৃষকদের বৈপ্লবিক মানসিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করে তাদের সংগঠিত করার চেষ্টা থেকে বিরত ছিলেন। অবশ্য কৃষক শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসের নিজেরও খুব একটা আস্থা ছিল না। কিন্তু বিপ্লবে ওদের সামিল করতে পারলে তা' যে আরও অনেক বেশী শক্তিশালী হবে—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। সেইজন্যই তিনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে বলেছিলেন যে, কৃষক শ্রেণীকে যে কোন উপায়ে শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী করে তুলতে। ১৮৫০ সালে জার্মানী ও ফ্রান্সে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থতায় মার্কস এঙ্গেলসকে এবং তাঁর মাধ্যমে জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টিকে জানিয়েছিলেন যে, জার্মানীতে বিপ্লব সফল করতে হলে কৃষক শ্রেণীকে হয় সহমতে আনতে হবে, নয়তো তাদেরকে কৃষক যুদ্ধে প্রণোদিত করতে হবে।

বিচক্ষণ লেনিন তাই ট্রটস্কির মতো সে ভুল আর করেননি। তিনি কৃষকদের শ্রমিক শ্রেণীর সহমতে এনে তাদের বিপ্লবে সামিল করতে পেরেছিলেন। ঐ রকম বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও ক্ষমতা দখলের পূর্বে যে দুটি বিষয়ে বলশেভিক দলকে ভাবিত করে তুলেছিল তা' হলো ক্ষমতা দখলের পরে শাসনগোষ্ঠী এবং তার অনুগামীরা তাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই চালাবে তার মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে এককভাবে সম্ভব হবে কিনা। কারণ তখন রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী এমন কোন প্রগতিশীল দেশ ছিল না যে, সেখান থেকে ঐ প্রতিবিপ্লব রুখতে তাদের সাহায্য ও সমর্থন আসবে। তাছাড়া দেশের মধ্যেই সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা তখনও খুব একটা আশানুরূপ ছিল না। তাই বিপ্লবের পরেও সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষক শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন পাওয়ার নিশ্চয়তা নির্ধারণ করে নেবার প্রয়োজন তাদের পক্ষে একান্তভাবেই ছিল। লেনিন সে কর্তব্য নিখুঁতভাবে পালন করেন। তাই নভেম্বর বিপ্লবে দেখা গেল মার্কসের কথিত কৃষক যুদ্ধ ও শ্রমিক বিপ্লব পাশাপাশি হয়েছে তাঁরই নেতৃত্বে। ঐ বিপ্লব থেকে এ শিক্ষাও আহরণ করা গেল যে, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে একই বিপ্লবে সামিল করা সম্ভব যদি সর্বহারা কৃষক শ্রেণীকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায় এবং তাদের সর্বহারা চেতনায় উজ্জীবিত করা যায়। সুতরাং নভেম্বর বিপ্লবে দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। প্রথমতঃ রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো কৃষক শ্রেণীর সহযোগিতায়, যারা সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী অপেক্ষা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়াতে তখনই সম্ভব হয়ে উঠলো যখন সেখানে

ধনতন্ত্র পুরোপুরিভাবে বিকাশলাভ করতে পারেনি, পরন্তু সে দেশ ছিল কৃষি প্রধান।

লেনিন এ বিপ্লবে আমাদের আরও শিখিয়েছেন যে, বিপ্লব সাফল্যের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার হলো সুসংগঠিত একটি বিপ্লবী দল, বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভবটাই বড়ো কথা নয়। রাজনৈতিক দলকে শুধু নির্বাচনসর্বস্ব হলেই চলবে না। প্রয়োজনে তাতে অংশ গ্রহণ করা চলে; কিন্তু এটাই বিপ্লবে বিশ্বাসী দলের শেষ কাজ নয়। তিনি কোন সময়েই রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম অংশ বলে মেনে নিতে পারেননি। তিনি মনে করতেন, বিপ্লবী দলের কাজ হবে বিভিন্ন কার্য ও আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিস্তারের চেষ্টা করা এবং তাদের সমর্থন আদায় করে তার মধ্য থেকেই পার্টির ক্যাডার সংগ্রহ করা। রাশিয়ায় সাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে তখন বিরাট বিরাট বিক্ষোভ মিছিলগুলির সামিল হয়ে বলশেভিক দল বুঝতে পেরেছিল যে বিপ্লব আসন্ন এবং এর সর্ব প্রস্তুতি তাদেরই চালাতে হবে। অতএব এর নেতৃত্ব দিতে হলে প্রয়োজন হবে একদল শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকের আর তা' সংগ্রহ করে নিতে হবে জনগণের আগুয়া অংশ থেকেই, কেননা বেতনভূক সৈন্যবাহিনী কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সংগঠিত করা সম্ভব নয়। বিপ্লবকে সার্থক করার জন্য তাই লেনিন সেদিন ঐসব বিক্ষোভ মিছিল ও আন্দোলন থেকেই শুধু সৈন্য সংগ্রহ করে ক্ষান্ত হননি, তিনি তা' সংগ্রহ করেছিলেন জেলা শহরের বিভিন্ন ডুমা নির্বাচনের সময়ে এবং কর্নিলোভ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়েও এবং তাদের সকলকে অক্লান্ত পরিশ্রমে বিপ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিতও করে তুলেছিলেন।

কিন্তু এভাবে সৈনিক সংগ্রহ করে বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে তখনই তিনি কাজে লাগাননি। তিনি নভেম্বরের আগে বিপ্লবের ডাক দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে বিপ্লব সংঘটনের প্রকৃত সময় তখনো রাশিয়ায় হয়নি। বলশেভিক দলের তখনও একটা কাজ বাকী ছিল—সেটা হলো রাশিয়ায় তখনকার আপোষপন্থী দলগুলিকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট-রিভোলিউশনারী দল দুটি তখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি এবং জনগণের উপর তাদের প্রভাব তখনও ছিল। এই দলগুলি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, বিপ্লব বিরোধী ও আপোষপন্থী। এইসব দলগুলির সংগে কোন রকম আঁতাত না গড়ে বলশেভিক দলকে তখন এককভাবেই কাজ করতে হয়। লেনিন বুঝেছিলেন যে, আপোষপন্থী এসব দুর্বল দলগুলিকে জনগণের সমর্থন হারা করতে না পারলে বিপ্লবের মধ্যে থেকেই এরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে। ১৯০৫—১৯১৬ পর্যন্ত বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের সময়, জার সাম্রাজ্যবাদকে যে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলটি টিকিয়ে রেখেছিল সেটি হলো 'ক্যাডেট পার্টি'। এই পার্টি জারতন্ত্রের সংগে সর্বদাই একটা আপোষের মাধ্যমে কৃষক অভ্যুত্থানের অগ্রগতিকে বার বার প্রতিহত করেছিল। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট-রেভোলিউশনারী দল দুটির বিপ্লব বিরোধী আসল চেহারাটাকে জনগণের কাছে নগ্নভাবে তুলে ধরেছিল। ফলে, বিপ্লবের আগে ঐ দল দুটি জনগণের সমর্থন একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল। এমনি করেই বিপ্লব প্রস্তুতির প্রত্যেকটি ধাপে সঠিক পন্থা গ্রহণে ও অভ্যুত্থানের সঠিক সময় নির্দ্ধারণে লেনিনের বিচক্ষণতা এ মহান নভেম্বর বিপ্লবকে সাফল্যের তোরণদ্বারে পৌঁছে দিয়ে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সার্থক করে তুলেছিল।

মহান সেই বিপ্লবের পরে দীর্ঘ একষট্টিটি বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু তার অমূল্য শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়ীত জনগণ আজও মুক্তির জন্য লড়াই করে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দেবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়েও সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার কাছে আজ সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিশ্বের যেখানেই আজ সাম্রাজ্যবাদের কুটিল চক্রান্ত, নভেম্বর বিপ্লবের প্রেরণা সেখানেই তার বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছে। আজ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ শোষণ মুক্ত। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আজ আরও ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার পরাধীন জাতিগুলি আজ মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো রংয়ের মানুষেরা বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। সদ্য স্বাধীন উন্নয়নশীল ও উন্নয়নকামী জাতি ও দেশসমূহ অর্জিত স্বাধীনতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য, অর্থনীতির সয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য দৃঢ়পণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এবং আরও বেশী করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার অবতীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ আজ সংকটের আবর্তে কোণঠাসা হলেও, শেষ হয়ে যায়নি। বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার আক্রমণাত্মক নীতির পরিবর্তন করেনি। কৌশল ও পদ্ধতি কিছু পালটে তারা এখনও পৃথিবীর নানাপ্রান্তে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করে আপন প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও বজায় রাখতে নিরলস চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তি প্রয়াস ও তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সে চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে এবং তা' সম্ভব হচ্ছে কেবলমাত্র নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকেই। সর্ব দেশেই আজ সর্বহারা শোষিত মানবসমাজ তাদের মুক্তির জন্য, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও জনশত্রুদের ধ্বংসের জন্য নভেম্বর বিপ্লবের অমূল্য শিক্ষাকেই প্রয়োগ করছে।

বিশ্বের সার্থক সেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

থেকে বিপ্লবে বিশ্বাসী প্রতিটি দলকে আজও অনেক শিক্ষা নিতে হবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বুলিটা আজ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অনেক ব্যক্তি ও দলের মুখেই শোনা যায়। এই বুলি সামনে রেখে তারা তাদর স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে এবং জনগণের একটা অংশকে বিভ্রান্ত করে রাখছে। এদেরই কেউ কেউ এই শ্লোগান দিয়ে কলে কারখানায় শ্রমিকদের সামান্য কারণে ক্ষেপিয়ে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে, শ্রমিকদের বিপদগ্রস্ত করে তুলছে। গ্রামাঞ্চলে কেউ কেউ এই বুলি আওড়ে কৃষকদের ক্ষেপিয়ে দু' চারজন জোতদার খতম করছে, কেউ কেউ এরই নাম করে রাস্তায় দু' চারটি বোমা ফাটিয়ে, রাতের অন্ধকারে দেশের মনীষীদের মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলে, বিপ্লবের পথকে সুগম করতে চাইছে। আসলে এরা এসব করে বিপ্লবের যে কি ক্ষতিসাধন করছে নভেম্বর বিপ্লব আমাদের 'তা' চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তাই নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে আজ তাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে বলি। সেই বিপ্লবের ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করে তারা তাদের বিপ্লবী বলে জাহির করতে পারবে না। সফল সে বিপ্লবের ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করে কিছু করতে যাওয়া মানেই তা' হবে বিপ্লবের মূলে কুঠারাঘাত করা এবং তার সম্ভাবনাকে বহুদূরে পিছিয়ে দেয়া। তাই তাদের আজ বুঝতে বলি, মেহনতী জনগণের কল্যাণ সাধনের পথ ও পন্থা ঐ হঠকারী কাজ নয়। এর সঠিক পথ ধ্রুবতারার মতো আজও আমাদের দেখিয়ে চলেছে নভেম্বর বিপ্লবে জেলে রাখা সেই উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।
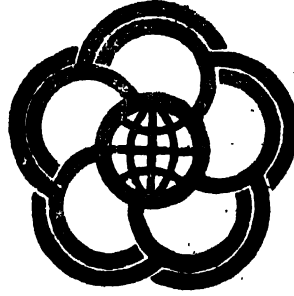
চিত্রে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী প্লাবন, ত্রাণ ও পুনর্গঠন

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানাগড়-ইলামবাজার রোড। এই রাস্তা ভেঙে সিউড়ির সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
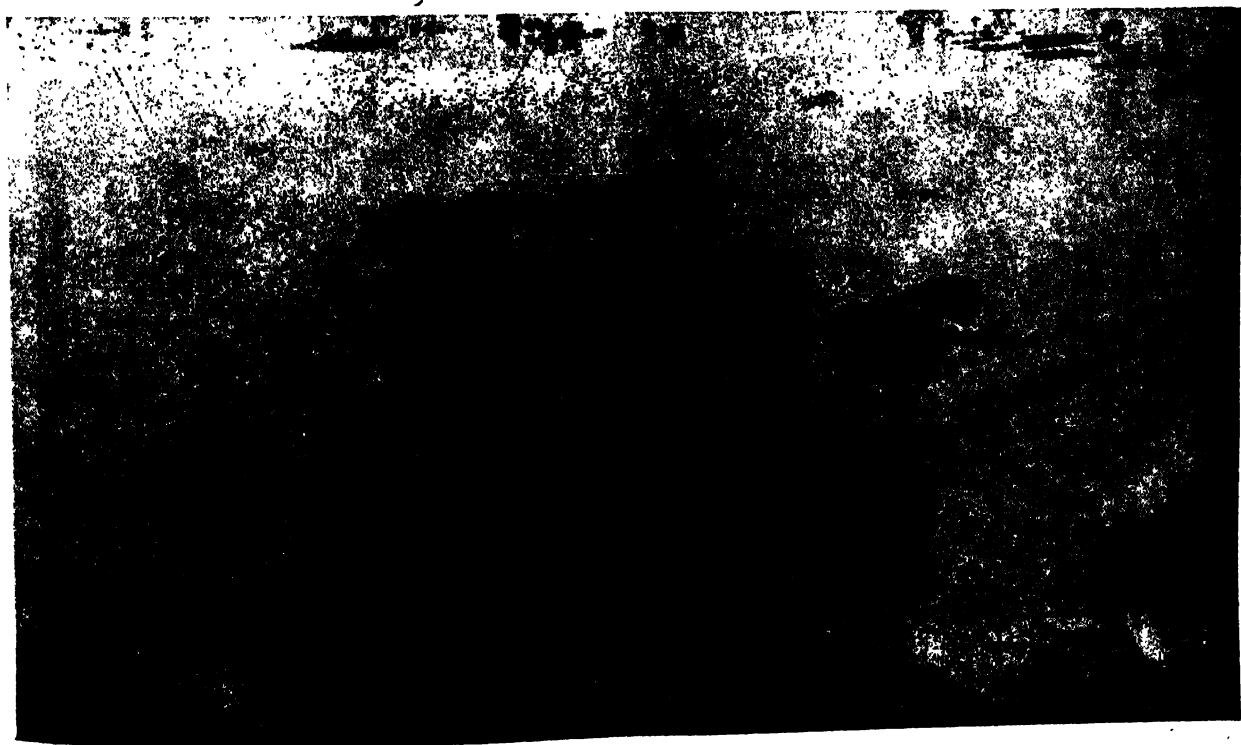
চারিদিকে অথৈ জল—বর্ধমান জেলায় বন্যার তাণ্ডবলীলা।
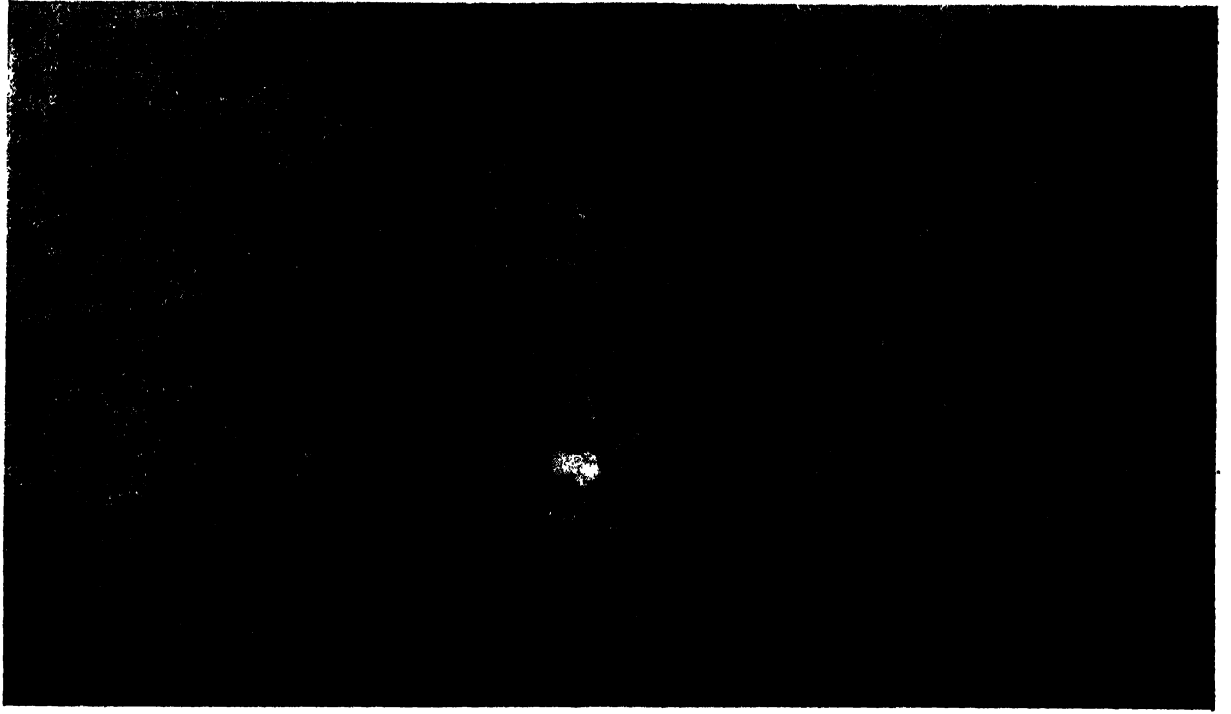
মেদিনীপুর জেলার ময়না/পশ্চিম নাইচানপুর অঞ্চলে বন্যাপ্লাবিত শস্যক্ষেত্র।
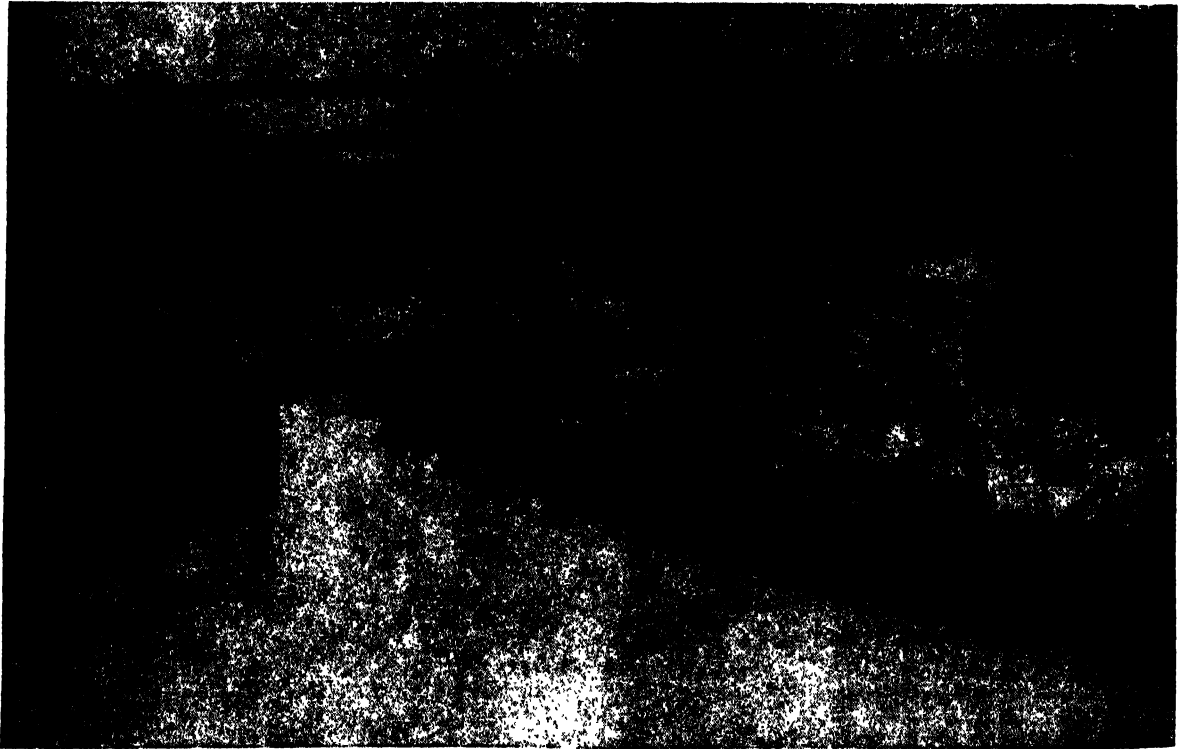
কালনার বাসুদেবপুর গ্রামের জলবন্দী মানুষদের উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয় তরুণ দল।

মেদিনীপুর জেলার ময়না/আড়ংকিয়ারানায় রান্না করা খাবার যোগান দেওয়ার কাজ চলছে।

মেদিনীপুরের ময়না/কিশোর চক্ অঞ্চলে বন্যাত্রাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

পানাগড় বিমান ক্ষেত্রে খাদ্যবস্তু প্যাকেট করার কাজ চলছে। এই বিমান ক্ষেত্র থেকে বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার জলবন্দী দুর্গত মানুষজনের কাছে ৩০ টন খাদ্য দ্রব্য পৌঁছে দেওয়া হয়

বন্যাপ্লাবিত কালনা শহরের মহিষমর্দ্দিনীতলা
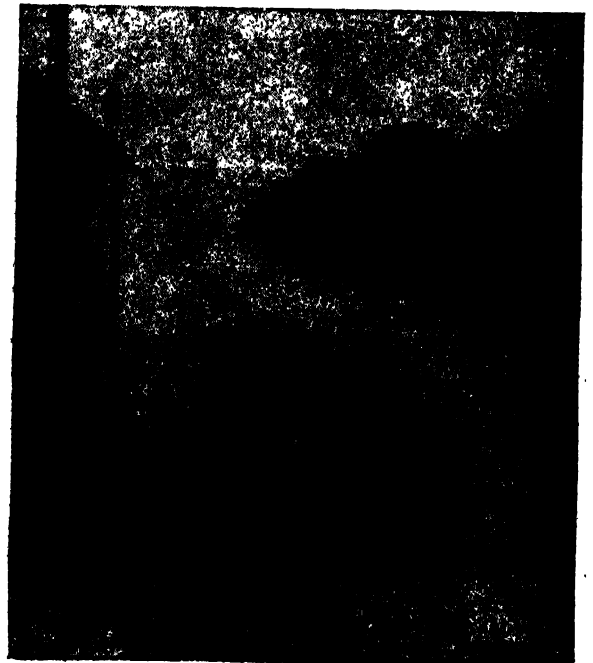
ব্লক যুবকেন্দ্র সমাচার

(১) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র

বয়স্ক শিক্ষার প্রসার যুবকল্যাণ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানসূচীর অন্যতম। দক্ষিণ ২৪-পরগণার ডায়মণ্ডহারবার-১ ও ২ ব্লক, ফলতা, সাগর, বারুইপুর, সোনারপুর, জয়নগর, নামখানা, মথুরাপুর ইত্যাদি ব্লক অফিসগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে ১৯৫০জন বয়স্ক শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করছেন। বর্ধমান জেলায় এই ধরনের ৫২টি শিক্ষাকেন্দ্রে ১২৩০জন শিক্ষাগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন।

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যে উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে তার সামগ্রিক পরিকল্পনার সংগে সামঞ্জস্য রেখে যাতে এই বিভাগের অধীনে যে সব বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি আছে সেগুলিতে ব্যাপকভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।

(২) অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প

এই বিভাগের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় চলতি আর্থিক বৎসরে এ বাবদ অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৫ লক্ষ টাকা প্রান্তিক দেয় মঞ্জুর করা হয়েছে। এই পরিমাণ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা। এইসব প্রকল্পের মধ্যে আছে—

কয়লা ডিপো, সার বিক্রয় কেন্দ্র, হিমক্রীম কারখানা, ট্রাক্টার, মনোহারী দোকান, কাটা কাপড়ের দোকান, মাদুর বয়ন, টাইলের কারখানা, সাইকেল মেরামতি দোকান, মুদিখানা, বই দোকান, পাওয়ার টিলার, মিনিবাস ও নানা ধরনের ট্রাক (বর্তমানে এ দুটি বন্ধ আছে), খেস কারখানা, সুইচ ও সুইচ বোর্ড তৈরী কারখানা, ইনটারকম্ কারখানা, সীবন শিল্প, গম পেষাই কল, ছাপাখানা, ছাগ ও পশুপালন, ষ্টীলের/কাঠের আসবাবপত্র, জুতো তৈরী, ধুম্রহীন গুল কারখানা, কাঠ চেরাই কল, ডেয়ারী, হাঁস ও মুরগী পালন, গবাদি পশুর খাদ্য বিক্রয় কেন্দ্র, রেডিও তৈরী, বেকারী, সিল্ক ছাপা কেন্দ্র ও কাগজের ব্যাগ তৈরী।

এছাড়াও এই বিভাগের যুবকেন্দ্রগুলি নানা ধরনের কারিগরী শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। সম্প্রতি আমডাঙ্গা ও বনগাঁতে ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় ৫০জন মহিলাকে সীবন ও এমব্রয়ডারী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার কাজ শুরু হতে চলেছে।

(৩) শিক্ষামূলক ভ্রমণ

এই বিভাগ থেকে প্রতি বৎসর শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। এ বৎসর অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে নানান বিদ্যালয়ের আবেদন বিচার-বিবেচনা করে এ বাবদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ২৮১টি বিদ্যালয় এই ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছে। অবহেলিত উত্তরবঙ্গের দরখাস্তকারী প্রতিটি বিদ্যালয় অর্থ সাহায্য লাভ করেছে। এ বাবদ এই বিভাগের ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬৩০ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে যাতে প্রতিটি বিদ্যালয়কে এই সুযোগ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে যুবকল্যাণ বিভাগ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জেলাওয়ারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ নীচে দেওয়া হোল।

জেলা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট সাহায্যের পরিমাণ
১। কলকাতা	২৮	৪৩,৩৬০ টাকা
২। বীরভূম	১২	২০,৬১০ "
৩। নদীয়া	১৯	২৯,৫৬০ "
৪। দার্জিলিং	১	২,০৮০ "
৫। হাওড়া	১৫	২৩,৩২০ "
৬। বাঁকুড়া	১০	২২,২৭০ "
৭। পুরুলিয়া	১০	১৬,৮৯০ "
৮। হুগলী	৩০	৩৮,০০০ "
৯। মুর্শিদাবাদ	১৩	২৪,৬৮০ "
১০। পশ্চিম দিনাজপুর	১৬	২৮,৩৯০ "
১১। মালদা	৮	১৬,৮৮০ "
১২। কুচবিহার	১৫	২৯,২৮০ "
১৩। জলপাইগুড়ি	৯	১৬,৬৭০ "
১৪। বর্ধমান	১৫	২১,০৯০ "
১৫। মেদিনীপুর	৩৬	৬৬,৪৯০ "
১৬। ২৪-পরগণা	৪৪	৬৮,১৪০ "
	২৮১ মোট	৪,৬৭,৬৩০ টাকা

(৪) যুব আবাস নির্মাণ প্রকল্প

স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেবার সদিচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভাগ বিভিন্ন জায়গায় যুব আবাস নির্মাণ করেছেন এবং করছেন। সম্প্রতি এই ধরনের একটি যুব আবাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হতে চলেছে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে একটি যুব আবাস তৈরীর জন্য বনবিভাগ থেকে প্রয়োজনায় জমি পাওয়া গেছে। পর্বতারোহণের শিক্ষাক্রম চালানোর ব্যাপারে উদ্যোগী সংস্থাগুলি এ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

(৬) পর্বতাভিযানের খবর

পর্বতাভিযাত্রীদের পক্ষে এ বছরটি সম্ভবত শুভ নয়। হিমালয়ের আবহাওয়া এবার প্রায় প্রত্যেকটি অভিযাত্রী দলের উপর অসহনীয় দুঃখ কষ্টের ছাপ রেখে গেছে। সাধারণ মানুষের কাছে সাফল্য আনন্দদায়ক হলেও অভিযাত্রীরা জানেন সাফল্য বা অসাফল্য বলে হিমালয়ে কিছু থাকতে পারে না। আমাদের দপ্তরে হিমালয় অভিযানের যে সংবাদ এসেছে তাতে দেখা যায় ট্রেকারস্ গিল্ডের ভারতীয় মানা-কামেট অভিযানে একজন সদস্য উচ্চতাজনিত (ইডিমা) রোগে মারা যাওয়ার পর অভিযান পারিত্যক্ত হয়। এটি প্রেসে যাওয়ার সময় পর্যন্ত হিমালয়ান এ্যাসোসিয়েশনের মহিলা অভিযাত্রীদের মধ্যে একজন সদস্যা এখনও নিখোঁজ আছেন। পার্বতী উপত্যকার ধর্মসুরা (হোয়াইট সেল) শৃঙ্গে এই দলের ৬ জন সদস্যা আরোহণ করেন।

বাদল মরসুমের আগে চলতি বছরের ৪টি অভিযানের খবর পাওয়া গেছে। আসানসোলের মাউনটেন লাভারস্ এ্যাসোসিয়েশন ও বার্ণপুরের ইসকো মাউনটেনিয়ারিং ক্লাব যথাক্রমে গাড়োয়াল হিমালয়ের শ্রীকণ্ঠ ও মাতৃ শৃঙ্গ জয় করে। এছাড়া কলকাতার পর্বত অভিযাত্রী সংঘ ও ট্রেকারস্ এণ্ড ক্লাইম্বারস্ যথাক্রমে গাড়োয়াল হিমালয়ের মন্দির পর্বত ও এ্যাভালাঞ্চ শৃঙ্গে অভিযান পরিচালনা করে।

বাদল মরসুমের শেষে প্রথমে উল্লিখিত দু'টি অভিযান ছাড়াও ৬টি সংস্থার অভিযানের সংবাদ আমাদের দপ্তরে এসেছে। এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছে কলকাতার দিগন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে গাড়োয়ালের গঙ্গোত্রী-গোমুখ যাওয়ার পথে এক বিধ্বংসী প্লাবন ও ধ্বস ঐ পথে নির্দিষ্ট বেশ কয়েকটি অভিযাত্রী দলকে অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে। অনেকেই তাঁদের অভিযানের এলাকা পরিবর্তন করেন। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দিগন্তের ঐ এলাকায় একটি অনামী শৃঙ্গে আরোহণ অভিযাত্রী মহলকে অভিভূত করে। ক্লাইম্বারস গ্রুপ বিশেষভাবে চেষ্টা করেও নির্দিষ্ট এলাকায় পেঁৗছোতে পারেনি। এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অনমনীয় চেষ্টাও উল্লেখ করার মত। হিমাচল প্রদেশে অভিযান চালিয়ে কলকাতার এ্যাডভেনচারার রাভালকাণ্ড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পবর্তারোহণ সংস্থা লায়ন ও অনামী শৃঙ্গ, ক্লাইম্বারস সারকেল শিতিধর ও মানালী এবং চন্দননগরের গিরিদূত ফ্রেণ্ডশীপ শৃঙ্গে আরোহণ করে। কুমায়ুন হিমালয় অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে মাউনটেনিয়ার্স ইয়ুথ রিং সংকল্প শৃঙ্গে আরোহণ করা ছাড়াও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কার্য পরিচালনা করে।

বন্যাত্রাণে যুব কল্যাণ বিভাগ

১২টি জেলায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মোকাবেলায় যুব কল্যাণ দপ্তরের কর্মীগণ এগিয়ে আসেন। এই বিভাগের যুব সংযোজক মদন মোহন সাহা বর্ধমান জেলায় বিমানে খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্বে কাজ করেছেন। দপ্তরের দুই সহ অধিকর্তা শ্যামলেন্দু বসু ও অরুণকুমার সরকার যথাক্রমে মেদিনীপুর জেলার গোপীগঞ্জে ও বাঁকুড়া জেলার কামারবণীতে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করেন। উল্লেখ করার বিষয় যে এই বিভাগের প্রায় প্রত্যেকটি কর্মীই বন্যাত্রাণে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। এই বিভাগের অধীনস্থ অধিকার, ব্লক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের তরফ থেকে প্রথম কিস্তিতে ১০০১ টাকা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করা ছাড়াও বেশ কিছু জামা-কাপড় ইত্যাদি বিতরণের জন্য দেওয়া হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় পড়ার বই-পত্তর, বেতন ও পরীক্ষার ফি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি এলাকায় কমিউনিটি সেণ্টার নির্মাণ করার কাজ হাতে নেওয়ায় বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

(৭) শ্যামলী মণ্ডল

এই বিভাগের কর্মী কুমারী শ্যামলী মণ্ডল কয়েক মাস আগে নেফ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কুমারী মণ্ডল এই দপ্তরের বারুইপুর ব্লক যুব অফিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিগত রাজ্য যুব উৎসবের সময় সাময়িকভাবে তিনি যুব কল্যাণ অধিকার অফিসে আসেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ব্যবহার ও কর্মতৎপরতায় এই দপ্তরের সকলে মুগ্ধ হন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে কুমারী মণ্ডল পবর্তারোহণেও বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। যেদিন তিনি শেষ অফিস ছেড়ে যান সেদিনও তিনি আর পাঁচজনের মত স্বাভাবিক ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি পি জি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান। এই দুঃসংবাদ বিভাগের কর্মচারী ছাড়াও নানান পর্বতারোহণ সংস্থার কাছে বিশেষ শোকসংবাদ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

বর্তমান সরকারের ঘোষিত নীতি অনুসারে এই একনিষ্ঠ কর্মীর ভ্রাতা প্রভাত মণ্ডলকে পুরসুরা ব্লক যুব অফিসে সহায়ক হিসাবে সম্প্রতি নিয়োগ করা হয়। শ্রীমণ্ডল কিছুদিন আগে কাজে যোগদান করেছেন।

—অনন্তভূষণ নায়ক

চিত্রে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প

বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানায় গৌরাঙ্গ গোপাল দাসের মুদির দোকান।
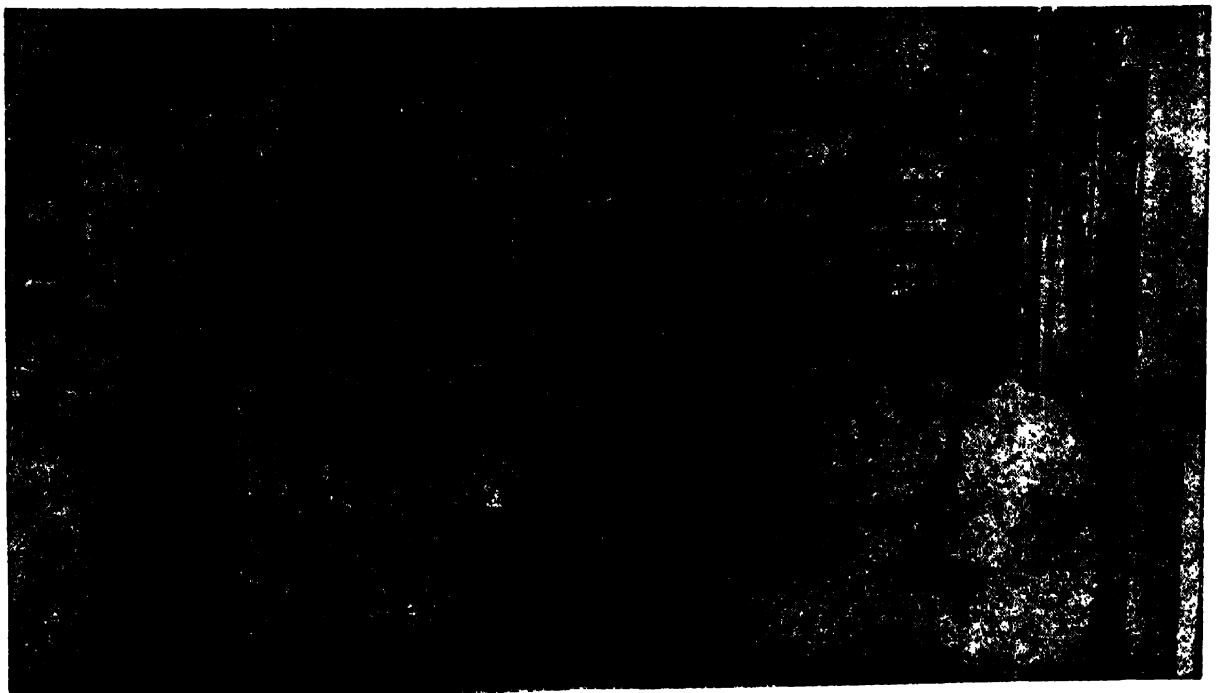
কাটা কাপড়ের দোকান

ক্রীড়া উন্নয়নে সরকারী সাহায্য-১৯৭৮

প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার খেলাধূলার উন্নতিকল্পে নানাভাবে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে সাহায্য দিয়ে থাকেন। চলতি বৎসরে এ পর্যন্ত সরকারী সাহায্যের ক্ষেত্র নিম্নরূপ।

(১) বিভিন্ন সংস্থাকে খেলাধূলার উন্নতিকল্পে সাহায্য হিসাবে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পোর্টস কাউন্সিলকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন।

(২) সন্তরণ প্রতিযোগিতাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য মুর্শিদাবাদ সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনকে ১২ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

(৩) বিগত দিনের দরিদ্র খেলোয়াড়দের অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের একটি পরিকল্পনা বর্তমান। এ বাবদ এ বৎসর প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে ১২জনকে দেওয়া হয়েছে।

(৪) দার্জিলিং-এর গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালন সংস্থাকে এই প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু আয়োজন করার জন্য ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

(৫) রাজ্য সরকার খেলাধূলার সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সদর কার্যালয়ে ও বড় বড় শহরে ২৭টি ষ্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ পর্যন্ত ৫টি এ ধরনের ষ্টেডিয়ামের কাজ শেষ হয়েছে। বাকীগুলির কাজ চলছে।

(৬) কোলকাতায় আগামী জানুয়ারী মাসে চতুর্থ মহিলা জাতীয় ক্রীড়া উৎসব শুরু হবে। এ বাবদ ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

(৭) ৭ই নভেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুদিরাম ক্রীড়া অনুশীলন কেন্দ্র সরকারীভাবে ক্রীড়াবিদ্‌দের জন্য খুলে দেন। সম্প্রতি এটি'র সংস্কার করা হয়। স্পোর্টস কাউন্সিল সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিদ্‌দের এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ হাতে নেবেন। এই কেন্দ্রে টেবল টেনিস, বাসকেট বল, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন ও জিমন্যাসটিকসে তালিম নেওয়া যাবে।

(৮) সল্ট লেক মহানগরীর ৩য় সেকটরে আন্তর্জাতিক মানের একটি ষ্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য শিক্ষা দফতরের (ক্রীড়া) একটি পরিকল্পনা আছে।

(৯) রবীন্দ্র সরোবরে আন্তর্জাতিক মানের একটি সুইমিং পুল নির্মাণের কাজ ঐ দফতর হাতে নিয়েছেন।

(১০) সারা বৎসরব্যাপী ক্রিকেট খেলা অনুশীলনের জন্য ১৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয়ে ইডেন গার্ডেনসে 'আচ্ছাদিত পীচ' নির্মাণের কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী ডিসেম্বর মাসে কাজ শেষ হয়ে যাবে।

(১১) ভারত সরকার পাতিয়ালার জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় ইউনিট কোলকাতায় স্থাপন করতে সম্মত হয়েছেন। রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়াম কমপ্লেকস-এ এই ইউনিট স্থাপিত হবে।

(১২) "Distressed and Needy Sportsmen and Women Welfare Fund" নামে একটি সাহায্য প্রকল্প থেকে West Bengal State Council of Sports 'এর মাধ্যমে দুঃস্থ ও দরিদ্র খেলোয়াড়দের বৃত্তি দেওয়া হবে। এ বাবদ ৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৬৭ টাকা দেওয়া হয়েছে।

সাহায্যের জন্য আবেদনকারী মহিলা/পুরুষ যে বৎসর বৃত্তি চাইবেন সেই বৎসরের ১লা জানুয়ারীতে অবশ্যই ২৫ বৎসর বয়সের কম হবেন।

(১৩) West Bengal Sports Council নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের কাজ চালাচ্ছেন। এ ব্যাপারে আবাসিক ক্রীড়াবিদ্‌রাও অংশ নিতে পারেন। এই শিবিরগুলির বেশ কিছু জেলা শহরে অনুষ্ঠিত হয় এবং উৎসাহী শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও উৎসাহজনক।

(১৪) সারা ভারত গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ রাজ্যের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা আশাব্যঞ্জক।

(১৫) এছাড়া West Bengal State Council বিকলাঙ্গদের খেলাধূলায় অংশগ্রহণের জন্য নানান সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

"বন্যা-কবলিত অসংখ্য মানুষকে রক্ষা করা ও তাঁদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, সকলেরই সক্রিয় উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। আসুন দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে দুর্গত মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমি সর্বসাধারণের কাছে, সর্বস্তরের মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

—মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে রক্ষা করতে হবে—

'জাতীয় সংহতির সমস্যা' আলোচনা চক্রে গীতা মুখার্জী আলোচনারত। মঞ্চে বাঁদিকে ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
মার্চ-এপ্রিল '৮০

প্রচ্ছদ/গৌতম ঘোষ দস্তিদার

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—[illegible]

সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারী মাসের ২৩শ থেকে ২৯শ তারিখ—এই সাতটা দিন উত্তরবাঙলার শিলিগুড়ি শহরে 'রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব-'৮০' হয়ে গেল। শুধু যুব-ছাত্র উৎসব বললে বোধহয় সবটা বলা হ'ল না বরং বলি—পশ্চিমবাঙলার হিমালয় থেকে সুন্দরবন অবধি নানা জাতি-ধর্ম-বর্ণ আর সম্প্রদায়ের মিলন মেলা, প্রাণে প্রাণ মেলাবার এক মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন পশ্চিমবাঙলার বর্তমান সরকার। উৎসব অনুষ্ঠানের গতানুগতিক গান-বাজনা এবং আর পাঁচটা আইটেমের মদির আবেশের সীমানা ছাড়িয়ে যে সুর এখানে ছড়িয়ে পড়েছে তার তাৎপর্য উপলব্ধির অনেক গভীরে গেঁথে গেছে। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের অ-সংগঠিত চেহারার পাশে পশ্চিমবাঙলার যুব-ছাত্র উৎসব সংগঠিত যুব-মানসের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভাস্বর উদাহরণ নিঃসন্দেহে। বেলচি-পরশ-বিঘা-পিপরার পৈশাচিক উন্মত্ততার পাশাপাশি মেদিনীপুর শহরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের প্রাণচাঞ্চল্য কিংবা দার্জিলিং শহরে নেপালী ভাষা-ভাষীদের মুখর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অথবা শিলিগুড়ি শহরের মূল অনুষ্ঠানে অসমীয়া শিল্পীদের প্রতি পশ্চিমবাঙলার মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা এসব-কিছুই প্রমাণ করেছে সুস্থ-সংগঠিত-স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে, হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং গণচেতনার সঠিক মূল্যায়নের দূরদৃষ্টিতে পশ্চিমবাঙলার মানুষ পরস্পরকে ঐক্যের উদাত্ত মঞ্চে সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আদর্শ হিসাবে খাড়া করতে পেরেছে। পশ্চিমবাঙলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অনেকবার বলেছেন, 'আমরাও দেশকে ভালবাসি, আমরাও ভারতবর্ষের ঐক্যে বিশ্বাস করি'—এসব কথার কথা নয়, এ যে বাঙলার মানুষের সত্যিকার আঁতের কথা তা এই উৎসব নিন্দুকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একই মঞ্চে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ অথচ চিন্তায় চেতনায় সাঁওতালী-নেপালী-বাঙালী—সবাই মিলে মিশে একাকার! এই তো ঐক্য, একেই বলে সমন্বয়। সমস্ত বিভেদের কালিমাকে ধুয়ে ফেলার এই তো প্রকৃত ঘাট।

উৎসবের ক'টা দিন সমগ্র শিলিগুড়ি শহর যেন মেতে উঠেছিল। বসন্তের প্রকৃতির রঙে রঙ মিলিয়ে দলে দলে মানুষ চলেছে এক মঞ্চ থেকে আর এক মঞ্চে। শিশু-যুবা-বৃদ্ধা সবাই। দর্শকদের আগ্রহ যেমন বিখ্যাত শিল্পীদের অনুষ্ঠানে তেমনি তারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে আদিবাসীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান অথবা নেপালী সংস্কৃতির কিছু উপকরণ। অসমীয়া যুবক-যুবতীদের অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁদের প্রাণের টান এত গভীর যে দর্শকদের অনুরোধে বার বার তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে হয়েছে। তাঁদের বিদায় মুহূর্তের অশ্রুঘন মুখগুলি ভুলবার নয়। সেমিনার, বিতর্ক অথবা প্রদর্শনীর মত সিরিয়াস বিষয়গুলিতেও মানুষের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। তাঁরা জানতে চেয়েছে। বুঝেছে। শিক্ষা নিয়েছে অনেক।

পাঁচটা মঞ্চে একযোগে অনুষ্ঠান চলেছে। বিশাল তার ব্যাপ্তি কিন্তু শৃঙ্খলা ছিল এদের অঙ্গের ভূষণ। শৃঙ্খলা ছাড়া কোন দিন কোন বড় কাজ কি কোথাও হয়েছে! কর্তৃপক্ষ এবং প্রস্তুতি কমিটি অসীম ধৈর্য্য আর আন্তরিকতা নিয়ে প্রতিটি বিষয়কে পরিচালনা করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক আর সাধারণ মানুষের বোঝাপড়ায় তা আরও সহজ হয়েছে, সাবলীল হয়েছে। এতসবের মধ্যেও খুঁত হয়ত অনেক ছিল, খুঁজলে ভুল যে পাওয়া যেত না এমন নয় কিন্তু সবকিছুকে ঢেকে দিতে ভাল কিছু করব এই সদিচ্ছা জয় করেছে জনগণকে। তাই তো সাধারণ মানুষ উৎসবকে নিজের করে নিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে প্রতিনিয়ত। রাজ্য সরকারের এও একটা বড় পাওনা বৈকি!

সংস্কৃতি বিনিময়ের এই তীর্থক্ষেত্র ক'টা দিন যে মুক্তির উচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠেছে, যে কোলাহলের ঢেউ তুলেছে যুব মনে তাকে লালন করে ছড়িয়ে দিতে হবে সারা ভারতবর্ষের বুকে, যেন সাম্রাজ্যবাদের চূড়াকে ভেঙে গুঁড়িয়ে তা মুক্তির নীলিমায় একাকার হ'তে পারে। সার্থক হয় বিশ্ব যুব উৎসবের আহ্বান। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্বের কথা মনে রেখে শিলিগুড়ি শহরের গলিতে-বস্তিতে-রাজপথে যে সুর শুনেছি তাতে গলা মিলিয়ে আমরাও বলি—যুব-ছাত্র উৎসব তুমি ফিরে এস। আবার। বার বার।

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি।

পত্রিকার নাম	—	যুবমানস
প্রকাশের সময় ব্যবধান	—	মাসিক
মুদ্রক		দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, ক'লকাতা-৯
প্রকাশক		শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় যুগ্ম-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার ৩২/১, বিবাদি বাগ (দক্ষিণ) ক'লকাতা-১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—		শ্রী কান্তি বিশ্বাস ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র মন্ত্রী যুবকল্যাণ ও স্বরাষ্ট্র (ছাড়পত্র) বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
সত্ত্বাধিকারী		পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আমি, শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, ঘোষণা করছি, উপরে দেওয়া তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ

শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়
১. ৪. ৮০

আমরা জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের সাহায্য নিয়ে চলি

গত ২০শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্য ১৯৮০-৮১ সালের ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি পেশ করেন। দাবির উপর বিভিন্ন দলের সদস্যরা বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। বিতর্কের শেষে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জ্যোতি বসু জবাবী ভাষণ দেন। ঐ ভাষণকে সম্পাদনা করে ছাপান হল।

—সম্পাদকমণ্ডলী যুবমানস

বিধানসভায় বিরোধী দলগুলি এখানে অনেক বক্তৃতা দিলেন। বললেন, পুলিস বাজেট খুব গুরুত্বপূর্ণ, আলোচনা করা প্রয়োজন। একথা বলে বক্তৃতা দিয়েই ইন্দিরা কংগ্রেস বিধানসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। পুলিস বাজেট সম্পর্কে আমরা কি বলি, অন্যরা কি বলেন, তা শোনবার দরকার নেই, বোঝবার দরকার নেই ওঁদের। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার দায়িত্বজ্ঞানহীন ইন্দিরা কংগ্রেস। ওঁরা গণ্ডগোল করছেন। পরিকল্পিতভাবে সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন আইন-শৃংখলা বিঘ্নিত করার জন্য। সারা ভারতের মানুষ, পশ্চিমবাংলার মানুষ ইন্দিরা কংগ্রেসীদের চেহারা দেখুন, বুঝুন ওদের আসল উদ্দেশ্য—এটাই আমরা চাই।

আমরা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকারে আছি। এই বাস্তব কথা আমরা সর্বত্র বলছি। এই বিধানসভায়ও বারবার বলেছি। কারণ, কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা ভুলে যেতে পারেন। সে জন্য একথা বার-বার বলার প্রয়োজন আছে। একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা একথা বলছি। আমরা দিল্লির ক্ষমতায় নেই। পশ্চিমবাংলায় আছি। সংবিধানের যে অবস্থা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক অন্যান্য সাধারণ যে অবস্থা আছে তা আমরা দেশের মানুষকে মনে করিয়ে দিতে চাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, আইনের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থাটা আমরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছি। বলছি, আমাদের দেশে ৩২ বছর ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছে। এই ব্যবস্থায় একটা রাজ্য সরকারে থেকে আমরা সব কিছুতে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারি না। সব কিছু পরিবর্তন করে দেব—এমন কথা আমরা কখনো বলিও নি। বললে, সেটা হতো অসত্য প্রচার। এটা আমরা করতে পারি না।

পুলিসী প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ৩২ বছর ধরে পুলিসকে ব্যবহার করা হয়েছে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ রক্ষার কাজে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। দুঃখের সংগে একথাও বলতে হচ্ছে, আমাদের দেশের লোকই পুলিসের কাজ করছে, গরিব ঘরের অনেক ছেলে কাজ করছে। মুষ্টিমেয়র স্বার্থরক্ষা, গণতন্ত্রের বিরোধিতা করার কাজে পুলিস ব্যবহার করার জন্য দায়ী তাঁরাই, যাঁরা এতদিন ধরে সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন বিশেষতঃ কেন্দ্রে এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায়। ওই সরকারের সংগে আমাদের লক্ষ্যের কোনো সামঞ্জস্য নেই, মিল নেই। শাসকশ্রেণী তাঁদের লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য সেইভাবে পুলিস ব্যবহার করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি? কিছু নেই। এসব বুঝেই আমরা সরকারে এসেছি। পশ্চিমবাংলার মানুষ এখানে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা সরকারে এসে জনসাধারণকে বলেছি, আপনারা অবস্থাটা বুঝুন। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, কোথায় কোথায় আমাদের বাধা আছে, বাধাগুলি কতটা অতিক্রম করতে পারি—এসব বুঝুন আপনারা। কিছুটা বাধা অতিক্রম করা যায়। সবটা যায় না। এ সব কথা আমরা জনসাধারণকে বলেছি। এখনই বলছি। সেই হিসেবে পুলিসকে বলেছি, একটা সুযোগ, বড় সুযোগ যখন এসেছে, বামফ্রন্ট সরকারের মত একটা সরকার এখানে পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই সুযোগ আপনারা নিন। আগেকার দিনে সরকার যা করেছেন, পুলিসকে দিয়ে করিয়েছেন, পুলিসের অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি সেই সব কাজে। মুখ বুজে তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। যার ফলে আজকে, স্বাধীনতার ৩২ বছর পরেও পুলিস মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, সমস্ত জায়গায়, সারা ভারতে বিচ্ছিন্ন। অথচ এটা বাঞ্ছনীয় নয়। একথা পুলিসকে বলেছি। পুলিসের সংগে নতুন করে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করছি। আমরা বিভিন্ন জায়গায়, জেলায় জেলায় কমিটি করেছি, কেন্দ্রে কমিটি করেছি। আমি তার সভাপতি। যতগুলি সংগঠন আছে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি করেছি। এ জিনিস করেছে ভারতবর্ষে আর কোন সরকার? কংগ্রেস, ইন্দিরা গান্ধী এতদিন ধরে তো রাজত্ব করেছেন। আমরা পুলিসের সংগে বসে আলোচনা করি। তাঁদের সংগঠন আছে। তাঁদের সংগে দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলি। দাবি-দাওয়া মানতে পারি না পারি, তাঁদের একথা বলি, এই কারণে মানতে পারছিনা। আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। এইভাবে আমরা চলবার চেষ্টা করছি। পুলিসকে বলেছি ব্যবহার পরিবর্তন করে এই সুযোগ আপনারাও গ্রহণ করুন। মানুষের সংগে ব্যবহার করতে আপনারা যেভাবে অভ্যস্ত হয়েছেন, বিগত দিনগুলির সরকার যে অভ্যাস করিয়েছেন আপনারা সেটা ভোলবার চেষ্টা করুন।

আমি জানি সময় লাগবে। কারণ, ভয়ংকর জিনিস এই অভ্যাস। আমি জানি এখানে যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ রয়েছে এ সবের মধ্যে অভ্যাস বদল হওয়া খুব কঠিন। কিন্তু তবুও তো কিছু করা যায়। কিছু হয়েছেও ইতিমধ্যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি দেখেছি, সরকার পক্ষের কেউ কেউ বলেছেনও, মানুষকে সাহায্য করার কাজে চরম বিপদের সময় পুলিস তো এগিয়ে গিয়েছেন। আমরা ক্ষমতায় আসার পর, গত দু-তিন বছরের মধ্যে আমরা দেখেছি কিছু পুলিস প্রাণও দিয়েছেন, আহত হয়েছেন হয়ত ডাকাত ধরতে গিয়ে, দুষ্কৃতকারী ধরতে গিয়ে, সমাজবিরোধীদের ধরতে গিয়ে। এক্ষেত্রে পুলিসকে আমরা প্রশংসা করেছি, তাঁদের পুরস্কৃতও করতে চাই আমরা। এইভাবে আমরা পুলিসকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। এটা শুধু সরকার আর কয়েকজন মন্ত্রী বক্তৃতা দিয়ে করে দিতে পারেন না, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে যেখানে পুলিসরা কাজ করেন সেখানে সেটা তাদের বুঝে নিতে হবে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিটা। কেউ কেউ হয়ত এই সুযোগটা গ্রহণ করছেন আবার কেউ কেউ হয়ত করছেন না। এখানে দু-একজন আমাকে বললেন যে, আপনি কি জানেন যে পুলিসের মধ্যে এরকম একটা ইস্তাহার বিলি করা হয়েছে? আমি তো জানি, আমার কাছেও আছে সেটা। আমরা তো একেবারে মূর্খ নই। আমাদের চোখ তো খোলাই আছে। অসংখ্য মানুষ আমাদের প্রতিদিন খবরাখবর দিচ্ছেন, আমরা জানি। সব হয়ত না জানতে পারি কিন্তু কিছু জানি যে কোথায় কি হচ্ছে। কিন্তু আমরা করবোটা কি? ইস্তাহারটা হিন্দিতে পড়ে শোনালেন (বিরোধী পক্ষের জনৈক সদস্য) দুজন পুলিস, আগে থেকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। তারা গুলি করে হত্যা করেছিল কাদের। সে সম্বন্ধে আমরা সরকারে আসার আগে থেকেই মামলা চলছিল। তারা সাজা পেলেন—যাবজ্জীবন—সেখানে অপরাধ হয়ে গেল আমাদের সরকারের! কিন্তু কি করবো আমরা? এই দুজন পুলিস বলছেন, আমরা তো বিগত সরকারের কথা শুনে মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছিলাম। কিন্তু আমি বলছি, সেখানে কোন উপায় নেই, আইনে যা আছে তাই হবে। আমরা কি করবো? এক্ষেত্রে আমরা কিছু করতে পারি না। এই যে বাইরে ইস্তাহার বিলি করা হচ্ছে এর মানে হচ্ছে সরকারের বিরোধিতা করো। এ সব তো আমরা জানি। দুবার আমরা সরকারে এসেছি, এ সব আমরা দেখেছি। এই বিধানসভার ভেতরেই আমরা আক্রমণ দেখেছি। কংগ্রেসীরা তার পেছনে ছিলেন যখন সেই আক্রমণ এখানে হয়েছে। তাদের আমরা স্তব্ধ করেছিলাম।

সারা ভারতবর্ষব্যাপী যা হয়েছে সেদিকে একবার আপনারা চেয়ে দেখুন। সেখানে পুলিসকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সি. আর. পি. নিয়ে গিয়ে, মিলিটারি নিয়ে গিয়ে। আমাদের এখানে এটা হয় নি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের পুলিসবাহিনীকে। তাঁদের সঙ্গে কি সব ব্যাপারে আমরা একমত? না, একমত নই। তথাপি ওই পথে তারা যান নি।

তারপর সি আই এস এফ-এর সঙ্গে গোলমাল হয়েছে জনতা পার্টির সরকার যখন ছিলেন। সেখানে গুলি গোলা চলেছে। আমাদের এখানে ওটা আমাদের আওতার মধ্যে নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দিল্লির সরকারের সঙ্গে কথা বলে একটা সমঝোতায় যাতে আসা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। এসব কি আর কোথাও হয়েছে? ভারতের আর কোথাও এসব হয় না। এখানে আমরা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলবার চেষ্টা করছি। কিছু সুফল আমরা পেয়েছি। এখনও অনেক কাজ আমাদের করতে হবে। এই সামাজিক অবস্থার মধ্যে, যেখানে নিদারুণ দারিদ্র্য আমাদের দেশে রয়েছে, প্রচণ্ড বেকারী সমস্যা আমাদের দেশে রয়েছে। এ সবই আমাদের চিন্তায় রাখতে হবে। তাছাড়া আমরা জানি কংগ্রেসীরা কয়েক হাজার সমাজবিরোধী তৈরি করে রেখে গিয়েছেন। তারা আমাদের ছেলেগুলিকে বিপথে পরিচালিত করেছেন নিজেরা সরকারে থাকবার জন্য। তাদের হাতে বোমা, পিস্তল তুলে দিয়েছেন। মানুষকে হত্যা করতে শিখিয়েছেন, নির্বাচন প্রহসনে পরিণত করতে শিখিয়েছেন। আমাদের ঘরের ছেলেগুলিকে তারা সেই পথে টেনে নিয়ে গিয়েছেন যাতে তারা পরীক্ষায় টোকাটুকি করে। কংগ্রেসী মন্ত্রী নেতারা তাদের ডেকে এই সব ব্যবস্থা করিয়েছেন যাতে তারা সমাজবিরোধীতে পরিণত হয়। তারা এটা করেছিলেন তার কারণ তাহলে যুব সমাজ আর দেশের জন্য, দশের জন্য সমাজ পরিবর্তনের জন্য লড়াই করতে পারবে না। তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তারা সফল হতে পারেন নি। চার পাঁচটি নির্বাচনে কত বড় জয় আমাদের এনে দিয়েছেন সেটা আপনারা দেখেছেন। সেজন্য মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁদের উপরই আমরা নির্ভর করি। আমরা বারে বারে বলেছি, গোপনে অন্য কথা বলি না, কংগ্রেসীদের মতন আমরা ভণ্ড নই। পুলিসকে খোলাখুলি বলেছি আপনারা নিরপেক্ষ থাকবেন আমাদের সরকারী দলের নাম করে যদি কেউ সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। খুন জখম রাহাজানী বা অন্য কিছু করে তা হলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

এখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, আপনাদের লোকেরা ধরা পড়ে? একবার এই বিধানসভায় আমি হিসেব দিয়েছিলাম। আবার আপনারা প্রশ্ন করুন—আমি জবাব দিয়ে দেব কত লোক গ্রেপ্তার হয়েছে। আমাদের ১১০০ ছেলে খুন হয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে এবং রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সমস্ত ব্যবস্থা দিল্লি থেকে করেছেন। ক'টা মামলা হয়েছে? ক'জন সাজা

পেয়েছে? ভারতের আর কোথায় এত হত্যাকাণ্ড হয়েছে? আজকে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে পুলিস নিরপেক্ষ কি না। তবে এটা ঠিক পুলিসের মধ্যে আমি দেখেছি, যে ভাবে এখানে একটা অরাজক অবস্থার মধ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসীরা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন—ইন্দিরা কংগ্রেসের ছেলেদের দেখে পুলিস অনেক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছেন। নিরপেক্ষ বলতে কি বোঝাচ্ছেন? নিরপেক্ষ বলতে যারা আক্রমণ করে তাদের পক্ষে দাঁড়ানো বোঝায়, না যারা আক্রান্ত হয় তাদের উপেক্ষা করা? এই রকম উদাহরণ আমার কাছে আছে। তা তো চলবে না। পুলিসকেও একটু বুঝতে হবে। মাথা ঘামাতে হবে। আক্রমণকারীকেই গ্রেপ্তার করতে হবে। যার খুশি নাম দিয়ে দিলাম যা খুশি হয় হবে? যে আক্রান্ত হলো জেনেশুনে সে গ্রেপ্তার হবে? একে নিরপেক্ষ বলে না। কিন্তু আমি জানি এই পরিবর্তিত অবস্থা হবার পরে, স্বৈরাচারী শক্তি দিল্লিতে জেতবার পরে এই রকম সব ঘটনা ইতিমধ্যেই আমার কাছে এসেছে। এটাকে আমি অন্ততঃ নিরপেক্ষ বলতে রাজী নই। কাজেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যদি হিসাব আপনারা চান আমি দিয়ে দেব। জমি নিয়ে, এটা নিয়ে, ওটা নিয়ে, পারিবারিক কলহ, গ্রামের মধ্যে কোন কলহ বিবাদ ইত্যাদি এই সব নিয়ে যে মামলা হয়েছে সেখানে গ্রেপ্তার হয়েছে সেখানে যে কোন পক্ষই আছে, যারাই এর মধ্যে লিপ্ত আছে, তারা গ্রেপ্তার হয়েছে। কেউ আমাকে বলতে পারবেন, আপনারা নেই? সি পি আই (এম)-এর তথাকথিত সমর্থক, অন্য কোন বামপন্থী দলের সমর্থক নেই? এটা এই রাজ্যে প্রমাণ করা যাবে না, অন্য রাজ্যে খুঁজে বেড়ান নিরপেক্ষ কেউ আছে কি না। আমাদের এখানে এই সব চলতে পারে না। আমরা মন্ত্রী হবার জন্য সরকারে আসি নি, সমাজ পরিবর্তনের জন্য।

আমাদের লোক যদি কোন ভুল করে, অন্যায় করে আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের ডেকে বলি, ভুল বা অন্যায়টা বুঝিয়ে বলি। যদি কেউ না বোঝেন তাহলে, আমাদের পার্টির সে ক্ষমতা আছে, বলে দিই বামপন্থীতে তাদের কোন স্থান নেই। তারা বেরিয়ে যাবেন, কংগ্রেসে যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এই সব থাকতে পারে না। এখানে আমি আপনাদের বলতে চাই, একটি কথা আবার শুনলাম, ইন্দিরা কংগ্রেসের ভোলানাথ সেন বলে গেলেন, উনি বলেই চলে গেলেন, হয়ত ওঁদের সব ধরা পড়ে গেছে। বললেন, আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে আমরা জনগণের সাহায্য নেওয়ার কথা বলেছি। তা ওঁরা 'জনগণ' কথাটা শুনলেই ক্ষেপে যাচ্ছেন। উনি বললেন, গ্রামে আপনারা আছেন, শহরে আপনারা আছেন, আপনাদের হাতে পঞ্চায়েত আছে। কিন্তু পঞ্চায়েত তো কংগ্রেসের হাতেও আছে। আমরা ওইভাবে চলি না। আমরা জনগণের সাহায্য নিয়ে চলি। অতীতের পঞ্চায়েত, পৌরসভা এই সব কথা বলি না। আমরা জনগণের প্রতিনিধি। আমরা বলেছি, যদি কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে গণ্ডগোল বাধে তাহলে সেখানে যে দলের নেতাই থাকুন বা যারাই থাকুক তাঁদের সংগে বসে আলোচনা কর—এতে অসুবিধার কি আছে? আমরা বরাবর এই নীতি নিয়ে চলেছি। কিন্তু উনি বললেন, জনগণের সংগে সহযোগিতা কেন হবে—পুলিস গুলি চালাবে। লাঠি চালাবে, যা খুশি তাই করবে। কিন্তু আমরা ভোলা সেনদের এই সব কথা মানছি না। ওঁদের সরকার যেখানে আছে তারা এই সব করবেন। আমরা এই সব মানতে রাজি নই, পুলিস বুঝেছেন আমাদের এই মনোভাব। তাঁরা অনেক সময় অসুবিধায় পড়ে যান। গোলমালে পড়ে যান, নানারকম অভিযোগ হয় পরস্পর বিরোধী। বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কৃষক সমিতির আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলন ইত্যাদি নানারকম আন্দোলন যখন হয় তখন এই সব হয়। কিন্তু সাধারণ অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে কারো সংগে আলোচনা করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এক্ষেত্রে কারো সংগে পরামর্শ করবো না, যোগাযোগ করবো না।

কেউ বলছেন, কংগ্রেস সরকারের সংগে আপনাদের তফাৎ কি—ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে আপনি বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ৫ কোটি টাকা বেড়েছিল বলে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এখন কি হচ্ছে? এখন এটুকু যদি বুঝতে না পারেন তা হলে আপনাদের বোঝাব কি করে? পুলিসের বাড়ি তৈরির জন্য খরচ করছেন বলে, মাইনে বাড়ছে বলে বাধা দিতাম? তা তো দিতাম না। আমরা বলেছি, এই পুলিসকে আপনারা ব্যবহার করছেন গণতন্ত্র হত্যা করার জন্য। জনগণের বিরুদ্ধে আপনারা কাজ করাচ্ছেন। পক্ষপাতিত্বের কাজ আপনারা করছেন, এই জন্য বাধা দিতাম।

ভোলাবাবু বলে চলে গেলেন। এই তো কোন খাতে কিছু বাড়লো। সব কমে গেল। তিনি বাজেট বইটা পড়েন নি। এমন কি আমার বক্তৃতাটাও পড়েন নি। দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক হলে যা হয়। আমার সব বলার সময় নেই। ১৯৬৬-৬৭ সালে শিক্ষাখাতে আমরা ৮০ কোটি টাকা খরচ করেছি আর এবারে সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪০ কোটি টাকা। অন্য খাতগুলি দেখুন, গঠনমূলক যে সমস্ত খাত আছে, কোথায় আমরা কত খরচ করেছি। এগুলি দেখলেই বুঝতে পারবেন, বাজেট ব্যয়ের মধ্যে গ্রামের জন্য আমরা কত ব্যয় করছি। এটা তো ওঁর দেখবার দরকার নেই। তিনি এই সবের দিকে না গিয়ে একটা হুমকি দিয়ে চলে গেলেন। ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যাবেন কি না জানি না। সংবিধানের ৩৬৫ নং ধারার কথা বলে চলে গেলেন। প্রেসিডেন্ট রুল নাকি এখানে করা হবে আমি যা বুঝলাম ওঁর কথায়। এর মানে কি হবে? কেন্দ্র যদি আমাকে বলে এই জনতা পার্টিতে যাঁরা সব রসে

আছেন, তাঁদের গলা কেটে দাও—তাহলে আমাকে কাটতে হবে? আমি বলেছি প্রণববাবুকে (প্রণব মুখার্জি, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী) আপনারা বিনা বিচারে আটক করতে চান করুন আপনাদের যেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজত্ব আছে। আপনারা ন'টা রাজ্য সরকার ভেঙে নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। আসাম আছে। আরও তো আপনাদের অনেক জায়গা আছে। আপনারা ক'জনকে বিনা বিচারে আটক করেছেন, বলুন। আপনারা গ্রেপ্তার করেন নি কারণ নির্বাচন আছে। কিন্তু আমরা তা করবো না। আপনাদের যদি সাহস থাকে আটকান। আপনারা বলুন আমাদের এখানে কাকে কাকে আটকাতে হবে। তাহলে অন্ততঃ আমরা বুঝতে পারি যে কারা কারা আপনাদের টাকা দেয়নি আমি সে লিস্ট পাই নি। বিনা বিচারে আটকের এই অসভ্য বর্বর আইনকে আমরা ব্যবহার করি না। এতে অসুবিধার কি আছে? সব ব্ল্যাক মারকেটিয়ার, জ্যোতি বসু থেকে আরম্ভ করে সবাইকে গ্রেফতার করে দাও। এই কথা আমাদের শুনতে হবে? এইসব কথা তো আমরা ৩৩ বছর ধরে শুনছি। এই সভায় বসে শুনলাম সিকিওরিটি অ্যাক্ট সম্বন্ধে। তখন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি বিরোধিতা করেছিলাম। জানি না কত সংশোধনী (অ্যামেন্ডমেন্ট) এনেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, এতো আপনাদের বিরুদ্ধে নয়। কেন আপনারা নিজের গায়ে মাখছেন এইসব সমাজ-বিরোধীদের জন্য। কিন্তু সেদিন আমাকে ভোর ৪টার সময় গড়িয়াহাটা রুট ধরে বাড়ি থেকে জীপ-এ করে নিয়ে গিয়েছিল। তখন দেখি, ওই ভদ্রলোক (প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী) রাস্তায় পাইচারী করছেন, মরনিং ওয়াক করতে বেরিয়েছেন। আমি তো তখন জীপ থেকে বলতে পারি না, কি মহাশয়, এ কি হোল, কি প্রতিশ্রুতি দিলেন আর কি হল? যা হোক আমি সে সব কথার মধ্যে যাচ্ছি না।

কে একজন বললেন যে, এখানে নাকি রেকর্ড খুন হচ্ছে। এখানে সাট্টার সব চেয়ে বেশি রেকর্ড। উনি নাকি পি ডবলিউ মিনিস্টারের কাছে গিয়েছিলেন। সাড়ে তিনটার সময় তিনজন অফিসারকে ফোন করেছিলেন, একজনকেও পাননি—এও রেকর্ড। এই রকম অনেক কিছু রেকর্ড বলে গেলেন। উনি কার নাম করলেন, উনি নাকি সাট্টাওয়ালাকে চেনেন এবং উনি পুলিস অফিসারের কথা বললেন। আমি জানি, দেখতে হবে এই সব জিনিস। এইরকমভাবে হচ্ছে আমি জানি না। আমি এখানে দুটি উদাহরণ দিচ্ছি:

১৯৭৮	ডাকাতি	ছিনতাই	হত্যাকাণ্ড
কলকাতা	৫২	১৭০	৯৭
দিল্লি	৫৩	৫৯৭	১৫৭
বম্বে	২২	৩১৪	১৯১
ব্যাঙ্গালোর	৪৭	৪১৬	৪৯

১৯৭৯ সালে ডাকাতি কলকাতায় ৩৬, দিল্লিতে ৬৯, বম্বে ৪১। ছিনতাই কলকাতায় ১৬০, দিল্লিতে ৬২৯, বম্বে ৩৪৫। হত্যাকাণ্ড কলকাতায় ৯৩, দিল্লিতে ১৯০ এবং বম্বে ১৫৭। এই রকম আরো অনেক রেকর্ড আমার কাছে আছে। এটা একটা অজুহাত আমাদেরই বা ৯৩ হবে কেন, ২৩-এ নেমে যাওয়া উচিত ছিল। আমি এটা বারে বারে স্বীকার করেছি। কিন্তু এখানে এমনভাবে দেখান হচ্ছে যেন আইন-শৃংখলা আর নেই। যাঁরা ৩৬৫-র কথা বলছেন ওখানে গিয়ে ৩৬৫ অ্যাপলাই (প্রয়োগ) করুন। ওখানে ইন্দিরা-কংগ্রেস রাজত্ব করছেন।

উত্তর প্রদেশে কি হবে জিজ্ঞাসা করি? এগুলিতো সাধারণ ডাকাতি নয়। আমরা দেখেছি, হরিজনদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, উপজাতিদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। তাঁদের নারীদের নির্যাতন করা হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। এই সব লোকদের কাছে আমাদের শুনতে হয় আইন-শৃংখলার কথা। এটা ঠিক, আমাদের এখানে যা ডাকাতি হচ্ছে, তার হিসেব দিলাম। অনেক জায়গায় প্রিভেন্ট (বন্ধ) করা যাচ্ছে না কিন্তু এইটুকু সান্ত্বনা আছে যে ডিটেকশন'টা আগের থেকে অনেক ভাল হচ্ছে। আমার অনেক হিসেব আছে, সেগুলি দেবার দরকার নেই। সেন্ট্রালব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন, দিল্লি থেকে তাঁরা আমাকে লিখেছেন ২. ৫. ৭৯ তারিখে। ডি. সি. ডি. ডি. কে লিখেছেন, Heartiest Congratulations on the Excellent work done by you and your colleagues in the detection of sensational robbery in the State Bank of Hyderabad, Maharshi Debendra Road, on April 4, 1979. Indeed the recovery of a large amount within so short a time must be a record in the History of criminal investigation of this country. (মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে, ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল হায়দ্রাবাদ স্টেট ব্যাঙ্কের চাঞ্চল্যকর ডাকাতি ধরার জন্য আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এত বেশি টাকা এত অল্প সময়ে উদ্ধার করেছেন। এটা এদেশের অপরাধ কার্যে একটা নজির হয়ে থাকবে)। এখন এটা যাঁরা করেছেন তাঁদের আমাদের অভিনন্দন জানাতে হবে। যেগুলি হয়নি সেটা হওয়া উচিত যা বিশেষ করে প্রিভেনশান—যেগুলি আরো ঠিক মত ইনভেস্টিগেশন হয়। হয়ত সেই ডাকাতগুলির এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে তারা ওই অপরাধমূলক কাজ করবে না। কাজেই সে দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এখানে অনেক সদস্য যে সব কথা বলেছেন, এগুলি কাট মোশানে থাকতো তাহলে একটু দেখে আসতে পারতাম। কিন্তু তা নেই। হঠাৎ টাইপ রাইটারের কাগজ নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। ভোলা সেন

নেই। তাঁর উত্তর দেবারও প্রয়োজন নেই। তিনি চলে গেছেন। তাঁর সৎ সাহসটুকু নেই যে আমার জবাবটা শুনে যাবেন উনি যা বলেছেন, বেশিরভাগ অসত্য বলে গেলেন। আর বাজেটও পড়েন না, আমার বক্তৃতা পড়েন না। ঠিক করে এসেছিলেন এই সব বলবেন। গণ্ডগোল সৃষ্টি করবেন, করে চলেগেলেন। এখানে কথা উঠেছে যে ব্যক্তিগতভাবে কে স্টুডেন্ট ফেডারেশনের মেম্বার ছিল। উনি জানলেন কি করে স্টুডেন্ট ফেডারেশনের মেম্বার ছিল? যা খুশি তাই বললেই হল। স্টুডেন্ট ফেডারেশনের মেম্বার হওয়া কোন আপত্তি জনক কথা নয়। কিন্তু উনি কি করে জানলেন সেটা আমি জিজ্ঞাসা করি কবে ছিল, কে ছিল? জনপ্রতিনিধি হয়ে সব আজগুবি বললেন, ওরা সব ঠিক করে ফেলেছেন যে কে কোথায় পোস্টেড হবে। আপনারা জানেন যে, একটা গোলমাল হয়েছে আমাদের ক্যালকাটা পুলিসের ব্যাপারে। কিন্তু এতে এত ভীত সন্ত্রস্ত আপনারা হবেন না। আমরাও জনগণের প্রতিনিধি। সংকটের কথা মনে করে এত ঘাবড়ে যাবার কি আছে? আমরা দেখছি, সমস্ত আমাদের হাতে আছে, জনগণ আমাদের পাশে আছেন। যদি তারা কিছু অন্যায় করে থাকেন, কিছু করে থাকলে, যতবড় অফিসারই হোন, আপনারা দেখেছেন আগেও আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। কিন্তু সেটা বিরোধীদলের সঙ্গে পরামর্শ করে করবো না। আমরা নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, যেভাবে চললে জনগণের উপকার হবে সেই ভাবে আমরা ব্যবস্থা নেব, কাজেই সেদিকে যেতে চাইনা। আর যেহেতু নতুন কোন কথা নেই, বারে বারে ওই মরিচঝাঁপির কথা, কাশীপুরের কথা, বর্ধমানের কথা উঠেছে। বর্ধমানে উনি (ভোলা সেন) নিজে গিয়েছিলেন। ভোলাবাবু এটাতো বললেন না, বললে ক্ষতি কি হত যে ওরা প্রথম পুলিসটাকে মেরে ফেললেন। তখন পুলিসের হাতে আর্মস (অস্ত্র-শস্ত্র) ছিলনা—ওদের ট্রেনে তুলেদিচ্ছিল দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাবার জন্য। উনি কতগুলি হাফ ট্রুথ (অর্ধসত্য) এবং কতগুলি অসত্য কথা বলে গেলেন। এঁরা মরিচঝাঁপিতে লোকেদের উস্‌কাবার চেষ্টা করে ছিলেন ঃ কিন্তু উস্‌কানো যায় নি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে এক লক্ষ কয়েক হাজার মানুষকে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওঁরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ ওঁদের মানছে না। কাজেই বাইরে থেকে মানুষ এনে—নারী পুরুষ শিশুদের নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছিলেন। এটাই কি তাঁদের দায়িত্ব।

তারপর অনেক স্পেসিফিক (নির্দিষ্ট) কেসের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে সমস্ত কিছু না পেলে আমি কিছুই বলতে পারব না। সেগুলি লিখিত ভাবে দিলে নিশ্চয়ই দেখব কি হয়েছে, না হয়েছে। সব নতুন ভাবে আবার হাওড়ার কথা এখানে তোলা হয়েছে। সেদিন হাওড়ার কথার উত্তর হয়ে গেছে। সেখানে মামলা হয়েছে। কাজেই মামলা যখন চলছে, ইনভেসটিগেশন (তদন্ত) যখন হচ্ছে তখন আমি আগে থেকে কি করে বলে দেব যে, সব প্রমাণ হয়ে গেছে? অথচ একজন আইনজীবী হয়ে ভোলাবাবু ওই সব কথা এখানে বলে বেরিয়ে গেলেন। এই সব দায়িত্বজ্ঞানহীন কথাবার্তা শুনলে আমাদের একটু আশংকা হয়। আগে প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের কাছে দিস্তা দিস্তা কাগজে চিঠি যেত। সেগুলি উনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমি সেগুলি দেখতাম। এখন সব দিল্লি চলে যাচ্ছে এবং সেসব সম্বন্ধে একবার জৈল সিং লিখছেন, একবার গান্ধী লিখছেন। আমি অবশ্য সেসবের জবাব দিচ্ছি। যে সব চিঠি আসছে এবং তার জবাব দিচ্ছি তা সব আমি পশ্চিমবাংলার জনগণকে ভারতবর্ষের জনগণকে দিয়ে দেব তাঁরা বুঝে নেবেন।

তবে ওই একটা ঘটনার কথা আমি বলি। বর্ধমানের যামুরিয়া না কোন্ জায়গার ঘটনা। সে সম্বন্ধে ইন্দিরা কংগ্রেসের কে একজন এম. পি. ইন্দিরা গান্ধীকে গিয়ে বলেছেন যে, ওখানে এক্স (প্রাক্তন) এম. এল. এ. এবং কংগ্রেসী লিডারের একমাত্র ছেলে খুন হয়ে গেছে, আর খুন যখন হয়েছে তখন নিশ্চয় সি পি আই (এম) করেছে। অথচ সেই কংগ্রেস লীডারের (নেতার) স্ত্রী কেঁদে কেটে আমার কাছে চিঠি লিখেছেন, আমরা জানি কারা খুন করেছে এবং আমরা ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক, আমাদের বিপক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসেরই যারা আছে তারা খুন করেছে। যদিও সেই চিঠি অনুযায়ী আমি কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করি নি। কারণ, ইনভেসটিগেশন (তদন্ত) চলছে, আমরা চাই ইনভেসটিগেশন হোক। কিন্তু আমি তাঁদের বলব যে, ওই চিঠি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠান।

আমাদের পক্ষের লোকদের যেখানে মারা হচ্ছে, সেখানে কি হচ্ছে? আমি তাই সমস্ত লিস্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভোলাবাবুরা আবার বিপদে পড়লেই বলছেন, আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি করবে? এটা স্টেট সাবজেক্ট, রাজ্যের বিষয়। কাজেই ৩৬৫ ধারা অনুযায়ী এই সরকারকে বিতাড়িত কর।

যাই হোক, ভোলাবাবু নতুন ইন্দিরা মাহাত্ম্য গাইছেন। ইলেকশনের আগে উনি অন্য একটা কংগ্রেসে ছিলেন। এখন ইন্দিরা কংগ্রেসে চলে গেছেন। এইসব লোকের কি কোনো মূল্য আছে, চরিত্র আছে? নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য দল বদল করে চলে গেলেন, আর তাঁর কাছ থেকে এসব বক্তব্য শুনতে হচ্ছে।

জয়নাল আবেদিন (কংগ্রেস-আ) অনেক কথা বলেছেন। আমি সব কথার উত্তর দিতে পারব না। তবে আমি তাঁকে বলতে চাই যে, উনি অনেক ঘটনার কথার মধ্যে আবার বললেন, পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। কিসের

পক্ষপাতিত্ব? আপনি তো আমার কাছে হিসাব চাইতে পারতেন। একটা কোশ্চেন (প্রশ্ন) করুন, হিসাব চান যে, কোন দলের তথাকথিত ক'জন ধরা পড়েছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করুন। আমি আবার বলছি, এভাবে সরকার চলে না। জয়নাল আবেদিন সাহেব আপনি নিজে কি করেছেন? আমি জানি সে সব নিশ্চয়ই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। এখন কোন কংগ্রেসে আছেন তাই বোঝা মুস্কিল। আপনি এখানে হঠাৎ ওই কোথায় মসজিদ দখল হয়ে গেছে ইত্যাদি বললেন। এসব ভয়ংকর কথা। মুসলমান ভাইবোনদের ধর্মীয় স্থান নিয়ে এইভাবে এখানে আলোচনা করা কি উচিত? এটাকে কি রাজনৈতিক মূলধন করা উচিত? আপনি তো আসতে পারতেন আমার কাছে। কত ব্যাপার নিয়েই তো আসেন। আপনার পরিবারের লোকেরা আমার কাছে চিঠি লিখেছে.........আপনার বাড়ির লোকেরা আমার কাছে আসছেন। তা কি আপনি জানেন? আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাই নি। এই সব ব্যাপারে বিশেষ করে জমির ব্যাপারে—জমিদারদের ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারি নি। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে, আমরা বিচার করবার চেষ্টা করছি, সুবিচার করতে যতটুকু পারি ততটুকু চেষ্টা করছি। ভুল ত্রুটি হয়তো কিছু হতে পারে কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে কংগ্রেসীরা গত ৩০ বছর ধরে সেই জিনিস করেছেন। আপনাদের কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো উচিত ছিল—মানুষ আপনাদের সাজা দিয়েছেন, এখন অন্য জায়গায় বাকি আছে।

আপনারা কি ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা এখানে ২-৪ জন মন্ত্রী হবার জন্য রাজনীতি করছিনা—আপনাদের মতন ঘর-বাড়ি তৈরি করার জন্য রাজনীতি করছি না। আমরা কমিউনিস্ট। আমরা বামপন্থী। আমরা যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই সেই লক্ষ্যে এখনও পৌঁছাতে পারি নি। আমরা সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে কাজ করছি। সত্যিকারের যাঁরা কৃষক, যাঁরা মজুর, যাঁরা মধ্যবিত্ত, যাঁরা ছাত্র-যুব-মহিলা তাঁদের যে সংগঠন আছে সেই সংগঠন আমরা গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। এ ছাড়া সমাজ বিপ্লব ঘটানো যায় না। এ ছাড়া আমূল পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা নেই। কাজেই এইসব ৩৬৫ ধারা দেখিয়ে কোন লাভ নেই। আমরা একটা লোকসভার, একটা বিধানসভার, পঞ্চায়েত এবং আবার লোকসভার নির্বাচনে জিতেছি। সেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের ঝড় উঠেছে বলে আমরা শুনেছিলাম, সেই ঝড় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবাংলার আকাশে। আর একবার ১৯৭১ সালে হয়েছিল—ইন্দিরা কংগ্রেস যেহেতু বাংলাদেশের লড়াইয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন সেইজন্য গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী জয়জয়কার শুনেছিলাম কিন্তু পশ্চিমবাংলার আকাশে কোন মেঘ দেখা যায়নি, পশ্চিমবাংলার আকাশে সেই ঝড় ওঠেনি। সেবারেও কংগ্রেসকে পরাজিত করেছিলাম যদিও বামপন্থী দলের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তথাপি কংগ্রেসীদের আমরা এই পশ্চিমবাংলায় পরাজিত করেছিলাম। ১৯৭২ সালে পরাজিত করতে পারি নি এই জন্যে যে. আপনারা, কংগ্রেসীরা চুরি জোচ্চুরি করে নির্বাচন করেছিলেন, বেলা ১১টার সময়ে নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর এবারে রাত ৯টা পর্যন্ত নির্বাচন হয়েছিল, যারা ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকেছিলেন তাঁরা রাত্রি আটটা ন'টা পর্যন্ত ভোট দিয়েছেন।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, গৌহাটী শাখার অভিনন্দন পত্র

[২৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কাছে অনুরোধ জানাই। আমরা চাই আমাদের আসাম ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার রক্তপাত থেকে মুক্ত হোক; ভাষা-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মেহনতী জনগণ আর ছাত্র-যুবকের ঐক্য অটুট থাকুক, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অটুট থাকুক, তা সুদৃঢ় হোক।

আজকের এই মিলন উৎসবে সমবেত বন্ধুদের সামনে আসামের সমগ্র সংগ্রামী জনতার মুখপত্র হয়ে একটা অনুরোধ রাখতে চাইছি: আসামে আজ গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা, মূল্যবোধ আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারের বিরুদ্ধে এক পরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। চক্রান্ত চলছে ভারতের সংগ্রামী জনগণের সংগ্রামী ঐক্যের বিরুদ্ধে। এই চক্রান্তকে ধ্বংস করতে আসামের গণতন্ত্রকামী, মানবতাবাদী আর প্রগতিবাদী শক্তিগুলি যে মরণপণ যুদ্ধ করছেন, সেই যুদ্ধে আপনারাও সামিল হোন, ঐক্য আর সম্প্রীতি সুদৃঢ় করতে এগিয়ে আসুন আর অসমীয়া মানুষের ন্যায়-সঙ্গত ভয় আর সন্দেহ যাতে ঐক্য বিরোধী আর সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলো ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য অসমীয়া জনসাধারণের চিন্তা চেতনা বৃদ্ধির জন্য সহায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। প্রকৃত সাথী সুলভ মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটুক সেই কামনা নিয়ে—

ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষক ঐক্য জিন্দাবাদ
গণসংস্কৃতি—জিন্দাবাদ
অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিতে শত পুষ্প বিকশিত হোক

গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে ২৩-২৯শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব '৭৯-'৮০ উদ্বোধন করে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী

কমরেডস্,

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে, শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে পশ্চিমবাংলার যুবসমাজ আজ এই সম্মেলনে সমবেত। আমি তাদের প্রতি জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

সাম্রাজ্যবাদের সে যৌবন আজ আর নাই, যখন তারা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, কোন পশ্চাদপদ দেশকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রাস করে, পৃথিবীকে নূতনভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে পারতো। পৃথিবীর একটি বড় অংশে ধনতন্ত্রের অবসানের মধ্য দিয়ে, শোষণ-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং একটি সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে ওঠার ফলে, পৃথিবীর শক্তিসমূহের ভারসাম্য ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে ঝুঁকেছে। তাই, পিছু হটতে হচ্ছে,

যুব উৎসবের উদ্বোধন করছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী

সাম্রাজ্যবাদকে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের প্রধান পাণ্ডা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। প্রতিনিয়ত পাল্টাতে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রাম কৌশলও।

প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মলাভের শুরু থেকেই, সাম্রাজ্যবাদীদের রণকৌশল ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'ঘেরাও করে কোনঠাসা করা', একঘরে করা, সামরিক হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্য দিয়ে তাকে গলাটিপে হত্যা করে, পৃথিবীকে কমিউনিজম-এর বিপদ থেকে মুক্ত করা। তাই, সেদিন যুদ্ধের উত্তেজনা ছিল, বার্লিনকে কেন্দ্র করে, প্রধানতঃ ইয়োরোপে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে চীন ধনতান্ত্রিক শিবির থেকে বেরা হয়ে আসার পর থেকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রণকৌশল ছিল, কমিউনিজমের প্রসার রুখবার জন্যে, তাকে 'গণ্ডীবদ্ধ' করে রাখার জন্য, মহাচীনের চারপাশে সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি তৈরী করা, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চালিয়েছে ভিয়েৎনাম-লাওস-কাম্বোডিয়াতে, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ করেছে—সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উপর।

আজ কিন্তু ইয়োরোপে সে উত্তেজনা নাই। ওয়ারসো সম্মেলনে পোলাণ্ডের সীমানা স্বীকৃত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্র সেখানে ব্যর্থ। উত্তেজনা কমেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও। ভিয়েৎনামের দেশভক্ত বীর জনগণ—পর পর তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাস্ত করে, নিজেদের দেশকেই শুধু মুক্ত করেন নি, সমগ্র অঞ্চল থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের পিছু হটতে বাধ্য করেছেন। মুক্ত হয়েছে লাওস, মুক্ত হয়েছে কাম্বোডিয়া।

সাম্রাজ্যবাদীদের এখন শেষ ঘাঁটি হয়ে উঠেছে—পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা, আমাদের এই উপমহাদেশ। এই অঞ্চলের সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমবেত হচ্ছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতাকাতলে, কিন্তু তবু দমন করা যাচ্ছেনা—প্যালেষ্টাইনের মুক্তিকামী সংগ্রামীদের। ইজরাইলের যুদ্ধ-ঘাঁটি, মিশরের বিশ্বাস ঘাতকদের কোন কাজে লাগ্‌ছে না।

তেমনি ধ্বস নামছে ইরানে। ইরানের ফ্যাসিষ্ট শাহ—বিতাড়িত হবার পর থেকে, তৈল অঞ্চলের এই মার্কিন ঘাঁটিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট আজ আর নির্ভরযোগ্য নয়। গ্রীস ও তুরস্কের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে।

আফ্রিকার দেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্ব-ব্যাপী মৈত্রী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের পিছু হটা যেমন লক্ষ্যণীয়, তেমনি উল্লেখযোগ্য তাদের টিকে থাকার জন্য নানা-ধরনের বিভেদ ও উস্কানীমূলক ষড়যন্ত্র।

ঠিক যে সময়ে ধনতান্ত্রিক সংকট আরও তীব্রতা লাভ করছে, তৈল-সংকট বাড়ছে, প্রতিটি ধনতান্ত্রিক দেশে মেহনতি মানুষ বিনা প্রতিবাদে অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা বহন করতে অস্বীকার করে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছে, ঠিক সেই সময়ে আফগান জনগণ সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন তাদের দেশ শাসনের ক্ষমতা। জন্মদিলেন এমন একটি বিপ্লবী সরকারকে, যারা আফগানিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করতে অস্বীকার করছেন। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত এই উপমহাদেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধঘাঁটি করে, 'গালফ্' অঞ্চলের তৈল এলাকার উপর প্রাধান্য বিস্তার করার যে পরিকল্পনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ রচনা করেছিল, তা সংগ্রামী আফগান জনগণের হাতে বাধা-প্রাপ্ত হচ্ছে দেখে তারা আজ ক্ষুব্ধ।

যেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যে কোন ষড়যন্ত্র বিস্তৃত করার ক্ষেত্র তৈরী। যেখানে সামন্ততন্ত্র শক্তিশালী, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রদায়িক, বিভেদপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী এজেন্টরা সক্রিয়। তাই, আফগানিস্তানের বিপ্লবের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। আধা-সামরিক শাসনে, পাকিস্তানের জনগণ হারিয়েছেন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই সেখানকার শাসকগোষ্ঠী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ডেকে নিয়ে আসছেন—আফগান উদ্বাস্তুদের স্বার্থ রক্ষার নাম করে, তাদের সশস্ত্র করে, আফগানিস্তানে প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহকে অস্ত্র সাহায্য দিতে। পাকিস্তানে ৪০০ কোটি ডলারের অস্ত্র যাচ্ছে—শুধু আফগানিস্তানের স্বাধীনতা নয়, পাকিস্তানী জনগণের বিরুদ্ধে, ভারত সমেত অন্যান্য সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের উপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। আফগানিস্তানে "ইসলাম বিপন্ন" বলে পাকিস্তানে যারা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে সমবেত করতে আজ ব্যস্ত, তারাই সেদিন "ইসলাম বিপন্ন" বলে চীৎকার তুলেছিলেন—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে রুখবার জন্য, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে।

সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই সকল ষড়যন্ত্র আফগানিস্তানের প্রশ্নে জনগণের সামনে যতখানি ধরা পড়েছে, ঠিক ততখানি কিন্তু তা' ধরা পড়ে নি—যখন সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে তার থাবা বিস্তার করেছে, নয়া সাম্রাজ্যবাদী কৌশল অবলম্বন করে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জাল বিস্তার করতে।

যতদিন ধনতন্ত্র আছে, প্রত্যক্ষভাবে হোক, আর পরোক্ষভাবে হোক ততদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নয়া ঔপনিবেশিক নীতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে—প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সৈনিককে। পৃথিবীর সেরা ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের শোষণের জাল

বিস্তার করেছে,—তৃতীয় দুনিয়ার সর্বত্র আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন প্রভৃতি মাধ্যমে, তাদের প্রায় ১১ হাজার শাখা এবং ৮২ হাজার উপ-শাখা বিস্তার করে। প্রায় ৫ লক্ষ মার্কিন সৈন্য বিদেশে মোতায়েন করে, দিওগো-গার্সিয়ার মত অসংখ্য ঘাঁটি সৃষ্টি করে। সমুদ্রে সমুদ্রে যুদ্ধজাহাজের টহলদারী বিস্তার করে সেই শোষণ ব্যবস্থাকে পাহারা দেয়া হচ্ছে। বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থার শাখা, উপ-শাখার অধিকাংশের জন্মভূমি আমেরিকা-বৃটেন। বিশ্বের বিভিন্ন অনগ্রসর এলাকায় বিদেশী মূলধন কিভাবে সেসব দেশের শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করে এবং সেই বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ কিভাবে প্রতিবছর বাড়ছে—তাও লক্ষ্য করতে হবে। ১৯৭০-৭১-এ তার পরিমাণ যেখানে ছিল সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার, ১৯৭৭-৭৮-এ তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে, ১০৫ বিলিয়ন ডলার। এই সময়ের মধ্যে বিদেশী ব্যাঙ্ক প্রভৃতির লগ্নি বেড়েছে—তিন বিলিয়ন থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলারে। তৈল প্রভৃতির মত সবচেয়ে মূল্যবান পণ্যের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের কব্জা সম্প্রতি আরো শক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। অনগ্রসর দেশগুলি সরবরাহ করছে কাঁচামাল, আর কারখানা-জাত পণ্য আসছে—ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে। সাম্রাজ্যবাদীরা অনগ্রসর দেশগুলির কাঁচামাল নিচ্ছে অল্প দরে, আর তাদের শিল্পজাত পণ্য বিক্রি করছে—অতিরিক্ত মুনাফা নিয়ে। এই অসম বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৭৭টি উন্নয়নকামী দেশের প্রতিনিধিদের দিল্লী সম্মেলনে অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা এতখানি অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন।

মনে রাখতে হবে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কোন আর্থিক সাহায্য, বহুজাতিক কর্পোরেশন বা ব্যাঙ্ক মাধ্যমে মূলধন খাটানো, নিছক ব্যবসা নয়, রাজনীতি-বর্জিত ঘটনা নয়। এর মধ্য দিয়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার বৈদেশিক নীতিকে কার্যকরী করছেন। এই সাহায্যের উপর নির্ভরশীল বলেই ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। একথা ঠিক যে ভারতের শাসকগোষ্ঠী কখনো কখনো সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্য গ্রহণ করেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির যে বিরোধ আছে—তার সুযোগ গ্রহণ করেন, ভারতে ধনতান্ত্রিক শাষণব্যবস্থা আরো শক্ত করতেই বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে বেশী করে আগ্রহ দেখান, বৈদেশিকনীতি তার দ্বারা সাময়িকভাবে প্রভাবিত হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের উপর নির্ভর না করে, দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার নীতি গ্রহণ করছেন সম্পূর্ণ স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা তাদের পথ নয়, তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়।

ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হলো —"রাজনৈতিক অস্থিরতা"—যা শাসকগোষ্ঠীকে গণতন্ত্রকে আঘাত করতে, দুর্বল করতে সাহায্য করে, সাম্রাজ্যবাদের উপর শাসকগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতা আরো বাড়িয়ে দেয়।

সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু মূলধন নিয়ে আসে না, কোন রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে তাকে আমদানী করতে হয়—প্রতিক্রিয়াশীল অপ-সংস্কৃতি ও মতবাদ। কোথাও সে মতবাদ আসে উগ্র-জাতীয়তাবাদের পোষাকে, কোথাও বিচ্ছিন্নতাবাদের মুখোস পরে, কোথাও সাম্প্রদায়িকতার আবরণ নিয়ে। কিন্তু পোষাক যত অভিনব হোকনা কেন, এইসকল বিভেদমূলক কার্যকলাপের মধ্যদিয়েই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া চক্রগুলি সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দা দপ্তরের (সি আই এ'র) টাকায় সক্রিয় হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়—যা আমরা দেখতে পাচ্ছি—ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। আনন্দমার্গ ধর্মীয় সংগঠনের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, এমন কি বৃটিশ শাসনের দিনেও এমন ব্যাপক ছিল না—যেমন আজ দেখা যাচ্ছে, এই উপমহাদেশে। অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা যেমন বাড়ছে, বেকার যুবসমাজের মধ্যে তেমনি বাড়ছে হতাশা—যা এই সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য চমৎকার জমি তৈরী করে দিচ্ছে।

ভারতের যুবসমাজের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য উজ্জ্বল। যখন যেখানে যেদেশে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ঘটেছে, সেখানে ভারতের যুবশক্তি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, মুক্তিকামী জনগণের সমর্থনে। ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে আন্তর্জাতিক ঐক্য আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, যে আন্তর্জাতিক কর্তব্যবোধ আমরা দেখেছি,—ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে, আজও সেই আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে—আফগানিস্তানের জনগণের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে আফ্রিকা, এশিয়ার জনগণের প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এসে। এই দায়িত্ব আমরা তখনই কার্যকরীভাবে পালন করতে পারবো—যখন আমরা রক্ষা করতে পারবো আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে, যখন আমরা রুখতে পারবো স্বৈরচারী প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহকে। গণতন্ত্রকে রক্ষা না করে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী না করে—সাম্রাজ্যবাদকে রোখা যায় না—পৃথিবীর ইতিহাস তাই প্রমাণ করে।

সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তারা পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এখনো বিপজ্জনক ভূমিকা নিতে সমর্থ হচ্ছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

[শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায়]

লেনিন—এক মহান জীবনের কয়েকটি দিক

রথীন গঙ্গোপাধ্যায়

"তিনি (লেনিন) ছিলেন সর্বোচ্চ শ্রেণীর নেতা—এক পার্বত্য ঈগল, যিনি কোন সংগ্রামেই ভয় পাওয়ার পাত্র ছিলেন না এবং যিনি রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের অজানা পথে পার্টিকে অসম সাহসিকতার সঙ্গে পরিচালিত করে নিয়ে গেছেন।"

—স্তালিন

১৮৭০ সাল, ২২শে এপ্রিল ভলগার তীরে সিমবিরস্ক শহরে (বর্তমানে উলিয়ানভস্ক) ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের জন্ম। এই ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভই মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈপ্লবিক মতবাদের প্রতিভাশালী উত্তরসাধক, প্রথম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক এবং বিশ্বের মেহনতী মানুষের প্রিয়তম নেতা ও শিক্ষক লেনিন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীই আজ আমরা আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে পালন করছি।

পিতা—ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ। প্রথম জীবনে ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পরে স্কুল পরিদর্শক ও শেষ জীবনে, সিমবিরস্ক প্রদেশের স্কুল পরিচালক। শিক্ষাবিস্তারে দারুণ আগ্রহ। কিন্তু সাধ থাকলে কী হবে, সাধ্য নেই। মা—মারিয়া আলেকসান্দ্রভনা বাড়িতে বসে লেখাপড়া করলেও কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানতেন। ভালবাসতেন সাহিত্য ও সঙ্গীত।

উলিয়ানভ পরিবারের ছয়টি ছেলেমেয়ে। ভ্লাদিমির সন্তান—আন্না, আলেকসান্দার ভ্লাদিমির, ওলগা, দমিত্রি ও মারিয়া। চঞ্চল হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল শিশু ভ্লাদিমির। সবাই ডাকে ভলোদয়া বলে। খেলাধুলায় তার যেমন ঝোঁক পড়াশুনায় তেমনি তুখোড়।

সে সময় রাশিয়ায় পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। গড়ে উঠছে কলকারখানা। তাহলেও টিঁকে ছিল ভূমিদাস-প্রথা। শহরে ও গ্রামে চলেছে জারের ভীষণ অত্যাচার। গরিব চাষীর পেটে অন্ন নেই। পেয়াদা এসে তাদের গরু বাছুর ধরে নিয়ে যায়। মজুরদের কষ্ট হয়ে ওঠে অসহনীয়। বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের কাজের ঘণ্টা। ধর্মঘট করে মজুররা। জারের পুলিস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উপর।

ঐ সব ঘটনা শিশু ভলোদয়ার অন্তরে দাগ কেটে যায়। খেলার সাথী ভেরা ও ইভানের কাছে শোনে গরিব চাষীদের কী কষ্টে দিন কাটে। ভলোদয়ার ভাবুক মনে তার ছাপ পড়ে। সারা জীবনে তা সে ভুলতে পারে না।

১৮৮৬। বাবা মারা গেলেন, নিতান্ত আকস্মিকভাবে। বড় বোন আন্না ও বড় ভাই আলেকসান্দার পড়ে সেন্ট পিটার্সবুর্গে। ভলোদয়াই এখন বাড়ির কর্তা। মায়ের কষ্ট লাঘব করার জন্য মনের দুঃখ চেপে হেসে হেসে কথা বলে। সবসময় মায়ের কাছে কাছে থাকে।

'বড় হয়ে সাশা-দার (দাদা আলেকসান্দার) মতো হব।' ভলোদয়ার চোখে সাশা-দা ছিল যেন এক রূপকথার বীর। জারের অত্যাচারে ছাত্ররা তখন ভীষণ বিক্ষুব্ধ। অত্যাচারী জারকে হত্যা করতে হবে—গুঞ্জন চলে ছাত্রদের মধ্যে। সাশা তাদের নেতা।

ভলোদয়া তখন স্কুলে। খবর এল দাদা ধরা পড়েছে। আন্নাও রেহাই পায় নি। ছুটে গিয়ে মাকে খবর দিল। মার বিছানা-পত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। স্টেশন থেকে ফেরার পথে ভলোদয়ার মনে অনেক কথাই জাগে—কেন সাশা-দা এমন কাজ করল? এ কি ঠিক পথ?

মা পিটার্সবুর্গ থেকে ফিরে এলেন নিদারুণ খবর নিয়ে—সাশাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ভলোদয়া কেঁপে উঠল। প্রতিজ্ঞা করল, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে সে অংশ নেবেই। সেটা ছিল ১৮৮৭ সালের মে মাস।

তরুণ ছাত্রনেতা

দাদার মৃত্যু ভ্লাদিমিরকে কঠিন করে দিয়ে গেল। সে বছরই সে চলে যায় কাজানে কলেজে পড়তে। এবার সে যোগ দিল পুরোপুরি ছাত্র আন্দোলনে। সতের বছরের তরুণ ছাত্রনেতা। পুলিস ধরে নিয়ে গেল তাকে। বিচারক বিদ্রূপ করে বলল, 'ছেলেমানুষ! এ পাগলামী কেন? দেখছ না তোমাদের বিরুদ্ধে কত বড় বাধা, নিরেট পাথরের প্রাচীর। একে ভাঙার দুঃসাহস করে লাভ কী?'

ভ্লাদিমির শান্ত ও নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিল, 'জীর্ণ প্রাচীর, এক ধাক্কায় সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।'

হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত। মায়ের অনুরোধে বিচারক ভ্লাদিমিরকে ককুসকিনো-তে (বর্তমানে লেনিনো গ্রাম) তার দিদি আন্নার কাছে নির্বাসিত করল। তিন বছর ভ্লাদিমির নজরবন্দী রইল তার দাদা মশায়ের পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে। এখানে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল চাষীজীবনের সঙ্গে।

এরপর ভ্লাদিমির চেষ্টা করল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে, কিন্তু অবাঞ্ছিত ব্যক্তির তালিকায় তার নাম

থাকাতে অনুমতি দেওয়া হল না। চার বছরের পাঠ্য-সূচী দেড় বছরের মধ্যে নিজে নিজেই পড়ে পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করল ভ্লাদিমির। ওকালতি শুরু করল। কিন্তু সে আর ক'দিন।

ভ্লাদিমির এখন ২৩ বছরের যুবক। কক্সাকি-নোতে থাকতে তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেন। ভ্লাদি-মির এখন পুরোদস্তুর বিপ্লবী। দাদার পথ নয়, মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষার মধ্যে তিনি তাঁর পথ খুঁজে পেয়েছেন; অত্যাচার ও শোষণমুক্ত সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে গেছে তাঁর সামনে।

যোগ দিলেন মার্কসবাদী চক্রে। গড়ে উঠল "শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিসংগ্রাম সমিতি"। জারের পুলিস ওৎ পেতে আছে। পেছনে চলে সব কাজ। গোয়েন্দার চোখ এড়িয়ে চলাফেরা। মাটির নিচে ছাপাখানা। এখান থেকে হাজার হাজার ইস্তাহার ছাপা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়ে শ্রমিকরা তরিতরকারির ঝুড়ি নিয়ে হাটে-বাজারে যায়! তার নিচে লুকিয়ে নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে তারা বিলি করে সেই ইস্তাহার।

১৮৯২ সালে ভ্লাদিমির সামারা সদর আদালতে উকিল হিসাবে নাম লেখান। কিন্তু ওকালতি তিনি করতে পারেন নি। নিজের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য তিনি নিয়োগ করলেন মার্কসবাদ অধ্যয়নে, বিপ্লবের প্রস্তুতিতে। যোগাযোগ করলেন ভলগা তীরের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে। মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক সংগঠনের পথে যে বাধা সৃষ্টি করেছিল উদার-নীতিক ও সংস্কারবাদীরা, তাদের মুখোশ খুলে দিতে লেখনী চালান। লেখেন 'জনগণের বন্ধু' কারা এবং কী ভাবে তারা সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে লড়ে বইখানি ছাপা ও প্রচারিত হয় গোপনে। কপির সংখ্যা বেশি ছিল না। 'হলদে খাতা' নামে বইটি হাতে হাতে ফিরত, তুমুল তর্ক ও উত্তেজনা জোগাত।

নাদেঝদা ক্রুপস্কায়ার সাথে পরিচয়

১৮৯৪ সালে ভ্লাদিমিরের পরিচয় হল নাদেঝদা কনস্তান্তিনোভনা ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে ক্রুপস্কায়া ছিলেন নেভস্কি ফটকের ওপারে শ্রমিকদের রবিবাসরীয় সান্ধ্য স্কুলের শিক্ষিকা। এ শ্রমিকচক্রের পরিচালনা করতেন ভ্লাদিমির। এভাবে তাঁর সঙ্গে ক্রুপস্কায়ার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ক্রুপস্কায়ার স্মৃতিকথায় আছে, "শ্রমিকদের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার প্রতিটি ব্যাপারেই ছিল ভ্লাদিমির ইলিচের আগ্রহ। বিভিন্ন দিক থেকে তিনি চাইতেন শ্রমিকদের সমগ্র জীবনটাকে ধরতে, সেই জিনিসটার খোঁজ করতেন যার হদিশ পেলে সবচেয়ে ভালোভাবে বিপ্লবী প্রচার নিয়ে হাজির হতে পারা যায় শ্রমিকদের কাছে"।

পিটার্সবুর্গে শ্রমিকদের মধ্যে ভ্লাদিমির হয়ে ওঠেন সংগঠক ও নেতা। তাঁর লেখা পুস্তিকা ও প্রচার-পত্রগুলি জনগণের মধ্যে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে, এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। লেখার প্রাঞ্জলতা আনবার জন্য সে সময় তিনি প্রায়ই কথাসাহিত্যের আশ্রয় নিতেন। 'নতুন কারখানা আইন' পুস্তিকায় তিনি 'সিংহের শিকার' গল্পটি তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, ওভারটাইমের নতুন নিয়মটায় সিংহের মাংস ভাগ করার কথা মনে পড়ে। "প্রথম ভাগটা সে ন্যায্য মতে নিজেই নিল। দ্বিতীয় ভাগটা নিল এজন্য যে সে পশুর রাজা। তৃতীয় ভাগটা নিল কারণ সে সবার চেয়ে বলবান, আর চতুর্থ ভাগটার দিকে যে থাবা বাড়াবে, তার আর প্রাণে বাঁচতে হবে না।" মজুরদের উপর শোষণ ও লুণ্ঠন চালাবার সময় পুঁজিপতিরাও ঠিক তাই করে।

১৮৯৫ সালে পশ্চিম ইউরোপীয় আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ভ্লাদিমির বিদেশে যান। সুইজারল্যান্ডে প্লেখানভের সঙ্গে দেখা করে 'রাবোৎনিক' (শ্রমিক) নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করা হবে ঠিক হয়। প্যারিসে মার্কসের জামাতা, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী পল লাফার্গের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের সঙ্গে দেখা করবার খুব ইচ্ছা ছিল তাঁর, কিন্তু এঙ্গেলস তখন ছিলেন গুরুতর অসুস্থ। সুটকেসের গোপন-তলায় মার্কসবাদী সাহিত্য লুকিয়ে নিয়ে তিনি পিটার্সবুর্গে ফিরে আসেন।

পিটার্সবুর্গ জেলে—সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে

বিপ্লবী কর্মীদের পরিশ্রমের ফল শীঘ্রই ফলল। ১৮৯৬ সালে সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে পিটার্সবুর্গে সুতাকল শ্রমিকরা ধর্মঘটে নামল। প্রচণ্ড আঘাত হানল জার সরকার। গ্রেপ্তার হলেন ভ্লাদিমির ও তাঁর বহু সহকর্মী। 'রাবোচেয়ে দেলো' (শ্রমিক আদর্শ) পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হস্তগত করল পুলিস। ভ্লাদিমিরকে নিয়ে যাওয়া হল পিটার্সবুর্গ জেলে। এই জেলে বসেই তিনি লেখেন মার্কসবাদী পার্টির প্রথম খসড়া কর্মসূচী। বই ও পত্রিকার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে কালির বদলে দুধ দিয়ে তিনি লিখতেন ও বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। আগুনের উপর ধরতেই দুধের লেখা স্পষ্ট হয়ে উঠত। পরদিন সেই লেখা ইস্তা-হার হয়ে ছড়িয়ে পড়ত সারা শহরে। রুটি দুধে ভিজিয়ে নিয়ে দোয়াত তৈরি করতেন তিনি। আর যেই সেলের গরাদের সামনে পায়ের শব্দ হত, অমনি তা খেয়ে ফেলতেন। পরিহাস করে এক চিঠিতে তিনি লিখে-ছিলেন, 'জানো, ছয়টা দোয়াত আজ আমাকে খেতে হয়েছে।'

ভ্লাদিমির পিটার্সবুর্গ জেলে কাটান প্রায় ১৪ মাস। এখানে বসেই তিনি শুরু করেন তাঁর বিখ্যাত বই "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ।" দিদি আন্না তাঁর প্রয়োজনীয় বই জেলে পৌঁছে দিতেন। ১৮৯৭ সালের

ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে তিন বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রেললাইন থেকে শত-শত কিলোমিটার দূরে এক অজ সাইবেরীয় গ্রাম শুসেনস্কয়ে-তে থাকা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। তবু এরই মাঝে তিনি পড়াশুনা ও লেখার কাজ চালিয়ে যেতেন। স্কেটিং করতেন, শিকারে যেতেন, দেখা করতেন আশেপাশে নির্বাসিত বন্ধুদের সঙ্গে। আর চিঠি লিখতেন এন্তার। এ সম্পর্কে আন্না ইলিনিচনা লিখেছেন, "চিঠিগুলিতে বিষাদ বা নালিশের কোন চিহ্ন ছিল না, বরং তার বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা থেকে আনন্দ উপচে পড়ত, যে কোন কাজের পক্ষে তা ছিল সেরা দাওয়াই।" চাষীরা তাঁর কাছে আসত, অভাব-অনটনের কথা জানাত, পরামর্শ ও সাহায্য চাইত। পরে ভ্লাদিমির সে সব কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, 'যখন সাইবেরিয়ায় ছিলাম, তখন আমাকে উকিল হতে হয়েছিল, অবশ্য আণ্ডারগ্রাউণ্ড উকিল।'

এক বছর পর শুসেনস্কয়ে গ্রামে নির্বাসিত হয়ে এলেন নাদেঝদা ক্রুপস্কায়া। ভ্লাদিমিরের বাগ্‌দত্তা বধূ হিসাবে তাঁকে এখানে এসে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়। বিয়ে হয় তাঁদের এখানেই।

নির্বাসন থাকাকালে ভ্লাদিমির লেখেন তিরিশটিরও বেশি রচনা। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের কর্তব্য"। "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ" বইখানি তিনি এখানেই শেষ করেন। বইটি হল রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মার্কসের 'পুঁজি'র পূর্বানুসরণ।

দূর-নির্বাসনে থেকেও তিনি শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এ সময় ধর্মঘট ও শ্রমিক বিক্ষোভের খানিক সাফল্যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের একটা অংশ শ্রমিকদের বোঝাতে শুরু করে, 'কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাও। রাজনৈতিক সংগ্রামটা বুর্জোয়াদের ব্যাপার।' 'অর্থনীতিবাদীদের' এই কার্যকলাপকে ভ্লাদিমির গুরুতর বিপদ বলে মনে করলেন। এরা শ্রমিক শ্রেণীকে ঠেলছিল বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপসের পথে, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকাকে ছোট করে রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে সরিয়ে দিয়ে। এই সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের মনোভাব নিয়ে তিনি মার্কসবাদী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা করেন। প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয় একটি রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রকাশের উপর, যে পত্রিকাটি শুধু প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, হবে সংগঠকও। মেলাতে হবে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের স্থানীয় চক্র ও গ্রুপগুলিকে একক সংগঠনে।

১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে ভ্লাদিমির সস্ত্রীক শুসেনস্কয়ে ছাড়লেন। রাজধানী পিটার্সবুর্গে আসার তাঁর উপায় ছিল না। পুলিসে ধরবে। তাই আশ্রয় নিলেন তিনি পাশের একটি ছোট শহর পস্কভ-এ। পত্রিকা প্রকাশের জন্য এবার তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। পুলিসের উপদ্রবে রাশিয়ায় তা বের করা অসম্ভব। তাই বিদেশ থেকে তা প্রকাশের সংকল্প করলেন। এই উদ্দেশ্যে পুলিসের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি মস্কো, পিটার্সবুর্গ, রিগা, সামারা, নিঝনি-নভগোরদ ও স্মলেনস্ক সফর করলেন। গ্রেপ্তার হলেন পিটার্সবুর্গ আসার পথে। তবে শীঘ্রই তিনি সেখার ছাড়া পান।

ইস্ক্রা প্রকাশিত হল

বহু কষ্টে সীমান্ত পার হয়ে ১৯০০-র ১৬ই জুলাই তিনি এলেন জার্মানীতে। শুরু হল তাঁর দেশান্তরী জীবন। সারা রুশ বিপ্লবী পত্রিকার নাম হয় "ইস্ক্রা" (স্ফুলিঙ্গ)। সম্পাদকমণ্ডলী আস্তানা নিলেন মিউনিকে। কাগজটির প্রতি সংখ্যায় বড় হরফে লেখা থাকত, "স্ফুলিঙ্গ থেকেই একদিন আগুন জ্বলে উঠবে।" পরে ঘটলও তাই। রাশিয়ায় বিপ্লববহ্নি লেলিহান হয়ে উঠল। আর তাতে ভস্মীভূত হল জার-স্বৈরাচার ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সমস্ত মন তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন এই পত্রিকা প্রকাশে। সে-সময় এক চিঠিতে তিনি লেখেন, "আমাদের সমস্ত জীবন-রস ঢালা চাই প্রসব-আসন্ন বাচ্চাটির পুষ্টির জন্য।" বাস্তবিকই 'ইস্ক্রা' ছিল তাঁর প্রিয়তম সন্তান।

রাশিয়ার মধ্যে গড়ে উঠল ইস্ক্রার সহযোগী গ্রুপ, এজেন্টদের একটা জালি-বুনট। তারা কাগজটি ছড়াত, খবরাখবর পাঠাত, চাঁদা তুলত। রাশিয়ায় কাগজটি পাঠানো ছিল খুবই কঠিন। পুলিসের চোখ এড়াবার জন্য, ইস্ক্রা যে সব স্যুটকেসে পাঠানো হত, তাতে থাকত দুটো করে তল। বইয়ের মলাটের মধ্যে বাঁধাই করে, যাত্রী কমরেডদের কোটের অভ্যন্তরণের মধ্যে সেলাই করে পাঠানো হত কাগজটি।

১৯০১ সালের শেষের দিকে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর কিছু কিছু লেখার নিচে স্বাক্ষর দিতে শুরু করেন—লেনিন। ক্রুপস্কায়ার মতে, এ ছদ্মনাম নির্বাচনটা নেহাত আকস্মিক হতে পারে। ইস্ক্রার কাজ তিনি করতেন প্লেখানভের সঙ্গে। প্লেখানভ তাঁর লেখার তলে স্বাক্ষর করতেন ভলগিন (ভলগা নদীর নামে)। লিনিন হয়তো তাঁর ছদ্মনামটা নেন সাইবেরীয় মহানদী লেনা থেকে।

১৯০২ সালে প্রকাশিত হল লেনিনের বই "কী করিতে হইবে?" এতে তিনি প্রলেতারিয়ান মার্কসবাদী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। রাশিয়ায় পার্টি রূপ গ্রহণের আগে থেকেই পশ্চিম ইওরোপে শ্রমিক পার্টি বর্তমান ছিল। এই সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি গড়ে উঠেছিল পুঁজিবাদের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ বিকাশের অবস্থায়। বিপ্লবী সংগ্রামের যোগ্যতা এদের ছিল না। এরা চলত আপসের পথে। এই সুবিধাবাদীরা বোঝাত যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়াই শোষণের অবসান ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। আসলে এরা হয়ে দাঁড়াত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দালাল। এদের বিরুদ্ধে, লেনিন বললেন, নতুন ধরনের

সংগ্রামী পার্টি, খাঁটি বিপ্লবী শ্রমিক পার্টি গড়তে হবে। এ পার্টিকে হতে হবে মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বে সমৃদ্ধ। "বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়"—বললেন লেনিন।

কৃষকদের কাছে পার্টির কর্মসূচী ব্যাখ্যার জন্য ১৯০৩ সালে লেনিন লিখলেন "গ্রামের গরিবদের প্রতি"। এতে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝান, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কী চায় এবং কেন শ্রমিকের সংগে কৃষকের ঐক্য প্রয়োজন।

১৯০৩ সালের মে মাসে ইস্ক্রার পেছনে পুলিসের চর লাগে। সম্পাদকরা লণ্ডন থেকে কাগজ বের করবেন স্থির করেন। এপ্রিলে লেনিন এলেন লণ্ডনে। এখানে থাকতে তিনি ইংরেজ শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, তাদের আন্দোলনকে মন দিয়ে লক্ষ্য করতেন, প্রায়ই যেতেন শ্রমিক সভায়, আর অনেকটা সময় দিতেন ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারে, যেখানে একদা মার্কস পড়াশুনা করেছেন।

এরপর আবার ইস্ক্রার মুদ্রণ স্থানান্তরিত হল জেনেভায়। লেনিনও চলে এলেন সেখানে। রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি সক্রিয় অংশ নেন। তিনি ইস্ক্রার সম্পাদকীয় বোর্ডে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় কংগ্রেস প্রথম বসে ব্রুসেলসে, কিন্তু বেলজিয়ান পুলিসের হানার পরে অধিবেশন চলে লণ্ডনে। কংগ্রেসে ইস্ক্রাপন্থীরা সংখ্যায় বেশি থাকলেও বহু সুবিধাবাদী এসে ভিড় করেছিল। এদের বিরুদ্ধে লেনিন সতেজে সংগ্রাম চালান। বিপ্লবী কর্মসূচী, প্রলেতারিয়ান একনায়কত্ব, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতা—এইসব মূল মার্কসবাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সুবিধাবাদীরা, কিন্তু তাদের সমস্ত আক্রমণই পরাস্ত হয়। লেনিনের সমর্থকরা অধিকাংশ (বলশিনস্তভো) ভোট পান। সেই থেকে তাঁদের নাম হয় বলশেভিক। আর সংখ্যালঘুতে পরিণত (মেনশিনস্তভো) সুবিধাবাদীদের বলা হয় মেনশেভিক। মেনশেভিকরা চায় পার্টিকে সুবিধাবাদের পথে টেনে নিতে। ফলে তাদের সংগে চলে বলশেভিকদের একটা অবিশ্রান্ত লড়াই। ১৯০৩ সালের নভেম্বরে প্লেখানভ মেনশেভিকদের দলে ভিড়ে পড়েন, ইস্ক্রা মেনশেভিকরা দখল করে নেয়। লেনিন তার সম্পাদকীয় বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেন।

স্তালিন তখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। লেনিন তাঁকে চিঠিতে পার্টির অবস্থা এবং পার্টির জন্য তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। জেনেভা থেকে প্রকাশিত হল লেনিনের বই "এক পা আগে দু' পা পিছে"। মেনশেভিকদের প্রচারের বিরুদ্ধে লেনিন জোর দিয়ে বললেন, "ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া প্রলেতারিয়েতের আর কোন অস্ত্র নেই। পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী সচেতন বাহিনী।"

লেনিন পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। রাশিয়ায় বিপ্লবের পরিস্থিতি পরিণত হয়ে উঠছিল। প্রয়োজন ছিল মেনশেভিকদের বিভেদমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করার। পার্টির মধ্যে সংগ্রামে অধিকাংশ পার্টি কমিটিগুলি বলশেভিকদের পক্ষে চলে আসে। পার্টির বিপুল অংশ সংহত হয় লেনিনের পেছনে।

১৯০৫ সালের জানুয়ারিতে লেনিনের পরিচালনায় জেনেভা থেকে প্রকাশিত হয় একটি বলশেভিক পত্রিকা —"ভ্পেরিয়োদ"। এতে প্রকাশিত "পোর্ট আর্থারের পতন" প্রবন্ধে লেনিন বললেন, রাশিয়ায় বিপ্লব আসছে।

রুশ-জাপান যুদ্ধ থেকে ক্লান্ত সৈন্যরা ফিরে এসে দেখে ঘরসংসারের দুরবস্থা চরম। পিটার্সবুর্গে শ্রমিকরা ঠিক করল, জারের কাছে গিয়ে তারা সাহায্য চাইবে। সাহায্য অবশ্য দিল 'ত্রাণকর্তা' জার, তবে রুটি নয়, বন্দুকের গুলি। ১৯০৫ সাল ৯ই জানুয়ারি। দু' হাজার শ্রমিক সেদিন রুটি চাইতে এসে গুলিতে প্রাণ দিল। শ্রমিকরা প্রতিজ্ঞা করল, আর ভিক্ষা নয়, এবার দাবি। আর লড়াই করেই এ দাবি আদায় করবে তারা।

দূরে প্রবাসে থেকে লেনিন সব কিছু লক্ষ্য করলেন। বুঝলেন তিনি, বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই অবিলম্বে কংগ্রেস আহ্বানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস বসল লণ্ডনে ১৯০৫ সালের এপ্রিলে। মেনশেভিকরা তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করল। জেনেভায় তারা ডাকল তাদের নিজেদের সম্মেলন, স্পষ্টতই এটা পার্টি ভাঙবার একটা পদক্ষেপ, বিপ্লবের মূল প্রশ্নগুলি আলোচিত হয় কংগ্রেসে। সভাপতি নির্বাচিত হন লেনিন। পেশ করেন তিনি একাধিক রিপোর্ট। সশস্ত্র বিপ্লব, সাময়িক বিপ্লবী সরকার, কৃষক আন্দোলনের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলির খসড়া তিনিই করেন। নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে থাকেন লেনিন। পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র "প্রলেতারি" পত্রিকার সম্পাদকও হন তিনি।

কংগ্রেসের পর লেনিন জেনেভায় ফেরেন। এ সময় প্রকাশিত হয় "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল" বইখানি। লেনিন রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে গণ্য করেন। এ বিপ্লবের লক্ষ্য—ভূমিদাস প্রথার বিলোপ, জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ। লেনিনই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুগের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, তার চালিকাশক্তি ও পরিপ্রেক্ষিতের বিচার করেন। তিনি মনে করেন, প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ হল বুর্জোয়া বিপ্লবকে সফল করা, কারণ এর ফলে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এগিয়ে

আসবে। বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি ও নেতা হতে হবে প্রলেতারিয়েতকেই। প্রলেতারিয়েতের সহযোগী হবে কৃষক। লেনিন দেখিয়ে দিলেন যে, মেনশেভিকদের লাইন হল বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন করার প্রয়াস। লেনিন এ বইয়ে লিখলেন, কৃষকের সঙ্গে একত্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জয়ী হবার পর প্রলেতারিয়েত তার শক্তি সংহত করে, গরিব কৃষক ও শহরের গরিবদের সম্মিলিত করে আঘাত হানবে পুঁজিবাদের উপর। এভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিণত হয়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে।

১৯০৫ সালের বিপ্লব

১৯০৫ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে পিটার্সবুর্গ ও অন্যান্য জায়গায় শ্রমিকরা ধর্মঘটে নামল। কৃষক আন্দোলনের ঢেউ উঠল। জুন মাসে কৃষ্ণসাগর নৌবাহিনীর "পতেমকিন" যুদ্ধ জাহাজে জ্বলে উঠল নৌসৈন্যের বিদ্রোহ। অক্টোবরে শুরু হল সর্বাত্মক রাজনৈতিক ধর্মঘট। বন্ধ হল কলকারখানা, ডাক ও তার অফিস। অচল হয়ে পড়ল দেশের জীবনযাত্রা। জার, জমিদার ও পুঁজিপতিরা সন্ত্রস্ত। জার সরকার ঘোষণা করল, সভাসমিতির স্বাধীনতা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকার দেওয়া হল। এ হল বিপ্লবের প্রথম জয়।

কিন্তু জারের এই ঘোষণা লেনিনকে ধোঁকা দিতে পারল না। তিনি স্পষ্ট বললেন, জারের ফাঁকা কথায় বিশ্বাস করো না। এখনও অনেক লড়াই বাকি। প্রস্তুত হও। সৈন্যদের দলে টেনে নিয়ে এসো। চাষীদের বুঝিয়ে এগিয়ে নাও। আরও ছড়িয়ে পড়ুক ধর্মঘট।

ঝড়ো দিনগুলির মধ্যে গড়ে উঠল গণ-রাজনৈতিক সংগঠন—শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। লেনিন বললেন, এগুলিই হবে আগামী দিনে মেহনতীদের রাষ্ট্রক্ষমতা। এ সময় রাশিয়া থেকে দূরে থাকা লেনিনের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ফিরে এলেন পিটার্সবুর্গে। আইনসঙ্গত বলশেভিক সংবাদপত্র "নভায়া ঝীজন" (নবজীবন) পরিচালনা করতে লাগলেন। জারের কাছ থেকে কিছু স্বাধীনতা আদায় হলেও লেনিনকে থাকতে হত পুলিসের চোখ এড়িয়ে। প্রায়ই পাসপোর্ট ও বাসা বদল করতে হত। কয়েকবার ফিনল্যান্ডেও চলে যেতে হয়েছিল।

বিপ্লব শীর্ষে পৌঁছল ডিসেম্বরে মস্কো শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে। নয়দিন ধরে কয়েক হাজার সশস্ত্র শ্রমিক বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালায় জারের পুলিস ও কশাক সৈন্যদের বিরুদ্ধে। গোর্কি তখন মস্কোয় ছিলেন। তিনি এক চিঠিতে শ্রমিকদের এ লড়াইকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। মস্কোর পরই বিদ্রোহ জেগে উঠল অন্যান্য শহরে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন এ সব অভ্যুত্থান তেমন সংগঠিত ছিল না। জার তাই নির্মমভাবে তা দমন করে দিতে পারল।

অনেক নেতাই হাল ছেড়ে দিলেন। লেনিনের কিন্তু বুঝতে এতটুকু দেরী হয় নি যে বিপ্লবের এ শেষ পর্ব নয়, এটা শুধু প্রথম পর্ব। শ্রমিকদের তিনি বোঝালেন, প্রস্তুত হও, আমাদের এগোতেই হবে।

পিটার্সবুর্গ ছেড়ে লেনিন ফিনল্যান্ডে এসেছেন। এখানে তামারফর্সে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনেই তাঁর স্তালিনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে স্তালিন লিখেছেন, "সাধারণত 'মস্ত লোকেরা' সভায় আসেন একটু দেরি করে যাতে লোকে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে এবং 'মস্ত লোকটি' এসেছেন শুনলেই 'ঐ আসছেন, চুপ চুপ' ধ্বনির একটা সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু যখন শুনলাম, লেনিন অন্য প্রতিনিধিদের আগেই সম্মেলনে এসে এক কোণে বসে সাধারণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে নেহাত মামুলি কথাবার্তা বলছেন, তখন আমি কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম......পরে বুঝেছি, এই যে সরল বিনয়নম্র স্বভাব, সবার দৃষ্টির অগোচরে থাকার, নিজেকে জাহির না করার মনোভাব, লেনিন-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই সাধারণ মানুষের, নতুন জনগণের নতুন নেতার সব থেকে বড় গুণ।"

ফিনল্যান্ডেও জারের পুলিস লেনিনের পিছু নেয়। চলে যেতে হবে, অনেক দূরে, একেবারে স্টকহোমে। যেতে হবে ডিঙি করে, কিন্তু সব ডিঙির উপরই পুলিসের কড়া নজর। ঠিক হল দূরে একটা দ্বীপে গিয়ে ডিঙি নেওয়া হবে। সে দ্বীপ কয়েক মাইল দূরে বল্টিক সাগরের মধ্যে। ডিসেম্বর মাস। জলের উপর বরফ জমেছে। তবে তখনও তা হেঁটে যাবার মতো শক্ত জমাট বাঁধে নি। এ অবস্থায় এ বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে যদি পায়ের তলায় বরফ একবার সরে যায়, তবে নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু উপায় নেই দেরি করার। পুলিস ধাওয়া করছে। একবার ধরতে পারলে একেবারে ছিঁড়ে খাবে। তাই দুজন চাষীকে নিয়ে লেনিন এগিয়ে চললেন। হঠাৎ পায়ের নিচে বরফ ভেঙে বসে যেতে আরম্ভ করল। মুহূর্তমধ্যে ঐ বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে ডুবে মরতে হবে। কী বিশ্রীই না হবে সে মরণ! ভাবলেন লেনিন। টেনেহিঁচড়ে কোনমতে তাঁরা একটা শক্ত বরফের চাঙড় ধরে সে যাত্রা বেঁচে যান। সময়মতো এটা ধরতে পেরেছিলেন, তাই রক্ষা।

এভাবে লেনিন গিয়ে পৌঁছলেন স্টকহোমে। যোগ দিলেন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির চতুর্থ (ঐক্য) কংগ্রেসে। বলশেভিকদের সঙ্গে মেনশেভিকদের তীব্র সংগ্রামের মধ্যে কংগ্রেস চলে। সে সময় অনেক বলশেভিক সংগঠন গণ-আন্দোলনে ব্যাপৃত ও দমনে বিপর্যস্ত থাকায় কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি। তাই মেনশেভিকরা সংখ্যাধিক্যে সমস্ত প্রধান প্রশ্নেই নিজেদের সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নিতে পারে। কেন্দ্রীয়

কমিটিতে সংখ্যাধিক্য লাভ ও কেন্দ্রীয় মুখপত্র দখলও সম্ভব হয় তাদের পক্ষে। কিন্তু মেনশেভিকদের এ জয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মার্কসবাদের বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের জয়ে দৃঢ় আস্থা ছিল লেনিনের। শীঘ্রই বলশেভিকরা মেনশেভিকদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারল।

১৯০৭ সালের মে মাসে লন্ডনে বসল রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস। লেনিন তার সভাপতিত্ব করলেন, লিখলেন কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাব। বিপ্লবে বলশেভিক কর্মসূচীর যথার্থতা সমর্থিত হল কংগ্রেসে। মেনশেভিকদের পরাভূত করল বলশেভিকরা। আগস্টে লেনিন স্টুটগার্টে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে হাজির থাকেন।

১৯০৮ সালের জানুয়ারিতে লেনিন আবার জেনেভায় ফিরলেন। আত্মনিয়োগ করলেন নতুন উদ্যোগ নিয়ে নতুন বিপ্লব প্রস্তুতির কাজে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, এ পরাজয় কেবল সাময়িক। স্বৈরাচারের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রলেতারিয়েতের জয় অবশ্যম্ভাবী। পার্টির উদ্দেশে লেনিন তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "বিপ্লবের জন্য দীর্ঘ বহু বছর ধরে কাজ করছি আমরা। আমাদের লৌহদৃঢ় বলা হয়, খামকা নয়। প্রলেতারিয়ান পার্টি প্রথম অসাফল্যে হতোদ্যম হয় না, মাথা খারাপ করে না, হঠকারিতায় নামে না...এই পার্টিই পৌঁছবে বিজয়ে!" প্রতিক্রিয়ার সে বিষণ্ণ বছরগুলিতে লেনিন ভাবছিলেন আসন্ন বিজয়ের কথা। তখন প্রতিশোধ নিচ্ছিল জার সরকার। হাজার হাজার মানুষের প্রাণদণ্ড ও নির্বাসন দিয়ে ভেবেছিল সবকিছু স্তব্ধ করে দেওয়া যাবে।

জেনেভায় এসে লেনিন "প্রলেতারি" পত্রিকার নব সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন করলেন। টেনে আনলেন গোর্কি, লুনাচারস্কি ও অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকদের। পুনঃপ্রকাশিত হল "প্রলেতারি"—বিপ্লবের নতুন জোয়ারের জন্য পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীকে প্রস্তুত করে তোলার এক হাতিয়ার। লেনিন বললেন, প্রয়োজন অবৈধ পার্টি সংগঠনকে জোরদার করা ও সেই সঙ্গে প্রকাশ্য শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করা। শেখালেন, দুমায় প্রকাশ্য বক্তৃতা দেবার যে কোন সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়ে কাজ করা দরকার। এভাবে আইনসঙ্গত কাজের সঙ্গে মেলাতে হবে বেআইনী কাজ। বিপ্লবের সাময়িক পরাজয়ের পর মেনশেভিকরা আতঙ্কে পিছু হটে, শ্রমিক শ্রেণীকে বলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপস করতে। কেউ কেউ বলে পার্টি তুলে দেবার কথা। লেনিন দৃঢ়ভাবে বলেন, প্রলেতারিয়েতের পার্টির কর্তব্য এই সমস্ত সুবিধাবাদীদের ঝেড়ে ফেলা।

১৯০৮-এর এপ্রিলে লেনিন গেলেন ইতালির কাপ্রি দ্বীপে গোর্কির সঙ্গে দেখা করতে। লেনিন মন দিয়ে শোনেন গোর্কির বাল্য ও কৈশোরের কথা, তাঁর ভবঘুরে জীবনের কাহিনী, পরামর্শ দেন তা লিখতে। লেনিনের সঙ্গে আলাপ গোর্কির উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে।

১৯০৮ সালের শেষের দিকে "প্রলেতারি" পত্রিকার প্রকাশন স্থানান্তরিত হয় প্যারিসে। লেনিন ও ক্রুপস্কায়া এ উপলক্ষে সেখানে আসেন। শ্রমজীবী ফ্রান্সের জীবন লেনিন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন, যান শ্রমিক সভায়, শ্রমিক এলাকার থিয়েটারগুলিতে। এ সময় পার্টির ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে লেনিন তাঁর তাত্ত্বিক ভিত্তির ভাবাদর্শগত বিশুদ্ধতা, মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদের প্রতি আনুগত্যের সংগ্রামও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন। দর্শনের ক্ষেত্রে শোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। লেনিন এর জবাবে লেখেন, "বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা"। এঙ্গেলস বলেছিলেন, "বিজ্ঞানের প্রত্যেক নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদকেও নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে হবে।" লেনিন দর্শন নিয়ে 'মাথা ঘামান না' বলে প্লেখানভ বিদ্রূপ করতে খুব পটু ছিলেন বটে, কিন্তু সবাই জানেন যে লেনিনই এ গ্রন্থে সে কর্তব্য পালন করেছেন, প্লেখানভ তা করতে সাহস পান নি। বইটিতে লেনিন মার্কসবাদী দর্শনের বিরোধীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।

শুধু যে লিকুইডেটরদের (যারা পার্টি তুলে দিতে চায়) মতো প্রকাশ্য সুবিধাবাদীদের সঙ্গেই লেনিন আপসহীন সংগ্রাম চালান তাই নয়, তিনি লড়েন তাদের বিরুদ্ধেও যারা নিজেদের সুবিধাবাদ চাপা দিত বিপ্লবী বুলির আড়ালে। পরে লেনিন " 'বামপন্থী' কমিউনিজম —শিশুসুলভ রোগ" (১৯২০-এ প্রকাশিত) বইয়ে লেখেন যে, বলশেভিক পার্টি তার বাহিনী অক্ষুণ্ণ রেখে পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিল এজন্য যে 'বুলি-বাগীশ বিপ্লবীদের' মুখোশ নির্মমভাবে উন্মোচন করে তাদের ঝেঁটিয়ে দূর করা হয়। ১৯০৮-১২ এই কয় বছর লেনিন প্রধানত দক্ষিণ ও বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। স্তালিন এক জায়গায় লিখেছেন, "অনেকে লেনিন সম্বন্ধে অভিযোগ করতেন যে, তিনি দারুণ বাদানুবাদ ও দল ভাঙাভাঙির প্রতি আসক্ত। কিন্তু এটা মানতেই হবে যে, যদি পার্টি থেকে সুবিধাবাদীদের না তাড়ানো হত, তাহলে পার্টির ভেতরকার দুর্বলতা ও ঢিলেমী ঘুচত না, পার্টির দৃঢ় শক্তিশালী চরিত্রও গড়ে উঠত না। বুর্জোয়া শাসনের দিনে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বাড়তে ও শক্তিশালী হতে পারে ঠিক সেই পরিমাণে, যে পরিমাণে সে তার ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সুবিধাবাদী, বিপ্লব-বিরোধী ও পার্টি-বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়তে পারে।"

১৯০৯-এর নভেম্বরে গোর্কির সাহিত্যের উচ্চ প্রশংসা করে লেনিন তাঁকে চিঠি দেন ও কয়েক মাস পরে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। উপস্থিত থাকেন কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় বলশেভিক পত্রিকা

"রাবোচায়া গাজেতা"র প্রথম সংখ্যা। এতে থাকে লেনিনের প্রবন্ধ "বিপ্লবের শিক্ষা"। তলস্তয়ের মৃত্যুর উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন লেনিন।

১৯১০ সালে রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে ফের প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। বলশেভিকরা পেত্রোগ্রাদ থেকে "জ্ভেজ্দা" (তারকা) এবং মস্কো থেকে "মিস্ল্" (ভাবনা) পত্রিকা প্রকাশে সমর্থ হয়। লেনিনের পরিচালনায় "জ্ভেজ্দা" হয়ে ওঠে সংগ্রামী মার্কসবাদী পত্রিকা। ১৯১১ সালে প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি পার্টি স্কুলের ব্যবস্থা করেন লেনিন।

১৯১২-র জানুয়ারি। প্রাগে এককভাবে বলশেভিকদের সম্মেলন হয়। বলশেভিক পার্টি, নতুন ধরনের পার্টি গঠনে প্রাগ সম্মেলনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এর একটি জরুরী সিদ্ধান্ত ছিল—পার্টি থেকে মেনশেভিক-লিকুইডেটরদের বহিষ্কার, সুবিধাবাদের সঙ্গে বলশেভিকদের পুরোপুরি সাংগঠনিক সম্পর্কচ্ছেদ। সম্মেলনে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন লেনিন, স্তালিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের উদ্যোগে এবং লেনিন ও স্তালিনের সম্পাদনায় বলশেভিকদের বৈধ দৈনিকপত্র "প্রাভদা"র প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৯১২-র ২২শে এপ্রিল। রাশিয়ার কাছাকাছি থাকার জন্য লেনিন প্যারিস ছেড়ে ক্রাকাউ (পোল্যান্ড) আসেন। এখানে তিনি ছিলেন দু'বছরের বেশি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া নাগাদ। প্রাভদার জন্য লেনিন প্রায় প্রতিদিনই লিখতেন। সেগুলি প্রকাশিত হত নানা ছদ্মনামে।

লেনিন বললেন, রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচনে অংশ নিতে হবে। গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, ৮ ঘণ্টা কাজের দিন, জমিদারদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত—এই তিনটি মূল দাবির উপর নির্বাচনী অভিযান চালাল বলশেভিকরা। নির্বাচনী ফলাফলে খুশি হলেন লেনিন। লিখলেন, বলশেভিক প্রতিনিধিদের চমৎকারিত্ব কথার ফুলঝুরিতে নয়, বরং শ্রমজীবী জনগণের সম্পর্কে সেই জনগণের মধ্যে আত্মোৎসর্গী কর্মে। সাইবেরিয়ায় লেনা সোনার খনিতে শ্রমিকদের গুলি করে হত্যার ঘটনায় সারা রাশিয়া বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। শ্রমিকরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে এল। লেনিন বুঝলেন, ১৯০৫-এর পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে উঠেছে শ্রমিকরা। আবার নতুন করে আসছে বিপ্লবের ঢেউ।

১৯১৪-র আগস্ট। শুরু হল সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম দিন থেকেই লেনিন দৃঢ়ভাবে এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কিছুদিনের মধ্যেই অস্থায়ী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে জার সরকারের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। দু সপ্তাহ আটক রেখে তাঁকে সুইজারল্যান্ডে চলে যেতে দেওয়া হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রচনা করেন লেনিন। বার্নে আসার পরদিনই তিনি বলশেভিকদের সভায় যুদ্ধ সম্পর্কে রিপোর্ট করেন এবং পেশ করেন "ইওরোপীয় যুদ্ধে বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির কর্তব্য।" লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালায়। বুর্জোয়া ও তাদের সেবাদাস সুবিধাবাদীরা কুৎসা রটায় যে, বলশেভিকদের দেশপ্রেম নেই, তারা দেশদ্রোহী। মোক্ষম জবাব দিয়ে লেনিন বোঝান, সত্যকার দেশপ্রেমিক হওয়ার অর্থ কী। তিনি লেখেন, সুবিধাবাদীরা হল শ্রমিক শ্রেণীর, মেহনতী মানুষের শত্রু, যারা শান্তির সময় বুর্জোয়ার স্বার্থে শ্রমিক পার্টির অভ্যন্তরে নিজেদের কাজ চালায় গোপনে, আর যুদ্ধের সময় খোলাখুলি জোট বাঁধে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সঙ্গে, গ্রহণ করে উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতি। পশ্চিম ইওরোপীয় পার্টিগুলির মধ্যে যারা প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতার পক্ষে ছিল, তাদের সংহতি সাধনের কাজ লেনিন চালিয়ে যান অক্লান্তভাবে। সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য তিনি ভেঙে-পড়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্থলে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়তে বলেন। রুশ বলশেভিক ও তাদের সহগামী পশ্চিম ইওরোপীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বামপন্থীরা সে সময় ছিল সংখ্যালঘু। কিন্তু মার্কসবাদের অনিবার্য বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে লেনিন বললেন, "আমরা একলা পড়েছি, এটা কোন বিপদ নয়। আমাদের সঙ্গেই আসবে লক্ষকোটি মানুষ, কেননা বলশেভিকদের মতটাই একমাত্র সঠিক মত।"

বামপন্থীদের সংহতির উদ্দেশ্যে লেনিন জিমারওয়ালডে ও কীন্থালে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হয়। প্রধান নির্ভর ছিল তাঁর লেখার আয়। অথচ যুদ্ধ-বিরোধী রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশন ছিল অতি দুষ্কর। সে সময় এক পত্রে তিনি লেখেন, "আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বলি, রোজগার দরকার। নইলে স্রেফ ধ্বংস, সত্যি বলছি।" সাদাসিদে দিন কাটাতেন তিনি। একটি কামরায় তিনি আর ক্রুপস্কায়া। আরামের অবকাশ ছিল না তাতে।

১৯১৬। লেনিনের মা মারা যান। মাকে বড় ভালোবাসতেন লেনিন। এ বছরই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত বই "সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়।" লেনিন তাতে দেখালেন যে, বিশ শতকের গোড়া থেকে পুঁজিবাদ তার বিকাশের নতুন পর্বে—সাম্রাজ্যবাদের পর্বে—প্রবেশ করেছে। "সাম্রাজ্যবাদ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বাহ্ণ।"

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের প্রথম সারিতে এগিয়ে এল লেনিনের পরিচালনায় রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকরা। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়, ধ্বংস ও দুর্ভিক্ষ জারতন্ত্রে একেবারে পচন ধরিয়ে দিল, লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, বিপ্লব আসছে। ডাক দিলেন তিনি, "যেসব বিশ্বাসঘাতকের দল নিজেদের স্বার্থে মুনাফার লোভে তোমাদের পরস্পরকে গুলি

ধরে মারতে বলছে, ঐসব শাসকদের, ঐসব পঁুজিদার-দের বিরুদ্ধে বন্দুকের মুখ ঘুরিয়ে ধর, এ যুদ্ধের আগুনে আজ বিপ্লববহ্নি জ্বালাও।"

প্রথম জেগে উঠল পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা। রক্তাক্ত রবিবারের বার্ষিকীতে একটা বিরাট যুদ্ধ-বিরোধী মিছিল বের হল। মিছিল হল মস্কো, বাকু, নিঝ্নি-নভগোরদেও। ফেব্রুয়ারিতে বলশেভিক পার্টির আহ্বানে পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটে নামল। তাতে যোগ দিল দুই লক্ষের উপর শ্রমিক। ধ্বনি উঠল, 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক', 'যুদ্ধ ধ্বংস হোক', 'রুটি চাই'। জার সরকার সৈন্য দিয়ে দমন করতে চাইল। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সঙ্গে এসে যোগ দিল সৈন্যদল ও নৌবাহিনী। শ্রমিকরা পেত্রোগ্রাদ শহর দখল করে নিল। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। কিন্তু সোভিয়েতগুলিতে যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভোলিউশনারিরা ঢুকে পড়েছিল, তারা শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থের প্রতি বেইমানি করে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দিল বুর্জোয়াদের গড়া অস্থায়ী সরকারের হাতে। দেখা দিল দ্বৈত ক্ষমতা—একদিকে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার, অন্যদিকে সোভিয়েত বা প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ক্ষমতা।

লেনিন তখন সুইজারল্যান্ডে। রাশিয়ায় ফিরবার জন্য ব্যাকুল। এদিকে সীমান্তে রুশ-জার্মান যুদ্ধ সমান-তালে চলেছে। জারের জায়গায় যে নতুন সরকার বসেছে, তারা না আনল শান্তি, না দিল জনসাধারণকে রুটি। শ্রমিকদের ঠকাল তারা, বলতে লাগল রাজতন্ত্রের পতনের পর যুদ্ধ নাকি ন্যায়যুদ্ধ হয়ে উঠেছে। জন-গণকে প্রতারণার ব্যাপারে বুর্জোয়াদের সাহায্য করতে লাগল মেনশেভিকরা। এ অবস্থায় গুপ্ত অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে বলশেভিক পার্টি তার শক্তি সমাবেশ করতে লাগল, বহু বিশিষ্ট কর্মী জার্জিনস্কি, স্ভের্দলভ, স্তালিন ফিরে এলেন জেল ও নির্বাসন থেকে। পুনঃপ্রকাশিত হল "প্রাভদা"। লেনিন লিখলেন, "বিপ্লবের প্রথম পর্যায় কেবল শেষ হয়েছে। ক্ষমতা গেছে বুর্জোয়াদের হাতে। অস্থায়ী সরকারকে বিশ্বাস করা চলবে না, চলবে না বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় পাকা হয়ে বসবার সুযোগ দেওয়া। সর্বোপায়ে লড়তে হবে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার লক্ষ্যসাধনের জন্য, বিধ্বস্ত করতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে এবং তৈরি হতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য।"

লেনিন রাশিয়ায় ফেরার উপায় খুঁজতে লাগলেন। বাধা দিল অস্থায়ী সরকার। এ সরকার বিদেশে তাদের প্রতিনিধিদের কাছে পাঠাল লেনিন ও অন্যান্য বলশে-ভিকদের নামে একটা ব্ল্যাকলিস্ট। দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হল না তাঁদের। অবশেষে বহুকষ্টে সুইজার-ল্যান্ডের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সাহায্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের একটা ব্যবস্থা হল। প্রায় দশ বছর ফেরারী জীবন কাটিয়ে ১৯১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল লেনিন পেত্রোগ্রাদে এসে পৌঁছলেন। মহোল্লাসে বিপ্লবী রাশিয়া অভ্যর্থনা জানাল তার মহান নেতাকে। সৈনিক ও নাবিকদের বিপ্লবী বাহিনী দিল গার্ড অব অনার। তুমুল করতালি ও আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে লেনিন উঠলেন তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ একটি সাঁজোয়া গাড়ির উপর এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের উদ্দীপ্ত আহ্বান জানা-লেন শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের কাছে।

নভেম্বর বিপ্লবের নায়ক

পেত্রোগ্রাদে পৌঁছেই ৪ঠা এপ্রিল বলশেভিকদের সভায় বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য নিয়ে থিসিস পেশ করেন। ইতিহাসে এটি "এপ্রিল থিসিস" নামে খ্যাত। এতে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এগিয়ে যাবার জন্য সংগ্রামের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা হাজির করেন।

এদিকে বুর্জোয়াদের স্বার্থে অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। দলে দলে সৈন্য পাঠানো হল ফ্রন্টে কামানের খোরাক হিসাবে। শ্রমিক-কৃষকের জীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ। ৩রা জুলাই শ্রমিক ও সৈনিকরা পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় নামল। তাদের কণ্ঠে গর্জে উঠল—সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা চাই। সশস্ত্র শক্তি নিয়ে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল অস্থায়ী সরকার। জন-গণের রক্তে রাজপথ ভাসল। তছনছ করা হল "প্রাভদা" সম্পাদকীয় ভবন। কারাগারে পাঠানো হল বহু বল-শেভিককে। অস্থায়ী সরকারের নেতা কেরেনস্কি ঘোষণা করল, লেনিনকে ধরে দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কার। পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা লেনিনকে নিয়ে লুকিয়ে রাখল তাদের বস্তিতে। পরে তিনি চলে যান রাজলিফ হ্রদের তীরে একটা কুঁড়ে ঘরে, ফিনদেশীয় ঘেসুড়ে সেজে। কুঁড়ের কিছু দূরে ঝোপের মাঝে ছোট্ট একটু জায়গা সাফ করে রাখা হল। লেনিন রসিকতা করে বলতেন, "আমার সবুজ অফিস-ঘর।" সেখানে ছিল দুটো কাঠের গুঁড়ি, চেয়ার টেবিলের বদলে। এই কাঠের গুঁড়ির উপর বসেই লেনিন লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "রাষ্ট্র ও বিপ্লব"।

১৯১৭-র আগস্টে আধা গোপনে পেত্রোগ্রাদে পার্টির যে ষষ্ঠ কংগ্রেস হয়, লেনিন তার পরিচালনা করেন গুপ্তভাবে। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির মূল রাজনৈতিক রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির খতিয়ান পেশ করেন স্তালিন। কংগ্রেস থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া ও জমিদারদের ক্ষমতা চূর্ণ করার সংগ্রামের আহ্বান দেওয়া হয়। সিদ্ধান্তে লেনিনের এই নির্দেশের উপর জোর দেওয়া হয় যে, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে গরিব কৃষকের মৈত্রীই হল সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের শর্ত। পার্টি কংগ্রেসের পর

কলকারখানায় গ্রামাঞ্চলে গড়ে ওঠে লাল রক্ষীবাহিনী। সেপ্টেম্বরের দিকে ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান সেজে লেনিন ফিনল্যান্ডে হেলসিংফোর্সে (হেলসিঙ্কি) চলে যান। বিপ্লবের শত্রুদের অভিসন্ধি তিনি আঁচ করেছিলেন। পার্টি ও জনগণকে তিনি সতর্ক করে দেন। জেনারেল কর্নিলভ প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ করে সৈন্য চালায় পেত্রোগ্রাদের দিকে। কর্নিলভের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব নিল পার্টি। বিধ্বস্ত হল কর্নিলভ। ফিনল্যান্ড থেকে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পেত্রোগ্রাদ ও মস্কো কমিটির নিকট পাঠালেন দুটি ঐতিহাসিক চিঠি— "বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতেই হবে" এবং "মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান।" এরপর লেনিন চলে এলেন ভিবর্গে পেত্রোগ্রাদের কাছাকাছি যাবার জন্য। "বলশেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি?" প্রবন্ধে লেনিন বোঝালেন যে, বুর্জোয়াদের এ প্রচারটা কেবল শ্রমিক শ্রেণীকে ভয় পাইয়ে দেবার মতলবে। এরপর এক পত্রে লেনিন লিখলেন, "অভ্যুত্থানের ব্যাপারে বিলম্ব করা চলে না, এই মুহূর্তে এগুনো দরকার।" ২০শে অক্টোবর গোপনে লেনিন পেত্রোগ্রাদে এলেন। ২৩শে অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে লেনিন রচিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হল। ২৯শে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হল স্তালিনের নেতৃত্বে একটি সামরিক বিপ্লবী কেন্দ্র। পার্টিতে হেরে গিয়ে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ বিশ্বাসঘাতকতার পথ নেয়, ফাঁস করে দেয় কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন সিদ্ধান্ত। লেনিন তাঁদের পার্টি থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলেন।

৬ই নভেম্বর লেনিন রাত্রে ছদ্মবেশে এলেন পেত্রোগ্রাদের স্মোলনি ইনস্টিটিউটে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য। শুরু হল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। শ্রমিক, সৈন্যদল ও নৌবাহিনী একযোগে ঝড়ের মতো আক্রমণ চালাল। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে পেত্রোগ্রাদে বিপ্লবী অভ্যুত্থান বিজয়ী হল। রাষ্ট্রক্ষমতা এল সোভিয়েতগুলির হাতে।
সন্ধ্যায় স্মোলনিতে বসল দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস। লেনিন শান্তি ও ভূমি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি প্রস্তাব আনেন, অবিলম্বে ফ্রন্টে যুদ্ধ বিরতির জন্য সমস্ত যুধ্যমান দেশের জনগণ ও সরকারের কাছে ঘোষণা পাঠানো হোক। শান্তি ও জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব—প্রথম দিন থেকেই এই হল নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি। কংগ্রেসে শান্তি ও ভূমি ডিক্রি গৃহীত হল। ভূমি ডিক্রিতে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি মালিকানা উচ্ছেদ হল। প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রের সভাপতি নির্বাচিত হলেন লেনিন।

স্মোলনিতে হল নতুন সরকারের কর্মকেন্দ্র। এখান থেকেই পাঠানো হত সব নির্দেশ ও সার্কুলার। দেশের সব প্রান্ত থেকে লোকজন আসত। সবদিকেই ছিল লেনিনের নেতৃত্ব। কিছুই তাঁর নজর এড়াত না। তিনি ছিলেন এই বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি। "জনগণের প্রতি" আবেদনে তিনি তাদের সোভিয়েতগুলির চারপাশে দাঁড়াবার, নির্ভয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার কাজ হাতে নেবার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রের কাজটা নাকি শুধু ধনীদের পক্ষেই সম্ভব, এই মিথ্যা রটনার সমাপ্তি করতে হবে। উৎপাদন ও বণ্টনের উপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের লেনিনীয় খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয় সোভিয়েত সরকারের প্রথম দিনগুলিতেই। ঘোষিত হয় রাশিয়ার সমস্ত জাতির পরিপূর্ণ সমানাধিকার। স্তালিন ঐ ঘোষণাটি রচনা করেন এবং এতে স্বাক্ষর দেন লেনিন ও স্তালিন উভয়েই। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পাঠানো হয়েছিল ট্রটস্কিকে। ট্রটস্কি পার্টির নির্দেশ অমান্য করে শান্তির আলোচনা ভেঙে দেন। এই সুযোগে জার্মান সৈন্য নতুন করে আক্রমণ শুরু করে। প্রতিরক্ষার কাজে সমস্ত শক্তি ও সংগতি নিয়োগের প্রস্তাব করেন লেনিন।

১৯১৮ সালে ৬ই মার্চ পেত্রোগ্রাদে বসল পার্টির ৭ম কংগ্রেস। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এই প্রথম পার্টি কংগ্রেস। গৃহীত হয় 'যুদ্ধ ও শান্তির সিদ্ধান্ত'। পার্টির নতুন নামকরণ হয়। ১৯১৮-র মার্চে রাজধানী স্থানান্তরিত হল মস্কোতে। লেনিন বাসা নিলেন ক্রেমলিনে।

কিন্তু বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শত্রুরা চুপ করে রইল না। কেরেনস্কি বাহিনীকে চূর্ণ করা হল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যোগ দিল রাশিয়ার ধনী ব্যবসায়ী জমিদারদের সঙ্গে। এই 'হোয়াইট'রা তিন দিক থেকে সোভিয়েতকে গ্রাস করার জন্য হাঁ করে এল। বহু ত্যাগ ও কষ্টের মধ্যে রাশিয়ার মেহনতী মানুষ যে ক্ষমতা দখল করেছে, তা রক্ষা করতে তারা এগিয়ে এল। ১৯২০ সালের মধ্যে পরাজিত হল 'হোয়াইট'রা লালফৌজের হাতে। খাদ্য পরিস্থিতি হল গুরুতর। কুলাক ও চোরাবাজারীরা শস্য লুকিয়ে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে বিপ্লবকে মারতে চাইল। লেনিন ধ্বনি তুললেন, শস্যের সংগ্রামই সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম। শ্রমিকদের তিনি বললেন, 'কমরেডস, মনে রাখবেন, পরিস্থিতি সংকটজনক। বিপ্লবকে বাঁচাতে পারেন কেবল আপনারাই, আর কেউ নয়।'

প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি লেনিন ও সোভিয়েত বিপ্লবের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ ছড়াতে লাগল। লেনিন হল তাদের ভাষায় দানব দস্যু। তারা গুজব রটিয়ে চলল, লেনিনকে হত্যা করা হয়েছে। আর তাঁকে হত্যার চেষ্টাও চলল। ১৯১৮, ৩০শে আগস্ট। একটা কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছেন লেনিন। হঠাৎ সোশ্যালিস্ট রেভোলিউশনারি সদস্যা কাপলান রিভলবার থেকে শ্রমিকদের প্রিয়তম নেতার উপর গুলি চালাল। গুরুতর আহত হলেন তিনি। উল্লসিত হল শত্রুর দল।

কিন্তু লেনিন বেঁচে উঠলেন। তাঁর যে এখনও অনেক কাজ বাকী রয়েছে।

১৮১৮-১৯। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণে নামল। দশ লক্ষাধিক শত্রুসৈন্য চারদিক থেকে বেষ্টন করল নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রকে। গড়ে উঠল লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদ। স্তালিন ও জার্জিনস্কিকে পাঠালেন লেনিন প্রাচ্যফ্রন্টে শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য।

প্রকাশিত হল লেনিনের "প্রলেতারিয়ান বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি" বইখানা। এই শক্তিশালী রচনায় তিনি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি সুবিধাবাদের প্রবক্তা কাউটস্কির বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে ধরেন।

১৯১৯ মার্চ। লেনিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস। এতে তিনি "বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও প্রলেতারিয়ান একনায়কত্ব" বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করেন। এরপরই বসে পার্টির অষ্টম কংগ্রেস, প্যারি কমিউন দিবসে ১৮ই মার্চ। কমিউনিস্টরা সেদিন যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা বাস্তবে রূপায়িত করেছে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত। এ কংগ্রেসের কর্মসূচীতে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের গোটা পর্বটার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়।

১৯২০ সালের মার্চে নবম কংগ্রেসে লেনিন অর্থনৈতিক নির্মাণের পরিকল্পনা হাজির করলেন পার্টির সামনে। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের তিনি ছিলেন অনুপ্রাণক ও সংগঠক।

জুলাই-আগস্টে পেত্রোগ্রাদে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস পরিচালনা করেন লেনিন। ১৯২১-এ পার্টির দশম কংগ্রেসেরও পরিচালক ছিলেন তিনি। সেখানে তিনি ট্রটস্কি, বুখারিন প্রভৃতি উপদল-নেতাদের ক্রিয়াকলাপ ও পার্টি-বিরোধী গ্রুপের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব আনেন। শুদ্ধির ফলে পার্টি সুসংহত হয়, দৃঢ় হয় তার ঐক্য।

কাজে একেবারে ডুবে ছিলেন লেনিন। তাঁর একমাত্র বিশ্রাম ছিল ক্রেমলিনের ময়দানে একটু পায়চারি অথবা বিশেষ ছুটির দিনে ক্রুপস্কায়া ও মারিয়া ইলিনিচনার সঙ্গে মস্কোর উপকণ্ঠের পাহাড়ে একটু বেড়ানো। কাজের চাপে ও গুলির জখমের ফলে (একটি গুলি তখনও বের করা যায় নি) লেনিনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। নিজের শরীরের দিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিল না, কিন্তু অন্য কারও শরীর একটু খারাপ হলেই বড় ব্যস্ত হয়ে উঠতেন তিনি। গোর্কির অসুখের জন্য লেনিন তাঁকে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন।

১৯২২ সালের মার্চে পার্টির একাদশ কংগ্রেসে লেনিন ভাষণ দেন। রিপোর্টে তিনি নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রথম বছরের খতিয়ান করেন এবং সানন্দে জানান যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই অগ্রগতি শুরু হয়েছে, শ্রমিক-কৃষক ঐক্য। পার্টি কংগ্রেসে এই লেনিনের শেষ বক্তৃতা।

১৯২২ সালের গ্রীষ্মে অসুস্থ হয়ে পড়ে লেনিন মস্কোর উপকণ্ঠে গোর্কিতে চলে যান। চাষীরা ঝুড়ি বোঝাই ফলমূল এনে দিত। তিনি রেগে উঠতেন, বারণ করতেন, কিন্তু ফিরিয়ে দিতে পারতেন না পাছে তারা মর্মাহত হয়। সব খাবার তিনি রুগ্ন কমরেডদের মধ্যে বিলি করে দিতেন।

অক্টোবরে মস্কো ফিরে এসে আবার কাজে লাগলেন। সভাপতিত্ব করলেন জনকমিশার পরিষদের, অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে, বক্তৃতা দিলেন। ১৩ই নভেম্বর তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৪র্থ কংগ্রেসে রিপোর্ট দেন, "রুশ বিপ্লবের পাঁচ বছর ও বিশ্ব-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত।" ২০শে নভেম্বর মস্কো সোভিয়েত অধিবেশনে লেনিন তাঁর শেষ প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটি একক ইউনিয়ন রাষ্ট্রে মিলিত করার কর্তব্য তিনি হাজির করেন। এ প্রশ্নের সিদ্ধান্তের জন্য স্তালিনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়।

১৯২২-এর ডিসেম্বরে লেনিন ফের গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবার একটু সেরে উঠলেন জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে। এ সময় তিনি শ্রুতিলিখন দিয়ে যান তাঁর শেষ প্রবন্ধগুলির—'কংগ্রেসের নিকট পত্র', 'দিনলিপির পাতাগুলি', 'সমবায় প্রসঙ্গে', 'আমাদের বিপ্লব', 'কি ভাবে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন পুনর্গঠিত করা উচিত', 'বরং অল্প কিন্তু ভাল করে'। "বরং অল্প কিন্তু ভাল করে" এই প্রবন্ধে লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেন—রাশিয়া ভারতবর্ষ ও চীন মুক্তি-সংগ্রামের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে বলে সমাজতন্ত্রের জয় আজ পৃথিবীতে অবশ্যম্ভাবী।

লেনিন নির্দেশ দিলেন, সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য আবশ্যক ভারী শিল্পের বিকাশ, টেকনিক্যাল পশ্চাদপদতার অবসান, সারা দেশের শিল্পায়ন ও বৈদ্যুতিকরণ। তিনি বললেন, জনশিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে যেন কোন কুণ্ঠা না করা হয়। তিনি শেখালেন, প্রলেতারিয়ান রাষ্ট্রই হল সমাজতন্ত্র নির্মাণের মূল হাতিয়ার। পার্টি কর্মীদের কাছ থেকে কঠোর শৃঙ্খলা দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন নিজেই সে শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত রেখে যান। বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদের সম্পর্কে যেমন তিনি ছিলেন কঠোর ক্ষমাহীন, তেমনি ছিলেন বিনয়ী অনাড়ম্বর সংবেদনশীল। শত্রুরা তার বলিষ্ঠ ও শাণিত যুক্তির সামনে দাঁড়াতে সাহস পেত না। লেনিনের যুক্তি ছিল এত স্পষ্ট ও জোরালো যে তা শ্রোতাদের মনকে প্রথমে আলোড়িত, ক্রমে উদ্দীপিত ও শেষপর্যন্ত, চলতি ভাষায় বলা চলে একেবারে দখল করে বসত। নীতির প্রতি নিষ্ঠা ছিল তাঁর অবিচল। "নীতিনিষ্ঠ কার্যপদ্ধতিই নির্ভুল কার্যপদ্ধতি" বলতেন লেনিন। আর

জনগণের সৃজনশীল শক্তিতে তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস।

সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল তাঁর বিপ্লবপ্রতিভা। সত্য-দ্রষ্টার মতো বিভিন্ন শ্রেণীর গতিপ্রকৃতি ও বিপ্লবের সম্ভাব্য গতিপথের বাঁকগুলো পরিষ্কার তিনি দেখতে পেতেন, যেন সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে। লেনিন চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্তালিন দুটো ঘটনার উল্লেখ করেছেন:

"প্রথম ঘটনাটা নভেম্বর বিপ্লবের ঠিক আগে, যখন লাখ লাখ শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ও দেশের মধ্যে সংকটের তাড়নায় শান্তি ও মুক্তির দাবি তুলছে; যখন সেনাপতিরা ও বুর্জোয়ারা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাবার মতলবে সামরিক শাসন কায়েম করার চেষ্টা করছে; যখন সমস্ত তথাকথিত 'সোশ্যালিস্ট' পার্টি-গুলো বলশেভিকদের বিরোধী এবং তাদের জার্মান-গুপ্তচর বলে বদনাম রটাচ্ছে, যখন কেরেনস্কি বল-শেভিকদের আত্মগোপনে বাধ্য করার চেষ্টা করছে; যখন একদিকে অস্ট্রিয়া-জার্মানীর শক্তিশালী সৈন্যদল আমাদের ক্লান্ত ধ্বংসোন্মুখ রুশবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আর অন্যদিকে পশ্চিম ইওরোপের 'সোশ্যা-লিস্টরা' নিজ নিজ দেশের সরকারের সঙ্গে ভিড়ে গেছে 'চূড়ান্ত জয়লাভ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবার জন্য'......এ অবস্থায় বিদ্রোহ শুরু করার অর্থ সর্বস্ব পণ করা। কিন্তু লেনিন সে ঝুঁকি নিতে মোটেই ভীত হন নি, কারণ, তিনি জানতেন, বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী এবং বিজয়ও সুনিশ্চিত। লেনিনের এই বৈপ্লবিক দূরদৃষ্টি পরবর্তী ঘটনায় সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।"

"দ্বিতীয় ঘটনা—নভেম্বর বিপ্লবের প্রথম দিন-গুলির কথা—যখন গণপ্রতিনিধি পরিষদ বিদ্রোহী সেনাপতি জেনারেল দুখোনিনকে যুদ্ধ-বন্ধ ও জার্মানীর সঙ্গে আপস আলোচনা শুরু করতে বাধ্য করার চেষ্টা করছেন। মনে পড়ে, লেনিন, ক্রাইলেঙ্কো ও আমি পেত্রোগ্রাদের সর্বোচ্চ সমর-পরিষদে গেলাম দুখোনিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে। দুখোনিন ও সমর-পরিষদ সটান বলে দিল, তারা গণ-প্রতিনিধি পরিষদের হুকুম মানবে না। সে একটা মারাত্মক মুহূর্ত। সামরিক কর্মচারী সমর-পরিষদের বশবর্তী। সৈন্যদের কথাও কিছু বলা যায় না। তার উপর কেরেনস্কি পেত্রো-গ্রাদের দিকে অভিযান চালাচ্ছে। টেলিফোনের কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লেনিনের মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বোঝা গেল, একটা সিদ্ধান্তে তিনি পেঁাছেছেন। বললেন, বেতার স্টেশনে চল। আমরা দুখোনিনকে বরখাস্ত করে, তার জায়গায় কমরেড ক্রাইলেঙ্কোকে সেনাপতি নিযুক্ত করে এক বিশেষ আদেশ জারি করব এবং অফিসারদের ডিঙিয়ে সৈন্যদের কাছে আবেদন জানাব, তারা যেন সেনাপতিগুলোকে ঘেরাও করে ফেলে, যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় এবং জার্মান-অস্ট্রীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়—এ ছিল অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া। কিন্তু লেনিন ঘাবড়ালেন না, কারণ তিনি জানতেন, সৈন্যরা শান্তি চায় এবং শান্তি তারা প্রতিষ্ঠা করবেই। আমরা জানি, এ ক্ষেত্রেও লেনিনের দূরদৃষ্টি আশ্চর্যরকমভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়।"

১৯২৩ সালের মে মাসে লেনিন আবার গর্কিতে চলে আসেন। গ্রামের মুক্ত হাওয়া তাঁকে একটু সজীব করে তোলে। ছোটবেলার খেলার সাথী ভেরা এল তার ছেলেকে নিয়ে তাঁকে দেখতে। শ্রমিক প্রতিনিধিরা এল। হাসিমুখে সবার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন লেনিন। কিন্তু এই ভাল হওয়া বেশি দিন টিকল না।

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে লেনিন—ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ মারা গেলেন। এক মহাজীবনের অবসান হল।

কিন্তু মৃত্যু নেই লেনিনের। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে মেহনতী মানুষ যেখানে শোষণের অবসান ঘটিয়ে নবজীবনের পথে, সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছেন, যেখানে মুক্তিকামী মানুষ কলে কারখানায়, ক্ষেতে খামারে, শহরের রাজপথে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর মুখোমুখি আজও লড়ছেন, তাঁদেরই মধ্যে বেঁচে রয়েছেন লেনিন, লেনিন তাঁদের পথ প্রদর্শক, মহানায়ক। দীর্ঘজীবী হোন কমরেড লেনিন।

[গণশক্তি লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৭০ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

[গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে: ১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ও কমিউনিস্ট শাসকগোষ্ঠীর, সাম্প্রতিক কার্যকলাপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমেত অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণমুখী হতে সাহায্য করছে। সমাজতান্ত্রিক শিবির যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি আক্রমণ, প্রতিটি হস্ত-ক্ষেপ, প্রতিটি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে—তারজন্যে ভারতের যুবসমাজকে জনমত সৃষ্টি করতে হবে ভারতের যুব শক্তিকে এইভাবেই আগামী দিনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল দল-মতের যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।' ইনক্লাব—জিন্দাবাদ

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, গৌহাটী শাখার অভিনন্দন পত্র

বন্ধুগণ,

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করে এনে যে স্নেহ আর সম্মান দিয়েছে, তার জন্য আমরা এই উৎসবের কর্মকর্তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর সাথে সাথে এই সম্মেলনের প্রতি শুভেচ্ছা আর বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আসামের বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত ছ'মাস ধরে বিদেশী বহিস্করণ আন্দোলনের ফলে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে আর এই আলোড়নে আসামের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে বেশ ভালোভাবেই নাড়া দিয়েছে।

বর্তমানের এই আন্দোলনের মূলে যে অসমীয়া মানুষের ভয় আর ভাবাবেগ কাজ করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিদেশীর প্রাবল্যে অসমীয়ারা নিজের ঘরেই সংখ্যালঘু হওয়ার আশংকা করেছে। তাছাড়া এই অবস্থায় আর্থিক বিকাশ, উদ্যোগীকরণ, কর্মসংস্থান আর কৃষি সংস্কারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তথা রাজ্যিক সরকারের দৃকপাতহীন মনোভাবের ফলে যে অন্তহীন নির্মম শোষণ আর বঞ্চনা চলছে তাও আসামবাসীদের মনে প্রচন্ড ক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে।

আসামবাসীর এই ন্যায়সঙ্গত ভয় আর ক্ষোভকে সাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদী আর ঐক্যবিরোধী শক্তিগুলো ব্যবহার করে আসামে হিংসা আর সংঘর্ষের এক দাবানল সৃষ্টি করেছে। বিদেশী সনাক্তকরণ আর বহিস্করণের মত একটা জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনা আর ন্যায়িক বিধি ব্যবস্থার বাইরে অন্য পথ নেই। এবং এই শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আর সহযোগিতাকে উপেক্ষা করার ফলে বিদেশী বিতাড়নের পরিবর্তে আসামের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের মনে শত শত বছর ধরে চলে থাকা ঐক্য আর সম্প্রীতির উপরে এক প্রচন্ড আঘাত আসলো; ভাষিক আর ধর্মীয় উভয় সম্প্রদায়েরই রক্ত ঝরলো; হাজার হাজার পরিবার সর্বস্বান্ত হলো। আর সংখ্যালঘুদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মরণপণ সংগ্রামকারী গণতান্ত্রিক সংগঠন, দল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরাও এই অমানুষিক আক্রমণের শিকার হলেন। ভ্রাতৃঘাতী আর সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলি বর্তমানের আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক ঐক্য আর ভারতের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার বিরুদ্ধে পরিচালিত করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরও দীর্ঘদিন থেকে তেমন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

আবার এই আন্দোলনকে মূলধন করে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা আসামের সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রা অচল করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। গরীব কৃষক শ্রমিকের অবস্থা জঘন্যতম হয়েছে। বাজার নেই, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য নেই, হাজিরা নেই। শ্রমিকের মজুরী আর অন্যান্য দাবী-দাওয়ার আন্দোলনও একেবারে বন্ধ। শিক্ষাজগতেও সেই একই অচলাবস্থা। শিক্ষাজীবনের একটা অমূল্য বছরও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপদ নেমে আসছে। বিভিন্ন ভাষা ধর্মের মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা বৃহৎ অসমীয়া জাতির ভাষা সংস্কৃতির বিকাশের পথে বাধা পড়েছে। মুসলমান কৃষিজীবী আর চা মজদুর, যারা অনসমীয়া হয়েও অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি গ্রহণ করে অসমীয়া জনসমাজের সাথে মিশে গিয়েছেন, তাদের মধ্যেও সন্দেহ আর ভীতি জন্ম নিয়েছে। এককথায় অসমীয়া জাতি আর ভাষা সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক সংগ্রামী আর ঐক্যবদ্ধ পরম্পরার ওপরে প্রতিক্রিয়াশীলরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গৌহাটী শাখা আসামের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মিলন আর ঐক্যের পতাকাকেই উর্ধে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি আসামের বিপ্লবী সংস্কৃতির অগ্রদূত আর এই সংঘের কর্মী জ্যোতিপ্রসাদ, বিষ্ণুরাভা আর মঘাই ওজা প্রভৃতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে রক্ষা আর প্রবাহিত করতে, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ আর ঐক্যকে সুনিশ্চিত আর প্রবাহিত করে আসামে মিলিত সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে তুলতে। সেই উদ্দেশ্যে এই সংঘের জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের পূর্বসূরীরা নিজের সীমিত শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করে আসছেন। আমরাও ব্যাতিক্রম নই। আর তাই বিদেশী সনাক্তকরণ আর বহিস্করণের ক্ষেত্রে আমরা এক শান্তিপূর্ণ, ন্যায়িক আর গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার দাবী করি আর বর্তমানের উত্তেজনা আর ভ্রাতৃঘাতী হিংসার অন্ত ফেলানোর জন্য জনগণের

[শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায়]

রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা

অশোক ভট্টাচার্য্য

অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব গত ২৩শে থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নানা দিক দিয়ে এবারের যুব-ছাত্র উৎসব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। প্রথম কারণটি হ'ল—এবারই ক'লকাতার গন্ডী পেরিয়ে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহর এই উৎসবটির আয়োজক। দ্বিতীয় কারণটি হ'ল--পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশের সংস্কৃতির প্রতিফলন এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। তৃতীয়টি—ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা। উপরের প্রথম দুট কারণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা নিঃসন্দেহে এবারের যুব-ছাত্র উৎসবের একটি রাজনৈতিক তাৎপর্যবাহী ঘটনা। কোলকাতার বাইরে যুব-ছাত্র উৎসব কতখানি সফল হ'তে পারে এনিয়ে যেমন সরকারী পর্যায়ে এবং অভিজ্ঞ মহলে আশংকা ছিল, তেমনি শিলিগুড়ির একজন যুবকর্মী হিসেবেও নিজেদের উপর পূর্ণ আস্থা কখনই রাখতে পারি নি। কারণ কোলকাতার বাইরে উত্তরবঙ্গের যাঁরা এই যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তুতি কমিটির কর্মকর্তা বা কর্মী ছিলেন তাঁদের অনেকেরই যুব-ছাত্র উৎসব সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোনও পরিষ্কার ধারণা ছিল না। যে যুব-ছাত্র উৎসব এ' বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হ'ল তা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে। সেই ভাবেই প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল, কিন্তু লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন ইতিমধ্যে এসে পড়ায় উৎসবের দিনটিকে পিছিয়ে দিতে হয়। স্বাভাবিক ভাবে যুব-উৎসব প্রস্তুতির সাথে যুক্ত কর্মীদের জড়িয়ে পড়তে হয় বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। স্কুল-কলেজগুলোও এই সময় হয় বন্ধ ছিল নতুবা স্বাভাবিক ক্লাস ব্যাহত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক কাজগুলোকে চালু রাখতে হয়। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বহু ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতাগুলোতে নাম লেখায়। লোকসভার নির্বাচনের পর যুব-ছাত্র কর্মীরা এই উৎসবের কাজে দায়িত্ব সহকারে এগিয়ে আসতে থাকে। কেন্দ্রীয় অফিসে স্থান সংকুলানের অভাব ঘটে ছাত্র-ছাত্রী কর্মীরা বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে গিয়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশ গ্রহণ করবার আবেদন জানায়। ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের অনুষ্ঠান শুরু হয় উত্তরবঙ্গের তিনটি কেন্দ্রে। শিলিগুড়ি কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলো প্রথম দিন থেকেই এমনভাবে শুরু হয় যা আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড়ই ছিলো ব্যাপক। আনন্দের কথা এই অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনায় যত স্বেচ্ছাসেবক ছিল তার সবটাই ছাত্র-ছাত্রী কর্মী। সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রতিযোগিতাগুলোতে শুধু মাত্র প্রতিযোগীদেরই ভীড় হ'ত না, তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরও ভীড় হ'ত প্রচুর। বিচারক হিসাবে শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের যাদের কাছেই আবেদন করা হয়েছিলো তারাই সাড়া দিয়েছিলেন অকুণ্ঠচিত্তে। এমন অনেক বিচারককে দেখা গেছে যেদিন তাঁদের বিভাগের প্রতিযোগীতা ছিল না, তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত কাজকে উপেক্ষা করেও দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। কি বিচারক, কি অভিভাবক, কি প্রতিযোগী সকলের মুখেই ছিল একটি কথা উত্তরবঙ্গের মানুষ এই ধরনের সুযোগ কোনও দিন পায় নি। চূড়ান্ত পর্যায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল দারুণভাবে সফল, প্রতিযোগীদের গুনাগুণ বিচারও ছিলো উন্নত। পশ্চিমবঙ্গের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ সুদূর কোলকাতা থেকে এগিয়ে এসেছিলেন শিলিগুড়ি শহরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুষ্ঠানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে। অন্যান্য প্রতিযোগীদের সংখ্যার দিক দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ছিলো আরও ব্যাপক।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রতিটি দিনই তিলক ময়দানে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, সাধারণ মানুষের প্রচুর সমাগম ঘটেছিলো। ভলিবল, খো-খো, হা-ডুডু, কাবাডি প্রতিযোগিতাগুলো দেখতে প্রচুর সংখ্যক মানুষের ভীড় হয়েছিলো। প্রতিটি মুহূর্ত ছিল উত্তেজনায় ভরা। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের অন্যান্য শহর থেকেও বিচারকরা এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। শিলিগুড়ির অনেক ক্রীড়া অনুরাগী মানুষের মুখেই শোনা যায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এই শহরে ইতিপূর্বে কখনও এত ব্যাপকভাবে সফল হয় নি। প্রতিযোগিতার বিষয়গুলোর মধ্যেও ছিল নতুনত্ব। সেদিক দিয়েও এই অনুষ্ঠান মানুষকে আরও বেশী আকর্ষিত করে। এবারের রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য হ'ল প্রতিযোগিতায় নেপালী ও আদিবাসী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন। দার্জিলিং শহরে ১লা, ২রা, ৩রা ফেব্রুয়ারী নেপালী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের

মধ্য দিয়ে শহরটি রূপ নিয়েছিলো ছোটো খাটো উৎসবের। প্রতিযোগীদের সংখ্যা ও মান ছিল অভিনন্দন যোগ্য। নেপালী-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে হয় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন নতুবা অন্য যেকোনো ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন অনুষ্ঠানকে সফল করতে। দার্জিলিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বড় অংশ পালন করেছে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব। চা-বাগান ও গ্রামাঞ্চলের আদিবাসীদের সমবেত নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। যে নৃত্য ও সঙ্গীত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধুমাত্র তাদের সমাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল সেই নৃত্য ও সঙ্গীতের যে একটি প্রতিযোগিতা হ'তে পারে ইতিপূর্বে তার প্রতিফলন কোথাও ঘটেছে কিনা জানা নেই। তরাই এলাকার প্রায় ১৬টি দল গত ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক ময়দানে যুব-ছাত্র উৎসব উপলক্ষ্যে আদিবাসী নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শহরের মানুষকে এই অনুষ্ঠানের কথা না জানানো সত্ত্বেও দু'টো দিনই প্রায় ৩ হাজার করে লোকের সমাগম ঘটেছিলো, মানুষ তাদের নৃত্য ও সঙ্গতকে মুহু-র্মুহু অভিনন্দন জানিয়েছে করতালির মধ্য দিয়ে। আদিবাসী ভাই বোনেরা পেয়েছে প্রাণভরা ভালবাসা ও প্রেরণা। এবারের যুব-ছাত্র উৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি কি হ'তে পারে এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়েই মানুষের

প্রদর্শনী দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু

তা বোধগম্য হয়েছিল। ২৩শে থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারীর দিনগুলো যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ততই মানুষের মধ্যে উৎসাহ বাড়তে লাগল। শারদ উৎসবের দিনগুলোর আগমনকে কেন্দ্রকরে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেমন পড়ে যায় আনন্দের প্রতিধ্বনি তেমনি ভাবেই আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল যুব-ছাত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে। ছাত্র টিকিট পেতে হাজার-হাজার স্কুল-কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের বিশাল লাইন দেখে প্রস্তুতি কমিটি হতভম্ব হয়ে যায়। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরই টিকিট দেওয়া সম্ভব হয় নি। ছাত্র টিকিটকে কেন্দ্র করে স্বার্থান্বেষী মহলের বিশৃংখলা সৃষ্টির কিছু সুক্ষ্ম চক্রান্ত থাকলেও সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যে যুব-ছাত্র উৎসবকে তাদের নিজেদেরই উৎসব বলে ধরে নিয়ে ছাত্র টিকিটের দাবী জানিয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। এদের একটি অংশকে যতই উত্তেজিত করবার চেষ্টা থাকনা কেন, যখনই উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ বসু সেই সমস্ত উত্তেজিত ছাত্রদের সাধারণ টিকিট নিতে আবেদন জানান, তখনই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সাধারণ টিকিটই সংগ্রহ করে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কতখানি সহযোগিতার মনোভাব ছিল তা এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়। মূল উৎসবের ৭ দিনে প্রতিদিন যে ৪০ হাজার লোকের সমাগম ঘটেছিল তা শুধু শিলিগুড়ি শহরেরই নয়, তার মধ্যে একটি ভাল অংশ ছিল গ্রামাঞ্চল ও চাবাগানের। মানুষ এসেছিলো প্রতিদিনই জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার, ইসলামপুর থেকেও। সাধারণভাবে শিলিগুড়ি শহরের মানুষ দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করেই বাঁধ-ভাঙ্গা জনস্রোত দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু এই যুব-ছাত্র উৎসবের এই জনস্রোত মানুষকে দিয়ে গেছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। হিলকার্ট রোড, সেভক রোড সহ সমস্ত বড় বড় রাস্তাগুলো ধরে মানুষ চলেছে হয় ভানুভক্ত মঞ্চে নয়তো গুরুদাস বা ঋত্বিক নতুবা সমীরণ মঞ্চ বা তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে চলেছে যুব উৎসবের প্রাঙ্গণে প্রাণে প্রাণ মেলাতে। রাত ১টা বা সারারাত্রি ব্যাপী মানুষ উপভোগ করেছে অনুষ্ঠানগুলো, এই মঞ্চ থেকে ওই মঞ্চে ছুটে গেছে। মেয়েরা ঘুরেছে একা একাই, নির্ভয়ে। সমস্ত পরিবেশটাই গড়ে উঠেছিল এত সুন্দরভাবে যে সমাজবিরোধীদের বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করতেও সমীহ করতে হয়েছিল। উৎসবের অঙ্গণে যে ধরণের অবস্থায় কিছু মানুষকে দেখা যায় তারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল এই পবিত্র প্রাঙ্গণ থেকে। এই হাজার-হাজার মানুষের ভীড়েও একটিও ছিনতাই বা অশালীন কোন ঘটনা ঘটে নি। অনেক মেয়েরা অভিভাবক ব্যাতিরেকেই উপভোগ করেছে সারারাত্রি ব্যাপী অনুষ্ঠানগুলো। প্রতিটি দিনে সেই সেই অংশের মানুষের ভীড়ই ছিল বেশী। শিশু ও মহিলা দিবসে এই দুই অংশের ভীড় ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৫ হাজার শিশুর সুসজ্জিত সুশৃংখল ও মুখরিত মিছিল শিশুদিবসের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। হাজার-হাজার মানুষ এই মিছিল উপভোগ করে রাস্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে থেকে। মহিলা মিছিলটিও ছিল আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করা ৫-শত স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষে সম্ভব হ'ত না যদি না হাজার-হাজার সাধারণ দর্শক আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতেন। কোথাও কোনো বিশৃংখলা সৃষ্টির সামান্য প্রচেষ্টা হলেই দর্শকরা নিজেরাই সেখানে শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছিল। দর্শকদের পক্ষ থেকে কোন শিল্পীর ক্ষেত্রেও ন্যূনতম বাধা পর্যন্ত আসে নি। আসাম, ত্রিপুরা, কেরালা রাজ্যের এবং বিভিন্ন লোক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষ দারুণভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে। আসামের শিল্পীদের অনুষ্ঠান মানুষ এমনভাবে নিয়েছিল যে তাদের দিয়ে নির্দিষ্ট মঞ্চ ব্যাতিরেকেও আরও দু'টো মঞ্চে অনুষ্ঠান করান হয়েছিল। আসামের অনুষ্ঠান চলাকালীন মানুষ এমন সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শন দেখিয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসেবে আমাদের গর্বিত করে তুলেছিল। আসামের শিল্পীরাও এই ভালবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বে অভিভূত হয়ে উঠেছিলেন। অশ্রু সজল নয়নে তারা বিদায় নেয় উৎসব অঙ্গণ থেকে।

রেকর্ড সংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটেছিলো ২৯শে ফেব্রুয়ারী উৎসবের শেষ দিনটিতে। কিন্তু বাধ সাধল বৃষ্টি। বৃষ্টি সাময়িকভাবে শেষ হ'তেই মানুষ আবার সমবেত হ'ল ময়দানে। তাদেরই অনুরোধে আবার শুরু হ'ল অনুষ্ঠানগুলো। ৭টি দিনের উৎসব শেষ হ'তেই উৎসব মুখর শিলিগুড়ি শহরের প্রাণস্পন্দন কেমন বন্ধ হয়ে গেল। সকলের মুখেই একই কথা শহরটাকে যেন শ্মশান করে দিয়ে গেল। এই সরকারের অতি বড় সমালোচকও বলতে বাধ্য হয়েছে এত সুশৃংখল ও এত সফলভাবে ৭টি দিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে কেবলমাত্র সুশৃংখল আদর্শবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বই। ৭টি দিনের একটি দিনেও ন্যূনতম বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় নি, অনেক মানুষের কাছে এটাই একটা ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রস্তুতি-কমিটির নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেছে সাধারণ মানুষ। অনুষ্ঠানগুলোর বৈচিত্র দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলেছে। আলোচনা চক্রগুলোতে বিপুল মানুষের ভীড় প্রমাণ করেছে মানুষ জানতে চায়।

অনেক মানুষেরই ভাল লেগেছে এই উৎসবে শ্রমিক-কৃষক-গরীব মানুষের বিপুল সমাবেশ দেখে। উৎসবের শেষটাকে শিলিগুড়ি শহরের মানুষ কিছুতেই যেন

মেনে নিতে পারছে না। একটি স্থানীয় ইন্দিরা কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা উৎসবের কয়েকদিন আগে মন্তব্য করেছিল "এই যুব-ছাত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের কোন উৎসাহ নেই"। তাদের সে গুড়ে বালি দিয়ে ১৯৭৯-৮০ সালের যুব-ছাত্র উৎসবের বিরাট সাফল্য উত্তরবঙ্গের গণতান্ত্রিক মানুষের মনে নতুন আত্মপ্রত্যয় জন্মে দিয়েছে। সাংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতার বাইরেও বাঙলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা ও এগিয়ে নেওয়া যায়, শিলিগুড়িতে যুব-ছাত্র উৎসব তাই প্রমাণ করেছে। যুব-ছাত্র উৎসবের এই সাফল্যের সিংহ ভাগেরই দাবীদার নিঃসন্দেহে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের জনগণ। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে।

টিকিট কাউন্টারে দর্শকদের বিরাট লাইন

এবারের যুব-ছাত্র উৎসবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সমীর গুপ্ত

পশ্চিমবাংলার ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে সুস্থ সামাজিক এবং সংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তোলার অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে যুব-ছাত্র উৎসব উদ্‌যাপনের যে কর্মসূচী ক্ষমতায় আসীন হবার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছিলেন এবারের যুব-ছাত্র উৎসব কর্মসূচী পালনের মধ্যদিয়ে তা আরো পরিণত রূপলাভ করলো। বিশ্ব যুব উৎসবের অংশ হিসাবেই বিগত যুব-ছাত্র উৎসব পালিত হয়েছিল। কিউবার হাভানা শহরের বুকে বিশ্ব যুব-ছাত্র সংস্থা সমূহ সারা দুনিয়ার যুব-ছাত্র সমাজের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুব-ছাত্র উৎসবে সামিল হবার আহ্বান জানিয়েছিল। পশ্চিমবাংলার যুব-ছাত্র সমাজের কাছে বিশ্ব যুব-ছাত্র সমাজের আহ্বান পৌঁছে দেবার অংশ হিসাবেও বিগত বছরের যুব-ছাত্র উৎসব পালিত হয়েছে।

এবছর বিশ্ব যুব-ছাত্র সমাজের কোন কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানসূচী ছিল না। দুনিয়াব্যাপী যুব-ছাত্র সমাজের কোন কেন্দ্রীয় আহ্বান না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যের যুব-ছাত্র সমাজের কাছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আহ্বান পৌঁছে দেবার মঞ্চ হিসাবে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তুতি কমিটি (১৯৭৯-৮০)" গঠন করেছিলেন। উৎসবের জৌলুসে যুবমানসে শুধুমাত্র আনন্দের খোরাক যোগাবার জন্য নয়—সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাধারণ চেতনার যুব-ছাত্র সমাজকে উৎসবের প্রাঙ্গণে সমবেত করা, এবং উৎসবে অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে যুবমানসে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্য নিয়েই আয়োজিত হয়েছিল যুব-ছাত্র উৎসব। বিগত বছরের চাইতে বহুবিধ স্বাতন্ত্র নিয়েই অনুষ্ঠিত হলো এবারের উৎসব।

অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মতো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কলকাতাই পশ্চিমবাংলার পীঠস্থান। সেকারণেই এযাবৎ সমস্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনই হয়েছে কলকাতা শহরে। সারা রাজ্যের মানুষের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার আহ্বান ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবারের উৎসব অনুষ্ঠানের আসর বসেছিল, উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি শহরে। উত্তরবাংলার পাঁচটি জেলাতেই যুব-ছাত্র সমাজের ব্যাপক অংশ গ্রহণের লক্ষ্য নিয়েই শুরু থেকে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। উৎসবের দিনগুলিতে উৎসব সংগঠকদের মুখ সাফল্যের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে উৎসবমুখর শিলিগুড়ি শহরের চেহারা দেখে। উৎসবের সময় যেন উত্তরবাংলার যৌবনশক্তির ঢল নেমেছিল উত্তরবাংলার প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ি শহরে। যৌবনের উৎসব প্রাঙ্গণে স্ত্রী-পুরুষ, শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী মিলে মিশে একাকার।

সমগ্র উৎসব অনুষ্ঠানকে বিশেষ গতিবেগ সঞ্চার করেছে উৎসবের অন্যতম অঙ্গ, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানসমূহ। মূল উৎসবের অনেক আগেই শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো দু'টি কেন্দ্রে—শিলিগুড়ি শহর এবং মেদিনীপুর শহরে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হিসাবে স্থান নির্ধারিত হয়েছিল কলকাতা, মেদিনীপুর, রায়গঞ্জ, কুচবিহার, শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিং শহর। মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত হলো শুধুমাত্র আদিবাসীদের ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। সারারাজ্যে যুব-ছাত্র সমাজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কেন্দ্র হিসাবে বাছাই করা হয়েছিল শিলিগুড়ি শহর। কলকাতা, রায়গঞ্জ, কুচবিহার এবং শিলিগুড়ি শহরে প্রাথমিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হল বাংলাভাষার চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। আর দার্জিলিং শহরে নেপালীভাষীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। এছাড়াও আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হলো শিলিগুড়ি শহরে।

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান কেন্দ্রের হিসাব থেকেই বিগতবছরের চাইতে এবারের অনুষ্ঠানের স্বাতন্ত্র বোঝা যাচ্ছে। মূল উৎসবের একমাসেরও বেশী সময় আগে থেকে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ফলে রাজ্যের ভাবী সংস্কৃতিক শিল্পী এবং ক্রীড়াবীদেরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে কার্যতঃ ৭ দিনের উৎসব অনুষ্ঠানের সময় সীমাকে বাড়িয়ে নিয়ে গেলেন ৩৮ দিনে। ২১শে জানুয়ারী তারিখে কলকাতায় যে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার শুরু তা রায়গঞ্জ এবং কুচবিহার শহরে গিয়ে শেষ হল ১৪ই ফেব্রুয়ারী, '৮০ তারিখে। পরের দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে শিলিগুড়ি শহরে শুরু হল বাংলাভাষার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। চললো ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। মাঝের দু'দিন বাদ দিয়ে শিলিগুড়ি শহরে মূল অনুষ্ঠানের শুরু ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে। একটানা ৩১ দিনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন ৬৭৯১ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতী।

শিশু দিবসে শিশুদের বর্ণাঢ্য সমাবেশ

একই মঞ্চ থেকে একাধিক ভাষাভাষীদের জন্য একাধিক স্থানে এজাতীয় প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান সম্ভবতঃ পশ্চিমবাংলার বুকে এই প্রথম। বর্তমান রাজ্য সরকার আয়োজিত বিগত যুব উৎসবের প্রাথমিব ঘোষণাতেও একাধিক ভাষাভাষীদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষীদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এবারে পূর্ব ঘোষণ অনুযায়ী আঞ্চলিক ভাষায় সাঁওতালীদের, হিন্দী ভাষায় আদিবাসীদের, নেপালী ভাষী এবং বাংলা ভাষার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক অংশের ভাষাভাষীদের অনুষ্ঠানেই বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন।

উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিতাভ বসু, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ঘোষণায় বলেছেন—"আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিবেশে, বহু বিচিত্র চেহারার প্রতিযোগিতা চলছে সমাজের সর্বত্র।। ব্যক্তি প্রতি-যোগিতার এমনি পরিবেশে আমরা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। বর্তমান সমাজের ব্যক্তি প্রতিযোগিতার সাধারণ চেহারার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বা ক্রীড়া জগতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অসংখ্য ব্যক্তির মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া চর্চা বৃদ্ধিই এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য।...বিভিন্ন বিষয়ে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থাও আমরা করেছি। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা।" এই স্বচ্ছ দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবীরা এবং বিচারক মণ্ডলীও সংগঠকদের এই মনোভাবের কথা জেনেই অনুষ্ঠান সফল করতে এগিয়ে এসেছেন।

মেদিনীপুরের অনুষ্ঠান

আঞ্চলিক ভাষী সাঁওতালীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাঁওতাল অধ্যুষিত মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে। মেদিনী-পুরের অরবিন্দ ষ্টেডিয়ামে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রায় দশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সর্বমোট ১৬টি বিষয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সমবেত নৃত্য (করম নাচ) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২১টি দলে সর্বমোট ২৭২ জন সমবেত নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। মেদিনীপুরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগিদেরই উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে স্মারক উপহার দেওয়া হয়। চেতনার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সাঁওতালী সম্প্রদায়ের ছাত্র-যুবদের সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া চর্চায় উৎসাহিত করার জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা। সাঁওতালীদের ৫২ জন প্রতিযোগীর সকলকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মেদিনীপুর জেলার গণ-আন্দোলনের শ্রদ্ধেয় নেতা সুকুমার সেনগুপ্ত। এছাড়াও রাজ্য সরকারের আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শম্ভু মাণ্ডি মহাশয়ও সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অরবিন্দ ষ্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হয়।

দার্জিলিংয়ে নেপালী ভাষার আসর

১লা থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী দার্জিলিং শহরের জি. ডি. এন. এস. স্কুলে নেপালী-ভাষীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সময়কালে দার্জিলিং শহরের সমস্ত স্কুল-কলেজে শীতকালীন ছুটি চলছিল তা সত্ত্বেও প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান সফল করতে দূর-দূরান্তের পাহাড়ী এলাকা থেকেও প্রতিযোগীরা ছুটে এসেছেন। একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের তিনদিন থাকা এবং সমস্ত প্রতিযোগীদের জন্যই থাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সিকিম এবং ভুটানের কিছু সংখ্যক প্রতিযোগীও আলোচ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠানের তিনদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানেই দার্জিলিং শহরের মানুষ দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দর্শকেরা যেমন অনুষ্ঠান দেখে আনন্দ উপ-ভোগ করেছেন, তেমনি প্রতিযোগীরাও দর্শকে ঠাসা হলে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও নেপালীভাষার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠকেরাই স্বেচ্ছায় বিচারকের আসন অলংকৃত করতে এগিয়ে এসেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নেপালীভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধি-জীবীরা দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছেন। সারা রাজ্যব্যাপী প্রবল আন্দোলনের ঢেউ না উঠলেও নেপালীভাষা অধ্যুষিত দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় বিগত কিছু দিন আগেও প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সারা রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মানুষই নেপালীভাষীদের এই সংগ্রামকে সমর্থন যুগিয়েছেন। কি কংগ্রেস, কি জনতা পার্টির সরকার—কোন কেন্দ্রীয় সরকারই নেপালীভাষীদের এই দাবীকে তখনো পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি। যদিও উভয় দলই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বাইরে থাকাকালীন নেপালী-ভাষীদের এই এই দাবীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

নেপালীভাষীদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীকে নির্বা-চনী বিজয়ের কাজে উভয় দলই ব্যবহার করেছেন। অথচ পশ্চিমবাংলার বামপন্থী সরকার নিজস্ব ভাষা-নীতি অনুযায়ীই নেপালীভাষার প্রতিও যথাযথ মর্যাদা দেখিয়েছেন। রাজ্য সরকারী ক্ষমতায় আসীন হবার পরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কথা খোলাখুলি সাধারণ মানুষকে জানিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় নেপালীভাষার সমর্থনে উত্থাপিত সরকারী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হয়েছে। কিন্তু আজো পর্যন্ত এই দাবী সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত আলোচ্য অনু-ষ্ঠানের মধ্যদিয়েও নেপালীভাষার স্বীকৃতির দাবীই আর একবার জোরালো সমর্থন লাভ করলো। একই সাংগঠনিক মঞ্চ থেকে বাংলাভাষার সাথে সাথে নেপালী-ভাষার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন হওয়াতে নেপালীভাষীরাও অনেক বাড়তি উৎসাহ নিয়ে প্রতি-কূল প্রাকৃতিক পরিবেশ সত্ত্বেও প্রতিযোগিতা অনু-ষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করতে সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বিষয় সমূহের মধ্যে ছিল—একাংক নাটক, সমবেত নৃত্য ও সংগীত, একক সংগীত, আবৃত্তি, বিতর্ক, প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা রচনা। নেপালীভাষার প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগীদের মধ্যে উৎসবের মূলমঞ্চে পুরস্কার বিতরণ করা ছাড়াও দার্জিলিং শহরের প্রতিযোগিতা-কেন্দ্রেও পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল।

কলকাতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা

মূলতঃ উত্তরবাংলা ভিত্তিক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হলেও দক্ষিণবাংলার প্রতিযোগীদের প্রাথমিক পর্বের বাছাই করার জন্য কলকাতায় প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২১শে জানুয়ারী থেকে ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত এবং ১২ই, ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করা

আদিবাসী দিবসের মিছিল

সম্ভব হয়নি। আর্থিক সমস্যার কারণে দক্ষিণবাংলার অনেক প্রতিযোগীর পক্ষেই অংশ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও দক্ষিণবাংলার প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ২৪৫৭ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছেন। বহু সংখ্যক ছাত্র-যুবর পক্ষে আলোচ্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি শহরের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য কলকাতা শহরে প্রাথমিক বাছাই কেন্দ্রের আয়োজনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হলেও চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অর্থ ব্যায় করে যাওয়া প্রায় অসম্ভব— এমন চিন্তা সত্ত্বেও প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হয়ে শিলিগুড়ি শহরের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন এমন প্রতিযোগীর সংখ্যা একাধিক। এদের নিজস্ব আর্থিক সঙ্গতির অভাব থাকলে এদের শুভানুধ্যায়ীরাই আর্থিক সাহায্য যুগিয়েছেন। এদিক থেকেও শিলিগুড়ি শহর থেকে বহু দূরে অবস্থিত কলকাতার শহরে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন সার্থক হয়েছে।

উত্তরবাংলার প্রাথমিক বাছাইয়ের আসর

উত্তরবাংলার ব্যাপক সংখ্যক প্রতিযোগীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি এবং কুচবিহার শহরে তিনটি কেন্দ্রে পৃথকভাবে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ফলও ফলেছে ভালো। উৎসব কমিটির প্রাথমিক ঘোষণাতেই এই তিন কেন্দ্রে পৃথকভাবে প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ঘোষণা থাকলে আরো বেশী সংখ্যক প্রতিযোগীর অংশ গ্রহণ ঘটতো। দেরীতে হলেও উৎসব কমিটির এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। কুচবিহার এবং রায়গঞ্জ শহরের অবস্থান শিলিগুড়ি শহর থেকে বহু দূরে। দূরবর্তী এই শহর দুটিতে পৃথকভাবে প্রাথমিক বাছাই অনুষ্ঠানের আয়োজনের ফলে যুব উৎসবের প্রচারও যেমন ব্যাপকতা লাভ করেছে তেমনি এই দুটি শহরের যে সমস্ত মানুষের পক্ষে শিলিগুড়ি শহরে উপস্থিত হয়ে মূল উৎসব দেখা সম্ভব হয়নি তাঁদের অনেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে উৎসবের সমগ্র আয়োজনের এক ভগ্নাংশমাত্র হলেও প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন। যেমনটি পেরেছেন মেদিনীপুর দার্জিলিং শহরের ক্ষেত্রে। সাধারণের উপভোগের যে সুযোগ কলকাতার মানুষদের জন্য করা সম্ভব হয়নি সেই ব্যবস্থা মেদিনীপুর, দার্জিলিং এবং কুচবিহার শহরের মানুষের জন্য করা হয়েছিল।

রায়গঞ্জ, কুচবিহার এবং দার্জিলিং শহরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে, সূচনায় কিছু আলোচনা অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যুব উৎসবে মূল দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় সমূহের আলোচনা উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। আলোচনার বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বক্তা উৎসবের দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত সকলের কাছে তুলে ধরা ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে যুবসমাজের কর্তব্য এবং রাজ্যের সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে যুবসমাজের ভূমিকা প্রসঙ্গেও আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রসঙ্গে

প্রাথমিক অবস্থায় সর্বমোট সাতটি দপ্তর থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চলেছে। স্থানীয় ছাত্র-যুব সম্প্রদায় এবং সরকারী কর্মচারীদের যুক্ত উদ্যোগের ফলেই প্রাথমিকভাবে প্রতিযোগীদের নাম তালিকাভুক্তির কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে ৭টি দপ্তর থেকে আবেদনপত্র বিতরণ এবং গ্রহণ করে নাম তালিকাভুক্তির ফলে অনেক আবেদনকারীই নিজস্ব বসবাসের কাছাকাছি কেন্দ্র থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ডাকযোগে আবেদনপত্র সংগ্রহে ইচ্ছুক এমন ৪৭৮ জনকে ডাকযোগেও আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে।

একই সঙ্গে এতগুলো দপ্তর থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুকদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে করা সম্ভব হয়েছে—এমন দাবী করা যায় না। যে সমস্ত দপ্তর থেকে মূল দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি সে সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতিযোগীদের সামান্য বিষয়ে সাময়িক কালের জন্য হলেও বহুবিধ বিভ্রান্তিতে ভুগতে হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ের তৎপরতার ফলে অনেক বিষয়ই সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুকদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা ব্যতিরেকেও এত সংখ্যার কেন্দ্র থেকে একই সাথে প্রাথমিক প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। এজন্য উৎসব কমিটিকে বিরাট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীর সাহায্যও গ্রহণ করতে হয়েছে। কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হলেও একাধিক কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিকল্পনা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে।

গ্রহণ বিভ্রাট

পূর্বঘোষিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সমস্ত কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে পালিত হলেও ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সূর্য গ্রহণের কথা উৎসব সংগঠকদের জানা ছিল না এমন নয়। কিন্তু যেটা জানা ছিলনা সেটা হলো—সরকারী ছুটির ঘোষণা। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের অনুমানের নামে সংবাদ পত্রগুলির প্রচার এবং শেষ মুহূর্তে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলেজ মাঠে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ।

সরকারী ছুটি ঘোষণার ফলে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১৬ তারিখের সমগ্র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৭ই তারিখে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রেডিও মারফৎ এই পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হলেও যানবাহন সমস্যা এবং সঠিক যোগাযোগের অভাবের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন প্রতিযোগী ঐদিনের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি কলকাতা থেকে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ একজন প্রতিযোগী শিলিগুড়ি শহরে উপস্থিত হয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। দক্ষিণ বাংলার প্রতিযোগীরা ঐদিন সকালে যথাসময়ে শিলিগুড়ি শহরে উপস্থিত হলেও উত্তরবাংলার রাষ্ট্রীয় পরিবহণ বন্ধ থাকার কারণে উত্তরবাংলার প্রতিযোগীদের বিরাট অংশের নিশ্চিত অনুপস্থিতিকে এড়াবার জন্যই ঐদিনের অনুষ্ঠান পরবর্তী দিনে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয়। কয়েক জন প্রতিযোগীর পক্ষে ১৬ তারিখের প্রতিযোগিতায় পরের দিন অর্থাৎ ১৭ই তারিখে অংশ গ্রহণ সম্ভব না হলেও সাধারণভাবে প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানসূচী পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেই মেনে নিয়েছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশংসনীয় ভূমিকা

স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিচারকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলেই এই বিরাট আয়তনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সফল করা সম্ভব হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের বিরাট অংশই ছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। এর মধ্যে শিলিগুড়ি শহরের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা শিলিগুড়ি শহরের স্কুলগুলিতে উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন দলে দলে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য উৎসব দপ্তরে যোগাযোগ করেছেন তেমনি এগিয়ে এসেছেন স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা নিয়ে।

কলকাতায় ইতিপূর্বে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও উত্তরবাংলার কেন্দ্রগুলিতে এজাতীয়

উদ্যোগ এই প্রথম। স্বভাবতই অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে সমগ্র অনুষ্ঠানকে আরো সুন্দর করে তোলার কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে—একটা সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বেচ্ছাসেবকেরা এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে এসেছেন উন্নত সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে, সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটাবার জন্য।

সর্বমোট ৫৮৫ জন স্বেচ্ছাসেবক সমগ্র অনুষ্ঠান (মূল উৎসব অনুষ্ঠানের বাইরে) পরিচালনায় অংশ নিয়েছেন। এদের মধ্যে কমপক্ষে ১২৩ জন প্রস্তুতির শুরু থেকেই সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন।

বিচারকেরা উৎসাহে এগিয়ে এসেছেন

প্রতিযোগিতা পরিচালনায় শিল্পী, সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরাও যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিচারকের আসন অলংকৃত করতে সম্মত হয়েছেন। অনেকেই নিজস্ব পেশার ক্ষতি-স্বীকার করেও সংগঠকদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রতিযোগিতা কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—সঙ্গীত শিল্পী শ্রী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রী ধীরেন মিত্র, ধীরেন বসু, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অংশুমান রায়, পূরবী দত্ত, অধ্যক্ষ কুমুদরঞ্জন ব্যানার্জী, ডাঃ শ্রী সুকুমার চ্যাটার্জী, গীতা চৌধুরী, সমরেশ ব্যানার্জী, নরেন মুখোপাধ্যায়, দীনেন চৌধুরী, আজিমুদ্দিন মিঞা, কঙ্কন ভট্টাচার্য্য, দিলীপ সেনগুপ্ত, উৎপলা গোস্বামী প্রমুখ। নৃত্য জগতের প্রখ্যাত শিক্ষক এবং শিল্পী এন. শিবশঙ্করণ, গোবিন্দ, কুনি, ক্ষান্তমুনি কুটি, বেলা অর্ণব, শান্তি বসু, স্নিগ্ধা ব্যানার্জী, শিবপদ ভৌমিক প্রমুখ। নাট্য জগতে শ্রী জ্ঞানেশ মুখার্জী, অনুপকুমার, বাসুদেব বসু, সুধী প্রধান, বিদ্যুৎ নাগ, অধ্যাপক দর্শণ চৌধুরী, বারিণ রায় প্রমুখ। আবৃত্তির আসরে উপস্থিত ছিলেন শ্রী প্রদীপ ঘোষ, রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, দীপঙ্কর মজুমদার, সৌমিত্র মিত্র, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস গাঙ্গুলী প্রমুখ। কবি ও সাহিত্যিক শ্রী অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, নেপাল মজুমদার, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, দিগ্‌বিজয় দে সরকার, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, পুষ্পজিত রায়, শ্যামসুন্দর দে প্রমুখ। চিত্র শিল্পী অধ্যক্ষ বিজন চৌধুরী, নির্মাল্য নাগ প্রমুখ। যন্ত্র শিল্পী শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বোডাস, দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল চক্রবর্তী প্রমুখ। সর্বমোট ১৯৭ জন বিচারক বিভিন্ন বিষয়ে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিযোগিতার বিষয় সমূহের মধ্যে আবৃত্তি (চারটি), রবীন্দ্র, নজরুল, মার্গ, কাব্যসঙ্গীত, লোকগীতি এবং গণসঙ্গীত, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, তবলা-লহরা, সেতার, একক নৃত্য, বার্ষিক পত্রিকা, প্রাচীর পত্রিকা, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা রচনা, একাংক নাটক, চিত্রাঙ্কণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিলিগুড়ি এবং মেদিনীপুর শহরে পৃথকভাবে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারী মূল উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। প্রথম স্থানাধিকারীদের সাধারণ মান থেকেই সমগ্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করা সম্ভব। সাধারণের মতে উচ্চমানের প্রতিযোগীরাই রাজ্য ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।

সমগ্র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ১১২ জন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। পুরস্কারের সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু এবং রাজ্য যুবকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাসের স্বাক্ষরযুক্ত মানপত্রও প্রতিযোগীদের উপহার দেওয়া হয়েছে।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা এবং প্রতিযোগিতার সংগঠকেরা প্রতিযোগিতার আঙ্গিনায় আগামী দিনের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সমবেত করার তৃপ্তি নিয়েই ঘরে ফিরেছেন। উচ্চমানের যে সমস্ত প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার আসরে সমবেত হয়েছিলেন, তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে চর্চা অব্যাহত রাখলে, অনেকেই সাধারণের কাছে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে পারবেন। প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি জগতের ভবিষ্যতেরা সকলে আলোচ্য আসরে অংশ নিয়েছেন এমন কথা হলফ করে বলতে না পারলেও, নিঃসন্দেহেই বলা যায়—এদের অনেকেই আরো অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারবেন। মূলতঃ যে বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেই বয়সটা হল—গড়ে ওঠার বয়স। এই বয়সে চাই অফুরন্ত উৎসাহ, উদ্যোগ এবং ধৈর্য। এই তিনটি বিষয়েরই মিলন ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তুতি কমিটি (১৯৭৯-৮০) আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়। সেদিক থেকে আলোচ্য অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনেকের মধ্যেই ভবিষ্যতের জন্য বাড়তি উৎসাহ নিয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বিশাল উদ্যোগ সৃষ্টির উন্নত মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকে সামান্য পরিমাণে হলেও রাজ্যের ভবিষ্যৎ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সুস্থভাবে গড়ে তোলার কাজেও উৎসব কমিটি আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান যথেষ্ট সফল ভূমিকা পালন করেছে।

যুব-ছাত্র উৎসবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অরুণ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব ১৯৭৯-৮০-এর অঙ্গ হিসাবে যুব কল্যাণ বিভাগ-এর তরফ থেকে রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ির তিলক ময়দানে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। এটি এই বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রথম রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো কলকাতার রনজি স্টেডিয়ামে ১৯৭৮ সালের ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল তারিখে। উল্লেখ্য, ঐ বছরেই কিউবার হাভানায় একাদশ বিশ্ব যুব-ছাত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং তারই সঙ্গে সংগতি রেখে যুবকল্যাণ বিভাগ ১ম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের আয়োজন করেছিলো।

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে আমাদের আয়োজন এবার পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারেনি। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক অসুবিধার জন্য সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেননি এবং শিলিগুড়িতে বাসস্থানের অভাবের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয়ও অনেক কাটছাঁট করতে হয়েছিলো।

প্রাসংগিক ভাবেই আমাদের যুবকল্যাণ বিভাগের রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক বিষয়ের কথা আসে, আর সেইজন্যই এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। ক্রীড়া ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা এই বিভাগ আয়োজিত যুব-ছাত্র উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই তিনটি পর্যায় হ'ল ব্লক, জেলা ও রাজ্য। যেসব প্রতিযোগী ব্লক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সফল হ'ন তারাই জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে আহূত হ'ন এবং জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীগণ রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে উপযুক্ত বিবেচিত হ'ন।

আগেই বলা হ'য়েছে এবারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পূর্ণাঙ্গ হয়নি তার কারণ দু'টো। প্রথমতঃ, বিভিন্ন অসুবিধার জন্য আমরা কেবলমাত্র মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং এই চারটি জেলায় জেলা যুব-ছাত্র উৎসব সম্পন্ন করতে পেরেছি—ফলে বাকী জেলাগুলো প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি এবং স্থানাভাবের জন্য দলগত প্রতিযোগিতা সমূহ বাদ দিতে হ'য়েছে।

মহিলাদের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলো নিম্নোক্ত ৬টি ঃ—

(১) ১০০ মিটার দৌড়,
(২) উচ্চ লম্ফন,
(৩) দীর্ঘ লম্ফন,
(৪) লৌহ গোলক নিক্ষেপ,
(৫) ডিস্‌কাস্ নিক্ষেপ,
ও
(৬) বর্শা নিক্ষেপ।

পুরুষ বিভাগে যে ৭টি বিষয় প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিলো সেগুলো—

(১) ১০০ মিটার দৌড়,
(২) ৮০০ মিটার দৌড়,
(৩) উচ্চ লম্ফন,
(৪) দীর্ঘ লম্ফন,
(৫) লৌহ গোলক নিক্ষেপ,
(৬) বর্শা নিক্ষেপ,
(৭) ডিস্‌কাস্ নিক্ষেপ।

বিভিন্ন বিষয়ে ৪টি জেলার অংশ গ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীদের পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল ঃ—

(ক) **বর্ধমান জেলা**
পুরুষ প্রতিযোগী—১৩
মহিলা প্রতিযোগী— ৫

(খ) **মেদিনীপুর জেলা**
পুরুষ প্রতিযোগী—১১
মহিলা প্রতিযোগী— ৭

(গ) **মুর্শিদাবাদ জেলা**
পুরুষ প্রতিযোগী—১৩
মহিলা প্রতিযোগী—১০

তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে পোড়ামাটির সুদৃশ্য মডেল।

(ঘ) **দার্জিলিং জেলা**

পুরুষ প্রতিযোগী—১২
মহিলা প্রতিযোগী— ৪

শিলিগুড়ির তিলক ময়দানে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮-৩০ মিনিটে অংশ গ্রহণকারী সমস্ত প্রতিযোগীদের এক সুশৃংখল উদ্বোধনী কুচকাওয়াজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং তাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন যুবকল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সংক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ এলাকায় খেলাধূলার প্রসারে সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে যুবকল্যাণ বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচীর উল্লেখ করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহদান করেন। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার প্রতিযোগীদের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, এর শেষ হয় পুরুষদেরই ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিভাগে মেদিনীপুর ও মেয়েদের বিভাগে মুর্শিদাবাদ বিশেষ সাফল্য লাভে সক্ষম হয়।

শিলিগুড়িতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞান-পত্র প্রদান করেন যুবকল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস।

পুরুষ ও মহিলা এই দুই বিভাগেরই অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের ক্রীড়া শৈলী আশাব্যঞ্জকরূপে উন্নতমানের ছিলো এবং মাঠের ভিতরে ও বাইরে তাদের সুশৃঙ্খল আচরণ প্রশংসনীয় ছিলো সন্দেহাতীত ভাবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে স্থানীয় ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ অকুণ্ঠভাবে আমাদের এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে সহযোগিতা ক'রেছেন। আমরা তাঁদের অকৃপণ সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে যুবকল্যাণ বিভাগের স্টল।

মৃত্যুহীন প্যারী কমিউন

রথীন সেন

১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে ১৮৭১ সালের ৭২টি দিন। সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসে এই ৭২টি দিন আশ্চর্য প্রেরণার উৎস, শোষিত লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের জীবনে অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত স্মৃতি।

১৮৪৮-এ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করলেন তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রথম সংগ্রাম—প্যারী কমিউন।

১৮৬৯-এর ফ্রান্স। রাজতন্ত্রের তীব্র ভ্রূকুটি, প্রভাব ও প্রচারকে অগ্রাহ্য করে ত্রিশলক্ষ ভোট পড়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে অসন্তোষ। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহে আলোড়িত হচ্ছে সারা দেশ। জাতীয় সম্মান রক্ষার অন্ধ মোহে জনচেতনাকে বিভ্রান্ত ক'রে হৃত মর্যাদা উদ্ধারের আশায় ১৮৭০ সালের ১৯শে জুলাই সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধ ঘোষণা করলেন প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই পরাজিত ফরাসী বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। বিজয়ী প্রুশিয়ানরা অবরোধ করল প্যারিস। শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রস্তুতি ও ঐক্যের অভাবের সুযোগে বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করে গঠন করল জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার।

দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত প্যারীর শ্রমিক শ্রেণী অবরুদ্ধ নগর রক্ষার জন্য নিজেরাই গঠন করল জাতীয় রক্ষী বাহিনী। প্রায় তিন লক্ষ মানুষ নাম লেখাল সশস্ত্র বাহিনীতে। মেহনতী মানুষের এই সংগ্রামী সশস্ত্র চেহারা দেখে আতঙ্কে শিহরিত বুর্জোয়ারা চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়ে আত্মসমর্পণ করল প্রুশিয়ানদের কাছে। নির্দেশ এল, জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিশ্বাসঘাতক সরকারের হাতে তুলে দিতে। শ্রমিকরা এবার রুখে দাঁড়াল, অস্বীকার করল অস্ত্র সমর্পণে। ১৮৭১-এর ১৮ই মার্চ বুর্জোয়া সরকার সৈন্য পাঠাল অস্ত্র দখলের জন্য।

কিন্তু '১৮ই মার্চের সকালে কমিউন দীর্ঘজীবী হোক এই বজ্রধ্বনিতে জেগে উঠল প্যারিস' (মার্কস)। বুর্জোয়া সরকার প্যারিস থেকে ভের্সাইতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল। অস্থায়ী সরকার হিসাবে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব গ্রহণ করল জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি, ঘোষণা করল, 'প্যারিসের প্রলেতারিয়েতরা শাসক শ্রেণীগুলির ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহিতা দেখে এ কথাই অনুভব করেছে যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের পরিচালনাভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে পরিস্থিতি ত্রাণের মুহূর্ত সমাগত।'

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দুলক্ষ ত্রিশ হাজার মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়িত্বশীল ও ইচ্ছানুসারে প্রত্যাহারযোগ্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হ'ল কমিউন। শুধু পৌর শাসন নয় রাষ্ট্র পরিচালিত সব উদ্যোগই অর্পিত হ'ল কমিউনের হাতে। শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের সমর্থিত প্রতিনিধিরাই কমিউনে নির্বাচিত হলেন।

কমিউনের ঘোষণাবাণীতে ধ্বনিত হ'ল এতদিনের পরিচিত প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ। 'কমিউন ছিল সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বিরুদ্ধরূপ।' কমিউন ছিল এমন 'এক প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্টরূপ যা শ্রেণী-প্রভুত্বের রাজতান্ত্রিক রূপকেই শুধু নয় খোদ শ্রেণী প্রভুত্বকেই বরবাদ ক'রে দিত' (মার্কস)।

স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর অবলুপ্তি ঘটিয়ে কমিউন সেখানে নিয়োগ করল সশস্ত্র জনসাধারণকে। পুলিসকে সরকারের হাতিয়ার হিসাবে না রেখে তাকে পরিণত করা হ'ল কমিউনের কাছে দায়ী ও যে কোন সময়ে প্রত্যাহারযোগ্য রূপে। গরিবদের বকেয়া খাজনা মুকুব করা হল, বন্ধ কারখানাগুলির উৎপাদন শুরুর দায়িত্ব দেওয়া হ'ল শ্রমিক সংস্থাদের। রুটি তৈরির কারখানাগুলিতে রাতের কাজ বন্ধ করা হ'ল। কারখানাগুলিতে প্রচলিত জরিমানা প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। রাষ্ট্রের ওপর অবসান হ'ল গির্জার কর্তৃত্বের। ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ক'রে শিক্ষাকে ঘোষণা করা হ'ল অবৈতনিক। কমিউন ঘোষণা করলঃ কমিউনের সদস্য হ'তে একজন নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মীকে সাধারণ শ্রমিকের মজুরি নিয়ে কাজ করতে হবে। এই ঘোষণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেনিন বলেছেন, 'এখানেই সবচেয়ে স্পষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র মজুরতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে মোড় ঘুরেছে, অত্যাচারীদের গণতন্ত্র অত্যাচারিত শ্রেণী সমূহের গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রেণী বিশেষকে দমনের জন্য বিশেষ শক্তি স্বরূপ যে-রাষ্ট্র তার রূপান্তর ঘটেছে; এখানে জনগণের অধিকাংশের, মজুর ও কৃষকদের সাধারণ শক্তি দিয়ে অত্যাচারীদের দমন করা হচ্ছে।'

[শেষাংশ ৪০ পৃষ্ঠায়]

মুন্সী প্রেমচাঁদ ও সাহিত্যে বাস্তববাদ

মহম্মদ আমিন

প্রতিটি ভাষায় সাহিত্যের অগ্রগতির একটি ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস মানবসমাজের অগ্রগতির ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই কারণে কোন সাহিত্যিক, কবি, লেখক বা নাট্যকারের মূল্যায়ন করতে গেলে এই বিষয়টা প্রধানত লক্ষ্য করতে হয় যে, শিল্প-সাহিত্যে বাস্তববাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার অবদান কতটুকু। তাছাড়া আরেকটা বিষয় মনেরাখা দরকার যে শিল্পী, সাহিত্যিক, কবির রচনাকাল কোন্ সময়। তার কারণ হ'ল যে সাহিত্য যদি শুধুমাত্র কল্পনার ভিত্তিতে রচনা হয় তবে সে সাহিত্য মানুষকে ততটা অনুপ্রাণিত করতে পারেনা যতটা বাস্তববাদী সাহিত্য করে থাকে।

মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে দমন করবার পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাঁকিয়ে বসে গিয়েছিল। মোগল রাজত্বের কালে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে একটা জড়তা থেকে গিয়েছিল এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেনি। যার ফলে মোগলরাজ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গেল, এবং এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, তাদের সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে শুধু বাঁচিয়েই দিলনা, তাকে আরো পোক্ত করল এবং ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্তম্ভরূপে গড়ে তুলল। ঠিক এই সময়ে উর্দু সাহিত্যে মুন্সী প্রেমচাঁদের আবির্ভাব ঘটল। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন উর্দুসাহিত্য আলিফলায়লা, আমির হামজা, হাতিম তায়ী গল্পে মেতেছিল এবং এগিয়ে যাওয়ার কোন সঠিক পথ পাচ্ছিলনা, তেমনি হিন্দী সাহিত্যও ঐ সময়ে রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের গল্পের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম উত্তরপ্রদেশের বেনারস জেলার একটি গ্রামে ৩১শে জুলাই ১৮৮০ সালে। প্রেমচাঁদের পিতার নাম ছিল মুন্সী আজায়ের লাল, তিনি পোস্ট অফিসের পিয়ন ছিলেন, চাকরী থেকে আংশিক উপার্জন হ'ত, অল্পকিছু জমিও ছিল। দুটি মিলিয়েই তাঁদের সংসার চলত। প্রেমচাঁদের আসল নাম হ'ল ধনপত রায়, তাঁকে আদর করে নবাব বলে ডাকা হ'ত। যখন তাঁর বয়স আট বছর তখনই তাঁর মা মারা যান, মায়ের স্নেহের অভাব মুন্সী প্রেমচাঁদ সারাজীবনই অনুভব করলেন, এবং বোধহয় এই কারণেই তাঁর গল্প এবং সাহিত্যে মায়ের প্রতি এত ভালবাসা দেখা যেত। উনি তের বছর বয়সেই যাদু-টোনার উপন্যাস পড়ে সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হন, এবং ১৮৯৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পরে চুনারের লন্ডন মিশন স্কুলের শিক্ষক হয়ে যান এবং তারপরে তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং বাহারাইচে শিক্ষক নিযুক্ত হন। তার কয়েকমাস পরেই তিনি প্রতাপগড়ে বদলী হয়ে যান এবং সেইখানে মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা করেন, যার নাম "ইসরারে মা-আবিদ"। এই উপন্যাসটি ১৯০৩ সালে বেনারসের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিস্তীতে প্রকাশিত হয়। চারিদিকে যখন অত্যাচার, বিশেষ করে গ্রামে কৃষকদের উপরে জোতদার-জমিদার-মহাজনের অত্যাচার এবং সারাদেশের উপরে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের অত্যাচার, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের যোগ-সাজসে যখন সমাজে নানারকমের অধঃপতন এবং যখন শিল্প-সাহিত্যও কলুষিত হচ্ছিল তখন উর্দু-সাহিত্যে প্রেমচাঁদের প্রবেশে মনে হ'ল যেন দীর্ঘ-কালরাত্রির পরে সকালের প্রথম আলো দেখা দিল। কেননা উর্দুসাহিত্যে মুন্সী প্রেমচাঁদ সর্বপ্রথম বাস্তব-বাদকে নিয়ে এলেন।

মুন্সী প্রেমচাঁদ নিজে কোনদিন ক্ষেতে লাঙ্গল ধরেননি, কিন্তু তাঁর গল্পে উত্তরপ্রদেশের গ্রাম-জীবনের যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তাতে তাঁকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে তুলনা করা যায়।

শরৎবাবু যেমন তাঁর সাহিত্যে গ্রামবাংলাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং সোজা সাদামাটা কথায় গ্রামের মানুষের বর্ণনা করেছেন মুন্সী প্রেমচাঁদ হুবহু তাই করেছেন। মুন্সী প্রেমচাঁদ একটা গরু বা একটা কুকুর বা একটি কৃষকরমণী বা একজন জমিদার যে কোন একটি বিষয়কে বেছে নিতেন এবং তাকে কেন্দ্র করে গোটা সমাজের অবস্থা বলে দিতেন। তার মধ্যে মানব চরিত্রের সমস্ত দিকই থাকত। ভয়ভীতি, লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা, আপষকরা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া কোন দিকই বাদ পড়তনা।

আমার একবার দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ে ইকবাল, প্রেমচাঁদ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, টলস্টয় ও লেনিনের যতগুলি বই আমি পেয়েছি সেগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে আমি পড়েছি, এবং সেই পড়ার মধ্যদিয়ে মুন্সী প্রেমচাঁদ সম্পর্কে আমার ধারণা যে উনি উর্দুসাহিত্যে তখনকার সমাজের সত্য কথাকে যত সহজ ও সরলভাবে তুলে ধরেছেন তা আজও অনেক সাহিত্যিক পারেননি। তাঁর যে কোন

একটি গল্প একটি আয়নার মত তখনকার সমাজের প্রতিফলন করে। শুধু ভাষার দিক থেকে নয়, বিষয়ের দিক থেকেও।

মুন্সী প্রেমচাঁদ মারা গিয়েছিলেন ১৮ই অক্টোবর ১৯৩৬ সালে, যখন তাঁর বয়স মাত্র ৫৬ বছর। উনি যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারতেন তাহলে হয়ত আজকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যেই তাঁর স্থান হ'ত। কিন্তু তাঁর গুনাগুন বুঝি এর চাইতেও বেশি এই কারণে যে তিনি বিংশশতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব কথা বলেছিলেন পরবর্তীকালে রুশ বিপ্লবের পরেও সেই সব কথার অর্থ আমাদের দেশে বোঝা যাচ্ছিলনা।

মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর যৌবনে গান্ধীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং একথা মনে করেছিলেন যে গ্রামের গরীবদের মুক্তি বোধহয় সেই পথেই আসবে। পরবর্তীকালে তিনি কিছু নতুন কথা বললেন, যেমন মহাজনী সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা এবং পঞ্চায়েতী রাজ্যের কথা। তিনি মনে করতেন যে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠিত হ'লে পরে সমস্ত ক্ষমতা পঞ্চের হাতে চলে আসবে এবং পঞ্চের মাধ্যমে পরমেশ্বর নেমে আসবেন, আর সকলের প্রতি ন্যায় বিচার হবে। কিন্তু তা হবে কি করে? এ প্রশ্নের জবাব উনি দিয়েছিলেন একথা বলে যে আমাদের কিষাণসভা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এটা মনে রাখা দরকার যে এই শব্দ "কিষাণসভা" কি অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে।

সমালোচকদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা এই কথা বলার চেষ্টা করেন যে মুন্সী প্রেমচাঁদ আজকের যুগে অচল। এটা শুধু অসত্য নয় একটা উদ্ভট কথা; তার কারণ হ'ল যে মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, নতুন সমাজের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মানুষ এবং তার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেসব কাজ কি সম্পন্ন হয়েছে? হরিজনদের উপরে তথাকথিত উঁচু জাতের অত্যাচার কি বন্ধ হয়েছে? নারী জাতির মুক্তি কি এসেছে? না এসব কোন প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়নি, এবং যতদিন এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবেনা অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবেনা ততদিন পর্যন্ত প্রেমচাঁদের সাহিত্য তাজা থাকবে, এবং সংগ্রামরত মেহনতী মানুষের বুকে ভরসা যোগাবে।

[মৃত্যুহীন প্যারী কমিউন : ৩৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মধ্যে ধনতান্ত্রিক সমাজ সেদিন স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য করেছিল তার ধ্বংসের বজ্র-গর্ভ মেঘ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে কেঁপে উঠেছিল শোষক প্রভুরা। তাই শ্রমিকদের ধ্বংসের লড়াই-এ সাহায্য করতে প্রুশিয়ান সরকার সমস্ত বন্দী ফরাসী সৈনিক-দের মুক্তি দিল। ভের্সাই আর জার্মান সরকারের সৈন্যরা আক্রমণ করল প্যারিস। অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে পথে পথে রক্তের আলপনা এঁকে দিল মৃত্যুঞ্জয়ী কমিউনার্ডরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২৮শে মে পতন হ'ল বুর্জোয়াদের হাতে প্যারিসের। বর্বর প্রতিহিংসায় বুর্জোয়ারা সেদিন রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছিল প্যারিসকে। শুধু গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ত্রিশ হাজার মানুষকে।

কমিউনকে বিচার করতে গেলে বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে যে কমিউনকে প্রথম থেকেই আত্মরক্ষার লড়াই এ ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীও সেদিন তার সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারেনি। শ্রমিকদের নিজস্ব কোন পার্টি ছিলনা, ছিলনা অভিজ্ঞতা। বুর্জোয়া ধ্যান ধারণার প্রভাবও ছিল তাদের ওপর গভীর। শোষণক্লিষ্ট কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ কমিউন স্থাপন করতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছিল ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশের মেহনতী মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে। দ্রুততার সঙ্গে ভের্সাই-এর বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে অভিযানও সংগঠিত করতে পারেনি কমিউন। তাই কৌশলী বুর্জোয়ারা সেদিন ধ্বংস করতে পেরেছিল কমিউনকে। কিন্তু মৃত্যু হয়নি কমিউনের আদর্শের। কমিউনই প্রথম পথ দেখিয়েছিল শ্রমিকদের আর্থিক মুক্তির রাষ্ট্রব্যবস্থার।

কমিউনের মৃত্যুহীন আদর্শ সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবে। সার্থক হ'ল চীন, ভিয়েতনাম আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুক্তি যুদ্ধে।

কমিউনের অভিজ্ঞতা ভাবীকালের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—শ্রমিক শ্রেণীকে শুধু আগের রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করলেই চলবেনা ঐ যন্ত্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করে স্থাপন করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র।

আজ পৃথিবীর এক চতুর্থাংশে উড়ছে সমাজতন্ত্রের জয় পতাকা। বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষ ছিন্ন করেছেন শোষণের শৃঙ্খল। গভীর থেকে গভীরতর সংকটে জর্জরিত হচ্ছে পুঁজিবাদ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংগ্রামে উত্তাল এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা। দারিদ্র্য, নিপীড়ন ও অনাহারের বিরুদ্ধে লড়ছে দুনিয়ার শ্রমিক। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের এই জয়যাত্রার মুহূর্তে মেহনতী মানুষ বারবার স্মরণ করবে প্যারী কমিউনকে।

'কমিউনের আদর্শ হচ্ছে সমাজবিপ্লবের আদর্শ, শ্রমজীবী মানুষের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আদর্শ। এ হচ্ছে সারা দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের আদর্শ। এই অর্থে কমিউনের মৃত্যু নেই' (লেনিন)।

শতবর্ষের আলোকে প্রেমচন্দ্

তপন চক্রবর্তী

যখন হিন্দী তথা উর্দু সাহিত্য বানানো কল্প-কাহিনী আর অবাস্তব চরিত্রের আজগুবি কান্ড কারখানার ভোজবাজীতে মসগুল হয়েছিল তখন সেই কল্পনার ইউটোপিয়া থেকে রক্তমাংসের মানুষের বাস্তব জীবনের কাছাকাছি হিন্দি তথা উর্দু সাহিত্যকে টেনে নিয়ে আসেন মনীষী লেখক মুন্সী প্রেমচন্দ্। তাঁর জন্ম ১৮৮০ সালে বেনারসের কাছা কাছি লমহি গ্রামে। বাবা অজয়ব রায় ছিলেন একজন ডাক কর্মী। শৈশবে মাতৃহীন প্রেমচন্দ্ জীবনের নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে—দুঃখ কষ্টের ঘনিষ্ঠ রূপকে অনুভব করতে পেরেছিলেন।

প্রেমচন্দ্ তাঁর আসল নাম নয়। তাঁর আসল নাম ধনপত্ রায়। লেখার জন্য রাজরোষে তাঁকে পড়তে হয় এবং নিজেকে গোপন রাখার জন্য কখনো নবাব রায় কখনো প্রেমচন্দ্ নাম নিতে হয়। অবশেষে প্রেম-চন্দ্ নামেই তিনি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

এই শতাব্দীর শুরু থেকেই প্রেমচন্দ্ তাঁর লেখনী ধরে ছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন (১৯৩৬ সাল) পর্যন্ত তাঁর কলম সক্রিয় ছিল। লেখক হিসেবে তিনি ৩৬ বছর ব্যাপী জীবন ও জগতের যে অবস্থা—দেশের যে অবস্থাকে দেখতে পেয়েছেন—তার ঘনিষ্ট বাস্তব রূপকে তাঁর কলমে সত্যনিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্বযুদ্ধের আলোড়নে অস্থির সেই সময়ের গ্রাম-জীবন—শোষণে, নির্যাতনে, জরাজীর্ণ গ্রামীণ গরীব মানুষ তাঁর কলমে কেবল স্থির চিত্র হয়েই ফুটে ওঠেনি। নিজের সৃজনশীল প্রতিভায় এবং দূরদর্শী জীবনবোধের সাহায্যে তিনি নিপীড়িত মানুষকে প্রতিবাদের সিংহদুয়ার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর এই জীবনবোধ এবং শ্রেণীসচেতনতা তৎকালে কেবল হিন্দি বা উর্দু সাহিত্যেই নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই তুলনাহীন।

প্রেমচন্দ্ প্রায় ২৭৫টি ছোট গল্প এবং ১৫ খানি উপন্যাস লিখেছেন। এছাড়া প্রবন্ধ, নাটক, শিশু সাহিত্যও রচনা করেছেন, এবং অনুবাদও করেছেন কয়েকটি বই। তবে সবকিছুর উপরে গল্পে ও উপন্যাসে তিনি সবচেয়ে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাঁর উপন্যাসের মধ্যে রঙ্গভূমি, কর্মভূমি, সেবা-সদন, গোদান, গবন এবং গল্প গ্রন্থের মধ্যে কাফন, সোজে বতন, সপ্ত সরোজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে একদিকে যেমন তিনি গ্রামের ও শহরের আর্থিক শোষণকে চিত্রিত করেছেন অন্যদিকে সমাজের নানা ব্যাধি, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে পাঠককে সচেতন করেছেন। তাঁর রচনায় দরিদ্রের দুর্দশা, পতিতাবৃত্তি, সাম্প্রদায়িকতা, জাত পাত ইত্যাদির সমস্যাগুলি নগ্নরূপে ফুটে উঠেছে। এবং সেই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে এই সব সমস্যার মোকাবিলায় মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের কথা।

এবছর প্রেমচন্দের শতবর্ষ। এবং সেকারনেই প্রগতিশীল মানুষের কাছে এই শতবর্ষের এক বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। শতবর্ষের এই সুযোগে প্রেমচন্দের সাহিত্য পাঠ ও আলোচনার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা গড়ে তোলা আজ বিশেষ প্রয়োজন। কারণ প্রেমচন্দ্ তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে যে সমস্যাগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন সেই সমস্যা আজও প্রায় অপরি-বর্তিত রয়েছে। তাই আজকের জীবনেও প্রেমচান্দ্ সমান ক্রিয়াশীল।

আমাদের কাছে খুবই আনন্দের বিষয় যে প্রেমচন্দ্ শতবর্ষের এই তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শতবর্ষের শুরুতেই কলকাতায় প্রেমচন্দের উপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভার আয়োজন করে-ছিলেন। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শিশির মঞ্চের সেই আলোচনা সভায় হিন্দি বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি প্রেম-চন্দের উপর নানা দিক থেকে আলোকপাত করেন যা প্রেমচন্দ্ চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনা সভার উদ্বোধন করে শ্রী ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ্ বলেন—প্রেমচন্দ্ যে ভাষায় তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন সে ভাষা আমি জানিনা। অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য পাঠ করেছি। এবং বন্ধু বান্ধবের মুখে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা শুনেছি। এতে আমার প্রেমচন্দ্ সম্পর্কে মনে হয়েছে যে তাঁর মতন লেখক তৎকালীন যুগের ভারতীয় সাহিত্যে আর কেউ ছিলেন না। সেই যুগে যে বিষয়গুলিকে তিনি তাঁর সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন সেই বিষয়গুলি বহু বড় সাহিত্যিকেরই চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। সমাজের আর্থিক শোষণ, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রেমচন্দ্ যেভাবে তাঁর কলম নিয়ে লড়াই করেছেন তেমনটা সে যুগে আর কেউ করেছেন বলে মনে হয়না। তাঁর সম-কালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে যদি প্রেমচন্দের তুলনা-মূলক আলোচনা করা যায় তাহলেই আমরা প্রেমচন্দের

গুরুত্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব। এই তুলনামূলক আলোচনা সমাজের অগ্রগতির স্বার্থেই এক মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রেমচন্দ্ চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে জানান পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুবাদের মাধ্যমে প্রেমচন্দ্ সাহিত্যকে বাঙালী পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। প্রথম দিনের সভার সভাপতি রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং প্রেমচন্দের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি অল্পবয়সে তাঁর যে উষ্ণ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন এবং প্রেমচন্দের স্থায়ী স্মারক নির্মাণের জন্য তিনি আবেদন জানান।

দ্বিতীয় দিনে শ্রী কে. সি পাণ্ডে ও ডঃ সরোজমোহন মিত্র দুটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। দুজনেই প্রেমচন্দের সাহিত্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তাঁদের প্রবন্ধে তুলে ধরেন। ঐ দিনের বিশিষ্ট বক্তা ডঃ নামওয়ার সিং প্রেমচন্দের রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন যে প্রেমচন্দ্ গান্ধীবাদ থেকে ক্রমশঃ মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে ছিলেন এমন কথা বলাটা ঠিক নয়। এটা নিছক সরলীকরণ। আসলে গভীর মানবতাবাদী ছিলেন প্রেমচন্দ্। সেই মানবতাবাদী মনোভাবই তাঁকে গান্ধীজীর আন্দোলনের কাছাকাছি এনেছিল এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়েও নিয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় দিনে সর্বশ্রী আলিখ লখনৌভি, নারায়ণ চৌধুরী, অর্তব নারায়ন সিং, শ্রীমতী চন্দ্রাপাণ্ডে প্রমুখ প্রেমচন্দ্ সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধে উর্দু সাহিত্যে প্রেমচন্দের স্থান, প্রেমচন্দের উত্তরাধিকার, প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে নারী ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। এই দিনের সভাপতি ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী মহঃ আমীন।

চতুর্থ দিনে এবং অন্যান্য দিনগুলিতে প্রেমচন্দের সাহিত্য নিয়ে তৈরী কয়েকটি নাটক ও চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

এই আলোচনা চক্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন প্রেমচন্দের পুত্র হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল শ্রী অমৃত রায়। তিনি প্রথম ও তৃতীয় দিনে আলোচনা করেন। প্রথম দিন তিনি প্রেমচন্দের সমকালীনত্ব বিষয়ে বললেন—প্রেমচন্দ্ যে সমস্ত সমাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে লিখেছেন, যে সব সংস্কার, দুর্নীতি, ও পশ্চাৎপদ মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন সেই সব সমস্যা, কুসংস্কার আজো আমাদের সমাজে বর্তমান। তাই প্রেমচন্দ্ সাহিত্য আজো সমান ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ দিনে তিনি প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে শৈলীর প্রশ্নে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, যারা প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে শৈলীর অভাব আছে বলে মতামত রাখেন তারা আসলে সাহিত্যে শৈলী বা শিল্প সম্পর্কে তাদের অস্পষ্ট ধারণা থেকেই প্রেমচন্দ্ সাহিত্যকে বিচার করেন। প্রেমচন্দ্ যে সব বিষয়গুলি সাহিত্যে নিয়ে এলেন তা তার পূর্বসূরীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বাস্তব জীবন, দারিদ্র্য, শোষণ ইত্যাদির রূপকে সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রচলিত ধারণায় ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। প্রসঙ্গত তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন—একজন রাজকন্যা আর একজন দেহাতী রমণীর রূপ একরকম হয়না। দেহাতী রমণীর রূপকে উপলব্ধি করতে হলে যে সুস্থ সৌন্দর্যবোধ প্রয়োজন সেই বোধের আলোকেই প্রেমচন্দ্ সাহিত্যকে দেখতে হবে।

এ প্রসংগে সেদিন চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনও বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সব মিলিয়ে আলোচনা চক্রটি প্রেমচন্দ্ সাহিত্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে বলেই মনে হয়।

প্রেমচন্দ্ শতবর্ষের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে এমন একটি আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রেমচন্দের সাহিত্যকে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিশ্রুত পথে এগিয়ে যাবেন প্রেমচন্দ্ প্রেমীদের এটাই প্রত্যাশা।

আলোচনা

অলচিকি ও পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু

সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে পুরুলিয়ায় গণ-সম্বর্ধনা দিয়েছেন। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু উদ্ভাবিত সাঁওতালি ভাষার হরফ অলচিকিকেও এই সঙ্গে রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেন, সঙ্গে অলচিকি লিপিকে সাঁওতাল জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির উপযোগী করে তোলার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও।

পশ্চিমবাংলায় প্রায় ২৫ লক্ষ সাঁওতাল আদিবাসী বসবাস করেন। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়, বীরভূমে ও মালদহ জেলায় মূলত এরা বসবাস করেন। এছাড়াও পশ্চিমদিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, হুগলী, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু সাঁওতাল বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও সাঁওতাল আদিবাসীরা ছড়িয়ে রয়েছেন বিহারের চাইবাসা, সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম প্রভৃতি জেলায়, উড়িষ্যায় ও আসামের কিছু কিছু অঞ্চলে। অর্থাৎ মূলত ভারতের চারটি প্রদেশে সাঁওতালরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন।

সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় নেই। কিন্তু সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতিরও সুমহান ঐতিহ্য আছে। অতীতে সাঁওতালরা গভীর বনে জঙ্গলে বসবাস করত। এখনও তাদের অনেকে নগর সভ্যতার আলো দেখেনি, তারা নিজস্ব জীবন ধারার ঐতিহ্য অনুযায়ী ছোট ছোট গোষ্ঠী করে বসবাস করছেন সুদূর গ্রামাঞ্চলে। আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে নিজেদের একান্ত আপন জগতে তারা নিমগ্ন।

ভাষা মানুষের আত্মপ্রকাশের অন্যতম বাহন। প্রতিটি ভাষার বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সাধারণ সত্যই উদ্ঘাটিত হয় যে, মানুষ তার নিজস্ব সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ভাষার জন্ম দিয়েছে, ক্রম বিকাশ ঘটিয়েছে। মানুষ যখন সভ্যতার আলো পায়নি, তখনও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য নানা রকম পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। গুহাবাসী মানুষ নানা রকম চিহ্ন ও সংকেতের মাধ্যমে, চিত্রের মাধ্যমে নিজেদের ভাব প্রকাশ করত। ক্রমে ক্রমে মানুষের প্রয়োজনেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, বর্ণলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, ছাপাখানা সৃষ্টি হয়েছে, জন্ম নিয়েছে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে সামান্য কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এমন উন্নত সভ্যতা উপহার দিয়েছে যার ফলে সমস্ত ভাষারই ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, শব্দ ভাণ্ডার দ্রুত স্ফীত হয়েছে। নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবিত হয়েছে।

সাঁওতাল আদিবাসীরা দীর্ঘকাল অবহেলিত রয়েছে। তাদের মধ্যে এখনও অনেক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সাঁওতাল আদিবাসীরাও যখন বনে জঙ্গলে বসবাস করত, কখনও ভয়, সভা, যোগাযোগ করা প্রভৃতি বিষয় বোঝানোর জন্য তারা পাথরের গায়ে অথবা গাছের ডালে নানা রকম চিহ্ন ও সংকেত এঁকে রাখত। শুধু চিহ্ন বা সংকেতের এই সব ব্যবহারই নয়, সামনে কোন বিপদ বা ভয়ের আশংকা থাকলে তারা পশুর সিং দ্বারা নির্মিত নানারকম বাদ্যযন্ত্র দিয়ে বিচিত্র শব্দের সাহায্যে সেই সব বিষয়ে সতর্কও করত। এসব ছাড়াও এখনও বিভিন্ন জায়গায় সাঁওতাল অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় যে, গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের গায়ে নানারকম দাগকেটে তারা মালিকানা নির্ধারণ করে দেয়। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন এখনও রয়েছে। বাঁ হাতে পোড়া দাগ সাঁওতাল উপজাতির চিহ্ন বহন করে। সাঁওতাল উপজাতি রমণীদের শরীরে শিল্প সুষমামণ্ডিত নীল রঙের প্রিন্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রিন্টগুলি অবশ্যই অর্থবহ এবং এগুলি উপজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে নানা রকম চিহ্ন সংকেত শব্দ ধ্বনির যে ব্যবহার প্রচলিত, ক্রমে সেইসব চিহ্ন সংকেত শব্দ ধ্বনি ভাষার জন্ম দিয়েছে কিন্তু লিখিত কোন সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ হয়নি, ছাপার হরফে বহু মানুষের সংযোগ সৃষ্টিকারী ভাষার জন্মও হয়নি, কারণ সাঁওতালী ভাষায় লেখার উপযোগী কোন হরফ ছিল না।

সাঁওতাল ভাষীদের মধ্যে শিক্ষার জন্য এবং ভাষা প্রকাশ করার জন্য বাংলা লিপির ব্যবহার করা হত। আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করার লক্ষ্য সামনে রেখে মিশনারীরা বিভিন্ন জায়গায় সুনিপুনভাবে আস্তানা গাড়ে। ধর্ম প্রচার করার

অছিলায় তারা সাঁওতালী জনগণকে রোমান হরফ ব্যবহার করার পথে ঠেলে দেয়। শিক্ষা ও ভাষার ক্ষেত্রে রোমান হরফ ব্যবহার করার জন্য খৃষ্টান মিশনারীরা উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু বিদেশী ভাষার হরফ ব্যবহার করে খুব একটা সুফল পাওয়া যায়নি, বরং সাঁওতালরা যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছেন।

অলচিকি লিপির উদ্ভাবক ও রূপকার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু যৌবনেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতি আধুনিক সভ্য সমাজে নিদারুণভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে যদি সাঁওতালী ভাষা তার একান্ত নিজস্ব হরফ উদ্ভাবন করতে না পারে। সাঁওতালী ভাষা ব্যবহার করার জন্য, চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য, পরস্পরের সংগে যোগাযোগ করা এবং ছাপাখানার মাধ্যমে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর জনগণের মধ্যে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সম্পদগুলিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাঁওতালী ভাষার নিজস্ব লিপির প্রয়োজন।

খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে কেউ কেউ রোমান হরফ ব্যবহার করলেও রঘুনাথবাবু কিন্তু অনুভব করেন যে, রোমান হরফে বা বাংলা হরফে সাঁওতালী ভাষার একান্ত নিজস্ব যে উচ্চারণ ধ্বনি তা সার্থকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বস্তুত অন্য কোন ভাষার হরফে ঠিক ঠিক ভাবে সাঁওতালী ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট প্রকাশ করার জন্য, তাদের সংখ্যা সমগ্র সাঁওতালী যারা রোমান হরফ ব্যবহার করতেন সাঁওতালী ভাষাকে প্রকাশ করার জন্য, তাদের সংখ্যা সমগ্র সাঁওতালী জাতির তুলনায় অতি নগণ্য ছিল।

রঘুনাথবাবু কৌতূহলী মানুষ। এখন এই চুয়াত্তর বছর বয়সেও তাঁর চোখে মুখে কৌতূহল, অজানাকে জানার আকাঙ্খা তীব্র। একজন আবিষ্কারকের মত

সস্ত্রীক পণ্ডিত মুর্মু, সংগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত প্রশংসাপত্র

অপরিসীম ধৈর্য, প্রলোভন ভুলে আত্মত্যাগ করার স্পৃহা এবং অন্যমত সহনশীলতার সঙ্গে বিচার বিবেচনা করে যুক্তি নির্ভর পদ্ধতিতে তা খণ্ডন করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার দুর্জয় নিষ্ঠা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর আছে।

হালকা শীতের সকালে রোদের দিকে পীঠ দিয়ে বসেছিলেন পণ্ডিত মুর্মু। মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, মাথায় ধবধবে সাদা অবিন্যস্ত কেশ। চুয়াত্তর বছরের দীর্ঘ জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছে হরফ আবিষ্কার ও প্রচার করার কাজে। শুরু করে ছিলেন ১৯২৫ সালে। আজও সেই প্রতিভা সমান ভাবে উজ্জ্বল। বর্তমানে পণ্ডিত মুর্মু আছেন সিংভূম জেলার টাটানগরের করণ ডিহিতে ছেলের কাছে। ছেলে টিসকোতে চাকরী করেন। যুব মানস পত্রিকার প্রয়োজনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে সাঁওতালী ভাষা, সংস্কৃতি ও আদিবাসী জীবনের অনেক অজানা কথা টুকরো টুকরো করে জানতে পেরেছি।

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্ম ১৯০৫ সালের ৫ই মে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম দাঁত-বোমে, বাবা নন্দলাল মুর্মু তাঁকে ম্যাট্রিককুলেশন পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। রঘুনাথবাবু বললেন—ময়ূরভঞ্জ জেলার বারিপাদা হাই স্কুলে লেখা-পড়া শেষ করে বারিপাদা পাওয়ার হাউসে শিক্ষা-নবীশ ছিলাম। কিন্তু শিক্ষা শেষ হ'লে কোন চাকরী করার ইচ্ছা হ'ল না। কুটির শিল্পে আগ্রহ দেখা দিল, বুনন শিল্পকে বেছে নিলাম।

কারপেট বুনন ও টুইস্টিং-এ অভিনবত্ব সৃষ্টি করলেন রঘুনাথ মুর্মু। বহু মানুষ তাঁর শিল্পী হাতের কাজ দেখতে আসতেন। একদিন ময়ূরভঞ্জ মহারাজার তৎকালীন দেওয়ান ডাঃ পি. কে. সেন এলেন দেখতে এবং মুগ্ধ হলেন। ফলে রঘুনাথজীকে প্রস্তাব দিলেন ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ যাওয়ার। রঘুনাথজী রাজী হয়ে গেলেন। কলকাতা শ্রীরামপুর ও গোসাবায় শিল্পের যান্ত্রিক কর্মকৌশল সম্পর্কে ট্রেনিংও নিলেন। তারপর বারিপাদা পূর্ণচন্দ্র ইনস্টি-টিউটের ইনস্ট্রাক্টর। কিন্তু এখানেও মন বসলো না, স্থায়ী হ'তে পারলেন না। ছ'মাসের মধ্যে পিতা নন্দলাল মুর্মুর জীবনাবসান ঘটল, ফিরে যেতে বাধ্য হলেন রঘুনাথজী। দেওয়ান সাহেব আবার রঘুনাথজীকে তার বাড়ীর কাছাকাছি বাদামটালিয়া মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। এখানেই রঘুনাথজীর জীবনে খানিকটা স্থায়ীত্ব এসেছিল।

রঘুনাথজী যখন বারিপাদায় শিক্ষানবীশ ছিলেন

[illegible]

১৬.২-৮০.

রঘুনাথ মুর্মুর নিজের হাতে লেখা অলচিকি

তখন তাঁকে আদিবাসী ভাষার বিভিন্ন লিপি লিখতে হয়েছে। সমস্যাটি তখনই তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। তিনি একান্ত নিজস্ব একটি বর্ণলিপির প্রয়োজনে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। সমস্যার জট খুলতে গিয়েই জন্ম নিল ইতিহাসের এক উজ্জ্বল মুহূর্ত, জন্ম নিল সাঁওতাল ভাষা-ভাষীদের নিজস্ব বর্ণমালা। অল স্ক্রিপট। তখন রঘুনাথজী বাদামটলিয়ায়। বর্ণলিপি না হয় এলো, তার প্রচার কিভাবে হল? আদিবাসী জনগণ নতুন বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত কিভাবে হলেন? কেমন করেই বা তা জনপ্রিয়তা লাভ করল? অলচিকির রূপকার রঘুনাথ মুর্মু এরকম একঝাঁক প্রশ্নের জবাব দিলেন ধীরে ধীরে একটার পর একটা করে। দেখুন, যৌবনকালেই কতগুলো প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে দেখা দেয়। দেখতাম চোখের সামনে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লেখাপড়া করে না, স্কুলে যেতে চায় না, অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে, সমগ্র সাঁওতাল জাত পিছিয়ে যাচ্ছে, সভ্য সমাজের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না।

ভাবতে ভাবতে ভাবনার জটও খুলতে লাগল। প্রশ্ন দেখা দিল আদিবাসী ভাষা 'Phonetically' অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে কতটা স্বতন্ত্র, কেন সাঁওতাল ছাত্ররা প্রচলিত বর্ণমালা গ্রহণ করছে না, কিভাবে বর্ণমালার উন্নতি করলে তা ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, ছাপা ও হাতের লেখার মধ্যে সুসামঞ্জস্য থাকবে এমন বর্ণমালার চেহারা কেমন হবে। ক'টা বর্ণের প্রয়োজন হবে, আদিবাসী সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, মাহালি বিহরদের ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা, রোমান, দেবনাগরী হরফ উচ্চারণ ধ্বনি যথাযথভাবে আনতে পারছে না। এবং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কেন বিভিন্ন ভাষার জন্য বিভিন্ন হরফ ব্যবহার করা হয়, এদের উদ্ভবের নেপথ্য কাহিনী কি? এই সব প্রশ্নই আমার হরফ আবিষ্কারের প্রেরণা, থামলেন রঘুনাথজী। "জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণ করার প্রচেষ্টাকেই প্রেরণা বলতে হয়। না হলে বাইরে থেকে অন্য কেউ আমাকে প্রেরণা দেয়নি।"

"অলচিকি তৈরী করার পর প্রশ্ন দেখাদিল প্রচার কিভাবে হবে। সবাইকে ধরে ধরে শেখান সম্ভব না। তার জন্য মুদ্রণ ব্যবস্থা চাই। বিদ্যালয়ে থাকতে থাকতেই একটা Hand Press তৈরী করলাম"।

হ্যাণ্ড প্রেস তৈরী করার অতীত স্মৃতি মনে পড়ে গেল পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর। একটু থামলেন তিনি। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস। "আজ অনেক মানুষ সময়ের অগ্রগমনের সাথে সাথে অল স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করছেন"। ঘটনাচক্রে রঘুনাথজীর তৈরী হরফ ও হ্যাণ্ড প্রেসের খবর পেয়েছিলেন শিক্ষা দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা। তাঁরা রঘুনাথজীকে রাজ্য প্রদর্শনীতে অলচিকি দেখাতে বললেন, সেটা হচ্ছে ১৯৩৯ সাল। প্রদর্শনীতে অলচিকি দারুণ আলোড়ন তোলে, প্রচার বাড়ে।

আদিবাসী সাঁওতালী জনগণ অলচিকি হরফ ব্যবহার একদিনে রপ্ত করেননি। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় এলাকায় প্রচার কাজ চালিয়েছেন। হ্যাণ্ড প্রেসে লিপি ছাপিয়ে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বিলি করেছেন। বাধারও সম্মুখীন হয়েছেন। তবুও সাঁওতাল সমাজের নিজস্ব বাক্‌রীতি উচ্চারণভঙ্গী ও ভাষা মাধুর্য রক্ষার জন্য একক উদ্যোগে অগ্রসর হয়েছেন। যুক্তি-পরামর্শও অনেক দিয়েছেন। বেশ কয়েকজন শিক্ষিত সাঁওতাল হরফ আবিষ্কারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তারা অলচিকি দেখার পর সেটাই গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেন, এবং এর উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন।

অলচিকি প্রায় চার দশক আগে পৃথিবীর আলো দেখেছে। জন্মের পর কয়েকটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, দেশও স্বাধীন হয়েছে অনেকদিন আগে। কিন্তু সরকারীভাবে অলচিকি লিপিকে মেনে নেওয়া হয়নি এতোদিন। রঘুনাথ মুর্মু পশ্চিমবাংলা, বিহার উড়িষ্যার সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় ঘুরে ঘুরে লিপির প্রয়োগ পদ্ধতি, ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্য ও শব্দ গঠন প্রণালী সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন।

হরফ আবিষ্কারের সময় সাঁওতালদের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি বিশ্বাসকে ও পরিচিত জগতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যাতে লিপি দ্রুত রপ্ত করা যায়।

রঘুনাথবাবুর আবিষ্কৃত অলচিকি লিপিতে ছয়টি স্বরবর্ণ ও চব্বিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে অর্থাৎ মোট তিরিশটি বর্ণ আছে। ডায়া ক্রিটিক্যাল মার্ক ব্যবহার করার ফলে কেউ কেউ এই হরফকে অবৈজ্ঞানিক ও জটিল বলে মনে করেন, কিন্তু পণ্ডিত মুর্মু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন হরফ আবিষ্কার করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনেই এবং এগুলি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাঁওতাল ভাষার উচ্চারণ ধ্বনি সঠিকভাবে আনার জন্যই ডায়া ক্রিটিক্যাল মার্ক ব্যবহার করা হয়েছে সামান্য কয়েকটা ক্ষেত্রে। প্রত্যেক স্বরবর্ণের পর চারটি করে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, এই 'arrangenent' শিশুদের বর্ণ রপ্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক। কারণ একটি স্বরবর্ণ সামনে থাকায় বর্ণ পাঠে গতিশীল নিয়মের সৃষ্টি করেছে।

পণ্ডিত মুর্মু তাঁর লিপিতে অন্য কোন লিপির প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করেন না। রঘুনাথবাবু ও তাঁর পুত্র আমাকে বর্ণগুলির গঠন প্রণালী বোঝাবার জন্য বেশ কিছু উদাহরণ দিলেন। কিভাবে, কোন

ঘটনাকে মনে রেখে কত সহজ উপায়ে এই সব লিপির কাঠামো রচিত হয়েছে তাও তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি সাঁওতালী ভাষার কোন জ্ঞান বা পূর্ব ধারণা না থাকায় তা সঠিকভাবে আমি বুঝতে পারিনি এবং তাই তার ব্যবহারও করলাম না।

নানারকম জটিল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সাঁওতালী জনগণের নিজস্ব বর্ণমালা অলচিকি অগ্রসর হয়েছে। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'Adibasi Socio-Educational and Cultural Association' বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অলচিকির প্রচার কাজ সংগঠিত করতে এগিয়ে এসেছেন। অন্যান্য কিছু কিছু সংগঠনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সরকারী পর্যায়ে কোন স্বীকৃতি না থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র্য আদিবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে অলচিকি সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ অগ্রসর হয়েছে। সম্পূর্ণ অলচিকিতে মাসিক পত্রিকা 'Sagen Sakam' ছাপাও হচ্ছে। আদিবাসী জনগণের অর্থ সাহায্যে কলকাতার 'স্বদেশী টাইপ ফাউণ্ড্রি' থেকে রঘুনাথবাবু ছাপার অক্ষর বানিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রেসও চালু করেছিলেন। কলকাতার 'Adibasi Socio-Educational and Cultural Association' নানারকম বইপত্র, পুস্তিকা ও সাহিত্য পত্রিকা 'Jug Jarpa' প্রকাশ করছেন অলচিকিতে।

দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম, গণডেপুটেশন মিছিল ও সভার মধ্যদিয়ে অলচিকিকে স্বীকৃতি দানের দাবী উত্থাপন করা হয়েছিল। কংগ্রেস সরকার জনতা সরকার সকলের কাছেই আবেদন পেশ করা হয়েছিল কিন্তু কেউ অলচিকিকে স্বীকৃতি দেননি। সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারই অলচিকিকে স্বীকৃতি দেন। আদিবাসী ও তপশিলী উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ শম্ভুনাথ মাণ্ডির সভাপতিত্বে গঠিত ক্যাবিনেট সাব কমিটি সুদীর্ঘ পর্যালোচনার পর আদিবাসী জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠের অভিমতকে মর্যাদা দিয়ে বিগত জুন মাসে অলচিকিকে সাঁওতাল জনগণের লিখিত ভাষার বাহন বলে স্বীকার করে নেন। সেই স্বীকৃতিই আনুষ্ঠানিক রূপ পায় গত ১৭ই নভেম্বর পুরুলিয়ার হজার হাজার আদিবাসীর উপস্থিতির আনন্দঘন অনুষ্ঠানে রঘুনাথ মুর্মুকে সম্বর্ধনা দানের সভায়। রঘুনাথবাবুর ধারণা বিহার, উড়িষ্যা ও অন্যান্য প্রদেশের সরকারও অলচিকিকে ধীরে ধীরে মেনে নেবেন এবং কালক্রমে অলচিকিই হবে সাঁওতাল জনগণের নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ট্যের সূচক।

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতাল জনগণের সামাজিক পশ্চাৎপদার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী। তাদের জীবনের নানা দিক নিয়ে শিক্ষমূলক কয়েকটা গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। যেমন অলচেমেদ, এলখা পোতপ (অংকের বই), পার্শি পোহা (স্কুল পাঠ্য বই), দারেশ ধন (নাটক), Ronode (ব্যাকরণ), বিধুচন্দন (নাটক), খেরোওয়ার বীর (নাটক) প্রভৃতি।

রঘুনাথ মুর্মু নিজস্ব কর্মক্ষেত্র ছাড়াও দেশ-বিদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু কিছু খবর রাখেন। আসামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে তিনি ব্যথিত, কেন্দ্রীয় সরকারের আরও তৎপরতা দরকার বলে তিনি মনে করেন। তিনি অবশ্য সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন না। মাঝে মাঝে সংবাদপত্র পাঠ করেই খবরাখবর জানতে পারেন।

সাঁওতালী ভাষার সৌন্দর্য ও নিজস্বতা রক্ষায় এবং তার অগ্রগমনে অলচিকি বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করবে বলে পণ্ডিত মুর্মু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। যারা এখন অলচিকির বিরোধীতা করছেন তারা অচিরেই তাদের ভুল ধরতে পারবেন কারণ এ কথা সবাই মানবেন যে একটি ভাষাকে আর একটি ভাষার লিপিতে প্রকাশ করলে ভাষা ক্রমশ দীন ও হতশ্রী হয়ে পড়ে। কেউ কি নিজের ভাষার ভগ্ন জীর্ণ চেহারা পছন্দ করেন দীর্ঘকাল। আমার ধারণা অলচিকির জয় ও স্থায়ীত্ব অনিবার্য।

নিজের ভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ রঘুনাথবাবু গৌরবান্বিত বোধ করছেন। ভবিষ্যতে এর উন্নতির জন্য আরও অসংখ্য শিক্ষিত সাঁওতাল যুবক এগিয়ে আসবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর শেষ জীবনের পাথেয়।

দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টার সাক্ষাৎকার শেষ করে ফিরে আসছিলাম এক বিস্ময়াভিভূত অনুভূতি নিয়ে। মাঝে চা টোস্টের লৌকিকতা শেষ করেছি। ওঠার আগে তাঁর স্বহস্তে অলচিকি লিপিতে কিছু লিখে দিতে বললাম। চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি, তবু ধরে ধরে লিখে দিলেন—"পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার অলচিকি লিপিকে স্বীকৃতি দিয়ে সাঁওতালি ভাষার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আশা করি সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য তাঁরা আরও অনেক কাজ করবেন"।

—বিশেষ প্রতিনিধি

মানভূমে পৌষের ভিড়ে

জি এম আবুবকর

বাঙালীর কাছে মাস হিসেবে পৌষের কদরটাই আলাদা। পৌষে গৃহস্থের ঘর ভরে যায় ফসলের সম্ভারে, আনন্দের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বাংলায় একটা চালু বাগধারা আছে—কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ। প্রিয় মাসটিকে ঠিক সর্বনাশের বিপরীত কোটিতে বসিয়ে পক্ষান্তরে তারই মহিমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুরুলিয়ার মানভূমী মানুষের কাছে পৌষের একই মর্যাদা।

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্নস্থানে মকর সংক্রান্তি ও টুসুপরব উপলক্ষে গ্রামীণ মেলা, মুরগী লড়াই ইত্যাদি আনন্দোপকরণের বিস্তর আয়োজন হয়। তবে এ বছর খরাজনিত পরিস্থিতির জন্য মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাসে কিছুটা ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবু উৎসবের এই মরশুমে মানুষ সামর্থ অনুযায়ী মেতে উঠেছে, তাও দেখেছি।

'আঘন সাকরাত' অর্থাৎ অগ্রাণ সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয় টুসুপরব। টুসু আজ মানভূমের মানুষের কাছে লৌকিক দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা। গ্রামের ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণীর মানুষ এই উৎসব পালন করেন। টুসুপরবের জাঁক-জমক আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে একমাত্র বাঙালীর দুর্গোৎসবের তুলনা চলতে পারে। উৎসবের আগে ঘরে ঘরে নতুন কাপড়চোপড় কেনাকাটার ধুম পড়ে যায়। ঘর-দুয়ার ঝাড়পোছ হয়।

শোনা যায়, কাশীপুরের পঞ্চকোটরাজ টুসু ও ভাদু—এ দুটি পরবের প্রবর্তন করেন। রাজদুহিতা টুসু ও ভাদুর অকালমৃত্যুর পর তাদের স্মৃতিরক্ষার্থে রাজা ভাদ্রমাসে ভাদুপরব ও পৌষমাসে টুসুপরব উদ্‌যাপন করেন এবং রাজ্যের প্রজাদেরও উৎসব পালন করতে উৎসাহিত করেন। তবে টুসুর নাকি মৃত্যু হয়েছিল বৈশাখমাসে। রাজ নির্দেশে পৌষমাসেই টুসু উৎসব শুরু হয়। মানভূম সংস্কৃতি ও নৃতত্ব বিষয়ে একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে এ দুটি পরবের উৎসব সম্বন্ধে কথা পেড়েছিলাম। তিনি বলেছেন, রাজদুহিতা ভাদুর মৃত্যুকাহিনীর সঙ্গে ভাদু উৎসবের সূচনার ব্যাপারটি সঠিক। কিন্তু টুসু উৎসব মানভূমে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। এর সঙ্গে কোন রাজকুমারীর মৃত্যুকাহিনী যুক্ত নেই।

যাই হোক, 'আঘন সাকরাতের' দিন টুসুকে ঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওইদিন থেকে গ্রামের মেয়েরা টুসু-গান শুরু করেন। টুসুগান আজ মানভূমী সংস্কৃতি তথা বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ। সহজ মোহনীয় পল্লীসুরে এগান গাওয়া হয়। সর্বত্র একই সুরের গান। মেয়েরা দলবেঁধে রাস্তায় চলতে চলতে, বনে কাঠ পাতা সংগ্রহ করতে করতে, ঘরে অবসর সময়ে আসর করে বসে টুসুগান করেন। গানের ভাষায় টুসুর মাহাত্ম, গ্রাম-জীবনের নানান কথা, প্রেমের কথাও থাকে। স্বভাব কবিদের মতো মুখে মুখে গানের কথা রচনা করা হয়। ইদানিং ছাপানো পুস্তিকায় টুসুগানের সংকলনও পাওয়া যায়। টুসুগান শুধু মেয়েরা নয়, ছেলেরাও করেন। তবে তাদের গানের কথায় আদি-রসের ছড়াছড়ি থাকে। সংক্রান্তির চারপাঁচ দিন পর থেকে গান বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এরপর গান গাইলে নাকি মুখে খোশ পাঁচড়া হয়।

সাকরাতে অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির রাত্রে মেয়েরা সারারাত জেগে গান করেন। পরদিন টুসুর "চৌডোল" নিয়ে দলবেঁধে নিকটবর্তী জলাশয় কিম্বা নদীতে ভাসিয়ে আসেন। সেই সঙ্গে মকর স্নান সেরে আসেন। মকর পরবে স্নানের রীতি এখানেও জনপ্রিয়। 'চকর দেখে মকর স্নান'—সূর্যোদয়ের সময় স্নান করলে বছরটা ভালো কাটবে। মকর স্নানে পুণ্যার্জনের ও পাপ স্খলনের প্রচলিত বিশ্বাস এখানে ততোটা পরিচিত নয়।

টুসুর 'চৌডোল' রঙিন কাগজ কেটে ও কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো হয়। দেখতে খানিকটা শিয়া মুসলমানদের মহরম পরবের তাজিয়ার মতো। চৌডোল প্রতি পাড়ায় বা বাড়িতে তৈরী হয়। অধিকাংশের আয়তন বেশ ছোট, খেলনা রথের মতো।

পৌষ সংক্রান্তিতে পুরুলিয়ার সর্বত্র মেলা বসে। এর মধ্যে নামডাক আছে মাঠাপাহাড়ে মাঠাকুরুর মেলা, চাণ্ডিলের অদূরে সুবর্ণরেখার তীরে জয়দার মেলা, বীরগ্রামে সতী মেলা, হুড়ার শিলাই মেলা, পুরুলিয়ার

কাছে চাঁচড়া মেলা, সুবর্ণরেখার তীরে ঐতিহ্যবাহী সতীঘাটার মেলা।

সংক্রান্তির দিন বলরামপুর থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটি ছোট মেলায় গিয়েছিলাম। সকাল থেকে সেখানে মোরগ লড়াই চলছে। বাবুগৌরবের কলকাতায় এককালে বাবুরা টাকা ওড়াতো মুরগী লড়াই করে। পুরুলিয়ার দেহাতী মানুষের কাছে আজো মোরগ লড়াই দারুণ জনপ্রিয়। অঘ্রাণ-পৌষ-মাঘ মাসে সর্বত্র মোরগ লড়াইয়ের আখড়া বসে। লড়াইয়ের মোরগ কেনাবেচা হয় নানান জায়গার হাটে। এ'বছর এক একটি মোরগ ১৫ টাকা থেকে ১৩০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। তাগড়া চেহারা, দারুণ লড়তে পারে—এরকম মোরগের দাম পঞ্চাশ ষাটের কম নয়।

মেলায় লোক আর ধরেনা। তার মধ্যে শ'আড়াই লোক গোল করে দাঁড়িয়ে মোরগ লড়াই দেখছিল। মোরগের একপায়ে ধারালো ফলার মতো অস্ত্র বাঁধা। স্থানীয় ভাষায় একে 'কাইত' বলে। লড়াই হচ্ছে প্রায় সমান সাইজের মোরগের সঙ্গে। দুর্বলের সঙ্গে প্রবলের নয়। দুটো মোরগকে মুখোমুখি ধরে রেখে রাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেড়ে দেওয়ামাত্র তারা ঘাড়ের কেশর ফুলিয়ে একে অপরের ওপর জাতশত্রুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঝুটোপুটি করতে করতে একের 'কাইতে' অন্যের বাজু বা পেট চিরে যাচ্ছে। আহত রক্তাক্ত পরাজিত মোরগ বিজয়ী মোরগের মালিকের পাওনা, রসনা তৃপ্তির আদিমতম রসদ। পরবের দিনে এইভাবে বহু নেশাগ্রস্ত লোককে মোরগ লড়াইয়ে টাকা ওড়াতে দেখলাম। অভাবী মনুষরাও বিরত নেই। অনেকে মোরগ লড়াই না করে শুধু লড়াইয়ের উপর টাকার বাজী ধরে জুয়া খেলছে। আজকাল আবার প্রাইজ দেবার চলন হয়েছে। নতুন জায়গায় লড়াইয়ের আখড়া বসানোর সময় লড়াইকে আকর্ষণীয় করার জন্য গেঞ্জী, ছাতা, বালতি ইত্যাদি গৃহস্থালী জিনিষপত্র উদ্যোক্তারা প্রাইজ হিসাবে ঘোষণা করেন। পুরুলিয়ার এই মোরগ লড়াই নামধেয় টাকার শ্রাদ্ধের ঐতিহ্য বহালতবিয়তে আছে, থাকবেও হয়ত দীর্ঘকাল এর জনপ্রিয়তার জন্য।

পৌষ সংক্রান্তির দিন বাঙালীর পিঠে পরব। পুরুলিয়াতেও এদিন সর্বত্র পিঠে খাওয়ার ও খাওয়ানোর প্রতিযোগিতা চলে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজন সকলে আন্তরিক অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হয়। আমিও বাদ গেলাম না। আমন্ত্রিত হলাম দুটি বন্ধু-গৃহে বাঙালী মেয়েদের কাছে পিঠে তৈরী—এ শিল্প বিশেষ। রসে ডুবু ডুবু পিঠে, চোবানো তেলে-ভাজা পিঠে, পিঠের পেটে নানানরকম পুর দিয়ে তৈরী পিঠে। ডালের, ছাতুর, সুগন্ধী মশলার, নারকোলের—নানান ধরণের পুর করতে বাঙালী মেয়েরা সিদ্ধহস্ত। চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী এসব পিঠে গরমজলের ভাপে সিদ্ধ করা হয়। খেলে রসনার পরিতৃপ্তি। তবে গরীবের অন্নব্যঞ্জনে যেমন পদের বৈচিত্র্য থাকেনা, তেমনি পিঠে পরবেও তাদের রকমফের করার সুযোগ থাকেনা। পুরুলিয়ার দরিদ্রসাধারণের প্রিয় আস্‌কা পিঠে, গুড় পিঠে আর উন্ধি পিঠে।

মকর সংক্রান্তিতে জয়দায় তিনদিনের বিরাট মেলা বসে। সংক্রান্তির পরদিন এক বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলাম মেলা দেখতে। বাংলার সীমানা পেরিয়ে বিহারের চান্ডিল, সেখান থেকে চার কিলোমিটার ভিতরে জয়দা। স্থানটি প্রকৃতির রূপপাগলদের বিহার ক্ষেত্র। এখানে এলেই মন আপনহারা মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। টাটা হয়ে পাকা রাস্তা এখানে সুবর্ণরেখার উপর দিয়ে রাঁচীর দিকে চলে গেছে। আশেপাশে ছোট ছোট পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই-খানেই পাহাড়ের গা ঘেঁসে সুবর্ণরেখা বাঁক নিয়েছে। সারা এলাকা সবুজ বনানীর চাদর মুড়ি দিয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে নদীর কিনারে শিবমন্দির। এইখানে প্রতিবছর মেলা বসে।

সকালবেলায় মেলায় গিয়ে দেখলাম মেঘলা আব-হাওয়ার জন্য লোকজন বেশী আসেনি। সুবর্ণরেখার ব্রিজের পাশে রাস্তার ধারে মেলা উপলক্ষে জীবন-বীমার স্টল, পরিবার কল্যাণ স্টল, অস্থায়ী থানা বসেছে। পরিবার কল্যাণ স্টলের মাইকে বাজছে পুরনো হিন্দী ফিল্মের গান। প্রচুর দোকান পশারী বসেছে রাস্তার ধারে। টাটা চান্ডিল থেকে মেলায় আসার জন্য বাস, মিনিবাস, লরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপর্যাপ্ত ব্যাবস্থা অব্যাবস্থার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেলা যতো বাড়তে লাগলো, মেঘলা আবহাওয়া ততো কেটে যেতে লাগলো। মানুষের ভিড়ও বাড়তে লাগলো। মেলাটি যদিও বিহারের মাটিতে, কিন্তু মেলার দর্শনার্থী প্রায় সকলে বাংলা ভাষী দেহাতী মানুষ।

গ্রামের মেয়েরা দলে দলে 'চৌডোল' নিয়ে আসতে লাগলো। কণ্ঠে তাদের টুসুগান। অনেকে চৌডোলের পরিবর্তে পদ্মাসীনা টুসুদেবীর প্রতিমা এনেছে বিসর্জন দিতে। প্রতিমা তৈরীর চলন ইদানিং শুরু হয়েছে। ছেলেদের টুসুদলও আসছে। তাদের সঙ্গের মাদলের 'গেদা ঘ্যান গেদ্দে গুড়ুম' বোল অদ্ভুত মাদকতা সৃষ্টি করছে। তারা গাইছে—'বল্‌ সঙ্গাতি জয়দা কতদূর/ত'য় উন্ধি পিঠা তিলের পুর।' বড়ো দলগুলোতে শুধু মাদল নয়, ধমসা, ফ্লুট বাঁশিও আছে। দলের অনেকের হাতে টাঙি উঁচু করে উপর দিকে তুলে ধরা। কারো কারো হাতে পাতাসুদ্ধু জ্যান্ত গাছের ডাল উঁচু করে ধরা। সবাই টুসুগান করতে করতে নাচতে নাচতে আসছে। এনাচের কোন জাত নেই। প্রতিমা বিসর্জনের সময় ছেলেরা রাস্তায় যে উদ্দাম নাচ নাচে, তার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে। গানের ভাষায় আদি রস, স্থূল রসিকতা। বোঝা যাচ্ছে অনেকেই 'দারু' পান করে 'মস্ত্‌' হয়ে আছে। দেহাতী

মানুষের কাছে পরবে 'দারু' পান করাটাই রেওয়াজ। অনেক মেয়েরা মেলার দর্শনার্থীর বিচিত্র পোষাক-আসাক, আচার আচরণ লক্ষ্য করে গান রচনা করে গাইছে।

নদীর তীরে বালির চড়ায় জমজমাট মেলা বসেছে। অস্থায়ী হোটেল, রকমারী খাবারের দোকান, খেলনা, ভেঁপু, ঘর-গৃহস্থালী জিনিষপত্র, শাঁখের জিনিষ, মোষের সিংয়ের বাহারী জিনিষের দোকান বসেছে। সর্বত্র ক্রেতা-বিক্রেতায় গিজগিজ করছে। পুতুল নাচ বসেছে মেলার একপ্রান্তে। ধমসা মাদল বাজিয়ে আরা লোক জড়ো করছে।

নদীর পাড়ে বালিভর্তি অঢেল জায়গা। দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসেছেন। তারা সুবর্ণ-রেখার জলে ডুব দিচ্ছেন। তারপর শিবমন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে আসছেন। মেয়েরাও নিঃসংকোচে স্নান করছেন। নদীতে হাঁটুজল, অল্প স্রোত। স্নান করতে পায়ে একটুও কাদা লাগেনা। পায়ের নীচে শুধু বালি। অনেকে দলবলসমেত রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে রন্ধনক্রিয়ায় রত। যেন পিকনিক করছে। স্থানটি পিকনিক বিলাসীদের পক্ষে আদর্শস্থান। শুনলাম অনেকেই ছুটির দিনে এখানে এসে পিকনিক করে এবং কয়েকঘণ্টার জন্য জায়গাটি সরগরম করে আবার চলে যায়।

নদীর দক্ষিণধারে খাড়াই পাহাড় অকাশে মাথা তুলেছে। পাহাড়ের গায়ে শিবমন্দির। ভক্তরা নতুন মন্দির তৈরী করে দিয়েছেন। এইখানে আগে ছিল পাথরের পুরনো মন্দির। মন্দিরের নিজস্ব মাইকে চল্‌তি ফিল্মের ভজনগান এবং হালকা গান দুই বাজছে। অনেককে দেখলাম ট্রানজিস্টারে টেস্ট ক্রিকেটের রিলে শুনছে, আবার মেলাও দেখছে। মন্দির চত্বরে সাধু ও ভিখারীরা ছাউনি ফেলেছে। দেহাতী মানুষদের সঙ্গে শহুরে ভক্তরাও মন্দিরে শ্রদ্ধাবনত হয়ে পূজা দিচ্ছেন। মন্দিরচত্বরে প্রাচীন পাথরের শিবলিঙ্গের ছড়াছড়ি। এগুলি নাকি পুরনো মন্দিরেই ছিল। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো প্রাচীন পাথরের একটি ময়ূরারূঢ় কার্তিকমূর্তি, দুটি হর-পার্বতীর যুগলমূর্তি ও হাল আমলের তৈরী একটি বিশালকায় ষাঁড়ের মূর্তি শিবের বাহন। পুরনো মন্দিরের ভগ্নাংশগুলো যাদুঘরে দর্শনীয় বস্তুর মতো করে বেদীর উপর রাখা হয়েছে। একটি জায়গায় একটি পাথরে খোদাইকরা নিবিড় আলিঙ্গনে পিষ্ট ওষ্ঠাধর চুম্বনরত প্রেমিকযুগল মূর্তি দেখলাম। দেখে কোনা-রকের মিথুন মূর্তির কথা স্মরণে এলো। একটি প্রস্তর ফলকে দেখলাম আমার আজানা কোন লিপিতে অজ্ঞাত কোন বাণী উৎকীর্ণ আছে। এ লিপি না বাংলা —না হিন্দী, অথচ দুটি লিপির সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে।

প্রস্তর ফলকটি আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখে এক ভাগ্যবিশারদ সাধুজী বললেনঃ স্রিফ নেহরুজীনে এহি লিখাই পড়নে সকা। আমি সাধুকে জিজ্ঞেস করি নেহরুজী এখানে কবে এসেছিলেন। তাঁর জবাবঃ উন্নিশশো ছিয়াত্তর সালতক্‌'। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি, তখন নেহরুজী ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। সাধু আমাকে আরো এক বিচিত্রতর তথ্য পরিবেশন করলেনঃ বিশ্‌কর্মাজীনে এহি মন্দির ব্যানায়া। দুনিয়ামে তিনো চীজোঁ বিশ্‌কর্মাজীনে আপনা হাথসে বানায়া। জগন্নাথ দেবকী মন্দির, এহি শিউ মন্দির, অউর সোনেকী লংকা।

স্থানীয় এক পূজার প্রসাদবিক্রেতা দোকানদারের মুখে শুনলাম, শিব মন্দিরটি বহু কালের পুরনো, রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলের। আগে লোকে নৌকায় করে মন্দিরে পূজা দিতে আসতো। তবে মেলার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের নয়; ষাট সত্তর বছরের বেশী হবেনা। প্রথমে একদিনের জন্য মেলা বসতো। যখন সুবর্ণরেখার উপরে ব্রিজ হয়নি, তখন লোক বনপ্রান্তর পেরিয়ে পায়ে হেঁটে মেলায় আসতো। তাঁর কাছে আরো শুনলাম, মন্দির থেকে এক ফার্লং দূরে নদীবক্ষে প্রসারিত পাহাড়ের পাথরের উপর একটি বেদী আছে। সেখানে বসে সীতা রামচন্দ্রের সঙ্গে পাশা খেলে-ছিলেন। ঔৎসুক্যবশে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে গেলাম সেখানে। কিন্তু কোথাও কোন বেদী দেখতে পেলাম না। শুধু একটি স্থানে দেখলাম পাথরের একটি অসমান চাতাল। তার উপরে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে—'জয় রাম'।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হবার আগেই আস্তানায় ফেরার উদ্যোগ করলাম। সুবর্ণরেখার ব্রিজের উপর উঠে শেষবারের মতো চেয়ে দেখলাম, মেলা দারুণ জমে উঠেছে। মাইকের কলতান, মাদলের দ্রিম দ্রিম শব্দ, মানুষের কোলাহল প্রকৃতির এই নির্জন কোলকে মুখর করে তুলেছে।

গল্প

ফার্স্ট স্ট্রোক

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

পৌষ মাসের শীতের ভোরে বাইরের উঠোনটায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিল খোকা মড়ল। হাতে বালতি আর খড়ের নুটোটা নিয়ে "শালা" "শালা" বলতে বলতে টিউকলের দিকে গেল বঙ্কিম নন্দী। "খাক্ থু" "খাক্ থু" করে থুথু ফেলে বার কয়েক। হাত পা ঘসে ঘসে ধোয়। নাকের কাছে হাতটা নিয়ে গিয়ে তেরে তেরে শোঁকে। এক খাবলা গোবর নিয়ে হাত-দুটো বারকয়েক ঘসে। কাঁপতে কাঁপতে আবার হড়হড় করে হাত পা ধুলো। তারপর ঠক্ ঠক্ করতে করতে হাত পা মুছে বিড়িটা ধরায়। খোকা মড়ল মাথামুখের চাদরটা একটু ফাঁক করে মুখ বার করে বলে—'না খুড়ো তোমার সিদিন বুঝেসুঝে অমন কান্ডটা করতে হোত।'

বঙ্কিম নন্দী গায়ে চাদরটা জড়িয়ে গুড়িসুড়ি মেরে বসে বলে—'বুঝে সুঝে কিরে! শালী এলো তোর রোদ উঠতে, ব্যাটার অসুখের ধানাইপানাই শুনোতে শুনোতে। মাঠে আমার ধান। তা বললুম তোকে আর খাটতে হবেনি ঘর যা। তা বলে কি জানিস, গতকালের খাটুনির দামটা মিটিয়ে দাও।'

—'যা দিনকাল পড়েছে খুড়ো মিটিয়ে দিয়ে পাপ-যন্ত্রণা চুকিয়ে দিলেই ভাল হোত।'

—'থাম না! তা আমি বললুম, তোর জন্যি ট্যাঁকে টাকা লিয়ে ঘুরতে হবে না কি লো! আবার যেদিন ভোর ভোর আসবি সিদিন দুবো।'

—'ভালই তো বলেছিলে। কথায় কোন ম্যারপ্যাচ নাই।'

—'তা আমি বললুম তো শোনে কে। বলে ছেলের ওষুধ লাগবে আবার বার্লিক লাগবে। তা রাগের মাথায় বলেছি খাটার গতর নাই, ছেলে তো বিয়েচ্ছিস পিল পিল করে।'

—'বেশ বলেছো খুড়ো'—খিক্ খিক্ হাসতে হাসতে বলে খোকা মড়ল।

—'তা তাতেই মহারানীর মানে লেদনা পড়ে গেল। তা জবাব কি জানিস, ট্যাঁকে পয়সা নাই তো মুনিস ডাকা কেনে!'

—'ইকি অনাছিষ্টি কথা। কোন শালা বলে বঙ্কিম নন্দীর পয়সা নাই। এমন গাছ পালুই কার ওঠে!' বেশ রাগ রাগ করে বলে খোকা মড়ল। গলাটা নামিয়ে তারপর বলে—'খুড়ির আমার বার ভরির বিছে—'

—'আর বুঝলি কিনা আমার মাথায় ঝাঁ করে রক্ত উঠে গেল; এমন কথা আমার মুখের সামনে আজ পর্যন্তি কেউ বলতে সাহস করেনি। রাগের মাথায় ঝাঁ করে মেরেদিলুম ব্যাঁতে এক চড়।'

—'ইখিনটিতেই তো ভুল করলে খুড়ো।' বিড়িতে একটা টান দিয়ে চাদরে ভাল করে টাঁকটা ঢেকে বলে খোকা মড়ল।—'হাজার হোক মেয়ে মানুষ। এক-কারে দল বেঁধে পঞ্চায়েতে চলেগেল। আর সি শালারাও তো ই-সব দেখতে বসে আছে। শালা চাটার ইয়ে চিয়ারে উঠেছে। তার উপর ডোমপাড়ার মাগী মরদ-গুলোর সি কি বিতিকিচ্ছিরি গালবাখান! তোমাকেই তো দোষ দিল।'

—'দিল বললেই মানলুম নাকি। বললুম গাল দিয়েছে তাই চড় মেরেছি। দোষ মানব কার কাছে! যা প্যারিস করে লিবি, কত হাতি গেল তল—'

—'আর সি জনিই তো ই কিত্তি খুড়ো'। আর একটা বিড়ি ধরিয়ে হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে খোকা মড়ল। 'মাঠে পাকা ধান তাও সয় সারা দেয়ালে গুল্যোপা!'

—'শালা শালীদের পেলে'—কথাটা বলতে বলতে হাত টা আর একবার শোঁকে বঙ্কিম নন্দী। 'শালা শুধু দিয়ালে চৌকাঠ পর্যন্তি।'

—'কি আর করবে খুড়ো'—সান্ত্বনা দেয় খোকা মড়ল। 'কলিকাল। গালমন্দ দিয়েই কি করবে। লোকে হাসবে গু ল্যাপার খপর শুনে। তার উপর মাঠে সত্তর বিঘে পাকা ধান। তোমার ঘরে খাটতে না এলে তোমারই লোসকান।'

—'তা তোরা সবাই মিলে তুলে দিবি। মাথা নুয়োবো কিরে!'

—'তা তো বুঝলুম কিন্তু আবার একটা ধর গিয়ে যদি গজড় লাগায়। সব চাষীরা কি আর আসবে এক্ষুনি যদি সব মুনিসগুলো বলে খাটতে যাবনি।'

—'বললিই হোল। পেটে জ্বালা ধরবেনি!'

—'পেত্নির আবার শাকচুন্নির ভয় খুড়ো! এমনিতে

জ্বটোনি আর দু'দিন খাবেনি। কিন্তু দেবতা একবার নামলে পাকা ধানে কি ক্ষেতিটা হবে ভেবে দেখো দিকিনি। তাইসই খুড়ো কিন্তু আবার যদি ল্যাপে—'

—'লেপলেই হোল'—গর্জে ওঠে বঙ্কিম নন্দী। 'হাত ভেঙে দুবো—আমিও শালা বঙ্কিম নন্দী।'

—'তা তো হোল খুড়ো কিন্তু রেতের বেলা লিপলে ক'রাত জেগে কাটাবে। তা ছাড়া যা দিনকাল রেতের বেলা পেছন থেকে তোমার গায়েই ঢেলে দিল এক খোলা।'

"থাক্ থু" "থাক থু" করে আর খানিক থুথু ফেলে বঙ্কিম নন্দী। গন্ধটা এখনও চারদিক ছড়াচ্ছে। মনে মনে গায়ে ঢাললে কি বিতিকিচ্ছিরি হবে ভাবতে ভাবতে গাটা গুলিয়ে ওঠে। আবার খানিক থুথু ফেলে। তার উপর পাড়াপড়শী দু'চারজনের সঙ্গে মন কষাকষি আছে। মরাই পালুয়ের গতর দেখলে, সনে সনে মা লক্ষ্মীর ক্ষেত্র বাড়লে অমন দু চার জনের রাগ হয়। আর সকাল হলেই তারা এক্ষুনি চারদিক চাউর করে দিবে। পাঁচজন এখন ব্যাঁত ফেড়ে দাঁত বার করে জিজ্ঞেস করবে ল্যাপা লেপির কথা। অন্যের কাছে শুনলেও জিজ্ঞেস করবে। একবার শুনলেও আরো পাঁচবার তেরে তেরে জিজ্ঞেস করবে। ভাবতে ভাবতে একটা বিড়ি ধরায় বঙ্কিম নন্দী। খানিক পরে বলে —"তা কি করা যায় বল্ দিকি মড়ল।"

খোকা মড়ল সামনের অবশিষ্ট দু'টি লড়া দাঁত জিব দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে—"আমি বলি খুড়ো এই ভোররেতে মাগীটার কাছে একবার যাও। ওর ব্যাটাটার হাতে একটা আধুলি দিয়ে বোলো মকরে মিষ্টি খাবি।"

—"সি কি রে বাবু—ই তোর যে বেশ কথা। ল্যাপাকে ল্যাপা আট আনা গচ্ছা।"

—"আহা হাতে দিলে বলে কি একবারে দিয়ে দিলে। পাঁচদিন কাজ করুক ধানটা উঠে যাক। তার-পর ঝাড়া হয়ে গেলে তো তোমার দিন। মুনিস তখন ফ্যা ফ্যা, শেষদিন আটআনা কেটে লিবে। আর ইদিক দিয়ে তোমার খপরটিও চেপে গেল।"

—"তোর মাথা বড় ভালো খেলে রে"—বেশ মোলায়েম করে বলে বঙ্কিম নন্দী। "আমার সব চুলগুলো পেকে গেল তবু তোর মত বুঝতে পারিনি।"

—"আমার থাকলিই তোমার থাকা খুড়ো।"—খিক্ খিক্ করে হাসতে হাসতে খুব খুশী হয়ে নিজের মাথাটাতে একবার হাত বুলোয় মড়ল। তারপর আবার বলে—"তবে একটু মোলায়েম করে বলো আরকি। তোর শ্বশুর আমার ঘরে খাটত। কত্তা বলতে অজ্ঞান। আর প্যালাটাকে বাইরে ডেকে হাতে একটা বিড়ির তাড়া দিয়ে দিও আরকি। নুলো হোক কুঠে হোক ভাতার তো বটে। ও বললে শুনবে।"

—'তাই করি বল্। তবে শালা ধান ঝাড়াটা হয়ে গেলে আমার একদিন কি ওদের একদিন। শালা তখন দেখে লুবো ডোম পাড়ার মাগী-মরদগুলোর কত তেল।'

—'তা তো দেখে লিবেই খুড়ো। শুধু পুর্ণ সূয্যি-গ্রেহণটা যেতে দাও। বোশেখ-জেষ্টি পড়ুক।'

—'হ্যাঁ দাঁড়ালা। এমন দিন চলবেনি! উপরে ভগ-বান আছে যেমুখে গাল দিয়েচে গলে গলে পড়বে। আর এক মাঘেতে কি শীত পালাইরে! আবার ভোট হবে চিরকালের গাঁয়ের মাথা বঙ্কিম নন্দী আবার মাথা হবে।'

—'তা হবে বইকি খুড়ো। তোমার মত গুণী লোক গাঁয়ে ক'টা আছে। গাঁয়ের লোকে আজও কি সম্মান দেয়। তা হারলেই কি মানুষের দাম কমে! তা যাক খুড়ো ঝুঁকো থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়। আবার পাঁচজনের চোখে পড়বে। হাজার হোক কলিকাল।'

টর্চটা ইচ্ছা করেই হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল বঙ্কিম নন্দী। একটু ঝুঁকো ঝুঁকো আছে দু'দিক ভালো করে দেখে যেতে হবে। হ্যাঁ যা ভেবেছিলো তাই। যে রাস্তা দিয়ে নাক খুলে এগোনো যেত না একবারে তক্ তক্ করছে। সব শালাশালীরা ভাঙা খোলায় কুড়িয়ে তার গাং দিয়ালিতে লেপে দিয়ে এসেছে। খোকা মড়লের কথাশুনে মাথাটা খানিক ঠাণ্ডা হয়ে-ছিল আবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। শালারা এত-দিন তার দুয়োর নিকিয়েছে আজ তাতে ল্যাপা! আজ এক চড়ে অত লাফানি তোদের বাপ দাদুদের যে পিঠে ঘা খেয়ে কালসিটে পড়ে গেসলরে! রাগে গরগর করতে করতে লম্বা লম্বা পা ফেলে প্যালার ঘরের দিকে এগোয় নন্দী। প্যালার দুয়োরে উঠে শ্বাস ফেলে। শালা ওর বোয়ের জন্যে যত কেলেংকারি। আগড়টা ঠেলে চড়চড় করে খোলে নন্দী। প্যালাকে হাঁক পাড়তে পাড়তে তোলে। প্যালা খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে "কত্তা যে" বলে উঠে বসে। সামনে পেয়ে খানিকটা তাকেই ঝেড়ে দেয় নন্দী—'শালা তোর বৌ আমার গাংদিয়ালিতে ইয়ে লেপে দিয়ে এয়চে। তোর বৌকে—' খানিক হাঁক ডাকে প্যালার বৌ লক্ষ্মী ওঠে। লণ্ঠনের আলোয় বঙ্কিম নন্দীকে দেখে বলে—"কত্তা যে।" "হুঁ" করতে গিয়ে নন্দী ধ্যাৎ করে ওঠে। ঘরের এককোণে পাঁঠি ছাগলটা বাঁধা। তিনটে বাচ্ছা হয়েছে। সেগুলো লিড়বিড় করে। লক্ষ্মী উঠে বলে—"কত্তা একটু পেছন ফিরো দিকি।"

ধক্ করে ওঠে নন্দীর বুকটা। খোকা মড়ল এমন একটা কথা বলেছিলো বটে। পিছন থেকে ঢেলে দিতে পারে। শালা ছোটলোকের রাজত্বি কিচ্ছু বলা যায়নি। নন্দী এদিক ওদিক চেয়ে বলে—'কেন লো?'

—'না ফিরলে রেতের কাপড় কি তোমার মুখের উপর ঠিক করবো?'

—"অ"—বলে পেছন ফিরে নন্দী। পরে কি বলবে মনে মনে ঠিক করে।

—"হয়চে। ঘুরো"—বলে প্যালার বৌ।

ধাঁ করে ঘুরে নন্দী। তারপর বেশ চড়া গলায় বলে—'তুই যত নষ্টের গোড়া। শালা তোরাই আমার গাং দিয়ালি—'

ব্যা-ব্যা করে বার দুই ভ্যাবাই ছাগলটা। 'থাম থাম' করে ধমকায় নন্দী। কে শোনে কার কথা! প্যালার বৌ গায়ে হায়ে হাত বুলোতে তবে থামে। বেশ তোয়াজ করে হাতবুলোয় প্যালার বৌ। প্যালা নন্দীকে হাত নেড়ে বলে—'না-না কত্তা। লক্ষ্মী সারা রেতে পাশটি ফিরেনি। আমি বলছি কত্তা আমার দিকে পাশ ফিরে ছেলো। লক্ষ্মী আমার অমন লয়—'

—'কৈ গন্ধ দেখাও দিকি'—হাতটা সট করে নন্দীর নাকের ডগায় আনে লক্ষ্মী। গাটা গুলিয়ে ওঠে নন্দীর। ছাগলের বটকা গন্ধ।

—"হাঁ লিপেছিস।"—এতক্ষণে জোর ধরে নন্দী। 'আমিও শালা বঙ্কিম নন্দী সব থানায় ঢুকোবো। ভেবেছিস কি এখনও থানায় গেলে দারোগা আমায় সেলাম ঠুকে।' তড়াক করে একটু সরে যায় নন্দী। প্যালা বলে—"ও কিছু লয় ছাগল ছেনা।" লক্ষ্মী ততক্ষণে কোমরে কাপড়টা জড়িয়েছে। বলে "ঢুকোও না কেনে। তোমার ঘরে লোকে খাটতে যাচ্ছেনি, তোমার গাং দিয়ালিতে কে কি লিপবে তা সব দোষ পারা লক্ষ্মীর। কাল তোমার মাথায় রেতে কে কি ঢালবে তাও লক্ষ্মী। কাল তোমার মাঠ থেকে ধান যাবে তাও পারা লক্ষ্মী।'

মাথাটা পাঁই করে ঘুরে যায় নন্দীর। খোকা মড়লের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলে যাচ্ছে। এখনও সত্তর বিঘে ধান মাঠে পড়ে আছে। আবার যদি ঢেলেই দেয় মাথায় লোকে কত হাসাহাসি করবে। দিন ঠিক আসবে এখন শুধু একটু বুঝেসুঝে চলতে হবে। মাথাটা ঠাণ্ডা করে নন্দী। বলে—'তা কি আর পারি—তোদের সঙ্গে এমন করতে পারি?' ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ির তাড়াটা বার করে একটা ধরায়। একটা প্যালার হাতে দেয়। বাকি তাড়াটা চুপিসাড়ে চাদরের ভিতর দিয়ে প্যালার দিকে ঠেলে দেয়। প্যালা বৌয়ের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নেয়। অনেক দিন বিড়ি জুটছেনি। বৌ দিন গেলে গোনা পাঁচটি কিনে দেয়। বলে—"ভাত জুটেনি বিড়ি।" প্যালা ভাবে নেশা তো করেনি—মেয়ে মানুষ ইর আর কি বুঝবে! যাক কাল এখন একটু মৌজ করে খাবে। নন্দী এবার বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বলে—"তা তোরা তো জানিস বাবু আমার মাথাটা মাঝে মাঝে গরম হয়ে যায়। তা লইলে তোর ব্যাটার অসুখ আর আমি অমন বলতে পারি। আর ধমকে দিতে গিয়ে বুঝলি না কি অসাড়ে হাতটা উঠেগেল।"

—"তা বলে গায়ে হাত তুলবে না কি?" ঝেঁঝিয়ে বলে লক্ষ্মী।

—"সি টি কিন্তু অন্যায় হয়েচে"—মাথা নেড়ে হাত ঝাকিয়ে বলে প্যালা। "গায়ে হাত কি! মেয়েছেলে মা লক্ষ্মী! আমার বৌ হাজার দোষ করুক তবু কেউ বলতে পারবে কোনোদিন প্যালা বৌকে এক ঘা দিয়েচে।"

—"আহা তোর বৌ আমার মেয়ের বয়সি।" গলাটা বেশ নরম নরম করে বলে নন্দী। 'ইকি আর মারব বলে মারা। আমার বড় বৌটিটা তিন ছেলের মা কথা না শুনলে এখনও দুচার ঘা মারি। বিধবা আদরের বুন—সি দিন দুঘা বসিয়ে দিলুম। আহা মায়ামমতা কার্র থালেই তো অমন জোর করতে পারি। তা লইতো কি আর লোকের ঘরে গিয়ে মারতে যাচ্ছি! দুর শালা—' হাতটা ঝিনকোর নন্দী। ছাগলটা জিব দিয়ে নন্দীর পিছন দিকে নন্দীর ঘাড়টা চাটছে। নন্দী একটু সরে বসে আবার বলে—"তা বুঝলি কিনা বাছা আমার ঘরে খাটবি চ। আর যে ব্যাপারটা বললুম সেই ল্যাপার কথা চেপে যাবি বুঝলি। নোংরা জিনিস যত রটে তত খরাপ। চ খাটবি চ—রাগ করে কি হবে বাবু। তোর শ্বশুর—বুঝলি লক্ষ্মী—আমাদের ঘরে বাঁধা মান্দার ছিল। কি ভালবাসতো আমাকে। ছোটবেলায় কোলে করত—কত কিল চড় মেরেছি। তা ছাড়া প্যালা খোঁড়া মানুষ আবার তুইও যদি না খাটিস্"—

—"সি কথা বোলোনি কত্তা"—চটে বলে প্যালা। "আমি যা ইদিক উঁদিক থেকে যোগাড় করি একটা মরদ পারবোনি। তবে তুমি ঘর বয়ে এয়েচ—যাবেতা লইলে অমন অনিল কুণ্ডু হাতে পারে ধরে বলে গেল খাটতে গেলানি।" নন্দী আবার গরম হয়ে যায়। মনে মনে বলে—"বড় কথা তো শালার হাতে পায়ে ধরে। দাঁড়া শালা ধান টা উঠুক আর গেহণটা যাক তারপর দেখব শালা তোদের কি আমাদের এক দিন।" মুখ ফুটে বলে—"তা ওঠ—সকাল হয়ে গেছে।" পয়সা আট আনা কোঁচ্চ থেকে আর বার করে না। বাইরে এসে সারা ডোম পাড়াটার দিকে আগুন-দৃষ্টিতে একবার তাকায়। তারপর কাছা খুলতে খুলতে পুকুর পাড় দিয়ে চলে যায়।

খানিক পরে পুকুর পাড় সেরে ঘরে ঢুকেই নন্দীর মেজাজটা একেবারে তিরখে হয়ে যায়। লক্ষ্মী দুয়োরে বসে পা মিলে কলাইয়ের কাপে চা খচ্ছে। আবার বলছে—"গুড়ের চায়ে একটুন আদা দিলে যা লাগেনি!" "মাঠ যা"—'মাঠ যা" বলতে বলতে গুয়োল ঘরের দিকে যায় নন্দী। মনে মনে গজগজ্ করে। "গাজবুলুনে কথা শোনো—আদা দিলে চা ভালো লাগেনি!" রাগে রি-রি করতে করতে গরুর দাঁড় খোলে। নিজের মনেই বলে—"দাঁড়া শালার তেল মিটোবো। বোশেখ-জৈষ্টি আসুক। দিনকালটা একটু পালটাক।" চড়াক করে ওঠে চাদরটা। গরুর শিঙে লেগে ছিঁড়ে গেল। লাফাতে লাফাতে ডাংটা নিয়ে ফটাফট ফটাফট করে ঘা কতক বসিয়ে দেয় নন্দী। এই শীতে গায়ে ঘাম ঝরছে। হাজার হোক ষাট-প'য়ষট্টি বয়েস হয়েছে তার উপর ভোর থেকে সারা

দেওয়াল লাতা দেওয়া, এত ঝগড়াঝাটি, গা জ্বলুনে কথা—মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে কতক্ষণ। ওদিকে আবার কানে ঢুকছে লক্ষ্মীর কথা—'আমাদের তো চারকাল জুটোনি ইকালে আর কি বাড়বে খুড়ি! তবে শুনছি কানাঘুষো দিনে আট টাকা বেতন লিয়ে সব এক চোট লাগবে। গমের দাম বেড়েছে, ধানের দাম বেড়েছে—খাটুনির দাম বাড়াতে হবেনি—গতর কি সস্তা!" ডাংটা হাতে নিয়ে নন্দীর মনে হয় গোদা গতরটা আগাদে দিয়ে আসে। আবার সেদিনের চড় চাপড়ের কথা মনে পড়াতে অনেক কষ্টে চেপে যায়। লক্ষ্মীর কথা আবার কানে ঢুকে—'কাল রেতে নিমাই বামুন এয়েছিলো। বলে গেলো কলকেতায় মিছিল করে যেতে হবে। আমাকেও যেতে বলে গেল। মন্ত্রী-দের সঙ্গে কথা বলতে হবে গো!' নন্দী ডাংটা এক-বার ঠোকে একবার 'মারবো' মারবো' বলে নামতে যায়। ঘামতে থাকে দরদর করে। ডাংটা দনে ঠোকে—ফোকলা মাড়ি দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। একা গোয়াল ঘরে মাথা নাড়ে। ভিতরটা হঠাৎ ধড়ফড় করে ওঠে। উল্টে দনের ভিতর পড়ে যায় নন্দী।

খানিক পরে চাকরটা চিৎকার করে গোয়াল থেকে লোক ডাকে। সবাই মিলে ছুটে এসে তোলে। একে-বারে অসাড়। কেউ বলে "ভূতে পেয়েছে গো" কেউ বলে "ঠাকুর পেয়েছে।" তুলে এনে দুয়োরে মাদুর পেতে বালিশ দিয়ে শোয়ায়। মুখে জলের ঝাপটা দেয়—মাথায় পাখা করে। বিনোদের পিসী গলায় কাপড় দিয়ে জোড় হাত করে বলে—"কি দোষ করেছি মা—বল মা কালী। মুখ ফুটে বল মা।" তবু মুখ ফোটে না। সব টিপ্ টিপ্ করে গড় হচ্ছে। হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বড় বেটা নরহরি বাপকে জড়িয়ে ধরে। ধরলেই কি হবে চোখ বন্ধ মুখ বন্ধ। দেহে প্রাণ নেই। নরহরির বৌ উঠে গিয়ে কত্তার বিছানার তলা হাতড়িয়ে চাবিটা নিয়ে আচলে বাঁধে। মেজ বৌ চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে কত্তার ছোট টিনের বাক্সটা নিজের ঘরে ঢুকিয়ে কাঁথা চাপা দেয়। ছোট বেটা খানিক কেঁদে ঘরে ঢুকে মায়ের বাক্স হাতড়ায়। ছুটতে ছুটতে আসে খোকা মড়ল। চোখ মুছতে মুছতে বলে—"খুড়ো আমায় পেছনে ফেলে স্বর্গে গেলো যে গো! এই ভোরবেলায় খুড়াকে যে ঠাকুর নাম করতে করতে গাং দিয়ালিতে গোবর লাতা দিতে দেখলুম গো! এই খানিক আগে বলছিলো গো লক্ষ্মীবার চারদিক পরিষ্কার করতে হয়!" সব্বাই ক'কিয়ে কেঁদে ওঠে। নন্দীর বিধবা দিদি "হ্যাঁ গো আমি কি করে বাঁচবো গো—দাদা যে আমার নেই গো" বলতে বলতে ঘর থেকে একটা ছেঁড়া বালিশ-এনে মাথার নিচে দিয়ে নতুন মাথার বালিশ আর পাশ বালিশটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আসে। এতক্ষণে হোমিও-প্যাথ ডাক্তার আসে। আর দেখেই কি হবে! ডাক্তার নাকে খানিক তুলো শোঁকায়। বুকে স্টেথেস্কোপ বসায়। নাড়ী দেখে বলে—"বেঁচে আছে। এক্ষুনি জ্ঞান ফিরবে। তিনবারের বেলা বাঁচেনা। এই তো সবে ফার্স্ট স্ট্রোক।" আবার চোখ মেলে বঙ্কিম নন্দী।

নাটকের সুখ-দুঃখ এবং কজল আলি আলছে

[৬২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

নাটকের প্রাণবায়ু। সমীরণের ভীরুতা এবং হীন-মন্যতাকে স্পষ্ট ক'রেছেন হারু বসু। এ ছাড়া অবিশ্যি কারো অভিনয়ই মনে দাগ কাটে না। মন্দার বাবা এবং ফ্যাক্টরীর মালিক চরিত্রের অভিনেতা জড় জিহ্বায় অজস্র ইংরেজী সংলাপ বললেও তা তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে সক্ষম হন না। এমনকি, তার উদ্দেশে দর্শকাসন থেকে কয়েকবার 'লাউডার' শব্দটি ছুঁড়তে শোনা যায়। তার আরেকটু সরব হওয়া দরকার। মন্দার একাকিত্ব, বিষণ্ণতা এবং বুদ্ধির ছাপ উপন্যাসে যেরকম ছোঁয়া গিয়েছিল, এখানে অভিনয় ত্রুটিতে তা একেবারেই অনুপস্থিত। বরং তাকে কেমন রঙিন সোসাইটি গার্ল মনে হয়। ঠিক তেমনই বৌধায়নের কবিত্ব এবং সরলতার বদলে এখানে সে যেন একটি হাবাগোবা বয়স্ক বালক। সুব্রত কিম্বা বলু দু'জনেই অভিনয় ক'রেছেন আস্ত থিয়েট্রিকাল ভাঁড়ের মত। বরং সে তুলনায় বৌদি চরিত্রের অভিনেত্রী অনেক সাবলীল।

এই নাটকের মঞ্চসজ্জা একেবারেই প্রয়োজনহীন বাহুল্য হ'য়ে থাকে। জোন-বিভক্ত মঞ্চ নাটকের বাইরের ব্যাপার মনে হয়। গানগুলি শুনতে মন্দ না লাগলেও, তা আসলে নাটকের অন্যান্য দুর্বলতা ঢাকার প্রয়াসে মোহন প্রলেপের মত ব্যবহৃত। বিশেষত শেষ দৃশ্যে বেমক্কা ব্যাক-জোন থেকে যাত্রার ঢঙে গান গেয়ে ওঠা যথেষ্ট বিসদৃশ।

আসলে এই নাটকের যাবতীয় দুর্বলতার জন্যে দায়ী নাট্যকার অমর গঙ্গোপাধ্যায়। এরকম একটি তীক্ষ্ণ থিমেটিক উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রদানের ব্যাপারে তিনি কেন মূলের সর্বগ্রাসিতার কাছে এ্যাত নতজানু র'য়ে গেলেন, বোঝা গ্যাল না। বস্তুত, সে কারণেই নাটকটি উপন্যাসের জলছবি হ'য়েই রইলো, আমাদের নতুন কোথাও পেঁছে দিতে পারলো না। অথচ, সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।

—গৌতম ঘোষ দস্তিদার

দিন বদ্‌লায়

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন বদ্‌লায়
ফিরে আসছি
দিন বদ্‌লায়
দিন।

চোখের পাতায় উথালপাথাল
যেন আচম্বিতে
উ'চিয়ে ফণা ছুটে আসছে
অবাধ্য কৈশোর
ছোবল দিলো বুকে আমার
কখন হোলো ভোর—
তাকিয়ে দেখি হাসছো তুমি
উদ্ধত সঙীন।

দিন চলে যায়
দিন বদ্‌লায়
দিন চলে যায়
দিন।

তবুও ঝড় ধমক দেয়
মাটিতে মেশে ঘর
পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে যায় ভিড়ে—
দুহাত ভরে ধরতে যাই
যা-ইচ্ছে-তাই খুশী
বুকের মধ্যে কোন্ চেনা মুখ
রাখছে আমায় ঘিরে!

আকাশে চোখ। কাঁপছে মাটি।
আগুনে-মেঘ ছোটে।
হতোদ্যম বুকে মেদুর
স্মৃতির মৃদু চাপ—
তবু কখন উঠে দাঁড়াই
শরীর টান টান
শিরায় ছোটে রক্ত, মনে
কিসের উত্তাপ?

বুঝতে হাতে হাত মেলাই
ঘৃণায় বাঁধি ভয়—
পাঞ্চজন্য গর্জে ওঠে
ভাঙতে দুর্দিন

দিন বদ্‌লায়
ফিরে আসছি
দিন বদ্‌লায়
দিন।

নতুন সূর্য নতুন দিন

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রত্যহ রক্তের মধ্যে ক্রোধ জমে ধারালো অশ্রুর মধ্যে ঘৃণা
এই ভাবে লালিত দুঃখ গুলি এক সময় গর্জে ওঠে নিজস্ব তাগিদে
পুড়ে ভালবাসা, পুড়ে সৌখীন সুখের শিল্প, পাতার প্রতিমা
রক্তাক্ত ভয়ঙ্কর মানুষের ইতিহাস এই ভাবে মানুষকে
রোজ শিক্ষা দেয়, জ্ঞান দেয়, যুদ্ধের পদ্ধতি প্রক্রিয়া
সহজে শিখিয়ে দেয় পৃথিবীর ভূগোল পাল্টায়।

স্বভাবের গুপ্ত কক্ষে দাবানল জ্বলতে থাকে জ্বলায় শরীর. .

দেশের পুরানো ত্বক দগ্ধ করে, লাল চামড়া ঝলসে যায় অবিনাশী তেজে:
সমাজ সভ্যতা পুড়ে স্বয়ংক্রিয় চুল্লির আগুনে
সমস্ত ঘৃণা ও ক্রোধ দুঃখ গুলি জোট বেঁধে প্রশস্ত রাজপথে
শোভাযাত্রা বের করে, বুকে সাঁটে কালো ব্যাজ
দুহাতে ফেস্টুন, প্রতিবাদে গর্জে ওঠে
গ্রেনেডের মুখে মুখে ঢালে তপ্ত খুন।

এই ভাবে শাসনের ছড়ি ভেঙ্গে প্রতিদিন এক একটা মানুষ
পাল্টে দেয় সিংহাসন মানচিত্র এবং মুকুট
নূতন সাম্রাজ্য এক জন্ম নেয় যুদ্ধরত সৈনিকের অস্ত্রের ডগায়
লাল সূর্য ঝলকে ওঠে, পৃথিবীর স্পর্ধিত যৌবন
সবুজ শস্যের সুরে ভূমিষ্ঠ দিনকে সুখে স্বাগত জানায়।

রক্তের ভিতরে গোপন ইশ্‌তাহার

সুবোধ চৌধুরী

এখন বস্তুত আগ্নেয় প্রস্তুতির কাল
কেননা অভিজ্ঞতার নখ-দর্পণে
শত্রুর ভয়াল মুখ আমি দেখেছি—
একদিন নিশ্চিত তার স্বার্থে
ভীষণ মারণাস্ত্র নিয়ে
আমাকে তোমাকে
মুখোমুখি হতে হবে।

কল্যাণী মাসিমা পানিহাটির
সোনারপুরের গীতা-বউদি
কিংবা সাত ভাই চম্পার এক বোন পারুল
মিয়াবাগানের অসীমা—
ওদের সকলের অশ্রুকে
বারুদে রূপান্তরিত করার চিন্তায়
মগ্ন ছিলাম আমি এতকাল
অনেককাল......।

এতদিন মূঢ় আমি
মোমের আলোয় করেছি শুধু পাঠ
জালিম জমানার সাগ্নিক সংকেত
অস্তিত্বের জীর্ণ দীর্ণ ভূর্জপত্রে।
এবার, বন্ধু, জেনেছি খবরঃ
মালতী মায়ের বুকে-বাঁধা মাইন
—শত্রুর নিশ্চিত কবর!

তখন তাই আগ্নেয় প্রস্তুতির কাল।
সাথী,
এখন তাই
রক্তের ভিতরে গোপন ইশ্‌তাহার
নিঃশব্দ হাত-বদল করে কে।

জীবন সন্ধানে

কৃষ্ণপদ কুণ্ডু

দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ির দেশ
এই তরাইয়ের বুকে জমা আছে
কতো নিরন্ন মানুষের না-বলা ইতিহাস,
আশা হতাশার ব্যথাদীর্ণ বেদনা
জীবনযন্ত্রণায় আছে শরীরী উত্তাপ......
চা-গাছের তৃষ্ণা মেটায় রক্তক্ষরা স্বেদ
চা-শ্রমিকের ক্ষুধাতুর চোখে থাকে
নোতুন পাতা ও কুঁড়ির প্রসববেদনা।
রোলার পেশনীতে সবুজ রসটুকু
নিঃশেষ ক'রে দিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে
প্যাকিং বাক্সবন্দী হয় তার বিবর্ণ রূপ—
বাণিজ্যিক মার্কে ঢাকা পড়ে থাকে
নেপথ্য ভূমিকায় শ্রেণীস্বার্থের
উলঙ্গ শোষণ অথবা
ফোস্‌কা পড়া আঙুলের ছাপঃ
অলস নিদ্রায় ভোরের বিছানায়
জোটায় দৈনিক নেশার খোরাক।
অধিক মুনাফায় সভ্যতার উল্টোপিঠে
মালিকের বিছানো অন্ধকারে
লেখা হয় কালের ইতিহাস।
কিম্বা ভাটিখানার নেশাখোর কাটে
ওদের ব্যস্ত পেশীর শংকিত সময়
লাল ঝাণ্ডার ডাক শুনেছে শোষিত মজুর
কাস্তের শাণিত ফলা আর হাতুড়িপেটা শব্দ
চিনিয়ে দিয়েছে ওদের মুক্তির লাল পথ......
পালা বদলের দিনে অগ্রপথিক
ওরাই নেমেছে পথে সংগ্রামী চেতনায়;
মুক্তির মাদল বাজাতে ওরাই আমাকে
রাজপথে টেনে আনলো রাজনৈতিক বোধিতে:
ওদের নিরন্ন পেটের বস্তুবাদী বাণী
আমার উদ্বুদ্ধ করে জীবনে বাঁচার
সবুজ ফসল তোলার জীবন সন্ধানে
কেননা ওরাই তরাই-সভ্যতার
বিস্তৃতি॥

মৃত হরিণেরা আজ জেগে ওঠে

তপনকান্তি মণ্ডল

মৃত হরিণেরা আজ জেগে ওঠে
চারণের ক্ষেতে ঝর্ণার ধারে
শিকারীর শেষ তীরে
সমবেত অন্ধকারে অরণ্য নদী পার হয়ে
জ্যোৎস্না রোদ্দুর আসেঃ স্বগত উজানে হাঁটে
উৎসবের আয়োজনে বেজে ওঠে ঘণ্টাধ্বনি

একদা এই চারণের ক্ষেতে
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির দিনে
শাবকেরা মেতেছিল ক্রীড়া-মাধুরীতে
দূরে ময়ূরীর সংগীতে
বনভূমি উঠেছিল নেচে
অথচ দিনের আলো নিভে না যেতে
রাত্রি নেমেছিল এই ভিজে মাটির বুকে

যখন আকাশের মেঘ ছিঁড়ে
নেমে এসেছিল তীব্র বর্শার গতিতে
ঝলমলে মিঠে সোনালি রোদ্দুর
সহসা তখন শ্বেতাঙ্গের শরে বিদ্ধ হ'ল নিরীহ মানুষ

মহাকলরোলে আজ বনভূমি কাঁপে
একে একে
মৃত হরিণেরা
ওঠে জেগে।

সত্যটা থাকবেই

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীটা ঘুরছে ঘুরবেই
সত্যটা থাকছে থাকবেই।
সূর্যটা উঠছে
ফুলগুলো ফুটছে
মৌমাছি জুটছে জুটবেই
বায়ুগুলো ছুটছে ছুটবেই।

মিথ্যেরা মরছে মরবেই
অন্যায় ঝরছে ঝরবেই।
হিংসেটা পড়ছে
পাপগুলো দৌড়ছে
ভয়ঠাই ছাড়ছে ছাড়বেই—
সত্যটা বাড়ছে বাড়বেই॥

মিছিলের প্রতিনিধি—আমিও

সুজয় চক্রবর্তী

মিছিলের প্রতিনিধি—আমিও
দেখি, এগিয়ে আসছে মিছিল
সমুদ্রের তীরঘেঁষা আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর মত
দুরন্ত আক্রোশে;
অগ্নিশিখার মত বুক চিতিয়ে
মনে সূর্যের তেজ নিয়ে
এগিয়ে আসছে বুভুক্ষু জনতার ঐ মিছিল
রাস্তার দুপাশের বড় বড় বাড়ীগুলোর দরজায়
ঐ ঢেউগুলো পড়ছে আছড়ে
ঐ বড় বড় দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে
অযুত কণ্ঠের সম্মিলিত স্বর
ওরা এগিয়ে আসছে
বারুদদগ্ধ রাজপথ দিয়ে
মৃত শবের পাশ কাটিয়ে—ধ্বংসস্তূপে
ওদের হাত উর্ধ্বমুখী, বজ্রমুষ্টি
মুখে দাবী-দাওয়া, আর ধিক্কারের
ফুলঝুরি, পরণে ছেঁড়া কাপড় আর বুকে সূর্যবহ্নি—
ওদেরকে অহর্নিশি এই মিছিলের প্রতিনিধি
করেছে।

ওদের হাতগুলো চায় আকাশ ছুঁতে—চায় বুঝি
ঈশ্বরকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনতে
ওদের এই সংগ্রামী রাজ্যে
স্বাধীনতার উদগ্র ক্ষুধা ওদেরকে দিয়েছে উৎসাহ
দিয়েছে প্রাণ, বলেছে, "তোমাদের বাঁচতে হবেই
তোমরাই ভবিষ্যৎ।" সংঘাতের কষ্টিপাথরে
নিজেদের যাচাই করে ওরা এখন সংগ্রামী—যোগ্যতার
উচ্চাসনে উপবিষ্ট হবার বাসনায়
ওদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর—
সামনে দাঁড়িয়ে "ঝুট্" কে "ঝুট" বলতে দেখে
আমার ভালো লাগল ওদেরকে
আমি সঙ্গ নিলাম ওদের অন্তহীন মিছিলে
মুখে দাবি-দাওয়া, ধিক্কার নিয়ে হাত উর্ধ্বমুখী,
বজ্রমুষ্টি করে
আমরা হেঁটে চলেছি—অন্তহীন সুদূরপ্রসারী
পথে।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

জ্বলে উঠল আলো-

আকৃতি-প্রকৃতি দোষ-গুণের কথা ভুলে গিয়েও একথা সবার আগে নির্দ্বিধায়, নির্ভয়ে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের অতি প্রিয়, অতি কাজের অতি প্রয়োজনের সঙ্গী ইলেকট্রিক বাল্বের জন্মশতবর্ষের কথা আমরা প্রায় ভুলে গিয়েছি।

অথচ গত একশ' বছরে মানুষ বিজ্ঞানের কাছ থেকে পাওয়া যতগুলি সুযোগ-সুবিধা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে কাজের, সবচেয়ে বেশীভাবে ব্যবহৃত বস্তুটির নাম ইলেকট্রিক বাল্ব। ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগেও ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলত, তবে তা ভাস্বর ছিল না, তার জীবনীশক্তি ছিল অতি সামান্য। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেভী নামে জনৈক ইংল্যাণ্ডবাসী কার্বণ আর্ক ল্যাম্প আবিষ্কার করেন। ব্যাপারটা ছিল খুবই সাধারণ। দু-খণ্ড কার্বণ দণ্ডকে দু'টি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের প্রান্তে জুড়ে দিয়ে তারপর কার্বণ দণ্ড দু'টিকে একবার ছুঁয়ে দিলেই তার মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং কার্বণ দণ্ড দু'টি যে বিন্দুতে একত্রিত হয় সেখানে সাদা উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হয়। আজকের দিনে স্কুলের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ছাত্ররা এরকম ঘটনা প্রায়ই দেখিয়ে থাকে। তার আগে অবশ্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেই জানা গেছিল যে কোন ধাতব পদার্থের মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ বিদ্যুৎ পাঠালে ও তাতে ধাতব পদার্থের তাপমাত্রা ২০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপর গেলেই ধাতব পদার্থ থেকে সাদা আলোর বিকিরণ ঘটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল যে এমন কোন ধাতু খুঁজে পাওয়া সেযুগে এতই দুষ্কর ছিল যা এই কাজে ব্যবহৃত হ'তে পারে। শুধু সেযুগ কেন আজকের দিনেও এমন ধাতুর সংখ্যা অত্যন্ত কম যা ২০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেও গলে যায় না। যদি সেরকম কোন ধাতু খুঁজে পাওয়া যেত তাহলে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দেই ভাস্বর ইলেকট্রিক ল্যাম্প আবিষ্কৃত হ'ত। কারণ, ঐ বছর ফ্রান্সের ডি-লা-রুই নামে এক ভদ্রলোক সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য ভাস্বর ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালাতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গত ভাস্বর ইলেকট্রিক বাল্বের সঙ্গে একটু পরিচিত হওয়া যাক। ভাস্বর ইলেকট্রিক বাল্ব হ'ল সেই ধরণের বাতি যা বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে একনাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ আলো দিতে সক্ষম। আমরা সাধারণত এই ধরণের ইলেকট্রিক ল্যাম্পই ব্যবহার করে থাকি। এছাড়াও আরও এক ধরনের ইলেকট্রিক ল্যাম্প আছে যা সাধারণত ফোটোগ্রাফির কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের বাতির জীবনীশক্তি খুবই সামান্য।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। ফার্মার ও ওয়ালেস নামে দুই ব্যক্তি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদক যন্ত্র বা ডায়নামো আবিষ্কার করলেন। বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে ডায়নামোর উদ্ভাবকরা চালালেন তাঁদের যন্ত্র। ডায়নামো চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সাংঘাতিক চিন্তা ফার্মার মাথায় খেলে গেল যে একটা দারুণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সবাই স্রেফ বাহবা জানিয়ে বাড়ী চলে গেলেও সেদিনের সেই ঘটনা একজনের মাথায় অন্য এক চিন্তার জন্ম দিল। ব্যক্তিটি হলেন টমাস আলভা এডিসন আর চিন্তাটি হ'ল,—কিভাবে একটানা দীর্ঘক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে বাতি জ্বালানো যায়। কারণ, ফার্মার ও ওয়ালেস তাঁদের উদ্ভাবিত ডায়নামোর ক্ষমতা প্রদর্শন করতে গিয়ে ডায়নামো উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে একটি আর্ক-বাতি জ্বালিয়েছিলেন। একথা আগেই বলেছি যে, আর্ক-বাতি বেশীক্ষণ জ্বলে না। তার জীবনীশক্তি বড়ই ক্ষীণ। সুতরাং এডিসন চিন্তা শুরু করলেন।

এবং যেহেতু শুধু চিন্তায় পেট ভরে না, অথবা ফাঁকা চিন্তার রাজপ্রাসাদ গড়েও লাভ নেই অতএব কোমর বেঁধে কাজে নেমে লড়াই শ্রেয় মনে করলেন এডিসন। কিন্তু, তাতে আবার অর্থ প্রয়োজন। সুতরাং শুরু হ'ল অর্থ সংগ্রহের পালা। নিউ-ইয়র্ক শহরে থাকতেন এডিসনের বন্ধু গ্রসভেনর লাউরী। ভদ্রলোক পেশায় উকিল। ব্যবসায় সবেমাত্র পসার জমাতে শুরু করেছেন। এমন সময় এডিসন তাঁর বিচিত্র ইচ্ছা নিয়ে হাজির হলেন লাউরীর কাছে। বললেন কি তাঁর করার ইচ্ছা। এবার মাঠে নামলেন লাউরী নিজে। অর্থ সংগ্রহের কাজ ভালভাবেই এগিয়ে

চলল। তারপর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হল "দি এডিসন ইলেকট্রিক লাইটিং কোম্পানী।" স্থান নিউ জার্সির মেনলো পার্কে অবস্থিত এডিসনের বাড়ী। নামেই ইলেকট্রিক লাইটিং কোম্পানী। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাতি বা ইলেকট্রিক ল্যাম্প তখনও দূরে অস্ত্। প্রধান যন্ত্র ডায়নামো কেনা হ'ল। কেনা হ'ল আরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। সেযুগে প্রাপ্য সূক্ষ্মতম যন্ত্রাদিও এল এডিসনের পরীক্ষাগারে। এল বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত পৃথিবীর যাবতীয় বহু পুস্তক। সংগৃহীত হ'ল তাবৎ পত্র-পত্রিকা। সে এক সাংঘাতিক হৈ হৈ ব্যাপার। আর আনা হ'ল একশ' জন সুদক্ষ কর্মীকে। তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন জন অটো, জন ক্রুমেদী, চার্লস্ ব্যাচিলর এর মত সুনিপুণ কারিগরবৃন্দ। অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যার সুপণ্ডিত ফ্রান্সিস্ আপটন ও যোগদান করলেন এডিসনের পরীক্ষাগারে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার ডলার নিয়োজিত হ'ল এই প্রকল্পে।

এবার শুরু হ'ল পরীক্ষা। উচ্চ তাপমাত্রায় অবিকৃত থাকতে পারে এমন একটি পদার্থ খুঁজে বার করতে প্রায় দু-হাজার জিনিষকে কাজে লাগানো হ'ল। কাগজ, বাঁশ, কার্ডবোর্ড, থেকে শুরু করে অত্যন্ত দামী ধাতু পর্যন্ত কিছুই বাদ গেল না এই পরীক্ষায়; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তখন এডিসন মন দিলেন অন্য দিকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র ডায়নামোকে আরও উন্নত করতে প্রয়াসী হলেন তিনি। বিদ্যুৎ মাপার বিভিন্ন যন্ত্রাদি যেমন গ্যালভানোমিটার, ভোল্টামিটার, আমমিটার প্রভৃতিকে তিনি উন্নত করলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হ'ল না।

তারপর অবশেষে এল সেই আলোকসঞ্চারী চমকপ্রদ দিন। যেদিনের সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাকে পরদিনের নিউ-ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় 'ইয়াঙ্কী ব্লাফ' বলে মন্তব্য করা হ'ল। সেদিনের ঘটনা সত্যি সত্যি মানবসভ্যতাকে নিয়ে এল আলোকময় যুগে। সমাজ-সভ্যতাকে হঠাৎ যেন এক ধাক্কায় এগিয়ে দিল অনেকটা পথ। যদিও সেই ঘটনার ফলাফলকে কাজে লাগাতে লণ্ডন শহরেরও লেগেছিল আরও ৪০ বছর। তবু ঘটনাটি স্মরণীয়।

তারিখটা ছিল ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। স্থান আমেরিকার নিউ জার্সির মেনলো পার্কের এডিসনের বাড়ী বা "দি এডিসন ইলেকট্রিক লাইটিং কোম্পানী।" সেদিন সত্যিকারের ৬০টি ইলেকট্রিক বাল্ব লাগানো হয়েছিল এই বাড়ীটির প্রাঙ্গণে বৃক্ষ-শাখায়। বহু প্রতীক্ষা নিয়ে প্রায় হাজার তিনেক মানুষ হাজির হয়েছিলেন ওখানে। রীতিমত বিশেষ ট্রেনের আয়োজন করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে। কাঁচের গোলকের মধ্যে সাধারণ সুতোকে কার্বনাইজড করে রাখা হয়েছিল। আর তার বাইরের দুই প্রান্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সঙ্গে। আজকের উন্নত বৈদ্যুতিক বাতি বা ইলেকট্রিক বাল্বের সেই ছিল প্রথম সংস্করণ। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আজ অনেক কিছুর মত বৈদ্যুতিক বাতি সম্পূর্ণ নিজের জন্য এক সুন্দর সাজানো গোছানো একাধারে শৈল্পিক আধুনিক জগত গড়ে নিয়েছে সত্যি; কিন্তু তার জন্মকালের দীর্ণ চেহারার কথা ভুললে চলবে না আর যাই হোক পরমায়ু ছিল মাত্র ৪৫ ঘণ্টা। আমরা আবার ফিরে যাই সেই সাংঘাতিক উন্মাদনা সৃষ্টিকারী দিনটিতে।

এটাই অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধরে। আশা-আশঙ্কায় অন্য অনেকের মত এডিসন নিজেও কিছুটা চিন্তান্বিত। যদিও কিছুদিন আগেই পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন কিন্তু জনসমক্ষে এই হবে তাঁর প্রথম পরীক্ষা। যোগাড়যন্ত্র সব প্রস্তুত। সমস্ত যন্ত্রপাতি একবার খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হ'ল। চলল ডায়নামো। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগুলো হঠাৎ যেন প্রাণ পেল। আর তারপর সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল নিয়ে সমস্ত আশা-আশঙ্কা অপেক্ষা-প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে, জ্বলে উঠলো আলো।

নাটকের সুখদুঃখ এবং 'ফজল আলি আসছে'

নাটক শেষ হওয়ার পর মঞ্চাঙ্গনের বাইরে আলোকিত রাজপথে বেরিয়ে সিগারেট ধরাতেই একটি সোনালি থালায় কিছুটা শুভ্র ভাতের কথা খুব বেশি মনে হয়। এবং খালি পেটে সিগারেট টানতে টানতে ক্রমশই শরীরের মধ্যে ওই অমোঘ ক্ষিধের প্রবল টান অনুভব ক'রতে পারি। আর তখন, হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত কয়েক মুহূর্ত, নিজেকে নাটকে দ্যাখা ফজল আলি ভ্রম হয়। যদিও, তিন মুহূর্ত পরেই, নিজের কাছে, স্ফটিকের চেয়েও স্বচ্ছভাবে, নাটকের ফজল আলির সাথে আমাদের শ্রেণীগত পার্থক্যটা খুব প্রকট হ'য়ে ওঠে।

তফাৎটা এইরকম যে, তখন, রাতদুপুরে শহরতলীর একটি নিরাপদ ছাদের তলায় ক্ষুধার্ত আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে র'য়েছেন এক সহাস্য ভাতের থালা। আর আপাতত আমার লড়াই, লড়াই শব্দটি এখানে খুব সৌখিন অর্থে ব্যবহৃত বোঝাই যায়, নাটক নিয়ে সবান্ধবে কিছুকাল আঁতলেমো ক'রে, ট্রাম-বাস হাঁকড়ে সেই প্রতীক্ষারত ভাতের কাছে পৌঁছনোর জন্যে। তারপর ভরপেটে মৌরী চিবুতে চিবুতে ওই ফজল আলির মত মানুষদের জন্যে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, শীতল বাতাসে গা এলিয়ে কিছুক্ষণ, গভীর কুম্ভিরাশ্রু মোচন ক'রবো। এবং তখন, যখন আমি এইভাবে মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট নিয়ে দ্রব হ'চ্ছি, ঠিক তখনই মধ্যরাতে অবিকল মানুষের মত দেখতে কিছু বিজাতীয় প্রাণীর, যাদের দেখে আমরা, বাবুরা প্রায়ই নাকে রুমাল দিয়ে থাকি, তাদের ক্ষিধে ও সঙ্গম একাকার হ'য়ে যাচ্ছে কী নিবিড় অসহায়তায়! স্তব্ধ রাতে শূন্য খাবারের পাত্র হাতে তারা ক্রমশই কেমন পাষাণ হ'য়ে যাচ্ছে। হায়, এই বিপরীত সহাবস্থানের চেয়ে চরম অশ্লীলতা আর কীই বা হ'তে পারে।

হল থেকে বেরিয়ে অন্য কেউ কিম্বা আমিই হয়তো বলেছিলাম, 'আহ্, কী অভিনয়, ফজল আলির'! কথাটা হঠাৎ আমাকে তীরের মত বিদ্ধ করে। যদিও, হয়তো কোন কারণ ছিল না। আমরা তো যথার্থই একটি 'নাটক' দেখতে এসেছিলাম। সুতরাং অভিনয়, নাট্যরূপ, প্রয়োগকৌশল, সংলাপ, আলোকপাত, সঙ্গীত, মঞ্চসজ্জা, পোষাক-আষাক ইত্যাদি কিছু শৈল্পিক শর্তাবলী তো খুব অনিবার্যভাবে আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতার সৃষ্টি ক'রবেই—নাটক এবং নাট্য ক্রিয়াকৌশল নিয়ে স্বভাবতই ভাবিত হবো। তবু, হঠাৎ কীরকম খট্‌কা লাগে। ওইরকম একটি শ্বাসরোধী অবস্থা দু'-আড়াই ঘণ্টা ধ'রে প্রত্যক্ষ করার পর, আমরা শুধু তার সূক্ষ্ম নান্দনিক দিকটি নিয়েই ভাবিত হবো, ওই ফজল আলিদের যন্ত্রণার আঁচ আমাদের নধর শরীরে একটুও স্পর্শ ক'রবে না? নাট্যশিল্পের সাথে যে সামাজিক, মানুষিক সচেতনতার প্রশ্ন খুব নিবিড়ভাবে ওতপ্রোত, শুধুমাত্র শিল্পের খাতিরে তার সাথে এরকম গভীর ব্যবধান গড়ে উঠবে? শিল্প কি জীবনের চেয়ে তত মহান? সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বন্যাক্লিষ্ট মানুষের ছবি দেখে আঁতকে না উঠে ক্যামেরাকৌশল বিষয়ে ভাবিত হওয়া তো বস্তুতই কোন কাজের কথা নয়। তাহ'লে কি পরিচ্ছন্ন সন্ধ্যেবেলা ঘাড়ে পাউডার দিয়ে নিখুঁত পোষাকে বিলোল প্রেমিকা সহ ক্ষিধের নাটক, বিপ্লবের নাটক দ্যাখা একধরনের বিশুদ্ধ ফ্যাশানে পরিণত হ'য়েছে?—এইসব জ্বলন্ত প্রশ্ন আমাকে তখন যুগপৎ অসহায় এবং বিস্ময়াবিষ্ট ক'রে তোলে।

কিন্তু এখন তো একথা আমরা সকলেই জেনে গেছি যে, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি মূলতই একটি বিপ্লবী কার্যক্রম এবং তা অবশ্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত সেইসব অধিকাংশ অসহায়, বোবা, ক্রন্দনরত মানুষের উজ্জ্বল অস্ত্র হিসেবে। অর্থাৎ মাও-ৎ-সেতুং যাকে বৈপ্লবিক যন্ত্রের অংশবিশেষ রূপে উল্লেখ ক'রেছিলেন এবং যে মেসিনের উৎপাদিত ফলাফল ব্যবহার ক'রবেন সেইসব শোষিত শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদি সম্প্রদায়। এই ব্যবহারিক যোগ্যতাই শিল্প-সাহিত্যের সার্থকতার একমাত্র মাপকাঠি। কেননা, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কলাকৈবল্য তো সোনার পাথর বাটি ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্দেশ্যহীন শিল্পবিলাস এই সমাজে বিশুদ্ধ যুক্তিহীনতারই নামান্তর। অথচ, শিল্প সংস্কৃতি আমাদের কাছে প্রায়ই একটা অর্থহীন শব্দ মাত্র। আর সেজন্য, আমাদের নান্দনিক দৃষ্টি

এ্যাতই একচক্ষু হরিণের মত যে, আমরা কেউ হিন্দী ফিলম্‌কেই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মনে করি, আর কেউ মাঝেমধ্যে চীনা খাবার খাওয়ার মত বিপ্লব-টিপ্লবের নাটক দেখে স্বাদ বদল করি! ব্যস্‌, এর বেশি কিছু নয়।

কিছুদিন আগে আমরা, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিমান এবং সংস্কৃত দর্শক মেট্রো সিনেমার নরম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আরামে ব'সে রঙিন পর্দায় একটি শক্তিশালী ছবি দেখেছিলাম। সেই ছবিটিতে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের স্পষ্ট ভূমিকা বিষয়ে আপোষহীন, জোরালো বক্তব্য রাখা হ'য়েছিল। অথচ, সেইসব তুচ্ছ ক'রে প্রতিষ্ঠান-পালিত জনৈক সিনে-আঁতেল আলোচ্য ছবিটির শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে একটি-মাত্র মহার্ঘ দৃশ্যের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রেছিলেন, যেখানে দ্যাখানো হ'য়েছে নায়িকার নগ্ন, নিটোল পায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে একবিন্দু টলটলে জল! এবং লেখাই অতিরিক্ত, এই দৃশ্যটি ছবির মূল বক্তব্যের সাথে বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্ট নয়। অথচ, সেই প্রাজ্ঞ সমালোচকের কাছে তা খুব জরুরী ব্যাপার—শিল্পের খাতিরে! আর এই স্বেচ্ছামূঢ়তা থেকে ছবির মূল অভিঘাতটিই মাঠে মারা যায়। আসলে, এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সামগ্রিক ষড়যন্ত্রেরই অংশবিশেষ। কেননা, বুর্জোয়া-প্রতিষ্ঠান চিরকালই শিল্প-সাহিত্যকে ভয় পেয়ে এসেছে, যেহেতু তা খুব বিস্ফোরক ব্যাপার। তাই তারা আমাদের স্বচ্ছ দ্যাখাকে বিভ্রান্ত ক'রে দিতে সক্রিয়। এবং অনিবার্যভাবে, ধনতন্ত্রের ঢাক ঢোল বাজনা অবিরত শুনতে শুনতে, আমরাও তার শিকার হ'য়ে পড়ছি। তাই আমরাও এখন যেন শিল্প থেকে কোনরূপ গভীর এবং আদর্শিক শিক্ষার্জনে তীব্রভাবে বীতস্পৃহ।

সেজন্যেই, শিল্প-সাহিত্যের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক আমরা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মানুষেরাও এই পরিষ্কার, লক্ষ্যস্থির ছবিটির দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত, প্ররোচিত হ'য়েছি, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অর্থাৎ এ-কথা আক্ষরিক ভাবেই সত্য যে, এখনো শিল্পের মনোরঞ্জক ক্ষমতা যতটা ব্যাপক, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে তার ব্যর্থতা ঠিক ততটাই। আমাদের শিল্প-দৃষ্টির সীমাবদ্ধতাই এর জন্যে দায়ী। শিল্পের সংজ্ঞাকে জীবনের কাছাকাছি আনতে গেলেই শিল্প-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যেমন আতংক হয় (সম্প্রতি অশ্লীল নাট্য প্রচারের বিরুদ্ধে নাট্যকর্মীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আনন্দবাজার কোম্পানীর যেমন হ'য়েছিল), তেমনই আমরাও শিল্পকে রাংতার মোড়কে সুগন্ধী সাবানের মত পেতে আগ্রহী এবং অভ্যস্থ। তাহ'লে এখানে ব্যর্থতা কার—শিল্পের, শিল্পীর, দর্শকের না সমূহ ব্যবস্থার?

যদিও, আধুনিক বাংলা নাটক তার ঊষাকাল থেকেই সামাজিকক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হ'য়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের রূপটি স্পষ্টতর ক'রে দ্যাখাবার, আন্দোলনের গুরুত্ব বিষয়ে আমাদের সচেতন করার কাজে নাটক একটি বিশেষ হাতিয়ার রূপে বিবেচিত। আমাদের নাট্যজগৎ (উত্তর কলকাতার ক্যাবারেকাম থিয়েটারের কথা এখানে অবশ্যই ধরা হচ্ছে না।) একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে জীবনকে—জীবনের স্থিতি কিম্বা ভঙ্গুরতাকে তুলে ধরতে চেয়েছে আপোষহীনভাবে, সাবধানে এবং অবশ্যই শিল্পিত প্রক্রিয়ায়। সামাজিক আবহে, সুস্থ চেতনায়, গভীরতম অনুভূতির ছোঁয়ায় এ এক মনোরম দৃশ্যপট, যা আগামী সূর্যের স্বপ্নে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। আর এইটাই আমাদের কাছে আশা এবং আনন্দের কথা যে, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মত নাটক এখনো সংস্কৃতি-বণিকদের থেকে কোরিয়ার ঘুষ নিতে-নিতে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হ'য়ে যায়নি। বহু উজ্জ্বল প্রলোভন তুচ্ছ ক'রে তা এখনো একটি স্থির ইডিওলজির প্রতি অবিচল, আস্থাশীল র'য়ে গ্যাছে। এবং তা সম্ভব হ'য়েছে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতার জন্যেই। অবিশ্যি, অনেকে রাজনীতি এবং শিল্পকে পরস্পর বিরোধী ব্যাপার বলে মনে করেন এবং সযত্নে রাজনীতিকে শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে সক্রিয় হন। তাঁরা সম্ভবত মনে করেন, প্রেমিক কবি লম্পট মাতাল জুয়ারী বোহেমিয়ান বেশ্যা সকলকে নিয়েই শিল্পসৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু কেউ যদি রাজনীতি করে, সমকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে না নিয়ে যদি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়, তাহ'লেই আমাদের পোষা শিল্পী-সাহিত্যিকেরা তা থেকে সাত হাত দূরে ছিটকে আসেন। আসলে, এরা সেই আদিমকাল থেকেই রাজার সিংহাসনের পাশে বীণা বাজিয়ে আসছেন, রাজাকে সিংহাসনে সমারূঢ় রাখবার জন্য তাদের বাদ্যি-বাজনার প্রয়োজন আছে। তাই চামচে-জীবী না হ'য়ে এদের উপায় নেই, নইলে প্রভুর রক্তচক্ষু তাকে গোল-গোল সুখ এবং খ্যাতির মিনার থেকে এক লাথিতে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে। সেটা নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষিত নয়! তাই রাজনীতির নামেই তারা আঁতকে ওঠেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, শিল্প ও রাজনীতির মধ্যে কোন সংঘাত নেই। রাজনৈতিক সচেতনতাই সৎ শিল্প সৃষ্টির একমাত্র উপাদান। শিল্পী যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, অসাড়তা বিষয়ে তাঁকে সচেতন থাকতেই হবে, এবং তার প্রতিফলন ঘটবে শিল্পকর্মে। কেননা, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় শিল্পীকে অবশ্যই কোন কল্যাণময় দ্বান্দ্বিক মতাদর্শের বিশ্বাসে অটল থেকে তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন ক'রতে হবে। দরবারী শিল্প থেকে কিছু নগদ বিদায় জুটলেও তার কোন স্থায়ী মূল্য নেই, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

'৪০-এর দশকে বাংলা নাটক এই রাজনৈতিক

বিশ্বাস থেকেই গড়ে উঠেছিল, যার জন্যে দায়ী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সাংস্কৃতিক প্লাটফর্ম ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সেই ঐতিহ্য, যা তৎকালীন বুর্জোয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভিত অনেকটাই কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম হ'য়েছিল, আজো আমাদের গ্রুপ-থিয়েটারগুলি যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েই রক্ষা ক'রে যাচ্ছে। তবে দুঃখের ব্যাপার এই যে, নাটক দর্শকের অনেক কাছাকাছি নেমে এলেও, দর্শকেরা নাটকের দিকে ঠিক ততটাই উঠে যেতে পারেনি। নাটক এখনো আমাদের অনেকের কাছে নিছক অবসর বিনোদন ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা অনেকেই (আঁ) তেল-(আঁ) তেল মুখে নাটক দেখতে যাই এবং নাটক শেষে তা কতখানি 'প্রতিক্রিয়াশীল' কিম্বা তার সেট-কম্পোজিশান কতটা ভঙ্গুর সেই আলোচনায় আত্মতৃপ্তি অনুভব করি। (অর্থাৎ আমরা একদল 'অতি বিপ্লবী', আরেকদল গাড়ল। গাড়লদের কিছু বলার না থাকলেও কাগুজে বিপ্লবীদের জন্যে এইটুকুই বলা যায়, নাটক আর পোস্টার যে এক নয়, ব্রেখ্ট কিম্বা স্ট্যানিসলোভস্কির এই বিশ্বাস থেকে শিক্ষা নিয়ে একটু ধৈর্য সহ শিল্পবিচার করুন। এবং জেনে রাখুন, অ্যাকাডেমির ঠাণ্ডা ঘর থেকে বিপ্লব হঠাৎ মোয়া হ'য়ে হাতে চলে আসবে না।) এবং খুব অনিবার্যভাবে বাড়ি গিয়ে নাটকটির কথা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে সক্ষম হই। নাটকটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন হই না। অবিশ্যি এরজন্যে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই, ভণ্ড দর্শকেরা একসময় প্রাকৃতিক নিয়মেই আমড়া পাতা খসার মত ঝ'রে গিয়ে সৎ দর্শকেরা নিজস্ব প্রয়োজনেই ঠিক নাটকের জন্যে রক্ত ঢেলে দেবে বীরের মত, প্রবীরের (দত্ত) মত।

এইসব কথা নতুন ক'রে মনে হ'ল সাম্প্রতিক কালে অভিনীত একটি নাটক দেখে—'নটরঙ্গ' প্রযোজিত এই নাটকটির নাম 'ফজল আলি আসছে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, আলোচ্য নাটকটি যে উপন্যাসের নাট্যরূপ তা প্রকাশিত হ'য়েছিল বঙ্গসংস্কৃতির পালকপিতা আনন্দবাজারকোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শারদ-কীর্তি রূপে। প্রতিষ্ঠানিক শাসনের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ ঈষৎ বিদ্রোহ ক'রে থাকেন, এবং শীর্ষেন্দুও এখানে তাই ক'রেছেন। অন্তত চেষ্টা ক'রেছেন। সেকারণেই এই উপন্যাসটি অনায়াসেই সমসময়ের একটি মহার্ঘ রচনা রূপে বিবেচিত হ'তে পারে। কী ঝরঝরে এবং জলতরঙ্গের মত অনায়াস শিল্পকর্ম শীর্ষেন্দুর করায়ত্ব, যা সাবলীল পদচারণার শেষে পাঠককে এক অনিবার্য স্থানুত্বের দিকে, যা কিনা অতল খাদের মত, ঠেলে দ্যায়। সমকালে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এই একটি উপন্যাস সরাসরি তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে। এই আপাত-পরিচ্ছন্ন বেঁচে থাকার যাবতীয় অসহায়তা, নষ্টামো, ক্রুরতা, ভণ্ডামী সবকিছু উজ্জ্বল ফুটে ওঠে শীর্ষেন্দুর অস্থির ক্যানভাসে।

রুবি ফ্যাক্টরির একজন অনশনরত শ্রমিক ফজল আলি। ১৪৫ দিন অনশনের পর কঙ্কালপ্রতিম এই মানুষটিকে আর ততো মানুষরূপে সনাক্ত করা যায় না। জ্বলন্ত ক্ষিধেকে গলা টিপে মারার চেষ্টায় তখন তার কোটরাগত চক্ষু দুটো প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত জ্বলজ্বল করে। কেননা, সে তখন এই সরল সত্যে পৌঁছে গ্যাছে যে, ক্ষিধে ব্যাপারটা একটা শারীরিক অভ্যেস ছাড়া আর কিছু নয়। আর সেই অভ্যেসকে জয় করার জন্যেই তার লড়াই। প্রাথমিকভাবে তার লড়াই মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে হ'লেও, ক্রমশই তা রূপান্তরিত হ'য়েছে নিজের সাথে অবিরাম সংগ্রামে। সে স্বপ্ন দেখেছে—একদিন, তার এই নতুন যুদ্ধের শেষে যে চরমপ্রাপ্তি আসবে, তা সে পৌঁছে দেবে পৃথিবীর সমুহ মানুষের কাছে—কি করিয়া না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সে বিষয়ে সে সমস্ত ক্ষুৎকাতর মানুষকে শিক্ষিত ক'রে তুলবে। তার কাছে ক্ষুধার্ত মানুষের এই-ই একমাত্র বাঁচার পথ। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এর মধ্যে একটা নঞর্থক চেতনা আভাসিত হ'লেও, এর ব্যাঙ্গাত্মক আবেদন অনেক বেশি তীব্র। এবং সেই তীব্রতাই আমাদের ক্রমশ একরূপ সদর্থকতার দিকে নিয়ে যায়। আর ওই অ-মানুষিক, প্রায় প্রতীকী চরিত্রটিকে কেন্দ্র ক'রে যে নাটকীয় বিন্যাস গড়ে উঠেছে, তার মানবিক দিকটিও কিছু কম স্বাস্থ্যকর নয়। তাছাড়া ফজল আলিকে আপাত চোখে সমাজ থেকে, একটি পূর্ণাঙ্গ লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাওয়া ব্যক্তি মনে হ'লেও অমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিৎ হবে যে, ফজল আলি আসলে একটি বৃহৎ লড়াইয়ে সামীল এবং তার চিন্তা-চেতনা সবই নিবেদিত উত্তরকালের ক্ষুধার্ত মানুষের জন্যে। যদিও, তার লড়াই অনেকটাই প্রতীকী, রোমান্টিক; তাসত্ত্বেও তার মহত্ব এবং ব্যাপ্ত-মনস্কতার কারণেই সে একটি উজ্জ্বল চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

এই নাটকের আভিনয়িক শক্তি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশেষত, ফজল আলির চরিত্রে সুব্রত বসু আক্ষরিক অর্থেই অসাধারণ অভিনয় ক'রেছেন। এরকম একটি রক্তমাংসহীন প্রতীকী, প্রায় অবিশ্বাস্য চরিত্রে তিনি কোনরকম ক্রিয়াত্মক ভূমিকা ছাড়াই (চরিত্রটি আগাগোড়া একটি খাটিয়ায় শুয়ে ছিল।), শুধুমাত্র সংলাপ অবলম্বন ক'রে যে শক্তিশালী অভিনয় ক'রে গ্যাছেন, তা আমাদের বহুদিন মনে থাকবে। তাছাড়া দোলগোবিন্দ উকিলের চরিত্রে সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাপটের সাথে অভিনয় ক'রেছেন। তবে চরিত্রটির পরিকল্পনার ত্রুটিতে তাকে প্রায়ই এই নাটকের বিবেক বলে মনে হয়। তবু তিনিই এই

[শেষাংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়]

সজল রায়ের তুলিতে—

নাই নাই ভয়.........!

বইপত্র

শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা। মহাশ্বেতা দেবী

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৮৬-তে প্রকাশিত।

"বাঢ়া গ্রামের ম্যানগ্রাফে তপশীলীদের অস্তিত্ব একেবারে গৌণ ও প্রয়োজনীয়। গৌণ তারা। মুখ্য এখানে রাজপুত সমাজ। প্রয়োজনীয় তারা সমাজের মুখ্য জীবগুলির বিবিধ কাজ করার জন্য। যেহেতু গ্রামটি মোদিনী সিং সদৃশ রাজপুতদের সৃষ্ট, সেই-হেতু এখানকার নয়ভাগ জমি তাদের দখলে। অন্যেরা, অর্থাৎ সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের জমি চষে।" চল্লিশ বছরের ধারাবাহিক মধ্য প্রাচ্যের এই ক্লোজআপ্ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা' উপন্যাসে। মূলত দুটি সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে একটি পরিবারের দু'পুরুষের নিটোল কাহিনীর মাধ্যমে। কাহিনীর সূত্রপাত বৃটিশ শাসন থেকে. শেষ হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত। আসলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শাসক ও শোষিতের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন লেখিকা ভাঙ্গী ও দুসাদ অধ্যুষিত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। বস্তুত যে অঞ্চলে সমস্ত জমির মালিকানা মাত্র কয়েকটি রাজপুত পরিবারের হাতে। এবং তাই রাজপুতেরা নিজেদের সমস্ত বিভেদ ভুলে হাতে হাত মিলিয়ে থাকে ভাঙ্গী ও দুসাদদের কব্জা করতে। সরল হিসেবে সমস্ত জমি কেন্দ্রীভূত হয়, আর দিনকে দিন ভূমিদাস ও ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। "বান্দা বা দাসপ্রথা আছে কি নেই তা বান্দাদের কেউ জানায়নি। তাদের বংশধরদের বেলা মালিকদের সুবিধে বেড়ে যায় আরো।" শুধু তাই নয় এইসব মধ্যযুগীয় প্রায় দাসদের জীবনের অত্যন্ত ন্যায্য ও সামান্য সুখগুলি এইসব 'মালিক' শ্রেণী যে রকম স্বাধীকারে প্রমত্ত হয়ে নষ্ট করে দেয় তারই সত্যনিষ্ঠ জীবনমুখী সাহিত্যরূপ এই উপন্যাস।

উপন্যাস শুরু হয়েছে গণেশের জন্ম থেকে। তার-পর সেই জন্মকে কেন্দ্র করে মোদিনী সিং-এর পরি-বার এবং তারপর সেই পরিবারকে কেন্দ্র করে বাঢ়া গ্রাম তথা সমগ্র সমাজটাই উপস্থিত হয়েছে উপন্যাসের পটভূমিকায়। উপস্থিত হয়েছে পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যানুযায়ী গণেশ সিং-এর অবিচার অত্যাচার ও ব্যাভিচারের কাহিনী। উপস্থিত হয়েছে ভাঙ্গীদের লোকসংস্কৃতি সং-এর গান। এই সময়, সমাজ ও সামাজিকতার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে গণেশ সিং নামক একটি চরিত্রের কিংবা একটি শ্রেণী চরিত্রের তথা একটি যুগের [যা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক] পতন ফুটে উঠেছে।

আর এই পতনকে ফুটিয়ে তুলতে লেখিকা নিপুণ-ভাবে অত্যাচারিত চরিত্রগুলির Development ঘটিয়েছেন। লছিমা জীবনের স্বপ্ন ও সাধকে বিসর্জন দিয়ে, পিতার রক্ষিতা ও পুত্রের ধাত্রীরূপে শৈবত জীবন যাপন করে, দীর্ঘ জীবনে নির্মম দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। আর তারই ফলস্বরূপ দেখতে পাই গণেশ সিংকে হত্যার হোতা হিসেবে স্তনদায়িনী সেই লছিমাকেই। সেই একই কারণে গান্ধী মিশনভুক্ত তপশীলীদের নেতা উভয়ের নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। সর্বহারাদের কোন জাত থাকতে পারে না—ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত ভাঙ্গী ও দুসাদরা এক হয়েছে বাঁচার তাগিদে সেই অভিজ্ঞতাতেই। আর এই-সব কিছুর নিয়ামক হিসাবে যিনি আছেন, সেই দেবাংশী পুরুষকে দাঁড় করিয়েছেন লেখিকা ব্যঙ্গ করে নাম ভূমিকায়।

সর্বশেষে লেখিকাকে সাধুবাদ জানাতে হয় এই উপন্যাসে তাঁর ভাষা ব্যবহারে। নাটকের মত তিনি চরিত্রগুলির মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন উক্ত অঞ্চলের কথ্যভাষা থেকে। কিন্তু যেখানে লেখিকা স্বয়ং উপস্থিত, উপন্যাস যেখানে বর্ণনাত্মক—তা হয়েছে প্রাঞ্জল বাংলা প্রবন্ধের ভাষা। তাঁর অন্যান্য মহতী সৃষ্টিগুলির মত এই উপন্যাসটির মধ্যেও লেখিকার আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা' অচিরেই নিজের আসন করে নেবে আশা করি।

—দুর্গা ঘোষাল

বিভাগীয় সংবাদ

বাঁকুড়া জেলা :

শালতোড়া ব্লক যুব-করণ—শালতোড়া ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং ব্লক ফুটবল প্রতিযোগিতা কমিটির পরিচালনায় ব্লক ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা ২২শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে মোট ৩৪টি স্থানীয় দল অংশ গ্রহণ করে। যুব কল্যাণ বিভাগ থেকে ব্লকে এই প্রথম ক্রীড়া সামগ্রী সাহায্য দেওয়ার ফলে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় যুব সংস্থাগুলির মধ্যে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার হয়। ব্লকের ৩৪টি যুব সংস্থার ৪০৮ জন তরুণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় তিলুড়ি মনোমোহিনী ইনস্টিটিউট ও শিরপুরা উদয়ন সংঘ যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

গত ৭ই ডিসেম্বর শালতোড়া ব্লকের রঘুনাথচক গ্রামে শালতোড়া ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ও রঘুনাথচক মহিলা সমিতির পরিচালনায় সেলাই শিল্পের উপর মহিলাদের একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ সূচী প্রাথমিকভাবে নয় মাস স্থায়ী হবে। পরবর্তী কালে এর কাজ পর্যালোচনা করে এর স্থায়ীত্বকে বাড়ান হতে পারে। বর্তমানে এই কেন্দ্রে ৫৩ জন শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মহিলা প্রশিক্ষণরত।

চলতি বছরে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্লক যুব-করণ পাঠ্যপুস্তক ঋণ দিয়েছেন। মোট তেত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী ব্লক যুব-করণের পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার থেকে এই সাহায্য পাচ্ছেন। পাঠশেষে তারা পুস্তকগুলি ফেরত দেবেন।

স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে এই ব্লক প্রায় সাতটি প্রকল্প অনুমোদন করে ব্যাঙ্কের বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে দু'টি প্রকল্প আশাকরা যায় বর্তমান মাসে ব্যাঙ্কের অনুমোদন পাবে এবং কাজে রূপায়িত হবে।

বনজ সম্পদে পূর্ণ এই ব্লকে নতুন কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যুব-করণ 'অভোজ্য তেল উৎপাদন ও প্রশিক্ষণের' একটি প্রকল্প রচনা করেছেন। প্রকল্পটি বর্তমানে দপ্তরের বিবেচনাধীন আছে। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে বহু সংখ্যক অশিক্ষিত তরুণের নতুন আয়ের রাস্তা খুলে যাবে বলে আশা করা যায়।

মেদিনীপুর জেলা :

বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণ—বিনপুর ১নং ব্লকের যুব সমাজের ফুটবল খেলার মান-উন্নয়নে এবং উৎসাহিত করার জন্য বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত লালগড় ময়দানে ১৫ দিনের ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে দৈনিক গড়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন যুবক অংশ গ্রহণ করে। এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেন অতীতের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় স্যামুয়েল অ্যান্টনী, যিনি পূর্বে বেশ কয়েকবার ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যুবকদের মধ্যে বিশেষকরে আদিবাসী যুবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। অনেকে দশ মাইল দূর থেকে এসে প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন। প্রশিক্ষক অ্যান্টনীর সুন্দর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী যুবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবির সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি প্রভূত সাহায্য করেছে। মনে হয় এই অঞ্চলে প্রথম এজাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন। আগামী দিনে বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণের লৌহবল, বর্শা ও ডিসকাস নিক্ষেপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ইচ্ছে আছে বলে ব্লক-যুব আধিকারীক জানিয়েছেন। এছাড়া যোগাসন শিক্ষা দেবার শিবিরের ব্যবস্থা করার চেষ্টাও চলছে। মার্চ মাসে যুব উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে।

জলপাইগুড়ি জেলা :

মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ—মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতের ৩১-তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে মাদারীহাট বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্য সুনীল কুজুরকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ব্লক যুব আধিকারীক শ্রীকুজুরকে যুব কল্যাণ বিভাগের লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে সুনীল কুজুর এই ধরণের অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের বিভিন্ন উদ্যোগকে যুব কল্যাণ বিভাগ কাজে রূপ দেবে, এই আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াই শ' যুবক-যুবতী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।

যুব সংগঠনগুলিকে আর্থিক অনুদান কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্প্রতি মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ স্থানীয় কুড়িটি যুব সংগঠনকে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে। খেলাধুলার সম্প্রসারণের জন্যও কুড়িটি সংগঠনকে বিনামূল্যে নেট ও ভলিবল দেওয়া

স্যামুয়েল অ্যান্টনীর তত্ত্বাবধানে বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণের ফুটবল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

হয়েছে। এই ব্লকে ব্লক স্তরে কাবাডি প্রতিযোগিতা, ভলিবল প্রতিযোগিতা ও ব্লক স্পোর্টস করার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি ও যুব সংগঠনগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানগুলি শুরু হ'তে চলেছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প অনুসারে মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ বীরপাড়াতে একটি টায়ার রিসোলিং ইউনিট, একটি মুদি দোকান ও একটি ক্ষুদ্র দেশলাই বিক্রয় ইউনিট চালু করেছে। তিনটি প্রকল্প বাবদ স্থানীয় ব্যাঙ্ক মোট ২৯,০৭০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে আর যুব কল্যাণ বিভাগ প্রান্তিক অর্থ বাবদ ২,৯০৭ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। প্রকল্পগুলির কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুসারে মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ মাদারীহাট ও বীরপাড়া দু'টি গ্রামে দু'টি মহিলা সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কেন্দ্র দু'টির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা সত্তর জন। মাদারীহাট শিক্ষণ কেন্দ্রের দশজন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে ঋণ দেবার প্রস্তাব স্থানীয় ব্যাঙ্কে পাঠান হয়েছে যাতে করে তাঁরা এই ঋণের সাহায্যে সেলাই মেশিন এবং প্রয়োজনীয় কাপড় কিনে ব্যক্তিগত ইউনিট গড়তে পারেন। আশাকরা যায় খুব তাড়াতাড়ি এই ইউনিটগুলি চালু হবে। এছাড়া উল নিটিং ইউনিট স্থাপনের জন্য দু'হাজার টাকা ঋণের প্রস্তাবও ব্যাঙ্কে পাঠান হয়েছে। মেসিনে সোয়েটার বোনার এই প্রকল্পটিও শীঘ্রই চালু করা যাবে।

১৯৮০-র ব্লক যুব উৎসবের প্রস্তুতিও এগিয়ে চলেছে।

ফালাকাটা ব্লক যুব-করণ—ফালাকাটা ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ও স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে স্থানীয় যুবকদের জন্য ১২ কি. মি. দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় যেমন অনেক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন তেমনি বহু সংখ্যায় সাধারণ মানুষ দর্শক হিসাবে যুবকদের দৌড় উপভোগ করেন। উৎসাহ দেন। দশজন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও সরকারী অভিজ্ঞান পত্র দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। মোট একানব্বই জন যুবক অংশ নেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাইশটি যুব সংগঠনকে গৃহ নির্মাণ, খেলাধুলার সরঞ্জাম কেনা ইত্যাদির জন্য পাঁচ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয় এবং ভলিবল ও নেট বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক যুব-করণের যৌথ উদ্যোগে নরসিংহপুর গ্রামে আদিবাসী উৎসব পালনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই উৎসবে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের নাচ, গান ও খেলাধুলার কর্মসূচী থাকছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পের কর্মসূচীতে ফালাকাটা ব্লকে জানুয়ারী মাসে একটি আটা চাকী ইউনিট খোলা হয়েছে। স্থানীয় ব্যাঙ্ক প্রকল্পটির জন্য ৯,৯৮৫ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে এবং যুব-কল্যাণ

বিভাগ প্রান্তিক ঋণ বাবদ ১৯৮ টাকা মঞ্জুর করে। প্রসংগত উল্লেখ করা যায় ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রকল্পে মোট ছ'জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেছে।

এছাড়াও এই ব্লক তৈরী পোষাকের দোকান, রেডিও দোকান এবং পরিবহণ ইউনিট (ট্রাক) প্রকল্পের জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ মঞ্জুরের প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুসারে ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারে মহিলাদের সেলাই শেখানোর কাজ চলছে। বারজন শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুরের প্রস্তাব ব্যাঙ্কে পাঠান হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার ঃ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে এই ব্লকে তিনটি মিনিবাস, দুটি মৎস চাষ প্রকল্প, একটি বেকারি, তৈরী পোষাকের দোকান এবং শাঁখার গহনার দোকান গত আগস্ট মাস থেকে চলছে। এতে মোট বিনিয়োগ ৫,৩০,০০০ টাকা, প্রান্তিক ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫৩,০০০ টাকা। কাজ পেয়েছে কুড়ি জন যুবক।

এই ব্লকের অন্তর্গত শিলবাড়ীহাট গ্রামে মেয়েদের সেলাই শেখানোর কাজ সাফল্যের সংগে এগোচ্ছে। এবং আলিপুরদুয়ার জংশনে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে দুঃস্থ মহিলাদের নিয়ে একটি সেলাই সমবায় কেন্দ্র স্থাপিত হ'তে চলেছে। এ'দের প্রশিক্ষণের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার কলেজে গত নভেম্বর মাসে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আলিপুরদুয়ার মহকুমা অফিসের সহযোগিতায় 'সাম্প্রদায়িকতা প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ' এবং সোনারপুর গ্রামে 'শিক্ষা প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক দুটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান দুটি আলোচনার উচ্চমানে এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশে দারুণ সাফল্য লাভ করে। আকাশবাণী শিলিগুড়ি দুটি অনুষ্ঠানকেই সম্প্রসারিত করে।

ব্লক ভিত্তিক ফুটবল ও ভলিবল খেলা তিনশো'রও বেশী যুবকের অংশ গ্রহণে জমে ওঠে। অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি ব্লককে বিনামূল্যে খেলাধুলোর সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সংগে পরামর্শ করে বারটি ক্লাবকে আর্থিক অনুদান হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণোৎসব এই অঞ্চলের মানুষের কাছে বিশেষ উৎসাহের খোরাক হয়েছিল। এব্যাপারে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এবং শিক্ষিত সমাজ কর্তৃপক্ষের সংগে নিজেদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তাঁদের সচেতনতার পরিচয় দেন। একটি স্মারক গ্রন্থও বের করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্লক যুব-করণ ৮ই মার্চ সোমেন চন্দ স্মরণোৎসবের আয়োজন করেন। বিপুল উৎসাহ এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই অনুষ্ঠান হয় আলিপুরদুয়ার মহকুমা গ্রন্থাগারে। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন অধ্যাপক-শিক্ষকেরা এসেছেন, এসেছেন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তেমনি অনেক সাধারণ মানুষও অংশ নিয়েছেন শহীদ শিল্পী সোমেন চন্দকে জানতে এই অনুষ্ঠানে। 'নবীন শিল্পী সোমেন চন্দ' এবং 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও সোমেন চন্দ' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং সোমেনের 'রাজপথ' কবিতাটি নিয়ে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনে আশাতীত সাড়া পাওয়া যায়। এছাড়া 'সোমেন চন্দ এবং সমকালীন সাহিত্য' আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, অধ্যাপক শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মিহির রঞ্জন লাহিড়ী এবং শ্রীদীনেন রায়। অনুষ্ঠান কক্ষে 'সোমেনের জীবন ও কর্মে'র উপর একটি প্রদর্শনী দর্শকদের ভীষণ আকৃষ্ট করে।

দার্জিলিং জেলা ঃ

মিরিক যুব-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের আর্থিক আনুকূল্যে এলাকার দুঃস্থ স্বল্প শিক্ষিত এবং নেপালী মহিলাদের সেলাই শিক্ষাদেবার ব্যাপারে মিরিক ব্লক যুব-করণ উদ্যোগ নেয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে প'য়ত্রিশ জন শিক্ষার্থী অনেক উৎসাহ নিয়ে কাজ শিখছেন। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস এবং উপ-সচিব শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করেন। এবং শিক্ষার্থীদের সংগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রীমহাশয় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অসুবিধার কথা উপলব্ধি করেন এবং পাঁচ হাজার চল্লিশ টাকা টিফিন খরচ বাবদ অনুমোদন করেন।

মালদহ জেলা ঃ

পুরাতন মালদা ব্লক যুব-করণ—গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পুরাতন মালদা ব্লক স্পোর্টস কমিটি এবং ব্লক যুব-করণের যৌথ উদ্যোগে পুরাতন মালদা কালাচাঁদ হাইস্কুল মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় পুরাতন মালদা ব্লকের ছ'টি অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব, সমিতি ও সংগঠনের মোট একশ' আশি জন যুবক-যুবতী অংশ নেয়।

এদের মধ্যে তিরানব্বই জন যুবক এবং সাতাশি জন যুবতী। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় এবং ব্লক স্পোর্টস কমিটির পরিচালনায় ব্লক ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত পনেরটি ক্লাব ও আটটি স্কুলের প্রায় একশ' পঞ্চান্ন জন প্রতিযোগী অংশ নেয় এবং পাঁচশোরও বেশী মানুষ এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের মধ্যে থেকে পাঁচজন যুবককে জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাঠান হয়।

রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল

॥ রবীন্দ্র সংগীত ॥

প্রথম ঃ—রিংকু করঞ্জাই, কলিকাতা-১
দ্বিতীয় ঃ—শ্যামলী দাস, নদীয়া।
তৃতীয় ঃ—বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য্য, হাওড়া।

॥ নজরুল গীতি ॥

প্রথম ঃ—রীতা গাঙ্গুলী, কলিকাতা-১৯।
দ্বিতীয় ঃ—নন্দা চক্রবর্তী, কলিকাতা-৪২।
তৃতীয় ঃ—পুলক ভদ্র।

॥ মার্গ সংগীত ॥

প্রথম ঃ—পিয়াল ব্যানার্জী, কলিকাতা-২৬।
দ্বিতীয় ঃ—পার্থ রায়,
তৃতীয় ঃ—কৃষ্ণা রায়, ২৪ পরগনা।

॥ লোকগীতি (একক) ॥

প্রথম ঃ—বকুল রায়,
দ্বিতীয় ঃ—যুধিষ্ঠির রায়,
তৃতীয় ঃ—তুহিন দত্ত, ২৪ পরগনা।

॥ লোকগীতি (সমবেত) ॥

প্রথম ঃ—তাপস বসুনিয়া ও সম্প্রদায়, দিনহাটা।
দ্বিতীয় ঃ—মালতি সরকার ও সম্প্রদায়, কোচবিহার।
তৃতীয় ঃ—শ্রীমতি কাবেরী ও সম্প্রদায়, শিলিগুড়ি।

॥ গণসংগীত (সমবেত) ॥

প্রথম ঃ—সঙ্গীতাংকুর,
দ্বিতীয় ঃ—কর্ণিক,
তৃতীয় ঃ—দমদম ৬নং ইউনিট, কলিকাতা-৩০।

॥ কাব্য সংগীত ॥

প্রথম ঃ—পার্থ কুমার রায়
দ্বিতীয় ঃ—অর্পণা চক্রবর্তী
তৃতীয় ঃ—তপতী বিশ্বাস

॥ আবৃত্তি—অগ্নিকোণ ॥

প্রথম ঃ—সুমিত্রা দিব্যশ্রী মজুমদার, ২৪ পরগনা।
দ্বিতীয় ঃ দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া-২।
তৃতীয় ঃ—জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, আসানসোল।
তৃতীয় ঃ—চন্দন সাহা, ইসলামপুর।

॥ আবৃত্তি—মৃত্যুঞ্জয় ॥

প্রথম ঃ—পৃথা দত্ত, হুগলী।
দ্বিতীয় ঃ—সুস্মিতা গুপ্ত, নদীয়া।
তৃতীয় ঃ—স্বস্তিকা ঘোষ, জলপাইগুড়ি।

॥ আবৃত্তি—প্রিয়তমাসু ॥

প্রথম ঃ—অমিতরঞ্জন ব্যানার্জী,
দ্বিতীয় ঃ—তুষার গাঙ্গুলী, বর্ধমান।
তৃতীয় ঃ—সংঘমিত্রা তরফদার, পঃ দিনাজপুর।

॥ আবৃত্তি—আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাস ॥

প্রথম ঃ—মধুমিতা ভট্টাচার্য, কলিকাতা-৫।
দ্বিতীয় ঃ—স্নিগ্ধা বিশ্বাস, হাওড়া।
তৃতীয় ঃ—শ্রীপর্ণা দত্ত,

॥ স্বরচিত কবিতা (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—কেয়া সেন, জলপাইগুড়ি
দ্বিতীয় ঃ—মনোমিতা দত্তগুপ্ত, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—ছন্দা দে, শিলিগুড়ি।

॥ স্বরচিত কবিতা (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—আশীস বোস, নদীয়া।
দ্বিতীয় ঃ এম. আফসার আলি, কুচবিহার।
তৃতীয় ঃ—পিনাকী চৌধুরী, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—দেবাশীষ মিশ্র, বীরভূম।

॥ ছোট গল্প (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—জয় বসু, কলিকাতা-৩।
দ্বিতীয় ঃ—হীরালাল ভট্টাচার্য্য, বর্ধমান।
তৃতীয় ঃ—সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা-১৪।
তৃতীয় ঃ—শর্মিষ্ঠা দত্ত মজুমদার, শিলিগুড়ি।

॥ ছোটগল্প (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, ২৪ পরগনা।
দ্বিতীয় ঃ—প্রবীর রুদ্র, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—সন্তোষ সাহা, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—শুভংকর চক্রবর্তী, কলিকাতা-৩৯।
তৃতীয় ঃ—গৌতম রায়, ২৪ পরগনা।

॥ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (স্কুল বিভাগ) ॥

প্রথম ঃ—জাতিস্মর ভারতী, উত্তর বাংলা
দ্বিতীয় ঃ—বিসব ভাওয়াল, উত্তর বাংলা
তৃতীয় ঃ—অনুপকুমার চ্যাটার্জী, উত্তর বাংলা

॥ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (কলেজ বিভাগ) ॥

প্রথম ঃ—গৌতম সেন, বহরমপুর।
দ্বিতীয় ঃ—বিষ্ণুপ্রসাদ ধর, উত্তর বাংলা

॥ চিত্রাঙ্কন (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—সুপর্ণা সাহা, কলিকাতা-৫৩।
দ্বিতীয় ঃ—রঞ্জিত সরকার, কুচবিহার
তৃতীয় ঃ—গোপাল সাহা, কুচবিহার

॥ চিত্রাঙ্কন (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—গোতম সেনগুপ্ত, কলিকাতা-৬৪।
দ্বিতীয় ঃ—অমরেন্দ্র মজুমদার, শিলিগুড়ি
তৃতীয় ঃ—জয়ন্ত সরকার, শিলিগুড়ি

॥ নৃত্য ॥

প্রথম ঃ—শ্রাবনী হালদার, আসানসোল।
দ্বিতীয় ঃ—রজা দত্ত, শিলিগুড়ি
তৃতীয় ঃ—বিদিশা ঘোষ দস্তিদার, শিলিগুড়ি
তৃতীয় ঃ- সঙ্গীতা পাল, শিলিগুড়ি

॥ সেতার ॥

প্রথম ঃ—সঞ্জয় গুহ, কলিকাতা-৭০০০২৫।
প্রথম ঃ—অনন্য দে, জলপাইগুড়ি
দ্বিতীয় ঃ—শান্তিরঞ্জন কর্মকার

॥ তবলা লহরা (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—শিবশংকর রায়, ২৪ পরগনা।
দ্বিতীয় ঃ—বিকাশ দে.
তৃতীয় ঃ—দীপংকর রায়,

॥ তবলা লহরা (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—শ্যামল কাঞ্জিলাল, কলিকাতা-৬৭।
দ্বিতীয় ঃ—দেবাশীষ বসু, শিলিগুড়ি
তৃতীয় ঃ—বিরেশ সরকার, কুচবিহার।

॥ প্রবন্ধ (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—ভাস্কর সরকার, কুচবিহার।
দ্বিতীয় ঃ—অনুপম কুমার চ্যাটার্জী, জলপাইগুড়ি।
তৃতীয় ঃ- কস্তুরি বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া-২।

॥ প্রবন্ধ (১৮—২০ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-৭৩।
দ্বিতীয় ঃ—অসীম কুমার কর্মকার,
তৃতীয় ঃ—মনীন্দ্র মাইতি, কলিকাতা-৬।

॥ বার্ষিক পত্রিকা, স্কুল বিভাগ ॥

প্রথম ঃ—রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়।
দ্বিতীয় ঃ—বিষ্ণুপুর সার রমেশ ইনস্টিটিউশন।
তৃতীয় ঃ—জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল।

॥ বার্ষিক পত্রিকা, কলেজ বিভাগ ॥

প্রথম ঃ—মালদহ কলেজ
দ্বিতীয় ঃ—মালদহ কলেজ (বাণিজ্য)
। ঃ—হেরম্ব চন্দ্র কলেজ।

॥ একাংক নাটক প্রতিযোগিতা ॥

প্রযোজনা—
প্রথম ঃ—সূর্যাবর্ত, নাটক সেইসুর, কলিকাতা-৫৯।

দ্বিতীয় ঃ—বিপ্লবী সংঘ, নাটক—ইতিহাস কাঁদে, ইসলামপুর।

তৃতীয় ঃ—শিল্পীসংসদ, নাটক—চলো সাগরে, জলপাইগুড়ি।

পরিচালনা—

প্রথম ঃ—অর্জুন ভট্টাচার্য, নাটক—সেইসুর।
দ্বিতীয় ঃ—সত্যজিত্ রায়, নাটক—চলো সাগরে, শিল্পীসংসদ, জলপাইগুড়ি।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—বলাই চট্টোপাধ্যায়, 'যুবক', সেইসুর।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—সংঘমিত্রা তরফদার, 'মেয়েটি', ইতিহাস কাঁদে, বিপ্লবী সংঘ।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—অশোক ভট্টাচার্য, 'ডাক্তার', চলো সাগরে, শিল্পীসংসদ।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী—তপতী বিশ্বাস, কাকদ্বীপের এক মা, মিলেমিশে, শিলিগুড়ি।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা—দিলীপ চৌধুরী, সংক্ষিপ্ত সংবাদ, সংকেত, বালুরঘাট।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেত্রী—শ্রাবণী দাশগুপ্তা, ইতিহাসের পাতা থেকে, নিউ আলিপুর কলেজ।

॥ আদিবাসী নৃত্য (সমবেত) ॥

প্রথম ঃ—সেন্ট মেরী গার্লস হাই স্কুল, গয়াগঙ্গা।
দ্বিতীয় ঃ—বিজলীমাটি টি এস্টেট, কমলবাগান।
তৃতীয় ঃ—পুটিং বাড়ী চা বাগান, পুটিং বাড়ী।

॥ বিতর্ক ॥

প্রথম ঃ—পক্ষে—জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল,
শ্রী কমলেশ শাও, শ্রীমতি সুমিত্রা মিশ্র, শ্রী সুব্রত সান্যাল।

বিপক্ষে—শিলিগুড়ি উচ্চ বালক বিদ্যালয়,
শ্রী বিপ্লব ভাওয়াল, শ্রী শান্তনু চক্রবর্তী, শ্রীসন্দীপন চন্দ।

॥ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ॥

পুরুষ বিভাগ—

১০০ মিটার দৌড়

পরমেশ্বর জানা	মেদিনীপুর	১ম
সুমন সরকার	মুর্শিদাবাদ	২য়
প্রদীপ মজুমদার	মুর্শিদাবাদ	৩য়

পুরুষ বিভাগ :—

শট পুট

গৌতম চ্যাটার্জী	মেদিনীপুর	১ম
দেবপ্রসাদ চন্দ্র	মুর্শিদাবাদ	২য়
দিলীপ শিকারী	মুর্শিদাবাদ	৩য়

লং জাম্প

সাধনকুমার দাস	মেদিনীপুর	১ম
অসিত সরকার	মুর্শিদাবাদ	২য়
নীলোৎপল কিস্কু	মেদিনীপুর	৩য়

ডিসকাস থ্রো

নির্মল ব্যানার্জী	বর্ধমান	১ম
দিলীপ শিকারী	মুর্শিদাবাদ	২য়
পি. মজুমদার	বর্ধমান	৩য়

হাই জাম্প

ইলিয়াস আলি মণ্ডল	বর্ধমান	১ম
বলরাম মাইতি	মেদিনীপুর	২য়
মহঃ মহসিন	বর্ধমান	৩য়

বর্শা ছোড়া

গৌতম চ্যাটার্জী	মেদিনীপুর	১ম
সতীশ মাথুর	বর্ধমান	২য়
আবদুস সালাম	মুর্শিদাবাদ	৩য়

৮০০ মিটার দৌড়

মোহনানন্দ ঘোষ	মেদিনীপুর	১ম
তাপস ভট্টাচার্য	দার্জিলিং	২য়
সুজিত চৌধুরী	বর্ধমান	৩য়

মহিলা বিভাগ :—

১০০ মিটার দৌড়

নিয়তি সিনহা	মুর্শিদাবাদ	১ম
হাসনুয়ারা বেগম	মেদিনীপুর	২য়
রূপালী তরফদার	বর্ধমান	৩য়

হাই জাম্প

মালা ঘোষ	বর্ধমান	১ম
সুষমা সাহা	মুর্শিদাবাদ	২য়
বুলা মণ্ডল	বর্ধমান	৩য়

শট পুট

প্রভাতী শীল	মুর্শিদাবাদ	১ম
ঝরনা দাস	মুর্শিদাবাদ	২য়
মিনতি সিনহা	মেদিনীপুর	৩য়

ডিসকাস থ্রো

ঝরনা দাস	মুর্শিদাবাদ	১ম
বনানী দাস	মুর্শিদাবাদ	২য়
সন্ধ্যা পাখিরা	বর্ধমান	৩য়

লং জাম্প

মালা ঘোষ	বর্ধমান	১ম
হাসনুয়ারা বেগম	মেদিনীপুর	২য়
বুলা মণ্ডল	বর্ধমান	৩য়

বর্শা ছোড়া

প্রভাতী শীল	মুর্শিদাবাদ	১ম
পুতুল দাস	মেদিনীপুর	২য়
সন্ধ্যা পাখিরা	বর্ধমান	৩য়

[পাঠকের ভাবনা : ৭২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

মহাশয়,

শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত যুব-উৎসবে (২৩—২৯ ফেব্রুয়ারী) আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। দীর্ঘদিনের অবহেলিত উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক তথা অন্যান্য বিভাগে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে গর্বিত। বিভিন্ন শাখায় আমাদের প্রগতি এবার সরকারীভাবেই প্রমাণিত হল। উত্তরবঙ্গেই বেশীরভাগ পুরস্কার এসেছে। ৮০'তে এমন একটি যুব-উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমরা প্রস্তুতি কমিটি ও জনপ্রিয় পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে জানাই সাধুবাদ ও সংগ্রামী উষ্ণ অভিনন্দন।

আমাদের এখানে একটা সায়েন্স ক্লাব আছে। সন্ধানী বিজ্ঞানচক্র বানারহাট। স্থাপিত ২-৮-৭৬।

যুবকদের মুখপত্র 'যুব মানস' দশ কপির এজেন্সী নিতে হলে কী করতে হবে দয়াকরে জানাবেন। কিছু কিছু পত্রিকা এইসাথে (পুরনো কপি) পাঠালে উপকৃত হবো। ইতি—

সংগ্রামী অভিনন্দনসহ
কৃষ্ণপদ কুণ্ডু, শিক্ষাকর্মী
বানারহাট, জলপাইগুড়ি।

পাঠকের ভাবনা

'যুব মানস' পত্রিকা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত জানিয়ে আমাদের দপ্তরে অনেক চিঠি আসছে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে 'যুব মানস'-কে আরও উন্নত করার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের মূল্যবান পরামর্শ আগামী সংখ্যাগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করতে আমাদের সাহায্য করবে।

আমরা যুব মানসে নিয়মিত পাঠক-পাঠিকাদের মতামত 'পাঠকের ভাবনাচিন্তা' বিভাগে প্রকাশ করছি। আপনাদের সহযোগিতায় এই বিভাগ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে আশাকরি।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

'যুব মানস' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে আপনাদের কয়েকটি কথা বিনীতভাবে জানাতে চাই।

আমরা গ্রাম বাংলার যুব সমাজ 'যুব মানস' পাঠ করে বর্তমান সমাজের অন্তর্গত নানা সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ও যুক্তিনিষ্ঠ পথের সন্ধান পাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে জটিল বিষয়বস্তুগুলিকে আরও সরল ভাষায় উপস্থিত করতে পারলে গ্রামাঞ্চলের যুব সমাজ মূল বক্তব্যগুলি সঠিকভাবে ধরতে পারবেন। আপনাদের পত্রিকার বিষয়বস্তুগুলি সব সময় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হচ্ছে না বলে মনে হয়।

যুব জীবন যদিও মূল জনসাধারণের জীবনধারার থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, তবু যুব জীবনের নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে। যুব জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি যেমন খেলাধুলা করা, গান-বাজনা চর্চা করা, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে লিটিল ম্যাগাজিন প্রকাশ করা, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা ঘটলেও অসীম ধৈর্য্য নিয়ে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করা ইত্যাদি। যুব সমাজের এই স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি বর্তমান সমাজে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতায় সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিভা স্ফুরণের যথার্থ পরিবেশ নেই। 'যুব মানসে'র পাতায় যুব সমাজের এই যন্ত্রণার ছবি বিশেষ পাইনি। আপনাদের কাছে অনুরোধ এই বিষয়গুলিকে ফিচার, আর্টিকেল ও তথ্যের মাধ্যমে 'যুব মানসে' হাজির করুন।

যুব কল্যাণ বিভাগের 'আমরা-প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা' নামক পুস্তিকাটি সম্প্রতি আমরা পাঠ করে ঐ দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। 'যুব মানসে' বিভিন্ন ব্লক যুব কল্যাণ করণের কিছু কিছু কাজের বাসি সংবাদ পড়েছি। আপনাদের পত্রিকায় নিয়মিত যুব কল্যাণ দপ্তরের কর্মধারার পরিচয় সংবাদ হিসাবে শুধু নয়, ব্যাখ্যামূলকভাবেও প্রকাশ করা যায় না কি? মফস্বলের যুবকরা অনেক অনেক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও যথার্থ পরিচালনার অভাবে সঠিক পথ অনেক সময় বেছে নিতে পারে না। 'যুব মানস' পত্রিকায় কর্মসংস্থান, লেখাপড়ার সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা, খেলাধুলার বৃহত্তর অঙ্গণে প্রবেশ করার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় ছোট ছোট আর্টিকেলের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে অনেকে লাভবান হতে পারেন। আপনারা তার ব্যবস্থা করুন না, তাতে পত্রিকাটি আরও মূল্যবান হয়ে উঠবে।

মফস্বলের যুবকরা প্রবল প্রতিকূল পরিবেশ ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আলোচনাসভা, বিতর্ক, নাটক, গান, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মধ্যদিয়ে এই লড়াই সংগঠিত করা হয়। যদি কখনও লিটিল ম্যাগাজিনগুলির পাতায় নজর দেন তাহলে অনেক চমকপ্রদ সংবাদ, বিষয়বস্তু ও মুন্সী কলমের সন্ধান পেয়ে যেতে পারেন। এ সবই নির্মমভাবে সীমাবদ্ধ প্রচারে আবদ্ধ থাকে। তাদের বিশাল পাঠক সমাজের সামনে হাজির করার দায়িত্ব আপনারা নিতে পারেন। আপনারা লেখক তালিকার গণ্ডীটা আরও প্রসারিত করুন না, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

আমার পত্রটিতে আমাদের একান্ত আপনজন 'যুব মানস'কে সমৃদ্ধ করার জন্য কয়েকটি পরামর্শ দিলাম। আপনারা বিচার করবেন। গ্রহণ করতে পারলে পত্রিকাটি যুব-জনের প্রকৃত মুখপত্র হয়ে উঠতে আরও কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নমস্কারান্তে
সরল বিশ্বাস
মালদহ।

মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর যে স্পর্ধা নিয়ে 'যুব মানস' পত্রিকা প্রকাশ করেন তা বাঙ্গালী যুব সমাজের কাছে শ্রদ্ধা ও গর্বের বস্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবুও আমার দৃষ্টি ভঙ্গীতে 'যুব মানস' পত্রিকাটি আরও ব্যাপক অর্থে প্রকাশ পেলে খুবই ভাল হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে

পড়াশুনা করে তারুণ্যের দোহাই দিয়ে। এই তারুণ্যকে শতধারায় ফুটিয়ে তুলতে আমাদের সরকারের খুব কম সংখ্যক পত্র-পত্রিকা এগিয়ে এসেছে। তাই 'যুব মানস' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন স্কুল জীবনে উর্ধ্ব শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভবিষ্যৎ যৌবনের কর্মপন্থা কি হবে, তাদের উচ্চাশা ও নবীন স্বপ্ন কিভাবে যৌবনে পদার্পণ করে দেশের ও দশের কাজে উৎসর্গীকৃত হবে, তার একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা 'যুব মানস' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করেন 'তরুণের স্বপ্ন' নাম দিয়ে, তবে বঙ্গবাসী, যুবসমাজ তথা তরুণ-তরুণীরা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করতে অধিক আগ্রহে সচেষ্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'যুব মানস' পত্রিকা দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা করি।

শ্রীদিলীপ কুমার গিরি
গ্রামঃ কৃষ্ণনগর
পোঃ গড়-কৃষ্ণনগর, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর।

মাননীয় সম্পাদক,

আপনার পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। বিগত দুই বছরে আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই ব্যক্তিগত সংগ্রহে সুরক্ষিত রয়েছে। পত্রিকাটি সংগ্রহ করার উৎসাহে অবশ্য মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে। কারণ আপনারা ভীষণ অনিয়মিতভাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন। অনিয়মিত প্রকাশনার মধ্য দিয়ে কোন দিন কোন পত্রিকা পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা উদ্যোগী হলে পত্রিকা নিয়মিত হবে। আর 'যুব মানস' নিয়মিত হলে আমার মত আরও অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন।

রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়েছেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বভাবতই সুস্থ জীবন ভাবনায় বিশ্বাসী সংস্কৃতিবান মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে এই বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন। 'যুব মানস' সুস্থ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যুব জীবনের সমস্যাবলীই শুধু নয়, সমগ্র সংস্কৃতির জগৎ সম্পর্কে 'যুব মানস' সচেতন রয়েছে বলে আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সুস্থ জীবন ভাবনায় বিশ্বাসী পত্র-পত্রিকার ভীষণ অভাব আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। সেই অভাব পূরণে 'যুব মানস' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, কিছুটা করছেও নিশ্চয়। এ রকম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যখন 'যুব মানসে'র ওপর অর্পিত হয়েছে, তখন তার নিয়মিত প্রকাশন ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী নয় কি? আশাকরি আপনারা বিষয়টি যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

ধন্যবাদান্তে
সুদীপ্ত গায়েন
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের পত্রিকায় মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হওয়ায় যুব-ছাত্র সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি আপনারা সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ওপর বিশেষ আলোকপাত করছেন না। 'যুব মানস' পত্রিকার পাতায় নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ আমরা দেখতে চাই।

আর একটা অনুরোধ করব। প্রবন্ধমূলক রচনার পাশাপাশি প্রগতিশীল গল্প, কবিতা আরও বেশী বেশী করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করুন। প্রগতিশীল লেখকের অভাব নেই, অভাব তাদের প্রকাশ মাধ্যমের। আপনারা নতুন ও সম্ভাবনাময় লেখকদের আত্মপ্রকাশের পথ করে দিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের গর্ব অনুভব করতে পারবেন।

অভিনন্দনসহ—
রঞ্জন রায়,
সেওড়াফুলী, হুগলী।

প্রিয় মহাশয়,

প্রতি সংখ্যায় মূল্যবান চিন্তার খোরাক দেওয়ায় আপনাদের ধন্যবাদ।

আপনাদের পত্রিকাটি সুমুদ্রিত ও সুদৃশ্য হলেও কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলে না। কোন নিয়মিত বিভাগ নেই। অথচ এ ধরণের প্রায় প্রতিটি পত্রিকাতেই কিছু নিয়মিত বিভাগ থাকে যেমন পাঠকের কলম, পুস্তক সমালোচনা, জানবার কথা, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ, মাসিক সংবাদ পর্যালোচনা, বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ইত্যাদি। সব বিভাগ হয়ত একসঙ্গে চালু করতে পারবেন না। অন্তত কয়েকটি করা কি খুবই শক্ত কাজ!

ধন্যবাদান্তে
সব্যসাচী বাগচী
রামধন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৪

[শেষাংশ ৭০ পৃষ্ঠায়]

আমরা করব জয়—

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে যুবক-যুবতীদের দৃপ্ত মিছিল।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে রক্ষা করতে হবে—

'জাতীয় সংহতির সমস্যা' আলোচনা চক্রে গীতা মুখার্জী আলোচনারত। মঞ্চে বাঁদিকে ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
মার্চ-এপ্রিল '৮০

প্রচ্ছদ/গৌতম ঘোষ দস্তিদার

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঞ্চাশ

সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারী মাসের ২৩শ থেকে ২৯শ তারিখ—এই সাতটা দিন উত্তরবাঙলার শিলিগুড়ি শহরে 'রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব-'৮০' হয়ে গেল। শুধু যুব-ছাত্র উৎসব বললে বোধহয় সবটা বলা হ'ল না বরং বলি—পশ্চিমবাঙলার হিমালয় থেকে সুন্দরবন অবধি নানা জাতি-ধর্ম-বর্ণ আর সম্প্রদায়ের মিলন মেলা, প্রাণে প্রাণ মেলাবার এক মহোৎসবের আয়োজন করে ছিলেন পশ্চিমবাঙলার বর্তমান সরকার। উৎসব অনুষ্ঠানের গতানুগতিক গান-বাজনা এবং আর পাঁচটা আইটেমের মদির আবেশের সীমানা ছাড়িয়ে যে সুর এখানে ছড়িয়ে পড়েছে তার তাৎপর্য উপলব্ধির অনেক গভীরে গেঁথে গেছে। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের অ-সংগঠিত চেহারার পাশে পশ্চিমবাঙলার যুব-ছাত্র উৎসব সংগঠিত যুব-মানসের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভাস্বর উদাহরণ নিঃসন্দেহে। বেল্চি-পরশ-বিঘা-পিপরার পৈশাচিক উন্মত্ততার পাশাপাশি মেদিনীপুর শহরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের প্রাণচাঞ্চল্য কিংবা দার্জিলিং শহরে নেপালী ভাষা-ভাষীদের মুখর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অথবা শিলিগুড়ি শহরের মূল অনুষ্ঠানে অসমীয়া শিল্পীদের প্রতি পশ্চিমবাঙলার মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা এসব-কিছুই প্রমাণ করেছে সুস্থ-সংগঠিত-স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে, হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং গণচেতনার সঠিক মূল্যায়নের দূরদৃষ্টিতে পশ্চিমবাঙলার মানুষ পরস্পরকে ঐক্যের উদাত্ত মঞ্চে সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আদর্শ হিসাবে খাড়া করতে পেরেছে। পশ্চিমবাঙলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অনেকবার বলেছেন, 'আমরাও দেশকে ভালবাসি, আমরাও ভারতবর্ষের ঐক্যে বিশ্বাস করি'—এসব কথার কথা নয়, এ যে বাঙলার মানুষের সত্যিকার আঁতের কথা তা এই উৎসব নিন্দুকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একই মঞ্চে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ অথচ চিন্তায় চেতনায় সাঁওতালী-নেপালী-বাঙালী—সবাই মিলে মিশে একাকার! এই তো ঐক্য, একেই বলে সমন্বয়। সমস্ত বিভেদের কালিমাকে ধুয়ে ফেলার এই তো প্রকৃত ঘাট।

উৎসবের ক'টা দিন সমগ্র শিলিগুড়ি শহর যেন মেতে উঠেছিল। বসন্তের প্রকৃতির রঙে রঙ মিশিয়ে দলে দলে মানুষ চলেছে এক মঞ্চ থেকে আর এক মঞ্চে। শিশু-যুবা-বৃদ্ধা সবাই। দর্শকদের আগ্রহ যেমন বিখ্যাত শিল্পীদের অনুষ্ঠানে তেমনি তারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে আদিবাসীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান অথবা নেপালী সংস্কৃতির কিছু উপকরণ। অসমীয়া যুবক-যুবতীদের অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁদের প্রাণের টান এত গভীর যে দর্শকদের অনুরোধে বার বার তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে হয়েছে। তাঁদের বিদায় মুহূর্তের অশ্রুঘন মুখগুলি ভুলবার নয়। সেমিনার, বিতর্ক অথবা প্রদর্শনীর মত সিরিয়াস বিষয়গুলিতেও মানুষের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। তাঁরা জানতে চেয়েছে। বুঝেছে। শিক্ষা নিয়েছে অনেক।

পাঁচটা মঞ্চে একযোগে অনুষ্ঠান চলেছে। বিশাল তার ব্যাপ্তি কিন্তু শৃঙ্খলা ছিল এদের অঙ্গের ভূষণ। শৃঙ্খলা ছাড়া কোন দিন কোন বড় কাজ কি কোথাও হয়েছে! কর্তৃপক্ষ এবং প্রস্তুতি কমিটি অসীম ধৈর্য্য আর আন্তরিকতা নিয়ে প্রতিটি বিষয়কে পরিচালনা করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক আর সাধারণ [illegible] বোঝাপড়ায় তা আরও [illegible] হয়েছে। এতসবের মধ্যেও খুঁত হয়ত অনেক ছিল, খুঁজলে ভুল যে পাওয়া যেত না এমন নয় কিন্তু সবকিছুকে ঢেকে দিতে ভাল কিছু করব এই সদিচ্ছা জয় করেছে জনগণকে। তাই তো সাধারণ মানুষ উৎসবকে নিজের করে নিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে প্রতিনিয়ত। রাজ্য সরকারের এও একটা বড় পাওনা বৈকি!

সংস্কৃতি বিনিময়ের এই তীর্থক্ষেত্র ক'টা দিন যে মুক্তির উচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠেছে, যে কোলাহলের ঢেউ তুলেছে যুব মনে তাকে লালন করে ছড়িয়ে দিতে হবে সারা ভারতবর্ষের বুকে, যেন সাম্রাজ্যবাদের চূড়াকে ভেঙে গুঁড়িয়ে তা মুক্তির নীলিমায় একাকার হ'তে পারে। সার্থক হয় বিশ্ব যুব উৎসবের আহ্বান। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্বের কথা মনে রেখে শিলিগুড়ি শহরের গলিতে-বস্তিতে-রাজপথে যে সুর শুনেছি তাতে গলা মিলিয়ে আমরাও বলি—যুব-ছাত্র উৎসব তুমি ফিরে এস। আবার। বার বার।

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি।

পত্রিকার নাম	—	যুবমানস
প্রকাশের সময় ব্যবধান	—	মাসিক
মুদ্রক	—	দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১/১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯
প্রকাশক	—	শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় যুগ্ম-আধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার ৩২/১, বিবাদি বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি	—	শ্রী কান্তি বিশ্বাস ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র মন্ত্রী যুবকল্যাণ ও স্বরাষ্ট্র (ছাড়পত্র) বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
সত্ত্বাধিকারী	—	পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আমি, শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, ঘোষণা করছি, উপরে দেওয়া তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ

শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

৯. ৪. ৮০

আমরা জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের সাহায্য নিয়ে চলি

গত ২০শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্য ১৯৮০-৮১ সালের ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি পেশ করেন। দাবির উপর বিভিন্ন দলের সদস্যরা বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। বিতর্কের শেষে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জ্যোতি বসু জবাবী ভাষণ দেন। ঐ ভাষণকে সম্পাদনা করে ছাপান হ'ল।

—সম্পাদকমণ্ডলী ধ্রুবমানস

বিধানসভায় বিরোধী দলগুলি এখানে অনেক বক্তৃতা দিলেন। বললেন, পুলিস বাজেট খুব গুরুত্বপূর্ণ, আলোচনা করা প্রয়োজন। একথা বলে বক্তৃতা দিয়েই ইন্দিরা কংগ্রেস বিধানসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। পুলিস বাজেট সম্পর্কে আমরা কি বলি, অন্যরা কি বলেন, তা শোনবার দরকার নেই, বোঝবার দরকার নেই ওঁদের। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার দায়িত্বজ্ঞানহীন ইন্দিরা কংগ্রেস। ওঁরা গণ্ডগোল করছেন। পরিকল্পিতভাবে সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন আইন-শৃংখলা বিঘ্নিত করার জন্য। সারা ভারতের মানুষ, পশ্চিমবাংলার মানুষ ইন্দিরা কংগ্রেসীদের চেহারা দেখুন, বুঝুন ওদের আসল উদ্দেশ্য—এটাই আমরা চাই।

আমরা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকারে আছি। এই বাস্তব কথা আমরা সর্বত্র বলছি। এই বিধানসভায়ও বারবার বলেছি। কারণ, কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা ভুলে যেতে পারেন। সে জন্য একথা বারবার বলার প্রয়োজন আছে। একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা একথা বলছি। আমরা দিল্লির ক্ষমতায় নেই। পশ্চিমবাংলায় আছি। সংবিধানের যে অবস্থা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক অন্যান্য সাধারণ যে অবস্থা আছে তা আমরা দেশের মানুষকে মনে করিয়ে দিতে চাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, আইনের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থাটা আমরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছি। বলছি, আমাদের দেশে ৩২ বছর ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছে। এই ব্যবস্থায় একটা রাজ্য সরকারে থেকে আমরা সব কিছুতে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারি না। সব কিছু পরিবর্তন করে দেব—এমন কথা আমরা কখনো বলিও নি। বললে, সেটা হতো অসত্য প্রচার। এটা আমরা করতে পারি না।

পুলিসী প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ৩২ বছর ধরে পুলিসকে ব্যবহার করা হয়েছে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ রক্ষার কাজে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। দুঃখের সঙ্গে একথাও বলতে হচ্ছে, আমাদের দেশের লোকই পুলিসের কাজ করছে. গরিব ঘরের অনেক ছেলে কাজ করছে। মুষ্টিমেয়র স্বার্থরক্ষা, গণতন্ত্রের বিরোধিতা করার কাজে পুলিস ব্যবহার করার জন্য দায়ী তাঁরাই, যাঁরা এতদিন ধরে সরকার চালিয়ে আছেন বিশেষতঃ কেন্দ্রে এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায়। ওই সরকারের সঙ্গে আমাদের লক্ষ্যের কোনো সামঞ্জস্য নেই, মিল নেই। শাসকশ্রেণী তাঁদের লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য সেইভাবে পুলিস ব্যবহার করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি? কিছু নেই। এসব বুঝেই আমরা সরকারে এসেছি। পশ্চিমবাংলার মানুষ এখানে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা সরকারে এসে জনসাধারণকে বলেছি, আপনারা অবস্থাটা বুঝুন। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, কোথায় কোথায় আমাদের বাধা আছে, বাধাগুলি কতটা অতিক্রম করতে পারি—এসব বুঝুন আপনারা। কিছুটা বাধা অতিক্রম করা যায়। সবটা যায় না। এ সব কথা আমরা জনসাধারণকে বলেছি। এখনই বলছি। সেই হিসেবে পুলিসকে বলেছি, একটা সুযোগ, বড় সুযোগ যখন এসেছে, বামফ্রন্ট সরকারের মত একটা সরকার এখানে পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই সুযোগ আপনারা নিন। আগেকার দিনে সরকার যা করেছেন, পুলিসকে দিয়ে করিয়েছেন, পুলিসের অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি সেই সব কাজে। মুখ বুজে তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। যার ফলে আজকে, স্বাধীনতার ৩২ বছর পরেও পুলিস মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, সমস্ত জায়গায়, সারা ভারতে বিচ্ছিন্ন। অথচ এটা বাঞ্ছনীয় নয়। একথা পুলিসকে বলেছি। পুলিসের সঙ্গে নতুন করে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করছি। আমরা বিভিন্ন জায়গায়, জেলায় জেলায় কমিটি করেছি, কেন্দ্রে কমিটি করেছি। আমি তার সভাপতি। যতগুলি সংগঠন আছে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি করেছি। এ জিনিস করেছে ভারতবর্ষে আর কোন্ সরকার? কংগ্রেস, ইন্দিরা গান্ধী এতদিন ধরে তো রাজত্ব করেছেন। আমরা পুলিসের সঙ্গে বসে আলোচনা করি। তাঁদের সংগঠন আছে। তাঁদের সঙ্গে দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলি। দাবি-দাওয়া মানতে পারি না পারি, তাঁদের একথা বলি, এই কারণে মানতে পারছিনা। আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। এইভাবে আমরা চলবার চেষ্টা করছি। পুলিসকে বলেছি ব্যবহার পরিবর্তন করে এই সুযোগ আপনারাও গ্রহণ করুন। মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে আপনারা যেভাবে অভ্যস্ত হয়েছেন, বিগত দিনগুলির সরকার যে অভ্যাস করিয়েছেন আপনারা সেটা ভোলবার চেষ্টা করুন।

আমি জানি সময় লাগবে। কারণ, ভয়ংকর জিনিস এই অভ্যাস। আমি জানি এখানে যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ রয়েছে এ সবের মধ্যে অভ্যাস বদল হওয়া খুব কঠিন। কিন্তু তবুও তো কিছু করা যায়। কিছু হয়েছেও ইতিমধ্যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি দেখেছি, সরকার পক্ষের কেউ কেউ বলেছেনও, মানুষকে সাহায্য করার কাজে চরম বিপদের সময় পুলিস তো এগিয়ে গিয়েছেন। আমরা ক্ষমতায় আসার পর, গত দু-তিন বছরের মধ্যে আমরা দেখেছি কিছু পুলিস প্রাণও দিয়েছেন, আহত হয়েছেন হয়ত ডাকাত ধরতে গিয়ে, দুষ্কৃতকারী ধরতে গিয়ে, সমাজবিরোধীদের ধরতে গিয়ে। এক্ষেত্রে পুলিসকে আমরা প্রশংসা করেছি, তাঁদের পুরস্কৃতও করতে চাই আমরা। এইভাবে আমরা পুলিসকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। এটা শুধু সরকার আর কয়েকজন মন্ত্রী বক্তৃতা দিয়ে করে দিতে পারেন না, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে যেখানে পুলিসরা কাজ করেন সেখানে সেটা তাদের বুঝে নিতে হবে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিটা। কেউ কেউ হয়ত এই সুযোগটা গ্রহণ করছেন আবার কেউ কেউ হয়ত করছেন না। এখানে দু-একজন আমাকে বললেন যে, আপনি কি জানেন যে পুলিসের মধ্যে এরকম একটা ইস্তাহার বিলি করা হয়েছে? আমি তো জানি, আমার কাছেও আছে সেটা। আমরা তো একেবারে মূর্খ নই। আমাদের চোখ তো খোলাই আছে। অসংখ্য মানুষ আমাদের প্রতিদিন খবরাখবর দিচ্ছেন, আমরা জানি। সব হয়ত না জানতে পারি কিন্তু কিছু জানি যে কোথায় কি হচ্ছে। কিন্তু আমরা করবোটা কি? ইস্তাহারটা হিন্দিতে পড়ে শোনালেন (বিরোধী পক্ষের জনৈক সদস্য) দু'জন পুলিস, আগে থেকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। তারা গুলি করে হত্যা করেছিল কাদের। সে সম্বন্ধে আমরা সরকারে আসার আগে থেকেই মামলা চলছিল। তারা সাজা পেলেন—যাবজ্জীবন—সেখানে অপরাধ হয়ে গেল আমাদের সরকারের! কিন্তু কি করবো আমরা? এই দু'জন পুলিস বলছেন, আমরা তো বিগত সরকারের কথা শুনে মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছিলাম। কিন্তু আমি বলছি, সেখানে কোন উপায় নেই, আইনে যা আছে তাই হবে। আমরা কি করবো? এক্ষেত্রে আমরা কিছু করতে পারি না। এই যে বাইরে ইস্তাহার বিলি করা হচ্ছে এর মানে হচ্ছে সরকারের বিরোধিতা করো। এ সব তো আমরা জানি। দু'বার আমরা সরকারে এসেছি, এ সব আমরা দেখেছি। এই বিধানসভার ভেতরেই আমরা আক্রমণ দেখেছি। কংগ্রেসীরা তার পেছনে ছিলেন যখন সেই আক্রমণ এখানে হয়েছে। তাদের আমরা স্তব্ধ করেছিলাম।

সারা ভারতবর্ষব্যাপী যা হয়েছে সেদিকে একবার আপনারা চেয়ে দেখুন। সেখানে পুলিসকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সি. আর. পি. নিয়ে গিয়ে, মিলিটারি নিয়ে গিয়ে। আমাদের এখানে এটা হয় নি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের পুলিসবাহিনীকে। তাঁদের সঙ্গে কি সব ব্যাপারে আমরা একমত? না, একমত নই। তথাপি ওই পথে তারা যান নি।

তারপর সি আই এস এফ-এর সঙ্গে গোলমাল হয়েছে জনতা পার্টির সরকার যখন ছিলেন। সেখানে গুলি গোলা চলেছে। আমাদের এখানে ওটা আমাদের আওতার মধ্যে নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দিল্লির সরকারের সঙ্গে কথা বলে একটা সমঝোতায় যাতে আসা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। এসব কি আর কোথাও হয়েছে? ভারতের আর কোথাও এসব হয় না। এখানে আমরা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলবার চেষ্টা করছি। কিছু সুফল আমরা পেয়েছি। এখনও অনেক কাজ আমাদের করতে হবে। এই সামাজিক অবস্থার মধ্যে, যেখানে নিদারুণ দারিদ্র্য আমাদের দেশে রয়েছে, প্রচণ্ড বেকারী সমস্যা আমাদের দেশে রয়েছে। এ সবই আমাদের চিন্তায় রাখতে হবে। তাছাড়া আমরা জানি কংগ্রেসীরা কয়েক হাজার সমাজবিরোধী তৈরি করে রেখে গিয়েছেন। তারা আমাদের ছেলেগুলিকে বিপথে পরিচালিত করেছেন নিজেরা সরকারে থাকবার জন্য। তাদের হাতে বোমা, পিস্তল তুলে দিয়েছেন। মানুষকে হত্যা করতে শিখিয়েছেন, নির্বাচন প্রহসনে পরিণত করতে শিখিয়েছেন। আমাদের ঘরের ছেলেগুলিকে তারা সেই পথে টেনে নিয়ে গিয়েছেন যাতে তারা পরীক্ষায় টোকাটুকি করে। কংগ্রেসী মন্ত্রী নেতারা তাদের ডেকে এই সব ব্যবস্থা করিয়েছেন যাতে তারা সমাজবিরোধীতে পরিণত হয়। তারা এটা করেছিলেন তার কারণ তাহলে যুব সমাজ আর দেশের জন্য, দশের জন্য, সমাজ পরিবর্তনের জন্য লড়াই করতে পারবে না, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তারা সফল হতে পারেন নি। চার পাঁচটি নির্বাচনে কত বড় জয় আমাদের এনে দিয়েছেন সেটা আপনারা দেখেছেন। সেজন্য মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁদের উপরই আমরা নির্ভর করি। আমরা বারে বারে বলেছি, গোপনে অন্য কথা বলি না, কংগ্রেসীদের মতন আমরা ভণ্ড নই। পুলিসকে খোলাখুলি বলেছি আপনারা নিরপেক্ষ থাকবেন আমাদের সরকারী দলের নাম করে যদি কেউ সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়, খুন জখম রাহাজানী বা অন্য কিছু করে তা হলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

এখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, আপনাদের লোকেরা ধরা পড়ে? একবার এই বিধানসভায় আমি হিসেব দিয়েছিলাম। আবার আপনারা প্রশ্ন করুন—আমি জবাব দিয়ে দেব কত লোক গ্রেপ্তার হয়েছে। আমাদের ১১০০ ছেলে খুন হয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে এবং রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সমস্ত ব্যবস্থা দিল্লি থেকে করেছেন। ক'টা মামলা হয়েছে? ক'জন সাজা

পেয়েছে? ভারতের আর কোথায় এত হত্যাকাণ্ড হয়েছে? আজকে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে পুলিস নিরপেক্ষ কি না! তবে এটা ঠিক পুলিসের মধ্যে আমি দেখেছি, যে ভাবে এখানে একটা অরাজক অবস্থার মধ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসীরা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন—ইন্দিরা কংগ্রেসের ছেলেদের দেখে পুলিস অনেক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছেন। নিরপেক্ষ বলতে কি বোঝাচ্ছেন? নিরপেক্ষ বলতে যারা আক্রমণ করে তাদের পক্ষে দাঁড়ানো বোঝায়, না যারা আক্রান্ত হয় তাদের উপেক্ষা করা? এই রকম উদাহরণ আমার কাছে আছে। তা তো চলবে না। পুলিসকেও একটু বুঝতে হবে। মাথা ঘামাতে হবে। আক্রমণকারীকেই গ্রেপ্তার করতে হবে। যার খুশি নাম দিয়ে দিলাম যা খুশি হয় হবে? যে আক্রান্ত হলো জেনেশুনে সে গ্রেপ্তার হবে? একে নিরপেক্ষ বলে না। কিন্তু আমি জানি এই পরিবর্তিত অবস্থা হবার পরে, স্বৈরাচারী শক্তি দিল্লিতে জেতবার পরে এই রকম সব ঘটনা ইতিমধ্যেই আমার কাছে এসেছে। এটাকে আমি অন্ততঃ নিরপেক্ষ বলতে রাজী নই। কাজেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যদি হিসাব আপনারা চান আমি দিয়ে দেব। জমি নিয়ে, এটা নিয়ে, ওটা নিয়ে, পারিবারিক কলহ, গ্রামের মধ্যে কোন কলহ বিবাদ ইত্যাদি এই সব নিয়ে যে মামলা হয়েছে সেখানে গ্রেপ্তার হয়েছে সেখানে যে কোন পক্ষই আছে, যারাই এর মধ্যে লিপ্ত আছে, তারা গ্রেপ্তার হয়েছে। কেউ আমাকে বলতে পারবেন, আপনারা নেই? সি পি আই (এম)-এর তথাকথিত সমর্থক, অন্য কোন বামপন্থী দলের সমর্থক নেই? এটা এই রাজ্যে প্রমাণ করা যাবে না, অন্য রাজ্যে খুঁজে বেড়ান নিরপেক্ষ কেউ আছে কি না। আমাদের এখানে এই সব চলতে পারে না। আমরা মন্ত্রী হবার জন্য সরকারে আসি নি, সমাজ পরিবর্তনের জন্য।

আমাদের লোক যদি কোন ভুল করে, অন্যায় করে আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের ডেকে বলি, ভুল বা অন্যায়টা বুঝিয়ে বলি। যদি কেউ না বোঝেন তাহলে, আমাদের পার্টির সে ক্ষমতা আছে, বলে দিই বামপন্থীতে তাদের কোন স্থান নেই। তারা বেরিয়ে যাবেন, কংগ্রেসে যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এই সব থাকতে পারে না। এখানে আমি আপনাদের বলতে চাই, একটি কথা আবার শুনলাম, ইন্দিরা কংগ্রেসের ভোলানাথ সেন বলে গেলেন, উনি বলেই চলে গেলেন, হয়ত ওঁদের সব ধরা পড়ে গেছে। বললেন, আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে আমরা জনগণের সাহায্য নেওয়ার কথা বলেছি। তা ওঁরা 'জনগণ' কথাটা শুনলেই ক্ষেপে যাচ্ছেন। উনি বললেন, গ্রামে আপনারা আছেন, শহরে আপনারা আছেন, আপনাদের হাতে পঞ্চায়েত আছে। কিন্তু পঞ্চায়েত তো কংগ্রেসের হাতেও আছে। আমরা ওইভাবে চলি না। আমরা জনগণের সাহায্য নিয়ে চলি। অতীতের পঞ্চায়েত, পৌরসভা এই সব কথা বলি না। আমরা জনগণের প্রতিনিধি। আমরা বলেছি, যদি কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে গণ্ডগোল বাধে তাহলে সেখানে যে দলের নেতাই থাকুন বা যারাই থাকুক তাঁদের সংগে বসে আলোচনা কর—এতে অসুবিধার কি আছে? আমরা বরাবর এই নীতি নিয়ে চলেছি। কিন্তু উনি বললেন, জনগণের সংগে সহযোগিতা কেন হবে—পুলিস গুলি চালাবে। লাঠি চালাবে, যা খুশি তাই করবে। কিন্তু আমরা ভোলা সেনদের এই সব কথা মানছি না। ওঁদের সরকার যেখানে আছে তারা এই সব করবেন। আমরা এই সব মানতে রাজি নই, পুলিস বুঝেছেন আমাদের এই মনোভাব। তাঁরা অনেক সময় অসুবিধায় পড়ে যান। গোলমালে পড়ে যান, নানারকম অভিযোগ হয় পরস্পর বিরোধী। বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কৃষক সমিতির আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলন ইত্যাদি নানারকম আন্দোলন যখন হয় তখন এই সব হয়। কিন্তু সাধারণ অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে কারো সংগে আলোচনা করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এক্ষেত্রে কারো সংগে পরামর্শ করবো না, যোগাযোগ করবো না!

কেউ বলছেন, কংগ্রেস সরকারের সংগে আপনাদের তফাৎ কি—ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে আপনি বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ৫ কোটি টাকা বেড়েছিল বলে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এখন কি হচ্ছে? এখন এটুকু যদি বুঝতে না পারেন তা হলে আপনাদের বোঝাব কি করে? পুলিসের বাড়ি তৈরির জন্য খরচ করছেন বলে, মাইনে বাড়ছে বলে বাধা দিতাম? তা তো দিতাম না। আমরা বলেছি, এই পুলিসকে আপনারা ব্যবহার করছেন গণতন্ত্র হত্যা করার জন্য। জনগণের বিরুদ্ধে আপনারা কাজ করাচ্ছেন। পক্ষপাতিত্বের কাজ আপনারা করছেন, এই জন্য বাধা দিতাম।

ভোলাবাবু বলে চলে গেলেন। এই তো কোন খাতে কিছু বাড়লো। সব কমে গেল। তিনি বাজেট বইটা পড়েন নি। এমন কি আমার বক্তৃতাটাও পড়েন নি। দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক হলে যা হয়। আমার সব বলার সময় নেই। ১৯৬৬-৬৭ সালে শিক্ষাখাতে আমরা ৮০ কোটি টাকা খরচ করেছি আর এবারে সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪০ কোটি টাকা। অন্য খাতগুলি দেখুন, গঠনমূলক যে সমস্ত খাত আছে, কোথায় আমরা কত খরচ করেছি। এগুলি দেখলেই বুঝতে পারবেন, বাজেট ব্যয়ের মধ্যে গ্রামের জন্য আমরা কত ব্যয় করছি। এটা তো ওঁর দেখবার দরকার নেই। তিনি এই সবের দিকে না গিয়ে একটা হুমকি দিয়ে চলে গেলেন। ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যাবেন কি না জানি না। সংবিধানের ৩৬৫ নং ধারার কথা বলে চলে গেলেন। প্রেসিডেন্ট রুল নাকি এখানে করা হবে আমি যা বুঝলাম ওঁর কথায়। এর মানে কি হবে? কেন্দ্র যদি আমাকে বলে এই জনতা পার্টিতে যাঁরা সব বসে

আছেন, তাঁদের গলা কেটে যাও—তাহলে আমাকে কাটতে হবে? আমি বলেছি প্রণববাবুকে (প্রণব মুখার্জি, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী) আপনারা বিনা বিচারে আটক করতে চান করুন আপনাদের যেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজত্ব আছে। আপনারা ন'টা রাজ্য সরকার ভেঙে নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। আসাম আছে। আরও তো আপনাদের অনেক জায়গা আছে। আপনারা ক'জনকে বিনা বিচারে আটক করেছেন, বলুন। আপনারা গ্রেপ্তার করেন নি কারণ নির্বাচন আছে। কিন্তু আমরা তা করবো না। আপনাদের যদি সাহস থাকে আটকান। আপনারা বলুন আমাদের এখানে কাকে কাকে আটকাতে হবে। তাহলে অন্ততঃ আমরা বুঝতে পারি যে কারা কারা আপনাদের টাকা দেয়নি আমি সে লিস্ট পাই নি। বিনা বিচারে আটকের এই অসভ্য বর্বর আইনকে আমরা ব্যবহার করি না। এতে অসুবিধার কি আছে? সব ব্ল্যাক মারকেটিয়ার, জ্যোতি বসু থেকে আরম্ভ করে সবাইকে গ্রেফতার করে দাও। এই কথা আমাদের শুনতে হবে? এইসব কথা তো আমরা ৩৩ বছর ধরে শুনছি। এই সভায় বসে শুনলাম সিকিওরিটি অ্যাক্ট সম্বন্ধে। তখন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি বিরোধিতা করেছিলাম। জানি না কত সংশোধনী (অ্যামেন্ডমেন্ট) এনেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, এতো আপনাদের বিরুদ্ধে নয়। কেন আপনারা নিজের গায়ে মাখছেন এইসব সমাজ-বিরোধীদের জন্য। কিন্তু সেদিন আমাকে ভোর ৪টার সময় গড়িয়াহাটা রুট ধরে বাড়ি থেকে জীপ-এ করে নিয়ে গিয়েছিল। তখন দেখি, ওই ভদ্রলোক (প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী) রাস্তায় পাইচারী করছেন, মরনিং ওয়াক করতে বেরিয়েছেন। আমি তো তখন জীপ থেকে বলতে পারি না, কি মহাশয়, এ কি হোল, কি প্রতিশ্রুতি দিলেন আর কি হল? যা হোক আমি সে সব কথার মধ্যে যাচ্ছি না।

কে একজন বললেন যে, এখানে নাকি রেকর্ড খুন হচ্ছে। এখানে সাট্টার সব চেয়ে বেশি রেকর্ড। উনি নাকি পি ডবলিউ মিনিস্টারের কাছে গিয়েছিলেন। সাড়ে তিনটার সময় তিনজন অফিসারকে ফোন করেছিলেন, একজনকেও পাননি—এও রেকর্ড। এই রকম অনেক কিছু রেকর্ড বলে গেলেন। উনি কার নাম করলেন, উনি নাকি সাট্টাওয়ালাকে চেনেন এবং উনি পুলিস অফিসারের কথা বললেন। আমি জানি, দেখতে হবে এই সব জিনিস। এইরকমভাবে হচ্ছে আমি জানি না। আমি এখানে দুটি উদাহরণ দিচ্ছি:

১৯৭৮	ডাকাতি	ছিনতাই	হত্যাকাণ্ড
কলকাতা	৫২	১৭০	৯৭
দিল্লি	৫৩	৫৯৭	১৫৭
বম্বে	২২	৩১৪	১৯১
বাঙ্গালোর	৪৭	৪৯৬	৪৯

১৯৭৯ সালে ডাকাতি কলকাতায় ৩৬, দিল্লিতে ৬৯, বম্বে ৪১। ছিনতাই কলকাতায় ১৬০, দিল্লিতে ৬২৯, বম্বে ৩৪৫। হত্যাকাণ্ড কলকাতায় ৯৩, দিল্লিতে ১৯০ এবং বম্বে ১৫৭। এই রকম আরো অনেক রেকর্ড আমার কাছে আছে। এটা একটা অজুহাত আমাদেরই বা ৯৩ হবে কেন, ২৩-এ নেমে যাওয়ার উচিত ছিল। আমি এটা বারে বারে স্বীকার করেছি। কিন্তু এখানে এমনভাবে দেখান হচ্ছে যেন আইন-শৃংখলা আর নেই। যাঁরা ৩৬৫-র কথা বলছেন ওখানে গিয়ে ৩৬৫ অ্যাপলাই (প্রয়োগ) করুন। ওখানে ইন্দিরা-কংগ্রেস রাজত্ব করছেন।

উত্তর প্রদেশে কি হবে জিজ্ঞাসা করি? এগুলিতো সাধারণ ডাকাতি নয়। আমরা দেখেছি, হরিজনদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, উপজাতিদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। তাঁদের নারীদের নির্যাতন করা হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। এই সব লোকদের কাছে আমাদের শুনতে হয় আইন-শৃংখলার কথা। এটা ঠিক, আমাদের এখানে যা ডাকাতি হচ্ছে, তার হিসেব দিলাম। অনেক জায়গায় প্রিভেন্ট (রুখ) করা যাচ্ছে না কিন্তু এইটুকু সান্ত্বনা আছে যে ডিটেকশন'টা আগের থেকে অনেক ভাল হচ্ছে। আমার অনেক হিসেব আছে, সেগুলি দেবার দরকার নেই। সেন্ট্রালব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন, দিল্লি থেকে তাঁরা আমাকে লিখেছেন ২. ৫. ৭৯ তারিখে। ডি. সি. ডি. ডি. কে লিখেছেন, Heartiest Congratulations on the Excellent work done by you and your colleagues in the detection of sensational robbery in the State Bank of Hyderabad, Maharshi Debendra Road, on April 4, 1979. Indeed the recovery of a large amount within so short a time must be a record in the History of criminal investigation of this country. (মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে, ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল হায়দ্রাবাদ স্টেট ব্যাঙ্কের চাঞ্চল্যকর ডাকাতি ধরার জন্য আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এত বেশি টাকা এত অল্প সময়ে উদ্ধার করেছেন। এটা এদেশের অপরাধ কার্যে একটা নজির হয়ে থাকবে)। এখন এটা যাঁরা করেছেন তাঁদের আমাদের অভিনন্দন জানাতে হবে। যেগুলি হয়নি সেটা হওয়া উচিত বা বিশেষ করে প্রিভেনশান—যেগুলি আরো ঠিক মত ইনভেস্টিগেশন হয়। হয়ত সেই ডাকাতগুলির এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে তারা ওই অপরাধমূলক কাজ করবে না। কাজেই সে দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এখানে অনেক সদস্য যে সব কথা বলেছেন, এগুলি কাট মোশানে থাকতো তাহলে একটু দেখে আসতে পারতাম। কিন্তু তা নেই। হঠাৎ টাইপ রাইটারের কাগজ নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। ভোলা সেন

নেই। তাঁর উত্তর দেবারও প্রয়োজন নেই। তিনি চলে গেছেন। তাঁর সৎ সাহসটুকু নেই যে আমার জবাবটা শুনে যাবেন উনি যা বলেছেন, বেশিরভাগ অসত্য বলে গেলেন। আর বাজেটও পড়েন না, আমার বক্তৃতা পড়েন না। ঠিক করে এসেছিলেন এই সব বলবেন। গণ্ডগোল সৃষ্টি করবেন, করে চলেগেলেন। এখানে কথা উঠেছে যে ব্যক্তিগতভাবে কে স্টুডেন্ট ফেডারেশনের মেম্বার ছিল। উনি জানলেন কি করে স্টুডেন্ট ফেডারেশনের মেম্বার ছিল? যা খুশি তাই বললেই হল। স্টুডেন্ট ফেডারেশনের মেম্বার হওয়া কোন আপত্তি জনক কথা নয়। কিন্তু উনি কি করে জানলেন সেটা আমি জিজ্ঞাসা করি কবে ছিল, কে ছিল? জনপ্রতিনিধি হয়ে সব আজগুবি বললেন, ওরা সব ঠিক করে ফেলেছেন যে কে কোথায় পোস্টেড হবে। আপনারা জানেন যে, একটা গোলমাল হয়েছে আমাদের ক্যালকাটা পুলিসের ব্যাপারে। কিন্তু এতে এত ভীত সন্ত্রস্ত আপনারা হবেন না। আমরাও জনগণের প্রতিনিধি। সংকটের কথা মনে করে এত ঘাবড়ে যাবার কি আছে? আমরা দেখছি, সমস্ত আমাদের হাতে আছে, জনগণ আমাদের পাশে আছেন। যদি তারা কিছু অন্যায় করে থাকেন, কিছু করে থাকলে, যতবড় অফিসারই হোন, আপনারা দেখেছেন আগেও আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। কিন্তু সেটা বিরোধীদলের সঙ্গে পরামর্শ করে করবো না। আমরা নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, যেভাবে চললে জনগণের উপকার হবে সেই ভাবে আমরা ব্যবস্থা নেব, কাজেই সেদিকে যেতে চাইনা। আর যেহেতু নতুন কোন কথা নেই, বারে বারে ওই মরিচঝাঁপির কথা, কাশীপুরের কথা, বর্ধমানের কথা উঠেছে। বর্ধমানে উনি (ভোলা সেন) নিজে গিয়েছিলেন। ভোলাবাবু এটাতো বললেন না, বললে ক্ষতি কি হত যে ওরা প্রথম পুলিসটাকে মেরে ফেললেন। তখন পুলিসের হাতে আর্মস (অস্ত্র-শস্ত্র) ছিলনা—ওদের ট্রেনে তুলেদিচ্ছিল দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাবার জন্য। উনি কতগুলি হাফ ট্রুথ (অর্ধসত্য) এবং কতগুলি অসত্য কথা বলে গেলেন। ওঁরা মরিচঝাঁপিতে লোকেদের উস্কাবার চেষ্টা করে ছিলেন; কিন্তু উস্কানো যায় নি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে এক লক্ষ কয়েক হাজার মানুষকে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওঁরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ ওঁদের মানছে না। কাজেই বাইরে থেকে মানুষ এনে—নারী পুরুষ শিশুদের নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছিলেন। এটাই কি তাঁদের দায়িত্ব।

তারপর অনেক স্পেসিফিক (নির্দিষ্ট) কেসের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে সমস্ত কিছু না পেলে আমি কিছুই বলতে পারব না। সেগুলি লিখিত ভাবে দিলে নিশ্চয়ই দেখব কি হয়েছে, না হয়েছে। সব নতুন ভাবে আবার হাওড়ার কথা এখানে তোলা হয়েছে। সেদিন হাওড়ার কথার উত্তর হয়ে গেছে। সেখানে মামলা হয়েছে। কাজেই মামলা যখন চলছে, ইনভেসটিগেশন (তদন্ত) যখন হচ্ছে তখন আমি আগে থেকে কি করে বলে দেব যে, সব প্রমাণ হয়ে গেছে? অথচ একজন আইনজীবী হয়ে ভোলাবাবু ওই সব কথা এখানে বলে বেরিয়ে গেলেন। এই সব দায়িত্বজ্ঞানহীন কথাবার্তা শুনলে আমাদের একটু আশংকা হয়। আগে প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের কাছে দিস্তা দিস্তা কাগজে চিঠি যেত। সেগুলি উনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমি সেগুলি দেখতাম। এখন সব দিল্লি চলে যাচ্ছে এবং সেসব সম্বন্ধে একবার জৈল সিং লিখছেন, একবার গান্ধী লিখছেন। আমি অবশ্য সেসবের জবাব দিচ্ছি। যে সব চিঠি আসছে এবং তার জবাব দিচ্ছি তা সব আমি পশ্চিমবাংলার জনগণকে ভারতবর্ষের জনগণকে দিয়ে দেব তাঁরা বুঝে নেবেন।

তবে ওই একটা ঘটনার কথা আমি বলি। বর্ধমানের যামুরিয়া না কোন্ জায়গার ঘটনা। সে সম্বন্ধে ইন্দিরা কংগ্রেসের কে একজন এম. পি. ইন্দিরা গান্ধীকে গিয়ে বলেছেন যে, ওখানে এক্স (প্রাক্তন) এম. এল. এ. এবং কংগ্রেসী লিডারের একমাত্র ছেলে খুন হয়ে গেছে, আর খুন যখন হয়েছে তখন নিশ্চয় সি পি আই (এম) করেছে। অথচ সেই কংগ্রেস লীডারের (নেতার) স্ত্রী কেঁদে কেটে আমার কাছে চিঠি লিখেছেন, আমরা জানি কারা খুন করেছে এবং আমরা ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক, আমাদের বিপক্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসেরই যারা আছে তারা খুন করেছে। যদিও সেই চিঠি অনুযায়ী আমি কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করি নি। কারণ, ইনভেসটিগেশন (তদন্ত) চলছে, আমরা চাই ইনভেসটিগেশন হোক। কিন্তু আমি তাঁদের বলব যে, ওই চিঠি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠান।

আমাদের পক্ষের লোকদের যেখানে মারা হচ্ছে, সেখানে কি হচ্ছে? আমি তাই সমস্ত লিস্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভোলাবাবুরা আবার বিপদে পড়লেই বলছেন, আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি করবে? এটা স্টেট সাবজেক্ট, রাজ্যের বিষয়। কাজেই ৩৬৫ ধারা অনুযায়ী এই সরকারকে বিতাড়িত কর।

যাই হোক, ভোলাবাবু নতুন ইন্দিরা মাহাত্ম্য গাইছেন। ইলেকশনের আগে উনি অন্য একটা কংগ্রেসে ছিলেন। এখন ইন্দিরা কংগ্রেসে চলে গেছেন। এইসব লোকের কি কোনো মূল্য আছে, চরিত্র আছে? নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য দল বদল করে চলে গেলেন, আর তাঁর কাছ থেকে এসব বক্তব্য শুনতে হচ্ছে।

জয়নাল আবেদিন (কংগ্রেস-আ) অনেক কথা বলেছেন। আমি সব কথার উত্তর দিতে পারব না। তবে আমি তাঁকে বলতে চাই যে, উনি অনেক ঘটনার কথার মধ্যে আবার বললেন, পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। কিসের

পক্ষপাতিত্ব? আপনি তো আমার কাছে হিসাব চাইতে পারতেন। একটা কোশ্চেন (প্রশ্ন) করুন, হিসাব চান যে কোন দলের তথাকথিত ক'জন ধরা পড়েছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করুন। আমি আবার বলছি, এভাবে সরকার চলে না। জয়নাল আবেদিন সাহেব আপনি নিজে কি করেছেন? আমি জানি সে সব নিশ্চয়ই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। এখন কোন কংগ্রেসে আছেন তাই বোঝা মুস্কিল। আপনি এখানে হঠাৎ ওই কোথায় মসজিদ দখল হয়ে গেছে ইত্যাদি বললেন। এসব ভয়ংকর কথা। মুসলমান ভাইবোনদের ধর্মীয় স্থান নিয়ে এইভাবে এখানে আলোচনা করা কি উচিত? এটাকে কি রাজনৈতিক মূলধন করা উচিত? আপনি তো আসতে পারতেন আমার কাছে। কত ব্যাপার নিয়েই তো আসেন। আপনার পরিবারের লোকেরা আমার কাছে চিঠি লিখেছে.........আপনার বাড়ির লোকেরা আমার কাছে আসছেন। তা কি আপনি জানেন? আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাই নি। এই সব ব্যাপারে বিশেষ করে জমির ব্যাপারে—জমিদারদের ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারি নি। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে, আমরা বিচার করবার চেষ্টা করছি, সুবিচার করতে যতটুকু পারি ততটুকু চেষ্টা করছি। ভুল ত্রুটি হয়তো কিছু হতে পারে কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে কংগ্রেসীরা গত ৩০ বছর ধরে সেই জিনিস করেছেন। আপনাদের কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো উচিত ছিল—মানুষ আপনাদের সাজা দিয়েছেন, এখন অন্য জায়গায় বাকি আছে।

আপনারা কি ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা এখানে ২-৪ জন মন্ত্রী হবার জন্য রাজনীতি করছিনা—আপনাদের মতন ঘর-বাড়ি তৈরি করার জন্য রাজনীতি করছি না। আমরা কমিউনিস্ট। আমরা বামপন্থী। আমরা যে লক্ষ্যে পৌছাতে চাই সেই লক্ষ্যে এখনও পৌছাতে পারি নি। আমরা সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে কাজ করছি। সত্যিকারের যাঁরা কৃষক, যাঁরা মজুর, যাঁরা মধ্যবিত্ত, যাঁরা ছাত্র-যুব-মহিলা তাঁদের যে সংগঠন আছে সেই সংগঠন আমরা গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। এ ছাড়া সমাজ বিপ্লব ঘটানো যায় না। এ ছাড়া আমূল পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা নেই। কাজেই এইসব ৩৬৫ ধারা দেখিয়ে কোন লাভ নেই। আমরা একটা লোকসভার, একটা বিধানসভার, পঞ্চায়েত এবং আবার লোকসভার নির্বাচনে জিতেছি। সেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের ঝড় উঠেছে বলে আমরা শুনেছিলাম, সেই ঝড় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবাংলার আকাশে। আর একবার ১৯৭১ সালে হয়েছিল—ইন্দিরা কংগ্রেস যেহেতু বাংলাদেশের লড়াইয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন সেইজন্য গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী জয়জয়কার শুনেছিলাম কিন্তু পশ্চিমবাংলার আকাশে কোন মেঘ দেখা যায়নি, পশ্চিমবাংলার আকাশে সেই ঝড় ওঠেনি। সেবারেও কংগ্রেসকে পরাজিত করেছিলাম যদিও বামপন্থী দলের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তথাপি কংগ্রেসীদের আমরা এই পশ্চিমবাংলায় পরাজিত করেছিলাম। ১৯৭২ সালে পরাজিত করতে পারি নি এই জন্যে যে, আপনারা, কংগ্রেসীরা চুরি জোচ্চুরি করে নির্বাচন করেছিলেন, বেলা ১১টার সময়ে নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর এবারে রাত ৯টা পর্যন্ত নির্বাচন হয়েছিল, যারা ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকেছিলেন তাঁরা রাত্রি আটটা ন'টা পর্যন্ত ভোট দিয়েছেন।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, গৌহাটী শাখার অভিনন্দন পত্র

[২৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কাছে অনুরোধ জানাই। আমরা চাই আমাদের আসাম ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার রক্তপাত থেকে মুক্ত হোক; ভাষা-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মেহনতী জনগণ আর ছাত্র-যুবকের ঐক্য অটুট থাকুক, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অটুট থাকুক, তা সুদৃঢ় হোক।

আজকের এই মিলন উৎসবে সমবেত বন্ধুদের সামনে আসামের সমগ্র সংগ্রামী জনতার মুখপত্র হয়ে একটা অনুরোধ রাখতে চাইছি: আসামে আজ গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা, মূল্যবোধ আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারের বিরুদ্ধে এক পরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। চক্রান্ত চলছে ভারতের সংগ্রামী জনগণের সংগ্রামী ঐক্যের বিরুদ্ধে। এই চক্রান্তকে ধ্বংস করতে আসামের গণতন্ত্রকামী, মানবতাবাদী আর প্রগতিবাদী শক্তিগুলি যে মরণপণ যুদ্ধ করছেন, সেই যুদ্ধে আপনারাও সামিল হোন, ঐক্য আর সম্প্রীতি সুদৃঢ় করতে এগিয়ে আসুন আর অসমীয়া মানুষের ন্যায়-সংগত ভয় আর সন্দেহ যাতে ঐক্য বিরোধী আর সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলো ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য অসমীয়া জনসাধারণের চিন্তা চেতনা বৃদ্ধির জন্য সহায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। প্রকৃত সাথী সুলভ মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটুক সেই কামনা নিয়ে—

ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষক ঐক্য জিন্দাবাদ
গণসংস্কৃতি—জিন্দাবাদ
অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিতে শত পুষ্প বিকশিত হোক

গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে ২৩-২৯শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব '৭৯-'৮০ উদ্বোধন করে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী

কমরেডস্,

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে, শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে পশ্চিমবাংলার যুবসমাজ আজ এই সম্মেলনে সমবেত। আমি তাদের প্রতি জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

সাম্রাজ্যবাদের সে যৌবন আজ আর নাই, যখন তারা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, কোন পশ্চাদপদ দেশকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রাস করে, পৃথিবীকে নূতনভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে পারতো। পৃথিবীর একটি বড় অংশে ধনতন্ত্রের অবসানের মধ্য দিয়ে, শোষণ-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং একটি সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে ওঠার ফলে, পৃথিবীর শক্তিসমূহের ভারসাম্য ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে ঝুঁকছে। তাই, পিছু হটতে হচ্ছে,

যুব উৎসবের উদ্বোধন করছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী

সাম্রাজ্যবাদকে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের প্রধান পাণ্ডা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। প্রতিনিয়ত পাল্টাতে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রাম কৌশলও।

প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মলাভের শুরু থেকেই, সাম্রাজ্যবাদীদের রণকৌশল ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'ঘেরাও করে কোনঠাসা করা', একঘরে করা, সামরিক হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্য দিয়ে তাকে গলাটিপে হত্যা করে, পৃথিবীকে কমিউনিজম-এর বিপদ থেকে মুক্ত করা। তাই, সেদিন যুদ্ধের উত্তেজনা ছিল, বার্লিনকে কেন্দ্র করে, প্রধানতঃ ইয়োরোপে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে চীন ধনতান্ত্রিক শিবির থেকে বের হয়ে আসার পর থেকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রণকৌশল ছিল, কমিউনিজমের প্রসার রুখবার জন্যে, তাকে 'গণ্ডীবদ্ধ' করে রাখার জন্য, মহাচীনের চারপাশে সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি তৈরী করা, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চালিয়েছে ভিয়েৎনাম-লাওস-কাম্বোডিয়াতে, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ করেছে—সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উপর।

আজ কিন্তু ইয়োরোপে সে উত্তেজনা নাই। ওয়ারসো সম্মেলনে পোলাণ্ডের সীমানা স্বীকৃত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্র সেখানে ব্যর্থ। উত্তেজনা কমেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও। ভিয়েৎনামের দেশভক্ত বীর জনগণ—পর পর তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাস্ত করে, নিজেদের দেশকেই শুধু মুক্ত করেন নি, সমগ্র অঞ্চল থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের পিছু হটতে বাধ্য করেছেন। মুক্ত হয়েছে লাওস, মুক্ত হয়েছে কাম্বোডিয়া।

সাম্রাজ্যবাদীদের এখন শেষ ঘাঁটি হয়ে উঠেছে—পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা, আমাদের এই উপমহাদেশ। এই অঞ্চলের সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমবেত হচ্ছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতাকাতলে, কিন্তু তবু দমন করা যাচ্ছেনা—প্যালেস্টাইনের মুক্তিকামী সংগ্রামীদের। ইজরাইলের যুদ্ধ-ঘাঁটি, মিশরের বিশ্বাস ঘাতকদের কোন কাজে লাগ্‌ছে না।

তেমনি ধ্বস নামছে ইরানে। ইরানের ফ্যাসিস্ট শাহ—বিতাড়িত হবার পর থেকে, তৈল অঞ্চলের এই মার্কিন ঘাঁটিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট আজ আর নির্ভরযোগ্য নয়। গ্রীস ও তুরস্কের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে।

আফ্রিকার দেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্ব-ব্যাপী মৈত্রী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের পিছু হটা যেমন লক্ষ্যণীয়, তেমনি উল্লেখযোগ্য তাদের টিকে থাকার জন্য নানা-ধরনের বিভেদ ও উস্কানীমূলক ষড়যন্ত্র।

ঠিক যে সময়ে ধনতান্ত্রিক সংকট আরও তীব্রতা লাভ করছে, তৈল-সংকট বাড়ছে, প্রতিটি ধনতান্ত্রিক দেশে মেহনতি মানুষ বিনা প্রতিবাদে অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা বহন করতে অস্বীকার করে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছে, ঠিক সেই সময়ে আফগান জনগণ সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন তাদের দেশ শাসনের ক্ষমতা। জন্মদিলেন এমন একটি বিপ্লবী সরকারকে, যারা আফগানিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করতে অস্বীকার করছেন। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত এই উপমহাদেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধঘাঁটি করে, 'গালফ্' অঞ্চলের তৈল এলাকার উপর প্রাধান্য বিস্তার করার যে পরিকল্পনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ রচনা করেছিল, তা সংগ্রামী আফগান জনগণের হাতে বাধা-প্রাপ্ত হচ্ছে দেখে তারা আজ ক্ষুব্ধ।

যেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যে কোন ষড়যন্ত্র বিস্তৃত করার ক্ষেত্র তৈরী। যেখানে সামন্ততন্ত্র শক্তিশালী, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রদায়িক, বিভেদপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী এজেন্টরা সক্রিয়। তাই, আফগানিস্তানের বিপ্লবের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। আধা-সামরিক শাসনে, পাকিস্তানের জনগণ হারিয়েছেন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই সেখানকার শাসকগোষ্ঠী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ডেকে নিয়ে আসছেন—আফগান উদ্বাস্তুদের স্বার্থ রক্ষার নাম করে, তাদের সশস্ত্র করে, আফগানিস্তানে প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহকে অস্ত্র সাহায্য দিতে। পাকিস্তানে ৪০০ কোটি ডলারের অস্ত্র যাচ্ছে—শুধু আফগানিস্তানের স্বাধীনতা নয়, পাকিস্তানী জনগণের বিরুদ্ধে, ভারত সমেত অন্যান্য সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের উপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। আফগানিস্তানে "ইসলাম বিপন্ন" বলে পাকিস্তানে যারা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে সমবেত করতে আজ ব্যস্ত, তারাই সেদিন "ইসলাম বিপন্ন" বলে চীৎকার তুলেছিলেন—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে রুখবার জন্য, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে।

সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই সকল ষড়যন্ত্র আফগানিস্তানের প্রশ্নে জনগণের সামনে যতখানি ধরা পড়েছে, ঠিক ততখানি কিন্তু তা' ধরা পড়ে নি—যখন সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে তার থাবা বিস্তার করেছে, নয়া সাম্রাজ্যবাদী কৌশল অবলম্বন করে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জাল বিস্তার করতে।

যতদিন ধনতন্ত্র আছে, প্রত্যক্ষভাবে হোক, আর পরোক্ষভাবে হোক ততদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নয়া ঔপনিবেশিক নীতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে—প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সৈনিককে। পৃথিবীর সেরা ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের শোষণের জাল

বিস্তার করেছে,—তৃতীয় দুনিয়ার সর্বত্র আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন প্রভৃতি মাধ্যমে, তাদের প্রায় ১১ হাজার শাখা এবং ৮২ হাজার উপ-শাখা বিস্তার করে। প্রায় ৫ লক্ষ মার্কিন সৈন্য বিদেশে মোতায়েন করে, দিওগো-গার্সিয়ার মত অসংখ্য ঘাঁটি সৃষ্টি করে। সমুদ্রে সমুদ্রে যুদ্ধজাহাজের টহলদারী বিস্তার করে সেই শোষণ ব্যবস্থাকে পাহারা দেয়া হচ্ছে। বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থার শাখা, উপ-শাখার অধিকাংশের জন্মভূমি আমেরিকা-বৃটেন। বিশ্বের বিভিন্ন অনগ্রসর এলাকায় বিদেশী মূলধন কিভাবে সেসব দেশের শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করে এবং সেই বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ কিভাবে প্রতিবছর বাড়ছে—তাও লক্ষ্য করতে হবে। ১৯৭০-৭১-এ তার পরিমাণ যেখানে ছিল সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার, ১৯৭৭-৭৮-এ তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে, ১০৫ বিলিয়ন ডলার। এই সময়ের মধ্যে বিদেশী ব্যাঙ্ক প্রভৃতির লগ্নি বেড়েছে—তিন বিলিয়ন থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলারে। তৈল প্রভৃতির মত সবচেয়ে মূল্যবান পণ্যের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের কব্জা সম্প্রতি আরো শক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। অনগ্রসর দেশগুলি সরবরাহ করছে কাঁচামাল, আর কারখানা-জাত পণ্য আসছে—ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে। সাম্রাজ্যবাদীরা অনগ্রসর দেশগুলির কাঁচামাল নিচ্ছে অল্প দরে, আর তাদের শিল্পজাত পণ্য বিক্রি করছে—অতিরিক্ত মুনাফা নিয়ে। এই অসম বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৭৭টি উন্নয়নকামী দেশের প্রতিনিধিদের দিল্লী সম্মেলনে অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা এতখানি অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন।

মনে রাখতে হবে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কোন আর্থিক সাহায্য, বহুজাতিক কর্পোরেশন বা ব্যাঙ্ক মাধ্যমে মূলধন খাটানো, নিছক ব্যবসা নয়, রাজনীতিবর্জিত ঘটনা নয়। এর মধ্য দিয়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার বৈদেশিক নীতিকে কার্যকরী করছেন। এই সাহায্যের উপর নির্ভরশীল বলেই ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। একথা ঠিক যে ভারতের শাসকগোষ্ঠী কখনো কখনো সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্য গ্রহণ করেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির যে বিরোধ আছে—তার সুযোগ গ্রহণ করেন, ভারতে ধনতান্ত্রিক শাষণব্যবস্থা আরো শক্ত করতেই বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে বেশী করে আগ্রহ দেখান, বৈদেশিকনীতি তার দ্বারা সাময়িকভাবে প্রভাবিত হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের উপর নির্ভর না করে, দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার নীতি গ্রহণ করছেন সম্পূর্ণ স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা তাদের পথ নয়, তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়।

ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হলো —"রাজনৈতিক অস্থিরতা"—যা শাসকগোষ্ঠীকে গণতন্ত্রকে আঘাত করতে, দুর্বল করতে সাহায্য করে, সাম্রাজ্যবাদের উপর শাসকগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতা আরো বাড়িয়ে দেয়।

সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু মূলধন নিয়ে আসে না, কোন রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে তাকে আমদানী করতে হয় -প্রতিক্রিয়াশীল অপ-সংস্কৃতি ও মতবাদ। কোথাও সে মতবাদ আসে উগ্র-জাতীয়তাবাদের পোষাকে, কোথাও বিচ্ছিন্নতাবাদের মুখোস পরে, কোথাও সাম্প্রদায়িকতার আবরণ নিয়ে। কিন্তু পোষাক যত অভিনব হোকনা কেন, এইসকল বিভেদমূলক কার্যকলাপের মধ্যদিয়েই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া চক্রগুলি সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দা দপ্তরের (সি আই এ'র) টাকায় সক্রিয় হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়—যা আমরা দেখতে পাচ্ছি—ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। আনন্দমার্গ ধর্মীয় সংগঠনের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, এমন কি বৃটিশ শাসনের দিনেও এমন ব্যাপক ছিল না—যেমন আজ দেখা যাচ্ছে, এই উপমহাদেশে। অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা যেমন বাড়ছে, বেকার যুবসমাজের মধ্যে তেমনি বাড়ছে হতাশা—যা এই সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য চমৎকার জমি তৈরী করে দিচ্ছে।

ভারতের যুবসমাজের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য উজ্জ্বল। যখন যেখানে যেদেশে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ঘটেছে, সেখানে ভারতের যুবশক্তি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, মুক্তিকামী জনগণের সমর্থনে। ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে আন্তর্জাতিক ঐক্য আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, যে আন্তর্জাতিক কর্তব্যবোধ আমরা দেখেছি,—ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে, আজও সেই আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে—আফগানিস্তানের জনগণের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে আফ্রিকা, এশিয়ার জনগণের প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এসে। এই দায়িত্ব আমরা তখনই কার্যকরীভাবে পালন করতে পারবো—যখন আমরা রক্ষা করতে পারবো আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে, যখন আমরা রুখতে পারবো স্বৈরচারী প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহকে। গণতন্ত্রকে রক্ষা না করে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী না করে সাম্রাজ্যবাদকে রোখা যায় না—পৃথিবীর ইতিহাস তাই প্রমাণ করে।

সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তারা পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এখনো বিপজ্জনক ভূমিকা নিতে সমর্থ হচ্ছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

[শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায়]

লেনিন—এক মহান জীবনের কয়েকটি দিক

রথীন গঙ্গোপাধ্যায়

"তিনি (লেনিন) ছিলেন সর্বোচ্চ শ্রেণীর নেতা—এক পার্বত্য ঈগল, যিনি কোন সংগ্রামেই ভয় পাওয়ার পাত্র ছিলেন না এবং যিনি রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের অজানা পথে পার্টিকে অসম সাহসিকতার সঙ্গে পরিচালিত করে নিয়ে গেছেন।"

—স্তালিন

১৮৭০ সাল, ২২শে এপ্রিল ভলগার তীরে সিমবিরস্ক শহরে (বর্তমানে উলিয়ানভস্ক) ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের জন্ম। এই ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভই মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈপ্লবিক মতবাদের প্রতিভাশালী উত্তরসাধক, প্রথম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক এবং বিশ্বের মেহনতী মানুষের প্রিয়তম নেতা ও শিক্ষক লেনিন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীই আজ আমরা আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে পালন করছি।

পিতা—ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ। প্রথম জীবনে ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পরে স্কুল পরিদর্শক ও শেষ জীবনে, সিমবিরস্ক প্রদেশের স্কুল পরিচালক। শিক্ষাবিস্তারে দারুণ আগ্রহ। কিন্তু সাধ থাকলে কী হবে, সাধ্য নেই। মা—মারিয়া আলেকসান্দ্রভনা বাড়িতে বসে লেখাপড়া করলেও কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানতেন। ভালবাসতেন সাহিত্য ও সংগীত।

উলিয়ানভ পরিবারের ছয়টি ছেলেমেয়ে। ভ্লাদিমির তৃতীয় সন্তান—আন্না, আলেকসান্দার, ভ্লাদিমির, ওলগা, দমিত্রি ও মারিয়া। চঞ্চল হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল শিশু ভ্লাদিমির। সবাই ডাকে ভলোদয়া বলে। খেলাধুলোয় তার যেমন ঝোঁক পড়াশুনায় তেমনি তুখোড়।

সে সময় রাশিয়ায় পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। গড়ে উঠছে কলকারখানা। তাহলেও টিঁকে ছিল ভূমিদাস-প্রথা। শহরে ও গ্রামে চলেছে জারের ভীষণ অত্যাচার। গরিব চাষীর পেটে অন্ন নেই। পেয়াদা এসে তাদের গরু বাছুর ধরে নিয়ে যায়। মজুরদের কষ্ট হয়ে ওঠে অসহনীয়। বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের কাজের ঘণ্টা। ধর্মঘট করে মজুররা। জারের পুলিস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উপর।

ঐ সব ঘটনা শিশু ভলোদয়ার অন্তরে দাগ কেটে যায়। খেলার সাথী ভেরা ও ইভানের কাছে শোনে গরিব চাষীদের কী কষ্টে দিন কাটে। ভলোদয়ার ভাবুক মনে তার ছাপ পড়ে। সারা জীবনে তা সে ভুলতে পারে না।

১৮৮৬। বাবা মারা গেলেন, নিতান্ত আকস্মিকভাবে। বড় বোন আন্না ও বড় ভাই আলেকসান্দার পড়ে সেন্ট পিটার্সবুর্গে। ভলোদয়াই এখন বাড়ির কর্তা। মায়ের কষ্ট লাঘব করার জন্য মনের দুঃখ চেপে হেসে হেসে কথা বলে। সবসময় মায়ের কাছে কাছে থাকে।

'বড় হয়ে সাশা-দার (দাদা আলেকসান্দার) মতো হব।' ভলোদয়ার চোখে সাশা-দা ছিল যেন এক রূপকথার বীর। জারের অত্যাচারে ছাত্ররা তখন ভীষণ বিক্ষুব্ধ। অত্যাচারী জারকে হত্যা করতে হবে—গুঞ্জন চলে ছাত্রদের মধ্যে। সাশা তাদের নেতা।

ভলোদয়া তখন স্কুলে। খবর এল দাদা ধরা পড়েছে। আন্নাও রেহাই পায় নি। ছুটে গিয়ে মাকে খবর দিল। মার বিছানা-পত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। স্টেশন থেকে ফেরার পথে ভলোদয়ার মনে অনেক কথাই জাগে—কেন সাশা-দা এমন কাজ করল? এ কি ঠিক পথ?

মা পিটার্সবুর্গ থেকে ফিরে এলেন নিদারুণ খবর নিয়ে—সাশাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ভলোদয়া কেঁপে উঠল। প্রতিজ্ঞা করল, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে সে অংশ নেবেই। সেটা ছিল ১৮৮৭ সালের মে মাস।

তরুণ ছাত্রনেতা

দাদার মৃত্যু ভ্লাদিমিরকে কঠিন করে দিয়ে গেল। সে বছরই সে চলে যায় কাজানে কলেজে পড়তে। এবার সে যোগ দিল পুরোপুরি ছাত্র আন্দোলনে। সতের বছরের তরুণ ছাত্রনেতা। পুলিস ধরে নিয়ে গেল তাকে। বিচারক বিদ্রূপ করে বলল, 'ছেলেমানুষ! এ পাগলামী কেন? দেখছ না তোমাদের বিরুদ্ধে কত বড় বাধা, নিরেট পাথরের প্রাচীর। একে ভাঙার দুঃসাহস করে লাভ কী?'

ভ্লাদিমির শান্ত ও নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিল, 'জীর্ণ প্রাচীর, এক ধাক্কায় সব ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।'

হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত। মায়ের অনুরোধে বিচারক ভ্লাদিমিরকে ককুসকিনো-তে (বর্তমানে লেনিনো গ্রাম) তার দিদি আন্নার কাছে নির্বাসিত করল। তিন বছর ভ্লাদিমির নজরবন্দী রইল তার দাদা মশায়ের পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে। এখানে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল চাষীজীবনের সঙ্গে।

এরপর ভ্লাদিমির চেষ্টা করল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে, কিন্তু অবাঞ্ছিত ব্যক্তির তালিকায় তার নাম

থাকাতে অনুমতি দেওয়া হল না। চার বছরের পাঠ্য-সূচী দেড় বছরের মধ্যে নিজে নিজেই পড়ে পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করল ভ্লাদিমির। ওকালতি শুরু করল। কিন্তু সে আর ক'দিন।

ভ্লাদিমির এখন ২৩ বছরের যুবক। কক্সাকিনোতে থাকতে তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেন। ভ্লাদিমির এখন পুরোদস্তুর বিপ্লবী। দাদার পথ নয়, মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষার মধ্যে তিনি তাঁর পথ খুঁজে পেয়েছেন, অত্যাচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে গেছে তাঁর সামনে।

যোগ দিলেন মার্কসবাদী চক্রে। গড়ে উঠল "শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিসংগ্রাম সমিতি"। জারের পুলিস ওৎ পেতে আছে। পেছনে চলে সব কাজ। গোয়েন্দার চোখ এড়িয়ে চলাফেরা। মাটির নিচে ছাপাখানা। এখান থেকে হাজার হাজার ইস্তাহার ছাপা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়ে শ্রমিকরা তরিতরকারির ঝুড়ি নিয়ে হাটে-বাজারে যায়। তার নিচে লুকিয়ে নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে তারা বিলি করে সেই ইস্তাহার।

১৮৯২ সালে ভ্লাদিমির সামারা সদর আদালতে উকিল হিসাবে নাম লেখান। কিন্তু ওকালতি তিনি করতে পারেন নি। নিজের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য তিনি নিয়োগ করলেন মার্কসবাদ অধ্যয়নে, বিপ্লবের প্রস্তুতিতে। যোগাযোগ করলেন ভলগা তীরের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে। মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক সংগঠনের পথে যে বাধা সৃষ্টি করেছিল উদারনীতিক ও সংস্কারবাদীরা, তাদের মুখোশ খুলে দিতে লেখনী চালান। লেখেন 'জনগণের বন্ধু' কারা এবং কী ভাবে তারা সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে লড়ে বইখানি ছাপা ও প্রচারিত হয় গোপনে। কপির সংখ্যা বেশি ছিল না। 'হলদে খাতা' নামে বইটি হাতে হাতে ফিরত, তুমুল তর্ক ও উত্তেজনা জোগাত।

নাদেঝদা ক্রুপস্কায়ার সাথে পরিচয়

১৮৯৪ সালে ভ্লাদিমিরের পরিচয় হল নাদেঝদা কনস্তান্তিনোভনা ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে ক্রুপস্কায়া ছিলেন নেভস্কি ফটকের ওপারে শ্রমিকদের রবিবাসরীয় সান্ধ্য স্কুলের শিক্ষিকা। এ শ্রমিকচক্রের পরিচালনা করতেন ভ্লাদিমির। এভাবে তাঁর সঙ্গে ক্রুপস্কায়ার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ক্রুপস্কায়ার স্মৃতিকথায় আছে, "শ্রমিকদের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার প্রতিটি ব্যাপারেই ছিল ভ্লাদিমির ইলিচের আগ্রহ। বিভিন্ন দিক থেকে তিনি চাইতেন শ্রমিকদের সমগ্র জীবনটাকে ধরতে, সেই জিনিসটার খোঁজ করতেন যার হদিশ পেলে সবচেয়ে ভালোভাবে বিপ্লবী প্রচার নিয়ে হাজির হতে পারা যায় শ্রমিকদের কাছে"।

পিটার্সবুর্গে শ্রমিকদের মধ্যে ভ্লাদিমির হয়ে ওঠেন সংগঠক ও নেতা। তাঁর লেখা পুস্তিকা ও প্রচার-পত্রগুলি জনগণের মধ্যে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে, এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। লেখার প্রাঞ্জলতা আনবার জন্য সে সময় তিনি প্রায়ই কথাসাহিত্যের আশ্রয় নিতেন। 'নতুন কারখানা আইন' পুস্তিকায় তিনি 'সিংহের শিকার' গল্পটি তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, ওভারটাইমের নতুন নিয়মটায় সিংহের মাংস ভাগ করার কথা মনে পড়ে। "প্রথম ভাগটা সে ন্যায্য মতে নিজেই নিল। দ্বিতীয় ভাগটা নিল এজন্য যে সে পশুর রাজা। তৃতীয় ভাগটা নিল কারণ সে সবার চেয়ে বলবান, আর চতুর্থ ভাগটার দিকে যে থাবা বাড়াবে, তার আর প্রাণে বাঁচতে হবে না।" মজুরদের উপর শোষণ ও লুণ্ঠন চালাবার সময় পুঁজিপতিরাও ঠিক তাই করে।

১৮৯৫ সালে পশ্চিম ইউরোপীয় আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ভ্লাদিমির বিদেশে যান। সুইজারল্যান্ডে প্লেখানভের সঙ্গে দেখা করে 'রাবোৎনিক' (শ্রমিক) নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করা হবে ঠিক হয়। প্যারিসে মার্কসের জামাতা, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী পল লাফার্গের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের সঙ্গে দেখা করবার খুব ইচ্ছা ছিল তাঁর, কিন্তু এঙ্গেলস তখন ছিলেন গুরুতর অসুস্থ। সুটকেসের গোপন-তলায় মার্কসবাদী সাহিত্য লুকিয়ে নিয়ে তিনি পিটার্সবুর্গে ফিরে আসেন।

পিটার্সবুর্গ জেলে—সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে

বিপ্লবী কর্মীদের পরিশ্রমের ফল শীঘ্রই ফলল। ১৮৯৬ সালে সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে পিটার্সবুর্গে সুতাকল শ্রমিকরা ধর্মঘটে নামল। প্রচণ্ড আঘাত হানল জার সরকার। গ্রেপ্তার হলেন ভ্লাদিমির ও তাঁর বহু সহকর্মী। 'রাবোচেয়ে দেলো' (শ্রমিক আদর্শ) পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হস্তগত করল পুলিস। ভ্লাদিমিরকে নিয়ে যাওয়া হল পিটার্সবুর্গ জেলে। এই জেলে বসেই তিনি লেখেন মার্কসবাদী পার্টির প্রথম খসড়া কর্মসূচী। বই ও পত্রিকার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে কালির বদলে দুধ দিয়ে তিনি লিখতেন ও বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। আগুনের উপর ধরতেই দুধের লেখা স্পষ্ট হয়ে উঠত। পরদিন সেই লেখা ইস্তাহার হয়ে ছড়িয়ে পড়ত সারা শহরে। রুটি দুধে ভিজিয়ে নিয়ে দোয়াত তৈরি করতেন তিনি। আর যেই সেলের গরাদের সামনে পায়ের শব্দ হত, অমনি তা খেয়ে ফেলতেন। পরিহাস করে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'জানো, ছয়টা দোয়াত আজ আমাকে খেতে হয়েছে।'

ভ্লাদিমির পিটার্সবুর্গ জেলে কাটান প্রায় ১৪ মাস। এখানে বসেই তিনি শুরু করেন তাঁর বিখ্যাত বই "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ।" দিদি আন্না তাঁর প্রয়োজনীয় বই জেলে পৌঁছে দিতেন। ১৮৯৭ সালের

ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে তিন বছরের জন্য সাইবেরিয়ার নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রেললাইন থেকে শত-শত কিলোমিটার দূরে এক অজ সাইবেরীয় গ্রাম শুসেনস্কয়ে-তে থাকা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। তবু এরই মাঝে তিনি পড়াশুনা ও লেখার কাজ চালিয়ে যেতেন। স্কেটিং করতেন, শিকারে যেতেন, দেখা করতেন আশেপাশে নির্বাসিত বন্ধুদের সঙ্গে। আর চিঠি লিখতেন এন্তার। এ সম্পর্কে আন্না ইলিনিচনা লিখেছেন, "চিঠিগুলিতে বিষাদ বা নালিশের কোন চিহ্ন ছিল না, বরং তার বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা থেকে আনন্দ উপচে পড়ত, যে কোন কাজের পক্ষে তা ছিল সেরা দাওয়াই।" চাষীরা তাঁর কাছে আসত, অভাব-অনটনের কথা জানাত, পরামর্শ ও সাহায্য চাইত। পরে ভ্লাদিমির সে সব কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, 'যখন সাইবেরিয়ায় ছিলাম, তখন আমাকে উকিল হতে হয়েছিল, অবশ্য আণ্ডারগ্রাউণ্ড উকিল।'

এক বছর পর শুসেনস্কয়ে গ্রামে নির্বাসিত হয়ে এলেন নাদেঝদা ক্রুপস্কায়া। ভ্লাদিমিরের বাগ্‌দত্তা বধূ হিসাবে তাঁকে এখানে এসে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়। বিয়ে হয় তাঁদের এখানেই।

নির্বাসন থাকাকালে ভ্লাদিমির লেখেন তিরিশটিরও বেশি রচনা। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের কর্তব্য"। "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ" বইখানি তিনি এখানেই শেষ করেন। বইটি হল রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মার্কসের 'পুঁজি'র পূর্বানুসরণ।

দূর-নির্বাসনে থেকেও তিনি শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এ সময় ধর্মঘট ও শ্রমিক বিক্ষোভের খানিক সাফল্যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের একটা অংশ শ্রমিকদের বোঝাতে শুরু করে, 'কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাও। রাজনৈতিক সংগ্রামটা বুর্জোয়াদের ব্যাপার।' 'অর্থনীতিবাদীদের' এই কার্যকলাপকে ভ্লাদিমির গুরুতর বিপদ বলে মনে করলেন। এরা শ্রমিক শ্রেণীকে ঠেলছিল বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপসের পথে, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকাকে ছোট করে রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে সরিয়ে দিয়ে। এই সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের মনোভাব নিয়ে তিনি মার্কসবাদী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা করেন। প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয় একটি রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রকাশের উপর, যে পত্রিকাটি শুধু প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, হবে সংগঠকও। মেলাতে হবে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের স্থানীয় চক্র ও গ্রুপগুলিকে একক সংগঠনে।

১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে ভ্লাদিমির সস্ত্রীক শুসেনস্কয়ে ছাড়লেন। রাজধানী পিটার্সবুর্গে আসার তাঁর উপায় ছিল না। পুলিসে ধরবে। তাই আশ্রয় নিলেন তিনি পাশের একটি ছোট শহর পস্কভ-এ। পত্রিকা প্রকাশের জন্য এবার তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। পুলিসের উপদ্রবে রাশিয়ায় তা বের করা অসম্ভব। তাই বিদেশ থেকে তা প্রকাশের সংকল্প করলেন। এই উদ্দেশ্যে পুলিসের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি মস্কো, পিটার্সবুর্গ, রিগা, সামারা, নিঝনি-নভগোরদ ও স্মলেনস্ক সফর করলেন। গ্রেপ্তার হলেন পিটার্সবুর্গ আসার পথে। তবে শীঘ্রই তিনি সেবার ছাড়া পান।

ইস্‌ক্রা প্রকাশিত হল

বহু কষ্টে সীমান্ত পার হয়ে ১৯০০-র ১৬ই জুলাই তিনি এলেন জার্মানীতে। শুরু হল তাঁর দেশান্তরী জীবন। সারা রুশ বিপ্লবী পত্রিকার নাম হয় "ইস্‌ক্রা" (স্ফুলিঙ্গ)। সম্পাদকমণ্ডলী আস্তানা নিলেন মিউনিকে। কাগজটির প্রতি সংখ্যায় বড় হরফে লেখা থাকত, "স্ফুলিঙ্গ থেকেই একদিন আগুন জ্বলে উঠবে।" পরে ঘটলও তাই। রাশিয়ায় বিপ্লববহ্নি লেলিহান হয়ে উঠল। আর তাতে ভস্মীভূত হল জারস্বৈরাচার ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সমস্ত মন তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন এই পত্রিকা প্রকাশে। সে-সময় এক চিঠিতে তিনি লেখেন, "আমাদের সমস্ত জীবন-রস ঢালা চাই প্রসব-আসন্ন বাচ্চাটির পুষ্টির জন্য।" বাস্তবিকই 'ইস্‌ক্রা' ছিল তাঁর প্রিয়তম সন্তান।

রাশিয়ার মধ্যে গড়ে উঠল ইস্‌ক্রার সহযোগী গ্রুপ, এজেন্টদের একটা জালি-বুনট। তারা কাগজটি ছড়াত, খবরাখবর পাঠাত, চাঁদা তুলত। রাশিয়ায় কাগজটি পাঠানো ছিল খুবই কঠিন। পুলিসের চোখ এড়াবার জন্য, ইস্‌ক্রা যে সব স্যুটকেসে পাঠানো হত, তাতে থাকত দুটো করে তল। বইয়ের মলাটের মধ্যে বাঁধাই করে, যাত্রী কমরেডদের কোটের অভ্যন্তরণের মধ্যে সেলাই করে পাঠানো হত কাগজটি।

১৯০১ সালের শেষের দিকে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর কিছু কিছু লেখার নিচে স্বাক্ষর দিতে শুরু করেন— লেনিন। ক্রুপস্কায়ার মতে, এ ছদ্মনাম নির্বাচনটা নেহাত আকস্মিক হতে পারে। ইস্‌ক্রার কাজ তিনি করতেন প্লেখানভের সঙ্গে। প্লেখানভ তাঁর লেখার তলে স্বাক্ষর করতেন ভলগিন (ভলগা নদীর নামে)। লেনিন হয়তো তাঁর ছদ্মনামটা নেন সাইবেরীয় মহানদী লেনা থেকে।

১৯০২ সালে প্রকাশিত হল লেনিনের বই "কী করিতে হইবে?" এতে তিনি প্রলেতারিয়ান মার্কসবাদী পার্টি গঠনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। রাশিয়ায় পার্টি রূপ গ্রহণের আগে থেকেই পশ্চিম ইওরোপে শ্রমিক পার্টি বর্তমান ছিল। এই সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি গড়ে উঠেছিল পুঁজিবাদের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ বিকাশের অবস্থায়। বিপ্লবী সংগ্রামের যোগ্যতা এদের ছিল না। এরা চলত আপসের পথে। এই সুবিধাবাদীরা বোঝাত যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়াই শোষণের অবসান ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। আসলে এরা হয়ে দাঁড়াত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দালাল। এদের বিরুদ্ধে, লেনিন বললেন, নতুন ধরনের

সংগ্রামী পার্টি, খাঁটি বিপ্লবী শ্রমিক পার্টি গড়তে হবে। এ পার্টিকে হতে হবে মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বে সমৃদ্ধ। "বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়"—বললেন লেনিন।

কৃষকদের কাছে পার্টির কর্মসূচী ব্যাখ্যার জন্য ১৯০৩ সালে লেনিন লিখলেন "গ্রামের গরিবদের প্রতি"। এতে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝান, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কী চায় এবং কেন শ্রমিকের সঙ্গে কৃষকের ঐক্য প্রয়োজন।

১৯০৩ সালের মে মাসে ইস্ক্রার পেছনে পুলিসের চর লাগে। সম্পাদকরা লণ্ডন থেকে কাগজ বের করবেন স্থির করেন। এপ্রিলে লেনিন এলেন লণ্ডনে। এখানে থাকতে তিনি ইংরেজ শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, তাদের আন্দোলনকে মন দিয়ে লক্ষ্য করতেন, প্রায়ই যেতেন শ্রমিক সভায়, আর অনেকটা সময় দিতেন ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারে, যেখানে একদা মার্কস পড়াশুনা করেছেন।

এরপর আবার ইস্ক্রার মুদ্রণ স্থানান্তরিত হল জেনেভায়। লেনিনও চলে এলেন সেখানে। রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি সক্রিয় অংশ নেন। তিনি ইস্ক্রার সম্পাদকীয় বোর্ডে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় কংগ্রেস প্রথম বসে ব্রুসেলসে, কিন্তু বেলজিয়ান পুলিসের হানার পরে অধিবেশন চলে লণ্ডনে। কংগ্রেসে ইস্ক্রাপন্থীরা সংখ্যায় বেশি থাকলেও বহু সুবিধাবাদী এসে ভিড় করেছিল। এদের বিরুদ্ধে লেনিন সতেজে সংগ্রাম চালান। বিপ্লবী কর্মসূচী, প্রলেতারিয়ান একনায়কত্ব, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতা—এইসব মূলে মার্কসবাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সুবিধাবাদীরা, কিন্তু তাদের সমস্ত অক্রমণই পরাস্ত হয়। লেনিনের সমর্থকরা অধিকাংশ (বলশিন্‌স্তভো) ভোট পান। সেই থেকে তাঁদের নাম হয় বলশেভিক। আর সংখ্যালঘুতে পরিণত (মেনশিন্‌স্তভো) সুবিধাবাদীদের বলা হয় মেনশেভিক। মেনশেভিকরা চায় পার্টিকে সুবিধাবাদের পথে টেনে নিতে। ফলে তাদের সঙ্গে চলে বলশেভিকদের একটা অবিশ্রান্ত লড়াই। ১৯০৩ সালের নভেম্বরে প্লেখানভ মেনশেভিকদের দলে ভিড়ে পড়েন, ইস্ক্রা মেনশেভিকরা দখল করে নেয়। লেনিন তার সম্পাদকীয় বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেন।

স্তালিন তখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। লেনিন তাঁকে চিঠিতে পার্টির অবস্থা এবং পার্টির জন্য তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। জেনেভা থেকে প্রকাশিত হল লেনিনের বই "এক পা আগে দু' পা পিছে"। মেনশেভিকদের প্রচারের বিরুদ্ধে লেনিন জোর দিয়ে বললেন, "ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া প্রলেতারিয়েতের আর কোন অস্ত্র নেই। পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী সচেতন বাহিনী।"

লেনিন পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। রাশিয়ায় বিপ্লবের পরিস্থিতি পরিণত হয়ে উঠছিল। প্রয়োজন ছিল মেনশেভিকদের বিভেদমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করার। পার্টির মধ্যে সংগ্রামে অধিকাংশ পার্টি কমিটিগুলি বলশেভিকদের পক্ষে চলে আসে। পার্টির বিপুল অংশ সংহত হয় লেনিনের পেছনে।

১৯০৫ সালের জানুয়ারিতে লেনিনের পরিচালনায় জেনেভা থেকে প্রকাশিত হয় একটি বলশেভিক পত্রিকা —"ভ্পেরিয়োদ"। এতে প্রকাশিত "পোর্ট আর্থারের পতন" প্রবন্ধে লেনিন বললেন, রাশিয়ায় বিপ্লব আসছে।

রুশ-জাপান যুদ্ধ থেকে ক্লান্ত সৈন্যরা ফিরে এসে দেখে ঘরসংসারের দুরবস্থা চরম। পিটার্সবুর্গে শ্রমিকরা ঠিক করল, জারের কাছে গিয়ে তারা সাহায্য চাইবে। সাহায্য অবশ্য দিল 'ত্রাণকর্তা' জার, তবে রুটি নয়, বন্দুকের গুলি। ১৯০৫ সাল ৯ই জানুয়ারি। দু' হাজার শ্রমিক সেদিন রুটি চাইতে এসে গুলিতে প্রাণ দিল। শ্রমিকরা প্রতিজ্ঞা করল, আর ভিক্ষা নয়, এবার দাবি। আর লড়াই করেই এ দাবি আদায় করবে তারা।

দূর প্রবাসে থেকে লেনিন সব কিছু লক্ষ্য করলেন। বুঝলেন তিনি, বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই অবিলম্বে কংগ্রেস আহ্বানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস বসল লণ্ডনে ১৯০৫ সালের এপ্রিলে। মেনশেভিকরা তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করল। জেনেভায় তারা ডাকল তাদের নিজেদের সম্মেলন, স্পষ্টতই এটা পার্টি ভাঙবার একটা পদক্ষেপ, বিপ্লবের মূল প্রশ্নগুলি আলোচিত হয় কংগ্রেসে। সভাপতি নির্বাচিত হন লেনিন। পেশ করেন তিনি একাধিক রিপোর্ট। সশস্ত্র বিপ্লব, সাময়িক বিপ্লবী সরকার, কৃষক আন্দোলনের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলির খসড়া তিনিই করেন। নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে থাকেন লেনিন। পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র "প্রলেতারি" পত্রিকার সম্পাদকও হন তিনি।

কংগ্রেসের পর লেনিন জেনেভায় ফেরেন। এ সময় প্রকাশিত হয় "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল" বইখানি। লেনিন রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে গণ্য করেন। এ বিপ্লবের লক্ষ্য—ভূমিদাস প্রথার বিলোপ, জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ। লেনিনই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুগের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, তার চালিকাশক্তি ও পরিপ্রেক্ষিতের বিচার করেন। তিনি মনে করেন, প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ হল বুর্জোয়া বিপ্লবকে সফল করা, কারণ এর ফলে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এগিয়ে

আসবে। বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি ও নেতা হতে হবে প্রলেতারিয়েতকেই। প্রলেতারিয়েতের সহযোগী হবে কৃষক। লেনিন দেখিয়ে দিলেন যে, মেনশেভিকদের লাইন হল বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন করার প্রয়াস। লেনিন এ বইয়ে লিখলেন, কৃষকের সঙ্গে একত্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জয়ী হবার পর প্রলেতারিয়েত তার শক্তি সংহত করে, গরিব কৃষক ও শহরের গরিবদের সম্মিলিত করে আঘাত হানবে পুঁজিবাদের উপর। এভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিণত হয়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে।

১৯০৫ সালের বিপ্লব

১৯০৫ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে পিটার্সবুর্গ ও অন্যান্য জায়গায় শ্রমিকরা ধর্মঘটে নামল। কৃষক আন্দোলনের ঢেউ উঠল। জুন মাসে কৃষ্ণসাগর নৌবাহিনীর "পতেমকিন" যুদ্ধ জাহাজে জ্বলে উঠল নৌসৈন্যের বিদ্রোহ। অক্টোবরে শুরু হল সর্বাত্মক রাজনৈতিক ধর্মঘট। বন্ধ হল কলকারখানা, ডাক ও তার অফিস। অচল হয়ে পড়ল দেশের জীবনযাত্রা। জার, জমিদার ও পুঁজিপতিরা সন্ত্রস্ত। জার সরকার ঘোষণা করল, সভাসমিতির স্বাধীনতা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকার দেওয়া হল। এ হল বিপ্লবের প্রথম জয়।

কিন্তু জারের এই ঘোষণা লেনিনকে ধোঁকা দিতে পারল না। তিনি স্পষ্ট বললেন, জারের ফাঁকা কথায় বিশ্বাস করো না। এখনও অনেক লড়াই বাকি। প্রস্তুত হও। সৈন্যদের দলে টেনে নিয়ে এসো। চাষীদের বুঝিয়ে এগিয়ে নাও। আরও ছড়িয়ে পড়ুক ধর্মঘট।

ঝড়ো দিনগুলির মধ্যে গড়ে উঠল গণ-রাজনৈতিক সংগঠন—শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। লেনিন বললেন, এগুলিই হবে আগামী দিনে মেহনতীদের রাষ্ট্রক্ষমতা। এ সময় রাশিয়া থেকে দূরে থাকা লেনিনের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ফিরে এলেন পিটার্সবুর্গে। আইনসঙ্গত বলশেভিক সংবাদপত্র "নভায়া ঝীজন" (নবজীবন) পরিচালনা করতে লাগলেন। জারের কাছ থেকে কিছু স্বাধীনতা আদায় হলেও লেনিনকে থাকতে হত পুলিসের চোখ এড়িয়ে। প্রায়ই পাসপোর্ট ও বাসা বদল করতে হত। কয়েকবার ফিনল্যান্ডেও চলে যেতে হয়েছিল।

বিপ্লব শীর্ষে পেঁছল ডিসেম্বরে মস্কো শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে। নয়দিন ধরে কয়েক হাজার সশস্ত্র শ্রমিক বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালায় জারের পুলিস ও কশাক সৈন্যদের বিরুদ্ধে। গোর্কি তখন মস্কোয় ছিলেন। তিনি এক চিঠিতে শ্রমিকদের এ লড়াইকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। মস্কোর পরই বিদ্রোহ জেগে উঠল অন্যান্য শহরে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন এ সব অভ্যুত্থান তেমন সংগঠিত ছিল না। জার তাই নির্মমভাবে তা দমন করে দিতে পারল।

অনেক নেতাই হাল ছেড়ে দিলেন। লেনিনের কিন্তু বুঝতে এতটুকু দেরী হয় নি যে বিপ্লবের এ শেষ পর্ব নয়, এটা শুধু প্রথম পর্ব। শ্রমিকদের তিনি বোঝালেন, প্রস্তুত হও, আমাদের এগোতেই হবে।

পিটার্সবুর্গ ছেড়ে লেনিন ফিনল্যান্ডে এসেছেন। এখানে তামারফর্সে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনেই তাঁর স্তালিনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে স্তালিন লিখেছেন, "সাধারণত 'মস্ত লোকেরা' সভায় আসেন একটু দেরি করে যাতে লোকে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে এবং 'মস্ত লোকটি' এসেছেন শুনলেই 'ঐ আসছেন, চুপ চুপ' ধ্বনির একটা সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু যখন শুনলাম, লেনিন অন্য প্রতিনিধিদের আগেই সম্মেলনে এসে এক কোণে বসে সাধারণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে নেহাত মামুলি কথাবার্তা বলছেন, তখন আমি কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম......পরে বুঝেছি, এই যে সরল বিনয়নম্র স্বভাব, সবার দৃষ্টির অগোচরে থাকার, নিজেকে জাহির না করার মনোভাব, লেনিন-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই সাধারণ মানুষের, নতুন জনগণের নতুন নেতার সব থেকে বড় গুণ।"

ফিনল্যান্ডেও জারের পুলিস লেনিনের পিছু নেয়। চলে যেতে হবে, অনেক দূরে, একেবারে স্টকহোমে। যেতে হবে ডিঙি করে, কিন্তু সব ডিঙির উপরই পুলিসের কড়া নজর। ঠিক হল দূরে একটা দ্বীপে গিয়ে ডিঙি নেওয়া হবে। সে দ্বীপ কয়েক মাইল দূরে বলটিক সাগরের মধ্যে। ডিসেম্বর মাস। জলের উপর বরফ জমেছে। তবে তখনও তা হেঁটে যাবার মতো শক্ত জমাট বাঁধে নি। এ অবস্থায় এ বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে যদি পায়ের তলায় বরফ একবার সরে যায়, তবে নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু উপায় নেই দেরি করার। পুলিস ধাওয়া করছে। একবার ধরতে পারলে একেবারে ছিঁড়ে খাবে। তাই দুজন চাষীকে নিয়ে লেনিন এগিয়ে চললেন। হঠাৎ পায়ের নিচে বরফ ভেঙে বসে যেতে আরম্ভ করল। মুহূর্তমধ্যে ঐ বরফের মতো ঠান্ডা জলে ডুবে মরতে হবে। কী বিশ্রীই না হবে সে মরণ! ভাবলেন লেনিন। টেনেহিঁচড়ে কোনমতে তাঁরা একটা শক্ত বরফের চাঙড় ধরে সে যাত্রা বেঁচে যান। সময়মতো এটা ধরতে পেরেছিলেন, তাই রক্ষা।

এভাবে লেনিন গিয়ে পেঁছলেন স্টকহোমে। যোগ দিলেন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির চতুর্থ (ঐক্য) কংগ্রেসে। বলশেভিকদের সঙ্গে মেনশেভিকদের তীব্র সংগ্রামের মধ্যে কংগ্রেস চলে। সে সময় অনেক বলশেভিক সংগঠন গণ-আন্দোলনে ব্যাপৃত ও দমনে বিপর্যস্ত থাকায় কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি। তাই মেনশেভিকরা সংখ্যাধিক্যে সমস্ত প্রধান প্রশ্নেই নিজেদের সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নিতে পারে। কেন্দ্রীয়

কমিটিতে সংখ্যাধিক্য লাভ ও কেন্দ্রীয় মুখপত্র দখলও সম্ভব হয় তাদের পক্ষে। কিন্তু মেনশেভিকদের এ জয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মার্কসবাদের বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের জয়ে দৃঢ় আস্থা ছিল লেনিনের। শীঘ্রই বলশেভিকরা মেনশেভিকদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারল।

১৯০৭ সালের মে মাসে লণ্ডনে বসল রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস। লেনিন তার সভাপতিত্ব করলেন, লিখলেন কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাব। বিপ্লবে বলশেভিক কর্মসূচীর যথার্থতা সমর্থিত হল কংগ্রেসে। মেনশেভিকদের পরাভূত করল বলশেভিকরা। আগস্টে লেনিন স্টুটগার্টে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে হাজির থাকেন।

১৯০৮ সালের জানুয়ারিতে লেনিন আবার জেনেভায় ফিরলেন। আত্মনিয়োগ করলেন নতুন উদ্যোগ নিয়ে নতুন বিপ্লব প্রস্তুতির কাজে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, এ পরাজয় কেবল সাময়িক। স্বৈরাচারের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রলেতারিয়েতের জয় অবশ্যম্ভাবী। পার্টির উদ্দেশে লেনিন তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "বিপ্লবের জন্য দীর্ঘ বহু বছর ধরে কাজ করছি আমরা। আমাদের লৌহদৃঢ় বলা হয়, খামকা নয়। প্রলেতারিয়ান পার্টি প্রথম অসাফল্যে হতোদ্যম হয় না, মাথা খারাপ করে না, হঠকারিতায় নামে না...এই পার্টিই পৌঁছবে বিজয়ে!" প্রতিক্রিয়ার সে বিষণ্ণ বছরগুলিতে লেনিন ভাবছিলেন আসন্ন বিজয়ের কথা। তখন প্রতিশোধ নিচ্ছিল জার সরকার। হাজার হাজার মানুষের প্রাণদণ্ড ও নির্বাসন দিয়ে ভেবেছিল সবকিছু স্তব্ধ করে দেওয়া যাবে।

জেনেভায় এসে লেনিন "প্রলেতারি" পত্রিকার নব সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন করলেন। টেনে আনলেন গোর্কি, লুনাচারস্কি ও অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকদের। পুনঃপ্রকাশিত হল "প্রলেতারি"—বিপ্লবের নতুন জোয়ারের জন্য পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীকে প্রস্তুত করে তোলার এক হাতিয়ার। লেনিন বললেন, প্রয়োজন অবৈধ পার্টি সংগঠনকে জোরদার করা ও সেই সঙ্গে প্রকাশ্য শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করা। শেখালেন, দুমায় প্রকাশ্য বক্তৃতা দেবার যে কোন সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়ে কাজ করা দরকার। এভাবে আইনসঙ্গত কাজের সঙ্গে মেলাতে হবে বেআইনী কাজ। বিপ্লবের সাময়িক পরাজয়ের পর মেনশেভিকরা আতঙ্কে পিছু হটে, শ্রমিক শ্রেণীকে বলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপস করতে। কেউ কেউ বলে পার্টি তুলে দেবার কথা। লেনিন দৃঢ়ভাবে বলেন, প্রলেতারিয়েতের পার্টির কর্তব্য এই সমস্ত সুবিধাবাদীদের ঝেড়ে ফেলা।

১৯০৮-এর এপ্রিলে লেনিন গেলেন ইতালির কাপ্রি দ্বীপে গোর্কির সঙ্গে দেখা করতে। লেনিন মন দিয়ে শোনেন গোর্কির বাল্য ও কৈশোরের কথা, তাঁর ভবঘুরে জীবনের কাহিনী; পরামর্শ দেন তা লিখতে। লেনিনের সঙ্গে আলাপ গোর্কির উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে।

১৯০৮ সালের শেষের দিকে "প্রলেতারি" পত্রিকার প্রকাশন স্থানান্তরিত হয় প্যারিসে। লেনিন ও ক্রুপস্কায়া এ উপলক্ষে সেখানে আসেন। শ্রমজীবী ফ্রান্সের জীবন লেনিন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন, যান শ্রমিক সভায়, শ্রমিক এলাকার থিয়েটারগুলিতে। এ সময় পার্টির ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে লেনিন তাঁর তাত্ত্বিক ভিত্তির ভাবাদর্শগত বিশুদ্ধতা, মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদের প্রতি আনুগত্যের সংগ্রামও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন। দর্শনের ক্ষেত্রে শোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। লেনিন এর জবাবে লেখেন, "বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা"। এঙ্গেলস বলেছিলেন, "বিজ্ঞানের প্রত্যেক নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদকেও নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে হবে।" লেনিন দর্শন নিয়ে 'মাথা ঘামান না' বলে প্লেখানভ বিদ্রূপ করতে খুব পটু ছিলেন বটে, কিন্তু সবাই জানেন যে লেনিনই এ গ্রন্থে সে কর্তব্য পালন করেছেন, প্লেখানভ তা করতে সাহস পান নি। বইটিতে লেনিন মার্কসবাদী দর্শনের বিরোধীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।

শুধু যে লিকুইডেটরদের (যারা পার্টি তুলে দিতে চায়) মতো প্রকাশ্য সুবিধাবাদীদের সঙ্গেই লেনিন আপসহীন সংগ্রাম চালান তাই নয়, তিনি লড়েন তাদের বিরুদ্ধেও যারা নিজেদের সুবিধাবাদ চাপা দিত বিপ্লবী বুলির আড়ালে। পরে লেনিন " 'বামপন্থী' কমিউনিজম —শিশুসুলভ রোগ" (১৯২০-এ প্রকাশিত) বইয়ে লেখেন যে, বলশেভিক পার্টি তার বাহিনী অক্ষুণ্ণ রেখে পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিল এজন্য যে 'বুলি-বাগীশ বিপ্লবীদের' মুখোশ নির্মমভাবে উন্মোচন করে তাদের ঝেঁটিয়ে দূর করা হয়। ১৯০৮-১২ এই কয় বছর লেনিন প্রধানত দক্ষিণ ও বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। স্তালিন এক জায়গায় লিখেছেন, "অনেকে লেনিন সম্বন্ধে অভিযোগ করতেন যে, তিনি দারুণ বাদানুবাদ ও দল ভাঙাভাঙির প্রতি আসক্ত। কিন্তু এটা মানতেই হবে যে, যদি পার্টি থেকে সুবিধাবাদীদের না তাড়ানো হত, তাহলে পার্টির ভেতরকার দুর্বলতা ও ঢিলেমী ঘুচত না, পার্টির দৃঢ় শক্তিশালী চরিত্রও গড়ে উঠত না। বুর্জোয়া শাসনের দিনে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বাড়তে ও শক্তিশালী হতে পারে ঠিক সেই পরিমাণে, যে পরিমাণে সে তার ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সুবিধাবাদী, বিপ্লব-বিরোধী ও পার্টি-বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়তে পারে।"

১৯০৯-এর নভেম্বরে গোর্কির সাহিত্যের উচ্চ প্রশংসা করে লেনিন তাঁকে চিঠি দেন ও কয়েক মাস পরে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। উপস্থিত থাকেন কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় বলশেভিক পত্রিকা

"রাবোচায়া গাজেতা"র প্রথম সংখ্যা। এতে থাকে লেনিনের প্রবন্ধ "বিপ্লবের শিক্ষা"। তলস্তয়ের মৃত্যুর উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন লেনিন।

১৯১০ সালে রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে ফের প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। বলশেভিকরা পেত্রোগ্রাদ থেকে "জ্‌ভেঝদা" (তারকা) এবং মস্কো থেকে "মিস্‌ল্‌" (ভাবনা) পত্রিকা প্রকাশে সমর্থ হয়। লেনিনের পরিচালনায় "জ্‌ভেঝদা" হয়ে ওঠে সংগ্রামী মার্কসবাদী পত্রিকা। ১৯১১ সালে প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি পার্টি স্কুলের ব্যবস্থা করেন লেনিন।

১৯১২-র জানুয়ারি। প্রাগে এককভাবে বলশেভিকদের সম্মেলন হয়। বলশেভিক পার্টি, নতুন ধরনের পার্টি গঠনে প্রাগ সম্মেলনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এর একটি জরুরী সিদ্ধান্ত ছিল—পার্টি থেকে মেনশেভিক-লিকুইডেটরদের বহিষ্কার, সুবিধাবাদের সঙ্গে বলশেভিকদের পুরোপুরি সাংগঠনিক সম্পর্কচ্ছেদ। সম্মেলনে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন লেনিন, স্তালিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের উদ্যোগে এবং লেনিন ও স্তালিনের সম্পাদনায় বলশেভিকদের বৈধ দৈনিকপত্র "প্রাভদা"র প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৯১২-র ২২শে এপ্রিল। রাশিয়ার কাছাকাছি থাকার জন্য লেনিন প্যারিস ছেড়ে ক্রাকাউ (পোল্যান্ড) আসেন। এখানে তিনি ছিলেন দু'বছরের বেশি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া নাগাদ। প্রাভদার জন্য লেনিন প্রায় প্রতিদিনই লিখতেন। সেগুলি প্রকাশিত হত নানা ছদ্মনামে।

লেনিন বললেন, রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচনে অংশ নিতে হবে। গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, ৮ ঘণ্টা কাজের দিন, জমিদারদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত—এই তিনটি মূল দাবির উপর নির্বাচনী অভিযান চালাল বলশেভিকরা। নির্বাচনী ফলাফলে খুশি হলেন লেনিন। লিখলেন, বলশেভিক প্রতিনিধিদের চমৎকারিত্ব কথার ফুলঝুরিতে নয়, বরং শ্রমজীবী জনগণের সম্পর্কে সেই জনগণের মধ্যে আত্মোৎসর্গী কর্মে। সাইবেরিয়ায় লেনা সোনার খনিতে শ্রমিকদের গুলি করে হত্যার ঘটনায় সারা রাশিয়া বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। শ্রমিকরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে এল। লেনিন বুঝলেন, ১৯০৫-এর পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে উঠেছে শ্রমিকরা। আবার নতুন করে আসছে বিপ্লবের ঢেউ।

১৯১৪-র আগস্ট। শুরু হল সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম দিন থেকেই লেনিন দৃঢ়ভাবে এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কিছুদিনের মধ্যেই অস্থায়ী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে জার সরকারের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। দু সপ্তাহ আটক রেখে তাঁকে সুইজারল্যান্ডে চলে যেতে দেওয়া হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রচনা করেন লেনিন। বার্নে আসার পরদিনই তিনি বলশেভিকদের সভায় যুদ্ধ সম্পর্কে রিপোর্ট করেন এবং পেশ করেন "ইওরোপীয় যুদ্ধে বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রাসির কর্তব্য।" লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালায়। বুর্জোয়া ও তাদের সেবাদাস সুবিধাবাদীরা কুৎসা রটায় যে, বলশেভিকদের দেশপ্রেম নেই, তারা দেশদ্রোহী। মোক্ষম জবাব দিয়ে লেনিন বোঝান, সত্যকার দেশপ্রেমিক হওয়ার অর্থ কী। তিনি লেখেন, সুবিধাবাদীরা হল শ্রমিক শ্রেণীর, মেহনতী মানুষের শত্রু, যারা শান্তির সময় বুর্জোয়ার স্বার্থে শ্রমিক পার্টির অভ্যন্তরে নিজেদের কাজ চালায় গোপনে, আর যুদ্ধের সময় খোলাখুলি জোট বাঁধে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সঙ্গে, গ্রহণ করে উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতি। পশ্চিম ইওরোপীয় পার্টিগুলির মধ্যে যারা প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতার পক্ষে ছিল, তাদের সংহতি সাধনের কাজ লেনিন চালিয়ে যান অক্লান্তভাবে। সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য তিনি ভেঙে-পড়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্থলে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়তে বলেন। রুশ বলশেভিক ও তাদের সহগামী পশ্চিম ইওরোপীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বামপন্থীরা সে সময় ছিল সংখ্যালঘু। কিন্তু মার্কসবাদের অনিবার্য বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে লেনিন বললেন, "আমরা একলা পড়েছি, এটা কোন বিপদ নয়। আমাদের সঙ্গেই আসবে লক্ষকোটি মানুষ, কেননা বলশেভিকদের মতটাই একমাত্র সঠিক মত।"

বামপন্থীদের সংহতির উদ্দেশ্যে লেনিন জিমারওয়াল্ডে ও কীন্থালে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হয়। প্রধান নির্ভর ছিল তাঁর লেখার আয়। অথচ যুদ্ধ-বিরোধী রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশন ছিল অতি দুষ্কর। সে সময় এক পত্রে তিনি লেখেন, "আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বলি, রোজগার দরকার। নইলে স্রেফ ধ্বংস, সত্যি বলছি।" সাদাসিদে দিন কাটাতেন তিনি। একটি কামরায় তিনি আর ক্রুপস্কায়া। আরামের অবকাশ ছিল না তাতে।

১৯১৬। লেনিনের মা মারা যান। মাকে বড় ভালোবাসতেন লেনিন। এ বছরই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত বই "সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়।" লেনিন তাতে দেখালেন যে, বিশ শতকের গোড়া থেকে পুঁজিবাদ তার বিকাশের নতুন পর্বে—সাম্রাজ্যবাদের পর্বে—প্রবেশ করেছে। "সাম্রাজ্যবাদ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বাহ্ন।"

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের প্রথম সারিতে এগিয়ে এল লেনিনের পরিচালনায় রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকরা। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়, ধ্বংস ও দুর্ভিক্ষ জারতন্ত্রে একেবারে পচন ধরিয়ে দিল, লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, বিপ্লব আসছে। ডাক দিলেন তিনি, "যেসব বিশ্বাসঘাতকের দল নিজেদের স্বার্থে মুনাফার লোভে তোমাদের পরস্পরকে গুলি

করে মারতে বলছে, ঐসব শাসকদের, ঐসব পঁুজিদার-দের বিরুদ্ধে বন্দুকের মুখ ঘুরিয়ে ধর, এ যুদ্ধের আগুনে আজ বিপ্লববহ্নি জ্বালাও।"

প্রথম জেগে উঠল পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা। রক্তাক্ত রবিবারের বার্ষিকীতে একটা বিরাট যুদ্ধ-বিরোধী মিছিল বের হল। মিছিল হল মস্কো, বাকু, নিঝনি-নভগোরদেও। ফেব্রুয়ারিতে বলশেভিক পার্টির আহ্বানে পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটে নামল। তাতে যোগ দিল দুই লক্ষের উপর শ্রমিক। ধ্বনি উঠল, 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক', 'যুদ্ধ ধ্বংস হোক', 'রুটি চাই'। জার সরকার সৈন্য দিয়ে দমন করতে চাইল। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সঙ্গে এসে যোগ দিল সৈন্যদল ও নৌবাহিনী। শ্রমিকরা পেত্রোগ্রাদ শহর দখল করে নিল। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। কিন্তু সোভিয়েতগুলিতে যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিরা ঢুকে পড়েছিল, তারা শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থের প্রতি বেইমানি করে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দিল বুর্জোয়াদের গড়া অস্থায়ী সরকারের হাতে। দেখা দিল দ্বৈত ক্ষমতা—একদিকে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার, অন্যদিকে সোভিয়েত বা প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ক্ষমতা।

লেনিন তখন সুইজারল্যান্ডে। রাশিয়ায় ফিরবার জন্য ব্যাকুল। এদিকে সীমান্তে রুশ-জার্মান যুদ্ধ সমান-তালে চলেছে। জারের জায়গায় যে নতুন সরকার বসেছে, তারা না আনল শান্তি, না দিল জনসাধারণকে রুটি। শ্রমিকদের ঠকাল তারা, বলতে লাগল রাজতন্ত্রের পতনের পর যুদ্ধ নাকি ন্যায়যুদ্ধ হয়ে উঠেছে। জন-গণকে প্রতারণার ব্যাপারে বুর্জোয়াদের সাহায্য করতে লাগল মেনশেভিকরা। এ অবস্থায় গুপ্ত অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে বলশেভিক পার্টি তার শক্তি সমাবেশ করতে লাগল, বহু বিশিষ্ট কর্মী জার্জিনস্কি, স্ভের্দলভ, স্তালিন ফিরে এলেন জেল ও নির্বাসন থেকে। পুনঃপ্রকাশিত হল "প্রাভদা"। লেনিন লিখলেন, "বিপ্লবের প্রথম পর্যায় কেবল শেষ হয়েছে। ক্ষমতা গেছে বুর্জোয়াদের হাতে। অস্থায়ী সরকারকে বিশ্বাস করা চলবে না, চলবে না বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় পাকা হয়ে বসবার সুযোগ দেওয়া। সর্বোপায়ে লড়তে হবে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার লক্ষ্যসাধনের জন্য, বিধ্বস্ত করতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে এবং তৈরি হতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য।"

লেনিন রাশিয়ায় ফেরার উপায় খুঁজতে লাগলেন। বাধা দিল অস্থায়ী সরকার। এ সরকার বিদেশে তাদের প্রতিনিধিদের কাছে পাঠাল লেনিন ও অন্যান্য বলশে-ভিকদের নামে একটা ব্ল্যাকলিস্ট। দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হল না তাঁদের। অবশেষে বহুকষ্টে সুইজার-ল্যান্ডের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সাহায্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের একটা ব্যবস্থা হল। প্রায় দশ বছর ফেরারী জীবন কাটিয়ে ১৯১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল লেনিন পেত্রোগ্রাদে এসে পেঁৗছলেন। মহোল্লাসে বিপ্লবী রাশিয়া অভ্যর্থনা জানাল তার মহান নেতাকে। সৈনিক ও নাবিকদের বিপ্লবী বাহিনী দিল গার্ড অব অনার। তুমুল করতালি ও আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে লেনিন উঠলেন তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ একটি সাঁজোয়া গাড়ির উপর এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের উদ্দীপ্ত আহ্বান জানা-লেন শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের কাছে।

নভেম্বর বিপ্লবের নায়ক

পেত্রোগ্রাদে পেঁৗছেই ৪ঠা এপ্রিল বলশেভিকদের সভায় বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য নিয়ে থিসিস পেশ করেন। ইতিহাসে এটি "এপ্রিল থিসিস" নামে খ্যাত। এতে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এগিয়ে যাবার জন্য সংগ্রামের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা হাজির করেন।

এদিকে বুর্জোয়াদের স্বার্থে অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। দলে দলে সৈন্য পাঠানো হল ফ্রন্টে কামানের খোরাক হিসাবে। শ্রমিক-কৃষকের জীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ। ৩রা জুলাই শ্রমিক ও সৈনিকরা পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় নামল। তাদের কণ্ঠে গর্জে উঠল—সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা চাই। সশস্ত্র শক্তি নিয়ে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল অস্থায়ী সরকার। জন-গণের রক্তে রাজপথ ভাসল। তছনছ করা হল "প্রাভদা" সম্পাদকীয় ভবন। কারাগারে পাঠানো হল বহু বল-শেভিককে। অস্থায়ী সরকারের নেতা কেরেনস্কি ঘোষণা করল, লেনিনকে ধরে দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কার। পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা লেনিনকে নিয়ে লুকিয়ে রাখল তাদের বস্তিতে। পরে তিনি চলে যান রাজলিফ হ্রদের তীরে একটা কুঁড়ে ঘরে, ফিনদেশীয় ঘেসুড়ে সেজে। কুঁড়ের কিছু দূরে ঝোপের মাঝে ছোট্ট একটু জায়গা সাফ করে রাখা হল। লেনিন রসিকতা করে বলতেন, "আমার সবুজ অফিস-ঘর।" সেখানে ছিল দুটো কাঠের গুঁড়ি, চেয়ার টেবিলের বদলে। এই কাঠের গুঁড়ির উপর বসেই লেনিন লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "রাষ্ট্র ও বিপ্লব"।

১৯১৭-র আগস্টে আধা গোপনে পেত্রোগ্রাদে পার্টির যে ষষ্ঠ কংগ্রেস হয়, লেনিন তার পরিচালনা করেন গুপ্তভাবে। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির মূল রাজনৈতিক রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির খতিয়ান পেশ করেন স্তালিন। কংগ্রেস থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া ও জমিদারদের ক্ষমতা চূর্ণ করার সংগ্রামের আহ্বান দেওয়া হয়। সিদ্ধান্তে লেনিনের এই নির্দেশের উপর জোর দেওয়া হয় যে, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে গরিব কৃষকের মৈত্রীই হল সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের শর্ত। পার্টি কংগ্রেসের পর

কলকারখানায় গ্রামাঞ্চলে গড়ে ওঠে লাল রক্ষীবাহিনী। সেপ্টেম্বরের দিকে ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান সেজে লেনিন ফিনল্যাণ্ডে হেলসিংফোর্সে (হেলসিঙ্কি) চলে যান। বিপ্লবের শত্রুদের অভিসন্ধি তিনি আঁচ করেছিলেন। পার্টি ও জনগণকে তিনি সতর্ক করে দেন। জেনারেল কর্নিলভ প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ করে সৈন্য চালায় পেত্রোগ্রাদের দিকে। কর্নিলভের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব নিল পার্টি। বিধ্বস্ত হল কর্নিলভ। ফিনল্যাণ্ড থেকে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পেত্রোগ্রাদ ও মস্কো কমিটির নিকট পাঠালেন দুটি ঐতিহাসিক চিঠি— "বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতেই হবে" এবং "মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান।" এরপর লেনিন চলে এলেন ভিবর্গে পেত্রোগ্রাদের কাছাকাছি যাবার জন্য। "বলশেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি?" প্রবন্ধে লেনিন বোঝালেন যে, বুর্জোয়াদের এ প্রচারটা কেবল শ্রমিক শ্রেণীকে ভয় পাইয়ে দেবার মতলবে। এরপর এক পত্রে লেনিন লিখলেন, "অভ্যুত্থানের ব্যাপারে বিলম্ব করা চলে না, এই মুহূর্তে এগুনো দরকার।" ২০শে অক্টোবর গোপনে লেনিন পেত্রোগ্রাদে এলেন। ২৩শে অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে লেনিন রচিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হল। ২৯শে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হল স্তালিনের নেতৃত্বে একটি সামরিক বিপ্লবী কেন্দ্র। পার্টিতে হেরে গিয়ে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ বিশ্বাসঘাতকতার পথ নেয়, ফাঁস করে দেয় কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন সিদ্ধান্ত। লেনিন তাঁদের পার্টি থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলেন।

৬ই নভেম্বর লেনিন রাত্রে ছদ্মবেশে এলেন পেত্রোগ্রাদের স্মোলনি ইনস্টিটিউটে অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য। শুরু হল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। শ্রমিক, সৈন্যদল ও নৌবাহিনী একযোগে ঝড়ের মতো আক্রমণ চালাল। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে পেত্রোগ্রাদে বিপ্লবী অভ্যুত্থান বিজয়ী হল। রাষ্ট্রক্ষমতা এল সোভিয়েতগুলির হাতে।

সন্ধ্যায় স্মোলনিতে বসল দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস। লেনিন শান্তি ও ভূমি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি প্রস্তাব আনেন, অবিলম্বে ফ্রন্টে যুদ্ধ বিরতির জন্য সমস্ত যুধ্যমান দেশের জনগণ ও সরকারের কাছে ঘোষণা পাঠানো হোক। শান্তি ও জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব—প্রথম দিন থেকেই এই হল নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি। কংগ্রেসে শান্তি ও ভূমি ডিক্রি গৃহীত হল। ভূমি ডিক্রিতে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি মালিকানা উচ্ছেদ হল। প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রের সভাপতি নির্বাচিত হলেন লেনিন।

স্মোলনিতে হল নতুন সরকারের কর্মকেন্দ্র। এখান থেকেই পাঠানো হত সব নির্দেশ ও সার্কুলার। দেশের সব প্রান্ত থেকে লোকজন আসত। সবদিকেই ছিল লেনিনের নেতৃত্ব। কিছুই তাঁর নজর এড়াত না। তিনি ছিলেন এই বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি। "জনগণের প্রতি" আবেদনে তিনি তাদের সোভিয়েতগুলির চারপাশে দাঁড়াবার, নির্ভয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার কাজ হাতে নেবার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রের কাজটা নাকি শুধু ধনীদের পক্ষেই সম্ভব, এই মিথ্যা রটনার সমাপ্তি করতে হবে। উৎপাদন ও বণ্টনের উপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের লেনিনীয় খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয় সোভিয়েত সরকারের প্রথম দিনগুলিতেই। ঘোষিত হয় রাশিয়ার সমস্ত জাতির পরিপূর্ণ সমানাধিকার। স্তালিন ঐ ঘোষণাটি রচনা করেন এবং এতে স্বাক্ষর দেন লেনিন ও স্তালিন উভয়েই। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পাঠানো হয়েছিল ট্রটস্কিকে। ট্রটস্কি পার্টির নির্দেশ অমান্য করে শান্তির আলোচনা ভেঙে দেন। এই সুযোগে জার্মান সৈন্য নতুন করে আক্রমণ শুরু করে। প্রতিরক্ষার কাজে সমস্ত শক্তি ও সঙ্গতি নিয়োগের প্রস্তাব করেন লেনিন।

১৮১৮ সালে ৬ই মার্চ পেত্রোগ্রাদে বসল পার্টির ৭ম কংগ্রেস। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এই প্রথম পার্টি কংগ্রেস। গৃহীত হয় 'যুদ্ধ ও শান্তির সিদ্ধান্ত'। পার্টির নতুন নামকরণ হয়। ১৯১৮-র মার্চে রাজধানী স্থানান্তরিত হল মস্কোতে। লেনিন বাসা নিলেন ক্রেমলিনে।

কিন্তু বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শত্রুরা চুপ করে রইল না। কেরেনস্কি বাহিনীকে চূর্ণ করা হল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যোগ দিল রাশিয়ার ধনী ব্যবসায়ী জমিদারদের সঙ্গে। এই 'হোয়াইট'রা তিন দিক থেকে সোভিয়েতকে গ্রাস করার জন্য হাঁ করে এল। বহু ত্যাগ ও কষ্টের মধ্যে রাশিয়ার মেহনতী মানুষ যে ক্ষমতা দখল করেছে, তা রক্ষা করতে তারা এগিয়ে এল। ১৯২০ সালের মধ্যে পরাজিত হল 'হোয়াইট'রা লালফৌজের হাতে। খাদ্য পরিস্থিতি হল গুরুতর। কুলাক ও চোরাবাজারীরা শষ্য লুকিয়ে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে বিপ্লবকে মারতে চাইল। লেনিন ধ্বনি তুললেন, শষ্যের সংগ্রামই সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম। শ্রমিকদের তিনি বললেন, 'কমরেডস, মনে রাখবেন, পরিস্থিতি সংকটজনক। বিপ্লবকে বাঁচাতে পারেন কেবল আপনারাই, আর কেউ নয়।'

প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি লেনিন ও সোভিয়েত বিপ্লবের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ ছড়াতে লাগল। লেনিন হল তাদের ভাষায় দানব দস্যু। তারা গুজব রটিয়ে চলল, লেনিনকে হত্যা করা হয়েছে। আর তাঁকে হত্যার চেষ্টাও চলল। ১৮১৮, ৩০শে আগস্ট। একটা কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছেন লেনিন। হঠাৎ সোশ্যালিস্ট রেভোলিউশনারি সদস্যা কাপলান রিভলবার খুলে শ্রমিকদের প্রিয়তম নেতার উপর গুলি চালাল। গুরুতর আহত হলেন তিনি। উল্লসিত হল শত্রুর দল।

কিন্তু লেনিন বেঁচে উঠলেন। তাঁর যে এখনও অনেক কাজ বাকী রয়েছে।

১৯১৮-১৯। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণে নামল। দশ লক্ষাধিক শত্রুসৈন্য চারদিক থেকে বেষ্টন করল নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রকে। গড়ে উঠল লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদ। স্তালিন ও জার্জিনস্কিকে পাঠালেন লেনিন প্রাচ্যফ্রন্টে শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য।

প্রকাশিত হল লেনিনের "প্রলেতারিয়ান বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি" বইখানা। এই শক্তিশালী রচনায় তিনি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি সুবিধাবাদের প্রবক্তা কাউটস্কির বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে ধরেন।

১৯১৯ মার্চ। লেনিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস। এতে তিনি "বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও প্রলেতারিয়ান একনায়কত্ব" বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করেন। এরপরই বসে পার্টির অষ্টম কংগ্রেস, প্যারি কমিউন দিবসে ১৮ই মার্চ। কমিউনিস্টরা সেদিন যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা বাস্তবে রূপায়িত করেছে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত। এ কংগ্রেসের কর্মসূচীতে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের গোটা পর্বটার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়।

১৯২০ সালের মার্চে নবম কংগ্রেসে লেনিন অর্থনৈতিক নির্মাণের পরিকল্পনা হাজির করলেন পার্টির সামনে। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের তিনি ছিলেন অনুপ্রাণক ও সংগঠক।

জুলাই-আগস্টে পেত্রোগ্রাদে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস পরিচালনা করেন লেনিন। ১৯২১-এ পার্টির দশম কংগ্রেসেরও পরিচালক ছিলেন তিনি। সেখানে তিনি ট্রটস্কি, বুখারিন প্রভৃতি উপদল-নেতাদের ক্রিয়াকলাপ ও পার্টি-বিরোধী গ্রুপের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব আনেন। শুদ্ধির ফলে পার্টি সুসংহত হয়, দৃঢ় হয় তার ঐক্য।

কাজে একেবারে ডুবে ছিলেন লেনিন। তাঁর একমাত্র বিশ্রাম ছিল ক্রেমলিনের ময়দানে একটু পায়চারি অথবা বিশেষ ছুটির দিনে ক্রুপস্কায়া ও মারিয়া ইলিনিচনার সঙ্গে মস্কোর উপকণ্ঠের পাহাড়ে একটু বেড়ানো। কাজের চাপে ও গুলির জখমের ফলে (একটা গুলি তখনও বের করা যায় নি) লেনিনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। নিজের শরীরের দিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিল না, কিন্তু অন্য কারও শরীর একটু খারাপ হলেই বড় ব্যস্ত হয়ে উঠতেন তিনি। গোর্কির অসুখের জন্য লেনিন তাঁকে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন।

১৯২২ সালের মার্চে পার্টির একাদশ কংগ্রেসে লেনিন ভাষণ দেন। রিপোর্টে তিনি নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রথম বছরের খতিয়ান করেন এবং সানন্দে জানান যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই অগ্রগতি শুরু হয়েছে, শ্রমিক-কৃষক ঐক্য। পার্টি কংগ্রেসে এই লেনিনের শেষ বক্তৃতা।

১৯২২ সালের গ্রীষ্মে অসুস্থ হয়ে পড়ে লেনিন মস্কোর উপকণ্ঠে গোর্কিতে চলে যান। চাষীরা ঝুড়ি বোঝাই ফলমূল এনে দিত। তিনি রেগে উঠতেন, বারণ করতেন, কিন্তু ফিরিয়ে দিতে পারতেন না পাছে তারা মর্মাহত হয়। সব খাবার তিনি রুগ্ন কমরেডদের মধ্যে বিলি করে দিতেন।

অক্টোবরে মস্কো ফিরে এসে আবার কাজে লাগলেন। সভাপতিত্ব করলেন জনকমিশার পরিষদের, অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে, বক্তৃতা দিলেন। ১৩ই নভেম্বর তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৪র্থ কংগ্রেসে রিপোর্ট দেন, "রুশ বিপ্লবের পাঁচ বছর ও বিশ্ব-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত।" ২০শে নভেম্বর মস্কো সোভিয়েত অধিবেশনে লেনিন তাঁর শেষ প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটি একক ইউনিয়ন রাষ্ট্রে মিলিত করার কর্তব্য তিনি হাজির করেন। এ প্রশ্নের সিদ্ধান্তের জন্য স্তালিনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়।

১৯২২-এর ডিসেম্বরে লেনিন ফের গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবার একটু সেরে উঠলেন জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে। এ সময় তিনি শ্রুতিলিখন দিয়ে যান তাঁর শেষ প্রবন্ধগুলির—'কংগ্রেসের নিকট পত্র', 'দিনলিপির পাতাগুলি', 'সমবায় প্রসঙ্গে', 'আমাদের বিপ্লব', 'কি ভাবে শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন পুনর্গঠিত করা উচিত', 'বরং অল্প কিন্তু ভাল করে'। "বরং অল্প কিন্তু ভাল করে" এই প্রবন্ধে লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেন—রাশিয়া ভারতবর্ষ ও চীন মুক্তি-সংগ্রামের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে বলে সমাজতন্ত্রের জয় আজ পৃথিবীতে অবশ্যম্ভাবী।

লেনিন নির্দেশ দিলেন, সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য আবশ্যক ভারী শিল্পের বিকাশ, টেকনিক্যাল পশ্চাদপদতার অবসান, সারা দেশের শিল্পায়ন ও বৈদ্যুতিকরণ। তিনি বললেন, জনশিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে যেন কোন কুণ্ঠা না করা হয়। তিনি শেখালেন, প্রলেতারিয়ান রাষ্ট্রই হল সমাজতন্ত্র নির্মাণের মূল হাতিয়ার। পার্টি কর্মীদের কাছ থেকে কঠোর শৃঙ্খলা দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন নিজেই সে শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত রেখে যান। বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদের সম্পর্কে যেমন তিনি ছিলেন কঠোর ক্ষমাহীন, তেমনি ছিলেন বিনয়ী অনাড়ম্বর সংবেদনশীল। শত্রুরা তার বলিষ্ঠ ও শাণিত যুক্তির সামনে দাঁড়াতে সাহস পেত না। লেনিনের যুক্তি ছিল এত স্পষ্ট ও জোরালো যে তা শ্রোতাদের মনকে প্রথমে আলোড়িত, ক্রমে উদ্দীপিত ও শেষপর্যন্ত, চলতি ভাষায় বলা চলে একেবারে দখল করে বসত। নীতির প্রতি নিষ্ঠা ছিল তাঁর অবিচল। "নীতিনিষ্ঠ কার্য-পদ্ধতিই নির্ভুল কার্যপদ্ধতি" বলতেন লেনিন। আর

জনগণের সৃজনশীল শক্তিতে তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস।

সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল তাঁর বিপ্লবপ্রতিভা। সত্যদ্রষ্টার মতো বিভিন্ন শ্রেণীর গতিপ্রকৃতি ও বিপ্লবের সম্ভাব্য গতিপথের বাঁকগুলো পরিষ্কার তিনি দেখতে পেতেন, যেন সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে। লেনিন চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্তালিন দুটো ঘটনার উল্লেখ করেছেন:

"প্রথম ঘটনাটা নভেম্বর বিপ্লবের ঠিক আগে, যখন লাখ লাখ শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ও দেশের মধ্যে সংকটের তাড়নায় শান্তি ও মুক্তির দাবি তুলছে; যখন সেনাপতিরা ও বুর্জোয়ারা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাবার মতলবে সামরিক শাসন কায়েম করার চেষ্টা করছে; যখন সমস্ত তথাকথিত 'সোশ্যালিস্ট' পার্টিগুলো বলশেভিকদের বিরোধী এবং তাদের জার্মান-গুপ্তচর বলে বদনাম রটাচ্ছে, যখন কেরেনস্কি বলশেভিকদের আত্মগোপনে বাধ্য করার চেষ্টা করছে; যখন একদিকে অস্ট্রিয়া-জার্মানীর শক্তিশালী সৈন্যদল আমাদের ক্লান্ত ধ্বংসোন্মুখ রুশবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, আর অন্যদিকে পশ্চিম ইওরোপের 'সোশ্যালিস্টরা' নিজ নিজ দেশের সরকারের সঙ্গে ভিড়ে গেছে 'চূড়ান্ত জয়লাভ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবার জন্য'......এ অবস্থায় বিদ্রোহ শুরু করার অর্থ সর্বস্ব পণ করা। কিন্তু লেনিন সে ঝুঁকি নিতে মোটেই ভীত হন নি, কারণ, তিনি জানতেন, বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী এবং বিজয়ও সুনিশ্চিত। লেনিনের এই বৈপ্লবিক দূরদৃষ্টি পরবর্তী ঘটনায় সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।"

"দ্বিতীয় ঘটনা—নভেম্বর বিপ্লবের প্রথম দিনগুলির কথা—যখন গণপ্রতিনিধি পরিষদ বিদ্রোহী সেনাপতি জেনারেল দুখোনিনকে যুদ্ধ-বন্ধ ও জার্মানীর সঙ্গে আপস আলোচনা শুরু করতে বাধ্য করার চেষ্টা করছেন। মনে পড়ে, লেনিন, ক্রাইলেংকো ও আমি পেত্রোগ্রাদের সর্বোচ্চ সমর-পরিষদে গেলাম দুখোনিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে। দুখোনিন ও সমর-পরিষদ সটান বলে দিল, তারা গণ-প্রতিনিধি পরিষদের হুকুম মানবে না। সে একটা মারাত্মক মুহূর্ত। সামরিক কর্মচারী সমর-পরিষদের বশবর্তী। সৈন্যদের কথাও কিছু বলা যায় না। তার উপর কেরেনস্কি পেত্রোগ্রাদের দিকে অভিযান চালাচ্ছে। টেলিফোনের কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লেনিনের মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বোঝা গেল, একটা সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছেছেন। বললেন, বেতার স্টেশনে চল। আমরা দুখোনিনকে বরখাস্ত করে, তার জায়গায় কমরেড ক্রাইলেংকোকে সেনাপতি নিযুক্ত করে এক বিশেষ আদেশ জারি করব এবং অফিসারদের ডিঙিয়ে সৈন্যদের কাছে আবেদন জানাব, তারা যেন সেনাপতিগুলোকে ঘেরাও করে ফেলে, যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় এবং জার্মান-অস্ট্রীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়—এ ছিল অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া। কিন্তু লেনিন ঘাবড়ালেন না, কারণ তিনি জানতেন, সৈন্যরা শান্তি চায় এবং শান্তি তারা প্রতিষ্ঠা করবেই। আমরা জানি, এ ক্ষেত্রেও লেনিনের দূরদৃষ্টি আশ্চর্যরকমভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়।"

১৯২৩ সালের মে মাসে লেনিন আবার গর্কিতে চলে আসেন। গ্রামের মুক্ত হাওয়া তাঁকে একটু সজীব করে তোলে। ছোটবেলার খেলার সাথী ভেরা এল তার ছেলেকে নিয়ে তাঁকে দেখতে। শ্রমিক প্রতিনিধিরা এল। হাসিমুখে সবার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন লেনিন। কিন্তু এই ভাল হওয়া বেশি দিন টিকল না।

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে লেনিন—ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ মারা গেলেন। এক মহাজীবনের অবসান হল।

কিন্তু মৃত্যু নেই লেনিনের। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে মেহনতী মানুষ যেখানে শোষণের অবসান ঘটিয়ে নবজীবনের পথে, সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছেন, যেখানে মুক্তিকামী মানুষ কলে কারখানায়, ক্ষেতে খামারে, শহরের রাজপথে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর মুখোমুখি আজও লড়ছেন, তাঁদেরই মধ্যে বেঁচে রয়েছেন লেনিন, লেনিন তাঁদের পথ প্রদর্শক, মহানায়ক। দীর্ঘজীবী হোন কমরেড লেনিন।

[গণশক্তি লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৭০ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

[গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে: ১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ও কমিউনিস্ট শাসকগোষ্ঠীর, সাম্প্রতিক কার্যকলাপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমেত অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণমুখী হতে সাহায্য করছে। সমাজতান্ত্রিক শিবির যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি আক্রমণ, প্রতিটি হস্তক্ষেপ, প্রতিটি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে তারজন্যে ভারতের যুবসমাজকে জনমত সৃষ্টি করতে হবে ভারতের যুব শক্তিকে এইভাবেই আগামী দিনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল দল-মতের যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।' ইনক্লাব—জিন্দাবাদ।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, গৌহাটী শাখার অভিনন্দন পত্র

বন্ধুগণ,

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করে এনে যে স্নেহ আর সম্মান দিয়েছে, তার জন্য আমরা এই উৎসবের কর্মকর্তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর সাথে সাথে এই সম্মেলনের প্রতি শুভেচ্ছা আর বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আসামের বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত ছ'মাস ধরে বিদেশী বহিষ্করণ আন্দোলনের ফলে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে আর এই আলোড়নে আসামের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে বেশ ভালোভাবেই নাড়া দিয়েছে।

বর্তমানের এই আন্দোলনের মূলে যে অসমীয়া মানুষের ভয় আর ভাবাবেগ কাজ করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিদেশীর প্রাবল্যে অসমীয়ারা নিজের ঘরেই সংখ্যালঘু হওয়ার আশঙ্কা করেছে। তাছাড়া এই অবস্থায় আর্থিক বিকাশ, উদ্যোগীকরণ, কর্মসংস্থান আর কৃষি সংস্কারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তথা রাজ্যিক সরকারের দৃকপাতহীন মনোভাবের ফলে যে অন্তহীন নির্মম শোষণ আর বঞ্চনা চলছে তাও আসামবাসীদের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে।

আসামবাসীর এই ন্যায়সঙ্গত ভয় আর ক্ষোভকে সাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদী আর ঐক্যবিরোধী শক্তিগুলো ব্যবহার করে আসামে হিংসা আর সংঘর্ষের এক দাবানল সৃষ্টি করেছে। বিদেশী সনাক্তকরণ আর বহিষ্করণের মত একটা জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনা আর ন্যায়িক বিধি ব্যবস্থার বাইরে অন্য পথ নেই। এবং এই শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আর সহযোগিতাকে উপেক্ষা করার ফলে বিদেশী বিতাড়নের পরিবর্তে আসামের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের মনে শত শত বছর ধরে চলে থাকা ঐক্য আর সম্প্রীতির উপরে এক প্রচণ্ড আঘাত আসলো; ভাষিক আর ধর্মীয় উভয় সম্প্রদায়েরই রক্ত ঝরলো; হাজার হাজার পরিবার সর্বস্বান্ত হলো। আর সংখ্যালঘুদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মরণপণ সংগ্রামকারী গণতান্ত্রিক সংগঠন, দল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরাও এই অমানুষিক আক্রমণের শিকার হলেন। ভ্রাতৃঘাতী আর সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলি বর্তমানের আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক ঐক্য আর ভারতের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার বিরুদ্ধে পরিচালিত করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরও দীর্ঘদিন থেকে তেমন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

আবার এই আন্দোলনকে মূলধন করে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা আসামের সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রা অচল করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। গরীব কৃষক শ্রমিকের অবস্থা জঘন্যতম হয়েছে। বাজার নেই, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য নেই, হাজিরা নেই। শ্রমিকের মজুরী আর অন্যান্য দাবী-দাওয়ার আন্দোলনও একেবারে বন্ধ। শিক্ষাজগতেও সেই একই অচলাবস্থা। শিক্ষাজীবনের একটা অমূল্য বছরও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপদ নেমে আসছে। বিভিন্ন ভাষা ধর্মের মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা বৃহৎ অসমীয়া জাতির ভাষা সংস্কৃতির বিকাশের পথে বাধা পড়েছে। মুসলমান কৃষিজীবী আর চা মজদুর, যারা অনসমীয়া হয়েও অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি গ্রহণ করে অসমীয়া জনসমাজের সাথে মিশে গিয়েছেন, তাদের মধ্যেও সন্দেহ আর ভীতি জন্ম নিয়েছে। এককথায় অসমীয়া জাতি আর ভাষা সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক সংগ্রামী আর ঐক্যবদ্ধ পরম্পরার ওপরে প্রতিক্রিয়াশীলরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গৌহাটী শাখা আসামের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মিলন আর ঐক্যের পতাকাকেই উর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি আসামের বিপ্লবী সংস্কৃতির অগ্রদূত আর এই সঙ্ঘের কর্মী জ্যোতিপ্রসাদ, বিষ্ণুরাভা আর মঘাই ওজা প্রভৃতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে রক্ষা আর প্রবাহিত করতে. বিভিন্ন ভাষা-ভাষী আর জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ আর ঐক্যকে সুনিশ্চিত আর প্রবাহিত করে আসামে মিলিত সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে তুলতে। সেই উদ্দেশ্যে এই সঙ্ঘের জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের পূর্বসূরীরা নিজের সীমিত শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করে আসছেন। আমরাও ব্যাতিক্রম নই। আর তাই বিদেশী সনাক্তকরণ আর বহিষ্করণের ক্ষেত্রে আমরা এক শান্তিপূর্ণ, ন্যায়িক আর গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার দাবী করি আর বর্তমানের উত্তেজনা আর ভ্রাতৃঘাতী হিংসার অন্ত ফেলানোর জন্য জনগণের

[শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায়]

রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা

অশোক ভট্টাচার্য্য

অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব গত ২৩শে থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নানা দিক দিয়ে এবারের যুব-ছাত্র উৎসব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। প্রথম কারণটি হ'ল—এবারই ক'লকাতার গন্ডী পেরিয়ে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহর এই উৎসবটির আয়োজক। দ্বিতীয় কারণটি হ'ল—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশের সংস্কৃতির প্রতিফলন এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। তৃতীয়টি—ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা। উপরের প্রথম দু'ট কারণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা নিঃসন্দেহে এবারের যুব-ছাত্র উৎসবের একটি রাজনৈতিক তাৎপর্যবাহী ঘটনা। কোলকাতার বাইরে যুব-ছাত্র উৎসব কতখানি সফল হ'তে পারে এনিয়ে যেমন সরকারী পর্যায়ে এবং অভিজ্ঞ মহলে আশংকা ছিল, তেমনি শিলিগুড়ির একজন যুবকর্মী হিসেবেও নিজেদের উপর পূর্ণ আস্থা কখনই রাখতে পারি নি। কারণ কোলকাতার বাইরে উত্তরবঙ্গের যাঁরা এই যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তুতি কমিটির কর্মকর্তা বা কর্মী ছিলেন তাঁদের অনেকেরই যুব-ছাত্র উৎসব সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোনও পরিষ্কার ধারণা ছিল না। যে যুব-ছাত্র উৎসব এ' বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হ'ল তা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে। সেই ভাবেই প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল, কিন্তু লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন ইতিমধ্যে এসে পড়ায় উৎসবের দিনটিকে পিছিয়ে দিতে হয়। স্বাভাবিক ভাবে যুব-উৎসব প্রস্তুতির সাথে যুক্ত কর্মীদের জড়িয়ে পড়তে হয় বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে। স্কুল-কলেজগুলোও এই সময় হয় বন্ধ ছিল নতুবা স্বাভাবিক ক্লাস ব্যাহত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক কাজগুলোকে চালু রাখতে হয়। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বহু ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতাগুলোতে নাম লেখায়। লোকসভার নির্বাচনের পর যুব-ছাত্র কর্মীরা এই উৎসবের কাজে দায়িত্ব সহকারে এগিয়ে আসতে থাকে। কেন্দ্রীয় অফিসে স্থান সংকুলানের অভাব ঘটে ছাত্র-ছাত্রী কর্মীরা বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে গিয়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশ-গ্রহণ করবার আবেদন জানায়। ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের অনুষ্ঠান শুরু হয় উত্তরবঙ্গের তিনটি কেন্দ্রে। শিলিগুড়ি কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলো প্রথম দিন থেকেই এমনভাবে শুরু হয় যা আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড়ই ছিলো ব্যাপক। আনন্দের কথা এই অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনায় যত স্বেচ্ছাসেবক ছিল তার সবটাই ছাত্র-ছাত্রী কর্মী। সংগীত, আবৃত্তি প্রতিযোগিতাগুলোতে শুধু মাত্র প্রতিযোগীদেরই ভীড় হ'ত না, তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরও ভীড় হ'ত প্রচুর। বিচারক হিসাবে শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের যাদের কাছেই আবেদন করা হয়েছিলো তারাই সাড়া দিয়েছিলেন অকুণ্ঠচিত্তে। এমন অনেক বিচারককে দেখা গেছে যেদিন তাঁদের বিভাগের প্রতিযোগীতা ছিল না, তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত কাজকে উপেক্ষা করেও দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। কি বিচারক, কি অভিভাবক, কি প্রতিযোগী সকলের মুখেই ছিল একটি কথা উত্তরবঙ্গের মানুষ এই ধরনের সুযোগ কোনও দিন পায় নি। চূড়ান্ত পর্যায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল দারুণভাবে সফল, প্রতিযোগীদের গুনাগুণ বিচারও ছিলো উন্নত। পশ্চিমবঙ্গের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ সুদূর কোলকাতা থেকে এগিয়ে এসেছিলেন শিলিগুড়ি শহরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুষ্ঠানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে। অন্যান্য প্রতিযোগীদের সংখ্যার দিক দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ছিলো আরও ব্যাপক।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রতিটি দিনই তিলক ময়দানে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, সাধারণ মানুষের প্রচুর সমাগম ঘটেছিলো। ভলিবল, খো-খো, হা-ডুডু, কাবাডি প্রতিযোগিতাগুলো দেখতে প্রচুর সংখ্যক মানুষের ভীড় হয়েছিলো। প্রতিটি মুহূর্তে ছিল উত্তেজনায় ভরা। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের অন্যান্য শহর থেকেও বিচারকরা এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। শিলিগুড়ির অনেক ক্রীড়া অনুরাগী মানুষের মুখেই শোনা যায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এই শহরে ইতিপূর্বে কখনও এত ব্যাপকভাবে সফল হয় নি। প্রতিযোগিতার বিষয়গুলোর মধ্যেও ছিল নতুনত্ব। সেদিক দিয়েও এই অনুষ্ঠান মানুষকে আরও বেশী আকর্ষিত করে। এবারের রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিযোগিতায় নেপালী ও আদিবাসী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন। দার্জিলিং শহরে ১লা, ২রা, ৩রা ফেব্রুয়ারী নেপালী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের

মধ্য দিয়ে শহরটি রূপ নিয়েছিলো ছোটো খাটো উৎসবের। প্রতিযোগীদের সংখ্যা ও মান ছিল অভিনন্দন যোগ্য। নেপালী-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে হয় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন নতুবা অন্য যেকোনো ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন অনুষ্ঠানকে সফল করতে। দার্জিলিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বড় অংশ পালন করেছে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব। চা-বাগান ও গ্রামাঞ্চলের আদিবাসীদের সমবেত নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। যে নৃত্য ও সংগীত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধুমাত্র তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল সেই নৃত্য ও সংগীতের যে একটি প্রতিযোগিতা হ'তে পারে ইতিপূর্বে তার প্রতিফলন কোথাও ঘটেছে কিনা জানা নেই। তরাই এলাকার প্রায় ১৬টি দল গত ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক ময়দানে যুব-ছাত্র উৎসব উপলক্ষ্যে আদিবাসী নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শহরের মানুষকে এই অনুষ্ঠানের কথা না জানানো সত্বেও দু'টো দিনই প্রায় ৩ হাজার করে লোকের সমাগম ঘটেছিলো, মানুষ তাদের নৃত্য ও সংগীতকে মুহু-র্মুহু অভিনন্দন জানিয়েছে করতালির মধ্য দিয়ে। আদিবাসী ভাই বোনেরা পেয়েছে প্রাণভরা ভালবাসা ও প্রেরণা। এবারের যুব-ছাত্র উৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ঠ্যটি কি হ'তে পারে এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়েই মানুষের

প্রদর্শনী দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু

তা বোধগম্য হয়েছিল। ২৩শে থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারীর দিনগুলো যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ততই মানুষের মধ্যে উৎসাহ বাড়তে লাগল। শারদ উৎসবের দিনগুলোর আগমনকে কেন্দ্রকরে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেমন পড়ে যায় আনন্দের প্রতিধ্বনি তেমনি ভাবেই আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল যুব-ছাত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে। ছাত্র টিকিট পেতে হাজার-হাজার স্কুল-কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের বিশাল লাইন দেখে প্রস্তুতি কমিটি হতভম্ব হয়ে যায়। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরই টিকিট দেওয়া সম্ভব হয় নি। ছাত্র টিকিটকে কেন্দ্র করে স্বার্থান্বেষী মহলের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কিছু সূক্ষ্ম চক্রান্ত থাকলেও সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যে যুব-ছাত্র উৎসবকে তাদের নিজেদেরই উৎসব বলে ধরে নিয়ে ছাত্র টিকিটের দাবী জানিয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। এদের একটি অংশকে যতই উত্তেজিত করবার চেষ্টা থাকনা কেন, যখনই উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ বসু সেই সমস্ত উত্তেজিত ছাত্রদের সাধারণ টিকিট নিতে আবেদন জানান, তখনই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সাধারণ টিকিটই সংগ্রহ করে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কতখানি সহযোগিতার মনোভাব ছিল তা এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়। মূল উৎসবের ৭ দিনে প্রতিদিন যে ৪০ হাজার লোকের সমাগম ঘটেছিল তা শুধু শিলিগুড়ি শহরেরই নয়, তার মধ্যে একটি ভাল অংশ ছিল গ্রামাঞ্চল ও চাবাগানের। মানুষ এসেছিলো প্রতিদিনই জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার, ইসলামপুর থেকেও। সাধারণভাবে শিলিগুড়ি শহরের মানুষ দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করেই বাঁধভাঙ্গা জনস্রোত দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু এই যুব-ছাত্র উৎসবের এই জনস্রোত মানুষকে দিয়ে গেছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। হিলকার্ট রোড, সেবক রোড সহ সমস্ত বড় বড় রাস্তাগুলো ধরে মানুষ চলেছে হয় ভানুভক্ত মঞ্চে নয়তো গুরুদাস বা ঋত্বিক নতুবা সমীরণ মঞ্চ বা তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে চলেছে যুব উৎসবের প্রাঙ্গণে প্রাণে প্রাণ মেলাতে। রাত ১টা বা সারারাত্রি ব্যাপী মানুষ উপভোগ করেছে অনুষ্ঠানগুলো, এই মঞ্চ থেকে ওই মঞ্চে ছুটে গেছে। মেয়েরা ঘুরেছে একা একাই, নির্ভয়ে। সমস্ত পরিবেশটাই গড়ে উঠেছিল এত সুন্দরভাবে যে সমাজবিরোধীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করতেও সমীহ করতে হয়েছিল। উৎসবের অঙ্গণে যে ধরণের অবস্থায় কিছু মানুষকে দেখা যায় তারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল এই পবিত্র প্রাঙ্গণ থেকে। এই হাজার-হাজার মানুষের ভীড়েও একটিও ছিনতাই বা অশালীন কোন ঘটনা ঘটে নি। অনেক মেয়েরা অভিভাবক ব্যাতিরেকই উপভোগ করেছে সারারাত্রি ব্যাপী অনুষ্ঠানগুলো। প্রতিটি দিনে সেই সেই অংশের মানুষের ভীড়ই ছিল বেশী। শিশু ও মহিলা দিবসে এই দুই অংশের ভীড় ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৫ হাজার শিশুর সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল ও মুখরিত মিছিল শিশুদিবসের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। হাজার-হাজার মানুষ এই মিছিল উপভোগ করে রাস্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে থেকে। মহিলা মিছিলটিও ছিল আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করা ৫-শত স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষে সম্ভব হ'ত না যদি না হাজার-হাজার সাধারণ দর্শক আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতেন। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সামান্য প্রচেষ্টা হলেই দর্শকরা নিজেরাই সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল। দর্শকদের পক্ষ থেকে কোন শিল্পীর ক্ষেত্রেও ন্যূনতম বাধা পর্যন্ত আসে নি। আসাম, ত্রিপুরা, কেরালা রাজ্যের এবং বিভিন্ন লোক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষ দারুণভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে। আসামের শিল্পীদের অনুষ্ঠান মানুষ এমনভাবে নিয়েছিল যে তাদের দিয়ে নির্দিষ্ট মঞ্চ ব্যাতিরেকেও আরও দু'টো মঞ্চে অনুষ্ঠান করান হয়েছিল। আসামের অনুষ্ঠান চলাকালীন মানুষ এমন সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শন দেখিয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসেবে আমাদের গর্বিত করে তুলেছিল। আসামের শিল্পীরাও এই ভালবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বে অভিভূত হয়ে উঠেছিলেন। অশ্রু সজল নয়নে তারা বিদায় নেয় উৎসব অঙ্গণ থেকে।

রেকর্ড সংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটেছিলো ২৯শে ফেব্রুয়ারী উৎসবের শেষ দিনটিতে। কিন্তু বাধ সাধল বৃষ্টি। বৃষ্টি সাময়িকভাবে শেষ হ'তেই মানুষ আবার সমবেত হ'ল ময়দানে। তাদেরই অনুরোধে আবার শুরু হ'ল অনুষ্ঠানগুলো। ৭টি দিনের উৎসব শেষ হ'তেই উৎসব মুখর শিলিগুড়ি শহরের প্রাণস্পন্দন কেমন বন্ধ হয়ে গেল। সকলের মুখেই একই কথা শহরটাকে যেন শ্মশান করে দিয়ে গেল। এই সরকারের অতি বড় সমালোচকও বলতে বাধ্য হয়েছে এত সুশৃঙ্খল ও এত সফলভাবে ৭টি দিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে কেবলমাত্র সুশৃঙ্খল আদর্শবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বই। ৭টি দিনের একটি দিনেও ন্যূনতম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় নি, অনেক মানুষের কাছে এটাই একটা ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রস্তুতি-কমিটির নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেছে সাধারণ মানুষ। অনুষ্ঠানগুলোর বৈচিত্র দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলেছে। আলোচনা চক্রগুলোতে বিপুল মানুষের ভীড় প্রমাণ করেছে মানুষ জানতে চায়।

অনেক মানুষেরই ভাল লেগেছে এই উৎসবে শ্রমিক-কৃষক-গরীব মানুষের বিপুল সমাবেশ দেখে। উৎসবের শেষটাকে শিলিগুড়ি শহরের মানুষ কিছুতেই যেন

মেনে নিতে পারছে না। একটি স্থানীয় ইন্দিরা কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা উৎসবের কয়েকদিন আগে মন্তব্য করেছিল "এই যুব-ছাত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের কোন উৎসাহ নেই"। তাদের সে গুড়ে বালি দিয়ে ১৯৭৯-৮০ সালের যুব-ছাত্র উৎসবের বিরাট সাফল্য উত্তরবঙ্গের গণতান্ত্রিক মানুষের মনে নতুন আত্মপ্রত্যয় জন্মে দিয়েছে। সাংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতার বাইরেও বাঙলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা ও এগিয়ে নেওয়া যায়, শিলিগুড়িতে যুব-ছাত্র উৎসব তাই প্রমাণ করেছে। যুব-ছাত্র উৎসবের এই সাফল্যের সিংহ ভাগেরই দাবীদার নিঃসন্দেহে শিলি-গুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের জনগণ। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্যই তা সম্ভব হয়েছে।

টিকিট কাউন্টারে দর্শকদের বিরাট লাইন

এবারের যুব-ছাত্র উৎসবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সমীর গুপ্তগুপ্ত

পশ্চিমবাংলার ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে সুস্থ সামাজিক এবং সংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তোলার অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে যুব-ছাত্র উৎসব উদ্‌যাপনের যে কর্মসূচী ক্ষমতায় আসীন হবার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছিলেন এবারের যুব-ছাত্র উৎসব কর্মসূচী পালনের মধ্যদিয়ে তা আরো পরিণত রূপলাভ করলো। বিশ্ব যুব উৎসবের অংশ হিসাবেই বিগত যুব-ছাত্র উৎসব পালিত হয়েছিল। কিউবার হাভানা শহরের বুকে বিশ্ব যুব-ছাত্র সংস্থা সমূহ সারা দুনিয়ার যুব-ছাত্র সমাজের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুব-ছাত্র উৎসবে সামিল হবার আহ্বান জানিয়েছিল। পশ্চিমবাংলার যুব-ছাত্র সমাজের কাছে বিশ্ব যুব-ছাত্র সমাজের আহ্বান পৌঁছে দেবার অংশ হিসাবেও বিগত বছরের যুব-ছাত্র উৎসব পালিত হয়েছে।

এবছর বিশ্ব যুব-ছাত্র সমাজের কোন কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানসূচী ছিল না। দুনিয়াব্যাপী যুব-ছাত্র সমাজের কোন কেন্দ্রীয় আহ্বান না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যের যুব-ছাত্র সমাজের কাছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আহ্বান পৌঁছে দেবার মঞ্চ হিসাবে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তুতি কমিটি (১৯৭৯-৮০)" গঠন করেছিলেন। উৎসবের জৌলুসে যুবমানসে শুধুমাত্র আনন্দের খোরাক যোগাবার জন্য নয়—সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাধারণ চেতনার যুব-ছাত্র সমাজকে উৎসবের প্রাঙ্গণে সমবেত করা, এবং উৎসবে অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে যুবমানসে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্য নিয়েই আয়োজিত হয়েছিল যুব-ছাত্র উৎসব। বিগত বছরের চাইতে বহুবিধ স্বাতন্ত্র নিয়েই অনুষ্ঠিত হলো এবারের উৎসব।

অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মতো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কলকাতাই পশ্চিমবাংলার পীঠস্থান। সেকারণেই এযাবৎ সমস্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনই হয়েছে কলকাতা শহরে। সারা রাজ্যের মানুষের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার আহ্বান ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবারের উৎসব অনুষ্ঠানের আসর বসেছিল, উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি শহরে। উত্তরবাংলার পাঁচটি জেলাতেই যুব-ছাত্র সমাজের ব্যাপক অংশ গ্রহণের লক্ষ্য নিয়েই শুরু থেকে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। উৎসবের দিনগুলিতে উৎসব সংগঠকদের মুখ সাফল্যের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে উৎসবমুখর শিলিগুড়ি শহরের চেহারা দেখে। উৎসবের সময় যেন উত্তরবাংলার যৌবনশক্তির ঢল নেমেছিল উত্তরবাংলার প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ি শহরে। যৌবনের উৎসব প্রাঙ্গণে স্ত্রী-পুরুষ, শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী মিলে মিশে একাকার।

সমগ্র উৎসব অনুষ্ঠানকে বিশেষ গতিবেগ সঞ্চার করেছে উৎসবের অন্যতম অঙ্গ, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানসমূহ। মূল উৎসবের অনেক আগেই শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো দু'টি কেন্দ্রে—শিলিগুড়ি শহর এবং মেদিনীপুর শহরে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হিসাবে স্থান নির্ধারিত হয়েছিল কলকাতা, মেদিনীপুর, রায়গঞ্জ, কুচবিহার, শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিং শহর। মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত হলো শুধুমাত্র আদিবাসীদের ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। সারারাজ্যে যুব-ছাত্র সমাজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কেন্দ্র হিসাবে বাছাই করা হয়েছিল শিলিগুড়ি শহর। কলকাতা, রায়গঞ্জ, কুচবিহার এবং শিলিগুড়ি শহরে প্রাথমিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হল বাংলাভাষার চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। আর দার্জিলিং শহরে নেপালীভাষীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। এছাড়াও আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হলো শিলিগুড়ি শহরে।

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান কেন্দ্রের হিসাব থেকেই বিগতবছরের চাইতে এবারের অনুষ্ঠানের স্বাতন্ত্র বোঝা যাচ্ছে। মূল উৎসবের একমাসেরও বেশী সময় আগে থেকে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ফলে রাজ্যের ভাবী সংস্কৃতিক শিল্পী এবং ক্রীড়াবীদেরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে কার্যতঃ ৭ দিনের উৎসব অনুষ্ঠানের সময় সীমাকে বাড়িয়ে নিয়ে গেলেন ৩৮ দিনে। ২১শে জানুয়ারী তারিখে কলকাতার যে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার শুরু তা রায়গঞ্জ এবং কুচবিহার শহরে গিয়ে শেষ হল ১৪ই ফেব্রুয়ারী, '৮০ তারিখে। পরের দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে শিলিগুড়ি শহরে শুরু হল বাংলাভাষার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। চললো ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। মাঝের দু'দিন বাদ দিয়ে শিলিগুড়ি শহরে মূল অনুষ্ঠানের শুরু ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে। একটানা ৩১ দিনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন ৬৭৯১ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতী।

শিশু দিবসে শিশুদের বর্ণাঢ্য সমাবেশ

একই মঞ্চ থেকে একাধিক ভাষাভাষীদের জন্য একাধিক স্থানে এজাতীয় প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান সম্ভবতঃ পশ্চিমবাংলার বুকে এই প্রথম। বর্তমান রাজ্য সরকার আয়োজিত বিগত যুব উৎসবের প্রাথমিব ঘোষণাতেও একাধিক ভাষাভাষীদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষীদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এবারে পূর্ব ঘোষণ অনুযায়ী আঞ্চলিক ভাষায় সাঁওতালীদের, হিন্দী ভাষায় আদিবাসীদের, নেপালী ভাষী এবং বাংলা ভাষার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক অংশের ভাষাভাষীদের অনুষ্ঠানেই বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন।

উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিতাভ বসু, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ঘোষণায় বলেছেন—"আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিবেশে, বহু বিচিত্র চেহারার প্রতিযোগিতা চলছে সমাজের সর্বত্র।। ব্যক্তি প্রতি-যোগিতার এমনি পরিবেশে আমরা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। বর্তমান সমাজের ব্যক্তি প্রতিযোগিতার সাধারণ চেহারার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বা ক্রীড়া জগতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অসংখ্য ব্যক্তির মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া চর্চা বৃদ্ধিই এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য।...বিভিন্ন বিষয়ে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থাও আমরা করেছি। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা।" এই স্বচ্ছ দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবীরা এবং বিচারক মণ্ডলীও সংগঠকদের এই মনোভাবের কথা জেনেই অনুষ্ঠান সফল করতে এগিয়ে এসেছেন।

মেদিনীপুরের অনুষ্ঠান

আঞ্চলিক ভাষী সাঁওতালীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাঁওতাল অধ্যুষিত মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে। মেদিনী-পুরের অরবিন্দ স্টেডিয়ামে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রায় দশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সর্বমোট ১৬টি বিষয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সমবেত নৃত্য (করম নাচ) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২১টি দলে সর্বমোট ২৭২ জন সমবেত নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। মেদিনীপুরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগিদেরই উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে স্মারক উপহার দেওয়া হয়। চেতনার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সাঁওতালী সম্প্রদায়ের ছাত্র-যুবদের সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া চর্চায় উৎসাহিত করার জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা। সাঁওতালীদের ৫২ জন প্রতিযোগীর সকলকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মেদিনীপুর জেলার গণ-আন্দোলনের শ্রদ্ধেয় নেতা সুকুমার সেনগুপ্ত। এছাড়াও রাজ্য সরকারের আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শম্ভু মান্ডি মহাশয়ও সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অরবিন্দ স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হয়।

দার্জিলিংয়ে নেপালী ভাষার আসর

১লা থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী দার্জিলিং শহরের জি. ডি. এন. এস. হলে নেপালী-ভাষীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সময়কালে দার্জিলিং শহরের সমস্ত স্কুল-কলেজে শীতকালীন ছুটি চলছিল তা সত্ত্বেও প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান সফল করতে দূর-দূরান্তের পাহাড়ী এলাকা থেকেও প্রতিযোগীরা ছুটে এসেছেন। একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের তিনদিন থাকা এবং সমস্ত প্রতিযোগীদের জন্যই খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সিকিম এবং ভুটানের কিছু সংখ্যক প্রতিযোগীও আলোচ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠানের তিনদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানেহ দার্জিলিং শহরের মানুষ দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দর্শকেরা যেমন অনুষ্ঠান দেখে আনন্দ উপ-ভোগ করেছেন, তেমনি প্রতিযোগীরাও দর্শকে ঠাসা হলে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সংগে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও নেপালীভাষার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংগঠকেরাই স্বেচ্ছায় বিচারকের আসন অলংকৃত করতে এগিয়ে এসেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নেপালীভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধি-জীবীরা দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছেন। সারা রাজ্যব্যাপী প্রবল আন্দোলনের ঢেউ না উঠলেও নেপালীভাষা অধ্যুষিত দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় বিগত কিছু দিন আগেও প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সারা রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মানুষই নেপালীভাষীদের এই সংগ্রামকে সমর্থন যুগিয়েছেন। কি কংগ্রেস, কি জনতা পার্টির সরকার—কোন কেন্দ্রীয় সরকারই নেপালীভাষীদের এই দাবীকে তখনো পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি। যদিও উভয় দলই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বাইরে থাকাকালীন নেপালী-ভাষীদের এই এই দাবীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

নেপালীভাষীদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীকে নির্বা-চনী বিজয়ের কাজে উভয় দলই ব্যবহার করেছেন। অথচ পশ্চিমবাংলার বামপন্থী সরকার নিজস্ব ভাষা-নীতি অনুযায়ীই নেপালীভাষার প্রতিও যথাযথ মর্যাদা দেখিয়েছেন। রাজ্য সরকারী ক্ষমতায় আসীন হবার পরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কথা খোলাখুলি সাধারণ মানুষকে জানিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় নেপালীভাষার সমর্থনে উত্থাপিত সরকারী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হয়েছে। কিন্তু আজো পর্যন্ত এই দাবী সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত আলোচ্য অনু-ষ্ঠানের মধ্যদিয়েও নেপালীভাষার স্বীকৃতির দাবীই আর একবার জোরালো সমর্থন লাভ করলো। একই সাংগঠনিক মঞ্চ থেকে বাংলাভাষার সাথে সাথে নেপালী-ভাষার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন হওয়াতে নেপালীভাষীরাও অনেক বাড়তি উৎসাহ নিয়ে প্রতি-কূল প্রাকৃতিক পরিবেশ সত্ত্বেও প্রতিযোগিতা অনু-ষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করতে সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বিষয় সমূহের মধ্যে ছিল—একাংক নাটক, সমবেত নৃত্য ও সংগীত, একক সংগীত, আবৃত্তি, বিতর্ক, প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা রচনা। নেপালীভাষার প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগীদের মধ্যে উৎসবের মূলমঞ্চে পুরস্কার বিতরণ করা ছাড়াও দার্জিলিং শহরের প্রতিযোগিতা-কেন্দ্রেও পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল।

কলকাতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা

মূলতঃ উত্তরবাংলা ভিত্তিক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হলেও দক্ষিণবাংলার প্রতিযোগীদের প্রাথমিক পর্বের বাছাই করার জন্য কলকাতায় প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২১শে জানুয়ারী থেকে ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত এবং ১২ই, ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করা

আদিবাসী দিবসের মিছিল

সম্ভব হয়নি। আর্থিক সমস্যার কারণে দক্ষিণবাংলার অনেক প্রতিযোগীর পক্ষেই অংশ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও দক্ষিণবাংলার প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ২৪৫৭ জন প্রতি-যোগী অংশ গ্রহণ করেছেন। বহু সংখ্যক ছাত্র-যুবর পক্ষে আলোচ্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি শহরের চূড়ান্ত প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য কলকাতা শহরে প্রাথমিক বাছাই কেন্দ্রের আয়োজনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হলেও চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অর্থ ব্যয় করে যাওয়া প্রায় অসম্ভব— এমন চিন্তা সত্ত্বেও প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হয়ে শিলিগুড়ি শহরের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন এমন প্রতিযোগীর সংখ্যা একাধিক। এদের নিজস্ব আর্থিক সঙ্গতির অভাব থাকলে এদের শুভানুধ্যায়ীরাই আর্থিক সাহায্য যুগিয়েছেন। এদিক থেকেও শিলিগুড়ি শহর থেকে বহু দূরে অবস্থিত কলকাতার শহরে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন সার্থক হয়েছে।

উত্তরবাংলার প্রাথমিক বাছাইয়ের আসর

উত্তরবাংলার ব্যাপক সংখ্যক প্রতিযোগীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি এবং কুচ-বিহার শহরে তিনটি কেন্দ্রে পৃথকভাবে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ফলও ফলেছে ভালো। উৎসব কমিটির প্রাথমিক ঘোষণাতেই এই তিন কেন্দ্রে পৃথকভাবে প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ঘোষণা থাকলে আরো বেশী সংখ্যক প্রতি-যোগীর অংশ গ্রহণ ঘটতো। দেরীতে হলেও উৎসব কমিটির এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। কুচবিহার এবং রায়গঞ্জ শহরের অবস্থান শিলিগুড়ি শহর থেকে বহু দূরে। দূরবর্তী এই শহর দুটিতে পৃথকভাবে প্রাথমিক বাছাই অনুষ্ঠানের আয়োজনের ফলে যুব উৎসবের প্রচারও যেমন ব্যাপকতা লাভ করেছে তেমনি এই দুটি শহরের যে সমস্ত মানুষের পক্ষে শিলি-গুড়ি শহরে উপস্থিত হয়ে মূল উৎসব দেখা সম্ভব হয়নি তাঁদের অনেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে উৎসবের সমগ্র আয়োজনের এক ভগ্নাংশমাত্র হলেও প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন। যেমনটি পেরেছেন মেদিনীপুর দার্জিলিং শহরের ক্ষেত্রে। সাধারণের উপভোগের যে সুযোগ কলকাতার মানুষদের জন্য করা সম্ভব হয়নি সেই ব্যবস্থা মেদিনীপুর, দার্জিলিং এবং কুচবিহার শহরের মানুষের জন্য করা হয়েছিল।

রায়গঞ্জ, কুচবিহার এবং দার্জিলিং শহরে প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে, সূচনায় কিছু আলোচনা অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যুব উৎসবে মূল দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় সমূহের আলোচনা উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। আলোচনার বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বক্তা উৎসবের দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত সকলের কাছে তুলে ধরা ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে যুবসমাজের কর্তব্য এবং রাজ্যের সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে যুবসমাজের ভূমিকা প্রসঙ্গেও আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রসঙ্গে

প্রাথমিক অবস্থায় সর্বমোট সাতটি দপ্তর থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চলেছে। স্থানীয় ছাত্র-যুব সম্প্রদায় এবং সরকারী কর্মচারীদের যুক্ত উদ্যোগের ফলেই প্রাথমিকভাবে প্রতিযোগীদের নাম তালিকাভুক্তির কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে ৭টি দপ্তর থেকে আবেদনপত্র বিতরণ এবং গ্রহণ করে নাম তালিকাভুক্তির ফলে অনেক আবেদনকারীই নিজস্ব বসবাসের কাছাকাছি কেন্দ্র থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ডাকযোগে আবেদনপত্র সংগ্রহে ইচ্ছুক এমন ৪৭৮ জনকে ডাকযোগেও আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে।

একই সঙ্গে এতগুলো দপ্তর থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুকদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে করা সম্ভব হয়েছে—এমন দাবী করা যায় না। যে সমস্ত দপ্তর থেকে মূল দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি সে সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতি-যোগীদের সামান্য বিষয়ে সাময়িক কালের জন্য হলেও বহুবিধ বিভ্রান্তিতে ভুগতে হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ের তৎপরতার ফলে অনেক বিষয়ই সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুকদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা ব্যতিরেকেও এত সংখ্যার কেন্দ্র থেকে একই সাথে প্রাথমিক প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। এজন্য উৎসব কমিটিকে বিরাট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীর সাহায্যও গ্রহণ করতে হয়েছে। কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হলেও একাধিক কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিকল্পনা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে।

গ্রহণ বিভ্রাট

পূর্বঘোষিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সমস্ত কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে পালিত হলেও ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সূর্য গ্রহণের কথা উৎসব সংগঠকদের জানা ছিল না এমন নয়। কিন্তু যেটা জানা ছিলনা সেটা হলো— সরকারী ছুটির ঘোষণা। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের অনু-মানের নামে সংবাদ পত্রগুলির প্রচার এবং শেষ মুহূর্তে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলেজ মাঠে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ।

সরকারী ছুটি ঘোষণার ফলে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১৬ তারিখের সমগ্র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৭ই তারিখে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রেডিও মারফৎ এই পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হলেও যানবাহন সমস্যা এবং সঠিক যোগাযোগের অভাবের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন প্রতিযোগী ঐদিনের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকি কলকাতা থেকে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ একজন প্রতিযোগী শিলিগুড়ি শহরে উপস্থিত হয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। দক্ষিণ বাংলার প্রতিযোগীরা ঐদিন সকালে যথাসময়ে শিলিগুড়ি শহরে উপস্থিত হলেও উত্তরবাংলার রাষ্ট্রীয় পরিবহণ বন্ধ থাকার কারণে উত্তরবাংলার প্রতিযোগীদের বিরাট অংশের নিশ্চিত অনুপস্থিতিকে এড়াবার জনাই ঐদিনের অনুষ্ঠান পরবর্তী দিনে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয়। কয়েক জন প্রতিযোগীর পক্ষে ১৬ তারিখের প্রতিযোগিতায় পরের দিন অর্থাৎ ১৭ই তারিখে অংশ গ্রহণ সম্ভব না হলেও সাধারণভাবে প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানসূচী পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেই মেনে নিয়েছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশংসনীয় ভূমিকা

স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিচারকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলেই এই বিরাট আয়তনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সফল করা সম্ভব হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের বিরাট অংশই ছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। এর মধ্যে শিলিগুড়ি শহরের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা শিলিগুড়ি শহরের স্কুলগুলিতে উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন দলে দলে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য উৎসব দপ্তরে যোগাযোগ করেছেন তেমনি এগিয়ে এসেছেন স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা নিয়ে।

কলকাতায় ইতিপূর্বে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও উত্তরবাংলার কেন্দ্রগুলিতে এজাতীয়

উদ্যোগ এই প্রথম। স্বভাবতই অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে সমগ্র অনুষ্ঠানকে আরো সুন্দর করে তোলার কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে—একটা সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বেচ্ছাসেবকেরা এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে এসেছেন উন্নত সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে, সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটাবার জন্য।

সর্বমোট ৫৮৫ জন স্বেচ্ছাসেবক সমগ্র অনুষ্ঠান (মূল উৎসব অনুষ্ঠানের বাইরে) পরিচালনায় অংশ নিয়েছেন। এদের মধ্যে কমপক্ষে ১২৩ জন প্রস্তুতির শুরু থেকেই সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন।

বিচারকেরা উৎসাহে এগিয়ে এসেছেন

প্রতিযোগিতা পরিচালনায় শিল্পী, সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরাও যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিচারকের আসন অলংকৃত করতে সম্মত হয়েছেন। অনেকেই নিজস্ব পেশার ক্ষতি-স্বীকার করেও সংগঠকদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রতিযোগিতা কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—সঙ্গীত শিল্পী শ্রী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রী ধীরেন মিত্র, ধীরেন বসু, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অংশুমান রায়, পুরবী দত্ত, অধ্যক্ষ কুমুদরঞ্জন ব্যানার্জী, ডাঃ শ্রী সুকুমার চ্যাটার্জী, গীতা চৌধুরী, সমরেশ ব্যানার্জী, নরেন মুখোপাধ্যায়, দীনেন চৌধুরী, আজিমুদ্দিন মিঞা, কঙ্কন ভট্টাচার্য্য, দিলীপ সেনগুপ্ত, উৎপলা গোস্বামী প্রমুখ। নৃত্য জগতের প্রখ্যাত শিক্ষক এবং শিল্পী এন. শিবশঙ্করণ, গোবিন্দ, কুনি, ক্ষান্তমুনি কুটি, বেলা অর্ণব, শান্তি বসু, স্নিগ্ধা ব্যানার্জী, শিবপদ ভৌমিক প্রমুখ। নাট্য জগতে শ্রী জ্ঞানেশ মুখার্জী, অনুপকুমার, বাসুদেব বসু, সুধী প্রধান, বিদ্যুৎ নাগ, অধ্যাপক দর্শণ চৌধুরী, বারিণ রায় প্রমুখ। আবৃত্তির আসরে উপস্থিত ছিলেন শ্রী প্রদীপ ঘোষ, রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, দীপঙ্কর মজুমদার, সৌমিত্র মিত্র, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস গাঙ্গুলী প্রমুখ। কবি ও সাহিত্যিক শ্রী অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, নেপাল মজুমদার, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, দিগ্‌বিজয় দে সরকার, প্রণব চট্টোপাধ্যায়. পুষ্পজিত রায়, শ্যামসুন্দর দে প্রমুখ। চিত্র শিল্পী অধ্যক্ষ বিজন চৌধুরী, নির্মাল্য নাগ প্রমুখ। যন্ত্র শিল্পী শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়. আনন্দ বোডাস, দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল চক্রবর্তী প্রমুখ। সর্বমোট ১৯৭ জন বিচারক বিভিন্ন বিষয়ে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিযোগিতার বিষয় সমূহের মধ্যে আবৃত্তি (চারটি), রবীন্দ্র, নজরুল, মার্গ, কাব্যসঙ্গীত, লোকগীতি এবং গণসঙ্গীত, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, তবলা-লহরা, সেতার, একক নৃত্য, বার্ষিক পত্রিকা, প্রাচীর পত্রিকা, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা রচনা, একাংক নাটক, চিত্রাঙ্কণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিলিগুড়ি এবং মেদিনীপুর শহরে পৃথকভাবে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারী মূল উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। প্রথম স্থানাধিকারীদের সাধারণ মান থেকেই সমগ্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করা সম্ভব। সাধারণের মতে উচ্চমানের প্রতিযোগীরাই রাজ্য ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।

সমগ্র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ৯৯২ জন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। পুরস্কারের সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু এবং রাজ্য যুবকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাসের স্বাক্ষরযুক্ত মানপত্রও প্রতিযোগীদের উপহার দেওয়া হয়েছে।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা এবং প্রতিযোগিতার সংগঠকেরা প্রতিযোগিতার আঙিনায় আগামী দিনের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সমবেত করার তৃপ্তি নিয়েই ঘরে ফিরেছেন। উচ্চমানের যে সমস্ত প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার আসরে সমবেত হয়েছিলেন, তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে চর্চা অব্যাহত রাখলে, অনেকেই সাধারণের কাছে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে পারবেন। প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি জগতের ভবিষ্যতেরা সকলে আলোচ্য আসরে অংশ নিয়েছেন এমন কথা হলফ করে বলতে না পারলেও, নিঃসন্দেহেই বলা যায়—এদের অনেকেই আরো অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারবেন। মূলতঃ যে বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেই বয়সটা হল—গড়ে ওঠার বয়স। এই বয়সে চাই অফুরন্ত উৎসাহ, উদ্যোগ এবং ধৈর্য। এই তিনটি বিষয়েরই মিলন ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব প্রস্তুতি কমিটি (১৯৭৯-৮০) আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়। সেদিক থেকে আলোচ্য অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনেকের মধ্যেই ভবিষ্যতের জন্য বাড়তি উৎসাহ নিয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বিশাল উদ্যোগ সৃষ্টির উন্নত মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকে সামান্য পরিমাণে হলেও রাজ্যের ভবিষ্যৎ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সুস্থভাবে গড়ে তোলার কাজেও উৎসব কমিটি আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান যথেষ্ট সফল ভূমিকা পালন করেছে।

যুব-ছাত্র উৎসবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অরুণ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব ১৯৭৯-৮০-এর অঙ্গ হিসাবে যুব কল্যাণ বিভাগ-এর তরফ থেকে রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ির তিলক ময়দানে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। এটি এই বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রথম রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ক'লকাতার রনজি স্টেডিয়ামে ১৯৭৮ সালের ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল তারিখে। উল্লেখ্য, ঐ বছরেই কিউবার হাভানায় একাদশ বিশ্ব যুব-ছাত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং তারই সঙ্গে সংগতি রেখে যুবকল্যাণ বিভাগ ১ম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের আয়োজন করেছিলো।

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে আমাদের আয়োজন এবার পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারেনি। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক অসুবিধার জন্য সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেননি এবং শিলিগুড়িতে বাসস্থানের অভাবের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয়ও অনেক কাটছাঁট করতে হয়েছিলো।

প্রাসংগিক ভাবেই আমাদের যুবকল্যাণ বিভাগের রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক বিষয়ের কথা আসে, আর সেইজন্যই এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। ক্রীড়া ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা এই বিভাগ আয়োজিত যুব-ছাত্র উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই তিনটি পর্যায় হ'ল ব্লক, জেলা ও রাজ্য। যেসব প্রতিযোগী ব্লক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সফল হ'ন তারাই জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে আহূত হ'ন এবং জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীগণ রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে উপযুক্ত বিবেচিত হ'ন।

আগেই বলা হ'য়েছে এবারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পূর্ণাঙ্গ হয়নি তার কারণ দু'টো। প্রথমতঃ, বিভিন্ন অসুবিধার জন্য আমরা কেবলমাত্র মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং এই চারটি জেলায় জেলা যুব-ছাত্র উৎসব সম্পন্ন করতে পেরেছি—ফলে বাকী জেলাগুলো প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি এবং স্থানাভাবের জন্য দলগত প্রতিযোগিতা সমূহ বাদ দিতে হ'য়েছে।

মহিলাদের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলো নিম্নোক্ত ৬টি ঃ—

(১) ১০০ মিটার দৌড়,
(২) উচ্চ লম্ফন,
(৩) দীর্ঘ লম্ফন,
(৪) লৌহ গোলক নিক্ষেপ,
(৫) ডিস্‌কাস্‌ নিক্ষেপ,
ও
(৬) বর্শা নিক্ষেপ।

পুরুষ বিভাগে যে ৭টি বিষয় প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিলো সেগুলো—

(১) ১০০ মিটার দৌড়,
(২) ৮০০ মিটার দৌড়,
(৩) উচ্চ লম্ফন,
(৪) দীর্ঘ লম্ফন,
(৫) লৌহ গোলক নিক্ষেপ,
(৬) বর্শা নিক্ষেপ,
(৭) ডিস্‌কাস্‌ নিক্ষেপ।

বিভিন্ন বিষয়ে ৪টি জেলার অংশ গ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীদের পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল ঃ—

(ক) **বর্ধমান জেলা**
পুরুষ প্রতিযোগী—১৩
মহিলা প্রতিযোগী— ৫

(খ) **মেদিনীপুর জেলা**
পুরুষ প্রতিযোগী—১১
মহিলা প্রতিযোগী— ৭

(গ) **মুর্শিদাবাদ জেলা**
পুরুষ প্রতিযোগী—১৩
মহিলা প্রতিযোগী—১০

তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে পোড়ামাটির সুদৃশ্য মডেল।

(ঘ) **দার্জিলিং জেলা**

পুরুষ প্রতিযোগী—১২
মহিলা প্রতিযোগী— ৪

শিলিগুড়ির তিলক ময়দানে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮-৩০ মিনিটে অংশ গ্রহণকারী সমস্ত প্রতিযোগীদের এক সুশৃংখল উদ্বোধনী কুচকাওয়াজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং তাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন যুবকল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সংক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ এলাকায় খেলাধুলার প্রসারে সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে যুবকল্যাণ বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচীর উল্লেখ করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহদান করেন। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার প্রতিযোগীদের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, এর শেষ হয় পুরুষদেরই ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিভাগে মেদিনীপুর ও মেয়েদের বিভাগে মুর্শিদাবাদ বিশেষ সাফল্য লাভে সক্ষম হয়।

শিলিগুড়িতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞান-পত্র প্রদান করেন যুবকল্যাণ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস।

পুরুষ ও মহিলা এই দুই বিভাগেরই অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের ক্রীড়া শৈলী আশাব্যঞ্জকরূপে উন্নতমানের ছিলো এবং মাঠের ভিতরে ও বাইরে তাদের সুশৃঙ্খল আচরণ প্রশংসনীয় ছিলো সন্দেহাতীত ভাবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে স্থানীয় ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ অকুণ্ঠভাবে আমাদের এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে সহযোগিতা ক'রেছেন। আমরা তাঁদের অকৃপণ সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

তিলক ময়দানের প্রদর্শনীতে যুবকল্যাণ বিভাগের স্টল।

মৃত্যুহীন প্যারী কমিউন

রবীন সেন

১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে ১৮৭১ সালের ৭২টি দিন। সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসে এই ৭২টি দিন আশ্চর্য প্রেরণার উৎস, শোষিত লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের জীবনে অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত স্মৃতি।

১৮৪৮-এ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করলেন তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রথম সংগ্রাম—প্যারী কমিউন।

১৮৬৯-এর ফ্রান্স। রাজতন্ত্রের তীব্র ভ্রূকুটি, প্রভাব ও প্রচারকে অগ্রাহ্য করে ত্রিশলক্ষ ভোট পড়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে অসন্তোষ। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহে আলোড়িত হচ্ছে সারা দেশ। জাতীয় সম্মান রক্ষার অন্ধ মোহে জনচেতনাকে বিভ্রান্ত করে হৃত মর্যাদা উদ্ধারের আশায় ১৮৭০ সালের ১৯শে জুলাই সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধ ঘোষণা করলেন প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই পরাজিত ফরাসী বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। বিজয়ী প্রুশিয়ানরা অবরোধ করল প্যারিস। শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রস্তুতি ও ঐক্যের অভাবের সুযোগে বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করে গঠন করল জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার।

দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত প্যারীর শ্রমিক শ্রেণী অবরুদ্ধ নগর রক্ষার জন্য নিজেরাই গঠন করল জাতীয় রক্ষী বাহিনী। প্রায় তিন লক্ষ মানুষ নাম লেখাল সশস্ত্র বাহিনীতে। মেহনতী মানুষের এই সংগ্রামী সশস্ত্র চেহারা দেখে আতঙ্কে শিহরিত বুর্জোয়ারা চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়ে আত্মসমর্পণ করল প্রুশিয়ানদের কাছে। নির্দেশ এল, জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিশ্বাসঘাতক সরকারের হাতে তুলে দিতে। শ্রমিকরা এবার রুখে দাঁড়াল, অস্বীকার করল অস্ত্র সমর্পণে। ১৮৭১-এর ১৮ই মার্চ বুর্জোয়া সরকার সৈন্য পাঠাল অস্ত্র দখলের জন্য। কিন্তু '১৮ই মার্চের সকালে কমিউন দীর্ঘজীবী হোক এই বজ্রধ্বনিতে জেগে উঠল প্যারিস' (মার্কস)। বুর্জোয়া সরকার প্যারিস থেকে ভের্সাইতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল। অস্থায়ী সরকার হিসাবে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব গ্রহণ করল জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি, ঘোষণা করল, 'প্যারিসের প্রলেতারিয়েতরা শাসক শ্রেণীগুলির ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহিতা দেখে এ কথাই অনুভব করেছে যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের পরিচালনাভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে পরিস্থিতি ত্রাণের মুহূর্ত সমাগত।'

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার মানুষের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়িত্বশীল ও ইচ্ছানুসারে প্রত্যাহারযোগ্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হ'ল কমিউন। শুধু পৌর শাসন নয় রাষ্ট্র পরিচালিত সব উদ্যোগই অর্পিত হ'ল কমিউনের হাতে। শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের সমর্থিত প্রতিনিধিরাই কমিউনে নির্বাচিত হলেন।

কমিউনের ঘোষণাবাণীতে ধ্বনিত হ'ল এতদিনের পরিচিত প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ম প্রতিবাদ। 'কমিউন ছিল সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বিরুদ্ধরূপ।' কমিউন ছিল এমন 'এক প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্টরূপ যা শ্রেণী-প্রভুত্বের রাজতান্ত্রিক রূপকেই শুধু নয় খোদ শ্রেণী প্রভুত্বকেই বরবাদ ক'রে দিত' (মার্কস)।

স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর অবলুপ্তি ঘটিয়ে কমিউন সেখানে নিয়োগ করল সশস্ত্র জনসাধারণকে। পুলিসকে সরকারের হাতিয়ার হিসাবে না রেখে তাকে পরিণত করা হ'ল কমিউনের কাছে দায়ী ও যে কোন সময়ে প্রত্যাহারযোগ্য রূপে। গরিবদের বকেয়া খাজনা মকুব করা হল, বন্ধ কারখানাগুলির উৎপাদন শুরুর দায়িত্ব দেওয়া হ'ল শ্রমিক সংস্থাদের। রুটি তৈরির কারখানাগুলিতে রাতের কাজ বন্ধ করা হ'ল। কারখানাগুলিতে প্রচলিত জরিমানা প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। রাষ্ট্রের ওপর অবসান হ'ল গির্জার কর্তৃত্বের। ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ক'রে শিক্ষাকে ঘোষণা করা হ'ল অবৈতনিক। কমিউন ঘোষণা করলঃ কমিউনের সদস্য হ'তে একজন নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মীকে সাধারণ শ্রমিকের মজুরি নিয়ে কাজ করতে হবে। এই ঘোষণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেনিন বলেছেন, 'এখানেই সবচেয়ে স্পষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র মজুরতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে মোড় ঘুরেছে, অত্যাচারীদের গণতন্ত্র অত্যাচারিত শ্রেণী সমূহের গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রেণী বিশেষকে দমনের জন্য বিশেষ শক্তি স্বরূপ যে-রাষ্ট্র তার রূপান্তর ঘটেছে; এখানে জনগণের অধিকাংশের, মজুর ও কৃষকদের সাধারণ শক্তি দিয়ে অত্যাচারীদের দমন করা হচ্ছে।'

[শেষাংশ ৪০ পৃষ্ঠায়]

মুন্সী প্রেমচাঁদ ও সাহিত্যে বাস্তববাদ

মহম্মদ আমিন

প্রতিটি ভাষায় সাহিত্যের অগ্রগতির একটি ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস মানবসমাজের অগ্রগতির ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই কারণে কোন সাহিত্যিক, কবি, লেখক বা নাট্যকারের মূল্যায়ন করতে গেলে এই বিষয়টা প্রধানত লক্ষ্য করতে হয় যে, শিল্প-সাহিত্যে বাস্তববাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার অবদান কতটুকু। তাছাড়া আরেকটা বিষয় মনেরাখা দরকার যে শিল্পী, সাহিত্যিক, কবির রচনাকাল কোন্ সময়। তার কারণ হ'ল যে সাহিত্য যদি শুধুমাত্র কল্পনার ভিত্তিতে রচনা হয় তবে সে সাহিত্য মানুষকে ততটা অনুপ্রাণিত করতে পারেনা যতটা বাস্তববাদী সাহিত্য করে থাকে।

মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে দমন করবার পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাঁকিয়ে বসে গিয়েছিল। মোগল রাজত্বের কালে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে একটা জড়তা থেকে গিয়েছিল এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেনি। যার ফলে মোগলরাজ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গেল, এবং এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, তাদের সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে শুধু বাঁচিয়েই দিলনা, তাকে আরো পোক্ত করল এবং ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্তম্ভরূপে গড়ে তুলল। ঠিক এই সময়ে উর্দু সাহিত্যে মুন্সী প্রেমচাঁদের আবির্ভাব ঘটল। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন উর্দুসাহিত্য আলিফলায়লা, আমির হাম্‌জা, হাতিম তায়ী গল্পে মেতেছিল এবং এগিয়ে যাওয়ার কোন সঠিক পথ পাচ্ছিলনা, তেমনি হিন্দী সাহিত্যও ঐ সময়ে রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের গল্পের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম উত্তরপ্রদেশের বেনারস জেলার একটি গ্রামে ৩১শে জুলাই ১৮৮০ সালে। প্রেমচাঁদের পিতার নাম ছিল মুন্সী আজায়ের লাল, তিনি পোস্ট অফিসের পিয়ন ছিলেন, চাকরী থেকে আংশিক উপার্জন হ'ত, অল্পকিছু জমিও ছিল। দুটি মিলিয়েই তাঁদের সংসার চলত। প্রেমচাঁদের আসল নাম হ'ল ধনপত রায়, তাঁকে আদর করে নবাব বলে ডাকা হ'ত। যখন তাঁর বয়স আট বছর তখনই তাঁর মা মারা যান, মায়ের স্নেহের অভাব মুন্সী প্রেমচাঁদ সারাজীবনই অনুভব করলেন, এবং বোধহয় এই কারণেই তাঁর গল্প এবং সাহিত্যে মায়ের প্রতি এত ভালবাসা দেখা যেত। উনি তের বছর বয়সেই যাদু-টোনার উপন্যাস পড়ে সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হন, এবং ১৮৯৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পরে চুনারের লন্ডন মিশন স্কুলের শিক্ষক হয়ে যান এবং তারপরে তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং বাহারাইচে শিক্ষক নিযুক্ত হন। তার কয়েকমাস পরেই তিনি প্রতাপগড়ে বদলী হয়ে যান এবং সেইখানে মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা করেন, যার নাম "ইসরারে মা-আবিদ"। এই উপন্যাসটি ১৯০৩ সালে বেনারসের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিস্তীতে প্রকাশিত হয়। চারিদিকে যখন অত্যাচার, বিশেষ করে গ্রামে কৃষকদের উপরে জোতদার-জমিদার-মহাজনের অত্যাচার এবং সারাদেশের উপরে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের অত্যাচার, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের যোগ-সাজসে যখন সমাজে নানারকমের অধঃপতন এবং যখন শিল্প-সাহিত্যও কলুষিত হচ্ছিল তখন উর্দু-সাহিত্যে প্রেমচাঁদের প্রবেশে মনে হ'ল যেন দীর্ঘ-কালরাত্রির পরে সকালের প্রথম আলো দেখা দিল। কেননা উর্দুসাহিত্যে মুন্সী প্রেমচাঁদ সর্বপ্রথম বাস্তব-বাদকে নিয়ে এলেন।

মুন্সী প্রেমচাঁদ নিজে কোনদিন ক্ষেতে লাঙ্গল ধরেননি, কিন্তু তাঁর গল্পে উত্তরপ্রদেশের গ্রাম-জীবনের যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তাতে তাঁকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে তুলনা করা যায়।

শরৎবাবু যেমন তাঁর সাহিত্যে গ্রামবাংলাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং সোজা সাদামাটা কথায় গ্রামের মানুষের বর্ণনা করেছেন মুন্সী প্রেমচাঁদ হুবহু তাই করেছেন। মুন্সী প্রেমচাঁদ একটা গরু বা একটা কুকুর বা একটি কৃষকরমণী বা একজন জমিদার যে কোন একটি বিষয়কে বেছে নিতেন এবং তাকে কেন্দ্র করে গোটা সমাজের অবস্থা বলে দিতেন। তার মধ্যে মানব চরিত্রের সমস্ত দিকই থাকত। ভয়ভীতি, লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা, আপষকরা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া কোন দিকই বাদ পড়তনা।

আমার একবার দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ে ইকবাল, প্রেমচাঁদ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, টলস্টয় ও লেনিনের যতগুলি বই আমি পেয়েছি সেগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে আমি পড়েছি, এবং সেই পড়ার মধ্যদিয়ে মুন্সী প্রেমচাঁদ সম্পর্কে আমার ধারণা যে উনি উর্দুসাহিত্যে তখনকার সমাজের সত্য কথাকে যত সহজ ও সরলভাবে তুলে ধরেছেন তা আজও অনেক সাহিত্যিক পারেননি। তাঁর যে কোন

একটি গল্প একটি আয়নার মত তখনকার সমাজের প্রতিফলন করে। শুধু ভাষার দিক থেকে নয়, বিষয়ের দিক থেকেও।

মুন্সী প্রেমচাঁদ মারা গিয়েছিলেন ১৮ই অক্টোবর ১৯৩৬ সালে, যখন তাঁর বয়স মাত্র ৫৬ বছর। উনি যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারতেন তাহলে হয়ত আজকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যেই তাঁর স্থান হ'ত। কিন্তু তাঁর গুনাগুন বুঝি এর চাইতেও বেশি এই কারণে যে তিনি বিংশশতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব কথা বলেছিলেন পরবর্তীকালে রুশ বিপ্লবের পরেও সেই সব কথার অর্থ আমাদের দেশে বোঝা যাচ্ছিলনা।

মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর যৌবনে গান্ধীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং একথা মনে করেছিলেন যে গ্রামের গরীবদের মুক্তি বোধহয় সেই পথেই আসবে। পরবর্তীকালে তিনি কিছু নতুন কথা বললেন, যেমন মহাজনী সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা এবং পঞ্চায়েতী রাজ্যের কথা। তিনি মনে করতেন যে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠিত হ'লে পরে সমস্ত ক্ষমতা পঞ্চের হাতে চলে আসবে এবং পঞ্চের মাধ্যমে পরমেশ্বর নেমে আসবেন, আর সকলের প্রতি ন্যায় বিচার হবে। কিন্তু তা হবে কি করে? এ প্রশ্নের জবাব উনি দিয়েছিলেন একথা বলে যে আমাদের কিষাণসভা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এটা মনে রাখা দরকার যে এই শব্দ "কিষাণসভা" কি অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে।

সমালোচকদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা এই কথা বলার চেষ্টা করেন যে মুন্সী প্রেমচাঁদ আজকের যুগে অচল। এটা শুধু অসত্য নয় একটা উদ্ভট কথা; তার কারণ হ'ল যে মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, নতুন সমাজের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মানুষ এবং তার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেসব কাজ কি সম্পন্ন হয়েছে? হরিজনদের উপরে তথাকথিত উঁচু জাতের অত্যাচার কি বন্ধ হয়েছে? নারী জাতির মুক্তি কি এসেছে? না এসব কোন প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়নি, এবং যতদিন এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবেনা অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবেনা ততদিন পর্যন্ত প্রেমচাঁদের সাহিত্য তাজা থাকবে, এবং সংগ্রামরত মেহনতী মানুষের বুকে ভরসা যোগাবে।

[মৃত্যুহীন প্যারী কমিউন: ৩৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কমিউনের মধ্যে ধনতান্ত্রিক সমাজ সেদিন স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য করেছিল তার ধ্বংসের বজ্র-গর্ভ মেঘ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে কেঁপে উঠেছিল শোষক প্রভুরা। তাই শ্রমিকদের ধ্বংসের লড়াই-এ সাহায্য করতে প্রুশিয়ান সরকার সমস্ত বন্দী ফরাসী সৈনিক-দের মুক্তি দিল। ভের্সাই আর জার্মান সরকারের সৈন্যরা আক্রমণ করল প্যারিস। অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে পথে পথে রক্তের আলপনা এঁকে দিল মৃত্যুঞ্জয়ী কমিউনার্ডরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২৮শে মে পতন হ'ল বুর্জোয়াদের হাতে প্যারিসের। বর্বর প্রতিহিংসায় বুর্জোয়ারা সেদিন রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছিল প্যারিসকে। শুধু গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ত্রিশ হাজার মানুষকে।

কমিউনকে বিচার করতে গেলে বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে যে কমিউনকে প্রথম থেকেই আত্মরক্ষার লড়াই এ ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীও সেদিন তার সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারেনি। শ্রমিকদের নিজস্ব কোন পার্টি ছিলনা, ছিলনা অভিজ্ঞতা। বুর্জোয়া ধ্যান ধারণার প্রভাবও ছিল তাদের ওপর গভীর। শোষণক্লিষ্ট কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ কমিউন স্থাপন করতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছিল ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশের মেহনতী মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে। দ্রুততার সঙ্গে ভের্সাই-এর বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে অভিযানও সংগঠিত করতে পারেনি কমিউন। তাই কৌশলী বুর্জোয়ারা সেদিন ধ্বংস করতে পেরেছিল কমিউনকে। কিন্তু মৃত্যু হয়নি কমিউনের আদর্শের। কমিউনই প্রথম পথ দেখিয়েছিল শ্রমিকদের আর্থিক মুক্তির রাষ্ট্রব্যবস্থার।

কমিউনের মৃত্যুহীন আদর্শ সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবে। সার্থক হ'ল চীন, ভিয়েতনাম আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুক্তি যুদ্ধে।

কমিউনের অভিজ্ঞতা ভাবীকালের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—শ্রমিক শ্রেণীকে শুধু আগের রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করলেই চলবেনা ঐ যন্ত্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করে স্থাপন করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র।

আজ পৃথিবীর এক চতুর্থাংশে উড়ছে সমাজতন্ত্রের জয় পতাকা। বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষ ছিন্ন করেছেন শোষণের শৃঙ্খল। গভীর থেকে গভীরতর সংকটে জর্জরিত হচ্ছে পুঁজিবাদ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংগ্রামে উত্তাল এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা। দারিদ্র্য, নিপীড়ন ও অনাহারের বিরুদ্ধে লড়ছে দুনিয়ার শ্রমিক। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের এই জয়যাত্রার মুহূর্তে মেহনতী মানুষ বারবার স্মরণ করবে প্যারী কমিউনকে।

'কমিউনের আদর্শ হচ্ছে সমাজবিপ্লবের আদর্শ, শ্রমজীবী মানুষের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আদর্শ। এ হচ্ছে সারা দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের আদর্শ। এই অর্থে কমিউনের মৃত্যু নেই' (লেনিন)।

শতবর্ষের আলোকে প্রেমচন্দ্

তপন চক্রবর্তী

যখন হিন্দী তথা উর্দু সাহিত্য বানানো কল্প-কাহিনী আর অবাস্তব চরিত্রের আজগুবি কাণ্ড কারখানার ভোজবাজীতে মসগুল হয়েছিল তখন সেই কল্পনার ইউটোপিয়া থেকে রক্তমাংসের মানুষের বাস্তব জীবনের কাছাকাছি হিন্দি তথা উর্দু সাহিত্যকে টেনে নিয়ে আসেন মনীষী লেখক মুন্সী প্রেমচন্দ্। তাঁর জন্ম ১৮৮০ সালে বেনারসের কাছা কাছি লমহি গ্রামে। বাবা অজয়ব রায় ছিলেন একজন ডাক কর্মী। শৈশবে মাতৃহীন প্রেমচন্দ্ জীবনের নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে—দুঃখ কষ্টের ঘনিষ্ঠ রূপকে অনুভব করতে পেরেছিলেন।

প্রেমচন্দ্ তাঁর আসল নাম নয়। তাঁর আসল নাম ধনপত্ রায়। লেখার জন্য রাজরোষে তাঁকে পড়তে হয় এবং নিজেকে গোপন রাখার জন্য কখনো নবাব রায় কখনো প্রেমচন্দ্ নাম নিতে হয়। অবশেষে প্রেম-চন্দ্ নামেই তিনি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

এই শতাব্দীর শুরু থেকেই প্রেমচন্দ্ তাঁর লেখনী ধরে ছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন (১৯৩৬ সাল) পর্যন্ত তাঁর কলম সক্রিয় ছিল। লেখক হিসেবে তিনি ৩৬ বছর ব্যাপী জীবন ও জগতের যে অবস্থা দেশের যে অবস্থাকে দেখতে পেয়েছেন তার ঘনিষ্ট বাস্তব রূপকে তাঁর কলমে সত্যনিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্বযুদ্ধের অলোড়নে অস্থির সেই সময়ের গ্রাম জীবন—শোষণে, নির্যাতনে, জরাজীর্ণ গ্রামীণ গরীব মানুষ তাঁর কলমে কেবল স্থির চিত্র হয়েই ফুটে ওঠেনি। নিজের সৃজনশীল প্রতিভায় এবং দূরদর্শী জীবনবোধের সাহায্যে তিনি নিপীড়িত মানুষকে প্রতিবাদের সিংহদুয়ার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর এই জীবনবোধ এবং শ্রেণীসচেতনতা তৎকালে কেবল হিন্দি বা উর্দু সাহিত্যেই নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই তুলনাহীন।

প্রেমচন্দ্ প্রায় ২৭৫টি ছোট গল্প এবং ১৫ খানি উপন্যাস লিখেছেন। এছাড়া প্রবন্ধ, নাটক, শিশু সাহিত্যও রচনা করেছেন, এবং অনুবাদও করেছেন কয়েকটি বই। তবে সর্বকিছুর উপরে গল্পে ও উপন্যাসে তিনি সবচেয়ে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাঁর উপন্যাসের মধ্যে বঙ্গভূমি, কর্মভূমি, সেবা-সদন, গোদান, গবন এবং গল্প গ্রন্থের মধ্যে কাফন সোজে বতন, সপ্ত সরোজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে একদিকে যেমন তিনি গ্রামের ও শহরের আর্থিক শোষণকে চিত্রিত করেছেন অন্যদিকে সমাজের নানা ব্যাধি, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে পাঠককে সচেতন করেছেন। তাঁর রচনায় দরিদ্রের দুর্দশা, পতিতাবৃত্তি, সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাত ইত্যাদির সমস্যাগুলি নগ্নরূপে ফুটে উঠেছে। এবং সেই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে এই সব সমস্যার মোকাবিলায় মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের কথা।

এবছর প্রেমচন্দের শতবর্ষ। এবং সেকারণেই প্রগতিশীল মানুষের কাছে এই শতবর্ষের এক বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। শতবর্ষের এই সুযোগে প্রেমচন্দের সাহিত্য পাঠ ও আলোচনার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা গড়ে তোলা আজ বিশেষ প্রয়োজন। কারণ প্রেমচন্দ্ তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে যে সমস্যাগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন সেই সমস্যা আজও প্রায় অপরি-বর্তিত রয়েছে। তাই আজকের জীবনেও প্রেমচান্দ্ সমান ক্রিয়াশীল।

আমাদের কাছে খুবই আনন্দের বিষয় যে প্রেমচন্দ্ শতবর্ষের এই তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শতবর্ষের শুরুতেই কলকাতায় প্রেমচন্দের উপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনসভার আয়োজন করে-ছিলেন। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শিশির মঞ্চের সেই আলোচনা সভায় হিন্দি বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি প্রেম-চন্দের উপর নানা দিক থেকে আলোকপাত করেন যা প্রেমচন্দ্ চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনা সভার উদ্বোধন করে শ্রী ই. এম. এস নাম্বুদ্রিপাদ্ বলেন—প্রেমচন্দ্ যে ভাষায় তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন সে ভাষা আমি জানিনা। অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য পাঠ করেছি। এবং বন্ধু বান্ধবের মুখে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা শুনেছি। এতে আমার প্রেমচন্দ্ সম্পর্কে মনে হয়েছে যে তাঁর মতন লেখক তৎকালীন যুগের ভারতীয় সাহিত্যে আর কেউ ছিলেন না। সেই যুগে যে বিষয়গুলিকে তিনি তাঁর সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন সেই বিষয়গুলি বহু বড় সাহিত্যিকেরই চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। সমাজের আর্থিক শোষণ, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রেমচন্দ্ যেভাবে তাঁর কলম নিয়ে লড়াই করেছেন তেমনটা সে যুগে আর কেউ করেছেন বলে মনে হয়না। তাঁর সম-কালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে যদি প্রেমচন্দের তুলনা-মূলক আলোচনা করা যায় তাহলেই আমরা প্রেমচন্দের

গুরুত্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব। এই তুলনামূলক আলোচনা সমাজের অগ্রগতির স্বার্থেই এক মহান ঐতিহাসিক দায়িত্ব হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রেমচন্দ্ চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে জানান পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুবাদের মাধ্যমে প্রেমচন্দ্ সাহিত্যকে বাঙালী পাঠকের কাছে পেশছে দিতে চান। প্রথম দিনের সভার সভাপতি রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং প্রেমচন্দের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি অল্পবয়সে তাঁর যে উষ্ণ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন এবং প্রেমচন্দের স্থায়ী স্মারক নির্মাণের জন্য তিনি আবেদন জানান।

দ্বিতীয় দিনে শ্রী কে. সি পাণ্ডে ও ডঃ সরোজমোহন মিত্র দুটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। দুজনেই প্রেমচন্দের সাহিত্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তাঁদের প্রবন্ধে তুলে ধরেন। ঐ দিনের বিশিষ্ট বক্তা ডঃ নামওয়ার সিং প্রেমচন্দের রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন যে প্রেমচন্দ্ গান্ধীবাদ থেকে ক্রমশঃ মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে ছিলেন এমন কথা বলাটা ঠিক নয়। এটা নিছক সরলীকরণ। আসলে গভীর মানবতাবাদী ছিলেন প্রেমচন্দ্। সেই মানবতাবাদী মনোভাবই তাঁকে গান্ধীজীর আন্দোলনের কাছাকাছি এনেছিল এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়েও নিয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় দিনে সর্বশ্রী আলিখ লখনৌভি, নারায়ণ চৌধুরী, অর্তব নারায়ন সিং, শ্রীমতী চন্দ্রাপাণ্ডে প্রমুখ প্রেমচন্দ্ সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধে উর্দু সাহিত্যে প্রেমচন্দের স্থান, প্রেমচন্দের উত্তরাধিকার, প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে নারী ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। এই দিনের সভাপতি ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী মহঃ আমীন।

চতুর্থ দিনে এবং অন্যান্য দিনগুলিতে প্রেমচন্দের সাহিত্য নিয়ে তৈরী কয়েকটি নাটক ও চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

এই আলোচনা চক্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন প্রেমচন্দের পুত্র হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম দিক্পাল শ্রী অমৃত রায়। তিনি প্রথম ও তৃতীয় দিনে আলোচনা করেন। প্রথম দিন তিনি প্রেমচন্দের সমকালীনত্ব বিষয়ে বললেন—প্রেমচন্দ্ যে সমস্ত সমাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে লিখেছেন, যে সব সংস্কার, দুর্নীতি, ও পশ্চাৎপদ মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন সেই সব সমস্যা, কুসংস্কার আজো আমাদের সমাজে বর্তমান। তাই প্রেমচন্দ্ সাহিত্য আজো সমান ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ দিনে তিনি প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে শৈলীর প্রশ্নে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, যারা প্রেমচন্দ্ সাহিত্যে শৈলীর অভাব আছে বলে মতামত রাখেন তারা আসলে সাহিত্যে শৈলী বা শিল্প সম্পর্কে তাদের অস্পষ্ট ধারণা থেকেই প্রেমচন্দ্ সাহিত্যকে বিচার করেন। প্রেমচন্দ্ যে সব বিষয়গুলি সাহিত্যে নিয়ে এলেন তা তার পূর্বসূরীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বাস্তব জীবন, দারিদ্র্য, শোষণ ইত্যাদির রূপকে সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রচলিত ধারণায় ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। প্রসঙ্গত তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন—একজন রাজকন্যা আর একজন দেহাতী রমণীর রূপ একরকম হয়না। দেহাতী রমণীর রূপকে উপলব্ধি করতে হলে যে সুস্থ সৌন্দর্যবোধ প্রয়োজন সেই বোধের আলোকেই প্রেমচন্দ্ সাহিত্যকে দেখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে সেদিন চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনও বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সব মিলিয়ে আলোচনা চক্রটি প্রেমচন্দ্ সাহিত্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে বলেই মনে হয়।

প্রেমচন্দ্ শতবর্ষের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে এমন একটি আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রেমচন্দের সাহিত্যকে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিশ্রুত পথে এগিয়ে যাবেন প্রেমচন্দ্ প্রেমীদের এটাই প্রত্যাশা।

আলোচনা

অলচিকি ও পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু

সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে পুরুলিয়ায় গণ-সম্বর্ধনা দিয়েছেন। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু উদ্ভাবিত সাঁওতালি ভাষার হরফ অলচিকিকেও এই সঙ্গে রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেন, সঙ্গে অলচিকি লিপিকে সাঁওতাল জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির উপযোগী করে তোলার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও।

পশ্চিমবাংলায় প্রায় ২৫ লক্ষ সাঁওতাল আদিবাসী বসবাস করেন। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়, বীরভূমে ও মালদহ জেলায় মূলত এরা বসবাস করেন। এছাড়াও পশ্চিমদিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, হুগলী, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু সাঁওতাল বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও সাঁওতাল আদিবাসীরা ছড়িয়ে রয়েছেন বিহারের চাইবাসা, সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম প্রভৃতি জেলায়, উড়িষ্যায় ও আসামের কিছু কিছু অঞ্চলে। অর্থাৎ মূলত ভারতের চারটি প্রদেশে সাঁওতালরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন।

সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় নেই। কিন্তু সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতিরও সুমহান ঐতিহ্য আছে। অতীতে সাঁওতালরা গভীর বনে জঙ্গলে বসবাস করত। এখনও তাদের অনেকে নগর সভ্যতার আলো দেখেনি, তারা নিজস্ব জীবন ধারার ঐতিহ্য অনুযায়ী ছোট ছোট গোষ্ঠী করে বসবাস করছেন সুদূর গ্রামাঞ্চলে। আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে নিজেদের একান্ত আপন জগতে তারা নিমগ্ন।

ভাষা মানুষের আত্মপ্রকাশের অন্যতম বাহন। প্রতিটি ভাষার বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সাধারণ সত্যই উদ্ঘাটিত হয় যে, মানুষ তার নিজস্ব সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ভাষার জন্ম দিয়েছে, ক্রম বিকাশ ঘটিয়েছে। মানুষ যখন সভ্যতার আলো পায়নি, তখনও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য নানা রকম পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। গুহাবাসী মানুষ নানা রকম চিহ্ন ও সংকেতের মাধ্যমে, চিত্রের মাধ্যমে নিজেদের ভাব প্রকাশ করত। ক্রমে ক্রমে মানুষের প্রয়োজনেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, বর্ণলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, ছাপাখানা সৃষ্টি হয়েছে, জন্ম নিয়েছে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে সামান্য কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এমন উন্নত সভ্যতা উপহার দিয়েছে যার ফলে সমস্ত ভাষারই ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, শব্দ ভাণ্ডার দ্রুত স্ফীত হয়েছে। নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবিত হয়েছে।

সাঁওতাল আদিবাসীরা দীর্ঘকাল অবহেলিত রয়েছে। তাদের মধ্যে এখনও অনেক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সাঁওতাল আদিবাসীরাও যখন বনে জঙ্গলে বসবাস করত, কখনও ভয়, সভা, যোগাযোগ করা প্রভৃতি বিষয় বোঝানোর জন্য তারা পাথরের গায়ে অথবা গাছের ডালে নানা রকম চিহ্ন ও সঙ্কেত এঁকে রাখত। শুধু চিহ্ন বা সঙ্কেতের এই সব ব্যবহারই নয়, সামনে কোন বিপদ বা ভয়ের আশংকা থাকলে তারা পশুর সিং দ্বারা নির্মিত নানারকম বাদ্যযন্ত্র দিয়ে বিচিত্র শব্দের সাহায্যে সেই সব বিষয়ে সতর্কও করত। এসব ছাড়াও এখনও বিভিন্ন জায়গায় সাঁওতাল অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় যে, গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের গায়ে নানারকম দাগকেটে তারা মালিকানা নির্দ্ধারণ করে দেয়। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন এখনও রয়েছে। বাঁ হাতে পোড়া দাগ সাঁওতাল উপজাতির চিহ্ন বহন করে। সাঁওতাল উপজাতি রমণীদের শরীরে শিল্প সুষমামণ্ডিত নীল রঙের প্রিন্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রিন্টগুলি অবশ্যই অর্থবহ এবং এগুলি উপজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে নানা রকম চিহ্ন সঙ্কেত শব্দ ধ্বনির যে ব্যবহার প্রচলিত, ক্রমে সেইসব চিহ্ন সঙ্কেত শব্দ ধ্বনি ভাষার জন্ম দিয়েছে কিন্তু লিখিত কোন সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ হয়নি, ছাপার হরফে বহু মানুষের সংযোগ সৃষ্টিকারী ভাষার জন্মও হয়নি, কারণ সাঁওতালী ভাষায় লেখার উপযোগী কোন হরফ ছিল না।

সাঁওতাল ভাষীদের মধ্যে শিক্ষার জন্য এবং ভাষা প্রকাশ করার জন্য বাংলা লিপির ব্যবহার করা হত। আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করার লক্ষ্য সামনে রেখে মিশনারীরা বিভিন্ন জায়গায় সুনিপুনভাবে আস্তানা গাড়ে। ধর্ম প্রচার করার

অছিলায় তারা সাঁওতালী জনগণকে রোমান হরফ ব্যবহার করার পথে ঠেলে দেয়। শিক্ষা ও ভাষার ক্ষেত্রে রোমান হরফ ব্যবহার করার জন্য খৃষ্টান মিশনারীরা উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু বিদেশী ভাষার হরফ ব্যবহার করে খুব একটা সুফল পাওয়া যায়নি, বরং সাঁওতালরা যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছেন।

অলচিকি লিপির উদ্ভাবক ও রূপকার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু যৌবনেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতি আধুনিক সভ্য সমাজে নিদারুণভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে যদি সাঁওতালী ভাষা তার একান্ত নিজস্ব হরফ উদ্ভাবন করতে না পারে। সাঁওতালী ভাষা ব্যবহার করার জন্য, চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং ছাপাখানার মাধ্যমে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর জনগণের মধ্যে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সম্পদগুলিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাঁওতালী ভাষার নিজস্ব লিপির প্রয়োজন।

খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে কেউ কেউ রোমান হরফ ব্যবহার করলেও রঘুনাথবাবু কিন্তু অনুভব করেন যে, রোমান হরফে বা বাংলা হরফে সাঁওতালী ভাষার একান্ত নিজস্ব যে উচ্চারণ ধ্বনি তা সার্থক-ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বস্তুত অন্য কোন ভাষার হরফে ঠিক ঠিক ভাবে সাঁওতালী ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট প্রকাশ করার জন্য, তাদের সংখ্যা সমগ্র সাঁওতালী যারা রোমান হরফ ব্যবহার করতেন সাঁওতালী ভাষাকে প্রকাশ করার জন্য, তাদের সংখ্যা সমগ্র সাঁওতালী জাতির তুলনায় অতি নগণ্য ছিল।

রঘুনাথবাবু কৌতূহলী মানুষ। এখন এই চুয়াত্তর বছর বয়সেও তাঁর চোখে মুখে কৌতূহল, অজানাকে জানার আকাঙ্খা তীব্র। একজন আবিষ্কারকের মত

সস্ত্রীক পণ্ডিত মুর্মু, সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত প্রশংসাপত্র

অপরিসীম ধৈর্য, প্রলোভনে ভুলে আত্মত্যাগ করার স্পৃহা এবং অন্যমত সহনশীলতার সঙ্গে বিচার বিবেচনা করে যুক্তি নির্ভর পদ্ধতিতে তা খণ্ডন করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার দুর্জয় নিষ্ঠা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর আছে।

হালকা শীতের সকালে রোদের দিকে পীঠ দিয়ে বসেছিলেন পণ্ডিত মুর্মু। মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, মাথায় ধবধবে সাদা অবিন্যস্ত কেশ। চুয়াত্তর বছরের দীর্ঘ জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছে হরফ আবিষ্কার ও প্রচার করার কাজে। শুরু করে ছিলেন ১৯২৫ সালে। আজও সেই প্রতিভা সমান-ভাবে উজ্জ্বল। বর্তমানে পণ্ডিত মুর্মু আছেন সিংভূম জেলার টাটানগরের করণ ডিহিতে ছেলের কাছে। ছেলে টিসকোতে চাকরী করেন। যুব মানস পত্রিকার প্রয়োজনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে সাঁওতালী ভাষা, সংস্কৃতি ও আদিবাসী জীবনের অনেক অজানা কথা টুকরো টুকরো করে জানতে পেরেছি।

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্ম ১৯০৫ সালের ৫ই মে। উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম দাঁড়-বোসে, বাবা নন্দলাল মুর্মু তাঁকে ম্যাট্রিককুলেশন পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। রঘুনাথবাবু বললেন—ময়ুরভঞ্জ জেলার বারিপাদা হাই স্কুলে লেখা-পড়া শেষ করে বারিপাদা পাওয়ার হাউসে শিক্ষা-নবীশ ছিলাম। কিন্তু শিক্ষা শেষ হ'লে কোন চাকরী করার ইচ্ছা হ'ল না। কুটির শিল্পে আগ্রহ দেখা দিল, বুনন শিল্পকে বেছে নিলাম।

কারপেট বুনন ও টুইস্টিং-এ অভিনবত্ব সৃষ্টি করলেন রঘুনাথ মুর্মু। বহু মানুষ তাঁর শিল্পী হাতের কাজ দেখতে আসতেন। একদিন ময়ুরভঞ্জ মহারাজার তৎকালীন দেওয়ান ডাঃ পি. কে. সেন এলেন দেখতে এবং মুগ্ধ হলেন। ফলে রঘুনাথজীকে প্রস্তাব দিলেন ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ যাওয়ার। রঘুনাথজী রাজী হয়ে গেলেন। কলকাতা শ্রীরামপুর ও গোসাবায় শিল্পের যান্ত্রিক কর্মকৌশল সম্পর্কে ট্রেনিংও নিলেন। তারপর বারিপাদা পূর্ণচন্দ্র ইনস্টিটিউটের ইনস্ট্রাক্টর। কিন্তু এখানেও মন বসলো না, স্থায়ী হতে পারলেন না। ছ'মাসের মধ্যে পিতা নন্দলাল মুর্মুর জীবনাবসান ঘটল, ফিরে যেতে বাধ্য হলেন রঘুনাথজী। দেওয়ান সাহেব আবার রঘুনাথজীকে তার বাড়ীর কাছাকাছি বাদামটালিয়া মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। এখানেই রঘুনাথজীর জীবনে খানিকটা স্থায়ীত্ব এসেছিল।

রঘুনাথজী যখন বারিপাদায় শিক্ষানবীশ ছিলেন

রঘুনাথ মুর্মুর নিজের হাতে লেখা অলচিকি

তখন তাঁকে আদিবাসী ভাষার বিভিন্ন লিপি লিখতে হয়েছে। সমস্যাটি তখনই তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। তিনি একান্ত নিজস্ব একটি বর্ণলিপির প্রয়োজনে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। সমস্যার জট খুলতে গিয়েই জন্ম নিল ইতিহাসের এক উজ্জ্বল মুহূর্ত, জন্ম নিল সাঁওতাল ভাষা-ভাষীদের নিজস্ব বর্ণমালা। অল চিক্রপট। তখন রঘুনাথজী বাদামটলিয়ায়। বর্ণলিপি না হয় এলো, তার প্রচার কিভাবে হল? আদিবাসী জনগণ নতুন বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত কিভাবে হলেন? কেমন করেই বা তা জনপ্রিয়তা লাভ করল? অলচিকির রূপকার রঘুনাথ মুর্মু এরকম একঝাঁক প্রশ্নের জবাব দিলেন ধীরে ধীরে একটার পর একটা করে। দেখুন, যৌবনকালেই কতগুলো প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে দেখা দেয়। দেখতাম চোখের সামনে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লেখাপড়া করে না, স্কুলে যেতে চায় না, অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে, সমগ্র সাঁওতাল জাত পিছিয়ে যাচ্ছে, সভ্য সমাজের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না।

ভাবতে ভাবতে ভাবনার জটও খুলতে লাগল। প্রশ্ন দেখা দিল আদিবাসী ভাষা 'Phonetically' অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে কতটা স্বতন্ত্র, কেন সাঁওতাল ছাত্ররা প্রচলিত বর্ণমালা গ্রহণ করছে না, কিভাবে বর্ণমালার উন্নতি করলে তা ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, ছাপা ও হাতের লেখার মধ্যে সুসামঞ্জস্য থাকবে এমন বর্ণমালার চেহারা কেমন হবে। ক'টা বর্ণের প্রয়োজন হবে, আদিবাসী সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, মাহালি বিহরদের ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা, রোমান, দেবনাগরী হরফ উচ্চারণ ধ্বনি যথাযথভাবে আনতে পারছে না। এবং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কেন বিভিন্ন ভাষার জন্য বিভিন্ন হরফ ব্যবহার করা হয়, এদের উদ্ভবের নেপথ্য কাহিনী কি? এই সব প্রশ্নই আমার হরফ আবিষ্কারের প্রেরণা, থামলেন রঘুনাথজী। "জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণ করার প্রচেষ্টাকেই প্রেরণা বলতে হয়। না হলে বাইরে থেকে অন্য কেউ আমাকে প্রেরণা দেয়নি।"

"অলচিকি তৈরী করার পর প্রশ্ন দেখা দিল প্রচার কিভাবে হবে। সবাইকে ধরে ধরে শেখান সম্ভব না। তার জন্য মুদ্রণ ব্যবস্থা চাই। বিদ্যালয়ে থাকতে থাকতেই একটা Hand Press তৈরী করলাম"।

হ্যাণ্ড প্রেস তৈরী করার অতীত স্মৃতি মনে পড়ে গেল পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর। একটু থামলেন তিনি। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস। "আজ অনেক মানুষ সময়ের অগ্রগমনের সাথে সাথে অল চিক্রপ্ট ব্যবহার করছেন"। ঘটনাচক্রে রঘুনাথজীর তৈরী হরফ ও হ্যাণ্ড প্রেসের খবর পেয়েছিলেন শিক্ষা দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা। তাঁরা রঘুনাথজীকে রাজ্য প্রদর্শনীতে অলচিকি দেখাতে বললেন, সেটা হচ্ছে ১৯৩৯ সাল। প্রদর্শনীতে অলচিকি দারুণ আলোড়ন তোলে, প্রচার বাড়ে।

আদিবাসী সাঁওতালী জনগণ অলচিকি হরফ ব্যবহার একদিনে রপ্ত করেননি। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় এলাকায় প্রচার কাজ চালিয়েছেন। হ্যাণ্ড প্রেসে লিপি ছাপিয়ে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বিলি করেছেন। বাধারও সম্মুখীন হয়েছেন। তবুও সাঁওতাল সমাজের নিজস্ব বাক্‌রীতি উচ্চারণভঙ্গী ও ভাষা মাধুর্য রক্ষার জন্য একক উদ্যোগে অগ্রসর হয়েছেন। যুক্তি-পরামর্শও অনেক দিয়েছেন। বেশ কয়েকজন শিক্ষিত সাঁওতাল হরফ আবিষ্কারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তারা অলচিকি দেখার পর সেটাই গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেন, এবং এর উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন।

অলচিকি প্রায় চার দশক আগে পৃথিবীর আলো দেখেছে। জন্মের পর কয়েকটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, দেশও স্বাধীন হয়েছে অনেকদিন আগে। কিন্তু সরকারীভাবে অলচিকি লিপিকে মেনে নেওয়া হয়নি এতোদিন। রঘুনাথ মুর্মু পশ্চিমবাংলা, বিহার উড়িষ্যার সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় ঘুরে ঘুরে লিপির প্রয়োগ পদ্ধতি, ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্য ও শব্দ গঠন প্রণালী সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে-

হরফ আবিষ্কারের সময় সাঁওতালদের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি বিশ্বাসকে ও পরিচিত জগতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যাতে লিপি দ্রুত রপ্ত করা যায়।

রঘুনাথবাবুর আবিষ্কৃত অলচিকি লিপিতে ছয়টি স্বরবর্ণ ও চব্বিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে অর্থাৎ মোট তিরিশটি বর্ণ আছে। ডায়া ক্রিটিক্যাল মার্ক ব্যবহার করার ফলে কেউ কেউ এই হরফকে অবৈজ্ঞানিক ও জটিল বলে মনে করেন, কিন্তু পণ্ডিত মুর্মু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন হরফ আবিষ্কার করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনেই এবং এগুলি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাঁওতাল ভাষার উচ্চারণ ধ্বনি সঠিকভাবে আনার জন্যই ডায়া ক্রিটিক্যাল মার্ক ব্যবহার করা হয়েছে সামান্য কয়েকটা ক্ষেত্রে। প্রত্যেক স্বরবর্ণের পর চারটি করে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, এই 'arrangenent' শিশুদের বর্ণ রপ্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক। কারণ একটি স্বরবর্ণ সামনে থাকায় বর্ণ পাঠে গতিশীল নিয়মের সৃষ্টি করেছে।

পণ্ডিত মুর্মু তাঁর লিপিতে অন্য কোন লিপির প্রভাব পড়েছে বলেও মনে করেন না। রঘুনাথবাবু ও তাঁর পুত্র আমাকে বর্ণগুলির গঠন প্রণালী বোঝাবার জন্য বেশ কিছু উদাহরণ দিলেন। কিভাবে, কোন

ঘটনাকে মনে রেখে কত সহজ উপায়ে এই সব লিপির কাঠামো রচিত হয়েছে তাও তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি সাঁওতালী ভাষায় কোন জ্ঞান বা পূর্ব ধারণা না থাকায় তা সঠিকভাবে আমি বুঝতে পারিনি এবং তাই তার ব্যবহারও করলাম না।

নানারকম জটিল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সাঁওতালী জনগণের নিজস্ব বর্ণমালা অলচিকি অগ্রসর হয়েছে। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'Adibasi Socio-Educational and Cultural Association' বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অলচিকির প্রচার কাজ সংগঠিত করতে এগিয়ে এসেছেন। অন্যান্য কিছু কিছু সংগঠনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সরকারী পর্যায়ে কোন স্বীকৃতি না থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র্য আদিবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে অলচিকি সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ অগ্রসর হয়েছে। সম্পূর্ণ অলচিকিতে মাসিক পত্রিকা 'Sagen Sakam' ছাপাও হচ্ছে। আদিবাসী জনগণের অর্থ সাহায্যে কলকাতার স্বদেশী টাইপ ফাউণ্ড্রি থেকে রঘুনাথবাবু ছাপার অক্ষর বানিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রেসও চালু করেছিলেন। কলকাতার 'Adibasi Socio-Educational and Cultural Association' নানারকম বইপত্র, পুস্তিকা ও সাহিত্য পত্রিকা 'Jug Jarpa' প্রকাশ করছেন অলচিকিতে।

দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম, গণডেপুটেশন মিছিল ও সভার মধ্যদিয়ে অলচিকিকে স্বীকৃতি দানের দাবী উত্থাপন করা হয়েছিল। কংগ্রেস সরকার জনতা সরকার সকলের কাছেই আবেদন পেশ করা হয়েছিল কিন্তু কেউ অলচিকিকে স্বীকৃতি দেননি। সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারই অলচিকিকে স্বীকৃতি দেন। আদিবাসী ও তপশিলী উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ শম্ভুনাথ মাণ্ডির সভাপতিত্বে গঠিত ক্যাবিনেট সাব কমিটি সুদীর্ঘ পর্যালোচনার পর আদিবাসী জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠের অভিমতকে মর্যাদা দিয়ে বিগত জুন মাসে অলচিকিকে সাঁওতাল জনগণের লিখিত ভাষার বাহন বলে স্বীকার করে নেন। সেই স্বীকৃতিই আনুষ্ঠানিক রূপ পায় গত ১৭ই নভেম্বর পুরুলিয়ায় হাজার হাজার আদিবাসীর উপস্থিতির আনন্দঘন অনুষ্ঠানে রঘুনাথ মুর্মুকে সম্বর্ধনা দানের সভায়। রঘুনাথবাবুর ধারণা বিহার, উড়িষ্যা ও অন্যান্য প্রদেশের সরকারও অলচিকিকে ধীরে ধীরে মেনে নেবেন এবং কালক্রমে অলচিকিই হবে সাঁওতাল জনগণের নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ট্যের সূচক।

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতাল জনগণের সামাজিক পশ্চাৎপদার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী। তাদের জীবনের নানা দিক নিয়ে শিক্ষামূলক কয়েকটা গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। যেমন অলচেমেদ, এলখা পোতপ (অংকের বই), পার্শি পোহা (স্কুল পাঠ্য বই), দারেশ ধন (নাটক), Ronode (ব্যাকরণ), বিধুচন্দন (নাটক), খেরোওয়ার বীর (নাটক) প্রভৃতি।

রঘুনাথ মুর্মু নিজস্ব কর্মক্ষেত্র ছাড়াও দেশ-বিদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু কিছু খবর রাখেন। আসামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে তিনি ব্যথিত, কেন্দ্রীয় সরকারের আরও তৎপরতা দরকার বলে তিনি মনে করেন। তিনি অবশ্য সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন না। মাঝে মাঝে সংবাদপত্র পাঠ করেই খবরাখবর জানতে পারেন।

সাঁওতালী ভাষার সৌন্দর্য ও নিজস্বতা রক্ষায় এবং তার অগ্রগমনে অলচিকি বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করবে বলে পণ্ডিত মুর্মু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। যারা এখন অলচিকির বিরোধীতা করছেন তারা অচিরেই তাদের ভুল ধরতে পারবেন কারণ এ কথা সবাই মানবেন যে একটি ভাষাকে আর একটি ভাষার লিপিতে প্রকাশ করলে ভাষা ক্রমশ দীন ও হতশ্রী হয়ে পড়ে। কেউ কি নিজের ভাষার ভগ্ন জীর্ণ চেহারা পছন্দ করেন দীর্ঘকাল। আমার ধারণা অলচিকির জয় ও স্থায়ীত্ব অনিবার্য।

নিজের ভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ রঘুনাথবাবু গৌরবান্বিত বোধ করছেন। ভবিষ্যতে এর উন্নতির জন্য আরও অসংখ্য শিক্ষিত সাঁওতাল যুবক এগিয়ে আসবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর শেষ জীবনের পাথেয়।

দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টার সাক্ষাৎকার শেষ করে ফিরে আসছিলাম এক বিস্ময়াভিভূত অনুভূতি নিয়ে। মাঝে চা টোস্টের লৌকিকতা শেষ করেছি। ওঠার আগে তাঁর স্বহস্তে অলচিকি লিপিতে কিছু লিখে দিতে বললাম। চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি, তবু ধরে ধরে লিখে দিলেন—"পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার অলচিকি লিপিকে স্বীকৃতি দিয়ে সাঁওতালি ভাষার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আশা করি সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য তাঁরা আরও অনেক কাজ করবেন"।

—বিশেষ প্রতিনিধি

মানভূমে পৌষের ভিড়ে

জি এম আবুবকর

বাঙালীর কাছে মাস হিসেবে পৌষের কদরটাই আলাদা। পৌষে গৃহস্থের ঘর ভরে যায় ফসলের সম্ভারে, আনন্দের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বাংলায় একটা চালু বাগধারা আছে—কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ। প্রিয় মাসটিকে ঠিক সর্বনাশের বিপরীত কোটিতে বসিয়ে পক্ষান্তরে তারই মহিমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুরুলিয়ার মানভূমী মানুষের কাছে পৌষের একই মর্যাদা।

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্নস্থানে মকর সংক্রান্তি ও টুসুপরব উপলক্ষে গ্রামীণ মেলা, মুরগী লড়াই ইত্যাদি আনন্দোপকরণের বিস্তর আয়োজন হয়। তবে এবছর খরাজনিত পরিস্থিতির জন্য মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাসে কিছুটা ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবু উৎসবের এই মরশুমে মানুষ সামর্থ অনুযায়ী মেতে উঠেছে, তাও দেখেছি।

'আঘন সাকরাত' অর্থাৎ অঘ্রাণ সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয় টুসুপরব। টুসু আজ মানভূমের মানুষের কাছে লৌকিক দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা। গ্রামের ধনী-নির্ধন সকলশ্রেণীর মানুষ এই উৎসব পালন করেন। টুসুপরবের জাঁক-জমক আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে একমাত্র বাঙালীর দুর্গোৎসবের তুলনা চলতে পারে। উৎসবের আগে ঘরে ঘরে নতুন কাপড়চোপড় কেনাকাটার ধুম পড়ে যায়। ঘর-দুয়ার ঝাড়পোছ হয়।

শোনা যায়, কাশীপুরের পঞ্চকোটরাজ টুসু ও ভাদু—এদুটি পরবের প্রবর্তন করেন। রাজদুহিতা টুসু ও ভাদুর অকালমৃত্যুর পর তাদের স্মৃতিরক্ষার্থে রাজা ভাদ্রমাসে ভাদুপরব ও পৌষমাসে টুসুপরব উদ্‌যাপন করেন এবং রাজ্যের প্রজাদেরও উৎসব পালন করতে উৎসাহিত করেন। তবে টুসুর নাকি মৃত্যু হয়েছিল বৈশাখমাসে। রাজ নির্দেশে পৌষমাসেই টুসু উৎসব শুরু হয়। মানভূম সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে এদুটি পরবের উৎসব সম্বন্ধে কথা পেড়েছিলাম। তিনি বলেছেন, রাজদুহিতা ভাদুর মৃত্যুকাহিনীর সঙ্গে ভাদু উৎসবের সূচনার ব্যাপারটি সঠিক। কিন্তু টুসু উৎসব মানভূমে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। এর সঙ্গে কোন রাজকুমারীর মৃত্যুকাহিনী যুক্ত নেই।

যাই হোক, 'আঘন সাকরাতের' দিন টুসুকে ঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওইদিন থেকে গ্রামের মেয়েরা টুসুগান শুরু করেন। টুসুগান আজ মানভূমী সংস্কৃতি তথা বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ। সহজ মোহনীয় পল্লীসুরে এগান গাওয়া হয়। সর্বত্র একই সুরের গান। মেয়েরা দলবেঁধে রাস্তায় চলতে চলতে, বনে কাঠ পাতা সংগ্রহ করতে করতে, ঘরে অবসর সময়ে আসর করে বসে টুসুগান করেন। গানের ভাষায় টুসুর মাহাত্ম, গ্রামজীবনের নানান কথা, প্রেমের কথাও থাকে। স্বভাব কবিদের মতো মুখে মুখে গানের কথা রচনা করা হয়। ইদানিং ছাপানো পুস্তিকায় টুসুগানের সংকলনও পাওয়া যায়। টুসুগান শুধু মেয়েরা নয়, ছেলেরাও করেন। তবে তাদের গানের কথায় আদি-রসের ছড়াছড়ি থাকে। সংক্রান্তির চারপাঁচ দিন পর থেকে গান বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এরপর গান গাইলে নাকি মুখে খোশ পাঁচড়া হয়।

সাকরাতে অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির রাত্রে মেয়েরা সারারাত জেগে গান করেন। পরদিন টুসুর "চৌডোল" নিয়ে দলবেঁধে নিকটবর্তী জলাশয় কিম্বা নদীতে ভাসিয়ে আসেন। সেই সঙ্গে মকর স্নান সেরে আসেন। মকর পরবে স্নানের রীতি এখানেও জনপ্রিয়। 'চকর দেখে মকর স্নান'—সূর্যোদয়ের সময় স্নান করলে বছরটা ভালো কাটবে। মকর স্নানে পুণ্যার্জনের ও পাপ স্খলনের প্রচলিত বিশ্বাস এখানে ততোটা পরিচিত নয়।

টুসুর 'চৌডোল' রঙিন কাগজ কেটে ও কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো হয়। দেখতে খানিকটা শিয়া মুসলমানদের মহরম পরবের তাজিয়ার মতো। চৌডোল প্রতি পাড়ায় বা বাড়িতে তৈরী হয়। অধিকাংশের আয়তন বেশ ছোট, খেলনা রথের মতো।

পৌষ সংক্রান্তিতে পুরুলিয়ার সর্বত্র মেলা বসে এর মধ্যে নামডাক আছে মাঠাপাহাড়ে মাঠাকুরুর মেলা, চাণ্ডিলের অদূরে সুবর্ণরেখার তীরে জয়দার মেলা বীরগ্রামে সতী মেলা, হুড়ার শিলাই মেলা, পুরুলিয়ার

কাছে চাঁচড়া মেলা, সুবর্ণরেখার তীরে ঐতিহ্যবাহী সতীঘাটার মেলা।

সংক্রান্তির দিন বলরামপুর থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটি ছোট মেলায় গিয়েছিলাম। সকাল থেকে সেখানে মোরগ লড়াই চলছে। বাবুগৌরবের কলকাতায় এককালে বাবুরা টাকা ওড়াতো মুরগী লড়াই করে। পুরুলিয়ার দেহাতী মানুষের কাছে আজো মোরগ লড়াই দারুণ জনপ্রিয়। অঘ্রাণ-পৌষ-মাঘ মাসে সর্বত্র মোরগ লড়াইয়ের আখড়া বসে। লড়াইয়ের মোরগ কেনাবেচা হয় নানান জায়গার হাটে। এ'বছর এক একটি মোরগ ১৫ টাকা থেকে ১৩০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। তাগড়া চেহারা, দারুণ লড়তে পারে—এরকম মোরগের দাম পঞ্চাশ ষাটের কম নয়।

মেলায় লোক আর ধরেনা। তার মধ্যে শ'আড়াই লোক গোল করে দাঁড়িয়ে মোরগ লড়াই দেখছিল। মোরগের একপায়ে ধারালো ফলার মতো অস্ত্র বাঁধা। স্থানীয় ভাষায় একে 'কাইত' বলে। লড়াই হচ্ছে প্রায় সমান সাইজের মোরগের সঙ্গে। দুর্বলের সঙ্গে প্রবলের নয়। দুটো মোরগকে মুখোমুখি ধরে রেখে রাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেড়ে দেওয়ামাত্র তারা ঘাড়ের কেশর ফুলিয়ে একে অপরের ওপর জাতশত্রুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঝুটোপুটি করতে করতে একের 'কাইতে' অন্যের বাজু বা পেট চিরে যাচ্ছে। আহত রক্তাক্ত পরাজিত মোরগ বিজয়ী মোরগের মালিকের পাওনা, রসনা তৃপ্তির আদিমতম রসদ। পরবের দিনে এইভাবে বহু নেশাগ্রস্ত লোককে মোরগ লড়াইয়ে টাকা ওড়াতে দেখলাম। অভাবী মনুষরাও বিরত নেই। অনেকে মোরগ লড়াই না করে শুধু লড়াইয়ের উপর টাকার বাজী ধরে জুয়া খেলছে। আজকাল আবার প্রাইজ দেবার চলন হয়েছে। নতুন জায়গায় লড়াইয়ের আখড়া বসানোর সময় লড়াইকে আকর্ষণীয় করার জন্য গেঞ্জী, ছাতা, বালতি ইত্যাদি গৃহস্থালী জিনিষপত্র উদ্যোক্তারা প্রাইজ হিসাবে ঘোষণা করেন। পুরুলিয়ার এই মোরগ লড়াই নামধেয় টাকার শ্রাদ্ধের ঐতিহ্য বহালতবিয়তে আছে, থাকবেও হয়ত দীর্ঘকাল এর জনপ্রিয়তার জন্য।

পৌষ সংক্রান্তির দিন বাঙালীর পিঠে পরব। পুরুলিয়াতেও এদিন সর্বত্র পিঠে খাওয়ার ও খাওয়ানোর প্রতিযোগিতা চলে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজন সকলে আন্তরিক অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হয়। আমিও বাদ গেলাম না। আমন্ত্রিত হলাম দুটি বন্ধু-গৃহে বাঙালী মেয়েদের কাছে পিঠে তৈরী-এ শিল্প বিশেষ। রসে ডুবু ডুবু পিঠে, চোবানো তেলে-ভাজা পিঠে, পিঠের পেটে নানানরকম পুর দিয়ে তৈরী পিঠে। ডালের, ছাতুর, সুগন্ধী মশলার, নারকোলের—নানান ধরণের পুর করতে বাঙালী মেয়েরা সিদ্ধহস্ত। চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী এসব পিঠে গরমজলের ভাপে সিদ্ধ করা হয়। খেলে রসনার পরিতৃপ্তি। তবে গরীবের অন্নব্যঞ্জনে যেমন পদের বৈচিত্র্য থাকেনা, তেমনি পিঠে পরবেও তাদের রকমফের করার সুযোগ থাকেনা। পুরুলিয়ার দরিদ্রসাধারণের প্রিয় আস্‌কা পিঠে, গুড় পিঠে আর উন্ধি পিঠে।

মকর সংক্রান্তিতে জয়দায় তিনদিনের বিরাট মেলা বসে। সংক্রান্তির পরদিন এক বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলাম মেলা দেখতে। বাংলার সীমানা পেরিয়ে বিহারের চান্ডিল, সেখান থেকে চার কিলোমিটার ভিতরে জয়দা। স্থানটি প্রকৃতির রূপপাগলদের বিহার ক্ষেত্র। এখানে এলেই মন আপনহারা মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। টাটা হয়ে পাকা রাস্তা এখানে সুবর্ণরেখার উপর দিয়ে রাঁচীর দিকে চলে গেছে। আশেপাশে ছোট ছোট পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এইখানেই পাহাড়ের গা ঘেঁসে সুবর্ণরেখা বাঁক নিয়েছে। সারা এলাকা সবুজ বনানীর চাদর মুড়ি দিয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে নদীর কিনারে শিবমন্দির। এইখানে প্রতিবছর মেলা বসে।

সকালবেলায় মেলায় গিয়ে দেখলাম মেঘলা আবহাওয়ার জন্য লোকজন বেশী আসেনি। সুবর্ণরেখার ব্রিজের পাশে রাস্তার ধারে মেলা উপলক্ষে জীবন-বীমার স্টল, পরিবার কল্যাণ স্টল, অস্থায়ী থানা বসেছে। পরিবার কল্যাণ স্টলের মাইকে বাজছে পুরনো হিন্দী ফিল্মের গান। প্রচুর দোকান পশারী বসেছে রাস্তার ধারে। টাটা কান্ডিল থেকে মেলায় আসার জন্য বাস, মিনিবাস, লরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপর্যাপ্ত ব্যাবস্থা অব্যাবস্থার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেলা যতো বাড়তে লাগলো, মেঘলা আবহাওয়া ততো কেটে যেতে লাগলো। মানুষের ভিড়ও বাড়তে লাগলো। মেলাটি যদিও বিহারের মাটিতে, কিন্তু মেলার দর্শনার্থী প্রায় সকলে বাংলা ভাষী দেহাতী মানুষ।

গ্রামের মেয়েরা দলে দলে 'চৌডোল' নিয়ে আসতে লাগলো। কণ্ঠে তাদের টুসুগান। অনেকে চৌডোলের পরিবর্তে পদ্মাসীনা টুসুদেবীর প্রতিমা এনেছে বিসর্জন দিতে। প্রতিমা তৈরীর চলন ইদানিং শুরু হয়েছে। ছেলেদের টুসুদলও আসছে। তাদের সঙ্গের মাদলের 'গেদা ঘ্যান গেদ্দে গুড়ুম' বোল অদ্ভুত মাদকতা সৃষ্টি করছে। তারা গাইছে—'বল্‌ সঙ্গাতি জয়দা কতদূর/ত'য় উন্ধি পিঠা তিলের পুর।' বড়ো দলগুলোতে শুধু মাদল নয়, ধমসা, ফ্লুট বাঁশিও আছে। দলের অনেকের হাতে টাঙি উঁচু করে উপর দিকে তুলে ধরা। কারো কারো হাতে পাতাসুদ্ধু জ্যান্ত গাছের ডাল উঁচু করে ধরা। সবাই টুসুগান করতে করতে নাচতে নাচতে আসছে। এনাচের কোন জাত নেই। প্রতিমা বিসর্জনের সময় ছেলেরা রাস্তায় যে উদ্দাম নাচ নাচে, তার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে। গানের ভাষায় আদি রস, স্থূল রসিকতা। বোঝা যাচ্ছে অনেকেই 'দারু' পান করে 'মস্ত্‌' হয়ে আছে। দেহাতী

মানুষের কাছে পরবে 'দারু' পান করাটাই রেওয়াজ। অনেক মেয়েরা মেলার দর্শনার্থীর বিচিত্র পোষাক-আসাক, আচার আচরণ লক্ষ্য করে গান রচনা করে গাইছে।

নদীর তীরে বালির চড়ায় জমজমাট মেলা বসেছে। অস্থায়ী হোটেল, রকমারী খাবারের দোকান, খেলনা, ভেঁপু, ঘর-গৃহস্থালী জিনিষপত্র, শাঁখের জিনিষ, মোষের সিংয়ের বাহারী জিনিষের দোকান বসেছে। সর্বত্র ক্রেতা-বিক্রেতায় গিজগিজ করছে। পুতুল নাচ বসেছে মেলার একপ্রান্তে। ধমসা মাদল বাজিয়ে তারা লোক জড়ো করছে।

নদীর পাড়ে বালিভর্তি অঢেল জায়গা। দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসেছেন। তারা সুবর্ণ-রেখার জলে ডুব দিচ্ছেন। তারপর শিবমন্দিরে গিয়ে পূজো দিয়ে আসছেন। মেয়েরাও নিঃসঙ্কোচে স্নান করছেন। নদীতে হাঁটুজল, অল্প স্রোত। স্নান করতে পায়ে একটুও কাদা লাগেনা। পায়ের নীচে শুধু বালি। অনেকে দলবলসমেত রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে রন্ধনক্রিয়ায় রত। যেন পিকনিক করছে। স্থানটি পিকনিক বিলাসীদের পক্ষে আদর্শস্থান। শুনলাম অনেকেই ছুটির দিনে এখানে এসে পিকনিক করে এবং কয়েকঘন্টার জন্য জায়গাটি সরগরম করে আবার চলে যায়।

নদীর দক্ষিণধারে খাড়াই পাহাড় অকাশে মাথা তুলেছে। পাহাড়ের গায়ে শিবমন্দির। ভক্তরা নতুন মন্দির তৈরী করে দিয়েছেন। এইখানে আগে ছিল পাথরের পুরনো মন্দির। মন্দিরের নিজস্ব মাইকে চলতি ফিল্মের ভজনগান এবং হালকা গান দুই বাজছে। অনেককে দেখলাম ট্রানজিস্টারে টেস্ট ক্রিকেটের রিলে শুনছে, আবার মেলাও দেখছে। মন্দির চত্তরে সাধু ও ভিখারীরা ছাউনি ফেলেছে। দেহাতী মানুষদের সঙ্গে শহুরে ভক্তরাও মন্দিরে শ্রদ্ধাবনত হয়ে পূজো দিচ্ছেন। মন্দিরচত্তরে প্রাচীন পাথরের শিবলিঙ্গের ছড়াছড়ি। এগুলি নাকি পুরনো মন্দিরেই ছিল। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো প্রাচীন পাথরের একটি ময়ূরারূঢ় কার্তিকমূর্তি, দুটি হর-পার্বতীর যুগলমূর্তি ও হাল আমলের তৈরী একটি বিশালকায় ষাঁড়ের মূর্তি শিবের বাহন। পুরনো মন্দিরের ভগ্নাংশগুলো যাদুঘরে দর্শনীয় বস্তুর মতো করে বেদীর উপর রাখা হয়েছে। একটি জায়গায় একটি পাথরে খোদাইকরা নিবিড় আলিঙ্গনে পিষ্ট ওষ্ঠাধর চুম্বনরত প্রেমিকযুগল মূর্তি দেখলাম। দেখে কোনারকের মিথুন মূর্তির কথা স্মরণে এলো। একটি প্রস্তর ফলকে দেখলাম আমার আজানা কোন লিপিতে অজ্ঞাত কোন বাণী উৎকীর্ণ আছে। এ লিপি না বাংলা —না হিন্দী, অথচ দুটি লিপির সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে।

প্রস্তর ফলকটি আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখে এক ভাগ্যবিশারদ সাধুজী বললেনঃ স্রিফ নেহরুজীনে এহি লিখাই পড়নে সকা। আমি সাধুকে জিজ্ঞেস করি নেহরুজী এখানে কবে এসেছিলেন। তাঁর জবাবঃ উন্নিশশো ছিয়াত্তর সালতক্। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি, তখন নেহরুজী ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। সাধু আমাকে আরো এক বিচিত্রতর তথ্য পরিবেশন করলেনঃ বিশ্‌কর্মাজীনে এহি মন্দির ব্যানায়া। দুনিয়ামে তিনো চীজোঁ বিশ্‌কর্মাজীনে আপনা হাথসে বানায়া। জগন্নাথ দেবকী মন্দির, এহি শিউ মন্দির, অউর সোনেকী লংকা।

স্থানীয় এক পূজোর প্রসাদবিক্রেতা দোকানদারের মুখে শুনলাম, শিব মন্দিরটি বহু কালের পুরনো, রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলের। আগে লোকে নৌকায় করে মন্দিরে পূজো দিতে আসতো। তবে মেলার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের নয়; ষাট সত্তর বছরের বেশী হবেনা। প্রথমে একদিনের জন্য মেলা বসতো। যখন সুবর্ণরেখার উপরে ব্রিজ হয়নি, তখন লোক বনপ্রান্তর পেরিয়ে পায়ে হেঁটে মেলায় আসতো। তাঁর কাছে আরো শুনলাম, মন্দির থেকে এক ফার্লং দূরে নদীবক্ষে প্রসারিত পাহাড়ের পাথরের উপর একটি বেদী আছে। সেখানে বসে সীতা রামচন্দ্রের সঙ্গে পাশা খেলে-ছিলেন। ঔৎসুক্যবশে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে গেলাম সেখানে। কিন্তু কোথাও কোন বেদী দেখতে পেলাম না। শুধু একটি স্থানে দেখলাম পাথরের একটি অসমান চাতাল। তার উপরে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে—'জয় রাম'।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হবার আগেই আস্তানায় ফেরার উদ্যোগ করলাম। সুবর্ণরেখার ব্রিজের উপর উঠে শেষবারের মতো চেয়ে দেখলাম, মেলা দারুণ জমে উঠেছে। মাইকের কলতান, মাদলের দ্রিম দ্রিম শব্দ, মানুষের কোলাহল প্রকৃতির এই নির্জন কোলকে মুখর করে তুলেছে।

গল্প

ফাস্ট' স্ট্রোক

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

পৌষ মাসের শীতের ভোরে বাইরের উঠোনটায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিল খোকা মড়ল। হাতে বালতি আর খড়ের লুটোটা নিয়ে "শালা" "শালা" বলতে বলতে টিউকলের দিকে গেল বঙ্কিম নন্দী। "খাক্ থু" "খাক্ থু" করে থুথু ফেলে বার কয়েক। হাত পা ঘসে ঘসে ধোয়। নাকের কাছে হাতটা নিয়ে গিয়ে তেরে তেরে শোঁকে। এক খাবলা গোবর নিয়ে হাত-দুটো বারকয়েক ঘসে। কাঁপতে কাঁপতে আবার হড়হড় করে হাত পা ধুলো। তারপর ঠক্ ঠক্ করতে করতে হাত পা মুছে বিড়িটা ধরায়। খোকা মড়ল মাথামুখের চাদরটা একটু ফাঁক করে মুখ বার করে বলে—'না খুড়ো তোমার সিদিন বুঝেসুঝে অমন কান্ডটা করতে হোত।'

বঙ্কিম নন্দী গায়ে চাদরটা জড়িয়ে গুড়িসুড়ি মেরে বসে বলে--'বুঝে সুঝে কিরে! শালী এলো তোর রোদ উঠতে, ব্যাটার অসুখের ধানাইপানাই শুনোতে শুনোতে। মাঠে আমার ধান। তা বললুম তোকে আর খাটতে হবেনি ঘর যা। তা বলে কি জানিস, গতকালের খাটুনির দামটা মিটিয়ে দাও।'

—'যা দিনকাল পড়েছে খুড়ো মিটিয়ে দিয়ে পাপ-যন্ত্রণা চুকিয়ে দিলেই ভাল হোত।'

—'থাম না! তা আমি বললুম, তোর জন্যি ট্যাঁকে টাকা লিয়ে ঘুরতে হবে না কি লো! আবার যেদিন ভোর ভোর আসবি সিদিন দুবো।'

—'ভালই তো বলেছিলে। কথায় কোন ম্যারপ্যাচ নাই।'

—'তা আমি বললুম তো শোনে কে। বলে ছেলের ওষুধ লাগবে আবার বারলিক লাগবে। তা রাগের মাথায় বলেছি খাটার গতর নাই, ছেলে তো বিয়োচ্ছিস পিল পিল করে।'

—'বেশ বলেছো খুড়ো'—খিক্ খিক্ হাসতে হাসতে বলে খোকা মড়ল।

—'তা তাতেই মহারানীর মানে লেদনা পড়ে গেল। তা জবাব কি জানিস, ট্যাঁকে পয়সা নাই তো মুনিস ডাকা কেনে!'

—'ইকি অনাছিষ্টি কথা। কোন শালা বলে বঙ্কিম নন্দীর পয়সা নাই। এমন গাছ পালুই কার ওঠে!' বেশ রাগ রাগ করে বলে খোকা মড়ল। গলাটা নামিয়ে তারপর বলে—'খুড়ির আমার বার ভরির বিছে—'

—'আর বুঝলি কিনা আমার মাথায় ঝাঁ করে রক্ত উঠে গেল; এমন কথা আমার মুখের সামনে আজ পর্যন্তি কেউ বলতে সাহস করেনি। রাগের মাথায় ঝাঁ করে মেরেদিলুম ব্যাঁতে এক চড়।'

—'ইখিনটিতেই তো ভুল করলে খুড়ো।' বিড়িতে একটা টান দিয়ে চাদরে ভাল করে টাঁকটা ঢেকে বলে খোকা মড়ল।—'হাজার হোক মেয়ে মানুষ। এক-ঝারে দল বেঁধে পঞ্চায়েতে চলেগেল। আর সি শালারাও তো ই-সব দেখতে বসে আছে। শালা চাটার ইয়ে চিয়ারে উঠেছে। তার উপর ডোমপাড়ার মাগী মরদ-গুলোর সি কি বিতিকিচ্ছিরি গালবাখান! তোমাকেই তো দোষ দিল।'

—'দিল বললেই মানলুম নাকি। বললুম গাল দিয়েছে তাই চড় মেরেছি। দোষ মানব কার কাছে! যা পারিস করে লিবি, কত হাতি গেল তল--'

—'আর সি জন্যিই তো ই কিত্তি খুড়ো'। আর একটা বিড়ি ধরিয়ে হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে খোকা মড়ল। 'মাঠে পাকা ধান তাও সয় সারা দেয়ালে গুল্যাপা!'

—'শালা শালীদের পেলে'--কথাটা বলতে বলতে হাত টা আর একবার শোঁকে বঙ্কিম নন্দী। 'শালা শুধু দিয়ালে চৌকাঠ পর্যন্তি।'

—'কি আর করবে খুড়ো'--সান্ত্বনা দেয় খোকা মড়ল। 'কলিকাল। গালমন্দ দিয়েই কি করবে। লোকে হাসবে গু ল্যাপার খপর শুনে। তার উপর মাঠে সত্তর বিঘে পাকা ধান। তোমার ঘরে খাটতে না এলে তোমারই লোসকান।'

—'তা তোরা সবাই মিলে তুলে দিবি। মাথা নুয়োবো কিরে!'

—'তা তো বুঝলুম কিন্তু আবার একটা ধর গিয়ে যদি গজড় লাগায়। সব চাষীরা কি আর আসবে এক্ষুনি যদি সব মুনিসগুলো বলে খাটতে যাবনি।'

—'বললিই হোল। পেটে জ্বালা ধরবেনি!'

—'পেত্নির আবার শাকচুন্নির ভয় খুড়ো! এমনিতে

জুটোনি আর দু'দিন খাবেনি। কিন্তু দেবতা একবার নামলে পাকা ধানে কি ক্ষেতিটা হবে ভেবে দেখো দিকিনি। তাইসই খুড়ো কিন্তু আবার যদি ল্যাপে—'

—'লেপলেই হোল'—গর্জে ওঠে বঙ্কিম নন্দী। 'হাত ভেঙে দুবো—আমিও শালা বঙ্কিম নন্দী।'

—'তা তো হোল খুড়ো কিন্তু রেতের বেলা লিপলে ক'রাত জেগে কাটাবে। তা ছাড়া যা দিনকাল রেতের বেলা পেছন থেকে তোমার গায়েই ঢেলে দিল এক খোলা।'

"থাক্ থু" "থাক থু" করে আর খানিক থুথু ফেলে বঙ্কিম নন্দী। গন্ধটা এখনও চারদিক ছড়াচ্ছে। মনে মনে গায়ে ঢাললে কি বিতিকিচ্ছিরি হবে ভাবতে ভাবতে গাটা গুলিয়ে ওঠে। আবার খানিক থুথু ফেলে। তার উপর পাড়াপড়শী দু'চারজনের সঙ্গে মন কষাকষি আছে। মরাই পালুয়ের গতর দেখলে, সনে সনে মা লক্ষ্মীর ক্ষেত্র বাড়লে অমন দু চার জনের রাগ হয়। আর সকাল হলেই তারা এক্ষুনি চারদিক চাউর করে দিবে। পাঁচজন এখন ব্যাঁত ফেড়ে দাঁত বার করে জিজ্ঞেস করবে ল্যাপা লেপির কথা। অন্যের কাছে শুনলেও জিজ্ঞেস করবে। একবার শুনলেও আরো পাঁচবার তেরে তেরে জিজ্ঞেস করবে। ভাবতে ভাবতে একটা বিড়ি ধরায় বঙ্কিম নন্দী। খানিক পরে বলে —"তা কি করা যায় বল্ দিকি মড়ল।"

খোকা মড়ল সামনের অবশিষ্ট দু'টি লড়া দাঁত জিব দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে—"আমি বলি খুড়ো এই ভোররেতে মাগীটার কাছে একবার যাও। ওর ব্যাটাটার হাতে একটা আধুলি দিয়ে বোলো মকরে মিষ্টি খাবি।"

—"সি কি রে বাবু—ই তোর যে বেশ কথা। ল্যাপাকে ল্যাপা আট আনা গচ্ছা।"

—"আহা হাতে দিলে বলে কি একবারে দিয়ে দিলে। পাঁচদিন কাজ করুক ধানটা উঠে যাক। তার-পর ঝাড়া হয়ে গেলে তো তোমার দিন। মুনিস তখন ফ্যা ফ্যা, শেষদিন আটআনা কেটে লিবে। আর ইদিক দিয়ে তোমার খপরটিও চেপে গেল।"

—"তোর মাথা বড় ভালো খেলে রে"—বেশ মোলায়েম করে বলে বঙ্কিম নন্দী। "আমার সব চুলগুলো পেকে গেল তবু তোর মত বুঝতে পারিনি।"

—"আমার থাকালিই তোমার থাকা খুড়ো।"—খিক্ খিক্ করে হাসতে হাসতে খুব খুশী হয়ে নিজের মাথাটাতে একবার হাত বুলোয় মড়ল। তারপর আবার বলে—"তবে একটু মোলায়েম করে বলো আরকি। তোর শ্বশুর আমার ঘরে খাটত। কত্তা বলতে অজ্ঞান। আর প্যালাটাকে বাইরে ডেকে হাতে একটা বিড়ির তাড়া দিয়ে দিও আরকি। নুলো হোক কুঠে হোক ভাতার তো বটে। ও বললে শুনবে।"

—'তাই করি বল্। তবে শালা ধান ঝাড়াটা হয়ে গেলে আমার একদিন কি ওদের একদিন। শালা তখন দেখে লুবো ডোম পাড়ার মাগী-মরদগুলোর কত তেল।'

—'তা তো দেখে লিবেই খুড়ো। শুধু পূর্ণ সূর্য্যি-গ্রেহণটা যেতে দাও। বোশেখ-জেষ্টি পড়ুক।'

—'হ্যাঁ দাঁড়ানা। এমন দিন চলবেনি! উপরে ভগ-বান আছে যেমুখে গাল দিয়েচে গলে গলে পড়বে। আর এক মাঘেতে কি শীত পালাইরে! আবার ভোট হবে চিরকালের গাঁয়ের মাথা বঙ্কিম নন্দী আবার মাথা হবে।'

—'তা হবে বইকি খুড়ো। তোমার মত গুণী লোক গাঁয়ে ক'টা আছে। গাঁয়ের লোকে আজও কি সম্মান দেয়। তা হারলেই কি মানুষের দাম কমে! তা যাক খুড়ো ঝুককো থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়। আবার পাঁচজনের চোখে পড়বে। হাজার হোক কলিকাল।'

টর্চটা ইচ্ছা করেই হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল বঙ্কিম নন্দী। একটু ঝুককো ঝুককো আছে দু'দিক ভালো করে দেখে যেতে হবে। হ্যাঁ যা ভেবেছিলো তাই। যে রাস্তা দিয়ে নাক খুলে এগোনো যেত না একবারে তক্ তক্ করছে। সব শালাশালীরা ভাঙা খোলায় কুড়িয়ে তার গাং দিয়ালিতে লেপে দিয়ে এসেছে। খোকা মড়লের কথাশুনে মাথাটা খানিক ঠাণ্ডা হয়ে-ছিল আবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। শালারা এত-দিন তার দুয়োর নিকিয়েছে আজ তাতে ল্যাপা! আজ এক চড়ে অত লাফানি তোদের বাপ দাদুদের যে পিঠে ঘা খেয়ে কালসিটে পড়ে গেসলরে! রাগে গরগর করতে করতে লম্বা লম্বা পা ফেলে প্যালার ঘরের দিকে এগোয় নন্দী। প্যালার দুয়োরে উঠে শ্বাস ফেলে। শালা ওর বোয়ের জন্যে যত কেলেংকারি। আগড়টা ঠেলে চড়চড় করে খোলে নন্দী। প্যালাকে হাঁক পাড়তে পাড়তে তোলে। প্যালা খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে "কত্তা যে" বলে উঠে বসে। সামনে পেয়ে খানিকটা তাকেই ঝেড়ে দেয় নন্দী—'শালা তোর বৌ আমার গাংদিয়ালিতে ইয়ে লেপে দিয়ে এয়চে। তোর বৌকে—' খানিক হাঁক ডাকে প্যালার বৌ লক্ষ্মী ওঠে। লণ্ঠনের আলোয় বঙ্কিম নন্দীকে দেখে বলে—"কত্তা যে।" "হু" করতে গিয়ে নন্দী ধ্যাৎ করে ওঠে। ঘরের এককোণে পাঁঠি ছাগলটা বাঁধা। তিনটে বাচ্ছা হয়েছে। সেগুলো লিড়বিড় করে। লক্ষ্মী উঠে বলে—"কত্তা একটু পেছন ফিরো দিকি।"

ধক্ করে ওঠে নন্দীর বুকটা। খোকা মড়ল এমন একটা কথা বলেছিলো বটে। পিছন থেকে ঢেলে দিতে পারে। শালা ছোটলোকের রাজত্বি কিচ্ছু বলা যায়নি। নন্দী এদিক ওদিক চেয়ে বলে—'কেন লো?'

—'না ফিরলে রেতের কাপড় কি তোমার মুখের উপর ঠিক করবো?'

—"অ"—বলে পেছন ফিরে নন্দী। পরে কি বলবে মনে মনে ঠিক করে।

—"হয়চে। ঘুরো"—বলে প্যালার বৌ।

ধাঁ করে ঘুরে নন্দী। তারপর বেশ চড়া গলায় বলে—'তুই যত নষ্টের গোড়া। শালা তোরাই আমার গাং দিয়ালি—'

ব্যা-ব্যা করে বার দুই ভ্যাবাই ছাগলটা। 'থাম থাম' করে ধমকায় নন্দী। কে শোনে কার কথা! প্যালার বৌ গায়ে হায়ে হাত বুলোতে তবে থামে। বেশ তোয়াজ করে হাতবুলোয় প্যালার বৌ। প্যালা নন্দীকে হাত নেড়ে বলে—'না-না কত্তা। লক্ষ্মী সারা রেতে পাশটি ফিরেনি। আমি বলছি কত্তা আমার দিকে পাশ ফিরে ছেলো। লক্ষ্মী আমার অমন লয়—'

—'কৈ গন্ধ দেখাও দিকি'—হাতটা সট করে নন্দীর নাকের ডগায় আনে লক্ষ্মী। গাটা গুলিয়ে ওঠে নন্দীর। ছাগলের বটকা গন্ধ।

—"হাঁ লিপেছিস।"—এতক্ষণে জোর ধরে নন্দী। 'আমিও শালা বঙ্কিম নন্দী সব থানায় ঢুকোবো। ভেবেছিস কি এখনও থানায় গেলে দারোগা আমায় সেলাম ঠুকে।' তড়াক করে একটু সরে যায় নন্দী। প্যালা বলে—"ও কিছু লয় ছাগল ছেনা।" লক্ষ্মী ততক্ষণে কোমরে কাপড়টা জড়িয়েছে। বলে "ঢুকোও না কেনে। তোমার ঘরে লোকে খাটতে যাচ্ছেনি, তোমার গাং দিয়ালিতে কে কি লিপবে তা সব দোষ পারা লক্ষ্মীর। কাল তোমার মাথায় রেতে কে কি ঢালবে তাও লক্ষ্মী। কাল তোমার মাঠ থেকে ধান যাবে তাও পারা লক্ষ্মী।'

মাথাটা পাঁই করে ঘুরে যায় নন্দীর। খোকা মড়লের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলে যাচ্ছে। এখনও সত্তর বিঘে ধান মাঠে পড়ে আছে। আবার যদি ঢেলেই দেয় মাথায় লোকে কত হাসাহাসি করবে। দিন ঠিক আসবে এখন শুধু একটু বুঝেসুঝে চলতে হবে। মাথাটা ঠান্ডা করে নন্দী। বলে—'তা কি আর পারি—তোদের সঙ্গে এমন করতে পারি?' ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ির তাড়াটা বার করে একটা ধরায়। একটা প্যালার হাতে দেয়। বাকি তাড়াটা চুপিসাড়ে চাদরের ভিতর দিয়ে প্যালার দিকে ঠেলে দেয়। প্যালা বৌয়ের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নেয়। অনেক দিন বিড়ি জুটছেনি। বৌ দিন গেলে গোনা পাঁচটি কিনে দেয়। বলে—"ভাত জুটেনি বিড়ি।" প্যালা ভাবে নেশা তো করোনি—মেয়ে মানুষ ইর আর কি বুঝবে! যাক কাল এখন একটু মৌজ করে খাবে। নন্দী এবার বেশ ঠান্ডা হয়ে বলে—"তা তোরা তো জানিস বাবু আমার মাথাটা মাঝে মাঝে গরম হয়ে যায়। তা লইলে তোর ব্যাটার অসুখ আর আমি অমন বলতে পারি। আর ধমকে দিতে গিয়ে বুঝলি না কি অসাড়ে হাতটা উঠেগেল।"

—"তা বলে গায়ে হাত তুলবে না কি?" ঝেঁঝিয়ে বলে লক্ষ্মী।

—"সি টি কিন্তু অন্যায় হয়েচে"—মাথা নেড়ে হাত ঝাকিয়ে বলে প্যালা। "গায়ে হাত কি! মেয়েছেলে মা লক্ষ্মী! আমার বৌ হাজার দোষ করুক তবু কেউ বলতে পারবে কোনোদিন প্যালা বৌকে এক ঘা দিয়েচে।"

—"আহা তোর বৌ আমার মেয়ের বয়সি।" গলাটা বেশ নরম নরম করে বলে নন্দী। 'ইকি আর মারব বলে মারা। আমার বড় বেটিটা তিন ছেলের মা কথা না শুনলে এখনও দুচার ঘা মারি। বিধবা আদরের বুন -সি দিন দুঘা বসিয়ে দিলুম। আহা মায়ামমতা আর থালিই তো অমন জোর করতে পারি। তা লইতো কি আর লোকের ঘরে গিয়ে মারতে যাচ্ছি! দুর শালা—' হাতটা ঝিনকোর নন্দী। ছাগলটা জিব দিয়ে নন্দীর পিছন দিকে নন্দীর ঘাড়টা চাটছে। নন্দী একটু সরে বসে আবার বলে—"তা বুঝলি কিনা বাছা আমার ঘরে খাটবি চ। আর যে ব্যাপারটা বললুম সেই ল্যাপার কথা চেপে যাবি বুঝলি। নোংরা জিনিস যত রটে তত খরাপ। চ খাটবি চ—রাগ করে কি হবে বাবু। তোর শ্বশুর—বুঝলি লক্ষ্মী—আমাদের ঘরে বাঁধা মান্দার ছিল। কি ভালবাসতো আমাকে। ছোটবেলায় কোলে করত—কত কিল চড় মেরেছি। তা ছাড়া প্যালা খোঁড়া মানুষ আবার তুইও যদি না খাটিস্"—

—"সি কথা বোলোনি কত্তা"—চটে বলে প্যালা। "আমি যা ইদিক উদিক থেকে যোগাড় করি একটা মরদ পারবোনি। তবে তুমি ঘর বয়ে এয়েচ—যাবেতা লইলে অমন অনিল কুণ্ডু হাতে পারে ধরে বলে গেল খাটতে গেলানি।" নন্দী আবার গরম হয়ে যায়। মনে মনে বলে—"বড় কথা তো শালার হাতে পায়ে ধরে। দাঁড়া শালা ধান টা উঠুক আর গেহণটা যাক তারপর দেখব শালা তোদের কি আমাদের এক দিন।" মুখ ফুটে বলে—"তা ওঠ—সকাল হয়ে গেছে।" পয়সা আট আনা কোঁচড় থেকে আর বার করে না। বাইরে এসে সারা ডোম পাড়াটার দিকে আগুন-দৃষ্টিতে একবার তাকায়। তারপর কাছা খুলতে খুলতে পুকুর পাড় দিয়ে চলে যায়।

খানিক পরে পুকুর পাড় সেরে ঘরে ঢুকেই নন্দীর মেজাজটা একেবারে তিরখে হয়ে যায়। লক্ষ্মী দুয়োরে বসে পা মিলে কলাইয়ের কাপে চা খাচ্ছে। আবার বলছে—"গুড়ের চায়ে একটুন আদা দিলে ষা লগেনি!" "মাঠ যা"—"মাঠ যা" বলতে বলতে গুয়োল ঘরের দিকে যায় নন্দী। মনে মনে গজ্‌গজ্ করে। "গাজবুলনে কথা শোনো—আদা দিলে চা ভালো লাগেনি!" রাগে রি-রি করতে করতে গরুর দাঁড় খোলে। নিজের মনেই বলে—"দাঁড়া শালার তেল মিটোবো। বোশেখ-জৈষ্টি আসুক। দিনকালটা একটু পালটাক।" চড়াক করে ওঠে চাদরটা। গরুর শিঙে লেগে ছিঁড়ে গেল। লাফাতে লাফাতে ডাংটা নিয়ে ফটাফট ফটাফট করে ঘা কতক বসিয়ে দেয় নন্দী। এই শীতে গায়ে ঘাম ঝরছে। হাজার হোক ষাট-পঁয়ষট্টি বয়েস হয়েছে তার উপর ভোর থেকে সারা

দেওয়াল লাতা দেওয়া, এত ঝগড়াঝাটি, গা জ্বলুনে কথা—মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে কতক্ষণ। ওদিকে আবার কানে ঢুকছে লক্ষ্মীর কথা—'আমাদের তো চারকাল জুটোনি ইকালে আর কি বাড়বে খুড়ি! তবে শুনছি কানাঘুষো দিনে আট টাকা বেতন লিয়ে সব এক চোট লাগবে। গমের দাম বেড়েছে, ধানের দাম বেড়েছে—খাটুনির দাম বাড়াতে হবেনি—গতর কি সস্তা!" ডাংটা হাতে নিয়ে নন্দীর মনে হয় গোদা গতরটা আগাদে দিয়ে আসে। আবার সেদিনের চড় চাপড়ের কথা মনে পড়াতে অনেক কষ্টে চেপে যায়। লক্ষ্মীর কথা আবার কানে ঢুকে—'কাল রেতে নিমাই বামুন এয়েছিলো। বলে গেলো কলকেতায় মিছিল করে যেতে হবে। আমাকেও যেতে বলে গেল। মন্ত্রী-দের সঙ্গে কথা বলতে হবে গো!' নন্দী ডাংটা এক-বার ঠোকে একবার 'মারবো' মারবো' বলে নামতে যায়। ঘামতে থাকে দরদর করে। ডাংটা দনে ঠোকে—ফোকলা মাড়ি দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। একা গোয়াল ঘরে মাথা নাড়ে। ভিতরটা হঠাৎ ধড়ফড় করে ওঠে। উল্টে দনের ভিতর পড়ে যায় নন্দী।

খানিক পরে চাকরটা চিৎকার করে গোয়াল থেকে লোক ডাকে। সবাই মিলে ছুটে এসে তোলে। একে-বারে অসাড়। কেউ বলে "ভূতে পেয়েছে গো" কেউ বলে "ঠাকুর পেয়েছে।" তুলে এনে দুয়োরে মাদুর পেতে বালিশ দিয়ে শোয়ায়। মুখে জলের ঝাপটা দেয়—মাথায় পাখা করে। বিনোদের পিসী গলায় কাপড় দিয়ে জোড় হাত করে বলে—"কি দোষ করেছি মা—বল মা কালী। মুখ ফুটে বল মা।" তবু মুখ ফোটে না। সব টিপ্ টিপ্ করে গড় হচ্ছে। হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বড় বেটা নরহরি বাপকে জড়িয়ে ধরে। ধরলেই কি হবে চোখ বন্ধ মুখ বন্ধ। দেহে প্রাণ নেই। নরহরির বৌ উঠে গিয়ে কত্তার বিছানার তলা হাতড়িয়ে চাবিটা নিয়ে আচলে বাঁধে। মেজ বৌ চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে কত্তার ছোট টিনের বাক্সটা নিজের ঘরে ঢুকিয়ে কাঁথা চাপা দেয়। ছোট বেটা খানিক কেঁদে ঘরে ঢুকে মায়ের বাক্স হাতড়ায়। ছুটতে ছুটতে আসে খোকা মড়ল। চোখ মুছতে মুছতে বলে—"খুড়ো আমায় পেছনে ফেলে স্বর্গে গেলো যে গো! এই ভোরবেলায় খুড়াকে যে ঠাকুর নাম করতে করতে গাং দিয়ালিতে গোবর লাতা দিতে দেখলুম গো! এই খানিক আগে বলছিলো গো লক্ষ্মীবার চারদিক পরিষ্কার করতে হয়!" সব্বাই ক'কিয়ে কেঁদে ওঠে। নন্দীর বিধবা দিদি "হ্যাঁ গো আমি কি করে বাঁচবো গো—দাদা যে আমার নেই গো" বলতে বলতে ঘর থেকে একটা ছেঁড়া বালিশ এনে মাথার নিচে দিয়ে নতুন মাথার বালিশ আর পাশ বালিশটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আসে। এতক্ষণে হোমিও-প্যাথ ডাক্তার আসে। আর দেখেই কি হবে! ডাক্তার নাকে খানিক তুলো শোঁকায়। বুকে টেথেস্কোপ বসায়। নাড়ী দেখে বলে—"বেঁচে আছে। এক্ষুনি জ্ঞান ফিরবে। তিনবারের বেলা বাঁচেনা। এই তো সবে ফার্স্ট স্ট্রোক।" আবার চোখ মেলে বঙ্কিম নন্দী।

নাটকের সুখ-দুঃখ এবং ফজল আলি আসছে

[৬২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

নাটকের প্রাণবায়ু। সমীরণের ভীরুতা এবং হীন-মন্যতাকে স্পষ্ট ক'রেছেন হারু বসু। এ ছাড়া অবিশ্যি কারো অভিনয়ই মনে দাগ কাটে না। মন্দার বাবা এবং ফ্যাক্টরীর মালিক চরিত্রের অভিনেতা জড় জিহ্বায় অজস্র ইংরেজী সংলাপ বললেও তা তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে সক্ষম হন না। এমনকি, তার উদ্দেশে দর্শকাসন থেকে কয়েকবার 'লাউডার' শব্দটি ছুঁড়তে শোনা যায়। তার আরেকটু সরব হওয়া দরকার। মন্দার একাকিত্ব, বিষন্নতা এবং বুদ্ধির ছাপ উপন্যাসে যেরকম ছোঁয়া গিয়েছিল, এখানে অভিনয় ত্রুটিতে তা একেবারেই অনুপস্থিত। বরং তাকে কেমন রঙিন সোসাইটি গার্ল মনে হয়। ঠিক তেমনই বোধায়নের কবিত্ব এবং সরলতার বদলে এখানে সে যেন একটি হাবাগোবা বয়স্ক বালক। সুব্রত কিম্বা বলু দু'জনেই অভিনয় ক'রেছেন আস্ত থিয়েট্রিকাল ভাঁড়ের মত। বরং সে তুলনায় বৌদি চরিত্রের অভিনেত্রী অনেক সাবলীল।

এই নাটকের মঞ্চসজ্জা একেবারেই প্রয়োজনহীন বাহুল্য হ'য়ে থাকে। জোন-বিভক্ত মঞ্চ নাটকের বাইরের ব্যাপার মনে হয়। গানগুলি শুনতে মন্দ না লাগলেও, তা আসলে নাটকের অন্যান্য দুর্বলতা ঢাকার প্রয়াসে মোহন প্রলেপের মত ব্যবহৃত। বিশেষত শেষ দৃশ্যে বেমক্কা ব্যাক-জোন থেকে যাত্রার ঢঙে গান গেয়ে ওঠা যথেষ্ট বিসদৃশ।

আসলে এই নাটকের যাবতীয় দুর্বলতার জন্যে দায়ী নাট্যকার অমর গঙ্গোপাধ্যায়। এরকম একটি তীক্ষ্ন থিমেটিক উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রদানের ব্যাপারে তিনি কেন মূলের সর্বগ্রাসিতার কাছে এ্যাত নতজানু র'য়ে গেলেন, বোঝা গ্যাল না। বস্তুত, সে কারণেই নাটকটি উপন্যাসের জলছবি হ'য়েই রইলো, আমাদের নতুন কোথাও পৌঁছে দিতে পারলো না। অথচ, সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।

—গৌতম ঘোষ দস্তিদার

দিন বদ্‌লায়

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন বদ্‌লায়
ফিরে আসছি
দিন বদ্‌লায়
দিন।

চোখের পাতায় উথালপাথাল
যেন আচম্বিতে
উঁচিয়ে ফণা ছুটে আসছে
অবাধ্য কৈশোর
ছোবল দিলো বুকে আমার
কখন হোলো ভোর—
তাকিয়ে দেখি হাসছো তুমি
উদ্ধত সঙীন।

দিন চলে যায়
দিন বদ্‌লায়
দিন চলে যায়
দিন।

তবুও ঝড় ধমক দেয়
মাটিতে মেশে ঘর
পায়ের চিহ্ন মিলিয়ে যায় ভিড়ে—
দুহাত ভ'রে ধরতে যাই
যা-ইচ্ছে-তাই খুশী
বুকের মধ্যে কোন্ চেনা মুখ
রাখছে আমায় ঘিরে!

আকাশে চোখ। কাঁপছে মাটি।
আগুনে-মেঘ ছোটে।
হতোদ্যম বুকে মেদুর
স্মৃতির মৃদু চাপ—
তবু কখন উঠে দাঁড়াই
শরীর টান টান
শিরায় ছোটে রক্ত, মনে
কিসের উত্তাপ?

বুঝতে হাতে হাত মেলাই
ঘৃণায় বাঁধি ভয়—
পাঞ্চজন্য গর্জে ওঠে
ভাঙতে দুর্দিন

দিন বদ্‌লায়
ফিরে আসছি
দিন বদ্‌লায়
দিন।

নতুন সূর্য নতুন দিন

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রত্যহ রক্তের মধ্যে ক্রোধ জমে ধারালো অশ্রুর মধ্যে ঘৃণা
এই ভাবে লালিত দুঃখ গুলি এক সময় গর্জে ওঠে নিজস্ব তাগিদে
পুড়ে ভালবাসা, পুড়ে সৌখীন সুখের শিল্প, পাতার প্রতিমা
রক্তাক্ত ভয়ঙ্কর মানুষের ইতিহাস এই ভাবে মানুষকে
রোজ শিক্ষা দেয়, জ্ঞান দেয়, যুদ্ধের পদ্ধতি প্রক্রিয়া
সহজে শিখিয়ে দেয় পৃথিবীর ভূগোল পাল্টায়।

স্বভাবের গুপ্ত কক্ষে দাবানল জ্বলতে থাকে জ্বলায় শরীর...

দেশের পুরানো ত্বক দগ্ধ করে, ছাল চামড়া ঝলসে যায় অবিনাশী তেজে;
সমাজ সভ্যতা পুড়ে স্বয়ংক্রিয় চুল্লির আগুনে
সমস্ত ঘৃণা ও ক্রোধ দুঃখ গুলি জোট বেঁধে প্রশস্ত রাজপথে
শোভাযাত্রা বের করে, বুকে সাঁটে কালো ব্যাজ
দুহাতে ফেস্টুন, প্রতিবাদে গর্জে ওঠে
গ্রেনেডের মুখে মুখে ঢালে তপ্ত খুন।

এই ভাবে শাসনের ছড়ি ভেঙ্গে প্রতিদিন এক একটা মানুষ
পাল্টে দেয় সিংহাসন মানচিত্র এবং মুকুট
নূতন সাম্রাজ্য এক জন্ম নেয় যুদ্ধরত সৈনিকের অস্ত্রের ডগায়
লাল সূর্য ঝলকে ওঠে, পৃথিবীর স্পর্ধিত যৌবন
সবুজ শস্যের সুরে ভূমিষ্ট দিনকে সুখে স্বাগত জানায়।

রক্তের ভিতরে গোপন ইশ্‌তাহার

সুবোধ চৌধুরী

এখন বস্তুত আগ্নেয় প্রস্তুতির কাল
কেননা অভিজ্ঞতার নখ-দর্পণে
শত্রুর ভয়াল মুখ আমি দেখেছি—
একদিন নিশ্চিত তার স্বার্থে
ভীষণ মারণাস্ত্র নিয়ে
আমাকে তোমাকে
মুখোমুখি হতে হবে।

কল্যাণী মাসিমা পানিহাটির
সোনারপুরের গীতা-বউদি
কিংবা সাত ভাই চম্পার এক বোন পারুল
মিয়াবাগানের অসীমা—
ওদের সকলের অশ্রুকে
বারুদে রূপান্তরিত করার চিন্তায়
মগ্ন ছিলাম আমি এতকাল
অনেককাল......।

এতদিন মূঢ় আমি
মোমের আলোয় করেছি শুধু পাঠ
জালিম জমানার সাগ্নিক সংকেত
অস্তিত্বের জীর্ণ দীর্ণ ভূর্জপত্রে।
এবার, বন্ধু, জেনেছি খবর ঃ
মালতী মায়ের বুকে-বাঁধা মাইন
—শত্রুর নিশ্চিত কবর!

তখন তাই আগ্নেয় প্রস্তুতির কাল।
সাথী,
এখন তাই
রক্তের ভিতরে গোপন ইশ্‌তাহার
নিঃশব্দ হাত-বদল করে কে।

জীবন সন্ধানে

কৃষ্ণপদ কুণ্ডু

দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ির দেশ
এই তরাইয়ের বুকে জমা আছে
কতো নিরন্ন মানুষের না-বলা ইতিহাস,
আশা হতাশার ব্যথাদীর্ণ বেদনা
জীবনযন্ত্রণায় আছে শরীরী উত্তাপ......
চা-গাছের তৃষ্ণা মেটায় রক্তক্ষরা স্বেদ ·
চা-শ্রমিকের ক্ষুধাতুর চোখে থাকে
নেতুন পাতা ও কুঁড়ির প্রসববেদনা।
রোলার পেশনীতে সবুজ রসটুকু
নিঃশেষ ক'রে দিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে
প্যাকিং বাক্সবন্দী হয় তার বিবর্ণ রূপ—
বাণিজ্যিক মার্কে ঢাকা পড়ে থাকে
নেপথ্য ভূমিকায় শ্রেণীস্বার্থের
উলঙ্গ শোষণ অথবা
ফোস্‌কা পড়া আঙুলের ছাপ ঃ
অলস নিদ্রায় ভোরের বিছানায়
জোটায় দৈনিক নেশার খোরাক।
অধিক মুনাফায় সভ্যতার উল্টোপিঠে
মালিকের বিছানো অন্ধকারে
লেখা হয় কালের ইতিহাস।
কিম্বা ভাটিখানার নেশাখোর কাটে
ওদের ব্যস্ত পেশীর শংকিত সময়
লাল ঝাণ্ডার ডাক শুনেছে শোষিত মজুর
কাস্তের শাণিত ফলা আর হাতুড়িপেটা শব্দ
চিনিয়ে দিয়েছে ওদের মুক্তির লাল পথ.....
পালা বদলের দিনে অগ্রপথিক
ওরাই নেমেছে পথে সংগ্রামী চেতনায়;
মুক্তির মাদল বাজাতে ওরাই আমাকে
রাজপথে টেনে আনলো রাজনৈতিক বোধিতে
ওদের নিরন্ন পেটের বস্তুবাদী বাণী
আমার উদ্বুদ্ধ করে জীবনে বাঁচার
সবুজ ফসল তোলার জীবন সন্ধানে
কেননা ওরাই তরাই-সভ্যতার মৃত্যুঞ্জয়ী
বিস্তৃতি॥

মৃত হরিণেরা আজ জেগে ওঠে

তপনকান্তি মণ্ডল

মৃত হরিণেরা আজ জেগে ওঠে
চারণের ক্ষেতে ঝর্ণার ধারে
শিকারীর শেষ তীরে
সমবেত অন্ধকারে অরণ্য নদী পার হয়ে
জ্যোৎস্না রোদ্দুর আসে ঃ স্বগত উজানে হাঁটে
উৎসবের আয়োজনে বেজে ওঠে ঘণ্টাধ্বনি

একদা এই চারণের ক্ষেতে
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির দিনে
শাবকেরা মেতেছিল ক্রীড়া-মাধুরীতে
দূরে ময়ূরীর সংগীতে
বনভূমি উঠেছিল নেচে
অথচ দিনের আলো নিভে না যেতে
রাত্রি নেমেছিল এই ভিজে মাটির বুকে

যখন আকাশের মেঘ ছিঁড়ে
নেমে এসেছিল তীব্র বর্শার গতিতে
ঝলমলে মিঠে সোনালি রোদ্দুর
সহসা তখন শ্বেতাঙ্গের শরে বিদ্ধ হ'ল নিরীহ মানুষ

মহাকলরোলে আজ বনভূমি কাঁপে
একে একে
মৃত হরিণেরা
ওঠে জেগে।

সত্যটা থাকবেই

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীটা ঘুরছে ঘুরবেই
সত্যটা থাকছে থাকবেই।
সূর্যটা উঠছে
ফুলগুলো ফুটছে
মৌমাছি জুটছে জুটবেই
বায়ুগুলো ছুটছে ছুটবেই।

মিথ্যেরা মরছে মরবেই
অন্যায় ঝরছে ঝরবেই।
হিংসেটা পড়ছে
পাপগুলো দৌড়ছে
ভয় ঠাঁই ছাড়ছে ছাড়বেই—
সত্যটা বাড়ছে বাড়বেই॥

মিছিলের প্রতিনিধি—আমিও

সুজয় চক্রবর্তী

মিছিলের প্রতিনিধি—আমিও
দেখি, এগিয়ে আসছে মিছিল
সমুদ্রের তীরঘেঁষা আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর মত
দুরন্ত আক্রোশে;
অগ্নিশিখার মত বুক চিতিয়ে
মনে সূর্যের তেজ নিয়ে
এগিয়ে আসছে বুভুক্ষু জনতার ঐ মিছিল
রাস্তার দুপাশের বড় বড় বাড়ীগুলোর দরজায়
ঐ ঢেউগুলো পড়ছে আছড়ে
ঐ বড় বড় দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে
অযুত কণ্ঠের সম্মিলিত স্বর
ওরা এগিয়ে আসছে
বারুদদগ্ধ রাজপথ দিয়ে
মৃত শবের পাশ কাটিয়ে—ধ্বংসস্তূপে
ওদের হাত ঊর্ধ্বমুখী, বজ্রমুষ্টি
মুখে দাবী-দাওয়া, আর ধিক্কারের
ফুলঝুরি, পরণে ছেঁড়া কাপড় আর বুকে সূর্যবহ্নি—
ওদেরকে অহর্নিশ এই মিছিলের প্রতিনিধি
করেছে।

ওদের হাতগুলো চায় আকাশ ছুঁতে—চায় বুঝি
ঈশ্বরকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনতে
ওদের এই সংগ্রামী রাজ্যে
স্বাধীনতার উদগ্র ক্ষুধা ওদেরকে দিয়েছে উৎসাহ
দিয়েছে প্রাণ, বলেছে, "তোমাদের বাঁচতে হবেই
তোমরাই ভবিষ্যৎ।" সংঘাতের কষ্টিপাথরে
নিজেদের যাচাই করে ওরা এখন সংগ্রামী—যোগ্যতার
উচ্চাসনে উপবিষ্ট হবার বাসনায়
ওদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর—
সামনে দাঁড়িয়ে "ঝুট্" কে "ঝুট" বলতে দেখে
আমার ভালো লাগল ওদেরকে
আমি সঙ্গ নিলাম ওদের অন্তহীন মিছিলে
মুখে দাবি-দাওয়া, ধিক্কার নিয়ে হাত ঊর্ধ্বমুখী,
বজ্রমুষ্টি করে
আমরা হেঁটে চলেছি—অন্তহীন সুদূরপ্রসারী
পথে।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

জ্বলে উঠল আলো—

আকৃতি-প্রকৃতি দোষ-গুণের কথা ভুলে গিয়েও একথা সবার আগে নির্দ্বিধায়, নির্ভয়ে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের অতি প্রিয়, অতি কাজের অতি প্রয়োজনের সঙ্গী ইলেকট্রিক বাল্বের জন্মশতবর্ষের কথা আমরা প্রায় ভুলে গিয়েছি।

অথচ গত একশ' বছরে মানুষ বিজ্ঞানের কাছ থেকে পাওয়া যতগুলি সুযোগ-সুবিধা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে কাজের, সবচেয়ে বেশীভাবে ব্যবহৃত বস্তুটির নাম ইলেকট্রিক বাল্ব। ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগেও ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলত, তবে তা ভাস্বর ছিল না, তার জীবনীশক্তি ছিল অতি সামান্য। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেভী নামে জনৈক ইংল্যাণ্ডবাসী কার্বণ আর্ক ল্যাম্প আবিষ্কার করেন। ব্যাপারটা ছিল খুবই সাধারণ। দু-খণ্ড কার্বণ দণ্ডকে দু'টি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের প্রান্তে জুড়ে দিয়ে তারপর কার্বণ দণ্ড দু'টিকে একবার ছুঁয়ে দিলেই তার মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং কার্বণ দণ্ড দু'টি যে বিন্দুতে একত্রিত হয় সেখানে সাদা উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হয়। আজকের দিনে স্কুলের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ছাত্ররা এরকম ঘটনা প্রায়ই দেখিয়ে থাকে। তার আগে অবশ্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেই জানা গেছিল যে কোন ধাতব পদার্থের মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ বিদ্যুৎ পাঠালে ও তাতে ধাতব পদার্থের তাপমাত্রা ২০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের উপর গেলেই ধাতব পদার্থ থেকে সাদা আলোর বিকিরণ ঘটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল যে এমন কোন ধাতু খুঁজে পাওয়া সেযুগে এতই দুষ্কর ছিল যা এই কাজে ব্যবহৃত হ'তে পারে। শুধু সেযুগ কেন আজকের দিনেও এমন ধাতুর সংখ্যা অত্যন্ত কম যা ২০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডেও গলে যায় না। যদি সেরকম কোন ধাতু খুঁজে পাওয়া যেত তাহলে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দেই ভাস্বর ইলেকট্রিক ল্যাম্প আবিষ্কৃত হ'ত। কারণ, ঐ বছর ফ্রান্সের ডি-লা-রুই নামে এক ভদ্রলোক সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য ভাস্বর ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালাতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গত ভাস্বর ইলেকট্রিক বাল্বের সঙ্গে একটু পরিচিত হওয়া যাক। ভাস্বর ইলেকট্রিক বাল্ব হ'ল সেই ধরণের বাতি যা বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে একনাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ আলো দিতে সক্ষম। আমরা সাধারণত এই ধরণের ইলেকট্রিক ল্যাম্পই ব্যবহার করে থাকি। এছাড়াও আরও এক ধরনের ইলেকট্রিক ল্যাম্প আছে যা সাধারণত ফোটোগ্রাফির কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের বাতির জীবনীশক্তি খুবই সামান্য।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। ফার্মার ও ওয়ালেস নামে দুই ব্যক্তি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদক যন্ত্র বা ডায়নামো আবিষ্কার করলেন। বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে ডায়নামোর উদ্ভাবকরা চালালেন তাঁদের যন্ত্র। ডায়নামো চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সাংঘাতিক চিন্তা ফার্মার মাথায় খেলে গেল যে একটা দারুণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সবাই স্রেফ বাহবা জানিয়ে বাড়ী চলে গেলেও সেদিনের সেই ঘটনা একজনের মাথায় অন্য এক চিন্তার জন্ম দিল। ব্যক্তিটি হলেন টমাস আলভা এডিসন আর চিন্তাটি হ'ল,—কিভাবে একটানা দীর্ঘক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে বাতি জ্বালানো যায়। কারণ, ফার্মার ও ওয়ালেস তাঁদের উদ্ভাবিত ডায়নামোর ক্ষমতা প্রদর্শন করতে গিয়ে ডায়নামো উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে একটি আর্ক-বাতি জ্বালিয়েছিলেন। একথা আগেই বলেছি যে, আর্ক-বাতি বেশীক্ষণ জ্বলে না। তার জীবনীশক্তি বড়ই ক্ষীণ। সুতরাং এডিসন চিন্তা শুরু করলেন।

এবং যেহেতু শুধু চিন্তায় পেট ভরে না, অথবা ফাঁকা চিন্তার রাজপ্রাসাদ গড়েও লাভ নেই অতএব কোমর বেঁধে কাজে নেমে লড়াই শ্রেয় মনে করলেন এডিসন। কিন্তু, তাতে আবার অর্থ প্রয়োজন। সুতরাং শুরু হ'ল অর্থ সংগ্রহের পালা। নিউ-ইয়র্ক শহরে থাকতেন এডিসনের বন্ধু গ্রসভেনর লাউরী। ভদ্রলোক পেশায় উকিল। ব্যবসায় সবেমাত্র পসার জমাতে শুরু করেছেন। এমন সময় এডিসন তাঁর বিচিত্র ইচ্ছা নিয়ে হাজির হলেন লাউরীর কাছে। বললেন কি তাঁর করার ইচ্ছা। এবার মাঠে নামলেন লাউরী নিজে। অর্থ সংগ্রহর কাজ ভালভাবেই এগিয়ে

চলল। তারপর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হল "দি এডিসন ইলেকট্রিক লাইটিং কোম্পানী।" স্থান নিউ জার্সির মেনলো পার্কে অবস্থিত এডিসনের বাড়ী। নামেই ইলেকট্রিক লাইটিং কোম্পানী। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাতি বা ইলেকট্রিক ল্যাম্প তখনও দূরে অস্ত্। প্রধান যন্ত্র ডায়নামো কেনা হ'ল। কেনা হ'ল আরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। সেযুগে প্রাপ্য সূক্ষ্মতম যন্ত্রাদিও এল এডিসনের পরীক্ষাগারে। এল বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত পৃথিবীর যাবতীয় বহু পুস্তক। সংগৃহীত হ'ল তাবৎ পত্র-পত্রিকা। সে এক সাংঘাতিক হৈ হৈ ব্যাপার। আর আনা হ'ল একশ' জন সুদক্ষ কর্মীকে। তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন জন অটো, জন ক্রুমেদী, চার্লস্ ব্যাচিলর এর মত সুনিপুণ কারিগরবৃন্দ। অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যার সুপণ্ডিত ফ্রান্সিস্ আপটন ও যোগদান করলেন এডিসনের পরীক্ষাগারে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার ডলার নিয়োজিত হ'ল এই প্রকল্পে।

এবার শুরু হ'ল পরীক্ষা। উচ্চ তাপমাত্রায় অবিকৃত থাকতে পারে এমন একটি পদার্থ খুঁজে বার করতে প্রায় দু-হাজার জিনিষকে কাজে লাগানো হ'ল। কাগজ, বাঁশ, কার্ডবোর্ড, থেকে শুরু করে অত্যন্ত দামী ধাতু পর্যন্ত কিছুই বাদ গেল না এই পরীক্ষায়; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তখন এডিসন মন দিলেন অন্য দিকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র ডায়নামোকে আরও উন্নত করতে প্রয়াসী হলেন তিনি। বিদ্যুৎ মাপার বিভিন্ন যন্ত্রাদি যেমন গ্যালভানোমিটার, ভোল্টামিটার, আমমিটার প্রভৃতিকে তিনি উন্নত করলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হ'ল না।

তারপর অবশেষে এল সেই আলোকসঞ্চারী চমকপ্রদ দিন। যেদিনের সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাকে পরদিনের নিউ-ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় 'ইয়াঙ্কী ব্লাফ্' বলে মন্তব্য করা হ'ল। সেদিনের ঘটনা সত্যি সত্যি মানবসভ্যতাকে নিয়ে এল আলোকময় যুগে। সমাজ-সভ্যতাকে হঠাৎ যেন এক ধাক্কায় এগিয়ে দিল অনেকটা পথ। যদিও সেই ঘটনার ফলাফলকে কাজে লাগাতে লণ্ডন শহরেরও লেগেছিল আরও ৪৩ বছর। তবু ঘটনাটি স্মরণীয়।

তারিখটা ছিল ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। স্থান আমেরিকার নিউ জার্সির মেনলো পার্কের এডিসনের বাড়ী বা "দি এডিসন ইলেকট্রিক লাইটিং কোম্পানী।" সেদিন সত্যিকারের ৬০টি ইলেকট্রিক বাল্ব লাগানো হয়েছিল এই বাড়ীটির প্রাঙ্গণে বৃক্ষ-শাখায়। বহু প্রতীক্ষা নিয়ে প্রায় হাজার তিনেক মানুষ হাজির হয়েছিলেন ওখানে। রীতিমত বিশেষ ট্রেনের আয়োজন করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে। কাঁচের গোলকের মধ্যে সাধারণ সুতোকে কার্বনাইজড করে রাখা হয়েছিল। আর তার বাইরের দুই প্রান্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সঙ্গে। আজকের উন্নত বৈদ্যুতিক বাতি বা ইলেকট্রিক বাল্বের সেই ছিল প্রথম সংস্করণ। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আজ অনেক কিছুর মত বৈদ্যুতিক বাতি সম্পূর্ণ নিজের জন্য এক সুন্দর সাজানো গোছানো একাধারে শৈল্পিক আধুনিক জগত গড়ে নিয়েছে সত্যি; কিন্তু তার জন্মকালের দীর্ণ চেহারার কথা ভুললে চলবে না আর যাই হোক পরমায়ু ছিল মাত্র ৪৫ ঘণ্টা। আমরা আবার ফিরে যাই সেই সাংঘাতিক উন্মাদনা সৃষ্টিকারী দিনটিতে।

এটাই অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধরে। আশা-আশঙ্কায় অন্য অনেকের মত এডিসন নিজেও কিছুটা চিন্তান্বিত। যদিও কিছুদিন আগেই পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন কিন্তু জনসমক্ষে এই হবে তাঁর প্রথম পরীক্ষা। যোগাড়যন্ত্র সব প্রস্তুত। সমস্ত যন্ত্রপাতি একবার খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হ'ল। চলল ডায়নামো। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগুলো হঠাৎ যেন প্রাণ পেল। আর তারপর সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল নিয়ে সমস্ত আশা-আশঙ্কা অপেক্ষা-প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে, জ্বলে উঠলো আলো।

শিল্প-সংস্কৃতি

নাটকের সুখদুঃখ এবং 'ফজল আলি আসছে'

নাটক শেষ হওয়ার পর মঞ্চোঙ্গনের বাইরে আলোকিত রাজপথে বেরিয়ে সিগারেট ধরাতেই একটি সোনালি থালায় কিছুটা শুভ্র ভাতের কথা খুব বেশি মনে হয়। এবং খালি পেটে সিগারেট টানতে টানতে ক্রমশই শরীরের মধ্যে ওই অমোঘ ক্ষিধের প্রবল টান অনুভব ক'রতে পারি। আর তখন, হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত কয়েক মুহূর্ত, নিজেকে নাটকে দ্যাখা ফজল আলি ভ্রম হয়। যদিও, তিন মুহূর্ত পরেই, নিজের কাছে, স্ফটিকের চেয়েও স্বচ্ছভাবে, নাটকের ফজল আলির সাথে আমাদের শ্রেণীগত পার্থক্যটা খুব প্রকট হ'য়ে ওঠে।

তফাৎটা এইরকম যে, তখন, রাতদুপুরে শহরতলীর একটি নিরাপদ ছাদের তলায় ক্ষুধার্ত আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে র'য়েছেন এক সহাস্য ভাতের থালা। আর আপাতত আমার লড়াই, লড়াই শব্দটি এখানে খুব সৌখিন অর্থে ব্যবহৃত বোঝাই যায়, নাটক নিয়ে সবান্ধবে কিছুকাল আঁতলেমো ক'রে, ট্রাম-বাস হাঁকড়ে সেই প্রতীক্ষারত ভাতের কাছে পৌঁছনোর জন্যে। তারপর ভরপেটে মৌরী চিবুতে চিবুতে ওই ফজল আলির মত মানুষদের জন্যে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, শীতল বাতাসে গা এলিয়ে কিছুক্ষণ, গভীর কুম্ভিরাশ্রু মোচন ক'রবো। এবং তখন, যখন আমি এইভাবে মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট নিয়ে দ্রব হ'চ্ছি, ঠিক তখনই মধ্যরাতে অবিকল মানুষের মত দেখতে কিছু বিজাতীয় প্রাণীর, যাদের দেখে আমরা, বাবুরা প্রায়ই নাকে রুমাল দিয়ে থাকি, তাদের ক্ষিধে ও সঙ্গম একাকার হ'য়ে যাচ্ছে কী নিবিড় অসহায়তায়! স্তব্ধ রাতে শূন্য খাবারের পাত্র হাতে তারা ক্রমশই কেমন পাষাণ হ'য়ে যাচ্ছে। হায়, এই বিপরীত সহাবস্থানের চেয়ে চরম অশ্লীলতা আর কীই বা হ'তে পারে।

হল থেকে বেরিয়ে অন্য কেউ কিম্বা আমিই হয়তো বলেছিলাম, 'আহ্, কী অভিনয়, ফজল আলির'! কথাটা হঠাৎ আমাকে তীরের মত বিদ্ধ করে। যদিও, হয়তো কোন কারণ ছিল না। আমরা তো যথার্থই একটি 'নাটক' দেখতে এসেছিলাম। সুতরাং অভিনয়, নাট্যরূপ, প্রয়োগকৌশল, সংলাপ, আলোকপাত, সঙ্গীত, মঞ্চসজ্জা, পোষাক-আষাক ইত্যাদি কিছু শৈল্পিক শর্তাবলী তো খুব অনিবার্যভাবে আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতার সৃষ্টি ক'রবেই—নাটক এবং নাট্য ক্রিয়াকৌশল নিয়ে স্বভাবতই ভাবিত হবো। তবু, হঠাৎ কীরকম খট্‌কা লাগে। ওইরকম একটি শ্বাসরোধী অবস্থা দু-আড়াই ঘণ্টা ধ'রে প্রত্যক্ষ করার পর, আমরা শুধু তার সূক্ষ্ম নান্দনিক দিকটি নিয়েই ভাবিত হবো, ওই ফজল আলিদের যন্ত্রণার আঁচ আমাদের নশ্বর শরীরে একটুও স্পর্শ ক'রবে না? নাট্যশিল্পের সাথে যে সামাজিক, মানুষিক সচেতনতার প্রশ্ন খুব নিবিড়ভাবে ওতপ্রোত, শুধুমাত্র শিল্পের খাতিরে তার সাথে এরকম গভীর ব্যবধান গড়ে উঠবে? শিল্প কি জীবনের চেয়ে তত মহান? সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বন্যাক্লিষ্ট মানুষের ছবি দেখে আঁতকে না উঠে ক্যামেরাকৌশল বিষয়ে ভাবিত হওয়া তো বস্তুতই কোন কাজের কথা নয়। তাহ'লে কি পরিচ্ছন্ন সন্ধ্যেবেলা ঘাড়ে পাউডার দিয়ে নিখুঁত পোষাকে বিলোল প্রেমিকা সহ ক্ষিধের নাটক, বিপ্লবের নাটক দ্যাখা একধরনের বিশুদ্ধ ফ্যাশানে পরিণত হ'য়েছে?—এইসব জ্বলন্ত প্রশ্ন আমাকে তখন যুগপৎ অসহায় এবং বিস্ময়াবিষ্ট ক'রে তোলে।

কিন্তু এখন তো একথা আমরা সকলেই জেনে গেছি যে, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি মূলতই একটি বিপ্লবী কার্যক্রম এবং তা অবশ্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত সেইসব অধিকাংশ অসহায়, বোবা, ক্রন্দনরত মানুষের উজ্জ্বল অস্ত্র হিসেবে। অর্থাৎ মাও-ৎ-সেতুং যাকে বৈপ্লবিক যন্ত্রের অংশবিশেষ রূপে উল্লেখ ক'রেছিলেন এবং যে মেসিনের উৎপাদিত ফলাফল ব্যবহার ক'রবেন সেইসব শোষিত শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদি সম্প্রদায়। এই ব্যবহারিক যোগ্যতাই শিল্পসাহিত্যের সার্থকতার একমাত্র মাপকাঠি। কেননা, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কলাকৈবল্য তো সোনার পাথরবাটি ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্দেশ্যহীন শিল্পবিলাস এই সমাজে বিশুদ্ধ যুক্তিহীনতারই নামান্তর। অথচ, শিল্প সংস্কৃতি আমাদের কাছে প্রায়ই একটা অর্থহীন শব্দ মাত্র। আর সেজন্য, আমাদের নান্দনিক দৃষ্টি

এ্যাতই একচক্ষু হরিণের মত যে, আমরা কেউ হিন্দী ফিলম্‌কেই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মনে করি, আর কেউ মাঝেমধ্যে চীনা খাবার খাওয়ার মত বিপ্লব-টিপ্লবের নাটক দেখে স্বাদ বদল করি! ব্যস্‌, এর বেশি কিছু নয়।

কিছুদিন আগে আমরা, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিমান এবং সংস্কৃত দর্শক মেট্রো সিনেমার নরম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আরামে ব'সে রঙিন পর্দায় একটি শক্তিশালী ছবি দেখেছিলাম। সেই ছবিটিতে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের স্পষ্ট ভূমিকা বিষয়ে আপোষহীন, জোরালো বক্তব্য রাখা হ'য়েছিল। অথচ, সেইসব তুচ্ছ ক'রে প্রতিষ্ঠান-পালিত জনৈক সিনে-আঁতেল আলোচ্য ছবিটির শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে একটি-মাত্র মহার্ঘ দৃশ্যের দিকে আঙুল-নির্দেশ ক'রেছিলেন, যেখানে দ্যাখানো হ'য়েছে নায়িকার নগ্ন, নিটোল পায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে একবিন্দু টলটলে জল। এবং লেখাই অতিরিক্ত, এই দৃশ্যটি ছবির মূল বক্তব্যের সাথে বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্ট নয়। অথচ, সেই প্রাজ্ঞ সমালোচকের কাছে তা খুব জরুরী ব্যাপার—শিল্পের খাতিরে! আর এই স্বেচ্ছামূঢ়তা থেকে ছবির মূল অভিঘাতটিই মাঠে মারা যায়। আসলে, এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সামগ্রিক ষড়যন্ত্রেরই অংশবিশেষ। কেননা, বুর্জোয়া-প্রতিষ্ঠান চিরকালই শিল্প-সাহিত্যকে ভয় পেয়ে এসেছে, যেহেতু তা খুব বিস্ফোরক ব্যাপার। তাই তারা আমাদের স্বচ্ছ দ্যাখাকে বিভ্রান্ত ক'রে দিতে সক্রিয়। এবং অনিবার্যভাবে, ধনতন্ত্রের ঢাক ঢোল বাজনা অবিরত শুনতে শুনতে, আমরাও তার শিকার হ'য়ে পড়ছি। তাই আমরাও এখন যেন শিল্প থেকে কোনরূপ গভীর এবং আদর্শিক শিক্ষার্জনে তীব্রভাবে বীতস্পৃহ।

সেজন্যেই, শিল্প-সাহিত্যের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক আমরা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মানুষেরাও এই পরিষ্কার, লক্ষ্যস্থির ছবিটির দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত, প্ররোচিত হ'য়েছি, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অর্থাৎ এ-কথা আক্ষরিক ভাবেই সত্য যে, এখনো শিল্পের মনোরঞ্জক ক্ষমতা যতটা ব্যাপক, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে তার ব্যর্থতা ঠিক ততটাই। আমাদের শিল্প-দৃষ্টির সীমাবদ্ধতাই এর জন্যে দায়ী। শিল্পের সংজ্ঞাকে জীবনের কাছাকাছি আনতে গেলেই শিল্প-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যেমন আতংক হয় (সম্প্রতি অশ্লীল নাট্য প্রচারের বিরুদ্ধে নাট্যকর্মীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আনন্দবাজার কোম্পানীর যেমন হ'য়েছিল), তেমনই আমরাও শিল্পকে রাংতার মোড়কে সুগন্ধী সাবানের মত পেতে আগ্রহী এবং অভ্যস্থ। তাহ'লে এখানে ব্যর্থতা কার—শিল্পের, শিল্পীর, দর্শকের না সমূহ ব্যবস্থার?

যদিও, আধুনিক বাংলা নাটক তার উষাকাল থেকেই সামাজিকক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হ'য়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের রূপটি স্পষ্টতর ক'রে দ্যাখাবার, আন্দোলনের গুরুত্ব বিষয়ে আমাদের সচেতন করার কাজে নাটক একটি বিশেষ হাতিয়ার রূপে বিবেচিত। আমাদের নাট্যজগৎ (উত্তর কলকাতার ক্যাবারেকাম থিয়েটারের কথা এখানে অবশ্যই ধরা হচ্ছে না।) একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে জীবনকে—জীবনের স্থিতি কিম্বা ভঙ্গুরতাকে তুলে ধরতে চেয়েছে আপোষহীনভাবে, সাবধানে এবং অবশ্যই শিল্পগত প্রক্রিয়ায়। সামাজিক আবহে, সুস্থ চেতনায়, গভীরতম অনুভূতির ছোঁয়ায় এ এক মনোরম দৃশ্যপট, যা আগামী সূর্যের স্বপ্নে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। আর এইটাই আমাদের কাছে আশা এবং আনন্দের কথা যে, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মত নাটক এখনো সংস্কৃতি-বণিকদের থেকে কেরিয়ার ঘুষ নিতে-নিতে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হ'য়ে যায়নি। বহু উজ্জ্বল প্রলোভন তুচ্ছ করে তা এখনো একটি স্থির ইডিওলজির প্রতি অবিচল, আস্থাশীল র'য়ে গ্যাছে। এবং তা সম্ভব হ'য়েছে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতার জন্যেই। অবিশ্যি, অনেকে রাজনীতি এবং শিল্পকে পরস্পর বিরোধী ব্যাপার বলে মনে করেন এবং সযত্নে রাজনীতিকে শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে সক্রিয় হন। তাঁরা সম্ভবত মনে করেন, প্রেমিক কবি লম্পট মাতাল জুয়ারী বোহেমিয়ান বেশ্যা সকলকে নিয়েই শিল্পসৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু কেউ যদি রাজনীতি করে, সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা'কে মেনে না নিয়ে যদি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়, তাহ'লেই আমাদের পোষা শিল্পী-সাহিত্যিকেরা তা থেকে সাত হাত দূরে ছিট্‌কে আসেন। আসলে, এরা সেই আদিমকাল থেকেই রাজার সিংহাসনের পাশে বীণা বাজিয়ে আসছেন, রাজাকে সিংহাসনে সমারূঢ় রাখবার জন্য তাদের বাদ্যি-বাজনার প্রয়োজন আছে। তাই চামচে-জীবী না হ'য়ে এদের উপায় নেই, নইলে প্রভুর রক্তচক্ষু তাকে গোল-গোল সুখ এবং খ্যাতির মিনার থেকে এক লাথিতে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে। সেটা নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষিত নয়! তাই রাজনীতির নামেই তারা আঁতকে ওঠেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, শিল্প ও রাজনীতির মধ্যে কোন সংঘাত নেই। রাজনৈতিক সচেতনতাই সৎ শিল্প সৃষ্টির একমাত্র উপাদান। শিল্পী যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, অসাড়তা বিষয়ে তাঁকে সচেতন থাকতেই হবে, এবং তার প্রতিফলন ঘটবে শিল্পকর্মে। কেননা, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় শিল্পীকে অবশ্যই কোন কল্যাণময় দ্বান্দ্বিক মতাদর্শের বিশ্বাসে অটল থেকে তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হবে। দরবারী শিল্প থেকে কিছু নগদ বিদায় জুটলেও তার কোন স্থায়ী মূল্য নেই, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

'৪০-এর দশকে বাংলা নাটক এই রাজনৈতিক

বিশ্বাস থেকেই গড়ে উঠেছিল, যার জন্যে দায়ী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সাংস্কৃতিক প্লাটফর্ম ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সেই ঐতিহ্য, যা তৎকালীন বুর্জোয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভিত অনেকটাই কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম হ'য়েছিল, আজো আমাদের গ্রুপ-থিয়েটারগুলি যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েই রক্ষা ক'রে যাচ্ছে। তবে দুঃখের ব্যাপার এই যে, নাটক দর্শকের অনেক কাছাকাছি নেমে এলেও, দর্শকেরা নাটকের দিকে ঠিক ততটাই উঠে যেতে পারেনি। নাটক এখনো আমাদের অনেকের কাছে নিছক অবসর বিনোদন ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা অনেকেই (আঁ) তেল-(আঁ) তেল মুখে নাটক দেখতে যাই এবং নাটক শেষে তা কতখানি 'প্রতিক্রিয়াশীল' কিম্বা তার সেট-কম্পোজিশান কতটা ভঙ্গুর সেই আলোচনায় আত্মতৃপ্তি অনুভব করি। (অর্থাৎ আমরা একদল 'অতি বিপ্লবী', আরেকদল গাড়ল। গাড়লদের কিছু বলার না থাকলেও কাগুজে বিপ্লবীদের জন্যে এইটুকুই বলা যায়, নাটক আর পোস্টার যে এক নয়, ব্রেখ্ট কিম্বা স্ট্যানিসলোভস্কির এই বিশ্বাস থেকে শিক্ষা নিয়ে একটু ধৈর্য সহ শিল্পবিচার করুন। এবং জেনে রাখুন, অ্যাকাডেমির ঠান্ডা ঘর থেকে বিপ্লব হঠাৎ মোয়া হ'য়ে হাতে চলে আসবে না।) এবং খুব অনিবার্যভাবে বাড়ি গিয়ে নাটকটির কথা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে সক্ষম হই। নাটকটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন হই না। অবিশ্যি এরজন্যে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই, ভন্ড দর্শকেরা একসময় প্রাকৃতিক নিয়মেই আমড়া পাতা খসার মত ঝ'রে গিয়ে সৎ দর্শকেরা নিজস্ব প্রয়োজনেই ঠিক নাটকের জন্যে রক্ত ঢেলে দেবে বীরের মত, প্রবীরের (দত্ত) মত।

এইসব কথা নতুন ক'রে মনে হ'ল সাম্প্রতিক কালে অভিনীত একটি নাটক দেখে—'নটরঙ্গ' প্রযোজিত এই নাটকটির নাম 'ফজল আলি আসছে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, আলোচ্য নাটকটি যে উপন্যাসের নাট্যরূপ তা প্রকাশিত হ'য়েছিল বঙ্গসংস্কৃতির পালকপিতা আনন্দবাজারকোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শারদ-কীর্তি রূপে। প্রতিষ্ঠানিক শাসনের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ ঈষৎ বিদ্রোহ ক'রে থাকেন, এবং শীর্ষেন্দুও এখানে তাই ক'রেছেন। অন্তত চেষ্টা ক'রেছেন। সেকারণেই এই উপন্যাসটি অনায়াসেই সমসময়ের একটি মহার্ঘ রচনা রূপে বিবেচিত হ'তে পারে। কী ঝরঝরে এবং জলতরঙ্গের মত অনায়াস শিল্পকর্ম শীর্ষেন্দুর করায়ত্ব, যা সাবলীল পদচারণার শেষে পাঠককে এক অনিবার্য স্থানুত্বের দিকে, যা কিনা অতল খাদের মত, ঠেলে দ্যায়। সমকালে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এই একটি উপন্যাস সরাসরি তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে। এই আপাতপরিচ্ছন্ন বেঁচে থাকার যাবতীয় অসহায়তা, নষ্টামো, ক্রুরতা, ভন্ডামী সবকিছু উজ্জ্বল ফুটে ওঠে শীর্ষেন্দুর অস্থির ক্যানভাসে।

রুবি ফ্যাক্টরির একজন অনশনরত শ্রমিক ফজল আলি। ১৪৫ দিন অনশনের পর কঙ্কালপ্রতিম এই মানুষটিকে আর ততো মানুষরূপে সনাক্ত করা যায় না। জ্বলন্ত ক্ষিধেকে গলা টিপে মারার চেষ্টায় তখন তার কোটরাগত চক্ষু দুটো প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত জ্বলজ্বল করে। কেননা, সে তখন এই সরল সত্যে পোঁছে গ্যাছে যে, ক্ষিধে ব্যাপারটা একটা শারীরিক অভ্যেস ছাড়া আর কিছু নয়। আর সেই অভ্যেসকে জয় করার জন্যেই তার লড়াই। প্রাথমিকভাবে তার লড়াই মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে হ'লেও, ক্রমশই তা রূপান্তরিত হ'য়েছে নিজের সাথে অবিরাম সংগ্রামে। সে স্বপ্ন দেখেছে—একদিন, তার এই নতুন যুদ্ধের শেষে যে চরমপ্রাপ্তি আসবে, তা সে পোঁছে দেবে পৃথিবীর সমূহ মানুষের কাছে—কি করিয়া না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সে বিষয়ে সে সমস্ত ক্ষুৎকাতর মানুষকে শিক্ষিত ক'রে তুলবে। তার কাছে ক্ষুধার্ত মানুষের এই-ই একমাত্র বাঁচার পথ। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এর মধ্যে একটা নঞর্থক চেতনা আভাসিত হ'লেও, এর ব্যাঙ্গাত্মক আবেদন অনেক বেশি তীব্র। এবং সেই তীব্রতাই আমাদের ক্রমশ একরূপে সদর্থকতার দিকে নিয়ে যায়। আর ওই অ-মানুষিক, প্রায় প্রতীকী চরিত্রটিকে কেন্দ্র ক'রে যে নাটকীয় বিন্যাস গড়ে উঠেছে, তার মানবিক দিকটিও কিছু কম স্বাস্থ্যকর নয়। তাছাড়া ফজল আলিকে আপাত চোখে সমাজ থেকে, একটি পূর্ণাঙ্গ লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাওয়া ব্যক্তি মনে হ'লেও অমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিৎ হবে যে, ফজল আলি আসলে একটি বৃহৎ লড়াইয়ে সামীল এবং তার চিন্তাচেতনা সবই নিবেদিত উত্তরকালের ক্ষুধার্ত মানুষের জন্যে। যদিও, তার লড়াই অনেকটাই প্রতীকী, রোমান্টিক; তাসত্ত্বেও তার মহত্ব এবং ব্যাঘ্র-মনস্কতার কারণেই সে একটি উজ্জ্বল চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

এই নাটকের আভিনয়িক শক্তি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশেষত, ফজল আলির চরিত্রে সুব্রত বসু আক্ষরিক অর্থেই অসাধারণ অভিনয় ক'রেছেন। এরকম একটি রক্তমাংসহীন প্রতীকী, প্রায় অবিশ্বাস্য চরিত্রে তিনি কোনরকম ক্রিয়াত্মক ভূমিকা ছাড়াই (চরিত্রটি আগাগোড়া একটি খাটিয়ায় শুয়ে ছিল।), শুধুমাত্র সংলাপ অবলম্বন ক'রে যে শক্তিশালী অভিনয় ক'রে গ্যাছেন, তা আমাদের বহুদিন মনে থাকবে। তাছাড়া দোলগোবিন্দ উকিলের চরিত্রে সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাপটের সাথে অভিনয় ক'রেছেন। তবে চরিত্রটির পরিকল্পনার ত্রুটিতে তাকে প্রায়ই এই নাটকের বিবেক বলে মনে হয়। তবু তিনিই এই

[শেষাংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়]

সজল রায়ের তুলিতে—

নাই নাই ভয়..

শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা। মহাশ্বেতা দেবী

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৮৬-তে প্রকাশিত।

"বাড়া গ্রামের ম্যাপগ্রাফে তপশীলীদের অস্তিত্ব একেবারে গৌণ ও প্রয়োজনীয়। গৌণ তারা মুখ্য এখানে রাজপুত সমাজ। প্রয়োজনীয় তারা সমাজের মুখ্য জীবগুলির বিবিধ কাজ করার জন্য। যেহেতু গ্রামটি মেদিনী সিং সদৃশ রাজপুতদের সৃষ্ট, সেই-হেতু এখানকার নয়ভাগ জমি তাদের দখলে। অন্যেরা, অর্থাৎ সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের জমি চষে।" চল্লিশ বছরের ধারাবাহিক মধ্য প্রাচ্যের এই ক্লোজআপ্ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা' উপন্যাসে। মূলত দুটি সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে একটি পরিবারের দু'পুরুষের নিটোল কাহিনীর মাধ্যমে। কাহিনীর সূত্রপাত বৃটিশ শাসন থেকে. শেষ হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত। আসলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শাসক ও শোষিতের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন লেখিকা ভাঙ্গী ও দুসাদ অধ্যুষিত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। বস্তুত যে অঞ্চলে সমস্ত জমির মালিকানা মাত্র কয়েকটি রাজপুত পরিবারের হাতে। এবং তাই রাজপুতেরা নিজেদের সমস্ত বিভেদ ভুলে হাতে হাত মিলিয়ে থাকে ভাঙ্গী ও দুসাদদের কব্জা করতে। সরল হিসেবে সমস্ত জমি কেন্দ্রীভূত হয়, আর দিনকে দিন ভূমিদাস ও ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। "বান্দা বা দাসপ্রথা আছে কি নেই তা বান্দাদের কেউ জানায়নি। তাদের বংশধরদের বেলা মালিকদের সুবিধে বেড়ে যায় আরো।" শুধু তাই নয় এইসব মধ্যযুগীয় প্রায় দাসদের জীবনের অত্যন্ত ন্যায্য ও সামান্য সুখগুলি এইসব 'মালিক' শ্রেণী যে রকম স্বাধীকারে প্রমত্ত হয়ে নষ্ট করে দেয় তারই সত্যনিষ্ঠ জীবনমুখী সাহিত্যরূপ এই উপন্যাস।

উপন্যাস শুরু হয়েছে গণেশের জন্ম থেকে। তার-পর সেই জন্মকে কেন্দ্র করে মেদিনী সিং-এর পরি-বার এবং তারপর সেই পরিবারকে কেন্দ্র করে বাড়া গ্রাম তথা সমগ্র সমাজটাই উপস্থিত হয়েছে উপন্যাসের পটভূমিকায়। উপস্থিত হয়েছে পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যানুবায়ী গণেশ সিং-এর অবিচার অত্যাচার ও ব্যাভিচারের কাহিনী। উপস্থিত হয়েছে ভাঙ্গীদের লোকসংস্কৃতি সং-এর গান। এই সময়, সমাজ ও সামাজিকতার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে গণেশ সিং নামক একটি চরিত্রের কিংবা একটি শ্রেণী চরিত্রের তথা একটি যুগের [যা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক] পতন ফুটে উঠেছে।

আর এই পতনকে ফুটিয়ে তুলতে লেখিকা নিপুণ-ভাবে অত্যাচারিত চরিত্রগুলির Development ঘটিয়েছেন। লছিমা জীবনের স্বপ্ন ও সাধকে বিসর্জন দিয়ে, পিতার রক্ষিতা ও পুত্রের ধাত্রীরূপে দ্বৈত জীবন যাপন করে, দীর্ঘ জীবনে নির্মম দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। আর তারই ফলস্বরূপ দেখতে পাই গণেশ সিংকে হত্যার হোতা হিসেবে স্তনদায়িনী সেই লছিমাকেই। সেই একই কারণে গান্ধী মিশনভুক্ত তপশীলীদের নেতা উভয়ের নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। সর্বহারাদের কোন জাত থাকতে পারে না—ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত ভাঙ্গী ও দুসাদরা এক হয়েছে বাঁচার তাগিদে সেই অভিজ্ঞতাতেই। আর এই-সব কিছুর নিয়ামক হিসাবে যিনি আছেন, সেই দেবাংশী পুরুষকে দাঁড় করিয়েছেন লেখিকা ব্যঙ্গ করে নাম ভূমিকায়।

সর্বশেষে লেখিকাকে সাধুবাদ জানাতে হয় এই উপন্যাসে তাঁর ভাষা ব্যবহারে। নাটকের মত তিনি চরিত্রগুলির মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন উক্ত অঞ্চলের কথ্যভাষা থেকে। কিন্তু যেখানে লেখিকা স্বয়ং উপস্থিত, উপন্যাস যেখানে বর্ণনাত্মক—তা হয়েছে প্রাঞ্জল বাংলা প্রবন্ধের ভাষা। তাঁর অন্যান্য মহতী সৃষ্টিগুলির মত এই উপন্যাসটির মধ্যেও লেখিকার আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা' অচিরেই নিজের আসন করে নেবে আশা করি।

—দুর্গা ঘোষাল

বিভাগীয় সংবাদ

বাঁকুড়া জেলা :

শালতোড়া ব্লক যুব-করণ—শালতোড়া ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং ব্লক ফুটবল প্রতিযোগিতা কমিটির পরিচালনায় ব্লক ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা ২২শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে মোট ৩৪টি স্থানীয় দল অংশ গ্রহণ করে। যুব কল্যাণ বিভাগ থেকে ব্লকে এই প্রথম ক্রীড়া সামগ্রী সাহায্য দেওয়ার ফলে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় যুব সংস্থাগুলির মধ্যে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার হয়। ব্লকের ৩৪টি যুব সংস্থার ৪০৮ জন তরুণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় তিলুড়ি মনোমোহিনী ইনস্টিটিউট ও শিরপুরা উদয়ন সংঘ যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

গত ৭ই ডিসেম্বর শালতোড়া ব্লকের রঘুনাথচক গ্রামে শালতোড়া ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ও রঘুনাথচক মহিলা সমিতির পরিচালনায় সেলাই শিল্পের উপর মহিলাদের একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ সূচী প্রাথমিকভাবে নয় মাস স্থায়ী হবে। পরবর্তী কালে এর কাজ পর্যালোচনা করে এর স্থায়ীত্বকে বাড়ান হতে পারে। বর্তমানে এই কেন্দ্রে ৫৩ জন শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মহিলা প্রশিক্ষণরত।

চলতি বছরে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্লক যুব-করণ পাঠ্যপুস্তক ঋণ দিয়েছেন। মোট তেত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রী ব্লক যুব-করণের পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার থেকে এই সাহায্য পাচ্ছেন। পাঠশেষে তারা পুস্তকগুলি ফেরত দেবেন।

স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে এই ব্লক প্রায় সাতটি প্রকল্প অনুমোদন করে ব্যাঙ্কের বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে দুটি প্রকল্প আশাকরা যায় বর্তমান মাসে ব্যাঙ্কের অনুমোদন পাবে এবং কাজে রূপায়িত হবে।

বনজ সম্পদে পূর্ণ এই ব্লকে নতুন কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যুব-করণ 'অভোজ্য তেল উৎপাদন ও প্রশিক্ষণের' একটি প্রকল্প রচনা করেছেন। প্রকল্পটি বর্তমানে দপ্তরের বিবেচনাধীন আছে। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে বহু সংখ্যক অশিক্ষিত তরুণের নতুন আয়ের রাস্তা খুলে যাবে বলে আশা করা যায়।

মেদিনীপুর জেলা :

বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণ—বিনপুর ১নং ব্লকের যুব সমাজের ফুটবল খেলার মান-উন্নয়নে এবং উৎসাহিত করার জন্য বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত লালগড় ময়দানে ১৫ দিনের ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে দৈনিক গড়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন যুবক অংশ গ্রহণ করে। এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেন অতীতের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় স্যামুয়েল অ্যান্টনী, যিনি পূর্বে বেশ কয়েকবার ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যুবকদের মধ্যে বিশেষকরে আদিবাসী যুবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। অনেকে দশ মাইল দূর থেকে এসে প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন। প্রশিক্ষক অ্যান্টনীর সুন্দর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী যুবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবির সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি প্রভূত সাহায্য করেছে। মনে হয় এই অঞ্চলে প্রথম এজাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন। আগামী দিনে বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণের লোহবল, বর্শা ও ডিসকাস নিক্ষেপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ইচ্ছে আছে বলে ব্লক-যুব আধিকারীক জানিয়েছেন। এছাড়া যোগাসন শিক্ষা দেবার শিবিরের ব্যবস্থা করার চেষ্টাও চলছে। মার্চ মাসে যুব উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে।

জলপাইগুড়ি জেলা :

মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ—মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতের ৩১-তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে মাদারীহাট বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্য সুনীল কুজুরকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ব্লক যুব আধিকারীক শ্রীকুজুরকে যুব কল্যাণ বিভাগের লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে সুনীল কুজুর এই ধরণের অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের বিভিন্ন উদ্যোগকে যুব কল্যাণ বিভাগ কাজে রূপ দেবে, এই আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াই শ' যুবক-যুবতী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।

যুব সংগঠনগুলিকে আর্থিক অনুদান কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্প্রতি মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ স্থানীয় কুড়িটি যুব সংগঠনকে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে। খেলাধুলার সম্প্রসারণের জন্যও কুড়িটি সংগঠনকে বিনামূল্যে নেট ও ভলিবল দেওয়া

স্যামুয়েল অ্যান্টনীর তত্ত্বাবধানে বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণের ফুটবল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

হয়েছে। এই ব্লকে ব্লক স্তরে কাবাডি প্রতিযোগিতা, ভলিবল প্রতিযোগিতা ও ব্লক স্পোর্টস করার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি ও যুব সংগঠনগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানগুলি শুরু হ'তে চলেছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প অনুসারে মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ বীরপাড়াতে একটি টায়ার রিসোলিং ইউনিট, একটি মুদি দোকান ও একটি ক্ষুদ্র দেশলাই বিক্রয় ইউনিট চালু করেছে। তিনটি প্রকল্প বাবদ স্থানীয় ব্যাঙ্ক মোট ২৯,০৭০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে আর যুব কল্যাণ বিভাগ প্রান্তিক অর্থ বাবদ ২,৯০৭ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। প্রকল্পগুলির কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুসারে মাদারীহাট-বীরপাড়া ব্লক যুব-করণ মাদারীহাট ও বীরপাড়া দু'টি গ্রামে দু'টি মহিলা সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কেন্দ্র দুটির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা সত্তর জন। মাদারীহাট শিক্ষণ কেন্দ্রের দশজন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে ঋণ দেবার প্রস্তাব স্থানীয় ব্যাঙ্কে পাঠান হয়েছে যাতে করে তাঁরা এই ঋণের সাহায্যে সেলাই মেশিন এবং প্রয়োজনীয় কাপড় কিনে ব্যক্তিগত ইউনিট গড়তে পারেন। আশাকরা যায় খুব তাড়াতাড়ি এই ইউনিটগুলি চালু হবে। এছাড়া উল নিটিং ইউনিট স্থাপনের জন্য ছ'হাজার টাকা ঋণের প্রস্তাবও ব্যাঙ্কে পাঠান হয়েছে। মেসিনে সোয়েটার বোনার এই প্রকল্পটিও শীঘ্রই চালু করা যাবে।

১৯৮০-র ব্লক যুব উৎসবের প্রস্তুতিও এগিয়ে চলেছে।

ফালাকাটা ব্লক যুব-করণ—ফালাকাটা ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ও স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে স্থানীয় যুবকদের জন্য ১২ কি. মি. দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় যেমন অনেক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন তেমনি বহু সংখ্যায় সাধারণ মানুষ দর্শক হিসাবে যুবকদের দৌড় উপভোগ করেন। উৎসাহ দেন। দশজন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও সরকারী অভিজ্ঞান পত্র দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। মোট একানব্বই জন যুবক অংশ নেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাইশটি যুব সংগঠনকে গৃহ নির্মাণ, খেলাধুলার সরঞ্জাম কেনা ইত্যাদির জন্য পাঁচ হাজার টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হয় এবং ভলিবল ও নেট বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক যুব-করণের যৌথ উদ্যোগে নর্মাসিংহপুর গ্রামে আদিবাসী উৎসব পালনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই উৎসবে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের নাচ, গান ও খেলাধুলার কর্মসূচী থাকছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পের কর্মসূচীতে ফালাকাটা ব্লকে জানুয়ারী মাসে একটি আটা চাকী ইউনিট খোলা হয়েছে। স্থানীয় ব্যাঙ্ক প্রকল্পটির জন্য ৯,৯৮৫ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে এবং যুব-কল্যাণ

বিভাগ প্রান্তিক ঋণ বাবদ ৯৯৮ টাকা মঞ্জুর করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রকল্পে মোট ছ'জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেছে।

এছাড়াও এই ব্লক তৈরী পোষাকের দোকান, রেডিও দোকান এবং পরিবহণ ইউনিট (ট্রাক) প্রকল্পের জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ মঞ্জুরের প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুসারে ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারে মহিলাদের সেলাই শেখানোর কাজ চলছে। বারজন শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুরের প্রস্তাব ব্যাঙ্কে পাঠান হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার: অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে এই ব্লকে তিনটি মিনিবাস, দু'টি মৎস চাষ প্রকল্প, একটি বেকারি, তৈরী পোষাকের দোকান এবং শাঁখার গহনার দোকান গত আগস্ট মাস থেকে চলছে। এতে মোট বিনিয়োগ ৫,৩০,০০০ টাকা, প্রান্তিক ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫৩,০০০ টাকা। কাজ পেয়েছে কুড়ি জন যুবক।

এই ব্লকের অন্তর্গত শিলবাড়ীহাট গ্রামে মেয়েদের সেলাই শেখানোর কাজ সাফল্যের সঙ্গে এগোচ্ছে। এবং আলিপুরদুয়ার জংশনে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে দুঃস্থ মহিলাদের নিয়ে একটি সেলাই সমবায় কেন্দ্র স্থাপিত হতে চলেছে। এ'দের প্রশিক্ষণের কাজ ইতি-মধ্যে শেষ হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার কলেজে গত নভেম্বর মাসে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আলিপুরদুয়ার মহকুমা অফিসের সহযোগিতায় 'সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-নাথ' এবং সোনারপুর গ্রামে 'শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক দু'টি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান দু'টি আলোচনার উচ্চমানে এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশে দারুণ সাফল্য লাভ করে। আকাশবাণী শিলিগুড়ি দু'টি অনুষ্ঠানকেই সম্প্রসারিত করে।

ব্লক ভিত্তিক ফুটবল ও ভলিবল খেলা তিনশো'রও বেশী যুবকের অংশ গ্রহণে জমে ওঠে। অংশ গ্রহণ-কারী প্রতিটি ব্লককে বিনামূল্যে খেলাধুলোর সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে বারটি ক্লাবকে আর্থিক অনুদান হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণোৎসব এই অঞ্চলের মানুষের কাছে বিশেষ উৎসাহের খোরাক হয়েছিল। এব্যাপারে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এবং শিক্ষিত সমাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিজেদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তাঁদের সচেতনতার পরিচয় দেন। একটি স্মারক গ্রন্থও বের করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্লক যুব-করণ ৮ই মার্চ সোমেন চন্দ স্মরণোৎসবের আয়োজন করেন। বিপুল উৎসাহ এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই অনুষ্ঠান হয় আলিপুর-দুয়ার মহকুমা গ্রন্থাগারে। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন অধ্যাপক-শিক্ষকেরা এসে-ছেন, এসেছেন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তেমনি অনেক সাধারণ মানুষও অংশ নিয়েছেন শহীদ শিল্পী সোমেন চন্দকে জানতে এই অনুষ্ঠানে। 'নবীন শিল্পী সোমেন চন্দ' এবং 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও সোমেন চন্দ' শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং সোমেনের 'রাজপথ' কবিতাটি নিয়ে আবৃত্তি প্রতি-যোগিতার আয়োজনে আশাতীত সাড়া পাওয়া যায়। এছাড়া 'সোমেন চন্দ এবং সমকালীন সাহিত্য' আলো-চনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, অধ্যাপক শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মিহির রঞ্জন লাহিড়ী এবং শ্রীদীনেন রায়। অনুষ্ঠান কক্ষে 'সোমেনের জীবন ও কর্মে'র উপর একটি প্রদর্শনী দর্শকদের ভীষণ আকৃষ্ট করে।

দার্জিলিং জেলা:

মিরিক যুব-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের আর্থিক আনুকূল্যে এলাকার দুঃস্থ স্বল্প শিক্ষিত এবং নেপালী মহিলাদের সেলাই শিক্ষাদেবার ব্যাপারে মিরিক ব্লক যুব-করণ উদ্যোগ নেয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে প'য়ত্রিশ জন শিক্ষার্থী অনেক উৎসাহ নিয়ে কাজ শিখছেন। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস এবং উপ-সচিব শ্রী রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করেন। এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রীমহাশয় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অসুবিধার কথা উপলব্ধি করেন এবং পাঁচ হাজার চল্লিশ টাকা টিফিন খরচ বাবদ অনুমোদন করেন।

মালদহ জেলা:

পুরাতন মালদা ব্লক যুব-করণ—গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী পুরাতন মালদা ব্লক স্পোর্টস কমিটি এবং ব্লক যুব-করণের যৌথ উদ্যোগে পুরাতন মালদা কালাচাঁদ হাই-স্কুল মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় পুরাতন মালদা ব্লকের ছ'টি অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব, সমিতি ও সংগঠনের মোট একশ' আশি জন যুবক-যুবতী অংশ নেয়।

এদের মধ্যে তিরানব্বই জন যুবক এবং সাতাশি জন যুবতী। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

হরিশচন্দ্রপুর ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় এবং ব্লক স্পোর্টস কমিটির পরিচালনায় ব্লক ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী হরিশচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত পনেরটি ক্লাব ও আটটি স্কুলের প্রায় একশ' পঞ্চান্ন জন প্রতি-যোগী অংশ নেয় এবং পাঁচশোরও বেশী মানুষ এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের মধ্যে থেকে পাঁচজন যুবককে জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাঠান হয়।

রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল

॥ রবীন্দ্র সংগীত ॥

প্রথম ঃ—রিংকু করঞ্জাই, কলিকাতা-১
দ্বিতীয় ঃ—শ্যামলী দাস, নদীয়া।
তৃতীয় ঃ—বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য্য, হাওড়া।

॥ নজরুল গীতি ॥

প্রথম ঃ—রীতা গাঙ্গুলী, কলিকাতা-১৯।
দ্বিতীয় ঃ—নন্দা চক্রবর্তী, কলিকাতা-৪২।
তৃতীয় ঃ—পুলক ভদ্র।

॥ মার্গ সংগীত ॥

প্রথম ঃ—পিয়াল ব্যানার্জী, কলিকাতা-২৬।
দ্বিতীয় ঃ—পার্থ রায়,
তৃতীয় ঃ—কৃষ্ণা রায়, ২৪ পরগনা।

॥ লোকগীতি (একক) ॥

প্রথম ঃ—বকুল রায়,
দ্বিতীয় ঃ—যুধিষ্ঠির রায়,
তৃতীয় ঃ—তুহিন দত্ত, ২৪ পরগনা।

॥ লোকগীতি (সমবেত) ॥

প্রথম ঃ—তাপস বসুনিয়া ও সম্প্রদায়, দিনহাটা।
দ্বিতীয় ঃ—মালতি সরকার ও সম্প্রদায়, কোচবিহার।
তৃতীয় ঃ—শ্রীমতি কাবেরী ও সম্প্রদায়, শিলিগুড়ি।

॥ গণসংগীত (সমবেত) ॥

প্রথম ঃ—সঙ্গীতাংকুর,
দ্বিতীয় ঃ—কর্ণিক,
তৃতীয় ঃ—দমদম ৬নং ইউনিট, কলিকাতা-৩০।

॥ কাব্য সংগীত ॥

প্রথম ঃ—পার্থ কুমার রায়
দ্বিতীয় ঃ—অর্পণা চক্রবর্তী
তৃতীয় ঃ—তপতী বিশ্বাস

॥ আবৃত্তি—অগ্নিকোণ ॥

প্রথম ঃ—সুমিত্রা দিব্যশ্রী মজুমদার, ২৪ পরগনা।
দ্বিতীয় ঃ দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া-২।
তৃতীয় ঃ—জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, আসানসোল।
তৃতীয় ঃ—চন্দন সাহা, ইসলামপুর।

॥ আবৃত্তি—মৃত্যুঞ্জয় ॥

প্রথম ঃ—পৃথা দত্ত, হুগলী।
দ্বিতীয় ঃ—সুস্মিতা গুপ্ত, নদীয়া।
তৃতীয় ঃ—স্বস্তিকা ঘোষ, জলপাইগুড়ি।

॥ আবৃত্তি—প্রিয়তমাসু ॥

প্রথম ঃ—অমিতরঞ্জন ব্যানার্জী,
দ্বিতীয় ঃ—তুষার গাঙ্গুলী, বর্ধমান।
তৃতীয় ঃ—সংঘমিত্রা তরফদার, পঃ দিনাজপুর।

॥ আবৃত্তি—আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাস ॥

প্রথম ঃ—মধুমিতা ভট্টাচার্য, কলিকাতা-৫।
দ্বিতীয় ঃ—স্নিগ্ধা বিশ্বাস, হাওড়া।
তৃতীয় ঃ—শ্রীপর্ণা দত্ত,

॥ স্বরচিত কবিতা (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—কেয়া সেন, জলপাইগুড়ি
দ্বিতীয় ঃ—মনোমিতা দত্তগুপ্ত, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—ছন্দা দে, শিলিগুড়ি।

॥ স্বরচিত কবিতা (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—আশীস বোস, নদীয়া।
দ্বিতীয় ঃ এম. আফসার আলি, কুচবিহার।
তৃতীয় ঃ—পিনাকী চৌধুরী, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—দেবাশীষ মিশ্র, বীরভূম।

॥ ছোট গল্প (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—জয় বসু, কলিকাতা-৩।
দ্বিতীয় ঃ—হীরালাল ভট্টাচার্য্য, বর্ধমান।
তৃতীয় ঃ—সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা-১৪।
তৃতীয় ঃ—শর্মিষ্ঠা দত্ত মজুমদার, শিলিগুড়ি।

॥ ছোটগল্প (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, ২৪ পরগনা।
দ্বিতীয় ঃ—প্রবীর রুদ্র, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—সন্তোষ সাহা, শিলিগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—শুভংকর চক্রবর্তী, কলিকাতা-৩৯।
তৃতীয় ঃ—গৌতম রায়, ২৪ পরগনা।

॥ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (স্কুল বিভাগ) ॥

প্রথম ঃ—জাতিস্মর ভারতী, উত্তর বাংলা
দ্বিতীয় ঃ—বিসব ভাওয়াল, উত্তর বাংলা
তৃতীয় ঃ—অনুপকুমার চ্যাটার্জী, উত্তর বাংলা

॥ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (কলেজ বিভাগ) ॥

প্রথম ঃ—গৌতম সেন, বহরমপুর।
দ্বিতীয় ঃ—বিষ্ণুপ্রসাদ ধর, উত্তর বাংলা

॥ চিত্রাঙ্কন (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—সুপর্ণা সাহা, কলিকাতা-৫৩।
দ্বিতীয় ঃ—রঞ্জিত সরকার, কুচবিহার
তৃতীয় ঃ—গোপাল সাহা, কুচবিহার

॥ চিত্রাঙ্কন (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—গৌতম সেনগুপ্ত, কলিকাতা-৬৪।
দ্বিতীয় ঃ—অমরেন্দ্র মজুমদার, শিলিগুড়ি
তৃতীয় ঃ—জয়ন্ত সরকার, শিলিগুড়ি

॥ নৃত্য ॥

প্রথম ঃ—শ্রাবনী হালদার, আসানসোল।
দ্বিতীয় ঃ—রজা দত্ত, শিলিগুড়ি
তৃতীয় ঃ—বিদিশা ঘোষ দস্তিদার, শিলিগুড়ি
তৃতীয় ঃ—সঙ্গীতা পাল, শিলিগুড়ি

॥ সেতার ॥

প্রথম ঃ—সঞ্জয় গুহ, কলিকাতা-৭০০০২৫।
প্রথম ঃ—অনন্য দে, জলপাইগুড়ি
দ্বিতীয় ঃ—শান্তিরঞ্জন কর্মকার

॥ তবলা লহরা (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—শিবশংকর রায়, ২৪ পরগনা।
দ্বিতীয় ঃ—বিকাশ দে.
তৃতীয় ঃ—দীপংকর রায়,

॥ তবলা লহরা (১৮—২৫ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—শ্যামল কাঞ্জিলাল, কলিকাতা-৬৭।
দ্বিতীয় ঃ—দেবাশীষ বসু, শিলিগুড়ি
তৃতীয় ঃ—বিরেশ সরকার, কুচবিহার।

॥ প্রবন্ধ (১৪—১৮ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—ভাস্কর সরকার, কুচবিহার।
দ্বিতীয় ঃ—অনুপম কুমার চ্যাটার্জী, জলপাইগুড়ি।
তৃতীয় ঃ—কস্তুরি বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া-২।

॥ প্রবন্ধ (১৮—২০ বৎসর) ॥

প্রথম ঃ—কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-৭৩।
দ্বিতীয় ঃ—অসীম কুমার কর্মকার,
তৃতীয় ঃ—মনীন্দ্র মাইতি, কলিকাতা-৬।

॥ বার্ষিক পত্রিকা, স্কুল বিভাগ ॥

প্রথম ঃ—রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়।
দ্বিতীয় ঃ—বিষ্ণুপুর সার রমেশ ইনস্টিটিউশন
তৃতীয় ঃ—জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল।

॥ বার্ষিক পত্রিকা, কলেজ বিভাগ ॥

প্রথম ঃ—মালদহ কলেজ
দ্বিতীয় ঃ—মালদহ কলেজ (বাণিজ্য)
। ঃ—হেরম্ব চন্দ্র কলেজ।

॥ একাংক নাটক প্রতিযোগিতা ॥

প্রযোজনা—

প্রথম ঃ—সূর্যাবর্ত, নাটক — সেইসুর, কলিকাতা-৫৯।

দ্বিতীয় ঃ—বিপ্লবী সংঘ, নাটক—ইতিহাস কাঁদে, ইসলামপুর।

তৃতীয় ঃ—শিল্পীসংসদ, নাটক—চলো সাগরে, জলপাইগুড়ি।

পরিচালনা—

প্রথম ঃ—অর্জুন ভট্টাচার্য, নাটক—সেইসুর।
দ্বিতীয় ঃ—সত্যজিত রায়, নাটক—চলো সাগরে, শিল্পীসংসদ, জলপাইগুড়ি।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—বলাই চট্টোপাধ্যায়, 'যুবক', সেইসুর।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—সংঘমিত্রা তরফদার, 'মেয়েটি', ইতিহাস কাঁদে, বিপ্লবী সংঘ।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—অশোক ভট্টাচার্য, 'ডাক্তার', চলো সাগরে, শিল্পীসংসদ।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী—তপতী বিশ্বাস, কাকদ্বীপের এক মা, মিলেমিশে, শিলিগুড়ি।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা—দিলীপ চৌধুরী, সংক্ষিপ্ত সংবাদ, সংকেত, বালুরঘাট।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেত্রী—শ্রাবণী দাশগুপ্তা, ইতিহাসের পাতা থেকে, নিউ আলিপুর কলেজ।

॥ আদিবাসী নৃত্য (সমবেত) ॥

প্রথম ঃ—সেন্ট মেরী গার্লস হাই স্কুল, গয়াগঙ্গা।
দ্বিতীয় ঃ—বিজলীমাটি টি এস্টেট, কমলবাগান।
তৃতীয় ঃ—পুটিং বাড়ী চা বাগান, পুটিং বাড়ী।

॥ বিতর্ক ॥

প্রথম ঃ—পক্ষে—জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল,
শ্রী কমলেশ শাও, শ্রীমতি সুমিত্রা মিশ্র, শ্রী সুব্রত সান্যাল।

বিপক্ষে—শিলিগুড়ি উচ্চ বালক বিদ্যালয়,
শ্রী বিপ্লব ভাওয়াল, শ্রী শান্তনু চক্রবর্তী, শ্রীসন্দীপন চন্দ।

॥ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ॥

পুরুষ বিভাগ—

১০০ মিটার দৌড়

পরমেশ্বর জানা	মেদিনীপুর	১ম
সুমন সরকার	মুর্শিদাবাদ	২য়
প্রদীপ মজুমদার	মুর্শিদাবাদ	৩য়

পুরুষ বিভাগ :—

শট পুট

গৌতম চ্যাটার্জী	মেদিনীপুর	১ম
দেবপ্রসাদ চন্দ্র	মুর্শিদাবাদ	২য়
দিলীপ শিকারী	মুর্শিদাবাদ	৩য়

লঙ জাম্প

সাধনকুমার দাস	মেদিনীপুর	১ম
অসিত সরকার	মুর্শিদাবাদ	২য়
নীলোৎপল কিস্কু	মেদিনীপুর	৩য়

ডিসকাস থ্রো

নির্মল ব্যানার্জী	বর্ধমান	১ম
দিলীপ শিকারী	মুর্শিদাবাদ	২য়
পি. মজুমদার	বর্ধমান	৩য়

হাই জাম্প

ইলিয়াস আলি মণ্ডল	বর্ধমান	১ম
বলরাম মাইতি	মেদিনীপুর	২য়
মহঃ মহসিন	বর্ধমান	৩য়

বর্শা ছোড়া

গৌতম চ্যাটার্জী	মেদিনীপুর	১ম
সতীশ মাথুর	বর্ধমান	২য়
আবদুস সালাম	মুর্শিদাবাদ	৩য়

৮০০ মিটার দৌড়

মোহনানন্দ ঘোষ	মেদিনীপুর	১ম
তাপস ভট্টাচার্য	দার্জিলিং	২য়
সুজিত চৌধুরী	বর্ধমান	৩য়

মহিলা বিভাগ :—

১০০ মিটার দৌড়

নিয়তি সিনহা	মুর্শিদাবাদ	১ম
হাসনুয়ারা বেগম	মেদিনীপুর	২য়
রূপালী তরফদার	বর্ধমান	৩য়

হাই জাম্প

মালা ঘোষ	বর্ধমান	১ম
সুষমা সাহা	মুর্শিদাবাদ	২য়
বুলা মণ্ডল	বর্ধমান	৩য়

শট পুট

প্রভাতী শীল	মুর্শিদাবাদ	১ম
ঝরনা দাস	মুর্শিদাবাদ	২য়
মিনতি সিনহা	মেদিনীপুর	৩য়

ডিসকাস থ্রো

ঝরনা দাস	মুর্শিদাবাদ	১ম
বনানী দাস	মুর্শিদাবাদ	২য়
সন্ধ্যা পাখিরা	বর্ধমান	৩য়

লঙ জাম্প

মালা ঘোষ	বর্ধমান	১ম
হাসনুয়ারা বেগম	মেদিনীপুর	২য়
বুলা মণ্ডল	বর্ধমান	৩য়

বর্শা ছোড়া

প্রভাতী শীল	মুর্শিদাবাদ	১ম
পুতুল দাস	মেদিনীপুর	২য়
সন্ধ্যা পাখিরা	বর্ধমান	৩য়

[পাঠকের ভাবনা : ৭২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

মহাশয়,

শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত যুব-উৎসবে (২৩—২৯ ফেব্রুয়ারী) আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। দীর্ঘদিনের অবহেলিত উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক তথা অন্যান্য বিভাগে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে গর্বিত। বিভিন্ন শাখায় আমাদের প্রগতি এবার সরকারীভাবেই প্রমাণিত হল। উত্তরবঙ্গেই বেশীরভাগ পুরস্কার এসেছে। ৮০'তে এমন একটি যুব-উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমরা প্রস্তুতি কমিটি ও জনপ্রিয় পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে জানাই সাধুবাদ ও সংগ্রামী উষ্ণ অভিনন্দন।

আমাদের এখানে একটা সায়েন্স ক্লাব আছে। সন্ধানী বিজ্ঞানচক্র বানারহাট। স্থাপিত ২-৮-৭৬।

যুবকদের মুখপত্র 'যুব মানস' দশ কপির এজেন্সী নিতে হলে কী করতে হবে দয়াকরে জানাবেন। কিছু কিছু পত্রিকা এইসাথে (পুরনো কপি) পাঠালে উপকৃত হবো। ইতি—

সংগ্রামী অভিনন্দনসহ
কৃষ্ণপদ কুণ্ডু, শিক্ষাকর্মী
বানারহাট, জলপাইগুড়ি।

পাঠকের ভাবনা

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

'যুব মানস' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে আপনাদের কয়েকটি কথা বিনীতভাবে জানাতে চাই।

আমরা গ্রাম বাংলার যুব সমাজ 'যুব মানস' পাঠ করে বর্তমান সমাজের অন্তর্গত নানা সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ও যুক্তিনিষ্ঠ পথের সন্ধান পাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে জটিল বিষয়বস্তুগুলিকে আরও সরল ভাষায় উপস্থিত করতে পারলে গ্রামাঞ্চলের যুব সমাজ মূল বক্তব্যগুলি সঠিকভাবে ধরতে পারবেন। আপনাদের পত্রিকার বিষয়বস্তুগুলি সব সময় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হচ্ছে না বলে মনে হয়।

যুব জীবন যদিও মূলে জনসাধারণের জীবনধারার থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, তবু যুব জীবনের নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে। যুব জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি যেমন খেলাধুলো করা, গান-বাজনা চর্চা করা, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে লিটিল ম্যাগাজিন প্রকাশ করা, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা ঘটলেও অসীম ধৈর্য্য নিয়ে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করা ইত্যাদি। যুব সমাজের এই স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি বর্তমান সমাজে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিভা স্ফূরণের যথার্থ পরিবেশ নেই। 'যুব মানসে'র পাতায় যুব সমাজের এই যন্ত্রণার ছবি বিশেষ পাইনি। আপনাদের কাছে অনুরোধ এই বিষয়গুলিকে ফিচার, আর্টিকেল ও তথ্যের মাধ্যমে 'যুব মানসে' হাজির করুন।

যুব কল্যাণ বিভাগের 'আমরা-প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা' নামক পুস্তিকাটি সম্প্রতি আমরা পাঠ করে ঐ দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। 'যুব মানসে' বিভিন্ন ব্লক যুব কল্যাণ করণের কিছু কিছু কাজের বাসি সংবাদ পড়েছি। আপনাদের পত্রিকায় নিয়মিত যুব কল্যাণ দপ্তরের কর্মধারার পরিচয় সংবাদ হিসাবে শুধু নয়, ব্যাখ্যামূলকভাবেও প্রকাশ করা যায় না কি? মফস্বলের যুবকরা অনেক অনেক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও যথার্থ পরিচালনার অভাবে সঠিক পথ অনেক সময় বেছে নিতে পারে না। 'যুব মানস' পত্রিকায় কর্মসংস্থান, লেখাপড়ার সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা, খেলাধুলার বৃহত্তর অঙ্গণে প্রবেশ করার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় ছোট ছোট আর্টিকেলের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে অনেকে লাভবান হতে পারেন। আপনারা তার ব্যবস্থা করুন না, তাতে পত্রিকাটি আরও মূল্যবান হয়ে উঠবে।

মফস্বলের যুবকরা প্রবল প্রতিকূল পরিবেশ ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আলোচনাসভা, বিতর্ক, নাটক, গান, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মধ্যদিয়ে এই লড়াই সংগঠিত করা হয়। যদি কখনও লিটিল ম্যাগাজিনগুলির পাতায় নজর দেন তাহলে অনেক চমকপ্রদ সংবাদ, বিষয়বস্তু ও মুন্সী কলমের সন্ধান পেয়ে যেতে পারেন। এ সবই নির্মমভাবে সীমাবদ্ধ প্রচারে আবদ্ধ থাকে। তাদের বিশাল পাঠক সমাজের সামনে হাজির করার দায়িত্ব আপনারা নিতে পারেন। আপনারা লেখক তালিকার গণ্ডীটা আরও প্রসারিত করুন না, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

আমার পত্রটিতে আমাদের একান্ত আপনজন 'যুব মানস'কে সমৃদ্ধ করার জন্য কয়েকটি পরামর্শ দিলাম। আপনারা বিচার করবেন। গ্রহণ করতে পারলে পত্রিকাটি যুব-জনের প্রকৃত মুখপত্র হয়ে উঠতে আরও কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নমস্কারান্তে
সরল বিশ্বাস
মালদহ।

'যুব মানস' পত্রিকা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত জানিয়ে আমাদের দপ্তরে অনেক চিঠি আসছে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে 'যুব মানস'-কে আরও উন্নত করার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের মূল্যবান পরামর্শ আগামী সংখ্যাগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করতে আমাদের সাহায্য করবে।

আমরা যুব মানসে নির্বাচিত পাঠক-পাঠিকাদের মতামত 'পাঠকের ভাবনাচিন্তা' বিভাগে প্রকাশ করছি। আপনাদের সহযোগিতায় এই বিভাগ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে আশাকরি।

মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর যে স্পর্ধা নিয়ে 'যুব মানস' পত্রিকা প্রকাশ করেন তা বাঙ্গালী যুব সমাজের কাছে শ্রদ্ধা ও গর্বের বস্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবুও আমার দৃষ্টি ভঙ্গীতে 'যুব মানস' পত্রিকাটি আরও ব্যাপক অর্থে প্রকাশ পেলে খুবই ভাল হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে

পড়াশুনা করে তারুণ্যের দোহাই দিয়ে। এই তারুণ্যকে শতধারায় ফুটিয়ে তুলতে আমাদের সরকারের খুব কম সংখ্যক পত্র-পত্রিকা এগিয়ে এসেছে। তাই 'যুব মানস' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন স্কুল জীবনে উর্ধ্ব শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভবিষ্যৎ যৌবনের কর্মপন্থা কি হবে, তাদের উচ্চাশা ও নবীন স্বপ্ন কিভাবে যৌবনে পদার্পণ করে দেশের ও দশের কাজে উৎসগীকৃত হবে, তার একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা 'যুব মানস' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করেন 'তরুণের স্বপ্ন' নাম দিয়ে, তবে বঙ্গবাসী, যুবসমাজ তথা তরুণ-তরুণীরা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করতে অধিক আগ্রহে সচেষ্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'যুব মানস' পত্রিকা দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা করি।

শ্রীদিলীপ কুমার গিরি
গ্রামঃ কৃষ্ণনগর
পোঃ গড়-কৃষ্ণনগর, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর।

মাননীয় সম্পাদক,

আপনার পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। বিগত দুই বছরে আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই ব্যক্তিগত সংগ্রহে সুরক্ষিত রয়েছে। পত্রিকাটি সংগ্রহ করার উৎসাহে অবশ্য মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে। কারণ আপনারা ভীষণ অনিয়মিতভাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন। অনিয়মিত প্রকাশনার মধ্য দিয়ে কোন দিন কোন পত্রিকা পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা উদ্যোগী হলে পত্রিকা নিয়মিত হবে। আর 'যুব মানস' নিয়মিত হলে আমার মত আরও অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন।

রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়েছেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বভাবতই সুস্থ জীবন ভাবনায় বিশ্বাসী সংস্কৃতিবান মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে এই বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন। 'যুব মানস' সুস্থ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যুব জীবনের সমস্যাবলীই শুধু নয়, সমগ্র সংস্কৃতির জগৎ সম্পর্কে 'যুব মানস' সচেতন রয়েছে বলে আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সুস্থ জীবন ভাবনায় বিশ্বাসী পত্র-পত্রিকার ভীষণ অভাব আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। সেই অভাব পূরণে 'যুব মানস' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, কিছুটা করছেও নিশ্চয়। এ রকম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যখন 'যুব মানসে'র ওপর অর্পিত হয়েছে, তখন তার নিয়মিত প্রকাশন ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী নয় কি? আশাকরি আপনারা বিষয়টি যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

ধন্যবাদান্তে
সুদীপ্ত গায়েন
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের পত্রিকায় মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হওয়ায় যুব-ছাত্র সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি আপনারা সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ওপর বিশেষ আলোকপাত করছেন না। 'যুব মানস' পত্রিকার পাতায় নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ আমরা দেখতে চাই।

আর একটা অনুরোধ করব। প্রবন্ধমূলক রচনার পাশাপাশি প্রগতিশীল গল্প, কবিতা আরও বেশী বেশী করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করুন। প্রগতিশীল লেখকের অভাব নেই, অভাব তাদের প্রকাশ মাধ্যমের। আপনারা নতুন ও সম্ভাবনাময় লেখকদের আত্মপ্রকাশের পথ করে দিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের গর্ব অনুভব করতে পারবেন।

অভিনন্দনসহ—
রঞ্জন রায়,
সেওড়াফুলী, হুগলী।

প্রিয় মহাশয়,

প্রতি সংখ্যায় মূল্যবান চিন্তার খোরাক দেওয়ায় আপনাদের ধন্যবাদ।

আপনাদের পত্রিকাটি সুমুদ্রিত ও সুদৃশ্য হলেও কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলে না। কোন নিয়মিত বিভাগ নেই। অথচ এ ধরণের প্রায় প্রতিটি পত্রিকাতেই কিছু নিয়মিত বিভাগ থাকে যেমন পাঠকের কলম, পুস্তক সমালোচনা, জানবার কথা, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ, মাসিক সংবাদ পর্যালোচনা, বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ইত্যাদি। সব বিভাগ হয়ত একসঙ্গে চালু করতে পারবেন না। অন্তত কয়েকটি করা কি খুবই শক্ত কাজ!

ধন্যবাদান্তে
সব্যসাচী বাগচী
রামধন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৪

[শেষাংশ ৭০ পৃষ্ঠায়]

আমরা করব জয়-

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে যুবক-যুবতীদের দৃপ্ত মিছিল।

খেলার মাঠে অসভ্যতা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী

গত ৮ই মে, ফেডারেশন কাপের ফাইন্যাল খেলাকে কেন্দ্র করে ইডেন উদ্যানে যে ধরণের ঘটনা ঘটেছে তা কলকাতার খেলার মাঠে অভাবনীয়। খেলার মাঠের বাইরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এ এক ন্যক্কারজনক উচ্ছৃংখলতা। খেলার মাঠের ভেতরে খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে ঘুষি মারামারি করতে দেখা গেছে, দর্শকরা খেলার মাঠে ঢুকে পড়েছে, মাঠের ফেন্সিং লাইনের ধারে একদল লোক জটলা করেছে। এসব কিছুই কলকাতা ফুটবলের ঐতিহ্যকে নষ্ট করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিষয়টি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কঠোর মনোভাবও গ্রহণ করেছেন। গত ৯ই মে মহাকরণে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন—

ফেডারেশন কাপ ফাইন্যাল খেলার মাঠে যে সব ঘটনা ঘটেছে এই ধরণের উচ্ছৃংখলতার বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র-যুবকদের প্রচার আন্দোলনে নামা উচিত। ফুটবল খেলা যদিও আই. এফ. এ.'র ব্যাপার, কিন্তু খেলার মাঠের প্রতিক্রিয়া বাইরেও পড়ে বলে রাজ্য সরকারও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বড় দু'টি ক্লাবের এই যদি খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব হয়, তাহলে সেটা খুবই দুঃখজনক। অথচ আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এসব ঘটনার নিন্দা করে দু'টি বড় ক্লাবের কর্মকর্তাদের কেউ কোন বিবৃতি দেননি। যেসব খেলোয়াড় খেলার মাঠের মধ্যে অখেলোয়াড়োচিত মনো-ভাবের পরিচয় দিয়েছে তাদের চিহ্নিত করা উচিত। আমাদের সময় দেখেছি খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে মারামারি হলে রেফারী তাদের মাঠ থেকে বের করে দিত।

ইডেনের মাঠের মধ্যে লাইনে এত লোক বসবে কেন? মাঠের ভেতরে যারা ঢুকবে তাদের বের করে দিতে হবে। তার জন্য গোলমাল হয়ে খেলা যদি বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যাবে। এসব কথা দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বলতে হচ্ছে।

খেলার মাঠ অসভ্যতা করার জায়গা নয়। কিছু ক্লাবের সমর্থক ব্লেড, ক্ষুর নিয়ে মাঠে ঢুকবে। এসব উচ্ছৃংখলতা তো সমাজ বিরোধী কাজ। আশি হাজার দর্শক খেলা দেখতে গেলে এসব কাজ করে মাত্র হাজার দুই লোক। সাধারণ মানুষ এ জিনিষ কখনই বরদাস্ত করবেন না। ছাত্র-যুবদের এই নোংরামীর বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
মে '৮০

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঁচিশ পয়সা

সম্পাদকীয়

গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে আমরাও দু-হাত বাড়িয়ে বরণ করছি ঐতিহাসিক মে-দিবসকে। অহোরাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কিংবা কখনও কখনও তারও বেশি সময় ধরে শ্রমিককে খাটিয়ে তার রক্ত নিংড়ানো সম্পদে মালিকশ্রেণী মুনাফার পাহাড় তৈরী করত—আর সেই সম্পদ সৃষ্টি কর্তা শ্রমিক দু-বেলা পেট ভরে খেতে পারত না। শিক্ষা চিকিৎসার সুযোগ থেকে তারা থাকত চির বঞ্চিত। কদর্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের এই দীর্ঘ-ক্ষণ ধরে হাড়ভাঙগা খাটুনির পর আলোহীন, বায়ু-হীন, স্যাতস্যাতে বস্তির খুপরির মধ্যে দিনের অব-শিষ্ট সময়টুকু অর্ধমৃতের মত শ্রমিককে কাটাতে হোত। এই ছিল শ্রমিক-জীবনের রোজ নামচা। দ্রুত-লয়ে বেড়ে ওঠা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলকারখানার শ্রমিক সংগঠিত হতে থাকল এবং ব্যাপকভাবে এই অমানবিক ব্যবস্থার প্রতিবাদে গর্জে উঠল। দাবী তুলল—৮ ঘণ্টার বেশি শ্রমিককে খাটানো চলবে না। দুনিয়ার কষাইখানা হিসাবে পরিচিত মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের চিকাগো শহরের হে মার্কেটে ১৮৮৬ সালে ১লা মে শ্রমিকের ৮ ঘণ্টার কাজের দাবীতে সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে মোকাবেলা করার জন্য সর-কারের সশস্ত্র বাহিনীর বন্দুক গর্জে উঠল। ঘামে ভেজা শ্রমিকের জামা কাপড় তার ক্ষত-বিক্ষত দেহের রক্তে রাঙা হোল। শ্রমিকশ্রেণী তার জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমেরিকার ধূসর-মাটিতে রক্তের অক্ষরে শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসের এক নতুন এবং সুদূর প্রসারী তাৎপর্যময় অধ্যায় সৃষ্টি করল।

তারপর আরও গুলি চলল—আরও শ্রমিককে আত্মা-হুতি দিতে হোল—আরও রক্ত ঝরল—বিচারের নামে তামাসা করে শ্রমিক নেতাদের ফাঁসিতে ঝুলানো হোল। কিন্তু যে দুর্জয় ঝড়ের সৃষ্টি হোল তাকে আমেরিকার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা গেল না। শ্রমিক মানসিকতার ইথারের তরঙ্গে ভর করে তামাম "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও"—কার্ল মার্ক্স-এর এই আহ্বানের অন্তর্নিহিত অর্থ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করল। ১৮৯০ সালে স্থির হোল বিশ্বব্যাপী ১লা মে তারিখটি "মে-দিবস" হিসাবে পালিত হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি

দিবস হিসাবে এই দিনটিকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে পালন করা হবে।

সেই থেকে ৯০টি বৎসর ধরে পৃথিবীব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ এই ঐতিহাসিক দিনটি পালন করে আসছেন। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ভীত মালিকশ্রেণী এবং তার সেবাদাস সরকারগুলি সমস্ত প্রকার দমন-পীড়নের পথ ধরে এই 'মে-দিবসের' অনুষ্ঠানকে বন্ধ করতে সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা চালিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই দিনটিকে বিভিন্ন ভাবে পালন করেছেন। ফ্যাসীবাদী দস্যুদের কারাগারে বন্দী মহান জুলিয়াস ফুচীক মে-দিবস পালন করার, লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করার কোন সুযোগ না পেয়ে নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে পরনের বস্ত্র নিজের রক্তে রাঙা করে, অন্ধকার বন্দীশালায় সেই কাপড় দুহাতে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে মে-দিবস পালন করেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার সুদৃঢ় শপথ গ্রহণ করেছেন। মে-দিবস পালন করার এই ধরনের অগণিত গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ইতিহাসকে আরও মহীয়ান করে তুলেছে।

এবার যখন আমরা মে-দিবস পালন করছি তখন পুঁজিবাদী পথ ধরে যে সকল দেশ চলছে সেইসব দেশগুলি এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক চরম অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। কোন মতে টিঁকে থাকার জন্য পুঁজিবাদীশ্রেণী এই সংকটের যাবতীয় বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে তথা সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপাবার চেষ্টায় সর্বদা ব্যস্ত থাকছে। ফলে কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লে-অফ, শ্রমিক সংকোচন নীতি অনুসরণ, শ্রমিককে দিয়ে আরও বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া, বোনাস দিতে টালবাহানা, দ্রব্যমূল্যসূচক সংখ্যার হিসাব জালিয়াতি করে শ্রমিককে তার পাওনা মজুরী থেকে বঞ্চিত করা—ইত্যাদি ব্যবস্থা মালিকের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। অন্যদিকে অধিক মুনাফার লোভে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের দাম যথেচ্ছভাবে বাড়িয়ে তোলা, শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত কাঁচামালের দাম খুসি মত কমিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে দুঃখ কষ্টের সহ্য সীমার শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষেরাও মুখ বুজে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছেন না। তারা একদিকে যেমন পেশাগত অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকে আদায় করার জন্য আরও সংগঠিতভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন অন্যদিকে শিক্ষায় এবং অভিজ্ঞতায় আরও সমৃদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণী বেশি বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছেন যে জীবনের দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণা হতে স্থায়ীভাবে নিস্কৃতি পেতে হলে ঘুন ধরা, পুঁজ পড়া এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তার সমাধির উপর নতুন শোষণহীন, অবিচারহীন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করতে হবে—এবং সেই কাজ সমাধা হতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণী আরও অধিক মাত্রায় অনুভব করতে পারছেন যে তার অধিকার সংগ্রাম, তার মুক্তির সংগ্রামকে যদি পরিচালিত করতে হয়—তাহলে একান্ত ভাবে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সংকট যত বাড়বে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর ধণিকশ্রেণীর, পুঁজিপতিশ্রেণীর আক্রমণ তত প্রখর হবে, স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির মেকী গণতন্ত্র মার্কা পাতলা আবরণটুকু তত দ্রুত অপসারিত হয়ে তার বীভৎস নগ্ন মূর্তি বিকট আকারে প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির চক্রান্তকে পরাজিত ক'রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা—তাকে আরও প্রসারিত করার কাজে শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকতর যোগ্যতার সাথে তার ভূমিকা পালন করতে হবে। বেশি বেশি করে বিভিন্ন স্তরে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে তার এই সংগ্রামের সাথী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ এলাকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মালিক শ্রেণীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেখানকার শ্রমজীবী মানুষের কাছে 'মে-দিবস' উৎসবের আমেজ নিয়ে হাজির হয়। আরও উন্নত জীবন যাপন, আরও অবকাশ, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সমূহকে ব্যবহারিক জীবনে আরও অধিক পরিমাণে প্রয়োগ ক'রে জীবনকে আরও উপভোগ্য করে গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করাকে মে-দিবস পালন করার অঙ্গ হিসাবে তারা ব্যবহার করে। বিশ্বের বাকী অংশের শ্রমজীবী মানুষ মে-দিবসকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন হিসাবে পালন করেন। এই দিনে দাঁড়িয়ে তারা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন দেশে দেশে যুগে যুগে অসংখ্য সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী অগণিত শ্রমজীবী মানুষকে। নতুন করে ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতিকে—সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের মূল লক্ষ্য অভিন্ন, আদর্শ এক, বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের মূল স্রোতধারার তারা অবিচ্ছেদ্য অংশ, মূলধন ছাড়া তাদের হারাবার কিছু নাই জয় করার জন্য আছে তামাম দুনিয়া।

[শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায়]

জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন

প্রায় এক বছর হ'ল আসাম সহ সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আন্দোলনের নামে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে করে সারা ভারতবর্ষের মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি রক্ষা করা যাবে তো?

এই সব জ্বলন্ত প্রশ্ন সামনে রেখে গত ২২শে এবং ২৩শে এপ্রিল ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক সর্বভারতীয় আলোচনা সভার মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে বর্তমানে দেশের এক গুরুতর সমস্যার সমাধানসূত্র বের করার চেষ্টা করেছেন। দু' দিন ব্যাপী এই আলোচনা সভাতে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মাদুরাই, আলিগড়, সিমলা, ভুবনেশ্বর, ত্রিপুরা, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি উপস্থিত ছিলেন হায়দ্রাবাদ, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ এবং বি. জি. ভার্গিস, রণজিৎ রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অনিল বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্ট সাংবাদিক বর্গ। এছাড়াও অন্নদাশংকর রায়, অমলেন্দু গুহর মত বুদ্ধিজীবীরা যেমন তাদের মূল্যবান মতামত রেখেছেন, অন্যদিকে জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জী, সৌরীন ভট্টাচার্য্য, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, ভোলা সেন, সত্যসাধন চক্রবর্তী, সাইফুদ্দিন চৌধুরী সহ অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাঁদের বক্তব্য রাখেন। আসামের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা হীরেন গোগই এবং গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত থেকে বর্তমান সমস্যার পটভূমিকা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামতে আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেন।

২২শে এপ্রিল জনাকীর্ণ শতবার্ষিকী হলে আলোচনা সভার উদ্বোধন করে সুদীর্ঘ ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু বলেন—

আসামের সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। শুধুমাত্র প্রশাসন দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। চাই রাজনৈতিক সমাধান। অবশ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং অত্যাবশ্যক পণ্য চলাচলের মত কয়েকটি বিষয়ে প্রশাসনকে কাজে লাগাতেই হবে কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানে আর গড়িমসি করবার সময় নেই। অনেক দেরী হয়ে গেছে। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই রাজনৈতিক সমাধানের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বারে বারে প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার কথা বলেছি। ঐ বৈঠকে যাঁরা আন্দোলন করছেন তাদেরও ডাকা হোক।

আসামের আন্দোলন জাতীয় অর্থনীতিরও যথেষ্ট ক্ষতি করছে। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যেরও অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ছ' হাজার উদ্বাস্তু পরিবার এই রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের ফিরিয়ে নেবার জন্য আমরা বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। কিন্তু কেন্দ্র এখনও কোন সাড়া দেয়নি।

আসামের ছাত্ররা আমায় তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এ এক আশ্চর্য কথা! ওরা বলবেন আসামের তেল আসামের জন্য—অথচ তার প্রতিবাদ করতে পারব না। আমরা যদি বলি পশ্চিমবাঙলার কয়লা, লোহা কেবল মাত্র পশ্চিমবাঙলার জন্য তাহলে জাতীয় সংহতি কি করে থাকবে? আমরা ঐসব কথা বলতে পারিনা। আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। আমাদের রাজ্যে সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের শতকরা মাত্র চল্লিশ ভাগ বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের সংগে তাদের প্রীতির সম্পর্ক কখনও নষ্ট হয়নি। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণ শত্রু—পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন।

তিনি দৃঢ়তার সংগে বলেন—এইরকম আলোচনা সভার মাধ্যমে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি এবং অগ্রগতির স্বার্থে দ্রুত আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে।

আলোচনাচক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার বলেন, আসাম সমস্যার উপর এই আলোচনা প্রমাণ করে যে এই রাজ্যের শিক্ষা জগত আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শ্রীশিবকুমার এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন—শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই ধরণের আলোচনা সভা হওয়া দরকার যাতে করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ একযোগে এই ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে পারে।

সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবী গোবিন্দ মুখোটী বলেন—বহুভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষে আসামের মত দাবি উঠতে শুরু করলে জাতীয় ঐক্য বলে কিছু থাকবে না। দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার আছে দেশের যে কোন অঞ্চলে বসবাস করার কিন্তু আসামের বর্তমান আন্দোলন নাগরিকদের এই অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক বি. জি. ভার্গিস বলেন যে, আসামের বিদেশী নাগরিক সংক্রান্ত প্রশ্নটিই বিভ্রান্তিকর। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই বিভ্রান্তি দূর করে একটা সুষ্ঠু সমাধানে আসতে হবে।

অপর এক সাংবাদিক রণজিৎ রায় বলেন, নাগরিক প্রশ্নে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি এবং ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে

আসামের বর্তমান আন্দোলন অত্যন্ত অন্যায্য। কেন্দ্রীয় সরকারকে ঐ দুই চুক্তিকে সামনে রেখে সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে।

আসামের ছাত্রনেতা হীরেন গোগই বলেন—আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। আসামের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করতে চলেছে তখন মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার কৌশল হিসাবে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আজকে তা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদেশী শক্তি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষদের উপর আক্রমণ হচ্ছে সেখানে। কিন্তু শত আক্রমণ অপপ্রচার সত্ত্বেও আসামের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. পি. দেশপাণ্ডে বলেন—এই আন্দোলন হিংসাত্মক, ভ্রাতৃঘাতী। এ এক বিপজ্জনক বৈশিষ্ট। ভারতের ঐক্য, সংহতির প্রতি এই আন্দোলন চরম আঘাত স্বরূপ।

পশ্চিমবঙ্গ আর্স কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী তাঁর ভাষণে বলেন—আমাদের এই সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস আসামে বিদেশী ভোটারের ধূয়া তুলে মঙ্গলদইতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করে। পরে তার পেছনে বিদেশী শক্তি যোগ দেয়। এই আন্দোলনের পেছনে সিয়া টাকা ঢালছে। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের হাত আছে এই আন্দোলনের পেছনে। নাগরিক প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা করে প্রকৃত সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে জাতীয় স্তরে একটি কমিটি গঠন করা দরকার। তাতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিতে হবে। তারা গোটা ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে পার্লামেন্টের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করবেন। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনার শুরুতেই বলতে ওঠেন গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন। তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যের মধ্যে আসামের সমাজ-অর্থনৈতিক অবস্থার অতীত এবং বর্তমান পটভূমি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন আসামে বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বলতার জন্যই এই রকম উগ্র প্রাদেশিকতার নীতিতে পরিচালিত আন্দোলন দানা বাঁধতে পেরেছে। এই আন্দোলন বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। তিনি তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে আসামে বহিরাগতদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে একথা ঠিক নয়। আসামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। অসমীয়া ভাষাও অত্যন্ত উন্নত। কিন্তু অসমীয়াদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বহিরাগতরা নষ্ট করে দেবে, এই আশংকা অমূলক। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যেও অন্য রাজ্যের লোকেরা বাস করছে। আসলে গোটা দেশ জুড়ে যে অনগ্রসরতা তাকে দূর করতে আন্দোলন করতে হবে এবং তা হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। কোন একটি রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সে আন্দোলন চলতে পারে না। কিন্তু আসামে তা না হয়ে অন্দোলনকারীরা সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। বামপন্থী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে। জ্যোতি বসুর কুশপুত্তলিকা পোড়াচ্ছে। আর এসবে মদত দিচ্ছে সেখানকার একচেটিয়া পুঁজিপতি-গোষ্ঠী। এই রকম একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও আসামের বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি উগ্রজাতীয়তাবাদ, প্রাদেশিকতা এবং আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

দুদিনের আলোচনা সভাতে মোট প্রায় চল্লিশ জন বক্তা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের বক্তব্য থেকে যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে তা হ'ল—আসাম সমস্যাকে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করতে হবে। বিদেশী প্রশ্নে একাত্তর সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নেহরু-লিয়াকত এবং ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সারা ভারতবর্ষব্যাপী গড়ে তুলতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সেমিনার কমিটির তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র মুখার্জী আলোচনা সভাতে 'আসাম সমস্যা ও জাতীয় সংহতি' শীর্ষক একটি কার্যকরী দলিল উপস্থাপিত করেন।

সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসামের শিল্পীদের পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠানকে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

[সম্পাদকীয় : ২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তাই মে-দিবসের অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় সমস্ত স্তরের লড়াকু সাধারণ মানুষ। যে দেশে ক্রমবর্ধমান বিভীষিকাময় বেকারীর তীব্র দংশনে যুব জীবন নষ্ট হতে থাকে, যেখানে সৃজনশীল শক্তিমান যুব সমাজের এক বিরাট অংশের কাছে জীবনটা এক দুর্বিসহ বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়, যে দেশের যুব শক্তির প্রতিভার যথোপযুক্ত স্ফুরণের সুযোগ অকল্পনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ—সেখানে মে-দিবস যুবসম্প্রদায়কে হাতছানি দিয়ে জীবন-সংগ্রামের সমাধানের সঠিক পথে আহ্বান করে। সেই জন্য বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও মে-দিবসকে স্বাগত জানাই, বরণডালা সাজিয়ে আমরাও মে-দিবসকে বন্দনা করি। সু-স্বাগতম মে-দিবস! জয়তু মে-দিবস।

রবীন্দ্রনাথ : বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে একটি সুর্যপ্রতিম দৃষ্টান্ত। উজ্জ্বলতম-জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাব-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—সারা দেশে তখন জাতীয়তার নামে প্রবল প্রাচ্যাভিমান বা হিন্দু-ঐতিহ্যের পুনরুত্থানপর্ব। রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনে মেতেছেন। কিন্তু এ সর্বনাশা সংকীর্ণ ঝোঁক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাই অগ্রজদের উদ্দেশে বললেন :

> তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
> ভেঙেছ মাটির আল,
> তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
> উজান স্রোতের কাল।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অন্য চেহারা। তিনি পুরোমাত্রায় চারণ। স্বদেশী গানে, প্রবন্ধে ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে মগ্ন, অধিকতর ব্যস্ত।

'এবার ফিরাও মোরে' কেবল কবির নয়, স্বদেশী যুগের ভারতবর্ষের প্রার্থনা। পর-পর স্বদেশে বিদেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে। কবিতা রচনার পক্ষে সে-সব খবর জানা এবং সেগুলির তাৎপর্য বুঝে উদ্দীপিত হওয়া মোটেই অপরিহার্য ছিলনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের কবি। যেখানেই সংকীর্ণতা, প্রবলের অত্যাচার, ন্যাশনালিজমের নামে বর্বরতা, বর্ণ-বৈষম্য জাতিবৈষম্য এবং পরস্পর হানাহানি সেখানেই কবির প্রতিবাদী কণ্ঠ মুখর।

বালগঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ড, সাম্রাজ্যবাদী দমননীতি, কার্জনের শিক্ষাসংকোচ, বঙ্গভঙ্গ, ভাষা-বিচ্ছেদ পরিকল্পনা, আফ্রিকায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা, বুয়র যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ রবীন্দ্রব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' রাজনীতির দ্বিধা অপমানের প্রতিকার সমস্যা প্রভৃতি প্রবন্ধে মনীষী রবীন্দ্রনাথকে সমকালের সংকীর্ণতা থেকে আশ্চর্য রকম মুক্ত থাকতে দেখি। স্বদেশী সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে তিনি হিন্দু-ঐতিহ্যবাদের দ্বারা অংশত প্রভাবিত হলেও প্রধান ঝোঁকটা ছিল দেশের শতকরা নব্বইজনের পক্ষে। স্বদেশীসমাজ পল্লীসমাজ পল্লীপ্রকৃতি এবং সংস্কার সমিতির গঠনতন্ত্র ও সংকল্পবাক্য রচনা কেবল দেশকর্মী রবীন্দ্রনাথের কাজ নয়। তিনি বস্তুত স্বদেশ-সাধনার এই পর্বে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। কিন্তু তখনও তিনি একাধারে বাঙালীর কবি, ভারতের কবি এবং কবি-সার্বভৌম। অখণ্ড বাংলা ও ভারতের সব সামাজিক অসাম্য ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বরাবর সরব প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, কৃষকবিদ্রোহ, মোপলাবিদ্রোহ, অসহযোগ, বয়কট-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আশ্চর্যরকম প্রগতিশীল। তাঁর দৃষ্টি যে কত দূরপ্রসারী তার কয়েকটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্কেচ—সজল রায়

স্বদেশী যুগের ভাবপ্লাবনের মধ্যেও ইংরেজীয়ানা অনেকখানি ছিল। তাই কবিকণ্ঠে ধিক্কার শোনা যায়ঃ 'দুঃসাধ্য, তবু মনের আক্ষেপ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। ......ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব।' 'সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব।'

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তাঁর সায় ছিল। বস্তুত অসহযোগের মধ্যে যে 'আত্মনির্মাণ' 'জাতি-নির্মাণ' এবং স্বদেশী শিক্ষার ভিত্তিনির্মাণের মহতী সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন, তাকেই সর্বশক্তি দিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। 'উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিষ্কৃতি পাইনি'—এ উক্তি ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত। এসব কথা কম-বেশী পরিচিত। কিন্তু কেন তিনি এই অসহযোগের উত্তেজনার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন, সেটিই আমাদের আলোচ্য। অনেকের মতে, কবির সৃষ্টি-কল্পনা কর্মযজ্ঞের তাড়নায় ব্যাহত হচ্ছিল বলেই আপন কবিধর্মের তাগিদে জনারণ্য থেকে 'বিদায়' নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনের 'নীল-নির্জনে' ফিরে গেছেন। কিন্তু আসল কথা অন্য। বয়কটের নামে জবরদস্তি, বোম্বাই-আমেদাবাদের কোটিপতিদের স্বার্থরক্ষা, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান ও বিরোধ বৃদ্ধি তাঁকে পীড়িত করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মনের পাত্রে বরাবর ঢালতে চেষ্টা করেছে। সে তার শ্রেণীস্বার্থে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যেই কোথাও একটা প্রস্তুতি ছিল। নইলে এত তাড়াতাড়ি এত বেশি রক্তপাত হতনা। ইংরেজী শিক্ষিত কয়েকজন এবং দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে গভীর বিচ্ছেদ, হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যে বিভেদ—এ সবই আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষিত Elit গোষ্ঠী এবিষয়ে অবহিতও ছিলনা। তাই তাঁর ধারণা যথার্থঃ 'বিলাতীদ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এত বড় অহিত আর কিছু নাই।'

পূর্বে আমরা যে তিনটি সমাজের কথা বলেছি, সেগুলির গঠনতন্ত্র থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে কবির সতর্ক চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

(১) স্বদেশী সমাজ

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনপ্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গভর্নমেন্টের স্মরণাপন্ন হইব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরাজীতে পত্র লিখিবনা।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজীখানা, ইংরেজী সাজ, ইংরেজী বাদ্য, মদ্য সেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাংলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি, ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজনির্দিষ্ট বিচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

(২) পল্লীসমাজ

১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।

২। সর্বপ্রকার গ্রাম্যবিবাদ-বিসম্বাদ সালিশের দ্বারা মীমাংসা।

৩। স্বদেশ শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।

৪। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যক মতো নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫। বিজ্ঞান ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্বধর্মের সার-নীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি ধর্মভাব একতা স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গো-মহিষাদির পালন দ্বারা জীবিকা-উপার্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

৯। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন।

১৩। পল্লীর তত্ত্বসংগ্রহঃ অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি-অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর) ওলাউঠা, বসন্ত, অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪। জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন ও ঐক্যসংবর্ধন।

(৩) সংস্কার সমিতি ১৯৩১

আমরা চাই

বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশ পরাভবের পথে চলিয়াছে। আমাদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে উপেক্ষা ও অসম্মান এই সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ। এইজন্যই মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুপণ করিয়া তপস্যায় বসিয়াছেন। সমস্ত

দেশবাসীরও প্রাণপণ করিয়া এই অপরাধ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

এখন অবিলম্বে আমাদের এই কয়েকটি ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভা সমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবেনা।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিতে দিবনা।

আমাদের কাজ

হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করা, দুর্গতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পরস্পর শ্রদ্ধা দ্বারা সর্বশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে সত্য করা, জনসাধারণের মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মশক্তি উদ্বোধন করার উদ্দেশে বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন পল্লী-সেবা বিভাগের ভিতর দিয়া বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে।......এখন হইতে...বিশ্বভারতীতে সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল।

সংস্কার সমিতির কার্যধারা মোটামুটি এইরূপ

১। পল্লীসেবা

(ক) কেন্দ্রীয়সভার অধীনে সুবিধামতো অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

(খ) ঐ শাখাকেন্দ্র হইতে পারিপার্শ্বিক গ্রামসমূহে সংস্কার সমিতি গড়া এবং তাহার অধীনে হরিসভা স্থাপন করিয়া তাহাতে সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে কীর্তন, পাঠ, কথকতা এবং সংবাদপত্র হইতে দেশের ও তৎপ্রসঙ্গে নিজ গ্রামের অবস্থা পর্যালোচনা। দুর্গতদের ঘনিষ্ঠ সহযোগে, তাহাদেরই সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, গ্রামে দিবা ও নৈশবিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, স্বাস্থ্য ও সেবা-সমিতি, ব্রতীদল, সালিশী-পঞ্চায়েৎ, সমবায় সমিতি পরিচালনা, মুষ্টিভিক্ষাসংগ্রহ, আবাস পরিষ্করণ এবং রাস্তাঘাট সংস্কার।

২। আবাসিক শিক্ষা

বিনা দক্ষিণায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে দুর্গতদের ছেলে রাখিয়া অন্যান্য ছাত্রদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্য হইতেই সমিতির ভাবী কর্মী ও কেন্দ্র-পরিচালক তৈরি করা।

৩। ব্যাপকভাবের প্রচার এবং সংঘ-সংগঠন

প্রচারকার্যের পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে সংস্কার সমিতির শাখা স্থাপন। তদ্দ্বারা স্থায়ীভাবে অস্পৃশ্যতা-পরিহার ও শিক্ষার প্রসারে দুর্গতদের সামাজিক অধিকার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। দুর্গতদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় উন্নতির পথে যে-সকল অন্তরায় আছে, তাহার প্রতিকার।

আমরা দেশবাসীদিগকে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য দেশের সর্বত্র এইরূপ স্থায়ী কাজের অনুষ্ঠান গড়িতে আহ্বান করিতেছি।...

এই সংস্কার সমিতি বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় কবির স্বাক্ষরিত আবেদন (১৫ই অঘ্রাণ ১৩৩৯, ১লা ডিসেম্বর ১৯৩২) 'Mahatmaji and the Depressed Humanity' শীর্ষক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল—'Proceeds from the sale of this book will go to the সংস্কার সমিতি, বিশ্বভারতী, for helping in its work of removing untouchability' অস্পৃশ্যতা, হরিজনদের ওপর অত্যাচার, গান্ধীর অনশন সম্পর্কে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ পত্রালাপ এই পুস্তিকার বিষয়। বলা বাহুল্য, অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে গান্ধী-পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর অচিরেই মতান্তর ঘটেছিল। চরকার ওপর অতিমাত্রায় জোর দিলে যদি গান্ধী-অনুমিত ৫০,০০০ টাকার সাশ্রয়ও হয়, তাতেও কৃষকের অধিকারের সীমা বাড়ছে না, তার সীমাহীন দারিদ্র্য ও সামাজিক নিপীড়নও দূর হচ্ছে না। প্রতি বছর কয়েকদিন ভাঙ্গি-কলোনিতে বাস করলেই সমস্যার সমাধান হয়না। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব, কৃষিজীবী জনগণ ও বুদ্ধিজীবী মানুষের মানসিক বিচ্ছেদের সমস্যাকে প্রায়-আধুনিক সমাজবিদের দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর পরিকল্পনাগুলিও অনেকাংশে 'ইউটোপিয়ান'। তবু তিনি সমস্যার গভীরে পৌঁচেছিলেন। অতদূর আর কোন দেশনেতার দৃষ্টি পড়েনি। যৌথখামার, ধর্মগোলা, দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট নিবারণ, মহামারী প্রতিষেধ, সমবায় ব্যাংক ও সমবায় সমিতি, বৃত্তিশিক্ষার দ্বারা যথার্থ আধুনিক সমাজকল্যাণ পদ্ধতিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কীর্তন, পাঠ এবং কথকতার সঙ্গে প্রাচীন সমাজের পুনরুত্থানের যোগ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা এবং পল্লীসমাজ-উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে এগুলিকে মিলিয়ে দেখতে হবে। পাঠ ও কথকতা লোকশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। নৈশ ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের পক্ষেও কার্যকর। লক্ষণীয় যে, সমবায়ের দ্বারা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা লাহোর কংগ্রেসের নেতারা ভাবতে পারেননি। 'কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিবনা বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না।'—এই কথায় আন্তরিক বিশ্বাস এখনো অনর্জিত।

সংস্কার সমিতির গঠনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের শুচি, স্নান-সমাপন, প্রেমের সোনা রং রেজিনী, প্রথম পূজা বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। কবিতাগুলি পরিচিত, তাই এখানে উদ্ধৃতি বর্জন করা হল। কিন্তু কী প্রবল গণমুখী মানবপ্রেম সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

'একজন লোক' কবিতার অংশ উদ্ধার করা হল।

আধ বুড়ো হিন্দুস্থানি
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ,
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে শহরের দিকে।

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ
সেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো
যেখানে আমি—একজন লোক।

একই দেশে একই সমাজের দুই শ্রেণী, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। আমদানীকরা শিক্ষার এমনই প্রভাব। এই এলিটীয় জীবন এবং অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলেছে। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে 'অস্থানে' বা 'একজন লোক' বিখ্যাত উপলখণ্ড নয়; কিন্তু নতুন মূল্যবোধের বিশিষ্ট নিদর্শন।

এইসব বিভেদ, বিচ্ছেদ থেকে মুক্তির জন্য কবি ডাক দিয়েছিলেন যুবসমাজকে।

'আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েছে। তাই অবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্রয়ের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গড়ে তুলি, তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আমাদের শুভ চেষ্টাও খণ্ড খণ্ড হয়ে দেশকে আহত করছে।

'এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তার নিঃশ্বাস রোধ করতে প্রবৃত্ত, এ-পাপ প্রাচীন যুগের, এই অন্ধ বার্ধক্য যাবার সময় হল। তার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জ্বালিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দুঃখই পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হয়ে যাক নিঃশেষে ভস্মসাৎ।

'আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক তরুণদের নব জীবনের মধ্যে। আচারভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হয়ে তারা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক। যে-দুর্বল সেই ক্ষমা করতে পারেনা, তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত করে দিক, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সার্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।'

বিষ্ণুপুর ১নং ব্লক যুব উৎসবে পুরুষদের উচ্চ-লম্ফন
প্রতিযোগিতায় লম্ফনরত জনৈক প্রতিযোগী।

গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রচার ও অপপ্রচার

নবীন পাঠক

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা হয়ে উঠেছে, এটা খুবই বিপজ্জনক। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রচারাভিযানে নেমেছে, তাকে সিদ্ধ করতে গিয়ে ভারতের কয়েকটি সংবাদপত্র ও স্বার্থান্বেষী মহলও উঠে পড়ে লেগেছে। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল কমিউনিস্টরা বলেই বিষয়টি বিপজ্জনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারকের ভূমিকায় নেমে তিরিশে মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে এমন পর্যন্ত লিখেছে, বামফ্রন্ট সরকারকে যদি কেন্দ্র যে কোন অজুহাতে ভেঙে দেয়, সেটা হবে গণতান্ত্রিক। সরকার ভেঙে দিতে না পারাটাই অগণতান্ত্রিক। একমাত্র জঙ্গীশাহী ও কমিউনিস্ট শাসনে নাকি সরকার ভাঙা যায় না, কাজেই কমিউনিস্টরা অগণতান্ত্রিক। গণতন্ত্রের এধরণের সংজ্ঞা মার্কিন প্রচারেরই অংশ। সুকৌশলে তা ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে।

বাস্তব জীবনের ঘটনাপ্রবাহে এ প্রশ্নের আজ সন্দেহাতীতভাবে উত্তর মিলে গেছে যে, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ এই দুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি জনগণের সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। পুঁজিবাদের প্রচারকরা মনে করছে, সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করতে গেলে আধুনিক যুগে মানবাধিকারের কথা বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে তারা পুঁজিবাদ সম্পর্কে একটা তাত্ত্বিক প্রহেলিকা তৈরি করে এবং গণতন্ত্র মানবিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করে। এর জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। গণতন্ত্রের সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে এই প্রচারকরা কোন উচ্চবাচ্য করে না। ওখানেই যে তাদের বিপদ।

একসময় যখন সামন্তশোষণ ছাড়া আর কিছু ছিল না, তখন ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার নামোচ্চারণ করা অসম্ভব ছিল। যে দাসত্বের সর্তই জমিদার সামন্ত প্রভু ও রাজা মহারাজারা দিক না কেন, সেটা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেওয়া সাধারণ মানুষ, দাস কিংবা কৃষকদের পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক। যখন শিল্পায়নের যুগ শুরু হল, তখন বড় বড় শিল্পপতিরা আরেক ধরণের শোষণ সৃষ্টি করল। সামন্ত প্রভুদের সাথে শিল্পপতিদের বিরাট বিরোধ বাধে। শিল্পপতিরা তখন সেই অর্থে প্রগতিশীল। কারণ শিল্পপতিরা বলল, অন্যায় হলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করা যাবে; আইন আদালত, ভোট সব থাকবে। এরই নাম দেওয়া হল গণতন্ত্র। এভাবে শিল্পপতিদের স্বাধীনতা অর্থাৎ শোষণ নিপীড়ণ চালাবার স্বাধীনতাকে যখন আইনসিদ্ধ, সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করা হল, তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার ফাঁকা আওয়াজের তীব্রতা বেড়ে যায়। নিপুণভাবে গোটা সমাজের ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি যার থেকে একক্ষেত্রে লাভবান গোটাকতক বড়লোক এবং সর্বনাশ সমাজের বাকি গোটা অংশের মানুষের। এই অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য যাতে শোষিত মানুষকে সমাজের এইসব শোষণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে না পারে তার জন্য গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা মানবাধিকার ইত্যাদি আওড়ানো হয়। যেমন শিশুর কান্নাকে রোধ করতে চকোলেট দেওয়া হয়। গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে মানুষ তার অসারত্ব বুঝে সত্যিই যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে আছে আইন, আদালত পুলিস মিলিটারী, ঠ্যাঙারে বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র। এই শিল্পপতি বড়লোকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য থাকে রাজনৈতিক দল। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম যুগে সমান ভোটাধিকার ছিল না। রাষ্ট্রশাসকদের হাতে ছিল সবকিছু। গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন বিস্তৃতির সাথে সাথে অধিকারও সম্প্রসারিত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে বা না-থেকে শিল্পপতিদের অর্থ ও ক্ষমতায় বলীয়ান রাজনৈতিক দলেরও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিপথগামী করতে। এসবের মধ্যে দাঁড়িয়েও যখন গণতান্ত্রিক উপায়েই জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বকারী দল বা গোষ্ঠী শত্রুদের কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়, তখনই 'গণতন্ত্রপ্রেমী' শাসকদের দল হয়ে ওঠে জঙ্গী। গণতন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় অথৈ জলে। সুদীর্ঘ মানব ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে উপরোক্ত কথাগুলি জাগতিক সূত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঘটনাবলীকে এইভাবে দেখার মত চেতনার যথেষ্ট অভাব থেকে যাওয়ায় এখনও বড়লোকদের দলগুলি মানুষকে বিপথগামী করতে পারে। মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে, গণতন্ত্রের মূল্য সম্পর্কে তার চেতনা জাগ্রত হলে গণতন্ত্রের শত্রুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বড়লোকদের দেওয়া গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করার সার্থকতা এখানেই।

প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই। প্রচারের উদ্যোক্তা আগেই বলেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং তাদের সম-মনোভাবাপন্ন ধনতান্ত্রিক দেশগুলি। ভারতের মত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের শত্রুরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই প্রচার প্রতিনিয়ত চালায়। চরণ সিং, মোরারজী দেশাই বা ইন্দিরা গান্ধী সবারই এক রা। জনগণের এক বিরাট অংশের মধ্যেও এ নিয়ে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পেরেছে। আমাদের দেশে একদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড়, অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর। কোটি কোটি মানুষকে শোষণে সর্বস্বান্ত করেই বড়লোকদের এত সম্পত্তি। সমস্ত অন্যায়ভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে পুঁজিপতি পরিবারগুলি মানুষের ওপর শোষণ নির্যাতন চালায়, মানুষ তার প্রতিবাদ জানায়। দিল্লির সর্বশক্তিমান সরকার বড়লোকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে কাজ করে। এরকম একটা পরিবেশে যুগ যুগ ধরে পৃষ্ট যে কোন মানুষের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক পরিবেশের কথা বাস্তবে উপলব্ধি করা সত্যিই কঠিন। আমাদের দেশে যে অর্থে গণতন্ত্র এত প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই অর্থে সেই ধরণের গণতন্ত্রের কোন প্রয়োজনই নেই। সাধারণ মানুষ তার তাগিদ-বোধ করে না। কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে বড়লোক গরিব বলে কিছু থাকছে না, একজন অপরকে শোষণও করতে পারে না। সমস্ত রকম শোষণ ব্যবস্থার বিলোপ করেই যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়। যে দেশে বেকারী নেই, সেখানে বেকার যুবকদের কাজের অধিকারের

জন্য আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকারদানের প্রশ্নই ওঠে না। ভাত কাপড়ের সমস্যা যে দেশে নেই, সে দেশে ভাত কাপড়ের জন্য আন্দোলন করার গণতন্ত্রেরও প্রয়োজন কি? মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির যেখানে সমাধান হয়নি, গণতন্ত্র দরকার সেইসব ধনতান্ত্রিক দেশেই, যে অর্থে অন্ততঃ এখন আমরা গণতন্ত্রের প্রয়োজনটা উপলব্ধি করি। গণতন্ত্র যে কারণে দরকার, সেই কারণগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশে দূর হয়ে যায়। উপরন্তু সত্যিকারের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপ সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব। সেই গণতন্ত্রের নাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। ভারতের মত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিদ্যমান গণতন্ত্রের নাম বুর্জোয়া গণতন্ত্র। এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থ,—শোষণ নিপীড়ণ অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের সভা, সমাবেশ, সংগঠন করার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু এটুকু গণতন্ত্রও শাসকদের পক্ষে একসময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তখন শাসকরা সেই গণতন্ত্রও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জঙ্গী হয়ে ওঠে। যেমন শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থার সময় জঙ্গী শাসন কায়েম করেছিল, যেমন পাকিস্তানে বাংলাদেশে ও বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে জঙ্গী ও সামরিক শাসকরা শাসন করছে। এই জঙ্গী শাসনের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অনুযায়ী শাসনপদ্ধতির যে কোন সমালোচনা যে কোন লোকই করতে পারে। সংবিধানে সেই অধিকার সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে। বড়লোক-গরিব না থাকায় সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার সমস্ত জনগণেরই সরকার। কাজেই ধনতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশের সাংবিধানিক অধিকার কথার ফুলঝুরিও নয়, ফাঁকা আওয়াজও নয়। কিন্তু যারা এই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমালোচক, তারা ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিবেশে মানুষ হয়ে তার চৌহদ্দির বাইরে কোনকিছু চিন্তা করতে শেখেনি। সেজন্য তারা ভাবে, সমাজতান্ত্রিক দেশে যখন প্রতিবাদ ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং, ট্রেন আটকানো, বাস পোড়ানো ইত্যাদি হয় না; পুলিস লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস চালায় না, মিথ্যা মামলায় পুলিস প্রতিবাদী মানুষ ও সমালোচকদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় না, সেটা আবার গণতন্ত্র হল কি করে? তাদের কাছে গণতন্ত্রের অর্থ, খুনোখুনি মারামারি তুলকালাম কান্ড। তারপর অনেক হেস্তনেস্ত করে বড়জোর বিচারবিভাগীয় তদন্ত। অপরাধীরা তাকে হেসেই উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা ভাবতেও পারে না, ধনতান্ত্রিক দেশের মত সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনকর্তারা জনগণের শত্রু নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে জনগণের বক্তব্য, সমালোচনা ও পরামর্শ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার গ্রহণ করে। সেজন্যই সেখানে তুলকালাম কান্ড করার কথা মানুষের চিন্তার মধ্যেই নেই। এই বুর্জোয়া প্রচারকরা ভাবে, গভর্নমেন্ট মানে এমন একটা বস্তু যা জনগণকে পিষে মারে, প্রতিবাদ করলে জনগণের বিরুদ্ধে পুলিস লেলিয়ে দেয়। গভর্নমেন্ট মানে জনগণ যা চাইবে, তার বিরুদ্ধে দমনপীড়নমূলক কাজ করা। সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকার যেহেতু জনগণের বক্তব্য ও সমালোচনাকে মর্যাদার সাথে গ্রহণ করে এবং সেজন্য যখন কোন সংঘর্ষ হয় না, তখন সেই সরকার সরকারই নয়। এই ধ্যান ধারণা নিয়েই তারা সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই বলে প্রচার করে। অথচ জনগণের সমালোচনা ও পরামর্শের মর্যাদা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশে দেওয়া হয় বলে গণতন্ত্র সেখানে বিকশিত হয়, গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপের বিকাশ ঘটে। জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত হয় একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই। সেখানে এই অধিকার হরণের কোন ভয় বা আশংকা নেই। সেজন্য সেখানে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-ও করতে হয় না, দিবারাত্র গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে বুকফাটা চিৎকারও করতে হয় না।

গণতন্ত্রের আর একটি মূল্যবান দিক হ'ল বিরোধীপক্ষ নাকি থাকতেই হবে। কিন্তু সে তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রে প্রয়োজন, যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভারতের মত যেখানে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আবরণ রয়েছে, সেই দেশে মানুষের খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই, জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে, কোটি কোটি মানুষ বেকার, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই সেখানে মানুষের শত সহস্র দাবি। সমস্যা জীবনমরণের। মানুষের দাবি ন্যূনতম, যেটুকু পেলে সে জীবনধারণটুকু করতে পারে। এই কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদকে ভাষা দিতে তাদের সংগঠন চাই, সংগঠন চাই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে। তা না হয় মানুষ অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন থাকলে তার ওপর কেন্দ্রের পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের সীমা পরিসীমা থাকে না। এই সংগঠনগুলিই হল বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিরোধীপক্ষের এই ভূমিকা পালনের অবকাশ সমাজতান্ত্রিক দেশে কোথায়? ওখানে চাকরি দাও—এই দাবিতে ক্ষোভ বিক্ষোভই নেই। খেতে দাও পরতে দাও রেশন দাও—এসব দাবি করার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই যে বিরোধীপক্ষ ভারতে, ব্রিটেনে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দরকার, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই বিরোধীপক্ষের প্রয়োজন কোথায়? কেন বিরোধীপক্ষ? কিসের বিরোধিতা করবে? বিরোধীপক্ষের কাজ কী হবে? সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার ভুলপথে চললে তাকে শোধরানো? সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারের ভুলপথে চলার অর্থ তো এই নয় যে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সমস্যা সৃষ্টি হবে? ছোটখাট ত্রুটি বিচ্যুতি যদি সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত করার পথে হয়েই থাকে, তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ লক্ষ সদস্য সমালোচনা আত্মসমালোচনা করে। এই লক্ষ লক্ষ সদস্য পার্টির ভেতরে যা কিছু বলবে, সেটা জনগণের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে জনগণের বিভিন্ন অংশের বক্তব্যই তুলে ধরে। তার বাইরে যে জনগণ রয়েছে, তাদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তার জন্য রয়েছে সরকারী-বেসরকারী অসংখ্য নির্বাচিত গণসংগঠন। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত হ'ল, শ্রমজীবী মানুষের ডেপুটিদের সোভিয়েত। এই সোভিয়েতগুলি গণসংস্থা। সাধারণ মানুষরা এদের নির্বাচিত করেন এবং সাধারণ মানুষের কথামতই তা চলে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রাম সোভিয়েত থেকে সুপ্রিম সোভিয়েত পর্যন্ত নির্বাচিত বিশ লক্ষ প্রতিনিধি বা ডেপুটি সরকার চালায়। এর সাথে রয়েছে ২৫ লক্ষ সক্রিয় সোভিয়েত কর্মী। কাজেই জনগণের বক্তব্যকে এভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলেই ক্ষোভ বিক্ষোভ আন্দোলন করতে হয় না জনগণকে। এই কারণেই বিরোধীপক্ষ গঠনের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, মানুষের বিক্ষোভ থেকে

যায়, তাঁরা আন্দোলন করতে চান, তাহলে ঘটা করে বিরোধী রাজনৈতিক দল করার প্রয়োজন হয় না, আপনা থেকেই বিরোধীপক্ষ গড়ে উঠতে বাধ্য এবং সেটা জাগতিক নিয়মেই হবে। সোভিয়েতে বিপ্লবের পর গত তেষট্টি বছরের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে এটা বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক। অন্যদিকে জংগী শাসনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় মানুষের ক্ষোভ থাকলে কী করে তা বিস্ফারিত হয়। পৃথিবীর বর্তমান ও অতীত ইতিহাসে জংগী শাসনের উত্থান-পতনের অজস্র ঘটনার মধ্যে কোথাও একটি ঘটনাও পাওয়া যাবে না যেখানে জংগীশাহী মানুষের বিদ্রোহের চাপে পর্যুদস্ত হয়নি। স্পেনে একনায়কতন্ত্রী জংগীশাসক ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে চল্লিশ বছর ধরে মানুষ লড়াই করে গেছে, অভ্যুত্থানে সফল হতে চল্লিশ বছর সময় লেগেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে সমালোচনা ও বিতর্ক যা কিছু হয়, সেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজকে প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত। কাজেই প্রতিবাদের ধরণ জংগীশাহী ও সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। সমাজতান্ত্রিক সমাজ উৎখাত করে ধনতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের কথা গোটা জনসংখ্যার কেউ বলেন না। সলঝেনিৎসিন প্রমুখদের আলাদা ব্যাপার। এদের আগেই তাড়ানো হল না কেন বুঝি না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথাই গোটা অংশের মানুষ বলে, ভারতে সেই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। গণতন্ত্র যেখানে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত, সেখানে বুর্জোয়া প্রচারকরা জংগীশাহী ও কমিউনিস্ট সমাজকে এক করে দেখার জন্য মানুষকে শিক্ষা দেয়। অথচ এই প্রচারকরাই চীন সোভিয়েতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলে, সেখানে ভাত কাপড় বা মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের কোন সমস্যাই নেই। ফ্যাসিস্ট হিটলারও বলতো সমাজতন্ত্রের কথা, যার নাম দিয়েছিল জাতীয় সমাজতন্ত্র। ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজী দেশাইদের মতো বুর্জোয়া শাসকরাও সমাজতন্ত্র গঠনের কথা বলে। কারণ সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এমন এক আস্থা গেঁথে দিয়েছে যে, সমাজতন্ত্রের কথা না বললে মানুষ আর কাউকে বিশ্বাস করছে না। এটা সমাজতন্ত্রেরই জয়ের একটা পরিচয়। কিন্তু গণতন্ত্রের নাম করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের এই শত্রুরা যে আক্রমণ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামকে তীব্রতর করা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিটি কর্মীরই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

গণতন্ত্র শব্দটির চেয়ে এত বেশি বলাৎকার অন্য কোন শব্দের ওপর হয় না। গ্রীক শব্দ "demoskratos" শব্দ থেকে Democracy কথাটা এসেছে। "demos" মানে জনগণ এবং "kratos" মানে শাসন। অর্থাৎ গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের শাসন। কিন্তু কল-কারখানা, জমি সম্পত্তি বাড়ি যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে থাকে এবং তারা যদি অবাধে কোটি কোটি মানুষকে শোষণ করে, তাহলে তাকে কি জনগণের শাসন বলা যায়? বুর্জোয়া শাসকরা শুধু মুখের কথায় বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা বলে। অথচ এরাই সেসবের হন্তা। সমাজতান্ত্রিক দেশে এসব স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়। সংবাদপত্রগুলি আমাদের দেশে কোটিপতিদের মালিকানায় রয়েছে। কাজেই পুঁজিপতিদের প্রচারটাই এসব সংবাদপত্রের মূলধন। রেডিওতে প্রচার হয় কেন্দ্রের জনবিরোধী সরকারের হুকুমে। জনগণের কথা তাতে স্থান পায় না। গণতন্ত্রের পুলিস রাখতে শতকরা পাঁচ সাত ভাগ জায়গা বিরোধীদের জন্য দেওয়া হয়। ঘুষে বিচারকদের রায় পর্যন্ত পাল্টে যায়। জনগণ বিচার কোথায় পাবে? এটা গোপন রাখার কিছু নেই যে, সমাজ-তান্ত্রিক দেশের প্রচার মাধ্যমে বুর্জোয়া ভাবধারা প্রচার করতে দেওয়া হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের পর দাবি উঠেছিল, জারপন্থী, রাজপন্থী, নৈরাজ্যপন্থীদের বক্তব্য প্রচার করতে দিতে হবে। লেনিন তখন বলেছিলেন, আমরা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীতেই এই প্রশ্নটাকে দেখি। কাজেই প্রচারযন্ত্রে এমন কিছু প্রচার করতে দেওয়া হবে না যা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা করবে এবং ধনতন্ত্রের জয়গান গাইবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের চেয়ে সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধনতান্ত্রিক সমাজ ভাল—এই জনবিরোধী প্রচার করতে দিলেই বুর্জোয়া প্রচারকদের কাছে "গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা" রক্ষিত হয়। সেই গণতন্ত্র জনগণের চরম শত্রু। সমাজতান্ত্রিক দেশে সংবাদপত্র একটি নয়, অসংখ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৫৭টি ভাষায় ১৪ হাজার সংবাদপত্র ও সাময়িকি প্রকাশিত হয়। চীনে এর চাইতে অনেক বেশি। সেখানে জনগণের সমস্ত অংশের মতামত প্রচারিত হয়।

ধনতান্ত্রিক দেশে যেমন ভারতে অন্যায় অবিচারের প্রতি-বাদ করা যায়, কিন্তু তা করতে গেলে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার সরকারের অন্যায় অবিচারের সমর্থন করে সমস্তরকমের সমাজবিরোধী কার্যকলাপও চালানো যায়। তার বিরুদ্ধেও আইন আছে বটে। কিন্তু আইনের নিয়ন্ত্রক সরকার ও তার প্রশাসন-পুলিস সেইসব সমাজবিরোধীদের মাথায় তুলে রাখে। এরই নাম বুর্জোয়া প্রচারকদের কাছে গণ-তন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশে উল্টোটা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজের সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য, প্রগতির জন্য যা কিছু করা হোক, সবটুকুকে সমাদর দেওয়া হয়। সমাজবিরোধী কার্য-কলাপ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও তিরোহিত। এর নাম সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্র। তাহলে সত্যিকারের গণতন্ত্র কোন্‌টি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ হয়ে জনগণের মধ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করার প্রবণতাই লোপ পায়। সেই প্রবণতার সামান্য-তম কিছু দেখা দিলেও কঠোর হস্তে তা দমন করা হয়। তাহলে দেখা যায়, কোন সরকার চাইলে শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার অবিচার সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশেই তা সম্ভব এবং একমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্রেই তা সম্ভব। তাহলে মৌলিক প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় কোন্‌টি ভাল—স্বৈরতন্ত্র বা জংগীশাহী না বুর্জোয়া গণতন্ত্র? কোন্‌টি ভাল—বুর্জোয়া গণতন্ত্র না সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র? কোন্‌টি ভাল—ধনতন্ত্র না সমাজতন্ত্র? তবে এটা তো নিশ্চিত যে, টাটা বিড়লার পক্ষে যা ভাল, জনগণের পক্ষে তা নিশ্চয়ই সর্বনাশ। আবার জনগণ যাকে ভাল মনে করবে, টাটা বিড়লারা তাকে সর্বনাশ মনে করবে। টাটা বিড়লারা চায় ভারতে এখন যে ব্যবস্থা সেটা, অর্থাৎ ধনতন্ত্র। জনগণ চান সম্পূর্ণ বিপরীতটা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। কাজেই সমাজতন্ত্রের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের জন্য লড়াই অব্যাহতগতিতে চালিয়ে যেতে হবে। এই লড়ায়ের জন্য বুর্জোয়া গণতন্ত্র দরকার। অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্র দরকার জনগণেরই।

গল্প

নিঙা ভাই মরিনি

প্রণব কুমার চক্রবর্তী

কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল—সেরকম কিছুই ছিলনা। অথচ শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল। ঘটে গেল এত বড় ব্যাপারটা।

গ্রামটা ছোট। সবে সন্ধ্যার মজলিস মণ্ডপতলায় জমে উঠব উঠব করছে। বোশেখী উত্তাপ। এরই মাঝে উত্তর পাড়ার নিতাই-পদ এসে খবরটা দিল—আর পাখির পালকের মত তা ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশ।

পালেদের লেঠেল টাঙি দিয়ে কচুকাটা করে ফেলেছে নিঙা কাহারকে। পাশের গাঁয়ের রমজান চাচার কাজ ছিল কামার দোকানে। ওখানেই বসেছিল ও। একলাফে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল—"কি হলছে র‍্যা ?" রমজান চাচা আগে ভাগেই কানা-ঘুষায় একটু আধটু শুনেছিল পালেদের সাথে নিঙার গণ্ড-গোলের কথা। ওকে বলেওছিল রমজান চাচা—"দ্যাখ ভাই আমরা হ্যালাম ছোট জাত—মুখ্যু নোক—মজুর খাটি—বাল-বাচ্চা আছে—আমাদের কি উসব বড়নোকদের সাথে আবাদ বিবাদ মানায় র‍্যা।"

নিঙা কথাগুলো ভালোকরে শুনেই উত্তর দেয়—"চাচা ইসব কথা ঠিক লয়। উ বড়নোক তাতি তুমর আমর কি ? উকি আমদের কিনি রাখছে ? উদের পয়সা আছে বলি যা খুশী তাই করবি ?—ইসব কেমন কথা গো চাচা।" রমজান চাচা বোঝাতে চেয়েছিল ব্যাপারটা। "ওদের জমিতে মজুর খেটিই আমদের পেট চালাতি হয়।" কিন্তু নিঙা ওর কথাই বলে—"উসব ছাড় চাচা। অলায্য কাজ করব না। হকপথে চলি। উ বড়নোক—তা কি হলু—যা খুশী তাই করবি ?"

আর কিছু না বলে—কিংবা রমজান চাচাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হনহন করে চলে গ্যাল। আজ হঠাৎ পালেদের সাথে নিঙার গণ্ডগোলের খবর পেয়ে চমকে উঠল রমজান চাচা। মনে পড়ল সেই কথাগুলো। একলাফে কামার দোকান থেকে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—"কি ব্যাপর র‍্যা ?"

নিতাইপদ এমনিতেই মজলিসের মাঝে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটা বলছিল—তাই উত্তেজনার মাঝে রমজান চাচার কথা আলাদা করে তার কানে গ্যালনা। যেটুকু রমজান চাচার কানে গ্যাল তাতে বুঝতে পারল পালেদের ভাড়াটে লেঠেল নিঙাকে খুন করেছে। তবে মরার আগে অবধি নিঙা লড়েছিল—মরদের মত। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গ্যাল মণ্ডপতলায়। ছেলে ছোকরার দল বয়স্কদের ধমকানি এড়িয়েও জমে রইল। ব্যাপারটা কি সে নিয়ে মাথাব্যাথা সেরকম নয়। সবার মুখে কথা একটাই—

"নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল।" কেউ হয়তো ভাসা গলায় বলল—"উদের পয়সা কত উরা তু মারবিই।" কেউ আফসোস করল—

"যাঃ, নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল র‍্যা!" ভুতো খুড়োই একমাত্র আইনের কথাটা তুলল। থানা পুলিস হবি। এপাশ ওপাশ থেকে কেউ বলল—"আরি উসব তো পয়সার ব্যাপর।"

তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনা কমে এল। কেউ ঘরের পানে আবার কেউ কেউ ঘটনাস্থলের দিকে যেতে শুরু করল। ব্যাপারটার মাঝে যে একটা কিন্তু আছে সেটা অনেকেই জানে—কিন্তুটা যে কি সেটা সঠিক কেউ জানেনা।

অবশ্য জমির ব্যাপারটা রমজান চাচা আর দু' চারজন ছাড়া ভালোভাবে কেউ জানেনা। রমজান চাচা চুপচাপ। কোন কথা নেই। কামারশালের একপ্রান্তে মাথা নীচু করে বসে আছে। ওদিকে হাতুড়ির ঘায়ে তার ইস্পাত ক্রমশ হাঁসুর আকার নিচ্ছে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রমজান চাচা উঠে পড়ল। "উদিকি একবার যাবার দরকার। ছুড়াটা অকালি চলি গ্যাল। উর ঘরের নোক আর বাল-বাচ্চাগুলা না খেতি পেয়ি মারা পড়বি ?"—নিজের মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রমজান চাচা।

বিলপারে যেখানটায় ঘটনাটা ঘটেছিল রমজান চাচা যখন সেখানে গ্যাল তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ওপাশের সুইজগেটের উপর বেশ কিছু লোক জড় হয়েছে। প্রত্যেকের মুখই কেমন থমথমে—হাঁ চাঁ নাই একটুও। একটু একটু করে রমজান চাচা নিঙার পড়ে থাকা দেহটার কাছে গ্যাল।

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে নিঙা! না নিশ্চিন্তে নয়। ওর মুখের মধ্যে বিরক্তির ছাপ—ভ্রূকুটি। মাটিতে হাঁটুগেড়ে রমজান চাচা আল্লার কাছে তার জন্যে প্রার্থনা জানাল—শ্রদ্ধা জানাল এই একগুঁয়ে—জেদী—চওড়া বুক ছোঁড়াটার জন্যে। যে দু'বেলা পেটভরে খেতে পেত না তার মধ্যে এত তেজ এত আগুন ছিল কে জানত ?

এতক্ষণে বেশ লোকজন এসে গ্যাছে। নিঙার আত্মীয় পাড়াপ্রতিবেশী। চারপাশে কানাকানি। কত রকম কথা। নিঙার সদ্য বিধবা বউ ও চার চারটে ছেলে সবগুলোই একথেকে আট বছরের মধ্যে নিঙার পাশে বসে আছে। বুঝবে আর কে কতটা ? ঐ বড়ছেলে কানু আর নিঙার বো। বো মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছে শাপশাপান্ত দিচ্ছে। কাঁদছে গলা ছেড়ে-"ওগু আমর কি হলু গা—আমর কি হবি ? মর মর সব মর। আমর মরদকে যারা মারেছিস তাদের নিব্বংশ হবে। আল্লা তুমি

বিচার করু—আল্লা—আমর মরদকে যারা মারিছে তাদের যেন নিব্বংশ হয়—মুখ দিয়ি গলগল করি অক্ত উঠে।" খুকনি পিসি, অচুখেপী যে যার মত সান্ত্বনাও দিচ্ছে। দুঃখ করছে। কেউ শুনছে। কেউ কিছু বলছে। আবার কেউ একেবারে চুপচাপ। কুলুপ আঁটা। কিছু একটা করা দরকার।

ফিসফিস গুঞ্জনটা ক্রমশ একটু চাপা উত্তেজনার দিকে মোড় নিতে শুরু করল। কয়েকজন বেশ উত্তেজিত—নিঙার প্রতিবেশী, রমজান চাচার পাড়ার লোক—এরা বেশ ক্ষুব্ধ। উত্তেজনা আরো বেড়ে উঠল। আইনরক্ষকের দল এসে পড়ল। বড় দারোগা এসেই জেরা শুরু করল—

"যখন ঘটনা ঘটে তখন কে কে উপস্থিত ছিলি?" প্রথমটা কেউ সাড়া দিতে চায়নি পরে দারোগা আবার হাঁকতে যেদিকটায় উত্তেজনা বেশী ছিল সেখান থেকে একজন বেঁটে শীর্ণকায় লোক বেরিয়ে এল—

—"আমি ছিলম বটে"

বলেই দারোগার সামনে মাথার মাথালটা ছুড়ে ফেলে দাঁড়াল। দারোগা ওর পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিল এক পলক। শুধাল—

—"তোর নাম কি?"

—"দীনু বটে।"

—"কোন গায়ে থাকিস?"

—"ঐ হোথা, উ গায়ে"—বলে পুবের দিকে আঙ্গুল দেখাল।

—"আরে নামটা বলবিতো"—বলে মাটিতে বুটটা ঘষে নিল।

—"শুশুনপুর বটে।"

—"তা তুই দেখেছিলি নিঙাকে কারা মারল?"

—"কারা কি গু? পালিদির লেঠিল আবর কারা? উরা তু ইর অ্যাগেও দু' সাতটা নোকাকি কুপাই কাটিছে—যে উদের মুখির উপর লাঠি ঘুরাইছে তাদিরকে শ্যাষ করি দিলছে—ভাড়া করা লেঠিল দিয়ি। কিন্তু এবারে নিঙাকি মারাটা......"

দারোগা "থাম" বলে—কাছের কনষ্টেবলকে ডাক দিল। ভীড়ের মাঝে—উত্তেজনাটা আরো অশান্ত হোল। সবার চোখ একবার দারোগার দিকে একবার দীনুর দিকে—কি হয় কি হয়। দারোগা একবার দেখে নিল—চারপাশটা। আজকাল কি সব হয়—বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। একসময় ছিল যখন এরকম খুনগুলো কিছুই ছিল না। আসবার দরকারও হোত না। সহকারী এসে কানে কানে কিছু বলতে দারোগা শুধু মাথা নাড়ল।

দারোগা ও দীনুর কথা থেকে বোঝা গেল নিঙা ওর বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে এ জমিটা চাষ করে আসছে। কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ পালেদের এ জমির প্রতি নজর পড়ে। বলে এ জমি আমাদের। অবশ্য পালেদের পুকুরটা সাইজ করার জন্যে এ জমিটার খুব দরকার। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নিঙার সাথে পালেদের খুচখাচ চলছিল। নিঙা আবার এমনিতেই একটু একগুঁয়ে, গোঁয়ার। দীনুর কথায়—"উ অলায্য কাজ করতুও না দেখতিও পারতু না।" বলাই মোড়ল এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। কিন্তু এবারে মুখ খুলল। "আরে চুপ কর বড় বড় কথা বলিসনি।" দারোগার দিকে তাকিয়ে বলল,—"যা হয় করুন আপনিই। ওদের কথা বাদ দিন। সব্ব তাতে বড় বড় কথা।"

কিন্তু দীনু সব কথাই বলবে। "কেনে বুলবুনা। উ যা বলিছি যা করিছি সব বুলবু।"

"সন্ধ্যের দিকে পালিদির বড় ছেলি লেঠিল নিয়ি এসে জমিতি নামে। নিঙা ধারে কাছিই ছিল। উ খবরটা পেতিই লাঠি নিয়ি ছুটি আসে। তখনো পালিদির লেঠিল জমিতি নামিনি। জমিতি বুক সমান পাট। চোখ জুড়ান পাট।"

নিঙা এসেই হুংকার ছাড়ল—"যে শালা জমিতি নামবি আজ তার একদিন কি আমর একদিন।"

বেশ কিছুক্ষণ বচসা হয়।

তারপর পালিদির লেঠিল জমিতি নামে। নিঙা বাধা দিতি গেলি পাঁচ ছ' জন ওকি ঘিরি ধরি টাঙ্গির কোপ বসিয়ি দেয়। উ একা আর কতুখণ লড়বি?"

সাঁঝ গড়িয়ে রাত নামব নামব। আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামবে মনে হয়। দারোগা একটু চঞ্চল হোল। ভীড়ের মাঝে এখন শুধুই উত্তেজনা।

দারোগা হাঁক দিল,—"রামধন, লাশ তোল।" কিন্তু চাপা গুঞ্জনটা এবার ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। দারোগা দেখল...... বিপত্তি......। বলাই মোড়ল ও ভূতো মোড়ল নড়ে চড়ে বসল। "দারোগাবাবু আপনিই দেখেন ব্যাপারটা আমরা ওদিকে যাই, জল হবে মনে হয়।"

দারোগা প্রথমে হুংকার দিয়ে সেই চিরায়ত নিয়মে ফায়সালা করা যায় কিনা দেখতে চাইল।

কিন্তু রমজান চাচা এবারে সপ্রতিভ। "না নিঙা ভাই কি আমরা কারুর হাতি দিবনা। যা করবার আমরই করবু।" দারোগা বুঝতে পারল আজ আর সুবিধে হবে না। হাসপাতালের পরীক্ষার কথা—আইনের কথা বলে দেখল কিছু হয় কিনা? শুধু বুট দিয়ে মাটী ঘষতে লাগল। হাতের উপর হাত ঘষতে লাগল।

রমজান চাচা এবারে জোর গলায় বলে উঠল—"ভাইসব নিঙাভাই মরিনি। নিঙাভাই আমদের দেখিয়ি দিল জান দিব তবে অধিকার ছাড়বো নাই। আর আমরা বড়নোকদের লাল-চোখকে ভয় পাবু না। ভাইসব, আজ সব থেকি দুঃখের কথা আমদের মতই মজুর তারা পালিদির কিনা গুলাম হয়ি সামন্য পয়সার লোভে আমদেরই এক ভাই কি খুন করলু।"

রমজান চাচার কণ্ঠস্বর প্রায় ভেঙে এসেছিল, কান্নায়—ক্ষোভে—দুঃখে, তবুও কিছু বলার চেষ্টা করছিল।

ফোটা ফোটা বৃষ্টি এবারে মুষলধারে নেমে এল। বাঁধ ভাঙা প্লাবনের মতো শেষ বোশেখের মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। তার মাঝে রমজান চাচা লাশে হাত লাগাল। রমজান চাচার পেছনে মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। দূরে দাঁড়িয়ে বড় দারোগা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বসন্ত

অসীম মুখোপাধ্যায়

দিগন্তবৃত্তের মধ্যে ডুবে গেছে সূর্য ও পাখীরা।

অর্ধনিমীলিত চোখ—ছুটে আসে ছায়ার বিমান
চরাচর শিস্‌মাখা স্তব্ধ প্রায় সাঁতালী পর্বত
আহ্নিকের কাল শেষ......তারাদের গগনবিহার ঃ
সপ্তর্ষির দীপ্তি নিয়ে অকাশ ভ্রূকুটি করে, হাসে
বাতাসে ফুলের গন্ধ মাতোয়ারা অখিল ভুবন!

খাবারের ঘণ্টা হলে এইসব রেখে যেতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ

ইরা সরকার

ইচ্ছে করে সব শিশুকেই দিই তোমার শৈশব
সোনার বাংলার গন্ধে স্বচ্ছল স্বচ্ছন্দ এক বিস্ময় আরক
লেখাপড়া গানশেখা বাবার সংগে ঘোরা
ডালহৌসী পাহাড়ে পাহাড়ে—

ইচ্ছে করে সব শিশুদের হাতে তুলে দিই
এক একটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতি
সদর স্ট্রীটের বাড়ী খুললে তারা ফিরে পাবে
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ সাবলীল জীবনের গতি—

আকাশের মস্ত খামে পৃথিবীর চিঠি প্রতিদিন
যে অক্ষরে লেখা থাকে শিশুরা তা বোঝে, তুমিও বুঝতে,
সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি, কিন্তু সবাই মানুষ হবে
ছড়ানো জীবন ধারা বহুদূর নদী এক পশ্চিম বাংলায়—

তুমি কি এখন কবি বাংলার পলিমাটি স্পন্দন আকুল
তোমার বাঁচার রস ছড়িয়েছ শিশুদের শিকড়ে শিকড়ে
যেমন অবুঝ মাকে ওপারের অবু মনে করে
রবির সোনার আলো এদেশের শ্যামল গভীরে॥

আগামী সকাল পর্যন্ত

চন্দন কুমার বসু

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কলম
স্থির
নিশ্চুপ...
সম্মুখে প্রস্তুত আগ্নেয়
ত্রস্ত
স্পন্দিত।
ডুবে যাবে মুহূর্ত পরেই
পশ্চিমে
নির্জনে—
তবু লাল, অনেক—অনেক লাল

মাথার আকাশ
আর
দিগন্ত রক্তিম।
নিংড়ে দেবেই রসদ
বাঁচতে
সারাটা রাত......
আগামী সকাল পর্যন্ত।

ব্রাহ্মস্পর্শের পাণ্ডুলিপিতে

কল্যাণ দে

ঈপ্সিত ঘাসের ডগায় প্রণয় ছড়িয়ে আছে হৈমন্তিকার ভোরে
দোর খোলেনা কেন স্বজন বকুল?
কাকের চোখের 'পরে স্বপ্ন যে ডিম ভেঙে স্নেহ ছড়ায়
মেঘের জাজিম লেপ এখনো বুকে জড়িয়ে
নিস্পৃহ সন্ন্যাস নিয়ে আত্মমগ্ন মাটির মানুষ......
বুক গুলো চিরে ফেল কলজেয় দেখ গাঁথা আছে
কালের শরীর
নগ্ন হলে নিজেকে বড় সহজেই চেনা যায়—

ঊর্ণনাভ বিছিয়ে রেখে গার্হস্থ্য মাঠের দাওয়ায়
নষ্ট বটের ছায়ার মত পাশা খেলা
বিধি বহির্ভূত গ্লানিকর
এত সব বাক্য শুধু নিষ্ফলা বীজ—ভেবোনা ঃ
জবান দিয়েছ যা নদীর দলিলে
এখন ব্রাহ্মস্পর্শের পাণ্ডুলিপিতে ঘোমটা খুলে হও
অরণ্যের সরল বর্গীয় উদ্ভিদ!

জনান্তিকে

কেতকী বিশ্বাস

কাস্তের ফলার মত পঞ্চমীর শিশু চাঁদ
থিক থিক করে কাঁপে
ঘুমন্ত আকাশের নিঃশ্বাসের চাপে,
অনাহুত, অশরীরী ইচ্ছারা কাঁপে
অস্পষ্ট তারায়, পাঁচিলের উপর গোড়া পেড়ে
কেটে ফেলা অশথের নরম পাতায়,
এখানে এক বুক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে
ছোট্ট ফাটলধরা চাতালে
পৌষের শীতে কাঁপি আমি।

বিছানার উত্তাপ স্বপ্নের দানবিক যন্ত্রণার কাছে
অতিরিক্ত, তাৎপর্যহীন,
ঘুম নেই; ঘুম আসে না;
ঘুমাতে নেই, ঘুমালে—
যন্ত্রণা চাপা পড়ে যায়
এক বুক কুয়াশার নিচে।
পাশের বস্তিতে সেই মেয়েটাও
ঘুমায় না আজ ক'দিন
ছটফট করে প্রসবের অসহ্য বেদনায়,
ঘুমাতে পারে না আরো অনেকে
যারা মেয়েটাকে পাহারা দেয়
এবং রাত্রিকেও।

পঞ্চমীর শিশুচাঁদ উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনে
টীনের চালে আটকে থাকা বাতাসের
করুণ প্রতিধ্বনি,
অভিজ্ঞ মায়েদের ফিস্‌ফিসে গলায়
সতর্ক প্রহর গোনা
এবং
আরো অনেকের সাথে আমার
ফুসফুসের দ্রুত উঠা নামা।

ঘুম নেই; ঘুম আসে না;
ঘুমাতে নেই; ঘুমালে, স্বপ্নের অশ্লীলতায়
স্বপ্নের সত্যটা মরে যায়!
তাই জেগে থাকি—
এক বুক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে
চরম যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে।
জেগে থাকি—
আরো অ-নে-ক "জেগে থাকা" চোখে
নিজেকে চিনব বলে।

চন্দ্রিমা

পরিতোষ দত্ত

দেখো চন্দ্রিমা—
চাঁদের তৈরী পাহাড়ের গপ্পো, আমি
শুনেছি অনেক,
দেখেছি কিন্তর—
মনে পড়ছে আবছা আবছা।
এক সেই বুড়ী
তার মাংস বিহীন দেহটাকে
যৌবন খোলসে পুরে
কোন ঐ আদ্যিকাল থেকে
শুধু চরকা কেটে চলেছে।

হাতে আমার অক্ষয় সুতো
ধমণীতে অমর পোষ্টার
দেবত্বের উত্তরাধিকার।

চন্দ্রিমা—
তোমার তৈরী পাহাড়ের গপ্পো আমার জানা নেই
শুনেছি বলে মনে পড়ে না
দেখেছি শুধু অমার অন্ধকারে
তবে—ভুলি নি কিছুই।
হয়তো বুঝেছিলাম—
তোমার নিঃশ্বাসে উষ্ণতা আছে,
রক্তের ফোঁটাগুলো এখনো দুধের মতো হয়নি
তোমার যৌবন পল্লবিত কুঞ্জ
পুরুষ্ট ন্যাকামির খোলসমুক্ত।
গোলাপ পাঁপড়ির স্তর বিভাগ—
আজও আমি জানি না,
ঘ্রাণের তীব্রতা—
জিজ্ঞেস করলে নির্ভুল উত্তর
আজ হয়তো তুমি আর পাবে না।
তবে ফুটপাথে বিছানো ছেঁড়া কাঁথার ঐ প্রত্যেকটি স্তর,
সিক্ত কাঁথার মাদকীয় ঘ্রাণ
কুশলী ছুঁচের নিপুণ টান
চন্দ্রা—
আজও আমি ভুলি নি।
চন্দ্রা, তোমার নিটোল যৌবন,
কুসুমিত কুঞ্জ—
অনন্ত সমুদ্রে, সময় মন্থনে ভাসিয়ে রাখো।
তোমার সৌন্দর্য, প্রতিটি মুহূর্ত,
মূর্ত হোক চিরবসন্তে।
শাশ্বত তন্ত্রীর ঝংকৃত বন্দনায়
ধরা থাক এক মলিন সত্য॥

লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন : এক পরম সত্য

ঋতীশ চক্রবর্তী

তর্‌ণ মানসের স্‌স্পষ্ট প্রতিফলন 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন'। ব্যবসায়িক দ্‌ষ্টিভঙ্গী অন্‌যায়ী একচেটিয়া প‌্‌জিপতি গোষ্ঠী সাহিত্য শিল্প জগৎ তাদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। এইসব সংবাদপত্র গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রের ম্‌ল লক্ষ্য ম্‌নাফা লোটাই শ্‌ধ্‌ নয়, এ'দের কেনা শিল্পী-সাহিত্যিক দিয়ে স্‌ষ্টিশীল মানসিকতাকে বিপথে পরিচালিত করা। মানসিক দিক থেকে এই বিকৃত চেতনা স্‌ষ্টির বির্‌দ্ধে সোচ্চারিত শব্দে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের আত্মপ্রকাশ।

বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতি আবহমানকালের। জীবনের জিজ্ঞাসা বাস্তবে চিত্রায়িত করবার প্রচেষ্টা করে থাকেন আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা। কিছ্‌ কিছ্‌ শিল্পী এরমধ্যে নিজেদের বিক্রী করে দেন জীবনের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবার জন্য। তাঁরা মৌলিক চিন্তাধারা থেকে অনেকটা সরে আসতে বাধ্য হন। যে শিল্প মান্‌ষের স্‌খ-দ্‌ঃখ হাসি-কান্নার প্‌রো চিত্রটাকে তুলে ধরতে পারে, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ করার মাধ্যম হিসেবে যে শিল্প প্রতিফলিত হয়, সেই শিল্পকেই আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন সময়ে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। অগণিত পাঠককে অন্‌প্রেরণা দিয়েছেন জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক স্থাপন করতে। কিন্তু আত্ম-বিক্রীত যাঁরা, তাঁদের স্‌ষ্টির সঙ্গে জীবনের কোন যোগ থাকে না। সম্ভবও নয়। সাধারণ মান্‌ষের স্নায়বিক চেতনার ওপর আঘাত দেবার তাঁরা চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন কিভাবে তর্‌ণের প্রাণোচ্ছলতাকে বিকৃত মানসিকতার পরিধির মধ্যে চিরস্থায়ী করে রাখা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের, তাঁরা শেষপর্যন্ত সফলকাম হতে পারেন না।

ভারতবর্ষের মত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই জন্ম হয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার। এই জীবন বিকেন্দ্রিক পরি-মন্ডলেই গড়ে ওঠে 'জীবনের জন্য শিল্প' মনোভাব। তার্‌ণ্যের দীপ্ততেজ প্রতিবাদীমন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বেশীর ভাগ লিট্‌ল ম্যাগাজিনেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আবহমান কালের সাহিত্যপ্রীতির প্রবাহে তর্‌ণ মানস দ্‌প্ত হয়ে ওঠে। গ্‌টিকতক ছেলে লেখার তাগিদকে ধরে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আত্মবিক্রীত সাহিত্যিককে যদি তাঁরা অন্‌-করণ করবার চেষ্টা করেন, দ্‌টো কি বড়জোর তিনটে সংখ্যা অনিয়মিতভাবে তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন সাধারণতঃ। তারপর উচ্ছ্বাসের ধারার মধ্যে ভাটা আসে কার্‌র। আবার কেউ হয়ত এরইমধ্যে একে-তাকে ধরে দ্‌ই একটা লেখা বাজারী সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেন। পত্রিকা প্রকাশ করবার ক্ষেত্রেও তাঁদের আর আগ্রহ থাকে না।

কিন্তু লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো—যখন একটা স্‌চিন্তিত মানসিকতা নিয়ে প‌্‌জিবাদী ব্যবস্থায় লড়াই-এর মাধ্যম হিসেবে লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হয়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেই পত্রিকাগ্‌লো বেশ কিছ্‌দিন অনিয়মিতভাবে হলেও প্রকাশিত হয়। প্রথম থেকেই উদ্যোক্তারা জানেন পথটা সহজ নয়। লড়াই-ই একমাত্র পথ। স্বভাবতঃই দমে যাবার কোন ইঙ্গিত তাঁদের মধ্যে নেই। যেহেতু দ্‌ষ্টিভঙ্গী সঠিক এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে তাঁরা আগ্রহী, পত্রিকার জীবনে আরও বেশ কিছ্‌ আদর্শবান ছেলে আসতে থাকেন। কারণ, তাঁদের নেশা আছে, সংগঠিতভাবে জীবনকে পরিচালিত করবার। সামান্য খড়কুটো পেলেই তাঁরা হাত বাড়িয়ে দেন। আস্তে আস্তে পত্রিকার জীবন এগিয়ে চলে। পথে বেশ কিছ্‌ নতুন ম্‌খ যেমন জোটে, আবার কিছ্‌ প্‌রোন ম্‌খও সরে পড়ে। সঠিক আদর্শ থাকে বলে বন্ধ্‌ বা শত্র্‌ চিনতে উদ্যোক্তাদের অস্‌বিধা হয় না। ফলে আগাছার স্‌ষ্টিও কম হয় সেখানে।

আর একটা গোষ্ঠী আছে যেখানে সম্পাদক তাঁর নিজের জীবনের অধ্যায় দিয়ে কিছ্‌ লোককে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেন। পত্রিকায় সম্পাদকের নিজের চার পাঁচটা কবিতা, প্রবন্ধ, তাঁর প্রকাশিত কোন বই-এর সমালোচনা, বিজ্ঞাপন। ম্‌লতঃ কিছ্‌ ছেলেকে পরিস্কারভাবে চিট করে সম্পাদকের আত্ম-প্রচার। এ প্রসঙ্গে দ্‌ঃখের সঙ্গে অনেক পরিচিত প্রগতিশীল কবিদের নামও মনে পড়ে যাচ্ছে। সম্পাদক যিনি থাকেন, তাঁর ম্‌ল লক্ষ্য পত্রিকার মধ্যে কতবার কতকায়দায় তাঁর নামটা ছাপান যেতে পারে। এ ধরণের পত্রিকার আয়্‌ও খ্‌বই সীমিত।

মোটাম্‌টিভাবে লিট্‌ল ম্যাগাজিন জগত সম্পর্কে যাঁরা জ্ঞাত আছেন তাঁরা আমার কথার সঙ্গে আশাকরি একমত হবেন—যে সমস্ত লিট্‌ল ম্যাগাজিন স্‌চিন্তিত দ্‌ষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিকৃত মানসিকতার বির্‌দ্ধে লড়াই ঘোষণা করতে পারে এবং এগিয়ে যেতে পারে স্‌স্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অঙ্গীকার নিয়ে, সে ধরনের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জীবনও অনেক বেশী সাবলীল। অনেক দ্‌প্ত। এবং তারা ক্ষণজীবীও নয়।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক চেতনায় উজ্জ্বল দলিল এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিন। এখনও এমন সম্পাদক-শিল্পী-সাহিত্যিক

রয়েছেন যাঁরা কোনকিছুর বিনিময়েও নিজেকে বিক্রী করবেন না। জীবনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠার সংকল্পে নিজেরা উৎসর্গীকৃত। বস্তুতঃ এ'দের তপস্যার ফসলই জাতির মানস সঞ্চয়ে সংগ্রহ করে রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সম্পাদনা যে শ্রমনিষ্ঠ ভালবাসা এবং সুস্থ মানসিকতা নির্ভর শিল্প, এ'দের লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোই তার সাক্ষ্য বহন করে। কিছু কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ যেমন এই পত্রিকায় থাকে, পাশাপাশি থাকে পরীক্ষামূলক বিভিন্ন রচনা। এই সব পরীক্ষা পাঠকদের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাজারী পত্র পত্রিকাগুলি এগিয়ে আসবে না। কারণ তাদের মূল লক্ষ্য সৃষ্টিশীল চেতনার বিকাশ সাধন নয়, মুনাফার পাহাড় বাড়ানো। সঙ্গতকারণেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মধ্যেই এই পরীক্ষা চলে। সঠিকভাবেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ল্যাবরেটরী। সাহিত্যকে কাটা ছেঁড়া করে পরীক্ষা করবার সুযোগ থাকে লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর পাতায়।

জাতীয় সামগ্রিক প্রয়োজনেই এই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারের চিন্তাভাবনা শুরু করা দরকার। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অকালমৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ বিজ্ঞাপনের অভাব। যদিও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করেছেন, যে কোন registered পত্রিকাকেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এরমধ্যে বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিনে রাজ্যসরকারী বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে। একটা পত্রিকায় রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে বড়জোর একটা কি দুটো মাত্র বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক কাগজের দাম আর প্রিন্টিং-এর অব্যবস্থা এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোকে ক্ষণজীবী হতে বাধ্য করে। আর্থিক সচ্ছলতা এই সব ম্যাগাজিনের থাকে না। স্বভাবতঃই বেশ কিছু টাকা অগ্রিম বাবদ প্রেসে তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রেসের মালিকও এই সব ম্যাগাজিনকে একটু অন্যভাবে দেখে। করুণার দৃষ্টিতে তারা দেখে। কারণ, সাধারণতঃ এই সব ম্যাগাজিনগুলো প্রথমে কিছু টাকা নিজেদের পকেট থেকে প্রেসকে দেন। যদি কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় তার টাকা জোগাড় করে পকেট থেকে আরও কিছু দিয়ে প্রেসের পুরো টাকা শোধ করে দেন। যেহেতু ছোট পত্রিকা, তাতে আবার টাকাটাও সাধারণতঃ কয়েক ক্ষেপে দেওয়া হয় তাই এদের ওপরে প্রেসের মালিকদের থাকে অনুকম্পার মনোভাব। যেন তারা কৃতার্থ করছেন। কিন্তু এই মালিকরাই আবার প্রচুর টাকা খরচ করে একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর কাজ করে দিচ্ছেন। যে টাকা কবে পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই, সেই কোম্পানীর যে ব্যক্তি এইসব দেখাশোনা করেন তাকে এ ছাড়াও আবার সন্তুষ্ট রাখবার জন্য কিছু প্রেসের মালিককে দিতে হয়। সুতরাং প্রিন্টিং-এর এই অব্যবস্থা লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে বেশ ধাক্কা দেয়।

বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গে আসা যাক। শুধুমাত্র রাজ্যসরকারের একটা বা দুটো বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করলে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জীবনের স্রোতধারাকে সাবলীল করা সম্ভব নয়। ধরুন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন একটা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনের জন্য কোন সম্পাদক গেলেন। সেখানে দেখা যায় যতটা গুরুত্ব এঁকে দিচ্ছেন তার থেকেও বেশী গুরুত্ব পাচ্ছেন কোন বাজারী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। তার নিজের সম্পাদিত পত্রিকা বা কোনও বন্ধু সম্পাদকের জন্য হয়ত তিনি গেছেন। তাঁদের আদর্শ সেই তথাকথিত আত্মবিক্রীত শিল্পীসাহিত্যিক। লেখকের একবার প্রয়োজন হয়েছিল কোন এক লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের জন্য ইস্টার্ন রেল পি. আর. ও. অফিসে যাওয়া। প্রথম দিকে বিভাগীয় ব্যক্তি বললেন কোন একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট-এর সার্টিফিকেট লাগবে—আপনাদের পত্রিকা ২২০০-এর মত বেরোয় এই হিসেবে। ক'দিন পরে সার্টিফিকেট নিয়ে দেখা করলাম সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে। বললেন, ডি. এ. ভি. পি.-র কোটা থাকলে পাবেন। হতাশ হয়ে আমাকে ফিরতে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু কোন বিখ্যাত বাজারী সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত আত্মবিক্রীত শিল্পী সাহিত্যিকদের এমন কিছু পত্রিকা রয়েছে যাদের এসবের প্রয়োজন হয় না। কারণ অপসংস্কৃতির বেলেল্লাপনায় সেই সব শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে এইসব সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও গা ভাসাতে হয়।

বর্তমান রাজ্যসরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই সুস্থ জীবনকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সপক্ষে সচেতন হতে দেশের জাগ্রত যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলো এর সপক্ষে সৃষ্টির প্রভাত থেকেই দৃপ্ত পদচারণা শুরু করেছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই না করতে পারলে এই অপসংস্কৃতির বেলেল্লাপনা রোখা যাবে না। তাই প্রয়োজন সংগঠিত প্রয়াস। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। বাংলাসাহিত্যের মধ্য থেকে আবর্জনাকে সরিয়ে দিতে হবে। আবর্জনা সংরক্ষণের দায়িত্ব পুঁজিপতি গোষ্ঠী পরিচালিত পত্রিকার কর্মকর্তাদের। সুস্থ জীবনমুখী চেতনার বিকাশ ঘটাতে গেলে সরকারেরও প্রয়োজন এই সব লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া। তাঁদের কাছে অনুরোধ—বছরে একবার শারদ সংখ্যার বিচার করে শ্রেষ্ঠ লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে পুরস্কৃত করুন। কিছু অনুদানেরও ব্যবস্থা করুন। যাতে এই সব পত্রিকা থেকে ফুল ফুটতে পারে। আনন্দের উদ্যান তৈরী হতে পারে। মানুষের বেঁচে থাকবার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিন। লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন চিরসত্য হয়ে উঠবেই।

আরো আরো দাও প্রাণ

সুমিত নন্দী

বিগত ৯ই মার্চ সমগ্র কলকাতার শরীরে মিশে ছিল এক অভিনব পদযাত্রা। এই কলকাতারই কর্মব্যস্ত মানুষের মনের কোণে বহু গোপনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নের শিকড়টিকে যারা সুখ ও সৌন্দর্যের গান গেয়ে নাড়া দিয়েছিলেন, সেই স্টুডেনথ হেলথ হোমকে অজস্র ধন্যবাদ। অসুখ থেকে সুখের পথে চলার আহ্বানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কলকাতার বিভিন্ন দিক থেকে পায়ে হেঁটে শহীদ মিনারের সামনে জমায়েত হন। আর, এই পদযাত্রায় অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে সমগ্র ছাত্রছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়ান শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, শিল্পী থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের মানুষ। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে তুলে ধরাই ছিল এই পদযাত্রার মূল উদ্দেশ্য। বলতে দ্বিধা নেই, বছরের পর বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্মম উদাসীনতার সন্ধান পেয়ে, আমরা আজ সত্যিই লজ্জিত। সেইজন্যই বিগত দিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলির দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য হই।

সেই প্রাচীনকালে প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে আরম্ভ করে হালের দিনের নয়া দার্শনিকের চিন্তাতেও একই কথা শোনা যায়, "সুন্দর স্বাস্থের বিনিময়ে আমরা পেতে পারি এক আদর্শ নাগরিক।" কথাটা একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আসলে, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে মনও সতেজ হয়, মনের প্রসারতা ঘটে। আর প্রসারিত মনের নাগরিকের কর্মচিন্তা সর্বদাই বাস্তবধর্মী ও মানবিকগুণসম্পন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবং সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ গঠনে এই সমস্ত নাগরিকের এক ঘনিষ্ঠ ভূমিকা থাকে। অথচ আজকের দিনের যে-শিশুরা ভবিষ্যতের নাগরিক এবং ঐ সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ গড়ার মূল উৎস, তাদের অবস্থা আমাদের দেশে বড়ই করুণ—ঠিক যেন ডানা ঝাপটানো পাখির মতো, অসুখের তাপ বুকে নিয়েও স্বপ্নোত্থিত উচ্চাকাশের পাহাড়ে চোখ রেখে বড় হওয়ার অদম্য উৎসাহ। কিন্তু, আজকের শিশুর এই উৎসাহের জোয়ারে পরিণত বয়সে নেমে আসে ভাটার টান।

ঐ ভাটার উৎস সন্ধানের তাগিদেই আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রয়োজন। আসলে শৈশব, বাল্য বা কৈশোরকালে মানুষ তার ক্ষুধার সাথে সঙ্গতি রেখে ঠিক মতো পুষ্টিকর খাদ্য না পেলে অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার হয়। অল্পবয়সে শরীরের সর্বঅংশের স্বাভাবিক বৃদ্ধি তখন অনিয়মিত আকার ধারণ করে। এবং তার ফলস্বরূপ পরিণত বয়সে চরম শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি হয়। যদিও আমরা জানি, আমাদের এই অর্থনীতিক কাঠামোয় বেশীরভাগ অভিভাবকের ক্ষেত্রেই তার সন্তানের প্রতি উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান ক'রে দেওয়া খুবই দুষ্কর। তাদের সংসারের আর্থিক অসংগতির টানাপোড়নে ঐ সমস্ত শিশু বা অল্পবয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে নেমে আসে দুর্বিসহ অন্ধকার। সেইজন্যই বড় হওয়ার উৎসাহে মগ্ন শিশুরা একদিন পরিণত বয়সে ব্যর্থতার ঝাপটানিতে হোঁচট খেতে খেতে বিচ্ছিন্নতার প্রতিভূ হ'য়ে এই বেনো-জলে মিশ্রিত উন্নয়নশীল সভ্যতার মাঝে বিন্দুর মতো কোনক্রমে টিকে থাকে। আমূল অর্থনৈতিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে এই অসংলগ্ন পরিবেশকে কখনই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু, ঐ আমূল অর্থনৈতিক পরি-বর্তনের আশায় এইসমস্ত ছেলেমেয়েদের ফেলে রাখা বড়ই অমানবিক। তাই অতি স্বল্প সামর্থকে পুঁজি করেই তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য স্টুডেনথ হেলথ হোমের এই নব প্রচেষ্টা।

খাদ্যের সমস্যা কিছুটা সমাধানের জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্কুলগুলিতেই বিশেষ টিফিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিছু বিদেশী সংস্থা বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক বছর ধ'রে এ-ব্যাপারে সহযোগী হ'লেও, তা মূলতঃ খুব সামান্য কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, তাদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক পরিবেশের মান অনুযায়ী স্কুল-গুলি নির্বাচনের প্রশ্নটিও সঠিক হ'য়ে ওঠে না। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রসঙ্গটির উপর বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আপাততঃ সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলিতে সরকার থেকে পুষ্টিকর টিফিন বিতরণের ব্যবস্থাটি সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। যদিও ব্যাপকহারে সব স্কুলে এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। আমরা জানি, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার-গুলিকে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার আড়ালে কিভাবে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। তার উপর যদি আবার ঐ কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার রাজনৈতিক প্রশ্নে ভিন্নধর্মী হয়, তা হলে তো কথাই নেই। সুতরাং, এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সবরকম উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সরকার ইচ্ছা করলেই হাত দিতে পারেন না। বহু কষ্ট ও সততার বিনিময়ে এবং মাথা খাটিয়ে এইসমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পিছনে অর্থের সংস্থান করতে হয়। সেইজন্যই তা সময়-সাপেক্ষ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হওয়া (একাশি সাল থেকে কার্যকর হবে), বেকার

ভাতা, বৈধব্যভাতা, বৃদ্ধ কৃষকদের পেনসন প্রবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে উন্নত মননশীল চিন্তার পরিচয় রেখেছেন, তা একদিনের ঘটনা নয়, ধীরে ধীরে জনচেতনার তাগিদেই এগুলি ফলপ্রসূ হয়েছে। সুতরাং আশা করা যায় আগামী দিনে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত স্কুলেই বিনাখরচায় ছাত্রছাত্রীদের একবেলা পেটভরার মতো টিফিন ব্যবস্থাকে চালু ক'রে সরকার সাধারণ মানুষের গোপন ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে, প্রয়োজন হলে কোনো নিস্বার্থ-বাদী ও উৎসাহী বেসরকারী বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগী হ'য়ে সরকার এই পরিকল্পনায় হাত দিতে পারেন।

শুধু প্রয়োজনীয় খাদ্য নয়, বাসস্থান এবং স্কুলের অবস্থান প্রভৃতি অনেক কারণেও ছাত্রছাত্রীরা রোগে আক্রান্ত হয়। কল-কাতা শহরে বিশেষত, বস্তি অঞ্চলে এমন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে একেবারেই আলোবাতাস ঢোকে না, তাছাড়া স্কুলবাড়ীর অবস্থিতিও খুব খারাপ। পাশেই হয়তো কোনো খাটাল বা পচা নর্দমার বিষাক্ত প্রভাবে ছাত্রছাত্রীরা হামেশাই আক্রান্ত হ'য়ে থাকে। এক্ষেত্রে, সেইমুহূর্তে সমগ্র বস্তি উন্নয়ন সম্ভব না হ'লেও, ঐ স্কুলবাড়ীটিকে অন্তত একটি স্বাভাবিক আলো-বাতাসপূর্ণ পরিবেশে স্থানান্তরিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

সেদিনের এই পদযাত্রাকে কেন্দ্র করেই ছাত্রছাত্রীদের এই সমস্যাগুলি সমস্ত মানুষের দৃষ্টিতে আরও বেশী করে প্রতি-ভাত হয়। এবং সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা উদ্ঘাটনের জন্য আমরা তাই আজ নতুন করে কিছু ভাবারও অবকাশ পাই। যদিও এই পদযাত্রায় ছাত্রছাত্রীদের রোগ বিনাশের জন্য প্রতি-রোধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে জোরদার করার দাবিটিই ছিল প্রধান। কোনো চরম রোগ শরীরে বাসা বাঁধার পূর্বেই যাতে তাকে ধ্বংস করা যায় এবং তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেই সমস্ত চিন্তার ফসলগুলি বিভিন্ন পোস্টার বা প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে স্টুডেনথ হেলথ হোম বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেন। বাস্তবে দেখা যায়, বেশীর ভাগ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথমজীবনের অবহেলিত অতি সামান্য রোগ পরবর্তীকালে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাছাড়া ঐ সামান্য রোগের ছোঁয়া সমগ্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করে। তাই রোগের শুরুতেই কোনো প্রতিষেধক টিকা বা ইন-জেকসন্, অথবা প্রতিরোধক ওষুধপত্র ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। স্টুডেনথ হেলথ হোমের সাথে প্রতিটা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সেইজন্যই এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা বিশেষ জরুরী। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক হেলথ হোম গঠন ক'রে তার মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে মাসে দু'বার, অন্তত শরীর চেকআপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতি মাসে ডাক্তারসহ কোনো ভ্রাম্যমান গাড়ি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থিত হলে, আরো ভালো হয়। এবং ঐ প্রতিষেধক ও প্রতি-রোধক ওষুধগুলো বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও স্টুডেনথ হেলথ হোমকে নিতে হবে। এ-ব্যাপারে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলির এবং অন্যান্য কলেজ বা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে স্টুডেনথ হেলথ হোমের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এগিয়ে এলে এই ব্যাপক সমস্যাকে সমাধান করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

এ-তো গেল শহর অঞ্চলের কথা। গ্রাম অঞ্চলের ছাত্রছাত্রী-দের মধ্যেও ঐ একই সমস্যা ছড়িয়ে আছে। বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রে দুবেলা পেটভরানোর তাগিদে সারাদিনের পরিশ্রমের পর, অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের শরীর বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু ভেবে দেখাকে অহেতুক বিলাসিতা বলেই মনে ক'রে থাকেন। তার উপর আছে অজ্ঞতা বা শিক্ষার অভাব। গ্রামাঞ্চল বা কলকাতার বাইরে নিম্ন আয়ের শ্রমিক-অধ্যুষিত কলোনি-গুলির ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক প্রশ্নটি তাই আরো জটিল। সুতরাং, বর্তমানে শুধু শহরমুখী চিন্তার আবরণে আটকে না থেকে স্টুডেনথ হেলথ হোমের বিভিন্ন শাখাকে ঐ-সমস্ত গ্রাম ও কলোনি অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে, সরকারের কাছে ব'জেট থেকে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উন্নয়নখাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি রাখা যেতে পারে। তাতেও পুরোপুরি আর্থিক ঘাটতি না মিটলে, স্টুডেনথ হেলথ হোম বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘরের দরজায় দরজায় গিয়ে সাহায্যের আবেদন রাখতে পারেন।

বিগত কয়েক বছরে দেখা গেছে যে, ছাত্রছাত্রীদের প্রায় বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র সরবরাহের জন্য স্টুডেনথ হেলথ হোম নামক সংগঠনটির অস্তিত্ব কলকাতার প্রায় বেশীরভাগ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই জানত না। শুধুমাত্র কয়েকটি নামজাদা স্কুল-কলেজের অহেতুক পৃষ্ঠপোষকতা ও উপযুক্ত প্রচারের অভাবেই অন্যান্য স্কুলগুলি এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেনি। সুতরাং, বর্তমানে গ্রাম-শহর-বস্তি-উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত অথবা, কোনো মানের প্রশ্ন ব্যতিরেকেই সমতার ভিত্তিতে সমস্ত স্কুল, স্টুডেনথ হেলথ হোমের এই সুযোগটুকুকে কাজে লাগাতে পারবে। কারণ, স্টুডেনথ হেলথ হোমের বক্তব্য এখন খুবই পরিষ্কারঃ ছাত্রছাত্রীদের নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন করা এবং খুব স্বল্প সুযোগকেও পরি-পূর্ণভাবে কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষেরই এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। পূর্ণবয়স্ক যে-কোনো নাগরিকই আজকের বা আগামীদিনের এইসমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভি-ভাবকের স্থান নিয়ে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা উন্মো-চনের খুব সামান্য এই রাস্তাটুকুকেও দেখিয়ে দিতে পারেন। সেদিন শহীদ মিনারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটাই পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের শরীর সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে শুধু সরকার বা কোনো সংগঠনের একার পক্ষে পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব নয়; সমগ্র মানুষের মিলিত প্রয়াসেই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অসুখ থেকে সুখের পথে নিয়ে যাওয়া সফল হতে পারে।

পরিশেষে, স্টুডেনথ হেলথ হোম তাদের নৈরাশ্যজনক ঝিমিয়ে যাওয়া ভাবটিকে কাটিয়ে উঠে আজ যে ভাবে নব-প্রচেষ্টায় ও নিবিড় উদ্যোগে রাস্তায় নেমে এসেছেন, তাকে আবার সাধুবাদ জানাই। আশাকরি, তারা বর্তমানের এই স্বল্প বাতাবরণকে মূলধন করেই ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলার সমগ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে, সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সচেষ্ট হবেন। কলকাতার কর্মব্যস্ত মানুষের মনের কোণে বহু গোপনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নের শিকড়টিকে সুখ ও সৌন্দর্যের গান গেয়ে তারা যে-ভাবে প্রভাবিত করছেন, তাকে কখনই নষ্ট হ'তে দেবেন না—বরঞ্চ, ঐ শিকড়টিকে স্বপ্নের আরো গভীরে পৌঁছে দিতে পারবেন।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

শক্তির উৎস

গোটা বিশ্বজুড়ে এখন শক্তি সংকট চলছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক প্রয়াস চলেছে শক্তির উৎস সন্ধানে। জিজ্ঞাসু পাঠক মনের কাছে এই কর্মকাণ্ডের কিছু তথ্যভিত্তিক আলোচনার তাগিদেই আমাদের বর্তমান ভাবনা। লেখাটি কয়েকটি কিস্তিতে বেরোবে। এই সংখ্যার বিষয় সৌরশক্তি।

—সম্পাদকমণ্ডলী

সৌরশক্তি/সূর্য্য—প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল সূর্য্য। সূর্য্য থেকে বেরিয়ে আশা তাপশক্তি ও আলোকশক্তিকে মানুষ যেমন ভয়ও পেয়েছে তেমনি শ্রদ্ধাও জানিয়েছে। আবার সূর্য্য-নির্গত তাপশক্তি ও আলোকশক্তি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সৌর-শক্তিকে নিজের প্রয়োজনে মানুষ সভ্যতার সেই আদিযুগ থেকেই ব্যবহার করে আসছে।

ফসল শুকানোর কাজে সৌরশক্তির ব্যবহার সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল যেদিন থেকে মানুষ ফসল উৎপাদন করতে শিখেছে। আজও এই কাজে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যভাবে সৌরশক্তির ব্যবহারের কথা বলতে প্রথমেই মনে আশে আর্কিমিডিসের কথা। খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দেই যিনি সূর্য্যালোক ব্যবহার করে আগুন জ্বালতে পেরেছিলেন। তারপর সৌরশক্তিকে সমাজ-সভ্যতার কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত আছে। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে আসে ফ্রান্সের মিঃ মৌচট্ (Mouchot)-এর কথা। যিনি সেই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সৌরশক্তি ব্যবহার করে একটি পাম্প চালান। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ফ্রাঙ্ক শ্যুমান (Frank Schuman) এক সাংঘাতিক কাজ করলেন। মিশরে তিনি এক চোঙাকৃতি প্রতিফলক (Cylindrical Reflector) বসালেন যার আয়তন ছিল ২৩০০০ বর্গফুট। এই বিশাল প্রতি-ফলকের উপর সূর্য্যালোক ফেলে তা দিয়ে জল গরম করে বাষ্প উৎপন্ন করে, সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালিয়ে তিনি ৫৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন এক পাম্প চালালেন। তার চেয়েও উন্নতভাবে সৌরশক্তির ব্যবহার করলেন ইতালীর জেনোয়ার অধিবাসী জি. ফ্র্যান্সিস্। সেটা ছিল ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ। ফ্র্যান্সিসের ব্যবস্থায় ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি যে পরি-মাণ তাপশক্তি উৎপাদন করতে পারে সেই পরিমাণ তাপ উৎপাদিত হয়েছিল।

সৌরশক্তি থেকে তাপ অথবা আলোক সরাসরি পাওয়া যায়। কিন্তু মানবসভ্যতার দ্রুত অগ্রগতিতে সর্বাধিক সাহায্য-কারী বিদ্যুৎশক্তি কিন্তু সরাসরি সূর্য্য থেকে পাওয়া যায় না। তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি অথবা জলপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য যেমন বিশেষ ধরণের কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয় সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য তেমনি কিছু বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয় ও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য সরাসরি সৌরশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার বন্ধ করা যায়। যেমন জলগরম করার ক্ষেত্রে। বৈদ্যুতিক হীটার-এর পরিবর্তে সৌরশক্তির ব্যবহারে জল গরম করা সম্ভব। শীত প্রধান দেশে বাড়ীঘর গরম রাখার জন্য সৌরশক্তির ব্যবহার চালু করা সম্ভব। কৃষিজ ও পশুজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারে সৌরশক্তি অনায়াসেই ব্যবহার করা যায় ও হচ্ছে। লবন উৎপাদনে সৌর-শক্তির ব্যবহার বহুকাল থেকেই চালু আছে। সৌরশক্তির ব্যবহারে মূল সমস্যাটা হল সূর্য্যালোক ও তাপকে একজায়গায় সংগৃহীত করা। ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ সৌরশক্তি প্রতিদিন এসে পৌঁছায় তা দিয়ে সতের হাজার কোটি মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত এই বিপুল পরিমাণ সৌরশক্তির সবটুকু সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। তবে তাকে বেশকিছুটা অন্ততঃ মানবসভ্যতার কাজে লাগানো যায়।

প্রতিফলক পদ্ধতি ও ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতিতে সৌর-শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়। প্রতিফলক পদ্ধতিতে প্রথমতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থিত প্রতিফলক-এর (আয়না অথবা পালিশ করা কোন ধাতব পাত) উপর সূর্য্যরশ্মি ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিফলকের উপর সূর্য্যকিরণ পড়লে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির তাপ অনেকগুণ বেড়ে যায়। এবার সেই তাপ কাজে লাগিয়ে জল গরম করা হয়। জল ফুটিয়ে বাষ্প করতে পারলে সেই বাষ্পকে অতিরিক্ত চাপে টারবাইন-এর উপর ফেলতে পারলে টারবাইন ঘোরান সম্ভব আর টারবাইন ঘুরলে তার সাথে জেনারেটর সমন্বিত থাকলে তাও ঘুরবে। আর জেনারেটর ঘুরলেই পাওয়া যাবে বহু কাঙ্ক্ষিত বিদ্যুৎশক্তি। এই হল সংক্ষেপে প্রতিফলক পদ্ধতিতে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কার্য-পদ্ধতি। সৌরশক্তির প্রতিফলকগুলির বৈজ্ঞানিক নাম তাপ সংগ্রাহক বা থার্মাল কালেক্টর। সূর্য্যরশ্মি প্রথমতঃ পড়ছে প্রতিফলকের উপর। প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির তাপকে কাজে লাগিয়ে পাশের ট্যাঙ্কের জল গরম করে বাষ্পে পরিণত করা হচ্ছে। সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালানো হবে। তারপর বাকী থাকে শুধুমাত্র জেনারেটর সংযুক্তিকরণের কাজ। এবার আসা যাক ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতিতে। ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতি হল সংক্ষেপে এইরকম,—দুটো বিসদৃশ পদার্থ, পাশা-পাশি রাখলে তাদের মিলনমুলে যদি অতি-বেগুনী রশ্মি পড়ে তাহলে তড়িৎ-চালক বল সৃষ্টি হয়। সূর্য্য রশ্মিতে অতি-বেগুনী রশ্মি আছে। এখন এমন একটি ব্যবস্থা করা হল যার

মধ্যে দুটো বিসদৃশ পদার্থ পাশাপাশি সংযুক্ত আছে এবং যার মিলনস্থলে সূর্যরশ্মি পড়তে পারে। তাহলে আমরা তার থেকে সরাসরি তড়িৎ-চালক বল পাব। আর তড়িৎ-চালক বল হল বিদ্যুৎশক্তির আঠাল। সুতরাং এই ব্যবস্থায় সরাসরি বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়। আর এই ব্যবস্থাটির নাম হল ফোটো-ভোল্টাইক সেল। এর সুবিধা হল যে এর সমস্ত অংশগুলি স্থায়ী (কোনপ্রকার নড়াচড়া করে না), আলাদা কোন শক্তি ব্যবহার করে একে উজ্জীবিত করতে হয় না। সর্বোপরি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভীষণ কম। ফোটোভোল্টাইক সেলের সাধারণ নাম হল 'সোলার সেল'। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সোলার সেল প্রথম চালু হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। সোলার সেলের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে সামুদ্রিক বয়া, লাইট হাউস, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মাইক্রোওয়েভ রিলে স্টেশন, বন প্রভৃতি কার্যে সোলার সেল ব্যবহৃত হচ্ছে।

সৌরশক্তির ব্যবহার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুরু হয়ে গেছে। জাপানে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে সৌরশক্তি পরিচালিত একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নিয়ে এখন গবেষণ চলছে। আশা করা যায় ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এটি চালু হবে। ফ্রান্সের ওডেলিওতে একটি সৌরশক্তি পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইতালীতে ৪০০ কিলো-ওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন একটি সৌরশক্তি পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরেকটি ১ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আমেরিকার নিও মেক্সিকোয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণা সবদেশেই চলছে।

ভারতবর্ষেও সৌরশক্তির ব্যবহার নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। তবে ভারতবর্ষের কোথাও এখনও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সৌরশক্তির ব্যবহার হয়নি।

পরিশেষে একথা নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে সৌরশক্তি আগামী দিনে ব্যাপকভাবে মানবসমাজের অনুকূলে কাজ করবে।

(ক্রমশঃ)

বহরমপুর ব্লক যুব উৎসবে কথক নৃত্যরত শিশুশিল্পী।

ব্লক যুব উৎসবে বালিকাদের কবাডি প্রতিযোগিতা

দিলীপ ভট্টাচার্যের তুলিতে—

এসো মন্ত্র কর..

দু'টি মেলা তিনটি উৎসব

কলকাতা বইমেলা

কলকাতা ময়দানে গত ১৪ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের উদ্যোগে পঞ্চম বইমেলা অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল। ১৯৭৬ সালে প্রথম যখন এই বইমেলার উদ্যোগ পর্ব শুরু হয়, তখন থেকেই কলকাতার গ্রন্থ-প্রেমিক মানুষ এই মেলার প্রতি একটা অমোঘ আকর্ষণ অনুভব ক'রেছিলেন। বই না কেনা গেলেও, শুধুমাত্র যদিচ্ছ বই নাড়াচাড়ায়ও যে কিছুটা গ্রন্থ-পিপাসা মেটে সেই প্রথম টের পাওয়া যায়। এবং প্রধানত সেই সূত্রেই কলকাতা বইমেলা প্রথম আবির্ভাবেই বই-প্রেমিকদের হৃদয় জিতে নেয়। বইমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর উদ্যোক্তারা বলেছেন, আমাদের আরো আগ্রহ জাগানো এবং নিয়মিত বই কেনার অভ্যেস তৈরী করা। বস্তুত, আমাদের যখন সততই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তখন বই বিষয়ে তত সচেতন থাকা নিয়ত সম্ভব হয় না। আন্তরিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তেল-নুনের হিসেব ক'রে ফের বই কেনাটা সত্যিই একধরণের বিলাসিতা হ'য়ে পড়ে। তাই গ্রন্থ-বিপননে সেইসব মানুষের কাছে এই বইমেলা আক্ষরিক অর্থেই একটি উপহারের মত। সে কারণে এ-বছর বই মেলার অনিশ্চয়তার সংবাদে বই প্রেমিকেরা স্বভাবতই ঈষৎ বিষণ্ণ ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা যে ওই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হইনি, সেজন্য রাজ্যসরকার এবং মেলার উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন।

এ-বছরের মেলায় কলকাতার বিভিন্ন নামী দামী প্রকাশক ছাড়াও অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানও তাঁদের পসরা সাজিয়ে ব'সেছিলেন। ক'দিনের জন্য সারা কলেজস্ট্রীট পাড়াটাই যেন উঠে এসেছিল এই ময়দানে। শুধু আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানই নয়, কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও এই মেলার মর্যাদাবৃদ্ধিতে সাহায্য ক'রেছিল। বিভিন্ন প্রকাশকের বিভিন্ন ধরনের বইয়ের বিস্তৃত তালিকা থেকে প্রত্যেকেই নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী বই সংগ্রহ ক'রতে পেরেছেন। এছাড়া মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল এইসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেকগুলি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের নিজস্ব স্টল। একমাত্র এ'রাই দোকানদারীর শ্বাসরুদ্ধতার মধ্যে অনেকটা খোলাবাতাস খেলাতে পেরেছিলেন। এ-বছর মেলায় মিনি বই প্রকাশনার একটি অদ্ভুত প্রবণতা দেখা গেছে। মিনি মহাভারত থেকে মধুসূদন, সুকুমার রায় গরম কেকের মত বিকিয়েছে। আশ্চর্য এরই পাশাপাশি সাঁইবাবা প্রকাশনের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্টলেও মন্দ ভিড় ছিল না।

প্রতিবছরের মত এবারের বইমেলার বিক্রী বেড়েছে, লোক সমাগম বেড়েছে। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে, অংকের হিসেবে এই মেলার সাফল্য বিশেষ নয়ন-সুখকর হ'লেও, বইমেলার সাফল্য মেলার মাপকাঠি হিসেবে বেশ ভঙ্গুর। কেননা, এতে কিছু মুষ্টিমেয় বই-ব্যবসায়ীর আখেরে কিছু লাভ হ'য়ে থাকলেও, ৫/৬ লক্ষ বই-পোকা মানুষের কাছে এটা তেমন কোন আহামরি সার্থকতা আনে না। এই মেলার যতটুকু সাফল্য তা আসলে নির্ভরশীল মেলায় উপস্থিত অসংখ্য বই পাগলদের সক্রিয় অংশগ্রহণে। ব্যবসায়ীদের শুধু দোকান সাজিয়ে বসা ছাড়া আর তেমন কোন উজ্জ্বল উদ্যোগ নেই, যা গ্রন্থ পিপাসুদের অনিবার্যভাবে মেলাপ্রাঙ্গণে টেনে আনতে পারে। আসলে এ'রা মেলায় এসেছেন বইয়ের প্রতি অপার ভালোবাসায় এবং কৌতূহলের টানে। নইলে স্বল্প-পরিসর মণ্ডপগুলিতে না আছে কোন শৈল্পিক পারিপাট্য, না আছে পুস্তক তালিকা সরবরাহ বা প্রচারে তেমন কোন চোখে পড়ার মত দৃষ্টান্ত, না আছে বই সাজানোর কোন সুশৃঙ্খল সুষমা, না আছে তেমন কোন দুর্লভ গ্রন্থের সমারোহ এবং সর্বোপরি নেই সুলভ মূল্যে বই সরবরাহের কোন আবশ্যিক উদ্যোগ।

এই বইমেলায় ক্রেতাদের কাছে যেটা সবচেয়ে ক্ষোভের ব্যাপার তাহ'ল, এখানকার ডিস্‌কাউন্টের কৃপণতা। কলেজ-স্ট্রীট পাড়ায় পাবলিসারের ঘর থেকে বই নিলে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে হেসে-খেলে ১৫ থেকে ২০ পার্সেন্ট এবং ইংরেজী বইয়ে ১২/১৩ পার্সেন্ট ছাড় পাওয়া যায়ই। তাহ'লে কি মানে হয় বহুদূর থেকে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে এখানে এসে ধুলো-খেয়ে, ভিড় ঠেলে এখান থেকে বই কেনার! অবশ্য বইমেলায় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রতিদিন ছিল তাহ'ল বই বাজার। ছাই ঘেঁটে সেখানে হঠাৎই পেয়ে যাওয়া যেত অনেক দুর্লভ বই। কিন্তু কোন দুরূহ কারণে এবার ক্রেতারা বই বাজারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'লেন, বোঝা গেল না।

বস্তুত, এই মেলার ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন মনে হয়, এই মেলা থেকে পুস্তক ব্যবসায়ীদের ফায়দালোটা এবং কিছু শহুরে বাবুর ইন্টেলেকচুয়াল সাজার অর্থহীন প্রয়াসকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া এই মেলার বোধহয় আর খুব-বেশি গুরুত্ব নেই।

শিল্পমেলা

শিল্পকলাকে জনমুখী করার জন্য, শিল্পী ও জনগণের মধ্যে মেলা বসানোর ঐকান্তিক বাসনায়, শিল্পকলা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার প্রয়াসে এবছরও ১৭ই মার্চ থেকে ২৩শে

মার্চ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর উদ্যোগে কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্পমেলার আয়োজন হ'য়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রামকিংকর, গোপাল ঘোষ প্রমুখ খ্যাতিমান শিল্পীদের শিল্পসম্ভারের পাশাপাশি অনেক তরুণ শক্তিমান শিল্পীর চিত্রও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। এ ছাড়া ছিল কিছু প্রখ্যাত বিদেশী শিল্পীর ছবির প্রিন্ট। প্রদর্শনীর পাশাপাশি মুক্তমঞ্চে প্রতিদিন শিল্প সমালোচকদের বিদগ্ধ আলোচনা, সংগীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। এই শিল্পমেলা জনসাধারণের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। মেলার শেষদিনে প্রখ্যাত শিল্পী এবং ভাস্কর রামকিংকর বেইজকে সম্বর্ধিত করার কথা থাকলেও শিল্পীর অসুস্থতার কারণে তা শেষপর্যন্ত আর সম্ভব হয় নি। শিল্প যে সো-কেসে সাজিয়ে রাখার সামগ্রী নয়, তা যে জনসাধারণের জীবনযাপনের এক অপরিহার্য অঙ্গ, তা এই প্রদর্শনী আরেকবার প্রমাণ করলো।

চলচ্চিত্র উৎসব '৮০

বাংলা ছবির ৬০ বছর পূর্তি এবং 'পথের পাঁচালী'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার ৮টি প্রেক্ষাগৃহে ৭ দিন ব্যাপী এক চলচ্চিত্র উৎসব হ'য়ে গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তোলা ৬০টি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হ'য়েছে। একসাথে এতগুলো সৎ ছবি দেখার সুযোগ ক'রে দিয়ে রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন। কেননা, এই প্রথম একটি রাজ্য সরকার এরকম একটি প্রায়-সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করলেন, যা অবশ্যই একটি শুভ সংকেত রূপে বিবেচিত হ'তে পারে। বিকিনি-শাসিত হিন্দী ফিল্ম এবং ফরমুলা বন্দী বাংলা ছবির পাশাপাশি এই চলচ্চিত্র উৎসব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রূপে আমাদের স্মৃতিতে রয়ে যাবে বহুকাল।

বাংলা ছবির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৩২ সালে তোলা জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে শুরু করে ১৯৮০-এর বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' পর্যন্ত প্রায় ৪০টি নির্বাচিত বাংলা ছবি ছিল এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। বাংলাছবির শৈশব অবস্থা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যা একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির ছবি স্পর্শ করে। ছবিগুলির নির্বাচনেও ছিল একরূপ দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা—শুধু শৈল্পিক উৎকর্ষতার ভিত্তিতে এগুলি নির্বাচিত হয়নি, বরং একটি ব্যাপক সাধারণ মানের ছবি প্রদর্শিত হ'য়েছে, যা থেকে বাংলাছবির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমরা খুব সহজেই পেয়ে যায়। ৩০, ৪০ দশকের ছবিগুলি প্রকৃতপক্ষেই আমাদের প্রজন্মের কাছে একটি উজ্জ্বল উদ্ধার। তবে এই ব্যাপারে একটু অভিযোগ থেকেই যায়—বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনেকগুলি চিত্ররূপ উৎসবে প্রদর্শিত হ'লেও শরৎচন্দ্রের কোন ছবি উৎসবে দেখা গেল না। অথচ একসময়, এবং হয়তো আজো, শরৎচন্দ্রের গল্পের জোরেই অনেক ছবি বিস্ফোরক বক্স-অফিস পেয়েছে। ইতিহাসের খাতিরে শরৎচন্দ্রকে উপেক্ষা করার কোন যুক্তি নেই।

'পথের পাঁচালী'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সত্যজিৎ রায়ের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ ছবি উৎসবে দেখানো হয়েছিল। 'পথের পাঁচালী' যতবার দেখা যায় ততো যেন আয়ু বাড়ে, পুণ্যি হয়। সত্যজিতের সামগ্রিক চিত্রকর্ম থেকে গুটিকয়েক ছবি নির্বাচন করা খুব দুরূহ ব্যাপার হ'লেও তাঁর 'দেবী', 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ', 'জলসাঘর', 'মহানগর' উৎসবে থাকা আবশ্যক ছিল। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বা 'প্রতিদ্বন্দ্বী'কে উৎসব থেকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যেত। কেননা, এগুলি সাম্প্রতিককালে বহুবার প্রদর্শিত হ'য়েছে। তুলনায় এই প্রজন্মের দর্শকেরা তাঁর প্রথম দিকের ছবি দেখার সুযোগ খুব কমই পেয়েছেন।

ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক', 'সুবর্ণরেখা', 'কোমল গান্ধার' ইত্যাদি ছবিগুলো এই উৎসবের মর্যাদা বৃদ্ধিতে দারুণ সহায়ক হ'য়েছিল। তাছাড়া পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র' বারীণ সাহার 'তের নদীর পারে', নারায়ণ চক্রবর্তীর 'দিবা-রাত্রির কাব্য', সৈকত ভট্টাচার্যের 'একদিন সূর্য', শংকর ভট্টাচার্যের 'দৌড়', মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন', এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' ছিল উৎসবের সম্পদ বিশেষ। উৎপল দত্তের 'ঝড়' একটি সেলুলয়েডের যাত্রা হিসেবে দেখতে মন্দ লাগে না। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' সম্পর্কে দর্শকদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। দারিদ্র্যের এই রকম ডকুমেন্টারী আমরা কলকাতা '৭১-এও দেখেছি। অবশ্য এই ছবির অভিনায়িক দৃঢ়তা একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কেননা, এই ছবির কোন শিল্পীই অভিনয় করেন না। শংকর ভট্টাচার্যের 'দৌড়' রাজনৈতিক ভ্রষ্টতার একটি সাহসিক দলিল হিসেবে স্মরণীয়।

বাংলাছবি ছাড়া ২০টি মারাঠি, মালয়ালম, কানাড়ী, তামিল, উর্দু, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া ছবিগুলিও দর্শক আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। দক্ষিণ ভারতীয় ছবিগুলি আমাদের সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল কেন্দ্রিক অহংকারের ওপর একটি সজোরে চপেটাঘাত করে যায়। ভাষার ব্যবধান ছাড়িয়ে (সব ছবিতে সাব-টাইটেল ছিলনা) ছবিগুলি অনায়াসে আমাদের অধিকার ক'রে নেয়। বিশেষত, 'ওকা উরি কথা', 'কোপিয়েওম', 'অশ্বত্থমা', 'আমপু', 'চিতেগু চিন্তি', 'গহণ', 'সর্ব-প্রাথা মা ভূমি', 'ঘাসিরাম কোতোয়াল', ইত্যাদি ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক-একটি অক্ষর মাইলস্টোন হ'য়ে থেকে যাবে। এরমধ্যে 'ঘটশ্রাদ্ধ' ছবিটিকে উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে চিহ্নিত করা যায়। গ্রামীণ জাতপাতের সমস্যা ছবিটির আলোচ্য বিষয়। ছবির মূল দু'টি চরিত্র যমুনা এবং মানীর ভূমিকানেতৃদ্বয় অভিনয় নৈপুণ্যে বুকের মধ্যে তীব্র মোচড় দিয়ে যায়। এই যমুনা নামে যুবতীটি এবং মানী নামে চালকটিকে দেখে, কার্যকারণ হীন ভাবে হ'লেও 'পথের পাঁচালী'র অপু, দুর্গাকে মনে পড়ে যায়।

ওড়িয়া ছবি 'বাতিঘর' (কাহিনী বুদ্ধদেব গুহ) স্বচ্ছ কাহিনী চিত্র হিসেবে দাগ কাটে।

হিন্দীছবির জগতেও যে একটা নতুন বাতাস এসেছে তা স্পষ্ট হয় সৈয়দ মির্জার দু'টি ছবি 'অরবিন্দ দেশাই কি জীবন দর্শন' এবং 'আলবার্ট পিন্টো ক গোস্যা কিউ আয়া' বিমল দত্তের 'কস্তুরী', শ্যাম বেনেগালের 'কলযুগ', বিপ্লব রায়চৌধুরীর 'শোধ' ইত্যাদি ছবিগুলি দেখে। 'অ্যালবার্ট

পিন্টো'র শেষদৃশ্যে পর্দায় মশালের, রক্ত পতাকার লাল আগুন লাগা একটি স্মরণীয় শিল্প সৃষ্টি। 'শোধ' ছবিটি এবছরের শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের জন্য পুরস্কৃত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। ছবিটির ফটোগ্রাফিক অসাধারণতা এবং বক্তব্যের দৃঢ়তা আমাদের খুব অনিবার্যভাবে ছুঁয়ে যায়। বেনেগালের 'কন্দুরা' আমাদের শোচনীয়ভাবে হতাশ করে। একটি প্রায় মিথোলজিকাল আখ্যান অবলম্বনে সত্তর দশকে ছবিটি তোলার অর্থ ঠিকঠিক অনুভব করা গেল না।

উৎসবে কাহিনী চিত্রগুলি ছাড়াও রবিশংকর, ইনার আই, এ হিস্ট্রি অফ ফিল্ম মেকিং, এবং পাকা ফসলের কড়চা ইত্যাদি তথ্যচিত্রগুলিও যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। বিশেষত শেষ ছবিটা একটি হাতিয়ার বিশেষ। জোতদার-জমিদারের শঠতা এবং ভূমিহীন কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এই ছবির প্রতিপাদ্য ব্যাপার। এর কয়েকটি দৃশ্যে যথাক্রমে জোতদারের ধান লুঠ করা এবং পাকা ধানের ক্ষেতে আগুন লাগানো এক নয়া দাঁড়ি পাল্লার মধ্যে অসহায়, পঙ্গু যুবক ডোমনের ক্লান্ত, উদ্দীপ্ত চোখ স্মরণীয় শিল্পকাজ। ছবিটি এই মুহূর্তে কলকাতার ঠান্ডা প্রেক্ষাগৃহ থেকে মুক্ত করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া একটি আবশ্যিক কর্তব্য।

এই চলচ্চিত্র উৎসব চিত্র নির্বাচনে একটি বিশেষ চরিত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ধনতান্ত্রিক পণ্যচিত্র এবং পর্ণোচিত্র ছাড়াও যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে সৎ চলচ্চিত্র তৈরী সম্ভব এবং তা যে যথেষ্ট দর্শক আনুকূল্যও পেতে পারে এই উৎসব তা আরেকবার প্রমাণ করে দেয়। বাঙ্গালোর চলচ্চিত্র উৎসবে যেখানে দর্শক যৌনাত্মক চিত্র প্রদর্শনের দাবিতে প্রেক্ষাগৃহে ভাঙচুর করে, সেখানে কলকাতা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের একটি ঐতিহাসিক দলিল হ'য়ে রইল। এই উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু যে আর্ট ফিল্ম-থিয়েটারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন, আমরা আশা করি, তা শুধুমাত্র একটি মিনার হ'য়েই থাকবে না, সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে তা হবে একটি বিস্ফোরক প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

গণনাট্য উৎসব

বাংলা শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণনাট্য সংঘের একটি বিশেষ অবদানের কথা সর্বজনজ্ঞাত। চল্লিশের দশকের সেই ব্যাপক সংস্কৃতি আন্দোলনকে ইতিহাসের পাতা থেকে গত ১৯ এবং ২০শে এপ্রিল দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। গণনাট্য উৎসব প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে স্টুডেন্ট হেলথ্ হোমের সাহায্যার্থে উৎসবটি সংগঠিত হয়।

কবি ইকবাল রচিত 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' গানটি গেয়ে উৎসবের উদ্বোধন হয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উদ্বোধনী ভাষণে সামাজিক অগ্রগতিতে শিল্প-সংস্কৃতির বলিষ্ঠ ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর শম্ভু ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় 'কল অফ দ্য ড্রামস' প্রতীক নৃত্যানুষ্ঠান শ্রোতাদের আনন্দিত করে।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল সেকাল এবং একালের গণ-সংগীত। তবে শ্রোতারা সমকাল অপেক্ষা ৩০/৪০ দশকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। সলিল চৌধুরীর গান এখনো শ্রোতাদের সঞ্চারিত করে, এর প্রমাণ আরেকবার পাওয়া গেল। এবং একক সংগীতে সুচিত্রা মিত্রের তুলনা তিনি নিজেই।

এছাড়া নবান্ন, নীলদর্পণ এবং কিমালিসের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় তৎকালীন নাট্য আবহকে তুলে ধরতে সক্ষম হ'য়েছিল। তৎকালীন প্রতিষ্ঠান-বিরোধী শিল্পীরা আজ যে নিজেরাই এক একটি প্রতিষ্ঠান হ'য়ে গেছেন, সেজন্য দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক।

পঁচিশে বৈশাখ

প্রতিবছরের মত এবারের ২৫শে বৈশাখের পবিত্র সকালে বহু রবীন্দ্র-মনসক মানুষ সমবেত হ'য়েছিলেন রবীন্দ্রসদন এবং জোড়াসাঁকোর মুক্ত রবীন্দ্রানুষ্ঠানে। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও ২৫শে বৈশাখের আরেকটি তাৎপর্য প্রায় দুই দশক ধ'রে বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহ্যের সাথে ভীষণ ভাবে ওতপ্রোত হ'য়ে গেছে। এই দিনে অসংখ্য ছোট-ছোট পত্রিকার প্রকাশনা যেন এই কথায় প্রমাণ করে যে, ২৫শে বৈশাখ শুধু রবীন্দ্রনাথেরই জন্মদিন নয়, তা আসলে বাংলা সাহিত্যেরই জন্মদিন। তাই নিঃসন্দেহে, পেটমোটা বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির পাশাপাশি দুর্বিনীত চ্যালেঞ্জের মত, এইসব লিটল্ ম্যাগাজিনের প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা, এ-কথা কে-না জানে যে, এইসব পত্র-পত্রিকাগুলিতেই আছে সেই অমোঘ শক্তি যার নাম যুবন্, এবং যা সাহিত্যের ন্যুব্জ মেরুদণ্ডকে, ক্ষয়া-খর্বুটে প্রবাহকে, টানটান রাখতে সাহায্য করে। সে কারণে পক্ষকাল ব্যাপী ফুলে, গানে, পদ্যে, পুরোহিতে রবীন্দ্র পুজোর তুলনায়; সমবেত সংস্কৃতি-মনসক মানুষের ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে, বৈশাখের প্রখর নিদাঘ উপেক্ষা ক'রে কবির প্রতি, বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই হ'ল শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

—উপল উপাধ্যায়

মস্কো অলিম্পিক : সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া

অধ্যাপক অশোক

বিশ্বের সকল দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার এবং তা আরোও দৃঢ় ও সংহত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৮৯৬ সালে প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অলিম্পিকের মহান আদর্শকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ২১টি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বিশ্বের সকল দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ্ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় অলিম্পিকের ২২তম অনুষ্ঠান আগামী ১৯শে জুলাই থেকে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে হতে চলেছে। অলিম্পিকের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আজ থেকে ছ' বছর আগে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে ১৯৮০ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা মস্কোতে অনুষ্ঠিত হবে তখন কমিটিকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ার সরকারগুলি এবং তাদেরই পাশাপাশি খেলাধুলাকে যারা নিছক পণ্যে পরিণত করেছে সেই সব ব্যবসায়ী, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্তকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তারা প্রথম থেকেই সুযোগ খুঁজছিল কিভাবে মস্কোর অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে বানচাল করা যায়। কথায় আছে দুর্জনের সুযোগের অভাব হয় না। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনাকে তারা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করল। সম্প্রতি আফগানিস্থান সরকারের আমন্ত্রণে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসা এবং আফগানিস্থানে সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতির ঘটনাকে সুযোগ হিসাবে এরা গ্রহণ করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার মস্কো অলিম্পিক বর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ্ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে প্রচারে নেমে গেছেন। বিভিন্ন দেশের সরকারের উপরও তাঁরা এই প্রশ্ন নিয়ে চাপ দেবার চেষ্টা করছেন। আজ যখন দুনিয়ার সর্বত্র ক্রীড়াবিদ্ ও ক্রীড়ামোদীরা অধীর আগ্রহে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তখনই সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার এই নেতারা খেলাধুলার ক্ষেত্রে রাজনীতিকে টেনে আনছেন, মরীয়া হয়ে মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে নেমে গেছেন। মস্কো অলিম্পিক বানচাল করার জন্য কেন এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা—এই প্রশ্ন আজ ক্রীড়াবিদ্ ও ক্রীড়ামোদীরা নিশ্চয়ই করতে পারেন।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতা : সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থান

বিগত কয়েকটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ফলাফল যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে প্রথমেই যেটা বিশেষভাবে চোখে পড়বে তা হল সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রীড়াবিদদের বিস্ময়কর সাফল্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের মত খেলাধুলার জগতেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিস্ময়কর অগ্রগতি ও সাফল্যকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকেরা খুব স্বাভাবিক কারণেই বরদাস্ত করতে পারে না। পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকেরা দুনিয়ার সাধারণ মানুষদের ধাপ্পা দেবার জন্য প্রচার করে যে খেলাধুলায় রাজনীতির কোনও স্থান নেই, খেলাধুলার জন্যই খেলাধুলা। কিন্তু এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অন্যান্য সকল জিনিষের মত খেলাধুলাকেও নিছক মুনাফা সৃষ্টিকারী একটি পণ্য হিসাবেই দেখা হয়। এই ব্যবস্থায় খেলাধুলা শাসকশ্রেণী ও শোষকশ্রেণীর রাজনীতির ঊর্ধ্বে কিছুতেই থাকতে পারে না। কিন্তু অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি যে সমস্ত দেশ পুঁজিবাদের শৃংখল ভেঙে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে সেই সব দেশে অন্যান্য সকল জিনিষের মত খেলাধুলাও পরিচালিত হয় একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবকিছু করা হয় সমাজের সকলের প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্য নিয়ে। ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক মালিকানায় চালানো হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেশের সকল সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য গঠনের সংগে সংগে শৃংখলা সৃষ্টির জন্য শিশু থেকে শুরু করে সকলের জন্য খেলাধুলার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্যান্য সকল বিষয়ের মত খেলাধুলারও নিয়ন্ত্রণ হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও আদর্শ। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে খেলাধুলাকে পণ্য হিসাবে দেখার কোনও প্রশ্নই আসে না। এখানে প্রতিটি মানুষের জীবনে অন্যান্য কাজের মত খেলাধুলাও অবশ্য করণীয় একটি কাজ। এই ধরণের ব্যবস্থায় মধ্যে খেলাধুলার উন্নতি ঘটতে বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দুনিয়ার সকল ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুনিয়ায় যেমন

বিশেষ স্থান দখল করেছে তেমনই খেলাধূলার জগতেও নিজেদের শক্তির জোরেই বিশিষ্ট স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার কর্ণধারেরা অলিম্পিক আসর থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে দূরে রাখার চেষ্টা প্রথম থেকেই করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসর থেকে দূরে সরিয়ে রাখা আর সম্ভব হল না। ১৯৫২ সালে অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার সময় থেকেই সোভিয়েত রাশিয়া এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি স্বাস্থ্যচর্চার আশ্চর্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যুবশক্তি আজ পূর্ণ মর্যাদায় অলিম্পিক ও খেলাধূলার অন্যান্য আসরে অংশগ্রহণ করছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রীড়াবিদেরা একের পর এক বিস্ময়কর রেকর্ড স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সকলের সামনে আদর্শবোধের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তও উপস্থিত করতে সক্ষম হচ্ছেন। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন থেকে শুরু করে ছোট দেশ কিউবা, উত্তর কোরিয়া—সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্রীড়াবিদেরা খেলাধূলার আসরেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারছেন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকেরা ও খেলাধূলার ব্যবসায়ীরা এ জিনিষ কি করে সহ্য করবে? খুব স্বাভাবিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতি এদের ক্ষিপ্ত করছে।

অলিম্পিক অনুষ্ঠান: সোভিয়েত সরকার ও জনগণ কি দৃষ্টিতে দেখছেন?

সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিকে প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৫২ সালে। অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার তিন দশক পরে সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব পেয়েছে। ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর থেকেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিয়েছে। অলিম্পিক কোনও মামুলী অনুষ্ঠান নয়। বিশ্ব মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শকে সামনে রেখে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ামোদী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মস্কোতে সমবেত হবেন। এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা পরস্পর ভাব বিনিময়, সংস্কৃতির বিনিময় করার সুযোগ পাবেন। এই কারণেই সোভিয়েত সরকার ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য যেন মেতে উঠেছেন। বিগত সাড়ে তিন বছর প্রস্তুতিপর্বে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিকরা অলিম্পিকের প্রস্তুতির কাজ দেখতে মস্কো গেছেন। তারা সকলেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের উদ্যোগ দেখে অভিভূত হয়েছেন। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অলিম্পিকের প্রস্তুতির কাজ দেখার জন্য কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীব সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় ফিরে এসে লিখেছেন, "The Moscow Olympic Games are scheduled to start in the third week of July. But go to any city of any republic of the USSR to-day, and it will seem to you that the games are starting tomorrow. The Modern Olympic Games had started way back 1896, but this is the first time in 84 years that a Socialist nation is going to hold it—and the arrangements, the Soviet people have made for the Games have over-shadowed all the previous efforts." (Sports World, ১৯৮০ সালের ১৯শে মার্চের সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত)

মন্ট্রিল বা মিউনিখ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যত খরচ হয়েছিল তার মধ্যে একটি বড় অংশ হয়েছে নতুন করে স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল ইত্যাদি তৈরী করার জন্য। কিন্তু দেশের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধূলার উন্নতি ও প্রসারের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল ইত্যাদি আগে থেকেই তৈরী ছিল বলে ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য সেই সব আর নতুন করে তৈরী করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে মন্ট্রিল ও মিউনিখ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করার জন্য যা খরচ হয়েছিল তার চেয়ে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ কম খরচ হবে মস্কো অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে। অলিম্পিকের অধিকাংশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মস্কোতে। লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ ও মিনস্ক এই তিনটি শহরে ফুটবলের তিনটি গ্রুপের কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ফুটবলের সেমিফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলাগুলি হবে মস্কোতে। পাল তোলা নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হবে বাল্টিক সাগর তীরবর্তী শহর আল্লিনে। এতগুলি জায়গা জুড়ে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় প্রতিটি দেশের ক্রীড়াবিদ, প্রতিনিধিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, কোনও বিদেশী পর্যটকের যাতে এতটুকু সমস্যায় পড়তে না হয় তার জন্য খুঁটিনাটি সব দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। অলিম্পিকের মত একটি বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সফল করতে হলে প্রচুর কর্মী প্রয়োজন। দেড় লক্ষ কর্মীর নাম ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত করে তাদের সকলকেই ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকের কাজ অনুযায়ী। অলিম্পিকের সময় ৪৫টি ভাষায় দোভাষী হিসাবে যারা কাজ করবেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ। ভাষাগত পার্থক্য যাতে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের সামান্য অসুবিধা সৃষ্টি না করতে পারে তার জন্য বিমানসেবিকা, বিমানবন্দরের কর্মী মিলিশিয়া, পর্যটন বিভাগ, ডাকঘর, ব্যাংক ট্রাংক টেলিফোন ও টেলেক্স বিভাগের কর্মী, গাড়ীর চালক, হোটেলের কর্মী, দোকানের কর্মী এবং খেলাধূলার সঙ্গে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে আছেন তাদের মধ্যে বিদেশী ভাষা শেখার ধুম পড়ে গেছে। বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কেবলমাত্র মস্কোতেই প্রায় ৬০০০টি বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৬ তলা বিশিষ্ট ১৮টি নতুন বাড়ী নিয়ে গড়ে উঠেছে অলিম্পিক ভিলেজ। মস্কোতে গড়ে ওঠা এই ভিলেজের মধ্যে

তৈরী করা হয়েছে একটি হাসপাতাল। নতুন করে তৈরী এই বাড়ীগুলি অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে এখানকার নাগরিকদের আবাসন হিসাবে ব্যবহৃত হবে। বিদেশী সাংবাদিক, রেডিও ও টেলিভিসনের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অলিম্পিকে যে প্রেসবক্সের ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে একসঙ্গে ৭২০০ জন ক্রীড়া সাংবাদিক বসতে পারবেন। ২২০০টির বেশী টেবিলে টেলিভিসন ও টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকবে। অলিম্পিক ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিদেশীদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এক বিশাল প্রমোদ কর্মসূচীও প্রস্তুত করা হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মত বহুজাতিক দেশের জনগণের শিল্পকলা ও সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে বিদেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের পরিচিত করানোর জন্য ১৪৪টি ব্যালে ও অপেরা অনুষ্ঠান, ৪৫০টির বেশী নাটক এবং ৩৫০টি সার্কাসের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার ব্যাপক জনগণ যে কোনও রকমেই হোক না কেন অলিম্পিকের অনুষ্ঠানে নিজেদের অংশীদার করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। গত বছর মস্কোতে একটি সাক্ষাৎকারে এক সোভিয়েত সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ইটালীর বিশিষ্ট সাংবাদিক এনরিকো ক্রেসপি বলেন "I have very pleasant impreassious. Preparatoins are going full stream ahead. People are working on Olympic projects with enthusiasm and competence. Apart from Moscow, I visited Tallin, uslere use all knows, the Olympic regatta will be held and I would say I was equally awed by Olympic projects there. In my view, you have advanced much further in your Pre-Olympic preparations. To this day them the organisers of the two previous games, in Munich and Montreal, in just as much thime.

But my dearest impression is of the Soviet people who are, at this early stage showing great interest and enthusiasm, the two qualities that make for the success of the 1980 Olympics, which are destined to play a Key role in strengthening sports, culture and friendly ties among nations." (অলিম্পিয়ান-৮০ অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত Olympic Panorama-র নবম সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত)

সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস, ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করা যাবে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নততর পরিবেশের মধ্যে অলিম্পিকের মত বিরাট অনুষ্ঠান হতে পারে। অলিম্পিক আসরে আগত সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি দেশের সরকার কিভাবে দেশের সমগ্র জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এই ধরণের এক বিরাট অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশীদার করতে পারে। অলিম্পিকের আসর যে যুদ্ধবিরোধী শান্তির মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে তাও প্রমাণিত হবে মস্কো অলিম্পিকে। কিন্তু শান্তির পয়লা নম্বরের শত্রু সাম্রাজ্যবাদীরা এ জিনিষ কিভাবে বরদাস্ত করবে? সাম্রাজ্যবাদীরা মস্কো অলিম্পিক বন্ধ করার জন্য অপচেষ্টা চালাবে—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রোশের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ: মস্কো অলিম্পিক বর্জন প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির গঠনতন্ত্রের ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, "জাতীয় অলিম্পিক কমিটিগুলি রাজনৈতিক বা ব্যবসায়ীভিত্তিক কোনও ঘটনার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারবে না।" এই ধারাটিতে সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন সময়ে সুবিধামত ব্যবহার করেছে। ১৯৩৬ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফ্যাসিস্ট হিটলারের অধীনে নাৎসী জার্মানীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই অনুষ্ঠানকে বর্জন করার কথা চিন্তা করেনি। বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে ও বর্ণবিদ্বেষীদের অকথ্য নির্যাতনের প্রতিবাদে বেশ কয়েকটি আফ্রিকার রাষ্ট্র যখন মন্ট্রিল অলিম্পিক বর্জনের জন্য আহ্বান করেছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাড়া দেয়নি। আমেরিকার নিগ্রোদের নির্যাতিত অবস্থার প্রতি বিশ্বের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ২০০ জন নিগ্রো ক্রীড়াবিদ যখন মেক্সিকো অলিম্পিক বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক ও কর্ণধারেরা বলেছিলেন যে অলিম্পিকে রাজনীতির কোনও স্থান নেই। কিন্তু আজ যখন মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই মতে স্থির থাকতে পারছে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের একের পর এক পরাজয় এবং পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সর্ববিষয়ে বিস্ময়কর অগ্রগতির পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসক ও কর্ণধারেরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশকে চেপে রাখতে পারছেন না। তাদের ক্ষিপ্ত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানাভাবে, নানা দিক দিয়ে। এইরকম এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মস্কো অলিম্পিক বর্জন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে।

মস্কো অলিম্পিক বর্জনের আহ্বান জানিয়ে আসরে নেমেছেন স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার। ক্রীড়াবিদদের কাছে এই আহ্বান জানানোর সময় কার্টার জানতেন যে একাজ খুব সহজ নয়। তাই তিনি নানা আশ্বাসও দিয়েছেন। মস্কো থেকে সরিয়ে অন্য কোনও দেশে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে এবং এই স্থান পরিবর্তন যদি আদৌ সম্ভব না হয় তাহলে একটি বিকল্প আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে—সকল দেশের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াবিদদের কাছে এইকথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। মস্কো অলিম্পিক বর্জনের পক্ষে মত সৃষ্টির জন্য কার্টার ব্যক্তিগত দূত হিসাবে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলিকে আফ্রিকার পাঁচটি দেশে পাঠিয়েছিলেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আসরে প্রথমেই নেমে পড়েছিলেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার। তাঁরাও নিজ নিজ দেশের ক্রীড়াবিদদের মস্কো অলিম্পিকে অংশগ্রহণ না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু মস্কো অলিম্পিক বর্জনের জন্য এই সব নেতার আহ্বানে ক্রীড়াবিদরা সাড়া দিচ্ছেন কি? এই আহ্বান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে?

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ও বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদরা কি ভাবছেন?

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি পরিষ্কার ঘোষণা করেছে যে, ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পূর্ব সিদ্ধান্ত মত এই অনুষ্ঠান মস্কোতেই হবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি লর্ড কিল্লানিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে আইনগত ও নীতিগত দিক থেকে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করা যায় না। মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার যে সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ১৯৭৪ সালে গ্রহণ করেছিল সেই সিদ্ধান্তকে স্বাভাবিকভাবেই লঙ্ঘন করা যায় না। এছাড়াও লর্ড কিল্লানিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খেলাধূলাকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। মস্কো অলিম্পিক বয়কট করার আহ্বানে সাড়া দেওয়া ত' দূরের কথা বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীরা এই ধরণের হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ জানিয়েছেন। একজন ক্রীড়াবিদের সাধারণতঃ জীবনে একবারই অলিম্পিকের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আসে। বেশ কয়েক বছর কঠোর অনুশীলনের পর যদি কোনও ক্রীড়াবিদ শোনেন যে তার দেশ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করবে না তাহলে তার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার হতে পারে না। মার্কিন ক্রীড়াবিদ মর জিওর্দারি ক্কোভের সঙ্গে বলেছেন, "১৯৮০ সালে অলিম্পিককে সামনে রেখে আমি দশ বছর ধরে অনুশীলন াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি ক্রীড়াবিদদের মত মত চাওয়া হয় তাহলে সকলেই রাষ্ট্রপতি কার্টারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মত দেবেন।" ১৯৩৬ সালে অলিম্পিকে চারটি স্বর্ণপদকজয়ী অ্যাথেলেটিকসের কিংবদন্তী পুরুষ প্রয়াত জেমি ওয়েনল রাষ্ট্রপতি কার্টারের অলিম্পিক বয়কটের আহ্বানকে গর্হিত কাজ বলে মন্তব্য করেছেন। গত বছর যে ক্রীড়াবিদ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলেটের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বৃটেনের সেই ক্রীড়াবিদ সেবাস্তিয়ান কো বলেছেন, "যদি টিকিটের মূল্য আমাকেই দিতে হয় তাও আমি মস্কোতে যাবই।"

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচারের কঠোর মনোভাবের জবাবে বৃটেনের প্রতিযোগী ক্রীড়াবিদরা বলেছেন যে সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত কোনও কঠোর মনোভাবই তাদের মস্কো অলিম্পিকে যোগদান বন্ধ করতে পারবে না।

আফ্রিকার পাঁচটি দেশে কার্টারের বিশেষ দূত হিসাবে সফর করার পর মহম্মদ আলির অভিজ্ঞতা কার্টারের অনুকূলে যায় নি। মহম্মদ আলি বলেছেন, "মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে আমাকে আফ্রিকায় পাঠিয়ে রাষ্ট্রপতি কার্টার অন্যায় করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষী সরকার সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবে আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশই ওয়াশিংটন সরকারের বিরোধী। যদি আমি আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র ইতিহাস আগে জানতাম তাহলে আমি রাষ্ট্রপতির অনুরোধে আফ্রিকার পাঁচটি দেশ সফরে আসতাম না।"

সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার তাবড় নেতারা মস্কো অলিম্পিক বর্জনের যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন সেই প্রচেষ্টা নৈতিক দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শেষপর্যন্ত যদি কয়েকটি দেশ মস্কো অলিম্পিক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সেই সিদ্ধান্তকে কোনও মতেই সেই সব দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীর সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না। অলিম্পিককে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্য খেলায় মেতেছেন সেই খেলায় তারা পরাস্ত হয়েছেন। এতে দুনিয়ার অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদী নিশ্চয়ই স্বস্তিবোধ করবেন। দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীর শুভেচ্ছা নিয়েই মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে--এই বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েত সরকার দেশের অগণিত সুশৃংখল জনগণের সহযোগিতা নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন।

কালনা ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে মেয়েদের ভলিবল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

নাগপাশ। সাধন চট্টোপাধ্যায়
ক্রান্তিক প্রকাশনী। চার টাকা

"নাগপাশ" চারটি গল্পের সংকলন। প্রথম গল্প 'নাগপাশ,' দ্বিতীয় 'খোলস', তৃতীয় 'তিনপুরুষ' এবং চতুর্থ 'জ্বালা।' প্রথম গল্প 'নাগপাশ' চব্বিশ পরগণার এক ছোট্ট গ্রামের যাত্রা উৎসব নিয়ে শুরু হয়েছে। এই যাত্রা পালার মধ্য দিয়ে কাহিনীর মূল চরিত্রগুলির সাথে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতি বোধে কাহিনীকার পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু চরিত্রগুলির সনাতন রহস্য উদ্ঘাটন লেখকের উপজীব্য নয়—সমাজ পারিপার্শ্বিকতায় তারা ফুটে উঠেছে। পালা শুরু হওয়ার সাথে সাথে দূর-দুরান্ত হ'তে মানুষের মিছিল এগিয়ে আসে। এই মিছিলের খোশগল্পের মধ্যদিয়ে আদিবাসী, মাঝি, মালো, চাষী এই সব শ্রমজীবী মানুষের টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে দেশকাল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের অনেকেরই আশংকা ধান কাটার মরশুমে বেশ কিছু বিপদ ঘটতে পারে এবং এই ক'টি কথার মধ্যদিয়ে লেখক কাহিনীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবী যে দ্বন্দ্ব তার পূর্বাভাস স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই আসরেই আমাদের পরিচয়ঘটে পুণ্ড্র সমাজের গরীব চাষীর ছেলে 'কালপাথরে খোদাই দেহ' নকুলের সাথে। ষাট-সত্তর বছর আগে এই বাদার বসতি পত্তনে নকুলদের পরিবার ছিল অন্যতম। আর এই বাদার অধিকারের প্রশ্নে লেখক তাই সেই ঐতিহাসিক সূত্রটাকে ছুঁয়ে গেছেন। 'এযেন অর্জিত অধিকার ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম।' যে সমাজের সাথে এই সংগ্রাম তার চরিত্রগুলি হোল যদুপতি, রাখাল ও অন্যান্যরা এবং তাদের শিরোমণি মন্মথ শিকদার।

কাহিনীর মধ্যে মন্মথ শিকদার এবং নকুল ও সবহারানো মানুষের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে ওঠে। মন্মথ শিকদারের অবাধ শোষণের সামান্য একটু বাধা নকুল। সে বাধাকে যখন মিষ্টি কথায় সরানো গেলোনা তখন শিকদার অন্যপথ ধরল। নকুলের বোন চাঁপা ধর্ষিত হোল মন্মথের বন্ধু এক ফরেস্ট অফিসারের মাধ্যমে। নকুল এবং এই গরীব মানুষদের যন্ত্রণা এবং দুর্ভোগ চূড়ান্ত রূপ নিল। কিন্তু মন্মথ শিকদার তাদের বশে আনতে পারলনা। শেষ করতে পারলনা। মানুষের প্রতিরোধ আরও তীব্র হয়ে উঠল। এবার মন্মথ শিকদারের কলকাতায় হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করা ছেলে রমেন এল। বুর্জোয়া নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করল। মানুষকে ছলচাতুরী দিয়ে সে বশ করতে চাইল। নকুলকে লঞ্চে চাকরী দিল। তাকে বিচ্ছিন্ন করল তার শ্রেণী থেকে এবং শেষপর্যন্ত তাকে ছাঁটাই করল। কাহিনীর নায়ক নকুল বাইরের জগতে ফিরে দেখল তার পায়ের নিচে মাটি নেই। সে বিধ্বস্ত—চূড়ান্ত ট্রাজেডির নায়কের মত আত্মযন্ত্রণার হাহাকারে অসহায়। গজেন, চাঁপা নেই যে তাকে সান্ত্বনা দেয়। পদ্ম তাকে ভালবাসত সেও আজ তার কাছ থেকে বহুদূরে। সে নির্জন নদীতীরে এসে ডিঙি খুলেদেয়। দক্ষিণে অথৈ সমুদ্র। মাঝনদীতে হঠাৎই দেখা হয়ে যায় পদ্ম, গজেন, চাপার সঙ্গে। নকুলের মনেহয় এই বৈঠায় টানেই সে সমুদ্রে চলে যেতে পারে। 'সশব্দে তার বৈঠার জল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল।'

এই গল্পটি লেখকের জীবনদর্শন, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সমাজ ও জনজীবনের সাথে নিবিড় সংযোগ এইসব কারণে পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে মূল্য পাবে। কিন্তু পাঠকের স্বভাবতই মনে হতে পারে লেখক কাহিনীর পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং চরিত্রগুলির ভিতর এবং বাইরের জগৎকে বিশ্লেষণ করে একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস উপহার দিতে পারতেন। ছোট গল্প হলে এ আলোচনা আসত না কিন্তু লেখক যেখানে বড় গল্পের পরিবেশ রচনা করেছেন সেখানে পরিবেশ ও চরিত্র আরো বিস্তৃত ও বিশ্লেষিত হলে কাহিনীটি আরো সার্থক হয়ে উঠতে পারত।

বাকি তিনটি কাহিনী নিঃসন্দেহে সবদিক দিয়ে ছোট গল্প। 'খোলস' গল্পের মধ্যে মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিক পরিবারমুখী সতীশের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। কিন্তু পরিবেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হারিয়ে যাননি লেখক। গল্পটির পরিণতি অভিনব—"ডাকবে কি ডাকবে না ভেবেও কে যেন ভিতর থেকে চিৎকার করে ডাকল সুধাবাবু? ও সুধাবাবু"। সুধাবাবু নামের মানুষ এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সতীশ তাকে ডাকতে পারেনি কারণ এদের সাথে মিশলে অনের কাছ হতে সে আঘাত আসার ভয় করে। এই ছোট গল্পটির মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ বিষয় অদ্ভুত কিছু শব্দের ব্যবহার—'আঠা আঠা চোখের সামনে', 'চোরা টাক', 'ল্যাম্পপোস্টটা অভাবী রঙয়ের চোখের তারার মত মিট্‌মিট করছে', 'সুখের খুদ' ইত্যাদি। এই ছোট গল্পটির মধ্যে গত দশকের অন্ধকার দিনগুলোর ছবি তির্যকভাবে লেখকের কলমে ধরা পড়েছে।

'তিন পুরুষ' গল্পটির মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্র ফুটে উঠেছে। যুগ পাল্টাচ্ছে এবং সাথে সাথে সমাজের আচার ব্যবহার পাল্টাচ্ছে এবং শোষণের পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে কিন্তু শোষণ ব্যবস্থা যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে তা রসোত্তীর্ণভাবে লেখক আমাদের দেখিয়েছেন।

'জ্বালা' কারখানার এক শ্রমিক কেনের দুঃখ এবং রাগ এবং এসবকিছুর মধ্যদিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন এবং মালিক শ্রেণীর চরিত্র ফুটে উঠেছে, এই লেখাটির পরে লেখকের যে জীবন এবং শিল্প সম্বন্ধে অনেক উত্তোরণ ঘটেছে তা আগের গল্পগুলি (যেগুলি লেখক গত দশকের সম্ভবত শেষদিকে লিখেছেন) হতে স্পষ্ট হয়।

—রামকুমার মুখোপাধ্যায়

বিভাগীয় সংবাদ

সারা রাজ্যজুড়ে আমাদের বিভিন্ন ব্লকগুলিতে যুব উৎসব কোথাও চলছে, আবার কোথাও শেষ হয়েছে। এপর্যন্ত আমাদের দপ্তরে যে সমস্ত সংবাদ পৌঁছেছে তাই দিয়েই এবারের বিভাগীয় সংবাদ।

বীরভূম জেলাঃ

রাজনগর ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও আনুকূল্যে এবং রাজনগর ব্লক যুব-উৎসব কমিটির পরিচালনায় ১৪ই থেকে ১৬ই মার্চ তিন-দিন ব্যাপী যুব উৎসব চলেছে। এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১২৫ জন শিশুসহ প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় ছ'টি দল অংশ গ্রহণ করে। আদিবাসীদের জন্য 'লোকনৃত্যে'-রও ব্যবস্থা ছিল।

১৪ই মার্চ পতাকা উত্তোলন এবং শিশুদের মার্চপাস্টের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও যুব উৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শিশু বিভাগের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল সম্মিলিত রিলে রেস, আবৃত্তি এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতীদের জন্য ছিল কবাডি, খো-খো, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, বিতর্ক ইত্যাদি। প্রতিদিন রাত্রে অনুষ্ঠিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে রাজনগর ইউনিক ক্লাব-এর 'শিকার'। দ্বিতীয় গার্গী গোষ্ঠীর 'সূচীপত্র'। কবাডি ও খো-খো প্রতি-যোগিতায় বিজয়ী হয় রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়।

বোলপুর ব্লক যুব-করণ—গত ১৫ই-১৭ই মার্চ বোলপুর ডাকবাংলো ময়দানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই মার্চ সকালে উদ্বোধনী মিছিল শুরু হয় উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে। মিছিলে অংশ নেয় গ্রামের সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ, যুব-ছাত্র, মহিলা, আদি-বাসী, সাঁওতাল প্রভৃতি সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শরদীস রায় এম. পি. ও জ্যোৎস্না গুপ্ত এম. এল. এ.। খেলাধুলায় বালক বালিকাদের দৌড়, হাই-জাম্প, লং-জাম্প ইত্যাদি ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণীয় খেলা ছিল আদিবাসী ও সাঁওতালদের তীর ধনুক ছোঁড়া, রণপা দৌড় ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত দলের মধ্যে হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা। বিকালে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার কবিতাগুলি ছিল—রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে', নজরুলের 'কুলিমজুর' এবং সুকান্তের 'চিল'। কবিগান ও ম্যাজিকের আসরও বসে। উত্তরণ সাংস্কৃতিক শাখা (বোলপুর) 'মুচকি মঙ্গল কাব্য' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। কসবা গ্রাম পঞ্চায়েত পরি-বেশিত 'রায়বেশে' একটি সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। এছাড়া 'বদন চাঁদের বজ্জাতি' নাটক ও 'মা মাটি মানুষ' যাত্রানুষ্ঠান দর্শকদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রীয় হওয়া উচিত। প্রতিযোগীরা এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিল্পীচক্রের সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'হুল' ব্যালে স্থানীয় জনমানসে উল্লেখ-যোগ্য রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন দিনে পঃ বঃ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি শাখার বীরভূম জেলা অফিস কর্তৃক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

তিনদিনে প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ এই উৎসব উপভোগ করে।

নানুর ব্লক যুব-করণ—নানুর ব্লকে তিনদিন পৃথকভাবে তিন জায়গায় খেলাধুলো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রথম দিন ২৭শে মার্চ খুজুটি পাড়া চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকালে শুরু হয় হা-ডু-ডু ও ভলিবল প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় গণসংগীত, কবিগান ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। পঃ বঃ সরকারের তথ্যচিত্রও দেখান হয়।

দ্বিতীয় দিন ২৮শে মার্চ কির্ণাহার শিবচন্দ্র হাইস্কুলে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় পাপুড়ি ইউনিট কর্তৃক 'রায়বেশে' এবং কির্ণাহার সুরঙ্গমা সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠান বেশ জমে ওঠে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন।

তৃতীয় দিনে নানুর ইউকো ব্যাঙ্ক মাঠে সকালের অনুষ্ঠানে গণসংগীত, সাঁওতালী সংগীত, চণ্ডীদাস পদাবলী পরিবেশিত হয়। তারপর শুরু হয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, স্বরচিত কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। দুপুরের অনুষ্ঠানে চারকল গ্রাম ইউনিট 'রায়বেশে' পরিবেশন করেন। পরে রবীন্দ্রসংগীত এবং ভাদুগান প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

অনুষ্ঠান শেষ হয় শম্ভু বাগের নির্দেশনায় চণ্ডীপুর নবনাট্য আলোড়ন গ্রুপের যাত্রাভিনয় 'সবুজের অভিযান' দিয়ে।

পুরস্কার বিতরণ করেন নানুর পঞ্চায়েত সমিতির সভা-পতি জিতেন মিত্র।

লাভপুর ব্লক যুব-করণ—গত ২৪, ২৫, ২৬শে মার্চ তিন-দিন ধরে যুব উৎসব পালিত হয়। উদ্বোধন করেন পুলিন-বিহারী চট্টোপাধ্যায়। লাভপুর যাদবলাল হাইস্কুল মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং স্থানীয় ব্লক ও যুবসংগঠনের অনেক যুবক-যুবতী।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সূচীতে ছিল—আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি ইত্যাদি। বিতর্কের বিষয় ছিল

—'আমূল ভূমি সংস্কার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে না'। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের আলোচনা তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে সকলের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

এছাড়াও বাউল গান, বোলান গান ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি সাধারণ মানুষ দারুণ আগ্রহ ভরে উপভোগ করে।

চব্বিশপরগনা জেলা :

সোনারপুর ব্লক যুব-করণ—বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গত ৪ঠা থেকে ৬ই এপ্রিল সোনারপুর ব্লক যুব উৎসব উদ্‌যাপিত হ'ল। গ্রামের যুবক-যুবতীদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতির চেতনাকে আরও বেশী বেশী করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলি ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। চাঁদমারীর মাঠে খো খো ও কাবাডি প্রতিযোগিতা, হরিণাভিতে সংগীত, আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী ফুটবল, রাজপুর ও বোড়ালে আলোচনা সভা এবং সোনারপুরে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বোসপুকুর ময়দানে।

বিভিন্ন আলোচনা সভায় বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় ছাত্রনেতা সাইফুদ্দিন চৌধুরী এম. পি., সত্যসাধন চক্রবর্তী এম. পি. এবং বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অনুনয় চট্টোপাধ্যায়।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন দক্ষিণ চব্বিশপরগনার যুব-সংযোজক মিহির কুমার দাস।

কাকদ্বীপ ব্লক যুব-করণ—কাকদ্বীপ বিধান ময়দান ও কিশোর প্রাঙ্গণে ২৮শে থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫৫১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বসে আঁকো, একাংক নাটক, সংগীত ইত্যাদি বিষয়। এতে অংশ নেয় ২০৪ জন প্রতিযোগী। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন বিধান সভার সদস্য হৃষিকেশ মাইতি।

বর্ধমান জেলা :

কালনা ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় এবং যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পরিচালনায় কালনা ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২০-২৩শে মার্চ। উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলা শাসক শ্রী বৈদ্যনাথ সিংহরায়। ২৩শে মার্চ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিধানসভার সদস্য গুরুপ্রসাদ সিংহরায় এবং প্রধান অতিথি বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ পুরস্কার বিতরণ করেন। উৎসবের ৪ দিন ব্লকের তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ, যুব কল্যাণ বিভাগ ছাড়াও এ. কে. বিদ্যামন্দির আয়োজিত একক বিজ্ঞান প্রদর্শনী দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

সালানপুর ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ সালানপুর ব্লক যুব অফিসের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১৬টি বিভিন্ন ধরণের ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এতে মোট ২৭ জন যুবকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের জন্য সীবন-শিল্পের উপর ১টি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এখানে ৪৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আশা করা যায় এ থেকে এ'রা নিজেদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন।

১৯শে মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব প্রতি বৎসরের মত এবারও প্রভূত উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হ'ল। বিশেষ করে তপশীলী ও আদিবাসী মহিলাদের দ্বারা পরিবেশিত লোকনৃত্য ও স্টেশন ক্লাবের ছেলেমেয়েদের জিমন্যাসটিক, জুডো ও ক্যারেটে প্রদর্শন এবং লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুয়া নৃত্যনাট্যটি জনচিত্তে বিশেষ রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করে উৎসব প্রাঙ্গণকে মুখর করে তোলে।

নদীয়া জেলা :

চাকদহ ব্লক যুব-করণ—গত ২১ থেকে ২৩শে মার্চ চাকদহ ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৫০ ও ৫০০ জন। প্রায় ১২,০০০ দর্শক সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত এইসব অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল বাগচী সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অন্যান্য বক্তারা যুব উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

চাপড়া ব্লক যুব-করণ—২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ কিং এডওয়ার্ড বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্লক যুব উৎসবের আসর বসে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন

নদীয়া জেলায় চাপড়া ব্লক যুব উৎসবে কবাডি প্রতিযোগিতা।

করা হয়। এছাড়া বিজ্ঞান, কলা ও হস্তশিল্পের উপর অনেক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একাংক নাটক প্রতিযোগিতার আসর বসে। এইসব বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নানান বিদ্যালয়ের ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। যুবমেলার উদ্বোধন করেন বিধানসভা সদস্য সাহাবুদ্দীন মণ্ডল। সদর মহকুমা শাসক সুবল মার্ন্ডি এবং বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

নাকাশীপাড়া ব্লক যুব-করণ—গত ২৮শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং যুব উৎসব কমিটির সহযোগিতায় বেথুয়াডহরী জে. সি. বিদ্যালয় ময়দানে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল একদিনের ফুটবল, ভলিবল ও কবাডি প্রতিযোগিতা, মহিলা খো-খো প্রদর্শনী, লাঠিখেলা, ব্রতচারী নৃত্য, ড্রিল, ব্যায়াম ও শরীর চর্চা প্রদর্শনী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, রবীন্দ্র ও নজরুলগীতি, কথন, কৌতুকাভিনয় ও আল্পনা প্রতিযোগিতা। এছাড়া একাংক নাটক প্রতিযোগিতা। অংশ নেয় ১৫টি দল। এরপরও ছিল দলগত লোকগীতি, সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, আলোচনাচক্র ইত্যাদি। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয়সূচী ছিল "আমূল ভূমি সংস্কারই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।" এবং আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল—"গণতন্ত্রের সুরক্ষায় ও সম্প্রসারণে যুব সমাজের ভূমিকা।"

এই যুব উৎসব জনমনে বিশেষ করে সাধারণ স্তরের মানুষের মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

কাকসা ব্লক যুব-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় ১২ থেকে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় এম. এল. এ. লক্ষ্মীনারায়ণ সাহা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম বিষয় ছিল আদিবাসী যুবকদের তীর ছোঁড়া ও যুবতীদের নৃত্যানুষ্ঠান। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন সম্পূর্ণ মাঝি, বি. ডি. ও.।

শান্তিপুর ব্লক যুব-করণ—এই যুব-করণের উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসবের (২০শে থেকে ২২শে মার্চ) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫০০ জন প্রতিযোগী সেমিনার, বিতর্ক, সঙ্গীত, আবৃত্তি, ব্রতচারী ও লোকনৃত্য, স্বরচিত গল্প ও কবিতা, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত ছিল কবাডি, হাই-জাম্প, দৌড় ইত্যাদি। স্থানীয় এম. এল. এ. বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়'এর সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ ডঃ চুনীলাল দেব কীর্ত্তনীয়া সফল প্রতিযোগীদের মানপত্র ও পুরস্কার দেন।

এছাড়া এই অফিস থেকে ৬৪ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়।

কৃষ্ণনগর ব্লক যুব-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় যে যুব উৎসব (২৩-২৫শে মার্চ) অনুষ্ঠিত হয় তার প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও মডেল প্রদর্শনী। এছাড়াও চলচ্চিত্র দেখান হয় এবং দেহ সৌষ্ঠব ও যোগাসন নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ৪৪২ ও ৩৫১ জন অংশগ্রহণ করে। উৎসবের উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলার সভাধিপতি পরিমল বাগচী ও সফলকাম প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন অধ্যক্ষ সুরেশ চন্দ্র সরকার।

হাঁসখালি ব্লক যুব-করণ—এই ব্লকের যুব উৎসব উদ্বোধনে (১৪. ৩. ৮০) উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শান্তিভূষণ ভট্টাচার্য ও বিধানসভার সদস্যদ্বয় সুকুমার মণ্ডল ও সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস। জেলা পরিষদের সদস্য বিমল চৌধুরী ও পঞ্চায়েত সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ নেন। সুদৃশ্য বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ২৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী যোগ দেয়। এরপর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৫৯ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

নবদ্বীপ ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং নবদ্বীপ থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য দেবী বসুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া আরো দুটি উপ-সমিতি গঠন করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল চিত্রাঙ্কণ, হস্তশিল্প, বসে আঁকো, বিজ্ঞান মডেল, বিতর্ক, সঙ্গীত, নৃত্য, একাঙ্ক নাটক ইত্যাদি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল কবাডি ও খো-খো। এই দুটি প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী বালক বালিকার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬৩ ও ৩৫৭ জন। পুরস্কার বিতরণী সভায় বসন্ত কুমার পাল, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি ও দীপঙ্কর সাহা, বি. ডি. ও. যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ

বহরমপুর ব্লক যুব-করণ—এই কেন্দ্রের উদ্যোগে ২, ৩ ও ৪ঠা এপ্রিল মণীন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম স্তরে ছিল শহরের প্রতিযোগীরা এবং ২য় ভাগে ছিল গ্রামীণ প্রতিযোগীরা। এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল

বহরমপুর ব্লক যুব উৎসবে বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী।

বিতর্ক, আবৃত্তি, সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, বসে আঁকো, যোগ ব্যায়াম ইত্যাদি। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৩৪৫।

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক যুব-করণ—এই যুব করণের পরিচালনায় ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রিল যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক দুটি ভাগ ছিল। অ্যাথলেটিকস ও খো-খো প্রতিযোগিতায় ১৮টি ক্লাবের ২৫৯ জন বালক-

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক যুব উৎসবে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় 'অশান্ত বিবর' নাটকে একটি দৃশ্য।

বালিকা অংশ নেয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আবৃত্তি, তবলা বাদ্য ও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। ২০টি ক্লাবের ১৮৮ জন তরুণ-তরুণী এতে অংশ নেয়।

মালদহ জেলা ঃ

হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক যুব-করণ—হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকের ময়দানে গত ২৩শে মার্চ হতে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত কৃষি, শিল্প মেলা ও ছাত্র-যুব উৎসব সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক আয়োজিত মেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল, তাছাড়াও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা ও ক্লাবগুলিরও ছিল কিছু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। উক্ত মেলায় ২৩শে মার্চ কৃষি দিবস, ২৪শে মার্চ পরিবার কল্যাণ দিবস, ২৫শে মার্চ শিল্প দিবস, ২৬শে মার্চ পঞ্চায়েত দিবস এবং ২৭শে মার্চ ছাত্র-যুব দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। মেলার উদ্বোধন করেন পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন চৌধুরী মহাশয়। মেলা প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী প্রত্যহ বেলা ২টা হতে খোলা থাকত এবং প্রত্যহ দিবস অনুযায়ী আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা ছিল। আলোচনা চক্র ব্যতীত মেলাকে সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য উক্ত ব্লকের ২টি ক্লাব ২টি নাটক করেন। ২৩শে মার্চ আঞ্চলিক শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন, ২৪শে মার্চ রাত্রি ৭ ঘটিকায় কলিকাতার গণনাট্য সংঘ কর্তৃক গণসঙ্গীত ও তরজাগান পরিবেশিত হয়। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বেতার শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী কর্তৃক পল্লীসঙ্গীত, ২৬শে মার্চ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুয়া গীতিনাট্য পরি-বেশিত হয়। যুব দিবস উপলক্ষে ২৭শে মার্চ বেলা ৩টায় ক্লাবের পতাকাসহ শোভাযাত্রাসহকারে উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত হয় ক্লাবের সদস্যারা। বেলা ৪টার সময় যুব উৎসব উপলক্ষে আন্তঃ ক্লাব ভলিবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলাটি হয় ভিঙ্গল সবুজ সংঘ বনাম হরিশ্চন্দ্রপুর সংগঠন সমিতির মধ্যে সংগঠন সমিতির মাঠে। ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করে ভিঙ্গল সবুজ সংঘ। ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ২৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক অংশগ্রহণ করে, তার মধ্যে ছাত্র-যুবকের সংখ্যা ১৮৮ ও বালিকার সংখ্যা ৫৫ জন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৯৭ জন, তারমধ্যে ছাত্র-যুব ৬০ জন ও ছাত্রী-যুবতীর সংখ্যা ৩৭ জনের মত। ভলিবল প্রতিযোগিতার পর কৃষি, শিল্প ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রদর্শনীর প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয় এবং যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজেতা দলকে যুব কল্যাণ বিভাগ ও ব্লক স্পোর্টস কমিটির পক্ষ থেকে শীল্ড ও খেলোয়াড়দের গেঞ্জি দেওয়া হয়। সমস্ত রকম প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মালদা জিলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় শ্রী মানিক ঝা মহাশয়। পুরস্কার বিতরণীর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। কৃষি, শিল্প মেলা ও ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার পুরুষ ও মহিলা মেলায় অংশগ্রহণ ক'রে আনন্দ উপভোগ করেন।

পুরাতন মালদহ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের পুরাতন মালদহ ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় মঙ্গলবাড়ী পি. ডাবু. ডি. অফিসের সম্মুখস্থ ময়দানে গত ২২শে মার্চ হতে ২৪শে মার্চ '৮০ পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী ব্লক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ২২শে মার্চ তারিখে ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় শ্রীদিব্যেন্দু মুখার্জী, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পুরাতন মালদা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুঃ মালদা ব্লকের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি ও সংঘের সদস্য-সদস্যারা নিজ নিজ সংস্থার পতাকা নিয়ে

অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিচিত্রানুষ্ঠান, গম্ভীরা, দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনী ও কোরাসের সংগীতাভিনয় "সাম্যের গান" আয়োজন করা হয়েছিল। যুব উৎসবের ১ম দিন প্রায় ১৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

যুব উৎসবের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান ও শিশু নাটক "সাত ভাই চম্পা ও পারুল" ... (পরিচালনায় মালদা ড্রামালীগ) সংগীত, নৃত্য, নাটক ও মূকাভিনয়ের (পরিবেশনায় পঃ কালচারাল ইউনিট) আয়োজন করা হয়। ২য় দিন প্রায় ২৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

যুব উৎসবের তৃতীয় দিন পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পুঃ মালদার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ আতাউর রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা সমাহর্তা মহাশয়, শ্রী আর. কে. প্রসন্ন। এবং তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কার বিতরণীর পর গম্ভীরাগান, (পরিবেশনায় দোকড়ি চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়) নাটিকা ও সমবেত সঙ্গীত (পরিবেশনায় গণনাট্য সংঘ, মালদা শাখা), এবং সবশেষে একটি নাটক (পরিবেশনায় কিশোর ভারতী পরিষদ, মঙ্গলবাড়ী) আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ২৭৫ জন।

কোচবিহার জেলা ঃ

কোচবিহার ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বাবুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, ৫ই থেকে ৭ই এপ্রিল '৮০ এক অনাড়ম্বর পরিবেশে কোচবিহার ১নং ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। ৫ই এপ্রিল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পরিবহন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহোদয়। সবুজের দলের ছোট ছোট শিশুমিতারা প্রধান অতিথি শ্রীচৌধুরীকে অভ্যর্থনা জানায়। ৫ই এপ্রিল যুব-ছাত্র দিবসে 'কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের' উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার ও শ্রীঅমিতোষ দত্ত রায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আলোচনা চক্র বন্ধ রাখা হয়।

৬ই এপ্রিল শ্রমিক কৃষক মৈত্রী দিবসে আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন শ্রীগোপাল সাহা, শ্রীপ্রদীপ নাথ, শ্রীসুনীলকুমার নন্দী ও শ্রীপরিতোষ পণ্ডিত।

৭ই এপ্রিল জাতীয় সংহতি রক্ষা দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনিখিলেশ দাস। এদিন তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন। যুব উৎসবে প্রত্যহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিকালে গণসংগীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যুব সংস্থা কর্তৃক নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে যেমন যুব-ছাত্ররা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল আবার শ্রমিক, আদিবাসীদের অংশগ্রহণ এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল তরুণ কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য পাঠের আসর। কোচবিহার ১নং ব্লকের ১৪ জন তরুণ কবি ও শহরের তিন বিশিষ্ট কবি এতে অংশগ্রহণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে কবিদের সম্বর্ধনা জানানোর ঘটনা কোচবিহার শহরে এই প্রথম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা, ডাওয়াগুড়ি শাখা, ত্রিফলরায় ও সম্প্রদায় ও পিন্টু দত্তের গিটার খুব আকর্ষণীয় ছিল। টোটো পাড়ার আদিবাসী নৃত্য দর্শকরা খুব উৎসাহের সঙ্গে দেখেছেন। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কিশোর নাট্য সংস্থা, কলেরপাড় তরুণ সংঘ, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ডাওয়াগুড়ি, বাণীতীর্থ ক্লাব ও তাঁত শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা নাটক পরিবেশন করেন। প্রত্যহ প্রায় ৪ হাজার দর্শকের সমাগম হয়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 'অমলের স্বপ্ন ভঙ্গ', বাণীতীর্থের 'ঘটনার বিবরণে প্রকাশ' নাটক দুটি উচ্চ মানের ছিল। অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানান যুব উৎসব কমিটির সম্পাদক ও ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাশ। বিভিন্ন দিনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যাঁরা প্রথমস্থান অধিকার করেছেন তাঁরা হলেন—আবৃত্তি (নবম/দশম) ঃ শ্রীমতী রীণা দত্ত, দেওয়ানহাট হাইস্কুল। আবৃত্তি (সর্বসাধারণ) ঃ শ্রীবিজয় ঘোষ, বাণীতীর্থ ক্লাব। রবীন্দ্র সংগীত ঃ শ্রীমতী রীণা দত্ত, দেওয়ানহাট হাইস্কুল। নজরুল গীতি ঃ শ্রীপ্রবীর কুমার রায়, হেলথ রিক্রিয়েশন ক্লাব। ভাওয়াইয়া ঃ শ্রীমতী অঞ্জনা রায়, কোচবিহার সাংস্কৃতিক পরিষদ। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ঃ শ্রীপরিতোষ পণ্ডিত, পি. এম. জি. ও ডাঃ অশোক চৌধুরী, হেলথ রিক্রিয়েশন ক্লাব। অঙ্কন ঃ শ্রীপবিত্র সরকার, তল্লীগুড়ি।

জলপাইগুড়ি জেলা ঃ

আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের (পঃ বঃ সরকার) আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ২৩শে থেকে ২৫শে মার্চ পলাশবাড়ি গ্রামে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত্ব হল এদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে এসেছিলেন। তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সুখেন্দু রায়। এবং পুরস্কার বিতরণ করেন আলিপুরদুয়ার ১নং পঞ্চায়েত সভাপতি দিলীপ চৌধুরী। উৎসবের দিনগুলিতে প্রায় ৬০০০ লোকের সমাবেশ হয়। ২৩শে মার্চ 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি দিবস', ২৪শে মার্চ 'শ্রমিক কৃষক দিবস' ও ২৫শে মার্চ 'যুব-ছাত্র দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

কালচিনি ব্লক যুব-করণ—এই যুব-করণের উদ্যোগে ও কালচিনি ব্লক যুব উৎসব '৮০ কমিটির পরিচালনায় হ্যামিলটনগঞ্জ কালীবাড়ী ময়দান ও কালচিনি থানা ময়দানে গত ২৪ থেকে ২৬শে মার্চ '৮০ পর্যন্ত যুব উৎসব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঐ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয় এবং পতাকা উত্তোলন করে যুব উৎসবের শুরু ঘোষণা করেন অঞ্জন রায়, যুব সংযোজক, নেহরু যুবক কেন্দ্র, আলিপুরদুয়ার। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, বিতর্ক, রচনা, স্বরচিত কবিতা, একাংক নাটক ও নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া সাঁওতালী নৃত্য, বোরো নৃত্য, নেপালী নৃত্য, ব্রতচারী ও তথ্য চিত্র প্রদর্শীত হয়েছে। এ বিভাগে মোট ২০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়

বিভিন্ন বিভাগে মোট ৩০০ যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এই উৎসবের অন্য একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল বিভিন্ন স্টলের আয়োজন। এর মধ্যে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও মহিলা সমিতির স্টলদুটি দর্শকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। গড়ে তিন হাজার দর্শক এই

কালচিনি ব্লক যুব উৎসবে শিশুদিবসে নৃত্যের ভঙ্গিতে জনৈক শিশু শিল্পী।

উৎসব উপভোগ করেন। কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন অংশ থেকে যুবক-যুবতী ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সত্যই প্রশংসার যোগ্য। এই অঞ্চলে সরকারী সহযোগিতায় এই ধরণের উৎসব দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হ'ল।

মেদিনীপুর জেলা:

সবং ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ প্রায় 8000 দর্শকের উপস্থিতিতে প্রতিযোগীরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। তিনদিনে মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৩৪৭ জন। এর মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৫৯ ও ৫৮৮ জন। প্রদর্শনীর সংখ্যা ছিল ১৭টি। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরের অধীন বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে লালগড় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে সারা ব্লকের সর্বস্তরের মানুষের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ২৬শে মার্চ থেকে ২৮শে মার্চ পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী ব্লক যুব উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে মার্চ সারা ব্লকের যুবকবৃন্দ ও জনসাধারণ এবং স্থানীয় স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রী ও মেদিনীপুরের পুলিস লাইনের ব্যাণ্ড সহযোগে সারা লালগড় অঞ্চলটি পরিক্রমা করে এবং পরিক্রমা শেষে নেহরু যুবক কেন্দ্রের যুব সংযোজক সুশান্তকুমার সরকার পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর যুব উৎসব ও মেলা শুরু হয়। এই মেলাতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, প্রবন্ধ ও নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বারোশত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিতর্কে ২৮ জন, আবৃত্তিতে ১১৫ জন, প্রবন্ধে ৩১ জন এবং সংগীতে ২৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। এই ব্লক মেলা ও যুব উৎসবে আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এবং ২৬শে মার্চ আদিবাসী দিবস হিসাবে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন খেলাধূলো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যায় প্রতিযোগী মেলাতে যোগদান করেন। বিশেষ করে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতায় ৪২০ জন, একক সংগীতে ১৮ জন, তীর নিক্ষেপ এ ৫২ জন অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসবে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ তাদের প্রদর্শনী ষ্টল দেন। এছাড়া প্রতিদিন চলচ্চিত্র, মেদিনীপুর ক্ষুদিরাম সংঘের পরিচালিত ব্যায়াম প্রদর্শনী এবং ভারতীয় লোক সংগীতের প্রখ্যাত গায়ক সত্যেন্দ্রনাথ মহান্তি ও তাঁর সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সংগীত পরিবেশনা ও স্থানীয় আদিবাসী জনসাধারণ কর্ত্তৃক যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়। যেভাবে সারা ব্লকের সর্বস্তরের মানুষ এই ব্লক মেলাতে যোগদান করে মেলাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তাতে প্রমাণ হয় যে এই উৎসব সারা ব্লকেরই উৎসব। শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণ করেন পঞ্চায়েত সমিতি ও মেলার সভাপতি সুধীর কুমার পাণ্ডে।

তমলুক ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে তমলুক ১নং ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় চনশ্বরপুর উচ্চবিদ্যালয় ফুটবল ময়দানে গত ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তমলুকের অতিরিক্ত জেলাশাসক বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

যুব উৎসবে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা, কাবাডি, খো-খো, লোকনৃত্য, চিত্রাঙ্কণ, আবৃত্তি, সংগীত, গণসংগীত, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, নাটক। বয়স্ক শিক্ষা, কৃষি এবং স্বাস্থ্যের উপর আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ।

উৎসবে ১২০০ শ' প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক এবং শিক্ষিকা ও বিভিন্ন সংস্থার ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই যুব উৎসব জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত আশা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

সমাপ্তি দিবসে পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন তমলুকের অতিরিক্ত জেলাশাসক বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিধানসভার সদস্য পুলক বেরা।

পুরুলিয়া জেলা ঃ

রঘুনাথপুর ব্লক যুব-কল্যাণ—বিগত ২৯শে এবং ৩০শে মার্চ এবং ৪, ৫, ৬ই এপ্রিল '৮০ দুটি স্তরে বিভক্ত হয়ে রঘুনাথপুর ১নং ব্লক 'যুব-উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের প্রস্তুতি পর্বে ১নং ব্লকে-র অন্তর্গত সমস্ত ক্লাবগুলি, পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা যুব সংগঠনগুলিকে নিয়ে 'যুব-উৎসব-কমিটি' গঠিত হয়। শ্রী রঙ্গনাথ আচারি, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি এবং শ্রী বিভূতি বেজ যুব-কল্যাণ আধিকারিক যথাক্রমে এই 'কমিটি'র সভাপতি এবং সম্পাদক মনোনীত হন। উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য শ্রী নীহার রঞ্জন চৌধুরী ও শ্রী চণ্ডীচরণ গুপ্তকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি ক্রীড়া উপ-সমিতি এবং অধ্যাপক দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রী পার্থ সারথি ঘোষকে আহ্বায়ক করে একটি সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি গঠন করা হয়।

দুদিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রঘুনাথপুর ১নং ব্লকের ৩৩টি ক্লাব ও ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৭০৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা শতাধিক। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে মোট ১৫টি বিষয়ে প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় 'তীর ছোঁড়া' এবং 'যেমন খুশী সাজো' প্রতিযোগিতা। শেষেরটিতে ১৫ জন অংশ গ্রহণ করেন। ক্রীড়া-বিভাগে প্রদত্ত মোট ৪৬টি পুরস্কারের মধ্যে 'পল্লী-শ্রী সংঘ' (ন-পাড়া-শাঁকা অঞ্চল) এবং রঘুনাথপুর গার্লস্ হাইস্কুল প্রত্যেকেই ৫টি করে এবং 'বয়েজ-ফ্রেন্ডস্ ক্লাব' (আদ্রা) 'অরবিন্দ-সংঘ' (আড়রা অঞ্চল) এবং 'আমরা সবাই' (রঘুনাথপুর) প্রত্যেকের চারটি করে পুরস্কার দখল সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যুব-উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজড্ জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে। রঘুনাথপুর শহর এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই উৎসবানুষ্ঠান যে এক অভূতপূর্ব সাড়া সৃষ্টি করতে পেরেছে তার মধ্যদিয়েই এর সার্থকতা ও সাফল্য পরিস্ফুট। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বিবিধ বিষয়ে অনেকগুলি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল প্রতিযোগী ও শ্রোতাদের কাছে। বালক-বালিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা এই প্রতিযোগিতায় সমান আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিশেষ কোনো গান নির্দিষ্ট করে না দেওয়াতে প্রতিযোগীরা যেমন স্ব-মনোনীত সংগীত পরিবেশনের সুযোগ লাভ করেছিলেন তেমনি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানের বিচিত্রভাব ও ঐশ্বর্য নানা রূপে রসে ও বৈচিত্র্যে ফুটে উঠতে পেরেছিল।

আবৃত্তি প্রযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সঙ্গে সুকান্তের কবিতাও শিশু বা কিশোর প্রতিযোগীদের কণ্ঠে সুচারু পারদর্শিতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে যথাক্রমে বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব-সাধারণের জন্যে এই জাতীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্কের বিষয় ছিল 'শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যম হওয়া উচিৎ'। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল দুটি (ক) পুরুলিয়া জেলার সার্বিক উন্নয়নে যুব-সমাজের ভূমিকা এবং (খ) আঞ্চলিকতা ভারতের জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে যে বিতর্ক, আলোচনা এবং বক্তৃতায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য প্রতিযোগীরা তা শুধুই যে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল তা নয়—ছিল যথেষ্ট শিক্ষামূলকও উৎসাহব্যঞ্জক। সমকালীন সমাজের মানব জীবনের সমস্যার নানা দিক ও তার সমাধানের সঠিক পথ সন্ধান নিয়ে যে আজকের যুব সমাজ ভাবছেন তা সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এখানে। বিতর্ক ও আলোচনার ক্ষেত্রে সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রী তপন লাহিড়ীর সুচিন্তিত ও মূল্যবান বক্তব্য প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক'। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর বিষয়ের উপর রচিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যাঁরা অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁরা যথেষ্ট উন্নত চিন্তার পরিচয় রেখেছেন।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো একাংক নাটকের প্রতিযোগিতা। এই অভিনয় প্রতিযোগিতা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে দর্শকমণ্ডলীর কাছে। কয়েক হাজার দর্শক নিবিষ্টচিত্তে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত এই উন্নত রুচির ও মানের নাটকগুলি পরম আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করেছেন। এই অঞ্চলের যুবকেরা অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এক্ষেত্রেও। বিষয় বৈচিত্র্যের এবং বক্তব্যের দিক্ থেকে সমুন্নত আদর্শের এইসব নাটকাভিনয় আঞ্চলিক যুব সমাজের অসাধারণ নাট্য-প্রতিভা এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। 'স্তালিনের নামে' (চোর পাহাড়ী নাট্য সংস্থা), 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া' (বিদ্যাসাগর-শরৎ-নজরুল-স্মৃতি পাঠচক্র, রঘুনাথপুর), স্কিৎস (ডাবর অরুণোদয় ক্লাব, চোর পাহাড়ী), কিংবা 'চন্দ্রালোকের যাত্রী' (আমরা সবাই, রঘুনাথপুর)-র অভিনয় তারই প্রমাণ। নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো বন্দলা খাজুরা অঞ্চল কর্তৃক সাঁওতাল ভাষার নাটক 'মার্শাল ডাহা'র অভিনয়। আশা করা যায় রঘুনাথপুর ১নং ব্লকের যুব-উৎসবের পক্ষে এই ঐতিহাসিক ঘটনা একটা স্থায়ী মূল্য নিয়ে আগামী ভবিষ্যতকে প্রেরণা যোগাবে।

৬ই এপ্রিল '৮০ সন্ধ্যায় এক সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী রঙ্গনাথ আচারী। সম্পাদকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মোট ২৬০ জন প্রতিযোগী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবের আর একটি উল্লেগযোগ্য ঘটনা হলো সীমান্তিক গোষ্ঠী (আদ্রা)-র গণসংগীত পরিবেশন।

পরিশেষে বলা যায়, এই জাতীয় উৎসবানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রঘুনাথপুর এবং সন্নিহিত অঞ্চলের যুব-সমাজের ক্রীড়াগত এবং সাংস্কৃতিক মান যে ভবিষ্যতে উজ্জ্বলতর হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই—সন্দেহ নেই এবিষয়েও যে এই অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, ও সহানুভূতিই এই যুব উৎসবকে সাফল্যের স্বর্ণ-শিখরে উপনীত করেছে।

পাঠকের ভাবনা

সম্পাদক সমীপেষু,

'যুবমানস' কবে বেরোবে—আশা নিয়ে দারুণ আগ্রহভরে অপেক্ষা করি। পড়তে ভাল লাগে। ইদানিং ভালবাসতে শুরু করেছি। গত সংখ্যা অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় কয়েকটি নতুন বিভাগের সংযোজন দেখলাম। আশা করব এমনি করে আগামী দিনগুলিতে 'যুবমানস' আরও সমৃদ্ধ হবে।

শিল্প সংস্কৃতি বিভাগে গৌতম ঘোষদস্তিদারের 'নাটকের কিছু কথা এবং ফজল আলী আসছে' একটি বলিষ্ঠ, যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। লেখার ভঙ্গিটিও সুন্দর। গৌতমবাবু শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাকরণবাগিশ সমালোচকদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন বিচারের মানদণ্ড অন্যত্র অর্থাৎ পাঠকের হৃদয়ে।

তবে বানানের ক্ষেত্রে এতখানি এগিয়ে যাওয়া ঠিক কি? পত্রিকার সময়মত প্রকাশ অবশ্য কাম্য।

শ্রদ্ধাসহ—

নমিতা ঘোষ।

বসিরহাট। ২৪-পরগনা।

প্রিয় সম্পাদক,

যুবমানসের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ভাষণের সম্পাদিত রূপ পড়লাম। আমাদের মত গ্রামের যুবক-যুবতীরা বিধানসভায় আমাদের প্রতিনিধিরা যা বলেন, তার খুব কম অংশ জানতে পারি। বাজারী সংবাদপত্রগুলিতে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সংবাদ সামান্যই ছাপা হয়। যদি বা ছাপা হয় তা পড়ে আমরা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ মূল্যায়ন করতে পারিনা এবং সত্যি কথা বলতে কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হই।

যুবমানসের পাতায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য পড়ে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে সরকার কোন পথে চলতে চান, আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ইত্যাদি বিষয়গুলি।

এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করে 'যুবমানস' আমাদের মত গাঁয়ের মানুষদের অনেক অজানা কথাকে জানতে সাহায্য করেছেন। যুবমানসের সম্পাদকমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—কামাল আমেদ

গ্রাম—ধানারপাড়া। নদীয়া।

সহ-সম্পাদক,

যুবমানস।

আপনাদের নতুন বিভাগ 'পাঠকের ভাবনা'-র সংযোজনে উৎসাহিত হয়ে চিঠি লিখছি। আপনারা পাঠকদের 'পরামর্শ'-কে মূল্য দেন জানিয়েছেন। সেই ভরসায় আমার প্রথম পরামর্শ—যুবমানস নিয়মিতভাবে প্রকাশ করুন। মাঝে মাঝে হঠাৎ শেয়ালদা' ষ্টেশনের হকারের হাতে 'যুবমানস' দেখতে পাই। আবার অনেক সময় অনেক খোঁজাখুজি করে পাইনা। সময়মত প্রকাশ করে এবং সুষ্ঠ বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তা সাধারণের কাছে পৌঁছুতে না পারলে এর মূল্য কমে যেতে বাধ্য। অথচ পত্রিকাটির চাহিদা আছে।

জানিনা আমার পরামর্শে আপনাদের অথবা আমাদের পত্রিকা কতখানি 'প্রাণবন্ত' হয়ে উঠবে। তবে উঠুক এটা সর্বান্তকরণে চাই।

নমস্কার জানবেন।

—নিতাই বড়াল

কুশমোড়। বীরভূম

শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমণ্ডলী,

মাসিক 'যুবমানস' কাগজের আমি নিয়মিত পাঠক। তা কট্টর পাঠক হিসেবে আমার দাবী আছে। ক্রম লুপ্ত বাংলার লোকসাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর সঠিক বৈজ্ঞানিক পথে গ্রথিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আপনাদের কাগজে আমি বাংলার লোকসাহিত্যে শিশু প্রবন্ধ ছাপতে চাই। বেশ কয়েক-বছর গ্রামগঞ্জ-এ মানুষের সাথে মিশে আত্যন্তিক প্রতিকুলতার মধ্যে রাত কাটিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার আলকাপ, গ্রামের আঞ্চলিক একান্ত নিজস্ব ছড়া, গান, প্রবাদ, কবি প্রভৃতি মহামূল্যবান তথ্য দলিল সংগ্রহ করেছি। এগুলিকে সুষ্ঠভাবে প্রকাশ করার একটি বিশেষ মাধ্যম চাই। তাই আপনাদের কাছে জানালুম আমার কথা। মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে একথা ভাবতে কষ্ট হয়। আপনারা জানাবেন আপনাদের বক্তব্য। উত্তরের অপেক্ষায় থাকলুম। নমস্কার।

গৌতম ঘোষ

শক্তিগড়। বনগ্রাম। ২৪ পরগনা।

রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের প্রদর্শনী মণ্ডপে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

/২৮

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা সডাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে নেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০ %
১৫০০-এর ঊর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০ %
৫০০০-এর ঊর্ধ্বে	৪০ %

১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান।

বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বীরভূমের বোলপুর ব্লক যুব উৎসবে সাঁওতাল 'বদ্রোহের পটভূমিকায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিল্পীচক্র শাখার ব্যালে 'হুল'-এর দুটি বিশেষ মুহূর্ত।

খেলার মাঠে অসভ্যতা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী

গত ৮ই মে. ফেডারেশন কাপের ফাইন্যাল খেলাকে কেন্দ্র করে ইডেন উদ্যানে যে ধরণের ঘটনা ঘটেছে তা কলকাতার খেলার মাঠে অভাবনীয়। খেলার মাঠের বাইরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এ এক ন্যক্কারজনক উচ্ছৃঙ্খলতা। খেলার মাঠের ভেতরে খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে ঘুষি মারামারি করতে দেখা গেছে, দর্শকরা খেলার মাঠে ঢুকে পড়েছে, মাঠের ফেন্সিং লাইনের ধারে একদল লোক জটলা করেছে। এসব কিছুই কলকাতা ফুটবলের ঐতিহ্যকে নষ্ট করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিষয়টি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কঠোর মনোভাবও গ্রহণ করেছেন। গত ৯ই মে মহাকরণে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন—

ফেডারেশন কাপ ফাইন্যাল খেলার মাঠে যে সব ঘটনা ঘটেছে এই ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র-যুবকদের প্রচার আন্দোলনে নামা উচিত। ফুটবল খেলা যদিও আই. এফ. এ.'র ব্যাপার, কিন্তু খেলার মাঠের প্রতিক্রিয়া বাইরেও পড়ে বলে রাজ্য সরকারও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বড় দু'টি ক্লাবের এই যদি খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব হয়, তাহলে সেটা খুবই দুঃখজনক। অথচ আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এসব ঘটনার নিন্দা করে দু'টি বড় ক্লাবের কর্মকর্তাদের কেউ কোন বিবৃতি দেননি। যেসব খেলোয়াড় খেলার মাঠের মধ্যে অখেলোয়াড়োচিত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তাদের চিহ্নিত করা উচিত। আমাদের সময় দেখেছি খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে মারামারি হলে রেফারী তাদের মাঠ থেকে বের করে দিত।

ইডেনের মাঠের মধ্যে লাইনে এত লোক বসবে কেন? মাঠের ভেতরে যারা ঢুকবে তাদের বের করে দিতে হবে। তার জন্য গোলমাল হয়ে খেলা যদি বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যাবে। এসব কথা দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বলতে হচ্ছে।

খেলার মাঠ অসভ্যতা করার জায়গা নয়। কিছু ক্লাবের সমর্থক ব্লেড, ক্ষুর নিয়ে মাঠে ঢুকবে। এসব উচ্ছৃঙ্খলতা তো সমাজ বিরোধী কাজ। আশি হাজার দর্শক খেলা দেখতে গেলে এসব কাজ করে মাত্র হাজার দুই লোক। সাধারণ মানুষ এ জিনিষ কখনই বরদাস্ত করবেন না। ছাত্র-যুবদের এই নোংরামীর বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে।

Complimentary Copy

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
মে '৮০

প্রচ্ছদ: খালেদ চৌধুরী

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঁচিশ পয়সা

গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে আমরাও দু-হাত বাড়িয়ে বরণ করছি ঐতিহাসিক মে-দিবসকে। অহোরাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কিংবা কখনও কখনও তারও বেশি সময় ধরে শ্রমিককে খাটিয়ে তার রক্ত নিংড়ানো সম্পদে মালিকশ্রেণী মুনাফার পাহাড় তৈরী করত—আর সেই সম্পদ সৃষ্টি কর্তা শ্রমিক দু-বেলা পেট ভরে খেতে পারত না। শিক্ষা চিকিৎসার সুযোগ থেকে তারা থাকত চির বঞ্চিত। কদর্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের এই দীর্ঘ-ক্ষণ ধরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর আলোহীন, বায়ু-হীন, স্যাতস্যাতে বস্তির খুপরির মধ্যে দিনের অব-শিষ্ট সময়টুকু অর্ধমৃতের মত শ্রমিককে কাটাতে হোত। এই ছিল শ্রমিক-জীবনের রোজ নামচা। দ্রুত-লয়ে বেড়ে ওঠা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলকারখানার শ্রমিক সংগঠিত হতে থাকল এবং ব্যাপকভাবে এই অমানবিক ব্যবস্থার প্রতিবাদে গর্জে উঠল। দাবী তুলল—৮ ঘণ্টার বেশি শ্রমিককে খাটানো চলবে না। দুনিয়ার কষাইখানা হিসাবে পরিচিত মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের চিকাগো শহরের হে মার্কেটে ১৮৮৬ সালে ১লা মে শ্রমিকের ৮ ঘণ্টার কাজের দাবীতে সুশৃংখল শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে মোকাবেলা করার জন্য সর-কারের সশস্ত্র বাহিনীর বন্দুক গর্জে উঠল। ঘামে ভেজা শ্রমিকের জামা কাপড় তার ক্ষত-বিক্ষত দেহের রক্তে রাঙা হোল। শ্রমিকশ্রেণী তার জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমেরিকার ধূসর-মাটিতে রক্তের অক্ষরে শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসের এক নতুন এবং সুদূর প্রসারী তাৎপর্যময় অধ্যায় সৃষ্টি করল।

তারপর আরও গুলি চলল—আরও শ্রমিককে আত্মা-হুতি দিতে হোল—আরও রক্ত ঝরল—বিচারের নামে তামাসা করে শ্রমিক নেতাদের ফাঁসিতে ঝুলানো হোল। কিন্তু যে দুর্জয় ঝড়ের সৃষ্টি হোল তাকে আমেরিকার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা গেল না। শ্রমিক মানসিকতার ইথারের তরঙ্গে ভর করে তামাম "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও"—কার্ল মার্ক্স-এর এই আহ্বানের অন্তর্নিহিত অর্থ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করল। ১৮৯০ সালে স্থির হোল বিশ্বব্যাপী ১লা মে তারিখটি "মে-দিবস" হিসাবে পালিত হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি

দিবস হিসাবে এই দিনটিকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে পালন করা হবে।

সেই থেকে ৯০টি বৎসর ধরে পৃথিবীব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ এই ঐতিহাসিক দিনটি পালন করে আসছেন। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ভীত মালিকশ্রেণী এবং তার সেবাদাস সরকারগুলি সমস্ত প্রকার দমন-পীড়নের পথ ধরে এই 'মে-দিবসের' অনুষ্ঠানকে বন্ধ করতে সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা চালিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিক-শ্রেণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই দিনটিকে বিভিন্ন ভাবে পালন করেছেন। ফ্যাসীবাদী দস্যুদের কারাগারে বন্দী মহান জুলিয়াস ফুচীক মে-দিবস পালন করার, লাল ঝান্ডা উত্তোলন করার কোন সুযোগ না পেয়ে নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে পরনের বস্ত্র নিজের রক্তে রাঙা করে, অন্ধকার বন্দীশালায় সেই কাপড় দুহাতে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে মে-দিবস পালন করেছেন। শ্রমিক-শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, পুঁজি-বাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার সুদৃঢ় শপথ গ্রহণ করে-ছেন। মে-দিবস পালন করার এই ধরনের অগণিত গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ইতিহাসকে আরও মহীয়ান করে তুলেছে।

এবার যখন আমরা মে-দিবস পালন করছি তখন পুঁজিবাদী পথ ধরে যে সকল দেশ চলছে সেইসব দেশগুলি এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক চরম অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। কোন মতে টি'কে থাকার জন্য পুঁজিবাদীশ্রেণী এই সংকটের যাবতীয় বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে তথা সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপাবার চেষ্টায় সর্বদা ব্যস্ত থাকছে। ফলে কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লে-অফ, শ্রমিক সংকোচন নীতি অনুসরণ, শ্রমিককে দিয়ে আরও বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া, বোনাস দিতে টালবাহানা, দ্রব্য-মূল্যসূচক সংখ্যার হিসাব জালিয়াতি করে শ্রমিককে তার পাওনা মজুরী থেকে বঞ্চিত করা—ইত্যাদি ব্যবস্থা মালিকের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। অন্যদিকে অধিক মুনাফার লোভে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের দাম যথেচ্ছভাবে বাড়িয়ে তোলা, শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত কাঁচামালের দাম খুসি মত কমিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে দুঃখ কষ্টের সহ্য সীমার শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষেরাও মুখ বুজে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছেন না। তারা একদিকে যেমন পেশাগত অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকে আদায় করার জন্য আরও সংগঠিতভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন অন্যদিকে শিক্ষায় এবং অভিজ্ঞতায় আরও সমৃদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণী বেশি বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছেন যে জীবনের দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণা হতে স্থায়ীভাবে নিষ্কৃতি পেতে হলে ঘুন ধরা, পচা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তার সমাধির উপর নতুন শোষণহীন, অবিচারহীন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করতে হবে—এবং সেই কাজ সমাধা হতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণী আরও অধিক মাত্রায় অনুভব করতে পারছেন যে তার অধিকার সংগ্রাম, তার মুক্তির সংগ্রামকে যদি পরিচালিত করতে হয়—তাহলে একান্ত ভাবে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সংকট যত বাড়বে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর ধণিকশ্রেণীর, পুঁজিপতি-শ্রেণীর আক্রমণ তত প্রখর হবে, স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির মেকী গণতন্ত্র মার্কা পাতলা আবরণটুকু তত দ্রুত অপসারিত হয়ে তার বীভৎস নগ্ন মূর্তি বিকট আকারে প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির চক্রান্তকে পরাজিত ক'রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা—তাকে আরও প্রসারিত করার কাজে শ্রমিক-শ্রেণীকে অধিকতর যোগ্যতার সাথে তার ভূমিকা পালন করতে হবে। বেশি বেশি করে বিভিন্ন স্তরে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে তার এই সংগ্রামের সাথী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ এলাকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মালিক শ্রেণীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেখানকার শ্রমজীবী মানুষের কাছে 'মে-দিবস' উৎসবের আমেজ নিয়ে হাজির হয়। আরও উন্নত জীবন যাপন, আরও অবকাশ, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সমূহকে ব্যবহারিক জীবনে আরও অধিক পরিমাণে প্রয়োগ ক'রে জীবনকে আরও উপভোগ্য করে গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করাকে মে-দিবস পালন করার অঙ্গ হিসাবে তারা ব্যবহার করে। বিশ্বের বাকী অংশের শ্রমজীবী মানুষ মে-দিবসকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন হিসাবে পালন করেন। এই দিনে দাঁড়িয়ে তারা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন দেশে দেশে যুগে যুগে অসংখ্য সংগ্রামে অংশ-গ্রহণকারী অগণিত শ্রমজীবী মানুষকে। নতুন করে ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতিকে—সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের মূল লক্ষ্য অভিন্ন, আদর্শ এক, বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের মূল স্রোতধারার তারা অবিচ্ছেদ্য অংশ, মূলধন ছাড়া তাদের হারাবার কিছু নাই জয় করার জন্য আছে তামাম দুনিয়া।

[শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায়]

জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন

প্রায় এক বছর হ'ল আসাম সহ সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আন্দোলনের নামে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে করে সারা ভারতবর্ষের মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি রক্ষা করা যাবে তো?

এই সব জ্বলন্ত প্রশ্ন সামনে রেখে গত ২২শে এবং ২৩শে এপ্রিল ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক সর্বভারতীয় আলোচনা সভার মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে বর্তমানে দেশের এক গুরুতর সমস্যার সমাধানসূত্র বের করার চেষ্টা করেছেন। দু' দিন ব্যাপী এই আলোচনা সভাতে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মাদুরাই, আলিগড়, সিমলা, ভুবনেশ্বর, ত্রিপুরা, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি উপস্থিত ছিলেন হায়দ্রাবাদ, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ এবং বি. জি. ভার্গিস, রণজিৎ রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অনিল বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্ট সাংবাদিক বর্গ। এছাড়াও অন্নদাশংকর রায়, অমলেন্দু গুহর মত বুদ্ধিজীবীরা যেমন তাদের মূল্যবান মতামত রেখেছেন, অন্যদিকে জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জী, সৌরীন ভট্টাচার্য্য, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, ভোলা সেন, সত্যসাধন চক্রবর্তী, সাইফুদ্দিন চৌধুরী সহ অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাঁদের বক্তব্য রাখেন। আসামের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা হীরেন গোগোই এবং গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত থেকে বর্তমান সমস্যার পটভূমিকা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামতে আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেন।

২২শে এপ্রিল জনাকীর্ণ শতবার্ষিকী হলে আলোচনা সভার উদ্বোধন করে সুদীর্ঘ ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু বলেন—

আসামের সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। শুধু-মাত্র প্রশাসন দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। চাই রাজনৈতিক সমাধান। অবশ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং অত্যাবশ্যক পণ্য চলাচলের মত কয়েকটি বিষয়ে প্রশাসনকে কাজে লাগাতেই হবে কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানে আর গড়ি-মসি করবার সময় নেই। অনেক দেরী হয়ে গেছে। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই রাজনৈতিক সমাধানের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বারে বারে প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার কথা বলেছি। ঐ বৈঠকে যাঁরা আন্দোলন করছেন তাদেরও ডাকা হোক।

আসামের আন্দোলন জাতীয় অর্থনীতিরও যথেষ্ট ক্ষতি করছে। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যেরও অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। দু' হাজার উদ্বাস্তু পরিবার এই রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের ফিরিয়ে নেবার জন্য আমরা বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। কিন্তু কেন্দ্র এখনও কোন সাড়া দেয়নি।

আসামের ছাত্ররা আমায় তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এ এক আশ্চর্য কথা! ওরা বলবেন আসামের তেল আসামের জন্য—অথচ তার প্রতিবাদ করতে পারব না। আমরা যদি বলি পশ্চিমবাঙ্লার কয়লা, লোহা কেবল মাত্র পশ্চিমবাঙ্লার জন্য তা'হলে জাতীয় সংহতি কি করে থাকবে? আমরা ঐসব কথা বলতে পারিনা। আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। আমাদের রাজ্যে সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের শতকরা মাত্র চল্লিশ ভাগ বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের প্রীতির সম্পর্ক কখনও নষ্ট হয়নি। তারা ঐক্যবদ্ধ-ভাবে সাধারণ শত্রু—পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—এইরকম আলোচনা সভার মাধ্যমে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি এবং অগ্রগতির স্বার্থে দ্রুত আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে।

আলোচনাচক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার বলেন, আসাম সমস্যার উপর এই আলোচনা প্রমাণ করে যে এই রাজ্যের শিক্ষা জগত আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্র-দায়িকতা, প্রাদেশিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শ্রীশিবকুমার এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন—শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই ধরণের আলোচনা সভা হওয়া দরকার যাতে করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এক-যোগে এই ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে পারে।

সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবী গোবিন্দ মুখোটী বলেন—বহুভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষে আসামের মত দাবি উঠতে শুরু করলে জাতীয় ঐক্য বলে কিছু থাকবে না। দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার আছে দেশের যে কোন অঞ্চলে বসবাস করার কিন্তু আসামের বর্তমান আন্দোলন নাগরিকদের এই অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে হবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক বি. জি. ভার্গিস বলেন যে, আসামের বিদেশী নাগরিক সংক্রান্ত প্রশ্নটিই বিভ্রান্তিকর। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই বিভ্রান্তি দূর করে একটা সুষ্ঠু সমাধানে আসতে হবে।

অপর এক সাংবাদিক রণজিৎ রায় বলেন, নাগরিক প্রশ্নে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি এবং ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে

আসামের বর্তমান আন্দোলন অত্যন্ত অন্যায্য। কেন্দ্রীয় সরকারকে ঐ দুই চুক্তিকে সামনে রেখে সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে।

আসামের ছাত্রনেতা হীরেন গোগই বলেন—আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। আসামের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করতে চলেছে তখন মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার কৌশল হিসাবে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আজকে তা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদেশী শক্তি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষদের উপর আক্রমণ হচ্ছে সেখানে। কিন্তু শত আক্রমণ অপপ্রচার সত্ত্বেও আসামের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. পি. দেশপান্ডে বলেন—এই আন্দোলন হিংসাত্মক, ভ্রাতৃঘাতী। এ এক বিপজ্জনক বৈশিষ্ট। ভারতের ঐক্য, সংহতির প্রতি এই আন্দোলন চরম আঘাত স্বরূপ।

পশ্চিমবঙ্গ আর্স কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী তাঁর ভাষণে বলেন—আমাদের এই সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস আসামে বিদেশী ভোটারের ধুয়া তুলে মঙ্গলদইতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করে। পরে তার পেছনে বিদেশী শক্তি যোগ দেয়। এই আন্দোলনের পেছনে সিয়া টাকা ঢালছে। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের হাত আছে এই আন্দোলনের পেছনে। নাগরিক প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা করে প্রকৃত সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে জাতীয় স্তরে একটি কমিটি গঠন করা দরকার। তাতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিতে হবে। তারা গোটা ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে পার্লামেন্টের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করবেন। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনার শুরুতেই বলতে ওঠেন গোহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন। তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যের মধ্যে আসামের সমাজ-অর্থনৈতিক অবস্থার অতীত এবং বর্তমান পটভূমি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন আসামে বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বলতার জন্যই এই রকম উগ্র প্রাদেশিকতার নীতিতে পরিচালিত আন্দোলন দানা বাঁধতে পেরেছে। এই আন্দোলন বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। তিনি তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে আসামে বহিরাগতদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে একথা ঠিক নয়। আসামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। অসমীয়া ভাষাও অত্যন্ত উন্নত। কিন্তু অসমীয়াদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বহিরাগতরা নষ্ট করে দেবে, এই আশংকা অমূলক। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যেও অন্য রাজ্যের লোকেরা বাস করছে। আসলে গোটা দেশ জুড়ে যে অনগ্রসরতা তাকে দূর করতে আন্দোলন করতে হবে এবং তা হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। কোন একটি রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সে আন্দোলন চলতে পারে না। কিন্তু আসামে তা না হয়ে আন্দোলনকারীরা সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। বামপন্থী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে। জ্যোতি বসুর কুশপুত্তলিকা পোড়াচ্ছে। আর এসবে মদত দিচ্ছে সেখানকার একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী। এই রকম একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও আসামের বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি উগ্রজাতীয়তাবাদ, প্রাদেশিকতা এবং আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

দুদিনের আলোচনা সভাতে মোট প্রায় চল্লিশ জন বক্তা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের বক্তব্য থেকে যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে তা হ'ল—আসাম সমস্যাকে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করতে হবে। বিদেশী প্রশ্নে একাত্তর সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নেহরু-লিয়াকত এবং ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সারা ভারতবর্ষব্যাপী গড়ে তুলতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সেমিনার কমিটির তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র মুখার্জী আলোচনা সভাতে 'আসাম সমস্যা ও জাতীয় সংহতি' শীর্ষক একটি কার্যকরী দলিল উপস্থাপিত করেন।

সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসামের শিল্পীদের পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠানকে সমবেত শ্রোতৃমন্ডলী বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

[সম্পাদকীয় : ২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তাই মে-দিবসের অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় সমস্ত স্তরের লড়াকু সাধারণ মানুষ। যে দেশে ক্রমবর্ধমান বিভীষিকাময় বেকারীর তীব্র দংশনে যুব জীবন নষ্ট হতে থাকে, যেখানে সৃজনশীল শক্তিমান যুব সমাজের এক বিরাট অংশের কাছে জীবনটা এক দুর্বিসহ বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়, যে দেশের যুব শক্তির প্রতিভার যথোপযুক্ত স্ফুরণের সুযোগ অকল্পনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ—সেখানে মে-দিবস যুব-সম্প্রদায়কে হাতছানি দিয়ে জীবন-সংগ্রামের সমাধানের সঠিক পথে আহ্বান করে। সেই জন্য বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও মে-দিবসকে স্বাগত জানাই, বরণডালা সাজিয়ে আমরাও মে-দিবসকে বন্দনা করি। সু-স্বাগতম মে-দিবস। জয়তু মে-দিবস।

রবীন্দ্রনাথ : বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে একটি সূর্যপ্রতিম দৃষ্টান্ত। উজ্জ্বলতম-জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাব-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—সারা দেশে তখন জাতীয়তার নামে প্রবল প্রাচ্যাভিমান বা হিন্দু-ঐতিহ্যের পুনরুত্থানপর্ব। রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনে মেতেছেন। কিন্তু এ সর্বনাশা সংকীর্ণ ঝোঁক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাই অগ্রজদের উদ্দেশে বললেন :

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অন্য চেহারা। তিনি পুরোমাত্রায় চারণ। স্বদেশী গানে, প্রবন্ধে ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে মগ্ন, অধিকতর ব্যস্ত। 'এবার ফিরাও মোরে' কেবল কবির নয়, স্বদেশী যুগের ভারতবর্ষের প্রার্থনা। পর-পর স্বদেশে বিদেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে। কবিতা রচনার পক্ষে সে-সব খবর জানা এবং সেগুলির তাৎপর্য বুঝে উদ্দীপিত হওয়া মোটেই অপরিহার্য ছিলনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের কবি। যেখানেই সংকীর্ণতা, প্রবলের অত্যাচার, ন্যাশনালিজমের নামে বর্বরতা, বর্ণ-বৈষম্য জাতিবৈষম্য এবং পরস্পর হানাহানি সেখানেই কবির প্রতিবাদী কণ্ঠ মুখর।

বালগঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ড, সাম্রাজ্যবাদী দমননীতি, কার্জনের শিক্ষাসংকোচ, বঙ্গভঙ্গ, ভাষা-বিচ্ছেদ পরিকল্পনা, আফ্রিকায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা, বুয়র যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ রবীন্দ্রব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' রাজনীতির দ্বিধা অপমানের প্রতিকার সমস্যা প্রভৃতি প্রবন্ধে মনীষী রবীন্দ্রনাথকে সমকালের সংকীর্ণতা থেকে আশ্চর্য রকম মুক্ত থাকতে দেখি। স্বদেশী সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে তিনি হিন্দু-ঐতিহ্যবাদের দ্বারা অংশত প্রভাবিত হলেও প্রধান ঝোঁকটা ছিল দেশের শতকরা নব্বইজনের পক্ষে। স্বদেশীসমাজ পল্লীসমাজ পল্লীপ্রকৃতি এবং সংস্কার সমিতির গঠনতন্ত্র ও সংকল্পবাক্য রচনা কেবল দেশকর্মী রবীন্দ্রনাথের কাজ নয়। তিনি বস্তুত স্বদেশ-সাধনার এই পর্বে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। কিন্তু তখনও তিনি একাধারে বাঙালীর কবি, ভারতের কবি এবং কবি-সার্বভৌম। অখণ্ড বাংলা ও ভারতের সব সামাজিক অসাম্য ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বারবার সরব প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, কৃষকবিদ্রোহ, মোপলাবিদ্রোহ, অসহযোগ, বয়কট-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আশ্চর্য-রকম প্রগতিশীল। তাঁর দৃষ্টি যে কত দূরপ্রসারী তার কয়েকটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্বদেশী যুগের ভাবপ্লাবনের মধ্যেও ইংরেজীয়ানা অনেকখানি ছিল। তাই কবিকণ্ঠে ধিক্কার শোনা যায়ঃ 'দুঃসাধ্য, তবু মনের আক্ষেপ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। ......ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব।' 'সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব।'

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তাঁর সায় ছিল। বস্তুত অসহযোগের মধ্যে যে 'আত্মনির্মাণ' 'জাতি-নির্মাণ' এবং স্বদেশী শিক্ষার ভিত্তিনির্মাণের মহতী সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন, তাকেই সর্বশক্তি দিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। 'উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিষ্কৃতি পাইনি'—এ উক্তি ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত। এসব কথা কম-বেশী পরিচিত। কিন্তু কেন তিনি এই অসহযোগের উত্তেজনার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন, সেটিই আমাদের আলোচ্য। অনেকের মতে, কবির সৃষ্টি-কল্পনা কর্মযজ্ঞের তাড়নায় ব্যাহত হচ্ছিল বলেই আপন কবিধর্মের তাগিদে জনারণ্য থেকে 'বিদায়' নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনের 'নীল-নির্জনে' ফিরে গেছেন। কিন্তু আসল কথা অন্য। বয়কটের নামে জবরদস্তি, বোম্বাই-আমেদাবাদের কোটিপতিদের স্বার্থরক্ষা, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান ও বিরোধ বৃদ্ধি তাঁকে পীড়িত করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মনের পাত্রে বরাবর ঢালতে চেষ্টা করেছে। সে তার শ্রেণীস্বার্থে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যেই কোথাও একটা প্রস্তুতি ছিল। নইলে এত তাড়াতাড়ি এত বেশি রক্তপাত হতনা। ইংরেজী শিক্ষিত কয়েকজন এবং দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে গভীর বিচ্ছেদ, হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যে বিভেদ—এ সবই আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষিত Elit গোষ্ঠী এবিষয়ে অবহিতও ছিলনা। তাই তাঁর ধারণা যথার্থঃ 'বিলাতীদ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এত বড় অহিত আর কিছু নাই।'

পূর্বে আমরা যে তিনটি সমাজের কথা বলেছি, সেগুলির গঠনতন্ত্র থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে কবির সতর্ক চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

(১) স্বদেশী সমাজ

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনপ্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গভর্নমেন্টের স্মরণাপন্ন হইব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরাজীতে পত্র লিখিবনা।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজীখানা, ইংরেজী সাজ, ইংরেজী বাদ্য, মদ্য সেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাংলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি, ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজনির্দিষ্ট বিচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

(২) পল্লীসমাজ

১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।

২। সর্বপ্রকার গ্রাম্যবিবাদ-বিসম্বাদ সালিশের দ্বারা মীমাংসা।

৩। স্বদেশ শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।

৪। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যক মতো নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫। বিজ্ঞান ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্বধর্মের সার-নীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি ধর্মভাব একতা স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গো-মহিষাদির পালন দ্বারা জীবিকা-উপার্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

৯। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন।

১০। পল্লীর তত্ত্বসংগ্রহঃ অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি-অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর) ওলাউঠা, বসন্ত, অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪। জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন ও ঐক্যসংবর্ধন।

(৩) সংস্কার সমিতি ১৯৩১

আমরা চাই

বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশ পরাভবের পথে চলিয়াছে। আমাদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে উপেক্ষা ও অসম্মান এই সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ। এইজন্যই মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুপণ করিয়া তপস্যায় বসিয়াছেন। সমস্ত

দেশবাসীরও প্রাণপণ করিয়া এই অপরাধ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

এখন অবিলম্বে আমাদের এই কয়েকটি ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভা সমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবেনা।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিতে দিবনা।

আমাদের কাজ

হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করা, দুর্গতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পরস্পর শ্রদ্ধা দ্বারা সর্বশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে সত্য করা, জনসাধারণের মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মশক্তি উদ্বোধন করার উদ্দেশে বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগের ভিতর দিয়া বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে।......এখন হইতে...বিশ্বভারতীতে সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল।

সংস্কার সমিতির কার্যধারা মোটামুটি এইরূপ

১। পল্লীসেবা

(ক) কেন্দ্রীয়সভার অধীনে সুবিধামতো অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

(খ) ঐ শাখাকেন্দ্র হইতে পারিপার্শ্বিক গ্রামসমূহে সংস্কার সমিতি গড়া এবং তাহার অধীনে হরিসভা স্থাপন করিয়া তাহাতে সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে কীর্তন, পাঠ, কথকতা এবং সংবাদপত্র হইতে দেশের ও তৎপ্রসঙ্গে নিজ গ্রামের অবস্থা পর্যালোচনা। দুর্গতদের ঘনিষ্ঠ সহযোগে, তাহাদেরই সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, গ্রামে দিবা ও নৈশবিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, স্বাস্থ্য ও সেবা-সমিতি, ব্রতীদল, সালিশী-পঞ্চায়েৎ, সমবায় সমিতি পরিচালনা, মুষ্টিভিক্ষাসংগ্রহ, আবাস পরিষ্করণ এবং রাস্তাঘাট সংস্কার।

২। আবাসিক শিক্ষা

বিনা দক্ষিণায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে দুর্গতদের ছেলে রাখিয়া অন্যান্য ছাত্রদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্য হইতেই সমিতির ভাবী কর্মী ও কেন্দ্র-পরিচালক তৈরি করা।

৩। ব্যাপকভাবের প্রচার এবং সংঘ-সংগঠন

প্রচারকার্যের পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে সংস্কার সমিতির শাখা স্থাপন। তদ্দ্বারা স্থায়ীভাবে অস্পৃশ্যতা-পরিহার ও শিক্ষার প্রসারে দুর্গতদের সামাজিক অধিকার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। দুর্গতদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় উন্নতির পথে যে-সকল অন্তরায় আছে, তাহার প্রতিকার।

আমরা দেশবাসীদিগকে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য দেশের সর্বত্র এইরূপ স্থায়ী কাজের অনুষ্ঠান গড়িতে আহ্বান করিতেছি।...

এই সংস্কার সমিতি বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় কবির স্বাক্ষরিত আবেদন (১৫ই অঘ্রাণ ১৩৩৯, ১লা ডিসেম্বর ১৯৩২) 'Mahatmaji and the Depressed Humanity' শীর্ষক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল—'Proceeds from the sale of this book will go to the সংস্কার সমিতি, বিশ্বভারতী, for helping in its work of removing untouchability' অস্পৃশ্যতা, হরিজনদের ওপর অত্যাচার, গান্ধীর অনশন সম্পর্কে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ পত্রালাপ এই পুস্তিকার বিষয়। বলা বাহুল্য, অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে গান্ধী-পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর অচিরেই মতান্তর ঘটেছিল। চরকার ওপর অতিমাত্রায় জোর দিলে যদি গান্ধী-অনুমিত ৫০,০০০ টাকার সাশ্রয়ও হয়, তাতেও কৃষকের অধিকারের সীমা বাড়ছে না, তার সীমাহীন দারিদ্র্য ও সামাজিক নিপীড়নও দূর হচ্ছে না। প্রতি বছর কয়েকদিন ভাঙ্গি-কলোনিতে বাস করলেই সমস্যার সমাধান হয়না। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব, কৃষিজীবী জনগণ ও বুদ্ধিজীবী মানুষের মানসিক বিচ্ছেদের সমস্যাকে প্রায়-আধুনিক সমাজবিদের দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর পরিকল্পনাগুলিও অনেকাংশে 'ইউটোপিয়ান'। তবু তিনি সমস্যার গভীরে পৌঁচেছিলেন। অতদূর আর কোন দেশনেতার দৃষ্টি পড়েনি। যৌথখামার, ধর্মগোলা, দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট নিবারণ, মহামারী প্রতিষেধ, সমবায় ব্যাংক ও সমবায় সমিতি, বৃত্তিশিক্ষার দ্বারা যথার্থ আধুনিক সমাজকল্যাণ পদ্ধতিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কীর্তন, পাঠ এবং কথকতার সঙ্গে প্রাচীন সমাজের পুনরুত্থানের যোগ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা এবং পল্লীসমাজ-উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে এগুলিকে মিলিয়ে দেখতে হবে। পাঠ ও কথকতা লোকশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। নৈশ ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের পক্ষেও কার্যকর। লক্ষণীয় যে, সমবায়ের দ্বারা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা লাহোর কংগ্রেসের নেতারা ভাবতে পারেননি। 'কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিবনা বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না।'—এই কথায় আন্তরিক বিশ্বাস এখনো অনর্জিত।

সংস্কার সমিতির গঠনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের শুচি, স্নান-সমাপন, প্রেমের সোনা রং রেজিনী, প্রথম পূজা বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। কবিতাগুলি পরিচিত, তাই এখানে উদ্ধৃতি বর্জন করা হল। কিন্তু কী প্রবল গণমুখী মানবপ্রেম সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

'একজন লোক' কবিতার অংশ উদ্ধার করা হল।

আধ বুড়ো হিন্দুস্থানি
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ,
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে শহরের দিকে।

সেও আমার গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ
সেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো
যেখানে আমি—একজন লোক।

একই দেশে একই সমাজের দুই শ্রেণী, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। আমদানীকরা শিক্ষার এমনই প্রভাব। এই এলিটীয় জীবন এবং অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলেছে। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে 'অস্থানে' বা 'একজন লোক' বিখ্যাত উপলখণ্ড নয়; কিন্তু নতুন মূল্যবোধের বিশিষ্ট নিদর্শন।

এইসব বিভেদ, বিচ্ছেদ থেকে মুক্তির জন্য কবি ডাক দিয়েছিলেন যুবসমাজকে।

'আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েছে। তাই অবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্রয়ের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গড়ে তুলি, তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আমাদের শুভ চেষ্টাও খণ্ড খণ্ড হয়ে দেশকে আহত করছে।

'এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তার নিঃশ্বাস রোধ করতে প্রবৃত্ত, এ-পাপ প্রাচীন যুগের, এই অন্ধ বার্ধক্য যাবার সময় হল। তার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জ্বালিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দুঃখই পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হয়ে যাক নিঃশেষে ভস্মসাৎ।

'আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক তরুণদের নব জীবনের মধ্যে। আচারভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হয়ে তারা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক। যে-দুর্বল সেই ক্ষমা করতে পারেনা, তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত করে দিক, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সার্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।'

বিষ্ণুপুর ১নং ব্লক যুব উৎসবে পুরুষদের উচ্চ-লম্ফন প্রতিযোগিতায় লম্ফনরত জনৈক প্রতিযোগী।

গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রচার ও অপপ্রচার

নবীন পাঠক

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা হয়ে উঠেছে, এটা খুবই বিপজ্জনক। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রচারাভিযানে নেমেছে, তাকে সিদ্ধ করতে গিয়ে ভারতের কয়েকটি সংবাদপত্র ও স্বার্থান্বেষী মহলও উঠে পড়ে লেগেছে। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল কমিউনিস্টরা বলেই বিষয়টি বিপজ্জনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারকের ভূমিকায় নেমে তিরিশে মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে এমন পর্যন্ত লিখেছে, বামফ্রন্ট সরকারকে যদি কেন্দ্র যে কোন অজুহাতে ভেঙে দেয়, সেটা হবে গণতান্ত্রিক। সরকার ভেঙে দিতে না পারাটাই অগণতান্ত্রিক। একমাত্র জঙ্গীশাহী ও কমিউনিস্ট শাসনে নাকি সরকার ভাঙা যায় না, কাজেই কমিউনিস্টরা অগণতান্ত্রিক। গণতন্ত্রের এধরণের সংজ্ঞা মার্কিন প্রচারেরই অংশ। সুকৌশলে তা ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে।

বাস্তব জীবনের ঘটনাপ্রবাহে এ প্রশ্নের আজ সন্দেহাতীতভাবে উত্তর মিলে গেছে যে, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ এই দুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি জনগণের সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। পুঁজিবাদের প্রচারকরা মনে করছে, সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করতে গেলে আধুনিক যুগে মানবাধিকারের কথা বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে তারা পুঁজিবাদ সম্পর্কে একটা তাত্ত্বিক প্রহেলিকা তৈরি করে এবং গণতন্ত্র মানবিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করে। এর জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। গণতন্ত্রের সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে এই প্রচারকরা কোন উচ্চবাচ্য করে না। ওখানেই যে তাদের বিপদ।

একসময় যখন সামন্তশোষণ ছাড়া আর কিছু ছিল না, তখন ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার নামোচ্চারণ করা অসম্ভব ছিল। যে দাসত্বের সর্তই জমিদার সামন্ত প্রভু ও রাজা মহারাজারা দিক না কেন, সেটা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেওয়া সাধারণ মানুষ, দাস কিংবা কৃষকদের পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক। যখন শিল্পায়নের যুগ শুরু হল, তখন বড় বড় শিল্পপতিরা আরেক ধরণের শোষণ সৃষ্টি করল। সামন্ত প্রভুদের সাথে শিল্পপতিদের বিরাট বিরোধ বাধে। শিল্পপতিরা তখন সেই অর্থে প্রগতিশীল। কারণ শিল্পপতিরা বলল, অন্যায় হলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করা যাবে; আইন আদালত, ভোট সব থাকবে। এরই নাম দেওয়া হল গণতন্ত্র। এভাবে শিল্পপতিদের স্বাধীনতা অর্থাৎ শোষণ নিপীড়ণ চালাবার স্বাধীনতাকে যখন আইনসিদ্ধ, সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করা হল, তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার ফাঁকা আওয়াজের তীব্রতা বেড়ে যায়। নিপুণভাবে গোটা সমাজের ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি যার থেকে এক্ষেত্রে লাভবান গোটাকতক বড়লোক এবং সর্বনাশ সমাজের বাকি গোটা অংশের মানুষের। এই অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য যাতে শোষিত মানুষকে সমাজের এইসব শোষণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে না পারে তার জন্য গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা মানবাধিকার ইত্যাদি আওড়ানো হয়। যেমন শিশুর কান্নাকে রোধ করতে চকোলেট দেওয়া হয়। গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে মানুষ তার অসারত্ব বুঝে সত্যিই যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে আছে আইন, আদালত পুলিস মিলিটারী, ঠ্যাঙারে বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র। এই শিল্পপতি বড়লোকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য থাকে রাজনৈতিক দল। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম যুগে সমান ভোটাধিকার ছিল না। রাষ্ট্রশাসকদের হাতে ছিল সবকিছু। গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন বিস্তৃতির সাথে সাথে অধিকারও সম্প্রসারিত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে বা না-থেকে শিল্পপতিদের অর্থ ও ক্ষমতায় বলীয়ান রাজনৈতিক দলেরও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিপথগামী করতে। এসবের মধ্যে দাঁড়িয়েও যখন গণতান্ত্রিক উপায়েই জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বকারী দল বা গোষ্ঠী শত্রুদের কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়, তখনই 'গণতন্ত্রপ্রেমী' শাসকদের দল হয়ে ওঠে জঙ্গী। গণতন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় অথৈ জলে। সুদীর্ঘ মানব ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে উপরোক্ত কথাগুলি জাগতিক সূত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঘটনাবলীকে এইভাবে দেখার মত চেতনার যথেষ্ট অভাব থেকে যাওয়ায় এখনও বড়লোকদের দলগুলি মানুষকে বিপথগামী করতে পারে। মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে, গণতন্ত্রের মূল্য সম্পর্কে তার চেতনা জাগ্রত হলে গণতন্ত্রের শত্রুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বড়লোকদের দেওয়া গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করার সার্থকতা এখানেই।

প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই। প্রচারের উদ্যোক্তা আগেই বলেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং তাদের সম-মনোভাবাপন্ন ধনতান্ত্রিক দেশগুলি। ভারতের মত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের শত্রুরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই প্রচার প্রতিনিয়ত চালায়। চরণ সিং, মোরারজী দেশাই বা ইন্দিরা গান্ধী সবারই এক রা'। জনগণের এক বিরাট অংশের মধ্যেও এ নিয়ে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পেরেছে। আমাদের দেশে একদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড়, অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর। কোটি কোটি মানুষকে শোষণে সর্বস্বান্ত করেই বড়লোকদের এত সম্পত্তি। সমস্ত অন্যায়ভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে পুঁজিপতি পরিবারগুলি মানুষের ওপর শোষণ নির্যাতন চালায়, মানুষ তার প্রতিবাদ জানায়। দিল্লির সর্বশক্তিমান সরকার বড়লোকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে কাজ করে। এরকম একটা পরিবেশে যুগ যুগ ধরে পুষ্ট যে কোন মানুষের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক পরিবেশের কথা বাস্তবে উপলব্ধি করা সত্যিই কঠিন। আমাদের দেশে যে অর্থে গণতন্ত্র এত প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই অর্থে সেই ধরণের গণতন্ত্রের কোন প্রয়োজনই নেই। সাধারণ মানুষ তার তাগিদ-বোধ করে না। কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে বড়লোক গরিব বলে কিছু থাকছে না, একজন অপরকে শোষণও করতে পারে না। সমস্ত রকম শোষণ ব্যবস্থার বিলোপ করেই যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়। যে দেশে বেকারী নেই, সেখানে বেকার যুবকদের কাজের অধিকারের

জন্য আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকারদানের প্রশ্নই ওঠে না। ভাত কাপড়ের সমস্যা যে দেশে নেই, সে দেশে ভাত কাপড়ের জন্য আন্দোলন করার গণতন্ত্রেরও প্রয়োজন কি? মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির যেখানে সমাধান হয়নি, গণতন্ত্র দরকার সেইসব ধনতান্ত্রিক দেশেই, যে অর্থে অন্ততঃ এখন আমরা গণতন্ত্রের প্রয়োজনটা উপলব্ধি করি। গণতন্ত্র যে কারণে দরকার, সেই কারণগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশে দূর হয়ে যায়। উপরন্তু সত্যিকারের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপ সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব। সেই গণতন্ত্রের নাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। ভারতের মত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিদ্যমান গণতন্ত্রের নাম বুর্জোয়া গণতন্ত্র। এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থ,—শোষণ নিপীড়ণ অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের সভা, সমাবেশ, সংগঠন করার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু এটুকু গণতন্ত্রও শাসকদের পক্ষে একসময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তখন শাসকরা সেই গণতন্ত্রও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জঙ্গী হয়ে ওঠে। যেমন শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থার সময় জঙ্গী শাসন কায়েম করেছিল, যেমন পাকিস্তানে বাংলাদেশে ও বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে জঙ্গী ও সামরিক শাসকরা শাসন করছে। এই জঙ্গী শাসনের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অনুযায়ী শাসনপদ্ধতির যে কোন সমালোচনা যে কোন লোকই করতে পারে। সংবিধানে সেই অধিকার সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে। বড়লোক-গরিব না থাকায় সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার সমস্ত জনগণেরই সরকার। কাজেই ধনতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশের সাংবিধানিক অধিকার কথার ফুলঝুরিও নয়, ফাঁকা আওয়াজও নয়। কিন্তু যারা এই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমালোচক, তারা ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিবেশে মানুষ হয়ে তার চৌহদ্দির বাইরে কোনকিছু চিন্তা করতে শেখেনি। সেজন্য তারা ভাবে, সমাজতান্ত্রিক দেশে যখন প্রতিবাদ ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং, ট্রেন আটকানো, বাস পোড়ানো ইত্যাদি হয় না; পুলিস লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস চালায় না, মিথ্যা মামলায় পুলিস প্রতিবাদী মানুষ ও সমালোচকদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় না, সেটা আবার গণতন্ত্র হল কি করে? তাদের কাছে গণতন্ত্রের অর্থ, খুনোখুনি মারামারি তুলকালাম কান্ড। তারপর অনেক হেস্তনেস্ত করে বড়জোর বিচারবিভাগীয় তদন্ত। অপরাধীরা তাকে হেসেই উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা ভাবতেও পারে না, ধনতান্ত্রিক দেশের মত সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনকর্তারা জনগণের শত্রু নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে জনগণের বক্তব্য, সমালোচনা ও পরামর্শ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার গ্রহণ করে। সেজন্যই সেখানে তুলকালাম কান্ড করার কথা মানুষের চিন্তার মধ্যেই নেই। এই বুর্জোয়া প্রচারকরা ভাবে, গভর্নমেন্ট মানে এমন একটা বস্তু যা জনগণকে পিষে মারে, প্রতিবাদ করলে জনগণের বিরুদ্ধে পুলিস লেলিয়ে দেয়। গভর্নমেন্ট মানে জনগণ যা চাইবে, তার বিরুদ্ধে দমনপীড়নমূলক কাজ করা। সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকার যেহেতু জনগণের বক্তব্য ও সমালোচনাকে মর্যাদার সাথে গ্রহণ করে এবং সেজন্য যখন কোন সংঘর্ষ হয় না, তখন সেই সরকার সরকারই নয়। এই ধ্যান ধারণা নিয়েই তারা সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই বলে প্রচার করে। অথচ জনগণের সমালোচনা ও পরামর্শের মর্যাদা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশে দেওয়া হয় বলে গণতন্ত্র সেখানে বিকশিত হয়, গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপের বিকাশ ঘটে। জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত হয় একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই। সেখানে এই অধিকার হরণের কোন ভয় বা আশংকা নেই। সেজন্য সেখানে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-ও করতে হয় না, দিবারাত্র গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে বুকফাটা চিৎকারও করতে হয় না।

গণতন্ত্রের আর একটি মূল্যবান দিক হ'ল বিরোধীপক্ষ নাকি থাকতেই হবে। কিন্তু সে তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রে প্রয়োজন, যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভারতের মত যেখানে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আবরণ রয়েছে, সেই দেশে মানুষের খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই, জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে, কোটি কোটি মানুষ বেকার, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই সেখানে মানুষের শত সহস্র দাবি। সমস্যা জীবন-মরণের। মানুষের দাবি ন্যূনতম, যেটুকু পেলে সে জীবন-ধারণটুকু করতে পারে। এই কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদকে ভাষা দিতে তাদের সংগঠন চাই, সংগঠন চাই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে। তা না হয় মানুষ অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন থাকলে তার ওপর কেন্দ্রের পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের সীমা পরিসীমা থাকে না। এই সংগঠনগুলিই হল বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিরোধীপক্ষের এই ভূমিকা পালনের অবকাশ সমাজতান্ত্রিক দেশে কোথায়? ওখানে চাকরি দাও—এই দাবিতে ক্ষোভ বিক্ষোভই নেই। খেতে দাও পরতে দাও রেশন দাও—এসব দাবি করার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই যে বিরোধীপক্ষ ভারতে, ব্রিটেনে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দরকার, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই বিরোধীপক্ষের প্রয়োজন কোথায়? কেন বিরোধীপক্ষ? কিসের বিরোধিতা করবে? বিরোধীপক্ষের কাজ কী হবে? সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার ভুলপথে চললে তাকে শোধরানো? সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারের ভুলপথে চলার অর্থ তো এই নয় যে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সমস্যা সৃষ্টি হবে? ছোটখাট ত্রুটি বিচ্যুতি যদি সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত করার পথে হয়েই থাকে, তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ লক্ষ সদস্য সমালোচনা আত্মসমালোচনা করে। এই লক্ষ লক্ষ সদস্য পার্টির ভেতরে যা কিছু বলবে, সেটা জনগণের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে জনগণের বিভিন্ন অংশের বক্তব্যই তুলে ধরে। তার বাইরে যে জনগণ রয়েছে, তাদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তার জন্য রয়েছে সরকারী-বেসরকারী অসংখ্য নির্বাচিত গণসংগঠন। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত হ'ল, শ্রমজীবী মানুষের ডেপুটিদের সোভিয়েত। এই সোভিয়েতগুলি গণসংস্থা। সাধারণ মানুষরা এদের নির্বাচিত করেন এবং সাধারণ মানুষের কথামতই তা চলে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রাম সোভিয়েত থেকে সুপ্রিম সোভিয়েত পর্যন্ত নির্বাচিত বিশ লক্ষ প্রতিনিধি বা ডেপুটি সরকার চালায়। এর সাথে রয়েছে ২৫ লক্ষ সক্রিয় সোভিয়েত কর্মী। কাজেই জনগণের বক্তব্যকে এভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলেই ক্ষোভ বিক্ষোভ আন্দোলন করতে হয় না জনগণকে। এই কারণেই বিরোধীপক্ষ গঠনের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, মানুষের বিক্ষোভ থেকে

যায়, তাঁরা আন্দোলন করতে চান, তাহলে ঘটা করে বিরোধী রাজনৈতিক দল করার প্রয়োজন হয় না, আপনা থেকেই বিরোধীপক্ষ গড়ে উঠতে বাধ্য এবং সেটা জাগতিক নিয়মেই হবে। সোভিয়েতে বিপ্লবের পর গত তেষট্টি বছরের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে এটা বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক। অন্যদিকে জঙ্গী শাসনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় মানুষের ক্ষোভ থাকলে কী করে তা বিস্ফারিত হয়। পৃথিবীর বর্তমান ও অতীত ইতিহাসে জঙ্গী শাসনের উত্থান-পতনের অজস্র ঘটনার মধ্যে কোথাও একটি ঘটনাও পাওয়া যাবে না যেখানে জঙ্গীশাহী মানুষের বিদ্রোহের চাপে পর্যুদস্ত হয়নি। স্পেনে একনায়কতন্ত্রী জঙ্গীশাসক ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে চল্লিশ বছর ধরে মানুষ লড়াই করে গেছে, অভ্যুত্থানে সফল হতে চল্লিশ বছর সময় লেগেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে সমালোচনা ও বিতর্ক যা কিছু হয়, সেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজকে প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত। কাজেই প্রতিবাদের ধরণ জঙ্গীশাহী ও সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। সমাজতান্ত্রিক সমাজ উৎখাত করে ধনতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের কথা গোটা জনসংখ্যার কেউ বলেন না। সলঝেনিৎসিন প্রমুখদের আলাদা ব্যাপার। এদের আগেই তাড়ানো হল না কেন বুঝি না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথাই গোটা অংশের মানুষ বলে, ভারতে সেই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। গণতন্ত্র যেখানে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত, সেখানে বুর্জোয়া প্রচারকরা জঙ্গীশাহী ও কমিউনিস্ট সমাজকে এক করে দেখার জন্য মানুষকে শিক্ষা দেয়। অথচ এই প্রচারকরাই চীন সোভিয়েতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলে, সেখানে ভাত কাপড় বা মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের কোন সমস্যাই নেই। ফ্যাসিস্ট হিটলারও বলতো সমাজতন্ত্রের কথা, যার নাম দিয়েছিল জাতীয় সমাজতন্ত্র। ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজী দেশাইদের মতো বুর্জোয়া শাসকরাও সমাজতন্ত্র গঠনের কথা বলে। কারণ সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এমন এক আস্থা গেঁথে দিয়েছে যে, সমাজতন্ত্রের কথা না বললে মানুষ আর কাউকে বিশ্বাস করছে না। এটা সমাজতন্ত্রেরই জয়ের একটা পরিচয়। কিন্তু গণতন্ত্রের নাম করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের এই শত্রুরা যে আক্রমণ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামকে তীব্রতর করা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিটি কর্মীরই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

গণতন্ত্র শব্দটির চেয়ে এত বেশি বলাৎকার অন্য কোন শব্দের ওপর হয় না। গ্রীক শব্দ "demoskratos" শব্দ থেকে Democracy কথাটা এসেছে। "demos" মানে জনগণ এবং "kratos" মানে শাসন। অর্থাৎ গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের শাসন। কিন্তু কল-কারখানা, জমি সম্পত্তি বাড়ি যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে থাকে এবং তারা যদি অবাধে কোটি কোটি মানুষকে শোষণ করে, তাহলে তাকে কি জনগণের শাসন বলা যায়? বুর্জোয়া শাসকরা শুধু মুখের কথায় বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা বলে। অথচ এরাই সেসবের হন্তা। সমাজতান্ত্রিক দেশে এসব স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়। সংবাদপত্রগুলি আমাদের দেশে কোটিপতিদের মালিকানায় রয়েছে। কাজেই পুঁজিপতিদের প্রচারটাই এসব সংবাদপত্রের মূলধন। রেডিওতে প্রচার হয় কেন্দ্রের জনবিরোধী সরকারের হুকুমে। জনগণের কথা তাতে স্থান পায় না। গণতন্ত্রের পালিস রাখতে শতকরা পাঁচ সাত ভাগ জায়গা বিরোধীদের জন্য দেওয়া হয়। ঘুষে বিচারকদের রায় পর্যন্ত পাল্টে যায়। জনগণ বিচার কোথায় পাবে? এটা গোপন রাখার কিছু নেই যে, সমাজ-তান্ত্রিক দেশের প্রচার মাধ্যমে বুর্জোয়া ভাবধারা প্রচার করতে দেওয়া হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের পর দাবি উঠেছিল, জারপন্থী, রাজপন্থী, নৈরাজ্যপন্থীদের বক্তব্য প্রচার করতে দিতে হবে। লেনিন তখন বলেছিলেন, আমরা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীতেই এই প্রশ্নটাকে দেখি। কাজেই প্রচারযন্ত্রে এমন কিছু প্রচার করতে দেওয়া হবে না যা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা করবে এবং ধনতন্ত্রের জয়গান গাইবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের চেয়ে সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধনতান্ত্রিক সমাজ ভাল—এই জনবিরোধী প্রচার করতে দিলেই বুর্জোয়া প্রচারকদের কাছে "গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা" রক্ষিত হয়। সেই গণতন্ত্র জনগণের চরম শত্রু। সমাজতান্ত্রিক দেশে সংবাদপত্র একটি নয়, অসংখ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৫৭টি ভাষায় ১৪ হাজার সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়। চীনে এর চাইতে অনেক বেশি। সেখানে জনগণের সমস্ত অংশের মতামত প্রচারিত হয়।

ধনতান্ত্রিক দেশে যেমন ভারতে অন্যায় অবিচারের প্রতি-বাদ করা যায়, কিন্তু তা করতে গেলে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার সরকারের অন্যায় অবিচারের সমর্থন করে সমস্তরকমের সমাজবিরোধী কার্যকলাপও চালানো যায়। তার বিরুদ্ধেও আইন আছে বটে। কিন্তু আইনের নিয়ন্ত্রক সরকার ও তার প্রশাসন-পুলিস সেইসব সমাজবিরোধীদের মাথায় তুলে রাখে। এরই নাম বুর্জোয়া প্রচারকদের কাছে গণ-তন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশে উল্টোটা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজের সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য, প্রগতির জন্য যা কিছু করা হোক, সবটুকুকে সমাদর দেওয়া হয়। সমাজবিরোধী কার্য-কলাপ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও তিরোহিত। এর নাম সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্র। তাহলে সত্যিকারের গণতন্ত্র কোন্‌টি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ হয়ে জনগণের মধ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করার প্রবণতাই লোপ পায়। সেই প্রবণতার সামান্য-তম কিছু দেখা দিলেও কঠোর হস্তে তা দমন করা হয়। তাহলে দেখা যায়, কোন সরকার চাইলে শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার অবিচার সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশেই তা সম্ভব এবং একমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্রেই তা সম্ভব। তাহলে মৌলিক প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় কোন্‌টি ভাল—স্বৈরতন্ত্র বা জঙ্গীশাহী না বুর্জোয়া গণতন্ত্র? কোন্‌টি ভাল—বুর্জোয়া গণতন্ত্র না সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র? কোন্‌টি ভাল—ধনতন্ত্র না সমাজতন্ত্র? তবে এটা তো নিশ্চিত যে, টাটা বিড়লার পক্ষে যা ভাল, জনগণের পক্ষে তা নিশ্চয়ই সর্বনাশ। আবার জনগণ যাকে ভাল মনে করবে, টাটা বিড়লারা তাকে সর্বনাশ মনে করবে। টাটা বিড়লারা চায় ভারতে এখন যে ব্যবস্থা সেটা, অর্থাৎ ধনতন্ত্র। জনগণ চান সম্পূর্ণ বিপরীতটা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। কাজেই সমাজতন্ত্রের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের জন্য লড়াই অব্যাহতগতিতে চালিয়ে যেতে হবে। এই লড়ায়ের জন্য বুর্জোয়া গণতন্ত্র দরকার। অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্র দরকার জনগণেরই।

নিঙা ভাই মরিনি

প্রণব কুমার চক্রবর্তী

কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল—সেরকম কিছুই ছিলনা। অথচ শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল। ঘটে গেল এত বড় ব্যাপারটা।

গ্রামটা ছোট। সবে সন্ধ্যার মজলিস মণ্ডপতলায় জমে উঠব উঠব করছে। বোশেখী উত্তাপ। এরই মাঝে উত্তর পাড়ার নিতাই-পদ এসে খবরটা দিল—আর পাখির পালকের মত তা ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশ।

পালেদের লেঠেল টাঙি দিয়ে কচুকাটা করে ফেলেছে নিঙা কাহারকে। পাশের গাঁয়ের রমজান চাচার কাজ ছিল কামার দোকানে। ওখানেই বসেছিল ও। একলাফে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল—"কি হলছে র‍্যা?" রমজান চাচা আগে ভাগেই কানা-ঘুষায় একটু আধটু শুনেছিল পালেদের সাথে নিঙার গণ্ড-গোলের কথা। ওকে বলেওছিল রমজান চাচা—"দ্যাখ ভাই আমরা হ্যালাম ছোট জাত—মুখ্যু নোক—মজুর খাটি—বাল-বাচ্চা আছে—আমাদের কি উসব বড়নোকদের সাথে আবাদ বিবাদ মানায় র‍্যা।"

নিঙা কথাগুলো ভালোকরে শুনেই উত্তর দেয়—"চাচা ইসব কথা ঠিক লয়। উ বড়নোক তাতি তুমর আমর কি? উকি আমদের কিনি রাখছে? উদের পয়সা আছে বলি যা খুশী তাই করবি?—ইসব কেমুন কথা গো চাচা।" রমজান চাচা বোঝাতে চেয়েছিল ব্যাপারটা। "ওদের জমিতে মজুর খেটেই আমদের পেট চালাতি হয়।" কিন্তু নিঙা ওর কথাই বলে—"উসব ছাড় চাচা। অলায্য কাজ করব না। হকপথে চলি। উ বড়নোক—তা কি হলু—যা খুশী তাই করবি?"

আর কিছু না বলে—কিংবা রমজান চাচাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হনহন করে চলে গ্যাল। আজ হঠাৎ পালেদের সাথে নিঙার গণ্ডগোলের খবর পেয়ে চমকে উঠল রমজান চাচা। মনে পড়ল সেই কথাগুলো। একলাফে কামার দোকান থেকে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—"কি ব্যাপর র‍্যা?"

নিতাইপদ এমনিতেই মজলিসের মাঝে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটা বলছিল—তাই উত্তেজনার মাঝে রমজান চাচার কথা আলাদা করে তার কানে গ্যালনা। যেটুকু রমজান চাচার কানে গ্যাল তাতে বুঝতে পারল পালেদের ভাড়াটে লেঠেল নিঙাকে খুন করেছে। তবে মরার আগে অবধি নিঙা লড়েছিল—মরদের মত। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গ্যাল মণ্ডপতলায়। ছেলে ছোকরার দল বয়স্কদের ধমকানি এড়িয়েও জমে রইল। ব্যাপারটা কি সে নিয়ে মাথাব্যাথা সেরকম নয়। সবার মুখে কথা একটাই—

"নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল।" কেউ হয়তো ভাসা গলায় বলল—"উদের পয়সা কত উরা তু মারবিই।" কেউ আফসোস করল—

"যাঃ, নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল র‍্যা!" ভুতো খুড়োই একমাত্র আইনের কথাটা তুলল। থানা পুলিস হবি। এপাশ ওপাশ থেকে কেউ বলল—"আরি উসব তো পয়সার ব্যাপর।"

তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনা কমে এল। কেউ ঘরের পানে আবার কেউ কেউ ঘটনাস্থলের দিকে যেতে শুরু করল। ব্যাপারটার মাঝে যে একটা কিন্তু আছে সেটা অনেকেই জানে—কিন্তুটা যে কি সেটা সঠিক কেউ জানেনা।

অবশ্য জমির ব্যাপারটা রমজান চাচা আর দু' চারজন ছাড়া ভালোভাবে কেউ জানেনা। রমজান চাচা চুপচাপ। কোন কথা নেই। কামারশালের একপ্রান্তে মাথা নীচু করে বসে আছে। ওদিকে হাতুড়ির ঘায়ে তার ইস্পাত ক্রমশ হাঁসুর আকার নিচ্ছে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রমজান চাচা উঠে পড়ল। "উদিকি একবার যাবার দরকার। ছুড়াটা অকালি চলি গ্যাল। উর ঘরের নোক আর বাল-বাচ্চাগুলা না খেতি পেয়ি মারা পড়বি?"—নিজের মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রমজান চাচা।

বিলপারে যেখানটায় ঘটনাটা ঘটেছিল রমজান চাচা যখন সেখানে গ্যাল তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ওপাশের সুইজগেটের উপর বেশ কিছু লোক জড় হয়েছে। প্রত্যেকের মুখই কেমন থমথমে—হাঁ চাঁ নাই একটুও। একটু একটু করে রমজান চাচা নিঙার পড়ে থাকা দেহটার কাছে গ্যাল।

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে নিঙা! না নিশ্চিন্তে নয়। ওর মুখের মধ্যে বিরক্তির ছাপ—ভ্রূকুটি। মাটিতে হাঁটুগেড়ে রমজান চাচা আল্লার কাছে তার জন্যে প্রার্থনা জানাল—শ্রদ্ধা জানাল এই একগুয়ে—জেদী—চওড়া বুক ছোঁড়াটার জন্যে। যে দু'বেলা পেটভরে খেতে পেত না তার মধ্যে এত তেজ এত আগুন ছিল কে জানত?

এতক্ষণে বেশ লোকজন এসে গ্যাছে। নিঙার আত্মীয় পাড়াপ্রতিবেশী। চারপাশে কানাকানি। কত রকম কথা। নিঙার সদ্য বিধবা বউ ও চার চারটে ছেলে সবগুলোই একথেকে আট বছরের মধ্যে নিঙার পাশে বসে আছে। বুঝবে আর কে কতটা? ঐ বড়ছেলে কানু আর নিঙার বো। বো মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছে শাপশাপান্ত দিচ্ছে। কাঁদছে গলা ছেড়ে—"ওগু আমর কি হলু গা—আমর কি হবি? মর মর সব মর। আমর মরদকে যারা মারেছিস তাদের নিব্বংশ হবে। আল্লা তুমি

বিচার করুন—আল্লা—আমর মরদকে যারা মারিছে তাদের যেন নিব্বংশ হয়—মুখ দিয়ি গলগল করি অক্ত উঠে।" খুকনি পিসি, অচুখেপী যে যার মত সান্ত্বনাও দিচ্ছে। দুঃখ করছে। কেউ শুনছে। কেউ কিছু বলছে। আবার কেউ একেবারে চুপচাপ। কুলুপ আঁটা। কিছু একটা করা দরকার।

ফিসফিস গুঞ্জনটা ক্রমশ একটু চাপা উত্তেজনায় দিকে মোড় নিতে শুরু করল। কয়েকজন বেশ উত্তেজিত—নিঙার প্রতিবেশী, রমজান চাচার পাড়ার লোক—এরা বেশ ক্ষুব্ধ। উত্তেজনা আরো বেড়ে উঠল। আইনরক্ষকের দল এসে পড়ল। বড় দারোগা এসেই জেরা শুরু করল—

"যখন ঘটনা ঘটে তখন কে কে উপস্থিত ছিলি ?" প্রথমটা কেউ সাড়া দিতে চায়নি পরে দারোগা আবার হাঁকতে যেদিকটায় উত্তেজনা বেশী ছিল সেখান থেকে একজন বেঁটে শীর্ণকায় লোক বেরিয়ে এল—

—"আমি ছিলম বটে"
বলেই দারোগার সামনে মাথার মাথালিটা ছুড়ে ফেলে দাঁড়াল। দারোগা ওর পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিল এক পলক। শুধাল—

—"তোর নাম কি ?"

—"দীনু বটে।"

—"কোন গায়ে থাকিস ?"

—"ঐ হোথা, উ গায়ে"—বলে পুবের দিকে আঙ্গুল দেখাল।

—"আরে নামটা বলবিতো"—বলে মাটিতে বুটটা ঘষে নিল।

—"শুশুনপুর বটে।"

—"তা তুই দেখেছিলি নিঙাকে কারা মারল ?"

—"কারা কি গু? পালিদির লেঠিল আবর কারা? উরা তু ইর অ্যাগেও দু' সাতটা নোকাকি কুপাই কাটিছে—যে উদের মুখির উপর লাঠি ঘুরাইছে তাদিরকে শ্যাষ করি দিলছে-ভাড়া করা লেঠিল দিয়ি। কিন্তু এবারে নিঙাকি মারাটা......"

দারোগা "থাম" বলে—কাছের কনস্টেবলকে ডাক দিল। ভীড়ের মাঝে—উত্তেজনাটা আরো অশান্ত হোল। সবার চোখ একবার দারোগার দিকে একবার দীনুর দিকে—কি হয় কি হয়। দারোগা একবার দেখে নিল—চারপাশটা। আজকাল কি সব হয়—বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। একসময় ছিল যখন এরকম খুনগুলো কিছুই ছিল না। আসবার দরকারও হোত না। সহকারী এসে কানে কানে কিছু বলতে দারোগা শুধু মাথা নাড়ল।

দারোগা ও দীনুর কথা থেকে বোঝা গেল নিঙা ওর বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে এ জমিটা চাষ করে আসছে। কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ পালেদের এ জমির প্রতি নজর পড়ে। বলে এ জমি আমাদের। অবশ্য পালেদের পুকুরটা সাইজ করার জন্যে এ জমিটার খুব দরকার। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নিঙার সাথে পালেদের খুচখাচ চলছিল। নিঙা আবার এমনিতেই একটু একগুঁয়ে, গোঁয়ার। দীনুর কথায়—"উ অলায্য কাজ করতুও না দেখতিও পারতু না।" বলাই মোড়ল এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। কিন্তু এবারে মুখ খুলল। "আরে চুপ কর বড় বড় কথা বলিসনি।" দারোগার দিকে তাকিয়ে বলল,—"যা হয় করুন আপনিই। ওদের কথা বাদ দিন। সব তাতে বড় বড় কথা।"

কিন্তু দীনু সব কথাই বলবে। "কেনে বুলবুনা। উ যা বলিছি যা করিছি সব বুলবু।"

"সন্ধ্যের দিকে পালিদির বড় ছেলি লেঠিল নিয়ি এসে জমিতি নামে। নিঙা ধারে কাছিই ছিল। উ খবরটা পেতিই লাঠি নিয়ি ছুটি আসে। তখনো পালিদির লেঠিল জমিতি নামিনি। জমিতি বুক সমান পাট। চোখ জুড়ান পাট।"

নিঙা এসেই হুংকার ছাড়ল—"যে শালা জমিতি নামবি আজ তার একদিন কি আমর একদিন।"

বেশ কিছুক্ষণ বচসা হয়।

তারপর পালিদির লেঠিল জমিতি নামে। নিঙা বাধা দিতি গেলি পাঁচ ছ' জন ওকি ঘিরি ধরি টাঙ্গির কোপ বসিয়ি দেয়। উ একা আর কতুখণ লর্ড়বি ?"

সাঁঝ গড়িয়ে রাত নামব নামব। আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামবে মনে হয়। দারোগা একটু চঞ্চল হোল। ভীড়ের মাঝে এখন শুধুই উত্তেজনা।

দারোগা হাঁক দিল,—"রামধন, লাশ তোল।" কিন্তু চাপা গুঞ্জনটা এবার ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। দারোগা দেখল...... বিপত্তি......। বলাই মোড়ল ও ভুতো মোড়ল নড়ে চড়ে বসল। "দারোগাবাবু আপনিই দেখেন ব্যাপারটা আমরা ওদিকে যাই, জল হবে মনে হয়।"

দারোগা প্রথমে হুংকার দিয়ে সেই চিরায়ত নিয়মে ফায়সালা করা যায় কিনা দেখতে চাইল।

কিন্তু রমজান চাচা এবারে সপ্রতিভ। "না নিঙা ভাই কি আমরা কারুর হাতি দিবনা। যা করবার আমরই করবু।" দারোগা বুঝতে পারল আজ আর সুবিধে হবে না। হাসপাতালের পরীক্ষার কথা—আইনের কথা বলে দেখল কিছু হয় কিনা? শুধু বুট দিয়ে মাটী ঘষতে লাগল। হাতের উপর হাত ঘষতে লাগল।

রমজান চাচা এবারে জোর গলায় বলে উঠল—"ভাইসব নিঙাভাই মরিনি। নিঙাভাই আমদের দেখিয়ি দিল জান দিব তবে অধিকার ছাড়বো নাই। আর আমরা বড়নোকদের লাল-চোখকে ভয় পাবু না। ভাইসব, আজ সব থেকি দুঃখের কথা আমদের মতই মজুর তারা পালিদির কিনা গুলাম হয়ি সামন্য পয়সার লোভে আমদেরই এক ভাই কি খুন করলু।"

রমজান চাচার কণ্ঠস্বর প্রায় ভেঙে এসেছিল, কান্নায়—ক্ষোভে—দুঃখে, তবুও কিছু বলার চেষ্টা করছিল।

ফোটা ফোটা বৃষ্টি এবারে মুষলধারে নেমে এল। বাঁধ ভাঙা প্লাবনের মতো শেষ বোশেখের মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। তার মাঝে রমজান চাচা লাশে হাত লাগাল। রমজান চাচার পেছনে মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। দূরে দাঁড়িয়ে বড় দারোগা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বসন্ত

অসীম মুখোপাধ্যায়

দিগন্তবৃত্তের মধ্যে ডুবে গেছে সূর্য ও পাখীরা।

অর্ধনিমীলিত চোখ—ছুটে আসে ছায়ার বিমান
চরাচর শিস্‌মাখা স্তব্ধ প্রায় সাঁতালী পর্বত
আহ্নিকের কাল শেষ......তারাদের গগনবিহার ঃ
সপ্তর্ষির দীপ্তি নিয়ে অকাশ ভ্রূকুটি করে, হাসে
বাতাসে ফুলের গন্ধ মাতোয়ারা অখিল ভুবন!

খাবারের ঘণ্টা হলে এইসব রেখে যেতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ

ইরা সরকার

ইচ্ছে করে সব শিশুকেই দিই তোমার শৈশব
সোনার বাংলার গন্ধে স্বচ্ছল স্বচ্ছন্দ এক বিস্ময় আরক
লেখাপড়া গানশেখা বাবার সংগে ঘোরা
ডালহৌসী পাহাড়ে পাহাড়ে—

ইচ্ছে করে সব শিশুদের হাতে তুলে দিই
এক একটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতি
সদর স্ট্রীটের বাড়ী খুললে তারা ফিরে পাবে
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ সাবলীল জীবনের গতি—

আকাশের মস্ত খামে পৃথিবীর চিঠি প্রতিদিন
যে অক্ষরে লেখা থাকে শিশুরা তা বোঝে, তুমিও বুঝতে,
সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি, কিন্তু সবাই মানুষ হবে
ছড়ানো জীবন ধারা বহুদূর নদী এক পশ্চিম বাংলায়—

তুমি কি এখন কবি বাংলার পলিমাটি স্পন্দন আকুল
তোমার বাঁচার রস ছড়িয়েছ শিশুদের শিকড়ে শিকড়ে
যেমন অবুঝ মাকে ওপারের অবু মনে করে
রবির সোনার আলো এদেশের শ্যামল গভীরে॥

আগামী সকাল পর্যন্ত

চন্দন কুমার বসু

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কলম
স্থির
নিশ্চুপ...
সম্মুখে প্রস্তুত আগ্নেয়
ত্রস্ত
স্পন্দিত।
ডুবে যাবে মুহূর্ত পরেই
পশ্চিমে
নির্জনে—
তবু লাল, অনেক—অনেক লাল
বধ্যভূমি
মাথার আকাশ
আর
দিগন্ত রক্তিম।
নিংড়ে দেবেই রসদ
বাঁচতে
সারাটা রাত......
আগামী সকাল পর্যন্ত।

ব্রাহ্মস্পর্শের পাণ্ডুলিপিতে

কল্যাণ দে

ঈপ্সিত ঘাসের ডগায় প্রণয় ছড়িয়ে আছে হৈমন্তিকার ভোরে
দোর খোলেনা কেন স্বজন বকুল?
কাকের চোখের 'পরে স্বপ্ন যে ডিম ভেঙে স্নেহ ছড়ায়
মেঘের জাজিম লেপ এখনো বুকে জড়িয়ে
নিস্পৃহ সন্ন্যাস নিয়ে আত্মমগ্ন মাটির মানুষ......
বুক গুলো চিরে ফেল কলজেয় দেখ গাঁথা আছে
কালের শরীর
নগ্ন হলে নিজেকে বড় সহজেই চেনা যায়—

ঊর্ণনাভ বিছিয়ে রেখে গার্হস্থ্য মাঠের দাওয়ায়
নষ্ট বটের ছায়ার মত পাশা খেলা
বিধি বহির্ভূত গ্লানিকর
এত সব বাক্য শুধু নিষ্ফলা বীজ—ভেবোনা ঃ
জবান দিয়েছ যা নদীর দলিলে
এখন ব্রাহ্মস্পর্শের পাণ্ডুলিপিতে ঘোমটা খুলে হও
অরণ্যের সরল বর্গীয় উদ্ভিদ!

জনান্তিকে

কেতকী বিশ্বাস

কাস্তের ফলার মত পঞ্চমীর শিশু চাঁদ
থিক থিক করে কাঁপে
ঘুমন্ত আকাশের নিঃশ্বাসের চাপে,
অনাহুত, অশরীরী ইচ্ছারা কাঁপে
অস্পষ্ট তারায়, পাঁচিলের উপর গোড়া পেড়ে
কেটে ফেলা অশথের নরম পাতায়,
এখানে এক বুক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে
ছোট্ট ফাটলধরা চাতালে
পৌষের শীতে কাঁপি আমি।

বিছানার উত্তাপ স্বপ্নের দানবিক যন্ত্রণার কাছে
অতিরিক্ত, তাৎপর্যহীন,
ঘুম নেই; ঘুম আসে না;
ঘুমাতে নেই, ঘুমালে—
যন্ত্রণা চাপা পড়ে যায়
এক বুক কুয়াশার নিচে।
পাশের বস্তিতে সেই মেয়েটাও
ঘুমায় না আজ ক'দিন
ছটফট করে প্রসবের অসহ্য বেদনায়,
ঘুমাতে পারে না আরো অনেকে
যারা মেয়েটাকে পাহারা দেয়
এবং রাত্রিকেও।

পঞ্চমীর শিশুচাঁদ উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনে
টীনের চালে আটকে থাকা বাতাসের
করুণ প্রতিধ্বনি,
অভিজ্ঞ মায়েদের ফিস্‌ফিসে গলায়
সতর্ক প্রহর গোনা
এবং
আরো অনেকের সাথে আমার
ফুসফুসের দ্রুত উঠা নামা।

ঘুম নেই; ঘুম আসে না;
ঘুমাতে নেই; ঘুমালে, স্বপ্নের অশ্লীলতায়
স্বপ্নের সত্যটা মরে যায়!
তাই জেগে থাকি—
এক বুক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে
চরম যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে।
জেগে থাকি—
আরো অ-নে-ক "জেগে থাকা" চোখে
নিজেকে চিনব বলে।

চন্দ্রিমা

পরিতোষ দত্ত

দেখো চন্দ্রিমা—
চাঁদের তৈরী পাহাড়ের গপ্পো, আমি
শুনেছি অনেক,
দেখেছি কিন্তর—
মনে পড়ছে আবছা আবছা।
এক সেই বুড়ী
তার মাংস বিহীন দেহটাকে
যৌবন খোলসে পুরে
কোন ঐ আদ্যিকাল থেকে
শুধু চরকা কেটে চলেছে।

হাতে আমার অক্ষয় সুতো
ধমণীতে অমর পোষ্টার
দেবত্বের উত্তরাধিকার।

চন্দ্রিমা—
তোমার তৈরী পাহাড়ের গপ্পো আমার জানা নেই
শুনেছি বলে মনে পড়ে না
দেখেছি শুধু অমার অন্ধকারে
তবে—ভুলি নি কিছুই।
হয়তো বুঝেছিলাম—
তোমার নিঃশ্বাসে উষ্ণতা আছে,
রক্তের ফোঁটাগুলো এখনো দুধের মতো হয়নি
তোমার যৌবন পল্লবিত কুঞ্জ
পুরুষ্ট ন্যাকামির খোলসমুক্ত।
গোলাপ পাঁপড়ির স্তর বিভাগ—
আজও আমি জানি না,
ঘ্রাণের তীব্রতা—
জিজ্ঞেস করলে নির্ভুল উত্তর
আজ হয়তো তুমি আর পাবে না।
তবে ফুটপাথে বিছানো ছেঁড়া কাঁথার ঐ প্রত্যেকটি স্তর,
সিক্ত কাঁথার মাদকীয় ঘ্রাণ
কুশলী ছুঁচের নিপুণ টান
চন্দ্রা—
আজও আমি ভুলি নি।
চন্দ্রা, তোমার নিটোল যৌবন,
কুসুমিত কুঞ্জ—
অনন্ত সমুদ্রে, সময় মন্থনে ভাসিয়ে রাখো।
তোমার সৌন্দর্য, প্রতিটি মুহূর্ত,
মূর্ত হোক চিরবসন্তে।
শাশ্বত তন্ত্রীর ঝংকৃত বন্দনায়
ধরা থাক এক মলিন সত্য॥

লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন : এক পরম সত্য

ঋতীশ চক্রবর্তী

তরুণ মানসের সুস্পষ্ট প্রতিফলন 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন'। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী সাহিত্য শিল্প জগৎ তাদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। এইসব সংবাদপত্র গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রের মূল লক্ষ্য মুনাফা লোটাই শুধু নয়, এ'দের কেনা শিল্পী-সাহিত্যিক দিয়ে সৃষ্টিশীল মানসিকতাকে বিপথে পরিচালিত করা। মানসিক দিক থেকে এই বিকৃত চেতনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে সোচ্চারিত শব্দে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের আত্মপ্রকাশ।

বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতি আবহমানকালের। জীবনের জিজ্ঞাসা বাস্তবে চিত্রায়িত করবার প্রচেষ্টা করে থাকেন আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা। কিছু কিছু শিল্পী এরমধ্যে নিজেদের বিক্রী করে দেন জীবনের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবার জন্য। তাঁরা মৌলিক চিন্তাধারা থেকে অনেকটা সরে আসতে বাধ্য হন। যে শিল্প মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার পুরো চিত্রটাকে তুলে ধরতে পারে, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ করার মাধ্যম হিসেবে যে শিল্প প্রতিফলিত হয়, সেই শিল্পকেই আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন সময়ে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। অগণিত পাঠককে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক স্থাপন করতে। কিন্তু আত্ম-বিক্রীত যাঁরা, তাঁদের সৃষ্টির সঙ্গে জীবনের কোন যোগ থাকে না। সম্ভবও নয়। সাধারণ মানুষের স্নায়বিক চেতনার ওপর আঘাত দেবার তাঁরা চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন কিভাবে তরুণের প্রাণোচ্ছলতাকে বিকৃত মানসিকতার পরিধির মধ্যে চিরস্থায়ী করে রাখা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের, তাঁরা শেষপর্যন্ত সফলকাম হতে পারেন না।

ভারতবর্ষের মত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই জন্ম হয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার। এই জীবন বিকেন্দ্রিক পরি-মণ্ডলেই গড়ে ওঠে 'জীবনের জন্য শিল্প' মনোভাব। তারুণ্যের দীপ্ততেজ প্রতিবাদীমন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বেশীর ভাগ লিট্‌ল ম্যাগাজিনেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আবহমান কালের সাহিত্যপ্রীতির প্রবাহে তরুণ মানস দৃপ্ত হয়ে ওঠে। গুটিকতক ছেলে লেখার তাগিদকে ধরে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আত্মবিক্রীত সাহিত্যিককে যদি তাঁরা অনু-করণ করবার চেষ্টা করেন, দুটো কি বড়জোর তিনটে সংখ্যা অনিয়মিতভাবে তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন সাধারণতঃ। তারপর উচ্ছ্বাসের ধারার মধ্যে ভাটা আসে কারুর। আবার কেউ হয়ত এরইমধ্যে একে-তাকে ধরে দুই একটা লেখা বাজারী সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেন। পত্রিকা প্রকাশ করবার ক্ষেত্রেও তাঁদের আর আগ্রহ থাকে না।

কিন্তু লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো—যখন একটা সুচিন্তিত মানসিকতা নিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লড়াই-এর মাধ্যম হিসেবে লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হয়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেই পত্রিকাগুলো বেশ কিছুদিন অনিয়মিতভাবে হলেও প্রকাশিত হয়। প্রথম থেকেই উদ্যোক্তারা জানেন পথটা সহজ নয়। লড়াই-ই একমাত্র পথ। স্বভাবতঃই দমে যাবার কোন ইঙ্গিত তাঁদের মধ্যে নেই। যেহেতু দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে তাঁরা আগ্রহী, পত্রিকার জীবনে আরও বেশ কিছু আদর্শবান ছেলে আসতে থাকেন। কারণ, তাঁদের নেশা আছে, সংগঠিতভাবে জীবনকে পরিচালিত করবার। সামান্য খড়কুটো পেলেই তাঁরা হাত বাড়িয়ে দেন। আস্তে আস্তে পত্রিকার জীবন এগিয়ে চলে। পথে বেশ কিছু নতুন মুখ যেমন জোটে, আবার কিছু পুরোন মুখও সরে পড়ে। সঠিক আদর্শ থাকে বলে বন্ধু বা শত্রু চিনতে উদ্যোক্তাদের অসুবিধা হয় না। ফলে আগাছার সৃষ্টিও কম হয় সেখানে।

আর একটা গোষ্ঠী আছে যেখানে সম্পাদক তাঁর নিজের জীবনের অধ্যায় দিয়ে কিছু লোককে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেন। পত্রিকায় সম্পাদকের নিজের চার পাঁচটা কবিতা, প্রবন্ধ, তাঁর প্রকাশিত কোন বই-এর সমালোচনা, বিজ্ঞাপন। মূলতঃ কিছু ছেলেকে পরিস্কারভাবে চিট করে সম্পাদকের আত্ম-প্রচার। এ প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে অনেক পরিচিত প্রগতিশীল কবিদের নামও মনে পড়ে যাচ্ছে। সম্পাদক যিনি থাকেন, তাঁর মূল লক্ষ্য পত্রিকার মধ্যে কতবার কতকায়দায় তাঁর নামটা ছাপান যেতে পারে। এ ধরণের পত্রিকার আয়ুও খুবই সীমিত।

মোটামুটিভাবে লিট্‌লে ম্যাগাজিন জগত সম্পর্কে যাঁরা জ্ঞাত আছেন তাঁরা আমার কথার সঙ্গে আশাকরি একমত হবেন—যে সমস্ত লিট্‌ল ম্যাগাজিন সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করতে পারে এবং এগিয়ে যেতে পারে সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অঙ্গীকার নিয়ে, সে ধরনের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জীবনও অনেক বেশী সাবলীল। অনেক দৃপ্ত। এবং তারা ক্ষণজীবীও নয়।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক চেতনার উজ্জ্বল দলিল এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিন। এখনও এমন সম্পাদক-শিল্পী-সাহিত্যিক

রয়েছেন যাঁরা কোনকিছুর বিনিময়েও নিজেকে বিক্রী করবেন না। জীবনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠার সংকল্পে নিজেরা উৎসর্গীকৃত। বস্তুতঃ এ'দের তপস্যার ফসলই জাতির মানস সঞ্চয়ে সংগ্রহ করে রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সম্পাদনা যে শ্রমনিষ্ঠ ভালবাসা এবং সুস্থ মানসিকতা নির্ভর শিল্প, এ'দের লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোই তার সাক্ষ্য বহন করে। কিছু কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ যেমন এই পত্রিকায় থাকে, পাশাপাশি থাকে পরীক্ষামূলক বিভিন্ন রচনা। এই সব পরীক্ষা পাঠকদের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাজারী পত্র পত্রিকাগুলি এগিয়ে আসবে না। কারণ তাদের মূল লক্ষ্য সৃষ্টিশীল চেতনার বিকাশ সাধন নয়, মুনাফার পাহাড় বাড়ানো। সঙ্গতকারণেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মধ্যেই এই পরীক্ষা চলে। সঠিকভাবেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ল্যাবরেটরী। সাহিত্যকে কাটা ছেঁড়া করে পরীক্ষা করবার সুযোগ থাকে লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর পাতায়।

জাতীর সামগ্রিক প্রয়োজনেই এই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারের চিন্তাভাবনা শুরু করা দরকার। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অকালমৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ বিজ্ঞাপনের অভাব। যদিও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করেছেন, যে কোন registered পত্রিকাকেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এরমধ্যে বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিনে রাজ্যসরকারী বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে। একটা পত্রিকায় রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে বড়জোর একটা কি দুটো মাত্র বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক কাগজের দাম আর প্রিন্টিং-এর অব্যবস্থা এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোকে ক্ষণজীবী হতে বাধ্য করে। আর্থিক সচ্ছলতা এই সব ম্যাগাজিনের থাকে না। স্বভাবতঃই বেশ কিছু টাকা অগ্রিম বাব্দ প্রেসে তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রেসের মালিকও এই সব ম্যাগাজিনকে একটু অন্যভাবে দেখে। করুণার দৃষ্টিতে তারা দেখে। কারণ, সাধারণতঃ এই সব ম্যাগাজিনগুলো প্রথমে কিছু টাকা নিজেদের পকেট থেকে প্রেসকে দেন। যদি কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় তার টাকা জোগাড় করে পকেট থেকে আরও কিছু দিয়ে প্রেসের পুরো টাকা শোধ করে দেন। যেহেতু ছোট পত্রিকা, তাতে আবার টাকাটাও সাধারণতঃ কয়েক ক্ষেপে দেওয়া হয় তাই এদের ওপরে প্রেসের মালিকদের থাকে অনুকম্পার মনোভাব। যেন তারা কৃতার্থ করছেন। কিন্তু এই মালিকরাই আবার প্রচুর টাকা খরচ করে একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর কাজ করে দিচ্ছেন। যে টাকা কবে পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই, সেই কোম্পানীর যে ব্যক্তি এইসব দেখাশোনা করেন তাকে এ ছাড়াও আবার সন্তুষ্ট রাখবার জন্য কিছু প্রেসের মালিককে দিতে হয়। সুতরাং প্রিন্টিং-এর এই অব্যবস্থা লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে বেশ ধাক্কা দেয়।

বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গে আসা যাক। শুধুমাত্র রাজ্যসরকারের একটা বা দুটো বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করলে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জীবনের স্রোতধারাকে সাবলীল করা সম্ভব নয়। ধরুন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন একটা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনের জন্য কোন সম্পাদক গেলেন। সেখানে দেখা যায় যতটা গুরুত্ব এ'কে দিচ্ছেন তার থেকেও বেশী গুরুত্ব পাচ্ছেন কোন বাজারী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। তার নিজের সম্পাদিত পত্রিকা বা কোনও বন্ধু সম্পাদকের জন্য হয়ত তিনি গেছেন। তাঁদের আদর্শ সেই তথাকথিত আত্মবিক্রীত শিল্পীসাহিত্যিক। লেখকের একবার প্রয়োজন হয়েছিল কোন এক লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের জন্য ইস্টার্ন রেল পি. আর. ও. অফিসে যাওয়া। প্রথম দিকে বিভাগীয় ব্যক্তি বললেন কোন একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট-এর সার্টিফিকেট লাগবে—আপনাদের পত্রিকা ২২০০-এর মত বেরোয় এই হিসেবে। ক'দিন পরে সার্টিফিকেট নিয়ে দেখা করলাম সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে। বললেন, ডি· এ. ভি. পি.-র কোটা থাকলে পাবেন। হতাশ হয়ে আমাকে ফিরতে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু কোন বিখ্যাত বাজারী সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত আত্মবিক্রীত শিল্পী সাহিত্যিকদের এমন কিছু পত্রিকা রয়েছে যাদের এসবের প্রয়োজন হয় না। কারণ অপসংস্কৃতির বেলেল্লাপনায় সেই সব শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে এইসব সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও গা ভাসাতে হয়।

বর্তমান রাজ্যসরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই সুস্থ জীবনকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সপক্ষে সচেতন হতে দেশের জাগ্রত যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলো এর সপক্ষে সৃষ্টির প্রভাত থেকেই দৃপ্ত পদচারণা শুরু করেছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই না করতে পারলে এই অপসংস্কৃতির বেলেল্লাপনা রোখা যাবে না। তাই প্রয়োজন সংগঠিত প্রয়াস। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। বাংলাসাহিত্যের মধ্য থেকে আবর্জনাকে সরিয়ে দিতে হবে। আবর্জনা সংরক্ষণের দায়িত্ব পুঁজিপতি গোষ্ঠী পরিচালিত পত্রিকার কর্মকর্তাদের। সুস্থ জীবনমুখী চেতনার বিকাশ ঘটাতে গেলে সরকারেরও প্রয়োজন এই সব লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া। তাঁদের কাছে অনুরোধ—বছরে একবার শারদ সংখ্যার বিচার করে শ্রেষ্ঠ লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে পুরস্কৃত করুন। কিছু অনুদানেরও ব্যবস্থা করুন। যাতে এই সব পত্রিকা থেকে ফুল ফুটতে পারে। আনন্দের উদ্যান তৈরী হতে পারে। মানুষের বেঁচে থাকবার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিন। লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন চিরসত্য হয়ে উঠবেই।

আরো আরো দাও প্রাণ

সুমিত নন্দী

বিগত ৯ই মার্চ সমগ্র কলকাতার শরীরে মিশে ছিল এক অভিনব পদযাত্রা। এই কলকাতারই কর্মব্যস্ত মানুষের মনের কোণে বহু গোপনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নের শিকড়টিকে যারা সুখ ও সৌন্দর্যের গান গেয়ে নাড়া দিয়েছিলেন, সেই স্টুডেনথ হেলথ হোমকে অজস্র ধন্যবাদ। অসুখ থেকে সুখের পথে চলার আহবানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কলকাতার বিভিন্ন দিক থেকে পায়ে হেঁটে শহীদ মিনারের সামনে জমায়েত হন। আর, এই পদযাত্রায় অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে সমগ্র ছাত্রছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়ান শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, শিল্পী থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের মানুষ। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে তুলে ধরাই ছিল এই পদযাত্রার মূল উদ্দেশ্য। বলতে দ্বিধা নেই, বছরের পর বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্মম উদাসীনতার সন্ধান পেয়ে, আমরা আজ সত্যিই লজ্জিত। সেইজন্যই বিগত দিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলির দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য হই।

সেই প্রাচীনকালে প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে আরম্ভ করে হালের দিনের নয়া দার্শনিকের চিন্তাতেও একই কথা শোনা যায়, "সুন্দর স্বাস্থ্যের বিনিময়ে আমরা পেতে পারি এক আদর্শ নাগারিক।" কথাটা একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আসলে, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে মনও সতেজ হয়, মনের প্রসারতা ঘটে। আর প্রসারিত মনের নাগরিকের কর্মচিন্তা সর্বদাই বাস্তবধর্মী ও মানবিকগুণসম্পন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবং সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ গঠনে এই সমস্ত নাগরিকের এক ঘনিষ্ঠ ভূমিকা থাকে। অথচ আজকের দিনের যে-শিশুরা ভবিষ্যতের নাগরিক এবং ঐ সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ গড়ার মূল উৎস, তাদের অবস্থা আমাদের দেশে বড়ই করুণ—ঠিক যেন ডানা ঝাপটানো পাখির মতো, অসুখের তাপ বুকে নিয়েও স্বপ্নোত্থিত উচ্চাকাশের পাহাড়ে চোখ রেখে বড় হওয়ার অদম্য উৎসাহ। কিন্তু, আজকের শিশুর এই উৎসাহের জোয়ারে পরিণত বয়সে নেমে আসে ভাটার টান।

ঐ ভাটার উৎস সন্ধানের তাগিদেই আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রয়োজন। আসলে শৈশব, বাল্য বা কৈশোরকালে মানুষ তার ক্ষুধার সাথে সঙ্গতি রেখে ঠিক মতো পুষ্টিকর খাদ্য না পেলে অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার হয়। অল্পবয়সে শরীরের সর্বঅংশের স্বাভাবিক বৃদ্ধি তখন অনিয়মিত আকার ধারণ করে। এবং তার ফলস্বরূপ পরিণত বয়সে চরম শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি হয়। যদিও আমরা জানি, আমাদের এই অর্থনীতিক কাঠামোয় বেশীরভাগ অভিভাবকের ক্ষেত্রেই তার সন্তানের প্রতি উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান ক'রে দেওয়া খুবই দুষ্কর। তাদের সংসারের আর্থিক অসংগতির টানাপোড়নে ঐ সমস্ত শিশু বা অল্পবয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে নেমে আসে দুর্বিসহ অন্ধকার। সেইজন্যই বড় হওয়ার উৎসাহে মগ্ন শিশুরা একদিন পরিণত বয়সে ব্যর্থতার ঝাপটানিতে হোঁচট খেতে খেতে বিচ্ছিন্নতার-প্রতিভূ হ'য়ে এই বেনো-জলে মিশ্রিত উন্নয়নশীল সভ্যতার মাঝে বিন্দুর মতো কোনক্রমে টিকে থাকে। আমূল অর্থনৈতিক পরিবর্তন ব্যাতিরেকে এই অসংলগ্ন পরিবেশকে কখনই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু, ঐ আমূল অর্থনৈতিক পরি-বর্তনের আশায় এইসমস্ত ছেলেমেয়েদের ফেলে রাখা বড়ই অমানবিক। তাই অতি স্বল্প সামর্থকে পুঁজি করেই তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য স্টুডেনথ হেলথ হোমের এই নব প্রচেষ্টা।

খাদ্যের সমস্যা কিছুটা সমাধানের জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্কুলগুলিতেই বিশেষ টিফিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিছু বিদেশী সংস্থা বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক বছর ধ'রে এ-ব্যাপারে সহযোগী হ'লেও, তা মূলতঃ খুব সামান্য কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, তাদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক পরিবেশের মান অনুযায়ী স্কুল-গুলি নির্বাচনের প্রশ্নটিও সঠিক হ'য়ে ওঠে না। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রসঙ্গটির উপর বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আপাততঃ সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলিতে সরকার থেকে পুষ্টিকর টিফিন বিতরণের ব্যবস্থাটি সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। যদিও ব্যাপকহারে সব স্কুলে এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। আমরা জানি, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার-গুলিকে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার আড়ালে কিভাবে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। তার উপর যদি আবার ঐ কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার রাজনৈতিক প্রশ্নে ভিন্নধর্মী হয়, তা হলে তো কথাই নেই। সুতরাং, এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সবরকম উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সরকার ইচ্ছা করলেই হাত দিতে পারেন না। বহু কষ্ট ও সততার বিনিময়ে এবং মাথা খাটিয়ে এইসমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পিছনে অর্থের সংস্থান করতে হয়। সেইজন্যই তা সময়-সাপেক্ষ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হওয়া (একাশি সাল থেকে কার্যকর হবে), বেকার

ভাতা, বৈধব্যভাতা, বৃদ্ধ কৃষকদের পেনসন প্রবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে উন্নত মননশীল চিন্তার পরিচয় রেখেছেন, তা একদিনের ঘটনা নয়, ধীরে ধীরে জনচেতনার তাগিদেই এগুলি ফলপ্রসূ হয়েছে। সুতরাং আশা করা যায় আগামী দিনে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত স্কুলেই বিনাখরচায় ছাত্রছাত্রীদের একবেলা পেটভরার মতো টিফিন ব্যবস্থাকে চালু ক'রে সরকার সাধারণ মানুষের গোপন ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে, প্রয়োজন হলে কোনো নিস্বার্থ-বাদী ও উৎসাহী বেসরকারী বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগী হ'য়ে সরকার এই পরিকল্পনায় হাত দিতে পারেন।

শুধু প্রয়োজনীয় খাদ্য নয়, বাসস্থান এবং স্কুলের অবস্থান প্রভৃতি অনেক কারণেও ছাত্রছাত্রীরা রোগে আক্রান্ত হয়। কলকাতা শহরে বিশেষত, বস্তি অঞ্চলে এমন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে একেবারেই আলোবাতাস ঢোকে না, তাছাড়া স্কুলবাড়ীর অবস্থিতিও খুব খারাপ। পাশেই হয়তো কোনো খাটাল বা পচা নর্দমার বিষাক্ত প্রভাবে ছাত্রছাত্রীরা হামেশাই আক্রান্ত হ'য়ে থাকে। এক্ষেত্রে, সেইমুহূর্তে সমগ্র বস্তি উন্নয়ন সম্ভব না হ'লেও, ঐ স্কুলবাড়ীটিকে অন্তত একটি স্বাভাবিক আলো-বাতাসপূর্ণ পরিবেশে স্থানান্তরিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

সেদিনের এই পদযাত্রাকে কেন্দ্র করেই ছাত্রছাত্রীদের এই সমস্যাগুলি সমস্ত মানুষের দৃষ্টিতে আরও বেশী করে প্রতিভাত হয়। এবং সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা উদ্‌ঘাটনের জন্য আমরা তাই আজ নতুন করে কিছু ভাবারও অবকাশ পাই। যদিও এই পদযাত্রায় ছাত্রছাত্রীদের রোগ বিনাশের জন্য প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে জোরদার করার দাবিটিই ছিল প্রধান। কোনো চরম রোগ শরীরে বাসা বাঁধার পূর্বেই যাতে তা'কে ধ্বংস করা যায় এবং তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেই সমস্ত চিন্তার ফসলগুলি বিভিন্ন পোস্টার বা প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে স্টুডেনথ হেলথ হোম বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের হা'তে তুলে দেন। বাস্তবে দেখা যায়, বেশীর ভাগ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রথমজীবনের অবহেলিত অতি সামান্য রোগ পরবর্তীকালে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাছাড়া ঐ সামান্য রোগের ছোঁয়া সমগ্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করে। তাই রোগের শুরুতেই কোনো প্রতিষেধক টিকা বা ইনজেকসন্, অথবা প্রতিরোধক ওষুধপত্র ব্যবহার একান্ত অবশ্যক। স্টুডেনথ হেলথ হোমের সাথে প্রতিটা স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সেইজন্যই এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা বিশেষ জরুরী। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক হেলথ হোম গঠন ক'রে তার মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে মাসে দু'বার, অন্তত শরীর চেকআপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতি মাসে ডাক্তারসহ কোনো ভ্রাম্যমান গাড়ি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থিত হলে, আরো ভালো হয়। এবং ঐ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ওষুধগুলো বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও স্টুডেনথ হেলথ হোমকে নিতে হবে। এ-ব্যাপারে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলির এবং অন্যান্য কলেজ বা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে স্টুডেনথ হেলথ হোমের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এগিয়ে এলে এই ব্যাপক সমস্যাকে সমাধান করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

এ-তো গেল শহর অঞ্চলের কথা। গ্রাম অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ঐ একই সমস্যা ছড়িয়ে আছে। বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রে দু'বেলা পেটভরানোর তাগিদে সারাদিনের পরিশ্রমের পর, অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের শরীর বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু ভেবে দেখাকে অহেতুক বিলাসিতা বলেই মনে ক'রে থাকেন। তার উপর আছে অজ্ঞতা বা শিক্ষার অভাব। গ্রামাঞ্চল বা কলকাতার বাইরে নিম্ন আয়ের শ্রমিক-অধ্যুষিত কলোনি-গুলির ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক প্রশ্নটি তাই আরো জটিল। সুতরাং, বর্তমানে শুধু শহরমুখী চিন্তার আবরণে আটকে না থেকে স্টুডেনথ হেলথ হোমের বিভিন্ন শাখাকে ঐ-সমস্ত গ্রাম ও কলোনি অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে, সরকারের কাছে বাজেট থেকে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উন্নয়নখাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি রাখা যেতে পা'রে। তাতেও পুরোপুরি আর্থিক ঘাটতি না মিটলে, স্টুডেনথ হেলথ হোম বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘরের দরজায় দরজায় গিয়ে সাহায্যের আবেদন রাখতে পারেন।

বিগত কয়েক বছরে দেখা গেছে যে, ছাত্রছাত্রীদের প্রায় বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র সরবরাহের জন্য স্টুডেনথ হেলথ হোম নামক সংগঠনটির অস্তিত্ব কলকাতার প্রায় বেশীরভাগ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই জানত না। শুধুমাত্র কয়েকটি নামজাদা স্কুল-কলেজের অহেতুক পৃষ্ঠপোষকতা ও উপযুক্ত প্রচারের অভাবেই অন্যান্য স্কুলগুলি এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেনি। সুতরাং, বর্তমানে গ্রাম-শহর-বস্তি-উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত অথবা, কোনো মানের প্রশ্ন ব্যতিরেকেই সমতার ভিত্তিতে সমস্ত স্কুল, স্টুডেনথ হেলথ হোমের এই সুযোগটুকুকে কাজে লাগাতে পারবে। কারণ, স্টুডেনথ হেলথ হোমের বক্তব্য এখন খুবই পরিষ্কার: ছাত্রছাত্রীদের নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন করা এবং খুব স্বল্প সুযোগকেও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষেরই এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। পূর্ণবয়স্ক যে-কোনো নাগরিকই আজকের বা আগামীদিনের এইসমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভিভাবকের স্থান নিয়ে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা উন্মোচনের খুব সামান্য এই রাস্তাটুকুকেও দেখিয়ে দিতে পারেন। সেদিন শহীদ মিনারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটাই পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, ছাত্রছাত্রীদের শরীর সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে শুধু সরকার বা কোনো সংগঠনের একার পক্ষে পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব নয়; সমগ্র মানুষের মিলিত প্রয়াসেই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অসুখ থেকে সুখের পথে নিয়ে যাওয়া সফল হতে পারে।

পরিশেষে, স্টুডেনথ হেলথ হোম তাদের নৈরাশ্যজনক ঝিমিয়ে যাওয়া ভাবটিকে কাটিয়ে উঠে আজ যে ভাবে নব-প্রচেষ্টায় ও নিবিড় উদ্যোগে রাস্তায় নেমে এসেছেন, তাকে আবার সাধুবাদ জানাই। আশাকরি, তারা বর্তমানের এই স্বল্প বাতাবরণকে মূলধন করেই ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলার সমগ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে, সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সচেষ্ট হবেন। কলকাতার কর্মব্যস্ত মানুষের মনের কোণে বহু গোপনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নের শিকড়টিকে সুখ ও সৌন্দর্যের গান গেয়ে তারা যে-ভাবে প্রভাবিত করছেন, তাকে কখনই নষ্ট হ'তে দেবেন না—বরঞ্চ, ঐ শিকড়টিকে স্বপ্নের আরো গভীরে পৌঁছে দিতে পারবেন।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

শক্তির উৎস

গোটা বিশ্বজুড়ে এখন শক্তি সংকট চলছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক প্রয়াস চলেছে শক্তির উৎস সন্ধানে। জিজ্ঞাসু পাঠক মনের কাছে এই কর্মকাণ্ডের কিছু তথ্যভিত্তিক আলোচনার তাগিদেই আমাদের বর্তমান ভাবনা। লেখাটি কয়েকটি কিস্তিতে বেরোবে। এই সংখ্যার বিষয় সৌরশক্তি।

—সম্পাদকমণ্ডলী

সৌরশক্তি/সূর্য্য—প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল সূর্য্য। সূর্য্য থেকে বেরিয়ে আশা তাপশক্তি ও আলোকশক্তিকে মানুষ যেমন ভয়ও পেয়েছে তেমনি শ্রদ্ধাও জানিয়েছে। আবার সূর্য্য-নির্গত তাপশক্তি ও আলোকশক্তি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সৌর-শক্তিকে নিজের প্রয়োজনে মানুষ সভ্যতার সেই আদিযুগ থেকেই ব্যবহার করে আসছে।

ফসল শুকানোর কাজে সৌরশক্তির ব্যবহার সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল যেদিন থেকে মানুষ ফসল উৎপাদন করতে শিখেছে। আজও এই কাজে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যভাবে সৌরশক্তির ব্যবহারের কথা বলতে প্রথমেই মনে আশে আর্কিমিডিসের কথা। খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দেই যিনি সূর্য্যালোক ব্যবহার করে আগুন জ্বালাতে পেরেছিলেন। তারপর সৌরশক্তিকে সমাজ-সভ্যতার কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত আছে। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে আসে ফ্রান্সের মিঃ মোচট্ (Mouchot)-এর কথা। যিনি সেই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সৌরশক্তি ব্যবহার করে একটি পাম্প চালান। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ফ্রাঙ্ক শ্যুমান (Frank Schuman) এক সাংঘাতিক কাজ করলেন। মিশরে তিনি এক চোঙাকৃতি প্রতিফলক (Cylindrical Reflector) বসালেন যার আয়তন ছিল ২৩০০০ বর্গফুট। এই বিশাল প্রতি-ফলকের উপর সূর্য্যালোক ফেলে তা দিয়ে জল গরম করে বাষ্প উৎপন্ন করে, সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালিয়ে তিনি ৫৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন এক পাম্প চালালেন। তার চেয়েও উন্নতভাবে সৌরশক্তির ব্যবহার করলেন ইতালীর জেনোয়ার অধিবাসী জি. ফ্র্যান্সিস্। সেটা ছিল ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ। ফ্র্যান্সিসের ব্যবস্থায় ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি যে পরি-মাণ তাপশক্তি উৎপাদন করতে পারে সেই পরিমাণ তাপ উৎপাদিত হয়েছিল।

সৌরশক্তি থেকে তাপ অথবা আলোক সরাসরি পাওয়া যায়। কিন্তু মানবসভ্যতার দ্রুত অগ্রগতিতে সর্বাধিক সাহায্য-কারী বিদ্যুৎশক্তি কিন্তু সরাসরি সূর্য্য থেকে পাওয়া যায় না। তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি অথবা জলপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য যেমন বিশেষ ধরণের কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয় সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য তেমনি কিছু বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয় ও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য সরাসরি সৌরশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার বন্ধ করা যায়। যেমন জলগরম করার ক্ষেত্রে। বৈদ্যুতিক হীটার-এর পরিবর্তে সৌরশক্তির ব্যবহারে জল গরম করা সম্ভব। শীত প্রধান দেশে বাড়ীঘর গরম রাখার জন্য সৌরশক্তির ব্যবহার চালু করা সম্ভব। কৃষিজ ও পশুজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারে সৌরশক্তি অনায়াসেই ব্যবহার করা যায় ও হচ্ছে। লবন উৎপাদনে সৌর-শক্তির ব্যবহার বহুকাল থেকেই চালু আছে। সৌরশক্তির ব্যবহারে মূল সমস্যাটা হল সূর্য্যালোক ও তাপকে একজায়গায় সংগৃহীত করা। ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ সৌরশক্তি প্রতিদিন এসে পৌঁছায় তা দিয়ে সতের হাজার কোটি মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত এই বিপুল পরিমাণ সৌরশক্তির সবটুকু সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। তবে তাকে বেশকিছুটা অন্ততঃ মানবসভ্যতার কাজে লাগানো যায়।

প্রতিফলক পদ্ধতি ও ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতিতে সৌর-শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়। প্রতিফলক পদ্ধতিতে প্রথমতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থিত প্রতিফলক-এর (আয়না অথবা পালিশ করা কোন ধাতব পাত) উপর সূর্য্যরশ্মি ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিফলকের উপর সূর্য্যকিরণ পড়লে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির তাপ অনেকগুণ বেড়ে যায়। এবার সেই তাপ কাজে লাগিয়ে জল গরম করা হয়। জল ফুটিয়ে বাষ্প করতে পারলে সেই বাষ্পকে অতিরিক্ত চাপে টারবাইন-এর উপর ফেলতে পারলে টারবাইন ঘোরান সম্ভব আর টারবাইন ঘুরলে তার সাথে জেনারেটর সমন্বিত থাকলে তাও ঘুরবে। আর জেনারেটর ঘুরলেই পাওয়া যাবে বহু কাঙ্ক্ষিত বিদ্যুৎশক্তি। এই হল সংক্ষেপে প্রতিফলক পদ্ধতিতে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কার্য-পদ্ধতি। সৌরশক্তির প্রতিফলকগুলির বৈজ্ঞানিক নাম তাপ সংগ্রাহক বা থার্মাল কালেক্টর। সূর্য্যরশ্মি প্রথমতঃ পড়ছে প্রতিফলকের উপর। প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির তাপকে কাজে লাগিয়ে পাশের ট্যাঙ্কের জল গরম করে বাষ্পে পরিণত করা হচ্ছে। সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালানো হবে। তারপর বাকী থাকে শুধুমাত্র জেনারেটর সংবর্দ্ধিতকরণের কাজ। এবার আসা যাক ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতিতে। ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতি হল সংক্ষেপে এইরকম,—দুটো বিসদৃশ পদার্থ, পাশা-পাশি রাখলে তাদের মিলনমূলে যদি অতি-বেগুনী রশ্মি পড়ে তাহলে তড়িৎ-চালক বল সৃষ্টি হয়। সূর্য্য রশ্মিতে অতি-বেগুনী রশ্মি আছে। এখন এমন একটি ব্যবস্থা করা হল যার

মধ্যে দুটো বিসদৃশ পদার্থ পাশাপাশি সংযুক্ত আছে এবং যার মিলনস্থলে সূর্য্যরশ্মি পড়তে পারে। তাহলে আমরা তার থেকে সরাসরি তড়িৎ-চালক বল পাব। আর তড়িৎ-চালক বল হল বিদ্যুৎশক্তির আধার। সুতরাং এই ব্যবস্থায় সরাসরি বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়। আর এই ব্যবস্থাটির নাম হল ফোটো-ভোল্টাইক সেল। এর সুবিধা হল যে এর সমস্ত অংশগুলি স্থায়ী (কোনপ্রকার নড়াচড়া করে না), আলাদা কোন শক্তি ব্যবহার করে একে উজ্জীবিত করতে হয় না। সর্বোপরি রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব ভীষণ কম। ফোটোভোল্টাইক সেলের সাধারণ নাম হল 'সোলার সেল'। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সোলার সেল প্রথম চালু হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। সোলার সেলের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে সামুদ্রিক বয়া, লাইট হাউস, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মাইক্রোওয়েভ রিলে স্টেশন, বন প্রভৃতি কার্যে সোলার সেল ব্যবহৃত হচ্ছে।

সৌরশক্তির ব্যবহার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুরু হয়ে গেছে। জাপানে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে সৌরশক্তি পরিচালিত একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নিয়ে এখন গবেষণ চলছে। আশা করা যায় ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এটি চালু হবে। ফ্রান্সের ওভেলিওতে একটি সৌরশক্তি পরিচালিত তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইতালীতে ৪০০ কিলো-ওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন একটি সৌরশক্তি পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরেকটি ১ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আমেরিকার নিও মেক্সিকোয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণা সবদেশেই চলছে।

ভারতবর্ষেও সৌরশক্তির ব্যবহার নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। তবে ভারতবর্ষের কোথাও এখনও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সৌরশক্তির ব্যবহার হয়নি।

পরিশেষে একথা নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে সৌরশক্তি আগামী দিনে ব্যাপকভাবে মানবসমাজের অনুকূলে কাজ করবে।

(ক্রমশঃ)

বহরমপুর ব্লক যুব উৎসবে কথক নৃত্যরত শিশুশিল্পী।

ব্লক যুব উৎসবে বালিকাদের কবাডি প্রতিযোগিতা

দিলীপ ভট্টাচার্যের তুলিতে—

এসো মন্ত্র কর......

শিল্প-সংস্কৃতি

দু'টি মেলা তিনটি উৎসব

কলকাতা বইমেলা

কলকাতা ময়দানে গত ১৪ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের উদ্যোগে পঞ্চম বইমেলা অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল। ১৯৭৬ সালে প্রথম যখন এই বইমেলার উদ্যোগ পর্ব শুরু হয়, তখন থেকেই কলকাতার গ্রন্থ-প্রেমিক মানুষ এই মেলার প্রতি একটা অমোঘ আকর্ষণ অনুভব ক'রেছিলেন। বই না কেনা গেলেও, শুধুমাত্র যদিচ্ছ বই নাড়াচাড়ায়ও যে কিছুটা গ্রন্থ-পিপাসা মেটে সেই প্রথম টের পাওয়া যায়। এবং প্রধানত সেই সূত্রেই কলকাতা বইমেলা প্রথম আবির্ভাবেই বই-প্রেমিকদের হৃদয় জিতে নেয়। বইমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর উদ্যোক্তারা বলেছেন, আমাদের আরো আগ্রহ জাগানো এবং নিয়মিত বই কেনার অভ্যেস তৈরী করা। বস্তুত, আমাদের যখন সততই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তখন বই বিষয়ে তত সচেতন থাকা নিয়ত সম্ভব হয় না। আন্তরিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তেল-নুনের হিসেব ক'রে ফের বই কেনাটা সত্যিই একধরণের বিলাসিতা হ'য়ে পড়ে। তাই গ্রন্থ-বিপননে সেইসব মানুষের কাছে এই বইমেলা আক্ষরিক অর্থেই একটি উপহারের মত। সে কারণে এ-বছর বই মেলার অনিশ্চয়তার সংবাদে বই প্রেমিকেরা স্বভাবতই ঈষৎ বিষণ্ণ ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা যে ওই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হইনি, সেজন্য রাজ্যসরকার এবং মেলার উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন।

এ-বছরের মেলায় কলকাতার বিভিন্ন নামী দামী প্রকাশক ছাড়াও অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানও তাঁদের পসরা সাজিয়ে ব'সেছিলেন। ক'দিনের জন্য সারা কলেজষ্ট্রীট পাড়াটাই যেন উঠে এসেছিল এই ময়দানে। শুধু আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানই নয়, কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও এই মেলার মর্যাদাবৃদ্ধিতে সাহায্য ক'রেছিল। বিভিন্ন প্রকাশকের বিভিন্ন ধরনের বইয়ের বিস্তৃত তালিকা থেকে প্রত্যেকেই নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী বই সংগ্রহ ক'রতে পেরেছেন। এছাড়া মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল এইসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেকগুলি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের নিজস্ব স্টল। একমাত্র এ'রাই দোকানদারীর শ্বাসরুদ্ধতার মধ্যে অনেকটা খোলাবাতাস খেলাতে পেরেছিলেন। এ-বছর মেলায় মিনি বই প্রকাশনার একটি অদ্ভুত প্রবণতা দেখা গেছে। মিনি মহাভারত থেকে মধুসূদন, সুকুমার রায় গরম কেকের মত বিকিয়েছে। আশ্চর্য এরই পাশাপাশি সাঁইবাবা প্রকাশনের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্টলেও মন্দ ভিড় ছিল না।

প্রতিবছরের মত এবারের বইমেলার বিক্রী বেড়েছে, লোক সমাগম বেড়েছে। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে, অংকের হিসেবে এই মেলার সাফল্য বিশেষ নয়ন-সুখকর হ'লেও, বইমেলার সাফল্য মেলার মাপকাঠি হিসেবে বেশ ভঙ্গুর। কেননা, এতে কিছু মুষ্টিমেয় বই-ব্যবসায়ীর আখেরে কিছু লাভ হ'য়ে থাকলেও, ৫/৬ লক্ষ বই-পোকা মানুষের কাছে এটা তেমন কোন আহামরি সার্থকতা আনে না। এই মেলার যতটুকু সাফল্য তা আসলে নির্ভরশীল মেলায় উপস্থিত অসংখ্য বই পাগলদের সক্রিয় অংশগ্রহণে। ব্যবসায়ীদের শুধু দোকান সাজিয়ে বসা ছাড়া আর তেমন কোন উজ্জ্বল উদ্যোগ নেই, যা গ্রন্থ পিপাসুদের অনিবার্যভাবে মেলাপ্রাঙ্গণে টেনে আনতে পারে। আসলে এ'রা মেলায় এসেছেন বইয়ের প্রতি অপার ভালোবাসায় এবং কৌতূহলের টানে। নইলে স্বল্প-পরিসর মণ্ডপগুলিতে না আছে কোন শৈল্পিক পারিপাট্য, না আছে পুস্তক তালিকা সরবরাহ বা প্রচারে তেমন কোন চোখে পড়ার মত দৃষ্টান্ত, না আছে বই সাজানোর কোন সুশৃঙ্খল সুষমা, না আছে তেমন কোন দুর্লভ গ্রন্থের সমারোহ এবং সর্বোপরি নেই সুলভ মূল্যে বই সরবরাহের কোন আবশ্যিক উদ্যোগ।

এই বইমেলায় ক্রেতাদের কাছে যেটা সবচেয়ে ক্ষোভের ব্যাপার তাহ'ল, এখানকার ডিস্‌কাউন্টের কৃপণতা। কলেজ-ষ্ট্রীট পাড়ায় পাবলিসারের ঘর থেকে বই নিলে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে হেসে-খেলে ১৫ থেকে ২০ পার্সেন্ট এবং ইংরেজী বইয়ে ১২/১৩ পার্সেন্ট ছাড় পাওয়া যায়ই। তাহ'লে কি মানে হয় বহুদূর থেকে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে এখানে এসে ধুলো-খেয়ে, ভিড় ঠেলে এখান থেকে বই কেনার! অবশ্য বইমেলায় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রতিদিন ছিল তাহ'ল বই বাজার। ছাই ঘেঁটে সেখানে হঠাৎই পেয়ে যাওয়া যেত অনেক দুর্লভ বই। কিন্তু কোন দুরূহ কারণে এবার ক্রেতারা বই বাজারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'লেন. বোঝা গেল না।

বস্তুত, এই মেলার ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন মনে হয়, এই মেলা থেকে পুস্তক ব্যবসায়ীদের ফায়দালোটা এবং কিছু শহুরে বাবুর ইন্টেলেকচুয়াল সাজার অর্থহীন প্রয়াসকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া এই মেলার বোধহয় আর খুব-বেশি গুরুত্ব নেই।

শিল্পমেলা

শিল্পকলাকে জনমুখী করার জন্য, শিল্পী ও জনগণের মধ্যে মেলা বসানোর ঐকান্তিক বাসনায়, শিল্পকলা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার প্রয়াসে এবছরও ১৭ই মার্চ থেকে ২৩শে

মার্চ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর উদ্যোগে কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্পমেলার আয়োজন হ'য়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রামকিংকর, গোপাল ঘোষ প্রমুখ খ্যাতিমান শিল্পীদের শিল্পসম্ভারের পাশাপাশি অনেক তরুণ শক্তিমান শিল্পীর চিত্রও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। এ ছাড়া ছিল কিছু প্রখ্যাত বিদেশী শিল্পীর ছবির প্রিন্ট। প্রদর্শনীর পাশাপাশি মুক্তমঞ্চে প্রতিদিন শিল্প সমালোচকদের বিদগ্ধ আলোচনা, সংগীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। এই শিল্পমেলা জনসাধারণের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। মেলার শেষদিনে প্রখ্যাত শিল্পী এবং ভাস্কর রামকিংকর বেইজকে সম্বর্ধিত করার কথা থাকলেও শিল্পীর অসুস্থতার কারণে তা শেষপর্যন্ত আর সম্ভব হয় নি। শিল্প যে সো-কেসে সাজিয়ে রাখার সামগ্রী নয়, তা যে জনসাধারণের জীবনযাপনের এক অপরিহার্য অঙ্গ, তা এই প্রদর্শনী আরেকবার প্রমাণ করলো।

চলচ্চিত্র উৎসব '৮০

বাংলা ছবির ৬০ বছর পূর্তি এবং 'পথের পাঁচালী'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার ৮টি প্রেক্ষাগৃহে ৭ দিন ব্যাপী এক চলচ্চিত্র উৎসব হ'য়ে গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তোলা ৬০টি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হ'য়েছে। একসাথে এতগুলো সৎ ছবি দেখার সুযোগ ক'রে দিয়ে রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন। কেননা, এই প্রথম একটি রাজ্য সরকার এরকম একটি প্রায়-সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করলেন, যা অবশ্যই একটি শুভ সংকেত রূপে বিবেচিত হ'তে পারে। বিকিনি-শাসিত হিন্দী ফিল্ম এবং ফরমুলা বন্দী বাংলা ছবির পাশাপাশি এই চলচ্চিত্র উৎসব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রূপে আমাদের স্মৃতিতে রয়ে যাবে বহুকাল।

বাংলা ছবির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৩২ সালে তোলা জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে শুরু করে ১৯৮০-এর বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' পর্যন্ত প্রায় ৪০টি নির্বাচিত বাংলা ছবি ছিল এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। বাংলাছবির শৈশব অবস্থা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যা একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির ছবি স্পর্শ করে। ছবিগুলির নির্বাচনেও ছিল একরূপ দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা—শুধু শৈল্পিক উৎকর্ষতার ভিত্তিতে এগুলি নির্বাচিত হয়নি, বরং একটি ব্যাপক সাধারণ মানের ছবি প্রদর্শিত হ'য়েছে, যা থেকে বাংলাছবির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমরা খুব সহজেই পেয়ে যায়। ৩০, ৪০ দশকের ছবিগুলি প্রকৃতপক্ষেই আমাদের প্রজন্মের কাছে একটি উজ্জ্বল উদ্ধার। তবে এই ব্যাপারে একটু অভিযোগ থেকেই যায়—বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনেকগুলি চিত্ররূপ উৎসবে প্রদর্শিত হ'লেও শরৎচন্দ্রের কোন ছবি উৎসবে দেখা গেল না। অথচ একসময়, এবং হয়তো আজো, শরৎচন্দ্রের গল্পের জোরেই অনেক ছবি বিস্ফোরক বক্স-অফিস পেয়েছে। ইতিহাসের খাতিরে শরৎচন্দ্রকে উপেক্ষা করার কোন যুক্তি নেই।

'পথের পাঁচালী'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সত্যজিৎ রায়ের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ ছবি উৎসবে দেখানো হয়েছিল। 'পথের পাঁচালী' যতবার দেখা যায় ততো যেন আয়ু বাড়ে, পুণ্যি হয়। সত্যজিতের সামগ্রিক চিত্রকর্ম থেকে গুটিকয়েক ছবি নির্বাচন করা খুব দুরূহ ব্যাপার হ'লেও তাঁর 'দেবী', 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ', 'জলসাঘর', 'মহানগর' উৎসবে থাকা আবশ্যক ছিল। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বা 'প্রতিদ্বন্দ্বী'কে উৎসব থেকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যেত। কেননা, এগুলি সাম্প্রতিককালে বহুবার প্রদর্শিত হ'য়েছে। তুলনায় এই প্রজন্মের দর্শকেরা তাঁর প্রথম দিকের ছবি দেখার সুযোগ খুব কমই পেয়েছেন।

ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক', 'সুবর্ণরেখা', 'কোমল গান্ধার' ইত্যাদি ছবিগুলো এই উৎসবের মর্যাদা বৃদ্ধিতে দারুণ সহায়ক হ'য়েছিল। তাছাড়া পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র' বারীণ সাহার 'তের নদীর পারে', নারায়ণ চক্রবর্তীর 'দিবারাত্রির কাব্য', সৈকত ভট্টাচার্যের 'একদিন সূর্য', শংকর ভট্টাচার্যের 'দৌড়', মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন', এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' ছিল উৎসবের সম্পদ বিশেষ। উৎপল দত্তের 'ঝড়' একটি সেলুলয়েডের যাত্রা হিসেবে দেখতে মন্দ লাগে না। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' সম্পর্কে দর্শকদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। দারিদ্র্যের এই রকম ডকুমেন্টারী আমরা কলকাতা '৭১-এও দেখেছি। অবশ্য এই ছবির অভিনায়িক দৃঢ়তা একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কেননা, এই ছবির কোন শিল্পীই অভিনয় করেন না। শংকর ভট্টাচার্যের 'দৌড়' রাজনৈতিক ভ্রষ্টতার একটি সাহসিক দলিল হিসেবে স্মরণীয়।

বাংলাছবি ছাড়া ২০টি মারাঠি, মালয়ালম, কানাড়ী, তামিল, উর্দু, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া ছবিগুলিও দর্শক আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। দক্ষিণ ভারতীয় ছবিগুলি আমাদের সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল কেন্দ্রিক অহংকারের ওপর একটি সজোরে চপেটাঘাত করে যায়। ভাষার ব্যবধান ছাড়িয়ে (সব ছবিতে সাব-টাইটেল ছিলনা) ছবিগুলি অনায়াসে আমাদের অধিকার ক'রে নেয়। বিশেষত, 'ওকা উরি কথা', 'কোপিয়েওম', 'অশ্বত্থমা', 'আমপু', 'চিতেগু চিন্তি', 'গহণ', 'সর্বপ্রাথা মা ভূমি', 'ঘাসিরাম কোতোয়াল', ইত্যাদি ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক-একটি অক্ষর মাইলস্টোন হ'য়ে থেকে যাবে। এরমধ্যে 'ঘটশ্রাদ্ধ' ছবিটিকে উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে চিহ্নিত করা যায়। গ্রামীণ জাতপাতের সমস্যা ছবিটির আলোচ্য বিষয়। ছবির মূল দু'টি চরিত্র যমুনা এবং মানীর ভূমিকানেতৃদ্বয় অভিনয় নৈপুণ্যে বুকের মধ্যে তীব্র মোচড় দিয়ে যায়। এই যমুনা নামে যুবতীটি এবং মানী নামে চালকটিকে দেখে, কার্যকারণ হীন ভাবে হ'লেও 'পথের পাঁচালী'র অপু, দুর্গাকে মনে পড়ে যায়।

ওড়িয়া ছবি 'বাতিঘর' (কাহিনী বুদ্ধদেব গুহ) স্বচ্ছ কাহিনী চিত্র হিসেবে দাগ কাটে।

হিন্দীছবির জগতেও যে একটা নতুন বাতাস এসেছে তা স্পষ্ট হয় সৈয়দ মির্জার দু'টি ছবি 'অরবিন্দ দেশাই কি জীবন দর্শন' এবং 'আলবার্ট পিন্টো ক গোস্যা কিউ আয়া' বিমল দত্তের 'কস্তুরী', শ্যাম বেনেগালের 'কল্দুর', বিপ্লব রায়চৌধুরীর 'শোধ' ইত্যাদি ছবিগুলি দেখে। 'অ্যালবার্ট

পিন্টো'র শেষদৃশ্যে পর্দায় মশালের, রক্ত পতাকার লাল আগুনে লাগা একটি স্মরণীয় শিল্প সৃষ্টি। 'শোধ' ছবিটি এবছরের শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের জন্য পুরস্কৃত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। ছবিটির ফটোগ্রাফিক অসাধারণতা এবং বক্তব্যের দৃঢ়তা আমাদের খুব অনিবার্যভাবে ছুঁয়ে যায়। বেনেগালের 'কন্দুরা' আমাদের শোচনীয়ভাবে হতাশ করে। একটি প্রায় মিথোলজিকাল আখ্যান অবলম্বনে সত্তর দশকে ছবিটি তোলার অর্থ ঠিকঠিক অনুভব করা গেল না।

উৎসবে কাহিনী চিত্রগুলি ছাড়াও রবিশংকর, ইনার আই, এ হিস্ট্রি অফ ফিল্ম মেকিং, এবং পাকা ফসলের কড়চা ইত্যাদি তথ্যচিত্রগুলিও যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। বিশেষত শেষ ছবিটা একটি হাতিয়ার বিশেষ। জোতদার-জমিদারের শঠতা এবং ভূমিহীন কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এই ছবির প্রতিপাদ্য ব্যাপার। এর কয়েকটি দৃশ্যে যথাক্রমে জোতদারের ধান লুঠ করা এবং পাকা ধানের ক্ষেতে আগুন লাগানো এক নয়া দাঁড়ি পাল্লার মধ্যে অসহায়, পঙ্গু যুবক ডোমনের ক্লান্ত, উদ্দীপ্ত চোখ স্মরণীয় শিল্পকাজ। ছবিটি এই মুহূর্তে কলকাতার ঠান্ডা প্রেক্ষাগৃহ থেকে মুক্ত করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া একটি আবশ্যিক কর্তব্য।

এই চলচ্চিত্র উৎসব চিত্র নির্বাচনে একটি বিশেষ চরিত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ধনতান্ত্রিক পণ্যচিত্র এবং পর্ণোচিত্র ছাড়াও যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে সৎ চলচ্চিত্র তৈরী সম্ভব এবং তা যে যথেষ্ট দর্শক আনুকূল্যও পেতে পারে এই উৎসব তা আরেকবার প্রমাণ করে দেয়। বাঙ্গালোর চলচ্চিত্র উৎসবে যেখানে দর্শক যৌনাত্মক চিত্র প্রদর্শনের দাবিতে প্রেক্ষাগৃহে ভাঙচুর করে, সেখানে কলকাতা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের একটি ঐতিহাসিক দলিল হ'য়ে রইল। এই উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু যে আর্ট ফিল্ম-থিয়েটারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন, আমরা আশা করি, তা শুধুমাত্র একটি মিনার হ'য়েই থাকবে না, সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে তা হবে একটি বিস্ফোরক প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

গণনাট্য উৎসব

বাংলা শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণনাট্য সংঘের একটি বিশেষ অবদানের কথা সর্বজনজ্ঞাত। চল্লিশের দশকের সেই ব্যাপক সংস্কৃতি আন্দোলনকে ইতিহাসের পাতা থেকে গত ১৯ এবং ২০শে এপ্রিল দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। গণনাট্য উৎসব প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে স্টুডেন্ট হেলথ্ হোমের সাহায্যার্থে উৎসবটি সংগঠিত হয়।

কবি ইকবাল রচিত 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' গানটি গেয়ে উৎসবের উদ্বোধন হয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উদ্বোধনী ভাষণে সামাজিক অগ্রগতিতে শিল্প-সংস্কৃতির বলিষ্ঠ ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর শম্ভু ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় 'কল অফ দ্য ড্রামস' প্রতীক নৃত্যানুষ্ঠান শ্রোতাদের আনন্দিত করে।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল সেকাল এবং একালের গণ-সংগীত। তবে শ্রোতারা সমকাল অপেক্ষা ৩০/৪০ দশকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। সলিল চৌধুরীর গান এখনো শ্রোতাদের সঞ্চারিত করে, এর প্রমাণ আরেকবার পাওয়া গেল। এবং একক সংগীতে সুচিত্রা মিত্রের তুলনা তিনি নিজেই।

এছাড়া নবান্ন, নীলদর্পণ এবং কিমালিসের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় তৎকালীন নাট্য আবহকে তুলে ধরতে সক্ষম হ'য়েছিল। তৎকালীন প্রতিষ্ঠান-বিরোধী শিল্পীরা আজ যে নিজেরাই এক একটি প্রতিষ্ঠান হ'য়ে গেছেন, সেজন্য দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক।

পঁচিশে বৈশাখ

প্রতিবছরের মত এবারের ২৫শে বৈশাখের পবিত্র সকালে বহু রবীন্দ্র-মনসক মানুষ সমবেত হ'য়েছিলেন রবীন্দ্রসদন এবং জোড়াসাঁকোর মুক্ত রবীন্দ্রানুষ্ঠানে। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও ২৫শে বৈশাখের আরেকটি তাৎপর্য প্রায় দুই দশক ধ'রে বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহ্যের সাথে ভীষণ ভাবে ওতপ্রোত হ'য়ে গেছে। এই দিনে অসংখ্য ছোট-ছোট পত্রিকার প্রকাশনা যেন এই কথায় প্রমাণ করে যে, ২৫শে বৈশাখ শুধু রবীন্দ্রনাথেরই জন্মদিন নয়, তা আসলে বাংলা সাহিত্যেরই জন্মদিন। তাই নিঃসন্দেহে, পেটমোটা বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির পাশাপাশি দুর্বিনীত চ্যালেঞ্জের মত, এইসব লিটল্ ম্যাগাজিনের প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা, এ-কথা কে-না জানে যে, এইসব পত্র-পত্রিকাগুলিতেই আছে সেই অমোঘ শক্তি যার নাম যুবন্, এবং যা সাহিত্যের ন্যুব্জ মেরুদণ্ডকে, ক্ষয়া-খর্বুটে প্রবাহকে, টানটান রাখতে সাহায্য করে। সে কারণে পক্ষকাল ব্যাপী ফুলে, গানে, পদ্যে, পুরোহিতে রবীন্দ্র পুজোর তুলনায়; সমবেত সংস্কৃতি-মনসক মানুষের ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে, বৈশাখের প্রখর নিদাঘ উপেক্ষা ক'রে কবির প্রতি, বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই হ'ল শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

—উপল উপাধ্যায়

মস্কো অলিম্পিক : সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া

অধ্যাপক অশোক দাশগুপ্ত

বিশ্বের সকল দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার এবং তা আরোও দৃঢ় ও সংহত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৮৯৬ সালে প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অলিম্পিকের মহান আদর্শকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ২১টি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বিশ্বের সকল দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় অলিম্পিকের ২২তম অনুষ্ঠান আগামী ১৯শে জুলাই থেকে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে হতে চলেছে। অলিম্পিকের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আজ থেকে ছ' বছর আগে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে ১৯৮০ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা মস্কোতে অনুষ্ঠিত হবে তখন কমিটিকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ার সরকারগুলি এবং তাদেরই পাশাপাশি খেলাধুলাকে যারা নিছক পণ্যে পরিণত করেছে সেই সব ব্যবসায়ী, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্তকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তারা প্রথম থেকেই সুযোগ খুঁজছিল কিভাবে মস্কোর অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে বানচাল করা যায়। কথায় আছে দুর্জনের সুযোগের অভাব হয় না। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনাকে তারা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করল। সম্প্রতি আফগানিস্থান সরকারের আমন্ত্রণে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসা এবং আফগানিস্থানে সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতির ঘটনাকে সুযোগ হিসাবে এরা গ্রহণ করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার মস্কো অলিম্পিক বর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে প্রচারে নেমে গেছেন। বিভিন্ন দেশের সরকারের উপরও তাঁরা এই প্রশ্ন নিয়ে চাপ দেবার চেষ্টা করছেন। আজ যখন দুনিয়ার সর্বত্র ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীরা অধীর আগ্রহে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তখনই সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার এই নেতারা খেলাধুলার ক্ষেত্রে রাজনীতিকে টেনে আনছেন, মরীয়া হয়ে মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে নেমে গেছেন। মস্কো অলিম্পিক বানচাল করার জন্য কেন এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা—এই প্রশ্ন আজ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীরা নিশ্চয়ই করতে পারেন।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতা : সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থান

বিগত কয়েকটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ফলাফল যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে প্রথমেই যেটা বিশেষভাবে চোখে পড়বে তা হল সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রীড়াবিদদের বিস্ময়কর সাফল্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের মত খেলাধুলার জগতেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিস্ময়কর অগ্রগতি ও সাফল্যকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকেরা খুব স্বাভাবিক কারণেই বরদাস্ত করতে পারে না। পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকেরা দুনিয়ার সাধারণ মানুষদের ধাপ্পা দেবার জন্য প্রচার করে যে খেলাধুলায় রাজনীতির কোনও স্থান নেই, খেলাধুলার জন্যই খেলাধুলা। কিন্তু এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অন্যান্য সকল জিনিষের মত খেলাধুলাকেও নিছক মুনাফা সৃষ্টিকারী একটি পণ্য হিসাবেই দেখা হয়। এই ব্যবস্থায় খেলাধুলা শাসকশ্রেণী ও শোষকশ্রেণীর রাজনীতির উর্ধ্বে কিছুতেই থাকতে পারে না। কিন্তু অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি যে সমস্ত দেশ পুঁজিবাদের শৃংখল ভেঙে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে সেই সব দেশে অন্যান্য সকল জিনিষের মত খেলাধুলাও পরিচালিত হয় একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবকিছু করা হয় সমাজের সকলের প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্য নিয়ে। ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক মালিকানায় চালানো হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেশের সকল সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শৃংখলা সৃষ্টির জন্য শিশু থেকে শুরু করে সকলের জন্য খেলাধুলার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্যান্য সকল বিষয়ের মত খেলাধুলারও নিয়ন্ত্রণ হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও আদর্শ। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে খেলাধুলাকে পণ্য হিসাবে দেখার কোনও প্রশ্নই আসে না। এখানে প্রতিটি মানুষের জীবনে অন্যান্য কাজের মত খেলাধুলাও অবশ্য করণীয় একটি কাজ। এই ধরণের ব্যবস্থার মধ্যে খেলাধুলার উন্নতি ঘটতে বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দুনিয়ার সকল ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুনিয়ায় যেমন

বিশেষ স্থান দখল করেছে তেমনই খেলাধুলোর জগতেও নিজেদের শক্তির জোরেই বিশিষ্ট স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার কর্ণধারেরা অলিম্পিক আসর থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে দূরে রাখার চেষ্টা প্রথম থেকেই করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসর থেকে দূরে সরিয়ে রাখা আর সম্ভব হল না। ১৯৫২ সালে অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার সময় থেকেই সোভিয়েত রাশিয়া এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি স্বাস্থ্যচর্চার আশ্চর্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যুবশক্তি আজ পূর্ণ মর্যাদায় অলিম্পিক ও খেলাধুলোর অন্যান্য আসরে অংশগ্রহণ করছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রীড়াবিদেরা একের পর এক বিস্ময়কর রেকর্ড স্থাপন করার সংগে সংগে দুনিয়ার সকলের সামনে আদর্শবোধের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তও উপস্থিত করতে সক্ষম হচ্ছেন। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন থেকে শুরু করে ছোট দেশ কিউবা, উত্তর কোরিয়া—সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্রীড়াবিদেরা খেলাধুলোর আসরেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারছেন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকেরা ও খেলাধুলোর ব্যবসায়ীরা এ জিনিষ কি করে সহ্য করবে? খুব স্বাভাবিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতি এদের ক্ষিপ্ত করছে।

অলিম্পিক অনুষ্ঠান: সোভিয়েত সরকার ও জনগণ কি দৃষ্টিতে দেখছেন?

সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিকে প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৫২ সালে। অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার তিন দশক পরে সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব পেয়েছে। ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর থেকেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিয়েছে। অলিম্পিক কোনও মামুলী অনুষ্ঠান নয়। বিশ্ব মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শকে সামনে রেখে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ামোদী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মস্কোতে সমবেত হবেন। এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা পরস্পর ভাব বিনিময়, সংস্কৃতির বিনিময় করার সুযোগ পাবেন। এই কারণেই সোভিয়েত সরকার ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য যেন মেতে উঠেছেন। বিগত সাড়ে তিন বছর প্রস্তুতিপর্বে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিকরা অলিম্পিকের প্রস্তুতির কাজ দেখতে মস্কো গেছেন। তারা সকলেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের উদ্যোগ দেখে অভিভূত হয়েছেন। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অলিম্পিকের প্রস্তুতির কাজ দেখার জন্য কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীব সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় ফিরে এসে লিখেছেন, "The Moscow Olympic Games are scheduled to start in the third week of July. But go to any city of any republic of the USSR to-day, and it will seem to you that the games are starting tomorrow. The Modern Olympic Games had started way back 1896, but this is the first time in 84 years that a Socialist nation is going to hold it—and the arrangements, the Soviet people have made for the Games have over-shadowed all the previous efforts." (Sports World, ১৯৮০ সালের ১৯শে মার্চের সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত)

মন্ট্রিল বা মিউনিখ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যত খরচ হয়েছিল তার মধ্যে একটি বড় অংশ হয়েছে নতুন করে স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল ইত্যাদি তৈরী করার জন্য। কিন্তু দেশের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধুলোর উন্নতি ও প্রসারের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল ইত্যাদি আগে থেকেই তৈরী ছিল বলে ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য সেই সব আর নতুন করে তৈরী করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে মন্ট্রিল ও মিউনিখ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করার জন্য যা খরচ হয়েছিল তার চেয়ে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ কম খরচ হবে মস্কো অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে। অলিম্পিকের অধিকাংশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মস্কোতে। লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ ও মিনস্ক এই তিনটি শহরে ফুটবলের তিনটি গ্রুপের কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ফুটবলের সেমিফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলাগুলি হবে মস্কোতে। পাল তোলা নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হবে বাল্টিক সাগর তীরবর্তী শহর আল্লিনে। এতগুলি জায়গা জুড়ে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় প্রতিটি দেশের ক্রীড়াবিদ, প্রতিনিধিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, কোনও বিদেশী পর্যটকের যাতে এতটুকু সমস্যায় পড়তে না হয় তার জন্য খুঁটিনাটি সব দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। অলিম্পিকের মত একটি বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সফল করতে হলে প্রচুর কর্মী প্রয়োজন। দেড় লক্ষ কর্মীর নাম ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত করে তাদের সকলকেই ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকের কাজ অনুযায়ী। অলিম্পিকের সময় ৪৫টি ভাষায় দোভাষী হিসাবে যারা কাজ করবেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ। ভাষাগত পার্থক্য যাতে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের সামান্য অসুবিধা সৃষ্টি না করতে পারে তার জন্য বিমানসেবিকা, বিমানবন্দরের কর্মী মিলিশিয়া, পর্যটন বিভাগ, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, ট্রাঙ্ক টেলিফোন ও টেলেক্স বিভাগের কর্মী, গাড়ীর চালক, হোটেলের কর্মী, দোকানের কর্মী এবং খেলাধুলোর সংগে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে আছেন তাদের মধ্যে বিদেশী ভাষা শেখার ধুম পড়ে গেছে। বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কেবলমাত্র মস্কোতেই প্রায় ৬০০০টি বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৬ তলা বিশিষ্ট ১৮টি নতুন বাড়ী নিয়ে গড়ে উঠেছে অলিম্পিক ভিলেজ। মস্কোতে গড়ে ওঠা এই ভিলেজের মধ্যে

তৈরী করা হয়েছে একটি হাসপাতাল। নতুন করে তৈরী এই বাড়ীগুলি অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে এখানকার নাগরিকদের আবাসন হিসাবে ব্যবহৃত হবে। বিদেশী সাংবাদিক, রেডিও ও টেলিভিসনের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অলিম্পিকে যে প্রেসবক্সের ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে একসংগে ৭২০০ জন ক্রীড়া সাংবাদিক বসতে পারবেন। ২২০০টির বেশী টেবিলে টেলিভিসন ও টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকবে। অলিম্পিক ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিদেশী-দের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এক বিশাল প্রমোদ কর্মসূচীও প্রস্তুত করা হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মত বহুজাতিক দেশের জনগণের শিল্পকলা ও সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন দিকের সংগে বিদেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের পরিচিত করানোর জন্য ১৪৪টি ব্যালে ও অপেরা অনুষ্ঠান, ৪৫০টির বেশী নাটক এবং ৩৫০টি সার্কাসের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার ব্যাপক জনগণ যে কোনও রকমেই হোক না কেন অলিম্পিকের অনুষ্ঠানে নিজেদের অংশীদার করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। গত বছর মস্কোতে একটি সাক্ষাৎকারে এক সোভিয়েত সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ইন্টার-ন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ইটালীর বিশিষ্ট সাংবাদিক এনরিকো ক্রেসপি বলেন "I have very pleasant impreassious. Preparatoins are going full stream ahead. People are working on Olympic projects with enthusiasm and competence. Apart from Moscow, I visited Tallin, uslere use all knows, the Olympic regatta will be held and I would say I was equally awed by Olympic projects there. In my view, you have advanced much further in your Pre-Olympic preparations. To this day them the organisers of the two previous games, in Munich and Montreal, in just as much thime.

But my dearest impression is of the Soviet people who are, at this early stage showing great interest and enthusiasm, the two qualities that make for the success of the 1980 Olympics, which are destined to play a Key role in strengthening sports, culture and friendly ties among nations." (অলিম্পিয়ান-৮০ অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত Olympic Panorama-র নবম সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত)

সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস, ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করা যাবে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নততর পরিবেশের মধ্যে অলিম্পিকের মত বিরাট অনুষ্ঠান হতে পারে। অলিম্পিক আসরে আগত সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি দেশের সরকার কিভাবে দেশের সমগ্র জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এই ধরণের এক বিরাট অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশীদার করতে পারে। অলিম্পিকের আসর যে যুদ্ধবিরোধী শান্তির মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে তাও প্রমাণিত হবে মস্কো অলিম্পিকে। কিন্তু শান্তির পয়লা নম্বরের শত্রু সাম্রাজ্যবাদীরা এ জিনিষ কিভাবে বরদাস্ত করবে? সাম্রাজ্যবাদীরা মস্কো অলিম্পিক বন্ধ করার জন্য অপচেষ্টা চালাবে—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রোশের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ: মস্কো অলিম্পিক বর্জন প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির গঠনতন্ত্রের ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, "জাতীয় অলিম্পিক কমিটিগুলি রাজ-নৈতিক বা ব্যবসায়ীভিত্তিক কোনও ঘটনার সংগে নিজেদের যুক্ত করতে পারবে না।" এই ধারাটিতে সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন সময়ে সুবিধামত ব্যবহার করেছে। ১৯৩৬ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফ্যাসিস্ট হিটলারের অধীনে নাৎসী জার্মানীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই অনুষ্ঠানকে বর্জন করার কথা চিন্তা করেনি। বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে ও বর্ণবিদ্বেষী-দের অকথ্য নির্যাতনের প্রতিবাদে বেশ কয়েকটি আফ্রিকার রাষ্ট্র যখন মন্ট্রিল অলিম্পিক বর্জনের জন্য আহ্বান করেছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাড়া দেয়নি। আমেরিকার নিগ্রোদের নির্যাতিত অবস্থার প্রতি বিশ্বের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ২০০ জন নিগ্রো ক্রীড়াবিদ যখন মেক্সিকো অলিম্পিক বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক ও কর্ণধারেরা বলেছিলেন যে অলিম্পিকে রাজনীতির কোনও স্থান নেই। কিন্তু আজ যখন মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তখন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র সেই মতে স্থির থাকতে পারছে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের একের পর এক পরা-জয় এবং পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সর্ববিষয়ে বিস্ময়কর অগ্রগতির পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসক ও কর্ণধারেরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশকে চেপে রাখতে পারছেন না। তাদের ক্ষিপ্ত মনো-ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানাভাবে, নানা দিক দিয়ে। এইরকম এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মস্কো অলিম্পিক বর্জন প্রতি-যোগিতার মধ্য দিয়ে।

মস্কো অলিম্পিক বর্জনের আহ্বান জানিয়ে আসরে নেমেছেন স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার। ক্রীড়াবিদদের কাছে এই আহ্বান জানানোর সময় কার্টার জানতেন যে একাজ খুব সহজ নয়। তাই তিনি নানা আশ্বাসও দিয়েছেন। মস্কো থেকে সরিয়ে অন্য কোনও দেশে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে এবং এই স্থান পরিবর্তন যদি আদৌ সম্ভব না হয় তাহলে একটি বিকল্প আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে—সকল দেশের বিশেষ করে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ক্রীড়াবিদদের কাছে এইকথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। মস্কো অলিম্পিক বর্জনের পক্ষে মত সৃষ্টির জন্য কার্টার ব্যক্তিগত দূত হিসাবে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলিকে আফ্রিকার পাঁচটি দেশে পাঠিয়েছিলেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টারের সংগে তাল মিলিয়ে আসরে প্রথমেই নেমে পড়েছিলেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার। তাঁরাও নিজ নিজ দেশের ক্রীড়াবিদদের মস্কো অলিম্পিকে অংশগ্রহণ না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু মস্কো অলিম্পিক বর্জনের জন্য এই সব নেতার আহ্বানে ক্রীড়াবিদরা সাড়া দিচ্ছেন কি? এই আহ্বান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে?

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ও বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদরা কি ভাবছেন?

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি পরিষ্কার ঘোষণা করেছে যে, ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পূর্ব সিদ্ধান্ত মত এই অনুষ্ঠান মস্কোতেই হবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি লর্ড কিল্লানিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে আইনগত ও নীতিগত দিক থেকে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করা যায় না। মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার যে সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ১৯৭৪ সালে গ্রহণ করেছিল সেই সিদ্ধান্তকে স্বাভাবিকভাবেই লঙ্ঘন করা যায় না। এছাড়াও লর্ড কিল্লানিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খেলাধূলোকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। মস্কো অলিম্পিক বয়কট করার আহ্বানে সাড়া দেওয়া ত' দূরের কথা বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীরা এই ধরণের হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ জানিয়েছেন। একজন ক্রীড়াবিদের সাধারণতঃ জীবনে একবারই অলিম্পিকের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আসে। বেশ কয়েক বছর কঠোর অনুশীলনের পর যদি কোনও ক্রীড়াবিদ শোনেন যে তার দেশ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করবে না তাহলে তার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার হতে পারে না। মার্কিন ক্রীড়াবিদ যর জিওর্দার্নি ক্লোভের সঙ্গে বলেছেন, "১৯৮০ সালে অলিম্পিককে সামনে রেখে আমি দশ বছর ধরে অনুশীলন করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি ক্রীড়াবিদদের মতামত চাওয়া হয় তাহলে সকলেই রাষ্ট্রপতি কার্টারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মত দেবেন।" ১৯৩৬ সালে অলিম্পিকে চারটি স্বর্ণপদকজয়ী অ্যাথেলেটিকসের কিংবদন্তী পুরুষ প্রয়াত জেমি ওয়েনল রাষ্ট্রপতি কার্টারের অলিম্পিক বয়কটের আহ্বানকে গর্হিত কাজ বলে মন্তব্য করেছেন। গত বছর যে ক্রীড়াবিদ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলেটের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বৃটেনের সেই ক্রীড়াবিদ সেবাস্তিয়ান কো বলেছেন, "যদি টিকিটের মূল্য আমাকেই দিতে হয় তাও আমি মস্কোতে যাবই।"

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচারের কঠোর মনোভাবের জবাবে বৃটেনের প্রতিযোগী ক্রীড়াবিদরা বলেছেন যে সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত কোনও কঠোর মনোভাবই তাদের মস্কো অলিম্পিকে যোগদান বন্ধ করতে পারবে না।

আফ্রিকার পাঁচটি দেশে কার্টারের বিশেষ দূত হিসাবে সফর করার পর মহম্মদ আলির অভিজ্ঞতা কার্টারের অনুকূলে যায় নি। মহম্মদ আলি বলেছেন, "মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে আমাকে আফ্রিকায় পাঠিয়ে রাষ্ট্রপতি কার্টার অন্যায় করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষী সরকার সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবে আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশই ওয়াশিংটন সরকারের বিরোধী। যদি আমি আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র ইতিহাস আগে জানতাম তাহলে আমি রাষ্ট্রপতির অনুরোধে আফ্রিকার পাঁচটি দেশ সফরে আসতাম না।"

সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার তাবড় নেতারা মস্কো অলিম্পিক বর্জনের যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন সেই প্রচেষ্টা নৈতিক দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শেষপর্যন্ত যদি কয়েকটি দেশ মস্কো অলিম্পিক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সেই সিদ্ধান্তকে কোনও মতেই সেই সব দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীর সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না। অলিম্পিককে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্য খেলায় মেতেছেন সেই খেলায় তারা পরাস্ত হয়েছেন। এতে দুনিয়ার অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদী নিশ্চয়ই স্বস্তিবোধ করবেন। দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীর শুভেচ্ছা নিয়েই মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে—এই বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েত সরকার দেশের অগণিত সুশৃংখল জনগণের সহযোগিতা নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন।

কালনা ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে মেয়েদের ভলিবল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

নাগপাশ। সাধন চট্টোপাধ্যায়
ক্রান্তিক প্রকাশনী। চার টাকা

"নাগপাশ" চারটি গল্পের সংকলন। প্রথম গল্প 'নাগপাশ,' দ্বিতীয় 'খোলস', তৃতীয় 'তিনপুরুষ' এবং চতুর্থ 'জ্বালা।' প্রথম গল্প 'নাগপাশ' চব্বিশ পরগণার এক ছোট্ট গ্রামের যাত্রা উৎসব নিয়ে শুরু হয়েছে। এই যাত্রা পালার মধ্য দিয়ে কাহিনীর মূল চরিত্রগুলির সাথে সূক্ষ্ম ও নিখুত পরিমিতি বোধে কাহিনীকার পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু চরিত্রগুলির সনাতন রহস্য উদ্ঘাটন লেখকের উপজীব্য নয়— সমাজ পারিপার্শ্বিকতায় তারা ফুটে উঠেছে। পালা শুরু হওয়ার সাথে সাথে দূর-দূরান্ত হ'তে মানুষের মিছিল এগিয়ে আসে। এই মিছিলের খোশগল্পের মধ্যদিয়ে আদিবাসী, মাঝি, মালো, চাষী এই সব শ্রমজীবী মানুষের টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে দেশকাল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের অনেকেরই আশংকা ধান কাটার মরশুমে বেশ কিছু বিপদ ঘটতে পারে এবং এই ক'টি কথার মধ্যদিয়ে লেখক কাহিনীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবী যে দ্বন্দ্ব তার পূর্বাভাস স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই আসরেই আমাদের পরিচয়ঘটে পুশুভ্র সমাজের গরীব চাষীর ছেলে 'কালপাথরে খোদাই দেহ' নকুলের সাথে। ষাট-সত্তর বছর আগে এই বাদায় বসতি পত্তনে নকুলদের পরিবার ছিল অন্যতম। আর এই বাদার অধিকারের প্রশ্নে লেখক তাই সেই ঐতিহাসিক সূত্রটাকে ছুঁয়ে গেছেন। 'এযেন অর্জিত অধিকার ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম।' যে সমাজের সাথে এই সংগ্রাম তার চরিত্র-গুলি হোল যদুপতি, রাখাল ও অন্যান্যরা এবং তাদের শিরোমণি মন্মথ শিকদার।

কাহিনীর মধ্যে মন্মথ শিকদার এবং নকুল ও সবহারানো মানুষের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে ওঠে। মন্মথ শিকদারের অবাধ শোষণের সামান্য একটু বাধা নকুল। সে বাধাকে যখন মিষ্টি কথায় সরানো গেলোনা তখন শিকদার অন্যপথ ধরল। নকুলের বোন চাঁপা ধর্ষিত হোল মন্মথের বন্ধু এক ফরেস্ট অফিসারের মাধ্যমে। নকুল এবং এই গরীব মানুষদের যন্ত্রণা এবং দুর্ভোগ চূড়ান্ত রূপ নিল। কিন্তু মন্মথ শিকদার তাদের বশে আনতে পারলনা। শেষ করতে পারলনা। মানুষের প্রতিরোধ আরও তীব্র হয়ে উঠল। এবার মন্মথ শিকদারের কলকাতায় হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করা ছেলে রমেন এল। বুর্জোয়া নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করল। মানুষকে ছলচাতুরী দিয়ে সে বশ করতে চাইল। নকুলকে লঞ্চে চাকরী দিল। তাকে বিচ্ছিন্ন করল তার শ্রেণী থেকে এবং শেষপর্যন্ত তাকে ছাটাই করল। কাহিনীর নায়ক নকুল বাইরের জগতে ফিরে দেখল তার পায়ের নিচে মাটি নেই। সে বিধ্বস্ত—চূড়ান্ত ট্রাজেডির নায়কের মত আত্মযন্ত্রণার হাহাকারে অসহায়। পাশে চাঁপা নেই যে তাকে সান্ত্বনা দেয়। পদ্ম তাকে ভালবাসত সেও আজ তার কাছ থেকে বহুদূরে। সে নির্জন নদীতীরে এসে ডিঙি খুলেদেয়। দক্ষিণে অথৈ সমুদ্র। মাঝনদীতে হঠাৎই দেখা হয়ে যায় পদ্ম, গজেন, চাপার সঙ্গে। নকুলের মনেহয় এই বৈঠার টানেই সে সমুদ্রে চলে যেতে পারে। 'সশব্দে তার বৈঠায় জল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল।'

এই গল্পটি লেখকের জীবনদর্শন, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সমাজ ও জনজীবনের সাথে নিবিড় সংযোগ এইসব কারণে পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে মূল্য পাবে। কিন্তু পাঠকের স্বভাবতই মনে হতে পারে লেখক কাহিনীর পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং চরিত্রগুলির ভিতর এবং বাইরের জগৎকে বিশ্লেষণ করে একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস উপহার দিতে পারতেন। ছোট গল্প হলে এ আলোচনা আসত না কিন্তু লেখক যেখানে বড় গল্পের পরিবেশ রচনা করেছেন সেখানে পরিবেশ ও চরিত্র আরো বিস্তৃত ও বিশ্লেষিত হলে কাহিনীটি আরো সার্থক হয়ে উঠতে পারত।

বাকি তিনটি কাহিনী নিঃসন্দেহে সবদিক দিয়ে ছোট গল্প। 'খোলস' গল্পের মধ্যে মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিক পরি-বারমুখী সতীশের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। কিন্তু পরিবেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হারিয়ে যাননি লেখক। গল্পটির পরিণতি অভিনব—"ডাকবে কি ডাকবে না ভেবেও. কে যেন ভিতর থেকে চিৎকার করে ডাকল সুধাবাবু? ও সুধাবাবু"। সুধাবাবু নামের মানুষ এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সতীশ তাকে ডাকতে পারেনি কারণ এদের সাথে মিশলে অনের কাছ হতে সে আঘাত আসার ভয় করে। এই ছোট গল্পটির মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ বিষয় অদ্ভুত কিছু শব্দের ব্যবহার—'আঠা আঠা চোখের সামনে', 'চোরা টাক', 'ল্যাম্পপোস্টটা অভাবী রঙয়ের চোখের তারার মত মিটমিট করছে', 'সুখের খুদ' ইত্যাদি। এই ছোট গল্পটির মধ্যে গত দশকের অন্ধকার দিনগুলোর ছবি তির্যকভাবে লেখকের কলমে ধরা পড়েছে।

'তিন পুরুষ' গল্পটির মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্র ফুটে উঠেছে। যুগ পাল্টাচ্ছে এবং সাথে সাথে সমাজের আচার ব্যবহার পাল্টাচ্ছে এবং শোষণের পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে কিন্তু শোষণ ব্যবস্থা যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে তা রসো-ত্তীর্ণভাবে লেখক আমাদের দেখিয়েছেন।

'জ্বালা' কারখানার এক শ্রমিক কেনের দুঃখ এবং রাগ এবং এসবকিছুর মধ্যদিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন এবং মালিক শ্রেণীর চরিত্র ফুটে উঠেছে, এই লেখাটির পরে লেখকের যে জীবন এবং শিল্প সম্বন্ধে অনেক উত্তোরণ ঘটেছে তা আগের গল্পগুলি (যেগুলি লেখক গত দশকের সম্ভবত শেষ-দিকে লিখেছেন) হতে স্পষ্ট হয়।

—রামকুমার মুখোপাধ্যায়

বিভাগীয় সংবাদ

সারা রাজ্যজুড়ে আমাদের বিভিন্ন ব্লকগুলিতে যুব উৎসব কোথাও চলছে, আবার কোথাও শেষ হয়েছে। এপর্যন্ত আমাদের দপ্তরে যে সমস্ত সংবাদ পৌঁছেছে তাই দিয়েই এবারের বিভাগীয় সংবাদ।

বীরভূম জেলা ঃ

রাজনগর ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও আনুকূল্যে এবং রাজনগর ব্লক যুব-উৎসব কমিটির পরিচালনায় ১৪ই থেকে ১৬ই মার্চ তিন-দিন ব্যাপী যুব উৎসব চলেছে। এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১২৫ জন শিশুসহ প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় ছ'টি দল অংশ গ্রহণ করে। আদিবাসীদের জন্য 'লোকনৃত্যে'-রও ব্যবস্থা ছিল।

১৪ই মার্চ পতাকা উত্তোলন এবং শিশুদের মার্চপাস্টের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও যুব উৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শিশু বিভাগের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল সম্মিলিত রিলে রেস, আবৃত্তি এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতীদের জন্য ছিল কবাডি, খো-খো, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, বিতর্ক ইত্যাদি। প্রতিদিন রাত্রে অনুষ্ঠিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে রাজনগর ইউনিক ক্লাব-এর 'শিকার'। দ্বিতীয় গার্গী গোষ্ঠীর 'সূচীপত্র'। কবাডি ও খো-খো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়।

বোলপুর ব্লক যুব-করণ—গত ১৫ই-১৭ই মার্চ বোলপুর ডাকবাংলো ময়দানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই মার্চ সকালে উদ্বোধনী মিছিল শুরু হয় উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে। মিছিলে অংশ নেয় গ্রামের সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ, যুব-ছাত্র, মহিলা, আদিবাসী, সাঁওতাল প্রভৃতি সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শরদীস রায় এম. পি. ও জ্যোৎস্না গুপ্ত এম. এল. এ.। খেলাধুলায় বালক বালিকাদের দৌড়, হাই-জাম্প, লং-জাম্প ইত্যাদি ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণীয় খেলা ছিল আদিবাসী ও সাঁওতালদের তীর ধনুক ছোঁড়া, রণপা দৌড় ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত দলের মধ্যে হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা। বিকালে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার কবিতাগুলি ছিল—রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে', নজরুলের 'কুলিমজুর' এবং সুকান্তের 'চিল'। কবিগান ও ম্যাজিকের আসরও বসে। উত্তরণ সাংস্কৃতিক শাখা (বোলপুর) 'মৃচ্ছকটিক মঙ্গল কাব্য' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। কসবা গ্রাম পঞ্চায়েত পরিবেশিত 'রায়বেশে' একটি সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। এছাড়া 'বদন চাঁদের বজ্জাতি' নাটক ও 'মা মাটি মানুষ' যাত্রানুষ্ঠান দর্শকদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রীয় হওয়া উচিত। প্রতিযোগীরা এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিল্পীচক্রের সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'হুল' ব্যালে স্থানীয় জনমানসে উল্লেখযোগ্য রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন দিনে পঃ বঃ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি শাখার বীরভূম জেলা অফিস কর্তৃক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

তিনদিনে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ এই উৎসব উপভোগ করে।

নানুর ব্লক যুব-করণ—নানুর ব্লকে তিনদিন পৃথকভাবে তিন জায়গায় খেলাধুলো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রথম দিন ২৭শে মার্চ খুজুটি পাড়া চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকালে শুরু হয় হা-ডু-ডু ও ভলিবল প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় গণসংগীত, কবিগান ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। পঃ বঃ সরকারের তথ্যচিত্রও দেখান হয়।

দ্বিতীয় দিন ২৮শে মার্চ কির্ণাহার শিবচন্দ্র হাইস্কুলে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় পাপুড়ি ইউনিট কর্তৃক 'রায়বেশে' এবং কির্ণাহার সুরঙ্গমা সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠান বেশ জমে ওঠে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন।

তৃতীয় দিনে নানুর ইউকো ব্যাঙ্ক মাঠে সকালের অনুষ্ঠানে গণসংগীত, সাঁওতালী সংগীত, চন্ডীদাস পদাবলী পরিবেশিত হয়। তারপর শুরু হয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, স্বরচিত কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। দুপুরের অনুষ্ঠানে চারকল গ্রাম ইউনিট 'রায়বেশে' পরিবেশন করেন। পরে রবীন্দ্রসংগীত এবং ভাদুগান প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

অনুষ্ঠান শেষ হয় শম্ভু বাগের নির্দেশনায় চন্ডীপুর নবনাট্য আলোড়ন গ্রুপের যাত্রাভিনয় 'সবুজের অভিযান' দিয়ে।

পুরস্কার বিতরণ করেন নানুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জিতেন মিত্র।

লাভপুর ব্লক যুব-করণ—গত ২৪, ২৫, ২৬শে মার্চ তিন-দিন ধরে যুব উৎসব পালিত হয়। উদ্বোধন করেন পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়। লাভপুর যাদবলাল হাইস্কুল মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং স্থানীয় ব্লক ও যুবসংগঠনের অনেক যুবক-যুবতী।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সূচীতে ছিল—আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি ইত্যাদি। বিতর্কের বিষয় ছিল

—'আমূল ভূমি সংস্কার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে না'। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের আলোচনা তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে সকলের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

এছাড়াও বাউল গান, বোলান গান ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি সাধারণ মানুষ দারুণ আগ্রহ ভরে উপভোগ করে।

চব্বিশপরগনা জেলা :

সোনারপুর ব্লক যুব-করণ—বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গত ৪ঠা থেকে ৬ই এপ্রিল সোনারপুর ব্লক যুব উৎসব উদ্‌যাপিত হ'ল। গ্রামের যুবক-যুবতীদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতির চেতনাকে আরও বেশী বেশী করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলি ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। চাঁদমারীর মাঠে খো খো ও কাবাডি প্রতিযোগিতা, হরিণাভিতে সংগীত, আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী ফুটবল, রাজপুর ও বোড়ালে আলোচনা সভা এবং সোনারপুরে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বোসপুকুর ময়দানে।

বিভিন্ন আলোচনা সভায় বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় ছাত্রনেতা সাইফুদ্দিন চৌধুরী এম. পি., সত্যসাধন চক্রবর্তী এম. পি. এবং বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অনুনয় চট্টোপাধ্যায়।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন দক্ষিণ চব্বিশপরগনার যুব-সংযোজক মিহির কুমার দাস।

কাকদ্বীপ ব্লক যুব-করণ—কাকদ্বীপ বিধান ময়দান ও কিশোর প্রাঙ্গণে ২৮শে থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫৫১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বসে আঁকো, একাংক নাটক, সংগীত ইত্যাদি বিষয়। এতে অংশ নেয় ২০৪ জন প্রতিযোগী। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন বিধান সভার সদস্য হৃষিকেশ মাইতি।

বর্ধমান জেলা :

কালনা ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় এবং যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পরিচালনায় কালনা ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২০-২৩শে মার্চ। উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলা শাসক শ্রী বৈদ্যনাথ সিংহরায়। ২৩শে মার্চ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিধানসভার সদস্য গুরুপ্রসাদ সিংহরায় এবং প্রধান অতিথি বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ পুরস্কার বিতরণ করেন। উৎসবের ৪ দিন ব্লকের তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ, যুব কল্যাণ বিভাগ ছাড়াও এ. কে. বিদ্যামন্দির আয়োজিত একক বিজ্ঞান প্রদর্শনী দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

সালানপুর ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ সালানপুর ব্লক যুব অফিসের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১৬টি বিভিন্ন ধরণের ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এতে মোট ২৭ জন যুবকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের জন্য সীবন-শিল্পের উপর ১টি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এখানে ৪৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আশা করা যায় এ থেকে এঁরা নিজেদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন।

১৯শে মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব প্রতি বৎসরের মত এবারও প্রভূত উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হ'ল। বিশেষ করে তপশীলী ও আদিবাসী মহিলাদের দ্বারা পরিবেশিত লোকনৃত্য ও ক্রিশেন ক্লাবের ছেলেমেয়েদের জিমন্যাসটিক, জুডো ও ক্যারেটে প্রদর্শন এবং লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুয়া নৃত্যনাট্যটি জনচিত্তে বিশেষ রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করে উৎসব প্রাঙ্গণকে মুখর করে তোলে।

নদীয়া জেলা :

চাকদহ ব্লক যুব-করণ—গত ২১ থেকে ২৩শে মার্চ চাকদহ ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৫০ ও ৫০০ জন। প্রায় ১২,০০০ দর্শক সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত এইসব অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল বাগচী সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অন্যান্য বক্তারা যুব উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

চাপড়া ব্লক যুব-করণ—২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ কিং এডওয়ার্ড বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্লক যুব উৎসবের আসর বসে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন

নদীয়া জেলায় চাপড়া ব্লক যুব উৎসবে কবাডি প্রতিযোগিতা।

করা হয়। এছাড়া বিজ্ঞান, কলা ও হস্তশিল্পের উপর অনেক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একাংক নাটক প্রতিযোগিতার আসর বসে। এইসব বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নানান বিদ্যালয়ের ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। যুবমেলার উদ্বোধন করেন বিধানসভা সদস্য সাহাবুদ্দীন মণ্ডল। সদর মহকুমা শাসক সুবল মার্ন্ডি এবং বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

নাকাশীপাড়া ব্লক যুব-করণ—গত ২৮শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং যুব উৎসব কমিটির সহযোগিতায় বেথুয়াডহরী জে. সি. বিদ্যালয় ময়দানে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল একদিনের ফুটবল, ভলিবল ও কবাডি প্রতিযোগিতা, মহিলা খো-খো প্রদর্শনী, লাঠিখেলা, ব্রতচারী নৃত্য, ড্রিল, ব্যায়াম ও শরীর চর্চা প্রদর্শনী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, রবীন্দ্র ও নজরুলগীতি, কথন, কৌতুকাভিনয় ও আল্পনা প্রতিযোগিতা। এছাড়া একাংক নাটক প্রতিযোগিতা। অংশ নেয় ১৫টি দল। এরপরও ছিল দলগত লোকগীতি, সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, আলোচনাচক্র ইত্যাদি। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয়সূচী ছিল "আমূল ভূমি সংস্কারই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।" এবং আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল—"গণতন্ত্রের সুরক্ষায় ও সম্প্রসারণে যুব সমাজের ভূমিকা।"

এই যুব উৎসব জনমনে বিশেষ করে সাধারণ স্তরের মানুষের মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

কাকসা ব্লক যুব-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় ১২ থেকে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় এম. এল. এ. লক্ষ্মীনারায়ণ সাহা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম বিষয় ছিল আদিবাসী যুবকদের তীর ছোঁড়া ও যুবতীদের নৃত্যানুষ্ঠান। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন সম্পূর্ণ মাঝি, বি. ডি. ও.।

শান্তিপুর ব্লক যুব-করণ—এই যুব-করণের উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসবের (২০শে থেকে ২২শে মার্চ) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫০০ জন প্রতিযোগী সেমিনার, বিতর্ক, সঙ্গীত, আবৃত্তি, ব্রতচারী ও লোকনৃত্য, স্বরচিত গল্প ও কবিতা, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত ছিল কবাডি, হাই-জাম্প, দৌড় ইত্যাদি। স্থানীয় এম. এল. এ. বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ ডঃ চুনীলাল দেব কীর্ত্তনীয়া সফল প্রতিযোগীদের মানপত্র ও পুরস্কার দেন।

এছাড়া এই অফিস থেকে ৬৪ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়।

কৃষ্ণনগর ব্লক যুব-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় যে যুব উৎসব (২৩-২৫শে মার্চ) অনুষ্ঠিত হয় তার প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও মডেল প্রদর্শনী। এছাড়াও চলচ্চিত্র দেখান হয় এবং দেহ সৌষ্ঠব ও যোগাসন নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ৪৪২ ও ৩৫১ জন অংশগ্রহণ করে। উৎসবের উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলার সভাধিপতি পরিমল বাগচী ও সফলকাম প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন অধ্যক্ষ সুরেশ চন্দ্র সরকার।

হাঁসখালি ব্লক যুব-করণ—এই ব্লকের যুব উৎসব উদ্বোধনে (১৪. ৩. ৮০) উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শান্তিভূষণ ভট্টাচার্য ও বিধানসভার সদস্যদ্বয় সুকুমার মণ্ডল ও সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস। জেলা পরিষদের সদস্য বিমল চৌধুরী ও পঞ্চায়েত সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ নেন। সুদৃশ্য বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ২৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী যোগ দেয়। এরপর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৫৯ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

নবদ্বীপ ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং নবদ্বীপ থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য দেবী বসুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া আরো দুটি উপসমিতি গঠন করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল চিত্রাঙ্কণ, হস্তশিল্প, বসে আঁকো, বিজ্ঞান মডেল, বিতর্ক, সঙ্গীত, নৃত্য, একাঙ্ক নাটক ইত্যাদি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল কবাডি ও খো-খো। এই দুটি প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী বালক বালিকার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬৩ ও ৩৫৭ জন। পুরস্কার বিতরণী সভায় বসন্ত কুমার পাল, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি ও দীপঙ্কর সাহা, বি. ডি. ও. যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা :

বহরমপুর ব্লক যুব-করণ—এই কেন্দ্রের উদ্যোগে ২, ৩ ও ৪ঠা এপ্রিল মণীন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম স্তরে ছিল শহরের প্রতিযোগীরা এবং ২য় ভাগে ছিল গ্রামীণ প্রতিযোগীরা। এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল

বহরমপুর ব্লক যুব উৎসবে বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী।

বিতর্ক, আবৃত্তি, সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, বসে আঁকো, যোগ ব্যায়াম ইত্যাদি। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৩৪৫।

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক যুব-করণ—এই যুব করণের পরিচালনায় ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রিল যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক দুটি ভাগ ছিল। অ্যাথলেটিকস্ ও খো-খো প্রতিযোগিতায় ১৮টি ক্লাবের ২৫৯ জন বালক-

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক যুব উৎসবে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় 'অশান্ত বিবর' নাটকে একটি দৃশ্য।

বালিকা অংশ নেয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আবৃত্তি, তবলা বাদ্য ও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। ২০টি ক্লাবের ১৪৮ জন তরুণ-তরুণী এতে অংশ নেয়।

মালদহ জেলা:

হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক যুব-করণ—হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকের ময়দানে গত ২৩শে মার্চ হতে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত কৃষি, শিল্প মেলা ও ছাত্র-যুব উৎসব সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক আয়োজিত মেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল, তাছাড়াও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা ও ক্লাবগুলিরও ছিল কিছু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। উক্ত মেলার ২৩শে মার্চ কৃষি দিবস, ২৪শে মার্চ পরিবার কল্যাণ দিবস, ২৫শে মার্চ শিল্প দিবস, ২৬শে মার্চ পঞ্চায়েত দিবস এবং ২৭শে মার্চ ছাত্র-যুব দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। মেলার উদ্বোধন করেন পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন চৌধুরী মহাশয়। মেলা প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী প্রত্যহ বেলা ২টা হতে খোলা থাকত এবং প্রত্যহ দিবস অনুযায়ী আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা ছিল। আলোচনা চক্র ব্যতীত মেলাকে সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য উক্ত ব্লকের ২টি ক্লাব ২টি নাটক করেন। ২৩শে মার্চ আঞ্চলিক শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন, ২৪শে মার্চ রাত্রি ৭ ঘটিকায় কলিকাতার গণনাট্য সংঘ কর্তৃক গণসঙ্গীত ও তরজাগান পরিবেশিত হয়। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বেতার শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী কর্তৃক পল্লীসঙ্গীত, ২৬শে মার্চ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুয়া গীতিনাট্য পরি-বেশিত হয়। যুব দিবস উপলক্ষে ২৭শে মার্চ বেলা ৩টায় ক্লাবের পতাকাসহ শোভাযাত্রাসহকারে উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত হয় ক্লাবের সদস্যরা। বেলা ৪টার সময় যুব উৎসব উপলক্ষে আন্তঃ ক্লাব ভলিবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলাটি হয় ভিঙ্গল সবুজ সংঘ বনাম হরিশ্চন্দ্রপুর সংগঠন সমিতির মধ্যে সংগঠন সমিতির মাঠে। ভলিবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীর সম্মান লাভ করে ভিঙ্গল সবুজ সংঘ। ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ২৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক অংশগ্রহণ করে, তার মধ্যে ছাত্র-যুবকের সংখ্যা ১৮৮ ও বালিকার সংখ্যা ৫৫ জন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৯৭ জন, তারমধ্যে ছাত্র-যুব ৬০ জন ও ছাত্রী-যুবতীর সংখ্যা ৩৭ জনের মত। ভলিবল প্রতিযোগিতার পর কৃষি, শিল্প ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রদর্শনীর প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয় এবং যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজেতা দলকে যুব কল্যাণ বিভাগ ও ব্লক স্পোর্টস কমিটির পক্ষ থেকে শীল্ড ও খেলোয়াড়দের গেঞ্জি দেওয়া হয়। সমস্ত রকম প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মালদা জিলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় শ্রী মানিক ঝা মহাশয়। পুরস্কার বিতরণীর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। কৃষি, শিল্প মেলা ও ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার পুরুষ ও মহিলা মেলায় অংশগ্রহণ ক'রে আনন্দ উপভোগ করেন।

পুরাতন মালদহ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের পুরাতন মালদহ ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় মঙ্গলবাড়ী পি. ডাব্লু. ডি. অফিসের সম্মুখস্থ ময়দানে গত ২২শে মার্চ হতে ২৪শে মার্চ '৮০ পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী ব্লক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ২২শে মার্চ তারিখে ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় শ্রীদিব্যেন্দু মুখার্জী, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পুরাতন মালদা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুঃ মালদা ব্লকের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি ও সংঘের সদস্য-সদস্যারা নিজ নিজ সংস্থার পতাকা নিয়ে

অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিচিত্রানুষ্ঠান, গম্ভীরা, দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনী ও কোরাসের সংগীতাভিনয় "সাম্যের গান" আয়োজন করা হয়েছিল। যুব উৎসবের ১ম দিন প্রায় ১৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

যুব উৎসবের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান ও শিশু নাটক "সাত বন্ধু খক্রুমণি" (পরিচালনায় মালদা ড্রামালীগ) সংগীত, নৃত্য, নাটক ও মূকাভিনয়ের (পরিবেশনায় পুঃ কালচারাল ইউনিট) আয়োজন করা হয়। ২য় দিন প্রায় ২৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

যুব উৎসবের তৃতীয় দিন পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পুঃ মালদার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ আতাউর রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা সমাহর্তা মহাশয়, শ্রী আর. কে. প্রসন্ন। এবং তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কার বিতরণীর পর গম্ভীরাগান, (পরিবেশনায় দোকড়ি চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়) নাটিকা ও সমবেত সঙ্গীত (পরিবেশনায় গণনাট্য সংঘ, মালদা শাখা), এবং সবশেষে একটি নাটক (পরিবেশনায় কিশোর ভারতী পরিষদ, মঙ্গলবাড়ী) আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ২৭৫ জন।

কোচবিহার জেলা ঃ

কোচবিহার ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বাবুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, ৫ই থেকে ৭ই এপ্রিল '৮০ এক অনাড়ম্বর পরিবেশে কোচবিহার ১নং ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। ৫ই এপ্রিল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পরিবহন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহোদয়। সবুজের দলের ছোট ছোট শিশুমিতারা প্রধান অতিথি শ্রীচৌধুরীকে অভ্যর্থনা জানায়। ৫ই এপ্রিল যুব-ছাত্র দিবসে 'কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের' উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার ও শ্রীঅমিতোষ দত্ত রায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আলোচনা চক্র বন্ধ রাখা হয়।

৬ই এপ্রিল শ্রমিক কৃষক মৈত্রী দিবসে আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন শ্রীগোপাল সাহা, শ্রীপ্রদীপ নাথ, শ্রীসুনীলকুমার নন্দী ও শ্রীপরিতোষ পণ্ডিত।

৭ই এপ্রিল জাতীয় সংহতি রক্ষা দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনিখিলেশ দাস। এদিন তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন। যুব উৎসবে প্রত্যহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিকালে গণসংগীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যুব সংস্থা কর্তৃক নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে যেমন যুব-ছাত্ররা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল আবার শ্রমিক, আদিবাসীদের অংশগ্রহণ এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল তরুণ কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য পাঠের আসর। কোচবিহার ১নং ব্লকের ১৪ জন তরুণ কবি ও শহরের তিন বিশিষ্ট কবি এতে অংশগ্রহণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে কবিদের সম্বর্ধনা জানানোর ঘটনা কোচবিহার শহরে এই প্রথম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা, ডাওয়াগুড়ি শাখা, ত্রিফুল্লরায় ও সম্প্রদায় ও পিন্টু দত্তের গিটার খুব আকর্ষণীয় ছিল। টোটো পাড়ার আদিবাসী নৃত্য দর্শকরা খুব উৎসাহের সঙ্গে দেখেছেন। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কিশোর নাট্য সংস্থা, কলেরপাড় তরুণ সংঘ, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ডাওয়াগুড়ি, বাণীতীর্থ ক্লাব ও তাঁত শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা নাটক পরিবেশন করেন। প্রত্যহ প্রায় ৪ হাজার দর্শকের সমাগম হয়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 'অমলের স্বপন ভঙ্গ', বাণীতীর্থের 'ঘটনার বিবরণে প্রকাশ' নাটক দুটি উচ্চ মানের ছিল। অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানান যুব উৎসব কমিটির সম্পাদক ও ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাশ। বিভিন্ন দিনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যাঁরা প্রথমস্থান অধিকার করেছেন তাঁরা হলেন—আবৃত্তি (নবম/দশম) ঃ শ্রীমতী রীণা দত্ত, দেওয়ানহাট হাইস্কুল। আবৃত্তি (সর্বসাধারণ) ঃ শ্রীবিজয় ঘোষ, বাণীতীর্থ ক্লাব। রবীন্দ্র সংগীত ঃ শ্রীমতী রীণা দত্ত, দেওয়ানহাট হাইস্কুল। নজরুল গীতি ঃ শ্রীপ্রবীর কুমার রায়, হেল্‌থ রিক্রিয়েশন ক্লাব। ভাওয়াইয়া ঃ শ্রীমতী অঞ্জনা রায়, কোচবিহার সাংস্কৃতিক পরিষদ। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ঃ শ্রীপরিতোষ পণ্ডিত, পি. এম. জি. ও ডাঃ অশোক চৌধুরী, হেলথ্ রিক্রিয়েশন ক্লাব। অঙ্কন ঃ শ্রীপবিত্র সরকার, তল্লীগুড়ি।

জলপাইগুড়ি জেলা ঃ

আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের (পঃ বঃ সরকার) আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ২৩শে থেকে ২৫শে মার্চ পলাশবাড়ি গ্রামে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত্ব হল এদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে এসেছিলেন। তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সুখেন্দু রায়। এবং পুরস্কার বিতরণ করেন আলিপুরদুয়ার ১নং পঞ্চায়েত সভাপতি দিলীপ চৌধুরী। উৎসবের দিনগুলিতে প্রায় ৬০০০ লোকের সমাবেশ হয়। ২৩শে মার্চ 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি দিবস', ২৪শে মার্চ 'শ্রমিক কৃষক দিবস' ও ২৫শে মার্চ 'যুব-ছাত্র দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

কালচিনি ব্লক যুব-করণ—এই যুব-করণের উদ্যোগে ও কালচিনি ব্লক যুব উৎসব '৮০ কমিটির পরিচালনায় হ্যামিলটনগঞ্জ কালীবাড়ী ময়দান ও কালচিনি থানা ময়দানে গত ২৪ থেকে ২৬শে মার্চ '৮০ পর্যন্ত যুব উৎসব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঐ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয় এবং পতাকা উত্তোলন করে যুব উৎসবের শুরু ঘোষণা করেন অঞ্জন রায়, যুব সংযোজক, নেহরু যুবক কেন্দ্র, আলিপুরদুয়ার। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, বিতর্ক, রচনা, স্বরচিত কবিতা, একাংক নাটক ও নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া সাঁওতালী নৃত্য, বোরো নৃত্য, নেপালী নৃত্য, ব্রতচারী ও তথ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এ বিভাগে মোট ২০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়

বিভিন্ন বিভাগে মোট ৩০০ যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এই উৎসবের অন্য একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল বিভিন্ন স্টলের আয়োজন। এর মধ্যে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও মহিলা সমিতির স্টলদুটি দর্শকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। গড়ে তিন হাজার দর্শক এই

কালচিনি ব্লক যুব উৎসবে শিশুদিবসে নৃত্যের ভঙ্গিতে জনৈক শিশু শিল্পী।

উৎসব উপভোগ করেন। কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন অংশ থেকে যুবক-যুবতী ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সত্যই প্রশংসার যোগ্য। এই অঞ্চলে সরকারী সহযোগিতায় এই ধরণের উৎসব দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হ'ল।

মেদিনীপুর জেলা:

সবং ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ প্রায় ৪০০০ দর্শকের উপস্থিতিতে প্রতিযোগীরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। তিনদিনে মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৩৪৭ জন। এর মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৫৯ ও ৫৮৮ জন। প্রদর্শনীর সংখ্যা ছিল ১৭টি। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরের অধীন বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে লালগড় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে সারা ব্লকের সর্বস্তরের মানুষের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ২৬শে মার্চ থেকে ২৮শে মার্চ পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী ব্লক যুব উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে মার্চ সারা ব্লকের যুবকবৃন্দ ও জনসাধারণ এবং স্থানীয় স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রী ও মেদিনীপুরের পুলিস লাইনের ব্যান্ড সহযোগে সারা লালগড় অঞ্চলটি পরিক্রমা করে এবং পরিক্রমা শেষে নেহরু যুবক কেন্দ্রের যুব সংযোজক সুশান্তকুমার সরকার পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর যুব উৎসব ও মেলা শুরু হয়। এই মেলাতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, প্রবন্ধ ও নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন প্রতি-যোগিতায় বারোশত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিতর্কে ২৮ জন, আবৃত্তিতে ১১৫ জন, প্রবন্ধে ৩১ জন এবং সংগীতে ২৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। এই ব্লক মেলা ও যুব উৎসবে আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এবং ২৬শে মার্চ আদিবাসী দিবস হিসাবে প্রতি-যোগিতামূলক বিভিন্ন খেলাধুলো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যায় প্রতিযোগী মেলাতে যোগদান করেন। বিশেষ করে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতায় ৪২০ জন, একক সংগীতে ১৮ জন, তীর নিক্ষেপ এ ৫২ জন অংশ-গ্রহণ করেন। এই উৎসবে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ তাদের প্রদর্শনী স্টল দেন। এছাড়া প্রতিদিন চলচ্চিত্র, মেদিনীপুর ক্ষুদিরাম সংঘের পরিচালিত ব্যায়াম প্রদর্শনী এবং ভারতীয় লোক সংগীতের প্রখ্যাত গায়ক সত্যেন্দ্রনাথ মহান্তি ও তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক সংগীত পরিবেশনা ও স্থানীয় আদিবাসী জনসাধারণ কর্তৃক যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়। যেভাবে সারা ব্লকের সর্বস্তরের মানুষ এই ব্লক মেলাতে যোগদান করে মেলাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তাতে প্রমাণ হয় যে এই উৎসব সারা ব্লকেরই উৎসব। শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণ করেন পঞ্চায়েত সমিতি ও মেলার সভাপতি সুধীর কুমার পাণ্ডে।

তমলুক ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে তমলুক ১নং ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় চনশ্বরপুর উচ্চবিদ্যালয় ফুটবল ময়দানে গত ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তমলুকের অতি-রিক্ত জেলাশাসক বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

যুব উৎসবে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন এ্যাথলেটিক্স প্রতি-যোগিতা, কাবাডি, খো-খো, লোকনৃত্য, চিত্রাঙ্কণ, আবৃত্তি, সংগীত, গণসংগীত, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, নাটক। বয়স্ক শিক্ষা, কৃষি এবং স্বাস্থ্যের উপর আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ।

উৎসবে ১২০০ শ' প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক এবং শিক্ষিকা ও বিভিন্ন সংস্থার ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই যুব উৎসব জনসাধারণের মধ্যে প্রভুত আশা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

সমাপ্তি দিবসে পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরহিত্য করেন তমলুকের অতিরিক্ত জেলাশাসক বরুণ কুমার মুখো-পাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিধান-সভার সদস্য পুলক বেরা।

পুরুলিয়া জেলা ঃ

রঘুনাথপুর ব্লক যুব-কল্যাণ—বিগত ২৯শে এবং ৩০শে মার্চ এবং ৪, ৫, ৬ই এপ্রিল '৮০ দু'টি স্তরে বিভক্ত হয়ে রঘুনাথপুর ১নং ব্লক 'যুব-উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের প্রস্তুতি পর্বে ১নং ব্লকে-র অন্তর্গত সমস্ত ক্লাবগুলি, পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা যুব সংগঠনগুলিকে নিয়ে 'যুব-উৎসব-কমিটি' গঠিত হয়। শ্রী রঙ্গনাথ আচারি, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি এবং শ্রী বিভূতি বেজ যুব-কল্যাণ আধিকারিক যথাক্রমে এই 'কমিটি'র সভাপতি এবং সম্পাদক মনোনীত হন। উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য শ্রী নীহার রঞ্জন চৌধুরী ও শ্রী চণ্ডীচরণ গুপ্তকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি ক্রীড়া উপ-সমিতি এবং অধ্যাপক দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রী পার্থ সারথি ঘোষকে আহ্বায়ক করে একটি সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি গঠন করা হয়।

দুদিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রঘুনাথপুর ১নং ব্লকের ৩৩টি ক্লাব ও ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৭০৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা শতাধিক। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে মোট ১৫টি বিষয়ে প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় 'তীর ছোঁড়া' এবং 'যেমন খুশী সাজো' প্রতিযোগিতা। শেষেরটিতে ১৫ জন অংশ গ্রহণ করেন। ক্রীড়া-বিভাগে প্রদত্ত মোট ৪৬টি পুরস্কারের মধ্যে 'পল্লী-শ্রী সংঘ' (ন-পাড়া-শাঁকা অঞ্চল) এবং রঘুনাথপুর গার্লস্ হাইস্কুল প্রত্যেকেই ৫টি করে এবং 'বয়েজ-ফ্রেন্ডস্ ক্লাব' (আদ্রা) 'অরবিন্দ-সংঘ' (আড়রা অঞ্চল) এবং 'আমরা সবাই' (রঘুনাথপুর) প্রত্যেকের চারটি করে পুরস্কার দখল সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যুব-উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগে অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজড্ জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে। রঘুনাথপুর শহর এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই উৎসবানুষ্ঠান যে এক অভূতপূর্ব সাড়া সৃষ্টি করতে পেরেছে তার মধ্যদিয়েই এর সার্থকতা ও সাফল্য পরিস্ফুট। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বিবিধ বিষয়ে অনেকগুলি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল প্রতিযোগী ও শ্রোতাদের কাছে। বালক-বালিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা এই প্রতিযোগিতায় সমান আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিশেষ কোনো গান নির্দিষ্ট করে না দেওয়াতে প্রতিযোগীরা যেমন স্ব-মনোনীত সংগীত পরিবেশনের সুযোগ লাভ করেছিলেন তেমনি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানের বিচিত্রভাব ও ঐশ্বর্য নানা রূপে রসে ও বৈচিত্র্যে ফুটে উঠতে পেরেছিল।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সংগে সুকান্তের কবিতাও শিশু বা কিশোর প্রতিযোগীদের কণ্ঠে সুচারু পারদর্শিতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে যথাক্রমে বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব-সাধারণের জন্যে এই জাতীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্কের বিষয় ছিল 'শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যম হওয়া উচিৎ'। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল দু'টি (ক) পুরুলিয়া জেলায় সার্বিক উন্নয়নে যুব-সমাজের ভূমিকা এবং (খ) আঞ্চলিকতা ভারতের জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে যে বিতর্ক, আলোচনা এবং বক্তৃতায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য প্রতিযোগীরা তা শুধুই যে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল তা নয়—ছিল যথেষ্ট শিক্ষামূলকও উৎসাহব্যঞ্জক। সমকালীন সমাজের মানব জীবনের সমস্যার নানা দিক ও তার সমাধানের সঠিক পথ সন্ধান নিয়ে যে আজকের যুব সমাজ ভাবছেন তা সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এখানে। বিতর্ক ও আলোচনার ক্ষেত্রে সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রী তপন লাহিড়ীর সুচিন্তিত ও মূল্যবান বক্তব্য প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক'। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর বিষয়ের উপর রচিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যাঁরা অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁরা যথেষ্ট উন্নত চিন্তার পরিচয় রেখেছেন।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো একাংক নাটকের প্রতিযোগিতা। এই অভিনয় প্রতিযোগিতা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে দর্শকমণ্ডলীর কাছে। কয়েক হাজার দর্শক নিবিষ্টচিত্তে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত এই উন্নত রুচির ও মানের নাটকগুলি পরম আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করেছেন। এই অঞ্চলের যুবকেরা অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এক্ষেত্রেও। বিষয় বৈচিত্র্যের এবং বক্তব্যের দিক্ থেকে সমন্বত আদর্শের এইসব নাটকাভিনয় আঞ্চলিক যুব সমাজের অসাধারণ নাট্য-প্রতিভা এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। 'স্তালিনের নামে' (চোর পাহাড়ী নাট্য সংস্থা), 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া' (বিদ্যাসাগর-শরৎ-নজরুল-স্মৃতি পাঠচক্র, রঘুনাথপুর), স্কিৎস (ডাবর অরুণোদয় ক্লাব, চোর পাহাড়ী), কিংবা 'চন্দ্রালোকের যাত্রী' (আমরা সবাই, রঘুনাথপুর)-র অভিনয় তারই প্রমাণ। নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো বুন্দলা খাজুরা অঞ্চল কর্তৃক সাঁওতাল ভাষার নাটক 'মার্শাল ডাহা'র অভিনয়। আশা করা যায় রঘুনাথপুর ১নং ব্লকের যুব-উৎসবের পক্ষে এই ঐতিহাসিক ঘটনা একটা স্থায়ী মূল্য নিয়ে আগামী ভবিষ্যতকে প্রেরণা যোগাবে।

৬ই এপ্রিল '৮০ সন্ধ্যায় এক সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী রঙ্গনাথ আচারী। সম্পাদকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মোট ২৬০ জন প্রতিযোগী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সীমান্তিক গোষ্ঠী (আদ্রা)-র গণসংগীত পরিবেশন।

পরিশেষে বলা যায়, এই জাতীয় উৎসবানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রঘুনাথপুর এবং সন্নিহিত অঞ্চলের যুব-সমাজের ক্রীড়াগত এবং সাংস্কৃতিক মান যে ভবিষ্যতে উজ্জ্বলতর হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই—সন্দেহ নেই এবিষয়েও যে এই অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, ও সহানুভূতিই এই যুব উৎসবকে সাফল্যের স্বর্ণ-শিখরে উপনীত করেছে।

পাঠকের ভাবনা

সম্পাদক সমীপেষু,

'যুবমানস' কবে বেরোবে—আশা নিয়ে দারুণ আগ্রহভরে অপেক্ষা করি। পড়তে ভাল লাগে। ইদানিং ভালবাসতে শুরু করেছি। গত সংখ্যা অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় কয়েকটি নতুন বিভাগের সংযোজন দেখলাম। আশা করব এমনি করে আগামী দিনগুলিতে 'যুবমানস' আরও সমৃদ্ধ হবে।

শিল্প সংস্কৃতি বিভাগে গৌতম ঘোষদস্তিদারের 'নাটকের কিছু কথা এবং ফজল আলী আসছে' একটি বলিষ্ঠ, যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। লেখার ভঙ্গিটিও সুন্দর। গৌতমবাবু শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাকরণবাগিশ সমালোচকদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন বিচারের মানদণ্ড অন্যত্র অর্থাৎ পাঠকের হৃদয়ে।

তবে বানানের ক্ষেত্রে এতখানি এগিয়ে যাওয়া ঠিক কি? পত্রিকার সময়মত প্রকাশ অবশ্য কাম্য।

শ্রদ্ধাসহ—

নমিতা ঘোষ।

বসিরহাট। ২৪-পরগনা।

প্রিয় সম্পাদক,

যুবমানসের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ভাষণের সম্পাদিত রূপ পড়লাম। আমাদের মত গ্রামের যুবক-যুবতীরা বিধানসভায় আমাদের প্রতিনিধিরা যা বলেন, তার খুব কম অংশ জানতে পারি। বাজারী সংবাদপত্রগুলিতে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সংবাদ সামান্যই ছাপা হয়। যদি বা ছাপা হয় তা পড়ে আমরা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ মূল্যায়ন করতে পারিনা এবং সত্যি কথা বলতে কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হই।

যুবমানসের পাতায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য পড়ে আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে সরকার কোন পথে চলতে চান, আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ইত্যাদি বিষয়গুলি।

এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করে 'যুবমানস' আমাদের মত গাঁয়ের মানুষদের অনেক অজানা কথাকে জানতে সাহায্য করেছেন। যুবমানসের সম্পাদকমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—কামাল আমেদ

গ্রাম—থানারপাড়া। নদীয়া।

সহ-সম্পাদক,

যুবমানস।

আপনাদের নতুন বিভাগ 'পাঠকের ভাবনা'-র সংযোজনে উৎসাহিত হয়ে চিঠি লিখছি। আপনারা পাঠকদের 'পরামর্শ'-কে মূল্য দেন জানিয়েছেন। সেই ভরসায় আমার প্রথম পরামর্শ—যুবমানস নিয়মিতভাবে প্রকাশ করুন। মাঝে মাঝে হঠাৎ শেয়ালদা' ষ্টেশনের হকারের হাতে 'যুবমানস' দেখতে পাই। আবার অনেক সময় অনেক খোঁজাখুজি করে পাইনা। সময়মত প্রকাশ করে এবং সুষ্ঠ বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তা সাধারণের কাছে পৌঁছুতে না পারলে এর মূল্য কমে যেতে বাধ্য। অথচ পত্রিকাটির চাহিদা আছে।

জানিনা আমার পরামর্শে আপনাদের অথবা আমাদের পত্রিকা কতখানি 'প্রাণবন্ত' হয়ে উঠবে। তবে উঠুক এটা সর্বান্তকরণে চাই।

নমস্কার জানবেন।

—নিতাই বড়াল

কুশমোড়। বীরভূম

শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমণ্ডলী,

মাসিক 'যুবমানস' কাগজের আমি নিয়মিত পাঠক। তা কট্টর পাঠক হিসেবে আমার দাবী আছে। ক্রম লুপ্ত বাংলার লোকসাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর সঠিক বৈজ্ঞানিক পথে গ্রথিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আপনাদের কাগজে আমি বাংলার লোকসাহিত্যে শিশু প্রবন্ধ ছাপতে চাই। বেশ কয়েক-বছর গ্রামগঞ্জ-এ মানুষের সাথে মিশে আত্যন্তিক প্রতিকুলতার মধ্যে রাত কাটিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার আলকাপ, গ্রামের আঞ্চলিক একান্ত নিজস্ব ছড়া, গান, প্রবাদ, কবি প্রভৃতি মহামূল্যবান তথ্য দলিল সংগ্রহ করেছি। এগুলিকে সুস্থভাবে প্রকাশ করার একটি বিশেষ মাধ্যম চাই। তাই আপনাদের কাছে জানালুম আমার কথা। মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে একথা ভাবতে কষ্ট হয়। আপনারা জানাবেন আপনাদের বক্তব্য। উত্তরের অপেক্ষায় থাকলুম। নমস্কার।

গৌতম ঘোষ

শক্তিগড়। বনগ্রাম। ২৪ পরগনা।

রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের প্রদর্শনী মণ্ডপে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা সডাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০ %
১৫০০-এর ঊর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০ %
৫০০০-এর ঊর্ধ্বে	৪০ %

১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান।

বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বীরভূমের বোলপুর ব্লক যুব উৎসবে সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিল্পীচক্র শাখার ব্যালে 'হুল'-এর দু'টি বিশেষ মুহূর্ত।

খেলার মাঠে অসভ্যতা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী

গত ৮ই মে, ফেডারেশন কাপের ফাইন্যাল খেলাকে কেন্দ্র করে ইডেন উদ্যানে যে [illegible] ঘটেছে তা কলকাতার খেলার [illegible] অভাবনীয়। খেলার মাঠের বাইরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থকদের মধ্যে [illegible] ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ [illegible] উচ্ছৃংখলতা। খেলার মাঠের [illegible] খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে ঘুষি [illegible] দেখা গেছে, [illegible] খেলার মাঠে ঢুকে পড়েছে, মাঠের [illegible] লোক [illegible] করেছে। এসব [illegible] কলকাতার [illegible] ঐতিহ্য নষ্ট করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিষয়টি সম্পর্কে [illegible] উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কঠোর মনোভাবও গ্রহণ করেছেন। গত [illegible] মে মহাকরণে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন—

ফেডারেশন কাপ ফাইন্যাল খেলায় মাঠে [illegible] সব ঘটনা ঘটেছে [illegible] উচ্ছৃংখলতার বিরুদ্ধে [illegible] সম্পন্ন [illegible] যুবকদের প্রচার আন্দোলনে আসা উচিত। ফুটবল খেলা [illegible] আই. এফ. এ.'র ব্যাপার, কিন্তু খেলার মাঠের প্রতিক্রিয়া বাইরেও পড়ে বলে রাজ্য সরকারও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বড় দু'টি ক্লাবের এই যদি খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব হয়, তাহলে সেটা খুবই দুঃখজনক। অথচ আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এসব ঘটনার নিন্দা করে দু'টি বড় ক্লাবের কর্মকর্তাদের কেউই কোন বিবৃতি দেননি। যেসব খেলোয়াড় খেলায় মাঠের মধ্যে অখেলোয়াড়োচিত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তাদের চিহ্নিত করা উচিত। আমাদের সময় দেখেছি খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে মারামারি হলে রেফারী তাদের মাঠ থেকে বের করে দিত।

ইডেনের মাঠের মধ্যে লাইনে এত লোক বসবে কেন? মাঠের ভেতরে যারা ঢুকবে তাদের বের করে দিতে হবে। তার জন্য গোলমাল হয়ে খেলা যদি বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যাবে। এসব কথা দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বলতে হচ্ছে।

খেলার মাঠ অসভ্যতা করার জায়গা নয়। কিছু ক্লাবের সমর্থক ব্লেড, ক্ষুর নিয়ে মাঠে ঢুকবে। এসব উচ্ছৃংখলতা তো সমাজ বিরোধী কাজ। আশি হাজার দর্শক খেলা দেখতে গেলে এসব কাজ করে মাত্র হাজার দুই লোক। সাধারণ মানুষ এ জিনিস কখনই বরদাস্ত করবেন না। ছাত্র-যুবদের এই নোংরামীর বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

মে '৮০

প্রচ্ছদঃ খালেদ চৌধুরী

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঁচিশ পয়সা

সম্পাদকীয়

গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে আমরাও দু-হাত বাড়িয়ে বরণ করছি ঐতিহাসিক মে-দিবসকে। অহোরাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কিংবা কখনও কখনও তারও বেশি সময় ধরে শ্রমিককে খাটিয়ে তার রক্ত নিংড়ানো সম্পদে মালিকশ্রেণী মুনাফার পাহাড় তৈরী করত—আর সেই সম্পদ সৃষ্টি কর্তা শ্রমিক দু-বেলা পেট ভরে খেতে পারত না। শিক্ষা চিকিৎসার সুযোগ থেকে তারা থাকত চির বঞ্চিত। কদর্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের এই দীর্ঘ-ক্ষণ ধরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর আলোহীন, বায়ু-হীন, স্যাতস্যাতে বস্তির খুপরির মধ্যে দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু অর্ধমৃতের মত শ্রমিককে কাটাতে হোত। এই ছিল শ্রমিক-জীবনের রোজ নামচা। দ্রুত-লয়ে বেড়ে ওঠা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলকারখানার শ্রমিক সংগঠিত হতে থাকল এবং ব্যাপকভাবে এই অমানবিক ব্যবস্থার প্রতিবাদে গর্জে উঠল। দাবী তুলল—৮ ঘণ্টার বেশি শ্রমিককে খাটানো চলবে না। দুনিয়ার কষাইখানা হিসাবে পরিচিত মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের চিকাগো শহরের হে সার্কেমে ১৮৮৬ সালে ১লা মে শ্রমিকের ৮ ঘণ্টার কাজের দাবীতে সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে মোকাবেলা করার জন্য সর-কারের সশস্ত্র বাহিনীর বন্দুক গর্জে উঠল। ঘামে ভেজা শ্রমিকের জামা কাপড় তার ক্ষত-বিক্ষত দেহের রক্তে রাঙা হোল। শ্রমিকশ্রেণী তার জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমেরিকার ধূসর-মাটিতে রক্তের অক্ষরে শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসের এক নতুন এবং সুদূর প্রসারী তাৎপর্যময় অধ্যায় সৃষ্টি করল।

তারপর আরও গুলি চলল—আরও শ্রমিককে আত্মা-হুতি দিতে হোল—আরও রক্ত ঝরল—বিচারের নামে তামাসা করে শ্রমিক নেতাদের ফাঁসিতে ঝুলানো হোল। কিন্তু যে দুর্জয় ঝড়ের সৃষ্টি হোল তাকে আমেরিকার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা গেল না। শ্রমিক মানসিকতার ইথারের তরঙ্গে ভর করে তামাম "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও"—কার্লমার্ক্স-এর এই আহ্বানের অন্তর্নিহিত অর্থ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করল। ১৮৯০ সালে স্থির হোল বিশ্বব্যাপী ১লা মে তারিখটি "মে-দিবস" হিসাবে পালিত হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি

দিবস হিসাবে এই দিনটিকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে পালন করা হবে।

সেই থেকে ৯০টি বৎসর ধরে পৃথিবীব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ এই ঐতিহাসিক দিনটি পালন করে আসছেন। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ভীত মালিকশ্রেণী এবং তার সেবাদাস সরকারগুলি সমস্ত প্রকার দমন-পীড়নের পথ ধরে এই 'মে-দিবসের' অনুষ্ঠানকে বন্ধ করতে সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা চালিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিক-শ্রেণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই দিনটিকে বিভিন্ন ভাবে পালন করেছেন। ফ্যাসীবাদী দস্যুদের কারাগারে বন্দী মহান জুলিয়াস ফুচীক মে-দিবস পালন করার, লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করার কোন সুযোগ না পেয়ে নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে পরনের বস্ত্র নিজের রক্তে রাঙা করে, অন্ধকার বন্দীশালায় সেই কাপড় দুহাতে উর্ধ্বে তুলে ধরে মে-দিবস পালন করেছেন। শ্রমিক-শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, পুঁজি-বাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার সুদৃঢ় শপথ গ্রহণ করে-ছেন। মে-দিবস পালন করার এই ধরনের অগণিত গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ইতিহাসকে আরও মহীয়ান করে তুলেছে।

এবার যখন আমরা মে-দিবস পালন করছি তখন পুঁজিবাদী পথ ধরে যে সকল দেশ চলছে সেইসব দেশগুলি এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক চরম অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। কোন মতে টিঁকে থাকার জন্য পুঁজিবাদীশ্রেণী এই সংকটের যাবতীয় বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে তথা সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপাবার চেষ্টায় সর্বদা ব্যস্ত থাকছে। ফলে কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লে-অফ, শ্রমিক সংকোচন নীতি অনুসরণ, শ্রমিককে দিয়ে আরও বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া, বোনাস দিতে টালবাহানা, দ্রব্য-মূল্যসূচক সংখ্যার হিসাব জালিয়াতি করে শ্রমিককে তার পাওনা মজুরী থেকে বঞ্চিত করা—ইত্যাদি ব্যবস্থা মালিকের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। অন্যদিকে অধিক মুনাফার লোভে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের দাম যথেচ্ছভাবে বাড়িয়ে তোলা, শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত কাঁচামালের দাম খুসি মত কমিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে দুঃখ কষ্টের সহ্য সীমার শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষেরাও মুখ বুজে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছেন না। তারা একদিকে যেমন পেশাগত অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকে আদায় করার জন্য আরও সংগঠিতভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন অন্যদিকে শিক্ষায় এবং অভিজ্ঞতায় আরও সমৃদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণী বেশি বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছেন যে জীবনের দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণা হতে স্থায়ীভাবে নিষ্কৃতি পেতে হলে ঘুন ধরা, পুঁজ পড়া এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তার সমাধির উপর নতুন শোষণহীন, অবিচারহীন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করতে হবে—এবং সেই কাজ সমাধা হতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর উপর ভিত্তি করে ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

শ্রমিকশ্রেণী আরও অধিক মাত্রায় অনুভব করতে পারছেন যে তার অধিকার সংগ্রাম, তার মুক্তির সংগ্রামকে যদি পরিচালিত করতে হয়—তাহলে একান্ত ভাবে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সংকট যত বাড়বে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর ধণিকশ্রেণীর, পুঁজিপতি-শ্রেণীর আক্রমণ তত প্রখর হবে, স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির মেকী গণতন্ত্র মার্কা পাতলা আবরণটুকু তত দ্রুত অপসারিত হয়ে তার বীভৎস নগ্ন মূর্তি বিকট আকারে প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির চক্রান্তকে পরাজিত ক'রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা—তাকে আরও প্রসারিত করার কাজে শ্রমিক-শ্রেণীকে অধিকতর যোগ্যতার সাথে তার ভূমিকা পালন করতে হবে। বেশি বেশি করে বিভিন্ন স্তরে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে তার এই সংগ্রামের সাথী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ এলাকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মালিক শ্রেণীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেখানকার শ্রমজীবী মানুষের কাছে 'মে-দিবস' উৎসবের আমেজ নিয়ে হাজির হয়। আরও উন্নত জীবন যাপন, আরও অবকাশ, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সমূহকে ব্যবহারিক জীবনে আরও অধিক পরিমাণে প্রয়োগ ক'রে জীবনকে আরও উপভোগ্য করে গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করাকে মে-দিবস পালন করার অঙ্গ হিসাবে তারা ব্যবহার করে। বিশ্বের বাকী অংশের শ্রমজীবী মানুষ মে-দিবসকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন হিসাবে পালন করেন। এই দিনে দাঁড়িয়ে তারা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন দেশে দেশে যুগে যুগে অসংখ্য সংগ্রামে অংশ-গ্রহণকারী অগণিত শ্রমজীবী মানুষকে। নতুন করে ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতিকে—সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের মূল লক্ষ্য অভিন্ন, আদর্শ এক, বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের মূল স্রোতধারার তারা অবিচ্ছেদ্য অংশ, মূলধন ছাড়া তাদের হারাবার কিছু নাই জয় করার জন্য আছে তামাম দুনিয়া।

[শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায়]

জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন

প্রায় এক বছর হ'ল আসাম সহ সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আন্দোলনের নামে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে করে সারা ভারতবর্ষের মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি রক্ষা করা যাবে তো?

এই সব জ্বলন্ত প্রশ্ন সামনে রেখে গত ২২শে এবং ২৩শে এপ্রিল ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক সর্বভারতীয় আলোচনা সভার মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে বর্তমানে দেশের এক গুরুতর সমস্যার সমাধানসূত্র বের করার চেষ্টা করেছেন। দু' দিন ব্যাপী এই আলোচনা সভাতে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মাদুরাই, আলিগড়, সিমলা, ভুবনেশ্বর, ত্রিপুরা, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি উপস্থিত ছিলেন হায়দ্রাবাদ, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ এবং বি. জি. ভার্গিস, রণজিৎ রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অনিল বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্ট সাংবাদিক বর্গ। এছাড়াও অন্নদাশংকর রায়, অমলেন্দু গুহর মত বুদ্ধিজীবীরা যেমন তাদের মূল্যবান মতামত রেখেছেন, অন্যদিকে জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জী, সৌরীন ভট্টাচার্য্য, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, ভোলা সেন, সত্যসাধন চক্রবর্তী, সাইফুদ্দিন চৌধুরী সহ অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাঁদের বক্তব্য রাখেন। আসামের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা হীরেন গোগই এবং গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত থেকে বর্তমান সমস্যার পটভূমিকা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামতে আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেন।

২২শে এপ্রিল জনাকীর্ণ শতবার্ষিকী হলে আলোচনা সভার উদ্বোধন করে সুদীর্ঘ ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু বলেন—

আসামের সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। শুধুমাত্র প্রশাসন দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। চাই রাজনৈতিক সমাধান। অবশ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং অত্যাবশ্যক পণ্য চলাচলের মত কয়েকটি বিষয়ে প্রশাসনকে কাজে লাগাতেই হবে কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানে আর গড়িমসি করবার সময় নেই। অনেক দেরী হয়ে গেছে। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই রাজনৈতিক সমাধানের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বারে বারে প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার কথা বলেছি। ঐ বৈঠকে যাঁরা আন্দোলন করছেন তাদেরও ডাকা হোক।

আসামের আন্দোলন জাতীয় অর্থনীতিরও যথেষ্ট ক্ষতি করছে। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যেরও অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ছ' হাজার উদ্বাস্তু পরিবার এই রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের ফিরিয়ে নেবার জন্য আমরা বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। কিন্তু কেন্দ্র এখনও কোন সাড়া দেয়নি।

আসামের ছাত্ররা আমায় তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এ এক আশ্চর্য কথা! ওরা বলবেন আসামের তেল আসামের জন্য—অথচ তার প্রতিবাদ করতে পারব না। আমরা যদি বলি পশ্চিমবাঙলার কয়লা, লোহা কেবল মাত্র পশ্চিমবাঙলার জন্য তা'হলে জাতীয় সংহতি কি করে থাকবে? আমরা ঐসব কথা বলতে পারিনা। আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। আমাদের রাজ্যে সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের শতকরা মাত্র চল্লিশ ভাগ বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের সংগে তাদের প্রীতির সম্পর্ক কখনও নষ্ট হয়নি। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণ শত্রু—পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন।

তিনি দৃঢ়তার সংগে বলেন—এইরকম আলোচনা সভার মাধ্যমে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের ঐক্য, সংহতি এবং অগ্রগতির স্বার্থে দ্রুত আসাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে।

আলোচনাচক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার বলেন, আসাম সমস্যার উপর এই আলোচনা প্রমাণ করে যে এই রাজ্যের শিক্ষা জগত আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শ্রীশিবকুমার এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন—শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই ধরণের আলোচনা সভা হওয়া দরকার যাতে করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ একযোগে এই ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে পারে।

সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবী গোবিন্দ মুখোটী বলেন—বহুভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষে আসামের মত দাবি উঠতে শুরু করলে জাতীয় ঐক্য বলে কিছু থাকবে না। দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার আছে দেশের যে কোন অঞ্চলে বসবাস করার কিন্তু আসামের বর্তমান আন্দোলন নাগরিকদের এই অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক বি. জি. ভার্গিস বলেন যে, আসামের বিদেশী নাগরিক সংক্রান্ত প্রশ্নটিই বিভ্রান্তিকর। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই বিভ্রান্তি দূর করে একটা সুষ্ঠু সমাধানে আসতে হবে।

অপর এক সাংবাদিক রণজিৎ রায় বলেন, নাগরিক প্রশ্নে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি এবং ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে

আসামের বর্তমান আন্দোলন অত্যন্ত অন্যায্য। কেন্দ্রীয় সরকারকে ঐ দুই চুক্তিকে সামনে রেখে সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে।

আসামের ছাত্রনেতা হীরেন গোগই বলেন—আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। আসামের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করতে চলেছে তখন মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার কৌশল হিসাবে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আজকে তা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদেশী শক্তি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষদের উপর আক্রমণ হচ্ছে সেখানে। কিন্তু শত আক্রমণ অপপ্রচার সত্ত্বেও আসামের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. পি. দেশপান্ডে বলেন—এই আন্দোলন হিংসাত্মক, ভ্রাতৃঘাতী। এ এক বিপজ্জনক বৈশিষ্ট। ভারতের ঐক্য, সংহতির প্রতি এই আন্দোলন চরম আঘাত স্বরূপ।

পশ্চিমবঙ্গ আর্স কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী তাঁর ভাষণে বলেন—আমাদের এই সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস আসামে বিদেশী ভোটারের ধুয়া তুলে মঙ্গলদইতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করে। পরে তার পেছনে বিদেশী শক্তি যোগ দেয়। এই আন্দোলনের পেছনে সিয়া টাকা ঢালছে। ওয়াল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের হাত আছে এই আন্দোলনের পেছনে। নাগরিক প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা করে প্রকৃত সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে জাতীয় স্তরে একটি কমিটি গঠন করা দরকার। তাতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিতে হবে। তারা গোটা ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে পার্লামেন্টের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করবেন। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনার শুরুতেই বলতে ওঠেন গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডঃ হীরেন গোয়াইন। তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যের মধ্যে আসামের সমাজ-অর্থনৈতিক অবস্থার অতীত এবং বর্তমান পটভূমি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন আসামে বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বলতার জন্যই এই রকম উগ্র প্রাদেশিকতার নীতিতে পরিচালিত আন্দোলন দানা বাঁধতে পেরেছে। এই আন্দোলন বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। তিনি তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে আসামে বহিরাগতদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে একথা ঠিক নয়। আসামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। অসমীয়া ভাষাও অত্যন্ত উন্নত। কিন্তু অসমীয়াদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বহিরাগতরা নষ্ট করে দেবে, এই আশংকা অমূলক। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যেও অন্য রাজ্যের লোকেরা বাস করছে। আসলে গোটা দেশ জুড়ে যে অনগ্রসরতা তাকে দূর করতে আন্দোলন করতে হবে এবং তা হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। কোন একটি রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সে আন্দোলন চলতে পারে না। কিন্তু আসামে তা না হয়ে আন্দোলনকারীরা সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। বামপন্থী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে। জ্যোতি বসুর কুশপুত্তলিকা পোড়াচ্ছে। আর এসবে মদত দিচ্ছে সেখানকার একচেটিয়া পুঁজিপতি-গোষ্ঠী। এই রকম একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও আসামের বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি উগ্রজাতীয়তাবাদ, প্রাদেশিকতা এবং আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

দুদিনের আলোচনা সভাতে মোট প্রায় চল্লিশ জন বক্তা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের বক্তব্য থেকে যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে তা হ'ল—আসাম সমস্যাকে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করতে হবে। বিদেশী প্রশ্নে একাত্তর সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নেহরু-লিয়াকত এবং ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী সংবিধান সম্মতভাবে নাগরিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সারা ভারতবর্ষব্যাপী গড়ে তুলতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সেমিনার কমিটির তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র মুখার্জী আলোচনা সভাতে 'আসাম সমস্যা ও জাতীয় সংহতি' শীর্ষক একটি কার্যকরী দলিল উপস্থাপিত করেন।

সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসামের শিল্পীদের পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠানকে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

[সম্পাদকীয়ঃ ২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তাই মে-দিবসের অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় সমস্ত স্তরের লড়াকু সাধারণ মানুষ। যে দেশে ক্রমবর্দ্ধমান বিভীষিকাময় বেকারীর তীব্র দংশনে যুব জীবন নষ্ট হতে থাকে, যেখানে সৃজনশীল শক্তিমান যুব সমাজের এক বিরাট অংশের কাছে জীবনটা এক দুর্বিসহ বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়, যে দেশের যুব শক্তির প্রতিভার যথোপযুক্ত স্ফুরণের সুযোগ অকল্পনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ—সেখানে মে-দিবস যুবসম্প্রদায়কে হাতছানি দিয়ে জীবন-সংগ্রামের সমাধানের সঠিক পথে আহ্বান করে। সেই জন্য বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও মে-দিবসকে স্বাগত জানাই, বরণডালা সাজিয়ে আমরাও মে-দিবসকে বন্দনা করি। সু-স্বাগতম মে-দিবস। জয়তু মে-দিবস।

রবীন্দ্রনাথ : বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে একটি সর্বপ্রতিম দৃষ্টান্ত। উজ্জ্বলতম-জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাব-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—সারা দেশে তখন জাতীয়তার নামে প্রবল প্রাচ্যাভিমান বা হিন্দু-ঐতিহ্যের পুনরুত্থানপর্ব। রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনে মেতেছেন। কিন্তু এ সর্বনাশা সংকীর্ণ ঝোঁক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাই অগ্রজদের উদ্দেশে বললেন :

> তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
> ভেঙেছ মাটির আল,
> তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
> উজান স্রোতের কাল।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অন্য চেহারা। তিনি পুরোমাত্রায় চারণ। স্বদেশী গানে, প্রবন্ধে ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে মগ্ন, অধিকতর ব্যস্ত।

'এবার ফিরাও মোরে' কেবল কবির নয়, স্বদেশী যুগের ভারতবর্ষের প্রার্থনা। পর-পর স্বদেশে বিদেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে। কবিতা রচনার পক্ষে সে-সব খবর জানা এবং সেগুলির তাৎপর্য বুঝে উদ্দীপিত হওয়া মোটেই অপরিহার্য ছিলনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের কবি। যেখানেই সংকীর্ণতা, প্রবলের অত্যাচার, ন্যাশনালিজমের নামে বর্বরতা, বর্ণ-বৈষম্য, জাতিবৈষম্য এবং পরস্পর হানাহানি সেখানেই কবির প্রতিবাদী কণ্ঠ মুখর।

বালগঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ড, সাম্রাজ্যবাদী দমননীতি, কার্জনের শিক্ষাসংকোচ, বঙ্গভঙ্গ, ভাষা-বিচ্ছেদ পরিকল্পনা, আফ্রিকায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা, বুয়র যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ রবীন্দ্রব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' রাজনীতির দ্বিধা অপমানের প্রতিকার সমস্যা প্রভৃতি প্রবন্ধে মনীষী রবীন্দ্রনাথকে সমকালের সংকীর্ণতা থেকে আশ্চর্য রকম মুক্ত থাকতে দেখি। স্বদেশী সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে তিনি হিন্দু-ঐতিহ্যবাদের দ্বারা অংশত প্রভাবিত হলেও প্রধান ঝোঁকটা ছিল দেশের শতকরা নব্বইজনের পক্ষে। স্বদেশীসমাজ পল্লীসমাজ পল্লীপ্রকৃতি এবং সংস্কার সমিতির গঠনতন্ত্র ও সংকল্পবাক্য রচনা কেবল দেশকর্মী রবীন্দ্রনাথের কাজ নয়। তিনি বস্তুত স্বদেশ-সাধনার এই পর্বে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। কিন্তু তখনও তিনি একাধারে বাঙালীর কবি, ভারতের কবি এবং কবি-সার্বভৌম। অখণ্ড বাংলা ও ভারতের সব সামাজিক অসাম্য ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বরাবর সরব প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, কৃষকবিদ্রোহ, মোপলাবিদ্রোহ, অসহযোগ, বয়কট-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আশ্চর্যরকম প্রগতিশীল। তাঁর দৃষ্টি যে কত দূরপ্রসারী তার কয়েকটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্কেচ—সজল রায়

স্বদেশী যুগের ভাবপ্লাবনের মধ্যেও ইংরেজীয়ানা অনেকখানি ছিল। তাই কবিকণ্ঠে ধিক্কার শোনা যায়ঃ 'দুঃসাধ্য, তবু মনের আক্ষেপ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। ......ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব।' 'সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব।'

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তাঁর সায় ছিল। বস্তুত অসহযোগের মধ্যে যে 'আত্মনির্মাণ' 'জাতি-নির্মাণ' এবং স্বদেশী শিক্ষার ভিত্তিনির্মাণের মহতী সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন, তাকেই সর্বশক্তি দিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। 'উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিষ্কৃতি পাইনি'—এ উক্তি ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত। এসব কথা কম-বেশী পরিচিত। কিন্তু কেন তিনি এই অসহযোগের উত্তেজনার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন, সেটিই আমাদের আলোচ্য। অনেকের মতে, কবির সৃষ্টি-কল্পনা কর্মযজ্ঞের তাড়নায় ব্যাহত হচ্ছিল বলেই আপন কবিধর্মের তাগিদে জনারণ্য থেকে 'বিদায়' নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনের 'নীল-নির্জনে' ফিরে গেছেন। কিন্তু আসল কথা অন্য। বয়কটের নামে জবরদস্তি, বোম্বাই-আমেদাবাদের কোটিপতিদের স্বার্থরক্ষা, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান ও বিরোধ বৃদ্ধি তাঁকে পীড়িত করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মনের পাত্রে বরাবর ঢালতে চেষ্টা করেছে। সে তার শ্রেণীস্বার্থে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যেই কোথাও একটা প্রস্তুতি ছিল। নইলে এত তাড়াতাড়ি এত বেশি রক্তপাত হতনা। ইংরেজী শিক্ষিত কয়েকজন এবং দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে গভীর বিচ্ছেদ, হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যে বিভেদ —এ সবই আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষিত Elit গোষ্ঠী এবিষয়ে অবহিতও ছিলনা। তাই তাঁর ধারণা যথার্থঃ 'বিলাতীদ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এত বড় অহিত আর কিছু নাই।'

পূর্বে আমরা যে তিনটি সমাজের কথা বলেছি, সেগুলির গঠনতন্ত্র থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে কবির সতর্ক চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

(১) স্বদেশী সমাজ

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনপ্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গভর্নমেন্টের স্মরণাপন্ন হইব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরাজীতে পত্র লিখিবনা।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজীখানা, ইংরেজী সাজ, ইংরেজী বাদ্য, মদ্য সেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ-নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাংলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি, ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজনির্দিষ্ট বিচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

(২) পল্লীসমাজ

১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।

২। সর্বপ্রকার গ্রাম্যবিবাদ-বিসম্বাদ সালিশের দ্বারা মীমাংসা।

৩। স্বদেশ শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।

৪। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যক মতো নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫। বিজ্ঞান ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান ও সর্বধর্মের সার-নীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি ধর্মভাব একতা স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গো-মহিষাদির পালন দ্বারা জীবিকা-উপার্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

৯। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন।

১০। পল্লীর তত্ত্বসংগ্রহঃ অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি-অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর) ওলাউঠা, বসন্ত, অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪। জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন ও ঐক্যসংবর্ধন।

(৩) সংস্কার সমিতি ১৯৩১

আমরা চাই

বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশ পরাভবের পথে চলিয়াছে। আমাদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে উপেক্ষা ও অসম্মান এই সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ। এইজন্যই মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুপণ করিয়া তপস্যায় বসিয়াছেন। সমস্ত

দেশবাসীরও প্রাণপণ করিয়া এই অপরাধ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

এখন অবিলম্বে আমাদের এই কয়েকটি ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভা সমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবেনা।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিতে দিবনা।

আমাদের কাজ

হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করা, দুর্গতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পরস্পর শ্রদ্ধা দ্বারা সর্বশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধকে সত্য করা, জনসাধারণের মধ্যে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মশক্তি উদ্বোধন করার উদ্দেশে বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগের ভিতর দিয়া বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে।......এখন হইতে...বিশ্বভারতীতে সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল।

সংস্কার সমিতির কার্যধারা মোটামুটি এইরূপ

১। পল্লীসেবা

(ক) কেন্দ্রীয়সভার অধীনে সুবিধামতো অন্যান্য স্থানেও কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

(খ) ঐ শাখাকেন্দ্র হইতে পারিপার্শ্বিক গ্রামসমূহে সংস্কার সমিতি গড়া এবং তাহার অধীনে হরিসভা স্থাপন করিয়া তাহাতে সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে কীর্তন, পাঠ, কথকতা এবং সংবাদপত্র হইতে দেশের ও তৎপ্রসঙ্গে নিজ গ্রামের অবস্থা পর্যালোচনা। দুর্গতদের ঘনিষ্ঠ সহযোগে, তাহাদেরই সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, গ্রামে দিবা ও নৈশবিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, স্বাস্থ্য ও সেবা-সমিতি, ব্রতীদল, সালিশী-পঞ্চায়েৎ, সমবায় সমিতি পরিচালনা, মুষ্টিভিক্ষাসংগ্রহ, আবাস পরিষ্করণ এবং রাস্তাঘাট সংস্কার।

২। আবাসিক শিক্ষা

বিনা দক্ষিণায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে দুর্গতদের ছেলে রাখিয়া অন্যান্য ছাত্রদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্য হইতেই সমিতির ভাবী কর্মী ও কেন্দ্র-পরিচালক তৈরি করা।

৩। ব্যাপকভাবের প্রচার এবং সংঘ-সংগঠন

প্রচারকার্যের পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে সংস্কার সমিতির শাখা স্থাপন। তদ্দ্বারা স্থায়ীভাবে অস্পৃশ্যতা-পরিহার ও শিক্ষার প্রসারে দুর্গতদের সামাজিক অধিকার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। দুর্গতদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় উন্নতির পথে যে-সকল অন্তরায় আছে, তাহার প্রতিকার।

আমরা দেশবাসীদিগকে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য দেশের সর্বত্র এইরূপ স্থায়ী কাজের অনুষ্ঠান গড়িতে আহ্বান করিতেছি।...

এই সংস্কার সমিতি বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় কবির স্বাক্ষরিত আবেদন (১৫ই অঘ্রাণ ১৩৩৯, ১লা ডিসেম্বর ১৯৩২) 'Mahatmaji and the Depressed Humanity' শীর্ষক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল—'Proceeds from the sale of this book will go to the সংস্কার সমিতি, বিশ্বভারতী, for helping in its work of removing untouchability' অস্পৃশ্যতা, হরিজনদের ওপর অত্যাচার, গান্ধীর অনশন সম্পর্কে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ পত্রালাপ এই পুস্তিকার বিষয়। বলা বাহুল্য, অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে গান্ধী-পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর অচিরেই মতান্তর ঘটেছিল। চরকার ওপর অতিমাত্রায় জোর দিলে যদি গান্ধী-অনুমিত ৫০,০০০ টাকার সাশ্রয়ও হয়, তাতেও কৃষকের অধিকারের সীমা বাড়ছে না, তার সীমাহীন দারিদ্র্য ও সামাজিক নিপীড়নও দূর হচ্ছে না। প্রতি বছর কয়েকদিন ভাঙ্গি-কলোনিতে বাস করলেই সমস্যার সমাধান হয়না। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব, কৃষিজীবী জনগণ ও বুদ্ধিজীবী মানুষের মানসিক বিচ্ছেদের সমস্যাকে প্রায়-আধুনিক সমাজবিদের দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর পরিকল্পনাগুলিও অনেকাংশে 'ইউটোপিয়ান'। তবু তিনি সমস্যার গভীরে পৌঁচেছিলেন। অতদূর আর কোন দেশনেতার দৃষ্টি পড়েনি। যৌথখামার, ধর্মগোলা, দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট নিবারণ, মহামারী প্রতিষেধ, সমবায় ব্যাংক ও সমবায় সমিতি, বৃত্তিশিক্ষার দ্বারা যথার্থ আধুনিক সমাজকল্যাণ পদ্ধতিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কীর্তন, পাঠ এবং কথকতার সঙ্গে প্রাচীন সমাজের পুনরুত্থানের যোগ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা এবং পল্লীসমাজ-উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে এগুলিকে মিলিয়ে দেখতে হবে। পাঠ ও কথকতা লোকশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। নৈশ ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের পক্ষেও কার্যকর। লক্ষণীয় যে, সমবায়ের দ্বারা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা লাহোর কংগ্রেসের নেতারা ভাবতে পারেননি। 'কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিবনা বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না।'—এই কথায় আন্তরিক বিশ্বাস এখনো অনর্জিত।

সংস্কার সমিতির গঠনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের শুচি, স্নান-সমাপন, প্রেমের সোনা রং রেজিনী, প্রথম পূজা বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। কবিতাগুলি পরিচিত, তাই এখানে উদ্ধৃতি বর্জন করা হল। কিন্তু কী প্রবল গণমুখী মানবপ্রেম সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

'একজন লোক' কবিতার অংশ উদ্ধার করা হল।

আধ বুড়ো হিন্দুস্থানি
রোগা লম্বা মানুষ,
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ,
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা, চলেছে শহরের দিকে।

সেও আমার গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ
সেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো
যেখানে আমি—একজন লোক।

একই দেশে একই সমাজের দুই শ্রেণী, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। আমদানীকরা শিক্ষার এমনই প্রভাব। এই এলিটীয় জীবন এবং অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলেছে। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে 'অস্থানে' বা 'একজন লোক' বিখ্যাত উপলখণ্ড নয়; কিন্তু নতুন মূল্যবোধের বিশিষ্ট নিদর্শন।

এইসব বিভেদ, বিচ্ছেদ থেকে মুক্তির জন্য কবি ডাক দিয়েছিলেন যুবসমাজকে।

'আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েছে। তাই অবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্রয়ের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গড়ে তুলি, তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আমাদের শুভ চেষ্টাও খণ্ড খণ্ড হয়ে দেশকে আহত করচে।

'এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তার নিঃশ্বাস রোধ করতে প্রবৃত্ত, এ-পাপ প্রাচীন যুগের, এই অন্ধ বার্ধক্য যাবার সময় হল। তার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জ্বালিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দুঃখই পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হয়ে যাক নিঃশেষে ভস্মসাৎ।

'আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক তরুণদের নব জীবনের মধ্যে। আচারভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হয়ে তারা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক। যে-দুর্বল সেই ক্ষমা করতে পারেনা, তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত করে দিক, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সার্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।'

বিষ্ণুপুর ১নং ব্লক যুব উৎসবে পুরুষদের উচ্চ-লম্ফন
প্রতিযোগিতায় লম্ফনরত জনৈক প্রতিযোগী।

গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রচার ও অপপ্রচার

নবীন পাঠক

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা হয়ে উঠেছে, এটা খুবই বিপজ্জনক। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রচারাভিযানে নেমেছে, তাকে সিদ্ধ করতে গিয়ে ভারতের কয়েকটি সংবাদপত্র ও স্বার্থান্বেষী মহলও উঠে পড়ে লেগেছে। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল কমিউনিস্টরা বলেই বিষয়টি বিপজ্জনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারকের ভূমিকায় নেমে তিরিশে মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে এমন পর্যন্ত লিখেছে, বামফ্রন্ট সরকারকে যদি কেন্দ্র যে কোন অজুহাতে ভেঙে দেয়, সেটা হবে গণতান্ত্রিক। সরকার ভেঙে দিতে না পারাটাই অগণতান্ত্রিক। একমাত্র জঙ্গীশাহী ও কমিউনিস্ট শাসনে নাকি সরকার ভাঙা যায় না, কাজেই কমিউনিস্টরা অগণতান্ত্রিক। গণতন্ত্রের এধরণের সংজ্ঞা মার্কিন প্রচারেরই অংশ। সুকৌশলে তা ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে।

বাস্তব জীবনের ঘটনাপ্রবাহে এ প্রশ্নের আজ সন্দেহাতীতভাবে উত্তর মিলে গেছে যে, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ এই দুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি জনগণের সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। পুঁজিবাদের প্রচারকরা মনে করছে, সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করতে গেলে আধুনিক যুগে মানবাধিকারের কথা বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে তারা পুঁজিবাদ সম্পর্কে একটা তাত্ত্বিক প্রহেলিকা তৈরি করে এবং গণতন্ত্র মানবিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করে। এর জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। গণতন্ত্রের সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে এই প্রচারকরা কোন উচ্চবাচ্য করে না। ওখানেই যে তাদের বিপদ।

একসময় যখন সামন্তশোষণ ছাড়া আর কিছু ছিল না, তখন ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার নামোচ্চারণ করা অসম্ভব ছিল। যে দাসত্বের সর্তই জমিদার সামন্ত প্রভু ও রাজা মহারাজারা দিক না কেন, সেটা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেওয়া সাধারণ মানুষ দাস কিংবা কৃষকদের পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক। যখন শিল্পায়নের যুগ শুরু হল, তখন বড় বড় শিল্পপতিরা আরেক ধরণের শোষণ সৃষ্টি করল। সামন্ত প্রভুদের সাথে শিল্পপতিদের বিরাট বিরোধ বাধে। শিল্পপতিরা তখন সেই অর্থে প্রগতিশীল। কারণ শিল্পপতিরা বলল, অন্যায় হলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করা যাবে; আইন আদালত, ভোট সব থাকবে। এরই নাম দেওয়া হল গণতন্ত্র। এভাবে শিল্পপতিদের স্বাধীনতা অর্থাৎ শোষণ নিপীড়ণ চালাবার স্বাধীনতাকে যখন আইনসিদ্ধ, সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করা হল, তখন ব্যক্তিস্বাধীনতার ফাঁকা আওয়াজের তীব্রতা বেড়ে যায়। নিপুণভাবে গোটা সমাজের ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি যার থেকে এক্ষেত্রে লাভবান গোটাকতক বড়লোক এবং সর্বনাশ সমাজের বাকি গোটা অংশের মানুষের। এই অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য যাতে শোষিত মানুষকে সমাজের এই-সব শোষণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে না পারে তার জন্য গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা মানবাধিকার ইত্যাদি আওড়ানো হয়। যেমন শিশুর কান্নাকে রোধ করতে চকোলেট দেওয়া হয়। গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে মানুষ তার অসারত্ব বুঝে সত্যিই যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে আছে আইন, আদালত পুলিস মিলিটারী, ঠ্যাঙারে বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র। এই শিল্পপতি বড়লোকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য থাকে রাজনৈতিক দল। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম যুগে সমান ভোটাধিকার ছিল না। রাষ্ট্রশাসকদের হাতে ছিল সবকিছু। গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন বিস্তৃতির সাথে সাথে অধিকারও সম্প্রসারিত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে বা না-থেকে শিল্পপতিদের অর্থ ও ক্ষমতায় বলীয়ান রাজনৈতিক দলেরও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে বিপথগামী করতে। এসবের মধ্যে দাঁড়িয়েও যখন গণতান্ত্রিক উপায়েই জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বকারী দল বা গোষ্ঠী শত্রুদের কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়, তখনই 'গণতন্ত্রপ্রেমী' শাসকদের দল হয়ে ওঠে জঙ্গী। গণতন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় অথৈ জলে। সুদীর্ঘ মানব ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে উপরোক্ত কথাগুলি জাগতিক সূত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঘটনাবলীকে এইভাবে দেখার মত চেতনার যথেষ্ট অভাব থেকে যাওয়ায় এখনও বড়লোকদের দলগুলি মানুষকে বিপথগামী করতে পারে। মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে, গণতন্ত্রের মূল্যে সম্পর্কে তার চেতনা জাগ্রত হলে গণতন্ত্রের শত্রুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বড়লোকদের দেওয়া গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করার সার্থকতা এখানেই।

প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই। প্রচারের উদ্যোক্তা আগেই বলেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং তাদের সম-মনোভাবাপন্ন ধনতান্ত্রিক দেশগুলি। ভারতের মত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের শত্রুরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই প্রচার প্রতিনিয়ত চালায়। চরণ সিং, মোরারজী দেশাই বা ইন্দিরা গান্ধী সবারই এক রা'। জনগণের এক বিরাট অংশের মধ্যেও এ নিয়ে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পেরেছে। আমাদের দেশে একদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড়, অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর। কোটি কোটি মানুষকে শোষণে সর্বস্বান্ত করেই বড়লোকদের এত সম্পত্তি। সমস্ত অন্যায়ভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে পুঁজিপতি পরিবারগুলি মানুষের ওপর শোষণ নির্যাতন চালায়, মানুষ তার প্রতিবাদ জানায়। দিল্লির সর্বশক্তিমান সরকার বড়লোকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে কাজ করে। এরকম একটা পরিবেশে যুগ যুগ ধরে পুষ্ট যে কোন মানুষের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক পরিবেশের কথা বাস্তবে উপলব্ধি করা সত্যিই কঠিন। আমাদের দেশে যে অর্থে গণতন্ত্র এত প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই অর্থে সেই ধরণের গণতন্ত্রের কোন প্রয়োজনই নেই। সাধারণ মানুষ তার তাগিদ-বোধ করে না। কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে বড়লোক গরিব বলে কিছু থাকছে না, একজন অপরকে শোষণও করতে পারে না। সমস্ত রকম শোষণ ব্যবস্থার বিলোপ করেই যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়। যে দেশে বেকারী নেই, সেখানে বেকার যুবকদের কাজের অধিকারের

জন্য আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকারদানের প্রশ্নই ওঠে না। ভাত কাপড়ের সমস্যা যে দেশে নেই, সে দেশে ভাত কাপড়ের জন্য আন্দোলন করার গণতন্ত্রেরও প্রয়োজন কি? মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির যেখানে সমাধান হয়নি, গণতন্ত্র দরকার সেইসব ধনতান্ত্রিক দেশেই, যে অর্থে অন্ততঃ এখন আমরা গণতন্ত্রের প্রয়োজনটা উপলব্ধি করি। গণতন্ত্র যে কারণে দরকার, সেই কারণগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশে দূর হয়ে যায়। উপরন্তু সত্যিকারের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপ সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব। সেই গণতন্ত্রের নাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। ভারতের মত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিদ্যমান গণতন্ত্রের নাম বুর্জোয়া গণতন্ত্র। এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থ,—শোষণ নিপীড়ণ অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের সভা, সমাবেশ, সংগঠন করার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু এটুকু গণতন্ত্রও শাসকদের পক্ষে একসময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তখন শাসকরা সেই গণতন্ত্রও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জঙ্গী হয়ে ওঠে। যেমন শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থার সময় জঙ্গী শাসন কায়েম করেছিল, যেমন পাকিস্তানে বাংলাদেশে ও বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে জঙ্গী ও সামরিক শাসকরা শাসন করছে। এই জঙ্গী শাসনের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অনুযায়ী শাসনপদ্ধতির যে কোন সমালোচনা যে কোন লোকই করতে পারে। সংবিধানে সেই অধিকার সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে। বড়লোক-গরিব না থাকায় সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার সমস্ত জনগণেরই সরকার। কাজেই ধনতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশের সাংবিধানিক অধিকার কথার ফুলঝুরিও নয়, ফাঁকা আওয়াজও নয়। কিন্তু যারা এই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমালোচক, তারা ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিবেশে মানুষ হয়ে তার চৌহদ্দির বাইরে কোনকিছু চিন্তা করতে শেখেনি। সেজন্য তারা ভাবে, সমাজতান্ত্রিক দেশে যখন প্রতিবাদ ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং, ট্রেন আটকানো, বাস পোড়ানো ইত্যাদি হয় না; পুলিস লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস চালায় না, মিথ্যা মামলায় পুলিস প্রতিবাদী মানুষ ও সমালোচকদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় না, সেটা আবার গণতন্ত্র হল কি করে? তাদের কাছে গণতন্ত্রের অর্থ, খুনোখুনি মারামারি তুলকালাম কান্ড। তারপর অনেক হেস্তনেস্ত করে বড়জোর বিচারবিভাগীয় তদন্ত। অপরাধীরা তাকে হেসেই উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা ভাবতেও পারে না, ধনতান্ত্রিক দেশের মত সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনকর্তারা জনগণের শত্রু নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে জনগণের বক্তব্য, সমালোচনা ও পরামর্শ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার গ্রহণ করে। সেজন্যই সেখানে তুলকালাম কান্ড করার কথা মানুষের চিন্তার মধ্যেই নেই। এই বুর্জোয়া প্রচারকরা ভাবে, গভর্নমেন্ট মানে এমন একটা বস্তু যা জনগণকে পিষে মারে, প্রতিবাদ করলে জনগণের বিরুদ্ধে পুলিস লেলিয়ে দেয়। গভর্নমেন্ট মানে জনগণ যা চাইবে, তার বিরুদ্ধে দমনপীড়নমূলক কাজ করা। সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকার যেহেতু জনগণের বক্তব্য ও সমালোচনাকে মর্যাদার সাথে গ্রহণ করে এবং সেজন্য যখন কোন সংঘর্ষ হয় না, তখন সেই সরকার সরকারই নয়। এই ধ্যান ধারণা নিয়েই তারা সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র নেই বলে প্রচার করে। অথচ জনগণের সমালোচনা ও পরামর্শের মর্যাদা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশে দেওয়া হয় বলে গণতন্ত্র সেখানে বিকশিত হয়, গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ রূপের বিকাশ ঘটে। জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত হয় একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই। সেখানে এই অধিকার হরণের কোন ভয় বা আশংকা নেই। সেজন্য সেখানে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-ও করতে হয় না, দিবারাত্র গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে বুকফাটা চিৎকারও করতে হয় না।

গণতন্ত্রের আর একটি মূল্যবান দিক হ'ল বিরোধীপক্ষ নাকি থাকতেই হবে। কিন্তু সে তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রে প্রয়োজন, যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভারতের মত যেখানে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আবরণ রয়েছে, সেই দেশে মানুষের খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই, জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে, কোটি কোটি মানুষ বেকার, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই সেখানে মানুষের শত সহস্র দাবি। সমস্যা জীবন-মরণের। মানুষের দাবি ন্যূনতম, যেটুকু পেলে সে জীবনধারণটুকু করতে পারে। এই কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদকে ভাষা দিতে তাদের সংগঠন চাই, সংগঠন চাই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে। তা না হয় মানুষ অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন থাকলে তার ওপর কেন্দ্রের পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের সীমা পরিসীমা থাকে না। এই সংগঠনগুলিই হল বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিরোধীপক্ষের এই ভূমিকা পালনের অবকাশ সমাজতান্ত্রিক দেশে কোথায়? ওখানে চাকরি দাও—এই দাবিতে ক্ষোভ বিক্ষোভই নেই। খেতে দাও পরতে দাও রেশন দাও—এসব দাবি করার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই যে বিরোধীপক্ষ ভারতে, ব্রিটেনে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দরকার, সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই বিরোধীপক্ষের প্রয়োজন কোথায়? কেন বিরোধীপক্ষ? কিসের বিরোধিতা করবে? বিরোধীপক্ষের কাজ কী হবে? সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার ভুলপথে চললে তাকে শোধরানো? সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারের ভুলপথে চলার অর্থ তো এই নয় যে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সমস্যা সৃষ্টি হবে? ছোটখাট ত্রুটি বিচ্যুতি যদি সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত করার পথে হয়েই থাকে, তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ লক্ষ সদস্য সমালোচনা আত্মসমালোচনা করে। এই লক্ষ লক্ষ সদস্য পার্টির ভেতরে যা কিছু বলবে, সেটা জনগণের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে জনগণের বিভিন্ন অংশের বক্তব্যই তুলে ধরে। তার বাইরে যে জনগণ রয়েছে, তাদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তার জন্য রয়েছে সরকারী-বেসরকারী অসংখ্য নির্বাচিত গণসংগঠন। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত হ'ল, শ্রমজীবী মানুষের ডেপুটিদের সোভিয়েত। এই সোভিয়েতগুলি গণসংস্থা। সাধারণ মানুষরা এদের নির্বাচিত করেন এবং সাধারণ মানুষের কথামতই তা চলে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রাম সোভিয়েত থেকে সুপ্রিম সোভিয়েত পর্যন্ত নির্বাচিত বিশ লক্ষ প্রতিনিধি বা ডেপুটি সরকার চালায়। এর সাথে রয়েছে ২৫ লক্ষ সক্রিয় সোভিয়েত কর্মী। কাজেই জনগণের বক্তব্যকে এভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলেই ক্ষোভ বিক্ষোভ আন্দোলন করতে হয় না জনগণকে। এই কারণেই বিরোধীপক্ষ গঠনের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, মানুষের বিক্ষোভ থেকে

যায়, তাঁরা আন্দোলন করতে চান, তাহলে ঘটা করে বিরোধী রাজনৈতিক দল করার প্রয়োজন হয় না, আপনা থেকেই বিরোধীপক্ষ গড়ে উঠতে বাধ্য এবং সেটা জাগতিক নিয়মেই হবে। সোভিয়েতে বিপ্লবের পর গত তেষট্টি বছরের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে এটা বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক। অন্যদিকে জঙ্গী শাসনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় মানুষের ক্ষোভ থাকলে কী করে তা বিস্ফারিত হয়। পৃথিবীর বর্তমান ও অতীত ইতিহাসে জঙ্গী শাসনের উত্থান-পতনের অজস্র ঘটনার মধ্যে কোথাও একটি ঘটনাও পাওয়া যাবে না যেখানে জঙ্গীশাহী মানুষের বিদ্রোহের চাপে পর্যুদস্ত হয়নি। স্পেনে একনায়কতন্ত্রী জঙ্গীশাসক ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে চল্লিশ বছর ধরে মানুষ লড়াই করে গেছে, অভ্যুত্থানে সফল হতে চল্লিশ বছর সময় লেগেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে সমালোচনা ও বিতর্ক যা কিছু হয়, সেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজকে প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত। কাজেই প্রতিবাদের ধরণ জঙ্গীশাহী ও সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। সমাজতান্ত্রিক সমাজ উৎখাত করে ধনতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের কথা গোটা জনসংখ্যার কেউ বলেন না। সলঝেনিৎসিন প্রমুখদের আলাদা ব্যাপার। এদের আগেই তাড়ানো হল না কেন বুঝি না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথাই গোটা অংশের মানুষ বলে, ভারতে সেই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। গণতন্ত্র যেখানে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত, সেখানে বুর্জোয়া প্রচারকরা জঙ্গীশাহী ও কমিউনিস্ট সমাজকে এক করে দেখার জন্য মানুষকে শিক্ষা দেয়। অথচ এই প্রচারকরাই চীন সোভিয়েতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলে, সেখানে ভাত কাপড় বা মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের কোন সমস্যাই নেই। ফ্যাসিস্ট হিটলারও বলতো সমাজতন্ত্রের কথা, যার নাম দিয়েছিল জাতীয় সমাজতন্ত্র। ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজী দেশাইদের মতো বুর্জোয়া শাসকরাও সমাজতন্ত্র গঠনের কথা বলে। কারণ সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এমন এক আস্থা গেঁথে দিয়েছে যে, সমাজতন্ত্রের কথা না বললে মানুষ আর কাউকে বিশ্বাস করছে না। এটা সমাজতন্ত্রেরই জয়ের একটা পরিচয়। কিন্তু গণতন্ত্রের নাম করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের এই শত্রুরা যে আক্রমণ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামকে তীব্রতর করা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিটি কর্মীরই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

গণতন্ত্র শব্দটির চেয়ে এত বেশি বলাৎকার অন্য কোন শব্দের ওপর হয় না। গ্রীক শব্দ "demoskratos" শব্দ থেকে Democracy কথাটা এসেছে। "demos" মানে জনগণ এবং "kratos" মানে শাসন। অর্থাৎ গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের শাসন। কিন্তু কলকারখানা, জমি সম্পত্তি বাড়ি যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে থাকে এবং তারা যদি অবাধে কোটি কোটি মানুষকে শোষণ করে, তাহলে তাকে কি জনগণের শাসন বলা যায়? বুর্জোয়া শাসকরা শুধু মুখের কথায় বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা বলে। অথচ এরাই সেসবের হন্তা। সমাজতান্ত্রিক দেশে এসব স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়। সংবাদপত্রগুলি আমাদের দেশে কোটিপতিদের মালিকানায় রয়েছে। কাজেই পুঁজিপতিদের প্রচারটাই এসব সংবাদপত্রের মূলধন। রেডিওতে প্রচার হয় কেন্দ্রের জনবিরোধী সরকারের হুকুমে। জনগণের কথা তাতে স্থান পায় না। গণতন্ত্রের পালিস রাখতে শতকরা পাঁচ সাত ভাগ জায়গা বিরোধীদের জন্য দেওয়া হয়। ঘুষে বিচারকদের রায় পর্যন্ত পাল্টে যায়। জনগণ বিচার কোথায় পাবে? এটা গোপন রাখার কিছু নেই যে, সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রচার মাধ্যমে বুর্জোয়া ভাবধারা প্রচার করতে দেওয়া হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের পর দাবি উঠেছিল, জারপন্থী, রাজপন্থী, নৈরাজ্যপন্থীদের বক্তব্য প্রচার করতে দিতে হবে। লেনিন তখন বলেছিলেন, আমরা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীতেই এই প্রশ্নটাকে দেখি। কাজেই প্রচারযন্ত্রে এমন কিছু প্রচার করতে দেওয়া হবে না যা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা করবে এবং ধনতন্ত্রের জয়গান গাইবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের চেয়ে সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধনতান্ত্রিক সমাজ ভাল—এই জনবিরোধী প্রচার করতে দিলেই বুর্জোয়া প্রচারকদের কাছে "গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা" রক্ষিত হয়। সেই গণতন্ত্র জনগণের চরম শত্রু। সমাজতান্ত্রিক দেশে সংবাদপত্র একটি নয়, অসংখ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৫৭টি ভাষায় ১৪ হাজার সংবাদপত্র ও সাময়িকি প্রকাশিত হয়। চীনে এর চাইতে অনেক বেশি। সেখানে জনগণের সমস্ত অংশের মতামত প্রচারিত হয়।

ধনতান্ত্রিক দেশে যেমন ভারতে অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু তা করতে গেলে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার সরকারের অন্যায় অবিচারের সমর্থন করে সমস্তরকমের সমাজবিরোধী কার্যকলাপও চালানো যায়। তার বিরুদ্ধেও আইন আছে বটে। কিন্তু আইনের নিয়ন্ত্রক সরকার ও তার প্রশাসন-পুলিস সেইসব সমাজবিরোধীদের মাথায় তুলে রাখে। এরই নাম বুর্জোয়া প্রচারকদের কাছে গণতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশে উল্টোটা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজের সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য, প্রগতির জন্য যা কিছু করা হোক, সকলকে সমাদর দেওয়া হয়। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও তিরোহিত। এর নাম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। তাহলে সত্যিকারের গণতন্ত্র কোন্‌টি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ হয়ে জনগণের মধ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করার প্রবণতাই লোপ পায়। সেই প্রবণতার সামান্যতম কিছু দেখা দিলেও কঠোর হস্তে তা দমন করা হয়। তাহলে দেখা যায়, কোন সরকার চাইলে শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার অবিচার সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশেই তা সম্ভব এবং একমাত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রেই তা সম্ভব। তাহলে মৌলিক প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় কোন্‌টি ভাল—স্বৈরতন্ত্র বা জঙ্গীশাহী না বুর্জোয়া গণতন্ত্র? কোন্‌টি ভাল—বুর্জোয়া গণতন্ত্র না সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র? কোন্‌টি ভাল—ধনতন্ত্র না সমাজতন্ত্র? তবে এটা তো নিশ্চিত যে, টাটা বিড়লার পক্ষে যা ভাল, জনগণের পক্ষে তা নিশ্চয়ই সর্বনাশ। আবার জনগণ যাকে ভাল মনে করবে, টাটা বিড়লারা তাকে সর্বনাশ মনে করবে। টাটা বিড়লারা চায় ভারতে এখন যে ব্যবস্থা সেটা, অর্থাৎ ধনতন্ত্র। জনগণ চান সম্পূর্ণ বিপরীতটা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। কাজেই সমাজতন্ত্রের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের জন্য লড়াই অব্যাহতগতিতে চালিয়ে যেতে হবে। এই লড়ায়ের জন্য বুর্জোয়া গণতন্ত্র দরকার। অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্র দরকার জনগণেরই।

নিঙা ভাই মরিনি

প্রণব কুমার চক্রবর্তী

কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল—সেরকম কিছুই ছিলনা। অথচ শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল। ঘটে গেল এত বড় ব্যাপারটা।

গ্রামটা ছোট। সবে সন্ধ্যার মজলিস মণ্ডপতলায় জমে উঠব উঠব করছে। বোশেখী উত্তাপ। এরই মাঝে উত্তর পাড়ার নিতাই-পদ এসে খবরটা দিল—আর পাখির পালকের মত তা ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশ।

পালেদের লেঠেল টাঙি দিয়ে কচুকাটা করে ফেলেছে নিঙা কাহারকে। পাশের গাঁয়ের রমজান চাচার কাজ ছিল কামার দোকানে। ওখানেই বসেছিল ও। একলাফে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল—"কি হলছে র‍্যা?" রমজান চাচা আগে ভাগেই কানা-ঘুষায় একটু আধটু শুনেছিল পালেদের সাথে নিঙার গণ্ড-গোলের কথা। ওকে বলেওছিল রমজান চাচা—"দ্যাখ ভাই আমরা হ্যলাম ছোট জাত—মুখ্যু নোক—মজুর খাটি—বাল-বাচ্চা আছে—আমাদের কি উসব বড়নোকদের সাথে আবাদ বিবাদ মানায় র‍্যা।"

নিঙা কথাগুলো ভালোকরে শুনেই উত্তর দেয়—"চাচা ইসব কথা ঠিক লয়। উ বড়নোক তাতি তুমর আমর কি? উকি আমদের কিনি রাখছে? উদের পয়সা আছে বলি যা খুশী তাই করবি?—ইসব কেমন কথা গো চাচা।" রমজান চাচা বোঝাতে চেয়েছিল ব্যাপারটা। "ওদের জমিতে মজুর খেটিই আমদের পেট চালাতি হয়।" কিন্তু নিঙা ওর কথাই বলে—"উসব ছাড় চাচা। অলাষ্য কাজ করব না। হকপথে চলি। উ বড়নোক—তা কি হল—যা খুশী তাই করবি?"

আর কিছু না বলে—কিংবা রমজান চাচাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হনহন করে চলে গ্যাল। আজ হঠাৎ পালেদের সাথে নিঙার গণ্ডগোলের খবর পেয়ে চমকে উঠল রমজান চাচা। মনে পড়ল সেই কথাগুলো। একলাফে কামার দোকান থেকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—"কি ব্যাপর র‍্যা?"

নিতাইপদ এমনিতেই মজলিসের মাঝে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটা বলছিল—তাই উত্তেজনার মাঝে রমজান চাচার কথা আলাদা করে তার কানে গ্যালনা। যেটুকু রমজান চাচার কানে গ্যাল তাতে বুঝতে পারল পালেদের ভাড়াটে লেঠেল নিঙাকে খুন করেছে। তবে মরার আগে অবধি নিঙা লড়েছিল—মরদের মত। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গ্যাল মণ্ডপতলায়। ছেলে ছোকরার দল বয়স্কদের ধমকানি এড়িয়েও জমে রইল। ব্যাপারটা কি সে নিয়ে মাথাব্যাথা সেরকম নয়। সবার মুখে কথা একটাই—

"নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল।" কেউ হয়তো ভাসা গলায় বলল—"উদের পয়সা কত উরা তু মারবিই।" কেউ আফসোস করল—"ধ্যাঃ, নিঙা কি ম্যারি ফ্যালল র‍্যা!" ভুতো খুড়োই একমাত্র আইনের কথাটা তুলল। থানা পুলিস হবি। এপাশ ওপাশ থেকে কেউ বলল—"আরি উসব তো পয়সার ব্যাপর।"

তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনা কমে এল। কেউ ঘরের পানে আবার কেউ কেউ ঘটনাস্থলের দিকে যেতে শুরু করল। ব্যাপারটার মাঝে যে একটা কিন্তু আছে সেটা অনেকেই জানে—কিন্তুটা যে কি সেটা সঠিক কেউ জানেনা।

অবশ্য জমির ব্যাপারটা রমজান চাচা আর দু' চারজন ছাড়া ভালোভাবে কেউ জানেনা। রমজান চাচা চুপচাপ। কোন কথা নেই। কামারশালের একপ্রান্তে মাথা নীচু করে বসে আছে। ওদিকে হাতুড়ির ঘায়ে তার ইস্পাত ক্রমশ হাঁসুর আকার নিচ্ছে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রমজান চাচা উঠে পড়ল। "উদিকি একবার যাবার দরকার। ছুড়াটা অকালি চলি গ্যাল। উর ঘরের নোক আর বাল-বাচ্চাগুলা না খেতি পেয়ি মারা পড়বি?"—নিজের মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রমজান চাচা।

বিলপারে যেখানটায় ঘটনাটা ঘটেছিল রমজান চাচা যখন সেখানে গ্যাল তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ওপাশের সুইজগেটের উপর বেশ কিছু লোক জড় হয়েছে। প্রত্যেকের মুখই কেমন থমথমে—হাঁ চাঁ নাই একটুও। একটু একটু করে রমজান চাচা নিঙার পড়ে থাকা দেহটার কাছে গ্যাল।

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে নিঙা! না নিশ্চিন্তে নয়। ওর মুখের মধ্যে বিরক্তির ছাপ—ভ্রূকুটি। মাটিতে হাঁটুগেড়ে রমজান চাচা আল্লার কাছে তার জন্যে প্রার্থনা জানাল—শ্রদ্ধা জানাল এই একগুঁয়ে—জেদী—চওড়া বুক ছোঁড়াটার জন্যে। যে দু'বেলা পেটভরে খেতে পেত না তার মধ্যে এত তেজ এত আগুন ছিল কে জানত?

এতক্ষণে বেশ লোকজন এসে গ্যাছে। নিঙার আত্মীয় পাড়াপ্রতিবেশী। চারপাশে কানাকানি। কত রকম কথা। নিঙার সদ্য বিধবা বউ ও চার চারটে ছেলে সবগুলোই একথেকে আট বছরের মধ্যে নিঙার পাশে বসে আছে। বুঝবে আর কে কতটা? ঐ বড়ছেলে কানু আর নিঙার বো। বো মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছে শাপশাপান্ত দিচ্ছে। কাঁদছে গলা ছেড়ে—"ওগু আমর কি হলু গা—আমর কি হবি? ম্বর মর সব মর। আমর মরদকে যারা মারেছিস তাদের নিব্বংশ হবে। আল্লা তুমি

বিচার করু—আল্লা—আমর মরদকে যারা মারিছে তাদের যেন নির্বংশ হয়—মুখ দিয়ি গলগল করি অক্ত উঠে।" খুকনি পিসি, অচুখেপী যে যার মত সান্ত্বনাও দিচ্ছে। দুঃখ করছে। কেউ শুনছে। কেউ কিছু বলছে। আবার কেউ একেবারে চুপচাপ। কুলুপ আঁটা। কিছু একটা করা দরকার।

ফিসফিস গুঞ্জনটা ক্রমশ একটু চাপা উত্তেজনার দিকে মোড় নিতে শুরু করল। কয়েকজন বেশ উত্তেজিত—নিঙার প্রতিবেশী, রমজান চাচার পাড়ার লোক—এরা বেশ ক্ষুব্ধ। উত্তেজনা আরো বেড়ে উঠল। আইনরক্ষকের দল এসে পড়ল। বড় দারোগা এসেই জেরা শুরু করল—

"যখন ঘটনা ঘটে তখন কে কে উপস্থিত ছিলি?" প্রথমটা কেউ সাড়া দিতে চায়নি পরে দারোগা আবার হাঁকতে যেদিকটায় উত্তেজনা বেশী ছিল সেখান থেকে একজন বেঁটে শীর্ণকায় লোক বেরিয়ে এল—

—"আমি ছিলম বটে"

বলেই দারোগার সামনে মাথার মাথালিটা ছুড়ে ফেলে দাঁড়াল। দারোগা ওর পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিল এক পলক। শুধাল—

—"তোর নাম কি?"

—"দীনু বটে।"

—"কোন গায়ে থাকিস?"

—"ঐ হোথা, উ গায়ে"—বলে পুবের দিকে আঙ্গুল দেখাল।

—"আরে নামটা বলবিতো"—বলে মাটিতে বুটটা ঘষে নিল।

—"শুশুনপুর বটে।"

—"তা তুই দেখেছিলি নিঙাকে কারা মারল?"

—"কারা কি গু? পালিদির লেঠিল আবর কারা? উরা তু ইর অ্যাগেও দু' সাতটা নোককি কুপাই কাটিছে—যে উদের মুখির উপর লাঠি ঘুরাইছে তাদিরকে শ্যাষ করি দিলছে—ভাড়া করা লেঠিল দিয়ি। কিন্তু এবারে নিঙাকি মারাটা......"

দারোগা "থাম" বলে—কাছের কনস্টেবলকে ডাক দিল। ভীড়ের মাঝে—উত্তেজনাটা আরো অশান্ত হোল। সবার চোখ একবার দারোগার দিকে একবার দীনুর দিকে—কি হয় কি হয়। দারোগা একবার দেখে নিল—চারপাশটা। আজকাল কি সব হয়—বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। একসময় ছিল যখন এরকম খুনগুলো কিছুই ছিল না। আসবার দরকারও হোত না। সহকারী এসে কানে কানে কিছু বলতে দারোগা শুধু মাথা নাড়ল।

দারোগা ও দীনুর কথা থেকে বোঝা গেল নিঙা ওর বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে এ জমিটা চাষ করে আসছে। কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ পালেদের এ জমির প্রতি নজর পড়ে। বলে এ জমি আমাদের। অবশ্য পালেদের পুকুরটা সাইজ করার জন্যে এ জমিটার খুব দরকার। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নিঙার সাথে পালেদের খুচখাচ চলছিল। নিঙা আবার এমনিতেই একটু একগুঁয়ে, গোঁয়ার। দীনুর কথায়—"উ অলাহ্য কাজ করতুও না দেখতিও পারতু না।" বলাই মোড়ল এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। কিন্তু এবারে মুখ খুলল। "আরে চুপ কর বড় বড় কথা বলিসনি।" দারোগার দিকে তাকিয়ে বলল,—"যা হয় করুন আপনিই। ওদের কথা বাদ দিন। সব তাতে বড় বড় কথা।"

কিন্তু দীনু সব কথাই বলবে। "কেনে বুলবুনা। উ যা বলিছি যা করিছি সব বুলবু।"

"সন্ধ্যের দিকে পালিদির বড় ছেলি লেঠিল নিয়ি এসে জমিতি নামে। নিঙা ধারে কাছিই ছিল। উ খবরটা পেতিই লাঠি নিয়ি ছুটি আসে। তখনো পালিদির লেঠিল জমিতি নামিনি। জমিতি বুক সমান পাট। চোখ জুড়ান পাট।"

নিঙা এসেই হুংকার ছাড়ল—"যে শালা জমিত নামবি আজ তার একদিন কি আমর একদিন।"

বেশ কিছুক্ষণ বচসা হয়।

তারপর পালিদির লেঠিল জমিতি নামে। নিঙা বাধা দিতি গেলি পাঁচ ছ' জন ওকি ঘিরি ধরি টাঙ্গির কোপ বসিয়ি দেয়। উ একা আর কতুখণ লড়বি?"

সাঁঝ গড়িয়ে রাত নামব নামব। আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামবে মনে হয়। দারোগা একটু চঞ্চল হোল। ভীড়ের মাঝে এখন শুধুই উত্তেজনা।

দারোগা হাঁক দিল,—"রামধন, লাশ তোল।" কিন্তু চাপা গুঞ্জনটা এবার ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। দারোগা দেখল...... বিপত্তি......। বলাই মোড়ল ও ভুতো মোড়ল নড়ে চড়ে বসল। "দারোগাবাবু আপনিই দেখেন ব্যাপারটা আমরা ওদিকে যাই, জল হবে মনে হয়।"

দারোগা প্রথমে হুংকার দিয়ে সেই চিরায়ত নিয়মে ফায়সালা করা যায় কিনা দেখতে চাইল।

কিন্তু রমজান চাচা এবারে সপ্রতিভ। "না নিঙা ভাই কি আমরা কারুর হাতি দিবনা। যা করবার আমরই করবু।" দারোগা বুঝতে পারল আজ আর সুবিধে হবে না। হাসপাতালের পরীক্ষার কথা—আইনের কথা বলে দেখল কিছু হয় কিনা? শুধু বুট দিয়ে মাটী ঘষতে লাগল। হাতের উপর হাত ঘষতে লাগল।

রমজান চাচা একারে জোর গলায় বলে উঠল—"ভাইসব নিঙাভাই মরিনি। নিঙাভাই আমদের দেখিয়ি দিল জান দিব তবে অধিকার ছাড়বো নাই। আর আম্রা বড়নোকদের লাল-চোখকে ভয় পাবু না। ভাইসব, আজ সব থেকি দুঃখের কথা আমদের মতই মজুর তারা পালিদির কিনা গুলাম হয়ি সামন্য পয়সার লোভে আমদেরই এক ভাই কি খুন করলু।"

রমজান চাচার কণ্ঠস্বর প্রায় ভেঙে এসেছিল, কান্নায়—ক্ষোভে—দুঃখে, তবুও কিছু বলার চেষ্টা করছিল।

ফোটা ফোটা বৃষ্টি এবারে মুষলধারে নেমে এল। বাঁধ ভাঙা প্লাবনের মতো শেষ বোশেখের মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। তার মাঝে রমজান চাচা লাশে হাত লাগাল। রমজান চাচার পেছনে মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। দূরে দাঁড়িয়ে বড় দারোগা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বসন্ত

অসীম মুখোপাধ্যায়

দিগন্তবৃত্তের মধ্যে ডুবে গেছে সূর্য ও পাখীরা।

অর্ধনিমীলিত চোখ—ছুটে আসে ছায়ার বিমান
চরাচর শিস্‌মাখা স্তব্ধ প্রায় সাঁতালী পর্বত
আহ্নিকের কাল শেষ......তারাদের গগনবিহার ঃ
সপ্তর্ষির দীপ্তি নিয়ে অকাশ ভ্রূকুটি করে, হাসে
বাতাসে ফুলের গন্ধ মাতোয়ারা অখিল ভুবন !

খাবারের ঘণ্টা হলে এইসব রেখে যেতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ

ইরা সরকার

ইচ্ছে করে সব শিশুকেই দিই তোমার শৈশব
সোনার বাংলার গন্ধে স্বচ্ছল স্বচ্ছন্দ এক বিস্ময় আরক
লেখাপড়া গানশেখা বাবার সঙ্গে ঘোরা
ডালহৌসী পাহাড়ে পাহাড়ে—

ইচ্ছে করে সব শিশুদের হাতে তুলে দিই
এক একটি রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতি
সদর স্ট্রীটের বাড়ী খুললে তারা ফিরে পাবে
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ সাবলীল জীবনের গতি—

আকাশের মস্ত খামে পৃথিবীর চিঠি প্রতিদিন
যে অক্ষরে লেখা থাকে শিশুরা তা বোঝে, তুমিও বুঝতে,
সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি, কিন্তু সবাই মানুষ হবে
ছড়ানো জীবন ধারা বহুদূর নদী এক পশ্চিম বাংলায়—

তুমি কি এখন কবি বাংলার পলিমাটি স্পন্দন আকুল
তোমার বাঁচার রস ছড়িয়েছ শিশুদের শিকড়ে শিকড়ে
যেমন অবুঝ মাকে ওপারের অবু মনে করে
রবির সোনার আলো এদেশের শ্যামল গভীরে॥

আগামী সকাল পর্যন্ত

চন্দন কুমার বসু

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কলম
স্থির
নিশ্চুপ...
সম্মুখে প্রস্তুত আগ্নেয়
ত্রস্ত
স্পন্দিত।
ডুবে যাবে মুহূর্ত পরেই
পশ্চিমে
নির্জনে—
তবু লাল, অনেক—অনেক লাল
বধ্যভূমি
মাথার আকাশ
আর
দিগন্ত রক্তিম।
নিংড়ে দেবেই রসদ
বাঁচতে
সারাটা রাত......
আগামী সকাল পর্যন্ত।

ব্রাহস্পর্শের পাণ্ডুলিপিতে

কল্যাণ দে

ঈপ্সিত ঘাসের ডগায় প্রণয় ছড়িয়ে আছে হৈমন্তিকার ভোরে
দোর খোলেনা কেন স্বজন বকুল ?
কাকের চোখের 'পরে স্বপ্ন যে ডিম ভেঙে স্নেহ ছড়ায়
মেঘের জাজিম লেপ এখনো বুকে জড়িয়ে
নিস্পৃহ সন্ন্যাস নিয়ে আত্মমগ্ন মাটির মানুষ......
বুক গুলো চিরে ফেল কলজেয় দেখ গাঁথা আছে
কালের শরীর
নগ্ন হলে নিজেকে বড় সহজেই চেনা যায়—

ঊর্ণনাভ বিছিয়ে রেখে গার্হস্থ্য মাঠের দাওয়ায়
নষ্ট বটের ছায়ার মত পাশা খেলা
বিধি বহির্ভূত প্লানিকর
এত সব বাক্য শুধু নিষ্ফলা বীজ—ভেবোনা ঃ
জবান দিয়েছ যা নদীর দলিলে
এখন ব্রাহস্পর্শের পাণ্ডুলিপিতে ঘোমটা খুলে হও
অরণ্যের সরল বর্ষীয়

জনান্তিকে

কেতকী বিশ্বাস

কাস্তের ফলার মত পঞ্চমীর শিশু চাঁদ
থিক থিক করে কাঁপে
ঘুমন্ত আকাশের নিঃশ্বাসের চাপে,
অনাহূত, অশরীরী ইচ্ছারা কাঁপে
অস্পষ্ট তারায়, পাঁচিলের উপর গোড়া পেড়ে
কেটে ফেলা অশথের নরম পাতায়,
এখানে এক বুক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে
ছোট্ট ফাটলধরা চাতালে
পৌষের শীতে কাঁপি আমি।

বিছানার উত্তাপ স্বপ্নের দানবিক যন্ত্রণার কাছে
অতিরিক্ত, তাৎপর্যহীন,
ঘুম নেই; ঘুম আসে না;
ঘুমাতে নেই, ঘুমালে—
যন্ত্রণা চাপা পড়ে যায়
এক বুক কুয়াশার নিচে।
পাশের বস্তিতে সেই মেয়েটাও
ঘুমায় না আজ ক'দিন
ছটফট করে প্রসবের অসহ্য বেদনায়,
ঘুমাতে পারে না আরো অনেকে
যারা মেয়েটাকে পাহারা দেয়
এবং রাত্রিকেও।

পঞ্চমীর শিশুচাঁদ উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনে
টীনের চালে আটকে থাকা বাতাসের
করুণ প্রতিধ্বনি,
অভিজ্ঞ মায়েদের ফিস্‌ফিসে গলায়
সতর্ক প্রহর গোনা
এবং
আরো অনেকের সাথে আমার
ফুসফুসের দ্রুত উঠা নামা।

ঘুম নেই; ঘুম আসে না;
ঘুমাতে নেই; ঘুমালে, স্বপ্নের অশ্লীলতায়
স্বপ্নের সত্যটা মরে যায়!
তাই জেগে থাকি—
এক বুক কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে
চরম যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে।
জেগে থাকি—
আরো অ-নে-ক "জেগে থাকা" চোখে
নিজেকে চিনব বলে।

চন্দ্রিমা

পরিতোষ দত্ত

দেখো চন্দ্রিমা—
চাঁদের তৈরী পাহাড়ের গপ্পো, আমি
শুনেছি অনেক,
দেখেছি কিন্তর—
মনে পড়ছে আবছা আবছা।
এক সেই বুড়ী
তার মাংস বিহীন দেহটাকে
যৌবন খোলসে পুরে
কোন ঐ আদ্যিকাল থেকে
শুধু চরকা কেটে চলেছে।

হাতে আমার অক্ষয় সুতো
ধমণীতে অমর পোষ্টার
দেবত্বের উত্তরাধিকার।

চন্দ্রিমা—
তোমার তৈরী পাহাড়ের গপ্পো আমার জানা নেই
শুনেছি বলে মনে পড়ে না
দেখেছি শুধু অমার অন্ধকারে
তবে—ভুলি নি কিছুই।
হয়তো বুঝেছিলাম—
তোমার নিঃশ্বাসে উষ্ণতা আছে,
রক্তের ফোঁটাগুলো এখনো দুধের মতো হয়নি
তোমার যৌবন পল্লবিত কুঞ্জ
পুরুষ্ট ন্যাকামির খোলসমুক্ত।
গোলাপ পাঁপড়ির স্তর বিভাগ—
আজও আমি জানি না,
ঘ্রাণের তীব্রতা—
জিজ্ঞেস করলে নির্ভুল উত্তর
আজ হয়তো তুমি আর পাবে না।
তবে ফুটপাথে বিছানো ছেঁড়া কাঁথার ঐ প্রত্যেকটি স্তর,
সিক্ত কাঁথার মাদকীয় ঘ্রাণ
কুশলী ছুঁচের নিপুণ টান
চন্দ্রা—
আজও আমি ভুলি নি।
চন্দ্রা, তোমার নিটোল যৌবন,
কুসুমিত কুঞ্জ—
অনন্ত সমুদ্রে, সময় মন্থনে ভাসিয়ে রাখো।
তোমার সৌন্দর্য, প্রতিটি মুহূর্ত,
মূর্ত হোক চিরবসন্তে।
শাশ্বত তন্ত্রীর ঝংকৃত বন্দনায়
ধরা থাক এক মলিন সত্য॥

লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন : এক পরম সত্য

ঋতীশ চক্রবর্তী

তরুণ মানসের সুস্পষ্ট প্রতিফলন 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন'। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী সাহিত্য শিল্প জগৎ তাদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। এইসব সংবাদপত্র গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রের মূল লক্ষ্য মুনাফা লোটাই শুধু নয়, এ'দের কেনা শিল্পী-সাহিত্যিক দিয়ে সৃষ্টিশীল মানসিকতাকে বিপথে পরিচালিত করা। মানসিক দিক থেকে এই বিকৃত চেতনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে সোচ্চারিত শব্দে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের আত্মপ্রকাশ।

বাঙ্গালীর সাহিত্যপ্রীতি আবহমানকালের। জীবনের জিজ্ঞাসা বাস্তবে চিত্রায়িত করবার প্রচেষ্টা করে থাকেন আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা। কিছু কিছু শিল্পী এরমধ্যে নিজেদের বিক্রী করে দেন জীবনের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবার জন্য। তাঁরা মৌলিক চিন্তাধারা থেকে অনেকটা সরে আসতে বাধ্য হন। যে শিল্প মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার পুরো চিত্রটাকে তুলে ধরতে পারে, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ করার মাধ্যম হিসেবে যে শিল্প প্রতিফলিত হয়, সেই শিল্পকেই আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন সময়ে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। অগণিত পাঠককে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক স্থাপন করতে। কিন্তু আত্ম-বিক্রীত যাঁরা, তাঁদের সৃষ্টির সঙ্গে জীবনের কোন যোগ থাকে না। সম্ভবও নয়। সাধারণ মানুষের স্নায়বিক চেতনার ওপর আঘাত দেবার তাঁরা চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন কিভাবে তরুণের প্রাণোচ্ছলতাকে বিকৃত মানসিকতার পরিধির মধ্যে চিরস্থায়ী করে রাখা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের, তাঁরা শেষপর্যন্ত সফলকাম হতে পারেন না।

ভারতবর্ষের মত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই জন্ম হয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার। এই জীবন বিকেন্দ্রিক পরি-মণ্ডলেই গড়ে ওঠে 'জীবনের জন্য শিল্প' মনোভাব। তারুণ্যের দীপ্ততেজ প্রতিবাদীমন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বেশীর ভাগ লিট্‌ল ম্যাগাজিনেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আবহমান কালের সাহিত্যপ্রীতির প্রবাহে তরুণ মানস দৃপ্ত হয়ে ওঠে। গুটিকতক ছেলে লেখার তাগিদকে ধরে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আত্মবিক্রীত সাহিত্যিককে যদি তাঁরা অনু-করণ করবার চেষ্টা করেন, দুটো কি বড়জোর তিনটে সংখ্যা অনিয়মিতভাবে তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন সাধারণতঃ। তারপর উচ্ছ্বাসের ধারার মধ্যে ভাটা আসে কারুর। আবার কেউ হয়ত এরইমধ্যে একে-তাকে ধরে দুই একটা লেখা বাজারী সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেন। পত্রিকা প্রকাশ করবার ক্ষেত্রেও তাঁদের আর আগ্রহ থাকে না।

কিন্তু লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো—যখন একটা সুচিন্তিত মানসিকতা নিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লড়াই-এর মাধ্যম হিসেবে লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হয়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেই পত্রিকাগুলো বেশ কিছুদিন অনিয়মিতভাবে হলেও প্রকাশিত হয়। প্রথম থেকেই উদ্যোক্তারা জানেন পথটা সহজ নয়। লড়াই-ই একমাত্র পথ। স্বভাবতঃই দমে যাবার কোন ইঙ্গিত তাঁদের মধ্যে নেই। যেহেতু দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে তাঁরা আগ্রহী, পত্রিকার জীবনে আরও বেশ কিছু আদর্শবান ছেলে আসতে থাকেন। কারণ, তাঁদের নেশা আছে, সংগঠিতভাবে জীবনকে পরিচালিত করবার। সামান্য খড়কুটো পেলেই তাঁরা হাত বাড়িয়ে দেন। আস্তে আস্তে পত্রিকার জীবন এগিয়ে চলে। পথে বেশ কিছু নতুন মুখ যেমন জোটে, আবার কিছু পুরোন মুখও সরে পড়ে। সঠিক আদর্শ থাকে বলে বন্ধু বা শত্রু চিনতে উদ্যোক্তাদের অসুবিধা হয় না। ফলে আগাছার সৃষ্টিও কম হয় সেখানে।

আর একটা গোষ্ঠী আছে যেখানে সম্পাদক তাঁর নিজের জীবনের অধ্যায় দিয়ে কিছু লোককে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেন। পত্রিকায় সম্পাদকের নিজের চার পাঁচটা কবিতা, প্রবন্ধ, তাঁর প্রকাশিত কোন বই-এর সমালোচনা, বিজ্ঞাপন। মূলতঃ কিছু ছেলেকে পরিস্কারভাবে চিট করে সম্পাদকের আত্ম-প্রচার। এ প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে অনেক পরিচিত প্রগতিশীল কবিদের নামও মনে পড়ে যাচ্ছে। সম্পাদক যিনি থাকেন, তাঁর মূল লক্ষ্য পত্রিকার মধ্যে কতবার কতকায়দায় তাঁর নামটা ছাপান যেতে পারে। এ ধরণের পত্রিকার আয়ুও খুবই সীমিত।

মোটামুটিভাবে লিট্‌ল ম্যাগাজিন জগত সম্পর্কে যাঁরা জ্ঞাত আছেন তাঁরা আমার কথার সঙ্গে আশাকরি একমত হবেন—যে সমস্ত লিট্‌ল ম্যাগাজিন সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করতে পারে এবং এগিয়ে যেতে পারে সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অঙ্গীকার নিয়ে, সে ধরনের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জীবনও অনেক বেশী সাবলীল। অনেক দৃপ্ত। এবং তারা ক্ষণজীবীও নয়।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক চেতনায় উজ্জ্বল দলিল এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিন। এখনও এমন সম্পাদক-শিল্পী-সাহিত্যিক

রয়েছেন যাঁরা কোনকিছুর বিনিময়েও নিজেকে বিক্রী করবেন না। জীবনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠার সংকল্পে নিজেরা উৎসর্গীকৃত। বস্তুতঃ এঁদের তপস্যার ফসলই জাতির মানস সঞ্চয়ে সংগ্রহ করে রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সম্পাদনা যে শ্রমনিষ্ঠ ভালবাসা এবং সুস্থ মানসিকতা নির্ভর শিল্প, এঁদের লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোই তার সাক্ষ্য বহন করে। কিছু কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ যেমন এই পত্রিকায় থাকে, পাশাপাশি থাকে পরীক্ষামূলক বিভিন্ন রচনা। এই সব পরীক্ষা পাঠকদের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাজারী পত্র পত্রিকাগুলি এগিয়ে আসবে না। কারণ তাদের মূল লক্ষ্য সৃষ্টিশীল চেতনার বিকাশ সাধন নয়, মুনাফার পাহাড় বাড়ানো। সঙ্গতকারণেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মধ্যেই এই পরীক্ষা চলে। সঠিকভাবেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ল্যাবরেটরী। সাহিত্যকে কাটা ছেঁড়া করে পরীক্ষা করবার সুযোগ থাকে লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর পাতায়।

জাতীয় সামগ্রিক প্রয়োজনেই এই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারের চিন্তাভাবনা শুরু করা দরকার। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অকালমৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ বিজ্ঞাপনের অভাব। যদিও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করেছেন, যে কোন registered পত্রিকাকেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এরমধ্যে বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিনে রাজ্যসরকারী বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে। একটা পত্রিকায় রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে বড়জোর একটা কি দুটো মাত্র বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক কাগজের দাম আর প্রিন্টিং-এর অব্যবস্থা এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোকে ক্ষণজীবী হতে বাধ্য করে। আর্থিক সচ্ছলতা এই সব ম্যাগাজিনের থাকে না। স্বভাবতঃই বেশ কিছু টাকা অগ্রিম বাবদ প্রেসে তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রেসের মালিকও এই সব ম্যাগাজিনকে একটু অন্যভাবে দেখে। করুণার দৃষ্টিতে তারা দেখে। কারণ, সাধারণতঃ এই সব ম্যাগাজিনগুলো প্রথমে কিছু টাকা নিজেদের পকেট থেকে প্রেসকে দেন। যদি কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় তার টাকা জোগাড় করে পকেট থেকে আরও কিছু দিয়ে প্রেসের পুরো টাকা শোধ করে দেন। যেহেতু ছোট পত্রিকা, তাতে আবার টাকাটাও সাধারণতঃ কয়েক ক্ষেপে দেওয়া হয় তাই এদের ওপরে প্রেসের মালিকদের থাকে অনুকম্পার মনোভাব। যেন তারা কৃতার্থ করছেন। কিন্তু এই মালিকরাই আবার প্রচুর টাকা খরচ করে একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর কাজ করে দিচ্ছেন। যে টাকা কবে পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই, সেই কোম্পানীর যে ব্যক্তি এইসব দেখাশোনা করেন তাকে এ ছাড়াও আবার সন্তুষ্ট রাখবার জন্য কিছু প্রেসের মালিককে দিতে হয়। সুতরাং প্রিন্টিং-এর এই অব্যবস্থা লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে বেশ ধাক্কা দেয়।

বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গে আসা যাক। শুধুমাত্র রাজ্যসরকারের একটা বা দুটো বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করলে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জীবনের স্রোতধারাকে সাবলীল করা সম্ভব নয়। ধরুন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন একটা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনের জন্য কোন সম্পাদক গেলেন। সেখানে দেখা যায় যতটা গুরুত্ব এঁকে দিচ্ছেন তার থেকেও বেশী গুরুত্ব পাচ্ছেন কোন বাজারী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। তার নিজের সম্পাদিত পত্রিকা বা কোনও বন্ধু সম্পাদকের জন্য হয়ত তিনি গেছেন। তাঁদের আদর্শ সেই তথাকথিত আত্মবিক্রীত শিল্পীসাহিত্যিক। লেখকের একবার প্রয়োজন হয়েছিল কোন এক লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের জন্য ইস্টার্ন রেল পি. আর. ও. অফিসে যাওয়া। প্রথম দিকে বিভাগীয় ব্যক্তি বললেন কোন একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট-এর সার্টিফিকেট লাগবে—আপনাদের পত্রিকা ২২০০-এর মত বেরোয় এই হিসেবে। ক'দিন পরে সার্টিফিকেট নিয়ে দেখা করলাম সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে। বললেন, ডি· এ. ভি. পি.-র কোটা থাকলে পাবেন। হতাশ হয়ে আমাকে ফিরতে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু কোন বিখ্যাত বাজারী সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত আত্মবিক্রীত শিল্পী সাহিত্যিকদের এমন কিছু পত্রিকা রয়েছে যাদের এসবের প্রয়োজন হয় না। কারণ অপসংস্কৃতির বেলেল্লাপনায় সেই সব শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে এইসব সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও গা ভাসাতে হয়।

বর্তমান রাজ্যসরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই সুস্থ জীবনকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সপক্ষে সচেতন হতে দেশের জাগ্রত যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলো এর সপক্ষে সৃষ্টির প্রভাত থেকেই দৃপ্ত পদচারণা শুরু করেছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই না করতে পারলে এই অপসংস্কৃতির বেলেল্লাপনা রোখা যাবে না। তাই প্রয়োজন সংগঠিত প্রয়াস। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। বাংলাসাহিত্যের মধ্য থেকে আবর্জনাকে সরিয়ে দিতে হবে। আবর্জনা সংরক্ষণের দায়িত্ব পুঁজিপতি গোষ্ঠী পরিচালিত পত্রিকার কর্মকর্তাদের। সুস্থ জীবনমুখী চেতনার বিকাশ ঘটাতে গেলে সরকারেরও প্রয়োজন এই সব লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া। তাঁদের কাছে অনুরোধ—বছরে একবার শারদ সংখ্যার বিচার করে শ্রেষ্ঠ লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে পুরস্কৃত করুন। কিছু অনুদানেরও ব্যবস্থা করুন। যাতে এই সব পত্রিকা থেকে ফুল ফুটতে পারে। আনন্দের উদ্যান তৈরী হতে পারে। মানুষের বেঁচে থাকবার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিন। লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ আন্দোলন চিরসত্য হয়ে উঠবেই।

আরো আরো দাও প্রাণ

সুমিত নন্দী

বিগত ৯ই মার্চ সমগ্র কলকাতার শরীরে মিশে ছিল এক অভিনব পদযাত্রা। এই কলকাতারই কর্মব্যস্ত মানুষের মনের কোণে বহু গোপনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নের শিকড়টিকে যারা সুখ ও সৌন্দর্যের গান গেয়ে নাড়া দিয়েছিলেন, সেই স্টুডেনথ হেলথ হোমকে অজস্র ধন্যবাদ। অসুখ থেকে সুখের পথে চলার আহ্বানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কলকাতার বিভিন্ন দিক থেকে পায়ে হেঁটে শহীদ মিনারের সামনে জমায়েত হন। আর, এই পদযাত্রায় অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে সমগ্র ছাত্রছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়ান শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, শিল্পী থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের মানুষ। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে তুলে ধরাই ছিল এই পদযাত্রার মূল উদ্দেশ্য। বলতে দ্বিধা নেই, বছরের পর বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্মম উদাসীনতার সন্ধান পেয়ে, আমরা আজ সত্যিই লজ্জিত। সেইজন্যই বিগত দিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলির দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য হই।

সেই প্রাচীনকালে প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে আরম্ভ করে হালের দিনের নয়া দার্শনিকের চিন্তাতেও একই কথা শোনা যায়, "সুন্দর স্বাস্থ্যের বিনিময়ে আমরা পেতে পারি এক আদর্শ নাগরিক।" কথাটা একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আসলে, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে মনও সতেজ হয়, মনের প্রসারতা ঘটে। আর প্রসারিত মনের নাগরিকের কর্মচিন্তা সর্বদাই বাস্তবধর্মী ও মানবিকগুণসম্পন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবং সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ গঠনে এই সমস্ত নাগরিকের এক ঘনিষ্ঠ ভূমিকা থাকে। অথচ আজকের দিনের যে-শিশুরা ভবিষ্যতের নাগরিক এবং ঐ সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ গড়ার মূল উৎস, তাদের অবস্থা আমাদের দেশে বড়ই করুণ—ঠিক যেন ডানা ঝাপটানো পাখির মতো, অসুখের তাপ বুকে নিয়েও স্বপ্নোত্থিত উচ্চাকাশের পাহাড়ে চোখ রেখে বড় হওয়ার অদম্য উৎসাহ। কিন্তু, আজকের শিশুর এই উৎসাহের জোয়ারে পরিণত বয়সে নেমে আসে ভাটার টান।

ঐ ভাটার উৎস সন্ধানের তাগিদেই আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রয়োজন। আসলে শৈশব, বাল্য বা কৈশোরকালে মানুষ তার ক্ষুধার সাথে সঙ্গতি রেখে ঠিক মতো পুষ্টিকর খাদ্য না পেলে অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার হয়। অল্পবয়সে শরীরের সর্বঅংশের স্বাভাবিক বৃদ্ধি তখন অনিয়মিত আকার ধারণ করে। এবং তার ফলস্বরূপ পরিণত বয়সে চরম শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি হয়। যদিও আমরা জানি, আমাদের এই অর্থনীতিক কাঠামোয় বেশীরভাগ অভিভাবকের ক্ষেত্রেই তার সন্তানের প্রতি উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান ক'রে দেওয়া খুবই দুষ্কর। তাদের সংসারের আর্থিক অসংগতির টানাপোড়নে ঐ সমস্ত শিশু বা অল্পবয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে নেমে আসে দুর্বিসহ অন্ধকার। সেইজন্যই বড় হওয়ার উৎসাহে মগ্ন শিশুরা একদিন পরিণত বয়সে ব্যর্থতার ঝাপটানিতে হোঁচট খেঁতে খেতে বিচ্ছিন্নতার প্রতিভূ হ'য়ে এই বেনো-জলে মিশ্রিত উন্নয়নশীল সভ্যতার মাঝে বিন্দুর মতো কোনক্রমে টিকে থাকে। আমূল অর্থনৈতিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে এই অসংলগ্ন পরিবেশকে কখনই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু, ঐ আমূল অর্থনৈতিক পরি-বর্তনের আশায় এইসমস্ত ছেলেমেয়েদের ফেলে রাখা বড়ই অমানবিক। তাই অতি স্বল্প সামর্থকে পুঁজি করেই তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য স্টুডেনথ হেলথ হোমের এই নব প্রচেষ্টা।

খাদ্যের সমস্যা কিছুটা সমাধানের জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্কুলগুলিতেই বিশেষ টিফিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিছু বিদেশী সংস্থা বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক বছর ধরে এ-ব্যাপারে সহযোগী হ'লেও, তা মূলতঃ খুব সামান্য কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, তাদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক পরিবেশের মান অনুযায়ী স্কুল-গুলি নির্বাচনের প্রশ্নটিও সঠিক হ'য়ে ওঠে না। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রসঙ্গটির উপর বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আপাততঃ সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলিতে সরকার থেকে পুষ্টিকর টিফিন বিতরণের ব্যবস্থাটি সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। যদিও ব্যাপকহারে সব স্কুলে এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। আমরা জানি, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার-গুলিকে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার আড়ালে কিভাবে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। তার উপর যদি আবার ঐ কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার রাজনৈতিক প্রশ্নে ভিন্নধর্মী হয়, তা হলে তো কথাই নেই। সুতরাং, এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সবরকম উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সরকার ইচ্ছা করলেই হাত দিতে পারেন না। বহু কষ্ট ও সততার বিনিময়ে এবং মাথা খাটিয়ে এইসমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পিছনে অর্থের সংস্থান করতে হয়। সেইজন্যই তা সময়-সাপেক্ষ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হওয়া (একাশি সাল থেকে কার্যকর হবে), বেকার

ভাতা, বৈধব্যভাতা, বৃদ্ধ কৃষকদের পেনসন প্রবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে উন্নত মননশীল চিন্তার পরিচয় রেখেছেন, তা একদিনের ঘটনা নয়, ধীরে ধীরে জনচেতনার তাগিদেই এগুলি ফলপ্রসূ হয়েছে। সুতরাং আশা করা যায় আগামী দিনে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত স্কুলেই বিনাখরচায় ছাত্রছাত্রীদের একবেলা পেটভরার মতো টিফিন ব্যবস্থাকে চালু ক'রে সরকার সাধারণ মানুষের গোপন ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে, প্রয়োজন হলে কোনো নিস্বার্থ-বাদী ও উৎসাহী বেসরকারী বা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগী হ'য়ে সরকার এই পরিকল্পনায় হাত দিতে পারেন।

শুধু প্রয়োজনীয় খাদ্য নয়, বাসস্থান এবং স্কুলের অবস্থান প্রভৃতি অনেক কারণেও ছাত্রছাত্রীরা রোগে আক্রান্ত হয়। কলকাতা শহরে বিশেষত, বস্তি অঞ্চলে এমন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে একেবারেই আলোবাতাস ঢোকে না, তাছাড়া স্কুলবাড়ীর অবস্থিতিও খুব খারাপ। পাশেই হয়তো কোনো খাটাল বা পচা নর্দমার বিষাক্ত প্রভাবে ছাত্রছাত্রীরা হামেশাই আক্রান্ত হ'য়ে থাকে। এক্ষেত্রে, সেইমুহূর্তে সমগ্র বস্তি উন্নয়ন সম্ভব না হ'লেও, ঐ স্কুলবাড়ীটিকে অন্তত একটি স্বাভাবিক আলো-বাতাসপূর্ণ পরিবেশে স্থানান্তরিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

সেদিনের এই পদযাত্রাকে কেন্দ্র করেই ছাত্রছাত্রীদের এই সমস্যাগুলি সমস্ত মানুষের দৃষ্টিতে আরও বেশী করে প্রতিভাত হয়। এবং সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা উদ্ঘাটনের জন্য আমরা তাই আজ নতুন করে কিছু ভাবারও অবকাশ পাই। যদিও এই পদযাত্রায় ছাত্রছাত্রীদের রোগ বিনাশের জন্য প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে জোরদার করার দাবিটিই ছিল প্রধান। কোনো চরম রোগ শরীরে বাসা বাঁধার পূর্বেই যাতে তাকে ধ্বংস করা যায় এবং তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেই সমস্ত চিন্তার ফসলগুলি বিভিন্ন পোস্টার বা প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে স্টুডেনথ হেলথ হোম বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেন। বাস্তবে দেখা যায়, বেশীর ভাগ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রথমজীবনের অবহেলিত অতি সামান্য রোগ পরবর্তীকালে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাছাড়া ঐ সামান্য রোগের ছোঁয়া সমগ্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবিত করে। তাই রোগের শুরুতেই কোনো প্রতিষেধক টিকা বা ইনজেকসন্, অথবা প্রতিরোধক ওষুধপত্র ব্যবহার একান্ত অবশ্যক। স্টুডেনথ হেলথ হোমের সাথে প্রতিটা স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সেইজন্যই এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা বিশেষ জরুরী। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক হেলথ হোম গঠন ক'রে তার মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে মাসে দু'বার, অন্তত শরীর চেকআপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতি মাসে ডাক্তারসহ কোনো ভ্রাম্যমান গাড়ি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থিত হলে, আরো ভালো হয়। এবং ঐ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ওষুধগুলো বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও স্টুডেনথ হেলথ হোমকে নিতে হবে। এ-ব্যাপারে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলির এবং অন্যান্য কলেজ বা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে স্টুডেনথ হেলথ হোমের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এগিয়ে এলে এই ব্যাপক সমস্যাকে সমাধান করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

এ-তো গেল শহর অঞ্চলের কথা। গ্রাম অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ঐ একই সমস্যা ছড়িয়ে আছে। বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রে দু'বেলা পেটভরানোর তাগিদে সারাদিনের পরিশ্রমের পর, অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের শরীর বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু ভেবে দেখাকে অহেতুক বিলাসিতা বলেই মনে ক'রে থাকেন। তার উপর আছে অজ্ঞতা বা শিক্ষার অভাব। গ্রামাঞ্চল বা কলকাতার বাইরে নিম্ন আয়ের শ্রমিক-অধ্যুষিত কলোনি-গুলির ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক প্রশ্নটি তাই আরো জটিল। সুতরাং, বর্তমানে শুধু শহরমুখী চিন্তার আবরণে আটকে না থেকে স্টুডেনথ হেলথ হোমের বিভিন্ন শাখাকে ঐ-সমস্ত গ্রাম ও কলোনি অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে, সরকারের কাছে বাজেট থেকে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উন্নয়নখাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি রাখা যেতে পারে। তাতেও পুরোপুরি আর্থিক ঘাটতি না মিটলে, স্টুডেনথ হেলথ হোম বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘরের দরজায় দরজায় গিয়ে সাহায্যের আবেদন রাখতে পারেন।

বিগত কয়েক বছরে দেখা গেছে যে, ছাত্রছাত্রীদের প্রায় বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র সরবরাহের জন্য স্টুডেনথ হেলথ হোম নামক সংগঠনটির অস্তিত্ব কলকাতার প্রায় বেশীরভাগ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই জানত না। শুধুমাত্র কয়েকটি নামজাদা স্কুল-কলেজের অহেতুক পৃষ্ঠপোষকতা ও উপযুক্ত প্রচারের অভাবেই অন্যান্য স্কুলগুলি এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেনি। সুতরাং, বর্তমানে গ্রাম-শহর-বস্তি-উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত অথবা, কোনো মানের প্রশ্ন ব্যতিরেকেই সমতার ভিত্তিতে সমস্ত স্কুল, স্টুডেনথ হেলথ হোমের এই সুযোগটুকুকে কাজে লাগাতে পারবে। কারণ, স্টুডেনথ হেলথ হোমের বক্তব্য এখন খুবই পরিষ্কারঃ ছাত্রছাত্রীদের নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন করা এবং খুব স্বল্প সুযোগকেও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষেরই এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। পূর্ণবয়স্ক যে-কোনো নাগরিকই আজকের বা আগামীদিনের এইসমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভিভাবকের স্থান নিয়ে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা উন্মোচনের খুব সামান্য এই রাস্তাটুকুকেও দেখিয়ে দিতে পারেন। সেদিন শহীদ মিনারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটাই পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, ছাত্রছাত্রীদের শরীর সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে শুধু সরকার বা কোনো সংগঠনের একার পক্ষে পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব নয়; সমগ্র মানুষের মিলিত প্রয়াসেই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অসুখ থেকে সুখের পথে নিয়ে যাওয়া সফল হতে পারে।

পরিশেষে, স্টুডেনথ হেলথ হোম তাদের নৈরাশ্যজনক ঝিমিয়ে যাওয়া ভাবটিকে কাটিয়ে উঠে আজ যে ভাবে নব-প্রচেষ্টায় ও নিবিড় উদ্যোগে রাস্তায় নেমে এসেছেন, তাকে আবার সাধুবাদ জানাই। আশাকরি, তারা বর্তমানের এই স্বল্প বাতাবরণকে মূলধন করেই ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলার সমগ্র ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে, সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সচেষ্ট হবেন। কলকাতার কর্মব্যস্ত মানুষের মনের কোণে বহু গোপনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নের শিকড়টিকে সুখ ও সৌন্দর্যের গান গেয়ে তারা যে-ভাবে প্রভাবিত করছেন, তাকে কখনই নষ্ট হ'তে দেবেন না—বরঞ্চ, ঐ শিকড়টিকে স্বপ্নের আরো গভীরে পৌঁছে দিতে পারবেন।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

শক্তির উৎস

গোটা বিশ্বজুড়ে এখন শক্তি সংকট চলছে। সংগে সংগে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক প্রয়াস চলেছে শক্তির উৎস সন্ধানে। জিজ্ঞাসু পাঠক মনের কাছে এই কর্মকাণ্ডের কিছু তথ্যভিত্তিক আলোচনার তাগিদেই আমাদের বর্তমান ভাবনা। লেখাটি কয়েকটি কিস্তিতে বেরোবে। এই সংখ্যার বিষয় সৌরশক্তি।

—সম্পাদকমণ্ডলী

সৌরশক্তি/সূর্য্য—প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল সূর্য্য। সূর্য্য থেকে বেরিয়ে আসা তাপশক্তি ও আলোকশক্তিকে মানুষ যেমন ভয়ও পেয়েছে তেমনি শ্রদ্ধাও জানিয়েছে। আবার সূর্য্য-নির্গত তাপশক্তি ও আলোকশক্তি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সৌর-শক্তিকে নিজের প্রয়োজনে মানুষ সভ্যতার সেই আদিযুগ থেকেই ব্যবহার করে আসছে।

ফসল শুকোনোর কাজে সৌরশক্তির ব্যবহার সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল যেদিন থেকে মানুষ ফসল উৎপাদন করতে শিখেছে। আজও এই কাজে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যভাবে সৌরশক্তির ব্যবহারের কথা বলতে প্রথমেই মনে আসে আর্কিমিডিসের কথা। খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দেই যিনি সূর্য্যালোক ব্যবহার করে আগুন জ্বালাতে পেরেছিলেন। তারপর সৌরশক্তিকে সমাজ-সভ্যতার কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত আছে। এ প্রসংগে সর্বাগ্রে মনে আসে ফ্রান্সের মিঃ মোচট্ (Mouchot)-এর কথা। যিনি সেই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সৌরশক্তি ব্যবহার করে একটি পাম্প চালান। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ফ্রাঙ্ক শ্যুমান (Frank Schuman) এক সাংঘাতিক কাজ করলেন। মিশরে তিনি এক চোঙাকৃতি প্রতিফলক (Cylindrical Reflector) বসালেন যার আয়তন ছিল ২৩০০০ বর্গফুট। এই বিশাল প্রতি-ফলকের উপর সূর্য্যালোক ফেলে তা দিয়ে জল গরম করে বাষ্প উৎপন্ন করে, সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালিয়ে তিনি ৫৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন এক পাম্প চালালেন। তার চেয়েও উন্নতভাবে সৌরশক্তির ব্যবহার করলেন ইতালীর জেনোয়ার অধিবাসী জি. ফ্র্যান্সিস্। সেটা ছিল ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ। ফ্র্যান্সিসের ব্যবস্থায় ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি যে পরি-মাণ তাপশক্তি উৎপাদন করতে পারে সেই পরিমাণ তাপ উৎপাদিত হয়েছিল।

সৌরশক্তি থেকে তাপ অথবা আলোক সরাসরি পাওয়া যায়। কিন্তু মানবসভ্যতার দ্রুত অগ্রগতিতে সর্বাধিক সাহায্য-কারী বিদ্যুৎশক্তি কিন্তু সরাসরি সূর্য্য থেকে পাওয়া যায় না। তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি অথবা জলপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য যেমন বিশেষ ধরণের কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয় সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য তেমনি কিছু বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয় ও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য সরাসরি সৌরশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার বন্ধ করা যায়। যেমন জলগরম করার ক্ষেত্রে। বৈদ্যুতিক হীটার-এর পরিবর্তে সৌরশক্তির ব্যবহারে জল গরম করা সম্ভব। শীত প্রধান দেশে বাড়ীঘর গরম রাখার জন্য সৌরশক্তির ব্যবহার চালু করা সম্ভব। কৃষিজ ও পশুজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারে সৌরশক্তি অনায়াসেই ব্যবহার করা যায় ও হচ্ছে। লবন উৎপাদনে সৌর-শক্তির ব্যবহার বহুকাল থেকেই চালু আছে। সৌরশক্তির ব্যবহারে মূল সমস্যাটা হল সূর্য্যালোক ও তাপকে একজায়গায় সংগৃহীত করা। ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ সৌরশক্তি প্রতিদিন এসে পৌঁছায় তা দিয়ে সতের হাজার কোটি মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত এই বিপুল পরিমাণ সৌরশক্তির সবটুকু সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। তবে তাকে বেশকিছুটা অন্ততঃ মানবসভ্যতার কাজে লাগানো যায়।

প্রতিফলক পদ্ধতি ও ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতিতে সৌর-শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়। প্রতিফলক পদ্ধতিতে প্রথমতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থিত প্রতিফলক-এর (আয়না অথবা পালিশ করা কোন ধাতব পাত) উপর সূর্য্যরশ্মি ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিফলকের উপর সূর্য্যকিরণ পড়লে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির তাপ অনেকগুণ বেড়ে যায়। এবার সেই তাপ কাজে লাগিয়ে জল গরম করা হয়। জল ফুটিয়ে বাষ্প করতে পারলে সেই বাষ্পকে অতিরিক্ত চাপে টারবাইন-এর উপর ফেলতে পারলে টারবাইন ঘোরান সম্ভব আর টারবাইন ঘুরলে তার সাথে জেনারেটর সমন্বিত থাকলে তাও ঘুরবে। আর জেনারেটর ঘুরলেই পাওয়া যাবে বহু কাঙ্ক্ষিত বিদ্যুৎশক্তি। এই হল সংক্ষেপে প্রতিফলক পদ্ধতিতে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কার্য-পদ্ধতি। সৌরশক্তির প্রতিফলকগুলির বৈজ্ঞানিক নাম তাপ সংগ্রাহক বা থার্মাল কালেক্টর। সূর্যরশ্মি প্রথমতঃ পড়ছে প্রতিফলকের উপর। প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির তাপকে কাজে লাগিয়ে পাশের ট্যাঙ্কের জল গরম করে বাষ্পে পরিণত করা হচ্ছে। সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালানো হবে। তারপর বাকী থাকে শুধুমাত্র জেনারেটর সংযুক্তিকরণের কাজ। এবার আসা যাক ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতিতে। ফোটোভোল্টাইক পদ্ধতি হল সংক্ষেপে এইরকম,—দুটো বিসদৃশ পদার্থ, পাশা-পাশি রাখলে তাদের মিলনমূলে যদি অতি-বেগুনী রশ্মি পড়ে তাহলে তড়িৎ-চালক বল সৃষ্টি হয়। সূর্য্য রশ্মিতে অতি-বেগুনী রশ্মি আছে। এখন এমন একটি ব্যবস্থা করা হল যার

মধ্যে দুটো বিসদৃশ পদার্থ পাশাপাশি সংযুক্ত আছে এবং যার মিলনস্থলে সূর্যরশ্মি পড়তে পারে। তাহলে আমরা তার থেকে সরাসরি তড়িৎ-চালক বল পাব। আর তড়িৎ-চালক বল হল বিদ্যুৎশক্তির আঠাল। সুতরাং এই ব্যবস্থায় সরাসরি বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়। আর এই ব্যবস্থাটির নাম হল ফোটো-ভোল্টাইক সেল। এর সুবিধা হল যে এর সমস্ত অংশগুলি স্থায়ী (কোনপ্রকার নড়াচড়া করে না), আলাদা কোন শক্তি ব্যবহার করে একে উজ্জীবিত করতে হয় না। সর্বোপরি রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব ভীষণ কম। ফোটোভোল্টাইক সেলের সাধারণ নাম হল 'সোলার সেল'। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সোলার সেল প্রথম চালু হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। সোলার সেলের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে সামুদ্রিক বয়া, লাইট হাউস, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মাইক্রোওয়েভ রিলে স্টেশন, বন প্রভৃতি কার্যে সোলার সেল ব্যবহৃত হচ্ছে।

সৌরশক্তির ব্যবহার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুরু হয়ে গেছে। জাপানে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে সৌরশক্তি পরিচালিত একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নিয়ে এখন গবেষণা চলছে। আশা করা যায় ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এটি চালু হবে। ফ্রান্সের ওডেলিওতে একটি সৌরশক্তি পরিচালিত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইতালীতে ৪০০ কিলো-ওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন একটি সৌরশক্তি পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরেকটি ১ মেগাওয়াট উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আমেরিকার নিও মেক্সিকোয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণা সবদেশেই চলছে।

ভারতবর্ষেও সৌরশক্তির ব্যবহার নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। তবে ভারতবর্ষের কোথাও এখনও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সৌরশক্তির ব্যবহার হয়নি।

পরিশেষে একথা নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে সৌরশক্তি আগামী দিনে ব্যাপকভাবে মানবসমাজের অনুকূলে কাজ করবে।

(ক্রমশঃ)

বহরমপুর ব্লক যুব উৎসবে কত্থক নৃত্যরত শিশুশিল্পী

ব্লক যুব উৎসবে বালিকাদের কবাডি প্রতিযোগিতা

দিলীপ ভট্টাচার্যের তুলিতে—

এসো মন্ত্র কর..

দু'টি মেলা তিনটি উৎসব

কলকাতা বইমেলা

কলকাতা ময়দানে গত ১৪ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের উদ্যোগে পঞ্চম বইমেলা অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল। ১৯৭৬ সালে প্রথম যখন এই বইমেলার উদ্যোগ পর্ব শুরু হয়, তখন থেকেই কলকাতার গ্রন্থ-প্রেমিক মানুষ এই মেলার প্রতি একটা অমোঘ আকর্ষণ অনুভব ক'রেছিলেন। বই না কেনা গেলেও, শুধুমাত্র যদিচ্ছ বই নাড়াচাড়ায়ও যে কিছুটা গ্রন্থ-পিপাসা মেটে সেই প্রথম টের পাওয়া যায়। এবং প্রধানত সেই সূত্রেই কলকাতা বইমেলা প্রথম আবির্ভাবেই বই-প্রেমিকদের হৃদয় জিতে নেয়। বইমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর উদ্যোক্তারা বলেছেন, আমাদের আরো আগ্রহ জাগানো এবং নিয়মিত বই কেনার অভ্যেস তৈরী করা। বস্তুত, আমাদের যখন সততই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তখন বই বিষয়ে তত সচেতন থাকা নিয়ত সম্ভব হয় না। আন্তরিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তেল-নুনের হিসেব ক'রে ফের বই কেনাটা সত্যিই একধরণের বিলাসিতা হ'য়ে পড়ে। তাই গ্রন্থ-বিপননে সেইসব মানুষের কাছে এই বইমেলা আক্ষরিক অর্থেই একটি উপহারের মত। সে কারণে এ-বছর বই মেলার অনিশ্চয়তার সংবাদে বই প্রেমিকেরা স্বভাবতই ঈষৎ বিষন্ন ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা যে ওই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হইনি, সেজন্য রাজ্যসরকার এবং মেলার উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন।

এ-বছরের মেলায় কলকাতার বিভিন্ন নামী দামী প্রকাশক ছাড়াও অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানও তাঁদের পসরা সাজিয়ে ব'সেছিলেন। ক'দিনের জন্য সারা কলেজস্ট্রীট পাড়াটাই যেন উঠে এসেছিল এই ময়দানে। শুধু আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানই নয়, কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও এই মেলার মর্যাদাবৃদ্ধিতে সাহায্য ক'রেছিল। বিভিন্ন প্রকাশকের বিভিন্ন ধরনের বইয়ের বিস্তৃত তালিকা থেকে প্রত্যেকেই নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী বই সংগ্রহ ক'রতে পেরেছেন। এছাড়া মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল এইসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেকগুলি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের নিজস্ব স্টল। একমাত্র এ'রাই দোকান-দারীর শ্বাসরুদ্ধতার মধ্যে অনেকটা খোলাবাতাস খেলাতে পেরেছিলেন। এ-বছর মেলায় মিনি বই প্রকাশনার একটি অদ্ভুত প্রবণতা দেখা গেছে। মিনি মহাভারত থেকে মধু-সূদন, সুকুমার রায় গরম কেকের মত বিকিয়েছে। আশ্চর্য এরই পাশাপাশি সাঁইবাবা প্রকাশনের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্টলেও মন্দ ভিড় ছিল না।

প্রতিবছরের মত এবারের বইমেলার বিক্রী বেড়েছে, লোক সমাগম বেড়েছে। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে, অংকের হিসেবে এই মেলার সাফল্য বিশেষ নয়ন-সুখকর হ'লেও, বইমেলার সাফল্য মেলার মাপকাঠি হিসেবে বেশ ভঙ্গুর। কেননা, এতে কিছু মুষ্টিমেয় বই-ব্যবসায়ীর আখেরে কিছু লাভ হ'য়ে থাকলেও, ৫/৬ লক্ষ বই-পোকা মানুষের কাছে এটা তেমন কোন আহামরি সার্থকতা আনে না। এই মেলার যতটুকু সাফল্য তা আসলে নির্ভরশীল মেলায় উপস্থিত অসংখ্য বই পাগলদের সক্রিয় অংশগ্রহণে। ব্যবসায়ীদের শুধু দোকান সাজিয়ে বসা ছাড়া আর তেমন কোন উজ্জ্বল উদ্যোগ নেই, যা গ্রন্থ পিপাসুদের অনিবার্যভাবে মেলাপ্রাঙ্গণে টেনে আনতে পারে। আসলে এ'রা মেলায় এসেছেন বইয়ের প্রতি অপার ভালোবাসায় এবং কৌতূহলের টানে। নইলে স্বল্প-পরিসর মন্ডপগুলিতে না আছে কোন শৈল্পিক পারিপাট্য, না আছে পুস্তক তালিকা সরবরাহ বা প্রচারে তেমন কোন চোখে পড়ার মত দৃষ্টান্ত, না আছে বই সাজানোর কোন সুশৃঙ্খল সুষমা, না আছে তেমন কোন দুর্লভ গ্রন্থের সমারোহ এবং সর্বোপরি নেই সুলভ মূল্যে বই সরবরাহের কোন আবশ্যিক উদ্যোগ।

এই বইমেলায় ক্রেতাদের কাছে যেটা সবচেয়ে ক্ষোভের ব্যাপার তাহ'ল, এখানকার ডিস্‌কাউন্টের কৃপণতা। কলেজ-স্ট্রীট পাড়ায় পাবলিসারের ঘর থেকে বই নিলে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে হেসে-খেলে ১৫ থেকে ২০ পার্সেন্ট এবং ইংরেজী বইয়ে ১২/১৩ পার্সেন্ট ছাড় পাওয়া যায়ই। তাহ'লে কি মানে হয় বহুদূর থেকে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে এখানে এসে ধুলো-খেয়ে, ভিড় ঠেলে এখান থেকে বই কেনার! অবশ্য বইমেলায় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রতিদিন ছিল তাহ'ল বই বাজার। ছাই ঘেঁটে সেখানে হঠাৎই পেয়ে যাওয়া যেত অনেক দুর্লভ বই। কিন্তু কোন দুরূহ কারণে এবার ক্রেতারা বই বাজারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'লেন, বোঝা গেল না।

বস্তুত, এই মেলার ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখন মনে হয়, এই মেলা থেকে পুস্তক ব্যবসায়ীদের ফায়দালোটা এবং কিছু শহুরে বাবুর ইন্টেলেক্‌চুয়াল সাজার অর্থহীন প্রয়াসকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া এই মেলার বোধহয় আর খুব-বেশি গুরুত্ব নেই।

শিল্পমেলা

শিল্পকলাকে জনমুখী করার জন্য, শিল্পী ও জনগণের মধ্যে মেলা বসানোর ঐকান্তিক বাসনায়, শিল্পকলা বিষয়ে জন-গণকে সচেতন করার প্রয়াসে এবছরও ১৭ই মার্চ থেকে ২৩শে

মার্চ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর উদ্যোগে কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্পমেলার আয়োজন হ'য়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রামকিংকর, গোপাল ঘোষ প্রমুখ খ্যাতিমান শিল্পীদের শিল্পসম্ভারের পাশাপাশি অনেক তরুণ শক্তিমান শিল্পীর চিত্রও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। এ ছাড়া ছিল কিছু প্রখ্যাত বিদেশী শিল্পীর ছবির প্রিন্ট। প্রদর্শনীর পাশাপাশি মুক্তমঞ্চে প্রতিদিন শিল্প সমালোচকদের বিদগ্ধ আলোচনা, সংগীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। এই শিল্পমেলা জনসাধারণের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। মেলার শেষদিনে প্রখ্যাত শিল্পী এবং ভাস্কর রামকিংকর বেইজকে সম্বর্ধিত করার কথা থাকলেও শিল্পীর অসুস্থতার কারণে তা শেষপর্যন্ত আর সম্ভব হয় নি। শিল্প যে সো-কেসে সাজিয়ে রাখার সামগ্রী নয়, তা যে জনসাধারণের জীবনযাপনের এক অপরিহার্য অঙ্গ, তা এই প্রদর্শনী আরেকবার প্রমাণ করলো।

চলচ্চিত্র উৎসব '৮০

বাংলা ছবির ৬০ বছর পূর্তি এবং 'পথের পাঁচালী'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার ৮টি প্রেক্ষাগৃহে ৭ দিন ব্যাপী এক চলচ্চিত্র উৎসব হ'য়ে গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তোলা ৬০টি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হ'য়েছে। একসাথে এতগুলো সৎ ছবি দেখার সুযোগ ক'রে দিয়ে রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন। কেননা, এই প্রথম একটি রাজ্য সরকার এরকম একটি প্রায়-সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করলেন, যা অবশ্যই একটি শুভ সংকেত রূপে বিবেচিত হ'তে পারে। বিকিনি-শাসিত হিন্দী ফিল্ম এবং ফরমুলা বন্দী বাংলা ছবির পাশাপাশি এই চলচ্চিত্র উৎসব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রূপে আমাদের স্মৃতিতে রয়ে যাবে বহুকাল।

বাংলা ছবির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৩২ সালে তোলা জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে শুরু করে ১৯৮০-এর বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' পর্যন্ত প্রায় ৪০টি নির্বাচিত বাংলা ছবি ছিল এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। বাংলাছবির শৈশব অবস্থা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যা একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির ছবি স্পর্শ করে। ছবিগুলির নির্বাচনেও ছিল একরূপ দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা—শুধু শৈল্পিক উৎকর্ষতার ভিত্তিতে এগুলি নির্বাচিত হয়নি, বরং একটি ব্যাপক সাধারণ মানের ছবি প্রদর্শিত হ'য়েছে, যা থেকে বাংলাছবির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমরা খুব সহজেই পেয়ে যায়। ৩০, ৪০ দশকের ছবিগুলি প্রকৃতপক্ষেই আমাদের প্রজন্মের কাছে একটি উজ্জ্বল উদ্ধার। তবে এই ব্যাপারে একটু অভিযোগ থেকেই যায়—বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনেকগুলি চিত্ররূপ উৎসবে প্রদর্শিত হ'লেও শরৎচন্দ্রের কোন ছবি উৎসবে দেখা গেল না। অথচ একসময়, এবং হয়তো আজো, শরৎচন্দ্রের গল্পের জোরেই অনেক ছবি বিস্ফোরক বক্স-অফিস পেয়েছে। ইতিহাসের খাতিরে শরৎচন্দ্রকে উপেক্ষা করার কোন যুক্তি নেই।

'পথের পাঁচালী'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সত্যজিৎ রায়ের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ ছবি উৎসবে দেখানো হয়েছিল। 'পথের পাঁচালী' যতবার দেখা যায় ততো যেন আয়ু বাড়ে, পুণ্যি হয়। সত্যজিতের সামগ্রিক চিত্রকর্ম থেকে গুটিকয়েক ছবি নির্বাচন করা খুব দুরূহ ব্যাপার হ'লেও তাঁর 'দেবী', 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ', 'জলসাঘর', 'মহানগর' উৎসবে থাকা আবশ্যক ছিল। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বা 'প্রতিদ্বন্দ্বী'কে উৎসব থেকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যেত। কেননা, এগুলি সাম্প্রতিককালে বহুবার প্রদর্শিত হ'য়েছে। তুলনায় এই প্রজন্মের দর্শকেরা তাঁর প্রথম দিকের ছবি দেখার সুযোগ খুব কমই পেয়েছেন।

ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক', 'সুবর্ণরেখা', 'কোমল গান্ধার' ইত্যাদি ছবিগুলো এই উৎসবের মর্যাদা বৃদ্ধিতে দারুণ সহায়ক হ'য়েছিল। তাছাড়া পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র' বারীণ সাহার 'তের নদীর পারে', নারায়ণ চক্রবর্তীর 'দিবারাত্রির কাব্য', সৈকত ভট্টাচার্যের 'একদিন সূর্য', শংকর ভট্টাচার্যের 'দৌড়', মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন', এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' ছিল উৎসবের সম্পদ বিশেষ। উৎপল দত্তের 'ঝড়' একটি সেলুলয়েডের যাত্রা হিসেবে দেখতে মন্দ লাগে না। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' সম্পর্কে দর্শকদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় না। দারিদ্র্যের এই রকম ডকুমেন্টারী আমরা কলকাতা '৭১-এও দেখেছি। অবশ্য এই ছবির অভিনায়িক দৃঢ়তা একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কেননা, এই ছবির কোন শিল্পীই অভিনয় করেন না। শংকর ভট্টাচার্যের 'দৌড়' রাজনৈতিক ভ্রষ্টতার একটি সাহসিক দলিল হিসেবে স্মরণীয়।

বাংলাছবি ছাড়া ২০টি মারাঠি, মালয়ালম, কানাড়ী, তামিল, উর্দু, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া ছবিগুলিও দর্শক আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। দক্ষিণ ভারতীয় ছবিগুলি আমাদের সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল কেন্দ্রিক অহংকারের ওপর একটি সজোরে চপেটাঘাত করে যায়। ভাষার ব্যবধান ছাড়িয়ে (সব ছবিতে সাব-টাইটেল ছিলনা) ছবিগুলি অনায়াসে আমাদের অধিকার ক'রে নেয়। বিশেষত, 'ওকা উরি কথা', 'কোপিয়েওম', 'অশ্বত্থমা', 'আমপু', 'চিতেগু চিন্তি', 'গহণ', 'সর্বপ্রাথা মা ভূমি', 'ঘাসিরাম কোতোয়াল', ইত্যাদি ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক-একটি অক্ষয় মাইলস্টোন হ'য়ে থেকে যাবে। এরমধ্যে 'ঘটশ্রাদ্ধ' ছবিটিকে উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে চিহ্নিত করা যায়। গ্রামীণ জাতপাতের সমস্যা ছবিটির আলোচ্য বিষয়। ছবির মূল দু'টি চরিত্র যমুনা এবং মানীর ভূমিকানেতৃত্বয় অভিনয় নৈপুণ্যে বুকের মধ্যে তীব্র মোচড় দিয়ে যায়। এই যমুনা নামে যুবতীটি এবং মানী নামে চালকটিকে দেখে, কার্যকারণ হীন ভাবে হ'লেও 'পথের পাঁচালী'র অপু, দুর্গাকে মনে পড়ে যায়।

ওড়িয়া ছবি 'বাতিঘর' (কাহিনী বুদ্ধদেব গুহ) স্বচ্ছ কাহিনী চিত্র হিসেবে দাগ কাটে।

হিন্দীছবির জগতেও যে একটা নতুন বাতাস এসেছে তা স্পষ্ট হয় সৈয়দ মির্জার দু'টি ছবি 'অরবিন্দ দেশাই কি জীবন দর্শন' এবং 'আলবার্ট পিন্টো ক গোস্যা কিউ আয়া বিমল দত্তের 'কস্তুরী', শ্যাম বেনেগালের 'কলযুগ', বিপ্লব রায়চৌধুরীর 'শোধ' ইত্যাদি ছবিগুলি দেখে। 'অ্যালবার্ট

পিল্টো'র শেষদৃশ্যে পর্দায় মশালের, রক্ত পতাকার লাল আগুন লাগা একটি স্মরণীয় শিল্প সৃষ্টি। 'শোধ' ছবিটি এবছরের শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের জন্য পুরস্কৃত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। ছবিটির ফটোগ্রাফিক অসাধারণতা এবং বক্তব্যের দৃঢ়তা আমাদের খুব অনিবার্যভাবে ছুঁয়ে যায়। বেনেগালের 'কন্দুরা' আমাদের শোচনীয়ভাবে হতাশ করে। একটি প্রায় মিথোলজিকাল আখ্যান অবলম্বনে সত্তর দশকে ছবিটি তোলার অর্থ ঠিকঠিক অনুভব করা গেল না।

উৎসবে কাহিনী চিত্রগুলি ছাড়াও রবিশংকর, ইনার আই, এ হিস্ট্রি অফ ফিল্ম মেকিং, এবং পাকা ফসলের কড়চা ইত্যাদি তথ্যচিত্রগুলিও যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। বিশেষত শেষ ছবিটা একটি হাতিয়ার বিশেষ। জোতদার-জমিদারের শঠতা এবং ভূমিহীন কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এই ছবির প্রতিপাদ্য ব্যাপার। এর কয়েকটি দৃশ্যে যথাক্রমে জোতদারের ধান লুঠ করা এবং পাকা ধানের ক্ষেতে আগুন লাগানো এক নয়া দাঁড়ি পাল্লার মধ্যে অসহায়, পঙ্গু যুবক ডোমনের ক্লান্ত, উদ্দীপ্ত চোখ স্মরণীয় শিল্পকাজ। ছবিটি এই মুহূর্তে কলকাতার ঠান্ডা প্রেক্ষাগৃহ থেকে মুক্ত করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া একটি আবশ্যিক কর্তব্য।

এই চলচ্চিত্র উৎসব চিত্র নির্বাচনে একটি বিশেষ চরিত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ধনতান্ত্রিক পণ্যচিত্র এবং পর্ণোচিত্র ছাড়াও যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে সৎ চলচ্চিত্র তৈরী সম্ভব এবং তা যে যথেষ্ট দর্শক আনুকূল্যও পেতে পারে এই উৎসব তা আরেকবার প্রমাণ করে দেয়। বাঙ্গালোর চলচ্চিত্র উৎসবে যেখানে দর্শক যৌনাত্মক চিত্র প্রদর্শনের দাবিতে প্রেক্ষাগৃহে ভাঙচুর করে, সেখানে কলকাতা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের একটি ঐতিহাসিক দলিল হ'য়ে রইল। এই উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু যে আর্ট ফিল্ম-থিয়েটারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন, আমরা আশা করি, তা শুধুমাত্র একটি মিনার হ'য়েই থাকবে না, সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে তা হবে একটি বিস্ফোরক প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

গণনাট্য উৎসব

বাংলা শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণনাট্য সংঘের একটি বিশেষ অবদানের কথা সর্বজনজ্ঞাত। চল্লিশের দশকের সেই ব্যাপক সংস্কৃতি আন্দোলনকে ইতিহাসের পাতা থেকে গত ১৯ এবং ২০শে এপ্রিল দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। গণনাট্য উৎসব প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে স্টুডেন্ট হেলথ্ হোমের সাহায্যার্থে উৎসবটি সংগঠিত হয়।

কবি ইকবাল রচিত 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' গানটি গেয়ে উৎসবের উদ্বোধন হয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উদ্বোধনী ভাষণে সামাজিক অগ্রগতিতে শিল্প-সংস্কৃতির বলিষ্ঠ ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর শম্ভু ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় 'কল অফ দ্য ড্রামস' প্রতীক নৃত্যানুষ্ঠান শ্রোতাদের অনন্দিত করে।

অনুষ্ঠানের মুখ্য অকর্ষণ ছিল সেকাল এবং একালের গণ-সংগীত। তবে শ্রোতারা সমকাল অপেক্ষা ৩০/৪০ দশকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। সলিল চৌধুরীর গান এখনো শ্রোতাদের সঞ্চারিত করে, এর প্রমাণ আরেকবার পাওয়া গেল। এবং একক সংগীতে সুচিত্রা মিত্রের তুলনা তিনি নিজেই।

এছাড়া নবান্ন, নীলদর্পণ এবং কিমলিসের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় তৎকালীন নাট্য আবহকে তুলে ধরতে সক্ষম হ'য়েছিল। তৎকালীন প্রতিষ্ঠান-বিরোধী শিল্পীরা আজ যে নিজেরাই এক একটি প্রতিষ্ঠান হ'য়ে গেছেন, সেজন্য দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক।

পঁচিশে বৈশাখ

প্রতিবছরের মত এবারের ২৫শে বৈশাখের পবিত্র সকালে বহু রবীন্দ্র-মনসক মানুষ সমবেত হ'য়েছিলেন রবীন্দ্রসদন এবং জোড়াসাঁকোর মুক্ত রবীন্দ্রানুষ্ঠানে। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও ২৫শে বৈশাখের আরেকটি তাৎপর্য প্রায় দুই দশক ধ'রে বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহ্যের সাথে ভীষণ ভাবে ওতপ্রোত হ'য়ে গেছে। এই দিনে অসংখ্য ছোট-ছোট পত্রিকার প্রকাশনা যেন এই কথায় প্রমাণ করে যে, ২৫শে বৈশাখ শুধু রবীন্দ্রনাথেরই জন্মদিন নয়, তা আসলে বাংলা সাহিত্যেরই জন্মদিন। তাই নিঃসন্দেহে, পেটমোটা বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির পাশাপাশি দুর্বিনীত চ্যালেঞ্জের মত, এইসব লিটল্ ম্যাগাজিনের প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা, এ-কথা কে-না জানে যে, এইসব পত্র-পত্রিকাগুলিতেই আছে সেই অমোঘ শক্তি যার নাম যুবন্, এবং যা সাহিত্যের ন্যুব্জ মেরুদণ্ডকে, ক্ষয়া-খর্বুটে প্রবাহকে, টানটান রাখতে সাহায্য করে। সে কারণে পক্ষকাল ব্যাপী ফুলে, গানে, পদ্যে, পুরোহিতে রবীন্দ্র পুজোর তুলনায়; সমবেত সংস্কৃতি-মনসক মানুষের ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে, বৈশাখের প্রখর নিদাঘ উপেক্ষা ক'রে কবির প্রতি, বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই হ'ল শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

—উপল উপাধ্যায়

মস্কো অলিম্পিক : সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া

অধ্যাপক অশোক দাশগুপ্ত

বিশ্বের সকল দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার এবং তা আরোও দৃঢ় ও সংহত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৮৯৬ সালে প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অলিম্পিকের মহান আদর্শকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ২১টি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বিশ্বের সকল দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় অলিম্পিকের ২২তম অনুষ্ঠান আগামী ১৯শে জুলাই থেকে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে হতে চলেছে। অলিম্পিকের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আজ থেকে ছ' বছর আগে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে ১৯৮০ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা মস্কোতে অনুষ্ঠিত হবে তখন কমিটিকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ার সরকারগুলি এবং তাদেরই পাশাপাশি খেলাধুলাকে যারা নিছক পণ্যে পরিণত করেছে সেই সব ব্যবসায়ী, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্তকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তারা প্রথম থেকেই সুযোগ খুঁজছিল কিভাবে মস্কোর অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে বানচাল করা যায়। কথায় আছে দুর্জনের সুযোগের অভাব হয় না। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনাকে তারা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করল। সম্প্রতি আফগানিস্থান সরকারের আমন্ত্রণে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসা এবং আফগানিস্থানে সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতির ঘটনাকে সুযোগ হিসাবে এরা গ্রহণ করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার মস্কো অলিম্পিক বর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের কাছে প্রচারে নেমে গেছেন। বিভিন্ন দেশের সরকারের উপরও তাঁরা এই প্রশ্ন নিয়ে চাপ দেবার চেষ্টা করছেন। আজ যখন দুনিয়ার সর্বত্র ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীরা অধীর আগ্রহে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তখনই সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার এই নেতারা খেলাধুলার ক্ষেত্রে রাজনীতিকে টেনে আনছেন, মরীয়া হয়ে মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে নেমে গেছেন। মস্কো অলিম্পিক বানচাল করার জন্য কেন এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা—এই প্রশ্ন আজ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীরা নিশ্চয়ই করতে পারেন।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতা : সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থান

বিগত কয়েকটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ফলাফল যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে প্রথমেই যেটা বিশেষভাবে চোখে পড়বে তা হল সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রীড়াবিদদের বিস্ময়কর সাফল্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের মত খেলাধুলার জগতেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিস্ময়কর অগ্রগতি ও সাফল্যকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকেরা খুব স্বাভাবিক কারণেই বরদাস্ত করতে পারে না। পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকেরা দুনিয়ার সাধারণ মানুষদের ধাপ্পা দেবার জন্য প্রচার করে যে খেলাধুলায় রাজনীতির কোনও স্থান নেই, খেলাধুলার জন্যই খেলাধুলা। কিন্তু এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অন্যান্য সকল জিনিষের মত খেলাধুলাকেও নিছক মুনাফা সৃষ্টিকারী একটি পণ্য হিসাবেই দেখা হয়। এই ব্যবস্থায় খেলাধুলা শাসকশ্রেণী ও শোষকশ্রেণীর রাজনীতির উর্ধ্বে কিছুতেই থাকতে পারে না। কিন্তু অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি যে সমস্ত দেশ পুঁজিবাদের শৃংখল ভেঙে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে সেই সব দেশে অন্যান্য সকল জিনিষের মত খেলাধুলাও পরিচালিত হয় একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবকিছু করা হয় সমাজের সকলের প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্য নিয়ে। ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক মালিকানায় চালানো হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেশের সকল সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য গঠনের সংগে সংগে শৃংখলা সৃষ্টির জন্য শিশু থেকে শুরু করে সকলের জন্য খেলাধুলার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্যান্য সকল বিষয়ের মত খেলাধুলারও নিয়ন্ত্রণ হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও আদর্শ। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে খেলাধুলাকে পণ্য হিসাবে দেখার কোনও প্রশ্নই আসে না। এখানে প্রতিটি মানুষের জীবনে অন্যান্য কাজের মত খেলাধুলাও অবশ্য করণীয় একটি কাজ। এই ধরণের ব্যবস্থার মধ্যে খেলাধুলার উন্নতি ঘটতে বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দুনিয়ার সকল ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুনিয়ায় যেমন

বিশেষ স্থান দখল করেছে তেমনই খেলাধুলার জগতেও নিজেদের শক্তির জোরেই বিশিষ্ট স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার কর্ণধারেরা অলিম্পিক আসর থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে দূরে রাখার চেষ্টা প্রথম থেকেই করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসর থেকে দূরে সরিয়ে রাখা আর সম্ভব হল না। ১৯৫২ সালে অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার সময় থেকেই সোভিয়েত রাশিয়া এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি স্বাস্থ্যচর্চার আশ্চর্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যুবশক্তি আজ পূর্ণ মর্যাদায় অলিম্পিক ও খেলাধুলার অন্যান্য আসরে অংশগ্রহণ করছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রীড়াবিদেরা একের পর এক বিস্ময়কর রেকর্ড স্থাপন করার সংগে সংগে দুনিয়ার সকলের সামনে আদর্শবোধের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তও উপস্থিত করতে সক্ষম হচ্ছেন। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন থেকে শুরু করে ছোট দেশ কিউবা, উত্তর কোরিয়া—সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্রীড়াবিদেরা খেলাধুলার আসরেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারছেন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকেরা ও খেলাধুলার ব্যবসায়ীরা এ জিনিষ কি করে সহ্য করবে? খুব স্বাভাবিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতি এদের ক্ষিপ্ত করছে।

অলিম্পিক অনুষ্ঠান: সোভিয়েত সরকার ও জনগণ কি দৃষ্টিতে দেখছেন?

সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিকে প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৫২ সালে। অলিম্পিক আসরে প্রথম অংশগ্রহণ করার তিন দশক পরে সোভিয়েত রাশিয়া অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব পেয়েছে। ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর থেকেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিয়েছে। অলিম্পিক কোনও মামুলী অনুষ্ঠান নয়। বিশ্ব মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শকে সামনে রেখে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ামোদী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মস্কোতে সমবেত হবেন। এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা পরস্পর ভাব বিনিময়, সংস্কৃতির বিনিময় করার সুযোগ পাবেন। এই কারণেই সোভিয়েত সরকার ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত জনগণ অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য যেন মেতে উঠেছেন। বিগত সাড়ে তিন বছর প্রস্তুতিপর্বে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিকরা অলিম্পিকের প্রস্তুতির কাজ দেখতে মস্কো গেছেন। তারা সকলেই সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের উদ্যোগ দেখে অভিভূত হয়েছেন। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অলিম্পিকের প্রস্তুতির কাজ দেখার জন্য কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীব সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় ফিরে এসে লিখেছেন, "The Moscow Olympic Games are scheduled to start in the third week of July. But go to any city of any republic of the USSR to-day, and it will seem to you that the games are starting tomorrow. The Modern Olympic Games had started way back 1896, but this is the first time in 84 years that a Socialist nation is going to hold it—and the arrangements, the Soviet people have made for the Games have over-shadowed all the previous efforts." (Sports World, ১৯৮০ সালের ১৯শে মার্চের সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত)

মন্ট্রিল বা মিউনিখ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যত খরচ হয়েছিল তার মধ্যে একটি বড় অংশ হয়েছে নতুন করে স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল ইত্যাদি তৈরী করার জন্য। কিন্তু দেশের অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধুলার উন্নতি ও প্রসারের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল ইত্যাদি আগে থেকেই তৈরী ছিল বলে ২২তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য সেই সব আর নতুন করে তৈরী করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে মন্ট্রিল ও মিউনিখ অলিম্পিক অনুষ্ঠান করার জন্য যা খরচ হয়েছিল তার চেয়ে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ কম খরচ হবে মস্কো অলিম্পিক অনুষ্ঠান করতে। অলিম্পিকের অধিকাংশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মস্কোতে। লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ ও মিনস্ক এই তিনটি শহরে ফুটবলের তিনটি গ্রুপের কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ফুটবলের সেমিফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলাগুলি হবে মস্কোতে। পাল তোলা নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হবে বাল্টিক সাগর তীরবর্তী শহর তাল্লিনে। এতগুলি জায়গা জুড়ে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় প্রতিটি দেশের ক্রীড়াবিদ, প্রতিনিধিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, কোনও বিদেশী পর্যটকের যাতে এতটুকু সমস্যায় পড়তে না হয় তার জন্য খুঁটিনাটি সব দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। অলিম্পিকের মত একটি বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সফল করতে হলে প্রচুর কর্মী প্রয়োজন। দেড় লক্ষ কর্মীর নাম ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত করে তাদের সকলকেই ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকের কাজ অনুযায়ী। অলিম্পিকের সময় ৪৫টি ভাষায় দোভাষী হিসাবে যারা কাজ করবেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ। ভাষাগত পার্থক্য যাতে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের সামান্য অসুবিধা সৃষ্টি না করতে পারে তার জন্য বিমানসেবিকা, বিমানবহরের কর্মী মিলিশিয়া, পর্যটন বিভাগ, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, ট্রাঙ্ক টেলিফোন ও টেলেক্স বিভাগের কর্মী, গাড়ীর চালক, হোটেলের কর্মী, দোকানের কর্মী এবং খেলাধুলার সংগে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে আছেন তাদের মধ্যে বিদেশী ভাষা শেখার ধুম পড়ে গেছে। বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কেবলমাত্র মস্কোতেই প্রায় ৬০০০টি বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৬ তলা বিশিষ্ট ১৮টি নতুন বাড়ী নিয়ে গড়ে উঠেছে অলিম্পিক ভিলেজ। মস্কোতে গড়ে ওঠা এই ভিলেজের মধ্যে

তৈরী করা হয়েছে একটি হাসপাতাল। নতুন করে তৈরী এই বাড়ীগুলি অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে এখানকার নাগরিকদের আবাসন হিসাবে ব্যবহৃত হবে। বিদেশী সাংবাদিক, রেডিও ও টেলিভিসনের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অলিম্পিকে যে প্রেসবক্সের ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে একসংগে ৭২০০ জন ক্রীড়া সাংবাদিক বসতে পারবেন। ২২০০টির বেশী টেবিলে টেলিভিসন ও টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকবে। অলিম্পিক ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিদেশী-দের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এক বিশাল প্রমোদ কর্মসূচীও প্রস্তুত করা হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মত বহুজাতিক দেশের জনগণের শিল্পকলা ও সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন দিকের সংগে বিদেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের পরিচিত করানোর জন্য ১৪৪টি ব্যালে ও অপেরা অনুষ্ঠান, ৪৫০টির বেশী নাটক এবং ৩৫০টি সার্কাসের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার ব্যাপক জনগণ যে কোনও রকমেই হোক না কেন অলিম্পিকের অনুষ্ঠানে নিজেদের অংশীদার করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। গত বছর মস্কোতে একটি সাক্ষাৎকারে এক সোভিয়েত সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ইন্টার-ন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং ইটালীর বিশিষ্ট সাংবাদিক এনরিকো ক্রেসপি বলেন "I have very pleasant impreassious. Prepara-toins are going full stream ahead. People are working on Olympic projects with enthusiasm and competence. Apart from Moscow, I visited Tallin, uslere use all knows, the Olympic regatta will be held and I would say I was equally awed by Olympic projects there. In my view, you have advanced much further in your Pre-Olympic preparations. To this day them the organisers of the two previous games, in Munich and Montreal, in just as much thime.

But my dearest impression is of the Soviet people who are, at this early stage showing great interest and enthusiasm, the two quali-ties that make for the success of the 1980 Olympics, which are destined to play a Key role in strengthening sports, culture and friendly ties among nations." (অলিম্পিয়ান-৮০ অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত Olympic Panorama-র নবম সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত)

সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস, ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করা যাবে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নততর পরিবেশের মধ্যে অলিম্পিকের মত বিরাট অনুষ্ঠান হতে পারে। অলিম্পিক আসরে আগত সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি দেশের সরকার কিভাবে দেশের সমগ্র জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এই ধরণের এক বিরাট অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশীদার করতে পারে। অলিম্পিকের আসর যে যুদ্ধবিরোধী শান্তির মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে তাও প্রমাণিত হবে মস্কো অলিম্পিকে। বিশ্ব শান্তির পয়লা নম্বরের শত্রু সাম্রাজ্যবাদীরা এ জিনিষ কিভাবে বরদাস্ত করবে? সাম্রাজ্যবাদীরা মস্কো অলিম্পিক বন্ধ করার জন্য অপচেষ্টা চালাবে—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রোশের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ: মস্কো অলিম্পিক বর্জন প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির গঠনতন্ত্রের ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, "জাতীয় অলিম্পিক কমিটিগুলি রাজ-নৈতিক বা ব্যবসায়ীভিত্তিক কোনও ঘটনার সংগে নিজেদের যুক্ত করতে পারবে না।" এই ধারাটিতে সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন সময়ে সুবিধামত ব্যবহার করেছে। ১৯৩৬ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফ্যাসিস্ট হিটলারের অধীনে নাৎসী জার্মানীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই অনুষ্ঠানকে বর্জন করার কথা চিন্তা করেনি। বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে ও বর্ণবিদ্বেষী-দের অকথ্য নির্যাতনের প্রতিবাদে বেশ কয়েকটি আফ্রিকার রাষ্ট্র যখন মন্ট্রিল অলিম্পিক বর্জনের জন্য আহ্বান করেছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাড়া দেয়নি। আমেরিকার নিগ্রোদের নির্যাতিত অবস্থার প্রতি বিশ্বের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ২০০ জন নিগ্রো ক্রীড়াবিদ যখন মেক্সিকো অলিম্পিক বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক ও কর্ণধারেরা বলেছিলেন যে অলিম্পিকে রাজনীতির কোনও স্থান নেই। কিন্তু আজ যখন মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তখন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র সেই মতে স্থির থাকতে পারছে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের একের পর এক পরা-জয় এবং পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সর্ববিষয়ে বিস্ময়কর অগ্রগতির পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসক ও কর্ণধারেরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশকে চেপে রাখতে পারছেন না। তাদের ক্ষিপ্ত মনো-ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানাভাবে, নানা দিক দিয়ে। এইরকম এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মস্কো অলিম্পিক বর্জন প্রতি-যোগিতার মধ্য দিয়ে।

মস্কো অলিম্পিক বর্জনের আহ্বান জানিয়ে আসরে নেমেছেন স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার। ক্রীড়াবিদদের কাছে এই আহ্বান জানানোর সময় কার্টার জানতেন যে একাজ খুব সহজ নয়। তাই তিনি নানা আশ্বাসও দিয়েছেন। মস্কো থেকে সরিয়ে অন্য কোনও দেশে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে এবং এই স্থান পরিবর্তন যদি আদৌ সম্ভব না হয় তাহলে একটি বিকল্প আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে—সকল দেশের বিশেষ করে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ক্রীড়াবিদদের কাছে এইকথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। মস্কো অলিম্পিক বর্জনের পক্ষে মত সৃষ্টির জন্য কার্টার ব্যক্তিগত দূত হিসাবে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলিকে আফ্রিকার পাঁচটি দেশে পাঠিয়েছিলেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টারের সংগে তাল মিলিয়ে আসরে প্রথমেই নেমে পড়েছিলেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার। তাঁরাও নিজ নিজ দেশের ক্রীড়াবিদদের মস্কো অলিম্পিকে অংশগ্রহণ না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু মস্কো অলিম্পিক বর্জনের জন্য এই সব নেতার আহবানে ক্রীড়াবিদরা সাড়া দিচ্ছেন কি? এই আহবান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে?

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ও বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদরা কি ভাবছেন?

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি পরিষ্কার ঘোষণা করেছে যে, ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পূর্ব সিদ্ধান্ত মত এই অনুষ্ঠান মস্কোতেই হবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি লর্ড কিল্লানিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে আইনগত ও নীতিগত দিক থেকে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করা যায় না। মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার যে সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ১৯৭৪ সালে গ্রহণ করেছিল সেই সিদ্ধান্তকে স্বাভাবিকভাবেই লঙ্ঘন করা যায় না। এছাড়াও লর্ড কিল্লানিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খেলাধূলোকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। মস্কো অলিম্পিক বয়কট করার আহবানে সাড়া দেওয়া ত' দূরের কথা বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীরা এই ধরণের হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ জানিয়েছেন। একজন ক্রীড়াবিদের সাধারণতঃ জীবনে একবারই অলিম্পিকের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আসে। বেশ কয়েক বছর কঠোর অনুশীলনের পর যদি কোনও ক্রীড়াবিদ শোনেন যে তার দেশ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করবে না তাহলে তার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার হতে পারে না। মার্কিন ক্রীড়াবিদ যর জিওর্দানি ক্রোভের সঙ্গে বলেছেন, "১৯৮০ সালে অলিম্পিককে সামনে রেখে আমি দশ বছর ধরে অনুশীলন করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি ক্রীড়াবিদদের মত-মত চাওয়া হয় তাহলে সকলেই রাষ্ট্রপতি কার্টারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মত দেবেন।" ১৯৩৬ সালে অলিম্পিকে চারটি স্বর্ণপদকজয়ী অ্যাথেলেটিকসের কিংবদন্তী পুরুষ প্রয়াত জেসি ওয়েন্স রাষ্ট্রপতি কার্টারের অলিম্পিক বয়কটের আহবানকে গর্হিত কাজ বলে মন্তব্য করেছেন। গত বছর যে ক্রীড়াবিদ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলেটের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বৃটেনের সেই ক্রীড়াবিদ সেবাস্তিয়ান কো বলেছেন, "যদি টিকিটের মূল্য আমাকেই দিতে হয় তাও আমি মস্কোতে যাবই।"

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচারের কঠোর মনোভাবের জবাবে বৃটেনের প্রতিযোগী ক্রীড়াবিদরা বলেছেন যে সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত কোনও কঠোর মনোভাবই তাদের মস্কো অলিম্পিকে যোগদান বন্ধ করতে পারবে না।

আফ্রিকার পাঁচটি দেশে কার্টারের বিশেষ দূত হিসাবে সফর করার পর মহম্মদ আলির অভিজ্ঞতা কার্টারের অনুকূলে যায় নি। মহম্মদ আলি বলেছেন, "মস্কো অলিম্পিক বর্জনের প্রচারে আমাকে আফ্রিকায় পাঠিয়ে রাষ্ট্রপতি কার্টার অন্যায় করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষী সরকার সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবে আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশই ওয়াশিংটন সরকারের বিরোধী। যদি আমি আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র ইতিহাস আগে জানতাম তাহলে আমি রাষ্ট্রপতির অনুরোধে আফ্রিকার পাঁচটি দেশ সফরে আসতাম না।"

সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার তাবড় নেতারা মস্কো অলিম্পিক বর্জনের যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন সেই প্রচেষ্টা নৈতিক দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শেষপর্যন্ত যদি কয়েকটি দেশ মস্কো অলিম্পিক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সেই সিদ্ধান্তকে কোনও মতেই সেই সব দেশের অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীর সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না। অলিম্পিককে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্য খেলায় মেতেছেন সেই খেলায় তারা পরাস্ত হয়েছেন। এতে দুনিয়ার অগণিত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদী নিশ্চয়ই স্বস্তিবোধ করবেন। দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীর শুভেচ্ছা নিয়েই মস্কোতে ২২তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে—এই বিরাট আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েত সরকার দেশের অগণিত সুশৃংখল জনগণের সহযোগিতা নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন।

কালনা ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে মেয়েদের ভলিবল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

নাগপাশ। সাধন চট্টোপাধ্যায়
ক্রান্তিক প্রকাশনী। চার টাকা

"নাগপাশ" চারটি গল্পের সংকলন। প্রথম গল্প 'নাগপাশ,' দ্বিতীয় 'খোলস', তৃতীয় 'তিনপুরুষ' এবং চতুর্থ 'জ্বালা।' প্রথম গল্প 'নাগপাশ' চব্বিশ পরগণার এক ছোট্ট গ্রামের যাত্রা উৎসব নিয়ে শুরু হয়েছে। এই যাত্রা পালার মধ্য দিয়ে কাহিনীর মূল চরিত্রগুলির সাথে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতি বোধে কাহিনীকার পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু চরিত্রগুলির সনাতন রহস্য উদ্ঘাটন লেখকের উপজীব্য নয়— সমাজ পারিপার্শ্বিকতায় তারা ফুটে উঠেছে। পালা শুরু হওয়ার সাথে সাথে দূর-দূরান্ত হ'তে মানুষের মিছিল এগিয়ে আসে। এই মিছিলের খোশগল্পের মধ্যদিয়ে আদিবাসী, মাঝি, মালো, চাষী এই সব শ্রমজীবী মানুষের টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে দেশকাল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের অনেকেরই আশংকা ধান কাটার মরশুমে বেশ কিছু বিপদ ঘটতে পারে এবং এই ক'টি কথার মধ্যদিয়ে লেখক কাহিনীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবী যে দ্বন্দ্ব তার পূর্বাভাস স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই আসরেই আমাদের পরিচয়ঘটে পুণ্ড্র সমাজের গরীব চাষীর ছেলে 'কালপাথরে খোদাই দেহ' নকুলের সাথে। ষাট-সত্তর বছর আগে এই বাদায় বসতি পত্তনে নকুলদের পরিবার ছিল অন্যতম। আর এই বাদার অধিকারের প্রশ্নে লেখক তাই সেই ঐতিহাসিক সূত্রটাকে ছুঁয়ে গেছেন। 'এযেন অর্জিত অধিকার ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম।' যে সমাজের সাথে এই সংগ্রাম তার চরিত্র-গুলি হোল যদুপতি, রাখাল ও অন্যান্যরা এবং তাদের শিরো-মণি মন্মথ শিকদার।

কাহিনীর মধ্যে মন্মথ শিকদার এবং নকুল ও সবহারানো মানুষের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে ওঠে। মন্মথ শিকদারের অবাধ শোষণের সামান্য একটু বাধা নকুল। সে বাধাকে যখন মিষ্টি কথায় সরানো গেলোনা তখন শিকদার অন্যপথ ধরল। নকুলের বোন চাঁপা ধর্ষিত হোল মন্মথের বন্ধু এক ফরেস্ট অফিসারের মাধ্যমে। নকুল এবং এই গরীব মানুষদের যন্ত্রণা এবং দুর্ভোগ চূড়ান্ত রূপ নিল। কিন্তু মন্মথ শিকদার তাদের বশে আনতে পারলনা। শেষ করতে পারলনা। মানুষের প্রতিরোধ আরও তীব্র হয়ে উঠল। এবার মন্মথ শিকদারের কলকাতার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করা ছেলে রমেন এল। বুর্জোয়া নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করল। মানুষকে ছলচাতুরী দিয়ে সে বশ করতে চাইল। নকুলকে লঞ্চে চাকরী দিল। তাকে বিচ্ছিন্ন করল তার শ্রেণী থেকে এবং শেষপর্যন্ত তাকে ছাঁটাই করল। কাহিনীর নায়ক নকুল বাইরের জগতে ফিরে দেখল তার পায়ের নিচে মাটি নেই। সে বিধ্বস্ত—চূড়ান্ত ট্রাজেডির নায়কের মত আত্মযন্ত্রণার হাহাকারে অসহায়। গজেন, চাঁপা নেই যে তাকে সান্ত্বনা দেয়। পদ্ম তাকে ভালবাসত সেও আজ তার কাছ থেকে বহুদূরে। সে নির্জন নদীতীরে এসে ডিঙি খুলেদেয়। দক্ষিণে অথৈ সমুদ্র। মাঝনদীতে হঠাৎই দেখা হয়ে যায় পদ্ম, গজেন, চাপার সঙ্গে। নকুলের মনেহয় এই বৈঠার টানেই সে সমুদ্রে চলে যেতে পারে। 'সশব্দে তার বৈঠায় জল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল।'

এই গল্পটি লেখকের জীবনদর্শন, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সমাজ ও জনজীবনের সাথে নিবিড় সংযোগ এইসব কারণে পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে মূল্য পাবে। কিন্তু পাঠকের স্বভাবতই মনে হতে পারে লেখক কাহিনীর পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং চরিত্রগুলির ভিতর এবং বাইরের জগৎকে বিশ্লেষণ করে একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস উপহার দিতে পারতেন। ছোট গল্প হলে এ আলোচনা আসত না কিন্তু লেখক যেখানে বড় গল্পের পরিবেশ রচনা করেছেন সেখানে পরিবেশ ও চরিত্র আরো বিস্তৃত ও বিশ্লেষিত হলে কাহিনীটি আরো সার্থক হয়ে উঠতে পারত।

বাকি তিনটি কাহিনী নিঃসন্দেহে সবদিক দিয়ে ছোট গল্প। 'খোলস' গল্পের মধ্যে মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিক পরি-বারমুখী সতীশের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। কিন্তু পরিবেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হারিয়ে যাননি লেখক। গল্পটির পরিণতি অভিনব—"ডাকবে কি ডাকবে না ভেবেও, কে যেন ভিতর থেকে চিৎকার করে ডাকল সুধাবাবু? ও সুধাবাবু"। সুধাবাবু নামের মানুষ এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সতীশ তাকে ডাকতে পারেনি কারণ এদের সাথে মিশলে অনের কাছ হতে সে আঘাত আসার ভয় করে। এই ছোট গল্পটির মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ বিষয় অদ্ভুত কিছু শব্দের ব্যবহার—'আঠা আঠা চোখের সামনে', 'চোরা টাক', 'ল্যাম্পপোস্টটা অভাবী রঙয়ের চোখের তারার মত মিট্‌মিট করছে', 'সুখের খুদ' ইত্যাদি। এই ছোট গল্পটির মধ্যে গত দশকের অন্ধকার দিনগুলোর ছবি তির্যকভাবে লেখকের কলমে ধরা পড়েছে।

'তিন পুরুষ' গল্পটির মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্র ফুটে উঠেছে। যুগ পাল্টাচ্ছে এবং সাথে সাথে সমাজের আচার ব্যবহার পাল্টাচ্ছে এবং শোষণের পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে কিন্তু শোষণ ব্যবস্থা যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে তা রসো-ত্তীর্ণভাবে লেখক আমাদের দেখিয়েছেন।

'জ্বালা' কারখানার এক শ্রমিক ব্রেনের দুঃখ এবং রাগ এবং এসবকিছুর মধ্যদিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন এবং মালিক শ্রেণীর চরিত্র ফুটে উঠেছে, এই লেখাটির পরে লেখকের যে জীবন এবং শিল্প সম্বন্ধে অনেক উত্তোরণ ঘটেছে তা আগের গল্পগুলি (যেগুলি লেখক গত দশকের সম্ভবত শেষ-দিকে লিখেছেন) হতে স্পষ্ট হয়।

—রামকুমার মুখোপাধ্যায়

বিভাগীয় সংবাদ

সারা রাজ্যজুড়ে আমাদের বিভিন্ন ব্লকগুলিতে যুব উৎসব কোথাও চলছে, আবার কোথাও শেষ হয়েছে। এপর্যন্ত আমাদের দপ্তরে যে সমস্ত সংবাদ পৌঁছেছে তাই দিয়েই এবারের বিভাগীয় সংবাদ।

বীরভূম জেলা :

রাজনগর ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও আনুকূল্যে এবং রাজনগর ব্লক যুব-উৎসব কমিটির পরিচালনায় ১৪ই থেকে ১৬ই মার্চ তিনদিন ব্যাপী যুব উৎসব চলেছে। এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১২৫ জন শিশুসহ প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় ছ'টি দল অংশ গ্রহণ করে। আদিবাসীদের জন্য 'লোকনৃত্যে'-রও ব্যবস্থা ছিল।

১৪ই মার্চ পতাকা উত্তোলন এবং শিশুদের মার্চপাস্টের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও যুব উৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শিশু বিভাগের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল সম্মিলিত রিলে রেস, আবৃত্তি এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতীদের জন্য ছিল কবাডি, খো-খো, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, বিতর্ক ইত্যাদি। প্রতিদিন রাত্রে অনুষ্ঠিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে রাজনগর ইউনিক ক্লাব-এর 'শিকার'। দ্বিতীয় গার্গী গোষ্ঠীর 'সূচীপত্র'। কবাডি ও খো-খো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়।

বোলপুর ব্লক যুব-করণ—গত ১৫ই-১৭ই মার্চ বোলপুর ডাকবাংলো ময়দানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই মার্চ সকালে উদ্বোধনী মিছিল শুরু হয় উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে। মিছিলে অংশ নেয় গ্রামের সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ, যুব-ছাত্র, মহিলা, আদিবাসী, সাঁওতাল প্রভৃতি সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শরদীস রায় এম. পি. ও জ্যোৎস্না গুপ্ত এম. এল. এ.। খেলাধুলায় বালক বালিকাদের দৌড়, হাই-জাম্প, লং-জাম্প ইত্যাদি ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণীয় খেলা ছিল আদিবাসী ও সাঁওতালদের তীর ধনুক ছোঁড়া, রণপা দৌড় ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত দলের মধ্যে হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা। বিকালে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার কবিতাগুলি ছিল—রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে', নজরুলের 'কুলিমজুর' এবং সুকান্তের 'চিল'। কবিগান ও ম্যাজিকের আসরও বসে। উত্তরণ সাংস্কৃতিক শাখা (বোলপুর) 'মুচাকি মঙ্গল কাব্য' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। কসবা গ্রাম পঞ্চায়েত পরিবেশিত 'রায়বেশে' একটি সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। এছাড়া 'বদন চাঁদের বজ্জাতি' নাটক ও 'মা মাটি মানুষ' যাত্রানুষ্ঠান দর্শকদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রীয় হওয়া উচিত। প্রতিযোগীরা এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিল্পীচক্রের সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'হুল' ব্যালে স্থানীয় জনমানসে উল্লেখযোগ্য রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন দিনে পঃ বঃ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি শাখার বীরভূম জেলা অফিস কর্তৃক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

তিনদিনে প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ এই উৎসব উপভোগ করে।

নানুর ব্লক যুব-করণ—নানুর ব্লকে তিনদিন পৃথকভাবে তিন জায়গায় খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রথম দিন ২৭শে মার্চ খুজুটি পাড়া চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকালে শুরু হয় হা-ডু-ডু ও ভলিবল প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় গণসংগীত, কবিগান ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। পঃ বঃ সরকারের তথ্যচিত্রও দেখান হয়।

দ্বিতীয় দিন ২৮শে মার্চ কির্ণাহার শিবচন্দ্র হাইস্কুলে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় পাপুড়ি ইউনিট কর্তৃক 'রায়বেশে' এবং কির্ণাহার সুরঙ্গমা সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠান বেশ জমে ওঠে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন।

তৃতীয় দিনে নানুর ইউকো ব্যাঙ্ক মাঠে সকালের অনুষ্ঠানে গণসংগীত, সাঁওতালী সংগীত, চন্ডীদাস পদাবলী পরিবেশিত হয়। তারপর শুরু হয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, স্বরচিত কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। দুপুরের অনুষ্ঠানে চারকল গ্রাম ইউনিট 'রায়বেশে' পরিবেশন করেন। পরে রবীন্দ্রসংগীত এবং ভাদুগান প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

অনুষ্ঠান শেষ হয় শম্ভু বাগের নির্দেশনায় চন্ডীপুর নবনাট্য আলোড়ন গ্রুপের যাত্রাভিনয় 'সবুজের অভিযান' দিয়ে।

পুরস্কার বিতরণ করেন নানুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জিতেন মিত্র।

লাভপুর ব্লক যুব-করণ—গত ২৪, ২৫, ২৬শে মার্চ তিনদিন ধরে যুব উৎসব পালিত হয়। উদ্বোধন করেন পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়। লাভপুর যাদবলাল হাইস্কুল মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং স্থানীয় ব্লক ও যুবসংগঠনের অনেক যুবক-যুবতী।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সূচীতে ছিল—আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি ইত্যাদি। বিতর্কের বিষয় ছিল

—'আমূল ভূমি সংস্কার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে না'। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের আলোচনা তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে সকলের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

এছাড়াও বাউল গান, বোলান গান ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি সাধারণ মানুষ দারুণ আগ্রহ ভরে উপভোগ করে।

চব্বিশপরগনা জেলা :

সোনারপুর ব্লক যুব-করণ—বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গত ৪ঠা থেকে ৬ই এপ্রিল সোনারপুর ব্লক যুব উৎসব উদ্‌যাপিত হ'ল। গ্রামের যুবক-যুবতীদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতির চেতনাকে আরও বেশী বেশী করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলি ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। চাঁদমারীর মাঠে খো খো ও কাবাডি প্রতিযোগিতা, হরিণাভিতে সংগীত, আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী ফুটবল, রাজপুর ও বোড়ালে আলোচনা সভা এবং সোনারপুরে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বোসপুকুর ময়দানে।

বিভিন্ন আলোচনা সভায় বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় ছাত্রনেতা সাইফুদ্দিন চৌধুরী এম. পি., সত্যসাধন চক্রবর্তী এম. পি. এবং বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অনুনয় চট্টোপাধ্যায়।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন দক্ষিণ চব্বিশপরগনার যুব-সংযোজক মিহির কুমার দাস।

কাকদ্বীপ ব্লক যুব-করণ—কাকদ্বীপ বিধান ময়দান ও কিশোর প্রাঙ্গণে ২৮শে থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫৫১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বসে আঁকো, একাংক নাটক, সংগীত ইত্যাদি বিষয়। এতে অংশ নেয় ২০৪ জন প্রতিযোগী। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন বিধান সভার সদস্য হৃষিকেশ মাইতি।

বর্ধমান জেলা :

কালনা ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় এবং যুব উৎসব প্রস্তুতি কমিটির পরিচালনায় কালনা ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২০-২৩শে মার্চ। উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলা শাসক শ্রী বৈদ্যনাথ সিংহরায়। ২৩শে মার্চ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিধানসভার সদস্য গুরুপ্রসাদ সিংহরায় এবং প্রধান অতিথি বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ পুরস্কার বিতরণ করেন। উৎসবের ৪ দিন ব্লকের তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ, যুব কল্যাণ বিভাগ ছাড়াও এ. কে. বিদ্যামন্দির আয়োজিত একক বিজ্ঞান প্রদর্শনী দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

সালানপুর ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ সালানপুর ব্লক যুব অফিসের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১৬টি বিভিন্ন ধরণের ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এতে মোট ২৭ জন যুবকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের জন্য সীবন-শিল্পের উপর ১টি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এখানে ৪৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আশা করা যায় এ থেকে এঁরা নিজেদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন।

১৯শে মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক যুব উৎসব প্রতি বৎসরের মত এবারও প্রভূত উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হ'ল। বিশেষ করে তপশীলী ও আদিবাসী মহিলাদের দ্বারা পরিবেশিত লোকনৃত্য ও ক্রিশেন ক্লাবের ছেলেমেয়েদের জিমন্যাস-টিক, জুডো ও ক্যারেটে প্রদর্শন এবং লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুয়া নৃত্যনাট্যটি জনচিত্তে বিশেষ রেখাপাত করে। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করে উৎসব প্রাঙ্গণকে মুখর করে তোলে।

নদীয়া জেলা :

চাকদহ ব্লক যুব-করণ—গত ২১ থেকে ২৩শে মার্চ চাকদহ ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৫০ ও ৫০০ জন। প্রায় ১২,০০০ দর্শক সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত এইসব অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল বাগচী সফল প্রতিযোগী-দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অন্যান্য বক্তারা যুব উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

চাপড়া ব্লক যুব-করণ—২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ কিং এডওয়ার্ড বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্লক যুব উৎসবের আসর বসে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন

নদীয়া জেলার চাপড়া ব্লক যুব উৎসবে কবাডি প্রতিযোগিতা।

করা হয়। এছাড়া বিজ্ঞান, কলা ও হস্তশিল্পের উপর অনেক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একাংক নাটক প্রতিযোগিতার আসর বসে। এইসব বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নানান বিদ্যালয়ের ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। যুবমেলার উদ্বোধন করেন বিধানসভা সদস্য সাহাবুদ্দীন মণ্ডল। সদর মহকুমা শাসক সুবল মার্ন্ডি এবং বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

নাকাশীপাড়া ব্লক যুব-করণ—গত ২৮শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং যুব উৎসব কমিটির সহযোগিতায় বেথুয়াডহরী জে. সি. বিদ্যালয় ময়দানে ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল একদিনের ফুটবল, ভলিবল ও কবাডি প্রতিযোগিতা, মহিলা খো-খো প্রদর্শনী, লাঠিখেলা, ব্রতচারী নৃত্য, ড্রিল, ব্যায়াম ও শরীর চর্চা প্রদর্শনী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল আবৃত্তি, বিতর্ক, রবীন্দ্র ও নজরুলগীতি, কথন, কৌতুকাভিনয় ও আল্পনা প্রতিযোগিতা। এছাড়া একাংক নাটক প্রতিযোগিতা। অংশ নেয় ১৫টি দল। এরপরও ছিল দলগত লোকগীতি, সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, আলোচনাচক্র ইত্যাদি। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয়সূচী ছিল "আমূল ভূমি সংস্কারই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।" এবং আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল—"গণতন্ত্রের সুরক্ষায় ও সম্প্রসারণে যুব সমাজের ভূমিকা।"

এই যুব উৎসব জনমনে বিশেষ করে সাধারণ স্তরের মানুষের মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

কাকসা ব্লক যুব-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় ১২ থেকে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় এম. এল. এ. লক্ষ্মীনারায়ণ সাহা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম বিষয় ছিল আদিবাসী যুবকদের তীর ছোঁড়া ও যুবতীদের নৃত্যানুষ্ঠান। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন সম্পূর্ণ মাঝি, বি. ডি. ও.।

শান্তিপুর ব্লক যুব-করণ—এই যুব-করণের উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসবের (২০শে থেকে ২২শে মার্চ) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫০০ জন প্রতিযোগী সেমিনার, বিতর্ক, সঙ্গীত, আবৃত্তি, ব্রতচারী ও লোকনৃত্য, স্বরচিত গল্প ও কবিতা, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত ছিল কবাডি, হাই-জাম্প, দৌড় ইত্যাদি। স্থানীয় এম. এল. এ. বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়'এর সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ ডঃ চুনীলাল দেব কীর্ত্তনীয়া সফল প্রতিযোগীদের মানপত্র ও পুরস্কার দেন।

এছাড়া এই অফিস থেকে ৬৪ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়।

কৃষ্ণনগর ব্লক যুব-করণ—এই অফিসের পরিচালনায় যে যুব উৎসব (২৩-২৫শে মার্চ) অনুষ্ঠিত হয় তার প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও মডেল প্রদর্শনী। এছাড়াও চলচ্চিত্র দেখান হয় এবং দেহ সৌষ্ঠব ও যোগাসন নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ৪৪২ ও ৩৫১ জন অংশগ্রহণ করে। উৎসবের উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলার সভাধিপতি পরিমল বাগচী ও সফল-কাম প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন অধ্যক্ষ সুরেশ চন্দ্র সরকার।

হাঁসখালি ব্লক যুব-করণ—এই ব্লকের যুব উৎসব উদ্বোধনে (১৪. ৩. ৮০) উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শান্তিভূষণ ভট্টাচার্য ও বিধানসভার সদস্যদ্বয় সুকুমার মণ্ডল ও সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস। জেলা পরিষদের সদস্য বিমল চৌধুরী ও পঞ্চায়েত সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ নেন। সুদৃশ্য বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ২৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী যোগ দেয়। এরপর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৫৯ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

নবদ্বীপ ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং নবদ্বীপ থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য দেবী বসুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া আরো দুটি উপ-সমিতি গঠন করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল চিত্রাঙ্কণ, হস্তশিল্প, বসে আঁকো, বিজ্ঞান মডেল, বিতর্ক, সঙ্গীত, নৃত্য, একাঙ্ক নাটক ইত্যাদি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত ছিল কবাডি ও খো-খো। এই দুটি প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী বালক বালিকার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬৩ ও ৩৫৭ জন। পুরস্কার বিতরণী সভায় বসন্ত কুমার পাল, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি ও দীপঙ্কর সাহা, বি. ডি. ও. যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা :

বহরমপুর ব্লক যুব-করণ—এই কেন্দ্রের উদ্যোগে ২, ৩ ও ৪ঠা এপ্রিল মণীন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম স্তরে ছিল শহরের প্রতিযোগীরা এবং ২য় ভাগে ছিল গ্রামীণ প্রতিযোগীরা। এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল

বহরমপুর ব্লক যুব উৎসবে বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী।

বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, বাউল সংগীত, বসে আঁকো, যোগ ব্যায়াম ইত্যাদি। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৩৪৫।

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক যুব-করণ—এই যুব করণের পরিচালনায় ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রিল যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক দু'টি ভাগ ছিল। অ্যাথলেটিকস ও খো-খো প্রতিযোগিতায় ১৮টি ক্লাবের ২৫৯ জন বালক-

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক যুব উৎসবে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় 'অশান্ত বিবর' নাটকে একটি দৃশ্য।

বালিকা অংশ নেয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আবৃত্তি, তবলা বাদ্য ও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। ২০টি ক্লাবের ১৮৮ জন তরুণ-তরুণী এতে অংশ নেয়।

মালদহ জেলা ঃ

হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক যুব-করণ—হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকের ময়দানে গত ২৩শে মার্চ হতে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত কৃষি, শিল্প মেলা ও ছাত্র-যুব উৎসব সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক আয়োজিত মেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল, তাছাড়াও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা ও ক্লাবগুলিরও ছিল কিছু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। উক্ত মেলায় ২৩শে মার্চ কৃষি দিবস, ২৪শে মার্চ পরিবার কল্যাণ দিবস, ২৫শে মার্চ শিল্প দিবস, ২৬শে মার্চ পঞ্চায়েত দিবস এবং ২৭শে মার্চ ছাত্র-যুব দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। মেলার উদ্বোধন করেন পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন চৌধুরী মহাশয়। মেলা প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী প্রত্যহ বেলা ২টা হতে খোলা থাকত এবং প্রত্যহ দিবস অনুযায়ী আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা ছিল। আলোচনা চক্র ব্যতীত মেলাকে সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য উক্ত ব্লকের ২টি ক্লাব ২টি নাটক করেন। ২৩শে মার্চ আঞ্চলিক শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন, ২৪শে মার্চ রাত্রি ৭ ঘটিকায় কলিকাতার গণনাট্য সংঘ কর্তৃক গণসংগীত ও তরজাগান পরিবেশিত হয়। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বেতার শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী কর্তৃক পল্লীসংগীত, ২৬শে মার্চ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক মহুয়া গীতিনাট্য পরি-বেশিত হয়। যুব দিবস উপলক্ষে ২৭শে মার্চ বেলা ৩টায় ক্লাবের পতাকাসহ শোভাযাত্রাসহকারে উৎসব প্রাঙ্গণে সমবেত হয় ক্লাবের সদস্যরা। বেলা ৪টার সময় যুব উৎসব উপলক্ষে আন্তঃ ক্লাব ভলিবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলাটি হয় ভিঙ্গল সবুজ সংঘ বনাম হরিশ্চন্দ্রপুর সংগঠন সমিতির মধ্যে সংগঠন সমিতির মাঠে। ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করে ভিঙ্গল সবুজ সংঘ। ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ২৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক অংশগ্রহণ করে, তার মধ্যে ছাত্র-যুবকের সংখ্যা ১৮৮ ও বালিকার সংখ্যা ৫৫ জন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৯৭ জন, তারমধ্যে ছাত্র-যুব ৬০ জন ও ছাত্রী-যুবতীর সংখ্যা ৩৭ জনের মত। ভলিবল প্রতিযোগিতার পর কৃষি, শিল্প ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রদর্শনীর প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয় এবং যুব উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজেতা দলকে যুব কল্যাণ বিভাগ ও ব্লক স্পোর্টস কমিটির পক্ষ থেকে শীল্ড ও খেলোয়াড়দের গেঞ্জি দেওয়া হয়। সমস্ত রকম প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মালদা জিলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় শ্রী মানিক ঝা মহাশয়। পুরস্কার বিতরণীর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। কৃষি, শিল্প মেলা ও ছাত্র-যুব উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার পুরুষ ও মহিলা মেলায় অংশগ্রহণ ক'রে আনন্দ উপভোগ করেন।

পুরাতন মালদহ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের পুরাতন মালদহ ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এবং ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় মঙ্গলবাড়ী পি. ডাব্লু. ডি. অফিসের সম্মুখস্থ ময়দানে গত ২২শে মার্চ হতে ২৪শে মার্চ '৮০ পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী ব্লক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ২২শে মার্চ তারিখে ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় শ্রীদিব্যেন্দু মুখার্জী, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পুরাতন মালদা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুঃ মালদা ব্লকের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি ও সংঘের সদস্য-সদস্যারা নিজ নিজ সংস্থার পতাকা দিয়ে

অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিচিত্রানুষ্ঠান, গম্ভীরা, দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনী ও কোরাসের সঙ্গীতাভিনয় "ময়ূরের গান" আয়োজন করা হয়েছিল। যুব উৎসবের ১ম দিন প্রায় ১৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

যুব উৎসবের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান ও শিশু নাটক "সাত বন্ধু খুকুমণি" (পরিচালনায় মালদা ড্রামা-লীগ) সংগীত, নৃত্য, নাটক ও মূকাভিনয়ের (পরিবেশনায় পুঃ কালচারাল ইউনিট) আয়োজন করা হয়। ২য় দিন প্রায় ২৫০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

যুব উৎসবের তৃতীয় দিন পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পুঃ মালদার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ আতাউর রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা সমাহর্তা মহাশয়, শ্রী আর. কে. প্রসন্ন। এবং তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কার বিতরণীর পর গম্ভীরাগান, (পরিবেশনায় দো-কড়ি চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়) নাটিকা ও সমবেত সঙ্গীত (পরিবেশনায় গণনাট্য সংঘ, মালদা শাখা), এবং সবশেষে একটি নাটক (পরিবেশনায় কিশোর ভারতী পরিষদ, মঙ্গলবাড়ী) আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ২৭৫ জন।

কোচবিহার জেলা ঃ

কোচবিহার ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বাবুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, ৫ই থেকে ৭ই এপ্রিল '৮০ এক অনাড়ম্বর পরিবেশে কোচবিহার ১নং ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। ৫ই এপ্রিল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পরিবহন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহোদয়। সবুজের দলের ছোট ছোট শিশুমিতারা প্রধান অতিথি শ্রীচৌধুরীকে অভ্যর্থনা জানায়। ৫ই এপ্রিল যুব-ছাত্র দিবসে 'কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের' উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার ও শ্রীঅমিতোষ দত্ত রায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আলোচনা চক্র বন্ধ রাখা হয়।

৬ই এপ্রিল শ্রমিক কৃষক মৈত্রী দিবসে আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন শ্রীগোপাল সাহা, শ্রীপ্রদীপ নাথ, শ্রীসুনীল-কুমার নন্দী ও শ্রীপরিতোষ পণ্ডিত।

৭ই এপ্রিল জাতীয় সংহতি রক্ষা দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনিখিলেশ দাস। এদিন তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন। যুব উৎসবে প্রত্যহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিকালে গণসংগীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যুব সংস্থা কর্তৃক নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে যেমন যুব-ছাত্ররা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল আবার শ্রমিক, আদিবাসীদের অংশগ্রহণ এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল তরুণ কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য পাঠের আসর। কোচবিহার ১নং ব্লকের ১৪ জন তরুণ কবি ও শহরের তিন বিশিষ্ট কবি এতে অংশগ্রহণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে কবিদের সম্বর্ধনা জানানোর ঘটনা কোচবিহার শহরে এই প্রথম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা, ডাওয়া-গুড়ি শাখা, ত্রিফুলরায় ও সম্প্রদায় ও পিন্টু দত্তের গিটার খুব আকর্ষণীয় ছিল। টোটো পাড়ার আদিবাসী নৃত্য দর্শকরা খুব উৎসাহের সংগে দেখেছেন। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কিশোর নাট্য সংস্থা, কলেরপাড় তরুণ সংঘ, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ডাওয়াগুড়ি, বাণীতীর্থ ক্লাব ও তাঁত শ্রমিক ইউ-নিয়নের সদস্যরা নাটক পরিবেশন করেন। প্রত্যহ প্রায় ৪ হাজার দর্শকের সমাগম হয়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 'অমলের স্বপন ভঙ্গ', বাণীতীর্থের 'ঘটনার বিবরণে প্রকাশ' নাটক দুটি উচ্চ মানের ছিল। অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানান যুব উৎসব কমিটির সম্পাদক ও ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাশ। বিভিন্ন দিনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যাঁরা প্রথমস্থান অধিকার করেছেন তাঁরা হলেন—আবৃত্তি (নবম/দশম) ঃ শ্রীমতী রীণা দত্ত, দেওয়ানহাট হাইস্কুল। আবৃত্তি (সর্বসাধারণ) ঃ শ্রীবিজয় ঘোষ, বাণীতীর্থ ক্লাব। রবীন্দ্র সংগীত ঃ শ্রীমতী রীণা দত্ত, দেওয়ান-হাট হাইস্কুল। নজরুল গীতি ঃ শ্রীপ্রবীর কুমার রায়, হেল্‌থ রিক্রিয়েশন ক্লাব। ভাওয়াইয়া ঃ শ্রীমতী অঞ্জনা রায়, কোচবিহার সাংস্কৃতিক পরিষদ। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ঃ শ্রীপরিতোষ পণ্ডিত, পি. এম. জি. ও ডাঃ অশোক চৌধুরী, হেলথ্ রিক্রিয়েশন ক্লাব। অঙ্কন ঃ শ্রীপবিত্র সরকার, তল্লীগুড়ি।

জলপাইগুড়ি জেলা ঃ

আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক যুব-করণ—যুব কল্যাণ বিভাগের (পঃ বঃ সরকার) আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লকের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ২৩শে থেকে ২৫শে মার্চ পলাশবাড়ি গ্রামে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত্ব হল এদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে এসেছিলেন। তিন দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সুখেন্দু রায়। এবং পুরস্কার বিতরণ করেন আলিপুরদুয়ার ১নং পঞ্চায়েত সভাপতি দিলীপ চৌধুরী। উৎসবের দিন-গুলিতে প্রায় ৬০০০ লোকের সমাবেশ হয়। ২৩শে মার্চ 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহতি দিবস', ২৪শে মার্চ 'শ্রমিক কৃষক দিবস' ও ২৫শে মার্চ 'যুব-ছাত্র দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

কালচিনি ব্লক যুব-করণ—এই যুব-করণের উদ্যোগে ও কালচিনি ব্লক যুব উৎসব '৮০ কমিটির পরিচালনায় হ্যামিলটন-গঞ্জ কালীবাড়ী ময়দান ও কালচিনি থানা ময়দানে গত ২৪ থেকে ২৬শে মার্চ '৮০ পর্যন্ত যুব উৎসব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঐ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয় এবং পতাকা উত্তোলন করে যুব উৎসবের শুরু ঘোষণা করেন অঞ্জন রায়, যুব সংযোজক, নেহরু যুবক কেন্দ্র, আলিপুরদুয়ার। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে শিশুদের বসে আঁকো প্রতি-যোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, বিতর্ক, রচনা, স্বরচিত কবিতা, একাংক নাটক ও নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া সাঁওতালী নৃত্য, বোরো নৃত্য, নেপালী নৃত্য, ব্রতচারী ও তথ্য চিত্র প্রদর্শীত হয়েছে। এ বিভাগে মোট ২০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়

বিভিন্ন বিভাগে মোট ৩০০ যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এই উৎসবের অন্য একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল বিভিন্ন স্টলের আয়োজন। এর মধ্যে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও মহিলা সমিতির স্টলদুটি দর্শকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। গড়ে তিন হাজার দর্শক এই

কালচিনি ব্লক যুব উৎসবে শিশুদিবসে নৃত্যের ভঙ্গিতে জনৈক শিশু শিল্পী।

উৎসব উপভোগ করেন। কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন অংশ থেকে যুবক-যুবতী ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ সত্যই প্রশংসার যোগ্য। এই অঞ্চলে সরকারী সহযোগিতায় এই ধরণের উৎসব দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হ'ল।

মেদিনীপুর জেলাঃ

সবং ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ প্রায় ৪০০০ দর্শকের উপস্থিতিতে প্রতিযোগীরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। তিনদিনে মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৩৪৭ জন। এর মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৫৯ ও ৫৮৮ জন। প্রদর্শনীর সংখ্যা ছিল ১৭টি। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরের অধীন বিনপুর ১নং ব্লক যুব-করণ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে লালগড় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে সারা ব্লকের সর্বস্তরের মানুষের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ২৬শে মার্চ থেকে ২৮শে মার্চ পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী ব্লক যুব উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে মার্চ সারা ব্লকের যুবকবৃন্দ ও জনসাধারণ এবং স্থানীয় স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রী ও মেদিনীপুরের পুলিস লাইনের ব্যাণ্ড সহযোগে সারা লালগড় অঞ্চলটি পরিক্রমা করে এবং পরিক্রমা শেষে নেহরু যুবক কেন্দ্রের যুব সংযোজক সুশান্তকুমার সরকার পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর যুব উৎসব ও মেলা শুরু হয়। এই মেলাতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, প্রবন্ধ ও নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বারোশত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিতর্কে ২৮ জন, আবৃত্তিতে ১১৫ জন, প্রবন্ধে ৩১ জন এবং সংগীতে ২৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। এই ব্লক মেলা ও যুব উৎসবে আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এবং ২৬শে মার্চ আদিবাসী দিবস হিসাবে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যায় প্রতিযোগী মেলাতে যোগদান করেন। বিশেষ করে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতায় ৪২০ জন, একক সংগীতে ১৮ জন, তীর নিক্ষেপ এ ৫২ জন অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসবে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ তাদের প্রদর্শনী স্টল দেন। এছাড়া প্রতিদিন চলচ্চিত্র, মেদিনীপুর ক্ষুদিরাম সংঘের পরিচালিত ব্যায়াম প্রদর্শনী এবং ভারতীয় লোক সংগীতের প্রখ্যাত গায়ক সত্যেন্দ্রনাথ মহান্তি ও তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক সংগীত পরিবেশনা ও স্থানীয় আদিবাসী জনসাধারণ কর্তৃক যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়। যেভাবে সারা ব্লকের সর্বস্তরের মানুষ এই ব্লক মেলাতে যোগদান করে মেলাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তাতে প্রমাণ হয় যে এই উৎসব সারা ব্লকেরই উৎসব। শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণ করেন পঞ্চায়েত সমিতি ও মেলার সভাপতি সুধীর কুমার পাণ্ডে।

তমলুক ১নং ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে তমলুক ১নং ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় চনশ্বরপুর উচ্চবিদ্যালয় ফুটবল ময়দানে গত ২০শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তমলুকের অতিরিক্ত জেলাশাসক বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

যুব উৎসবে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা, কাবাডি, খো-খো, লোকনৃত্য, চিত্রাঙ্কণ, আবৃত্তি, সংগীত, গণসংগীত, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, নাটক। বয়স্ক শিক্ষা, কৃষি এবং স্বাস্থ্যের উপর আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ।

উৎসবে ১২০০ শ' প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক এবং শিক্ষিকা ও বিভিন্ন সংস্থার ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই যুব উৎসব জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত আশা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

সমাপ্তি দিবসে পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরহিত্য করেন তমলুকের অতিরিক্ত জেলাশাসক বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিধানসভার সদস্য পুলক বেরা।

পুরুলিয়া জেলা :

রঘুনাথপুর ব্লক যুব-কল্যাণ—বিগত ২৯শে এবং ৩০শে মার্চ এবং ৪, ৫, ৬ই এপ্রিল '৮০ দুটি স্তরে বিভক্ত হয়ে রঘুনাথপুর ১নং ব্লক 'যুব-উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের প্রস্তুতি পর্বে ১নং ব্লকে-র অন্তর্গত সমস্ত ক্লাবগুলি, পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা যুব সংগঠনগুলিকে নিয়ে 'যুব-উৎসব-কমিটি' গঠিত হয়। শ্রী রঙ্গনাথ আচারি, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি এবং শ্রী বিভূতি বেজ যুব-কল্যাণ আধিকারিক যথাক্রমে এই 'কমিটি'র সভাপতি এবং সম্পাদক মনোনীত হন। উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য শ্রী নীহার রঞ্জন চৌধুরী ও শ্রী চণ্ডীচরণ গুপ্তকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি ক্রীড়া উপ-সমিতি এবং অধ্যাপক দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রী পার্থ সারথি ঘোষকে আহ্বায়ক করে একটি সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি গঠন করা হয়।

দুদিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রঘুনাথপুর ১নং ব্লকের ৩৩টি ক্লাব ও ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৭০৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা শতাধিক। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে মোট ১৫টি বিষয়ে প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় 'তীর ছোঁড়া' এবং 'যেমন খুশী সাজো' প্রতিযোগিতা। শেষেরটিতে ১৫ জন অংশ গ্রহণ করেন। ক্রীড়া-বিভাগে প্রদত্ত মোট ৪৬টি পুরস্কারের মধ্যে 'পল্লী-শ্রী সংঘ' (ন-পাড়া-শাঁকা অঞ্চল) এবং রঘুনাথপুর গার্লস্ হাইস্কুল প্রত্যেকেই ৫টি করে এবং 'বয়েজ-ফ্রেন্ডস্ ক্লাব' (আদ্রা) 'অরবিন্দ-সংঘ' (আড়রা অঞ্চল) এবং 'আমরা সবাই' (রঘুনাথপুর) প্রত্যেকের চারটি করে পুরস্কার দখল সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যুব-উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজড্ জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে। রঘুনাথপুর শহর এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই উৎসবানুষ্ঠান যে এক অভূতপূর্ব সাড়া সৃষ্টি করতে পেরেছে তার মধ্যদিয়েই এর সার্থকতা ও সাফল্য পরিস্ফুট। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বিবিধ বিষয়ে অনেকগুলি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল প্রতিযোগী ও শ্রোতাদের কাছে। বালক-বালিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা এই প্রতিযোগিতায় সমান আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিশেষ কোনো গান নির্দিষ্ট করে না দেওয়াতে প্রতিযোগীরা যেমন স্ব-মনোনীত সংগীত পরিবেশনের সুযোগ লাভ করেছিলেন তেমনি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানের বিচিত্রভাব ও ঐশ্বর্য নানা রূপে রসে ও বৈচিত্র্যে ফুটে উঠতে পেরেছিল।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সঙ্গে সুকান্তের কবিতাও শিশু বা কিশোর প্রতিযোগীদের কণ্ঠে সুচারু পারদর্শিতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে যথাক্রমে বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব-সাধারণের জন্যে এই জাতীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে বিতর্কের বিষয় ছিল 'শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যম হওয়া উচিৎ'। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল দুটি (ক) পুরুলিয়া জেলার সার্বিক উন্নয়নে যুব-সমাজের ভূমিকা এবং (খ) আঞ্চলিকতা ভারতের জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে যে বিতর্ক, আলোচনা এবং বক্তৃতায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য প্রতিযোগীরা তা শুধুই যে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল তা নয়—ছিল যথেষ্ট শিক্ষামূলকও উৎসাহব্যঞ্জক। সমকালীন সমাজের মানব জীবনের সমস্যার নানা দিক ও তার সমাধানের সঠিক পথ সন্ধান নিয়ে যে আজকের যুব সমাজ ভাবছেন তা সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এখানে। বিতর্ক ও আলোচনার ক্ষেত্রে সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রী তপন লাহিড়ীর সুচিন্তিত ও মূল্যবান বক্তব্য প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক'। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর বিষয়ের উপর রচিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যাঁরা অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁরা যথেষ্ট উন্নত চিন্তার পরিচয় রেখেছেন।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো একাংক নাটকের প্রতিযোগিতা। এই অভিনয় প্রতিযোগিতা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে দর্শকমণ্ডলীর কাছে। কয়েক হাজার দর্শক নিবিষ্টচিত্তে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত এই উন্নত রুচির ও মানের নাটকগুলি পরম আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করেছেন। এই অঞ্চলের যুবকেরা অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এক্ষেত্রেও। বিষয় বৈচিত্র্যের এবং বক্তব্যের দিক্ থেকে সমুন্নত আদর্শের এইসব নাটকাভিনয় আঞ্চলিক যুব সমাজের অসাধারণ নাট্য-প্রতিভা এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। 'স্তালিনের নামে' (চোর পাহাড়ী নাট্য সংস্থা), 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া' (বিদ্যাসাগর-শরৎ-নজরুল-স্মৃতি পাঠচক্র, রঘুনাথপুর), স্ফিংস (ডাবর অরুণোদয় ক্লাব, চোর পাহাড়ী), কিংবা 'চন্দ্রালোকের যাত্রী' (আমরা সবাই, রঘুনাথপুর)-র অভিনয় তারই প্রমাণ। নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো বন্দলা খাজুরা অঞ্চল কর্তৃক সাঁওতাল ভাষার নাটক 'মার্শাল ডাহা'র অভিনয়। আশা করা যায় রঘুনাথপুর ১নং ব্লকের যুব-উৎসবের পক্ষে এই ঐতিহাসিক ঘটনা একটা স্থায়ী মূল্য নিয়ে আগামী ভবিষ্যতকে প্রেরণা যোগাবে।

৬ই এপ্রিল '৮০ সন্ধ্যায় এক সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী রঙ্গনাথ আচারী। সম্পাদকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মোট ২৬০ জন প্রতিযোগী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সীমান্তিক গোষ্ঠী (আদ্রা)-র গণসংগীত পরিবেশন।

পরিশেষে বলা যায়, এই জাতীয় উৎসবানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রঘুনাথপুর এবং সন্নিহিত অঞ্চলের যুব-সমাজের ক্রীড়াগত এবং সাংস্কৃতিক মান যে ভবিষ্যতে উজ্জ্বলতর হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই—সন্দেহ নেই এবিষয়েও যে এই অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, ও সহানুভূতিই এই যুব উৎসবকে সাফল্যের স্বর্ণ-শিখরে উপনীত করেছে।

পাঠকের ভাবনা

সম্পাদক সমীপেষু,

'যুবমানস' কবে বেরোবে—আশা নিয়ে দারুণ আগ্রহভরে অপেক্ষা করি। পড়তে ভাল লাগে। ইদানিং ভালবাসতে শুরু করেছি। গত সংখ্যা অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় কয়েকটি নতুন বিভাগের সংযোজন দেখলাম। আশা করব এমনি করে আগামী দিনগুলিতে 'যুবমানস' আরও সমৃদ্ধ হবে।

শিল্প সংস্কৃতি বিভাগে গৌতম ঘোষদস্তিদারের 'নাটকের কিছু কথা এবং ফজল আলী আসছে' একটি বলিষ্ঠ, যুক্তিপূর্ণ আলোচনা। লেখার ভঙ্গিটিও সুন্দর। গৌতমবাবু শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাকরণবাগিশ সমালোচকদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন বিচারের মানদণ্ড অন্যত্র অর্থাৎ পাঠকের হৃদয়ে।

তবে বানানের ক্ষেত্রে এতখানি এগিয়ে যাওয়া ঠিক কি? পত্রিকার সময়মত প্রকাশ অবশ্য কাম্য।

শ্রদ্ধাসহ—

নমিতা ঘোষ।

বসিরহাট। ২৪-পরগনা।

প্রিয় সম্পাদক,

যুবমানসের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ভাষণের সম্পাদিত রূপ পড়লাম। আমাদের মত গ্রামের যুবক-যুবতীরা বিধানসভায় আমাদের প্রতিনিধিরা যা বলেন, তার খুব কম অংশ জানতে পারি। বাজারী সংবাদপত্রগুলিতে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সংবাদ সামান্যই ছাপা হয়। যদি বা ছাপা হয় তা পড়ে আমরা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ মূল্যায়ন করতে পারিনা এবং সত্যি কথা বলতে কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হই।

যুবমানসের পাতায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য পড়ে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে সরকার কোন পথে চলতে চান, আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ইত্যাদি বিষয়গুলি।

এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করে 'যুবমানস' আমাদের মত গাঁয়ের মানুষদের অনেক অজানা কথাকে জানতে সাহায্য করেছেন। যুবমানসের সম্পাদকমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—কামাল আমেদ

গ্রাম—থানারপাড়া। নদীয়া।

সহ-সম্পাদক,

যুবমানস।

আপনাদের নতুন বিভাগ 'পাঠকের ভাবনা'-র সংযোজনে উৎসাহিত হয়ে চিঠি লিখছি। আপনারা পাঠকদের 'পরামর্শ'-কে মূল্য দেন জানিয়েছেন। সেই ভরসায় আমার প্রথম পরামর্শ—যুবমানস নিয়মিতভাবে প্রকাশ করুন। মাঝে মাঝে হঠাৎ শেয়ালদা' স্টেশনের হকারের হাতে 'যুবমানস' দেখতে পাই। আবার অনেক সময় অনেক খোঁজাখুজি করে পাইনা। সময়মত প্রকাশ করে এবং সুষ্ঠ বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তা সাধারণের কাছে পোঁছুতে না পারলে এর মূল্য কমে যেতে বাধ্য। অথচ পত্রিকাটির চাহিদা আছে।

জানিনা আমার পরামর্শে আপনাদের অথবা আমাদের পত্রিকা কতখানি 'প্রাণবন্ত' হয়ে উঠবে। তবে উঠুক এটা সর্বান্তকরণে চাই।

নমস্কার জানবেন।

—নিতাই বড়াল

কুশমোড়। বীরভূম

শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমণ্ডলী,

মাসিক 'যুবমানস' কাগজের আমি নিয়মিত পাঠক। তা কট্টর পাঠক হিসেবে আমার দাবী আছে। ক্রম লুপ্ত বাংলার লোকসাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর সঠিক বৈজ্ঞানিক পথে গ্রথিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আপনাদের কাগজে আমি বাংলার লোকসাহিত্যে শিশু প্রবন্ধ ছাপতে চাই। বেশ কয়েক-বছর গ্রামগঞ্জ-এ মানুষের সাথে মিশে আত্যন্তিক প্রতিকুলতার মধ্যে রাত কাটিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার আলকাপ, গ্রামের আঞ্চলিক একান্ত নিজস্ব ছড়া, গান, প্রবাদ, কবি প্রভৃতি মহামূল্যবান তথ্য দলিল সংগ্রহ করেছি। এগুলিকে সুস্থভাবে প্রকাশ করার একটি বিশেষ মাধ্যম চাই। তাই আপনাদের কাছে জানালুম আমার কথা। মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে একথা ভাবতে কষ্ট হয়। আপনারা জানাবেন আপনাদের বক্তব্য। উত্তরের অপেক্ষায় থাকলুম। নমস্কার।

গৌতম ঘোষ

শক্তিগড়। বনগ্রাম। ২৪ পরগনা।

রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসবের প্রদর্শনী মণ্ডপে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা সডাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০ %
১৫০০-এর ঊর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০ %
৫০০০-এর ঊর্ধ্বে	৪০ %

১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠার প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান।

বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

বীরভূমের বোলপুর ব্লক যুব উৎসবে সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একতারা শিল্পীচক্র শাখার ব্যালে 'হুল'-এর দু'টি বিশেষ মুহূর্ত।

কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে প্রদর্শনীতে ভাগচাষী রেকর্ড সম্পর্কে চাষীদের বোঝান হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
জুন-জুলাই '৮০

প্রচ্ছদ/চন্দন বসু

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঞ্চাশ পয়সা

সম্পাদকীয়

কোন কিছু ধ্বংস করিতে তিন বৎসর যথেষ্ট সময় কিন্তু কোন বিষয় বা বস্তু গঠন করিতে এই সময়কাল নিতান্তই নগণ্য। তিন বৎসর আরও তুচ্ছ সময় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—যদি ঐ নির্মাণকাণ্ডের সহিত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে স্পর্শ করিবার প্রশ্ন বিদ্যমান থাকে। বলিলে বোধ করি এতটুকু বাড়াইয়া বলা হইবে না যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামজোট সরকার তাহার শাসনকালের এই স্বল্প তিন বৎসরের মধ্যে সাড়ে চার কোটি মানুষের সমস্যা জর্জরিত রাজ্যের নির্মাণ কার্যে এক অভূতপূর্ব গতিবেগ এক অদৃষ্টপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

যে পরিস্থিতির মধ্যে এই সরকারের হাতে শাসন ভার অর্পিত হইয়াছিল সেই অবস্থার কথা এই সময়ের মধ্যে তো কেহই ভুলিয়া যায় নাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পঠন-পাঠনের পরিবেশকে প্রায় নির্মূল করা হইয়াছিল—পরীক্ষা ক্ষেত্রে চরম উচ্ছৃংখলতা বিরাজ করিতেছিল। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য সমস্ত প্রচলিত নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী দেখাইয়া মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যকে লইয়া গঠিত সাব-কমিটি'র উপর প্রার্থী বাছাই করার সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছিল—বিরাট সংখ্যক বেকার যুবকের নির্মম অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে শাসক শ্রেণীর কর্ণধারদের নিকট নতজানু হইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল—যৌবন জনোচিত দৃঢ়তাকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে দুর্নীতির পঙ্কে ডুবাইয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার যাবতীয় বন্দোবস্ত সুকৌশলে করা হইয়াছিল। অপ-সংস্কৃতির প্লাবন সৃষ্টি করিয়া, যৌনতা নগ্নতা দিয়া যুব মানসিকতাকে বিকৃত করিয়া, 'হিরোইন', 'এল. এস. ডি' ইত্যাদি নেশা করা দ্রব্য সম্ভারে যুব মনকে পঙ্গু করিবার কতই না ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করিয়া দেবার জন্য সকল-প্রকার স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছিল। সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছিল। অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-পরিবহণ এমনকি তৃষ্ণার জলটুকুর সমস্যার কোন সমাধান দূরে থাকুক তাহা হ্রাস করিবার নিমিত্ত বাস্তব পরিকল্পনার কোন লেশমাত্র ছিল না। দূরদর্শিতার অভাব, প্রকল্প সমূহকে বাস্তবায়িত করার আন্তরিকতা ও যোগ্যতার অভাব, ব্যক্তি স্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থের সেবা করিবার জন্য অকল্পনীয় লিপ্সা, আত্মকলহে নিমগ্ন শাসকগোষ্ঠীর কুৎসিত ক্রিয়াকলাপ, বিদ্যুত সহ সকল মৌল সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি, প্রশাসনের সকল স্তরে দুর্নীতির দাপট—এই সবই ছিল সেই সময়ের বৈশিষ্ট্য। আর এই অসহ অবস্থার প্রতিবাদে টু শব্দটি যাহাতে কোথাও উচ্চারিত না হইতে পারে তাহার জন্য আধা-ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়া একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করিয়া গণতন্ত্রকে সমাধিস্থ করিবার আনুষঙ্গিক সকল কাজকর্ম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল।

সেই সময় রাজ্যের সাধারণ মানুষ অনেক বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া, নীরবে-নিঃশব্দে ভোটের মাধ্যমে তাঁহাদের রায় ঘোষণা করিয়া সুকঠোর কর্তব্যের মুকুট মাথায় পরাইয়া কাঁটার সিংহাসনে এই সরকারকে বসাইয়াছিলেন।

ভারতের সংবিধানের বিধান অনুসারে একটি অঙ্গ রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা একেবারেই সীমাবদ্ধ, ততোধিক সীমিত তাহার প্রশাসনিক অধিকার। অর্থের জন্য, অনুমতির জন্য দিল্লীর দিকে তাকাইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে ও অনিশ্চয়তার সহিত প্রহর গুনিতে হয়। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়াই রাজ্যের জনগণের জীবনের কতকগুলি মৌলিক দিক যথা—কৃষি, সেচ, চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহণ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি বিধানের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই পালন করিতে হয়। দায়িত্ব পালনের উপাদান ও সুযোগের অভাব যতই থাকুক না কেন কতকগুলি অতিরিক্ত সুবিধাও এই রাজ্যের বর্তমান সরকারের ভাগ্যে জুটিয়াছে। অগণিত মানুষের আস্থা, সকল স্তরের সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মধ্যবিত্তের একনিষ্ঠ সমর্থন ইহার পূর্বে আর কোন্ সরকারের অদৃষ্টে ছিল?

দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর এই সরকার জনগণের ভালবাসাকে পাথেয় করিয়া প্রত্যয়-সিদ্ধ মনোভাব লইয়া বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া হাজার বৎসরের দৃষ্টান্ত বিহীন বন্যার ধ্বংস স্তূপ হইতে রাজ্যের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে আবার এত কম সময়ের মধ্যে চাঙ্গা করিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য ক্ষতিগ্রস্থ লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব খুয়াইয়া হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ভিটামাটি ছাড়িয়া শত্রুর মুখে ছাই দিয়া শহরের রাজপথে ভিক্ষুকের মিছিলে সামিল হয় নাই। সেই জন্যই গণনাতীত ঐতিহ্যের সৃষ্টিকারী ছাত্র-যুবকেরা দেহের রক্ত বিক্রি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুনর্গঠনের কাজে এই ভাবে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। আবার তাহার পরের বৎসরেই অভূতপূর্ব খরায় রাজ্যের ব্যাপক এলাকায় নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এই সরকারের সময়োপযোগী ও বলিষ্ঠ ব্যবস্থার ফলে মানুষ গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারিয়াছে। নিন্দুকে যাহাই বলুক না কেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ দিল্লীর সরকার মারফত খরা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য সাধুবাদ জানাইয়াছেন।

ক্ষমতায় বসার একবৎসরের মধ্যে দেড়যুগ ধরিয়া স্থগিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া এই সরকার গ্রামীণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—গ্রামের মানুষকে দেশ গঠনের কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া একদিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করিয়াছেন, অন্যদিকে চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিকতার ফাঁস হইতে গ্রামীণ কর্মধারাকে যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত করিয়াছেন। পঞ্চায়েতগুলির হাতে পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বেশি অর্থ বরাদ্দ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজের বদলে খাদ্য ইত্যাদি কর্মসূচীর ফলে সেই জন্য প্রায় ছয় কোটি কাজের দিন সৃষ্টি করিয়া গ্রামীণ বেকারীকে কিছুটা পরিমাণে লাঘব করিতে পারিয়াছে।

প্রায় নয় লক্ষ একর খাস জমি দরিদ্র কৃষকের মধ্যে বণ্টন করিয়া, প্রায় সাড়ে আট লক্ষ বর্গাদার আধিয়ারের নাম নথিভুক্ত করিয়া, ব্যাঙ্ক হইতে পাট্টাদার ও বর্গাদারকে সামান্য সুদে বা বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা করিয়া, ষাট বৎসরের বেশি বয়স্ক দীন-দরিদ্র ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষককে ষাট টাকা করিয়া মাসিক পেনসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিধবা ভাতা, এবং প্রায় তিন লক্ষ বেকার যুবককে বেকার-ভাতা প্রদান করিয়া গোটা ভারতের জনগণের নিকট এই সরকার একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিয়াই শুধু ক্ষান্ত হয় নাই—সেই শিক্ষা পদ্ধতিকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে গণতন্ত্রীকরণ ও সার্বজনীন করিবার জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে—সমাজের অবহেলিত নির্যাতিত স্তরের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে।

একমাত্র কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমেই রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারদের বয়সের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়ার একটি পরিচ্ছন্ন নীতি গ্রহণ করিয়া এবং তিন বৎসরে প্রায় চল্লিশ হাজার যুবককে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতিকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিয়া গোটা দেশের মানুষের বিশেষ করিয়া যুব সমাজের নিকট এই সরকার ধন্যবাদার্হ হইয়াছে। ৩৫টি বন্ধ কারখানা খুলিয়া চাঙ্গা করিয়া প্রায় চল্লিশ হাজার শ্রমিকের কাজের সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিবার ফলে এই তিন বৎসরে মালিকের নিকট হইতে রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণী প্রায় কুড়ি কোটি টাকার অতিরিক্ত মজুরী আদায় করিতে পারিয়াছেন—শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক সাবলীল গতিময়তা আনা সম্ভব হইয়াছে।

রাজ্যের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক শিক্ষাকর্মীসহ অন্যান্য কর্মচারীর চাকুরীর নিরাপত্তা, কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদির শুধু ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাই নহে তাহাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন করিবার পূর্ণ অধিকার গোটা দেশের মধ্যে প্রথম এই রাজ্য সরকার প্রদান করিয়া সাম্রাজ্যবাদী আমলের একটি ধারাকে লুপ্ত করিয়া ভারতের শ্রমজীবী মানুষের প্রশংসাধন্য হইয়াছে।

সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন, খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি, যুব জীবনের বিভিন্ন চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নানা ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করিয়া—নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের মধ্যে এই রাজ্য সরকার এক অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে।

১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বৎসরে এই রাজ্যের বার্ষিক ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ যেখানে ছিল ৭০০ কোটি টাকার কিছু বেশি সেইখানে বর্তমান বৎসরে এই রাজ্য সরকার সেই পরিমাণকে দ্বিগুণ করিয়া ১৪০০ কোটি টাকার উপর ধার্য করিয়াছেন। রাজ্য যোজনার জন্য এই সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্ব বৎসরে বরাদ্দ করা হইয়াছিল ২০০ কোটি টাকা আর বর্তমান বৎসরে এই রাজ্য সরকার যোজনা খাতে ব্যয়ের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন ৪৮০ কোটি টাকা। রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্য স্বল্প তিন বৎসরে একটি রাজ্য সরকারের সমতুল আন্তরিকতার নজীর ত্রিপুরা ও কেরালা ব্যাতীত আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক পরিবেশকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত

[শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়]

বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর : গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে গতিপ্রবাহের সূচনা করেছে

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

একটা বিনম্র ন্যূনতম কর্মসূচী সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিমর্যাদা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার কথা ঘোষণা করে জনসাধারণের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই কর্মসূচীতে রাজ্যের শ্রমবিষয়ক, ভূমিসংস্কার, কৃষিসমস্যা, শিক্ষা সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাঁদের ঘোষিত কর্মসূচী রূপ দেবার সাধ্যমত প্রচেষ্টা নিচ্ছেন।

আমাদের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। কৃষিজীবী পরিবারগুলির বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভূমিহারা হয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটান। ফসলের চড়া ভাগ, মহাজনী জুলুম, নিদারুণ বেকারী, ট্যাক্সের বোঝা ও ধনতান্ত্রিক শোষণের জুলুম কৃষককে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত করছে। কৃষক জমি রাখতে পারছেনা। পরিণতিতে জমি হারিয়ে ভিড় করছে খেতমজুরদের দলে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ চিত্র হল কর্মাভাব, বুভুক্ষা, ঋণভার আর দুঃস্থতার বিষাদময় পশ্চাৎপদতা।

শাসক শ্রেণীগুলি স্বাধীনতার পর বিগত তিরিশ বছর ধরে জমিদারী ব্যবস্থার আমূল অবসান ঘটিয়ে কৃষকের স্বার্থে প্রকৃত ভূমি সংস্কার করতে অস্বীকার করেছে। কৃষি ব্যবস্থায় এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমি সম্পর্কের ওপর সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শৃংখল ভেঙে ফেলে মধ্যযুগীয় বর্বর নিপীড়নের অবশেষগুলির বিলোপ ঘটানো না গেলে প্রকৃত ভূমিসংস্কার বাস্তবায়িত হতে পারেনা, সামাজিক অগ্রগতি কথার কথা থেকে যায়। ভূমি সংস্কার ও কৃষি সমস্যার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

চতুর্থ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছেন, 'যেহেতু বর্তমান অবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয় তাই জনগণের সাময়িক দুর্গতি মোচনের জন্য এবং আগামী সংগ্রামের জন্য তাদের মনে বিশ্বাস ও শক্তি এনে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' পুঁজিপতি-জমিদার রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সংবিধানের বেড়াজালে একটা অঙ্গ রাজ্যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে সমস্যার মৌলিক সমাধান করা যায় না। এই সরকার পারবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছুটা প্রসার ঘটিয়ে জনগণের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে এবং আশু সমস্যাগুলির ওপর নজর দিয়ে জনগণের ওপর চাপানো বোঝা কিছুটা হালকা করতে। বামফ্রন্ট সরকারের গণমুখী কর্মসূচী জনগণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবে এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার কাজ সহজতর হবে। আশু দাবির সাফল্য গণসমাবেশ ব্যাপকতর করে এবং শাসক শ্রেণীগুলি সম্পর্কে মোহমুক্তির প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থান ও কর্মসূচী এই ব্যাপারে কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে গণতান্ত্রিক শক্তির সেটাই হল প্রধান বিবেচনার বিষয়।

আমাদের দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়ে আছে একটা নিশ্ছিদ্র ও কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর। সমস্ত ক্ষমতা ওপরতলায় কেন্দ্রীভূত। শাসক শ্রেণী ও তাদের অনুগত আমলাদের দ্বারা পরিচালিত সরকারী কাঠামোর মধ্যে যথার্থ গণতন্ত্রের কোন জায়গা নেই। নিচের তলায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়েই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো সম্ভব। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যক্রমের বিকাশের সাথে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের সোপান হল এটি।

শুধু মাত্র বিনাবিচারে আটক, সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন সমস্ত ধরণের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং জনগণের ওপর অত্যাচারের তদন্তের ব্যবস্থা করাই নয়, বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা হাতে নেবার সময় থেকেই আমলাতন্ত্রের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরতার পদ্ধতি না নিয়ে গণসংগঠনগুলির পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করছেন এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির ওপর অধিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা তুলে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নজির সৃষ্টি করেছেন। গ্রাম্য জীবনের অগ্রগতিতে বামফ্রন্ট সরকারের এই অবদান উল্লেখ করার মত।

গ্রামের পঞ্চায়েতগুলি ছিল জোতদার কায়েমীস্বার্থের স্থানীয় রাজনৈতিক কেন্দ্রের ঘাটি, প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রের আখড়া। নিচের তলায় প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে বাস্তুঘুঘুদের হঠিয়ে দিয়ে গরিবের প্রতিনিধিরাই অধিকাংশ পঞ্চায়েতে এখন নির্বাচিত। বামফ্রন্ট সরকার পূর্বের ঘুণধরা পঞ্চায়েতগুলিতে কাজের প্রবাহ সৃষ্টি করতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর ব্যাপক দায়িত্ব তুলে দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ গ্রামাঞ্চলে গরিবদের দিকে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা নিয়েছেন। কাজের বিনিময়ে খাদ্য, গ্রামোন্নয়ণ ও পুনর্গঠন প্রকল্পগুলির ব্যাপক প্রচলনে গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর, গরিব চাষী ও কর্মচ্যুত কারিগরদের কাজের সংস্থান বৃদ্ধি পাবার অনিবার্য ফল হিসেবে ঋণ সরবরাহকারী পরগাছা মহাজনের ওপর নির্ভরতা কমানো গিয়েছে। শ্রমনির্ভর এই কাজগুলি বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করছে এবং অভাবের তাড়নায় শেষ সম্বল হিসেবে ঘরের থালা-বাটি, বাস্তুভিটা বা জমিখণ্ডটুকু বন্ধক রেখে অথবা মরশুমে খেটে শোধ দেবার কড়ারে বড় জমির মালিক ও মহাজনের দরজায় ধর্ণা দেবার দীর্ঘ দিনের অবস্থাটার এক নিশ্চিত পরিবর্তন ঘটেছে। গরিবের হাতে সম্পদকে ঠেলে দেবার ফলে, টাকার হাতফেরতা

নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রুদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের এই গতিবেগ, পরিবর্তনের একটা সূচনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে কাজের সংস্থান, গরিব জনগণের আর্থিক সংস্থানের কিছুটা সুযোগ বৃদ্ধি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। দুঃখ কষ্ট লাঘবের প্রচেষ্টায় অথবা গ্রামীণ সম্পদ পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পঞ্চায়েত-গুলির উদ্যোগ গৌরব করার মত। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল বামফ্রন্ট সরকারের ব্যবস্থাবলী ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক কর্মকান্ড জনগণের চেতনা ও সমাবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে কতটা, বামফ্রন্ট সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্বন্ধে উপলব্ধি গড়ে উঠছে কিনা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীশত্রুদের কতদূর বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করা গেল। দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মানুষ পশ্চিমবঙ্গের কাছে এটাই প্রত্যাশা করে। বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতগুলির ওপর বিরাট দায়িত্ব দিয়ে এই সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরী করতে সাহায্য করেছে।

কৃষক সাধারণ ও গ্রামের গরিব জনগণের ওপর শোষণ নির্যাতনের নায়ক জোতদার-কায়েমীস্বার্থই হল স্বৈরাচারী শক্তির গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ভিত্তি। গ্রাম্য সমাজজীবন থেকে জমিদারী শোষণের শেকড় উপড়ে ফেলতে না পারলে স্বৈরাচার বারে বারেই তার বিষদাঁত ফোটাতে চাইবে, সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যাবে না। গ্রামাঞ্চলে জমিদারী শোষণকে কতটা আঘাত দেওয়া গেল, শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সচেতন গণউদ্যোগ ও জনসমাবেশ গড়ে উঠছে কেমন এবং গণতান্ত্রিক চেতনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্তরে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা এটাই হল বামপন্থী শক্তির মূলে বিবেচনার বিষয়। বামফ্রন্ট সরকারের কার্যক্রম এই সম্ভাবনার দিক খুলে দিতে সাহায্য করেছে।

যত সদিচ্ছাই থাকুক না কেন, বর্তমান ভূমি সম্পর্কের মূলে কাঠামোকে বজায় রেখে সংবিধান ও আইনগত পরিধির মধ্যে ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর ফলাফল সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ সচেতন থেকে বর্তমান সীমাবদ্ধ সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে ব্যাপক অংশের গ্রামের গরিব মানুষের আর্থিক দুরবস্থা কিছুটা হালকা করা যাবে এবং এই কর্মসূচীর সাফল্য গ্রামাঞ্চলে জোতদার কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে গরিব মানুষদের উৎসাহের সৃষ্টি করবে। শাসক শ্রেণীর তৈরী সংবিধান যে গ্রামাঞ্চলে জমিদার সম্পত্তিবানদের স্বার্থের পাহারাদার সেই উপলব্ধিতে গ্রামের জনগণ ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছেন। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বর্গাদারদের প্রসারিত অধিকার, সিলিং বহির্ভূত জমি অধিগ্রহণ ও বণ্টন, অভাবের কারণে হস্তান্তরিত জমি ফেরতের ব্যবস্থা, ভাগচাষী ও খাস জমির পাট্টাপ্রাপ্ত গরিব কৃষককে ব্যাঙ্কঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদির সাফল্য গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি বাড়িয়ে তুলতে এবং মালিক ও মহাজনের সাথে ব্যবধান সৃষ্টি করতে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নিচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলন আংশিক দাবি-গুলি নিয়ে যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে তাকে স্বীকৃতি দিয়েই বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীতে 'ভূমি-সংস্কার ও কৃষক' সংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিরলসভাবে তা কার্যকরী করে চলেছেন। আংশিক দাবির সাফল্য জনগণের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করবে, চেতনার বিকাশ ঘটে, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়টি সামনে এসে হাজির হয় এবং শত্রুরা দুর্বল ও কোণঠাসা হয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ ব্যাপকতর হবার প্রশ্নে, জোতদার কায়েমীস্বার্থকে বিচ্ছিন্ন করতে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে গৌরবের।

জোতদার বাস্তুঘুঘুদের আঘাত না দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর রূপায়ন সার্থক হতে পারে না, আবার কায়েমীস্বার্থের বাধা অতিক্রম করতে না পারলে বামফ্রন্টের কর্মসূচীর সাফল্যের অগ্রগতি হতে পারে না। জোতদার মহাজনেরা তাই আজ মরিয়া।

আমাদের লক্ষ লক্ষ যুবকরা এক অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের আশংকায় নিরুদ্দম জীবন কাটাতে বাধ্য হন। বেকারী ও অর্ধবেকারীর জ্বালায় তাঁরা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েন। গ্রাম্য জীবনের কোটি কোটি জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে গেলে শিল্পের বাজারে অনিবার্য সংকট দেখা দেয়, সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। বেকারী ভয়াবহ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষার সংকট, সংস্কৃতির সংকট, দেশের সকল ক্ষেত্রে সংকট ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়। সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রবাহ আনার প্রথম সর্ত হল কৃষকের হাতে জমি এবং কাজ। সীমাবদ্ধ ভূমিসংস্কারের সাফল্য ও কর্মসংস্থানের বর্ধিত সুযোগ গরিব কৃষকের চাষের নিরাপত্তা ও অগণিত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কিছুটা বাড়িয়ে তুলে পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে সবলতা আনার সূচনা ঘটিয়েছে। গোটা সমাজের বিশেষতঃ যুব সমাজের কাছে এই সম্ভাবনাময় দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক শোষণের জগদ্দল পাথরকে চূর্ণ করে উৎপাদনের উৎসমুখ খুলে দেওয়া না গেলে নতুন পুঁজি সৃষ্টির জায়গা কোথায়? বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী ও গৃহীত পদক্ষেপগুলি জমিদারী শোষণের শেকড়কে আলগা করতে সাহায্য করছে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হবার পটভূমিকায় বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য তাই ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতবহ।

জমিদারী ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে উন্নত চাষের প্রচলনের অনিবার্য পরিণতিতে কৃষক আজ মরতে বসেছে। কৃষক চাষের উৎপাদনে উপকরণ সংগ্রহের বাজারদরে মার খাচ্ছে, উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ে মার খাচ্ছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিযন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণে দেশী বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি গ্রামাঞ্চলে ক্রমেই তার থাবা বিস্তার করছে। কায়েমী-স্বার্থের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষক সাধারণকে সংগঠিত করতে না পারলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ অপূর্ণ থেকে যায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন ও আংশিক হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের ওপর চাপানো বোঝা হালকা করতে সাধারণ কৃষকের জমি নিস্কর, সেচ ব্যবস্থার প্রসার ও সেচকর হ্রাস, ব্যাপক কৃষিঋণ সরবরাহ, মিনিকিট বন্টন, ভর্তুকি দিয়ে চাষের উপকরণ সরবরাহ, বার্ধক্যভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা নিয়েছেন। কৃষককে রক্ষা করতে এই আংশিক দাবিগুলির

স্বীকৃতি দিয়ে গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ ব্যাপকতর হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের মাত্র তিন বছরের কার্যক্রম কৃষকের জমি হারাবার প্রক্রিয়াকে মন্থর করতে পেরেছে। সারা দেশের কাছে এটা একটা নতুন দিক।

জন্মের প্রথম দিনটি থেকে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের মূল রণধ্বনী হল কৃষকের জমি এবং নিপীড়ন থেকে মুক্তি। মূল লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে গ্রামাঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। তীব্রতর আংশিক দাবির সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামে রূপ নিয়ে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী আন্দোলনের অপরিহার্য শক্তি হিসেবে একটা বিশেষ পর্যায়ে বামফ্রন্ট সরকারের জন্ম দিতে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত প্রশ্নে, গ্রামাঞ্চলের আশু সমস্যাগুলি সমাধান করতে, বিশেষতঃ জমিতে চাষের অধিকার ও বন্ধন নিপীড়ন থেকে কৃষক সাধারণকে মুক্তির আস্বাদ দিতে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার কতটা ভূমিকা পালন করল, সেটাই হল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চরম বিচার।

গ্রামাঞ্চলের গরিব জনগণ মাথা তুলে চলতে শুরু করেছেন। অনেক পথ বাকি। কিন্তু অগণিত গরিব মানুষ, মেহনতি কৃষক মর্যাদাবোধে সচেতন হয়ে আজ সিদ্ধান্তকারী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছেন। বামফ্রন্ট সরকারের পদক্ষেপ গ্রামের গরিব জনগণ ও কৃষক সাধারণের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ সহজতর করেছে। স্বৈরাচারী শক্তির আতঙ্কের কারণ এখানেই। বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর সফল রূপায়ন ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে।

[সম্পাদকীয় : ২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করিয়াছে, বিনা রক্তপাতে সকল মতের সকল পদের মানুষ শতকরা ৮০ ভাগ কিম্বা তারও বেশি সংখ্যক মানুষ এই সরকারের আমলে একাধিকবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাইয়া নিরপেক্ষ ও দক্ষ সরকারী প্রশাসনের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সমস্ত প্রকারের দুর্নীতি মুক্ত একটি সুষ্ঠু ও জনমুখী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার এক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া যাহারা সুবিচার হইতে বঞ্চিত থাকিয়াছেন—অপমানিত হইয়াছেন—শোষিত নিপীড়িত হইয়াছেন—তাহারা অন্ততঃ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার অবকাশ পাইয়াছেন—মাত্র তিন বৎসরে এহেন কৃতিত্বের দাবী নিশ্চিতভাবে বর্তমান রাজ্য সরকার করিতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতা, অস্পৃশ্যতা, হরিজন নিগ্রহ, ভাষাগত অসহিষ্ণুতার মত সর্বনাশা ব্যাধি হইতে এই রাজ্য বলা যাইতে পারে প্রায় মুক্ত—জনগণের সাথে সাথে রাজ্য সরকারও ইহার জন্য প্রশংসিত হইতে পারে।

গোটা উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-ভারতে বিচ্ছিন্নতা কামী শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতে সারা দেশের ঐক্যকে চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছে, আর সেই সুরে সুর মিলাইতে ঝাড়খণ্ড, উত্তরখণ্ড ও গোর্খাখণ্ডের পাণ্ডারা মাথা খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় তৎপরতার সাথে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া চক্রান্তকারীদের জনজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "খণ্ড" আন্দোলনকারীদের দুর্বুদ্ধিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া যেকোন দেশপ্রেমিক ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রশংসাধন্য হইয়াছে।

বাধা বিপত্তি অনেক, ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর সরকারের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে—সরকারকে উৎখাত করিতে। কিন্তু সহায় যাহারা জনগণের অকুণ্ঠ ভালবাসা শুধু এ রাজ্যের নয় তাবৎ ভারতের, আদর্শ যখন অভ্রান্ত, নিশানা যেখানে সঠিক, নিষ্ঠা যেখানে চালিকা শক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা ও দৃঢ়তা যেখানে হাতিয়ার, সংগ্রামী সাথী যেখানে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুব তখন সকল বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সমস্ত চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করিয়া এই সরকার তাহার লক্ষ্য পথে বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইবে—সকলের সাথে আমরাও কায়মনবাক্যে সেই আশাই করিব। জয়তু পশ্চিমবাঙলার বামজোট সরকার।

শিক্ষার পক্ষে তিনটি বছর

আর্শিস চ্যাটার্জী

আজকাল বেশী বেশী করে শিক্ষানীতিকে সমাজনীতির সাথে মিলিয়ে ভাবা হচ্ছে। এটা একটা সুলক্ষণ। কেননা অন্য অনেক ধরনের মতবাদ আছে, যা শিক্ষাকে সমাজ, তার কাঠামো, শাসন পদ্ধতি, শাসক ইত্যাদি থেকে আলাদা করে ভাবাতে চায়। এই মতামতের প্রবক্তারা সেইজন্য অনেক সময়ে বলেছেন শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সব আলাদা থাকবেন সমাজে যা কিছু হচ্ছে তার থেকে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজদর্শন ভাবতে হবে না কিছু। সে বাধা আর টিকলো না। বেঁচে থাকার ব্যবস্থাটার নড়াচড়ার সাথে সাথে ছাত্র-সমাজ, শিক্ষকমহাশয়রা নড়লেন চড়লেন, পথে নামলেন। ভাবতে লাগলেন বেশী বেশী করে এরা আর সব মানুষের সাথে—ব্যাপারখানা কি? শিক্ষিত হয়েও যেন অনেকেই শিক্ষিত নন, যে সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো বিকশিত হবার কথা ছিল শিক্ষা পেয়ে, সে অঙ্কটা আর মিলছে না। দেখা গেল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যেমনটি হওয়ার কথা ছিল তেমনটি আর নেই, ছাত্রদের পড়ার থেকে পাশের দিকে নজর বেশী, তার জন্য অনেকে সবসময় সৎ উপায়ও অবলম্বন করছেন না, অনেক শিক্ষকও ভুলে যাচ্ছেন তার সামাজিক দায়দায়িত্বের কথা। গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাটা যেন প্রচন্ড অসুস্থতায় ভুগছে, সে রোগের অনেক লক্ষণ—গণটোকাটুকি, অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস, শিক্ষণের অনুপযুক্ত মান, ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও একটা ব্যাপার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল—তা হচ্ছে গণ-অশিক্ষা। দেশের বেশীর ভাগ মানুষই নিরক্ষর। শহর বা মফঃস্বলে শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও দেশের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ যে গ্রামাঞ্চলে বাস করেন, সেখানে নিরক্ষরতা সর্বব্যাপী।

কেন এমন হল? ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসেছিল রাজত্ব করতে—তারা তাদের শাসনের স্বার্থে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সে সময়ে, আধুনিক স্কুল কলেজও গড়ে উঠল, ব্রিটেনের ধাঁচে শিক্ষিত করা হচ্ছিল কিছু মানুষকে। এসব শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন ছিল ব্রিটিশ ভারতে আমলাতন্ত্রের কাঠামো তৈরীর জন্য। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা বড় বড় প্রশাসনিক পদে আসীন হয়েছিল এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজ জমিদারের যোগ্য পারিষদ হয়েছিল।

পরাধীন ভারতেই বিপুল বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতার সমস্যা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বাংলায় বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মণীষীরা এই দাবীকে সামনে নিয়ে এলেন। দেশ স্বাধীন হবার পরে দেশের মানুষ স্বভাবতঃই আশা করেছিল শিক্ষার সমস্যাগুলি দূর হবে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে শিক্ষার সমস্যা ছিল অনেক। কিন্তু মূল সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নিরক্ষরতার সমস্যা। ১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী তখন দেশে ১৯·২৬% মানুষ স্বাক্ষর ছিল। স্বভাবতঃই ব্যাপক জনগণের কল্যাণে একটি জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োজন ছিল যা দ্রুত দেশের সমস্ত মানুষকে স্বাক্ষর করে তুলবে। কিন্তু ইতিহাস লেখা হল অন্যভাবে। স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতি যেভাবে সাজানো হ'ল তাতে উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিক রয়ে গেল জমিদার-জোতদার, কারখানার মালিক এবং সাম্রাজ্যবাদীরা। দেশীয় বাজারকে ব্যবহার করে বড় পুঁজিপতিরা শীঘ্র একচেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হলেন। এখন পুঁজিবাদের নিয়মই হলো টাকা খাটিয়ে মুনাফা করা, সেই মুনাফা পুঁজিতে যোগ করা, বেশী পুঁজি বিনিয়োগ করে বেশী উৎপাদন করা, এই উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রী করে মুনাফা করা এবং আবার তা পুঁজির সঙ্গে যোগ করা। এইভাবে উৎপাদন সীমাহীনভাবে বাড়তে থাকে কিন্তু জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে না, একসময় উৎপাদিত সামগ্রী বাজারের ধারণক্ষমতার বেশী হয়ে যায়, পুঁজিবাদ থমকে দাঁড়ায়। যতদিন উৎপাদন বাড়তে থাকে, ততদিন এবং সেই পরিমাণে প্রয়োজন হয় দক্ষ শ্রমিক, অফিসের কেরাণী, উৎপাদন-ব্যবস্থা তদারকির জন্য উচ্চশিক্ষিত লোকজন। ততদিন এবং সেই পরিমাণেই শিক্ষার প্রসার ঘটে। কিন্তু যেদিনই নূতন নূতন দক্ষ শ্রমিক ও উচ্চশিক্ষিত লোকজনের প্রয়োজন পুঁজিবাদের কাছে ফুরিয়ে যায়, সেদিন থেকেই শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনও তাদের কাছে ফুরোয়। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় এবং বেশীর ভাগ রাজ্য-সরকারগুলির ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস বা জনতা দল যা পুঁজিপতি-জমিদারদের প্রতিনিধি। এই সরকার দেশে পুঁজিবাদের বৃদ্ধির স্বার্থেই কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু যেদিন পুঁজিবাদের বাড়বার ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল, সেদিন থেকে প্রচলিত ব্যবস্থাটাকেও সংকুচিত করার চেষ্টা শুরু হল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে ক্রমাগতঃ শিক্ষাখাতে কমানো হয়েছে; যেমন প্রথম পরিকল্পনায়—মোট বরাদ্দের ৪·৯% শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়েছে, পঞ্চম পরিকল্পনায় এ হিসেব ১·৩%। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল ইচ্ছা করলেই প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকে যেমন ইচ্ছে সংকুচিত করতে পুঁজিপতিরা বা তাদের সরকার পারে না, কেননা জনগণ শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করে, শিক্ষা-সংকোচনের যেকোন পদক্ষেপকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের চাকরীর ব্যবস্থা হ'ল না, শিক্ষিত বেকারের মিছিল দিন দিন লম্বা হয়েই চলেছে। যাই হোক, স্বাধীনতার পর প্রায় ২০% স্বাক্ষরতাকে ৩০% এর বেশী বাড়ানো হল না এবং আজও দেশের প্রায় ৭০% মানুষ নিরক্ষর। আবার যে শিক্ষার কাঠামোটা ছিল, তাও সকলের জন্য সমান নয়। আমাদের সমাজে শিক্ষা কিনতে হয়। যে বেশী দাম দিতে পারবে তার জন্য বেশী চকচকে শিক্ষার ব্যবস্থা, চাকরী-বাকরীতে তারই সুযোগ বেশী। খুব অল্পসংখ্যক স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা পাবলিক স্কুল বা ঐ জাতীয় কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়বে, আর বাকীরা যে কোন স্কুলে যেমন তেমন পড়ে পাশ করবে।

এরকম পটভূমিকায় ১৯৭৭ সালের জুন মাসে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু কংগ্রেস সরকারগুলি থেকে মৌলিকভাবেই আলাদা। শোষিত নিপীড়িত অসংখ্য শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত এবং তাদের ঘরের সন্তান ছাত্র-যুবকের প্রতিনিধিত্ব করে এই সরকার। কিন্তু মজাটা হলো এই যে বামফ্রন্ট সরকারকে বর্তমান পুঁজিপতি-জমিদার রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই কাজ চালাতে হচ্ছে। তাই কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন এই সরকারের ক্ষমতার বাইরে। তার উপরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সিংহভাগটাই কেন্দ্রের হাতে, রাজ্যের হাতে রয়েছে ছিটেফোটা। এই সীমাবদ্ধতাকে গণনার মধ্যে রেখেই বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম দেখতে হবে।

বেশীরভাগ নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি বাম সরকারের কাছে প্রথম কর্তব্য অবশ্যই ছিল শিক্ষার বিস্তার। এখন, গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষকদের এবং শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশের আয় এত কম যে বেতন দিয়ে তাদের ঘরের সন্তানদের পড়ানো অসম্ভব। তাই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শিক্ষাকে অবৈতনিক করা প্রয়োজন। সরকার ধাপে ধাপে দশম শ্রেণী অবধি শিক্ষা অবৈতনিক করলেন এবং আগামী ১৯৮১ সাল থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনা চালানোর ব্যবস্থা করলেন। নিঃসন্দেহে এ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। যা পশ্চিমবাংলার মানুষ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে পায়নি মাত্র তিন বছরে বামফ্রন্ট সরকার তাই করলেন। শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে কাজ হাতে নিলেন, এবং ৩,৪০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১০,২০০ প্রাথমিক শিক্ষকের পদ অনুমোদিত হল। ৩৪১টি নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩,৫০০ শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে জুনিয়ার হাই স্কুল, মাদ্রাসা ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য। আবার গ্রামাঞ্চলে বা দরিদ্র শ্রমিক বস্তিতে শুধু বিনা বেতনে পড়তে দেওয়াই যথেষ্ট হয় না। যে বালককে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার কথা, সে তার বাবার সাথে মাঠে গিয়ে চাষের কাজে সাহায্য করলে বা শহরাঞ্চলে মোটর গ্যারেজ বা চায়ের দোকানে কাজ করলে তার নিজের খাদ্যটুকু হয়তো সংগ্রহ করতে পারে। তাই সেই বালকটিকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে হলে দুপুরে কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করতে হয় তার জন্য। বাম সরকার কলকাতায় ২,৫০,০০০, কলকাতা ছাড়া শহরাঞ্চলে ৫,০০,০০০ এবং গ্রামাঞ্চলে ২৬,২১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুকে "শিশুপুষ্টি" প্রকল্পের আওতায় এনে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এইসব ব্যবস্থার ফলে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বিরাট অঙ্কে বেড়েছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে ৮৪% ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিল এবং ৭৯-৮০ সালে তা বেড়ে ৮৬% হয়। ১৯৭৭-৭৯ সালের মধ্যে ৪,৮৯,৫৭১ জন বেশী ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নথিভুক্ত হয়েছে। ৭৯-৮০ সালে এই বৃদ্ধির হিসেব ধরা হয়েছে ২,০০,০০০ জন। সকল তফশিলী জাতি ও আদিবাসী ছাত্রীদের স্কুলের পোশাক বিতরণ করা হচ্ছে। সাধারণ ছাত্রীদের ৪০% কে এই পোশাক দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। নিয়মিত উপস্থিতির জন্য সকল তফশিলী জাতি ও আদিবাসী ছাত্রীদের এবং অন্যান্য ছাত্রীদের ২০% কে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে এছাড়া প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে স্লেট, পেনসিল ও খাতা দিচ্ছেন বামফ্রন্ট সরকার। এসবের সাথে আছে ব্যাপক বয়স্ক-শিক্ষার প্রকল্প। সব মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকার নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক অভিযানে নেমেছেন।

এখন, শিক্ষাকে শুধু অবৈতনিক করলেই ত' চলবে না, একটি শিশু বা কিশোর যাতে তা গ্রহণ করতে পারে তার দিকেও নজর দেওয়া চাই। এর জন্য প্রথমেই যা করা প্রয়োজন ছিল, তা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে—শুধুমাত্র মাতৃভাষা পড়ানো, সিলেবাসকে নূতন করে সাজিয়ে—এই বয়সের ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী করে তোলা ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজে বামফ্রন্ট সরকার বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

স্বভাবতঃই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পরে আসে উচ্চ-শিক্ষার কথা। উচ্চশিক্ষা বলতে বোঝাব স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের কথা। এসমস্ত স্তরে শিক্ষার সমস্যা একটু ভিন্ন প্রকৃতির ও জটিল। কিন্তু তারও মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রথমেই শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের দায়িত্ব নিলেন। অতীতের অবস্থাটা নিশ্চয় আমাদের সকলের জানা। মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রীর দেয় বেতন ও কিছু সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হোতো শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের। ফলে প্রতি মাসে বেতন তো' জুটতোই না, দু-তিন মাস অন্তর কিছু টাকা হয়তো পাওয়া যেত। বাম সরকারের 'পে-প্যাকেট' এই সমস্যার সমাধান করেছে। এছাড়া নূতন নূতন কলেজ তৈরী করা, মেদিনীপুরে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি উচ্চ-শিক্ষার জগতে যুগান্তকারী।

আমরা বলেছি উচ্চ-শিক্ষার সমস্যাটা জটিল, যেমন, একটি ছাত্র স্নাতক স্তরে কোন কোন বিষয় নিয়ে পড়বে, তা ঠিক করায় ছাত্র-ছাত্রীকে আরও অধিকার দেওয়া। এসব আগে ছিল না। তখন যে কলা বা বাণিজ্য বিভাগে পড়ত, তাকে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরাজী ও বাংলা পড়তে হোত। আবার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী কখনোই ভাষা-সাহিত্যকে পাঠক্রমে রাখতে পারতনা। নূতন নিয়মে সমস্ত বিষয়গুলোকে কয়েকটি শৃঙ্খলায় (Discipline) ভাগ করা হয়েছে। যেমন কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এখন, যে ছাত্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে সে বিজ্ঞানের দুটি বিষয়ের সাথে অন্য যে কোন শৃঙ্খলার একটি বিষয় নিতে পারবে। যেমন, কোন ছাত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইতিহাস নিয়ে পড়তে পারবে। সে যদি দুটি কলার বিষয়, যথা ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা এবং একটি বিজ্ঞানের বিষয় যথা অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে পড়তে চায়, তাও পারবে, শুধু সে তখন কলাবিভাগের ছাত্র হবে। ভাষা-সাহিত্য পড়বার ক্ষেত্রেও এরকম। অর্থাৎ একজন ছাত্র-ছাত্রী নিজের খুশীমত বিষয় নিতে পারবে।

এরই সঙ্গে চলে আসে স্নাতক স্তর ক-বছরের হবে। পুরানো ব্যবস্থায় পাস ও অনার্স সব স্নাতকস্তরের ছাত্রকেই তিন বছর পড়তে হোত। এখন যারা পাস পড়বে, তাদের দু বছর আবার যারা অনার্স পড়বে তাদের তিন বছর। যারা পাস নিয়ে ভর্তি হবে তারাও যে বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাবে সেই বিষয়ে এক বছর পড়তে পারবে সাম্মানিক স্নাতক হবার জন্য। অন্যরা দু-বছর পরেই স্নাতক হবে। এইসব ব্যবস্থা উচ্চ-শিক্ষাকে আরও উপযোগী ও বৈজ্ঞানিক করেছে।

আমরা এ কথা বলে শুরু করেছিলাম যে গোটা শিক্ষা

[শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায়]

সুস্থ সংস্কৃতি ও বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

মানুষের সবচেয়ে বড় সাধনা হল আপন স্বদেশকে শোষণ-মুক্ত ও মহীয়ান করে তোলা। দুনিয়ার ইতিহাসে মানুষই যেদিন থেকে মানুষকে শোষণ করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে তাকে আর সূক্ষ্ম বিচারে সভ্যতার ইতিহাস বলা যায় না। প্রায়শই মনে হতে থাকে—এ কেমন সভ্যতা, যেখানে মানুষ মানুষকে মনে করে পণ্য, তার রক্ত, শ্রম, ঘাম শোষণ করে বেঁচে থাকে। একাজটা কি ধরনের সভ্যতা?

শোষণহীন এমন ঈপ্সিত জন্মভূমি গড়ে তোলবার প্রাথমিক শর্ত হল একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ দর্শন, তার ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক কর্মসূচী ও কর্মনীতি এবং তাকে রূপায়িত করার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সংগঠন। শ্রেণী দ্বন্দ্বের পূর্ণ অবসান ঘটানো তার চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং তা করার জন্য শোষক আর শোষিতে বিভক্ত বর্তমান সমাজটা বদলে অন্য এক সমাজে উত্তরিত হওয়ার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালানো তার কাজ। আপনা থেকে বা সংগ্রাম না করে এ কাজ করা অসম্ভব। সমাজ বদলের এই সংগ্রামের ধারণাটা বহু ব্যাপ্ত এবং ব্যাপক। শ্রমজীবী মানুষের নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রাম এই লড়াই-এর মূল শক্তি, কিন্তু তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের অতৃপ্তিজনিত ক্ষোভ, ব্যথা, বেদনা। শেষ পর্যন্ত বঞ্চনার এই সুবিশাল স্তূপ ক্রোধে ফেটে পড়ে, প্রধান সংগ্রামের ধারার সঙ্গে মিশে যায়।

সংগ্রামের হাতিয়ার সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হল এই সংগ্রামের উপাদানগুলিকে পুষ্ট করে তোলার এক অনিবার্য ও তাৎপর্যময় হাতিয়ার। পুঁজিবাদী সমাজে ধনিক শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর তাদের মালিকানা অক্ষুন্ন রাখার জন্য এবং উৎপাদন সম্পর্কটিকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য যে কোন ধরনের ছল, বল বা কৌশল প্রয়োগ করে। শ্রেণী স্বার্থের কারণেই তারা সর্বপ্রকার ন্যায় অন্যায় বোধকে বিসর্জন দেয়। পুঁজিবাদী সমাজ সমস্ত কিছুকেই পণ্যে পরিণত করে এবং সেই পণ্যের চাহিদা, চরিত্র ও বাজার পরিপূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সংস্কৃতিও তাই পুঁজিবাদী সভ্যতায় তাদের চোখে একটি পণ্য ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের উপযোগী একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য তারা প্রয়োজনীয় ভাড়াটে ও ক্রীতদাস বুদ্ধিজীবী নিযুক্ত করে। এরাই তাদের হয়ে সমগ্র সামাজিক আবহাওয়াটি কলুষিত করার কাজটি সম্পন্ন করে। স্বভাবতই সাংস্কৃতিক ফসল নির্মাণের সময় মূলতঃ এরা যেটা দেখে তা হল—কোন্ ধরনের সাংস্কৃতিক পণ্য বাজারে বিকোবে বেশী। মানুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এরা কলম ধরে না। এমনকি মানুষের চাহিদাটাও যাতে বিকৃত হয়ে ওঠে সে ব্যাপারেও এরা সচেতন। প্রশ্ন উঠলে জবাব আসে—মানুষ চাইছে, তাই আমরা এসব সৃষ্টি করছি। সত্যটা গোপন করে যায়।

প্রতিক্রিয়ার ফাঁদ

সমাজ বদলের লড়াই-এর জন্য ক্ষুধার্ত, ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ মানুষই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সচেতন ও মানসিকভাবে বিকাশ-প্রাপ্ত মানুষ। এটা জানে বলেই তারা সমাজে এমন একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চায়, যাতে বঞ্চিত মানুষ সচেতন ও মানসিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত না হয়ে উঠতে পারে। সমাজের সার্বিক অগ্রগতি এবং বিকাশ ঠেকিয়ে রেখে প্রাণপণে তারা স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতে চায়। নানা মিথ্যার আড়ালে শোষণের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে চায় বা তাকে আড়াল করে রাখে এবং এই সব কাজ করতে গিয়ে তারা যে সংস্কৃতির প্রচার ও গুণগান করে তাকেই আমরা অপসংস্কৃতি নাম দিয়েছি। এর বাইরের দিকে কিছু চাকচিক্য থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ জিনিস অন্তঃসারশূন্য। এতে চোখ হয়ত ধাঁধে, কিন্তু মন ভরে না।

সংস্কৃতি কি

সংস্কৃতি হল সামগ্রিক জীবনচর্চা। মানুষকে সুস্থ, প্রাণবন্ত ও শুভবোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ করা তার কাজ। অপসংস্কৃতি বলতে আমরা তাকেই বুঝছি যার পরিমণ্ডলে এবং আবহাওয়ায় গোটা জাতির মানসিক স্বাস্থ্য পীড়িত ও অসুস্থ হয়ে যায়। সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবাংলায় সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি নিয়ে অজস্র সভাসমিতি, সেমিনার বা লেখা হচ্ছে। অসংখ্য মানুষ শুনতে আসছেন এই সব অনুষ্ঠান। আলোচনা হচ্ছে। পক্ষে বিপক্ষে নানা মত বেরিয়ে আসছে। এই লক্ষণটা সমাজে সজীবতার লক্ষণ। কিন্তু বর্তমান সময়ে এমন ঘটছে বলেই একথা কেউ যেন মনে না করি যে শোষকদের এই প্রয়াস ও তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আগে কখনও হয়নি। সভ্যতার ইতিহাস আমাদের স্পষ্টই দেখিয়ে দেয় যে শাসকশ্রেণীর অনুসৃত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিগুলির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সংকট একটা তীব্র মাত্রায় পৌঁছলেই এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিলেই তারা অপসংস্কৃতির বেনো জলে মানুষের মনকে ভাসিয়ে দিতে মরিয়া চেষ্টা চালায়, সমগ্র প্রজন্মকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিতে চায়। জীবনের শত্রু মিত্র অভিজ্ঞতায় চিনে নিয়ে আপন দুঃখ কষ্ট নিরসনের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠার আগেই মানুষকে তাৎক্ষণিক মোহগ্রস্ততায় মাতিয়ে দিয়ে জীবনের প্রকৃত পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

দুটি সংজ্ঞা

সংস্কৃতি কি? আগেই বলেছি মানুষের গোটা জীবনচর্চাই হল সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। একজন মানুষ কি ভাবে, কেমনভাবে কথা বলে, তার কাজ, ভঙ্গী, সারাদিনের মেলামেশা, চিন্তার প্রক্রিয়া, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী, এক কথায় তার সমগ্র জীবনচর্চাই হল তার সাংস্কৃতিকবোধের পরিচায়ক। অপসংস্কৃতি বলতেও তেমনি আমরা শুধু যৌনতা, অশ্লীলতা, বা নিছক নোংরামি বুঝব না। এর মূল আরো গভীরে। এবং এই দুইয়েরই শিকড় সমাজ-অর্থনীতিক কাঠামোর অভ্যন্তরে।

রোগলক্ষণ ও রোগ

মানুষের শরীরে একটা ব্যাধির প্রকাশ তার লক্ষণগুলির মাধ্যমে। লক্ষণগুলো ব্যাধি নয়। ডাক্তাররা লক্ষণগুলো সারান না, রোগলক্ষণ বুঝে তাঁরা সেগুলির কারণ স্বরূপ ব্যাধিটির চিকিৎসা করেন। আজকের দিনে যাঁরা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, তাঁদের তাই বুঝতে হবে, যৌনবিকার বা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী, রিরংসা বা হীনমন্যতা শুধু এগুলিই অপসংস্কৃতি নয়। এরা সেই মূল ব্যাধির নানাবিধ প্রকাশ মাত্র।

শিল্প ভাবনার উৎস

মানুষের সমাজে প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে—সভ্যতার অগ্রগতির ধাপে ধাপে কখনও প্রকৃতির সঙ্গে, কখনও বা অন্যশ্রেণীভুক্ত মানুষের সঙ্গে মানুষ যে অসংখ্য সংগ্রাম করছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে এগিয়ে যাচ্ছে যে ইতিহাস—এই সব ঘটনাই হল মস্তিষ্ক নামক যন্ত্রের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, এসব থেকে রসদ সংগ্রহ করেই তাই শিল্পী বা বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্ক নতুন নতুন শিল্পচিন্তা, তত্ত্বের, ভাবনার জন্ম দেয়। মানব সমাজ ও সভ্যতা প্রায় গোড়া থেকেই যেহেতু দুটি মূল ভাগে বিভক্ত, মোটা দাগে এই দুভাগ হল শোষক ও শোষিত—তাদের সমস্ত কার্যকলাপ যেহেতু পরস্পর বিরোধী ধরনের, ইতিহাসে যেহেতু একই সঙ্গে চিন্তার ও জীবনযাত্রার দুটি পরস্পর বিরোধী ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, মস্তিষ্ক তাই প্রায় শুরু থেকেই ভাবনার ক্ষেত্রে দুধরনের সামাজিক রসদ পেয়ে এসেছে। এক ধরনের শক্তি পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে সক্রিয়, যার স্বরূপ হল যেমন করে পারি আমার ব্যক্তি বা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য আমি অপরকে শোষণ করব, অন্যরা যাতে তাদের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে তার জন্য গড়ে তুলব সব রকমের দমন পীড়নের ব্যবস্থা। এই কাজের যারা নেতা, তারা হল জমিদার, মালিক, পুঁজিপতি ও তাদের দালালরা। তাদের কার্যকলাপের এক ধারাবাহিক প্রবাহ চলছে আদি যুগ থেকে—এই সব কাজের সমর্থনে। এই সব কাজকে মহিমান্বিত করে দেখাতে একদল স্বার্থান্বেষী, অর্থলোভী, আদর্শচ্যুত মস্তিষ্কজীবী সদাব্যাপৃত। অন্যদিকে রয়েছে অগণিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই—প্রথম দলের আঘাত প্রত্যাহৃত করতে মরণপণ প্রতিজ্ঞা। এদিকে রয়েছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, অন্যান্য মেহনতী মানুষ এবং তাদের দরদী বুদ্ধিজীবীরা। দুধরনের জীবনযাত্রা, দুধরনের চিন্তা-প্রবণতা—অন্তহীনকাল ধরে মস্তিষ্কের কাছে তাই দুধরনের কাঁচামাল সরবরাহ হচ্ছে। দুটি পরস্পরবিরোধী ধরনের চিন্তা-ভাবনা শিল্প ও তত্ত্বের জন্ম হওয়া তাই স্বাভাবিক। প্রথম দলের শিল্প প্রচেষ্টাটা শেষ বিচারে হল অসংখ্য মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা, মানুষের অধিকার ও মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্টা। শোষণ, দমন ও পীড়নের জন্য শিল্প, সত্যের সূর্যকে ঢেকে দেবার জন্য শিল্প, শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে বিভ্রান্ত করার শিল্প,—যে কেউ বুঝতে পারবেন এমন ধরনের প্রচেষ্টা শুভ হয়ে উঠতে পারে না। এই যে অশুভ প্রয়াস, সংস্কৃতির নাম করে এই যে কাণ্ডকারখানা, এটার জন্য ব্যাকরণসিদ্ধ একটি শব্দের অস্তিত্ব যদি না থাকে, আমরা এটাকে "অপসংস্কৃতি" বলছি, বলবো এবং সমাজের মাটি থেকে শিকড়শুদ্ধ একে উপড়ে ফেলার চেষ্টা চালাবো।

বামফ্রন্টের সীমাবদ্ধতা

পশ্চিমবাংলায় এবং ভারতবর্ষের অন্য কয়েকটি রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের একটি বিশেষ স্তরে বামফ্রন্ট সরকারগুলির ক্ষমতালাভ আমাদের সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। বামফ্রন্ট সরকারগুলি সম্পর্কে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক কথাটি হল এই যে, সমাজ বদল করে মানুষের জীবনে যে মৌলিক পরিবর্তন আনার কথা আমরা উল্লেখ করেছি সেই কাজটা এই সরকার সমাধা করতে পারেন না। কিন্তু সেই মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার ক্ষেত্রে এই সরকারকে একটি বিশিষ্ট ধাপ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেভাবে তাকে ব্যবহার করাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে ৩৬ দফা কর্মসূচীর উল্লেখ করেছিলেন। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে মৌলিক কোন পরিবর্তন তাঁরা হয়ত করতে পারবেন না—কিন্তু এর মধ্যেও, সদিচ্ছা থাকলে, একটা দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হলে মানুষের দুঃখদুর্দশার যে কিছুটা লাঘব করা যায়, সেই কথা স্মরণে রেখেই ঐ কর্মসূচী। মানুষের জীবনকে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে যদি নাও পারি, কেন তা বিকশিত হয়ে উঠছে না, তার উন্নয়নের পথে বাধা কি, এটুকু অন্তত যদি স্পষ্ট করে খুলে বলতে পারি, এবং মানুষকে তার নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলার আহ্বান জানাতে পারি, সেটাও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ কথা।

কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত

গোটা ভারতে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট যখন ঘনীভূত, ঠিক যখন প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা সাংস্কৃতিক জগতে এক অসুস্থ নৈতিবাদী পরিমণ্ডল তৈরী করতে কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে, তখনই পশ্চিমবঙ্গ ও আর কয়েকটি রাজ্যে দ্বান্দ্বিক কারণেই বামফ্রন্ট সরকারগুলির আবির্ভাব। ওরা অবিরাম চেষ্টা চালাবে এক জীবনবিমুখ ভোগলালসা-রিরংসাময় বিকৃত সংস্কৃতির স্রোত বইয়ে দেবার। এই সব নৈতিবাদী বিষয়গুলিকে মানুষের মনের কাছে গ্রাহ্য করে তোলার জন্য তারা খুঁজে খুঁজে নিযুক্ত করবে আদর্শহীন একদল বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও শিল্পী। দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের চরিত্র, মত, দৃষ্টিভঙ্গী ও গোটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সুবিধামত গড়ে তোলবার

চেষ্টা করবে তারাই—সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক, গান, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে।

সর্বজনীন দায়িত্ব

সূক্ষ্ম বিচারে শুধু এই নোংরা নাটক, গান, সিনেমা বা সাহিত্যই অপসংস্কৃতি নয়, তার মূল অনেক গভীরে। তার বিরুদ্ধে লড়াই দীর্ঘকালীন কঠিন লড়াই, একথা আমরা আগেই বলেছি। তবু যেহেতু ব্যাপক অর্থে জনগণের এই চিত্ত বিনোদন ও বিকাশের ক্ষেত্রটিকে ঘিরেই ঘনায়মান সংকট, তাই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইতে এগুলির বিরুদ্ধে পাল্টা সৃষ্টির ও দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অসীম। তাত্ত্বিক বিতর্ক চালাতে হবে. প্রতিবাদী জনমত গঠন করতে হবে। সমাজ বদলের সংগ্রামে যথাযথ সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করতে হবে—কিন্তু সাথে সাথে পাল্টা সৃষ্টিতে মাতিয়ে দিতে হবে গ্রাম শহর, ক্ষেতকারখানা। পাল্টা সৃষ্টির বাস্তব অবস্থা ও সুযোগ তৈরী করতে হবে, এটাও কম কথা নয়। যেহেতু সামগ্রিক সংগ্রামেরই এটা একটা অংশ তাই সর্বস্তরের সংগ্রামী মানুষকেই এবিষয়ে সচেতন হতে হবে। নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে হবে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র. যুবক বা মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা তাঁদের নিজেদের দাবী-দাওয়া নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন, আংশিকভাবে দাবী আদায়ও করতে পারেন, তার মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর লড়াইতে সামিল হবার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। এগুলি শাসকরা কোনভাবেই রুদ্ধ করে দিতে পারে না। চেষ্টা করলেও, অত্যাচার নিপীড়ন চালালেও তাকে অতিক্রম করতে হয়—কারণ নান্য পন্থা। কিন্তু সংস্কৃতির জায়গাটা ফাঁক থেকে গেলে বিপদ। এইখানে ওরা যখন সতর্ক জাল ফেলে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি বলে দিই, ওটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, বা ওটা আমাদের বোঝার ব্যাপার নয়, তাহলে বিপদের আশঙ্কা। শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন কৃষক সমস্যা বুঝতে হবে, কৃষককে বুঝতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি, ছাত্র যুব বা মধ্যবিত্তকেও যেমন বুঝে নিতে হবে শ্রমিক কৃষকের সমস্যা, রাজনীতি ও মুক্তির পথ, তেমনি সবাইকেই বুঝতে হবে সংস্কৃতির সংকট, বিপদ ও তার প্রতিরোধের কথা। এ কাজটি ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখলে চলবে না, শুরু করতে হবে এখন থেকেই। শত্রুরা জানে সচেতন মানুষকে এই বিষ দিয়ে পঙ্গু করা যাবে না, তাই মুখ্যত তাদের লক্ষ্য হল অসচেতন মানুষ ও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীরা। জীবনের সঠিক পথ চিনে, আন্দোলনে সামিল হবার আগেই যদি ব্যাপক মানুষকে চিন্তার ক্ষেত্রে পঙ্গু করে তোলা যায় তাতে ভবিষ্যতের লড়াইতে এ পক্ষের সৈনিক কমে যাবে এই পরিকল্পনায় তারা ফাঁদ পাতে। সতর্কভাবে আমাদের তা এড়াতে হবে।

দায়িত্বশীল সরকারের ঘোষণা

এবং পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার সক্রিয়ভাবে সেই উদ্যোগ নিয়েছেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানুষের জন্য তাঁরা ইতিমধ্যেই বিরাট কিছু করেছেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটা প্রকাশিত হয়েছে। তিন বছরের কার্যকলাপে মানুষ তা ক্রমে উপলব্ধি করছেন। সরকার গঠন করার অব্যবহিত পরেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ঘোষণা করেছিলেন। এবং এমন ঘটনা ভারতবর্ষে তেত্রিশ বছরে এই প্রথম। তিনি বলেছিলেন, আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। বলেছিলেন, "কোন দায়িত্বশীল সরকার সাংস্কৃতিক জগতের এই বিষাক্ত আবহাওয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না।" বুদ্ধির বিচারে এটা লজ্জার, যে এই প্রশ্নও উঠেছিল, মুখ্যমন্ত্রী কি সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রের মানুষ? না—মুখ্যমন্ত্রী জীবনের সপক্ষের মানুষ। সংস্কৃতি চর্চা মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, জীবনকে বিকশিত করে তোলাই তার কাজ—তাই মানুষের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী ঐ আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সংস্কৃতির নামে যাঁরা জীবনের অগ্রগতিকেই রুদ্ধ করে দিতে চাইছেন তাঁরাই মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানকে অনধিকার চর্চা বলে বালকোচিত সমালোচনা করছেন।

প্রাক পরিস্থিতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা

তিন বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। তবু একটা সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হওয়ার পক্ষে সময়টা কমও নয়। এ রাজ্যে এই সরকার গঠনের সময়ে সমগ্র রাজ্যের পরিস্থিতি কেমন ছিল তা কেউই বিস্মৃত হন নি। সেই থমথমে অবস্থা কাটিয়ে একটা সুস্থ, ভয়হীন, গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা এই সরকারের প্রথম সাফল্য। শিক্ষার বিস্তার সংস্কৃতি চর্চার ও সুস্থ সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ৭৭ সালের আগে প্রায় সাত আট বছর ধরে এই রাজ্যে শিক্ষা বিষয়ক প্রতিটি দিক নিদারুণভাবে অবহেলিত ও আক্রান্ত হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে অবাধ টোকাটুকি করা এক শ্রেণীর ছাত্র নিজেদের অধিকার বলে ভাবতে শুরু করেছিল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যে আমাদের ঐতিহ্যময় শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে একটা থমথমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছিল। তাকে কাটিয়ে তুলে এখন সেখানে পড়াশোনার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনা এবং সময়মত পরীক্ষা নিয়ে, তার ফল প্রকাশে এই সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। সিলেবাসগুলি পরীক্ষামূলকভাবে বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে পরিবর্তন করা হচ্ছে, শিক্ষার আলো বহুতর মানুষের মধ্যে পেঁৗছে দেবার জন্য এঁরা নানা ব্যবস্থা নিচ্ছেন, গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। সেগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষককে নিয়োগ করা যাচ্ছে। এঁরা স্কুল পর্যায়ের সমস্ত ক্লাসগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সমস্ত খরচ চালানোর দায়িত্ব নিচ্ছেন। বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রও এঁদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। শিক্ষার প্রসারের জন্য এই রাজ্যে এত ব্যাপক ব্যবস্থা এর আগে অন্য কোন সরকার করেন নি।

মাতৃভাষা ও সংখ্যালঘুদের সম্মান

রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, সহজ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা আর সেই সঙ্গে শিক্ষার প্রসারের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা—এগুলি বামফ্রন্ট সরকারের সুস্থ সংস্কৃতি প্রসারের জন্য তাঁদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর

প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দিক। রাজ্যসরকার যুগপৎ অন্ততঃ ৬টি ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন। সেগুলির সাফল্য অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে গেছে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবনা ও কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ এতে থাকছে। সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু মূল্যবান সৃজনমূলক রচনা। প্রথিতযশা বহু লেখক এই সব কাগজে লিখছেন। বিগত সরকারের আমলেও পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতে দেখেছি —তখন এই কাগজ কেউ নিয়মিত আগ্রহ নিয়ে পড়তেন বলে শুনিনি। এর প্রচার সংখ্যা ছিল খুব বেশী হলে হাজার তিনেক। বর্তমান সরকারের প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা প্রায় লক্ষের ঘরে পেঁাছতে যাচ্ছে। সরকারী কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে তাঁরা বাংলা ভাষাকে পুরোপুরি চালু করেছেন। এই রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, চিন্তা করেন—তাঁরা যদি কাজ করার জন্য এমন একটি ভাষা ব্যবহার করেন, যার আশ্রয়ে তাঁরা বেড়ে ওঠেন নি, তাহলে কাজের গতি ও পারিপাট্য কমে যায়। অন্য ভাষাগুলি তা বলে অবহেলিত হয়নি। বরঞ্চ প্রতিটি আঞ্চলিক উপভাষা ও অন্যান্য ভাষাকে যথোচিত মর্যাদা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অলচিকি ও নেপালীভাষাকে এ'রা সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রতিও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। নেপালী শিল্প আঙ্গিক ও সাহিত্যকে উৎসাহদানের জন্য একটি নেপালী একাডেমী স্থাপন বামফ্রন্ট সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিগুলি বিকশিত হয়ে না উঠলে, গোটা রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। সেদিকে নজর রেখেই তাঁরা এই সব পদক্ষেপ নিয়েছেন। একটি রাজ্যে একটি বিশেষ ভাষাভাষী মানুষ সংখ্যায় বেশী বলে সেই মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকেই একমাত্র বলে চালাতে হবে, বুদ্ধির এমন মারাত্মক বিকার আমরা কোথাও কোথাও দেখতে পাচ্ছি—সংখ্যালঘুর ভাষাকে প্রয়োজনীয় ও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন সেইসব দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ।

আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা নয়

সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে এই সরকার নানাবিধ কর্মসূচী নিয়েছেন। নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা বা সাহিত্য কোনটিতেই তাঁরা অবহেলা করছেন না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করবে তা হল ঔপনিবেশিক আমল থেকেই এখানে প্রচলিত আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীলতার অভ্যাসবর্জন। এই সমাজ ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র গতিশীলতার বিরোধী। তাঁরা যে পালটাতে পারেন না, এমন নয়, কিন্তু দীর্ঘকালের গতানুগতিক চরিত্র বজায় রেখে চলতেই তাঁরা অভ্যস্ত। বামফ্রন্ট গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে সেখানে গ্রামোন্নয়নের কাজটি আমলাতন্ত্রের হাত এড়িয়ে সরাসরি গ্রামের মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় Municipal Act চালু হতে যাচ্ছে, কর্পরেশনের কাজকর্মের বিবিধ পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের ওপর নির্ভরশীলতা তাতেও অনেকটা হ্রাস পাবে। সংস্কৃতি দপ্তরের কাজকর্মেও এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়েছে। শিল্পচর্চার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিকল্পনাগুলি এখন আর সরকারী অফিসারদের মর্জিমাফিক হচ্ছে না—কি করা হবে সেটা ঠিক করছেন বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ শিল্পী এবং বোদ্ধা মানুষেরা। সরকার এ'দের নিয়ে অনেকগুলি কমিটি করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী সাংস্কৃতিক কাজকর্মে নিঃসন্দেহে নতুন প্রাণাবেগ সৃষ্টি করবে। অপসংস্কৃতির বিষাক্ত প্রভাবকে প্রতিরোধ করার জন্য পশ্চিমবাংলার গ্রামে শহরে প্রগতিশীল চিন্তার লেখকশিল্পীরা বিগত কয়েক বছর ধরে নানা আন্দোলন ও সৃজনমূলক প্রয়াস চালাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে তা প্রভূত সাড়া এনেছে। "অপসংস্কৃতি কাকে বলে—কেন তা খারাপ—কেমন করে তা রোখা যাবে", শুধু এবিষয়ে আলোচনা শোনার জন্য গ্রামে শহরে নানা সভাসমিতি হচ্ছে এবং তা শুনতে আসছেন অসংখ্য মানুষ। এই রকম সমস্ত প্রয়াসকে আন্তরিক মদত দিচ্ছেন বামফ্রন্ট সরকার। কোথাও বা সৎ সংস্কৃতির প্রয়াসে আর্থিক সাহায্যও দিচ্ছেন। আমাদের রাজ্যে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সরকারী আনুকূল্যে এ রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের আমলে আমরা বহুবিধ অন্যায় ও নৈতিবাদী কাজ হতে দেখেছি। বহু সময়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তি সম্পর্কে শোনা গেছে বহু নোংরা অভিযোগ। লম্পট, গুণ্ডা বা সমাজবিরোধীরা প্রকাশ্য মদত পেয়েছে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের কাছে। স্বাধীনতা-উত্তর তিরিশ বছরে সবার মধ্যে একটা ধারণা তিলে তিলে তৈরী হয়েছে, যে অসৎ পথ অবলম্বন না করলে, ঘুষ না দিলে, ব্যক্তিস্বার্থে নিজেকে ব্যবহৃত হতে না দিলে এদেশে প্রায় কোথাও কোন কাজ হবার নয়। জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে এমন ধারণা জাতির মধ্যেই তৈরী হলে ভয়ানক বিপদের কথা।

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র হল শিল্প সংস্কৃতির জগতে সবচেয়ে জনচিত্তজয়ী ও ব্যাপকতম মাধ্যম। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, যে এই শিল্পের মালিকেরা প্রচুর পরিমাণ টাকা ঢেলে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে নিজেদের মুনাফা অর্জনের চেয়ে মানুষের চরিত্রগঠন ও জীবনমুখী হয়ে ওঠাকে বড় করে দেখবেন না। সমাজে সংকট যত বাড়বে, সেই সংকট সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা হবে, মানুষ সেই ভার বহন করতে চাইবে না—অত্যাচার, নিপীড়ন হবে এবং তা প্রতিরোধও হবে। একই সঙ্গে চেষ্টা হবে এই সব সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সংকটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার। স্বভাবতই এই জনপ্রিয়তম মাধ্যমটিকে সে কাজে ব্যবহার করা হবে। এমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হবে যার মধ্যে জীবনের প্রকৃত সমস্যা বা তা থেকে উত্তরণের পথের কোন হদিশ নেই। বদলে কিছু ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা, তাৎক্ষণিক মোহগ্রস্ততা, উদ্ভট কল্পনামিশ্রিত রোমান্টিক ভাবালুতা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই সব চলচ্চিত্র। বহু গবেষণায় এসব তৈরী করে মানুষের মনের ক্ষিধে মেটানো হবে, তাকে অভ্যাস করানো হবে এই বিষ পান করতে এবং বলা হবে মানুষ চাইছে বলেই এসব তৈরী হচ্ছে। অথচ জীবনের প্রসারিত অন্য দিক পড়ে আছে। সেই জীবনের ছবি সম্পর্কে এরা চোখ বুজে থাকবে। বামফ্রন্ট সরকার এক ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধ থেকে এগিয়ে এসেছেন এই অন্য জীবন, অন্য ছবির শিল্পায়নের সাহায্যে। তাঁদের ক্ষমতা কম। একচেটিয়া বাজারে অনুপ্রবেশ করা কঠিন, তবু তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রতি বছর অন্ততঃ

২০টি দলিল চিত্র তুলবেন—পশ্চিমবাংলার শহরে গ্রামে মানুষের অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াই কিভাবে চলছে, দেশগঠনে নতুন উদ্যমে গ্রামের মানুষ কেমনভাবে নেমেছেন পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে, তা দেখানো হবে। দেখানো হবে, যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত মানুষ নবচেতনার মন্ত্রে কেমন করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। সরকার শিশুদের জন্য ছবি তুলছেন, প্রযোজনা করছেন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র। ছবি তোলার জন্য বিশিষ্ট পরিচালকদের অনুদান দিচ্ছেন, যাতে তাঁরা আর্থিক বাধাটা অন্ততঃ আংশিকভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন। ছবি রিলিজের সমস্যাটা এখনও রয়েছে—ছবি তোলার পর যাতে তা দীর্ঘকাল বাক্সবন্দী পড়ে না থাকে, সেটা দেখা খুব জরুরী। প্রযোজক পরিবেশকদের দীর্ঘকালের তৈরী করা বেড়াজাল, তাকে ছিন্ন করা কঠিন, সময় সাপেক্ষ। বাইরে থেকেও এ রাজ্যে প্রসিদ্ধ ও উন্নতমানের পরিচালকরা ছবি তুলতে আসছেন। তাতে পশ্চিমবাংলায় তোলা ছবি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আসন পাবে, প্রচার লাভ করবে। সম্মান ও আর্থিক প্রশ্ন দুটোই এতে জড়িত। আমাদের ষ্টুডিয়ো ও লেবরেটরীগুলি উন্নত মানের যন্ত্রের অভাবে বহু সময়েই কাজের পারিপাট্য বজায় রাখতে পারে না, বা বহুসময়েই সেখানে কাজের অগ্রগতি হয় অত্যন্ত শ্লথ। সরকার উন্নতমানের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ঋণ দিচ্ছেন। ষ্টুডিয়োয় ব্যবহারের উপযোগী উন্নতমানের ক্যামেরা কিনেছেন, যাতে পরিচালকরা কম ভাড়ায় তা পেতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা মৃতপ্রায় টেকনিসিয়ান ষ্টুডিয়োর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সল্ট লেকে রঙ্গীন ফিল্ম লেবরেটরী তৈরীর কাজও প্রাথমিকভাবে শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রসদনের পেছনের জমিতে করেছেন আর্ট থিয়েটার। সারা রাজ্যে ফিল্ম থিয়েটার স্থাপনের জন্য তাঁরা আর্থিক সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটি ফিল্ম ডিভিশন স্থাপনের। গত তিন বছরের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার ৫টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন। ৩টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের শিশুচিত্র এবং ২৮টি তথ্যচিত্র-ও এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন চিত্রগৃহে মানুষ সেগুলি দেখছেন। চলচ্চিত্র হিসাবে সেগুলির বিচার হবে ইতিহাসের গতিধারায়। আপাতত আমরা এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সপক্ষে দাঁড়াচ্ছি।

নাটক

নাটক হল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ আর একটি দিক। আমাদের এখানে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায়িক দাপটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার একটা সুস্থ চিন্তার নাট্য আন্দোলনের ধারাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। নানা অসুবিধা, মতাদর্শগত সূক্ষ্ম পার্থক্য, আর্থিক অসংগতি, হলের সমস্যা সত্ত্বেও তাঁরা থামেন নি। সাম্প্রতিককালে কলকাতার থিয়েটারে সংস্কৃতির নামে যে অবাধ চূড়ান্ত নোংরামি চলছে তা আমাদের সমস্ত ঐতিহ্যের কলঙ্ক। তাকে বাধা দেওয়া এঁদের আর একটা কাজ। নতুন নতুন নাট্যচর্চার মাধ্যমেই তাঁরা তা করছেন। দায়িত্বশীল ও সৎ কিন্তু বিচ্ছিন্ন এই প্রতিবাদী প্রচেষ্টাগুলির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন এই সরকার। ৭৮ সালে সরকারী উদ্যোগে নাট্যোৎসব করে প্রগতি নাট্যচর্চার প্রতি তাঁরা তাঁদের সংহতি জানিয়েছিলেন। ৭৯-তে নিয়েছিলেন জেলায় জেলায় নাট্যোৎসবের পরিকল্পনা। এখন শুরু হয়েছে নতুন নতুন মঞ্চ নির্মাণ, জেলায় জেলায় রবীন্দ্রভবনগুলির সংস্কার। টাউন হলগুলি মেরামত করা হচ্ছে। অপেশাদার নাট্যদলগুলি কম ভাড়ায় এগুলি পেলে তাঁদের আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটবে। কয়েকদিন আগে শ্রীজ্যোতি বসু উত্তর কলকাতায় গিরীশ মঞ্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নাট্যামোদীদের বহুদিনের ইচ্ছা পূরণ করেছেন। প্রবীন নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রীমন্মথ রায় আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, আশীর্বাদ জানিয়েছেন এই পদক্ষেপকে। সরকার আর্ট গ্যালারীর জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করেছেন, গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে নানাবিধ করদান থেকে রেহাই ও আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন। দুঃস্থ শিল্পীদের এককালীন সাহায্য ও পেনশন দিচ্ছেন। অনেক ব্যক্তি-শিল্পী-প্রতিভাও এই রকম সাহায্য পাবেন। কেন্দ্রীয় ও জেলাস্তরে তাঁরা আয়োজন করেছেন নাট্য প্রতিযোগিতার। সব মিলিয়ে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এ এক নতুন যুগ। সরকার এগিয়ে এসেছেন। যৌথ ঐক্যবদ্ধ বেসরকারী প্রচেষ্টার পাশে দাঁড়াচ্ছেন—প্রতিক্রিয়ার শক্তি থেমে থাকবে না। নতুন নতুন উদ্যমে তারা বাধা সৃষ্টি করবে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে যখন এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার একটি নাট্যমঞ্চে সকল স্তরের লেখক-শিল্পীদের সমাবেশে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুস্থ চিন্তার জন্য আবেদন জানালেন, তার অব্যবহিত পরেই সেখানেই শুরু হল নাটকের নামে বেলেল্লাপনা। সচেতন জনমত গড়ে তুলে মুখর প্রতিবাদে এই হীন চক্রান্তকে দমাতে হবে।

চিত্রকলা

চিত্রকলার বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়। কিন্তু এবার সেদিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে বেশ কিছু ছাপা Poster Set বেরিয়েছে—লেখা ও রেখায় যা সহজেই মানুষের মন স্পর্শ করে। বক্তব্য ও অলংকরণে সমৃদ্ধ এই Set গুলিকে বহু সংগঠন বিনা খরচে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করছেন। জাতীয় মিউজিয়াম ও গ্যালারী তৈরীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আমাদের রাজ্যের অতীত দিনের শিল্পীদের কিছু উন্নত মানের কাজ যথাযোগ্য মর্যাদায় চিরকালের জন্য যাতে সংরক্ষিত হতে পারে সেটা দেখা একটা বিরাট কাজ।

সাহিত্যচর্চা

সাহিত্যের নানা দিকে নানা ধরনের উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ গ্রহণ সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকদের ক্রমশই উৎসাহিত করছে। রবীন্দ্রপুরস্কার পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-সেবীদের কাছে অন্যতম প্রধান সামাজিক স্বীকৃতি। অথচ এই পুরস্কারকে ঘিরে কয়েকবছর আগেও যেসব নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা নিতান্তই অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক। রবীন্দ্রপুরস্কারকে এই লাঞ্ছনার হাত থেকে তুলে এনে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে বামফ্রন্ট সরকার তাকে তার সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়েকটি পুরস্কার পুনরায় প্রবর্তন করে সাহিত্যিক সমাজে সঞ্চার করেছেন নতুন উৎসাহের। সেই সঙ্গে নতুন

কয়েকটা পুরস্কার দেওয়ার কথাও তাঁরা ভাবছেন। এগুলির অর্থমূল্য নেহাৎ কম নয়, কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। সমাজগঠনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে সাহিত্যিকদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া ও উৎসাহিত করার যে দৃষ্টিভঙ্গী এ থেকে বেরিয়ে আসছে, সেটাই আসল কথা।

বামফ্রন্ট সরকার প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা ভরতুকি দিয়ে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্র রচনাবলী। প্রকাশ করার কথা ভাবছেন শরৎচন্দ্র, নজরুল, মানিকের সমস্ত লেখা। আরও কিছু চিরায়ত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রনের কথাও তাঁরা ভাবছেন। যে ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে সভ্যতা ও সমাজ আজকের স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া এক মহান দায়িত্ব। বিভিন্ন সময়ে সরকারী উদ্যোগে ভারতবর্ষের মহান সন্তানদের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে প্রাজ্ঞব্যক্তিদের আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে তাঁরা পালন করেছেন ইকবাল ও প্রেমচাঁদ জন্মশতবার্ষিকী। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে "আলোর ফুলকি" নাম দিয়ে যে শিশু সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে কোন কোন মহল থেকে তার অর্থহীন সমালোচনা করা হচ্ছে, এটা আমাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু তাতে এই প্রয়াসের গৌরব কমে নি। নতুন নতুন বই প্রকাশের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করার কথা তাঁরা ভাবছেন। ভাবছেন দুঃস্থ সাহিত্যিকদের পেনশন দেওয়া যায় কিনা। সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক বিনয় ঘোষের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব বহন করে বামফ্রন্ট সরকার গোটা দেশের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। প্রখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্করকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলিতে অবহেলিত এই শিল্পীর চিকিৎসার সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন এঁরাই। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বাগত জানাই।

বিবিধ প্রয়াস

সমগ্র এশিয়ার অসংখ্য জাতি ও বৈচিত্রময় জীবনচর্চার মানুষের সাংস্কৃতিক বোধ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানোর জন্য Netaji Institute for Asian Studies তৈরী হচ্ছে। দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়িতে দুটি নতুন তথ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে, চা বাগান ও কয়লাখনি অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে শ্রম তথ্যকেন্দ্র। রাজ্যসরকারের তথ্য দপ্তরের কাজ এখন আর শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। তাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ব্লকস্তর পর্যন্ত। সংগীতচর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য এ রাজ্যে একটি সংগীত একাদেমী স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক গ্যালারী। লোকরঞ্জন শাখার কাজকর্ম গোটা রাজ্যে জুড়ে প্রসারিত হয়েছে। তাদের কর্মসূচীর মধ্যে যুক্ত হয়েছে জীবনের সপক্ষে বহু নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস। ঝাড়গ্রাম ও শিলিগুড়িতে লোকরঞ্জন শাখা স্থাপিত হয়েছে আঞ্চলিক মানুষের সাংস্কৃতিক চাহিদার দিকে নজর রেখে। রাজ্যসরকার একটি লোকসাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গঠন করেছেন। বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে লোক উৎসব. সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলা দেশের লোকজীবনে প্রচলিত ঐতিহ্যময় বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সংস্কৃতি দপ্তর ছোট বড় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপের ব্যাপক প্রচার করছেন। বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু বিজ্ঞান সম্মত নীতি চালু হয়েছে—ছোট বড় সমস্ত রেজিস্টার্ড কাগজই বিনা তদ্বিরে বিজ্ঞাপন পাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে এরই মাধ্যমে গোটা দেশের মানুষের কাছে তাঁদের এই ব্যাপক কর্মউদ্যোগ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী পরিচিত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী

আমরা যেগুলি উল্লেখ করলাম সেগুলি বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত কর্মসূচী রূপায়ণে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এর গুরুত্ব সর্বভারতীয়। এই ব্যাপক কর্মকান্ডের প্রভাব গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী মানুষের ওপর পড়তে বাধ্য। কিন্তু বর্তমান সমাজকে পালটে যে নতুন ভারতবর্ষ গঠনের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেখানে পৌঁছবার পক্ষে এই কার্যকলাপ নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়। গভীরভাবে আমাদের ভেবে দেখতে হবে এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আপাতত আরও কি কি আমরা করতে পারি। নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সেই কাজ আমাদের করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে কোন্ কাজ কতটুকু করা হল তথ্য ও সংখ্যার বিচারে সেটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কথা। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হল মানুষের প্রতি এক দরদী দৃষ্টিভঙ্গী। সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রটি মুষ্টিমেয়র লীলাবিলাসের কব্জা থেকে উদ্ধার করে ব্যাপক মানুষের অংশ গ্রহণের উদার ক্ষেত্রে পরিণত করার যে অঙ্গীকার বর্তমান সময়ে উদ্ভাসিত হয়েছে সেটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। বহু মানুষের দ্বারা চর্চিত না হলে সংস্কৃতির বর্ণচ্ছটাময় সুরভিত কুসুমটি বাঁচে না। বন্ধ দুয়ারের আড়াল থেকে বের করে এনে তাকে স্থাপিত করতে হবে বহু মানুষের বিস্তীর্ণ আঙিনায়। মনে রাখতে হবে, এ কাজ খুব সহজে কুসুমাস্তীর্ণ পথে করা যাবে না। প্রতিক্রিয়ার সক্রিয় বাধা আসবে। মরণাপন্ন পুঁজিবাদী সভ্যতা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে আজ কোণঠাসা। তার পূতিগন্ধময় শরীরে এখন জনগণের মনোহরণকারী কোন আকর্ষণ আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবার আগে সে চরম আঘাত হানার চেষ্টা করবেই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা বারবার দেখা দেবে। সমাজে তাদেরই সৃষ্ট ক্ষতগুলির দিকে বীভৎস অঙ্গুলি নির্দেশে তারা দেখাবে এই হল অনিবার্য ও একমাত্র বাস্তব। অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন করে তোলবার চেষ্টা করবে আজকের প্রজন্মকে। বর্তমানকে করে তুলবে বিষণ্ণ, ভবিষ্যতকে নির্দিষ্ট করবে অনিশ্চিত বলে। চোখ কান খোলা রাখলে দৃষ্টি এড়াবে না যে এক বিশাল দায়িত্বের সামান্য যে প্রারম্ভিক কাজ এই সরকার শুরু করেছেন, কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে তাতেই নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অকারণ, মিথ্যা ও হাস্যকর সমালোচনা করা হচ্ছে বাজারী কাগজে, অর্ধশিক্ষিত নেতাদের বক্তৃতায়। তার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু দায়িত্ব নেবার আছে। একটা সংগ্রাম চলছে, চলবে দীর্ঘকাল। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমাদের বহু ঐতিহ্যময় দেশকে, সংস্কৃতিকে নিয়ে যেতে হবে ঈপ্সিত কাঙ্ক্ষিত লোকে। সে কাজে হাত লাগাতে হবে সকল স্তরের মানুষকে শ্রমে, সচেতনতায়।

বামফ্রন্ট সরকারের তিন বছর ও যুবকল্যাণ বিভাগ

অরুণ সরকার

বিষয়টি অবতারণার আগে বলা প্রয়োজন যে যুবকল্যাণের যাবতীয় উদ্যোগ কার্যকরী করবার জন্য সারা ভারতের অঙ্গ-রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সর্বপ্রথম একটি পৃথক দপ্তরের সৃষ্টি করা হ'য়েছে এবং সম্ভবতঃ এ বিষয়ে পশ্চিম-বঙ্গ আজও অদ্বিতীয়।

আমাদের সমাজে দারিদ্র আছে, ক্ষুধা আছে, কর্মহীনতা আছে, আছে নিরক্ষরতা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগের অভাব; সামাজিক সংকীর্ণতা ও উন্নাসিকতা আছে, আছে সুস্থ জীবনধর্মী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের সীমাবদ্ধতা। আপামর জনসাধারণের সঙ্গে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুবসমাজও এই ঘনীভূত সংকটে নিমজ্জিত। এই সামগ্রিক সমস্যা ছাড়াও যুবসমাজের কিছু নিজস্ব চাহিদা, কিছু অভাব ও আবেদন, কর্মসংস্থানের অভাবনীয় অপ্রতুলতা, সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধূলায় অংশগ্রহণে হাজারো প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি নিয়েই যুবজীবনের বর্তমান চালচিত্র।

সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সব সমস্যার মৌল সমাধান সম্ভব নয়। যুবসমাজের চাহিদা সীমাহীন আর রাজ্য সরকারের ক্ষমতা অতি সীমিত। তবুও এরই মধ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতাকে মূলধন ক'রে এই বিভাগ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে ক'রে যুবজীবনের এই বেদনাকে একটু প্রশমিত করা যায়, একটু সুযোগ, একটুখানি অধিকারে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তারা উপলব্ধি করতে পারে যে সরকার তাদের সমব্যথী এবং সাথী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের কর্মসূচী মূলতঃ গ্রামমুখী। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে কিছু কিছু প্রকল্পের সুযোগ সকলের জন্য নির্দিষ্ট। আরও অধিকমাত্রায় শহরগুলিকে বিশেষকরে শহরের অনগ্রসর এলাকাগুলিকে এই বিভাগের কাজের পরিধির মধ্যে আনার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন রয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে বিগত তিন বছরে আমরা যেসব কর্মসূচী রূপায়ণ করতে পেরেছি তার কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হ'য়েছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প

কর্মক্ষম মানুষের কাজের সংস্থান না থাকা তার জীবনের এক চরম অভিশাপ। দুঃসহ বেকারীর জ্বালায় যুবসমাজ হতাশাগ্রস্ত এবং বিভ্রান্ত। এই হতাশা ও বিভ্রান্তির অনিবার্য ফলশ্রুতি হ'ল তার নৈতিক মানের অধঃপতন এবং প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া। এই দুরূহ সমস্যার বদ্ধমূল সমাধান যদিও সম্ভব নয় তবু যুবকল্যাণ বিভাগ তার সীমিত সংগতির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টারই একটি অঙ্গ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প। এই অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণ লগ্নীসংস্থা শতকরা ৯০ ভাগ অর্থ সাধারণতঃ ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকেন এবং এই বিভাগ থেকে প্রান্তিক ঋণ হিসাবে বাকী ১০ ভাগ মঞ্জুর করা হয়। যে সমস্ত প্রকল্প অতিরিক্ত কর্মসংস্থার খাতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে, ছাগল ও শূকর পালন, সার/ মণিহারী/বই/ তৈরী পোষাক ইত্যাদির দোকান স্থাপন, মোমবাতি/ছাতা/ টালি/খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম/পুতুল/সাবান ইত্যাদি তৈরীর কারখানা স্থাপন এবং কিছু ক্ষেত্রে পরিবহণ প্রকল্পে প্রান্তিক ঋণ দেওয়া হ'য়েছে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে বিগত তিন বছরের কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল—

(১) যুবকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত প্রান্তিক ঋণের পরিমাণ— ৩০,৯৪,২৬০,০০

(২) প্রকল্প সমূহে নিয়োজিত মোট অর্থের পরিমাণ— ৩,০৯,৪২,৬০০,০০

(৩) এই সব প্রকল্পে মোট নিযুক্তির সংখ্যা—২৪০০ জনেরও বেশী

পর্বতাভিযান, পর্বতারোহণ শিক্ষণ, ট্রেকিং ও স্কীয়িং

যুবসমাজকে দুঃসাহসিক কাজে অনুপ্রাণিত করা, তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় গড়ে তোলা এবং পরিবেশের প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করবার মত মানসিকতা সৃষ্টি করার কাজে যুবকল্যাণ বিভাগের যেসব কর্মসূচী নেওয়া হ'য়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল পর্বতাভিযান ও ট্রেকিং অভিযান পরিচালনায় অর্থ সাহায্য দেওয়া এবং পর্বতারোহণ ও স্কীয়িং এ প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া। পর্বতাভিযানে এ রাজ্যের পর্বতারোহীদের সাহায্য করার জন্য চলতি আর্থিক বছর থেকে এই বিভাগ একটি সরঞ্জাম ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে এবং এ বিষয়ে পর্বতারোহীদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি পুস্তকাগার স্থাপনের কাজও সমাপ্তির পথে।

বিগত তিন বছরের পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল।

(ক) বিগত তিন বছরে পর্বতাভিযান পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পর্বতারোহী সংস্থাকে মোট ২,২২,০০০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হ'য়েছে।

(খ) ঐ সময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'য়েছে—
(১) পর্বতারোহণের জন্য—৪৬ জনকে।
স্কীয়িং-এর জন্য—১৪ জনকে।

(গ) সরঞ্জাম ভাণ্ডার ও পাঠাগারের জন্য নির্দিষ্ট মানের সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মহাশয়কে ২,৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে। কিছু সরঞ্জাম কেনা হ'য়েছে এবং তার বিতরণের কাজও শুরু হ'য়েছে।

স্কাউটিং, গাইডিং, ব্রতচারী ও মণিমেলা

শিশু ও কিশোর কিশোরীদের চরিত্র গঠন, শরীর গঠন, নিয়মানুবর্তীতা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এই বিভাগ থেকে ভারত স্কাউট এবং গাইড, ব্রতচারী মণিমেলা ইত্যাদি সংস্থাকে প্রতি বছর দেড় লক্ষ টাকারও অধিক অনুদান দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের কার্যক্রম

১৯৭৯ সালটি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত ছিল—ঐ বছরটি যথোপচিত মর্যাদার সঙ্গে এই বিভাগ পালন করেছে। ঐ বছর অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা আমাদের অধীন তিনটি শ্রীঅরবিন্দ বালকেন্দ্রের মাধ্যমে কলকাতার বস্তি এলাকার শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক ও প্রমোদানুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।

অসম-সাহসিকতার জন্য উৎসাহদান প্রকল্প

মহৎ উদ্দেশ্যে সাহসিকতার জন্য যুবক-যুবতীদের উৎসাহিত করার জন্য এই বিভাগ এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ বাবদ বর্তমান আর্থিক বছরে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবকল্যাণ বিভাগের কার্যক্রম

যুবকল্যাণ বিভাগের বিজ্ঞান কার্যক্রমের মূলে উদ্দেশ্য হ'ল গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য করে তুলে ধরা। বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারেই নিবদ্ধ নয় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গেও যে বিজ্ঞান অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটানো আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। বিজ্ঞান মনকে যুক্তিবাদী করে, কুসংস্কার দূর করে আত্মপ্রত্যয় গড়ে তোলে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বস্তুবানুগ মূল্যায়ণে পরিমন্ডল সৃষ্টিতে সহায়তা করে—বিজ্ঞানের এইসব মূল্যবান বার্তাকে গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে দেবার কাজে আমরা ব্রতী।

বিগত তিন বছরে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা নিম্নোক্ত কর্মসূচীগুলো গ্রহণ করেছি—

বিজ্ঞান ক্লাব গঠন ও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ক্লাব সমূহকে সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনকে সংগঠিত করে একে সুসংহত ও গতিশীল করে তুলতে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিপূরক কারিগরি সাহায্য আমরা পাচ্ছি ভারত সরকারের বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার কাছ থেকে। গত আর্থিক বছরে ৪৭টি বিজ্ঞান ক্লাবকে মোট ২৩,৫০০ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হ'য়েছে।

বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার সহযোগিতায় এই বিভাগ প্রতিবৎসর নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও বিজ্ঞানমেলা ও শিবির পরিচালনা করে আসছে।

বিজ্ঞান আলোচনাচক্র :—এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্র চারটি স্তরে অনুষ্ঠিত হয়—(১) ব্লকস্তর, (২) জেলাস্তর (৩) রাজ্যস্তর এবং (৪) আন্তরাজ্যস্তর। এই প্রতিযোগিতায় উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করতে পারে। বিগত তিন বছরে এই প্রতিযোগিতায় ৪০০০ হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। প্রতি স্তরের প্রতিযোগিতায় আকর্ষণীয় পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হ'য়েছে।

জেলা বিজ্ঞান মেলা ও পূর্বভারতীয় (আন্তঃরাজ্য) বিজ্ঞান শিবির—

এই প্রকল্পে ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের তৈরী মডেল ইত্যাদির প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়—(১) জেলা পর্যায় ও (২) আন্তঃরাজ্য পর্যায়। এই প্রতিযোগিতায় বিগত তিন বছরে ২৮০০ জন অংশ গ্রহণ করেছে এবং কৃতি অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হ'য়েছে।

জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন—

গ্রামীণ এলাকায় বিজ্ঞান গবেষণা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের উন্নতিকরণ, বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন, বেকার যুবকদের স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদান, স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ইত্যাদির জন্য পুরুলিয়ায় একটি জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হ'য়েছে। এই প্রকল্পটি ভারত সরকারের বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা ও যুবকল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে রূপায়ণ করা হবে। যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে এ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হ'বে; এর মধ্যে ২ লক্ষ টাকা ইতিপূর্বেই এই বিভাগ থেকে গত আর্থিক বছরে মঞ্জুর করা হ'য়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প সমূহ

বিদ্যালয় সমবায়—

সম্বলহীন দুঃস্থ পল্লীবাংলার ছাত্রছাত্রীদের নায্যমূল্যে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ সমূহ সরবরাহের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে বিদ্যালয়-সমবায় স্থাপনে আর্থিক সাহায্য অনুমোদন করা হয়। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে ১৭৯টি বিদ্যালয় সমবায় স্থাপন করা হ'য়েছে এবং এর দ্বারা উপকৃত হ'য়েছে ৬২,০০০ এর অধিক ছাত্রছাত্রী।

পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার—

ব্লক এলাকার দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্য প্রতি ব্লকে পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার স্থাপনের এক প্রকল্প এই বিভাগ থেকে নেওয়া হ'য়েছে। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হ'য়েছে। এর মাধ্যমে মোট ৬২,৪৩৬ জন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হ'য়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান—

মাধ্যমিক ও উচ্চতর বিদ্যায়তন সমূহের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান এই বিভাগের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। প্রতি আর্থিক বছরের শুরুতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ বিদ্যায়তন সমূহ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। যাতায়াতের রেলভাড়া ও অংশগ্রহণকারী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের খাইখরচা বাবদ অনুদান এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। বিগত তিন বছরে এ বাবদ ৮১০টি বিদ্যায়তনকে মোট ১৫,৫৭,১০০ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হ'য়েছে। উপকৃত

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫,৮৫০ জন। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ২৪০০ জন।

বিভাগীয় পত্রিকা 'যুবমানস' প্রকাশন

বর্তমান সরকার কার্যভার গ্রহণ করার পর এই পত্রিকাটিকে ত্রৈমাসিক স্তর থেকে মাসিক আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে এবং এর প্রচার সংখ্যা ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার করা হ'য়েছে। যুব জীবনের নানাবিধ সমস্যার সঠিক প্রতিফলনে, যুব জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশনে, দেশ ও বিদেশের তথ্য ও সংবাদাদির প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনে, যুব সমাজকে একটি সুস্থ ও গতিশীল সাংস্কৃতিক পথনির্দেশনায় এবং তাঁদের সাহিত্যচেতনাকে প্রগতিবাদী করার উদ্দেশ্য নিয়েই 'যুবমানস' প্রকাশনা করা হচ্ছে। এই পত্রিকাটি যুব সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে ইতিমধ্যেই সক্ষম হ'য়েছে।

যুবকল্যাণ কার্যক্রম আরও ব্যাপকভাবে রূপায়ণে অধিক সংখ্যায় যুব অফিস স্থাপন

বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার সময় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র ৪০টি ব্লক যুব অফিস খোলা হ'য়েছিলো। যুব সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম যাতে আরও প্রসারিত করা যায় এবং যাতে অবহেলিত যুব সম্প্রদায়ের আরও কাছাকাছি পৌঁছতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বিগত তিন বছরে নতুন ২৮৭টি ব্লক যুব অফিস খোলা হ'য়েছে। আজ পশ্চিমবাংলায় ব্লক যুব অফিসের সংখ্যা ৩২৭। এতাবৎকাল কেন্দ্রীয় সরকারের জেলাস্তরের যুবকেন্দ্র সমূহ এই বিভাগের জেলা অফিসের দায়িত্বপালন করে আসছিলেন। কিন্তু আমাদের ক্রমবর্ধমান কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের জন্য এবং প্রশাসনিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রতিটি জেলায় জেলা পর্যায়ের যুব অফিস খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'য়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় কর্মীনিয়োগের কাজ হ'তে নেওয়া হ'য়েছে। অনতিবিলম্বেই এই জেলা যুব অফিসগুলি দায়ীত্বভার গ্রহণে সক্ষম হ'বে।

বয়স্কশিক্ষা কর্মসূচী

রাজ্যের বয়স্ক-নিরক্ষর মানুষকে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা ও তৎসহ বিধিমুক্ত শিক্ষাদানের জন্য এই বিভাগ একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে ক'লকাতার বস্তী এলাকা ও হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগনা জেলার শিল্পাঞ্চলে ৩০০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার কাজ হাতে নেওয়া হ'য়েছে। এ বাবদ বর্তমান আর্থিক বছরে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

যুব আবাস প্রকল্প

গণ্ডীবদ্ধ জীবনের কূপমণ্ডুকতা যুব জীবনের এক অভিশাপ। বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে, তাদের দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে, সুখ-দুঃখ-আশানিরাশার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে জীবনের অভিজ্ঞতাকে পূর্ণতা দান যুব সমাজের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু শুধুমাত্র ইচ্ছার অভাবের জন্যই নয় আর্থিক অনটনই যুব সমাজের এক গরিষ্ঠ অংশকে ভ্রমণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখে। যুব সম্প্রদায়ের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে সস্তায় স্বল্পকালীন বাসের জন্য রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে যুব আবাস স্থাপনের কর্মসূচীকে আরও সম্প্রসারিত করার কাজে যুবকল্যাণ বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজ্যের বাইরে রাজগীরে যুব-আবাস এর জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করা হ'য়েছে। পুরীতে একটি যুব-আবাস স্থাপনের একটি পরিকল্পনা নেওয়া হ'য়েছে। এ ছাড়াও রাজ্যের বাইরে আরো যুব-আবাস স্থাপনের বিষয়টি সক্রিয়-ভাবে বিভাগের বিবেচনাধীন আছে।

রাজ্যের ভিতর শিলিগুড়িতে একটি ২০ আসনবিশিষ্ট যুব-আবাস সম্প্রতি স্থাপন করা হ'য়েছে। দীঘাতে, লালবাগে যুব-আবাস তৈরীর কাজ নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী চলছে। আশাকরা যাচ্ছে এই বছরের মধ্যেই নির্মাণের কাজ শেষ হবে।

শুশুনিয়া এবং বোলপুর যুব-আবাস স্থাপনের প্রাথমিক কাজ পূর্তবিভাগ শেষ করেছেন এবং নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

রাজ্য যুবকেন্দ্র

কলকাতার মৌলালীতে রাজ্য যুবকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যুবসম্প্রদায়ের জন্য একটি বহু উদ্দেশ্যসাধক প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে। ঐ প্রকল্প বাবদ রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকার উপরে।

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রাজ্য যুবকেন্দ্রে থাকবে একটি প্রেক্ষাগৃহ, লাইব্রেরী, জিমন্যাসিয়াম, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক যুব-আবাস, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই বহুতল বিশিষ্ট কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ এই বছরের মধ্যেই শেষ হবে।

কমিউনিটি হল ও মুক্তাঙ্গণ মঞ্চ স্থাপন

গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে (ক) কমিউনিটি হল ও (খ) মুক্তাঙ্গণ মঞ্চ স্থাপনের প্রকল্প নেওয়া হ'য়েছে। এই প্রকল্প দুটির খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী অনুদান হিসবে দেওয়া হ'য় এবং বাকী ৫০ ভাগ খরচের দায়ীত্ব স্থানীয় উপকৃত জনসাধারণের। প্রতিটি কমিউনিটি হ'লের জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ১২,৫০০ এবং মুক্তাঙ্গণ মঞ্চের ক্ষেত্রে এই সাহায্যের পরিমাণ ৭০০০। জেলা পরিষদের মাধ্যমে এই প্রকল্প দুটি রূপায়ণ করা হয়। এপর্যন্ত ১১৮টি কমিউনিটি হ'লের জন্য মোট ১৪,৭৫০০০ ও সম-সংখ্যক মুক্তাঙ্গণ মঞ্চের জন্য ৮,২৬,০০০ টাকা এই বিভাগ থেকে মঞ্জুর করা হ'য়েছে।

গ্রামীণ খেলাধূলার উন্নতিতে যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী

গ্রামীণ এলাকায় খেলাধূলার সম্প্রসারণ ও উন্নতিসাধনে যুবকল্যাণ বিভাগ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল—

(১) খেলার মাঠ স্থাপন

খেলার মাঠের অপ্রতুলতা গ্রামীণ খেলাধূলার উন্নয়নের একটি অন্যতম অন্তরায়। এই অসুবিধা দূরীকরণে এই বিভাগ খেলার মাঠ স্থাপনের কাজে উদ্যোগী হ'য়েছে। এই প্রকল্পে খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। এই সাহায্যের পরিমাণ মাঠ পিছু ২৫০০০ টাকা। এই প্রকল্পটিরও রূপায়ণ স্থানীয় জেলাপরিষদের মাধ্যমেই

করা হয়। এই খাতে এ পর্যন্ত মোট ১৪৭টি খেলার মাঠের জন্য ৩৬,৭৫,০০০ টাকা বিভাগ থেকে বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

(২) ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহ দেবার জন্য প্রতি বছরই যুব উৎসবের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা তিনটি স্তরে অনুষ্ঠিত হয়—(১) ব্লক স্তর (২) জেলা স্তর ও (৩) রাজ্য পর্যায়।

(৩) খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম সরবরাহ

খেলাধুলার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাব গ্রামীণ খেলাধুলার আর এক অন্তরায়। এই কথা মনে রেখে এই বিভাগ খেলাধুলার সরঞ্জাম বিলির কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্প বাবদ বিগত তিন বছরে এই বিভাগ ৫,৯০,০০০ টাকা ব্যয় করেছে। এর মাধ্যমে ত্রিশ হাজারের বেশী ছেলেমেয়ে উপকৃত হ'য়েছে।

(৪) গ্রামীণ খেলাধুলার উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ দান

অভিজ্ঞ এবং দক্ষ প্রশিক্ষকের দ্বারা গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মান উন্নয়নের জন্য এই বিভাগ একটি কর্মসূচী গ্রহণ ক'রেছে। চলতি আর্থিক বছরে এ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

(৫) জিমনাসিয়াম তৈরীর প্রকল্প

গ্রামীণ যুবসম্প্রদায়কে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর গঠনে শরীর চর্চার উপকারীতা সম্বন্ধে অবহিত ও উৎসাহিত করার জন্য প্রতিটি ব্লকে একটি করে জিমনাসিয়াম কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'য়েছে। এ প্রকল্পের জন্য এই আর্থিক বছরে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

(৬) ক্লাব সমূহকে সাহায্যদান প্রকল্প

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের ক্লাবগুলিকে খেলাধুলার উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের কাজে উৎসাহিত করার জন্য এই বিভাগ থেকে আর্থিক সাহায্যদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হ'য়েছে। এ বাবদ গত আর্থিক বছরে মোট ১১,৪০,০০০ টাকা ব্যয় করা হ'য়েছে। এই বরাদ্দের ২৩,৫০০ টাকা বিজ্ঞান ক্লাব সমূহকে দেওয়া হ'য়েছে।

ছাত্র নয় এমন যুবক-যুবতীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান

গত আর্থিক বছর থেকে অ-ছাত্র যুবক-যুবতীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হ'য়েছে এবং এই খাতে ১,৯০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

যুব উৎসব

উৎসব গ্রামের মানুষের জীবনধারার একটি মূল স্রোত। তাই গ্রামবাংলার প্রতি প্রান্তে এত বেশী লোক-উৎসবের ছড়াছড়ি, সেখানে বারো মাসে তের পাবনের সমারোহ। উৎসবের এই আবেদনকে সামনে রেখেই যুবকল্যাণ বিভাগ প্রতিবছর ব্লক, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ের যুব উৎসবের আয়োজন নিয়মিতভাবে করে আসছে। এই উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধুলা, বিতর্ক, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা হয় এবং গ্রামের আপামর জনসাধারণ বিশেষতঃ অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিচিতি ঘটানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করাও এইসব উৎসবের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

বহুমুখী জেলা যুবকেন্দ্র প্রকল্প

যুবক-যুবতীদের বেকারী নিরসনে সাহায্যদান, খেলাধুলায় উৎসাহ সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক পুনরোজ্জীবনে অনুপ্রাণিত করা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করার জন্য প্রতি জেলায় একটি করে জেলা যুবকেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হ'য়েছে এবং এ বাবদ চলতি আর্থিক বছরে ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

বহুমুখী ব্লক যুব তথ্য ও কল্যাণ কেন্দ্র

বহুমুখী জেলা কেন্দ্রের অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রতিটি ব্লকে একটি করে ব্লক তথ্য ও কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হ'য়েছে।

[শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি বছর: ৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ব্যবস্থা নৈরাজ্যের শিকার হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের কাছে সবথেকে বড় বিষয় ছিল এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এটা একটা আদর্শগত সংগ্রাম। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব মহলের সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গণটোকাটুকির কথা। এই রোগে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত। এখন এর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট অংশের মানুষের সহযোগিতা ও উদ্যোগ দরকার। এ কথা বলা যেতে পারে এই লড়াইতে সুস্থ বুদ্ধির জয় হয়েছে। এরই সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ব্যাপক ও সর্বব্যাপী দুর্নীতি এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলি (যেমন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিন্ডিকেট, ইত্যাদি) এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এসব সংস্থাকে ভেঙে দিয়ে কাউন্সিল তৈরী করেন এবং নূতন আইন তৈরীর কাজে হাত দেন। এই আইনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা থাকতে পারবেন, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের আরও গণতন্ত্রীকরণ হবে। এসব কিছুই উচ্চশিক্ষাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি বাম সরকার একটি নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। এই নীতি হল—শিক্ষা-প্রসারের পক্ষে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে। একটি গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি গরীব মানুষ সমাজের মালিক না হন, বামফ্রন্ট সরকার সমাজকাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন করতে পারবেন না, তার জন্য সমাজবিপ্লবের প্রয়োজন হবে। যতদিন না তা' হচ্ছে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষার স্বার্থে কাজ করছেন। এরজন্য চাই রাজ্যের হাতে আরও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাই শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করা, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের মত গণতান্ত্রিক দাবীগুলি নিয়ে বাম সরকার দাবী উত্থাপন করছেন। বাম সরকারের এই বক্তব্যের সাথে এ রাজ্যের এবং অন্যান্য রাজ্যের মানুষ কণ্ঠ মিলিয়েছেন।

সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদ

সুকুমার দাস

ভারতের স্বাধীনতার জন্মলগ্নে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এ দেশের মাটিতে দ্বিজাতি তত্ত্বকে কেন্দ্র করে যে সাংঘাতিক জাতিবৈরীতার বীজটিকে রোপণ করে গিয়েছিল তাই আজ মহীরূহ হয়ে দেশের মধ্যে নানা অশান্তি ও অনৈক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করে চলেছে। আজকের নানা বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদীর আন্দোলনের উৎস সেখানেই। নানা বিচিত্র দাবী নিয়ে বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আজ দেশের নানা প্রান্তে, নানা নামে নানা চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে দেশের সংহতি ও ঐক্যের সর্বনাশ ডেকে আনছে। ভারতের স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পরেও তাই আজও ওঠে দেশের অখণ্ডতার প্রশ্ন। স্বাভাবিকভাবে এ জিনিষ কল্পনাও করা যায় না। এই বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের আগুনে আজ দগ্ধ হতে চলেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং এর শিকার হয়ে চলেছে দেশের হাজার হাজার মানুষ। এমনটি চললে দেশ একদিন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে—বিপন্ন হবে দেশের স্বাধীনতা। এ প্রসঙ্গে দূরদর্শী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উচ্চারিত সেই সাবধান বাণী আজ আবার মনে পড়বে, যা' অক্ষরে অক্ষরে সত্য হ'তে চলেছে। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না করে, দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে আপোষের মাধ্যমে যদি দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়, তবে সে স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলে মনে করা ভুল হবে। কারণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় চতুর সাম্রাজ্যবাদ শক্তি দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করে জাতিবৈরীতার যে বীজ দেশবাসীর মনে বপন করে যাবে তাতে একদিন "ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে।" দেশ স্বাধীন হবার পরে যা' হবার তাই হ'ল। বিদেশীর বদলে শাসন ক্ষমতা পেলো দেশী বুর্জোয়ার দল। এতে কোন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হল না। পরিবর্তন হলো শুধু শোষকের। এরাও একটানা দীর্ঘ ত্রিশ বছর দেশ শাসন করলো ইংরেজের মতোই 'বিভাজন ও শাসন' এ নীতিকে আশ্রয় করে। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি, সুখ সুবিধার দিকে বিন্দুমাত্র নজর এরা দেয়নি। এদের চরম ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তুললো। এ ক্ষিপ্ততার কারণ তাদের অন্তরের বহুদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনার বেদনা। সেই পুঞ্জীভূত বেদনাই আজ যে কোন উস্কানিতে মানুষকে ধাবিত করছে চরমপন্থার দিকে। আজ যে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করছে এর পেছনেও কারণ ঐ একই দীর্ঘ দিনের উপেক্ষা ও বঞ্চনা। আর আজকের এ আন্দোলন যে নামেই চলুক, যে দাবিকে সামনে নিয়েই হাজির হোক না কেন—আসলে এ বিভেদপন্থী আন্দোলন দেশের ঐক্য ও সংহতির সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু ডেকে আনছে না।

আজ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে অযৌক্তিক নানা দাবীকে সামনে রেখে আন্দোলনের নামে চলছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস। আসাম থেকে তা' মিজোরামে, মিজোরাম থেকে মণিপুর, মণিপুর থেকে ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা থেকে পশ্চিমবাংলার উত্তর প্রান্তে এবং মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার বেশ কিছু অঞ্চলে। নাগাল্যান্ড তো স্বাধীনতার প্রাক্কাল থেকেই হয়ে আছে অগ্নিগর্ভ। শুধু উত্তর-পূর্ব ভারতেই নয় বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন আজ গ্রাস করতে চলেছে ভারতের আরও নানা প্রান্তকে। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়। ভারতের স্বাধীনতার আগে জিন্না সাহেব দেশ ভাগের সময় পাকিস্তান ছাড়া শিখদের দলে টানবার জন্য স্বাধীন "শিখিস্থান" গড়বার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু শিখদের অনীহার জন্য তাঁর সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু সেদিন যা হয়নি, পাঞ্জাবে আজ আবার সে দাবি উঠছে। তারা দাবি তুলছে ভারত থেকে পৃথক হয়ে একটি "স্বাধীন শিখ রাজ্য" প্রতিষ্ঠার। রাজধানীর অতি কাছে চলছে এর উদ্যোগ। অবশ্য ভারতে প্রথম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল নাগাল্যান্ডে। নাগাদের মধ্যে ছিল শ্রেণী বিভাগ। ছিল তীব্র গোষ্ঠী বিবাদ। একে যখন ভারতের অঙ্গরাজ্যরূপে গ্রহণ করা হয়, বিদেশী অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে তখনই ওখানে শুরু হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন। সেই ভয়াবহ আন্দোলনকে রুখতে ভারত সরকারকে শেষ পর্যন্ত সৈন্য বাহিনী পাঠাতে হয়। এর পরই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন দেখাদেয় মাদ্রাজে। এদের দাবি ছিল পৃথক "দ্রাবিড় ভূমির"। এ দাবি সেদিন মাদ্রাজের গণদাবিতে পরিণত হয়। এবং এ আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে হিন্দিভাষা ও হিন্দি এলাকার প্রভুত্বের অভিযোগ তুলে। এর ফলে মাদ্রাজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হয় হিন্দি ভাষাকে এবং রাজ্যের নাম বদলে রাখা হয় 'তামিলনাড়ু'। আসাম সরকারের চরম অবহেলায় মিজোরামেও শুরু হয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ফলে একদিন আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা গঠন করে পৃথক মিজোরাম রাজ্য। মিজোরামের পরই সে ঢেউ ধাক্কা দেয় মণিপুরে। মণিপুরের সেই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের স্রোত আজও চলছে এবং এর তীব্রতা ক্রমশই তীব্রতর হচ্ছে সীমান্তরাজ্য বার্মা থেকে অস্ত্রশস্ত্রের আমদানীতে।

সাম্প্রতিক কালে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসামরাজ্য এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের স্রষ্টা। এটা নতুন নয়, এ রাজ্যে এরকম আন্দোলনের জিগির তোলা হয়েছে বার বার। এ যেন কোন সুপ্ত আগ্নেয়গিরির কিছুদিনের বিরামের পর হঠাৎ অগ্নি উদ্গিরণ। যে কোন একটু উস্কানি, যে কোন রকম প্রাদেশিকতার সুরসুরি পেলেই সেখানে শুরু হয়ে যায় লুঠতরাজ, খুন, জখম। আর এ আন্দোলনের মূল শিকার হয়ে আসছিলো এতদিন শুধু সংখ্যালঘু বাঙ্গালীরা। এবারের আন্দোলন চলছে সেখানকার 'আসু' ও গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে। এবারের এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কিন্তু আর "বাঙ্গালী খেদাও" আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এবার এ আন্দোলন চলছে বিদেশী তাড়ানোর নামে। তার ফলে শুধু

বাঙালী, নেপালীরাই নয়, মার খাচ্ছে গোটা সংখ্যালঘু অ-অসমীয়ারা। তাদের অনেকেই এদের সহিংস এ আন্দোলনের বলি হয়েছে। হয়েছে হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা, এমনকি প্রদেশ ছাড়া। তারা আজ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ওরা আর আসামে ফিরে যেতে চাইছে না। ওদের আশঙ্কা ওখানে ফিরে গেলে প্রাণে আর তারা বাঁচতে পারবে না, কারণ ঐ সব আন্দোলনকারীরা সংবিধান মানে না। বিদেশী বলে ওরা ভারতের নাগরিকদের যা' খুশী তাই করতে পারে। বিদেশী কারা তা' তারা নির্দ্ধারণ করবে নিজেদেরই ইচ্ছামত। ভারতের যে কোন প্রান্তের নাগরিকই যে ভারতের যে কোন প্রদেশে বসবাস ও জীবিকা অর্জনের অধিকারী—একথাটা ওরা মানতেই চাইছেনা, ওদের খেয়ালের শিকার হতে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই আন্দোলনের পেছনে মদত জোগাচ্ছে কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদ ও প্রতিক্রিয়াশীল ধনীর দল এবং কিছু বিদেশী শক্তি। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদেশী হঠানোর নামে এরা অর্থ ও প্ররোচনা দিয়ে এক শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের বিপথগামী করে তুলছে। এরা চাইছে এ আন্দোলনকে সামনে রেখে ওদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। অথচ আশ্চর্যের কথা কেন্দ্রীয় সরকার সব কিছু বুঝেও এ সমস্যা সমাধানের ফলপ্রসূ কোন ব্যবস্থা আজও গ্রহণ করতে পারছে না। কেন পারছে না ? প্রশ্নটা সেখানেই।

অনুরূপভাবে সম্প্রতি ত্রিপুরাতে উপজাতি আন্দোলনের নাম করে উগ্র-উপজাতি দল মান্ডাই বাজারে অ-ত্রিপুরাবাসীদের উপর অতর্কিতে হানা দিয়ে যে নারকীয় গণহত্যা সংঘঠিত করলো তাতেও বলি হলো প্রায় ছ' শোর মত মানুষ। বহু লোক আহত হলো। পুড়লো অনেক ঘরবাড়ী। ঘর ছাড়া হলো কয়েক হাজার মানুষ। এর পেছনেও আছে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমীস্বার্থবাদের এবং বিদেশী শক্তির মদত। এরা উপজাতি আন্দোলনের নাম করে দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টির এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিল অনেক আগেই। উপজাতি ও বাংলা ভাষাভাষীদের সংগ্রামী ঐক্য নষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য। ত্রিপুরাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে বেশী করে উৎসাহ জুগিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী, বিদেশী মিশনারী সংস্থা ও সি, আই, এ। এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় উগ্রপন্থী উপজাতি যুব-সমিতি বীভৎস হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে। এদের উস্কানিতেই উপজাতিদের একাংশ আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে উপজাতিরা সুদীর্ঘকাল সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এমন কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা পায়নি যার ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। উপজাতিরা আজও সমানভাবে অনগ্রসরই রয়ে গেছে। ত্রিপুরার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী সে বিষয়টি আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রথমত এই ধরনের সম্ভাব্য উপজাতি আক্রমণের আশঙ্কায় ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রের কাছে একাধিকবার সৈন্য ইত্যাদির সাহায্য চেয়েছিল. কিন্তু কেন্দ্র এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছে। দ্বিতীয়ত এখনও ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ সেনা আছে তা পার্বত্য-উপজাতিদের আচমকা আক্রমণের মোকাবিলা করার পর ত্রিপুরার নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার সেটা পূরণ করতে গড়িমসী করছেন। অতএব এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ত্রিপুরাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আরও খেলাতে চাইছে। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করাই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রের সব থেকে প্রধান উদ্দেশ্য হলো বামপন্থী আন্দোলনের ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করা। সেটা দেখা যাচ্ছে আসামের বেলায়। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আজ ভারতের বাম আন্দোলনের কাছে অনেকটা শক্তিহীন, তাই তাকে আজ স্তব্ধ করতে আশ্রয় ও কৌশল নিয়েছে অন্য পথের। আসামে আসাম ছাত্র ইউনিয়ন বা গণসংগ্রাম পরিষদকে মদত এবং ত্রিপুরার উগ্র-উপজাতিদের মদত দেওয়া সেই ষড়যন্ত্রেরই একটা চাল। অর্থাৎ আসাম ও ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে আজ আক্রমণের ষড়যন্ত্র চলছে বামপন্থী আন্দোলনের উপর। আগামী দিনে তা আরও ভয়ঙ্কর পথে যে মোড় নেবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আসামের ঘটনার সঙ্গে ত্রিপুরার সামগ্রিক ঘটনাবলীর কিছু মূলগত পার্থক্য আছে। আসামে বিপন্ন হয়ে পড়েছে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের চাপে। আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আজ একাধিক কারণে নিজেদের আশঙ্কায় ভরিয়ে তুলে সংখ্যালঘু অংশকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে দিতে সচেষ্ট। সেই প্রয়াস থেকেই রব উঠেছে প্রাদেশিকতাবাদের—স্বতন্ত্র আসাম দেশ গঠনের। অতএব আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সেখানে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আন্দোলন গড়ে তোলার, দাবী আদায়ের, নিজেদের সুখ সুবিধাকে প্রতিষ্ঠা করার। অপর দিকে ত্রিপুরার ঘটনাবলী সম্পূর্ণ আলাদা। ত্রিপুরায় আক্রমণের সূচনা করেছে উপজাতিরা—যারা ত্রিপুরায় সংখ্যালঘু অংশ। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পুরোধাও তারা। সাম্প্রতিক গণহত্যার নায়কও তারাই। আসামে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতির জন্য যে আশঙ্কায় শঙ্কিত সংখ্যাগুরু অংশ, ত্রিপুরায় সেই আশঙ্কায় শঙ্কিত সংখ্যালঘু অংশ, সংখ্যাগুরুদের ভয়ে। দুটি স্রোতই কিন্তু একই জায়গায় মিশতে চলেছে। দুটি স্রোতের মূল লক্ষ্যও এক।

উপজাতিরা দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়েই রয়েছে। অনগ্রসর অংশ হিসাবেই তারা চিহ্নিত। ব্রিটিশ সব সময়েই উপজাতিদের সঙ্গে অ-উপজাতিদের একটা বিরোধের সূত্রকে জীইয়ে এসেছে। গত তিরিশ বছরে তৎকালীন সরকার সমূহের অপদার্থতায় সে সূত্র আরও বড় আকার নিয়েছে। এটা পরিষ্কার যে, তিরিশ বছর আগে উপজাতি সম্প্রদায়ের যে অর্থনৈতিক মান ও ভিত্তি ছিল, আজ সেই মান এক থেকে দেড় শতাংশের বেশী বাড়েনি। এই বৈষম্যের ছবি দীর্ঘকাল মনে গাঁথতে গাঁথতে আজ তা' পরিণত হয়েছে ব্যাপক হিংসা ও দ্বেষে। আর এই প্রবল বিতৃষ্ণাকেই কাজে লাগিয়েছে চতুর রাজনীতিবিদেরা এবং অদৃশ্য বিদেশী হাত। এরাই মদত জুগিয়েছে হিংসার। সে হিংসা ছিন্ন করেছে আজ ত্রিপুরাবাসীদের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতিকে।

আসাম ও ত্রিপুরার অশান্ত ঢেউ আজ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তে এসে আঘাত করেছে। উত্তর বাংলার কোন কোন অঞ্চলে রাজবংশী ও অনগ্রসর তপশীল জাতি ও উপজাতির জনসাধারণের মধ্যে "উত্তর খণ্ড" আন্দোলনের নামে এক প্রচার কার্য চলছে। সংখ্যায় এরা স্বল্প হলেও একে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। এখানেও সেই একই কারণে অর্থাৎ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর লোক এই দাবী তুলছে যে, উত্তর বাংলার জমিজমা বণ্টনের

ব্যাপারে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ দাবী অনেক ক্ষেত্রে অযৌক্তিক বা অন্যায় বলা যাবে না। কিন্তু এ আন্দোলনের যেমন ভাবে এ'রা প্রসার ঘটাতে চাইছেন সেটাই বিপদের। এ আন্দোলনের নেতারা এমন প্রচার-কার্য চালাচ্ছেন যা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে উদ্বাস্তু বাঙ্গালীরাই বুঝি ওদের সব দুঃখের কারণ। ওরাই নাকি ওদের অন্নে বাইরে থেকে এসে ভাগ বসাতে চাইছে। অর্থাৎ ওরা নাকি বহিরাগত। আসামে 'বঙ্গাল খেদাও' আন্দোলন এবং ত্রিপুরায় নৃশংস হত্যাকান্ডের পর এই আন্দোলনকে নিতান্ত নিরীহ বলে ভাবার কোন অবকাশ থাকে না। কারণ এ আন্দোলনের দাবী যা'ই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনে পরিণত হবে। ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতির মত উত্তরখন্ডের আন্দোলনকারীরাও যে একদিন 'ভাটিয়া' তাড়াও বলে হুংকার ছাড়বে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর এর মূল রয়েছে কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্তির সময় থেকেই। ঐ সময়ে রাজবংশীদেরই একটা অংশ কোচবিহারকে সঙ্গে যুক্ত করতে। ঐ দাবীদার ছিল সেখানকার সম্পন্ন লোকেরাই এবং জোতদারেরা। তারাই সেদিন সরল সাধারণ মানুষকে নানা প্রলোভনের সুরসুরির সাহায্যে বিভ্রান্ত করে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল। উত্তর বাংলার উন্নয়নের দাবী অবশ্যই ন্যায্য। দীর্ঘদিন উত্তর বাংলাকে নানা দিক দিয়ে উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু একটা অঞ্চলের অনগ্রসরতার সমস্যা সমাধানের পথ নিশ্চয়ই এ ধরনের বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন নয়। দেশভাগের ফলে বাংলা-ভাষী অঞ্চলের অধিকাংশই ভারত থেকে আলাদা হয়ে যায়। সঙ্কুচিত পশ্চিমবঙ্গকে যে সংকটের মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করতে হয়েছে, তা ভুললে চলবে না। উত্তর বাংলার উন্নয়ন গোটা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নেরই সঙ্গে যুক্ত। তাকে আলাদা বলে দেখা ঠিক হবে না। তবে ওদের প্রচারে কিছু কিছু ভুল রয়েছে। যে সংখ্যা ও তথ্য দিয়ে সকলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রচার চাই। এটা অনস্বীকার্য যে বামফ্রন্ট সরকার রাজবংশী ও তপশীলদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু কিছু চেষ্টা ইতিমধ্যে করেছেন। জমি বণ্টনের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পেয়েছে ওখানকার তপশীল সম্প্রদায়ই। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে উত্তরখণ্ড আন্দোলনও ভ্রান্ত পথে চালিত হতে পারে। তার জন্যই পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ ও সরকারকে এ সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। দেশের ঐক্য ও সংহতি বিরোধী এই ধরনের বিভেদপন্থী আন্দোলন কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলির উচিত এখনই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং এ বিভেদের বীজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে ফেলা। এ আন্দোলন জোরদার করতে কোন রাজনৈতিক দলই যেন এগিয়ে যেতে সাহস না করে এর জন্য বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দলের কর্মীদের উচিত সজাগ দৃষ্টি রাখা।

দৃষ্টি না রেখে উপায় নেই কারণ এর পেছনেও রয়েছে জঘন্য এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের হঠাৎ তীব্রতা অনুভব করা গিয়েছিল সেখানকার বিগত নির্বাচনে বামপন্থীদের সামান্য শক্তিবৃদ্ধিতেই। কায়েমী স্বার্থবাদীর দল এতেই বিচলিত বোধ করেছে। বাধ্য হয়েই বাম স্রোতকে রুখতে এরা বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনকে উস্কানি দিয়েছে। আবার ত্রিপুরায়ও যখন বামফ্রন্ট সরকারের অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেল, তখনই সমস্ত কায়েমী স্বার্থ উপজাতি ও বাঙ্গালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য, বিশেষকরে বর্গাদার, ক্ষেতমজুর প্রান্তিক চাষীদের অভূতপূর্ব জাগরণ ও তাদের অবস্থার উন্নতিতে দিশেহারা হয়ে কায়েমীস্বার্থ এখানেও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। উত্তরবঙ্গেও এরা তারই সুযোগ খুঁজছে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় কয়েক লক্ষ চা বাগান শ্রমিক আছে। তা' ছাড়া আছে বনাঞ্চলে সংগ্রামী বন-শ্রমিক, এরা প্রধানত আদিবাসী ও নেপালী। বাঁচার দাবীতে চা বাগানের শ্রমিক ও বন-শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমিক ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ওখানকার মালিকশ্রেণীর পক্ষে এ সম্ভাবনাকে মানা সম্ভব নয়। তাই তারা সুযোগ খুঁজছে এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করার জন্য। এর পিছনে ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রমিক ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরানো। দৃষ্টি আরও দিতে হবে এই জন্য যে ঐ সব বিচ্ছিন্নতাবাদীর দল আরও বিচিত্র নানা দাবীকে ওদের আন্দোলনের সামনে রাখবার চেষ্টা করছে, যা' পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। উত্তরখণ্ডের আন্দোলনকারীদের কেউ কেউ কিছু দিন আগে 'কামতাপুর' রাজ্য গড়ারও স্বপ্ন দেখেছে। এদের অনেকেরই আজও দৃঢ়বিশ্বাস কোচবিহারের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত নয়। একে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই শুধু নয়, ভারত থেকেও বিচ্ছিন্ন করতে হবে। আবার কেউ কেউ নেপালী বাঙ্গালী বিরোধ বাঁধিয়ে দার্জিলিং জেলাকেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক এমনকি পারলে ভারত থেকেও পৃথক করার কথা বলছে। এক সময় এখান থেকেই উঠেছিল, নেপাল, দার্জিলিং জেলা ও সিকিমকে নিয়ে এক 'মহানেপাল' গড়ার বিচিত্র শ্লোগান।

এদিকে আবার ঝাড়গ্রামকে কেন্দ্র করে বীনপুর গোপীবল্লভপুর দহিজুড়ী ইত্যাদি আদিবাসী মাহাতো ও সাঁওতালরা আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি নামক এক প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংহত হওয়ার চেষ্টা করছে। তারা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও সাঁওতাল পরগনা ও ময়ুরভঞ্জ সংলগ্ন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি একত্র করে ঝাড়খণ্ড নামে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি রাজ্য গঠনের আন্দোলনে ব্রতী হয়েছেন। এ ঘটনাও উপেক্ষার নয়। কারণ এর পেছনেও আছে বহুদিনের পুঞ্জীভূত দুঃখ, বেদনার ও অবহেলার ইতিহাস। এখানেও আদিবাসীদের একটা বড় অংশ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর। আশেপাশের বহু পরিবর্তন ও উন্নয়নের চেহারায় তারাও আজ ক্ষিপ্ত। সেই ক্ষোভই হয়তো এ বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের রূপকার। তিন দশকের বেশী শাসন কর্তৃত্ব হাতে পেয়েও শাসকবর্গ ওদের জন্য কিছু করার চেষ্টাই করেননি কেন—সে প্রশ্নই আজ তারা করছে। ক্ষোভের তাড়নায় জাগৃতির আন্দোলনকে অস্বাভাবিক ভাবা যায় না, আন্দোলন করবার অধিকার তাদের আছে কিন্তু সে পথ কোনমতেই আত্মস্বাতন্ত্রের পথ হওয়া উচিত নয়। যে কোন আত্মস্বাতন্ত্রের আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার আন্দোলনের দিকে যায়। এখানেও দেখতে হবে পেছন থেকে সুতো টানছে কারা? বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদেশী কুচক্রীরা এদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে এবং করেছে বলেই

[শেষাংশ ২৭ পৃষ্ঠায়]

মস্কো অলিম্পিক : মানুষের অলিম্পিক

সৌমিত্র লাহিড়ী

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট রাশিয়া। সেই সোভিয়েট রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় এবার ২২তম অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য শুধু প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে নয়, এই প্রথম একটি সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাধীন দেশে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় সারা বিশ্বের ক্রীড়ামোদি জনগণ অসীম কৌতূহলে বর্তমান অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিকে তাকিয়ে আছেন।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি চার বছর অন্তর। ২১-তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে মন্ট্রিলে, এবার বাইশ-তম প্রতিযোগিতা। স্বভাবতই কৌতূহল জাগে, প্রথম অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? প্রথম অলিম্পিক গত শতাব্দীর শেষ দিকে **১৮৯৬ সালে** গ্রীস দেশের এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জনক **ব্যারন পিয়ের ডি কাউবারটিন** (Baron Pierre de Coubertin) উদ্যোগী হয়ে এই প্রতিযোগিতা পুনরায় শুরু করেন। জন্ম হয় আধুনিক অলিম্পিকের।

'আধুনিক' এবং 'পুনরায়' শব্দদুটি চলে এলো। অতএব একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যার সূত্র নিহিত রয়েছে অলিম্পিকের ইতিহাসের পাতায়। বিস্তারিত ইতিহাস উল্লেখ না করে তারও একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ নেওয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে অলিম্পিয়া মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ভূকম্পনে ভূগর্ভে অন্তলীন হয়ে যায় এবং এর কিছুদিন পরেই আসে আলফিউস নদীতে প্রবল বন্যা। প্রলয়ংকরী ভূকম্পন এবং বিধ্বংসী বন্যার করাল গ্রাসে অলিম্পিয়ার উপত্যকা ডুবে যায়। অলিম্পিকের সুমহান ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্রীড়াঙ্গণ অতীতের স্মৃতির মতন হারিয়ে যায়, জমে ওঠে পলি আর অরন্যাবৃত সবুজ ভূমির ওপর বিশাল বিশাল গাছপালা। দেখে বোঝাই যায় না এখানে কখনও কোনদিন কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অতীতের স্মৃতি খুঁড়ে প্রাচীন অলিম্পিক প্রান্তর আবিষ্কার করেছেন প্রায় এক শতাব্দী আগে (১৮৭৬-১৮৮১)।

প্রাচীন অলিম্পিক কত প্রাচীন সে বিষয়ে নানা রকম মতভেদ আছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি অবশ্য সর্ব-সম্মত একটা ইতিহাস তৈরী করেছেন।

প্রাচীন গ্রীস দেশের গাথা ও চারনদের গানের মধ্যে অলিম্পিক ক্রীড়ার টুকরো টুকরো ছবি পাওয়া যায়। হোমারের লেখাতেও অলিম্পিকের ছায়াপাত ঘটেছে। আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব এক হাজার বছর আগে প্রাচীন অলিম্পিক শুরু হয়, কিন্তু ৮৮৪ খৃঃ পূঃ আগেকার ধারাবাহিক স্মৃতি কোথাও নেই বলে জানা যায় না অলিম্পিক সত্যিই কত প্রাচীন।

অলিম্পিয়া শব্দটি গ্রীক শব্দ **অলিম্পিয়াস** থেকে এসেছে। এই শব্দটির অর্থ দেবতাদের আবাসভূমি। মানুষ তার ইতি-হাসকে যেমন বিভিন্ন শিল্পে সাহিত্যে গানে, সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল, সেই সূত্র ধরে ধরে, গ্রন্থনা করে করে যেমন আমরা আমাদের অতীতকে চিনেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই অলিম্পিকের সম্পর্কেও কিছু কিছু গল্প কথা, উপকথা প্রচলিত আছে, যার সূত্র ধরে ধরে, গ্রন্থনা করে করে, আমরা খুঁজে পাই অতীত, আমরা খুঁজে পেয়েছি তার ইতিহাস, তার সুমহান ঐতিহ্য, তার চির অম্লান বাণী 'আন্তর্জাতিক মৈত্রী, সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ব, সংহতির বিজয় গান'। মানুষের সুস্থ সুন্দর সবল সৌর্যবীর্যের প্রতীক অলিম্পিক।

ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার সময়ই দেখা যায় আর্য জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আর্য জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে খেলা ধূলার বিশেষ প্রচলন ছিল। বিবাহ, দেবপূজা, বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও মিলিত হয়ে আর্য যুবকরা শরীর চর্চা, অস্ত্রচালনা এবং অন্যান্য ক্রীড়ার নানা কায়দা কৌশল প্রদর্শন করতেন। ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভের পর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রমাণ খৃষ্ট পূর্ব দু'হাজার বৎসর পূর্বে ক্রীটের মাইনোসের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা নানা ছবিতে রয়েছে।

গ্রীস দেশেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল খেলাধূলা। বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে এবং ছুটির দিনে গ্রীক জাতির মধ্যে মিলিত হয়ে ক্রীড়া চর্চার নজির খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষায় এই সব আনন্দ অনুষ্ঠানের নাম 'প্যানে-গেরিশ'। হোমারের ইলিয়ডে (২৩ খণ্ডে) পেট্রোক্লিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে প্যানেগেরিশের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ১১০০ খৃঃ পূঃ অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় রথ চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারী প্রস্তর নিক্ষেপ, কুস্তি প্রভৃতি ছিল অন্যতম আকর্ষণ। ট্রোজান যুদ্ধখ্যাত আজাক্স ইউলিসিস এণ্টিলোকাস প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেছিলেন ওডেসিতে রাজা আলমিন্যাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি প্যানেগেরিশে।

প্যানেগেরিশ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ফলে তিন চারটি প্যানেগেরিশ নিয়ে একটি বৃহত্তর প্যানেগেরিশ সৃষ্টি হয়। আর এই প্যানেগেরিশে যোগদানের জন্য শরীর চর্চা ও ক্রীড়া গ্রীক জাতির অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। পিণ্ডার হেসিয়ড, হেরোডোটাস পসেনিয়াস প্রভৃতি বহু বৃহত্তর প্যানেগেরিশের কথা জানা গেছে। তার মধ্যে ওলিম্পিয়ার জিউসদেবের মহা-পূজা উপলক্ষে ওলিম্পিয়ার উৎসব, এপোলোদেবের পাইথন হত্যার উপলক্ষে পাইথন উৎসব, হারকিউলিসের 'নেম্যান সিংহ' হত্যা উপলক্ষে নেম্যান উৎসব, হারকিউলিসের ক্রীটের উন্মত্ত বৃষ হত্যা উপলক্ষে ফোরিন্স যোজকে ইসথমিয়ান উৎসব, হায়্যানসিনথ্যাসের মৃত্যু উপলক্ষে হায়্যাসিনথ্যাস উৎসব, এথেন্সের থারপেলিয়া এথেনা দেবীর সম্মানে অনুষ্ঠিত প্যানথেসিয়া উৎসব, নবান্ন উপলক্ষে মেটাপটানিয়া উৎসব মাইফেলের প্যানয়াবোমিয়া উৎসব, ডেল্লেসের এপোলোদেব উৎসব উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে এইসব উৎসব গ্রীক জাতির জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাস বলে স্থানীয় প্যানে-

পেরিশ থেকে জাতীয় হেলেনিক ন্যাশনাল গেমস সৃষ্টি হয়েছিল। হেলেনেসদের চারটি হেলেনিক জাতীয় ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। কালক্রমে অলিম্পিয়ার জিউসদেবের সম্মানে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য তিনটি বন্ধ হয়ে যায়। অলিম্পিক ক্রীড়াই ছিল প্রাচীনতম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

অলিম্পিক ক্রীড়া জন্মলগ্নের পর থেকে বার বার নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। যুদ্ধ মহামারী সংঘর্ষ রক্তপাত বার বার দেখা দিয়েছে, কিন্তু অলিম্পিকের আদর্শ কখনও ম্লান হতে পারে নি। যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা গেছে অলিম্পিক ক্রীড়া হচ্ছে। কিন্তু তারও সমাপ্তি ঘটে কালের অমোঘ নিয়মে। ১১৭২ বছর পর ২৯৭তম অলিম্পিয়াডের সাথে সাথে অলিম্পিকের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেন অলিম্পিকের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৭৬ সালে ফরাসী জাতির যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ফরাসী জাতির জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। গোটা জাতি হতাশায় ডুবে যায়। তখন ফরাসী ধনকুবের পরিবারের সন্তান কিউবারটিনের বয়স মাত্র ১৪ বছর। তার জন্ম ১ জানুয়ারী ১৮৬২। বালক বয়সেই ধনিক পরিবারের সন্তান হলেও কিউবারটিন যুদ্ধের উন্মত্ত লালসা থেকে মুক্ত শান্তির পৃথিবীতে বাস করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন দেখার মুহূর্তেই জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিকরা অতীত দিনের অলিম্পিকের মহান বাণীর স্মারক চিহ্নগুলি মাটির গহ্বর থেকে সূর্যের আলোয় টেনে আনছিলেন। যুদ্ধ হাঙ্গামা বিধ্বস্ত ফরাসী জাতির মনে মানবীয় মূল্যবোধগুলিকে পুনঃস্থাপিত করতে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত করতে কিউবারটিন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুনরায় চালু করতে উদ্যোগী হন। কলেজে কলেজে ছাত্রদের জমায়েত করে, বক্তৃতা করে, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে তিনি সফল হলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী বন্ধ থাকার পর আধুনিক অলিম্পিক আবার আত্মপ্রকাশ করল ১৮৯৬ সালে। আধুনিক অলিম্পিকের জনক কিউবারটিন প্রথম অলিম্পিক প্যারীতে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু গ্রীস দেশের প্রবল ইচ্ছারও চাপ ও ঐক্যের খাতিরে তিনি অলিম্পিকের জন্মস্থান গ্রীস দেশেই অলিম্পিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে সম্মত হন।

প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি হন গ্রীস দেশের ডিমিট্রিয়াস ভাইকেলাস। প্রথম অলিম্পিক কংগ্রেস থেকে নীতিগত সাতটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তগুলি হ'লো (১) প্রাচীন অলিম্পিকের আদর্শে বর্তমান অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হলেও যুগের পরিবর্তনের সাথে একে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে। (২) আন্তর্জাতিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র অপেশাদার ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। (৩) আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার অধিকারী হবে। (৪) কোন রাষ্ট্র নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে অন্য কোন দেশের নাগরিকদের মনোনীত করতে পারবে না। (৫) অলিম্পিক প্রতিযোগিতার প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে। (৬) ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতা যথাক্রমে এথেন্স ও প্যারীতে অনুষ্ঠিত হবে এবং এরপর প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। (৭) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র শক্তির সাহায্য ব্যতীত অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফল হতে পারে না।

১৮৯৬ সালের প্রথম আধুনিক অলিম্পিকে দশটি দেশের মাত্র ৫৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। এথেন্স অলিম্পিকে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে ছিল আমেরিকা, গ্রীস, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী, চিলি ও সুইডেন।

মস্কো অলিম্পিক ২২তম অলিম্পিক হলেও আসলে ১৯ বার অলিম্পিকের আসর বসছে। ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য মোট তিনবার অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান হতে পারেনি।

এপর্যন্ত যেসব জায়গায় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে—(১) এথেন্স (১৮৯৬) (২) প্যারী (১৯০০) (৩) সেন্ট লুইস (১৯০৪) (৪) লন্ডন (১৯০৮) (৫) স্টকহোম (১৯১২) (৬) বার্লিন (শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি), ১৯১৬ (৭) এনাইওয়ার্প (১৯২০) (৮) প্যারী (১৯২৪) (৯) আর্মস্টারডাম (১৯২৮) (১০) লস্ এঞ্জেলস (১৯৩২) (১১) বার্লিন (১৯৩৬) (১২) লন্ডন (১৯৪৮) (১৩) হেলসিংকি (১৯৫২) (১৪) মেলবোর্ণ (১৯৫৬) (১৫) রোম (১৯৬০) (১৬) টোকিও (১৯৬৪) (১৭) মেক্সিকো (১৯৬৮) (১৮) মিউনিক (১৯৭২) (১৯) মন্ট্রিল (১৯৭৬)।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থায়ী জায়গা গ্রীস দেশেই হোক এই দাবী গ্রীস দেশ উপস্থিত করেছিল; আমেরিকার সমর্থন ছিল এই দাবীর প্রতি। কিন্তু কিউবারটিন অলিম্পিক ক্রীড়ার আন্তর্জাতিক চরিত্র অব্যাহত রাখার জন্য অবিচল থাকলেন। দ্বিতীয় অলিম্পিক কংগ্রেস থেকে তিনি সভাপতি হন এবং প্যারীতে দ্বিতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় ১৯০০ সালে। রাশিয়া খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ না করলেও দ্বিতীয় অলিম্পিক কংগ্রেসে সরকারীভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল।

দ্বিতীয় অলিম্পিকে ১৫টি দেশ অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ১২১। ভারতের যোগদান এই অলিম্পিকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতীয় এ্যাথলেট ডব্লু. জি. পিটচার্ড বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তার প্রসঙ্গে আমাদের দেশে বিশেষ কিছু পাওয়া না গেলেও আলেকজান্ডার এস অয়েন্ডার লিখেছেন—"that in the 2nd Olympic held in 1900, an Indian athleth Mr. W. G. Pritchard secured the second position in 200 metres and 200 metres Hardle run, these securing 6 point for India in truck and field events" প্যারীতে পয়েন্ট গণনা হত কোন বিষয়ে প্রথম ৫ পয়েন্ট, দ্বিতীয় ৩ পয়েন্ট তৃতীয় ১ পয়েন্ট। এই হিসাব অনুসারে আমেরিকা ১৪০ পয়েন্ট, গ্রেট ব্রিটেন ৩১ পয়েন্ট, ফ্রান্স ২০ পয়েন্ট, ভারত ও হাঙ্গেরী ৬ পয়েন্ট পায়। প্রথম অলিম্পিকে গ্রীক মতে পয়েন্ট ছিল প্রথম ২ পয়েন্ট ও দ্বিতীয় ১ পয়েন্ট। এই হিসাবে আমেরিকা ২৩ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম ও গ্রীস ৫ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে।

অলিম্পিক ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংহতি ভ্রাতৃত্ববোধ

ও মানবীয় মূল্য বোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। অলিম্পিকের প্রধান শ্লোগান ছিল মানুষ অপরাজেয়, মানুষ সব কিছু জয় করতে পারে, অলিম্পিকের আদর্শ হলো—Fitius, Altius, Fortius. (তুরীয়ান, তুঙ্গীয়ান, বলীয়ান)।

অলিম্পিকের মহান আদর্শ পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন তোলে ফলে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে যোগদানকারী দেশের ও প্রতিযোগীর সংখ্যা এবং দর্শকের সংখ্যাও। পরপর বিভিন্ন দেশে অলিম্পিকের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে এইভাবে সংখ্যাগুলি বাড়তে থাকে—তৃতীয় অলিম্পিকে ৪৯৬ জন প্রতিযোগী ১১টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, চতুর্থ অলিম্পিকে ২০৫৯ জন (৩৬ জন মহিলা সহ) ২২টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, পঞ্চম অলিম্পিকে ২৮টি দেশের ২৫৪১ জন অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫৭ জন মহিলা ছিলেন। সপ্তম অলিম্পিকে ২৯টি দেশের ২৬০৬ জন প্রতিযোগী ছিলেন যার ৬৩ জন মহিলা। অষ্টম অলিম্পিকে দেশের সংখ্যা আরও বাড়ে। ৪৪টি দেশের ৩০৯২ জন প্রতিযোগী ছিলেন, যার ১৩৬ জন মহিলা। নবম অলিম্পিকে ৪৬টি দেশের ২৯০ জন মহিলা সহ ৩০১৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। দশম অলিম্পিকে অবশ্য প্রতিযোগীর ও দেশের সংখ্যা কমে যায়। ৩৭টি দেশের ১৪০৮ জন প্রতিযোগী এই অলিম্পিকে যোগদান করেন যার মধ্যে ১২৭ জন ছিলেন মহিলা। একাদশ অলিম্পিকে ৪৯টি দেশের ৪০৬৯ জন প্রতিনিধি ছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন ৩২৮ জন মহিলা। দ্বাদশ অলিম্পিক জাপানের টোকিওতে প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যুদ্ধ অলিম্পিক আন্দোলনে আবার নখদন্ত বিস্তার করে। স্থান পরিবর্তন করে ফিনিসে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আই, ও, সি, করে, কিন্তু হিংসার উন্মত্ত লেলিহান শিখা সেখানেও থাবা উঁচিয়ে বলে—তফাৎ যাও। ফলে অলিম্পিক স্থগিত হয়ে যায়। ত্রয়োদশ অলিম্পিকও মহাযুদ্ধের ফলে লন্ডনে হতে পারেনি। চতুর্দশ অলিম্পিক আবার বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে লন্ডনে। যুদ্ধের রণদামামা থামার সঙ্গে সঙ্গেই এই খেলার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পর পর দুটি অলিম্পিক বাতিল হয়ে গেলেও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক অবিচ্ছেদ্য আন্দোলন বলে চিহ্নিত করার জন্য ক্রমিক হিসাবে লন্ডন অলিম্পিককে চতুর্দশ অলিম্পিক রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই অলিম্পিকে ৫৯টি দেশের ৪৪৬৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫৮ জনে।

পঞ্চদশ অলিম্পিক নানা দিক থেকে স্মরণীয়। ১৯৫২ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত এই অলিম্পিকেই সর্ব প্রথম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া যোগদান করে। শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ও ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

অলিম্পিকের মূল আদর্শ অংশ গ্রহণ, জয়লাভ বা পদক লাভ প্রধান লক্ষ্য নয়। কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অলিম্পিক গ্রামকে ক্রীড়া জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারগুলি উপস্থিত করার কেন্দ্র রূপে বিবেচনা করা হয়। অতীতের অলিম্পিকে অলিম্পিয়ারা গ্রামে মূল অনুষ্ঠানের এগার মাস আগে প্রতিযোগীরা হাজির হতেন। তাদের নিয়মিত অনুশীলন, শরীর চর্চা ও তালিমের ব্যবস্থা থাকত। কঠোর শৃংখলা ও অনুশীলনের এগার মাসের শিক্ষানবীশ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটত মূল ক্রীড়াঙ্গণে। এখনও অতীতের মত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্মত অলিম্পিক গ্রাম তৈরী করা হয়। সেখানে ক্রীড়া চর্চার পাশাপাশি মানসিক বিকাশের জন্য শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থাও থাকে।

অলিম্পিক আদর্শের কথা স্মরণে রেখেও বলা প্রয়োজন সোভিয়েট রাশিয়ার অংশ গ্রহণের ফলে অলিম্পিক ক্রীড়ার গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। পদক বিজয়ে আমেরিকার নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের রাশ টেনে ধরে খেলাধুলার জগতেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অপরূপ সাফল্য এই অলিম্পিকে চমক সৃষ্টি করে। পদক বিজয়ে অবশ্য সেবারও আমেরিকা শীর্ষে ছিল। আমেরিকা পায় ৪০টি স্বর্ণ, ১৮টি রৌপ্য এবং ১৭টি ব্রোনজ (বেসরকারী হিসাব মতে ৬১৫ পয়েন্ট)। আর সোভিয়েট রাশিয়া পায় ২২টি স্বর্ণ, ৩০টি রৌপ্য এবং ১৫টি ব্রোনজ (বেসরকারী হিসাব মতে ৫৪১ পয়েন্ট)। আর একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হাঙ্গেরী স্বর্ণ পায় ১৬, রৌপ্য ১০ এবং ব্রোনজ ১৫টি যার বেসরকারী পয়েন্ট ৩০৫। সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি ৫,০০০ মি, ১০,০০০ মিটার ও ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণ পদক লাভ করে মানব ইঞ্জিন নামে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়। মানব ইঞ্জিন এমিল জেটোপ্যাকের স্ত্রী ডানা জেটোপ্যাকও ১৬৫-৭ ফুট জেভিলিন নিক্ষেপ করে অতীতের সমস্ত বিশ্ব রেকর্ড ম্লান করে দেন।

পঞ্চদশ অলিম্পিকে যে চমক জাগানো আবির্ভাব সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ঘটিয়েছিল তা পরবর্তী কালেও অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববাসী আজ একথা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতি মানবজীবনের প্রাথমিক দৈনন্দিন চাহিদাগুলির সমস্যা মীমাংসায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ধনতান্ত্রিক বিশ্বকে শুধু টেক্কা দেয়নি, মানব জীবনের বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সমাজব্যবস্থা বিশল্যকরণীর মত কাজ করেছে। খেলাধুলায় অগ্রগতি একটি ধারাবাহিক পরিকল্পনা মাফিক ব্যবস্থার ফসল মাত্র, তাই মাত্র সাতটি অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে সোভিয়েট রাশিয়া এপর্যন্ত ৬৮৩টি পদক পেয়েছে (স্বর্ণ ২৫৮, রৌপ্য ২২১, ব্রোনজ ২০৪), আর আমেরিকা পেয়েছে ৬০৫টি পদক। প্রসঙ্গত আমরা ৬৬ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষের করুণ চেহারা স্মরণ না করে পারিনা। দুই সমাজব্যবস্থার মৌলিক তফাৎটি এক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে। লজ্জায় ঘৃণায় আমরা মুখ লুকাই যখন দেখি আমাদের প্রতিযোগীরা প্রায় শূন্য হাতেই ঘরে ফিরে আসছে।

২২তম অলিম্পিক ১৯ জুলাই শুরু এবং শেষ ৩ আগস্ট। গত এক শতাব্দীর আবহাওয়া কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে বলা হয়েছে, এই সময় মস্কোর আবহাওয়া থাকবে মনোরম, প্রতিযোগিতার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। বেশীর ভাগ খেলাই হবে মস্কোতে। শুধু ইয়টিঙ প্রতিযোগিতা হবে তাল্লিনে এবং বাছাই পর্যায়ের ফুটবল ম্যাচগুলি লেনিনগ্রাদে কিয়েভ ও মিনস্কে অনুষ্ঠিত হবে। আশা করা হচ্ছে ২১টি খেলার ২০৩টি প্রতিযোগিতায় ছয় হাজার ক্রীড়াবিদ অংশ গ্রহণ করবেন।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মস্কোয় যাতে অনুষ্ঠিত না হয় তার জন্য বিশ্ববাসীর পয়লা নম্বরের শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘকাল ধরে চক্রান্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে চূড়ান্ত ঘোষণার সাথে সাথে মস্কো প্রস্তুত হতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী শিবির চায় না যে, বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদরা মস্কোর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সীমাহীন সাফল্যগুলিকে স্বচক্ষে দেখতে পায়। এমনিতেই অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যেভাবে সাফল্য অর্জন করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে তারা যেভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় নিজেদের হাজির করেছে, তাতে সাম্রাজ্যবাদী শিবির আতঙ্কিত। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যে মিথ্যা প্রচার দীর্ঘকাল ধরে তারা করে এসেছে তার মুখোশ খশে পড়ছে, প্রচারের উলঙ্গ চেহারা আরও নির্মমভাবে ধরা পড়ে যাবে যদি বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ ও দর্শকরা মস্কোর অলিম্পিকে যোগদেন। তাই তারা ছুতো খুঁজছিল। অবশেষে আফগান জনগণের আহ্বানে সোভিয়েট সৈন্য সে দেশে অনুপ্রবেশ করার ঘটনাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তুরুপের তাসের মত পেয়ে গেছে। এই তুরুপের তাস রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টায় তারা মরিয়া।

প্রেসিডেন্ট কার্টার একা নন। তার সঙ্গে আছেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার প্রমুখ পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রনায়করা। তারা মস্কো অলিম্পিক বয়কট করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালায়। নানা রকম অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, প্রতিযোগীদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিশ্বখ্যাত মুষ্ঠিযোদ্ধা মহম্মদ আলিকে দূত করে আফ্রিকার দেশে দেশে অভিযানে পাঠায়। কিন্তু তাতেও খুব বেশী সাড়া মেলেনি।

একজন ক্রীড়াবিদের জীবনে অলিম্পিকে যোগদানের সম্মান ও সুযোগ বার বার আসে না। অলিম্পিকে পদক জয়ের স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যারা প্রস্তুত হয়েছে তাদের কার্টার সাহেব ভয় ভীতি প্রলোভন দেখিয়েও অবদমিত করতে পারেনি, অনেক প্রতিযোগী যোগ দিচ্ছেন; এমনকি অনেক অলিম্পিক কমিটি দেশের শাসক বর্গের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শান্তি ও মৈত্রীর পতাকা অলিম্পিকের পতাকা তুলে নিয়েছেন।

৮৩টি দেশ এবার মস্কো অলিম্পিকে যোগদান করেছে। মস্কোয় ন্যাটো চুক্তি ভুক্ত অনেকগুলি দেশের উপস্থিতি এবং অস্ট্রেলিয়ার মত দেশের যোগদান কার্টারের মানবীয় অধিকার ও শান্তি ধ্বংস করার চক্রান্তকে চপেটাঘাত করবে। আঙ্গোলা, ভিয়েৎনাম, লাওস, বোস্টয়ানা, জিম্বাবোয়ে, সেচিলিজ প্রভৃতি দেশের প্রথম যোগদান অলিম্পিক আন্দোলনের অবিরাম সাফল্যেরই ইঙ্গিতবাহী। নারী পুরুষের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে এবার কোয়ায়েতের মহিলা ক্রীড়াবিদরা মস্কোয় আসছেন। কোয়ায়েতের ইতিহাসে এই রকম ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

আমেরিকার নির্লজ্জ ভূমিকার প্রতিবাদে সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনগণ সোচ্চার হয়েছেন, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি আইরিশ ভদ্রলোক লর্ড কিলানিন খেলাধুলাকে রাজনীতির সূক্ষ্ম জটিলতায় আবদ্ধ না রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। অলিম্পিকের আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরবার আহ্বান জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের অলিম্পিক কমিটি, ক্রীড়াবিদ, এমনকি মার্কিন অলিম্পিক কমিটির সভাপতি রবার্ট কেন ও বয়কট সিদ্ধান্তকে তীব্র সমালোচনা করেছেন।

বয়কট আন্দোলনের তামাশা সত্ত্বেও মস্কো নিপুণভাবে প্রস্তুত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের আদর্শ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি মানুষ কর্মযজ্ঞে মেতে উঠেছেন। সামান্য কাজকেও অসামান্য গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সম্পাদন করা হচ্ছে। কোন কাজই গুরুত্বহীন নয়, কোন মানুষই অপ্রয়োজনীয় নন। মানুষের এই মর্যাদা ও সম্মান দেখে, কাজের এই অপূর্ব শৃংখলা দেখে, খেলাধুলার প্রতি এই মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা দেখে বিখ্যাত ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক মারচেল্লো মারচেলিনি বলেছেন—রোম অলিম্পিককে যদি সংগীতের অলিম্পিক বলা যায়, টোকিওকে বলা যায় কারিগরীবিদ্যার অলিম্পিক, মেক্সিকো সিটির অলিম্পিককে যদি গ্রাফিক শিল্পের অলিম্পিক বলা হয়, মিউনিখকে বলা হয় স্থাপত্যবিদ্যার অলিম্পিক এবং মন্ট্রিল অলিম্পিকের নাম দেওয়া যায় সংকটের অলিম্পিক, তাহলে মস্কো অলিম্পিককে বলতে হবে মানুষের অলিম্পিক।

বলাবাহুল্য মারচেল্লো মারচেলিনি ক্রীড়াবিদ বা ক্রীড়া সংগঠক নন। শান্তি-মৈত্রী-সংহতির মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত অলিম্পিক মানুষের ক্ষমতার সীমাহীনতার প্রতীক। সেই মানুষের বন্ধন মুক্ত করে দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। সোভিয়েট রাশিয়া তার প্রথম পার্থ। তাই আমরাও প্রতিধ্বনি তুলে বলতে চাই মস্কো অলিম্পিক মানুষের অলিম্পিক। এর সাফল্য অনিবার্য।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি ব্লক যুব উৎসবে জিমনাস্টিক প্রদর্শনী।

রোমানিয়ার কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার একাদশ সম্মেলন

অমিতাভ বসু

"সমসাময়িক কালের প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে যুবশক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানবসমাজে নতুন নতুন পরিবর্তন বহন করে আনতে যুবসমাজই সবচেয়ে সজীব, উৎসাহী শক্তি......" যুবসমাজের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য উপস্থিত করেছেন রোমানিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি, নিকোলে চসেস্কি।

এই বক্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে সমাজবাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে বীর দর্পে এগিয়ে চলেছে রোমানিয়া। সামাজিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছে রোমানিয়ার যুবসমাজ, জনগণ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে।

রোমানিয়ার যুবসমাজ, জনগণের অতীত ইতিহাস শোষণের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের ইতিহাস। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গর্ভেই ১৯২১ সালে রোমানিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে রোমানিয়ার যুব সংগঠনের ইতিহাস অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত। ১৯২২ সালে রোমানিয়ার সমাজবাদী যুবসংগঠনের জন্ম। বিশেষ করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সংগ্রামের ভূমিকায় এই যুব সংগঠন ভাস্বর হয়ে আছে। নিকোলে চসেস্কি ১৯৩৯-৪৪ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রোমানিয়ার যুব কমিউনিষ্ট সংঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সংগ্রামের সাফল্যে, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে রোমানিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম হয়। বিগত ৩৫ বৎসর ধরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎখাত করে, প্রধান প্রধান শিল্প, খনি, ব্যাঙ্ক, বীমা এবং পরিবহণ ব্যবস্থা জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে এই দেশের জনগণের সঙ্গে যুবশক্তি সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে অগ্রসর করে নিয়ে চলেছে। "এমন একটি দেশ যার চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কৃষি ভিত্তিক, যেখানে নিরক্ষর মানুষ ছিল ৪০ লক্ষ সেই রোমানিয়া রূপায়িত হয়েছে শিল্প ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকারী দেশে। ব্যাপক শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় খামার এবং কৃষি সমবায় আধুনিকীকরণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে......"

এই প্রথম ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ, রোমানিয়ার কমিউনিস্ট যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে তাদের একাদশ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। ৫ই মে সকাল ৯টায় একাদশ সম্মেলনের উদ্বোধন হলো স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল হলে। হলটি অনেকটা আমাদের নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মত। ৮০০০ লোকের বসার উপযোগী আসন ব্যবস্থা এবং গ্যালারি সহ একটি খোলা মঞ্চ। সম্মেলন উদ্বোধন করলেন নিকোলে চসেস্কি—"কমিউনিষ্ট যুব সংগঠন, কমিউনিষ্ট ছাত্র সংগঠন, পাইওনিয়ার সংগঠন এবং শিশু সংগঠনের এই একাদশ সম্মেলন সমাজতান্ত্রিক রোমানিয়ার যুব ও শিশুদের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সম্মেলন কমিউনিষ্ট যুব তথা দেশের সমগ্র যুব সমাজের সামনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বহুমুখী বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে তুলে ধরবে।"

সম্মেলনের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় প্যালেস অফ রিপাবলিক-এ (প্রজাতন্ত্র প্রাসাদে)। এই প্রাসাদটি রোমানিয়ার রাজধানী, বুখারেস্ট শহরের কেন্দ্রে। এর একটু দূরেই কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর। আর এক পাশে কমিউনিষ্ট যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর। এগুলিও এক একটি প্রাসাদ-তুল্য। সম্মেলন ৭ই মে পর্যন্ত।

১৯৭৯ সালে কমিউনিষ্ট যুব সংঘের সদস্য সংগৃহীত হয় ৩২৫০,০০০ হাজার। কারখানা, খামার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং সামরিক কেন্দ্র ভিত্তিক কমিউনিস্ট যুব সংস্থার ইউনিটগুলি গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত ইউনিট থেকে নির্বাচিত ২৫০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। বিদেশী প্রতিনিধি ছিলেন ১৩০ জন। ২৫০০ প্রতিনিধির মধ্যে শ্রমিক ১২৮২, কৃষক ৩৫০, ইঞ্জিনিয়ার ১৭৫, শিক্ষক ৭৫, ৩৭৫ স্কুলের ছাত্র, ১০৬ জন কলেজের ছাত্র, ৫০ জন ডাক্তার এবং অর্থনীতিবিদ, ৭৫ জন জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ১২ জন অফিস কর্মচারী। প্রতিনিধিদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা শতকরা ৪৬·৬।

কমিউনিষ্ট যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থাপিত এক দীর্ঘ প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ৬৩ জন। প্লেনারী অধিবেশনে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের পদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরনের। এই একই রিপোর্টের উপর সর্বোচ্চ সম্মেলনের পূর্বে বিকেন্দ্রীত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৪৬৩ জন। এদের আলোচনার মর্মবস্তু উপস্থিত করেন ঐ ৬৩ জন প্রতিনিধি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় হচ্ছে কত বেশি বেশি যুব সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সতেজ ও সজীব মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহণ করছেন। কিভাবে, কতটা যোগ্যতা অর্জন করছেন, কি লক্ষ্য ছিল, কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন, দুর্বলতা কোথায়, সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে তাকে অতিক্রম করার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখছিলেন তাদের মাতৃভাষায়—রোমানিয়া ভাষায়। কিন্তু একই সময় ছয়টি ভাষায় অনূদিত হয়ে হেডফোনের মাধ্যমে ভিনদেশীয় প্রতিনিধিদের শোনাবার ব্যবস্থা ছিল।

কমিউনিষ্ট যুব সংঘের সম্মেলন সমাজতান্ত্রিক রোমানিয়ার প্রতিটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সময় সীমা অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যুবদের বিগত-দিনের বিশাল এবং সুন্দর কাজগুলির সঙ্গে ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের পরিচিতি ঘটানো। এই কর্মসূচী শুরু হয় ২রা মে থেকে।

মে দিবসের পোস্টার, ফেস্টুন, লাল পতাকায় মুখরিত বুখারেস্ট শহর। গোটা বুখারেস্ট শহরে রাস্তার দুধারে, মাঝখানে চেরি, স্ট্র বেরী, ঝাউ-এর বাগান। মাঝে মাঝে লাই-লাক, তুলিফ এবং আরো নানা রং-এর ফুলের বাগান। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধব্ ধব্ করছে চারিধার। অজস্র ফুলের দোকান। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলের হাতেই ফুল। কাজে যাচ্ছে ফুল নিয়ে কাজ থেকে ফিরছে ফুল নিয়ে। কাজের সিফ্ট চেঞ্জ হলো। ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে নিযুক্ত মহিলারা, যাদের স্থলে যোগ দিলেন তাদের হাতে তুলে দিলেন নানা রং-এর একতোড়া ফুল। নিয়মিত এই ঘটনা, সত্যিই লক্ষ্যণীয়। রাস্তায় অজস্র ট্রাম, বাস, ট্রলি-বাস, বৈদ্যুতিক বাস, মোটর গাড়ী চলছে, চলছে প্রশস্ত পথ ধরে অথবা কম প্রশস্ত পথ ধরে। কোথাও ভিড় নেই বা ভিড়ে পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে দেখা যায় নি।

প্রত্যেক ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে একজন করে গাইড্ এবং দোভাষী। যুব-ছাত্রদের সাংস্কৃতিক প্রাসাদে যেতে হলো এক সন্ধ্যায়। যুব-ছাত্ররা নিজেরাই গড়ে তুলেছেন ত্রিতল বিশিষ্ট সেই প্রাসাদ। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যুব-ছাত্ররা এইখানে সংস্কৃতি বিশেষতঃ নাট্য, সংগীত, নৃত্য কলা প্রসঙ্গে পড়াশুনা, মহড়া এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকেন। প্রাসাদের বাইরে এবং ভিতরে অপূর্ব ওয়ালপেন্টিং এবং ফ্রেসকোর কাজ। স্থপতিরাই শিল্পী। কোনো আতিশয্য নেই প্রাসাদের নির্মাণ-ভঙ্গির মধ্যে। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন তার অভাব কারো মনে হলো না। ঘুরিয়ে, ঘুরিয়ে দেখানো হলো। এই একটি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২০০০ হাজার যুব-ছাত্র। এরকম আরো কেন্দ্র আছে সারা দেশে।

সেদিন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল ট্রান্সিলভেনিয়া, মলডে-ভিয়া এবং ওয়ালেশিয়ার লোকনৃত্য আর গান। দুটি ব্যালে নৃত্যও প্রদর্শিত হলো। সুরে, ছন্দে, তাল, লয়ের ঐক্যতানে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলো সেই সন্ধ্যা। বীরত্বপূর্ণ অতীত কাহিনী প্রাণের আবেগে মাতিয়ে তুলেছিলো ব্যালের মাধ্যমে। ক্যান্টিন ঘরে বসে এই সমস্ত শিল্পী যুব-ছাত্রদের সঙ্গে পরে পরিচয় হলো।

'ঐতিহাসিক মিউজিয়াম'—সত্যই বিস্মিত হতে হয়। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে আধুনিক কালের গোটা রোমানিয়ার উল্লেখযোগ্য ঘটনা, প্রতিভা এবং সৃষ্টিশীলতার নিদর্শনগুলিকে নিখুঁত, ধারাবাহিকভাবে, স্থান-কালের সমন্বয়ে উপস্থিত করা হয়েছে এই মিউজিয়ামে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দেখেও ছয়ঘণ্টা লাগলো। বড় বড় এক একটা হল ঘর এক একটি শতাব্দী। সমস্ত মানুষের চেতনায় একটা সামগ্রিক চিন্তা তুলে ধরার কি অপূর্ব 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদী' প্রয়াস এই মিউজিয়াম তা প্রমাণ করে।

একটি ইলেক্ট্রনিক কারখানা, ১০ হাজার কর্মী কাজ করেন। শতকরা ৯০ জনের বয়স ১৮ থেকে ২৩-এর মধ্যে। কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ২৯০০। কারখানা ইউনিটের সম্পাদক একজন মহিলা, ৫৫ বৎসর বয়স, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী মহিলা। এছাড়া কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার সদস্য ৩০০০। মহিলা কর্মী শতকরা ৬০ জন। কাজের সময় ৮ ঘণ্টা। ন্যূনতম বেতন ১৮০০ লেই এবং সবচেয়ে বেশীর বেতন ৩২০০ লেই। ডলারের হিসাবে এক লেই সমান ২ টাকার কিছু বেশী হবে। কারখানার ভিতর ঝক্‌ঝক্ তক্-তক্ করছে চারদিক। কর্মীদের গায়ে ধব-ধবে পোষাক-পরিচ্ছদ। দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবরা কারখানায় কাজে নিযুক্ত হন এবং পরে তারা উচ্চ শিক্ষা অথবা বিশেষ উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। এই কারখানা সম্পর্কিত কারিগরী কলেজ এবং স্কুল আছে। শতকরা ৯০ জন কর্মী বিশেষ স্নাতক শিক্ষা অর্জন করে বিশেষ বিশেষ দক্ষ কাজে তারা নিযুক্ত আছেন। পার্টি নেতৃত্বের আদর আপ্যায়নে সত্যই মোহিত হতে হয়। গর্ব এবং বিনয়ের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে এদের ব্যবহারে।

'ঐতিহাসিক উদ্যান' এর মধ্যে প্রায় ৩ কিঃ মিঃ দীর্ঘ একটি হ্রদ। এই উদ্যান থেকেই (তখন ছিল জঙ্গল) প্রথম ১৯৩৯ সালে নাৎসি বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়। তাই উদ্যানটির নাম ঐতিহাসিক উদ্যান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। ১২৫ রকমের একটি গোলাপ বাগান এই উদ্যানের মধ্যে। বসন্তের শুরু গোল পেরও প্রায় শেষ। উদ্যানের মধ্যে খেলাধুলার স্থান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। হ্রদে ভ্রমণের জন্য বড় বড় লঞ্চ, স্পিড্ বোট, দাঁড় বাইবার নৌকো, ইয়াস্ট হ্রদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

ছুটির মেজাজ নিয়ে প্রায় ৫০০০ হাজার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী গ্রাম, শিল্পাঞ্চল, শহর থেকে চলে আসেন। সে সময় মে দিবসের ছুটি চলছিল। ওখানে মে দিবসের ৪ দিন ছুটি। উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল গোটা উদ্যানটি। অফুরান প্রাণের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে উদ্যানের মাটি আর হ্রদের জল।

বেকার যুবক বা যুবতীর সন্ধান ৮ দিনের মধ্যে পাওয়া গেল না। বেকার শব্দটাই ওদের কাছে অজানা। বিগত বিশ বছরে আয় বেড়েছে অনেক কিন্তু জিনিষ পত্রের দাম বিশ বছর আগে যা ছিল আজও তাই আছে। ভিখারী চোখে পড়ে না।

সম্মেলনের শেষের দিনে নাদীয়া কমানেসীর সঙ্গে পরি-চয় করিয়ে দিলেন নব-নির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। অপূর্ব সুন্দরী এবং সরল। কথা বলার সময় মনেই হচ্ছিল না এই সেই মন্ট্রিল অলিম্পিক তারকা। এতটুকু অহমিকা নেই। অল্প স্বল্প ইংরাজী জানেন। আমি ঠাট্টা করে বললাম—দেখত, তোমার উপস্থিতিতে আমাদের অটো-গ্রাফ্ দেওয়া কি শোভা পায়। কিশোর, কিশোরীরা, আমাদের অটোগ্রাফ্ নেওয়ার জন্য ঘিরে ধরেছিল। নাদীয়া কমানেসী কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সম্মেলন থেকে ১০ জনের সম্পাদকমণ্ডলী এবং ২৩ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হন। প্যানটেলিমন গ্যাভেনেস্কু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে যুব দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

কথা হচ্ছিল সম্পাদকমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যদের সঙ্গে। মূলত আমাদের দেশের অবস্থা, যুবকদের অবস্থা এবং ওদের ভবিষ্যৎ গড়ার কথা। কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার নেতৃত্ব মনে করেন আগামী পাঁচ বৎসর তাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। সমস্যা আছে। এ সমস্যা তাদের অতিক্রম করতেই হবে। সেই বিপ্লবী আবেগ এবং মনোভাব নিয়েই তারা কথা বলছিলেন। তাঁদের বক্তব্যের মূল কথাটা হলো—"এই বহুমুখী বিকশিত সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজ তাদের উচ্ছ্বলতা এবং বিপ্লবী মনোভাব নিয়েই সামনের সারিতে থাকবে। তারা সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, গবেষণা সংস্কৃতির অঙ্গনে উপস্থিত থাকবে। কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার সমগ্র কর্মসূচী বিপ্লবী সাম্যবাদী মনোভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, দেশের প্রতি অসীম ভালবাসা এবং সমগ্র জনগণের স্বার্থের উদ্দেশে নিয়োজিত হবে।"

সম্মেলনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভিন্ন দেশীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। কিছু দোভাষী কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী। তারাই প্রধানত এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সাহায্য করতেন।

[সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদ : ২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সরকার ও জনসাধারণকে সতর্কভাবে এ আন্দোলনকে বিস্তারে বাধা দিতে হবে। আর আদিবাসী অঞ্চলে কোন বিদেশী সংস্থা যাতে সক্রিয় থাকতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। ঝাড়গ্রামে নাকি সম্প্রতি বিদেশীদের আগমন অনেক বেড়েছে এবং এর পর থেকেই নাকি সেখানে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা কিছুদিন থেকে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবীতে সোচ্চার হয়েছে। ঝাড়গ্রাম ছাড়াও এরা পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় নানা ধরনের গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা চাইছে, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ পাশাপাশি কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি পৃথক রাজ্য গড়তে। এ ব্যাপারে ঝাড়গ্রামে কিছু পোষ্টারও পড়েছে, দেয়াল লিখনও চলছে। তবু এও সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তেই। কারণ বিদেশীচক্র এখানে বেশ সক্রিয়। এ আন্দোলনের সংগঠকদের দাবী—ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে কোন উদ্বাস্তু আনা চলবে না এবং সকল সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে ঝাড়খণ্ডীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে দেশের যে কোন অংশের বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন হঠাৎ কোন উদ্দেশ্যহীন বিচ্ছিন্ন আন্দোলন নয়। এর পেছনে রয়েছে এক একটা ষড়যন্ত্র এবং উদ্দেশ্য। এর জন্ম ও বিস্তার রাজনৈতিক কারণেই। এবং এর মদত দেয় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং সাম্রাজ্যবাদী কিছু বিদেশী শক্তি। সেই বিদেশী শক্তির অনুচর হিসাবে চুপিসারে কাজ করে যাচ্ছে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি। এরাই দেশের মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগে তাদের বিভেদমূলক আন্দোলনে প্ররোচিত করে। পশ্চিমবঙ্গেও ওরা জাল পাতার চেষ্টা করছে।

পরিশেষে বলি, আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদমূলক আন্দোলনের তরঙ্গ বইছে তার প্রধান শিকার হচ্ছে কিন্তু বাঙ্গালীরা। এরা সেই বাঙ্গালী, যারা দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। আর সেদিন এরা উদ্বাস্তু হয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থেই। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেন কখনও না ভোলেন যে সেদিন তাঁদেরই কেউ কেউ এদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন এদের স্বার্থ সুরক্ষার এক সুন্দর প্রতিশ্রুতি। সেই বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর দলকে যদি কোন অজুহাতে ভারতের কোন অংশে বসবাস করতে দেয়া না হয় তবে তাঁরা আজ যাবেন কোথায়? স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পরেও কি সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের আগুনেই তাদের দগ্ধ হতে হবে?

কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে কম খরচে যৌথ শৌচাগার-এর মডেল দেখান হচ্ছে

জনসংখ্যা সমস্যা ও সমাজতন্ত্র

অগাস্ট বেবেল

জনাধিক্যের আতংক

এমন লোক আছেন যাঁরা জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুতর ও আশু সমস্যার সমাধানের যোগ্য বিষয় বলে বিবেচনা করেন। কারণ, এখনই এটা আতংকজনক হয়ে পড়েছে। এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়েই প্রয়োজন। কেননা, মানুষের আহার্য ও বসবাস ক্রমবর্ধমানহারে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত। ম্যালথাসের সময় থেকেই লোকসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ম সম্পর্কে ব্যাপক বিতর্ক হয়ে আসছে। তাঁর একদা-বিখ্যাত ও অধুনা-কুখ্যাত জনসংখ্যা নীতির ওপর রচনায় তিনি বলেছেন—জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে (১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২) আর খাদ্য বাড়ে গাণিতিক হারে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)। এই রচনার ওপর কার্ল মার্ক্স মন্তব্য করেছেন, এটা স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী, হালকা এবং স্যার জেমস স্টিওয়ার্ট, টাউনসেন্ড, ফ্রাঙ্কলিন ওয়ালেস থেকে পেশাদারী-অলঙ্কারপূর্ণ-ধর্মপ্রচারের সাহিত্যিক-চৌর্যাপরাধের একটি টুকরো মাত্র" এবং এটাতে "একটি লাইনও নিজস্ব নয়।" এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হ'ল: অতি দ্রুত জনসংখ্যা ও খাদ্যসরবরাহে অসঙ্গতি দেখা দেবে; এই অবস্থা অনিবার্যভাবে ব্যাপক দৈন্য ও পরিণামস্বরূপ ব্যাপক মৃত্যু ডেকে আনবে। কাজেই "জন্মনিরোধ অবলম্বন করা" অত্যাবশ্যক। পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম ব্যক্তিদের বিয়ে করতে দেওয়া অনুচিত। অন্যথা, তার বংশধরদের "প্রকৃতির কোলে" স্থান হবে না।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির আতংক অনেক পুরনো। এই আতংক গ্রীস ও রোমান আমলেও ছিল এবং মধ্যযুগের অবসানের সময়েও ছিল। প্লেটো এবং এরিস্টটল, রোমান ও মধ্যযুগের পাতিবুর্জোয়ারা সবাই এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এর প্রভাবে ভলটেয়ারও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই বিষয়ের ওপর বই লেখেন। অন্যান্য লেখকও তাঁকে অনুসরণ করেন। সব শেষে ম্যালথাসের রচনায় এই আতংক অত্যন্ত শক্তিশালী অভিব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হয়।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, তখন সবসময় জনসংখ্যার মাত্রাধিক্যের আতংক দেখা দেয়। তখন যে সাধারণ অসন্তোষ দপ্ করে ছড়িয়ে পড়ে, জনসংখ্যার আধিক্য ও খাদ্যের স্বল্পতাই তার কারণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়, খাদ্য কিভাবে উৎপাদিত ও বণ্টিত হয় তা নয়।

মানুষ দ্বারা মানুষের সবরকমের শোষণের ভিত্তি হচ্ছে শ্রেণীশাসন যার প্রথম ও প্রধান উপায় হল জমি কুক্ষিগত করা। সাধারণ সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। মানুষকে বিত্তহীন করে বিত্তবানদের সেবা করেই জীবিকা অর্জনে বাধ্য করা হয়। এই অবস্থায় পরিবারে সামান্য নবাগতকেও বোঝা বলে মনে হয়। জনাধিক্যের (ওভারপপুলেশন) ভূত মরীচিকার মত দেখা দেয়। এটা সেই পরিমাণে আতংক সৃষ্টি করে যে পরিমাণে জমি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে উৎপাদন ব্যাহত করে। তা ছাড়া জমি উপযুক্তভাবে চাষ না হওয়ার জন্য কিংবা ভাল জমিগুলি পশুচারণে পরিণত করার ফলে অথবা জমির মালিকের শিকারের সখ মেটাতে জমি সংরক্ষণ করার জন্য। খাদ্য উৎপাদনের জন্য এই জমি আর পাওয়া যায় না। রোম ও ইতালি খাদ্যসংকটে কষ্ট পায় যখন দেশের জমি মাত্র তিন হাজার জমিদারের হাতে থাকে। "জমিদারীগুলিই রোমের সর্বনাশের কারণ"—সেখানে এই ধ্বনিই তখন চীৎকৃত হয়। ইতালির জমি পরিণত হয় সম্ভ্রান্ত মালিকদের সুবিস্তীর্ণ শিকারভূমি ও সৌখীন উদ্যানে। দাসশ্রমিক দিয়ে কৃষিকাজ ব্যয়বহুল বলে বহু জমি পতিত রাখা হয়। এর চাইতে আফ্রিকা বা সিসিলি থেকে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য দামে সস্তা পড়ে। এটা খাদ্যশস্য থেকে মুনাফাবাজির দরজা খুলে দেয়। এই ব্যবসায় রোমের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরা প্রধান ভূমিকা নেয়। পরে এই ব্যবসা দেশে জমিচাষে ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধনী ব্যক্তিরা দেশে জমি চাষ করার পরিবর্তে খাদ্য ব্যবসায়ে অধিক মুনাফা অর্জন করতে থাকে।

শাসকশ্রেণীগুলির সংখ্যাল্পতা রোধ করার উদ্দেশ্যে এই অবস্থায় শাসকশ্রেণী রোমের নাগরিক ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট অভিজাতবর্গদের বিয়ে ও সন্তান উৎপাদনে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্যদান সত্ত্বেও তারা বিয়ে করা ও সন্তান প্রজনন থেকে বিরত থাকেন। শাসকশ্রেণীগুলির অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়নি।

সমাজের উচ্চশ্রেণী ও পুরোহিতবর্গ শত শত বছর ধরে সবরকমের চক্রান্ত ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে অসংখ্য কৃষকের জমি আত্মসাৎ ও জনসাধারণের জমি কুক্ষিগত করার পর মধ্যযুগের অবসানের সময় অনুরূপ ব্যাপার সৃষ্টি হয়। যখন দীর্ঘ অবর্ণনীয় নির্যাতনের ফলে কৃষকরা বিদ্রোহ করে এবং ঐ বিদ্রোহ চূর্ণ করা হয়, তখন অভিজাতশ্রেণীর দস্যুতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমনকি ধর্মীয় রাষ্ট্রের সংস্কার সাধিত গির্জার অনুগামী রাজন্যবর্গ এই অপকর্ম অনুশীলন করে। চোরডাকাত, ভিখারি ও ভবঘুরেদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে অতীতের সব সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং রিফর্মেশনের (ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন সংঘটিত হয়। এটা ছিল মূলতঃ সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলন। অনেক দেশে এই আন্দোলন তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে—যেমন ১৫২৪-২৫ সালে জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ইংলন্ড ইত্যাদি জায়গায় বুর্জোয়া বিপ্লব) পর এই সংখ্যা চরমে ওঠে। জমির দখলহারা কৃষকরা দলে দলে ছুটল সহরের দিকে। কিন্তু উপরিবর্ণিত কারণে সেখানেও জীবনযাত্রার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। কাজেই "সর্বত্রই জনাধিক্য" বিরাজ করছিল।

ম্যালথাসের আবির্ভাব ইংলণ্ডের শিল্প বিকাশের সময়েই। তখন হারগ্রিভস, আর্করাইট ও ওয়াট প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রশিল্পে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রধানতঃ যন্ত্রশিল্পে এই প্রভাব পড়ায় কুটির

শিল্পে নিযুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়। সেই সময়ে ইংলণ্ডে ভূসম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হয় এবং বৃহদাকার শিল্পের প্রভূত বিকাশ ঘটে। একদিকে যেমন সম্পদ বাড়তে থাকে, অন্যদিকে ব্যাপক দারিদ্র ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়ে শাসক-শ্রেণীগুলির একথা ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে তদানীন্তন জগত সম্ভাব্য সকল জগতগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট জগত ছিল, এবং ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ণ ও অপরিমেয় সম্পদসৃষ্টির মাঝখানে ব্যাপক জনসাধারণকে নিঃস্ব করার মত স্ববিরোধী ঘটনায় আপাতঃদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত সমাধান খুঁজতে গিয়ে তারা অপরাধস্ক্ষালনের সুযোগ পায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি ও মুষ্টিমেয় জমিদারের হাতে জমির কেন্দ্রীভবনের ফলে যে অগণিত শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে তার পরিবর্তে অতি প্রজননের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর অতি দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর দোষ চাপানোর চাইতে সহজতর আর কিছু ছিল না। এই অবস্থায় ম্যালথাস "স্কুল ছাত্রের উপযোগী, লঘু ও পেশাদারী ধর্মপ্রচারের অলংকারপূর্ণ ভাষণের সাহিত্যিক চৌর্যাপরাধের অংশ" রচনা করে বর্তমান দুরবস্থার যে কারণ নির্দেশ করেন তাতে শাসকশ্রেণীর অন্তরের গভীর চিন্তা ও কামনাই প্রতি-ফলিত হয়েছে এবং দুনিয়ার সামনে শাসকশ্রেণীর সেই চিন্তা ও কামনার যৌক্তিকতাকে হাজির করেছে। একমহল থেকে এর পেছনে সোল্লাস সমর্থন এবং অন্যদিক থেকে এর প্রবল বিরোধীতাই এর কারণ। ম্যালথাস সঠিক সময়ে সঠিক কথা নিয়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের পক্ষে হাজির হয়েছেন এবং যদিও "তাঁর রচনায় একটিও নিজস্ব বাক্য নেই," তবুও তিনি এইভাবে একজন মহৎ ও বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন এবং সম্পূর্ণ মতবাদের সাথে তাঁর নাম সমার্থক হয়ে আছে।

(২) জনাধিক্যের কারণ

যে অবস্থা ম্যালথাসকে বিপদ সংকেত দেখাতে ও কর্কশ শিক্ষা দিতে প্ররোচিত করেছে তা তখন থেকেই যুগে যুগে বিস্তার লাভ করছে। শ্রমিকদের প্রতি তাঁর উপদেশ আঘাতের উপর অপমান-স্বরূপ। এটা যে ম্যালথাসের স্বদেশ গ্রেট-ব্রিটেনে শুধু ছড়িয়েছে তা নয়, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা-সম্পন্ন সব দেশেই এর বিস্তৃতি ঘটেছে। এই ব্যবস্থা ভূমি-লুণ্ঠন ও জনসাধারণকে যন্ত্র ও কারখানার দাসে পরিণত করেছে। এই ব্যবস্থা শ্রমিককে তার উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে,—তা জমিই হোক বা যন্ত্রই হোক এবং পুঁজিপতিদের কাছে তাকে সমর্পণ করেছে। এই পদ্ধতি নিত্যনতুন শিল্পশাখা নির্মাণ করে তা উন্নত ও কেন্দ্রীভূত করে; কিন্তু এটা বরাবর নতুন জনসমষ্টিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে ঘোষণা করে বেকারে পরিণত করে। প্রাচীন রোমের মত এটা আনুষঙ্গিক কুফল সহ 'লাটিফাণ্ডিয়া' বা জমি-দারীতে উৎসাহ প্রদর্শন করে। ইংলণ্ডীয় ধারায় ভূমি লুণ্ঠনে সর্বাধিক ক্লিষ্ট আয়ারল্যাণ্ড ইয়োরোপের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ১৮৭৪ সালে আয়ারল্যাণ্ডের ১২, ৩৭৮, ২৪৪ একর তৃণভূমি ও উৎকৃষ্ট পশুচারণভূমি ছিল, কিন্তু কর্ষণো-পযোগী জমি ছিল মাত্র ৩, ৩৭৩, ৫০৮ একর। প্রতি বছরই লোকসংখ্যা কমতে থাকে; অথচ, আরও বেশী কৃষিযোগ্য জমি তৃণভূমি ও পশুচারণভূমিতে এবং জমিদারদের শিকার ভূমিতে পরিণত করা হয়। ১৯০৪ সালে দাঁড়ায় ১৪, ৮০৫, ০৪৬ একর তৃণভূমি ও ২, ৩২৮, ৯০৬ একর মাত্র কৃষিযোগ্য জমি। তাছাড়া, কর্ষণোপযোগী জমির অধিকাংশ থাকে বিপুল-সংখ্যক ছোট থেকে আরও ছোট কৃষকদের হাতে যারা জমি থেকে প্রয়োজনীয় উৎপাদনে অসমর্থ। এই ভাবেই আয়ারল্যাণ্ড কৃষিজমি থেকে পশুচারণভূমিতে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনসংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ, এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষের কিছু বেশি, তাতেও বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ বাড়তি হয়ে পড়েছে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আইরিশদের বিদ্রোহকে এইভাবে অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যায়। জমির মালিকানা ও জমি কর্ষণের ক্ষেত্রে স্কটল্যাণ্ডেও অনু-রূপ চিত্র দেখা যায়। এই একই রকম অবস্থা হাঙ্গেরীতেও। সেখানে সাম্প্রতিক দশকে আধুনিক প্রগতির চিহ্ন বিদ্যমান। ইউরোপের অনেক দেশের চাইতে উন্নত জমিতে সমৃদ্ধ একটি দেশ আজ ঋণভারে জর্জরিত, জনগণ দারিদ্রক্লিষ্ট এবং মহা-জনের কৃপার ওপর নির্ভরশীল। হতাশ জনগণ ব্যাপকহারে দেশত্যাগ করছে। কিন্তু জমি এমন সব আধুনিক পুঁজিপতি রাঘববোয়ালদের হাতে কেন্দ্রীভূত যারা বর্বরভাবে বনভূমি ও কৃষিজমি স্বীয় স্বার্থসাধনে ব্যবহার করছে। ফলে হাঙ্গেরী অদূর ভবিষ্যতে শস্য রপ্তানিকারক দেশ থাকবে না। ইতালিতেও অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান। জার্মানির মত ইতালিও জাতীয় রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক বিকাশ উন্নত করেছে। কিন্তু পিডমন্ট, লোম্বার্ডি, টাসকেশী, রোমাগ্না ও সিসিলির পরিশ্রমী কৃষকরা ক্রমশঃ দরিদ্র হতে হতে ধ্বংসের সম্মুখীন। কয়েক বছর আগে যেখানে দরিদ্র কৃষকের দখলী জমিগুলি সযত্ন-পরিচালিত উদ্যান ছিল, আজ তা জলাভূমিতে পরিণত হতে শুরু করেছে। রোমের নিকটবর্তী ক্যামপাগ্নার লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি পতিত রয়েছে। ঐ এলাকা এককালে পুরনো রোমের অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু স্থানের অন্যতম ছিল। জলায় পরিণত জমিগুলি বিষাক্ত দুর্গন্ধ বাষ্প নির্গত করে। যদি যথাযথভাবে ক্যামপাগ্নার জল নিষ্কাশন ও জলসেচনের উত্তম ব্যবস্থা হয় রোমের অধিবাসীরা খাদ্যের একটা সমৃদ্ধ উৎস পেয়ে আনন্দিত হতো। কিন্তু ইতালি বৃহৎশক্তি হওয়ায় দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। নিকৃষ্ট শাসন পরিচালনা, সামরিক ও নৌ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের জন্য এবং উপনিবেশ তৈরির জন্য অর্থব্যয় করে ইতালির শাসকরা জনগণের সর্বনাশ করে। এজন্য কৃষিকাজ, যেমন ক্যামপাগ্নার জমি উদ্ধার ইত্যাদির জন্য অর্থের সংস্থান তারা করতে পারে না, ক্যামপাগ্নার মত অনুরূপ দুরবস্থা দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলিতেও বর্তমান। যে সিসিলি এককালে রোমের শস্যাগার ছিল আজ তা দারিদ্রের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত। সিসিলির মত দারিদ্রজর্জরিত ও নিগৃহীত লোক ইউরোপের আর কোথাও নেই। ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর দেশের অল্পে-সন্তুষ্ট সন্তানরা আজ ইউরোপের অধিকাংশ ও আমেরিকায় নগণ্য মজুরিতে কাজের সন্ধানে ভিড় করে; কিংবা দলবেঁধে চিরকালের জন্য দেশত্যাগী হয়। কারণ স্বদেশের জমি তাদের সম্পত্তি নয়, নিজের দেশে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতেও তারা চায় না। ম্যালেরিয়ার মত উৎকট জ্বর-ব্যাধি ইতালিতে এত ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে যে সরকার অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ১৮৮২ সাল নাগাদ এক তদন্ত চালান। তদন্তে এই শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ হয় যে দেশের ৬৯টি বিভাগের মধ্যে ৩২টি বিভাগ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত, ৩২টি আংশিক-

ভাবে এবং মাত্র ৫টি বিভাগ এই রোগ থেকে মুক্ত। এই রোগ আগে শুধু গ্রামাঞ্চলেই দেখা যেত, এখন শহরগুলিতেও প্রবেশ করেছে যেখানে দলে দলে গ্রাম্য সর্বহারাদের সহরে চলে আসার ফলে ঘন সন্নিবিষ্ট সহুরে সর্বহারার দল বহুগুণ বর্ধিত হয় এবং রোগ সংক্রামণের যোগ্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

(৩) দারিদ্র ও বহুপ্রসূতা

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিকে যে কোন দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, দেখা যায়, খাদ্যের স্বল্পতা এবং জীবনধারণের উপায়ের অভাব জনসাধারণের অভাব ও দুর্দশার ফল নয়। যে অসম বন্টন ও অর্থনীতিক কুব্যবস্থা কাউকে প্রাচুর্য দান করে এবং অন্যদের খাদ্যাভাবে মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করে,—এটা তারই ফল। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দিক থেকেই ম্যালথাসীয় যুক্তি অর্থপূর্ণ। অন্যদিকে ধনবাদী ব্যবস্থাই সন্তান প্রজননে উৎসাহ দেয়। কারখানায় শিশুদের সস্তা ও সুলভ শ্রম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই প্রয়োজন হয়, হিসাব করেই সর্বহারাদের জন্মদান করতে হয়—তাদের ভরণপোষণের মত উৎপাদন করতে হয়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কুটিরশিল্পে নিযুক্ত সর্বহারাদের অধিক সন্তান লাভ করতে বাধ্য হতে হয়। এই অনস্বীকার্য ঘৃণ্য প্রক্রিয়া শ্রমিকের দারিদ্র তীব্রতর করে এবং নিয়োগকর্তার ওপর নির্ভরতা বাড়ায়। সর্বহারা অত্যন্ত দুঃখদায়ক মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। কুটির শিল্পে শ্রমিকদের জন্য কোন কল্যাণকর ব্যবস্থা করতে বা সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনে অধিক অর্থব্যয় করতে নিয়োগকর্তা বাধ্য না থাকায় কুটিরশিল্পে সে অধিকসংখ্যক লোক নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়। কেননা, এই জাতীয় শিল্পে সে যে সুবিধা পায়, অন্য উৎপাদন পদ্ধতিতে তা সহজে পায় না; অবশ্য বিশেষ কোন উৎপাদন পদ্ধতি সেই অবস্থায় যদি সম্ভব হয়ে থাকে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি শুধু যে পণ্য ও শ্রমিকের অতি উৎপাদনের ব্যবস্থা করে তা নয়, এই ব্যবস্থা অধিক বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির দিকেও চালিত হয়। বুদ্ধিজীবিশ্রেণীর সদস্যদেরও চাকরি পাওয়া ক্রমবর্ধমানহারে কঠিন হয়ে পড়ে। চাহিদার চাইতে সরবরাহ স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায়। ধনতান্ত্রিক জগতে একটিমাত্র জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় না—তা হ'ল পুঁজি ও তার মালিক পুঁজিপতি।

যদি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা ম্যালথাসের অনুগামী হয়ে থাকেন, তাহলে তা তাদের বুর্জোয়া স্বার্থের দিক থেকে স্বাভাবিকই, শুধু সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাদের এই বুর্জোয়া খেয়াল প্রসারিত না করাই উচিত। জন স্টুয়ার্ট মিল লিখেছেন, "......কমিউনিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে এই জাতীয় স্বার্থপর অমিতাচারের বিরুদ্ধে জনমত তীব্রতম প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। যে কোন সংখ্যাবৃদ্ধি জনগণের আরামের অপহ্নব ঘটাবে বা শ্রমের পরিমান বৃদ্ধি করবে তা সমাজের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অসুবিধা সৃষ্টি করবে এবং এটাকে নিয়োগকর্তার অর্থলিপ্সা বা ধনীদের অন্যায্য অধিকারের ফল বলা যাবে না। এই পরিবর্তিত অবস্থায় অযৌক্তিক ধারণাকে অস্বীকার করা হয় এবং তাতেও না হলে যে কোন রকম শাস্তিমূলক বিধান নেওয়া হয় বা সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিকর নিন্দনীয় আরাম-আয়েশের প্রতি বশ্যতার প্রশ্রয় দিতে হয়। কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা লোকসংখ্যাবৃদ্ধির আতঙ্ক থেকে উত্থিত প্রতিবাদ প্রকাশ্যে গ্রহণ করার পরিবর্তে ঐ পাপ বা অমঙ্গল ঘটবার আগেই বাধা দেবার চেষ্টা করে।" অধ্যাপক এ ওয়াজুনার ব্রাউ-এর 'ম্যানুয়াল অব পলিটিক্যাল ইকনমি' বইয়ের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন, "সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিবাহ ও সন্তান উৎপাদকের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।" উপরোক্ত লেখকরা এই ধারণা থেকেই তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন যে সবরকম সমাজব্যবস্থাতেই জনসংখ্যা-বৃদ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান, কিন্তু উভয়েই স্বীকার করেন যে অন্য সবরকম সমাজব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে অধিকতর সক্ষম। তাদের পরবর্তী সিদ্ধান্তটি সঠিক, আগেরটি নয়।

অবশ্য ম্যালথাসীয় মতবাদে কলুষিত কিছু কিছু সমাজ-তন্ত্রী আছেন যাঁরা জনাধিক্যের আশু বিপদ সম্পর্কে আতঙ্কিত। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রী ম্যালথাসবাদীরা এখন উধাও হয়েছে। প্রকৃতি ও বুর্জোয়া সমাজের আসল চরিত্র সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নের ফলে তাঁদের শিক্ষা হয়েছে। আমাদের কৃষি বিশেষজ্ঞদের সবিলাপ সঙ্গীত থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে আমরা বিশ্ববাজারের দৃষ্টিতে অতি-রিক্ত খাদ্যই উৎপাদন করি—যার ফলে দাম যায় কমে এবং কম-দামের জন্য খাদ্য উৎপাদন অলাভজনক হয়ে পড়েছে।

আমাদের ম্যালথাসবাদীরা ভাবে, আর চিন্তাশক্তিহীন বুর্জোয়া প্রবক্তাদের ঐক্যতান সেই ভাষাকেই প্রতিধ্বনিত করে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ভালবাসার পাত্র নির্বাচনে স্বাধীনতা বর্তমান এবং যেখানে মানুষের উপযোগী ব্যবস্থা সকলের জন্য অবারিত, সেখানে মানুষ শশকের মত বংশবৃদ্ধি করে যাবে এবং নীতিবহির্গত যৌন সম্ভোগে ব্যাপৃত থেকে ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটাবে। আশা করা যায়, ঘটবে এর বিপরীতটাই। এখনও পর্যন্ত সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট পরিবারে নয়, নিকৃষ্টতম পরিবারেই অধিকসংখ্যক শিশুর আগমন দেখা যায়। অতি-রঞ্জনের অপবাদ থেকে মুক্ত থেকে একথা বলা যায়, অধিকতর দুর্দশাগ্রস্থ সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যেই অধিকতর সংখ্যা শিশুর আবির্ভাব হয়। ব্যতিক্রম যে একেবারে নেই তা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিরচোর লেখা থেকে এর সমর্থন মেলে, মানসিক উদ্দীপক বস্তু থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, অধঃ-পতনের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত ইংরেজ শ্রমিক মাত্র ২টি উপভোগের উৎস জানে, এক মাদকতা, দুই যৌন সংগম। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সাইলেসিয়ার জনগণও তার সমস্ত কামনা-বাসনা এই দুই বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করে। সুরা ও যৌন কামনা পরিতৃপ্তিই সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং একথা অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যায় যে শারীরিক বলিষ্ঠতা ও নৈতিক দৃঢ়তা যে পরিমাণে কমে সেই পরিমাণে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

মার্কসও তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। "প্রকৃতপক্ষে, কেবলমাত্র জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যাই নয়, পরিবারসমূহের পূর্ণ আয়তন আয়ের উচ্চতার বিপরীত অনুপাতে হয়ে থাকে এবং সেজন্য বিভিন্ন স্তরেই শ্রমিকের জীবিকার ওপরও নির্ভর করে। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই নীতি অসভ্য জাতির কাছে অবাস্তব মনে হবে, এমনকি সভ্য উপনিবেশের অধিবাসীদের পক্ষেও। এটা ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল

ও নিয়ত আক্রান্ত পশুগুলির সীমাহীন বৃদ্ধির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।" মার্কস লাইং-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "সব মানুষ যদি অনায়াসে জীবনধারণের অবস্থায় থাকত তাহলে পৃথিবী অনতিবিলম্বে জনশূন্য হয়ে যেতো।" লাইং ম্যালথাসের বিপরীত মত পোষণ করেনঃ জীবনযাত্রার উন্নত মান বরং জন্মহ্রাসেরই অনুকূল, জন্মবৃদ্ধির নয়। হার্বার্ট স্পেন্সর একই মত প্রকাশ করেছেন, "পূর্ণতা ও প্রজননশক্তি সবসময় সর্বত্রই পরস্পরবিরোধী। এর থেকে এটাই দাঁড়ায় যে, আরও প্রগতির জন্য মানবজাতি যে সমাজের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ফলে সম্ভবতঃ সন্তান উৎপাদন হ্রাস হবে।"

আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী ব্যক্তিরা এই একটি বিষয়ে একমত এবং আমরা তা সমর্থন করি।

(৪) লোকসংখ্যার ঘাটতি ও খাদ্যে বাড়তি

জনসংখ্যার গোটা প্রশ্নটি এই বলে সহজেই ছেড়ে দেওয়া যায় যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বিপদ দৃষ্টিগোচর নয়, কারণ আমরা অতিরিক্ত খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন, যা আবার বছরের পর বছর বৃদ্ধি পাবারই আশংকা। তাই এই সম্পদ নিয়ে কি করা হবে এই দুশ্চিন্তা, খাদ্য পর্যাপ্ত কিনা এই দুশ্চিন্তার চেয়ে অনেকবেশি বড়। খাদ্য উৎপাদনকারীরা সাগ্রহে খাদ্যের ভক্ষকদের দ্রুত বৃদ্ধিকে অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু ম্যালথাস-বাদীরা আপত্তি তুলতে ক্লান্তিবোধ করেন না। সুতরাং আমাদের নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতে হবে পাছে তারা এই অজুহাতের আশ্রয় নিতে পারে না যে তাদের আপত্তি অকাট্য।

তাঁরা দাবি করেন যে অতি নিকট ভবিষ্যতে জনাধিক্যের বিপদ 'ক্রম হ্রাসমান উৎপাদন বিধি'-র মধ্যে নিহিত। আমাদের জমি "উৎপাদনে নিঃশেষিত," বর্ধিষ্ণু ফসল আর আশা করা যায় না এবং যেহেতু কৃষির উপযোগী জমি ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে, তাই খাদ্য সংকটের বিপদ আসন্ন যদি লোকসংখ্যা বাড়তেই থাকে। কৃষিতে জমির ব্যবহার সম্পর্কিত অধ্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে একথা প্রমাণ করতে পেরেছি বলে আমরা বিশ্বাস করি যে, কৃষি বিজ্ঞানের বর্তমান স্তরেই নতুন খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ কি বিপুল অগ্রগতি ঘটাতে পারে। আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একজন অত্যন্ত যোগ্য বড় ভূস্বামী ও সর্বজনস্বীকৃত অর্থনীতিবিদ (যিনি উভয় ক্ষেত্রে ম্যালথাসের চাইতে শ্রেষ্ঠ।) বডবার্টাস কৃষি রসায়ন শাস্ত্রের শৈশবে ১৮৫০ সালে বলেছেন, "কাঁচা সামগ্রী উৎপাদন যেমন, খাদ্যোৎপাদন ভবিষ্যতে শিল্পোৎপাদনে ও পরিবহনের পেছনে পড়ে থাকবে না। কৃষি রসায়ন এখনই কৃষির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে আরম্ভ করছে। যদিও এর ভুলপথ পরিক্রমা করার আশংকা বিদ্যমান, তবুও এটা পরিণামে খাদ্য উৎপাদনকে সমাজের আয়ত্তাধীনে স্থাপন করবে, যেমন বর্তমানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পশমের সরবরাহ পেলে যে কোন পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করা যায়।"

কৃষি রসায়ণের প্রতিষ্ঠাতা জুস্টাস ভন লিবিগ এই মত পোষণ করেন যে "যদি মানুষের শ্রম ও সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহলে জমি অফুরন্ত উৎপাদনশীল থাকে এবং বছরের পর বছর অপরিমেয় ফসল দিতে পারে।" উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ম্যালথাসীয় খেয়াল মাত্র, এটা কৃষিকাজের অতি নিম্নস্তরে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদিও এই নিয়ম বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বহু আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নিয়মটি বরং এইভাবে বলা যায়—"একটা জমির উৎপাদন মানুষের ব্যয়িত শ্রম (বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতিসমেত) ও সেই জমিতে প্রদত্ত যথার্থ সারের সাথে সমানুপাতিক।" যদি গত ৯০ বছরে ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষুদ্র কৃষি খামারগুলি নিয়ে তার উৎপাদন চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়ে থাকে (লোকসংখ্যা কিন্তু দ্বিগুণও বাড়েনি), তাহলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পন্ন সমাজ থেকে অনেক বেশি ভাল ফল আশা করা যায়। ম্যালেথাসবাদীরা আর একটি সত্য এড়িয়ে যান যে, শুধু আমাদের দেশের কথাই হিসাবের মধ্যে গণ্য করলে চলবে না, পৃথিবীর সব জমি, প্রধানতঃ যে সব দেশের জমি আমাদের দেশের ভূখন্ড থেকে বিশ থেকে ত্রিশ ও তারও বেশি গুণ ফসল দেয়, তাকেও হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। বস্তুতঃ পৃথিবীর সম্পদরাশি মানুষ ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছে। তবুও বলতে হয় এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বাদ দিলে যতটুকু হওয়া সম্ভব সেভাবে কোথাও জমির চাষ ও ফলপ্রদভাবে তার ব্যবহার হচ্ছে না। শুধু গ্রেট ব্রিটেনই যে একমাত্র বর্তমানে যা উৎপাদন করে তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারে তাই নয়; ফ্রান্স, জার্মানি ও অস্ট্রিয়াও তা পারে এবং এ সত্য ইউরোপের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য। ক্ষুদ্র ওয়ার্টেমবার্গে ৮৭৯,৯৭০ হেক্টর কর্ষণযোগ্য জমিতে কেবল বাষ্পচালিত লাঙ্গল ব্যবহারের ফলে ৬,১৪০,০০০ সেন্টনার উৎপাদনকে ৯,০০০,০০০ সেন্টনারে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

জার্মানির বর্তমান জনসংখ্যার অবস্থা দিয়ে বিচার করলে ইউরোপীয় রাশিয়া তার বর্তমান ১০ কোটি লোকসংখ্যার পরিবর্তে ৪৭·৫ কোটি লোককে খাওয়াতে পারে। আজকের ইউরোপীয় রাশিয়াতে প্রতি বর্গমাইলে ১৯·৪ জন লোক বাস করে, সেক্সনীতে করে ৩০০ জন। রাশিয়ার সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে জলবায়ু উচ্চপর্যায়ের উর্বরতা অসম্ভব করে তুলেছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের জলবায়ু ও মাটি জার্মানির জমির তুলনায় অনেক বেশি কৃষি উৎপাদনক্ষম। তখন আবার জনসংখ্যার ঘণত্ব ও উন্নত জমি কর্ষণ (যা অব্যবহিত পরেই হয়) জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাবে যা এমনকি আজও অনুমানকে হার মানায়। যেখানেই লোক রাশীকৃত হয়, সেখানেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে।

এসব বিষয়ের ওপর আমরা গুরুত্ব দিই না বললেই হয়, এমনকি এগুলির সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতেও আমরা অক্ষম। কারণ বর্তমান অবস্থায় এ বিষয়ে বিরাট আকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ বা সম্ভাবনা আমাদের নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আজকের অতি হাল্কা বসতিপূর্ণ নরওয়ে ও সুইডেন তাদের বিরাট বনাঞ্চল, সত্যিকারের অফুরন্ত খণিজ সম্পদ, অসংখ্য নদনদী এবং সমুদ্রতীরবর্তী দীর্ঘ এলাকা নিয়ে আরও ঘণ জনসংখ্যার জন্য সমৃদ্ধ খাদ্যসংস্থান করতে পারবে। বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায়ের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে বিক্ষিপ্ত জনসাধারণের একাংশ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে যা বলা যায়, ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কে আরও অতুলনীয় অধিক মাত্রায় তা প্রযোজ্য—যেমন পর্তুগাল, স্পেন, ইতালি, গ্রীস, দানিয়ুবীয় রাজ্যসমূহ,

হাঙ্গেরী, তুরস্ক প্রভৃতি। ঐসব দেশসমূহের ক্লৈদাক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ফলে শত সহস্র মানুষ দেশে অবস্থান বা নিকটবর্তী সুবিধাজনকভাবে-অবস্থিত দেশে স্থায়ী বসবাস করার পরিবর্তে দেশত্যাগ করে সমুদ্রের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হয়। যেইমাত্র একটা ন্যায়নিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা স্থাপিত হবে, তখন ঐ বিস্তীর্ণ ও উর্বর ভূমিকে উন্নত পর্যায়ের কৃষিভূমিতে উন্নীত করতে নতুন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রয়োজন হবে।

অদূর ভবিষ্যতে যখন ইউরোপে অতি উন্নত সাংস্কৃতিক লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হবে লোকসংখ্যা বাড়তির চাইতে ঘাটতিই দেখা দেবে এবং সেই অবস্থায় জনাধিক্যের আতঙ্ক পোষণ করা অসম্ভব হবে। সবসময় মনে রাখা দরকার যে শ্রম ও বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদনের উৎসের যথাযথ ব্যবহার সীমাহীনভাবেই করা যায়। কারণ প্রত্যেক দিনই নিত্যনতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন খাদ্যের উৎসবৃদ্ধি করে যাচ্ছে।

আমরা ইউরোপ ছেড়ে যদি অন্য দেশের দিকে তাকাই, তাহলে লোকের ঘাটতি ও জমির প্রাচুর্য আপনা থেকেই আমাদের চোখে পড়ে। পৃথিবীর প্রচুর পরিমাণ উর্বর জমি সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। কারণ পতিত জমি কৃষি উপযোগী করে যথাযথ ব্যবহারের কাজ সম্পাদন করা কয়েক হাজার লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, বহু লক্ষ লোকের ব্যাপক উপনিবেশ স্থাপন প্রয়োজন, প্রকৃতির এই প্রাচুর্যের কিয়দংশকে মানুষের নিয়ন্ত্রাধীন করতে। অন্যান্যের মধ্যে এই পর্যায়ে পড়ে কয়েক লক্ষ বর্গমাইলের বিরাট ভূখণ্ড, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আর্জেন্টিনার অধীনে ৯·৬ কোটি হেক্টর উর্বর জমির মধ্যে অনধিক ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় শস্য উৎপাদনক্ষম পতিত জমির পরিমাণ কমপক্ষে আনুমানিক ২০ কোটি হেক্টর; অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সে সম্মিলিতভাবে শস্য উৎপাদন হয় ১০·৫ কোটি হেক্টর জমি। ৪০ বছর আগে ক্যারী এই মত পোষণ করতেন যে ৩৬০ মাইল দীর্ঘ ওরিনোকো উপত্যকা একাই সমগ্র মানবজাতিকে খাওয়াবার মত শস্য উৎপাদনে সমর্থ। এই অনুমানের অর্ধেকও মেনে নিলে তবু আরও প্রচুর থাকে। যে কোন ক্ষেত্রে একা দক্ষিণ আমেরিকাই বর্তমান জগতের লোকসংখ্যার বহুগুণকে খাওয়াতে পারে। পুষ্টিকারিতার দিক থেকে একখণ্ড জমিতে কলা চাষ ও ঐ পরিমাণ জমিতে গম চাষের হার হয় ১৩৩ : ১। যেখানে আমাদের ভাল জমিতে গমের ফসল বীজের ১১ থেকে ২০ গুণ মাত্র হয়, সেখানে ধান উৎপাদনকারী জমিতে বীজের তুলনায় ফসলের পরিমাণ হয় ৮০ থেকে ১০০ গুণ, ভুট্টা ২৫০-৩০০ গুণ এবং কোন কোন স্থানে যেমন ফিলিপাইনে ধানের উৎপাদন হয় বীজের ৪০০ গুণের মত। এইসব বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু উৎপাদনের সময় তার পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধির দিকে নজর রাখা দরকার। পুষ্টির ক্ষেত্রে রসায়নশাস্ত্রের বিকাশের সীমাহীন পরিধি রয়েছে।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষতঃ ব্রাজিলে, আয়তনে প্রায় সারা ইউরোপের সমান। ব্রাজিলের আয়তন ৮,৫২৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার অথচ জনসংখ্যা ২·২ কোটি যেখানে ইউরোপের আয়তন ৯,৮৯৭,০১০ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৪৩ কোটি। জমির প্রাচুর্য ও উর্বরতার জন্য এই দেশের গর্ব পরিব্রাজকদের বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করে। তাছাড়া এই-দেশসমূহে অফুরাণ আকরিক ও ধাতব পদার্থ আছে। তবুও এসব দেশ এখনও বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ এখানকার জনসাধারণ শ্রমবিমুখ ও সংখ্যায়ও তারা নেহাৎ অল্প, সভ্যতার আলো পেয়েছে সামান্যই এবং শক্তিধর প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে তারা অক্ষম। আফ্রিকার অবস্থা কি রকম সেটা সাম্প্রতিক দশকগুলির আবিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে। মধ্য আফ্রিকার একটি ভাল অংশ ইউরোপীয় চাষের পক্ষে অনুপযোগী হলেও এমন বিরাট বিরাট ভূখণ্ডও রয়েছে, মানুষের উপনিবেশ গড়ার যুক্তিগ্রাহ্য নীতিগুলি প্রয়োগ করা হলে যেগুলিকে ভালভাবে কাজে লাগানো যায়। অন্যদিকে, এসিয়ার সুবিস্তীর্ণ ও উর্বর এলাকাগুলি লক্ষ লক্ষ অগণিত লোকের খাদ্যের সংস্থান করতে পারে। অতীতে আমরা দেখেছি, মৃদু জলবায়ু পেলে প্রায় মরুভূমির মত অনুর্বর স্থানগুলি মূল্যবান পুষ্টির যোগান দিতে পারে যদি মানুষ জানে কিভাবে তাতে জীবনসঞ্চারী জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়। বর্বর ধ্বংসমূলক দেশজয় ও স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর উন্মত্ত নির্যাতনের মাধ্যমে অতি উন্নত ধরণের কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী ও সেচ ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের ফলে পশ্চিম এসিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকাগুলির হাজার হাজার বর্গমাইল বালির মরুভূমিতে পরিণত হয়। একই ঘটনা সংঘটিত হয় উত্তর আফ্রিকা, মেক্সিকো ও পেরুতে। যদি সভ্য মানুষ এই সমূহ এলাকায় লক্ষে লক্ষে বসবাস করে তাহলে অফুরন্ত খাদ্যের উৎসের দ্বার খুলে যায়। এশিয়া ও আফ্রিকায় খেজুর গাছের ফল অবিশ্বাস্য প্রাচুর্যে ফলে এবং তাতে এত কম জায়গার দরকার হয় যে, ২০০টি গাছ এক মর্গেন স্থানে (দুই একরের সামান্য বেশি) রোপন করা যায়। মিশরে ডুরা (আটা ময়দার মত গুঁড়ো করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়) নামক শস্য বীজের ৩০০০ গুণ ফলন দেয়। তবুও দেশটি গরিব। জনাধিক্য এর কারণ নয়। বর্বর ধ্বংসকার্যের ফলে যুগ যুগ ধরে মরুভূমি বেড়েই চলেছে, এই গোটা দেশে মধ্য ইউরোপের উদ্যান ও কৃষির কলাকৌশল প্রয়োগ করলে যে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যাবে তা সব হিসাবকে হার মানায়।

বর্তমান কৃষি ব্যবস্থাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বর্তমান জনসংখ্যার (৮·৫ কোটি) ১৫ থেকে ২০ গুন লোকের (১৫০ কোটি থেকে ১৭০ কোটি) অনায়াসে আহারের সংস্থান করতে পারে। অনুরূপভাবে কানাডাও ৬০ লক্ষ মানুষের খাদ্য সংস্থানের পরিবর্তে কোটি কোটি লোককে খাওয়াতে পারে। তারপর দৃষ্টান্তস্বরূপ রয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপ যার মধ্যে অনেকগুলি আয়তনে যেমন বড়, উর্বরতাও তার অসাধারণ। সভ্যতার নামে এখন লোকসংখ্যা কমানো নয়, বাড়ানোর আবেদনই মানবজাতির কাছে পেশ করা হচ্ছে।

সর্বত্রই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বর্তমান উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিই মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি নয়। কয়েকটি উত্তম ফসল উপর্যুপরি খাদ্যের মূল্য এত কমিয়ে দেয় যে অসংখ্য চাষীরই সর্বনাশ হয়। কৃষকের অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই হয়। ভাল ফসলের মূল্য কমে যায় বলে বর্তমানে কৃষকদের এক বৃহদাংশ ভাল ফসলকেই

দুর্ভাগ্য বলে মনে করে। এবং একেই দুর্ভিক্ষের অবস্থা মনে করা হয়। অন্য দেশের ফসল প্রাপ্তি থেকে আমাদের বঞ্চিত করার জন্য খাদ্যশস্যের ওপর চড়া শুল্ক বসানো হয়। এতে বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানী ব্যাহত হয় এবং দেশী বাজারে দাম চড়ে যায়। কারখানার প্রস্তুতজাত বহু সামগ্রীর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সম্পদ ও উৎপাদন সম্পর্কের জন্য যেমন লক্ষ লক্ষ লোক প্রয়োজন মেটাতে পারে না, সেইরকম লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পায়, কারণ খাদ্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তারা তার দাম দিতে অপারগ। এই রকম একটা উন্মত্ত অবস্থা স্পষ্টতঃই বিদ্যমান। যখন ফসল ভাল হয় আমাদের খাদ্যশস্যের মুনাফাখোরেরা ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য নষ্ট করে ফেলে, কারণ তারা জানে, যে পরিমাণ খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয় সেই পরিমাণে তার মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এই অবস্থায় জনাধিক্যের ভয় আমাদের করতেই হয়! রাশিয়া, দক্ষিণ ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গুদাম ও পরিবহনের সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ সেন্টনার (এক সেন্টনার প্রায় ৫০ কেজির সমান) খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় ফসলকাটার যন্ত্রপাতির অভাবে বা ঠিক সময়ে কাজ করার লোকের স্বল্পতার জন্য প্রতি বছর আরও লক্ষ লক্ষ সেন্টনার খাদ্যশস্যের অপচয় হয়। বহু শস্য-মঞ্জরী ও পরিপূর্ণ শস্যাগার এবং গোটা ভূসম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এর ফলে যে লাভ হয়, তার চাইতে বীমার প্রিমিয়ম অনেক বেশি লাভজনক। একই-কারণে নাবিকসহ শস্যভর্তি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে খাদ্যশস্য বিনষ্ট করা হয়। আমাদের সামরিক অভিযানের সময় ফসলের একটা বিরাট অংশ বছর বছর নষ্ট করা হয়। মাত্র কয়েকদিনের সামরিক অভিযানের জন্য ব্যয় হয় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। এটা সকলেরই জানা বিষয় যে এই হিসাব খুব কম করেই ধরা হয়, এবং অনেক সামরিক অভিযান প্রতি বছরই হয়ে থাকে। একই উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক গ্রামের সম্পূর্ণটাই ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং বিরাট এলাকা কৃষিকাজ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

এটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সমুদ্র হল খাদ্যের একটা সহায়ক উৎস। পৃথিবীর জলভাগ স্থলভাগের ১৮ঃ৭ অনুপাতে আছে অর্থাৎ জলভাগ স্থলভাগের চাইতে আড়াইগুণ বড় এবং এর অপরিমেয় খাদ্যসম্পদ এখন বিচারবুদ্ধিসম্মতভাবে ব্যবহারের অপেক্ষা রাখে। সম্ভাবনায় ভবিষ্যৎ ম্যালথাসবাদীদের অঙ্কিত জীর্ণ চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পরিশেষে, কে বলতে পারে আমাদের রাসায়নিক, প্রাকৃতিক ও শারীরবৃত্ত সম্পর্কীয় জ্ঞানের শেষ কোথায়? কে সাহস করে বলতে পারে মানুষ আগামী শতাব্দীগুলিতে আবহাওয়া পরিবর্তনের ও জমি ব্যবহারের পদ্ধতির জন্য কি বিরাট বিরাট পরিকল্পনা কার্যকরী করবে?

আজ আমরা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে পরিকল্পনা কার্যকরী হতে দেখি এক শতাব্দী আগে এটাকে অসম্ভব ও উন্মাদ পরিকল্পনা বলেই ভাবা হতো। বিস্তৃত যোজক কেটে সমুদ্রকে সংযুক্ত করা হচ্ছে। অতি উচ্চ পর্বতমালা দ্বারা বিভক্ত দেশকে সংযোজনের জন্য বহু মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পৃথিবীর বুকে খনন করা হচ্ছে। দূরত্ব কমাবার জন্য এবং সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত দেশের নানা বাধা বিপত্তি দূর করার জন্য সমুদ্রগর্ভেও অনুরূপ সুড়ঙ্গ খনন চলছে। "ব্যস, এপর্যন্তই, আর না!"—এই কথা কবার কে? বর্তমান অভিজ্ঞতা 'ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি' (Law of diminishing returns) শুধু যে খণ্ডন করেছে তা নয়, উদ্ধৃত উর্বর জমিও কোটি কোটি লোক দ্বারা কর্ষিত হবার অপেক্ষায় আছে।

এই সমূহ কৃষি প্রকল্প যদি একই সঙ্গে হাতে নেওয়া হয়, আমরা লোকের আধিক্যের বদলে লোকের অতি-স্বল্পতাই অনুভব করব। সামনে যে কাজ পড়ে আছে তা সমাধানের জন্য মানবজাতির প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি দরকার। চাষের আয়ত্তাধীনে আনা জমিরও পরিপূর্ণ ব্যবহার যেমন হচ্ছে না, তেমনই পৃথিবীর ভূভাগের প্রায় তিন চতুর্থাংশ পরিমাণ জমি চাষ করার জন্য প্রচুর লোকেরও অভাব। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রমিক ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর যে আপেক্ষিক জনাধিক্য সৃষ্টি করে, সভ্যতার উন্নত স্তরে তা আশীর্বাদ বলে গণ্য হবে। জনসংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন, তা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়, অন্তরায় হয় না। যেমন, বর্তমানে খাদ্য ও পণ্যের অতি উৎপাদন; নারী ও শিশুকে শিল্পে নিয়োগের ফলে পারিবারিক ভাঙ্গন এবং বৃহৎ পুঁজিপতিদের দ্বারা সমাজের মধ্যশ্রেণীর উৎসাদন ইত্যাদি সবকিছুই সভ্যতার উন্নত স্তরের পূর্বসর্ত হয়।

৫। সামাজিক সম্পর্ক ও সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা

এই সমস্যার অন্যদিক হচ্ছে—মানুষ কি অনির্দিষ্ট হারে বাড়ে এবং এই বাড়ার প্রয়োজন কি তারা অনুভব করে?

মানুষের সন্তান উৎপাদনের বিরাট ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ম্যালথাসবাদীরা সাধারণতঃ ব্যতিক্রমযুক্ত পরিবার ও মানুষের বিরল ঘটনার উল্লেখ করেন। কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। এসব বিরল ঘটনার বিপরীতদিকে আবার এমন ঘটনা আছে যেখানে অনুকূল জীবনযাপন ব্যবস্থার মধ্যেও সম্পূর্ণ বন্ধ্যাত্ব বা নামমাত্র জন্মদান ক্ষমতা অল্পসময় পরেই দেখা দেয়। অবস্থাপন্ন পরিবারগুলি কি দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয় সেটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য অন্য দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এবং প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক, কমবয়সে বসবাসের জন্য এদেশে আসা সত্ত্বেও প্রতি ৩০ বছরে মাত্র জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। বার থেকে কুড়ি বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার কোন দৃষ্টান্ত কোথাও বিরাট আকারে নেই।

ভির্চো ও মার্ক্স থেকে উদ্ধৃত বাক্যসমূহ প্রমাণ করে যে দরিদ্রতম অঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় বেশি দ্রুত। কারণ, ভির্চো সঠিকভাবেই দাবি করেন যে মাদকতা ছাড়াও যৌন সংগমেই হ'ল তাদের একমাত্র আনন্দ। সপ্তম গ্রেগরি (Gregory) যখন যাজকদের উপর চিরকৌমার্যব্রত বাধ্যতামূলক করেন, মেইঞ্জের বিশপের এলাকায় নিম্নপদের যাজকদের অভিযোগঃ প্রধান পুরোহিতদের দেখেই বোঝা যায় যে যারা সম্ভাব্য সব বয়সের আনন্দে যোগদান করতে পারে, তাদের আনন্দের উৎস মাত্র একটিই—তা হ'ল নারীসম্ভোগ। হরেকরকম পেশার অভাবের জন্যও বোঝা যায় কেন গ্রাম্য পুরোহিতদের বিবাহ অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। এটাও অনস্বীকার্য যে জার্মানীর দরিদ্রতম অঞ্চলগুলি যেমন ইউলেনবার্গ (সাইলেসিয়ার), লাসিজ, আর্জ, ফিক্টেলজিবার্গ, থুরিঙ্গিয়ার

বন, হার্জ প্রভৃতি অধিক ঘন বসতিতে পূর্ণ, যদিও তাদের প্রধান খাদ্য হ'ল আলু। এটাও নিশ্চিত যে যক্ষ্মারোগে আক্রান্তদের যৌন আবেগ বিশেষভাবে তীব্র; এবং শারীরিক অবস্থার অবনতির সময় যখন সন্তান উৎপাদন অসম্ভব মনে হয় তখনই অধিক সন্তানের জন্ম দেয়।

(১) সংখ্যা দিয়ে মানের ক্ষতিপূরণ করাটাই প্রকৃতির নিয়ম। (২) হার্বার্ট স্পেনসার, লাইণ্ড প্রভৃতির উদ্ধৃত বাক্য থেকেও এর সমর্থন মেলে। বড় ও শক্তিশালী পশু যথা হাতী, সিংহ ও উট প্রভৃতি, আমাদের গৃহপালিত পশু যেমন ঘোড়া, গাধা ও গরু প্রভৃতি জগতে কম সন্তানই আনয়ন করে। অন্যত্র নিম্নশ্রেণীর পশুরা বিপরীত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। যেমন সব রকমের পোকামাকড়, অধিকাংশ মৎস্য, নিম্ন স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে খরগোশ, ইঁদুর প্রভৃতি। অন্যদিকে ডারউইন এটা প্রতিষ্ঠিত করেন যে কতকগুলি পশু তাদের প্রজননশক্তি হারিয়ে ফেলে যখন তাদের বশীভূত করে গৃহপালিত করা হয়। হাতী একটা দৃষ্টান্ত। এতে প্রমাণিত হয় যে নতুন জীবন ধারণের পরিবেশ ও পরিবর্তিত জীবন যাপনের পদ্ধতি প্রজনন ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করে দেয়।

এটা বিস্ময়ের বিষয় যে ডারউইনবাদীরাই জনাধিক্যের আতঙ্কের অংশীদার এবং তাদের পাণ্ডিত্যের ওপরই আমাদের আধুনিক ম্যালথাসবাদীরা ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক ডারউইনপন্থীরা যখন তাদের তত্ত্বগুলি মানব জাতির প্রতি প্রয়োগ করেন তখন তাঁদের ভাগ্য সব সময়ই বিরূপ হয়, কারণ তাঁরা সেরা হাতুড়ে পদ্ধতির শরণাপন্ন হন এবং বিস্মৃত হন যে মানুষ যদিও উচ্চ পর্যায়ের জীব এবং প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, যা অন্য পশুরা পারে না—নিজের স্বার্থে প্রকৃতির নিয়মকে ভাল ভাবে কাজে লাগাতে জানে।

অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের তত্ত্বমতে নতুন জীবনের বীজ প্রাণধারণের বর্তমান উপায়ের চাইতে অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান থাকতে পারে। এই তত্ত্ব মানুষের বেলায়ও প্রয়োগ করা যেত যদি মানুষ মস্তিষ্কচালনা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাতাস, জমি ও জলকে ন্যায্যভাবে ব্যবহারের পরিবর্তে তৃণভোজী পশুর মত চরতে থাকত বা বানরের মত অবাধ যৌনকার্যে নিরত থাকত, অর্থাৎ সে যদি বানর হয়ে যেত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, মানুষ বাদ দিলে বানররাই একমাত্র জীব যাদের যৌন আবেগ কোন নির্দিষ্ট সময়ের দ্বারা সীমিত নয়, এটা একটা অকাট্য প্রমাণ যে, এই উভয় জাতির মধ্যে একটা নিকট সম্পর্ক আছে। কিন্তু যদিও তারা নিকট সম্পর্কিত, তারা অভিন্ন নয় এবং তাদের একই পর্যায়ে স্থাপন করা চলে না বা একই মানদণ্ডে বিচার করাও চলে না।

এটা সত্য যে মালিকানা ও উৎপাদনের বর্তমান সম্পর্কের অধীনে ব্যক্তি মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং এখনও করতে হয়। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে অনেকেই ব্যর্থ, জীবনধারণের উপায়ের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এটা নয়। এর কারণ হ'ল—বর্তমান সামাজিক অবস্থায়—এমন একটা জগতে বেঁচে থাকার উপায় থেকে মানুষ বঞ্চিত যেখানে এক বিরাট প্রাচুর্য বিদ্যমান। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করাও অন্যায় হবে যে যখন আজ পর্যন্ত এই ধরণের অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে, কাজেই এটা পরিবর্তনের অতীত এবং কখনও তার পরিবর্তন হবে না। এখানেই ডারউইনবাদীরা স্থানচ্যুত হন। কারণ তাঁরা প্রাকৃতিক ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব অনুশীলন করেন কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন তাঁরা করেন না। সুতরাং গভীরভাবে বিবেচনা করেই তাঁরা বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের পথের পথিক হয়ে যান। এই জন্যই তাঁরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন।

মানুষের সহজাত যৌন উন্মাদনা সারা বছরব্যাপীই থাকে; এটা সবচাইতে শক্তিশালী উন্মাদনা এবং স্বাস্থ্য খারাপ না হওয়া পর্যন্ত তার তৃপ্তি খোঁজে। এই প্রেরণা সাধারণতঃ তীব্র হয় সুস্থ এবং স্বাভাবিক সুঠাম শরীরে, ঠিক যেমন স্বাভাবিক ক্ষিদে এবং হজম সুস্থ পাকস্থলীর লক্ষণ এবং সুস্থ শরীরের মৌলিক পূর্বসর্ত। কিন্তু যৌন প্রেরণায় পরিতৃপ্তি এবং গর্ভসঞ্চার এক কথা নয়। মানব জাতির প্রজনন সম্পর্কে বহুবিধ তত্ত্ব প্রচারিত আছে। মোটের ওপর, আমরা এই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। তার প্রধান কারণ হ'ল, বহু শতাব্দী ধরে মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশের সূত্র অনুসন্ধানে, মানুষের সন্তান উৎপাদন ও বিকাশ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে মানুষকে বিরত রেখেছে বোধশূন্যহীন নিষেধের বেড়া। অবস্থা শুধু ক্রমশঃ পাল্টাচ্ছে এবং আরও পাল্টাতে বাধ্য।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন যে উচ্চতর মানসিক বিকাশ এবং কঠোর মানসিক পরিশ্রম, এক কথায়, উন্নততর স্নায়বিক ক্রিয়াশীলতা যৌন আকাঙ্ক্ষা দমিত করে এবং প্রজননশক্তি দুর্বল করে। এই মতের যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁরা দেখেন যে গড়ে অবস্থাপন্ন শ্রেণীর সন্তান সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং তা শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণের ফল নয়। নিঃসন্দেহভাবে তীব্র মানসিক পরিশ্রম যৌন আবেগ দমন করে, কিন্তু আমাদের সম্পদশালী শ্রেণীর অধিকাংশ এই ধরণের কাজ করে বলা হলে তা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যৌন আকাঙ্ক্ষা দমনে অত্যধিক কায়িক পরিশ্রমের একটা প্রভাব আছে। কিন্তু, সব রকমের অত্যধিক পরিশ্রমই ক্ষতিকর এবং তা বর্জনীয়।

অন্যেরা দাবি করেন যে নারীর জীবনধারা বিশেষতঃ খাদ্যতালিকা ও তার সাথে কতিপয় প্রাকৃতিক অবস্থা মিলিতভাবে তার গর্ভধারণের ও প্রসবের শক্তি নির্দ্ধারণ করে দেয়। পশুর বেলায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে অন্যান্য সব জিনিষের চাইতে খাদ্যই প্রজনন ক্রিয়ার কার্যকারিতাকে বেশি প্রভাবিত করে। এটাই বস্তুতঃ প্রধান নিয়ামক শক্তি হতে পারে। কোন কোন প্রাণীর জীবকোষের ওপর খাদ্যের প্রভাব বিস্ময়করভাবে প্রদর্শিত হয়েছে মৌমাছির বেলায়। বিশেষ খাদ্য প্রদানের দ্বারা ইচ্ছামত রাণীর জন্মদান চলে। মৌমাছিরা তাহলে তাদের যৌনবিকাশের জ্ঞানে মানুষের চাইতে অগ্রগামী। খুব সম্ভবতঃ গত দু' হাজার বছর ধরে তাদের মধ্যে এটা প্রবেশ করানো হয়নি যে যৌন ব্যাপারে আলোচনা "অশ্লীল" ও "নীতিবিগর্হিত"।

এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে উৎকৃষ্ট ও ভাল সার দেওয়া জমিতে গাছ খুব বিপুলভাবে বাড়ে কিন্তু ফল দেয়না। এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই যে মানুষের বেলায়ও পুরুষের শুক্রকীট গঠনে ও নারীর ডিম্ব ফলপ্রসূ করণে খাদ্যের প্রভাব আছে। কাজেই মানুষের প্রজনন ক্ষমতার অনেকখানি নির্ভর করে তাদের খাদ্যের প্রকৃতির ওপর। এ

ব্যাপারে অন্য কিছু বিষয়েরও ভূমিকা আছে যদিও তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু জানা যায়নি।

ভবিষ্যতে জনসংখ্যার প্রশ্নে অত্যন্ত নিষ্পত্তিমূলক গুরুত্বের বিষয় হবে বিনা ব্যত্যয়ে আমাদের সকল নারীর উচ্চতর ও অধিকতর স্বাধীন অবস্থায় অবস্থান। ব্যতিক্রম বাদ দিলে ভগবানের দান হিসেবে অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে, জীবনের সর্বোত্তম বছরগুলি গর্ভবতী থাকতে বা কোলে একটি শিশু নিয়ে বুকের দুধ দিয়ে কাটাবার ইচ্ছে বুদ্ধিমতী ও তেজী মহিলাদের নেই। ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গর্ভবতী নারী ও জননীদের যত উন্নত ব্যবস্থাই করুক না কেন অধিক সংখ্যক সন্তান না পাওয়ার প্রবণতা (এমনকি এখনও যা অধিকাংশ নারীর মধ্যে আছে) না কমে বরং বাড়বে। আমাদের মতে এর অর্থ এই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া সমাজের চাইতে জনসংখ্যা খুব সম্ভবতঃ অনেক ধীর বাড়বে।

ভবিষ্যতে মানব জাতির বৃদ্ধি নিয়ে আমাদের ম্যালথাসীয়-দের মাথা ঠোকার সত্যই কোন হেতু নেই। আজ পর্যন্ত কোন জাতি লোকসংখ্যা হ্রাসের জন্য ধ্বংস হয়েছে বলে জানা যায়নি, জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তো নয়ই। সর্বশেষ বিশ্লেষণে বলা যায় যে সমাজ ক্ষতিকর মিতাচার ও অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলবে, সেই সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবে। এই বিষয়েও ভবিষ্যৎ কার্ল মার্ক্সের যাথার্থ প্রতিপাদন করবে। প্রত্যেক অর্থনৈতিক বিকাশের সময়কালে, তার নিজস্ব একটা বিশেষ জন্ম-মৃত্যু বিধি থাকে, সমাজতন্ত্রের অধীনেও মার্ক্সের এই অভিমত সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

এইচ ফার্ড 'বংশের কৃত্রিম সীমাবদ্ধতা' গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন—"ম্যালথাসবাদের তীব্র বিরোধিতা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের একটা বদমাইসি মাত্র। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হলে জনগণের দারিদ্র বাড়বে এবং এর ফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। জনাধিক্য যদি রোধ করা হয় তাহলে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির অবসান হবে এবং সমস্ত চাকচিক্যসহ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্র চিরকালের জন্য কবরস্থ হবে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে উৎখাতের জন্য অন্যান্য অস্ত্রের মধ্যে আরও একটি অস্ত্র আমাদের বাড়ল—তা হ'ল ম্যালথাসবাদ।"

অধ্যাপক এডলফ ওয়াগনার জনাধিক্যের আতংকে পীড়িত ব্যক্তিদের একজন। তাঁর দাবি হল, বিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্রমিকদের বিয়ে করা ও বাসস্থান নির্বাচনের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত। তিনি অভিযোগ করেন যে মধ্যবিত্তদের তুলনায় শ্রমিকরা অতি অল্প বয়সেই বিয়ে করে। এই একই মতাবলম্বী অনেকের মত তিনিও এই সত্য অগ্রাহ্য করেন যে মধ্যবিত্তেরা নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী বিয়ে করার অবস্থায় যখন আসেন, তখন তাঁদের বয়েস হয়ে যায় অনেক। কিন্তু তারা তাদের এই মিতাচারের ক্ষতিপূরণ করে গণিকাসক্ত হয়ে। শ্রমিকদের বিয়ের ক্ষেত্রে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয় তারাও একই পথে ধাবিত হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এর পরিণতি সম্পর্কে কোন অনুযোগ থাকা উচিত নয় এবং "ধর্ম ও নৈতিকতা গেল গেল" বলে চীৎকারও যেন না ওঠে। যদি পুরুষ ও নারী (কারণ নারীরও পুরুষের মতই অনুভূতি) স্বাভাবিক যৌন কামনা চরিতার্থ করতে অবৈধভাবে মিলিত হয় এবং সহর ও পল্লী বীজের মত অবৈধ সন্তানে ভরে দেয় তাহলেও রাগ করা উচিত নয়। ওয়াগনার অ্যান্ড কোম্পানির মতবাদ বুর্জোয়া স্বার্থের ও আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের বিরোধী। কারণ এর জন্য প্রয়োজন হয় যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কাজের লোক যাতে একটা শ্রমিক বাহিনীকে প্রতিযোগিতার জন্য দুনিয়ার বাজারে নিক্ষেপ করা যায়। বর্তমান যুগের পাপ পঙ্কিলতা মামুলি প্রস্তাবগুলিতে দূর করা যাবে না, যে প্রস্তাবের উৎসস্থান হ'ল অদূরদর্শী বৈষয়িকতাবাদ ও পশ্চাদপদতা। বিংশ শতাব্দীর এই প্রথমভাগে কোন শ্রেণীর বা রাষ্ট্রশক্তির এমন শক্তি নেই যে সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে পিছু টানে ধরে রাখতে পারে বা তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে। এই জাতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বিকাশের জোয়ার এত শক্তিশালী যে তা সমস্ত বাধাই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পেছনের দিকে নয়, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই আজকের রণধ্বনি। যে এখনও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশকে ঠেকিয়ে রাখাতে বিশ্বাস করে, সে নির্বোধ মাত্র।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানবজাতি সর্বপ্রথম যথার্থ স্বাধীন হবে এবং স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী জীবনধারণ করবে। মানবজাতি তখন তার নিজের বিকাশকে সচেতনভাবে চালিত করবে। পূর্ববর্তী যুগসমূহে মানুষ উৎপাদন ও বণ্টন এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে। এবং তা করেছে কোন্ নিয়মে তারা শাসিত হচ্ছে সেটা না জেনেই অর্থাৎ অচেতনভাবে। নতুন সমাজে স্বীয় বিকাশের নিয়মধারা সম্পর্কিত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে মানবজাতি কাজ করবেন সচেতনভাবে এবং পরিকল্পনা-মাফিক।

সমাজতন্ত্র হচ্ছে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিজ্ঞান।

[ভাষান্তর—মৃদুল দে]

[অগাস্ট বেবেল ছিলেন জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একজন সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় নেতা। ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের ভাষায়, অগাস্ট বেবেল ছিলেন জার্মান পার্টির সবচেয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মননের এবং অগাস্ট বেবেল এমন একজন ব্যক্তি সবসময়ে ও যে কোন অবস্থায় যাঁর ওপর নির্ভর করা যায়, কোনকিছুই তাঁকে বিপথগামী করতে পারে না। ১৮৪০ সালে তাঁর জন্ম ও ১৯১৩ সালে তাঁর মৃত্যু। প্রায় এক শতাব্দী আগে জনসংখ্যা সম্পর্কে বুর্জোয়া নীতিবাগীশদের যে তত্ত্ব বেবেল খণ্ডন করেছেন, আজ সেই অসার তত্ত্বই নয়া-ম্যালথাসবাদীরা বুর্জোয়াদের প্রবক্তা হিসেবে হাজির করছে। মানুষের এত দুঃখ দুর্দশা ও দারিদ্রের জন্য বুর্জোয়ারা দায়ী করছে একমাত্র জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে। কিন্তু আসলে তার জন্য দায়ী শ্রেণীবিভক্ত সমাজের লাগামহীন শোষণব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্য। বেবেল সমাজতান্ত্রিক সমাজ দেখে যেতে পারেননি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনসংখ্যার এই সমস্যাকে সমাধান করা হয়েছে। ম্যালথাসবাদীদের প্রচারকে আরও অসার করার মতো তথ্যপ্রমাণ ও দৃষ্টান্ত বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা রেখেছে। পরবর্তী সংখ্যায় তা আলোচিত হবে।

—অনুবাদক]

রাজশেখর কিম্বা পরশুরাম : একটি ধ্রুপদী ব্যক্তিত্ব

গৌতম ঘোষদস্তিদার

এখন এ-কথা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় যে, রাজশেখর বসু গত শতকের এক উজ্জ্বল চরিত্র—প্রজ্ঞায়, প্রতিভায়, ব্যক্তিত্বে, হাস্য-পরিহাসে তাঁর মত ঋজু পুরুষ ওই শতকে আর খুব কমই জন্মেছেন। বেঙ্গল কেমিকেলের বৈজ্ঞানিক কর্মশালা থেকে এক প্রতিভাবান রসায়নবীদ হঠাৎ যে-ভাবে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ ক'রে সকলকে সচকিত ক'রে তুলেছিলেন, সেটা ছিল অনেকটাই অভাবনীয়। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি সাহিত্যজগতে একটি বিশেষ স্থান ক'রে নিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। এমনকি, বৈজ্ঞানিক রাজশেখরের সাহিত্যিক রূপে আকস্মিক আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের মত পাঠককেও বিস্মিত ক'রে তুলেছিল, তিনি রাজশেখরের প্রতিভাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এবং পরবর্তীকালে প্রমাণিত হ'য়েছিল যে তিনি 'খাঁটি খনিজ সোনা' চিনতে একটুও ভুল করেন নি।

বাংলাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথ নামে সূর্যটি ঈষৎ স্তিমিত হ'য়ে এলেও পাশাপাশি উজ্জ্বল তারকার অভাব ছিল না। ছোট গল্পের জগতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী এবং শরৎচন্দ্র তো আসর জাঁকিয়ে আছেনই. উপরন্তু জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ তৎকালীন তরুণ লেখকগণ ক্রমশই স্বপ্রতিভায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ক'রছেন। রবীন্দ্রানুগত্য এবং রবীন্দ্রবিরোধিতার পরস্পর বিরোধী পথে বাংলাসাহিত্য পূর্ণতার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্য আন্দোলনের এই দুই বিপরীত জলোচ্ছ্বাসে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম একটুও তলিয়ে না গিয়ে, একটি স্থির বাতিস্তম্ভের মত বাংলাসাহিত্যের অন্তস্থলে সুদৃঢ় শিকড় চালিয়ে দিয়েছিলেন। জীবনকে—জীবনের স্থিতি কিম্বা ভঙ্গুরতাকে ঔপনিবেশিক বা ফ্রয়েডীয়—কোন চোখেই না দেখে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে দেখতে এবং দেখাতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তার রহস্যের চাবিকাঠি ছিল এক অনাবিল হাস্যরস মহিমায় প্রোথিত। তিনি একরূপ স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, অনসূয়, সংযত হাস্যরস ধারায় বাংলাসাহিত্যকে সঞ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

আমরা আগে যে-ক'জন গল্পকারের উল্লেখ ক'রেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই জীবনকে নানা ভাবগম্ভীর দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। শুধুমাত্র প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ছাড়া হাস্যরসের সাহিত্যিক প্রয়াস আর কা'রো মধ্যে তেমন লক্ষ্যগোচর হয় নি। অবশ্য, সমকালে না হ'লেও বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের প্রবর্তন ঘটেছিল আরো আগে। ঈশ্বর গুপ্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, এমনকি বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হাস্যরসের প্রবাহকে আরো গতিশীল করেছিলেন। তাই রাজশেখর বা পরশুরামের রচনা একেবারে ঐতিহ্যহীন এবং আকস্মিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত, লোকরহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত, রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, হিং-টিং-ছট, জুতা আবিষ্কার ইত্যাদি দুর্লভ হাস্যরসের সাহিত্য পরশুরামের আগেই লেখা হ'য়ে গেছে। তবে বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সকলের রচনাই বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আঘাতধর্মী।

কিন্তু পরশুরামের অবলম্বন ছিল একমাত্র বিশুদ্ধ হাস্যরস। তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের রচনায় যতটুকু রুদ্ধতা এবং সীমাবদ্ধতা ছিল তার অনায়াস অপসারণ ঘটেছে রাজশেখরের হাতে। বস্তুত, তাঁর গল্পগুলির আড়ালে সমাজ সমালোচনার কটাক্ষ থাকলেও তাঁর হাস্যরস-রসিকতা কখনোই বিদ্রূপাত্মক 'স্যাটায়ার'-এ পরিণত হয় নি। যদিও তাঁর রচনায় ভণ্ড গুরু, ধূর্ত ব্যবসায়ী, নারীলোলুপ যুবক, ন্যাকা যুবতী, সুযোগসন্ধানী ডাক্তার ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে নরনারী তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হ'লেও, তিনি কখনোই কিন্তু তাদের মানবিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেন নি। তাঁর 'পরশুরাম' ছদ্মনাম গ্রহণে এরকম মনে হ'তেই পারে যে, তিনি বোধহয় বিভিন্ন সামাজিক অসংগতির ওপর কুঠারাঘাত হানার প্রেরণায় ওইরূপ নামগ্রহণ ক'রেছিলেন। কিন্তু ঘটনা আদৌ সেরকম নয়। তাঁর নিজের ভাষায় এই পরশুরাম হ'ল 'একজন স্যাকরা'। পৌরাণিক পরশুরামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।......এই নামের পিছনে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নেই। পরে আরো লিখবো জানলে ও-নাম হয়তো নিতাম না'।

১৯২২ সালে, ৪২ বছর বয়সে (একজন লেখকের গুণাগুণ যে-বয়সে স্পষ্ট নির্ধারিত হয়ে যায়) তিনি লেখেন জীবনের প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'—এই প্রথম গল্পেই তিনি দারুণ হৈ-চৈ ফেলে দিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। গল্পটি প'ড়ে অনেকে ধারণা ক'রেছিলেন যে তা কোন আইনজীবীর রচনা। কেননা, একটি লিমিটেড কোম্পানী গড়ে তোলার যে কূটকৌশল তিনি এখানে বর্ণনা ক'রেছেন, তা আইনবিদ্যা জানা না থাকলে অসম্ভব। আবার এই গল্পেই হাস্যচ্ছলে বৈজ্ঞানিক রাজশেখরের কুমড়োর সাথে কস্টিক পটাশের

রাসায়নিক সংমিশ্রণে ভোজটেবিল স্যু' তৈরীর আজব পরিকল্পনা আমাদের অনাবিল হাস্যরসের সন্ধান দিয়ে যায়। এবং সেই সাথে অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতি তিনি কীরকম ক্রুদ্ধ ছিলেন, এই গল্পটি তারও প্রমাণ। তবে সমাজ সংস্কার বা সমালোচকের তিক্ততা তাঁর রচনায় কখনোই প্রকট নয়। কেননা তাঁর সামাজিক ক্রোধ এবং ঘৃণা তাঁর চরিত্রেরই অন্তর্গত বিষয়. তাই তার প্রকাশ এত স্বতোস্ফূর্ত। তাঁর চরিত্রে কোন অন্ধ সংস্কার ছিল না, তাই তিনি সাদাকে সাদা, কালোকে কালো রূপে দেখতে পেয়েছিলেন। এবং এই সংস্কারহীনতার কারণেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো এত জীবন্ত। সেজন্যেই শিহরণ সেন, লালিমা পাল (পুং), দোদুল দে. বিগলিত ব্যানার্জী, গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া, পেলব রায়, অকিঞ্চিৎ কর. ইত্যাদি চরিত্র এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ আজো আমাদের পুলকিত করে। তাঁর শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, কচিসংসদ, গড্ডালিকা, চিকিৎসা-সংকট, বিরিঞ্চি বাবা, কজ্জলী, ধুস্তরীমায়া, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি অসংখ্য উজ্জ্বল ছোটগল্প রাজশেখরের অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কৌতুকরস সৃষ্টির দুর্লভ শক্তি, বুদ্ধির শাণিত উজ্জ্বলতা এবং ব্যঙ্গরস পরিবেশনে এখনো আমাদের অত্যন্ত আকর্ষণের বিষয় হ'য়ে আছে। হাস্যরসকে ধ্রুপদী পর্যায়ে উন্নীত করার সমস্ত গৌরব তাঁর প্রাপ্য।

পরশুরামের প্রতিভা যে কতটা বৈচিত্র্যধর্মী, তা বোঝা যায় তাঁর অন্যান্য গম্ভীর গ্রন্থের পরিচয় নিলে। বাংলা বানান সমস্যা সমাধানের তিনি ছিলেন এক উত্তম নায়ক। অশুদ্ধ শব্দ এবং শব্দের অপপ্রয়োগ এবং ভাষার স্বেচ্ছাচার তাঁকে পীড়িত করেছিল। তাই শব্দচিন্তা এবং পরিভাষা প্রণয়নে তিনি একক প্রচেষ্টায় অনেকদূর এগিয়ে ছিলেন। তবে শব্দের এবং বানানের শুদ্ধতা রক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকলেও তিনি কখনোই পাণ্ডিত্যের অন্ধ অহংকার দ্বারা পরিচালিত হননি। মাতৃভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা অপেক্ষাও বিদেশী ভাষা থেকে শক্তি সঞ্চয় করার দিকেও তাঁর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিদেশী শব্দ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, 'অপ্রয়োজনে আহার করলে অজীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না'। অন্ধ সংস্কার নয়, তাঁর কাছে এই প্রয়োজনটাই ছিল বড় কথা।

১৯৩০ সালে 'চলন্তিকা' প্রকাশের সাথে-সাথেই রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার প্রমুখ শব্দ-বিশারদেরা তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করলেন। এই কিম্বদন্তীপ্রতিম অভিধানে বাংলা বানান এবং শব্দের ব্যবহার, সাধু-চলিত ক্রিয়াপদ, তৎসম শব্দের বানানরীতি, ব্যকরণের দুরূহ তত্ত্ব ইত্যাদির একটি বিশেষ আদর্শ স্থির করতে চেয়েছিলেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি তাঁর অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ ক'রে বাংলা ভাষার অশেষ উপকার ক'রেছেন। তাঁর 'চলন্তিকা' এখনো আমাদের কাছে একটি পরম নির্ভরযোগ্য হ্যাণ্ডবুক।

বুদ্ধদেব বসুর বিশেষ অনুরোধে তিনি বাংলা ছন্দ বিষয়েও আগ্রহী হ'য়েছিলেন। তবে তাঁর মহত্তম কাজ বাংলা পরিভাষাকে একটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা। এছাড়াও রামায়ণ, মহাভারতের সরস চলতি গদ্যানুবাদ ক'রে তিনি অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে হাস্যরসের কারবারী মানুষটি কীভাবে শব্দ চর্চা, ছন্দ চর্চা, অনুবাদ ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়েও একজন কিম্বদন্তীর নায়ক হ'য়ে উঠেছিলেন। আসলে, তাঁর ব্যক্তিত্বে দু'টি স্পষ্ট ভাগ ছিল—পরশুরাম এবং রাজশেখর। প্রথমজন যেখানে হাসির স্রোতে আমাদের একেবারে ভাসিয়ে দেন, তিনিই আবার দ্বিতীয়জন হ'য়ে আমাদের জ্ঞান পিপাসার সহায়ক হন, যিনি আমাদের স্রোতে ভাসান তিনিই আবার শৃঙ্খলিত করেন। বস্তুত পক্ষে, প্রজ্ঞা এবং আনন্দের সহাবস্থানে রাজশেখর এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, এক কিম্বদন্তীর পুরুষ।

তারুণ্যের বিজয় উৎসব বাগমুণ্ডিতে

জি. এম. আবুবকর

গত ১৮ই এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল বাগমুণ্ডিতে অনুষ্ঠিত হোল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত যুব উৎসব '৮০।

এতদঞ্চলে এর পূর্বে কখনো এমন বৈচিত্র্যেভরা বর্ণময় আনন্দ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়নি। উৎসব প্রাঙ্গণ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল পলাশ কুসুম শাল পিয়াল বৃক্ষশোভিত পাথরডি গ্রাম। তার পিছনে বিস্তীর্ণ উদার অযোধ্যা পাহাড় নৈসর্গিক দৃশ্যপট হয়ে দাঁড়িয়ে। এই প্রখর গ্রীষ্মের দিনেও এখানে এলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মায়ায় মন আপনা থেকে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যুব উৎসবের খেলাধুলোর আঙিনা হিসেবে ছাতাটাড়ের বি এস এ ময়দানকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর জন্য বি-ডি-ও-অফিসের পিছনের খোলা মাঠে অনুষ্ঠান মঞ্চ ও প্রদর্শনী মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল।

খেলাধুলোর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে পুরুষ বিভাগে ছিল ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ দৌড়, উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফন, বর্শা, লৌহ গোলক ও তীর নিক্ষেপ এবং সাইকেল রেস। মহিলা বিভাগে ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন, বর্শা ও লৌহ গোলক নিক্ষেপ এবং মিউজিক্যাল চেয়ার। অনুর্দ্ধ চোদ্দ বছর বয়সী বালকদের জন্য ১০০ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন ও ক্রিকেট বল নিক্ষেপ এবং বালিকাদের ৭৫ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন ও মাটির কলসী মাথায় করে ভারসাম্যের দৌড়। এছাড়া সকলের জন্য মজাদার 'যেমন খুশী সাজো'। আর ছিল পুরুষদের আটটি দলের লাঠিখেলা। একটি প্রদর্শনী ম্যাচ ছিল 'ছুর' খেলার। এই গ্রামীণ খেলাটির স্থানবিশেষে নাম 'দাঁড়িয়া বান্ধা'।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কয়েকটির হিট ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৮শে মার্চ। ওইদিন বিকেলে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টি নামে। ফলে মাঝপথে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। উৎসবে সমস্ত খেলাধুলোর মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৫৪৬ জন। পুরুষদের তীর ছোঁড়ায় ও বালকদের ১০০ মিঃ দৌড়ে শতাধিক করে প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে।

১৮ই এপ্রিল অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল সাতটায় সাইকেল রেস দিয়ে। ওই সময় মাঠে উপস্থিত ছিলেন ল্যান্ড রিফর্মস্ কমিশনার ও অন্যান্য অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ। সাইকেল রেস ছিল যুব উৎসবের অন্যতম আকর্ষণীয় খেলা। ২৩টি যুবক উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে জাইরার মোড় পর্যন্ত কালীমাটি গামী ২০ কিলো মিটার কংক্রীটের রাস্তায় সাইকেলে জোর ছুটেছেন। রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে তাদের দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠেছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন।

এদিকে খেলার মাঠে শুরু হয়েছে পুরুষ ও মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সেখানেও ক্রীড়ামোদী দর্শকের ভিড়। সমস্ত খেলাধুলা বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে শেষ হয়েছে ফলে প্রখর রৌদ্রের তাপ খেলোয়াড়দের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

'বৈকালিকী বৈঠকে' ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। খুবই পরিচিত কবিতা, বড়োদের জন্য সুকান্তের 'প্রিয়তমাসু' আর ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন'। 'সান্ধ্যবাসরে' ঝুমুর সংগীত প্রতিযোগিতায় ৬৫ জন শিল্পী অংশ নিয়েছেন। শিল্পীদের অনেকেই রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, দিনু তাঁতী, ভব প্রীতানন্দ, বিনন্দা সিং এর পদ গেয়েছেন। প্রতিযোগিতায় বয়সের কোন বিধিনিষেধ ছিল না। তাই ১০ বছরের কনিষ্ঠ শিল্পীর পরে ষাটোর্দ্ধ প্রবীণ শিল্পীকেও সংগীত পরিবেশন করতে দেখা গেছে। কণ্ঠ মাধুর্যের সৌকর্যে উভয়েরই গান উপভোগ্য হয়েছে। ঝুমুরের অনুষঙ্গ মাদল বাঁশি। শিল্পীদের অনেকে হারমোনিয়াম ব্যবহার করেছেন। অনেকে মাদলের পরিবর্তে তবলা ব্যবহার করেছেন। অনেকে কোন যন্ত্রানুসঙ্গ ছাড়াই গান পরিবেশন করেছেন।

'নৈশ আসরে' আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্থানীয় সাঁওতালী নাচের দলগুলি অংশ নিয়েছে।

প্রথমদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সংগীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র (শার্ঙ্গদেব), কলকাতার প্রখ্যাত লোক সংগীত শিল্পী দীনেন্দ্র চৌধুরী। তিনি ঝুমুরগানের আকর্ষণে বাগমুণ্ডির যুব উৎসবে এসেছেন। আর ছিলেন পুরুলিয়ার প্রবীণ বিদগ্ধ ব্যক্তি, 'সমবায়ের কথা'র সম্পাদক ও আকাশবাণী সংবাদদাতা অশোক চৌধুরী, 'ছত্রাক' পত্রিকার প্রতিনিধি নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। এবং ছো-নৃত্য ও ঝুমুর গানের প্রবীণ রসিক সমজদার ও পৃষ্ঠপোষক, ভবানীপুর গ্রামের ভ্রাতৃদ্বয় দ্বিজেন্দ্র সিংহদেব ও ব্রজেন্দ্র সিংহদেব।

১৯শে এপ্রিল সকালে খেলার মাঠে ছোটদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চোদ্দবছর বয়সী ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়েছে। বৈকালিক অনুষ্ঠানে ছিল নির্বাচিত ঝুমুরগানের অনুষ্ঠান

ঝুমুরিয়া'। এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকের ঝুমুর—দাঁড়, ভাদরিয়া, বৈঠকী, পালা, দেহতত্ত্ব, ঢুয়া, ঝিঙাফুলী, ডমকোচ, খেমটা, উদাসা, কীর্ত্তনা, লগনসাহী প্রভৃতি। সুরবৈচিত্র্যে ও মাধুর্যে সমৃদ্ধ লোকসংগীতের এই ধারাটি মানভূমের গ্রামের মানুষেরা বুকে করে ধরে রেখেছেন। কীর্তনের মতো ঝুমুরগানে আছে রাধা কৃষ্ণের প্রেমকথা। সঙ্গীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র অভিমত প্রকাশ করেছেন, ঝুমুরের ইতিহাস কীর্তনের চেয়েও পুরানো। মানভূমের মানুষের কাছে এ সংগীতের মর্যাদা জাতীয় সংগীতের মতো।

অনুষ্ঠানে সুভাষ ভকত গেয়েছেন ভাদরিয়া আর ডমকোচ। 'কাচ মরকত নবীন জড়িত/সুকোমল তনু শ্যামল/ভুরু দুটি আঁকা, ঈষৎ বাঁকা/বাঁকা আঁখি দুটি ঢলঢল/দেখে যা সখী ভরিয়া আঁখি/নাগর রূপে বন করিয়াছে আলো।' অপূর্ব গেয়েছেন তরুন গায়ক সুভাষ। অনুষ্ঠানে আকাশবাণীর প্রতিনিধি সোমনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বেতারের জন্য গানটি টেপরেকর্ডে তুলে নিয়েছেন। শ্রোতারা পরপর অনুরোধ করে গেছেন অন্য একজন নবীন শিল্পী অবনীপ্রসাদ সিংহের একাধিক গান শোনার জন্য। এছাড়া সংগীত পরিবেশন করলেন খুদ্দি গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ শিল্পী সুচাঁদ মাহাতো। এই শিল্পীর নাচনীনাচে ও ঝুমুরগানের অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি যন্ত্রানুসঙ্গ ছাড়াই ধরলেন দুর্যোধন দাসের পদ একটি দরবারী ঝুমুর—'কে না যায় যমুনার জলে/কে না চায় কালার কদমতলে গো/তবে কেন মন্দ বলে আমায় পরস্পর।' শিল্পীর আর সেই গানের গলা নেই। তবু অস্তমিত সূর্যের দিগন্তভালে ছড়িয়ে থাকা রক্তিমাভার মতো তাঁর কণ্ঠে আছে ছন্দ, লয় আর বৈঠকী ঢঙ। এই অনুষ্ঠানে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সংগীত পরিবেশন করলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছো-নৃত্য শিল্পী গম্ভীর সিং। 'ঝুমুরিয়া' অনুষ্ঠানটি বিদগ্ধজনদের প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছিল।

এর পরের অনুষ্ঠান ছিল আলোচনাচক্র। বিষয়—পুরুলিয়া জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার স্থান। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় বিদগ্ধ ব্যক্তি বিরিঞ্চি মোহন দে ও নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ্যেশ্বর মিত্র। শ্রীমিত্র তাঁর আলোচনায় ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির স্থান নিয়ে তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

আলোচনাচক্রের পর গুণীজন সম্বর্দ্ধনা সভায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছো-নৃত্য শিল্পী চড়িদার গম্ভীর সিং মুড়াকে ও ঝুমুরগান ও নাচনীনাচের প্রবীণ অশীতিপর বৃদ্ধ শিল্পী সুচাঁদ মাহাতোকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হলো। যুব উৎসব কমিটি ও বাগমুণ্ডির অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এঁদের দুজনকে স্মারক হিসেবে দুটি সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত উষ্ণীষ পরিয়ে দিয়েছেন। গম্ভীর সিং তাঁর নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, তাঁর বাল্যকাল দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। ছোটবেলায় তিনি গরু-বাগালী করতেন আর নদীর ধারে বালির উপর একা একা নাচতেন। এইভাবে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তবে তাঁর রক্তে ছিল নাচের ছন্দ। সেকালের প্রখ্যাত ছো-নৃত্য শিল্পী জিপা সিং তাঁরই পিতা। গম্ভীর সিং এবং তাঁর দল স্বদেশে বিদেশে শত শত অনুষ্ঠানে ছো-নৃত্য পরিবেশন করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছেন। ছো-নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তাঁর অবদান অপারমেয়।

সুচাঁদ মাহাতো প্রথমে নিজের সম্পর্কে মুখ খুলতে চাননি। পরে সকলের অনুরোধে রাজী হয়ে যা বলেছেন তা সকল শিল্পীজীবনেরই মর্মকথা। তিনি সারাটি জীবন অবিরামভাবে নৃত্য গীতের মাধ্যমে রূপ ও রসের সৃষ্টি করে এসেছেন। আজ জীবনের সায়াহ্নকালে উপস্থিত হয়ে তাঁকে যে এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে এনে সম্মান জানানো হলো এজন্য তিনি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে সবাই গুরুত্ব দিয়ে একটি কথা বলেছেন যে, এই ধরনের গুণীজন সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করে যে সমস্ত লোকশিল্পীরা জীবনভর কোন একটি শিল্পের জন্য সারাটা জীবন ব্যয়িত করলেন তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করাকে সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের আশু কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা উচিত।

ছো-নৃত্যের আসর বসলো রাত্রি দশটায়। আসরে লোকে লোকারণ্য। দূর দূর গ্রাম থেকে লোক এসেছে সারারাত ধরে ছো-নাচ দেখার জন্য। পুলিশ আর ভলান্টিয়াররা ভিড় সামলাতে হিমশিম খেয়েছে। উপচে পড়া ভিড় মাঝে মাঝে মঞ্চের সামনে নাচের জন্য নির্দ্ধারিত জায়গায় ঢুকে পড়ছে। অনেকে খালিগায়ে বিপদের সহচর টাঙি কিম্বা লাঠি হাতে নিয়ে বনের পথ ভেঙে উপস্থিত হয়েছে আসরে। আঠারোটি দলের প্রতিযোগিতামূলক নৃত্য। ছো-নৃত্যের প্রত্যেকটি পালা রামায়ণ মহাভারতের কোন একটি বীর রসাত্মক কাহিনী অবলম্বনে পারকল্পিত। প্রত্যেক নৃত্যশিল্পী তাঁর নির্দিষ্ট চরিত্রের মুখোশ এঁটে দলগত নৃত্য পরিবেশন করবেন।

আসরে একজন বিদেশিনী অতিথি উপস্থিত ছিলেন। মিস্ সুসান হকস্—তিনি ইংলণ্ড থেকে এসেছেন ছো-নৃত্য কলার উপর গবেষণা করতে। বাগমুণ্ডির যুব উৎসবের সংবাদ পেয়ে উৎসাহ অনুসন্ধিৎসু নিয়ে হাজির হয়েছেন আসরে। এই অল্পবয়সী তরুণী সারারাত জেগে ছো-নাচ দেখেছেন, তাঁর দামী ক্যামেরায় মুহুর্মুহু ছবি তুলেছেন আর নোট লিখেছেন।

প্রথম নৃত্য পরিবেশন করলেন অযোধ্যা পাহাড়ের কৃত্তিবাস মাহাতোর দল গণেশ বন্দনা দিয়ে। ছো-নৃত্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রত্যেকদল নৃত্য শুরু করার আগে গণেশ বন্দনা করেন। বিচারকরা সময়াভাবের জন্য কেবল প্রথমদলকে গণেশ বন্দনার সুযোগ দিয়েছেন। ধমসা, ঢোল আর সায়নার (শানাই) আওয়াজে মেলা প্রাঙ্গণ গমগম করতে লাগলো। কৃত্তিবাস মাহাতোর দলের গণেশ বন্দনার পর ছাতাটাঁড়ের বিবেকানন্দ ক্লাবের কিরাত অর্জ্জুন পালা, কড়েং এর চরণ মাহাতোর দলের গো-সিঙ্গা বধ, বুকাডির দলের সাত্যকী ভূরীসর্বা বধ। রেলার ধনঞ্জ সিং মুড়ার দলের অভিমন্যু বধ (প্রথমস্থান), বুড়দার তরুণ সংঘের রক্তবীর্য অসুর বধ (দ্বিতীয়), সিন্ধির খুল্লু মাহাতোর দলের শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ (তৃতীয়) নৃত্য পরিবেশন খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ছো-নাচ যখন শেষ হলো তখন ভোরের পাখিরা গান গাইছে, পূর্বাকাশে রক্তিম সূর্য উঁকি দিয়েছে।

উৎসবের শেষদিনে সকাল আটটায় আটটি দলের লাঠিখেলা হয়েছে। লাঠিখেলার সঙ্গে ছিল ঢোল আর সানাইয়ের

বাজনা। এই বাজনা না থাকলে খেলার মেজাজই আসেনা। লাঠির পরে ছিল তিনদলের গ্রামীণ 'ছুর' খেলা। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল পুরস্কার বিতরণী উৎসব। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সুবোধ বসু রায়, প্রবীণ অতিথি রাজেশ্বর মিত্র এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মিস্ সুসান হক্স্। যুব উৎসবের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে মানপত্র ও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পুরস্কার বিতরণী উৎসবে।

পুরস্কার বিতরণের পর ছিল 'বিচিত্রা' নামাঙ্কিত অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, গণসঙ্গীত, নৃত্য-গীতি, আধুনিক গান, ইত্যাদি পরিবেশন করেন। প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী দীনেন্দ্র চৌধুরীও সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের উদ্দীপিত করেন।

যুবউৎসবের শেষ অনুষ্ঠান ছিল গম্ভীর সিং এর দলের আমন্ত্রিত ছো-নাচ, কিরাত-অর্জ্জুন ও অভিমন্যুবধ পালা। এ অনুষ্ঠানটিও অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল।

যুবউৎসব উপলক্ষে অযোধ্যা পাহাড়ের চারটি গ্রামে সাঁওতাল মেয়েদের দেয়াল চিত্রাঙ্কণের একটি অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে যুব-উৎসব কমিটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোক্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন অযোধ্যা পাহাড়ের লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস কর্তৃপক্ষ। পুনিয়াশাসন, সাহারজুড়ি, বাদাঁ, বাগানডি—এই চারটি গ্রামের ৯৭ জন গ্রাম্য রমণী তাঁদের মাটির বাড়ির দেয়াল রঙের আলপনায় ভরিয়ে তুলেছিলেন। এইসব চিত্র আঁকতে মেয়েরা বাইরের কোন দোকানের রঙ ব্যবহার করেননি। ঘাস পুড়িয়ে কালো রঙ, ছাই থেকে ছাই-রঙ, পাহাড়ের বিভিন্ন বর্ণের মাটি যোগাড় করে নানান রঙ ব্যবহার করেছেন তাঁরা। বেশীরভাগ দেয়ালেই একপ্রকার সহজ আলপনার মতো গোল ফুল। কোথাও লতা পাতা গাছ ফুল মনোলোভা রঙে আঁকা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার একটি দেয়াল ছাড়া কোন দেয়ালে জীবজন্তু বা মানুষের চিত্র দেখা যায়নি। বাগানডি গ্রামের মেয়েরা প্রায় সকলেই অনবদ্য এঁকেছেন। চোখ জুড়ানো ভালো লাগার মতো এঁকেছেন রঙ্গী কর্মকার (প্রথম), মঙ্গলা মুড়াইন (দ্বিতীয়), রবন সর্দারী, শান্তি কর্মকার, বেহুলা মাছুয়ার, সোমারী লোহার, বুধনী হেমব্রম, ঘাসনী মুর্মু ও শান্তি মাছুয়ার। গ্রামের আদিবাসী মেয়েদের দেয়াল অলংকরণের মতো অনাদৃত লোক শিল্পকে তুলে ধরে যুবউৎসব কমিটি যে একটি ভালো কাজ করেছেন তা সংস্কৃতিবান প্রতিটি মানুষ একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

যুবউৎসবে মেলা প্রাঙ্গণে পুরুলিয়ার পত্রপত্রিকার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে মানভূম সংস্কৃতি মুখপত্র 'ছত্রাক' পত্রিকাগোষ্ঠী তঁদের দরাজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্টলে শ'খানেক মূল্যবান স্যুভেনীর অজস্র পত্রপত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন, ম্যাপ, দলিল-পত্র ছিল। পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে বেশী সংখ্যায় ছিল মুক্তি, সমবায়ের কথ, মালভূমি, রু, মজদুর দর্পণ, শিখর ভূমি, ডহর, টুকলু, কংশাবতী, পুরুলিয়া প্রভাকর, কেতকী, পুরুলিয়া গেজেট, জয়যাত্রা ইত্যাদি। 'ছত্রাক' পত্রিকার জন্ম থেকে প্রত্যেকটি সংখ্যা। এছাড়া ছত্রাকের মূল্যবান সংখ্যা-গুলোর প্রচ্ছদের বাঁধিত কলেবরে সুদৃশ্য রঙিন চিত্র যা দেখে দর্শককে মানভূম সংস্কৃতিতে পত্রিকাটির অবদানের কথা বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পত্রপত্রিকার স্টলের পাশেই ছিল মুখোশ ও মৃৎশিল্পের প্রদর্শনীর স্টল। স্টলে ঢুকতেই চোখে পড়ে রামচন্দ্র কুমারের মৃন্ময়ী সাঁওতালী মেয়ে। অনেকে প্রথম দর্শনে একে জীবন্ত মানব প্রতিমা জ্ঞানে ভ্রম করেছেন। মৃৎশিল্পের মধ্যে অধিক সংখ্যায় ছিল ষাঁড়, ময়ূর, গরু, ভালুক ইত্যাদি। মুখোশ শিল্পের প্রদর্শনীতে চাঁড়দার মুখোশ শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারত খুঁজে যেন এক একটি চরিত্রকে শিল্পীরা হাজির করেছেন। শিব, কার্তিক, অভিমন্যু, গয়াসুর, কালিঙ্গাসুর, নরসিংহ দৈত্য, কিরাত-কিরাতী, গো-শিঙ্গার ভিড় বেশী। সারা পুরুলিয়ার ছো-নৃত্য শিল্পীদের মুখোশ সরবরাহ করেন এই চাঁড়দার মুখোশ শিল্পীরা। প্রতিটির মূল্য পাঁচ টাকা থেকে শুরু করে দু'শ আড়াইশ। কাপড়ের সঙ্গে কাগজ মিশিয়ে অপূর্ব কৌশলে এইসব মুখোশ তৈরী হয়, তারপর দেওয়া হয় বাহারী রঙের ছোপ, করা হয় নানান অলঙ্করণ।

বাগমুণ্ডিতে অনুষ্ঠিত যুবউৎসব '৮০ যুব মানসে ও সামগ্রিক জনমনে অভাবনীয় সাড়া জাগিয়েছে। সকল শ্রেণীর মানুষ উৎসবে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের আকৃষ্ট করতে বিচক্ষণতার সঙ্গে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। একদিকে মান-ভূমের চিরায়ত লোক সংস্কৃতিকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে বাংলার প্রচলিত সংস্কৃতিকেও পাশাপাশি স্থান দেওয়া হয়েছে। বিদগ্ধ চিন্তাশীল মানুষের জন্য আলোচনাচক্র, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, পত্রপত্রিকার প্রদর্শনী, অন্যদিকে যৌবনদীপ্ত তরুণদের জন্য বিস্তর খেলাধুলার আয়োজন উৎসবের দিনগুলোকে মুখর করে তুলেছে। উৎসব পরিচালনা করতে স্থানীয় ক্লাবগুলি, পঞ্চায়েত সংগঠন, সরকারী কর্মচারীরা স্থানীয় নাগরিকরা এবং লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ও ছত্রাক পত্রিকা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিবেশনার মধ্যেও ছিল অভিনবত্ব, রুচিশীলতা ও মনোহারীত্ব। উৎসব সমাপ্তিতে প্রতিটি মানুষ কামনা করেছেন এমন আনন্দ-মুখর উৎসবের দিন তাঁদের কাছে যেন প্রতিবছরই ফিরে ফিরে আসে।

গল্প

অরাজনৈতিক সেই লোকটার গল্প

শুভাশীষ চৌধুরী

মিছিলটা নিঃশব্দতার মলিন শোকাহত কনকনে বাতাস সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো। রাশি রাশি সুতীক্ষ্ণ চোখগুলো কি এক জিজ্ঞাসায় সামনে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে মিছিল প্রবাহিত নদ-নদীর মত এসে মূল মহা সমুদ্রের উত্তাল স্রোতের সাথে ক্রমাগত একাকার হ'য়ে যাচ্ছে। এ মিছিলের শেষ কোথায় বোঝা যায় না। শুরুটাও ঠিক মত ধরা যায় না। কোন কোন জায়গায় দু সারি লাইন ঠিক মতো নেই। সেখানে দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন আকৃতির মানুষ এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন সম্প্রদায়। শুধু এগিয়ে যাওয়াটাই মূল লক্ষ্য। মুখ বরাবর, সামনের দিকে। এই ভাবে আমরা, অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবেরা দানবীয় কালো, অন্ধকার রাতটার সাথে জীবন্ত প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলাম। ওপরের হাজার হাজার মূক নক্ষত্রমণ্ডল, নীচের বিস্তীর্ণ শিশির সিক্ত প্রান্ত ভূমিকে মনে হচ্ছে আলোর সাথে যুদ্ধ-জয়ী কোনো বীরপুঙ্গবের পরিশ্রান্ত স্বেদ বিন্দু।

নজরুল হঠাৎ ব'লে ওঠে আমরা তো থানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি? এদিক দিয়ে যাওয়ার কি দরকার ছিল? কথা ও খুব আস্তে বলে। কারণ এটাতো একটা শোক মিছিল। ওর কথার পাল্টা কোন উত্তর আসে না। আমি নিমাইয়ের পকেটে হাত দিয়ে একটা বিড়ি বের করি। দম নেওয়া দরকার। দেড় ঘণ্টার ওপর শুধু হেঁটেই চলেছি। নিমাই অন্ধকারে আমায় ঠাওর ক'রে ব'লে ওঠে—আচ্ছা এতো লোক আমাদের মিছিলে এলো ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। শহরের বাড়ি ঘর কি সব ফাঁকা? আমি বিড়ির ধোঁয়ায় আমেজ এনে বলি মিছিলে আবার আমাদের তোমাদের কি? একজন মানুষ হঠাৎই খুন হ'লো। খুনটা কি জলভাত? সাড়া শব্দ নেই। পাল্টা কথাও আসে না। নিমাই মোটা কাঁথার মত চাদরটি খুলে কোমরে লেপ্টে রাখে। চাদরটায় আধোয়া-জনিত একটা বিট-কেল গন্ধ বের হয়। শীতের হুল ক্রমাগত ফুটে চলে শিরা-উপশিরায়—মিছিলটা এগিয়ে চলে। নিঃঝুম থমথমে সারিবদ্ধ মিছিল।

আমায় হঠাৎই পেছন থেকে কে যেন চিমটি কেটে তার পাশুটে কণ্ঠ শুনিয়ে ব'লে ওঠে—আচ্ছা ওনার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরাও নাকি এই মিছিলে আছে? আমি প্রতি উত্তরে বলি—এ সময় কথা বলা ঠিক নয়। মিছিলটাতো এক জায়গায় শেষ হবেই। তখন সব জানা যাবে। পাল্টা চিমটি আসে—ব'লে ওঠে—না ঘটনাটা কিন্তু খুবই আশ্চর্যের। একজন রাজনৈতিক ঝুট ঝামেলা মুক্ত মানুষও খুন হ'লো। ধর্মঘটের দিনেও তো ও বলেছিল কারখানায় না গেলে খাবো কি? চাকরী চলে গেলে কে দেখবে? তাকেই কিনা আমরা আজ কাঁধে নিয়ে চলেছি। বাঁ পাশ থেকে একজন বুড়ো কফ্-গলায় ঘর্ঘর ক'রে বলে—কেন কাঁধে নেওয়াটা কি পাপ? লোকটাতো শেষ পর্যন্ত প্রতি-বাদ ক'রেছিলো। ওর কথাগুলো ঠিক মতো কানে আসে না। দাঁতবিহীন ঘন-কফে কেমন যেন জড়িয়ে যায়। কেউ ওর কথা শুনছে কিনা সে খেয়াল ওর থাকে না। বা এসময় কথা বলা ঠিক নয় তাও ও বোঝে না। ধর্মঘট করার প্রশ্নে লোকটার মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীর নগনরূপ দেখে ওর মানবিক বোধ জেগে ওঠে।—তেতে থাকা উত্তেজনায় বুড়ো কথাগুলো বলে—ওর হাতের বিক্ষিপ্ত কাটা ছেঁড়া জায়গাগুলো দেখিয়ে ও বলে আমাকেও ওরা রেহাই দেয় নি।

সুজন মার্কা ক্যাপের মাঝখান থেকে ঠোঁট নেড়ে জবাব দেয়—আসলে কমরেড অজিত ওর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অজিতের উপর হামলাটা আসায় লোকটা আর চুপ থাকতে পারে নি। লোকটা স্বভাব চরিত্রে এক নম্বর ভীতু। তাছাড়া কোনদিন উঠোন-লেপ্টানো পরিসর ছেড়ে বাইরে বের হয় না।

মিছিলটা কখন থামবে বোঝা যাচ্ছে না। সবাই আমরা সকাল বেলায় এসেছি। কথা ছিল তিন শিফ্‌টে দায়ীত্বপূর্ণ কয়েকজন কমরেডের ওপর আলাদা আলাদা ভাবে দায়ীত্ব দেওয়া থাকবে। সেই ভাবেই দায়ীত্ব ভাগ করা হ'য়েছিল গতকালের সভায়। আমি, সাগর, অজিত, নজরুল ছিলাম ফার্স্ট সিফ্‌টে। গণ্ডগোল যে হ'তে পারে তা আমরা আগেই বুঝেছিলাম। কারণ গতবার যারা আমাদের ধর্মঘটে যোগ দেয়নি তার বেশীর ভাগ অংশই এবার আমাদের সাথে আছে। স্বাভাবিক ভাবেই মালিক এবার অন্য ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তবে সুবিধা ছিল আমাদের অন্য ইউনিয়নের নীচু তলার শ্রমিকরা প্রকাশ্যেই ব'লে ছিল রাজনৈতিকভাবে আপনাদের সমর্থন করি না তবে যে দাবী নিয়ে ধর্মঘট করা হ'চ্ছে আমরা তা সমর্থন করি। আর এই জায়গাতেই ছিল আমাদের আসল ঐক্য। আমরা ধর্মঘটের দিন কারখানায় এসে সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। উপস্থিতির হার শতকরা দশ জনও নয়। গেটে নজরুল, সাগর, অজিতের এক সাথে থাকবার

কথাও নয়। ওদের উপর আক্রমণ হ'তে পারে আমরা সবাই তা জানতাম। ওরা যে কেন হঠাৎ ওখানে একসাথে জড়ো হ'য়ে বক্তৃতা শুরু করেছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশগুলো প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা পালন ক'রতে পারে নি। গুণ্ডারা এ্যাকশন্ ক'রেছে ওরা দূরে ব'সে নীল আকাশে হাই তুলেছিল।

সাগর যে কোথা থেকে আমার পাশ ধ'রে ধ'রে হাঁটছিল তা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। ওর মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। আমি ব'ললাম—কমরেড তোমার কি খুব কষ্ট হ'চ্ছে? ও দাঁত বের করে হেসে উঠলো। বললো—কি ব্যাপাররে শালা একেবারে ইউনিয়নের মিটিংয়ের ঢংয়ে কথা। '৬২ সালের মার মনে নাইরে হারামজাদা! বলেই ও আমার পিঠে ওর ব্যান্ডেজ বাঁধা কপালের এক গোত্তা দিল। আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

......এতক্ষণে একটা আওয়াজ কানে এসে পে'ৗছালো। মনে হ'ল অজিতের গলা। ও চীৎকার ক'রে ব'লছে—আপনারা সবাই এখানে ব'সে পড়ুন। বিরাট ফাঁকা মাঠ আছে। ব'সবার কোন অসুবিধা হবে না।

ও যে কথাগুলো ব'লছে তার অর্ধেক কথা বোঝা যাচ্ছে না।

নজরুল আমায় ব'লে, এই শীতে হাত পা সব কাঠের মতো হ'য়ে গেল। আচ্ছা শীতটা কি এবার একটু আগে পড়েছে? আমি ব'ললাম,—হ'তে পারে। থাকতে তো হবেই। নজরুল বলে তা লোকটার নাম কি ছিল? আমি তো জানি উনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড় বংশের ছেলে। আমিষ খেতেন না। বুড়ো মনে হয় সজাগই ছিল। শীত ওকে পরাস্ত ক'রতে পারে নি। ব'লে ওঠে—ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আসছে কোথা থেকে? লোকটা আমাদের মত একজন শ্রমিক। এই গঙ্গার ধারে পাটকলের শ্রমিক। তাকে গুণ্ডারা খুন ক'রেছে। যারা ধর্মঘট ভাঙ্গতে এসেছিল তারা খুন করেছে। ও এখন আমাদের একজন। আমি ঐ লোকটাকে একটা বিশেষ কারণে ভাল মত চিনি। ওর নাম দীনদয়াল আচার্য। মাপা ছকে বেড়ে ওঠা নিরীহ মানুষ। অন্যায় করতেন না—অন্যায় দেখলে কিছু ব'লতেন না। গত ধর্মঘটে পুলিশ যখন আমায় পিটিয়ে কেটে পড়লো তখন আমি ওকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে একটু সাহায্য করতে বলেছিলাম। সেই সময় তিনি আমায় একটা রিক্সা ডেকে দিতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎই আমি আসছি বলে চলে গেলেন। পরে হাসপাতাল থেকে ফিরে ওকে দারুণ গালিগালাজ করে ছিলাম। অজিত না থাকলে হয়তো পিটিয়েও দিতাম। যাই হোক মাঠটা অজস্র রকম মানুষের ভীড়ে কানায় কানায় ফুলে ফেঁপে উঠলো। শিশির সিক্ত ঘাসে আমরা সবাই হাত পা গুটিয়ে ব'সে পড়লাম। পিছন থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে বলে উঠলো হুকুম দিন—শালাদের পিঠের চামড়া তুলে দেবো। কয়েকজন ওর কথাকে সমর্থন জানানোর জন্য হাততালি দিয়ে উঠলো। বিভিন্ন জনের বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে মনে হ'চ্ছিল আমাদের দানবীয় চুল্লিটা যেন সাময়িক ভাবে এখানে উঠিয়ে আনা হ'য়েছে। শীতের তীব্র কাঁটা কারো গায়ে বিঁধতে পারছে না। বারুদে ডোবানো হাজার হাজার পরিচিত দেখা-অদেখা কালো কালো অবয়ব মাঠের এদিক সেদিক ছটফট্ ক'রছে। ঘৃণা, ক্রোধ সঞ্চিত অভিশপ্ত জীবনের অবসান চায় সবাই। এই লগ্নেই।

অজিত একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে ওর বক্তৃতা আরম্ভ ক'রলো। অজিত আমি কারখানায় একই বিভাগে কাজ করি। দুজনেই ফাজলামি-ইয়ার্কী খুব করি; কিন্তু এখন ও আমার সাথে ঠাট্টা মস্করা করা—বন্ধু অজিত নয়। ও এখন বিরাট একটা দলের প্রতিনিধি। সমস্ত মানুষের মেজাজ আজ ওর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

ও শুরু করে—কমরেড আজ আমি এই রাতে আপনাদের বেশী কথা বলবো না। দীনদয়াল বাবুকে ওরা খুন করেছে। আমরা এতক্ষণ মিছিল ক'রলাম। আমাদের যখন গুণ্ডারা আক্রমণ করে তখন তিনি প্রতিবাদ ক'রেছিলেন। উনি ওদের বলেছিলেন কারখানায় যাদের ঢোকার ইচ্ছা ছিল তারা তো ঢুকেই গ্যাছে। আমরা জানি তিনিও কারখানায় ঢোকার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। উনি সে কথাও ওদের ব'লেছিলেন। কিন্তু গুণ্ডারা যখন আমাদের উপর আক্রমণ ক'রলো সাগরের মাথা ফাটিয়ে দিলো তখন তিনি আর চুপ করে থাকতে পারেন নি। এটাই আমাদের আনন্দ এবং গর্ব। এ সময় সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। পিছন থেকে শ্লোগান উঠল শহীদের রক্ত, হবে নাকো ব্যর্থ। অজিত রেশ টেনে ব'লে চলে আমরা আগামীকাল আবার ধর্মঘট করবো। আমরা দোষী গুণ্ডাদের শাস্তি চাই। মালিকদের বাধ্য করবো যাতে তাঁর স্ত্রী ঐ কারখানায় চাকরী পায়। তবুও যদি দাবী না মানা হয় তবে ধর্মঘট চলবে। সবাই সমস্বরে বলে ওঠে—হ্যাঁ এটাই ঠিক। তাই ক'রতে হবে আমাদের। মাঠের দক্ষিণ দিক থেকে এক মহিলা কমরেড বলে ওঠে ওনার স্ত্রীকে বলবেন ওর হাজার হাজার অভিভাবক ওদের পরিবারকে চোখের মণির মত আগলিয়ে রাখবে। যে যায় সে আসে না; কিন্তু তার কাজ ইতিহাস হ'য়ে থাকে। আমরা বহু চেষ্টা করেও ওনার স্ত্রীর চেহারাটা অন্ধকারে দেখতে পেলাম না। সম্ভবতঃ কোলের দুটো বাচ্চা নিয়ে উনি এখন খুব কাঁদছেন। হয়তো অফিস থেকে গিয়েই শুদ্ধ কাপড়ে গঙ্গাজলে আচমন ক'রে তিনি পুজোয় বসতেন। সংসারের বাঁধা জালটায় বসে বৌয়ের সাথে গল্প ক'রতেন। হয়তো রোজই তিনি তাই ক'রতেন। কেউ কোন খোঁজ নিত না। খোঁজ করার মতো কোন কিছুই তিনি হয়তো কখনো করতেন না। পাশ কাটিয়ে চলতেন। কিন্তু আজ, সামান্য একটু প্রতিবাদ। বুঝিবা প্রতিবাদও নয় নিছক রাজী করানোর আস্থা নিয়ে ভালোমানুষী। ভিতর থেকে উগ্‌লে বেরোনো মানবতার টান। শুধু সেই কারণেই তিনি পৃথিবীতে আর থাকতে পারলেন না।

কফ-গলায় ঘর্ঘর আওয়াজে বুড়ো বলে ওঠে—কাল যে অচীন ছিল আজ সে আমাদের মনের বাড়তি শক্তি হ'য়ে উঠলো!

সেদিন সূর্য

চট্টোপাধ্যায়

গতরাত্রেই বলব সে কি,
আকাশভরা চন্দ্র
গ্রামশহরের মাথায় মাথায়
জ্বল্‌ছিল চন্দ্র।

ভোর হয়েছে ভোরের মত
উত্তরণের দীপ্তি
তিমির ছেঁড়া অন্ধকারেও
যুবজীবন দীপ্তি—

সকাল হতেই জীবনযাপন
চায় মশালের মন্ত্র
অবাক আলোয় ঝরতে থাকে
বীজ বপনের মন্ত্র;

হাঁটতে হাঁটতে আটকে গেলাম
সামনে দেখি সূর্য......
মাঠের পরে মাঠ চলেছে
চতুর্দিকেই সূর্য।

মেহগনি ও বণিক সভ্যতা

রণজিৎ সিংহ

বাড়ির দক্ষিণ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে মেহগনি। তার প্রকাণ্ড গুঁড়ি আর ছড়ানো ডালপালায় উপছে পড়ছে বাঁচা। চিকন সবুজ পাতায় ঝরছে খুশি।

ফাল্গুনে বহুদূর পর্যন্ত তার ফুলের সুগন্ধ বুক ভরে টেনে আমরা টের পাই এ সেই মেহগনি। বৈশাখে জ্যৈষ্ঠে মহা-পরাক্রমশালী সূর্যের আঁচে ঝলসে আমরা তার ছায়ায় দাঁড়াই। আর বলিঃ তুমি বাঁচো চিরদিন।

শোনা যায় ফড়ে আর মালিকে চলছে দরকষাকষি। মালিক চায় ১২ হাজার। ফড়ে ৭ পর্যন্ত উঠে আবার আড়ে আড়ে দৈর্ঘ প্রস্থ বেড় জরিপ করে। আর অঙ্ক কষে তক্তার হিসেবে ঠিক কতয় পড়তা।

মায়ের মুখ

আদিত্য মুখোপাধ্যায়

এইমেঘ আকাশ বাতাস ভালোবাসা স্ফটিক খচিত প্রিয় মুখ
এই মুখ বর্ষার অনন্ত ভিজে মুখ
রাশভারী আমার মায়ের মুখ সোহাগ মেশানো,
মাটির অমেয় স্বাদ পড়ন্ত বেলার ঘ্রাণ
চাষার মাতানো গান শালিখের সিক্ত প্রাণ
স্বচ্ছ বাঙলার মুখ এইখানে এই গাঁয়েতে বিছানো।

এইখানে বৃক্ষলতা তাল-তরু সারি স্থবির স্থপতি
আমার মায়ের প্রজা মা আমার সবার নৃপতি
রোজ রোজ পদ্ম ফোটে মায়ের চরণতলে পূত হয় দীঘির শরীর,
ঘরময় মাতৃপদচিহ্ন আঁকা মনময় প্রেমের বিন্দুক
মাঠময় অসীম তালুক তার সাজানো সিন্দুক
দিকচক্রবালে এক বন-রেখ গন্ডী আঁকা সীমানা খড়ির।

মহুল ফুলের ভিজে ঘ্রাণ বাউল গানের প্রিয় প্রাণ
ডাহুক-ডাহুকী প্রেম দান গাঁয়ের বধূর অভিমান
এইসব নিয়ে আমার মায়ের মুখ সোহাগী মায়ের মুখ,
মায়ের গেরুয়া শাড়ী পথময় সোনালী স্বপন
লাল সিঁথি পাকা শস্য অনুরাগী হিমেল নয়ন
আমার মায়ের স্বাদ এইখানে এইখানে আমার মায়ের মুখ।

লুট

বিদ্রোহেন্দ্রনাথ চন্দ

ঢাকনাখোলা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে
থরে থরে সাজানো বিশাল সম্পদ
উদাম পড়ে আছে

লুটেরাদের হাত ঢোকে ঝাঁপির ভিতরে।
প্রতিযোগিতা,
রক্তারক্তি।
শূন্য হাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি
নিঃস্ব পৃথিবীর বুকে।

সাপেরা বাসা বাঁধে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে।

শিল্প-সংস্কৃতি

বাংলা সিনেমা—তরুণ মনে তার প্রতিক্রিয়া

হীরালাল শীল

তরুণ মনে সিনেমার প্রতিক্রিয়া কেমন, কতখানি, তা নিয়ে আলোচনা করার আগে একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক। সিনেমার জন্ম-লগ্নটা একটু তুলে ধরা যাক না।

বাংলা সিনেমার বয়স ষাট বছর পূর্ণ হ'ল ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে। প্যারিসের গ্রাণ্ডকাফেতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর যখন প্রথম 'চলমান ছবি' প্রদর্শিত হ'ল, তার মাস দুয়েকের মধ্যেই তা বাঙালীর কল্পনার ভিতকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। ১৯০০ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নানা সময়ে বাংলাদেশে চলমান ছবি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আলাপ-আলোচনা চলেছিল। তারই ফলে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রূপালী পর্দায় প্রথম বাংলা ফিচার ফিল্মের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাংলা চলচ্চিত্রের জনক-স্থানীয়দের মধ্যে জ্যোতিষচন্দ্র সরকার, হীরালাল সেন, দেবী ঘোষালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁদের হাতেই এদেশের ছায়াছবির হাতেখড়ি। তবে প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি জন্ম নিয়েছিল জে. এফ. ম্যাডানের হাতে। ১৯১৮ সালে ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'বিল্বমঙ্গল' তৈরী করে।

ক্রমশঃ বাংলা ছবি ৪২ বছর ধরে এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব পথে—গতিতে ছন্দে। যে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিশুর জন্ম হয়েছে দাদাসাহেব ফালকের হাতে, তার শিক্ষক বলা যায় বাংলা ছবির কারিগরদের। শিশুকে চলতে শিখিয়েছেন তাঁরাই।

দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বোস প্রমুখ প্রখ্যাত পরিচালকদের হাতে পড়ে সেই শিশু বড় হয়ে উঠেছে। সে আজ কিশোর, কিংবা যুবক নয়, সে প্রৌঢ়-পরিণত। আজ সে নিজেই একটি চরিত্র—তার ভাষা আলাদা, বিভিন্ন পরিচালক চলচ্চিত্রকে মাধ্যম করে সমাজের বিভিন্ন দিকের চিত্রকে তুলে ধরেন। সুখের কথা, আমাদের কোন পরিচালকের অভাব যেমন কোনদিন ছিল না, আজও নেই। কিন্তু সিনেমার জন্ম-লগ্নে যে ধরনের ছবি তৈরী হয়েছে, আর আজকাল যে ধরনের ছবি তৈরী হচ্ছে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য কি আমাদের চোখে পড়ছে না? অবশ্য, পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ, যুগের ধর্মকে তো অস্বীকার করা যায় না। সে যুগে সেটাই সত্য ছিল, তার পেছনে ছিল আন্তরিকতা—নিষ্ঠা। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে যে ধরনের ছবি তৈরী হচ্ছে, তার পেছনে কতটুকু আন্তরিকতা, নিষ্ঠা বর্তমান সে ব্যাপারে চিন্তা করলে হতাশ হতে হয়, বিগত দুই দশক ধরে যে সব বাংলা ছবি (নামোল্লেখের প্রয়োজন নেই) আমাদের দেখানো হ'ল, সেগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ ছবিই অত্যন্ত নিম্নমানের, কি উপস্থাপনার দিক থেকে, কি আঙ্গিকের দিক থেকে, কি বক্তব্যের দিক থেকে। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, পূর্ণেন্দু পত্রীর কথা বাদ দিলে আমরা এমন কোন পরিচালকের নাম কি খুঁজে পাব, যাঁদের চলচ্চিত্র থেকে আমরা কিছু পেয়েছি? অথচ দেশে বাঙালী পরিচালকের তো অভাব নেই, ছবির সংখ্যাও তো পরিমাণের দিক থেকে কম দেখছি না, তবে গুণের অভাব কেন? কেন এই সব পরিচালক পরিণত মনস্তাত্ত্বিকের ভাবনা-চিন্তা-সৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন না? কেন একবার ভেবে দেখেন না, 'অযান্ত্রিকে'র মতো আর একটা কিছু করা যেতে পারে কিনা? চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? ভাবতে কষ্ট লাগে বর্তমানে পরিচালকদের স্বাধীনতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রযোজকদের মর্জির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এর ফলে বাঙলা সিনেমার যে কি অপূরণীয় ক্ষতি হতে চলেছে, তা একবার তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি? ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে সিনেমাকে মানের দিক থেকে খাটো করা কখনওই উচিত নয়। সেই কারণেই বর্তমানে সিনেমার অশ্লীলতার পরিমাণটাই বেশি চোখে পড়ে।

ঋত্বিক ঘটক তাঁর ছবিগুলিতে যে মহত্তর সত্য ও জীবনের নতুনতর অর্থের সন্ধান করে গেছেন সারা জীবন, যে রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়েও তাঁর চরিত্রদের হারতে দেখিনি কখনও: এখনকার পরিচালকদের ছবিগুলিতে সেই সব আর খুঁজে পাই না কেন? কেন 'কিছু একটা করা'র নামে সস্তা চটুল ছবি দেখানো হয়?

শুধু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই নয়, গত কয়েক দশকের প্রায় শ'তিনেক বাংলা ছবির তালিকার দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাব যে, শিল্পগত মানের দিক থেকে বাংলা সিনেমা কতটা নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। একই রীতি, একই ধরনের সংলাপ, একই চরিত্রচিত্রণের পুনরাবৃত্তিতে বাঙালী দর্শক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন—"চারপাশের মানুষগুলোর জীবনের সাথে নাড়ীর যোগ রেখে ছবি করতে হয়। তা না হলে ছবি করার কোন মানেই হয় না।" দুঃখের বিষয়, জীবনের সঙ্গে নাড়ীর যোগ দূরের ব্যাপার বাঙালী পরিচালকরা আমাদের চারপাশের মানুষগুলোকেই জানেন না। পৃথিবীর সর্বত্র সিনেমা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আছে, তর্ক-বিতর্ক আছে.

[শেষাংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়]

ভানু ত্রিবেদীর তুলিতে—

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

পরিবর্ত শক্তি-উৎস

বাতাস/হাওয়া-কল—আদিম মানুষ ভয় পেত হাওয়াকে। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে, মানুষ অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির মত হাওয়া অর্থাৎ বাতাসকেও তার কাজে লাগাতে শিখল। যে বাতাসকে মানুষ কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভয় করত আস্তে আস্তে সেই বাতাসকে মানুষ তার দৈহিক শক্তির পরিবর্ত শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত করতে শিখল।

আজ থেকে অনেক দিন আগেই মানুষ দেখেছিল যে, চার পাঁচটা পাখার সমন্বয়ে যদি একটা চক্র তৈরী করা যায়, আর সেই চক্রকে যদি বাতাসের সামনে রাখা যায় তাহলে সেই চক্রটি ঘোরে। বাতাসের জোরে বওয়া আস্তে বওয়ার উপর নির্ভর করে চক্রের ঘোরার গতি। মানুষ এটুকুও বুঝেছিল যে চক্রের মূল অক্ষদণ্ডর সাথে যদি কুয়োর দড়িটাকে একটু কায়দা করে সংযুক্ত করতে পারলে কুয়ো থেকে আর টেনে টেনে জল তুলতে হয় না। এবং সুতরাং বাতাসকে কাজে লাগিয়ে মানুষ পানীয় জল ও কৃষিকার্যের জল সংগ্রহর কাজটাকে সহজ করে তুলল, একই ব্যবস্থায় মানুষ আরও অনেক কাজই করতে শিখেছিল যার ফলে তার দৈহিক শক্তির ব্যবহার অনেকটা কমে গেল। কি কি কাজ? যব অথবা গম ভাঙানো, আখ মাড়াই, ধান কোটা, খড় কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যাপকভাবে বাতাসকে কাজে লাগানো হত। বাতাসকে কাজে লাগিয়ে কাঠ চেরাইয়ের মত দুরূহ কাজও মানুষ করেছিল। পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই এই ধরণের কাজে বাতাসকে মানুষ বড় বড় চক্রাকার এক ধরণের যন্ত্র যার চলতি নাম হাওয়া-কল, তার মাধ্যমে নিজের কাজে লাগাত। প্রতিমুহূর্তে উন্নতি-অগ্রগতির অন্বেষণে নিরত মানুষ, হাওয়া-কলকে বাতিল করে দিল সেদিন যেদিন আরও সুবিধার সন্ধান সে পেয়ে গেল। বাষ্প-চালিত, বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রাদি হাতের মুঠোয় আসায় হাওয়া-কল নামক বস্তুটি সম্ভবতঃ হারিয়ে গেল। তারপর যেদিন খনিজ তৈল (পেট্রোলজাত তৈলাদি) তার কব্জাগত হল সেদিন তো একেবারে সবাই ভুলেই গেল বাতাস পরিচালিত হাওয়া-কলের কথা।

কিন্তু আজ টান পড়েছে কয়লার ভাঁড়ারে, তেলের অবস্থাও সুবিধার নয়। তার উপর ক্রমাগত দাম বাড়ার ফলে সবাই আবার নতুন করে ভাবছে হাওয়া-কল বা wind-mill এর কথা। তবে পুরোনো আমলের হাওয়া-কলের থেকে আজকের হাওয়া-কলের চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। আজ যারাই হাওয়া-কল নিয়ে চিন্তা করছেন তারা ভাবছেন কিভাবে হাওয়া-কলকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্র জেনারেটর-এর সংগে সংযুক্ত করে আরও বেশী বেশী করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাওয়া-কল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী এগিয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসা (NASA) নামক সংগঠনটি এমন একটি হাওয়া-কল প্রস্তুত করেছে যার সাহায্যে ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ঘণ্টায় ২৩ মাইল বেগে হাওয়া বইলে তার সাহায্যে ২০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে ওদেশেরই অন্য একটি প্রস্তুতকারক সংস্থা। আমেরিকান এনার্জি অল্টারনেটিভ নামক একটি সংস্থা এমন একটি হাওয়া-কল তৈরী করেছে যার সহায়তায় ১·৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। (ছবি-১) ওদেশের আরেকটি সংস্থা ইন্ডিপেণ্ডেন্ট পাওয়ার ডেভেলপস একটি হাওয়া-কল তৈরী করেছে; এর সাহায্যে ১৮ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। (ছবি-২) অন্যান্য দেশগুলিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ফ্রান্সের একটি সংস্থার তৈরী "এ্যারো-ওয়াট" (ছবি-৩) নামক হাওয়া-কলের সাহায্যে ৪·১ কিলো-ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ডেমেনিকো স্পেরাণ্ডিও নামক একটি ইটালীয় সংস্থার তৈরী হাওয়া-কলের সাহায্যে ১ মেগাওয়াগ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। সুইজারল্যাণ্ডের ইলেকট্রো গ্যাম্ব সংস্থা ইলেক্ট্রোজেনারেটর (ছবি-৪) নামে এক ধরণের হাওয়া-কল তৈরী করেছে যার সাহায্যে ৫০ ওয়াট থেকে ৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার "ডানলাইট" (ছবি-৫) ইলেক্ট্রিক্যাল কোম্পানী যে হাওয়া-কল তৈরী করেছে তার উৎপাদন ক্ষমতা ১ মেগা-ওয়াট থেকে ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

ছবি—১

ছবি—২

ছবি—৩

ছবি—৪

ছবি—৫

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে সারা পৃথিবী জুড়েই হাওয়া-কল নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। তবে সবারই উদ্দেশ্য এক—বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এই কাজে কোন সংস্থা অথবা কোন প্রতিষ্ঠান কিছুটা হয়তো এগিয়ে গেছে কেউ বা একটু পিছিয়ে চলছে। তবে এই শক্তি সংকটের যুগে সবাই আবার বাতাসকে কাজে লাগাবার চিন্তা করছেন এটাই আশার কথা। আর এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক দিক হল—ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে গ্রামীণ সভ্যতার উন্নয়নে হাওয়া-কলের মত যন্ত্র সত্যি সত্যি মানুষের উপকারে আসবে।

—অমিতাভ রায়

শিল্প-সংস্কৃতি : ৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে, কেবল বাংলা চলচ্চিত্রে তার কোন তাপ-উত্তাপ নেই।

আসলে, সিনেমা তৈরীর পেছনে দরকার সততা. তা আমাদের কতটা আছে? রোজ একটি করে আর্ট ফিল্ম হোক, এতটা আমরা নিশ্চয়ই কেউ আশা করি না। কিন্তু ভালো কমার্শিয়াল ছবির জন্যও যা যা প্রয়োজন—সুলিখিত কাহিনী, সু-অভিনয়, সুগ্রথিত চিত্রনাট্য, বাস্তববোধ, জীবনচেতনা, আঙ্গিকের বুদ্ধিসম্মত প্রয়োগ, এই সবের একান্ত অভাবই আমাদের যন্ত্রণা দেয়।

মানলাম, বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে যথেষ্ট সংখ্যক পুঁজির অভাব, এমনকি ভালো ল্যাবরেটরি ও স্টুডিও পশ্চিমবঙ্গে নেই, কিন্তু তাই বলে সব রকম প্রচেষ্টা হাল্কা প্রমোদ-উপকরণের স্রোতে ভেসে যাবে কেন? প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন প্রায় চোখে পড়ে—"মুমূর্ষু বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প বাঁচুক—ভালো ছবি তৈরী হোক। ভালো ছবির জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং এখনই।" এই 'এখন' কবে আসবে গালে হাত দিয়ে না ভেবে, কিংবা চায়ের কাপে তুফান না তুলে যদি আমরা রুচিসম্মত মানুষেরা রুচীহীন চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়া চলচ্চিত্র শিল্পকে টেনে তুলি, তবে কি আমরা বাংলা সিনেমাকে নতুন জীবন দান করতে পারব না?

কলকাতায় এশীয় টেব্‌ল টেনিসের আসর

মে মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম এশীয় টেব্‌লে টেনিস প্রতিযোগিতা। ১৯৭৫-এর ফেবরুআরিতে অনুষ্ঠিত তেত্রিশতম বিশ্ব টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতার পর এই দ্বিতীয়বার কলকাতার নেতাজী ইন্‌ডোর স্টেডিয়াম এই ধরনের বড়সড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক আসরে পরিণত হল। কল্লোলিনী কলকাতার ইদানিংকার ইতিহাসে এই প্রতিযোগিতা সংগঠনের বিশালতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎকর্ষে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রইল। অনুকূল পরিস্থিতি, ক্রীড়ারসিক দর্শকদের সাগ্রহ উপস্থিতি এবং ক্রীড়া সংগঠকদের পরিশ্রমের যোগফলে আরও একবার প্রমাণিত হল কলকাতাই এই ধরনের প্রতিযোগিতা সংগঠনের দাবিদার হতে পারে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্রগুলির মধ্যে। অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার সংগঠকেরা রাজ্যসরকারের পূর্ণ সহযোগিতায় একটি মর্যাদাপূর্ণ ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা দর্শকদের কাছে উপহার দিতে পেরেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৯ মে তারিখে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সময়োচিত ভাষণে তিনি এই ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠানের সার্থকতা ও তাৎপর্যের কথা তুলে ধরলেন। প্রতিযোগী দেশগুলির মার্চপাস্ট এবং সি. এল.-টির চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই দিনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল বহুলাংশে। আলোকোজ্জ্বল স্টেডিয়ামের বিভিন্ন দিকের দর্শকের করতালি ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল কলকাতার ক্রীড়ামোদী দর্শকদের সহজাত প্রবণতা ও মানসিকতা। এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন এবং উপস্থিতি সংগঠকদের ভবিষ্যতে আরও বর্ণোজ্জ্বল ক্রীড়ানুষ্ঠান সংগঠনে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করবে। ১০ মে থেকে শুরু হল দলগত প্রতিযোগিতার খেলা। চলল ১৩ মে পর্যন্ত। ১৪ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত (১৭ মে বাদে) হল ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার খেলা। আট দিনের সুখস্মৃতি ক্রীড়ারসিক দর্শকদের আলোড়িত করে রাখল কানায় কানায়। দুটি প্রতিযোগিতাতেই জয়জয়কার হল সমাজতান্ত্রিক চীনের। আরও একবার প্রমাণিত হল রাষ্ট্রের কল্যাণব্রতী দৃষ্টিভঙ্গী, শারীরিক পটুতা ও নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন একটা দেশের সাফল্যকে কিভাবে সুনিশ্চিত করে।

এই প্রতিযোগিতায় মোট বাইশটি দেশ অংশ নিয়েছিল। সেগুলি হলঃ ভারত, চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, তাইল্যান্ড, লাওস, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, হংকং, ব্রহ্মদেশ, সিংগাপুর, ইরাণ, সৌদী আরব, ইয়েমেন (এ. আর), শ্রীলংকা, ইয়েমেন (পি. ডি. আর), সিরিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ এবং বাহরিন। প্যালেস্টিন থেকে এই প্রথম একজন প্রতিনিধি এশীয় টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে এসেছিলেন। এছাড়া অনুপস্থিত ছিলেন কাম্পুচিয়া, সংযুক্ত আরবশাহী, কাতার, ক্যুয়েত—এই চারটি দেশের প্রতিনিধি এবং খেলোয়াড়েরা। আতিথ্য, পরিবহণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুখস্মৃতি নিয়েই যে এই সমস্ত দেশের খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিরা দেশে ফিরেছেন, সেকথা তারা যাবার আগে বারবারই বলে গেছেন। চীন দলগত ও ব্যক্তিগত—দুটি প্রতিযোগিতাতেই শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। বাছাই তালিকার শীর্ষস্থানেও ছিল এই চীন। পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতায় চীনের পরের স্থান ছিল জাপানের, মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় চীনের পরের স্থান ছিল উত্তর কোরিয়ার। ১৯৭৭ সালের কুয়ালালামপুরের চতুর্থ এশীয় টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষ ও মহিলা দুটি বিভাগেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল উত্তর কোরিয়া। জাপানের খেলা এবার দর্শকদের পুরোপুরি হতাশ করেছে। উত্তর কোরিয়ার ক্রীড়াপদ্ধতিতেও খুব একটা উন্নতির ছাপ ফুটে উঠতে দেখা যায় নি। ১৯৭৫-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপের নিরিখেই একথা-গুলো মনে আসছে। পুরুষ বিভাগে বিশ্বের দুনম্বর চীনের গুয়ো হুয়া, ১৮ বছরের কিশোর সাইকে জাপানের গোটো এবং উত্তর কোরিয়ার জো ইয়ং হো ক্রীড়াশৈলীর সুস্পষ্ট পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন। মহিলা বিভাগে হংকঙের হুই সো হুং, জাপানের এমিকো কান্ডা, চীনের লিউ ইয়ং এবং উত্তর কোরিয়ার লি সং সুক ছিলেন শ্রেষ্ঠ 'চার খেলোয়াড়'। ৭৫ ও ৭৭ সালের মহিলা বিভাগের বিজয়িনী পাক-ইয়ং সুন বরং দর্শকদের প্রত্যাশার ওপর সুবিচার করেন নি। ভারতের মনমিত সিং ও নন্দিনী কুলকার্নীর খেলায় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির ছাপ ছিল। বালক বিভাগের রাণার্স সুজয় ঘোড়পাড়ে আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্পষ্ট পরিচয় রাখতে পেরেছে। তুলনায় ভারতের চন্দ্রশেখর এবং ইন্দু পুরীর খেলায় শারীরিক অক্ষমতার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আটটি দেশের বিরুদ্ধে একতরফা খেলে চীন সরাসরি ৫-০ ম্যাচে জিতেছে। দলগত প্রতিযোগিতার 'এ' গ্রুপে চীনের সাথে ছিল ভারত, উত্তর কোরিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া, তাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া। উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়রাই যা চীনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ কিছুটা গড়ে তুলেছিলেন। তা না হলে, চীন না খেলেই জিতে গেল, এরকম কথা বললেও অত্যুক্তি হত না। ভারত চতুর্থ স্থান দখল করে কিছুটা এগিয়েছে বলা চলে।

এর আগে এশীয় প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে ভারতের স্থান ছিল ষষ্ঠ। চীন ও জাপান ভারতের বিরুদ্ধে সহজে জিতলেও উত্তর কোরিয়াকে ভারত ভাল মতই বেগ দিতে পেরেছে বলা চলে। উত্তর কোরীয় প্রশিক্ষকের নির্দেশনায় ভারত যে বেশ কিছুটা এগোতে পেরেছে, এটা তার একটা বড় প্রমাণ। বিশেষ করে মনমিত সিং উত্তর কোরিয়ার দুই বাছাই খেলোয়াড় জো ইয়ং হো এবং হং সুন চোলকে যথাক্রমে ২১-১৮, ১০-২১ ও ২১-১৪ এবং ২৪-২২ ও ২১-১৭ পয়েন্টে হারিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় চীন জয়ের পথে একমাত্র উত্তর কোরিয়া ছাড়া অন্য সবকটি দেশ—ভারত, জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও অস্ট্রেলিয়াকে সরাসরি (৩-০ ম্যাচে) হারিয়েছে। ভারত মহিলা বিভাগে ষষ্ঠ স্থান পায়। এর আগের এশীয় প্রতিযোগিতায় ভারতের স্থান ছিল চতুর্থ। পুরুষ সিঙ্গলস্, ডাবলস্, মহিলা সিঙ্গলস্, ডাবলস্, এবং মিক্সড্ ডাবলসে এই পাঁচটি বিভাগেই শীর্ষে ছিল চীন। বালক ও বালিকাদের সিঙ্গলস্ জিতেছে যথাক্রমে হংকং এবং জাপান। পুরুষদের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইন্যালে পরপর তিনটি গেম জিতে ঝিহাও সাইকেকে পরাজিত করলেন। চীনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে ফাইন্যালের দুজনেই এলেন একই দেশ থেকে। মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে জয়ী হলেন চীনের আট নম্বর বাছাই খেলোয়াড় কি কাউজিয়াং। তিনি হারালেন স্বদেশেরই অ-বাছাই খেলোয়াড় লিউ ইয়াংকে ৩-১ ম্যাচে। পুরুষদের ডাবলসে চীনের গুয়ো ইয়ে হুয়া ও জাই সাইকে ৩-১ ম্যাচে স্বদেশের অ-বাছাই শি ঝিহাও ও সাই ঝেন হুয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হলেন। মহিলাদের ডাবলসে শীর্ষ বাছাই জুড়ি উত্তর কোরিয়ার পাক ইয়াং ওক এবং হংগিল সুনকে হারিয়ে চীনের ঝ্যাং ডাইং এবং লিউ ইয়াং জয়ী হলেন। মিক্সড ডাবলসে স্বদেশের শীর্ষ বাছাই জুড়ি গুয়ো ইয়ে হুয়া ও লিউ জুটিকে সরাসরি ৩-০ ম্যাচে হারিয়ে অ-বাছাই জুড়ি জি সাইকে এবং ঝ্যাং ডাইং জুটি জয়ী হলেন। বালকদের বিভাগে ভারতের সুজয় ঘোড়পাড়ে ফাইন্যালে হারল হংকঙের ল কামটুঙের কাছে। স্বদেশের দিসকা হোসিনোকে হারিয়ে বালিকা সিঙ্গলস্ জিতেছে জাপানের ফুকিংমা ওকামোটো।

মোট ৮৩ জন আম্পায়ার এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলাগুলি পরিচালনা করেছিলেন। এর মধ্যে দুজন ছিলেন বিদেশী। পুরুষ আম্পায়ার মিঃ ওং এসেছিলেন সিঙ্গাপুর থেকে, প্রতিযোগিতায় একমাত্র মহিলা আম্পায়ার ছিলেন হংকঙের ফু চ্যাং লিং। ভারতীয় সংবাদসংস্থা ও পত্রপত্রিকার প্রতিনিধি ছাড়াও মোট ১২ জন বিদেশী সাংবাদিক এই উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন। চীনের সিনহুয়া নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধি ছিলেন ৪ জন। এছাড়া ইরাণ, জাপান, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের সাংবাদিকরাও ছিলেন। খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন অভ্যর্থনা উপ-সমিতির নির্দেশনায় ৬০ জন তরুণ-তরুণী এ্যাটাশে বা সহায়কেরা। স্টেডিয়ামের মধ্যেই মিনি হাসপাতালে সবরকমের আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন সমাগত খেলোয়াড়েরা। বিভিন্ন দিনে মেডিক্যাল ইউনিট নানাভাবে খেলোয়াড়দের পরিচর্যা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিরা একবাক্যে সংগঠকদের নিপুনতা, নিষ্ঠা এবং কলকাতার দর্শকদের সমঝদারি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করে গেছেন।

ময়দানী বিশৃংখলা : প্রতিকার কোন পথে

সাম্প্রতিককালে ময়দানের ফুটবলকে কেন্দ্র করে দর্শক-অশান্তি এবং উচ্ছৃংখল আচরণের প্রশ্নটি বিশেষ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু আইন-শৃংখলার প্রশ্নই এর সংগে জড়িত নেই। সামাজিক মূল্যবোধের অপহ্নব এবং যুবমানসের বিপথচারী প্রবণতা এই ধরনের গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই প্রশ্নটি নিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। এটা সুখের কথা, সুস্থ চিন্তা-সম্পন্ন মানুষ এই ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনাসভা এবং পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় মূল্যায়ণ—ইত্যাদির মাধ্যমে এই সমস্যাটি সকলের সামনে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। রাজ্যসরকার এই প্রশ্নটি নিয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল শিশির মঞ্চে এই প্রসংগে একটি আলোচনাসভারও আয়োজন করেছিলেন। ৭ জুন, ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু এই ধরনের গণ্ডগোলের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার ওপর জোর দিয়ে বলেছিলেন : রেফারি, বড় ক্লাব, খেলোয়াড়, সংবাদপত্র ও পুলিসের দায়িত্ব এই প্রবণতা রোধে সবচেয়ে বেশী।

মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছিলেন : ফুটবলের মত জনপ্রিয়তম খেলার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মুষ্টিমেয় দর্শকের উচ্ছৃংখল এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করতেই হবে। এই অরাজকতাকে সমূলে উৎখাত করার জন্য তিনি বড় ক্লাবগুলি এবং সেই সংগে কলকাতার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আই. এফ. এ-র কাছে সময়োচিত আবেদনও জানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত হোল : ক্লাবগুলি এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বসে কি করে শৃংখলার সংগে সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হয়। খেলোয়াড়দের দায়িত্বের কথাও তিনি এই প্রসংগে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। রেফারীদের সংগঠনকেও তিনি মাঠের শৃংখলা-রক্ষার প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কেননা এ ব্যাপারে তারা তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। পুলিসকে আইন-শৃংখলার প্রশ্নটি শক্তহাতে মোকাবিলা করতেই হবে। কিন্তু গণ্ডগোল হলে তার প্রতিক্রিয়া যেভাবে সর্বত্রচারী হয়ে পড়ে, তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের বুদ্ধিমত্তার সংগে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তিনি সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন : উত্তেজনা প্রশমনে তাদের বিরাট ভূমিকা আছে। লেখার স্বাধীনতা থাকলেও তার অপব্যবহারও কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। উত্তেজনা বাড়তে পারে এমন কিছু প্রকাশ করা ঠিক নয়। এই আলোচনায় রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি শ্রী স্নেহাংশুকান্ত আচার্য এবং আই. এফ. এ-র তৎকালীন সম্পাদক শ্রী অশোক ঘোষও অংশগ্রহণ করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে পরিস্থিতির উপযুক্ত মোকাবিলার পথনির্দেশ করেছিলেন।

এর পরবর্তীকালে দায়িত্বশীল যুবসংগঠন এবং ছাত্রসংস্থাগুলি পথসভা এবং আলোচনাচক্রের মাধ্যমে এই অরাজকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলে। তবে সমস্যার গুরুত্ব ও জটিলতার বিচারে এই প্রয়াসগুলি যথোচিত সার্থকতার রূপ নিতে পারে নি, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

ময়দানী বিশৃঙ্খলার প্রশ্নটি গত ফেডারেশন কাপের খেলার সূত্রে বড় হয়ে দেখা দিলেও, কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে ধারাবাহিক অশান্তির পরিবেশটি গত কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে, তার পটভূমি অন্বেষণে আমাদের কতকগুলি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কতকগুলি প্রশ্ন এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একথা অনস্বীকার্য, কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশটি মহানগরী কলকাতাকে ঘিরে থাকে বছরের প্রায় অর্ধেকটা সময় জুড়ে, তার পেছনে বহু লোকের ক্রীড়ামনস্কতা যেমন কাজ করে, তেমনই বহু ধরনের অবাঞ্ছিত প্রবণতা এবং স্বার্থবাহী কার্যকলাপও একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। এই সমস্ত প্রবণতা ও কার্যকলাপের জটীলতা আপাতভাবে তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য না হলেও গভীরে এদের উপস্থিতি একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে।

প্রথমেই বড় ক্লাবগুলির কার্যবিধির দিকে চোখ ফেরানো যাক। তিনটি বড় ক্লাব তাদের সুবিপুল সমর্থকদের কল্যাণে বছরের পর বছর ধরে উত্তরোত্তর বিরাট অঙ্কের বাজেট অবলম্বন করে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রথম সোপানের কাজ করে যাচ্ছে। সমর্থকদের পৃষ্ঠপোষকতা তাদের মানসিক আবেগের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাকে মূলধন করছে বড় ক্লাবগুলি সুনিপুণভাবে। ধনিক স্বার্থ অনুপ্রবেশ করছে এই রাস্তা ধরেই। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে নিকৃষ্ট ধরনের ব্যান জ্যাক ফড়িয়াবৃত্তি। বিপুল টাকার লেনদেনে যে খেলার শুরু, ক্রমশ তা রূপ নিচ্ছে শিবির ভাগের নোংরামিতে। যে অবক্ষয়ের চেহারা সমাজের সর্বস্তরে শিকড় গড়ছে অন্য অনন্য নির্দেশে, তারই একটা রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে খেলার মাঠে। বিপথগামী যুবশক্তি প্রতিটি বিকেলে তাই ময়দান অঞ্চল ছাড়িয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিকৃত দলবাজির আগুন নিয়ে সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠছে। এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, সর্বগ্রাসী মূল্যবোধের অপহ্নবে এদের আর ভূমিকা কতটুকু। কিন্তু যেটা আশংকার কথা, এই যুবশক্তি বৃহত্তর ভাঙনের খেলায় খেলার মাঠের টেনিংকে কাজে লাগাচ্ছে, সামাজিক পরিবেশে অশান্তি ডেকে আনছে, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক কর্মের অংশীদার হচ্ছে। তাই প্রয়োজন বড় ক্লাবের বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের অনুগৃহীতজন ও পরিষদবর্গের অচলায়তন ভাঙা। এ ব্যাপারে জনমত গঠন করার অবকাশ আছে। তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

খেলা যেহেতু পরিচালিত হয় রেফারির নির্দেশে, সেহেতু খেলা পরিচালনার মানও যাতে উন্নত হয়, তার জন্য চেষ্টা করাটাও জরুরি। একটি অমূল্য ভুলেই, মনে রাখা উচিত, নব্বুই মিনিটের খেলার ফলাফল নির্ধারিত হতে পারে যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ায় জ্বলে ওঠে অশান্তির আগুন। তখনই এসে পড়ে আইন-শৃংখলার প্রশ্ন, সামাজিক পরিবেশ হয়ে ওঠে বিঘ্নিত। তাই উপযুক্ত নির্বাচন, পরিচালনার মুনশিয়ানা, রেফারিদের সঠিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা—সবকিছুই শান্তিরক্ষার গ্যারান্টি হয়ে দাঁড়ায়। খেলায় জয়-পরাজয় আছেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আসল কথা—এসব যেমন সত্যি, তেমনই একথাও মনে রাখা উচিত মানসিক উত্তাপ সৃষ্টির সমস্ত রকমের উৎসমুখ বন্ধ করে রাখার চেষ্টা সব সময়েই করতে হবে। সেইজন্যই প্রয়োজন খেলা পরিচালনার মান উন্নয়ন, রেফারিদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু ব্যবথার কার্যকরণ।

এবার আসা যাক খেলোয়াড়দের দায়িত্ববোধের প্রসঙ্গে। যেহেতু তাঁদেরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে কিশোর ও তরুণদর্শকদের মানসিক আবেগের কেন্দ্রগুলি, সেহেতু আচরণে তাদের আদর্শস্থানীয় হতে হবে। উত্তেজনায় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে, কিন্তু কোন সময়েই তাঁদের ভব্যতার সীমারেখা অতিক্রম করা ঠিক নয়। তাঁদের সামান্য একটু ক্রোধের প্রকাশ হাজার হাজার দর্শকের ক্রোধকে উস্কে দিতে সক্ষম, এটা মনে রাখা উচিত। মনে রাখা উচিত, তাদের পেছনে ব্যয়িত হচ্ছে বহু মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ, সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা তাঁরা করতে পারেন না। গ্যালারির অভিনন্দনকে পুঁজি করে তাঁদের উচিত উন্নততর ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করা, উত্তেজনার শরিক হওয়া নয়। সাম্প্রতিককালের কিছু নামজাদা খেলোয়াড় তাঁদের আচরণে এই ধরনের প্রবৃত্তিরই স্বাক্ষর রেখেছেন। তাতে তাঁদের ক্রীড়াদক্ষতারও অপহ্নব ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের কথায় বলা যায়, তারাই পারেন এই দর্শক-অশান্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলায় সবচেয়ে সার্থক ভূমিকা পালনে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তারা সে দায়িত্ব অনেকক্ষেত্রে পালন করছেন না, উপরন্তু একটা মোহ ও কল্পনার পরিবেশ তৈরি করে উত্তেজনা সৃষ্টির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই সমস্ত পত্রিকার খুব একটা সদর্থক ভূমিকা নেই, বরং বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর তাড়নায় এবং সুচিন্তিত জনবিরোধী পরিকল্পনার মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে করতে ক্রীড়াক্ষেত্রেও তারা থাবা বাড়াচ্ছেন ধীরে ধীরে। এদের ভূমিকা সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। শুভবুদ্ধির উদ্বোধনে দরকার হলে এদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। দায়িত্বশীল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি এ ব্যাপারে তাদের যোগ্য ভূমিকা পালন করুক, এটা সবাই চান।

সবশেষে, আইনশৃংখলা রক্ষার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে আরক্ষা বাহিনীকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, সংযমের সঙ্গে। যেখানে হাজার হাজার মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, পশ্চিমবাংলার সুমহান ক্রীড়া-ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে কঠোরতার ব্যাপারটিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে কোন মূল্যে মানুষের সমর্থনকে পাথেয় করে ময়দানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুন্ন করার ক্ষেত্রে আরক্ষা বাহিনীর দায়িত্বই সর্বাধিক।

—দেবাশীষ দত্ত

ঐক্য বাক্য মাণিক্য। তপন চক্রবর্তী
ক্রান্তিক প্রকাশন, ১১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। সাত টাকা।

তপন চক্রবর্তী প্রগতি শিবিরের তরুণতম লেখকদের অন্যতম। তার গল্প কবিতা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের বাহক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে। 'ঐক্য বাক্য মাণিক্য' গল্প সংকলনে নন্দন, সত্যযুগ, ক্রান্তিক, গল্প সংকলন প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ১৪টি গল্পকে গ্রথিত করা হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত এই গল্পগুলির রচনাকাল সত্তর দশকের প্রথম আটটি বছর। সত্তর দশকের রক্তাক্ত চত্বরে গল্পগুলি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই সব গল্পে বারবার মেহনতী মানুষের সংগ্রাম আন্দোলন, দমন পীড়ন, খুন-সন্ত্রাস, গুলিবাজী নির্যাতন, জোতদারের কুটিল চক্রান্ত, হিংস্র আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও অকুতোভয়ে সংগ্রামকে বিকশিত করার জন্য দাঁতে দাঁত কষে এগিয়ে যাওয়ার ছবি ঘুরে ফিরে এসেছে। লেখককে ধন্যবাদ 'রূপ-সর্বস্ব' সাহিত্য সৃষ্টির চটুল মাদকতা অস্বীকার করে তিনি গণ-আন্দোলন সংগ্রামকেই তার সাহিত্যের বিষয়ভুক্ত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তাই কল্পাড়ের মানদা মাসীর তাৎক্ষণিক বুদ্ধির দীপ্তি, নিবারণের অনুভূতির নবজন্ম, রামরাবণের সংগ্রামের ময়দানে লুটিয়ে পড়া শব, সাংবাদিক অরুণের শৃংখল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা প্রক্রিয়া, রেল ধর্মঘটের দিনে ভিখিরী মেয়ের হলদে দাঁতের হাসি, অবনীবাবুর প্রমোশন নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা, বন্যাত্রাণে জাত পাতের প্রশ্ন তুলে জোতদারের আখের গোছানোর হীন প্রচেষ্টা, চটকলে মজুর ধর্মঘট ভাঙতে দেখে বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার জন্য কুসুমের মনের অতলে তলিয়ে যাওয়া, ভেড়ির মালিকের নিষ্ঠুর লুণ্ঠন, ট্রেনের মধ্যে গরীব মানুষের একাত্ম অনুভব করার কথা, আবু হোসেনের গল্প প্রভৃতি টুকরো টুকরো ছবি তার গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ছবির মত চোখের সামনে তুলে ধরে।

সংকলনের গল্পগুলির বিষয়বস্তু অত্যন্ত গভীর। টুকরো টুকরো ছবির মাধ্যমে লেখক লড়াকু মানুষের জীবনজয়ের চিত্রটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই সংগ্রামে কখনও কখনও ভুল হয় (কমরেড), কখনও বিশ্বাসহীনতা দেখা দেয় (অবনীবাবুর প্রমোশন), কখনও হঠাৎ স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে (নখদর্পন, খবর, মাছরাঙ্গা) আবার কখনও মানুষ অপরূপ উপলব্ধির স্পর্শে নবরূপে উদ্ভাসিত হয় (ঐক্য বাক্য মাণিক্য, কুসুমের মন, গতকালও আজ প্রভৃতি)। লেখক আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন গল্পের নায়ক নায়িকাদের বিশ্বাস যোগ্য করে তুলতে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পারেন নি। গল্পগুলি পড়তে পড়তে প্রায়ই মনে হয়েছে লেখক বিষয় বস্তু সংগ্রহে যতটা ব্যস্ত, ভাষা বিন্যাস, শব্দ চয়ন, সংলাপ নির্মাণ, এক-কথায় রচনা শৈলীর প্রতি ততটা মনোযোগী নন। অনুশীলনের অভাব অধিকাংশ গল্পে প্রকট হয়ে উঠেছে। হলদে দাঁতের হাসি ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের একটি চমৎকার চিত্র বিধৃত করেছে। কিন্তু ঐ হলদে দাঁতের হাসিতে এসে থামলেই যেন গল্পটি আরও বেশী ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠত। সেন্সর গল্পে রূপকের মাধ্যম অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু রূপক গল্পে যে তীব্র ভাষার গতি প্রয়োজন তা একদম নেই, ফলে গল্পটি একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। অবনীবাবুর প্রমোশন গল্পটি একটি মনস্তত্ব নির্ভর গল্প। এই গল্প একই সংগঠনের মধ্যে থাকা সত্বেও সংগঠকে সংগঠকে যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, ভুল বোঝাবুঝি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার নেপথ্য কারণ তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন লেখক। কিন্তু বাণীকণ্ঠ, অবনীবাবু সুরমা দের মনস্তত্ব ধরার মত কলমের জোর তপনবাবুর নেই। কুসুমের মন গল্পটাই মহিলাদের আত্ম মর্যাদা বোধ ও ধর্মঘট ভাঙ্গা দালালদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কুসুমের মত বাপ মা হারা মেয়ের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মত মানসিক জোর সংগ্রহ করার জন্য যে পূর্ব প্রস্তুতি দরকার তার সামান্যতম চিত্রও নেই। ফলে ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য 'ভালো ছেলে অশোক' দালালি করে চটকলে ঢুকছে দেখেই কুসুমের মন বিষাক্ত হয়ে গেল দেখাল ব্যাপারটা খুবই সরলীকরণ মনে হতে পারে। সংকলনের অনেক গল্পেই এ রকম অসংগতি চোখে পড়ে। বিষয়ের গভীরতা থাকলেই যে কলমের জোরে তাকে বিশ্বস্ত করে তোলা যায় তার জন্য চাই দীর্ঘ অনুশীলন। লেখক সেই অনুশীলনের ক্ষেত্রে চরম অবহেলা দেখিয়েছেন বলে মনে হলো। গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি পড়ে নীচু ক্লাসে ছাত্রের সিঁড়ি ভাঙ্গা অংকে যেনতেন প্রকারেণ শেষ উত্তর শূন্য করার ঝোঁকের কথা মনে পড়েছে বারবার। কে না জানে সিঁড়ি ভাঙ্গা অংকে সাধারণত মুখ্য উত্তর এলেও অসংখ্য ক্ষেত্রে অন্য উত্তরও আসে, তাতে অংক ভুল হয় না। লেখক প্রায় সব গল্পেই শেষ কালে একটি সংগ্রাম বা বিদ্রোহ বা বিক্ষোভকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। যেসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে এই চিত্র এসে পড়ে সেখানে বলার কিছু নেই, কিন্তু যেখানে জোর করে আনতে হয় আপত্তি ওঠে সেখানেই। টুকরো টুকরো ছবিতে মানুষের জীবনের নানা রকম চিত্র তুলে ধরে সংগ্রামের কথা না বলেও পাঠকের মনে রেখাপাত করা যায়। তার জন্য চাই দক্ষতা। আমরা আশা করব লেখক সেই দক্ষতা অদূর ভবিষ্যতেই অর্জন করবেন। বর্তমান সংকলনে সেই প্রতিশ্রুতি খুব উজ্জ্বল ভাবেই ফুটে উঠেছে।

গল্প সংকলনের ছাপা এতো পীড়াদায়ক হলে পাঠকের ধৈর্য ধরে রাখা খুবই কষ্টকর হয়। এতো অসংখ্য ছাপার ভুল কেন? এই অবহেলা নতুন লেখকদের সুনাম অর্জনে বাধার কারণ হতে পারে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে প্রকাশক এদিকে দৃষ্টি দেবেন। প্রচ্ছদ সাধারণ মানের। ছাপার জগতে সংকটের দিনে একশ চার পাতার বই সাতটাকায় পাওয়া গেলে আপত্তি করার কোন কারণ নেই।

—সরল বিশ্বাস

বিভাগীয় সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলা

সাগরদিঘী ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এই ব্লকের ব্লক যুব উৎসব (১৩ থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত) মার্চ মাসের ১৬ তারিখে শেষ হয়। একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সভাপতি। এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল ২৫টি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান এবং ৫টি প্রদর্শনী। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল শিশুদের বসে আঁকো, অঙ্ক দৌড়, আবৃত্তি, যেমন খুশী সাজো, নাটক, নানা ধরণের সংগীত, আলোচনা চক্র, বিতর্ক ইত্যাদি। খেলাধূলার

বামনগোলা ব্লক যুব উৎসবে বালিকদের যোগাসন প্রদর্শনী

মধ্যে ছিল ভলিবল, খো-খো, ডিসকাস, দৌড়, কবাডি, তীর নিক্ষেপ ও লৌহগোলক নিক্ষেপ। সর্বমোট ১০৯৪ জন নানা ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ১৭ই মার্চ সকাল ৯টায় জেলা পরিষদের সভাধিপতির সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় জন প্রতিনিধি পঞ্চায়েত সভাপতি, বিডিও ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বেলডাঙ্গা-১ ব্লক যুব-করণের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২১ থেকে ২৩শে মার্চ। উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সভাপতি মহঃ নৌসাদ আলি। নানা ধরণের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী চলে তিনদিন ধরে। ২৩শে মার্চ সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শরীর শিক্ষা আধিকারিক অধীর ঘোষ। এ ছাড়া আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ধরণের অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিমদিনাজপুর জেলা

রায়গঞ্জ ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে ও পরিচালনায় ৪ঠা মে ব্লক স্তরে সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতার চারটি বিভাগে ৩৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সাহিত্যিক ডাঃ বৃন্দাবন বাগচীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী ব্রততী ঘোষরায় ১৫ জন কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেন। এবারকার এই প্রতিযোগিতায় গ্রামীণ প্রতিযোগীদের সংখ্যাধিক্য একটি বিশেষ আনন্দসংবাদ বলা যেতে পারে। এই ব্লকের পরিচালনায় ১৬ ও ১৮ মে যুব উৎসবের আয়োজন করা

গাইঘাটা ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন রণজিৎ মিত্র, এম. এল. এ

হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন যুব-উৎসব কমিটির সভাপতি প্রাণনাথ দাস। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে ৫৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। আদিবাসী যুবকদের জন্য বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। যুব-উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন সত্যব্রত ঘোষ। বিভিন্ন বিভাগের কৃতী ৬৩ জনকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র উপহার দেওয়া হয়।

বর্ধমান জেলা

[illegible]-১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ২১, ২২ ও ২৩ শে মার্চ যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুব উৎসব কমিটির সভাপতি কালিদাস মাঝি উৎসবের উদ্বোধন করেন। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৪০০ জন। আদিবাসী যুবকদের জন্য তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা নির্দিষ্ট ছিল। কৃতী প্রতিযোগীদের শ্রীযুক্ত মাঝি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

রায়গঞ্জ ব্লক যুব উৎসবে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় জনৈক আদিবাসী প্রতিযোগী

আউসগ্রাম ২নং ব্লক যুব অফিস যুব উৎসব চলে ২৯ থেকে ৩১শে মার্চ। উৎসবের সূচনা করেন পঞ্চায়েত সভাপতি জানে আলম্। বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬৯ জন ও ৭৯ জন। সরকারী প্রচেষ্টায় এ ধরনের অনুষ্ঠান এখানে প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ায় জনমনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহবুব জাহেদী।

কালনা ২ নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসব অনুষ্ঠানের ২৯শে মার্চ উদ্বোধন করেন পঃ বঃ সরকারের পশুপালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতামূলক নানা ধরনের অনুষ্ঠানসূচীতে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে সফল ১০৭ জনকে পুরস্কৃত করেন বর্ধমান জেলাপরিষদের সভাধিপতি মেহবুব জাহেদী।

কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে প্রদর্শনী মণ্ডপ

নদীয়া জেলা :

রানাঘাট ২ নং ব্লক যুব-করণ আয়োজিত ১৩ থেকে ১৫ই মার্চ ব্যাপী যে যুব উৎসব অনুষ্ঠান চলে তার উদ্বোধন করেন রানাঘাট (পশ্চিম) কেন্দ্রের বিধানসভার সদস্য গৌর চন্দ্র কুণ্ডু। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়সূচীর মধ্যে ছিল বিভিন্ন মিটারের দৌড়, দীর্ঘ ও উচ্চ লম্ফন, ডিসকাস থ্রো ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে আবৃত্তি, সঙ্গীত, লোকনৃত্য, ব্রতচারী

নবদ্বীপ ব্লক যুব উৎসবে দৌড় প্রতিযোগিতা

অভিপ্রদর্শন, বিতর্ক, একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। বিষয়সূচীভেদে ২ থেকে ৭ হাজার পর্যন্ত জনসমাগম হয়। ১৫ই মার্চ স্থানীয় রানাঘাট (পূর্ব) কেন্দ্রের বিধান সভার সদস্য সতীশচন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দার্জিলিং জেলা :

মিরিক ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক অফিসের উদ্যোগ ও ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় মারমা প্রেমসুন্দর স্মারক পাঠশালা প্রাঙ্গণে ১০ ও ১১ই মে যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয় ও যুব সংগঠনের প্রায় তিন শত ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পাহাড়ী ওম্ফু নাচ, নেপালী নৃত্য ও লোকনৃত্য ও লোকগীতি, কবিতা ও শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন রকমারি পাহাড়ী ফুলের প্রদর্শনী, হাতের কাজ এবং শিশুদের চিত্রাঙ্কন খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দূর-দূরান্ত থেকে আগত চা-বাগানের কর্মীদের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় এক প্রবীণ (৯৬) সমাজসেবী। পুরস্কার বিতরণ করেন মারমা চা-বাগানের ম্যানেজার এল. বি. দেওয়ান। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মিরিক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সি. বি. রাই ও মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক।

রায়গঞ্জ ব্লক যুব উৎসবে উচ্চ লম্ফনরত জনৈক প্রতিযোগী

কার্শিয়াঙ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত পাহাড়ী এলাকা বেষ্টিত কার্শিয়াঙ শহরে এন, ভি, ট্রেনিং সেণ্টার ময়দানে গত ১৪ ও ১৫ জুন '৮০ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে হাজার হাজার পাহাড়ী লোকের সমাগমে কার্শিয়াঙ ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি জগতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অসংখ্য যুব ছাত্রের মধ্যে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চা বৃদ্ধিই এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৪ জুন সকাল দশটায় অসংখ্য ছাত্র যুব উপস্থিতি কার্শিয়াঙ সদরের মহকুমা শাসক ডি. পি. ব্যানার্জি প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং ভারত স্কাউটস এণ্ড গাইডের কার্শিয়াঙ শাখার পরিচালনায় বর্ণাঢ্য মার্চ পাস্টের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সহ-মহকুমা শাসক ও যুব উৎসব কমিটির সভাপতি আর. মুৎসুদ্দি এবং স্বাগত ভাষণ দেন ব্লক যুব আধিকারিক ও যুব উৎসব কমিটির সম্পাদক ও আহ্বায়ক এস. দেওয়ান।

১৪ জুন বিকাল ৪টায় যুব উৎসবের শিক্ষামূলক অঙ্গ হিসাবে বর্তমান আসাম সমস্যা ও পার্বত্য বিকাশ প্রকল্পের ওপর এক "আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত" হয়। আলোচনা চক্রে সভাপতিত্ব করেন দার্জিলিঙ জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী শিবকুমার রাই। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সহ-মহকুমা শাসক আর. মুৎসুদ্দি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অসিত রাই। তুলসী ভণ্ডারাই ও আরো অনেকে।

১৫ জুন সকাল দশটায় স্থানীয় সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ যুব ছাত্রদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতামূলক "সাহিত্য বাসরের" আসর বসে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে সাহিত্য বাসরের শুভ সূচনা করেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পি. কে. রায়। সভাপতিত্ব করেন সহ-মহকুমা শাসক আর. মুৎসুদ্দি ও প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন ডাউহিল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি এস. প্রধান।

১৫ জুন দুপুর দুটায় নেপালী একক ও যৌথভাবে নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠান সব থেকে বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উৎসব প্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য কার্শিয়াঙ ব্লকের বহু দূরদূরান্ত বস্তী থেকে তরুণ তরুণীরা এসে এই উৎসব প্রাঙ্গণকে মুখরিত করে রেখেছিল। রাত্রি ৯টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। উভয়দিনে পুরস্কার বিতরণ করেন মহকুমা শাসক ডি. পি. ব্যানার্জি। এই যুব উৎসব প্রসঙ্গে দেওয়ান জানান যে, সব বিভাগ মিলিয়ে প্রায় চারশত প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে ৯৭ জন প্রতিযোগীকে আকর্ষণীয় পুরস্কারসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানপত্র দেওয়া হয়।

নাটক প্রকাশ করুন

অপসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান মাধ্যম নাটক। আবার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়বার সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম এই নাটক। অথচ অপসংস্কৃতি মূলক নাটকের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সুস্থ সংস্কৃতির নাটকের সংখ্যা খুব কম।

'যুবমানস' পত্রিকা একটি সুস্থ সংস্কৃতির বলিষ্ঠ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সেই জন্য আমাদের অনুরোধ 'যুবমানসের' প্রতি সংখ্যায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের সাথে সাথে একটি করে সুস্থ সংস্কৃতির ও প্রগতিশীল নাটক প্রকাশ করুন।

—দিলীপ কুমার মাজী
গ্রাম-চাউলা
পোঃ-ঘাটাল
মেদিনীপুর

প্রচার ব্যাপক হোক

যুবমানসের মার্চ-এপ্রিল '৮০ সংখ্যা পড়ে অনুপ্রাণিত হ'লাম। বিশেষতঃ প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত সমকাল চিহ্নিত এবং রাজনীতি-সচেতন।

তবুও বলতে হয়, 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর মত 'যুবমানস' পত্রিকার ব্যাপক প্রচার নেই। কারণ জানিনা। আজকের হতাশ-গ্রস্থ বিভ্রান্ত যুবকসম্প্রদায় যথেচ্ছ রুচিতে পড়তে বাধ্য হচ্ছে বাজারী পত্রিকাগুলোর উপহার ঃ বস্তাপচা সাহিত্যের প্রভাব।

যুবমানসের প্রচার ব্যাপক হ'লে বিভ্রান্ত পাঠকদের কাছে 'যুবমানস' আদর্শ সম্মিল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

—স্বপন নাগ
১১৮, পি. কে. গুহ রোড। কলকাতা-২৮

মাসিক যুবমানসের আমি নিয়মিত পাঠক। আর সেই অধিকারে এই পত্রটি পাঠাচ্ছি 'পাঠকের ভাবনা' বিভাগে। যুব-মানসের গত মে সংখ্যায় প্রকাশিত একগুচ্ছ কবিতা পড়ে ভাল লাগল। আর একটি মূল্যবান লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ঃ বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে'। লেখাটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

'যুবমানস' যে ক্রমেই উন্নত হচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সাথে সাথে একটা অনুরোধ, এত সুন্দর একটি পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন।

—পাঁচুগোপাল হাজরা
১০০৮/১৫, কল্যাণগড় (হাবড়া)
২৪-পরগনা।

নিয়মিত প্রকাশ প্রয়োজন

আমি 'যুবমানস' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। পত্রিকাটি বেশ উপভোগ্য। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই। বর্তমানের এই পত্রিকার ব্যাপক প্রচারের ফলে যুব-ছাত্র সমাজ বেশ উপকৃত হয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান কয়েকটি সংখ্যা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। পত্রিকার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা বিভাগ সত্যিই মূল্যবান।

তথাপি এই পত্রিকার অনিয়মিত প্রকাশনায় পাঠক সমাজ সত্যিই হতাশ-গ্রস্থ। এই পত্রিকার প্রকাশ যদি নিয়মিত না হয় এবং পাঠক সমাজের হাতে যদি নিয়মিত না পেঁছায়, তাহ'লে এই পত্রিকা হয়ত পাঠক সমাজের মানস লোকের অজ্ঞাতেই থেকে যাবে। ব্যর্থ হবে যুব মনের চাহিদা মেটাতে।

আপনারা পত্রিকাতে 'পাঠকের ভাবনা' বিভাগ সংযোজন করেছেন, তাই উৎসাহিত হয়ে এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করে আমার এই আবেদন।

—তুষার কান্তি সামন্ত
গড়-কোটালপুর। বাঁকুড়া।

পাঠকদের কাছে নিবেদন

গত সংখ্যায় গোতম ঘোষ দস্তিদারের লেখা 'দুটি মেলা তিনটি উৎসব' রিপোর্টদুটিতে কিছু ছাপার অস্বস্তিকর ভুল থেকে গেছে। ২৪ পৃষ্ঠায় 'কোপিয়াত্তম' নয় 'কোডিয়াত্তম', 'আমপু' নয় 'থামপু', 'চিতেগু চিন্তি' নয় 'চিত্রেকু চিন্তে' গহণ নয় 'গ্রহণ' পড়তে হবে। এছাড়া গোতম ঘোষের তেলেগু ছবি 'মা ভূমি'-এর আগে সর্বপ্রাথা শব্দটি বাদ যাবে। 'ঘটশ্রাদ্ধ' ছবিটির নাম 'খর্ব শ্রাদ্ধ' হ'য়ে গেছে এবং এই ছবির একটি চরিত্র 'নানী'-এর স্থলে হয়েছে 'মানী'। 'চালক' নয় হবে 'বালক'। সৈয়দ মীর্জার ছবি দু'টির সঠিক নাম—'অরবিন্দ দেশাই কী আজব দস্তানা' এবং 'আলবার্ট পিন্টো কো গোস্যা কিউ আতা হ্যায়'।

'সলিল চৌধুরীর গান আমাদের অনুপ্রাণিত করে' জায়গায় পড়তে হবে সঞ্জীবিত করে।

এই অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা আন্তরিক-ভাবে দুঃখিত।

—সঃ মঃ যুবমানস

বাগমুণ্ডি ব্লক যুব উৎসব '৮০ তে ছো-নৃত্য

সিটুর রাজ্য সম্মেলনে যুব কল্যাণ বিভাগের প্রদর্শনী স্টলে ছাত্র-যুবদের ভীড়

কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে প্রদর্শনীতে ভাগচাষী রেকর্ড সম্পর্কে চাষীদের বোঝান হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
জুন-জুলাই '৮০

প্রচ্ছদ/চন্দন বসু

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঞ্চাশ পয়সা

সম্পাদকীয়

কোন কিছু ধ্বংস করিতে তিন বৎসর যথেষ্ট সময় কিন্তু কোন বিষয় বা বস্তু গঠন করিতে এই সময়কাল নিতান্তই নগণ্য। তিন বৎসর আরও তুচ্ছ সময় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—যদি ঐ নির্মাণকান্ডের সহিত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে স্পর্শ করিবার প্রশ্ন বিদ্যমান থাকে। বলিলে বোধ করি এতটুকু বাড়াইয়া বলা হইবে না যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামজোট সরকার তাহার শাসনকালের এই স্বল্প তিন বৎসরের মধ্যে সাড়ে চার কোটি মানুষের সমস্যা জর্জরিত রাজ্যের নির্মাণ কার্যে এক অভূতপূর্ব গতিবেগ এক অদৃষ্টপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

যে পরিস্থিতির মধ্যে এই সরকারের হাতে শাসন ভার অর্পিত হইয়াছিল সেই অবস্থার কথা এই সময়ের মধ্যে তো কেহই ভুলিয়া যায় নাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পঠন-পাঠনের পরিবেশকে প্রায় নির্মূল করা হইয়াছিল—পরীক্ষা ক্ষেত্রে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিতেছিল। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য সমস্ত প্রচলিত নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যকে লইয়া গঠিত সাব-কমিটি'র উপর প্রার্থী বাছাই করার সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছিল—বিরাট সংখ্যক বেকার যুবকের নির্মম অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে শাসক শ্রেণীর কর্ণধারদের নিকট নতজানু হইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল—যৌবন জনোচিত দৃঢ়তাকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে দুর্নীতির পঙ্কে ডুবাইয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার যাবতীয় বন্দোবস্ত সুকৌশলে করা হইয়াছিল। অপসংস্কৃতির প্লাবন সৃষ্টি করিয়া, যৌনতা নগ্নতা দিয়া যুব মানসিকতাকে বিকৃত করিয়া, 'হিরোইন', 'এল. এস. ডি' ইত্যাদি নেশা করা দ্রব্য সম্ভারে যুব মনকে পঙ্গু করিবার কতই না ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করিয়া দেবার জন্য সকল-প্রকার স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছিল। সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছিল। অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-পরিবহণ এমনকি তৃষ্ণার জলটুকুর সমস্যার কোন সমাধান দূরে থাকুক তাহা হ্রাস করিবার নিমিত্ত বাস্তব পরিকল্পনার কোন লেশমাত্র ছিল না। দূরদর্শিতার অভাব, প্রকল্প সমূহকে বাস্তবায়িত করার আন্তরিকতা ও যোগ্যতার অভাব, ব্যক্তি স্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থের সেবা করিবার জন্য অকল্পনীয় লিপ্সা, আত্মকলহে নিমগ্ন শাসকগোষ্ঠীর কুৎসিত ক্রিয়াকলাপ, বিদ্যুত সহ সকল মৌল সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি, প্রশাসনের সকল স্তরে দুর্নীতির দাপট—এই সবই ছিল সেই সময়ের বৈশিষ্ট্য। আর এই অসহ অবস্থার প্রতিবাদে টু শব্দটি যাহাতে কোথাও উচ্চারিত না হইতে পারে তাহার জন্য আধা-ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়া একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করিয়া গণতন্ত্রকে সমাধিস্থ করিবার আনুষঙ্গিক সকল কাজকর্ম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল।

সেই সময় রাজ্যের সাধারণ মানুষ অনেক বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া, নীরবে-নিঃশব্দে ভোটের মাধ্যমে তাঁহাদের রায় ঘোষণা করিয়া সুকঠোর কর্তব্যের মুকুট মাথায় পরাইয়া কাঁটার সিংহাসনে এই সরকারকে বসাইয়াছিলেন।

ভারতের সংবিধানের বিধান অনুসারে একটি অঙ্গ রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা একেবারেই সীমাবদ্ধ, ততোধিক সীমিত তাহার প্রশাসনিক অধিকার। অর্থের জন্য, অনুমতির জন্য দিল্লীর দিকে তাকাইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে ও অনিশ্চয়তার সহিত প্রহর গুনিতে হয়। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়াই রাজ্যের জনগণের জীবনের কতকগুলি মৌলিক দিক যথা—কৃষি, সেচ, চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহণ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি বিধানের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই পালন করিতে হয়। দায়িত্ব পালনের উপাদান ও সুযোগের অভাব যতই থাকুক না কেন কতকগুলি অতিরিক্ত সুবিধাও এই রাজ্যের বর্তমান সরকারের ভাগ্যে জুটিয়াছে। অগণিত মানুষের আস্থা, সকল স্তরের সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মধ্যবিত্তের একনিষ্ঠ সমর্থন ইহার পূর্বে আর কোন্ সরকারের অদৃষ্টে ছিল?

দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর এই সরকার জনগণের ভালবাসাকে পাথেয় করিয়া প্রত্যয়-সিদ্ধ মনোভাব লইয়া বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া হাজার বৎসরের দৃষ্টান্ত বিহীন বন্যার ধ্বংস স্তূপ হইতে রাজ্যের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে আবার এত কম সময়ের মধ্যে চাঙ্গা করিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য ক্ষতিগ্রস্থ লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব খুয়াইয়া হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ভিটামাটি ছাড়িয়া শত্রুর মুখে ছাই দিয়া শহরের রাজপথে ভিক্ষুকের মিছিলে সামিল হয় নাই। সেই জন্যই গণনাতীত ঐতিহ্যের সৃষ্টিকারী ছাত্র-যুবকেরা দেহের রক্ত বিক্রি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুনগঠনের কাজে এই ভাবে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। আবার তাহার পরের বৎসরেই অভূতপূর্ব খরায় রাজ্যের ব্যাপক এলাকায় নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এই সরকারের সময়োপযোগী ও বলিষ্ঠ ব্যবস্থার ফলে মানুষ গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারিয়াছে। নিন্দুকে যাহাই বলুক না কেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ দিল্লীর সরকার মারফত খরা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য সাধুবাদ জানাইয়াছেন।

ক্ষমতায় বসার একবৎসরের মধ্যে দেড়যুগ ধরিয়া স্থগিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া এই সরকার গ্রামীণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—গ্রামের মানুষকে দেশ গঠনের কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া একদিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করিয়াছেন, অন্যদিকে চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিকতার ফাঁস হইতে গ্রামীণ কর্মধারাকে যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত করিয়াছেন। পঞ্চায়েতগুলির হাতে পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বেশি অর্থ বরাদ্দ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজের বদলে খাদ্য ইত্যাদি কর্মসূচীর ফলে সেই জন্য প্রায় ছয় কোটি কাজের দিন সৃষ্টি করিয়া গ্রামীণ বেকারীকে কিছুটা পরিমাণে লাঘব করিতে পারিয়াছে।

প্রায় নয় লক্ষ একর খাস জমি দরিদ্র কৃষকের মধ্যে বণ্টন করিয়া, প্রায় সাড়ে আট লক্ষ বর্গাদার আধিয়ারের নাম নথিভুক্ত করিয়া, ব্যাঙ্ক হইতে পাট্টাদার ও বর্গাদারকে সামান্য সুদে বা বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা করিয়া, ষাট বৎসরের বেশি বয়স্ক দীন-দরিদ্র ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষককে ষাট টাকা করিয়া মাসিক পেনসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিধবা ভাতা, এবং প্রায় তিন লক্ষ বেকার যুবককে বেকার-ভাতা প্রদান করিয়া গোটা ভারতের জনগণের নিকট এই সরকার একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিয়াই শুধু ক্ষান্ত হয় নাই—সেই শিক্ষা পদ্ধতিকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে গণতন্ত্রীকরণ ও সার্বজনীন করিবার জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে—সমাজের অবহেলিত নির্যাতিত স্তরের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে।

একমাত্র কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমেই রেজিস্ট্রীকৃত বেকারদের বয়সের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়ার একটি পরিচ্ছন্ন নীতি গ্রহণ করিয়া এবং তিন বৎসরে প্রায় চল্লিশ হাজার যুবককে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতিকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিয়া গোটা দেশের মানুষের বিশেষ করিয়া যুব সমাজের নিকট এই সরকার ধন্যবাদার্হ হইয়াছে। ৩৫টি বন্ধ কারখানা খুলিয়া চাঙ্গা করিয়া প্রায় চল্লিশ হাজার শ্রমিকের কাজের সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিবার ফলে এই তিন বৎসরে মালিকের নিকট হইতে রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণী প্রায় কুড়ি কোটি টাকার অতিরিক্ত মজুরী আদায় করিতে পারিয়াছেন—শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক সাবলীল গতিময়তা আনা সম্ভব হইয়াছে।

রাজ্যের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক শিক্ষাকর্মীসহ অন্যান্য কর্মচারীর চাকুরীর নিরাপত্তা, কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদির শুধু ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাই নহে তাহাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন করিবার পূর্ণ অধিকার গোটা দেশের মধ্যে প্রথম এই রাজ্য সরকার প্রদান করিয়া সাম্রাজ্যবাদী আমলের একটি ধারাকে লুপ্ত করিয়া ভারতের শ্রমজীবী মানুষের প্রশংসাধন্য হইয়াছে।

সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন, খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি, যুব জীবনের বিভিন্ন চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নানা ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করিয়া—নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের মধ্যে এই রাজ্য সরকার এক অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে।

১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বৎসরে এই রাজ্যের বার্ষিক ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ যেখানে ছিল ৭০০ কোটি টাকার কিছু বেশি সেইখানে বর্তমান বৎসরে এই রাজ্য সরকার সেই পরিমাণকে দ্বিগুণ করিয়া ১৪০০ কোটি টাকার উপর ধার্য করিয়াছেন। রাজ্য যোজনার জন্য এই সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে বৎসরে বরাদ্দ করা হইয়াছিল ২০০ কোটি টাকা আর বর্তমান বৎসরে এই রাজ্য সরকার যোজনা খাতে ব্যয়ের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন ৪৮০ কোটি টাকা। রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্য স্বল্প তিন বৎসরে একটি রাজ্য সরকারের সমতুল আন্তরিকতার নজীর ত্রিপুরা ও কেরালা ব্যতীত আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক পরিবেশকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত

[শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়]

বামফ্রন্ট সরকারের তিন বছর : গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে গতিপ্রবাহের সূচনা করেছে

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

একটা বিনম্র ন্যূনতম কর্মসূচী সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিমর্যাদা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার কথা ঘোষণা করে জনসাধারণের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সংগতি রেখে এই কর্মসূচীতে রাজ্যের শ্রমবিষয়ক, ভূমিসংস্কার, কৃষিসমস্যা, শিক্ষা সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাঁদের ঘোষিত কর্মসূচী রূপ দেবার সাধ্যমত প্রচেষ্টা নিচ্ছেন।

আমাদের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। কৃষিজীবী পরিবারগুলির বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভূমিহারা হয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটান। ফসলের চড়া ভাগ, মহাজনী জুলুম, নিদারুণ বেকারী, ট্যাক্সের বোঝা ও ধনতান্ত্রিক শোষণের জুলুম কৃষককে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত করছে। কৃষক জমি রাখতে পারছেনা। পরিণতিতে জমি হারিয়ে ভিড় করছে খেতমজুরদের দলে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ চিত্র হল কর্মাভাব, বুভুক্ষা, ঋণভার আর দুঃস্থতার বিষাদময় পশ্চাৎপদতা।

শাসক শ্রেণীগুলি স্বাধীনতার পর বিগত তিরিশ বছর ধরে জমিদারী ব্যবস্থার আমূল অবসান ঘটিয়ে কৃষকের স্বার্থে প্রকৃত ভূমি সংস্কার করতে অস্বীকার করেছে। কৃষি ব্যবস্থায় এবং গ্রামাঞ্চলে ভূমি সম্পর্কের ওপর সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শৃংখল ভেঙে ফেলে মধ্যযুগীয় বর্বর নিপীড়নের অবশেষগুলির বিলোপ ঘটানো না গেলে প্রকৃত ভূমিসংস্কার বাস্তবায়িত হতে পারেনা, সামাজিক অগ্রগতি কথার কথা থেকে যায়। ভূমি সংস্কার ও কৃষি সমস্যার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

চতুর্থ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছেন, 'যেহেতু বর্তমান অবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয় তাই জনগণের সাময়িক দুর্গতি মোচনের জন্য এবং আগামী সংগ্রামের জন্য তাদের মনে বিশ্বাস ও শক্তি এনে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' পুঁজিপতি-জমিদার রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সংবিধানের বেড়াজালে একটা অঙ্গ রাজ্যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে সমস্যার মৌলিক সমাধান করা যায় না। এই সরকার পারবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছুটা প্রসার ঘটিয়ে জনগণের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে এবং আশু সমস্যাগুলির ওপর নজর দিয়ে জনগণের ওপর চাপানো বোঝা কিছুটা হালকা করতে। বামফ্রন্ট সরকারের গণমুখী কর্মসূচী জনগণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবে এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার কাজ সহজতর হবে। আশু দাবির সাফল্য গণসমাবেশ ব্যাপকতর করে এবং শাসক শ্রেণীগুলি সম্পর্কে মোহমুক্তির প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থান ও কর্মসূচী এই ব্যাপারে কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে গণতান্ত্রিক শক্তির সেটাই হল প্রধান বিবেচনার বিষয়।

আমাদের দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়ে আছে একটা নিশ্ছিদ্র ও কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর। সমস্ত ক্ষমতা ওপরতলায় কেন্দ্রীভূত। শাসক শ্রেণী ও তাদের অনুগত আমলাদের দ্বারা পরিচালিত সরকারী কাঠামোর মধ্যে যথার্থ গণতন্ত্রের কোন জায়গা নেই। নিচের তলায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়েই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো সম্ভব। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যক্রমের বিকাশের সাথে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের সোপান হল এটি।

শুধু মাত্র বিনাবিচারে আটক, সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন সমস্ত ধরণের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং জনগণের ওপর অত্যাচারের তদন্তের ব্যবস্থা করাই নয়, বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা হাতে নেবার সময় থেকেই আমলাতন্ত্রের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরতার পদ্ধতি না নিয়ে গণসংগঠনগুলির পরামর্শ ও সহায়তা নিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করছেন এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির ওপর অধিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা তুলে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নজির সৃষ্টি করেছেন। গ্রাম্য জীবনের অগ্রগতিতে বামফ্রন্ট সরকারের এই অবদান উল্লেখ করার মত।

গ্রামের পঞ্চায়েতগুলি ছিল জোতদার কায়েমীস্বার্থের স্থানীয় রাজনৈতিক কেন্দ্রের ঘাটি, প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রের আখড়া। নিচের তলায় প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে বাস্তুঘুঘুদের হটিয়ে দিয়ে গরিবের প্রতিনিধিরাই অধিকাংশ পঞ্চায়েতে এখন নির্বাচিত। বামফ্রন্ট সরকার পূর্বের ঘুণধরা পঞ্চায়েতগুলিতে কাজের প্রবাহ সৃষ্টি করতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর ব্যাপক দায়িত্ব তুলে দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ গ্রামাঞ্চলে গরিবদের দিকে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা নিয়েছেন। কাজের বিনিময়ে খাদ্য, গ্রামোন্নয়ণ ও পুনর্গঠন প্রকল্পগুলির ব্যাপক প্রচলনে গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর, গরিব চাষী ও কর্মচ্যুত কারিগরদের কাজের সংস্থান বৃদ্ধি পাবার অনিবার্য ফল হিসেবে ঋণ সরবরাহকারী পরগাছা মহাজনের ওপর নির্ভরতা কমানো গিয়েছে। শ্রমনির্ভর এই কাজগুলি বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করছে এবং অভাবের তাড়নায় শেষ সম্বল হিসেবে ঘরের থালা-বাটি, বাস্তুভিটা বা জমিখণ্ডটুকু বন্ধক রেখে অথবা মরশুমে খেটে শোধ দেবার কড়ারে বড় জমির মালিক ও মহাজনের দরজায় ধর্ণা দেবার দীর্ঘ দিনের অবস্থাটার এক নিশ্চিত পরিবর্তন ঘটেছে। গরিবের হাতে সম্পদকে ঠেলে দেবার ফলে, টাকার হাতফেরতা

নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রুদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের এই গতিবেগ, পরিবর্তনের একটা সূচনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে কাজের সংস্থান, গরিব জনগণের আর্থিক সংস্থানের কিছুটা সুযোগ বৃদ্ধি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। দুঃখ কষ্ট লাঘবের প্রচেষ্টায় অথবা গ্রামীণ সম্পদ পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পঞ্চায়েত-গুলির উদ্যোগ গৌরব করার মত। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল বামফ্রন্ট সরকারের ব্যবস্থাবলী ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক কর্মকান্ড জনগণের চেতনা ও সমাবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে কতটা, বামফ্রন্ট সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্বন্ধে উপলব্ধি গড়ে উঠছে কিনা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীশত্রুদের কতদূর বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করা গেল। দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মানুষ পশ্চিমবঙ্গের কাছে এটাই প্রত্যাশা করে। বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতগুলির ওপর বিরাট দায়িত্ব দিয়ে এই সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরী করতে সাহায্য করেছে।

কৃষক সাধারণ ও গ্রামের গরিব জনগণের ওপর শোষণ নির্যাতনের নায়ক জোতদার-কায়েমীস্বার্থই হল স্বৈরাচারী শক্তির গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ভিত্তি। গ্রাম্য সমাজজীবন থেকে জমিদারী শোষণের শেকড় উপড়ে ফেলতে না পারলে স্বৈরাচার বারে বারেই তার বিষদাঁত ফোটাতে চাইবে, সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যাবে না। গ্রামাঞ্চলে জমিদারী শোষণকে কতটা আঘাত দেওয়া গেল, শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সচেতন গণউদ্যোগ ও জনসমাবেশ গড়ে উঠছে কেমন এবং গণতান্ত্রিক চেতনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্তরে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা এটাই হল বামপন্থী শক্তির মূল বিবেচনার বিষয়। বামফ্রন্ট সরকারের কার্যক্রম এই সম্ভাবনার দিক খুলে দিতে সাহায্য করেছে।

যত সদিচ্ছাই থাকুক না কেন, বর্তমান ভূমি সম্পর্কের মূল কাঠামোকে বজায় রেখে সংবিধান ও আইনগত পরিধির মধ্যে ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর ফলাফল সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ সচেতন থেকে বর্তমান সীমাবদ্ধ সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে ব্যাপক অংশের গ্রামের গরিব মানুষের আর্থিক দুরবস্থা কিছুটা হালকা করা যাবে এবং এই কর্মসূচীর সাফল্য গ্রামাঞ্চলে জোতদার কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে গরিব মানুষদের উৎসাহের সৃষ্টি করবে। শাসক শ্রেণীর তৈরী সংবিধান যে গ্রামাঞ্চলে জমিদার সম্পত্তিবানদের স্বার্থের পাহারাদার সেই উপলব্ধিতে গ্রামের জনগণ ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছেন। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বর্গাদারদের প্রসারিত অধিকার, সিলিং বহির্ভূত জমি অধিগ্রহণ ও বণ্টন, অভাবের কারণে হস্তান্তরিত জমি ফেরতের ব্যবস্থা, ভাগচাষী ও খাস জমির পাট্টাপ্রাপ্ত গরিব কৃষককে ব্যাঙ্কঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদির সাফল্য গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি বাড়িয়ে তুলতে এবং মালিক ও মহাজনের সাথে ব্যবধান সৃষ্টি করতে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নিচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলন আংশিক দাবি-গুলি নিয়ে যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে তাকে স্বীকৃতি দিয়েই বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীতে 'ভূমি-সংস্কার ও কৃষক' সংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিরলসভাবে তা কার্যকরী করে চলেছেন। আংশিক দাবির সাফল্য জনগণের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করবে, চেতনার বিকাশ ঘটে, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়টি সামনে এসে হাজির হয় এবং শত্রুরা দুর্বল ও কোণঠাসা হয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ ব্যাপকতর হবার প্রশ্নে, জোতদার কায়েমীস্বার্থকে বিচ্ছিন্ন করতে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে গৌরবের।

জোতদার বাস্তুঘুঘুদের আঘাত না দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর রূপায়ন সার্থক হতে পারে না, অবার কায়েমীস্বার্থের বাধা অতিক্রম করতে না পারলে বামফ্রন্টের কর্মসূচীর সাফল্যের অগ্রগতি হতে পারে না। জোতদার মহাজনেরা তাই আজ মরিয়া।

আমাদের লক্ষ লক্ষ যুবকরা এক অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের আশংকায় নিরুদ্দম জীবন কাটাতে বাধ্য হন। বেকারী ও অর্দ্ধবেকারীর জ্বালায় তাঁরা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েন। গ্রাম্য জীবনের কোটি কোটি জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে গেলে শিল্পের বাজারে অনিবার্য সংকট দেখা দেয়, সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। বেকারী ভয়াবহ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষার সংকট, সংস্কৃতির সংকট, দেশের সকল ক্ষেত্রে সংকট ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়। সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রবাহ আনার প্রথম সর্ত হল কৃষকের হাতে জমি এবং কাজ। সীমাবদ্ধ ভূমিসংস্কারের সাফল্য ও কর্মসংস্থানের বর্দ্ধিত সুযোগ গরিব কৃষকের চাষের নিরাপত্তা ও অগণিত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কিছুটা বাড়িয়ে তুলে পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে সবলতা আনার সূচনা ঘটিয়েছে। গোটা সমাজের বিশেষতঃ যুব সমাজের কাছে এই সম্ভাবনাময় দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক শোষণের জগদ্দল পাথরকে চূর্ণ করে উৎপাদনের উৎসমুখ খুলে দেওয়া না গেলে নতুন পুঁজি সৃষ্টির জায়গা কোথায়? বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী ও গৃহীত পদক্ষেপগুলি জমিদারী শোষণের শেকড়কে আলগা করতে সাহায্য করছে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হবার পটভূমিকায় বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য তাই ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতবহ।

জমিদারী ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে উন্নত চাষের প্রচলনের অনিবার্য পরিণতিতে কৃষক আজ মরতে বসেছে। কৃষক চাষের উৎপাদনে উপকরণ সংগ্রহে বাজারদরে মার খাচ্ছে, উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ে মার খাচ্ছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিযন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণে দেশী বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি গ্রামাঞ্চলে ক্রমেই তার থাবা বিস্তার করছে। কায়েমী-স্বার্থের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষক সাধারণকে সংগঠিত করতে না পারলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ অপূর্ণ থেকে যায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন ও আংশিক হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের ওপর চাপানো বোঝা হালকা করতে সাধারণ কৃষকের জমি নিষ্কর, সেচ ব্যবস্থার প্রসার ও সেচকর হ্রাস, ব্যাপক কৃষিঋণ সরবরাহ, মিনিকিট বন্টন, ভর্তুকি দিয়ে চাষের উপকরণ সরবরাহ, বার্দ্ধক্যভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা নিয়েছেন। কৃষককে রক্ষা করতে এই আংশিক দাবিগুলির

স্বীকৃতি দিয়ে গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক সমাবেশ ব্যাপকতর হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের মাত্র তিন বছরের কার্যক্রম কৃষকের জমি হারাবার প্রক্রিয়াকে মন্থর করতে পেরেছে। সারা দেশের কাছে এটা একটা নতুন দিক।

জন্মের প্রথম দিনটি থেকে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের মূল রণধ্বনী হল কৃষকের জমি এবং নিপীড়ন থেকে মুক্তি। মূল লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে গ্রামাঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। তীব্রতর আংশিক দাবির সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামে রূপ নিয়ে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী আন্দোলনের অপরিহার্য শক্তি হিসেবে একটা বিশেষ পর্যায়ে বামফ্রন্ট সরকারের জন্ম দিতে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত প্রশ্নে, গ্রামাঞ্চলের আশু সমস্যাগুলি সমাধান করতে, বিশেষতঃ জমিতে চাষের অধিকার ও বন্ধন নিপীড়ন থেকে কৃষক সাধারণকে মুক্তির আস্বাদ দিতে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার কতটা ভূমিকা পালন করল, সেটাই হল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চরম বিচার।

গ্রামাঞ্চলের গরিব জনগণ মাথা তুলে চলতে শুরু করেছেন। অনেক পথ বাকি। কিন্তু অগণিত গরিব মানুষ, মেহনতি কৃষক মর্যাদাবোধে সচেতন হয়ে আজ সিদ্ধান্তকারী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছেন। বামফ্রন্ট সরকারের পদক্ষেপ গ্রামের গরিব জনগণ ও কৃষক সাধারণের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ সহজতর করেছে। স্বৈরাচারী শক্তির আতঙ্কের কারণ এখানেই। বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর সফল রূপায়ন ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে।

[সম্পাদকীয় : ২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করিয়াছে, বিনা রক্তপাতে সকল মতের সকল পদের মানুষ শতকরা ৮০ ভাগ কিম্বা তারও বেশি সংখ্যক মানুষ এই সরকারের আমলে একাধিকবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাইয়া নিরপেক্ষ ও দক্ষ সরকারী প্রশাসনের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সমস্ত প্রকারের দুর্নীতি মুক্ত একটি সুষ্ঠু ও জনমুখী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার এক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া যাহারা সুবিচার হইতে বঞ্চিত থাকিয়াছেন—অপমানিত হইয়াছেন—শোষিত নিপীড়িত হইয়াছেন—তাহারা অন্ততঃ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার অবকাশ পাইয়াছেন—মাত্র তিন বৎসরে এহেন কৃতিত্বের দাবী নিশ্চিতভাবে বর্তমান রাজ্য সরকার করিতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতা, অস্পৃশ্যতা, হরিজন নিগ্রহ, ভাষাগত অসহিষ্ণুতার মত সর্বনাশা ব্যাধি হইতে এই রাজ্য বলা যাইতে পারে প্রায় মুক্ত—জনগণের সাথে সাথে রাজ্য সরকারও ইহার জন্য প্রশংসিত হইতে পারে।

গোটা উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-ভারতে বিচ্ছিন্নতা কামী শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতে সারা দেশের ঐক্যকে চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছে, আর সেই সুরে সুর মিলাইতে ঝাড়খণ্ড, উত্তরখণ্ড ও গোর্খাখণ্ডের পাণ্ডারা মাথা খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় তৎপরতার সাথে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া চক্রান্তকারীদের জনজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "খণ্ড" আন্দোলনকারীদের দুর্বুদ্ধিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া যেকোন দেশপ্রেমিক ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রশংসাধন্য হইয়াছে।

বাধা বিপত্তি অনেক, ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর সরকারের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে—সরকারকে উৎখাত করিতে। কিন্তু সহায় যাহারা জনগণের অকুণ্ঠ ভালবাসা শুধু এ রাজ্যের নয় তাবৎ ভারতের, আদর্শ যখন অভ্রান্ত, নিশানা যেখানে সঠিক, নিষ্ঠা যেখানে চালিকা শক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা ও দৃঢ়তা যেখানে হাতিয়ার, সংগ্রামী সাথী যেখানে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুব তখন সকল বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সমস্ত চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করিয়া এই সরকার তাহার লক্ষ্য পথে বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইবে—সকলের সাথে আমরাও কায়মনবাক্যে সেই আশাই করিব। জয়তু পশ্চিমবাঙলার বামজোট সরকার।

শিক্ষার পক্ষে তিনটি বছর

আশিস চ্যাটার্জী

আজকাল বেশী বেশী করে শিক্ষানীতিকে সমাজনীতির সাথে মিলিয়ে ভাবা হচ্ছে। এটা একটা সুলক্ষণ। কেননা অন্য অনেক ধরনের মতবাদ আছে, যা শিক্ষাকে সমাজ, তার কাঠামো, শাসন পদ্ধতি, শাসক ইত্যাদি থেকে আলাদা করে ভাবাতে চায়। এই মতামতের প্রবক্তারা সেইজন্য অনেক সময়ে বলেছেন শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সব আলাদা থাকবেন সমাজে যা কিছু হচ্ছে তার থেকে, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজদর্শন ভাবতে হবে না কিছু। সে বাধা আর টিকলো না। বেঁচে থাকার ব্যবস্থাটার নড়াচড়ার সাথে সাথে ছাত্র-সমাজ, শিক্ষকমহাশয়রা নড়লেন চড়লেন, পথে নামলেন। ভাবতে লাগলেন বেশী বেশী করে এরা আর সব মানুষের সাথে—ব্যাপারখানা কি? শিক্ষিত হয়েও যেন অনেকেই শিক্ষিত নন, যে সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো বিকশিত হবার কথা ছিল শিক্ষা পেয়ে, সে অংকটা আর মিলছে না। দেখা গেল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যেমনটি হওয়ার কথা ছিল তেমনটি আর নেই, ছাত্রদের পড়ার থেকে পাশের দিকে নজর বেশী, তার জন্য অনেকে সবসময় সৎ উপায়ও অবলম্বন করছেন না, অনেক শিক্ষকও ভুলে যাচ্ছেন তার সামাজিক দায়দায়িত্বের কথা। গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাটা যেন প্রচন্ড অসুস্থতায় ভুগছে, সে রোগের অনেক লক্ষণ—গণটোকা-টুকি, অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস, শিক্ষণের অনুপযুক্ত মান, ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও একটা ব্যাপার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল—তা হচ্ছে গণ-অশিক্ষা। দেশের বেশীর ভাগ মানুষই নিরক্ষর। শহর বা মফঃস্বলে শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও দেশের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ যে গ্রামাঞ্চলে বাস করেন, সেখানে নিরক্ষরতা সর্বব্যাপী।

কেন এমন হল? ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসেছিল রাজত্ব করতে—তারা তাদের শাসনের স্বার্থে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সে সময়ে, আধুনিক স্কুল কলেজও গড়ে উঠল, ব্রিটেনের ধাঁচে শিক্ষিত করা হচ্ছিল কিছু মানুষকে। এসব শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন ছিল ব্রিটিশ ভারতে আমলাতন্ত্রের কাঠামো তৈরীর জন্য। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা বড় বড় প্রশাসনিক পদে আসীন হয়েছিল এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজ জমিদারের যোগ্য পারিষদ হয়েছিল।

পরাধীন ভারতেই বিপুল বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতার সমস্যা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বাংলায় বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মণীষীরা এই দাবীকে সামনে নিয়ে এলেন। দেশ স্বাধীন হবার পরে দেশের মানুষ স্বভাবতঃই আশা করেছিল শিক্ষার সমস্যাগুলি দূর হবে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে শিক্ষার সমস্যা ছিল অনেক। কিন্তু মূল সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নিরক্ষরতার সমস্যা। ১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী তখন দেশে ১৯·২৬% মানুষ স্বাক্ষর ছিল। স্বভাবতঃই ব্যাপক জনগণের কল্যাণে একটি জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োজন ছিল যা দ্রুত দেশের সমস্ত মানুষকে স্বাক্ষর করে তুলবে। কিন্তু ইতিহাস লেখা হল অন্যভাবে। স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতি যেভাবে সাজানো হ'ল তাতে উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিক রয়ে গেল জমিদার-জোতদার, কারখানার মালিক এবং সাম্রাজ্যবাদীরা। দেশীয় বাজারকে ব্যবহার করে বড় পুঁজিপতিরা শীঘ্র এক চেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হলেন। এখন পুঁজিবাদের নিয়মই হলো টাকা খাটিয়ে মুনাফা করা, সেই মুনাফা পুঁজিতে যোগ করা, বেশী পুঁজি বিনিয়োগ করে বেশী উৎপাদন করা এই উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রী করে মুনাফা করা এবং আবার তা পুঁজির সঙ্গে যোগ করা। এইভাবে উৎপাদন সীমাহীন ভাবে বাড়তে থাকে কিন্তু জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে না, এক সময় উৎপাদিত সামগ্রী বাজারের ধারণক্ষমতার বেশী হয়ে যায় পুঁজিবাদ থমকে দাঁড়ায়। যতদিন উৎপাদন বাড়তে থাকে ততদিন এবং সেই পরিমাণে প্রয়োজন হয় দক্ষ শ্রমিক, অফিসে কেরাণী, উৎপাদন-ব্যবস্থা তদারকির জন্য উচ্চশিক্ষিত লোক জন। ততদিন এবং সেই পরিমাণেই শিক্ষার প্রসার ঘটে। কিন্তু যেদিনই নূতন নূতন দক্ষ শ্রমিক ও উচ্চশিক্ষিত লোকজনের প্রয়োজন পুঁজিবাদের কাছে ফুরিয়ে যায়, সেদিন থেকে শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনও তাদের কাছে ফুরোয়। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় এবং বেশীর ভাগ রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস বা জনতা দল যা পুঁজি পতি-জমিদারদের প্রতিনিধি। এই সরকার দেশে পুঁজিবাদের বৃদ্ধির স্বার্থেই কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু যেদিন পুঁজিবাদের বাড়বার ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল, সেদিন থেকে প্রচলিত ব্যবস্থাটাকেও সংকুচিত করার চেষ্টা শুরু হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে ক্রমাগতঃ শিক্ষাখাতে কমানো হয়েছে; যেমন প্রথম পরিকল্পনায়—মোট বরাদ্দের ৪·৯% শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়েছে, পঞ্চম পরিকল্পনায় এ হিসাব ১·৩%। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল ইচ্ছা করলেই প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকে যেমন ইচ্ছে সংকুচিত করতে পুঁজিপতিরা বা তাদের সরকার পারে না, কেননা জনগণ শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করে, শিক্ষা-সঙ্কোচনের যেকোন পদক্ষেপকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের চাকরীর ব্যবস্থা হয় না, শিক্ষিত বেকারের মিছিল দিন দিন লম্বা হয়েই চলেছে। যাই হোক, স্বাধীনতার পর প্রায় ২০% স্বাক্ষরতাকে ৩০% এর বেশী বাড়ানো হল না এবং আজও দেশের প্রায় ৭০% মানুষ নিরক্ষর। আবার যে শিক্ষার কাঠামোটা ছিল, তা সকলের জন্য সমান নয়। আমাদের সমাজে শিক্ষা কিনতে হয় যে বেশী দাম দিতে পারবে তার জন্য বেশী চকচকে শিক্ষা ব্যবস্থা, চাকরী-বাকরীতে তারই সুযোগ বেশী। খুব অল্প সংখ্যক স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা পাবলিক স্কুল বা জাতীয় কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়বে, আর বাকীরা যে কোন স্কুলে যেমন তেমন পড়ে পাশ করবে।

এরকম পটভূমিকায় ১৯৭৭ সালের জুন মাসে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু কংগ্রেস সরকারগুলি থেকে মৌলিকভাবেই আলাদা। শোষিত নিপীড়িত অসংখ্য শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত এবং তাদের ঘরের সন্তান ছাত্র-যুবকের প্রতিনিধিত্ব করে এই সরকার। কিন্তু মজাটা হলো এই যে বামফ্রন্ট সরকারকে বর্তমান পুঁজিপতি-জমিদার রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই কাজ চালাতে হচ্ছে। তাই কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন এই সরকারের ক্ষমতার বাইরে। তার উপরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সিংহভাগটাই কেন্দ্রের হাতে, রাজ্যের হাতে রয়েছে ছিটেফোটা। এই সীমাবদ্ধতাকে গণনার মধ্যে রেখেই বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম দেখতে হবে।

বেশীরভাগ নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি বাম সরকারের কাছে প্রথম কর্তব্য অবশ্যই ছিল শিক্ষার বিস্তার। এখন, গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষকদের এবং শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশের আয় এত কম যে বেতন দিয়ে তাদের ঘরের সন্তানদের পড়ানো অসম্ভব। তাই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শিক্ষাকে অবৈতনিক করা প্রয়োজন। সরকার ধাপে ধাপে দশম শ্রেণী অবধি শিক্ষা অবৈতনিক করলেন এবং আগামী ১৯৮১ সাল থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনা চালানোর ব্যবস্থা করলেন। নিঃসন্দেহে এ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। যা পশ্চিমবাংলার মানুষ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে পায়নি, মাত্র তিন বছরে বামফ্রন্ট সরকার তাই করলেন। শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে কাজ হাতে নিলেন, এবং ৩,৪০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১০,২০০ প্রাথমিক শিক্ষকের পদ অনুমোদিত হল। ৩৪১টি নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৩,৫০০ শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে জুনিয়ার হাই স্কুল, মাদ্রাসা ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য। আবার গ্রামাঞ্চলে বা দরিদ্র শ্রমিক বস্তিতে শুধু বিনা বেতনে পড়তে দেওয়াই যথেষ্ট হয় না। যে বালককে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার কথা, সে তার বাবার সাথে মাঠে গিয়ে চাষের কাজে সাহায্য করলে বা শহরাঞ্চলে মোটর গ্যারেজ বা চায়ের দোকানে কাজ করলে তার নিজের খাদ্যটুকু হয়তো সংগ্রহ করতে পারে। তাই সেই বালকটিকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে হলে দুপুরে কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করতে হয় তার জন্য। বাম সরকার কলকাতায় ২,৫০,০০০, কলকাতা ছাড়া শহরাঞ্চলে ৫,০০,০০০ এবং গ্রামাঞ্চলে ২৬,২১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুকে "শিশুপুষ্টি" প্রকল্পের আওতায় এনে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এইসব ব্যবস্থার ফলে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বিরাট অংকে বেড়েছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে ৪% ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিল এবং ৭৯-৮০ সালে তা বেড়ে ৮৬% হয়। ১৯৭৭-৭৯ সালের মধ্যে ,৮৯,৫৭১ জন বেশী ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৭৯-৮০ সালে এই বৃদ্ধির হিসেব ধরা হয়েছে ,০০,০০০ জন। সকল তফশিলী জাতি ও আদিবাসী ছাত্রীদের স্কুলের পোশাক বিতরণ করা হচ্ছে। সাধারণ ছাত্রীদের ০% কে এই পোশাক দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। নিয়মিত উপস্থিতির জন্য সকল তফশিলী জাতি ও আদিবাসী ছাত্রীদের এবং অন্যান্য ছাত্রীদের ২০% কে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে স্লেট, পেনসিল ও খাতা দিচ্ছেন বামফ্রন্ট সরকার। এসবের সাথে আছে ব্যাপক বয়স্ক-শিক্ষার প্রকল্প। সব মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকার নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক অভিযানে নেমেছেন।

এখন, শিক্ষাকে শুধু অবৈতনিক করলেই ত' চলবে না, একটি শিশু বা কিশোর যাতে তা গ্রহণ করতে পারে তার দিকেও নজর দেওয়া চাই। এর জন্য প্রথমেই যা করা প্রয়োজন ছিল, তা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে—শুধুমাত্র মাতৃভাষা পড়ানো, সিলেবাসকে নূতন করে সাজিয়ে—এই বয়সের ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী করে তোলা ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজে বামফ্রন্ট সরকার বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

স্বভাবতঃই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পরে আসে উচ্চ-শিক্ষার কথা। উচ্চশিক্ষা বলতে বোঝাব স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের কথা। এসমস্ত স্তরে শিক্ষার সমস্যা একটু ভিন্ন প্রকৃতির ও জটিল। কিন্তু তারও মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রথমেই শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের দায়িত্ব নিলেন। অতীতের অবস্থাটা নিশ্চয় আমাদের সকলের জানা। মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রীর দেয় বেতন ও কিছু সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হোতো শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের। ফলে প্রতি মাসে বেতন তো' জুটতোই না, দু-তিন মাস অন্তর কিছু টাকা হয়তো পাওয়া যেত। বাম সরকারের 'পে-প্যাকেট' এই সমস্যার সমাধান করেছে। এছাড়া নূতন নূতন কলেজ তৈরী করা, মেদিনীপুরে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি উচ্চ-শিক্ষার জগতে যুগান্তকারী।

আমরা বলেছি উচ্চ-শিক্ষার সমস্যাটা জটিল, যেমন, একটি ছাত্র স্নাতক স্তরে কোন কোন বিষয় নিয়ে পড়বে, তা ঠিক করায় ছাত্র-ছাত্রীকে আরও অধিকার দেওয়া। এসব আগে ছিল না। তখন যে কলা বা বাণিজ্য বিভাগে পড়ত, তাকে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরাজী ও বাংলা পড়তে হোত। আবার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী কখনোই ভাষা-সাহিত্যকে পাঠক্রমে রাখতে পারতনা। নূতন নিয়মে সমস্ত বিষয়গুলোকে কয়েকটি শৃঙ্খলায় (Discipline) ভাগ করা হয়েছে। যেমন কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এখন, যে ছাত্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে সে বিজ্ঞানের দুটি বিষয়ের সাথে অন্য যে কোন শৃঙ্খলার একটি বিষয় নিতে পারবে। যেমন, কোন ছাত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইতিহাস নিয়ে পড়তে পারবে। সে যদি দুটি কলার বিষয়, যথা ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা এবং একটি বিজ্ঞানের বিষয় যথা অংকশাস্ত্র নিয়ে পড়তে চায়, তাও পারবে, শুধু সে তখন কলাবিভাগের ছাত্র হবে। ভাষা-সাহিত্য পড়বার ক্ষেত্রেও এরকম। অর্থাৎ একজন ছাত্র-ছাত্রী নিজের খুশীমত বিষয় নিতে পারবে।

এরই সঙ্গে চলে আসে স্নাতক স্তর ক-বছরের হবে। পুরানো ব্যবস্থায় পাস ও অনার্স সব স্নাতকস্তরের ছাত্রকেই তিন বছর পড়তে হোত। এখন যারা পাস পড়বে, তাদের দু বছর আবার যারা অনার্স পড়বে তাদের তিন বছর। যারা পাস নিয়ে ভর্তি হবে তারাও যে বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাবে সেই বিষয়ে এক বছর পড়তে পারবে সাম্মানিক স্নাতক হবার জন্য। অন্যরা দু-বছর পরেই স্নাতক হবে। এইসব ব্যবস্থা উচ্চ-শিক্ষাকে আরও উপযোগী ও বৈজ্ঞানিক করেছে।

আমরা এ কথা বলে শুরু করেছিলাম যে গোটা শিক্ষা

[শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায়]

সুস্থ সংস্কৃতি ও বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

মানুষের সবচেয়ে বড় সাধনা হল আপন স্বদেশকে শোষণ-মুক্ত ও মহীয়ান করে তোলা। দুনিয়ার ইতিহাসে মানুষই যেদিন থেকে মানুষকে শোষণ করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে তাকে আর সূক্ষ্ম বিচারে সভ্যতার ইতিহাস বলা যায় না। প্রায়শই মনে হতে থাকে—এ কেমন সভ্যতা, যেখানে মানুষ মানুষকে মনে করে পণ্য, তার রক্ত, শ্রম, ঘাম শোষণ করে বেঁচে থাকে। একাজটা কি ধরনের সভ্যতা?

শোষণহীন এমন ঈপ্সিত জন্মভূমি গড়ে তোলবার প্রাথমিক শর্ত হল একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ দর্শন, তার ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক কর্মসূচী ও কর্মনীতি এবং তাকে রূপায়িত করার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সংগঠন। শ্রেণী দ্বন্দ্বের পূর্ণ অবসান ঘটানো তার চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং তা করার জন্য শোষক আর শোষিতে বিভক্ত বর্তমান সমাজটা বদলে অন্য এক সমাজে উত্তরিত হওয়ার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালানো তার কাজ। আপনা থেকে বা সংগ্রাম না করে এ কাজ করা অসম্ভব। সমাজ বদলের এই সংগ্রামের ধারণাটা বহু ব্যাপ্ত এবং ব্যাপক। শ্রমজীবী মানুষের নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রাম এই লড়াই-এর মূল শক্তি, কিন্তু তারই সংগে যুক্ত হয়ে থাকে সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের অতৃপ্তিজনিত ক্ষোভ, ব্যথা, বেদনা। শেষ পর্যন্ত বঞ্চনার এই সুবিশাল স্তূপ ক্রোধে ফেটে পড়ে, প্রধান সংগ্রামের ধারার সংগে মিশে যায়।

সংগ্রামের হাতিয়ার সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হল এই সংগ্রামের উপাদানগুলিকে পুষ্ট করে তোলার এক অনিবার্য ও তাৎপর্যময় হাতিয়ার। পুঁজিবাদী সমাজে ধনিক শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর তাদের মালিকানা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং উৎপাদন সম্পর্কটিকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য যে কোন ধরনের ছল, বল বা কৌশল প্রয়োগ করে। শ্রেণী স্বার্থের কারণেই তারা সর্বপ্রকার ন্যায় অন্যায় বোধকে বিসর্জন দেয়। পুঁজিবাদী সমাজ সমস্ত কিছুকেই পণ্যে পরিণত করে এবং সেই পণ্যের চাহিদা, চরিত্র ও বাজার পরিপূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সংস্কৃতিও তাই পুঁজিবাদী সভ্যতায় তাদের চোখে একটি পণ্য ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের উপযোগী একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য তারা প্রয়োজনীয় ভাড়াটে ও ক্রীতদাস বুদ্ধিজীবী নিযুক্ত করে। এরাই তাদের হয়ে সমগ্র সামাজিক আবহাওয়াটি কলুষিত করার কাজটি সম্পন্ন করে। স্বভাবতই সাংস্কৃতিক ফসল নির্মাণের সময় মূলতঃ এরা যেটা দেখে তা হল—কোন্ ধরনের সাংস্কৃতিক পণ্য বাজারে বিকোবে বেশী। মানুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এরা কলম ধরে না। এমনকি মানুষের চাহিদাটাও যাতে বিকৃত হয়ে ওঠে সে ব্যাপারেও এরা সচেতন। প্রশ্ন উঠলে জবাব আসে—মানুষ চাইছে, তাই আমরা এসব সৃষ্টি করছি। সত্যটা গোপন করে যায়।

প্রতিক্রিয়ার ফাঁদ

সমাজ বদলের লড়াই-এর জন্য ক্ষুধার্ত, ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ মানুষই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সচেতন ও মানসিকভাবে বিকাশ-প্রাপ্ত মানুষ। এটা জানে বলেই তারা সমাজে এমন একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চায়, যাতে বঞ্চিত মানুষ সচেতন ও মানসিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত না হয়ে উঠতে পারে। সমাজের সার্বিক অগ্রগতি এবং বিকাশ ঠেকিয়ে রেখে প্রাণপণে তারা স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতে চায়। নানা মিথ্যার আড়ালে শোষণের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে চায় বা তাকে আড়াল করে রাখে এবং এই সব কাজ করতে গিয়ে তারা যে সংস্কৃতির প্রচার ও গুণগান করে তাকেই আমরা অপসংস্কৃতি নাম দিয়েছি। এর বাইরের দিকে কিছু চাকচিক্য থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ জিনিস অন্তঃসারশূন্য। এতে চোখ হয়ত ধাঁধে, কিন্তু মন ভরে না।

সংস্কৃতি কি

সংস্কৃতি হল সামগ্রিক জীবনচর্চা। মানুষকে সুস্থ, প্রাণবন্ত ও শুভবোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ করা তার কাজ। অপসংস্কৃতি বলতে আমরা তাকেই বুঝছি যার পরিমণ্ডলে এবং আবহাওয়ায় গোটা জাতির মানসিক স্বাস্থ্য পীড়িত ও অসুস্থ হয়ে যায়। সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবাংলায় সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি নিয়ে অজস্র সভাসমিতি, সেমিনার বা লেখা হচ্ছে। অসংখ্য মানুষ শুনতে আসছেন এই সব অনুষ্ঠান। আলোচনা হচ্ছে। পক্ষে বিপক্ষে নানা মত বেরিয়ে আসছে। এই লক্ষণটা সমাজে সজীবতার লক্ষণ। কিন্তু বর্তমান সময়ে এমন ঘটছে বলেই একথা কেউ যেন মনে না করি যে শোষকদের এই প্রয়াস ও তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আগে কখনও হয়নি। সভ্যতার ইতিহাস আমাদের স্পষ্টই দেখিয়ে দেয় যে শাসকশ্রেণীর অনুসৃত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিগুলির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সংকট একটা তীব্র মাত্রায় পৌঁছলেই এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিলেই তারা অপসংস্কৃতির বেনো জলে মানুষের মনকে ভাসিয়ে দিতে মরিয়া চেষ্টা চালায়, সমগ্র প্রজন্মকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিতে চায়। জীবনের শত্রু মিত্র অভিজ্ঞতায় চিনে নিয়ে আপন দুঃখ কষ্ট নিরসনের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠার আগেই মানুষকে তাৎক্ষণিক মোহ-গ্রস্ততায় মাতিয়ে দিয়ে জীবনের প্রকৃত পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

দুটি সংজ্ঞা

সংস্কৃতি কি? আগেই বলেছি মানুষের গোটা জীবনচর্চাই হল সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। একজন মানুষ কি ভাবে, কেমনভাবে কথা বলে, তার কাজ, ভঙ্গী, সারাদিনের মেলামেশা, চিন্তার প্রক্রিয়া, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী, এক কথায় তার সমগ্র জীবনচর্চাই হল তার সাংস্কৃতিকবোধের পরিচায়ক। অপসংস্কৃতি বলতেও তেমনি আমরা শুধু যৌনতা, অশ্লীলতা, বা নিছক নোংরামি বুঝব না। এর মূল আরো গভীরে। এবং এই দুইয়েরই শিকড় সমাজ-অর্থনীতিক কাঠামোর অভ্যন্তরে।

রোগলক্ষণ ও রোগ

মানুষের শরীরে একটা ব্যাধির প্রকাশ তার লক্ষণগুলির মাধ্যমে। লক্ষণগুলো ব্যাধি নয়। ডাক্তাররা লক্ষণগুলো সারান না, রোগলক্ষণ বুঝে তাঁরা সেগুলির কারণ স্বরূপ ব্যাধিটির চিকিৎসা করেন। আজকের দিনে যাঁরা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, তাঁদের তাই বুঝতে হবে, যৌনবিকার বা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী, রিরংসা বা হীনমন্যতা শুধু এগুলিই অপসংস্কৃতি নয়। এরা সেই মূল ব্যাধির নানাবিধ প্রকাশ মাত্র।

শিল্প ভাবনার উৎস

মানুষের সমাজে প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে—সভ্যতার অগ্রগতির ধাপে ধাপে কখনও প্রকৃতির সঙ্গে, কখনও বা অন্যশ্রেণীভুক্ত মানুষের সঙ্গে মানুষ যে অসংখ্য সংগ্রাম করছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে এগিয়ে যাচ্ছে যে ইতিহাস—এই সব ঘটনাই হল মস্তিষ্ক নামক যন্ত্রের প্রয়োজনীয় কাচামাল, এসব থেকে রসদ সংগ্রহ করেই তাই শিল্পী বা বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্ক নতুন নতুন শিল্পচিন্তা, তত্ত্বের, ভাবনার জন্ম দেয়। মানব সমাজ ও সভ্যতা প্রায় গোড়া থেকেই যেহেতু দুটি মূল ভাগে বিভক্ত, মোটা দাগে এই দুভাগ হল শোষক ও শোষিত—তাদের সমস্ত কার্যকলাপ যেহেতু পরস্পর বিরোধী ধরনের, ইতিহাসে যেহেতু একই সঙ্গে চিন্তার ও জীবনযাত্রার দুটি পরস্পর বিরোধী ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, মস্তিষ্ক তাই প্রায় শুরু থেকেই ভাবনার ক্ষেত্রে দুধরনের সামাজিক রসদ পেয়ে এসেছে। এক ধরনের শক্তি পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে সক্রিয়, যার স্বরূপ হল যেমন করে পারি আমার ব্যক্তি বা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য আমি অপরকে শোষণ করব, অন্যরা যাতে তাদের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে তার জন্য গড়ে তুলব সব রকমের দমন পীড়নের ব্যবস্থা। এই কাজের যারা নেতা, তারা হল জমিদার, মালিক, পুঁজিপতি ও তাদের দালালরা। তাদের কার্যকলাপের এক ধারাবাহিক প্রবাহ চলছে আদি যুগ থেকে—এই সব কাজের সমর্থনে। এই সব কাজকে মহিমান্বিত করে দেখাতে একদল স্বার্থান্বেষী, অর্থলোভী, আদর্শচ্যুত মস্তিষ্কজীবী সদাব্যাপৃত। অন্যদিকে রয়েছে অগণিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই—প্রথম দলের আঘাত প্রত্যাহৃত করতে মরণপণ প্রতিজ্ঞা। এদিকে রয়েছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, অন্যান্য মেহনতী মানুষ এবং তাদের দরদী বুদ্ধিজীবীরা। দুধরনের জীবনযাত্রা, দুধরনের চিন্তা-প্রবণতা—অন্তহীনকাল ধরে মস্তিষ্কের কাছে তাই দুধরনের কাঁচামাল সরবরাহ হচ্ছে। দুটি পরস্পরবিরোধী ধরনের চিন্তা-ভাবনা শিল্প ও তত্ত্বের জন্ম হওয়া তাই স্বাভাবিক। প্রথম দলের শিল্প প্রচেষ্টাটা শেষ বিচারে হল অসংখ্য মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা, মানুষের অধিকার ও মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্টা। শোষণ, দমন ও পীড়নের জন্য শিল্প, সত্যের সূর্যকে ঢেকে দেবার জন্য শিল্প, শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে বিভ্রান্ত করার শিল্প,—যে কেউ বুঝতে পারবেন এমন ধরনের প্রচেষ্টা শুভ হয়ে উঠতে পারে না। এই যে অশুভ প্রয়াস, সংস্কৃতির নাম করে এই যে কাণ্ডকারখানা, এটার জন্য ব্যাকরণসিদ্ধ একটি শব্দের অস্তিত্ব যদি না থাকে, আমরা এটাকে "অপসংস্কৃতি" বলছি, বলবো এবং সমাজের মাটি থেকে শিকড়শুদ্ধ একে উপড়ে ফেলার চেষ্টা চালাবো।

বামফ্রন্টের সীমাবদ্ধতা

পশ্চিমবাংলায় এবং ভারতবর্ষের অন্য কয়েকটি রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের একটি বিশেষ স্তরে বামফ্রন্ট সরকারগুলির ক্ষমতালাভ আমাদের সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। বামফ্রন্ট সরকারগুলি সম্পর্কে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক কথাটি হল এই যে, সমাজ বদল করে মানুষের জীবনে যে মৌলিক পরিবর্তন আনার কথা আমরা উল্লেখ করেছি সেই কাজটা এই সরকার সমাধা করতে পারেন না। কিন্তু সেই মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার ক্ষেত্রে এই সরকারকে একটি বিশেষ ধাপ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেভাবে তাকে ব্যবহার করাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে ৩৬ দফা কর্মসূচীর উল্লেখ করেছিলেন। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে মৌলিক কোন পরিবর্তন তাঁরা হয়ত করতে পারবেন না—কিন্তু এর মধ্যেও, সদিচ্ছা থাকলে, একটা দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হলে মানুষের দুঃখদুর্দশার যে কিছুটা লাঘব করা যায়, সেই কথা স্মরণে রেখেই ঐ কার্যসূচী। মানুষের জীবনকে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে যদি নাও পারি, কেন তা বিকশিত হয়ে উঠছে না, তার উন্নয়নের পথে বাধা কি, এটুকু অন্তত যদি স্পষ্ট করে খুলে বলতে পারি, এবং মানুষকে তার নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলার আহ্বান জানাতে পারি, সেটাও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ কথা।

কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত

গোটা ভারতে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট যখন ঘনীভূত, ঠিক যখন প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা সাংস্কৃতিক জগতে এক অসুস্থ নৈতিবাদী পরিমণ্ডল তৈরী করতে কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে, তখনই পশ্চিমবঙ্গ ও আর কয়েকটি রাজ্যে দ্বান্দ্বিক কারণেই বামফ্রন্ট সরকারগুলির আবির্ভাব। ওরা অবিরাম চেষ্টা চালাবে এক জীবনবিমুখ ভোগলালসা-রিরংসাময় বিকৃত সংস্কৃতির স্রোত বইয়ে দেবার। এই সব নৈতিবাদী বিষয়গুলিকে মানুষের মনের কাছে গ্রাহ্য করে তোলার জন্য তারা খুঁজে খুঁজে নিযুক্ত করবে আদর্শহীন একদল বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও শিল্পী। দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের চরিত্র, মত, দৃষ্টিভঙ্গী ও গোটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সুবিধামত গড়ে তোলবার

চেষ্টা করবে তারাই—সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক, গান, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে।

সার্বজনীন দায়িত্ব

সূক্ষ্ম বিচারে শুধু এই নোংরা নাটক, গান, সিনেমা বা সাহিত্যই অপসংস্কৃতি নয়, তার মূল অনেক গভীরে। তার বিরুদ্ধে লড়াই দীর্ঘকালীন কঠিন লড়াই, একথা আমরা আগেই বলেছি। তবু যেহেতু ব্যাপক অর্থে জনগণের এই চিত্ত বিনোদন ও বিকাশের ক্ষেত্রটিকে ঘিরেই ঘনায়মান সংকট, তাই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইতে এগুলির বিরুদ্ধে পাল্টা সৃষ্টির ও দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অসীম। তাত্বিক বিতর্ক চালাতে হবে. প্রতিবাদী জনমত গঠন করতে হবে। সমাজ বদলের সংগ্রামে যথাযথ সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করতে হবে—কিন্তু সাথে সাথে পাল্টা সৃষ্টিতে মাতিয়ে দিতে হবে গ্রাম শহর, ক্ষেতকারখানা। পাল্টা সৃষ্টির বাস্তব অবস্থা ও সুযোগ তৈরী করতে হবে, এটাও কম কথা নয়। যেহেতু সামগ্রিক সংগ্রামেরই এটা একটা অংশ তাই সর্বস্তরের সংগ্রামী মানুষকেই এবিষয়ে সচেতন হতে হবে। নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে হবে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র. যুবক বা মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা তাঁদের নিজেদের দাবী-দাওয়া নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন, আংশিকভাবে দাবী আদায়ও করতে পারেন, তার মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর লড়াইতে সামিল হবার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। এগুলি শাসকরা কোনভাবেই রুদ্ধ করে দিতে পারে না। চেষ্টা করলেও, অত্যাচার নিপীড়ন চালালেও তাকে অতিক্রম করতে হয়—কারণ নান্য পন্থা। কিন্তু সংস্কৃতির জায়গাটা ফাঁক থেকে গেলে বিপদ। এইখানে ওরা যখন সতর্ক জাল ফেলে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি বলে দিই, ওটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, বা ওটা আমাদের বোঝার ব্যাপার নয়, তাহলে বিপদের আশঙ্কা। শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন কৃষক সমস্যা বুঝতে হবে, কৃষককে বুঝতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি, ছাত্র যুব বা মধ্যবিত্তকেও যেমন বুঝে নিতে হবে শ্রমিক কৃষকের সমস্যা, রাজনীতি ও মুক্তির পথ, তেমনি সবাইকেই বুঝতে হবে সংস্কৃতির সংকট, বিপদ ও তার প্রতিরোধের কথা। এ কাজটি ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখলে চলবে না, শুরু করতে হবে এখন থেকেই। শত্রুরা জানে সচেতন মানুষকে এই বিষ দিয়ে পঙ্গু করা যাবে না, তাই মুখ্যত তাদের লক্ষ্য হল অসচেতন মানুষ ও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীরা। জীবনের সঠিক পথ চিনে, আন্দোলনে সামিল হবার আগেই যদি ব্যাপক মানুষকে চিন্তার ক্ষেত্রে পঙ্গু করে তোলা যায় তাতে ভবিষ্যতের লড়াইতে এ পক্ষের সৈনিক কমে যাবে এই পরিকল্পনায় তারা ফাঁদ পাতে। সতর্কভাবে আমাদের তা এড়াতে হবে।

দায়িত্বশীল সরকারের ঘোষণা

এবং পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার সক্রিয়ভাবে সেই উদ্যোগ নিয়েছেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানুষের জন্য তাঁরা ইতিমধ্যেই বিরাট কিছু করেছেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটা প্রকাশিত হয়েছে। তিন বছরের কার্যকলাপে মানুষ তা ক্রমে উপলব্ধি করছেন। সরকার গঠন করার অব্যবহিত পরেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ঘোষণা করেছিলেন। এবং এমন ঘটনা ভারতবর্ষে তেত্রিশ বছরে এই প্রথম। তিনি বলেছিলেন, আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। বলেছিলেন, "কোন দায়িত্বশীল সরকার সাংস্কৃতিক জগতের এই বিষাক্ত আবহাওয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না।" বুদ্ধির বিচারে এটা লজ্জার, যে এই প্রশ্নও উঠেছিল, মুখ্যমন্ত্রী কি সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রের মানুষ? না—মুখ্যমন্ত্রী জীবনের সপক্ষের মানুষ। সংস্কৃতি চর্চা মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, জীবনকে বিকশিত করে তোলাই তার কাজ—তাই মানুষের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী ঐ আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সংস্কৃতির নামে যাঁরা জীবনের অগ্রগতিকেই রুদ্ধ করে দিতে চাইছেন তাঁরাই মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানকে অনধিকার চর্চা বলে বালকোচিত সমালোচনা করছেন।

প্রাক পরিস্থিতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা

তিন বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। তবু একটা সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হওয়ার পক্ষে সময়টা কমও নয়। এ রাজ্যে এই সরকার গঠনের সময়ে সমগ্র রাজ্যের পরিস্থিতি কেমন ছিল তা কেউই বিস্মৃত হন নি। সেই থমথমে অবস্থা কাটিয়ে একটা সুস্থ, ভয়হীন, গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা এই সরকারের প্রথম সাফল্য। শিক্ষার বিস্তার সংস্কৃতি চর্চার ও সুস্থ সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ৭৭ সালের আগে প্রায় সাত আট বছর ধরে এই রাজ্যে শিক্ষা বিষয়ক প্রতিটি দিক নিদারুণভাবে অবহেলিত ও আক্রান্ত হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে অবাধ টোকাটুকি করা এক শ্রেণীর ছাত্র নিজেদের অধিকার বলে ভাবতে শুরু করেছিল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যে আমাদের ঐতিহ্যময় শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে একটা থমথমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছিল। তাকে কাটিয়ে তুলে এখন সেখানে পড়াশোনার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনা এবং সময়মত পরীক্ষা নিয়ে, তার ফল প্রকাশে এই সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। সিলেবাসগুলি পরীক্ষামূলকভাবে বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে পরিবর্তন করা হচ্ছে, শিক্ষার আলো বহুতর মানুষের মধ্যে পেৌছে দেবার জন্য এ'রা নানা ব্যবস্থা নিচ্ছেন, গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। সেগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষককে নিয়োগ করা যাচ্ছে। এ'রা স্কুল পর্যায়ের সমস্ত ক্লাসগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সমস্ত খরচ চালানোর দায়িত্ব নিচ্ছেন। বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রও এ'দের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। শিক্ষার প্রসারের জন্য এই রাজ্যে এত ব্যাপক ব্যবস্থা এর আগে অন্য কোন সরকার করেন নি।

মাতৃভাষা ও সংখ্যালঘুদের সম্মান

রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, সহজ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা আর সেই সঙ্গে শিক্ষার প্রসারের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা—এগুলি বামফ্রন্ট সরকারের সুস্থ সংস্কৃতি প্রসারের জন্য তাঁদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর

প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দিক। রাজ্যসরকার যুগপৎ অন্ততঃ ৬টি ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন। সেগুলির সাফল্য অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে গেছে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবনা ও কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ এতে থাকছে। সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু মূল্যবান সৃজনমূলক রচনা। প্রথিতযশা বহু লেখক এই সব কাগজে লিখছেন। বিগত সরকারের আমলেও পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতে দেখেছি —তখন এই কাগজ কেউ নিয়মিত আগ্রহ নিয়ে পড়তেন বলে শুনিনি। এর প্রচার সংখ্যা ছিল খুব বেশী হলে হাজার তিনেক। বর্তমান সরকারের প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা প্রায় লক্ষের ঘরে পৌঁছতে যাচ্ছে। সরকারী কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে তাঁরা বাংলা ভাষাকে পুরোপুরি চালু করেছেন। এই রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, চিন্তা করেন—তাঁরা যদি কাজ করার জন্য এমন একটি ভাষা ব্যবহার করেন, যার আশ্রয়ে তাঁরা বেড়ে ওঠেন নি, তাহলে কাজের গতি ও পারিপাট্য কমে যায়। অন্য ভাষাগুলি তা বলে অবহেলিত হয়নি। বরঞ্চ প্রতিটি আঞ্চলিক উপভাষা ও অন্যান্য ভাষাকে যথোচিত মর্যাদা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অলচিকি ও নেপালীভাষাকে এঁরা সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রতিও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। নেপালী শিল্প আঙ্গিক ও সাহিত্যকে উৎসাহদানের জন্য একটি নেপালী একাডেমী স্থাপন বামফ্রণ্ট সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিগুলি বিকশিত হয়ে না উঠলে, গোটা রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। সেদিকে নজর রেখেই তাঁরা এই সব পদক্ষেপ নিয়েছেন। একটি রাজ্যে একটি বিশেষ ভাষাভাষী মানুষ সংখ্যায় বেশী বলে সেই মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকেই একমাত্র বলে চালাতে হবে, বুদ্ধির এমন মারাত্মক বিকার আমরা কোথাও কোথাও দেখতে পাচ্ছি—সংখ্যালঘুর ভাষাকে প্রয়োজনীয় ও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন সেইসব দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ।

আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা নয়

সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে এই সরকার নানাবিধ কর্মসূচী নিয়েছেন। নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা বা সাহিত্য কোনটিতেই তাঁরা অবহেলা করছেন না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করবে তা হল ঔপনিবেশিক আমল থেকেই এখানে প্রচলিত আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীলতার অভ্যাসবর্জন। এই সমাজ ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র গতিশীলতার বিরোধী। তাঁরা যে পাল্টাতে পারেন না, এমন নয়, কিন্তু দীর্ঘকালের গতানুগতিক চরিত্র বজায় রেখে চলতেই তাঁরা অভ্যস্ত। বামফ্রণ্ট গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে সেখানে গ্রামোন্নয়নের কাজটি আমলাতন্ত্রের হাত এড়িয়ে সরাসরি গ্রামের মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় Municipal Act চালু হতে যাচ্ছে, কর্পরেশনের কাজকর্মের বিবিধ পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের ওপর নির্ভরশীলতা তাতেও অনেকটা হ্রাস পাবে। সংস্কৃতি দপ্তরের কাজকর্মেও এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়েছে। শিল্পচর্চার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিকল্পনাগুলি এখন আর সরকারী অফিসারদের মর্জিমাফিক হচ্ছে না—কি করা হবে সেটা ঠিক করছেন বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ শিল্পী এবং বোদ্ধা মানুষেরা। সরকার এঁদের নিয়ে অনেকগুলি কমিটি করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী সাংস্কৃতিক কাজকর্মে নিঃসন্দেহে নতুন প্রাণাবেগ সৃষ্টি করবে। অপসংস্কৃতির বিষাক্ত প্রভাবকে প্রতিরোধ করার জন্য পশ্চিমবাংলার গ্রামে শহরে প্রগতিশীল চিন্তার লেখকশিল্পীরা বিগত কয়েক বছর ধরে নানা আন্দোলন ও সৃজনমূলক প্রয়াস চালাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে তা প্রভূত সাড়া এনেছে। "অপসংস্কৃতি কাকে বলে—কেন তা খারাপ—কেমন করে তা রোখা যাবে", শুধু এবিষয়ে আলোচনা শোনার জন্য গ্রামে শহরে নানা সভাসমিতি হচ্ছে এবং তা শুনতে আসছেন অসংখ্য মানুষ। এই রকম সমস্ত প্রয়াসকে আন্তরিক মদত দিচ্ছেন বামফ্রণ্ট সরকার। কোথাও বা সৎ সংস্কৃতির প্রয়াসে আর্থিক সাহায্যও দিচ্ছেন। আমাদের রাজ্যে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সরকারী আনুকূল্যে এ রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের আমলে আমরা বহুবিধ অন্যায় ও নেতিবাদী কাজ হতে দেখেছি। বহু সময়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তি সম্পর্কে শোনা গেছে বহু নোংরা অভিযোগ। লম্পট, গুণ্ডা বা সমাজবিরোধীরা প্রকাশ্য মদত পেয়েছে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের কাছে। স্বাধীনতা-উত্তর তিরিশ বছরে সবার মধ্যে একটা ধারণা তিলে তিলে তৈরী হয়েছে, যে অসৎ পথ অবলম্বন না করলে, ঘুষ না দিলে, ব্যক্তিস্বার্থে নিজেকে ব্যবহৃত হতে না দিলে এদেশে প্রায় কোথাও কোন কাজ হবার নয়। জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে এমন ধারণা জাতির মধ্যেই তৈরী হলে ভয়ানক বিপদের কথা।

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র হল শিল্প সংস্কৃতির জগতে সবচেয়ে জনচিত্তজয়ী ও ব্যাপকতম মাধ্যম। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, যে এই শিল্পের মালিকেরা প্রচুর পরিমাণ টাকা ঢেলে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে নিজেদের মুনাফা অর্জনের চেয়ে মানুষের চরিত্রগঠন ও জীবনমুখী হয়ে ওঠাকে বড় করে দেখবেন না। সমাজে সংকট যত বাড়বে, সেই সংকট সাধারণ মানুষের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা হবে, মানুষ সেই ভার বহন করতে চাইবে না—অত্যাচার, নিপীড়ন হবে এবং তা প্রতিরোধও হবে। একই সঙ্গে চেষ্টা হবে এই সব সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সংকটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার। স্বভাবতই এই জনপ্রিয়তম মাধ্যমটিকে সে কাজে ব্যবহার করা হবে। এমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হবে যার মধ্যে জীবনের প্রকৃত সমস্যা বা তা থেকে উত্তরণের পথের কোন হদিশ নেই। বদলে কিছু ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা, তাৎক্ষণিক মোহগ্রস্ততা, উদ্ভট কল্পনামিশ্রিত রোমান্টিক ভাবালুতা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই সব চলচ্চিত্র। বহু গবেষণায় এসব তৈরী করে মানুষের মনের ক্ষিধে মেটানো হবে, তাকে অভ্যাস করানো হবে এই বিষ পান করতে এবং বলা হবে মানুষ চাইছে বলেই এসব তৈরী হচ্ছে। অথচ জীবনের প্রসারিত অন্য দিক পড়ে আছে। সেই জীবনের ছবি সম্পর্কে এরা চোখ বুজে থাকবে। বামফ্রণ্ট সরকার এক ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধ থেকে এগিয়ে এসেছেন এই অন্য জীবন, অন্য ছবির শিল্পায়নের সাহায্যে। তাঁদের ক্ষমতা কম। একচেটিয়া বাজারে অনুপ্রবেশ করা কঠিন, তবু তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রতি বছর অন্ততঃ

২০টি দলিল চিত্র তুলবেন—পশ্চিমবাংলার শহরে গ্রামে মানুষের অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াই কিভাবে চলছে, দেশগঠনে নতুন উদ্যমে গ্রামের মানুষ কেমনভাবে নেমেছেন পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে, তা দেখানো হবে। দেখানো হবে, যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত মানুষ নবচেতনার মন্ত্রে কেমন করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। সরকার শিশুদের জন্য ছবি তুলছেন, প্রযোজনা করছেন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র। ছবি তোলার জন্য বিশিষ্ট পরিচালকদের অনুদান দিচ্ছেন, যাতে তাঁরা আর্থিক বাধাটা অন্ততঃ আংশিকভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন। ছবি রিলিজের সমস্যাটা এখনও রয়েছে—ছবি তোলার পর যাতে তা দীর্ঘকাল বাক্সবন্দী পড়ে না থাকে, সেটা দেখা খুব জরুরী। প্রযোজক পরিবেশকদের দীর্ঘকালের তৈরী করা বেড়াজাল, তাকে ছিন্ন করা কঠিন, সময় সাপেক্ষ। বাইরে থেকেও এ রাজ্যে প্রসিদ্ধ ও উন্নতমানের পরিচালকরা ছবি তুলতে আসছেন। তাতে পশ্চিমবাংলায় তোলা ছবি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আসন পাবে, প্রচার লাভ করবে। সম্মান ও আর্থিক প্রশ্ন দুটোই এতে জড়িত। আমাদের ষ্টুডিয়ো ও লেবরেটরীগুলি উন্নত মানের যন্ত্রের অভাবে বহু সময়েই কাজের পারিপাট্য বজায় রাখতে পারে না, বা বহুসময়েই সেখানে কাজের অগ্রগতি হয় অত্যন্ত শ্লথ। সরকার উন্নতমানের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ঋণ দিচ্ছেন। ষ্টুডিয়োয় ব্যবহারের উপযোগী উন্নতমানের ক্যামেরা কিনেছেন, যাতে পরিচালকরা কম ভাড়ায় তা পেতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা মৃতপ্রায় টেকনিসিয়ান ষ্টুডিয়োর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সল্ট লেকে রঙগীন ফিল্ম লেবরেটরী তৈরীর কাজও প্রাথমিকভাবে শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রসদনের পেছনের জমিতে করেছেন আর্ট থিয়েটার। সারা রাজ্যে ফিল্ম থিয়েটার স্থাপনের জন্য তাঁরা আর্থিক সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটি ফিল্ম ডিভিশন স্থাপনের। গত তিন বছরের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার ৫টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন। ৩টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের শিশুচিত্র এবং ২৮টি তথ্যচিত্র-ও এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন চিত্রগৃহে মানুষ সেগুলি দেখছেন। চলচ্চিত্র হিসাবে সেগুলির বিচার হবে ইতিহাসের গতিধারায়। আপাতত আমরা এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সপক্ষে দাঁড়াচ্ছি।

নাটক

নাটক হল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ আর একটি দিক। আমাদের এখানে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায়িক দাপটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার একটা সুস্থ চিন্তার নাট্য আন্দোলনের ধারাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। নানা অসুবিধা, মতাদর্শগত সূক্ষ্ম পার্থক্য, আর্থিক অসংগতি, হলের সমস্যা সত্ত্বেও তাঁরা থামেন নি। সাম্প্রতিককালে কলকাতায় থিয়েটারে সংস্কৃতির নামে যে অবাধ চূড়ান্ত নোংরামি চলছে তা আমাদের সমস্ত ঐতিহ্যের কলঙ্ক। তাকে বাধা দেওয়া এঁদের আর একটা কাজ। নতুন নতুন নাট্যচর্চার মাধ্যমেই তাঁরা তা করছেন। দায়িত্বশীল ও সৎ কিন্তু বিচ্ছিন্ন এই প্রতিবাদী প্রচেষ্টাগুলির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন এই সরকার। ৭৮ সালে সরকারী উদ্যোগে নাট্যোৎসব করে প্রগতি নাট্যচর্চার প্রতি তাঁরা তাঁদের সংহতি জানিয়েছিলেন। ৭৯-তে নিয়েছিলেন জেলায় জেলায় নাট্যোৎসবের পরিকল্পনা। এখন শুরু হয়েছে নতুন নতুন মঞ্চ নির্মাণ, জেলায় জেলায় রবীন্দ্রভবনগুলির সংস্কার। টাউন হলগুলি মেরামত করা হচ্ছে। অপেশাদার নাট্যদলগুলি কম ভাড়ায় এগুলি পেলে তাঁদের আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটবে। কয়েকদিন আগে শ্রীজ্যোতি বসু উত্তর কলকাতায় গিরীশ মঞ্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নাট্যমোদীদের বহুদিনের ইচ্ছা পূরণ করেছেন। প্রবীন নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রীমন্মথ রায় আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, আশীর্বাদ জানিয়েছেন এই পদক্ষেপকে। সরকার আর্ট গ্যালারীর জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করেছেন, গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে নানাবিধ করদান থেকে রেহাই ও আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন। দুঃস্থ শিল্পীদের এককালীন সাহায্য ও পেনশন দিচ্ছেন। অনেক ব্যক্তি-শিল্পী-প্রতিভাও এই রকম সাহায্য পাবেন। কেন্দ্রীয় ও জেলাস্তরে তাঁরা আয়োজন করেছেন নাট্য প্রতিযোগিতার। সব মিলিয়ে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এ এক নতুন যুগ। সরকার এগিয়ে এসেছেন। যৌথ ঐক্যবদ্ধ বেসরকারী প্রচেষ্টার পাশে দাঁড়াচ্ছেন—প্রতিক্রিয়ার শক্তি থেমে থাকবে না। নতুন নতুন উদ্যমে তারা বাধা সৃষ্টি করবে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে যখন এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার একটি নাট্যমঞ্চে সকল স্তরের লেখক-শিল্পীদের সমাবেশে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুস্থ চিন্তার জন্য আবেদন জানালেন, তার অব্যবহিত পরেই সেখানেই শুরু হল নাটকের নামে বেলেল্লাপনা। সচেতন জনমত গড়ে তুলে মুখর প্রতিবাদে এই হীন চক্রান্তকে দমাতে হবে।

চিত্রকলা

চিত্রকলার বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়। কিন্তু এবার সেদিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে বেশ কিছু ছাপা Poster Set বেরিয়েছে—লেখা ও রেখায় যা সহজেই মানুষের মন স্পর্শ করে। বক্তব্য ও অলংকরণে সমৃদ্ধ এই Set গুলিকে বহু সংগঠন বিনা খরচে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করছেন। জাতীয় মিউজিয়াম ও গ্যালারী তৈরীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আমাদের রাজ্যের অতীত দিনের শিল্পীদের কিছু উন্নত মানের কাজ যথাযোগ্য মর্যাদায় চিরকালের জন্য যাতে সংরক্ষিত হতে পারে সেটা দেখা একটা বিরাট কাজ।

সাহিত্যচর্চা

সাহিত্যের নানা দিকে নানা ধরনের উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ গ্রহণ সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকদের ক্রমশই উৎসাহিত করছে। রবীন্দ্রপুরস্কার পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-সেবীদের কাছে অন্যতম প্রধান সামাজিক স্বীকৃতি। অথচ এই পুরস্কারকে ঘিরে কয়েক-বছর আগেও যেসব নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা নিতান্তই অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক। রবীন্দ্রপুরস্কারকে এই লাঞ্ছনার হাত থেকে তুলে এনে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে বামফ্রন্ট সরকার তাকে তার সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়েকটি পুরস্কার পুনরায় প্রবর্তন করে সাহিত্যিক সমাজে সঞ্চার করেছেন নতুন উৎসাহের। সেই সঙ্গে নতুন

কয়েকটা পুরস্কার দেওয়ার কথাও তাঁরা ভাবছেন। এগুলির অর্থমূল্য নেহাৎ কম নয়, কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। সমাজগঠনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে সাহিত্যিকদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া ও উৎসাহিত করার যে দৃষ্টিভঙ্গী এ থেকে বেরিয়ে আসছে, সেটাই আসল কথা।

বামফ্রন্ট সরকার প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা ভরতুকি দিয়ে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্র রচনাবলী। প্রকাশ করার কথা ভাবছেন শরৎচন্দ্র, নজরুল, মানিকের সমস্ত লেখা। আরও কিছু চিরায়ত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রনের কথাও তাঁরা ভাবছেন। যে ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে সভ্যতা ও সমাজ আজকের স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া এক মহান দায়িত্ব। বিভিন্ন সময়ে সরকারী উদ্যোগে ভারতবর্ষের মহান সন্তানদের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে প্রাজ্ঞব্যক্তিদের আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে তাঁরা পালন করেছেন ইকবাল ও প্রেমচাঁদ জন্মশতবার্ষিকী। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে "আলোর ফুলকি" নাম দিয়ে যে শিশু সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে কোন কোন মহল থেকে তার অর্থহীন সমালোচনা করা হচ্ছে, এটা আমাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু তাতে এই প্রয়াসের গৌরব কমে নি। নতুন নতুন বই প্রকাশের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করার কথা তাঁরা ভাবছেন। ভাবছেন দুঃস্থ সাহিত্যিকদের পেনশন দেওয়া যায় কিনা। সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক বিনয় ঘোষের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব বহন করে বামফ্রন্ট সরকার গোটা দেশের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। প্রখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্করকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলিতে অবহেলিত এই শিল্পীর চিকিৎসার সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন এঁরাই। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বাগত জানাই।

বিবিধ প্রয়াস

সমগ্র এশিয়ার অসংখ্য জাতি ও বৈচিত্রময় জীবনচর্চার মানুষের সাংস্কৃতিক বোধ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানোর জন্য Netaji Institute for Asian Studies তৈরী হচ্ছে। দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়িতে দুটি নতুন তথ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে, চা বাগান ও কয়লাখনি অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে শ্রম তথ্যকেন্দ্র। রাজ্যসরকারের তথ্য দপ্তরের কাজ এখন আর শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। তাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ব্লকস্তর পর্যন্ত। সংগীতচর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য এ রাজ্যে একটি সংগীত একাদেমী স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক গ্যালারী। লোকরঞ্জন শাখার কাজকর্ম গোটা রাজ্য জুড়ে প্রসারিত হয়েছে। তাদের কর্মসূচীর মধ্যে যুক্ত হয়েছে জীবনের সপক্ষে বহু নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস। ঝাড়গ্রাম ও শিলিগুড়িতে লোকরঞ্জন শাখা স্থাপিত হয়েছে আঞ্চলিক মানুষের সাংস্কৃতিক চাহিদার দিকে নজর রেখে। রাজ্যসরকার একটি লোকসাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গঠন করেছেন। বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে লোক উৎসব, সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলা দেশের লোকজীবনে প্রচলিত ঐতিহ্যময় বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সংস্কৃতি দপ্তর ছোট বড় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপের ব্যাপক প্রচার করছেন। বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু বিজ্ঞান সম্মত নীতি চালু হয়েছে—ছোট বড় সমস্ত রেজিস্টার্ড কাগজই বিনা তদবিরে বিজ্ঞাপন পাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে এরই মাধ্যমে গোটা দেশের মানুষের কাছে তাঁদের এই ব্যাপক কর্ম-উদ্যোগ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী পরিচিত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী

আমরা যেগুলি উল্লেখ করলাম সেগুলি বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত কর্মসূচী রূপায়ণে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এর গুরুত্ব সর্বভারতীয়। এই ব্যাপক কর্মকাণ্ডের প্রভাব গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী মানুষের ওপর পড়তে বাধ্য। কিন্তু বর্তমান সমাজকে পালটে যে নতুন ভারতবর্ষ গঠনের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেখানে পৌঁছবার পক্ষে এই কার্যকলাপ নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়। গভীরভাবে আমাদের ভেবে দেখতে হবে এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আপাতত আরও কি কি আমরা করতে পারি। নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সেই কাজ আমাদের করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে কোন্ কাজ কতটুকু করা হল তথ্য ও সংখ্যার বিচারে সেটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কথা। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হল মানুষের প্রতি এক দরদী দৃষ্টিভঙ্গী। সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রটি মুষ্টিমেয়র লীলাবিলাসের কব্জা থেকে উদ্ধার করে ব্যাপক মানুষের অংশ গ্রহণের উদার ক্ষেত্রে পরিণত করার যে অঙ্গীকার বর্তমান সময়ে উদ্ভাসিত হয়েছে সেটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। বহু মানুষের দ্বারা চর্চিত না হলে সংস্কৃতির বর্ণচ্ছটাময় সুরভিত কুসুমটি বাঁচে না। বন্ধ দুয়ারের আড়াল থেকে বের করে এনে তাকে স্থাপিত করতে হবে বহু মানুষের বিস্তীর্ণ আঙিনায়। মনে রাখতে হবে, এ কাজ খুব সহজে কুসুমাস্তীর্ণ পথে করা যাবে না। প্রতিক্রিয়ার সক্রিয় বাধা আসবে। মরণাপন্ন পুঁজিবাদী সভ্যতা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে আজ কোণঠাসা। তার পুতিগন্ধময় শরীরে এখন জনগণের মনোহরণকারী কোন আকর্ষণ আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবার আগে সে চরম আঘাত হানার চেষ্টা করবেই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা বারবার দেখা দেবে। সমাজে তাদেরই সৃষ্ট ক্ষতগুলির দিকে বীভৎস অঙ্গুলি নির্দেশে তারা দেখাবে এই হল অনিবার্য ও একমাত্র বাস্তব। অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন করে তোলবার চেষ্টা করবে আজকের প্রজন্মকে। বর্তমানকে করে তুলবে বিষণ্ণ, ভবিষ্যতকে নির্দিষ্ট করবে অনিশ্চিত বলে। চোখ কান খোলা রাখলে দৃষ্টি এড়াবে না যে এক বিশাল দায়িত্বের সামান্য যে প্রারম্ভিক কাজ এই সরকার শুরু করেছেন, কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে তাতেই নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অকারণ, মিথ্যা ও হাস্যকর সমালোচনা করা হচ্ছে বাজারী কাগজে, অর্দ্ধশিক্ষিত নেতাদের বক্তৃতায়। তার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু দায়িত্ব নেবার আছে। একটা সংগ্রাম চলছে, চলবে দীর্ঘকাল। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমাদের বহু ঐতিহ্যময় দেশকে, সংস্কৃতিকে নিয়ে যেতে হবে ঈপ্সিত কাঙ্ক্ষিত লোকে। সে কাজে হাত লাগাতে হবে সকল স্তরের মানুষকে শ্রমে, সচেতনতায়।

বামফ্রণ্ট সরকারের তিন বছর ও যুবকল্যাণ বিভাগ

অরুণ সরকার

বিষয়টি অবতারণার আগে বলা প্রয়োজন যে যুবকল্যাণের যাবতীয় উদ্যোগ কার্যকরী করবার জন্য সারা ভারতের অঙ্গ-রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সর্বপ্রথম একটি পৃথক দপ্তরের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সম্ভবতঃ এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজও অদ্বিতীয়।

আমাদের সমাজে দারিদ্র আছে, ক্ষুধা আছে, কর্মহীনতা আছে, আছে নিরক্ষরতা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগের অভাব; সামাজিক সংকীর্ণতা ও উন্নাসিকতা আছে, আছে সুস্থ জীবনধর্মী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের সীমাবদ্ধতা। আপামর জনসাধারণের সঙ্গে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুবসমাজও এই ঘনীভূত সংকটে নিমজ্জিত। এই সামগ্রিক সমস্যা ছাড়াও যুবসমাজের কিছু নিজস্ব চাহিদা, কিছু অভাব ও আবেদন, কর্মসংস্থানের অভাবনীয় অপ্রতুলতা, সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধূলায় অংশগ্রহণে হাজারো প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি নিয়েই যুবজীবনের বর্তমান চালচিত্র।

সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সব সমস্যার মৌল সমাধান সম্ভব নয়। যুবসমাজের চাহিদা সীমাহীন আর রাজ্য সরকারের ক্ষমতা অতি সীমিত। তবুও এরই মধ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতাকে মূলধন করে এই বিভাগ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে যুবজীবনের এই বেদনাকে একটু প্রশমিত করা যায়, একটু সুযোগ, একটুখানি অধিকারে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তারা উপলব্ধি করতে পারে যে সরকার তাদের সমব্যথী এবং সাথী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের কর্মসূচী মূলতঃ গ্রামমুখী। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে কিছু কিছু প্রকল্পের সুযোগ সকলের জন্য নির্দিষ্ট। আরও অধিকমাত্রায় শহরগুলিকে বিশেষকরে শহরের অনগ্রসর এলাকাগুলিকে এই বিভাগের কাজের পরিধির মধ্যে আনার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন রয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে বিগত তিন বছরে আমরা যেসব কর্মসূচী রূপায়ণ করতে পেরেছি তার কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প

কর্মক্ষম মানুষের কাজের সংস্থান না থাকা তার জীবনের এক চরম অভিশাপ। দুঃসহ বেকারীর জ্বালায় যুবসমাজ হতাশাগ্রস্ত এবং বিভ্রান্ত। এই হতাশা ও বিভ্রান্তির অনিবার্য ফলশ্রুতি হ'ল তার নৈতিক মানের অধঃপতন এবং প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া। এই দুরূহ সমস্যার বদ্ধমূল সমাধান যদিও সম্ভব নয় তবু যুবকল্যাণ বিভাগ তার সীমিত সংগতির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টারই একটি অঙ্গ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প। এই অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণ লগ্নীসংস্থা শতকরা ৯০ ভাগ অর্থ সাধারণতঃ ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকেন এবং এই বিভাগ থেকে প্রান্তিক ঋণ হিসাবে বাকী ১০ ভাগ মঞ্জুর করা হয়। যে সমস্ত প্রকল্প অতিরিক্ত কর্মসংস্থার খাতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে, ছাগল ও শূকর পালন, সার/ মণিহারী/বই/ তৈরী পোষাক ইত্যাদির দোকান স্থাপন, মোমবাতি/ছাতা/ টালি/খেলাধূলোর সাজসরঞ্জাম/পুতুল/সাবান ইত্যাদি তৈরীর কারখানা স্থাপন এবং কিছু ক্ষেত্রে পরিবহণ প্রকল্পে প্রান্তিক ঋণ দেওয়া হ'য়েছে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে বিগত তিন বছরের কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান দেওয়া হ'ল—

(১) যুবকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত প্রান্তিক ঋণের পরিমাণ— ৩০,৯৪,২৬০,০০

(২) প্রকল্প সমূহে নিয়োজিত মোট অর্থের পরিমাণ— ৩,০৯,৪২,৬০০,০০

(৩) এই সব প্রকল্পে মোট নিযুক্তির সংখ্যা—২৪০০ জনেরও বেশী

পর্বতাভিযান, পর্বতারোহণ শিক্ষণ, ট্রেকিং ও স্কীয়িং

যুবসমাজকে দুঃসাহসিক কাজে অনুপ্রাণিত করা, তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় গড়ে তোলা এবং পরিবেশের প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করবার মত মানসিকতা সৃষ্টি করার কাজে যুবকল্যাণ বিভাগের যেসব কর্মসূচী নেওয়া হ'য়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল পর্বতাভিযান ও ট্রেকিং অভিযান পরিচালনায় অর্থ সাহায্য দেওয়া এবং পর্বতারোহণ ও স্কীয়িং এ প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া। পর্বতাভিযানে এ রাজ্যের পর্বতারোহীদের সাহায্য করার জন্য চলতি আর্থিক বছর থেকে এই বিভাগ একটি সরঞ্জাম ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে এবং এ বিষয়ে পর্বতারোহীদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি পুস্তকাগার স্থাপনের কাজও সমাপ্তির পথে।

বিগত তিন বছরের পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল।

(ক) বিগত তিন বছরে পর্বতাভিযান পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পর্বতারোহী সংস্থাকে মোট ২,২২,০০০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হ'য়েছে।

(খ) ঐ সময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'য়েছে—
(১) পর্বতারোহণের জন্য—৪৬ জনকে।
স্কীয়িং-এর জন্য—১৪ জনকে।

(গ) সরঞ্জাম ভাণ্ডার ও পাঠাগারের জন্য নির্দিষ্ট মানের সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ - মহাশয়কে ২,৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে। কিছু সরঞ্জাম কেনা হ'য়েছে এবং তার বিতরণের কাজও শুরু হ'য়েছে।

স্কাউটিং, গাইডিং, ব্রতচারী ও মণিমেলা

শিশু ও কিশোর কিশোরীদের চরিত্র গঠন, শরীর গঠন, নয়মানুবর্তীতা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এই বিভাগ থেকে ভারত স্কাউট এবং গাইড, ব্রতচারী মণিমেলা ইত্যাদি সংস্থাকে প্রতি বছর দেড় লক্ষ টাকারও অধিক অনুদান দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের কার্যক্রম

১৯৭৯ সালটি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত ছিল—ঐ বছরটি যথোপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে এই বিভাগ পালন করেছে। ঐ বছর অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা আমাদের অধীন তিনটি শ্রীঅরবিন্দ বালকেন্দ্রের মাধ্যমে কলকাতার বস্তি এলাকার শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক ও প্রমোদানুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।

অসম-সাহসিকতার জন্য উৎসাহদান প্রকল্প

মহৎ উদ্দেশ্যে সাহসিকতার জন্য যুবক-যুবতীদের উৎসাহিত করার জন্য এই বিভাগ এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ বাবদ বর্তমান আর্থিক বছরে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবকল্যাণ বিভাগের কার্যক্রম

যুবকল্যাণ বিভাগের বিজ্ঞান কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য করে তুলে ধরা। বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারেই নিবদ্ধ নয় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গেও যে বিজ্ঞান অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটানো আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। বিজ্ঞান মনকে যুক্তিবাদী করে কুসংস্কার দূর করে আত্মপ্রত্যয় গড়ে তোলে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বস্তুবানুগ মূল্যায়ণে পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বিজ্ঞানের এইসব মূল্যবান বার্তাকে গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে দেবার কাজে আমরা ব্রতী।

বিগত তিন বছরে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা নিম্নোক্ত কর্মসূচীগুলো গ্রহণ করেছি—

বিজ্ঞান ক্লাব গঠন ও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ক্লাব সমূহকে সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনকে সংগঠিত করে একে সুসংহত ও গতিশীল করে তুলতে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিপূরক কারিগরি সাহায্য আমরা পাচ্ছি ভারত সরকারের বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার কাছ থেকে। গত আর্থিক বছরে ৪৭টি বিজ্ঞান ক্লাবকে মোট ২৩,৫০০ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার সহযোগিতায় এই বিভাগ প্রতিবৎসর নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও বিজ্ঞানমেলা ও শিবির পরিচালনা করে আসছে।

বিজ্ঞান আলোচনাচক্র :—এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্র চারটি স্তরে অনুষ্ঠিত হয়—(১) ব্লকস্তর, (২) জেলাস্তর (৩) রাজ্যস্তর এবং (৪) আন্তরাজ্যস্তর। এই প্রতিযোগিতায় উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করতে পারে। বিগত তিন বছরে এই প্রতিযোগিতায় ৪০০০ হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। প্রতি স্তরের প্রতিযোগিতায় আকর্ষণীয় পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জেলা বিজ্ঞান মেলা ও পূর্বভারতীয় (আন্তঃরাজ্য) বিজ্ঞান শিবির—

এই প্রকল্পে ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের তৈরী মডেল ইত্যাদির প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়—(১) জেলা পর্যায় ও (২) আন্তঃরাজ্য পর্যায়। এই প্রতিযোগিতায় বিগত তিন বছরে ২৮০০ জন অংশ গ্রহণ করেছে এবং কৃতি অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়েছে।

জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন—

গ্রামীণ এলাকায় বিজ্ঞান গবেষণা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের উন্নতিকরণ, বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন, বেকার যুবকদের স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদান, স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ইত্যাদির জন্য পুরুলিয়ায় একটি জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি ভারত সরকারের বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা ও যুবকল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে রূপায়ণ করা হবে। যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে এ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে; এর মধ্যে ২ লক্ষ টাকা ইতিপূর্বেই এই বিভাগ থেকে গত আর্থিক বছরে মঞ্জুর করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প সমূহ

বিদ্যালয় সমবায়—

সম্বলহীন দুঃস্থ পল্লীবাংলার ছাত্রছাত্রীদের নায্যমূল্যে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ সমূহ সরবরাহের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে বিদ্যালয়-সমবায় স্থাপনে আর্থিক সাহায্য অনুমোদন করা হয়। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে ১৭৯টি বিদ্যালয় সমবায় স্থাপন করা হয়েছে এবং এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে ৬২,০০০ এর অধিক ছাত্রছাত্রী।

পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার—

ব্লক এলাকার দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্য প্রতি ব্লকে পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার স্থাপনের এক প্রকল্প এই বিভাগ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোট ৬২,৪৩৬ জন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান—

মাধ্যমিক ও উচ্চতর বিদ্যায়তন সমূহের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান এই বিভাগের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। প্রতি আর্থিক বছরের শুরুতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ বিদ্যায়তন সমূহ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। যাতায়াতের রেলভাড়া ও অংশগ্রহণকারী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের খাইখরচা বাবদ অনুদান এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। বিগত তিন বছরে এ বাবদ ৮১০টি বিদ্যায়তনকে মোট ১৫,৫৭,১০০ টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে। উপকৃত

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫,৮৫০ জন। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ২৪০০ জন।

বিভাগীয় পত্রিকা 'যুবমানস' প্রকাশন

বর্তমান সরকার কার্যভার গ্রহণ করার পর এই পত্রিকাটিকে ত্রৈমাসিক স্তর থেকে মাসিক আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর প্রচার সংখ্যা ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার করা হয়েছে। যুব জীবনের নানাবিধ সমস্যার সঠিক প্রতিফলনে, যুব জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশনে, দেশ ও বিদেশের তথ্য ও সংবাদাদির প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনে, যুব সমাজকে একটি সুস্থ ও গতিশীল সাংস্কৃতিক পথনির্দেশনায় এবং তাঁদের সাহিত্যচেতনাকে প্রগতিবাদী করার উদ্দেশ্য নিয়েই 'যুবমানস' প্রকাশনা করা হচ্ছে। এই পত্রিকাটি যুব সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে ইতিমধ্যেই সক্ষম হয়েছে।

যুবকল্যাণ কার্যক্রম আরও ব্যাপকভাবে রূপায়ণে অধিক সংখ্যায় যুব অফিস স্থাপন

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার সময় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র ৪০টি ব্লক যুব অফিস খোলা হয়েছিলো। যুব সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম যাতে আরও প্রসারিত করা যায় এবং যাতে অবহেলিত যুব সম্প্রদায়ের আরও কাছাকাছি পৌঁছতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বিগত তিন বছরে নতুন ২৮৭টি ব্লক যুব অফিস খোলা হয়েছে। আজ পশ্চিমবাংলায় ব্লক যুব অফিসের সংখ্যা ৩২৭। এতাবৎকাল কেন্দ্রীয় সরকারের জেলাস্তরের যুবকেন্দ্র সমূহ এই বিভাগের জেলা অফিসের দায়িত্বপালন করে আসছিলেন। কিন্তু আমাদের ক্রমবর্ধমান কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের জন্য এবং প্রশাসনিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রতিটি জেলায় জেলা পর্যায়ের যুব অফিস খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় কর্মীনিয়োগের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। অনতিবিলম্বেই এই জেলা যুব অফিসগুলি দায়ীত্বভার গ্রহণে সক্ষম হবে।

বয়স্কশিক্ষা কর্মসূচী

রাজ্যের বয়স্ক-নিরক্ষর মানুষকে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা ও তৎসহ বিধিমুক্ত শিক্ষাদানের জন্য এই বিভাগ একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে কলকাতার বস্তী এলাকা ও হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগনা জেলার শিল্পাঞ্চলে ৩০০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এ বাবদ বর্তমান আর্থিক বছরে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

যুব আবাস প্রকল্প

গণ্ডীবদ্ধ জীবনের কূপমণ্ডুকতা যুব জীবনের এক অভিশাপ। বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে, তাদের দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে, সুখ-দুঃখ-আশানিরাশার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে জীবনের অভিজ্ঞতাকে পূর্ণতা দান যুব সমাজের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু শুধুমাত্র ইচ্ছার অভাবের জন্যই নয় আর্থিক অনটনই যুব সমাজের এক গরিষ্ঠ অংশকে ভ্রমণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখে। যুব সম্প্রদায়ের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে সস্তায় স্বল্পকালীন বাসের জন্য রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে যুব আবাস স্থাপনের কর্মসূচীকে আরও সম্প্রসারিত করার কাজে যুবকল্যাণ বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজ্যের বাইরে রাজগীরে যুব-আবাস এর জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। পুরীতে একটি যুব-আবাস স্থাপনের একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও রাজ্যের বাইরে আরো যুব-আবাস স্থাপনের বিষয়টি সক্রিয়-ভাবে বিভাগের বিবেচনাধীন আছে।

রাজ্যের ভিতর শিলিগুড়িতে একটি ২০ আসনবিশিষ্ট যুব-আবাস সম্প্রতি স্থাপন করা হয়েছে। দীঘাতে, লালবাগে যুব-আবাস তৈরীর কাজ নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী চলছে। আশাকরা যাচ্ছে এই বছরের মধ্যেই নির্মাণের কাজ শেষ হবে।

শুশুনিয়া এবং বেলপুর যুব-আবাস স্থাপনের প্রাথমিক কাজ পূর্তবিভাগ শেষ করেছেন এবং নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

রাজ্য যুবকেন্দ্র

কলকাতার মৌলালীতে রাজ্য যুবকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যুবসম্প্রদায়ের জন্য একটি বহু উদ্দেশ্যসাধক প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে। ঐ প্রকল্প বাবদ রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকার উপরে।

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রাজ্য যুবকেন্দ্রে থাকবে একটি প্রেক্ষাগৃহ, লাইব্রেরী, জিমনাসিয়াম, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক যুব-আবাস, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই বহুতল বিশিষ্ট কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ এই বছরের মধ্যেই শেষ হবে।

কমিউনিটি হল ও মুক্তাঙ্গণ মঞ্চ স্থাপন

গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যুবকল্যাণ বিভাগ থেকে (ক) কমিউনিটি হল ও (খ) মুক্তাঙ্গণ মঞ্চ স্থাপনের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প দুটির খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী অনুদান হিসাবে দেওয়া হয় এবং বাকী ৫০ ভাগ খরচের দায়ীত্ব স্থানীয় উপকৃত জনসাধারণের। প্রতিটি কমিউনিটি হলের জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ১২,৫০০ এবং মুক্তাঙ্গণ মঞ্চের ক্ষেত্রে এই সাহায্যের পরিমাণ ৭০০০। জেলা পরিষদের মাধ্যমে এই প্রকল্প দুটি রূপায়ণ করা হয়। এপর্যন্ত ১১৮টি কমিউনিটি হলের জন্য মোট ১৪,৭৫০০০ ও সম-সংখ্যক মুক্তাঙ্গণ মঞ্চের জন্য ৮,২৬,০০০ টাকা এই বিভাগ থেকে মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্রামীণ খেলাধুলার উন্নতিতে যুবকল্যাণ বিভাগের কর্মসূচী

গ্রামীণ এলাকায় খেলাধুলার সম্প্রসারণ ও উন্নতিসাধনে যুবকল্যাণ বিভাগ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল—

(১) খেলার মাঠ স্থাপন

খেলার মাঠের অপ্রতুলতা গ্রামীণ খেলাধুলার উন্নয়নের একটি অন্যতম অন্তরায়। এই অসুবিধা দূরীকরণে এই বিভাগ খেলার মাঠ স্থাপনের কাজে উদ্যোগী হয়েছে। এই প্রকল্পে খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। এই সাহায্যের পরিমাণ মাঠ পিছু ২৫০০০ টাকা। এই প্রকল্পটিরও রূপায়ণ স্থানীয় জেলাপরিষদের মাধ্যমেই

করা হয়। এই খাতে এ পর্যন্ত মোট ১৪৭টি খেলার মাঠের জন্য ৩৬,৭৫,০০০ টাকা বিভাগ থেকে বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

(২) ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহ দেবার জন্য প্রতি বছরই যুব উৎসবের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতা তিনটি স্তরে অনুষ্ঠিত হয়—(১) ব্লক স্তর (২) জেলা স্তর ও (৩) রাজ্য পর্যায়।

(৩) খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম সরবরাহ

খেলাধুলার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাব গ্রামীণ খেলাধুলার আর এক অন্তরায়। এই কথা মনে রেখে এই বিভাগ খেলাধুলার সরঞ্জাম বিলির কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্প বাবদ বিগত তিন বছরে এই বিভাগ ৫,৯০,০০০ টাকা ব্যয় করেছে। এর মাধ্যমে ত্রিশ হাজারের বেশী ছেলেমেয়ে উপকৃত হ'য়েছে।

(৪) গ্রামীণ খেলাধুলার উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ দান

অভিজ্ঞ এবং দক্ষ প্রশিক্ষকের দ্বারা গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মান উন্নয়নের জন্য এই বিভাগ একটি কর্মসূচী গ্রহণ ক'রেছে। চলতি আর্থিক বছরে এ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

(৫) জিমনাসিয়াম তৈরীর প্রকল্প

গ্রামীণ যুবসম্প্রদায়কে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর গঠনে শরীর চর্চার উপকারীতা সম্বন্ধে অবহিত ও উৎসাহিত করার জন্য প্রতিটি ব্লকে একটি করে জিমনাসিয়াম কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'য়েছে। এ প্রকল্পের জন্য এই আর্থিক বছরে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

(৬) ক্লাব সমূহকে সাহায্যদান প্রকল্প

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের ক্লাবগুলিকে খেলাধুলার উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের কাজে উৎসাহিত করার জন্য এই বিভাগ থেকে আর্থিক সাহায্যদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হ'য়েছে। এ বাবদ গত আর্থিক বছরে মোট ১১,৪০,০০০ টাকা ব্যয় করা হ'য়েছে। এই বরাদ্দের ২৩,৫০০ টাকা বিজ্ঞান ক্লাব সমূহকে দেওয়া হ'য়েছে।

ছাত্র নয় এমন যুবক-যুবতীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান

গত আর্থিক বছর থেকে অ-ছাত্র যুবক-যুবতীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অনুদান দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হ'য়েছে এবং এই খাতে ১,৯০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

যুব উৎসব

উৎসব গ্রামের মানুষের জীবনধারার একটি মূল স্রোত। তাই গ্রামবাংলার প্রতি প্রান্তে এত বেশী লোক-উৎসবের ছড়াছড়ি, সেখানে বারো মাসে তের পাবনের সমারোহ। উৎসবের এই আবেদনকে সামনে রেখেই যুবকল্যাণ বিভাগ প্রতিবছর ব্লক, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ের যুব উৎসবের আয়োজন নিয়মিতভাবে করে আসছে। এই উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধুলা, বিতর্ক, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা হয় এবং গ্রামের আপামর জনসাধারণ বিশেষতঃ অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিচিতি ঘটানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করাও এইসব উৎসবের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

বহুমুখী জেলা যুবকেন্দ্র প্রকল্প

যুবক-যুবতীদের বেকারী নিরসনে সাহায্যদান, খেলাধুলায় উৎসাহ সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক পুনরোজ্জীবনে অনুপ্রাণিত করা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করার জন্য প্রতি জেলায় একটি করে জেলা যুবকেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হ'য়েছে এবং এ বাবদ চলতি আর্থিক বছরে ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হ'য়েছে।

বহুমুখী ব্লক যুব তথ্য ও কল্যাণ কেন্দ্র

বহুমুখী জেলা কেন্দ্রের অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রতিটি ব্লকে একটি করে ব্লক তথ্য ও কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হ'য়েছে।

[শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি বছর: ৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ব্যবস্থা নৈরাজ্যের শিকার হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের কাছে সবথেকে বড় বিষয় ছিল এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এটা একটা আদর্শগত সংগ্রাম। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব মহলের সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গণটোকাটুকির কথা। এই রোগে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত। এখন এর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট অংশের মানুষের সহযোগিতা ও উদ্যোগ দরকার। এ কথা বলা যেতে পারে এই লড়াইতে সুস্থ বুদ্ধির জয় হয়েছে। এরই সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ব্যাপক ও সর্বব্যাপী দুর্নীতি এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলি (যেমন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিন্ডিকেট, ইত্যাদি) এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এসব সংস্থাকে ভেঙে দিয়ে কাউন্সিল তৈরী করেন এবং নূতন আইন তৈরীর কাজে হাত দেন। এই আইনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা থাকতে পারবেন, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের আরও গণতন্ত্রীকরণ হবে। এসব কিছুই উচ্চশিক্ষাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি বাম সরকার একটি নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। এই নীতি হল—শিক্ষা-প্রসারের পক্ষে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে। একটি গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি গরীব মানুষ সমাজের মালিক না হন, বামফ্রন্ট সরকার সমাজকাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন করতে পারবেন না, তার জন্য সমাজবিপ্লবের প্রয়োজন হবে। যতদিন না তা হচ্ছে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষার স্বার্থে কাজ করছেন। এরজন্য চাই রাজ্যের হাতে আরও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাই শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করা, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের মত গণতান্ত্রিক দাবীগুলি নিয়ে বাম সরকার দাবী উত্থাপন করছেন। বাম সরকারের এই বক্তব্যের সাথে এ রাজ্যের এবং অন্যান্য রাজ্যের মানুষ কণ্ঠ মিলিয়েছেন।

সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদ

সুকুমার দাস

ভারতের স্বাধীনতার জন্মলগ্নে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এ দেশের মাটিতে দ্বিজাতি তত্ত্বকে কেন্দ্র করে যে সাংঘাতিক জাতিবৈরীতার বীজটিকে রোপণ করে গিয়েছিল তাই আজ মহীরূহ হয়ে দেশের মধ্যে নানা অশান্তি ও অনৈক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করে চলেছে। আজকের নানা বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদীর আন্দোলনের উৎস সেখানেই। নানা বিচিত্র দাবী নিয়ে বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আজ দেশের নানা প্রান্তে, নানা নামে নানা চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে দেশের সংহতি ও ঐক্যের সর্বনাশ ডেকে আনছে। ভারতের স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পরেও তাই আজও ওঠে দেশের অখণ্ডতার প্রশ্ন। স্বাভাবিকভাবে এ জিনিষ কল্পনাও করা যায় না। এই বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের আগুনে আজ দগ্ধ হতে চলেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং এর শিকার হয়ে চলেছে দেশের হাজার হাজার মানুষ। এমনটি চললে দেশ একদিন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে—বিপন্ন হবে দেশের স্বাধীনতা। এ প্রসঙ্গে দূরদর্শী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উচ্চারিত সেই সাবধান বাণী আজ আবার মনে পড়বে, যা' অক্ষরে অক্ষরে সত্য হ'তে চলেছে। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না করে, দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে আপোষের মাধ্যমে যদি দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়, তবে সে স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলে মনে করা ভুল হবে। কারণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় চতুর সাম্রাজ্যবাদ শক্তি দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করে জাতিবৈরীতার য বীজ দেশবাসীর মনে বপন করে যাবে তাতে একদিন "ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে।" দেশ স্বাধীন হবার পরে যা' হবার তাই হ'ল। বিদেশীর বদলে শাসন ক্ষমতা পেলো দেশী বুর্জোয়ার দল। এতে কোন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হল না। পরিবর্তন হলো শুধু শোষকের। এরাও একটানা দীর্ঘ ত্রিশ বছর দেশ শাসন করলো ইংরেজের মতোই 'বিভাজন ও শাসন' এ নীতিকে আশ্রয় করে। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি, সুখ সুবিধার দিকে বিন্দুমাত্র নজর এরা দেয়নি। এদের চরম ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তুললো। এ ক্ষিপ্ততার কারণ তাদের অন্তরের বহুদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনার বেদনা। সেই পুঞ্জীভূত বেদনাই আজ যে কোন উস্কানিতে মানুষকে ধাবিত করছে চরমপন্থার দিকে। আজ যে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করছে এর পেছনেও কারণ ঐ একই দীর্ঘ দিনের উপেক্ষা ও বঞ্চনা। আর আজকের এ আন্দোলন যে নামেই চলুক, যে দাবিকে সামনে নিয়েই হাজির হোক না কেন—আসলে এ বিভেদপন্থী আন্দোলন দেশের ঐক্য ও সংহতির সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু ডেকে আনছে না।

আজ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে অযৌক্তিক নানা দাবীকে সামনে রেখে আন্দোলনের নামে চলছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস। আসাম থেকে তা' মিজোরামে, মিজোরাম থেকে মণিপুরে, মণিপুর থেকে ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা থেকে পশ্চিমবাংলার উত্তর প্রান্তে এবং মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার বেশ কিছু অঞ্চলে। নাগাল্যান্ড তো স্বাধীনতার প্রাক্কাল থেকেই হয়ে আছে অগ্নিগর্ভ। শুধু উত্তর-পূর্ব ভারতেই নয় বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন আজ গ্রাস করতে চলেছে ভারতের আরও নানা প্রান্তকে। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়। ভারতের স্বাধীনতার আগে জিন্না সাহেব দেশ ভাগের সময় পাকিস্তান ছাড়া শিখদের দলে টানবার জন্য স্বাধীন "শিখিস্থান" গড়বার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু শিখদের অনীহার জন্য তাঁর সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু সেদিন যা হয়নি, পাঞ্জাবে আজ আবার সে দাবি উঠছে। তারা দাবি তুলছে ভারত থেকে পৃথক হয়ে একটি "স্বাধীন শিখ রাজ্য" প্রতিষ্ঠার। রাজধানীর অতি কাছে চলছে এর উদ্যোগ। অবশ্য ভারতে প্রথম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল নাগাল্যান্ডে। নাগাদের মধ্যে ছিল শ্রেণী বিভাগ। ছিল তীব্র গোষ্ঠী বিবাদ। একে যখন ভারতের অঙ্গরাজ্যরূপে গ্রহণ করা হয়, বিদেশী অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে তখনই ওখানে শুরু হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন। সেই ভয়াবহ আন্দোলনকে রুখতে ভারত সরকারকে শেষ পর্যন্ত সৈন্য বাহিনী পাঠাতে হয়। এর পরই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন দেখাদেয় মাদ্রাজে। এদের দাবি ছিল পৃথক "দ্রাবিড় ভূমির"। এ দাবি সেদিন মাদ্রাজের গণদাবিতে পরিণত হয়। এবং এ আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে হিন্দিভাষা ও হিন্দি এলাকার প্রভুত্বের অভিযোগ তুলে। এর ফলে মাদ্রাজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হয় হিন্দি ভাষাকে এবং রাজ্যের নাম বদলে রাখা হয় 'তামিলনাড়ু'। আসাম সরকারের চরম অবহেলায় মিজোরামেও শুরু হয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ফলে একদিন আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা গঠন করে পৃথক মিজোরাম রাজ্য। মিজোরামের পরই সে ঢেউ ধাক্কা দেয় মণিপুরে। মণিপুরের সেই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের স্রোত আজও চলছে এবং এর তীব্রতা ক্রমশই তীব্রতর হচ্ছে সীমান্তরাজ্য বার্মা থেকে অস্ত্রশস্ত্রের আমদানীতে।

সাম্প্রতিক কালে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসামরাজ্য এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের স্রষ্টা। এটা নতুন নয়, এ রাজ্যে এরকম আন্দোলনের জিগির তোলা হয়েছে বার বার। এ যেন কোন সুপ্ত আগ্নেয়গিরির কিছুদিনের বিরামের পর হঠাৎ অগ্নি উদ্গিরণ। যে কোন একটু উস্কানি, যে কোন রকম প্রাদেশিকতার সুরসুরি পেলেই সেখানে শুরু হয়ে যায় লুঠতরাজ, খুন, জখম। আর এ আন্দোলনের মূল শিকার হয়ে আসছিলো এতদিন শুধু সংখ্যালঘু বাঙ্গালীরা। এবারের আন্দোলন চলছে সেখানকার 'আসু' ও গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে। এবারের এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কিন্তু আর "বাঙ্গালী খেদাও" আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এবার এ আন্দোলন চলছে বিদেশী তাড়ানোর নামে। তার ফলে শুধু

বাঙালী, নেপালীরাই নয়, মার খাচ্ছে গোটা সংখ্যালঘু অ-অসমীয়ারা। তাদের অনেকেই এদের সহিংস এ আন্দোলনের বলি হয়েছে। হয়েছে হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা, এমনকি প্রদেশ ছাড়া। তারা আজ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ওরা আর আসামে ফিরে যেতে চাইছে না। ওদের আশংকা ওখানে ফিরে গেলে প্রাণে আর তারা বাঁচতে পারবে না, কারণ ঐ সব আন্দোলনকারীরা সংবিধান মানে না। বিদেশী বলে ওরা ভারতের নাগরিকদের যা' খুশী তাই করতে পারে। বিদেশী কারা তা' তারা নির্দ্ধারণ করবে নিজেদেরই ইচ্ছামত। ভারতের যে কোন প্রান্তের নাগরিকই যে ভারতের যে কোন প্রদেশে বসবাস ও জীবিকা অর্জনের অধিকারী—একথাটা ওরা মানতেই চাইছেনা, ওদের খেয়ালের শিকার হতে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই আন্দোলনের পেছনে মদত জোগাচ্ছে কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদ ও প্রতিক্রিয়াশীল ধনীর দল এবং কিছু বিদেশী শক্তি। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদেশী হঠানোর নামে এরা অর্থ ও প্ররোচনা দিয়ে এক শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের বিপথগামী করে তুলছে। এরা চাইছে এ আন্দোলনকে সামনে রেখে ওদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। অথচ আশ্চর্যের কথা কেন্দ্রীয় সরকার সব কিছু বুঝেও এ সমস্যা সমাধানের ফলপ্রসূ কোন ব্যবস্থা আজও গ্রহণ করতে পারছে না। কেন পারছে না? প্রশ্নটা সেখানেই।

অনুরূপভাবে সম্প্রতি ত্রিপুরাতে উপজাতি আন্দোলনের নাম করে উগ্র-উপজাতি দল মান্ডাই বাজারে অ-ত্রিপুরাবাসীদের উপর অতর্কিতে হানা দিয়ে যে নারকীয় গণহত্যা সংঘটিত করলো তাতেও বলি হলো প্রায় ছ' শোর মত মানুষ। বহু লোক আহত হলো। পুড়লো অনেক ঘরবাড়ী। ঘর ছাড়া হলো কয়েক হাজার মানুষ। এর পেছনেও আছে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমীস্বার্থবাদের এবং বিদেশী শক্তির মদত। এরা উপজাতি আন্দোলনের নাম করে দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টির এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিল অনেক আগেই। উপজাতি ও বাংলা ভাষাভাষীদের সংগ্রামী ঐক্য নষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য। ত্রিপুরাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে বেশী করে উৎসাহ জুগিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী, বিদেশী মিশনারী সংস্থা ও সি, আই, এ। এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় উগ্রপন্থী উপজাতি যুব-সমিতি বীভৎস হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে। এদের উস্কানিতেই উপজাতিদের একাংশ আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে উপজাতিরা সুদীর্ঘকাল সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এমন কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা পায়নি যার ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। উপজাতিরা আজও সমানভাবে অনগ্রসরই রয়ে গেছে। ত্রিপুরার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী সে বিষয়টি আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রথমত এই ধরনের সম্ভাব্য উপজাতি আক্রমণের আশংকায় ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রের কাছে একাধিকবার সৈন্য ইত্যাদির সাহায্য চেয়েছিল. কিন্তু কেন্দ্র এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছে। দ্বিতীয়ত এখনও ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ সেনা আছে তা পার্বত্য-উপজাতিদের আচমকা আক্রমণের মোকাবিলা করার পর ত্রিপুরার নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার সেটা পূরণ করতে গড়িমসী করছেন। অতএব এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ত্রিপুরাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আরও খেলতে চাইছে। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করাই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রের সব থেকে প্রধান উদ্দেশ্য হলো বামপন্থী আন্দোলনের ঘাটিগুলিকে ধ্বংস করা। সেটা দেখা যাচ্ছে আসামের বেলায়। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আজ ভারতের বাম আন্দোলনের কাছে অনেকটা শক্তিহীন, তাই তাকে আজ স্তব্ধ করতে আশ্রয় ও কৌশল নিয়েছে অন্য পথের। আসামে আসাম ছাত্র ইউনিয়ন বা গণসংগ্রাম পরিষদকে মদত এবং ত্রিপুরার উগ্র-উপজাতিদের মদত দেওয়া সেই ষড়যন্ত্রেরই একটা চাল। অর্থাৎ আসাম ও ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে আজ আক্রমণের ষড়যন্ত্র চলছে বামপন্থী আন্দোলনের উপর। আগামী দিনে তা আরও ভয়ংকর পথে যে মোড় নেবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আসামের ঘটনার সংগে ত্রিপুরার সামগ্রিক ঘটনাবলীর কিছু মূলগত পার্থক্য আছে। আসামে বিপন্ন হয়ে পড়েছে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের চাপে। আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আজ একাধিক কারণে নিজেদের আশংকায় ভরিয়ে তুলে সংখ্যালঘু অংশকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে দিতে সচেষ্ট। সেই প্রয়াস থেকেই রব উঠেছে প্রাদেশিকতাবাদের—স্বতন্ত্র আসাম দেশ গঠনের। অতএব আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সেখানে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আন্দোলন গড়ে তোলার, দাবী আদায়ের, নিজেদের সুখ সুবিধাকে প্রতিষ্ঠা করার। অপর দিকে ত্রিপুরার ঘটনাবলী সম্পূর্ণ আলাদা। ত্রিপুরায় আক্রমণের সূচনা করেছে উপজাতিরা—যারা ত্রিপুরায় সংখ্যালঘু অংশ। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পুরোধাও তারা। সাম্প্রতিক গণহত্যার নায়কও তারাই। আসামে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতির জন্য যে আশংকায় শংকিত সংখ্যাগুরু অংশ, ত্রিপুরায় সেই আশংকায় শংকিত সংখ্যালঘু অংশ, সংখ্যাগুরুদের ভয়ে। দুটি স্রোতই কিন্তু একই জায়গায় মিশতে চলেছে। দুটি স্রোতের মূল লক্ষ্যও এক।

উপজাতিরা দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়েই রয়েছে। অনগ্রসর অংশ হিসাবেই তারা চিহ্নিত। ব্রিটিশ সব সময়েই উপজাতিদের সংগে অ-উপজাতিদের একটা বিরোধের সূত্রকে জীইয়ে এসেছে। গত তিরিশ বছরে তৎকালীন সরকার সমূহের অপদার্থতায় সে সূত্র আরও বড় আকার নিয়েছে। এটা পরিষ্কার যে, তিরিশ বছর আগে উপজাতি সম্প্রদায়ের যে অর্থনৈতিক মান ও ভিত্তি ছিল, আজ সেই মান এক থেকে দেড় শতাংশের বেশী বাড়েনি। এই বৈষম্যের ছবি দীর্ঘকাল মনে গাঁথতে গাঁথতে আজ তা' পরিণত হয়েছে ব্যাপক হিংসা ও দ্বেষে। আর এই প্রবল বিতৃষ্ণাকেই কাজে লাগিয়েছে চতুর রাজনীতিবিদেরা এবং অদৃশ্য বিদেশী হাত। এরাই মদত জুগিয়েছে হিংসার। সে হিংসা ছিন্ন করেছে আজ ত্রিপুরাবাসীদের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতিকে।

আসাম ও ত্রিপুরার অশান্ত ঢেউ আজ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তে এসে আঘাত করেছে। উত্তর বাংলার কোন কোন অঞ্চলে রাজবংশী ও অনগ্রসর তপশীল জাতি ও উপজাতির জনসাধারণের মধ্যে "উত্তর খন্ড" আন্দোলনের নামে এক প্রচার কার্য চলছে। সংখ্যায় এরা স্বল্প হলেও একে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। এখানেও সেই একই কারণে অর্থাৎ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর লোক এই দাবী তুলছে যে, উত্তর বাংলার জমিজমা বন্টনের

ব্যাপারে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ দাবী অনেক ক্ষেত্রে অযৌক্তিক বা অন্যায় বলা যাবে না। কিন্তু এ আন্দোলনের যেমন ভাবে এ'রা প্রসার ঘটাতে চাইছেন সেটাই বিপদের। এ আন্দোলনের নেতারা এমন প্রচার-কার্য চালাচ্ছেন যা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে উদ্বাস্তু বাঙ্গালীরাই বুঝি ওদের সব দুঃখের কারণ। ওরাই নাকি ওদের অন্নে বাইরে থেকে এসে ভাগ বসাতে চাইছে। অর্থাৎ ওরা নাকি বহিরাগত। আসামে 'বঙ্গাল খেদাও' আন্দোলন এবং ত্রিপুরায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এই আন্দোলনকে নিতান্ত নিরীহ বলে ভাবার কোন অবকাশ থাকে না। কারণ এ আন্দোলনের দাবী যা'ই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনে পরিণত হবে। ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতির মত উত্তরখণ্ডের আন্দোলনকারীরাও যে একদিন 'ভাটিয়া' তাড়াও বলে হুংকার ছাড়বে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর এর মূল রয়েছে কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্তির সময় থেকেই। ঐ সময়ে রাজবংশীদেরই একটা অংশ চেয়েছিল কোচবিহারকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করতে। ঐ দাবীদার ছিল সেখানকার সম্পন্ন লোকেরাই এবং জোতদারেরা। তারাই সেদিন সরল সাধারণ মানুষকে নানা প্রলোভনের সুরসুরির সাহায্যে বিভ্রান্ত করে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল। উত্তর বাংলার উন্নয়নের দাবী অবশ্যই ন্যায্য। দীর্ঘদিন উত্তর বাংলাকে নানা দিক দিয়ে উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু একটা অঞ্চলের অনগ্রসরতার সমস্যা সমাধানের পথ নিশ্চয়ই এ ধরনের বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন নয়। দেশভাগের ফলে বাংলা-ভাষী অঞ্চলের অধিকাংশই ভারত থেকে আলাদা হয়ে যায়। সঙ্কুচিত পশ্চিমবঙ্গকে যে সংকটের মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করতে হয়েছে, তা ভুললে চলবে না। উত্তর বাংলার উন্নয়ন গোটা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নেরই সঙ্গে যুক্ত। তাকে আলাদা বলে দেখা ঠিক হবে না। তবে ওদের প্রচারে কিছু কিছু ভুল রয়েছে। যে সংখ্যা ও তথ্য দিয়ে সকলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রচার চাই। এটা অনস্বীকার্য যে বামফ্রণ্ট সরকার রাজবংশী ও তপশীলদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু কিছু চেষ্টা ইতিমধ্যে করেছেন। জমি বণ্টনের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পেয়েছে ওখানকার তপশীল সম্প্রদায়ই। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে উত্তরখণ্ড আন্দোলনও ভ্রান্ত পথে চালিত হতে পারে। তার জন্যই পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ ও সরকারকে এ সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। দেশের ঐক্য ও সংহতি বিরোধী এই ধরনের বিভেদপন্থী আন্দোলন কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলির উচিত এখনই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং এ বিভেদের বীজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে ফেলা। এ আন্দোলন জোরদার করতে কোন রাজনৈতিক দলই যেন এগিয়ে যেতে সাহস না করে এর জন্য বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দলের কর্মীদের উচিত সজাগ দৃষ্টি রাখা।

দৃষ্টি না রেখে উপায় নেই কারণ এর পেছনেও রয়েছে জঘন্য এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের হঠাৎ তীব্রতা অনুভব করা গিয়েছিল সেখানকার বিগত নির্বাচনে বামপন্থীদের সামান্য শক্তিবৃদ্ধিতেই। কায়েমী স্বার্থবাদীর দল এতেই বিচলিত বোধ করেছে। বাধ্য হয়েই বাম স্রোতকে রুখতে এরা বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনকে উস্কানি দিয়েছে। আবার ত্রিপুরায়ও যখন বামফ্রণ্ট সরকারের অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেল, তখনই সমস্ত কায়েমী স্বার্থ উপজাতি ও বাঙ্গালীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকারের সাফল্য, বিশেষকরে বর্গাদার, ক্ষেতমজুর প্রান্তিক চাষীদের অভূতপূর্ব জাগরণ ও তাদের অবস্থার উন্নতিতে দিশেহারা হয়ে কায়েমীস্বার্থ এখানেও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। উত্তরবঙ্গেও এরা তারই সুযোগ খুঁজছে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় কয়েক লক্ষ চা বাগান শ্রমিক আছে। তা' ছাড়া আছে বনাঞ্চলে সংগ্রামী বন-শ্রমিক, এরা প্রধানত আদিবাসী ও নেপালী। বাঁচার দাবীতে চা বাগানের শ্রমিক ও বন-শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমিক ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ওখানকার মালিকশ্রেণীর পক্ষে এ সম্ভাবনাকে মানা সম্ভব নয়। তাই তারা সুযোগ খুঁজছে এ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করার জন্য। এর পিছনে ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রমিক ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরানো। দৃষ্টি আরও দিতে হবে এই জন্য যে ঐ সব বিচ্ছিন্নতাবাদীর দল আরও বিচিত্র নানা দাবীকে ওদের আন্দোলনের সামনে রাখবার চেষ্টা করছে, যা' পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। উত্তরখণ্ডের আন্দোলনকারীদের কেউ কেউ কিছু দিন আগে 'কামতাপুর' রাজ্য গড়ারও স্বপ্ন দেখেছে। এদের অনেকেরই আজও দৃঢ়বিশ্বাস কোচবিহারের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত নয়। একে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই শুধু নয়, ভারত থেকেও বিচ্ছিন্ন করতে হবে। আবার কেউ কেউ নেপালী বাঙ্গালী বিরোধ বাঁধিয়ে দার্জিলিং জেলাকেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক, এমনকি পারলে ভারত থেকেও পৃথক করার কথা বলছে। এক সময় এখান থেকেই উঠেছিল, নেপাল, দার্জিলিং জেলা ও সিকিমকে নিয়ে এক 'মহানেপাল' গড়ার বিচিত্র শ্লোগান।

এদিকে আবার ঝাড়গ্রামকে কেন্দ্র করে বীনপুর গোপী-বল্লভপুর দহিজুড়ী ইত্যাদি আদিবাসী মাহাতো ও সাঁওতালরা আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি নামক এক প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংহত হওয়ার চেষ্টা করছে। তারা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও সাঁওতাল পরগনা ও ময়ুরভঞ্জ সংলগ্ন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি একত্র করে ঝাড়খণ্ড নামে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি রাজ্য গঠনের আন্দোলনে ব্রতী হয়েছেন। এ ঘটনাও উপেক্ষার নয়। কারণ এর পেছনেও আছে বহুদিনের পুঞ্জীভূত দুঃখ, বেদনার ও অবহেলার ইতিহাস। এখানেও আদিবাসীদের একটা বড় অংশ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর। আশে-পাশের বহু পরিবর্তন ও উন্নয়নের চেহারায় তারাও আজ ক্ষিপ্ত। সেই ক্ষোভই হয়তো এ বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের রূপকার। তিন দশকের বেশী শাসন কর্তৃত্ব হাতে পেয়েও শাসকবর্গ ওদের জন্য কিছু করার চেষ্টাই করেননি কেন—সে প্রশ্নই আজ তারা করছে। ক্ষোভের তাড়নায় জাগৃতির আন্দোলনকে অস্বাভাবিক ভাবা যায় না, আন্দোলন করবার অধিকার তাদের আছে কিন্তু সে পথ কোনমতেই আত্মস্বাতন্ত্রের পথ হওয়া উচিত নয়। যে কোন আত্মস্বাতন্ত্রের আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার আন্দোলনের দিকে যায়। এখানেও দেখতে হবে পেছন থেকে সুতো টানছে কারা? বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদেশী কুচক্রীরা এদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে এবং করেছে বলেই

[শেষাংশ ২৭ পৃষ্ঠায়]

মস্কো অলিম্পিক : মানুষের অলিম্পিক

সৌমিত্র লাহিড়ী

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট রাশিয়া। সেই সোভিয়েট রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় এবার ২২তম অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য শুধু প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে নয়, এই প্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাধীন দেশে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় সারা বিশ্বের ক্রীড়ামোদি জনগণ অসীম কৌতূহলে বর্তমান অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিকে তাকিয়ে আছেন।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি চার বছর অন্তর। ২১-তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে মন্ট্রিলে, এবার বাইশ-তম প্রতিযোগিতা। স্বভাবতই কৌতূহল জাগে, প্রথম অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? প্রথম অলিম্পিক গত শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৯৬ সালে গ্রীস দেশের এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জনক ব্যারন পিয়ের ডি কাউবারটিন (Baron Pierre de Coubertin) উদ্যোগী হয়ে এই প্রতিযোগিতা পুনরায় শুরু করেন। জন্ম হয় আধুনিক অলিম্পিকের।

'আধুনিক' এবং 'পুনরায়' শব্দদুটি চলে এলো। অতএব একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যার সূত্র নিহিত রয়েছে অলিম্পিকের ইতিহাসের পাতায়। বিস্তারিত ইতিহাস উল্লেখ না করে তারও একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ নেওয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে অলিম্পিয়া মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ভূকম্পনে ভূগর্ভে অন্তলীন হয়ে যায় এবং এর কিছুদিন পরেই আসে আলফিউস নদীতে প্রবল বন্যা। প্রলয়ঙ্করী ভূকম্পন এবং বিধ্বংসী বন্যার করাল গ্রাসে অলিম্পিয়ার উপত্যকা ডুবে যায়। অলিম্পিকের সুমহান ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্রীড়াঙ্গণ অতীতের স্মৃতির মতন হারিয়ে যায়, জমে ওঠে পলি আর অরন্যাবৃত সবুজ ভূমির ওপর বিশাল বিশাল গাছপালা। দেখে বোঝাই যায় না এখানে কখনও কোনদিন কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিকরা অতীতের স্মৃতি খুঁড়ে প্রাচীন অলিম্পিক প্রান্তর আবিষ্কার করেছেন প্রায় এক শতাব্দী আগে (১৮৭৬-১৮৮১)।

প্রাচীন অলিম্পিক কত প্রচীন সে বিষয়ে নানা রকম মতভেদ আছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি অবশ্য সর্বসম্মত একটা ইতিহাস তৈরী করেছেন।

প্রাচীন গ্রীস দেশের গাথা ও চারনদের গানের মধ্যে অলিম্পিক ক্রীড়ার টুকরো টুকরো ছবি পাওয়া যায়। হোমারের লেখতেও অলিম্পিকের ছায়াপাত ঘটেছে। আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব এক হাজার বছর আগে প্রাচীন অলিম্পিক শুরু হয়, কিন্তু ৮৮৪ খৃঃ পূঃ আগেকার ধারাবাহিক স্মৃতি কোথাও নেই বলে জানা যায় না অলিম্পিক সত্যিই কত প্রাচীন।

অলিম্পিয়া শব্দটি গ্রীক শব্দ অলিম্পিয়াস থেকে এসেছে। এই শব্দটির অর্থ দেবতাদের আবাসভূমি। মানুষ তার ইতিহাসকে যেমন বিভিন্ন শিল্পে সাহিত্যে গানে, সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল, সেই সূত্র ধরে ধরে, গ্রন্থনা করে করে যেমন আমরা আমাদের অতীতকে চিনেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই অলিম্পিকের সম্পর্কেও কিছু কিছু গল্প কথা, উপকথা প্রচলিত আছে, যার সূত্র ধরে ধরে, গ্রন্থনা করে করে, আমরা খুঁজে পাই অতীত, আমরা খুঁজে পেয়েছি তার ইতিহাস, তার সুমহান ঐতিহ্য, তার চির অম্লান বাণী 'আন্তর্জাতিক মৈত্রী, সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ব, সংহতির বিজয় গান'। মানুষের সুস্থ সুন্দর সবল সৌর্যবীর্যের প্রতীক অলিম্পিক।

ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার সময়ই দেখা যায় আর্য জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আর্য জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে খেলা ধুলার বিশেষ প্রচলন ছিল। বিবাহ, দেবপূজা, বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও মিলিত হয়ে আর্য যুবকরা শরীর চর্চা, অস্ত্রচালনা এবং অন্যান্য ক্রীড়ার নানা কায়দা কৌশল প্রদর্শন করতেন। ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভের পর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রমাণ খৃষ্ট পূর্ব দুহাজার বৎসর পূর্বে ক্রীটের মাইনোসের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা নানা ছবিতে রয়েছে।

গ্রীস দেশেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল খেলাধুলা। বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে এবং ছুটির দিনে গ্রীক জাতির মধ্যে মিলিত হয়ে ক্রীড়া চর্চার নজির খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষায় এই সব আনন্দ অনুষ্ঠানের নাম 'প্যানেগেরিশ'। হোমারের ইলিয়ডে (২৩ খণ্ডে) পেট্রোক্লিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে প্যানেগেরিশের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ১১০০ খৃঃ পূঃ অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় রথ চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারী প্রস্তর নিক্ষেপ, কুস্তি প্রভৃতি ছিল অন্যতম আকর্ষণ। ট্রোজান যুদ্ধখ্যাত আজাক্স ইউলিসিস এন্টিলোকাস প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেছিলেন ওডেসিতে রাজা আলমিন্যাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি প্যানেগেরিশে।

প্যানেগেরিশ ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ফলে তিন চারটি প্যানেগেরিশ নিয়ে একটি বৃহত্তর প্যানেগেরিশ সৃষ্টি হয়। আর এই প্যানেগেরিশে যোগদানের জন্য শরীর চর্চা ও ক্রীড়া গ্রীক জাতির অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। পিণ্ডার হেসিয়ড, হেরো ডোটাস পসেনিয়াস প্রভৃতি বহু বৃহত্তর প্যানেগেরিশের কথা জানা গেছে। তার মধ্যে ওলিম্পিয়ার জিউসদেবের মহা-পূজা উপলক্ষে ওলিম্পিয়ার উৎসব, এপোলোদেবের পাইথন হত্যার উপলক্ষে পাইথন উৎসব, হারকিউলিসের 'নেম্যান সিংহ' হত্যা উপলক্ষে নেম্যান উৎসব, হারকিউলিসের ক্রীটের উন্মত্ত বৃষ হত্যা উপলক্ষে ফোরিন্স যোজকে ইসমিয়ান উৎসব, হায়ানসিনথ্যাসের মৃত্যু উপলক্ষে হায়াসিনথ্যাস উৎসব, এথেন্সের থারপেলিয়া এথেনা দেবীর সম্মানে অনুষ্ঠিত প্যানথেসিয়া উৎসব, নবান্ন উপলক্ষে মেটাপটানিয়া উৎসব মাইফেলের প্যানয়াবোমিয়া উৎসব, ডেল্লসের এপোলোদেব উৎসব উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে এইসব উৎসব গ্রীক জাতির জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাস বলে স্থানীয় প্যানে-

গেরিশ থেকে জাতীয় হেলেনিক ন্যাশনাল গেমস সৃষ্টি হয়েছিল। হেলেনেসদের চারটি হেলেনিক জাতীয় ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। কালক্রমে অলিম্পিয়ার জিউসদেবের সম্মানে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য তিনটি বন্ধ হয়ে যায়। অলিম্পিক ক্রীড়াই ছিল প্রাচীনতম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

অলিম্পিক ক্রীড়া জন্মলগ্নের পর থেকে বার বার নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। যুদ্ধ মহামারী সংঘর্ষ রক্তপাত বার বার দেখা দিয়েছে, কিন্তু অলিম্পিকের আদর্শ কখনও ম্লান হতে পারে নি। যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা গেছে অলিম্পিক ক্রীড়া হচ্ছে। কিন্তু তারও সমাপ্তি ঘটে কালের অমোঘ নিয়মে। ১১৭২ বছর পর ২৯৭তম অলিম্পিয়াডের সাথে সাথে অলিম্পিকের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেন অলিম্পিকের' পরিসমাপ্তি ঘটেছিল তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৭৬ সালে ফরাসী জাতির যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ফরাসী জাতির জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। গোটা জাতি হতাশায় ডুবে যায়। তখন ফরাসী ধনকুবের পরিবারের সন্তান কিউবারটিনের বয়স মাত্র ১৪ বছর। তার জন্ম ১ জানুয়ারী ১৮৬২। বালক বয়সেই ধনিক পরিবারের সন্তান হলেও কিউবারটিন যুদ্ধের উন্মত্ত লালসা থেকে মুক্ত শান্তির পৃথিবীতে বাস করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন দেখার মুহূর্তেই জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিকরা অতীত দিনের অলিম্পিকের মহান বাণীর স্মারক চিহ্নগুলি মাটির গহ্বর থেকে সূর্যের আলোয় টেনে আনছিলেন। যুদ্ধ হাঙ্গামা বিধ্বস্ত ফরাসী জাতির মনে মানবীয় মূল্যবোধগুলিকে পুনঃস্থাপিত করতে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত করতে কিউবারটিন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুনরায় চালু করতে উদ্যোগী হন। কলেজে কলেজে ছাত্রদের জমায়েত করে, বক্তৃতা করে, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে তিনি সফল হলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী বন্ধ থাকার পর আধুনিক অলিম্পিক আবার আত্মপ্রকাশ করল ১৮৯৬ সালে। আধুনিক অলিম্পিকের জনক **কিউবারটিন** প্রথম অলিম্পিক প্যারীতে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু গ্রীস দেশের প্রবল ইচ্ছারও চাপ ও ঐক্যের খাতিরে তিনি অলিম্পিকের জন্মস্থান গ্রীস দেশেই অলিম্পিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে সম্মত হন।

প্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি হন গ্রীস দেশের **ডিমিট্রিয়াস ভাইকেলাস**। প্রথম অলিম্পিক কংগ্রেস থেকে নীতিগত সাতটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তগুলি হ'লো (১) **প্রাচীন অলিম্পিকের আদর্শে বর্তমান অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হলেও যুগের পরিবর্তনের সাথে একে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে।** (২) **আন্তর্জাতিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র অপেশাদার ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।** (৩) **আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার অধিকারী হবে।** (৪) **কোন রাষ্ট্র নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে অন্য কোন দেশের নাগরিকদের মনোনীত করতে পারবে না।** (৫) **অলিম্পিক প্রতিযোগিতার প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে।** (৬) **১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতা যথাক্রমে এথেন্স ও প্যারীতে অনুষ্ঠিত হবে এবং এরপর প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।** (৭) **বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র শক্তির সাহায্য ব্যতীত অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফল হতে পারে না।**

১৮৯৬ সালের প্রথম আধুনিক অলিম্পিকে দশটি দেশের মাত্র ৫৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। এথেন্স অলিম্পিকে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে ছিল আমেরিকা, গ্রীস, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী, চিলি ও সুইডেন।

মস্কো অলিম্পিক ২২তম অলিম্পিক হলেও আসলে ১৯ বার অলিম্পিকের আসর বসছে। ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য মোট তিনবার অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান হতে পারেনি।

এপর্যন্ত যেসব জায়গায় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে—(১) **এথেন্স** (১৮৯৬) (২) **প্যারী** (১৯০০) (৩) **সেন্ট লুইস** (১৯০৪) (৪) **লন্ডন** (১৯০৮) (৫) **স্টকহোম** (১৯১২) (৬) **বার্লিন** (শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি), ১৯১৬ (৭) **এনাইওয়ার্প** (১৯২০) (৮) **প্যারী** (১৯২৪) (৯) **আর্মস্টারডাম** (১৯২৮) (১০) **লস্ এঞ্জেলস্** (১৯৩২) (১১) **বার্লিন** (১৯৩৬) (১২) **লন্ডন** (১৯৪৮) (১৩) **হেলসিংকি** (১৯৫২) (১৪) **মেলবোর্ণ** (১৯৫৬) (১৫) **রোম** (১৯৬০) (১৬) **টোকিও** (১৯৬৪) (১৭) **মেক্সিকো** (১৯৬৮) (১৮) **মিউনিক** (১৯৭২) (১৯) **মন্ট্রিল** (১৯৭৬)।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থায়ী জায়গা গ্রীস দেশেই হোক এই দাবী গ্রীস দেশ উপস্থিত করেছিল; আমেরিকার সমর্থন ছিল এই দাবীর প্রতি। কিন্তু কিউবারটিন অলিম্পিক ক্রীড়ার আন্তর্জাতিক চরিত্র অব্যাহত রাখার জন্য অবিচল থাকলেন। দ্বিতীয় অলিম্পিক কংগ্রেস থেকে তিনি সভাপতি হন এবং প্যারীতে দ্বিতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় ১৯০০ সালে। রাশিয়া খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ না করলেও দ্বিতীয় অলিম্পিক কংগ্রেসে সরকারীভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল।

দ্বিতীয় অলিম্পিকে ১৫টি দেশ অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ১২১। ভারতের যোগদান এই অলিম্পিকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতীয় এ্যাথলেট ডব্লু. জি. পিটচার্ড বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তার প্রসঙ্গে আমাদের দেশে বিশেষ কিছু পাওয়া না গেলেও আলেকজান্ডার এস অয়ন্ডার লিখেছেন—"that in the 2nd Olympic held in 1900, an Indian athleth Mr. W. G. Pritchard secured the second position in 200 metres and 200 metres Hardle run, these securing 6 point for India in truck and field events" প্যারীতে পয়েন্ট গণনা হত কোন বিষয়ে প্রথম ৫ পয়েন্ট, দ্বিতীয় ৩ পয়েন্ট তৃতীয় ১ পয়েন্ট। এই হিসাব অনুসারে আমেরিকা ১৪০ পয়েন্ট, গ্রেট ব্রিটেন ৩১ পয়েন্ট, ফ্রান্স ২০ পয়েন্ট, ভারত ও হাঙ্গেরী ৬ পয়েন্ট পায়। প্রথম অলিম্পিকে গ্রীক মতে পয়েন্ট ছিল প্রথম ২ পয়েন্ট ও দ্বিতীয় ১ পয়েন্ট। এই হিসাবে আমেরিকা ২৩ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম ও গ্রীস ৫ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে।

অলিম্পিক ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংহতি ভ্রাতৃত্ববোধ

ও মানবীয় মূল্য বোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। অলিম্পিকের প্রধান শ্লোগান ছিল মানুষ অপরাজেয়, মানুষ সব কিছু জয় করতে পারে, অলিম্পিকের আদর্শ হলো—Fitius, Altius, Fortius. (তুরীয়ান, তুঙ্গীয়ান, বলীয়ান)।

অলিম্পিকের মহান আদর্শ পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন তোলে ফলে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে যোগদানকারী দেশের ও প্রতিযোগীর সংখ্যা এবং দর্শকের সংখ্যাও। পরপর বিভিন্ন দেশে অলিম্পিকের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে এইভাবে সংখ্যাগুলি বাড়তে থাকে—তৃতীয় অলিম্পিকে ৪৯৬ জন প্রতিযোগী ১১টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, চতুর্থ অলিম্পিকে ২০৫৯ জন (৩৬ জন মহিলা সহ) ২২টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, পঞ্চম অলিম্পিকে ২৮টি দেশের ২৫৪১ জন অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫৭ জন মহিলা ছিলেন। সপ্তম অলিম্পিকে ২৯টি দেশের ২৬০৬ জন প্রতিযোগী ছিলেন যার ৬৩ জন মহিলা। অষ্টম অলিম্পিকে দেশের সংখ্যা আরও বাড়ে। ৪৪টি দেশের ৩০৯২ জন প্রতিযোগী ছিলেন, যার ১৩৬ জন মহিলা। নবম অলিম্পিকে ৪৬টি দেশের ২৯০ জন মহিলা সহ ৩০১৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন। দশম অলিম্পিকে অবশ্য প্রতিযোগীর ও দেশের সংখ্যা কমে যায়। ৩৭টি দেশের ১৪০৮ জন প্রতিযোগী এই অলিম্পিকে যোগদান করেন যার মধ্যে ১২৭ জন ছিলেন মহিলা। একাদশ অলিম্পিকে ৪৯টি দেশের ৪০৬৯ জন প্রতিনিধি ছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন ৩২৮ জন মহিলা। দ্বাদশ অলিম্পিক জাপানের টোকিওতে প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যুদ্ধ অলিম্পিক আন্দোলনে আবার নখদন্ত বিস্তার করে। স্থান পরিবর্তন করে ফিনিসে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আই, ও, সি, করে, কিন্তু হিংসার উন্মত্ত লোলিহান শিখা সেখানেও থাবা উঁচিয়ে বলে—তফাৎ যাও। ফলে অলিম্পিক স্থগিত হয়ে যায়। ত্রয়োদশ অলিম্পিকও মহাযুদ্ধের ফলে লন্ডনে হতে পারেনি। চতুর্দশ অলিম্পিক আবার বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে লন্ডনে। যুদ্ধের রণদামামা থামার সঙ্গে সঙ্গেই এই খেলার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পর পর দুটি অলিম্পিক বাতিল হয়ে গেলেও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক অবিচ্ছেদ্য আন্দোলন বলে চিহ্নিত করার জন্য ক্রমিক হিসাবে লন্ডন অলিম্পিককে চতুর্দশ অলিম্পিক রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই অলিম্পিকে ৫৯টি দেশের ৪৪৬৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫৮ জনে।

পঞ্চদশ অলিম্পিক নানা দিক থেকে স্মরণীয়। ১৯৫২ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত এই অলিম্পিকেই সর্ব প্রথম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া যোগদান করে। শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ও ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

অলিম্পিকের মূল আদর্শ অংশ গ্রহণ, জয়লাভ বা পদক লাভ প্রধান লক্ষ্য নয়। কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অলিম্পিক গ্রামকে ক্রীড়া জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারগুলি উপস্থিত করার কেন্দ্র রূপে বিবেচনা করা হয়। অতীতের অলিম্পিকে অলিম্পিয়া গ্রামে মূল অনুষ্ঠানের এগার মাস আগে প্রতিযোগীরা হাজির হতেন। তাদের নিয়মিত অনুশীলন, শরীর চর্চা ও তালিমের ব্যবস্থা থাকত। কঠোর শৃংখলা ও অনুশীলনের এগার মাসের শিক্ষানবীশ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটত মূল ক্রীড়াঙ্গণে। এখনও অতীতের মত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্মত অলিম্পিক গ্রাম তৈরী করা হয়। সেখানে ক্রীড়া চর্চার পাশাপাশি মানসিক বিকাশের জন্য শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থাও থাকে।

অলিম্পিক আদর্শের কথা স্মরণে রেখেও বলা প্রয়োজন সোভিয়েট রাশিয়ার অংশ গ্রহণের ফলে অলিম্পিক ক্রীড়ার গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। পদক বিজয়ে আমেরিকার নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের রাশ টেনে ধরে খেলাধুলার জগতেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অপরূপ সাফল্য এই অলিম্পিকে চমক সৃষ্টি করে। পদক বিজয়ে অবশ্য সেবারও আমেরিকা শীর্ষে ছিল। আমেরিকা পায় ৪০টি স্বর্ণ, ১৮টি রৌপ্য এবং ১৭টি ব্রোনজ (বেসরকারী হিসাব মতে ৬১৫ পয়েন্ট)। আর সোভিয়েট রাশিয়া পায় ২২টি স্বর্ণ, ৩০টি রৌপ্য এবং ১৫টি ব্রোনজ (বেসরকারী হিসাব মতে ৫৪১ পয়েন্ট)। আর একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হাঙ্গেরী স্বর্ণ পায় ১৬, রৌপ্য ১০ এবং ব্রোনজ ১৫টি যার বেসরকারী পয়েন্ট ৩০৫। সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি ৫,০০০ মি, ১০,০০০ মিটার ও ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণ পদক লাভ করে মানব ইঞ্জিন নামে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়। মানব ইঞ্জিন এমিল জেটোপ্যাকের স্ত্রী ডানা জেটোপ্যাকও ১৬৫-৭ ফুট জেভিলিন নিক্ষেপ করে অতীতের সমস্ত বিশ্ব রেকর্ড ম্লান করে দেন।

পঞ্চদশ অলিম্পিকে যে চমক জাগানো আবির্ভাব সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ঘটিয়েছিল তা পরবর্তী কালেও অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববাসী আজ একথা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতি মানবজীবনের প্রাথমিক দৈনন্দিন চাহিদাগুলির সমস্যা মীমাংসায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ধনতান্ত্রিক বিশ্বকে শুধু টেক্কা দেয়নি, মানব জীবনের বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সমাজব্যবস্থা বিশল্যকরণীর মত কাজ করেছে। খেলাধুলায় অগ্রগতি একটি ধারাবাহিক পরিকল্পনা মাফিক ব্যবস্থার ফসল মাত্র, তাই মাত্র সাতটি অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে সোভিয়েট রাশিয়া এপর্যন্ত ৬৮৩টি পদক পেয়েছে (স্বর্ণ ২৫৮, রৌপ্য ২২১, ব্রোনজ ২০৪), আর আমেরিকা পেয়েছে ৬০৫টি পদক। প্রসঙ্গত আমরা ৬৬ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষের করুণ চেহারা স্মরণ না করে পারিনা। দুই সমাজব্যবস্থার মৌলিক তফাৎটি এক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে। লজ্জায় ঘৃণায় আমরা মুখ লুকাই যখন দেখি আমাদের প্রতিযোগীরা প্রায় শূন্য হাতেই ঘরে ফিরে আসছে।

২২তম অলিম্পিক ১৯ জুলাই শুরু এবং শেষ ৩ আগস্ট। গত এক শতাব্দীর আবহাওয়া কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে বলা হয়েছে, এই সময় মস্কোর আবহাওয়া থাকবে মনোরম, প্রতিযোগিতার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। বেশীর ভাগ খেলাই হবে মস্কোতে। শুধু ইয়টিঙ প্রতিযোগিতা হবে তাল্লিনে এবং বাছাই পর্যায়ের ফুটবল ম্যাচগুলি লেনিনগ্রাদে কিয়েভ ও মিনস্কে অনুষ্ঠিত হবে। আশা করা হচ্ছে ২১টি খেলার ২০৩টি প্রতিযোগিতায় ছয় হাজার ক্রীড়াবিদ অংশ গ্রহণ করবেন।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মস্কোয় যাতে অনুষ্ঠিত না হয় তার জন্য বিশ্ববাসীর পয়লা নম্বরের শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘকাল ধরে চক্রান্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে চূড়ান্ত ঘোষণার সাথে সাথে মস্কো প্রস্তুত হতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী শিবির চায় না যে, বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদরা মস্কোয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সীমাহীন সাফল্যগুলিকে স্বচক্ষে দেখতে পায়। এমনিতেই অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যেভাবে সাফল্য অর্জন করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে তারা যেভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় নিজেদের হাজির করেছে, তাতে সাম্রাজ্যবাদী শিবির আতঙ্কিত। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যে মিথ্যা প্রচার দীর্ঘকাল ধরে তারা করে এসেছে তার মুখোশ খশে পড়ছে, প্রচারের উলঙ্গ চেহারা আরও নির্মমভাবে ধরা পড়ে যাবে যদি বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদ ও দর্শকরা মস্কোর অলিম্পিকে যোগদেন। তাই তারা ছুতো খুঁজছিল। অবশেষে আফগান জনগণের আহ্বানে সোভিয়েট সৈন্য সে দেশে অনুপ্রবেশ করার ঘটনাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তুরুপের তাসের মত পেয়ে গেছে। এই তুরুপের তাস রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টায় তারা মরিয়া।

প্রেসিডেন্ট কার্টার একা নন। তার সঙ্গে আছেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফ্রেজার প্রমুখ পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রনায়করা। তারা মস্কো অলিম্পিক বয়কট করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালায়। নানা রকম অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, প্রতিযোগীদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিশ্বখ্যাত মুষ্ঠিযোদ্ধা মহম্মদ আলিকে দূত করে আফ্রিকার দেশে দেশে অভিযানে পাঠায়। কিন্তু তাতেও খুব বেশী সাড়া মেলেনি।

একজন ক্রীড়াবিদের জীবনে অলিম্পিকে যোগদানের সম্মান ও সুযোগ বার বার আসে না। অলিম্পিকে পদক জয়ের স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যারা প্রস্তুত হয়েছে তাদের কার্টার সাহেব ভয় ভীতি প্রলোভন দেখিয়েও অবদমিত করতে পারেনি, অনেক প্রতিযোগী যোগ দিচ্ছেন; এমনকি অনেক অলিম্পিক কমিটি দেশের শাসক বর্গের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শান্তি ও মৈত্রীর পতাকা অলিম্পিকের পতাকা তুলে নিয়েছেন।

৮৩টি দেশ এবার মস্কো অলিম্পিকে যোগদান করেছে। মস্কোয় ন্যাটো চুক্তি ভুক্ত অনেকগুলি দেশের উপস্থিতি এবং অস্ট্রেলিয়ার মত দেশের যোগদান কার্টারের মানবীয় অধিকার ও শান্তি ধ্বংস করার চক্রান্তকে চপেটাঘাত করবে। আঙ্গোলা, ভিয়েৎনাম, লাওস, বোস্টয়ানা, জিম্বাবেয়ে. সেচিলিজ প্রভৃতি দেশের প্রথম যোগদান অলিম্পিক আন্দোলনের অবিরাম সাফল্যেরই ইঙ্গিতবাহী। নারী পুরুষের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে এবার কোয়ায়েতের মহিলা ক্রীড়াবিদরা মস্কোয় আসছেন। কোয়ায়েতের ইতিহাসে এই রকম ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

আমেরিকার নির্লজ্জ ভূমিকার প্রতিবাদে সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনগণ সোচ্চার হয়েছেন, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি আইরিশ ভদ্রলোক লর্ড কিলানিন খেলাধুলাকে রাজনীতির সূক্ষ্ম জটিলতায় আবদ্ধ না রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। অলিম্পিকের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার আহ্বান জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের অলিম্পিক কমিটি, ক্রীড়াবিদ, এমনকি মার্কিন অলিম্পিক কমিটির সভাপতি রবার্ট কেন ও বয়কট সিদ্ধান্তকে তীব্র সমালোচনা করেছেন।

বয়কট আন্দোলনের তামাশা সত্ত্বেও মস্কো নিপুণভাবে প্রস্তুত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের আদর্শ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি মানুষ কর্মযজ্ঞে মেতে উঠেছেন। সামান্য কাজকেও অসামান্য গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সম্পাদন করা হচ্ছে। কোন কাজই গুরুত্বহীন নয়, কোন মানুষই অপ্রয়োজনীয় নন। মানুষের এই মর্যাদা ও সম্মান দেখে, কাজের এই অপূর্ব শৃংখলা দেখে, খেলাধুলার প্রতি এই মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা দেখে বিখ্যাত ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক মারচেল্লো মারচেলিনি বলেছেন—রোম অলিম্পিককে যদি সংগীতের অলিম্পিক বলা যায়, টোকিওকে বলা যায় কারিগরীবিদ্যার অলিম্পিক, মেক্সিকো সিটির অলিম্পিককে যদি গ্রাফিক শিল্পের অলিম্পিক বলা হয়, মিউনিখকে বলা হয় স্থাপত্যবিদ্যার অলিম্পিক এবং মন্ট্রিল অলিম্পিকের নাম দেওয়া যায় সংকটের অলিম্পিক, তাহলে মস্কো অলিম্পিককে বলতে হবে মানুষের অলিম্পিক।

বলাবাহুল্য মারচেল্লো মারচেলিনি ক্রীড়াবিদ বা ক্রীড়া সংগঠক নন। শান্তি-মৈত্রী-সংহতির মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত অলিম্পিক মানুষের ক্ষমতার সীমাহীনতার প্রতীক। সেই মানুষের বন্ধন মুক্ত করে দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। সোভিয়েট রাশিয়া তার প্রথম পার্থ। তাই আমরাও প্রতিধ্বনি তুলে বলতে চাই মস্কো অলিম্পিক মানুষের অলিম্পিক। এর সাফল্য অনিবার্য।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি ব্লক যুব উৎসবে জিমনাস্টিক প্রদর্শনী।

রোমানিয়ার কমিউনিষ্ট যুব সংস্থার একাদশ সম্মেলন

অমিতাভ বসু

"সমসাময়িক কালের প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে যুবশক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানবসমাজে নতুন নতুন পরিবর্তন বহন করে আনতে যুবসমাজই সবচেয়ে সজীব, উৎসাহী শক্তি......" যুবসমাজের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য উপস্থিত করেছেন রোমানিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি, নিকোলে চসেস্কি।

এই বক্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে সমাজবাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে বীর দর্পে এগিয়ে চলেছে রোমানিয়া। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছে রোমানিয়ার যুবসমাজ, জনগণ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে।

রোমানিয়ার যুবসমাজ, জনগণের অতীত ইতিহাস শোষণের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের ইতিহাস। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গর্ভেই ১৯২১ সালে রোমানিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে রোমানিয়ার যুব সংগঠনের ইতিহাস অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত। ১৯২২ সালে রোমানিয়ার সমাজবাদী যুবসংগঠনের জন্ম। বিশেষ করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সংগ্রামের ভূমিকায় এই যুব সংগঠন ভাস্বর হয়ে আছে। নিকোলে চসেস্কি ১৯৩৯-৪৪ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রোমানিয়ার যুব কমিউনিষ্ট সংঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সংগ্রামের সাফল্যে, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে রোমানিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম হয়। বিগত ৩৫ বৎসর ধরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎখাত করে, প্রধান প্রধান শিল্প, খনি, ব্যাংক, বীমা এবং পরিবহণ ব্যবস্থা জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে এই দেশের জনগণের সঙ্গে যুবশক্তি সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে অগ্রসর করে নিয়ে চলেছে। "এমন একটি দেশ যার চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কৃষি ভিত্তিক, যেখানে নিরক্ষর মানুষ ছিল ৪০ লক্ষ সেই রোমানিয়া রূপায়িত হয়েছে শিল্প ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকারী দেশে। ব্যাপক শিল্পায়ণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় খামার এবং কৃষি সমবায় আধুনিকীকরণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে......"

এই প্রথম ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ, রোমানিয়ার কমিউনিষ্ট যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে তাদের একাদশ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। ৫ই মে সকাল ৯টায় একাদশ সম্মেলনের উদ্বোধন হলো স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল হলে। হলটি অনেকটা আমাদের নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মত। ৮০০০ লোকের বসার উপযোগী আসন ব্যবস্থা এবং গ্যালারি সহ একটি খোলা মঞ্চ। সম্মেলন উদ্বোধন করলেন নিকোলে চসেস্কি—"কমিউনিষ্ট যুব সংগঠন, কমিউনিষ্ট ছাত্র সংগঠন, পাইওনিয়ার সংগঠন এবং শিশু সংগঠনের এই একাদশ সম্মেলন সমাজতান্ত্রিক রোমানিয়ার যুব ও শিশুদের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সম্মেলন কমিউনিষ্ট যুব তথা দেশের সমগ্র যুব সমাজের সামনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বহুমুখী বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে তুলে ধরবে।"

সম্মেলনের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় প্যালেস অফ রিপাবলিক-এ (প্রজাতন্ত্র প্রাসাদে)। এই প্রাসাদটি রোমানিয়ার রাজধানী, বুখারেস্ট শহরের কেন্দ্রে। এর একটু দূরেই কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর। আর এক পাশে কমিউনিষ্ট যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর। এগুলিও এক একটি প্রাসাদ-তুল্য। সম্মেলন ৭ই মে পর্যন্ত।

১৯৭৯ সালে কমিউনিষ্ট যুব সংঘের সদস্য সংগৃহীত হয় ৩২৫০,০০০ হাজার। কারখানা, খামার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং সামরিক কেন্দ্র ভিত্তিক কমিউনিস্ট যুব সংস্থার ইউনিটগুলি গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত ইউনিট থেকে নির্বাচিত ২৫০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। বিদেশী প্রতিনিধি ছিলেন ১৩০ জন। ২৫০০ প্রতিনিধির মধ্যে শ্রমিক ১২৮২, কৃষক ৩৫০, ইঞ্জিনিয়ার ১৭৫, শিক্ষক ৭৫, ৩৭৫ স্কুলের ছাত্র, ১০৬ জন কলেজের ছাত্র, ৫০ জন ডক্তার এবং অর্থনীতিবিদ, ৭৫ জন জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ১২ জন অফিস কর্মচারী। প্রতিনিধিদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা শতকরা ৪৬·৬।

কমিউনিষ্ট যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থাপিত এক দীর্ঘ প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ৬৩ জন। প্লেনারী অধিবেশনে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের পদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরনের। এই একই রিপোর্টের উপর সর্বোচ্চ সম্মেলনের পূর্বে বিকেন্দ্রীত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৪৬৩ জন। এদের আলোচনার মর্মবস্তু উপস্থিত করেন ঐ ৬৩ জন প্রতিনিধি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় হচ্ছে কত বেশি বেশি যুব সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সতেজ ও সজীব মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহণ করছেন। কিভাবে, কতটা যোগ্যতা অর্জন করছেন, কি লক্ষ্য ছিল, কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন, দুর্বলতা কোথায়, সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে তাকে অতিক্রম করার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখছিলেন তাদের মাতৃভাষায়—রোমানিয়া ভাষায়। কিন্তু একই সময় ছয়টি ভাষায় অনুদিত হয়ে হেডফোনের মাধ্যমে ভিনদেশীয় প্রতিনিধিদের শোনাবার ব্যবস্থা ছিল।

কমিউনিষ্ট যুব সংঘের সম্মেলন সমাজতান্ত্রিক রোমানিয়ার প্রতিটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সময় সীমা অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যুবদের বিগত-দিনের বিশাল এবং সুন্দর কাজগুলির সংগে ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের পরিচিতি ঘটানো। এই কর্মসূচী শুরু হয় ২রা মে থেকে।

মে দিবসের পোস্টার, ফেস্টুন, লাল পতাকায় মুখরিত বুখারেস্ট শহর। গোটা বুখারেস্ট শহরে রাস্তার দুধারে, মাঝখানে চেরি, স্ট্র বেরী, ঝাউ-এর বাগান। মাঝে মাঝে লাইলাক, তুলিফ এবং আরো নানা রং-এর ফুলের বাগান। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধব্ ধব্ করছে চারিধার। অজস্র ফুলের দোকান। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলের হাতেই ফুল। কাজে যাচ্ছে ফুল নিয়ে কাজ থেকে ফিরছে ফুল নিয়ে। কাজের সিফ্‌ট চেঞ্জ হলো। ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে নিযুক্ত মহিলারা, যাদের স্থলে যোগ দিলেন তাদের হাতে তুলে দিলেন নানা রং-এর একতোড়া ফুল। নিয়মিত এই ঘটনা, সত্যিই লক্ষ্যণীয়। রাস্তায় অজস্র ট্রাম, বাস, ট্রলি-বাস, বৈদ্যুতিক বাস, মোটর গাড়ী চলছে, চলছে প্রশস্ত পথ ধরে অথবা কম প্রশস্ত পথ ধরে। কোথাও ভিড় নেই বা ভিড়ে পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে দেখা যায় নি।

প্রত্যেক ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের সংগে একজন করে গাইড্ এবং দোভাষী। যুব-ছাত্রদের সাংস্কৃতিক প্রাসাদে যেতে হলো এক সন্ধ্যায়। যুব-ছাত্ররা নিজেরাই গড়ে তুলেছেন ত্রিতল বিশিষ্ট সেই প্রাসাদ। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যুব-ছাত্ররা এইখানে সংস্কৃতি বিশেষতঃ নাট্য, সংগীত, নৃত্য কলা প্রসংগে পড়াশুনা, মহড়া এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকেন। প্রাসাদের বাইরে এবং ভিতরে অপূর্ব ওয়ালপেন্টিং এবং ফ্রেসকোর কাজ। স্থপতিরাই শিল্পী। কোনো আতিশয্য নেই প্রাসাদের নির্মাণ-ভঙ্গির মধ্যে। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন তার অভাব কারো মনে হলো না। ঘুরিয়ে, ঘুরিয়ে দেখানো হলো। এই একটি কেন্দ্রের সংগে যুক্ত প্রায় ২০০০ হাজার যুব-ছাত্র। এরকম আরো কেন্দ্র আছে সারা দেশে।

সেদিন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল ট্রান্সিলভেনিয়া, মলডেভিয়া এবং ওয়ালেশিয়ার লোকনৃত্য আর গান। দুটি ব্যলে নৃত্যও প্রদর্শিত হলো। সুরে, ছন্দে, তাল, লয়ের ঐক্যতানে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলো সেই সন্ধ্যা। বীরত্বপূর্ণ অতীত কাহিনী প্রাণের আবেগে মাতিয়ে তুলেছিলো ব্যালের মাধ্যমে। ক্যান্টিন ঘরে বসে এই সমস্ত শিল্পী যুব-ছাত্রদের সংগে পরে পরিচয় হলো।

'ঐতিহাসিক মিউজিয়াম'—সত্যই বিস্মিত হতে হয়। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে আধুনিক কালের গোটা রোমানিয়ার উল্লেখযোগ্য ঘটনা, প্রতিভা এবং সৃষ্টিশীলতার নিদর্শনগুলিকে নিখুঁত, ধারাবাহিকভাবে, স্থান-কালের সমন্বয়ে উপস্থিত করা হয়েছে এই মিউজিয়ামে। অত্যন্ত দ্রুততার সংগে দেখেও ছয়ঘণ্টা লাগলো। বড় বড় এক একটা হল ঘর এক একটি শতাব্দী। সমস্ত মানুষের চেতনায় একটা সামগ্রিক চিন্তা তুলে ধরার কি অপূর্ব 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদী' প্রয়াস এই মিউজিয়াম তা প্রমাণ করে।

একটি ইলেকট্রনিক কারখানা, ১০ হাজার কর্মী কাজ করেন। শতকরা ৯০ জনের বয়স ১৮ থেকে ২৩-এর মধ্যে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ২৯০০। কারখানা ইউনিটের সম্পাদক একজন মহিলা, ৫৫ বৎসর বয়স, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী মহিলা। এছাড়া কমিউনিস্ট যুব সংস্থার সদস্য ৩০০০। মহিলা কর্মী শতকরা ৬০ জন। কাজের সময় ৮ ঘণ্টা। ন্যূনতম বেতন ১৮০০ লেই এবং সবচেয়ে বেশীর বেতন ৩২০০ লেই। ডলারের হিসাবে এক লেই সমান ২ টাকার কিছু বেশী হবে। কারখানার ভিতর ঝক্‌ঝক্ তক্-তক্ করছে চারদিক। কর্মীদের গায়ে ধব-ধবে পোষাক-পরিচ্ছদ। দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবরা কারখানায় কাজে নিযুক্ত হন এবং পরে তারা উচ্চ শিক্ষা অথবা বিশেষ উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। এই কারখানা সম্পর্কিত কারিগরী কলেজ এবং স্কুল আছে। শতকরা ৯০ জন কর্মী বিশেষ স্নাতক শিক্ষা অর্জন করে বিশেষ বিশেষ দক্ষ কাজে তারা নিযুক্ত আছেন। পার্টি নেতৃত্বের আদর আপ্যায়নে সত্যই মোহিত হতে হয়। গর্ব এবং বিনয়ের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে এদের ব্যবহারে।

'ঐতিহাসিক উদ্যান' এর মধ্যে প্রায় ৩ কিঃ মিঃ দীর্ঘ একটি হ্রদ। এই উদ্যান থেকেই (তখন ছিল জঙ্গল) প্রথম ১৯৩৯ সালে নাৎসি বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু হয়। তাই উদ্যানটির নাম ঐতিহাসিক উদ্যান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। ১২৫ রকমের একটি গোলাপ বাগান এই উদ্যানের মধ্যে। বসন্তের শুরু গোল,পেরও প্রায় শেষ। উদ্যানের মধ্যে খেলাধুলার স্থান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। হ্রদে ভ্রমণের জন্য বড় বড় লঞ্চ, স্পিড্ বোট, দাঁড় বাইবার নৌকো, ইয়াল্ট হ্রদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

ছুটির মেজাজ নিয়ে প্রায় ৫০০০ হাজার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী গ্রাম, শিল্পাঞ্চল, শহর থেকে চলে আসেন। সে সময় মে দিবসের ছুটি চলছিল। ওখানে মে দিবসের ৪ দিন ছুটি। উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল গোটা উদ্যানটি। অফুরান প্রাণের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে উদ্যানের মাটি আর হ্রদের জল।

বেকার যুবক বা যুবতীর সন্ধান ৮ দিনের মধ্যে পাওয়া গেল না। বেকার শব্দটাই ওদের কাছে অজানা। বিগত বিশ বছরে আয় বেড়েছে অনেক কিন্তু জিনিষ পত্রের দাম বিশ বছর আগে যা ছিল আজও তাই আছে। ভিখারী চোখে পড়ে না।

সম্মেলনের শেষের দিনে নাদীয়া কমানেসীর সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন নব-নির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। অপূর্ব সুন্দরী এবং সরল। কথা বলার সময় মনেই হচ্ছিল না এই সেই মন্ট্রিল অলিম্পিক তারকা। এতটুকু অহমিকা নেই। অল্প স্বল্প ইংরাজী জানেন। আমি ঠাট্টা করে বললাম—দেখত, তোমার উপস্থিতিতে আমাদের অটোগ্রাফ্ দেওয়া কি শোভা পায়। কিশোর, কিশোরীরা, আমাদের অটোগ্রাফ্ নেওয়ার জন্য ঘিরে ধরেছিল। নাদীয়া কমানেসী কমিউনিস্ট যুব সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সম্মেলন থেকে ১০ জনের সম্পাদকমণ্ডলী এবং ২৩ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হন। প্যানটেলিমন গ্যাভেনেস্কু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে যুব দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

কথা হচ্ছিল সম্পাদকমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যদের সঙ্গে। মূলত আমাদের দেশের অবস্থা, যুবকদের অবস্থা এবং ওদের ভবিষ্যৎ গড়ার কথা। কমিউনিস্ট যুব সংস্থার নেতৃত্ব মনে করেন আগামী পাঁচ বৎসর তাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। সমস্যা আছে। এ সমস্যা তাদের অতিক্রম করতেই হবে। সেই বিপ্লবী আবেগ এবং মনোভাব নিয়েই তারা কথা বলছিলেন। তাদের বক্তব্যের মূল কথাটা হলো—"এই বহুমুখী বিকশিত সমাজতান্ত্রিক কর্মকান্ডে যুবসমাজ তাদের উচ্ছলতা এবং বিপ্লবী মনোভাব নিয়েই সামনের সারিতে থাকবে। তারা সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কর্মকান্ড, শিক্ষা, গবেষণা সংস্কৃতির অঙ্গনে উপস্থিত থাকবে। কমিউনিস্ট যুব সংস্থার সমগ্র কর্মসূচী বিপ্লবী সাম্যবাদী মনোভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, দেশের প্রতি অসীম ভালবাসা এবং সমগ্র জনগণের স্বার্থের উদ্দেশে নিয়োজিত হবে।"

সম্মেলনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভিন্ দেশীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। কিছু দোভাষী কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী। তারাই প্রধানত এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সাহায্য করতেন।

তাদের বিভেদমূলক আন্দোলনে প্ররোচিত করে। পশ্চিমবঙ্গেও ওরা জাল পাতার চেষ্টা করছে।

পরিশেষে বলি, আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদমূলক আন্দোলনের তরঙ্গ বইছে তার প্রধান শিকার হচ্ছে কিন্তু বাঙ্গালীরা। এরা সেই বাঙ্গালী, যারা দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়েছিলেন। আর সেদিন এরা উদ্বাস্তু হয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থেই। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেন কখনও না ভোলেন যে সেদিন তাঁদেরই কেউ কেউ এদের কাছে পেঁাছে দিয়েছিলেন এদের স্বার্থ সংরক্ষার এক সুন্দর প্রতিশ্রুতি। সেই বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর দলকে যদি কোন অজুহাতে ভারতের কোন অংশে বসবাস করতে দেয়া না হয় তবে তাঁরা আজ যাবেন কোথায়? স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পরেও কি সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনের আগুনেই তাদের দগ্ধ হতে হবে?

[সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতাবাদ : ২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সরকার ও জনসাধারণকে সতর্কভাবে এ আন্দোলনকে বিস্তারে বাধা দিতে হবে। আর আদিবাসী অঞ্চলে কোন বিদেশী সংস্থা যাতে সক্রিয় থাকতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। ঝাড়গ্রামে নাকি সম্প্রতি বিদেশীদের আগমন অনেক বেড়েছে এবং এর পর থেকেই নাকি সেখানে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা কিছুদিন থেকে পৃথক ঝাড়খন্ড রাজ্যের দাবীতে সোচ্চার হয়েছে। ঝাড়গ্রাম ছাড়াও এরা পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় নানা ধরনের গন্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছে। ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা চাইছে, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ পাশাপাশি কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি পৃথক রাজ্য গড়তে। এ ব্যাপারে ঝাড়গ্রামে কিছু পোস্টারও পড়েছে, দেয়াল লিখনও চলছে। তবু এও সংগঠিত আন্দোলনে পরিণত হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তেই। কারণ বিদেশীচক্র এখানে বেশ সক্রিয়। এ আন্দোলনের সংগঠকদের দাবী—ঝাড়খন্ড অঞ্চলে কোন উদ্বাস্তু আনা চলবে না এবং সকল সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে ঝাড়খন্ডীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে দেশের যে কোন অংশের বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন হঠাৎ কোন উদ্দেশ্যহীন বিচ্ছিন্ন আন্দোলন নয়। এর পেছনে রয়েছে এক একটা ষড়যন্ত্র এবং উদ্দেশ্য। এর জন্ম ও বিস্তার রাজনৈতিক কারণেই। এবং এর মদত দেয় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং সাম্রাজ্যবাদী কিছু বিদেশী শক্তি। সেই বিদেশী শক্তির অনুচর হিসাবে চুপিসারে কাজ করে যাচ্ছে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি। এরাই দেশের মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগে

কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে কম-খরচে যৌথ শৌচাগার-এর মডেল দেখান হচ্ছে

জনসংখ্যা সমস্যা ও সমাজতন্ত্র

অগাস্ট বেবেল

জনাধিক্যের আতংক

এমন লোক আছেন যাঁরা জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুতর ও আশু সমস্যার সমাধানের যোগ্য বিষয় বলে বিবেচনা করেন। কারণ, এখনই এটা আতংকজনক হয়ে পড়েছে। এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা বিশেষভাবে আন্ত-র্জাতিক পর্যায়েই প্রয়োজন। কেননা, মানুষের আহার্য ও বসবাস ক্রমবর্ধমানহারে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত। ম্যালথাসের সময় থেকেই লোকসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ম সম্পর্কে ব্যাপক বিতর্ক হয়ে আসছে। তাঁর একদা-বিখ্যাত ও অধুনা-কুখ্যাত জনসংখ্যা নীতির ওপর রচনায় তিনি বলেছেন—জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে (১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২) আর খাদ্য বাড়ে গাণিতিক হারে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)। এই রচনার ওপর কার্ল মার্ক্স মন্তব্য করেছেন, এটা স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী, হালকা এবং স্যার জেমস স্টিওয়ার্ট, টাউনসেন্ড, ফ্রাঙ্কলিন ওয়ালেস থেকে পেশাদারী-অলঙ্কারপূর্ণ-ধর্মপ্রচারের সাহিত্যিক-চৌর্যাপরাধের একটি টুকরো মাত্র" এবং এটাতে "একটি লাইনও নিজস্ব নয়।" এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হ'ল: অতি দ্রুত জনসংখ্যা ও খাদ্যসরবরাহে অসঙ্গতি দেখা দেবে; এই অবস্থা অনিবার্যভাবে ব্যাপক দৈন্য ও পরিণামস্বরূপ ব্যাপক মৃত্যু ডেকে আনবে। কাজেই "জন্মনিরোধ অবলম্বন করা" অত্যাবশ্যক। পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম ব্যক্তিদের বিয়ে করতে দেওয়া অনুচিত। অন্যথা, তার বংশধরদের "প্রকৃতির কোলে" স্থান হবে না।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির আতংক অনেক পুরনো। এই আতংক গ্রীস ও রোমান আমলেও ছিল এবং মধ্যযুগের অবসানের সময়েও ছিল। প্লেটো এবং এরিস্টটল, রোমান ও মধ্যযুগের পাতিবুর্জোয়ারা সবাই এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এর প্রভাবে ভলটেয়ারও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই বিষয়ের ওপর বই লেখেন। অন্যান্য লেখকও তাঁকে অনুসরণ করেন। সব শেষে ম্যালথাসের রচনায় এই আতংক অত্যন্ত শক্তিশীল অভিব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হয়।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, তখন সবসময় জনসংখ্যার মাত্রাধিক্যের আতংক দেখা দেয়। তখন যে সাধারণ অসন্তোষ দপ্ করে ছড়িয়ে পড়ে, জনসংখ্যার আধিক্য ও খাদ্যের স্বল্পতাই তার কারণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়, খাদ্য কিভাবে উৎপাদিত ও বণ্টিত হয় তা নয়।

মানুষের দ্বারা মানুষের সবরকমের শোষণের ভিত্তি হচ্ছে শ্রেণীশাসন যার প্রথম ও প্রধান উপায় হল জমি কুক্ষিগত করা। সাধারণ সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। মানুষকে বিত্তহীন করে বিত্তবানদের সেবা করেই জীবিকা অর্জনে বাধ্য করা হয়। এই অবস্থায় পরিবারে সামান্য নবা-গতকেও বোঝা বলে মনে হয়। জনাধিক্যের (ওভারপপুলেশন) ভূত মরীচিকার মত দেখা দেয়। এটা সেই পরিমাণে আতংক সৃষ্টি করে যে পরিমাণে জমি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে উৎপাদন ব্যাহত করে। তা ঘটে জমি উপযুক্ত-ভাবে চাষ না হওয়ার জন্য কিংবা ভাল জমিগুলি পশুচারণে পরিণত করার ফলে অথবা জমির মালিকের শিকারের সখ মেটাতে জমি সংরক্ষণ করার জন্য। খাদ্য উৎপাদনের জন্য এই জমি আর পাওয়া যায় না। রোম ও ইতালি খাদ্যসংকটে কষ্ট পায় যখন দেশের জমি মাত্র তিন হাজার জমিদারের হাতে থাকে। "জমিদারীগুলিই রোমের সর্বনাশের কারণ"—সেখানে এই ধ্বনিই তখন চীৎকৃত হয়। ইতালির জমি পরিণত হয় সম্ভ্রান্ত মালিকদের সুবিস্তীর্ণ শিকারভূমি ও সৌখীন উদ্যানে। দাসশ্রমিক দিয়ে কৃষিকাজ ব্যয়বহুল বলে বহু জমি পতিত রাখা হয়। এর চাইতে আফ্রিকা বা সিসিলি থেকে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য দামে সস্তা পড়ে। এটা খাদ্যশস্য থেকে মুনাফাবাজির দরজা খুলে দেয়। এই ব্যবসায় রোমের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরা প্রধান ভূমিকা নেয়। পরে এই ব্যবসা দেশে জমি-চাষে ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধনী ব্যক্তিরা দেশে জমি চাষ করার পরিবর্তে খাদ্য ব্যবসায়ে অধিক মুনাফা অর্জন করতে থাকে।

শাসকশ্রেণীগুলির সংখ্যাল্পতা রোধ করার উদ্দেশ্যে এই অবস্থায় শাসকশ্রেণী রোমের নাগরিক ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট অভি-জাতবর্গদের বিয়ে ও সন্তান উৎপাদনে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য-দান সত্ত্বেও তাঁরা বিয়ে করা ও সন্তান প্রজনন থেকে বিরত থাকেন। শাসকশ্রেণীগুলির অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়নি।

সমাজের উচ্চশ্রেণী ও পুরোহিতবর্গ শত শত বছর ধরে সবরকমের চক্রান্ত ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে অসংখ্য কৃষকের জমি আত্মসাৎ ও জনসাধারণের জমি কুক্ষিগত করার পর মধ্যযুগের অবসানের সময় অনুরূপ ব্যাপার সৃষ্টি হয়। যখন দীর্ঘ অবর্ণনীয় নির্যাতনের ফলে কৃষকরা বিদ্রোহ করে এবং ঐ বিদ্রোহ চূর্ণ করা হয়, তখন অভিজাতশ্রেণীর দস্যুতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমনকি ধর্মীয় রাষ্ট্রের সংস্কার সাধিত গির্জার অনুগামী রাজন্যবর্গ এই অপকর্ম অনুশীলন করে। চোরডাকাত, ভিখারি ও ভবঘুরেদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে অতীতের সব সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং রিফর্মেশনের (ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন সংঘটিত হয়। এটা ছিল মূলতঃ সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলন। অনেক দেশে এই আন্দোলন তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে—যেমন ১৫২৪-২৫ সালে জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ইংলন্ড ইত্যাদি জায়গায় বুর্জোয়া বিপ্লব) পর এই সংখ্যা চরমে ওঠে। জমির দখলহারা কৃষকরা দলে দলে ছুটল সহরের দিকে। কিন্তু উপরিবর্ণিত কারণে সেখানেও জীবনযাত্রার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। কাজেই "সর্বত্রই জনাধিক্য" বিরাজ করছিল।

ম্যালথাসের আবির্ভাব ইংলন্ডের শিল্প বিকাশের সময়েই। তখন হারগ্রিভস, আর্করাইট ও ওয়াট প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ফলে বস্ত্রশিল্পে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিরাট পরি-বর্তন দেখা দেয়। প্রধানতঃ বস্ত্রশিল্পে এই প্রভাব পড়ায় কুটির

শিল্পে নিযুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়। সেই সময়ে ইংলণ্ডে ভূসম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হয় এবং বৃহদাকার শিল্পের প্রভূত বিকাশ ঘটে। একদিকে যেমন সম্পদ বাড়তে থাকে, অন্যদিকে ব্যাপক দারিদ্র ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়ে শাসক-শ্রেণীগুলির একথা ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে তদানীন্তন জগত সম্ভাব্য সকল জগতগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট জগত ছিল, এবং ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পায়ণ ও অপরিমেয় সম্পদসৃষ্টির মাঝখানে ব্যাপক জনসাধারণকে নিঃস্ব করার মত স্ববিরোধী ঘটনায় আপাতঃদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত সমাধান খুঁজতে গিয়ে তারা অপরাধস্ক্ষালনের সুযোগ পায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি ও মুষ্টিমেয় জমিদারের হাতে জমির কেন্দ্রীভবনের ফলে যে অগণিত শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে তার পরিবর্তে অতি প্রজননের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর অতি দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর দোষ চাপানোর চাইতে সহজতর আর কিছু ছিল না। এই অবস্থায় ম্যালথাস "স্কুল ছাত্রের উপযোগী, লঘু ও পেশাদারী ধর্মপ্রচারের অলংকারপূর্ণ ভাষণের সাহিত্যিক চৌর্যাপরাধের অংশ" রচনা করে বর্তমান দুরবস্থার যে কারণ নির্দেশ করেন তাতে শাসকশ্রেণীর অন্তরের গভীর চিন্তা ও কামনাই প্রতি-ফলিত হয়েছে এবং দুনিয়ার সামনে শাসকশ্রেণীর সেই চিন্তা ও কামনার যৌক্তিকতাকে হাজির করেছে। একমহল থেকে এর পেছনে সোল্লাস সমর্থন এবং অন্যদিক থেকে এর প্রবল বিরোধীতাই এর কারণ। ম্যালথাস সঠিক সময়ে সঠিক কথা নিয়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের পক্ষে হাজির হয়েছেন এবং যদিও "তাঁর রচনায় একটিও নিজস্ব বাক্য নেই," তবুও তিনি এইভাবে একজন মহৎ ও বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন এবং সম্পূর্ণ মতবাদের সাথে তাঁর নাম সমার্থক হয়ে আছে।

(২) জনাধিক্যের কারণ

যে অবস্থা ম্যালথাসকে বিপদ সংকেত দেখাতে ও কর্কশ শিক্ষা দিতে প্ররোচিত করেছে তা তখন থেকেই যুগে যুগে বিস্তার লাভ করছে। শ্রমিকদের প্রতি তাঁর উপদেশ আঘাতের উপর অপমান-স্বরূপ। এটা যে ম্যালথাসের স্বদেশ গ্রেট-ব্রিটেনে শুধু ছড়িয়েছে তা নয়, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা-সম্পন্ন সব দেশেই এর বিস্তৃতি ঘটেছে। এই ব্যবস্থা ভূমি-লুণ্ঠন ও জনসাধারণকে যন্ত্র ও কারখানার দাসে পরিণত করেছে। এই ব্যবস্থা শ্রমিককে তার উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে,—তা জমিই হোক্ বা যন্ত্রই হোক্ এবং পুঁজিপতিদের কাছে তাকে সমর্পণ করেছে। এই পদ্ধতি নিত্যনতুন শিল্পশাখা নির্মাণ করে তা উন্নত ও কেন্দ্রীভূত করে; কিন্তু এটা বরাবর নতুন জনসমষ্টিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে ঘোষণা করে বেকারে পরিণত করে। প্রচীন রোমের মত এটা আনুষঙ্গিক কুফল সহ 'ল্যাটিফান্ডিয়া' বা জমি-দারীতে উৎসাহ প্রদর্শন করে। ইংলণ্ডীয় ধারায় ভূমি লুণ্ঠনে সর্বাধিক ক্লিষ্ট আয়ারল্যান্ড ইয়োরোপের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ১৮৭৪ সালে আয়ারল্যান্ডের ১২, ৩৭৮, ২৪৪ একর তৃণভূমি ও উৎকৃষ্ট পশুচারণভূমি ছিল, কিন্তু কর্ষণো-পযোগী জমি ছিল মাত্র ৩, ৩৭৩, ৫০৮ একর। প্রতি বছরই লোকসংখ্যা কমতে থাকে; অথচ, আরও বেশী কৃষিযোগ্য জমি তৃণভূমি ও পশুচারণভূমিতে এবং জমিদারদের শিকার ভূমিতে পরিণত করা হয়। ১৯০৪ সালে দাঁড়ায় ১৪, ৮০৫, ০৪৬ একর তৃণভূমি ও ২, ৩২৪, ৯০৬ একর মাত্র কৃষিযোগ্য জমি। তাছাড়া, কর্ষণোপযোগী জমির অধিকাংশ থাকে বিপুল-সংখ্যক ছোট থেকে আরও ছোট কৃষকদের হাতে যারা জমি থেকে প্রয়োজনীয় উৎপাদনে অসমর্থ। এই ভাবেই আয়ারল্যান্ড কৃষিজমি থেকে পশুচারণভূমিতে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনসংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ, এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষের কিছু বেশি, তাতেও বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ বাড়তি হয়ে পড়েছে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আইরিশদের বিদ্রোহকে এইভাবে অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যায়। জমির মালিকানা ও জমি কর্ষণের ক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডেও অনু-রূপ চিত্র দেখা যায়। এই একই রকম অবস্থা হাঙ্গেরীতেও। সেখানে সাম্প্রতিক দশকে আধুনিক প্রগতির চিহ্ন বিদ্যমান। ইউরোপের অনেক দেশের চাইতে উন্নত জমিতে সমৃদ্ধ একটি দেশ আজ ঋণভারে জর্জরিত, জনগণ দারিদ্রক্লিষ্ট এবং মহা-জনের কৃপার ওপর নির্ভরশীল। হতাশ জনগণ ব্যাপকহারে দেশত্যাগ করছে। কিন্তু জমি এমন সব আধুনিক পুঁজিপতি রাঘববোয়ালদের হাতে কেন্দ্রীভূত যারা বর্বরভাবে বনভূমি ও কৃষিজমি স্বীয় স্বার্থসাধনে ব্যবহার করছে। ফলে হাঙ্গেরী অদূর ভবিষ্যতে শস্য রপ্তানিকারক দেশ থাকবে না। ইতালিতেও অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান। জার্মানির মত ইতালিও জাতীয় রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক বিকাশ উন্নত করেছে। কিন্তু পিডমন্ট, লোম্বার্ডি, টাসকেশী, রোমাগ্না ও সিসিলির পরিশ্রমী কৃষকরা ক্রমশঃ দরিদ্র হতে হতে ধ্বংসের সম্মুখীন। কয়েক বছর আগে যেখানে দরিদ্র কৃষকের দখলী জমিগুলি সযত্ন-পরিচালিত উদ্যান ছিল, আজ তা জলাভূমিতে পরিণত হতে শুরু করেছে। রোমের নিকটবর্তী ক্যামপাগ্নার লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি পতিত রয়েছে। ঐ এলাকা এককালে পুরনো রোমের অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু স্থানের অন্যতম ছিল। জলায় পরিণত জমিগুলি বিষাক্ত দুর্গন্ধ বাষ্প নির্গত করে। যদি যথাযথভাবে ক্যামপাগ্নার জল নিষ্কাশন ও জলসেচনের উত্তম ব্যবস্থা হয় রোমের অধিবাসীরা খাদ্যের একটা সমৃদ্ধ উৎস পেয়ে আনন্দিত হতো। কিন্তু ইতালি বৃহৎশক্তি হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। নিকৃষ্ট শাসন পরিচালনা, সামরিক ও নৌ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের জন্য এবং উপনিবেশ তৈরির জন্য অর্থব্যয় করে ইতালির শাসকরা জনগণের সর্বনাশ করে। এজন্য কৃষিকাজ, যেমন ক্যামপাগ্নার জমি উদ্ধার ইত্যাদির জন্য অর্থের সংস্থান তারা করতে পারে না, ক্যামপাগ্নার মত অনুরূপ দুরবস্থা দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলিতেও বর্তমান। যে সিসিলি এককালে রোমের শস্যাগার ছিল আজ তা দারিদ্রের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত। সিসিলির মত দারিদ্রজর্জরিত ও নিগৃহীত লোক ইউরোপের আর কোথাও নেই। ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর দেশের অল্পে-সন্তুষ্ট সন্তানরা আজ ইউরোপের অধিকাংশ ও আমেরিকায় নগণ্য মজুরিতে কাজের সন্ধানে ভিড় করে; কিংবা দলবেঁধে চিরকালের জন্য দেশত্যাগী হয়। কারণ স্বদেশের জমি তাদের সম্পত্তি নয়, নিজের দেশে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতেও তারা চায় না। ম্যালেরিয়ার মত উৎকট জ্বর-ব্যাধি ইতালিতে এত ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে যে সরকার অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ১৮৮২ সাল নাগাদ এক তদন্ত চালান। তদন্তে এই শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ হয় যে দেশের ৬৯টি বিভাগের মধ্যে ৩২টি বিভাগ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত, ৩২টি আংশিক-

ভাবে এবং মাত্র ৫টি বিভাগ এই রোগ থেকে মুক্ত। এই রোগ আগে শুধু গ্রামাঞ্চলেই দেখা যেত, এখন শহরগুলিতেও প্রবেশ করেছে যেখানে দলে দলে গ্রাম্য সর্বহারাদের সহরে চলে আসার ফলে ঘন সন্নিবিষ্ট সহুরে সর্বহারার দল বহুগুণ বর্ধিত হয় এবং রোগ সংক্রামণের যোগ্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

(৩) দারিদ্র ও বহুপ্রসূতা

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিকে যে কোন দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, দেখা যায়, খাদ্যের স্বল্পতা এবং জীবনধারণের উপায়ের অভাব জনসাধারণের অভাব ও দুর্দশার ফল নয়। যে অসম বন্টন ও অর্থনীতিক কুব্যবস্থা কাউকে প্রাচুর্য দান করে এবং অন্যদের খাদ্যাভাবে মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করে,—এটা তারই ফল। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দিক থেকেই ম্যালথাসীয় যুক্তি অর্থপূর্ণ। অন্যদিকে ধনবাদী ব্যবস্থাই সন্তান প্রজননে উৎসাহ দেয়। কারখানায় শিশুদের সস্তা ও সুলভ শ্রম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই প্রয়োজন হয়, হিসাব করেই সর্বহারাদের জন্মদান করতে হয়—তাদের ভরণপোষণের মত উৎপাদন করতে হয়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কুটিরশিল্পে নিযুক্ত সর্বহারাদের অধিক সন্তান লাভ করতে বাধ্য হতে হয়। এই অনস্বীকার্য ঘৃণ্য প্রক্রিয়া শ্রমিকের দারিদ্র তীব্রতর করে এবং নিয়োগকর্তার ওপর নির্ভরতা বাড়ায়। সর্বহারা অত্যন্ত দুঃখদায়ক মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। কুটির শিল্পে শ্রমিকদের জন্য কোন কল্যাণকর ব্যবস্থা করতে বা সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনে অধিক অর্থব্যয় করতে নিয়োগকর্তা বাধ্য না থাকায় কুটিরশিল্পে সে অধিকসংখ্যক লোক নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়। কেননা, এই জাতীয় শিল্পে সে যে সুবিধা পায়, অন্য উৎপাদন পদ্ধতিতে তা সহজে পায় না; অবশ্য বিশেষ কোন উৎপাদন পদ্ধতি সেই অবস্থায় যদি সম্ভব হয়ে থাকে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি শুধু যে পণ্য ও শ্রমিকের অতি উৎপাদনের ব্যবস্থা করে তা নয়, এই ব্যবস্থা অধিক বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির দিকেও চালিত হয়। বুদ্ধিজীবিশ্রেণীর সদস্যদেরও চাকরি পাওয়া ক্রমবর্ধমানহারে কঠিন হয়ে পড়ে। চাহিদার চাইতে সরবরাহ স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায়। ধনতান্ত্রিক জগতে একটিমাত্র জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় না—তা হ'ল পুঁজি ও তার মালিক পুঁজিপতি।

যদি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা ম্যালথাসের অনুগামী হয়ে থাকেন, তাহলে তা তাদের বুর্জোয়া স্বার্থের দিক থেকে স্বাভাবিকই, শুধু সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাদের এই বুর্জোয়া খেয়াল প্রসারিত না করাই উচিত। জন স্টুয়ার্ট মিল লিখেছেন, "......কমিউনিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে এই জাতীয় স্বার্থপর অমিতাচারের বিরুদ্ধে জনমত তীব্রতম প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। যে কোন সংখ্যাবৃদ্ধি জনগণের আরামের অপহ্নব ঘটাবে বা শ্রমের পরিমান বৃদ্ধি করবে তা সমাজের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অসুবিধা সৃষ্টি করবে এবং এটাকে নিয়োগকর্তার অর্থলিপ্সা বা ধনীদের অন্যায্য অধিকারের ফল বলা যাবে না। এই পরিবর্তিত অবস্থায় অযৌক্তিক ধারণাকে অস্বীকার করা হয় এবং তাতেও না হলে যে কোন রকম শাস্তিমূলক বিধান নেওয়া হয় বা সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিকর নিন্দনীয় আরাম-আয়েশের প্রতি বশ্যতার প্রশ্রয় দিতে হয়। কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা লোকসংখ্যাবৃদ্ধির আতঙ্ক থেকে উত্থিত প্রতিবাদ প্রকাশ্যে গ্রহণ করার পরিবর্তে ঐ পাপ বা অমঙ্গল ঘটবার আগেই বাধা দেবার চেষ্টা করে।" অধ্যাপক এ ওয়াজুনার রাউ-এর 'ম্যানুয়াল অব পলিটিক্যাল ইকনমি' বইয়ের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন, "সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিবাহ ও সন্তান উৎপাদকের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।" উপরোক্ত লেখকরা এই ধারণা থেকেই তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন যে সবরকম সমাজব্যবস্থাতেই জনসংখ্যা-বৃদ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান, কিন্তু উভয়েই স্বীকার করেন যে অন্য সবরকম সমাজব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে অধিকতর সক্ষম। তাদের পরবর্তী সিদ্ধান্তটি সঠিক, আগেরটি নয়।

অবশ্য ম্যালথাসীয় মতবাদে কলুষিত কিছু কিছু সমাজ-তন্ত্রী আছেন যাঁরা জনাধিক্যের আশু বিপদ সম্পর্কে আতঙ্কিত। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রী ম্যালথাসবাদীরা এখন উধাও হয়েছে। প্রকৃতি ও বুর্জোয়া সমাজের আসল চরিত্র সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নের ফলে তাঁদের শিক্ষা হয়েছে। আমাদের কৃষি বিশেষজ্ঞদের সবিলাপ সংগীত থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে আমরা বিশ্ববাজারের দৃষ্টিতে অতি-রিক্ত খাদ্যই উৎপাদন করি—যার ফলে দাম যায় কমে এবং কম-দামের জন্য খাদ্য উৎপাদন অলাভজনক হয়ে পড়েছে।

আমাদের ম্যালথাসবাদীরা ভাবে, আর চিন্তাশক্তিহীন বুর্জোয়া প্রবক্তাদের ঐক্যতান সেই ভাষাকেই প্রতিধ্বনিত করে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ভালবাসার পাত্র নির্বাচনে স্বাধীনতা বর্তমান এবং যেখানে মানুষের উপযোগী ব্যবস্থা সকলের জন্য অবারিত, সেখানে মানুষ শশকের মত বংশবৃদ্ধি করে যাবে এবং নীতিবহির্গত যৌন সম্ভোগে ব্যাপৃত থেকে ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটাবে। আশা করা যায়, ঘটবে এর বিপরীতটাই। এখনও পর্যন্ত সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট পরিবারে নয়, নিকৃষ্টতম পরিবারেই অধিকসংখ্যক শিশুর আগমন দেখা যায়। অতি-রঞ্জনের অপবাদ থেকে মুক্ত থেকে একথা বলা যায়, অধিকতর দুর্দশাগ্রস্থ সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যেই অধিকতর সংখ্যা শিশুর আবির্ভাব হয়। ব্যতিক্রম যে একেবারে নেই তা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিরচোর লেখা থেকে এর সমর্থন মেলে, মানসিক উদ্দীপক বস্তু থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, অধঃ-পতনের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত ইংরেজ শ্রমিক মাত্র ২টি উপভোগের উৎস জানে, এক মাদকতা, দুই যৌন সংগম। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সাইলেসিয়ার জনগণও তার সমস্ত কামনা-বাসনা এই দুই বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করে। সুরা ও যৌন কামনা পরিতৃপ্তিই সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং একথা অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যায় যে শারীরিক বলিষ্ঠতা ও নৈতিক দৃঢ়তা যে পরিমাণে কমে সেই পরিমাণে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

মার্কসও তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। "প্রকৃতপক্ষে, কেবলমাত্র জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যাই নয়, পরিবারসমূহের পূর্ণ আয়তন আয়ের উচ্চতার বিপরীত অনুপাতে হয়ে থাকে এবং সেজন্য বিভিন্ন স্তরেই শ্রমিকের জীবিকার ওপরও নির্ভর করে। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই নীতি অসভ্য জাতির কাছে অবাস্তব মনে হবে, এমনকি সভ্য উপনিবেশের অধিবাসীদের পক্ষেও। এটা ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল

ও নিয়ত আক্রান্ত পশুগুলির সীমাহীন বৃদ্ধির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।" মার্কস লাইং-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "সব মানুষ যদি অনায়াসে জীবনধারণের অবস্থায় থাকত তাহলে পৃথিবী অনতিবিলম্বে জনশূন্য হয়ে যেতো।" লাইং ম্যালথাসের বিপরীত মত পোষণ করেনঃ জীবনযাত্রার উন্নত মান বরং জন্মহ্রাসেরই অনুকূল, জন্মবৃদ্ধির নয়। হার্বার্ট স্পেন্সর একই মত প্রকাশ করেছেন, "পূর্ণতা ও প্রজননশক্তি সবসময় সর্বত্রই পরস্পরবিরোধী। এর থেকে এটাই দাঁড়ায় যে, আরও প্রগতির জন্য মানবজাতি যে সমাজের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ফলে সম্ভবতঃ সন্তান উৎপাদন হ্রাস হবে।"

আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী ব্যক্তিরা এই একটি বিষয়ে একমত এবং আমরা তা সমর্থন করি।

(৪) লোকসংখ্যায় ঘাটতি ও খাদ্যে বাড়তি

জনসংখ্যার গোটা প্রশ্নটি এই বলে সহজেই ছেড়ে দেওয়া যায় যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বিপদ দৃষ্টিগোচর নয়, কারণ আমরা অতিরিক্ত খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন, যা আবার বছরের পর বছর বৃদ্ধি পাবারই আশংকা। তাই এই সম্পদ নিয়ে কি করা হবে এই দুশ্চিন্তা, খাদ্য পর্যাপ্ত কিনা এই দুশ্চিন্তার চেয়ে অনেকবেশি বড়। খাদ্য উৎপাদনকারীরা সাগ্রহে খাদ্যের ভক্ষকদের দ্রুত বৃদ্ধিকে অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু ম্যালথাস-বাদীরা আপত্তি তুলতে ক্লান্তিবোধ করেন না। সুতরাং আমাদের নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতে হবে পাছে তারা এই অজুহাতের আশ্রয় নিতে পারে না যে তাদের আপত্তি অকাট্য।

তাঁরা দাবি করেন যে অতি নিকট ভবিষ্যতে জনাধিক্যের বিপদ 'ক্রম হ্রাসমান উৎপাদন বিধি'-র মধ্যে নিহিত। আমাদের জমি "উৎপাদনে নিঃশেষিত," বর্ধিষ্ণু ফসল আর আশা করা যায় না এবং যেহেতু কৃষির উপযোগী জমি ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে, তাই খাদ্য সংকটের বিপদ আসন্ন যদি লোকসংখ্যা বাড়তেই থাকে। কৃষিতে জমির ব্যবহার সম্পর্কিত অধ্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে একথা প্রমাণ করতে পেরেছি বলে আমরা বিশ্বাস করি যে, কৃষি বিজ্ঞানের বর্তমান স্তরেই নতুন খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ কি বিপুল অগ্রগতি ঘটাতে পারে। আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একজন অত্যন্ত যোগ্য বড় ভূস্বামী ও সর্বজনস্বীকৃত অর্থনীতিবিদ (যিনি উভয় ক্ষেত্রে ম্যালথাসের চাইতে শ্রেষ্ঠ।) রডবার্টাস কৃষি রসায়ন শাস্ত্রের শৈশবে ১৮৫০ সালে বলেছেন, "কাঁচা সামগ্রী উৎপাদন যেমন, খাদ্যোৎপাদন ভবিষ্যতে শিল্পোৎপাদনে ও পরিবহনের পেছনে পড়ে থাকবে না। কৃষি রসায়ন এখনই কৃষির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে আরম্ভ করছে। যদিও এর ভুলপথ পরিক্রমা করার আশংকা বিদ্যমান, তবুও এটা পরিণামে খাদ্য উৎপাদনকে সমাজের আয়ত্তাধীনে স্থাপন করবে, যেমন বর্তমানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পশমের সরবরাহ পেলে যে কোন পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করা যায়।"

কৃষি রসায়ণের প্রতিষ্ঠাতা জুস্টাস ভন লিবিগ এই মত পোষণ করেন যে "যদি মানুষের শ্রম ও সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহলে জমি অফুরন্ত উৎপাদনশীল থাকে এবং বছরের পর বছর অপরিমেয় ফসল দিতে পারে।" উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম ম্যালথাসীয় খেয়াল মাত্র, এটা কৃষিকাজের অতি নিম্নস্তরে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদিও এই নিয়ম বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বহু আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নিয়মটি বরং এইভাবে বলা যায়—"একটা জমির উৎপাদন মানুষের ব্যয়িত শ্রম (বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতিসমেত) ও সেই জমিতে প্রদত্ত যথার্থ সারের সাথে সমানুপাতিক।" যদি গত ৯০ বছরে ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষুদ্র কৃষি খামারগুলি নিয়ে তার উৎপাদন চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়ে থাকে (লোকসংখ্যা কিন্তু দ্বিগুণও বাড়েনি), তাহলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পন্ন সমাজ থেকে অনেক বেশি ভাল ফল আশা করা যায়। ম্যালথাসবাদীরা আর একটি সত্য এড়িয়ে যান যে, শুধু আমাদের দেশের কথাই হিসাবের মধ্যে গণ্য করলে চলবে না, পৃথিবীর সব জমি, প্রধানতঃ যে সব দেশের জমি আমাদের দেশের ভূখন্ড থেকে বিশ থেকে ত্রিশ ও তারও বেশি গুণ ফসল দেয়, তাকেও হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। বস্তুতঃ পৃথিবীর সম্পদরাশি মানুষ ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছে। তবুও বলতে হয় এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বাদ দিলে যতটুকু হওয়া সম্ভব সেভাবে কোথাও জমির চাষ ও ফলপ্রদভাবে তার ব্যবহার হচ্ছে না। শুধু গ্রেট ব্রিটেনই যে একমাত্র বর্তমানে যা উৎপাদন করে তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারে তাই নয়; ফ্রান্স, জার্মানি ও অস্ট্রিয়াও তা পারে এবং এ সত্য ইউরোপের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য। ক্ষুদ্র ওয়ার্টেমবার্গে ৮৭৯,৯৭০ হেক্টর কর্ষণযোগ্য জমিতে কেবল বাষ্পচালিত লাঙ্গল ব্যবহারের ফলে ৬,১৪০,০০০ সেন্টনার উৎপাদনকে ৯,০০০,০০০ সেন্টনারে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

জার্মানির বর্তমান জনসংখ্যার অবস্থা দিয়ে বিচার করলে ইউরোপীয় রাশিয়া তার বর্তমান ১০ কোটি লোকসংখ্যার পরিবর্তে ৪৭·৫ কোটি লোককে খাওয়াতে পারে। আজকের ইউরোপীয় রাশিয়াতে প্রতি বর্গমাইলে ১৯·৪ জন লোক বাস করে, সেক্সনীতে করে ৩০০ জন। রাশিয়ার সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে জলবায়ু উচ্চপর্যায়ের উর্বরতা অসম্ভব করে তুলেছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের জলবায়ু ও মাটি জার্মানির জমির তুলনায় অনেক বেশি কৃষি উৎপাদনক্ষম। তখন আবার জনসংখ্যার ঘণত্ব ও উন্নত জমি কর্ষণ (যা অব্যবহিত পরেই হয়) জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাবে যা এমনকি আজও অনুমানকে হার মানায়। যেখানেই লোক রাশীকৃত হয়, সেখানেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে।

এসব বিষয়ের ওপর আমরা গুরুত্ব দিই না বললেই হয়, এমনকি এগুলির সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতেও আমরা অক্ষম। কারণ বর্তমান অবস্থায় এ বিষয়ে বিরাট আকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ বা সম্ভাবনা আমাদের নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আজকের অতি হাল্কা বসতিপূর্ণ নরওয়ে ও সুইডেন তাদের বিরাট বনাঞ্চল, সত্যিকারের অফুরন্ত খণিজ সম্পদ, অসংখ্য নদনদী এবং সমুদ্রতীরবর্তী দীর্ঘ এলাকা নিয়ে আরও ঘণ জনসংখ্যার জন্য সমৃদ্ধ খাদ্যসংস্থান করতে পারবে। বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায়ের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে বিক্ষিপ্ত জনসাধারণের একাংশ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে যা বলা যায়, ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কে আরও অতুলনীয় অধিক মাত্রায় তা প্রযোজ্য—যেমন পর্তুগাল, স্পেন, ইতালি, গ্রীস, দানিয়ুবীয় রাজ্যসমূহ,

হাঙ্গেরী, তুরস্ক প্রভৃতি। ঐসব দেশসমূহের ক্লেদাক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ফলে শত সহস্র মানুষ দেশে অবস্থান বা নিকটবর্তী সুবিধাজনকভাবে-অবস্থিত দেশে স্থায়ী বসবাস করার পরিবর্তে দেশত্যাগ করে সমুদ্রের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হয়। যেইমাত্র একটা ন্যায়নিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা স্থাপিত হবে, তখন ঐ বিস্তীর্ণ ও উর্বর ভূমিকে উন্নত পর্যায়ের কৃষিভূমিতে উন্নীত করতে নতুন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রয়োজন হবে।

অদূর ভবিষ্যতে যখন ইউরোপে অতি উন্নত সাংস্কৃতিক লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হবে লোকসংখ্যা বাড়তির চাইতে ঘাটতিই দেখা দেবে এবং সেই অবস্থায় জনাধিক্যের আতঙ্ক পোষণ করা অসম্ভব হবে। সবসময় মনে রাখা দরকার যে শ্রম ও বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদনের উৎসের যথাযথ ব্যবহার সীমাহীনভাবেই করা যায়। কারণ প্রত্যেক দিনই নিত্যনতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন খাদ্যের উৎসবৃদ্ধি করে যাচ্ছে।

আমরা ইউরোপ ছেড়ে যদি অন্য দেশের দিকে তাকাই, তাহলে লোকের ঘাটতি ও জমির প্রাচুর্য আপনা থেকেই আমাদের চোখে পড়ে। পৃথিবীর প্রচুর পরিমাণ উর্বর জমি সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। কারণ পতিত জমি কৃষি উপযোগী করে যথাযথ ব্যবহারের কাজ সম্পাদন করা কয়েক হাজার লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, বহু লক্ষ লোকের ব্যাপক উপনিবেশ স্থাপন প্রয়োজন, প্রকৃতির এই প্রাচুর্যের কিয়দংশকে মানুষের নিয়ন্ত্রাধীন করতে। অন্যান্যের মধ্যে এই পর্যায়ে পড়ে কয়েক লক্ষ বর্গমাইলের বিরাট ভূখণ্ড, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আর্জেন্টিনার অধীনে ৯·৬ কোটি হেক্টর উর্বর জমির মধ্যে অনধিক ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় শস্য উৎপাদনক্ষম পতিত জমির পরিমাণ কমপক্ষে আনুমানিক ২০ কোটি হেক্টর; অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সে সম্মিলিতভাবে শস্য উৎপাদন হয় ১০·৫ কোটি হেক্টর জমি। ৪০ বছর আগে ক্যারী এই মত পোষণ করতেন যে ৩৬০ মাইল দীর্ঘ ওরিনোকো উপত্যকা একাই সমগ্র মানবজাতিকে খাওয়াবার মত শস্য উৎপাদনে সমর্থ। এই অনুমানের অর্ধেকও মেনে নিলে তবু আরও প্রচুর থাকে। যে কোন ক্ষেত্রে একা দক্ষিণ আমেরিকাই বর্তমান জগতের লোকসংখ্যার বহুগুণকে খাওয়াতে পারে। পুষ্টিকারিতার দিক থেকে একখণ্ড জমিতে কলা চাষ ও ঐ পরিমাণ জমিতে গম চাষের হার হয় ১৩৩ঃ১। যেখানে আমাদের ভাল জমিতে গমের ফসল বীজের ১১ থেকে ২০ গুণ মাত্র হয়, সেখানে ধান উৎপাদনকারী জমিতে বীজের তুলনায় ফসলের পরিমাণ হয় ৮০ থেকে ১০০ গুণ, ভুট্টা ২৫০-৩০০ গুণ এবং কোন কোন স্থানে যেমন ফিলিপাইনে ধানের উৎপাদন হয় বীজের ৪০০ গুণের মত। এইসব বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু উৎপাদনের সময় তার পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধির দিকে নজর রাখা দরকার। পুষ্টির ক্ষেত্রে রসায়নশাস্ত্রের বিকাশের সীমাহীন পরিধি রয়েছে।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষতঃ ব্রাজিলে, আয়তনে প্রায় সারা ইউরোপের সমান। ব্রাজিলের আয়তন ৮,৫২৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার অথচ জনসংখ্যা ২·২ কোটি যেখানে ইউরোপের আয়তন ৯,৮৯৭,০১০ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৪৩ কোটি। জমির প্রাচুর্য ও উর্বরতার জন্য এই দেশের গর্ব পরিব্রাজকদের বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করে। তাছাড়া এই-দেশসমূহে অফুরাণ আকরিক ও ধাতব পদার্থ আছে। তবুও এসব দেশ এখনও বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ এখানকার জনসাধারণ শ্রমবিমুখ ও সংখ্যায়ও তারা নেহাৎ অল্প, সভ্যতার আলো পেয়েছে সামান্যই এবং শক্তিধর প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে তারা অক্ষম। আফ্রিকার অবস্থা কি রকম সেটা সাম্প্রতিক দশকগুলির আবিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে। মধ্য আফ্রিকার একটি ভাল অংশ ইউরোপীয় চাষের পক্ষে অনুপযোগী হলেও এমন বিরাট বিরাট ভূখণ্ডও রয়েছে, মানুষের উপনিবেশ গড়ার যুক্তিগ্রাহ্য নীতিগুলি প্রয়োগ করা হলে যেগুলিকে ভালভাবে কাজে লাগানো যায়। অন্যদিকে, এসিয়ার সুবিস্তীর্ণ ও উর্বর এলাকাগুলি লক্ষ লক্ষ অগণিত লোকের খাদ্যের সংস্থান করতে পারে। অতীতে আমরা দেখেছি, মৃদু জলবায়ু পেলে প্রায় মরুভূমির মত অনুর্বর স্থানগুলি মূল্যবান পুষ্টির যোগান দিতে পারে যদি মানুষ জানে কিভাবে তাতে জীবনসঞ্চারী জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়। বর্বর ধ্বংসমূলক দেশজয় ও স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর উন্মত্ত নির্যাতনের মাধ্যমে অতি উন্নত ধরণের কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী ও সেচ ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের ফলে পশ্চিম এসিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটস নদীর উপত্যকাগুলির হাজার হাজার বর্গমাইল বালির মরুভূমিতে পরিণত হয়। একই ঘটনা সংঘটিত হয় উত্তর আফ্রিকা, মেক্সিকো ও পেরুতে। যদি সভ্য মানুষ এই সমূহ এলাকায় লক্ষে লক্ষে বসবাস করে তাহলে অফুরন্ত খাদ্যের উৎসের দ্বার খুলে যায়। এশিয়া ও আফ্রিকায় খেজুর গাছের ফল অবিশ্বাস্য প্রাচুর্যে ফলে এবং তাতে এত কম জায়গার দরকার হয় যে, ২০০টি গাছ এক মর্গেন স্থানে (দুই একরের সামান্য বেশি) রোপন করা যায়। মিশরে ডুরা (আটা ময়দার মত গুঁড়ো করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়) নামক শস্য বীজের ৩০০০ গুণ ফলন দেয়। তবুও দেশটি গরিব। জনাধিক্য এর কারণ নয়। বর্বর ধ্বংসকার্যের ফলে যুগ যুগ ধরে মরুভূমি বেড়েই চলেছে, এই গোটা দেশে মধ্য ইউরোপের উদ্যান ও কৃষির কলাকৌশল প্রয়োগ করলে যে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যাবে তা সব হিসাবকে হার মানায়।

বর্তমান কৃষি ব্যবস্থাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বর্তমান জনসংখ্যার (৮·৫ কোটি) ১৫ থেকে ২০ গুন লোকের (১৫০ কোটি থেকে ১৭০ কোটি) অনায়াসে আহারের সংস্থান করতে পারে। অনুরূপভাবে কানাডাও ৬০ লক্ষ মানুষের খাদ্য সংস্থানের পরিবর্তে কোটি কোটি লোককে খাওয়াতে পারে। তারপর দৃষ্টান্তস্বরূপ রয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপ যার মধ্যে অনেকগুলি আয়তনে যেমন বড়, উর্বরতাও তার অসাধারণ। সভ্যতার নামে এখন লোকসংখ্যা কমানো নয়, বাড়ানোর আবেদনই মানবজাতির কাছে পেশ করা হচ্ছে।

সর্বত্রই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বর্তমান উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিই মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি নয়। কয়েকটি উত্তম ফসল উপর্যুপরি খাদ্যের মূল্য এত কমিয়ে দেয় যে অসংখ্য চাষীরই সর্বনাশ হয়। কৃষকের অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই হয়। ভাল ফসলের মূল্য কমে যায় বলে বর্তমানে কৃষকদের এক বৃহদাংশ ভাল ফসলকেই

দুর্ভাগ্য বলে মনে করে। এবং একেই যুক্তিযুক্ত অবস্থা মনে করা হয়। অন্য দেশের ফসল প্রাপ্তি থেকে আমাদের বঞ্চিত করার জন্য খাদ্যশস্যের ওপর চড়া শুল্ক বসানো হয়। এতে বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানী ব্যাহত হয় এবং দেশী বাজারে দাম চড়ে যায়। কারখানার প্রস্তুতজাত বহু সামগ্রীর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সম্পদ ও উৎপাদন সম্পর্কের জন্য যেমন লক্ষ লক্ষ লোক প্রয়োজন মেটাতে পারে না, সেইরকম লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পায়, কারণ খাদ্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তারা তার দাম দিতে অপারগ। এই রকম একটা উন্মত্ত অবস্থা স্পষ্টতঃই বিদ্যমান। যখন ফসল ভাল হয় আমাদের খাদ্যশস্যের মুনাফাখোরেরা ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য নষ্ট করে ফেলে, কারণ তারা জানে, যে পরিমাণ খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয় সেই পরিমাণে তার মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এই অবস্থায় জনাধিক্যের ভয় আমাদের করতেই হয়! রাশিয়া, দক্ষিণ ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গুদাম ও পরিবহনের সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্রতি-বছর লক্ষ লক্ষ সেন্টনার (এক সেন্টনার প্রায় ৫০ কেজির সমান) খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় ফসলকাটার যন্ত্রপাতির অভাবে বা ঠিক সময়ে কাজ করার লোকের স্বল্পতার জন্য প্রতি বছর আরও লক্ষ লক্ষ সেন্টনার খাদ্যশস্যের অপচয় হয়। বহু শস্য-মঞ্জরী ও পরিপূর্ণ শস্যাগার এবং গোটা ভূসম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এর ফলে যে লাভ হয়, তার চাইতে বীমার প্রিমিয়ম অনেক বেশি লাভজনক। একই-কারণে নাবিকসহ শস্যভর্তি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে খাদ্যশস্য বিনষ্ট করা হয়। আমাদের সামরিক অভিযানের সময় ফসলের একটা বিরাট অংশ বছর বছর নষ্ট করা হয়। মাত্র কয়েকদিনের সামরিক অভিযানের জন্য ব্যয় হয় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। এটা সকলেরই জানা বিষয় যে এই হিসাব খুব কম করেই ধরা হয়, এবং অনেক সামরিক অভিযান প্রতি বছরই হয়ে থাকে। একই উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক গ্রামের সম্পূর্ণটাই ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং বিরাট এলাকা কৃষিকাজ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

এটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সমুদ্র হল খাদ্যের একটা সহায়ক উৎস। পৃথিবীর জলভাগ স্থলভাগের ১৮ঃ ৭ অনুপাতে আছে অর্থাৎ জলভাগ স্থলভাগের চাইতে আড়াইগুণ বড় এবং এর অপরিমেয় খাদ্যসম্পদ এখন বিচারবুদ্ধিসম্মতভাবে ব্যবহারের অপেক্ষা রাখে। সম্ভাবনায় ভবিষ্যৎ ম্যালথাসবাদীদের অঙ্কিত জীর্ণ চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পরিশেষে, কে বলতে পারে আমাদের রাসায়নিক, প্রাকৃতিক ও শারীরবৃত্ত সম্পর্কীয় জ্ঞানের শেষ কোথায়? কে সাহস করে বলতে পারে মানুষ আগামী শতাব্দীগুলিতে আবহাওয়া পরিবর্তনের ও জমি ব্যবহারের পদ্ধতির জন্য কি বিরাট বিরাট পরিকল্পনা কার্যকরী করবে?

আজ আমরা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে পরিকল্পনা কার্যকরী হতে দেখি এক শতাব্দী আগে এটাকে অসম্ভব ও উন্মাদ পরিকল্পনা বলেই ভাবা হতো। বিস্তৃত যোজক কেটে সমুদ্রকে সংযুক্ত করা হচ্ছে। অতি উচ্চ পর্বতমালা দ্বারা বিভক্ত দেশকে সংযোজনের জন্য বহু মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পৃথিবীর বুকে খনন করা হচ্ছে। দূরত্ব কমাবার জন্য এবং সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত দেশের নানা বাধা বিপত্তি দূর করার জন্য সমুদ্রগর্ভেও অনুরূপ সুড়ঙ্গ খনন চলছে। "ব্যাস, এপর্যন্তই, আর না!"—এই কথা বলার কে কে? বর্তমান অভিজ্ঞতা 'ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি' (Law of diminishing returns) শুধু যে খণ্ডন করেছে তা নয়, উদ্ধৃত উর্বর জমিও কোটি কোটি লোক দ্বারা কর্ষিত হবার অপেক্ষায় আছে।

এই সমূহ কৃষি প্রকল্প যদি একই সঙ্গে হাতে নেওয়া হয়, আমরা লোকের আধিক্যের বদলে লোকের অতি-স্বল্পতাই অনুভব করব। সামনে যে কাজ পড়ে আছে তা সমাধানের জন্য মানবজাতির প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি দরকার। চাষের আয়ত্ত্বাধীনে আনা জমিরও পরিপূর্ণ ব্যবহার যেমন হচ্ছে না, তেমনই পৃথিবীর ভূভাগের প্রায় তিন চতুর্থাংশ পরিমাণ জমি চাষ করার জন্য প্রচুর লোকেরও অভাব। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রমিক ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর যে আপেক্ষিক জনাধিক্য সৃষ্টি করে, সভ্যতার উন্নত স্তরে তা আশীর্বাদ বলে গণ্য হবে। জনসংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন, তা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়, অন্তরায় হয় না। যেমন, বর্তমানে খাদ্য ও পণ্যের অতি উৎপাদন; নারী ও শিশুকে শিল্পে নিয়োগের ফলে পারিবারিক ভাঙ্গন এবং বৃহৎ পুঁজিপতিদের দ্বারা সমাজের মধ্যশ্রেণীর উৎসাদন ইত্যাদি সবকিছুই সভ্যতার উন্নত স্তরের পূর্বসর্ত হয়।

৫। সামাজিক সম্পর্ক ও সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা

এই সমস্যার অন্যদিক হচ্ছে—মানুষ কি অনির্দিষ্ট হারে বাড়ে এবং এই বাড়ার প্রয়োজন কি তারা অনুভব করে?

মানুষের সন্তান উৎপাদনের বিরাট ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ম্যালথাসবাদীরা সাধারণতঃ ব্যতিক্রমযুক্ত পরিবার ও মানুষের বিরল ঘটনার উল্লেখ করেন। কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। এসব বিরল ঘটনার বিপরীতদিকে আবার এমন ঘটনা আছে যেখানে অনুকূল জীবনযাপন ব্যবস্থার মধ্যেও সম্পূর্ণ বন্ধ্যাত্ব বা নামমাত্র জন্মদান ক্ষমতা অল্পসময় পরেই দেখা দেয়। অবস্থাপন্ন পরিবারগুলি কি দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয় সেটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য অন্য দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এবং প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক, কমবয়সে বসবাসের জন্য এদেশে আসা সত্ত্বেও প্রতি ৩০ বছরে মাত্র জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। বার থেকে কুড়ি বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার কোন দৃষ্টান্ত কোথাও বিরাট আকারে নেই।

ভির্চো ও মার্ক্স থেকে উদ্ধৃত বাক্যসমূহ প্রমাণ করে যে দরিদ্রতম অঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় বেশি দ্রুত। কারণ, ভির্চো সঠিকভাবেই দাবি করেন যে মাদকতা ছাড়াও যৌন সংগমেই হ'ল তাদের একমাত্র আনন্দ। সপ্তম গ্রেগরি (Gregory) যখন যাজকদের উপর চিরকৌমার্যব্রত বাধ্যতামূলক করেন, মেইঞ্জের বিশপের এলাকায় নিম্নপদের যাজকদের অভিযোগঃ প্রধান পুরোহিতদের দেখেই বোঝা যায় যে যারা সম্ভাব্য সব বয়সের আনন্দে যোগদান করতে পারে, তাদের আনন্দের উৎস মাত্র একটিই—তা হ'ল নারীসম্ভোগ। হরেকরকম পেশার অভাবের জন্যও বোঝা যায় কেন গ্রাম্য পুরোহিতদের বিবাহ অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। এটাও অনস্বীকার্য যে জার্মানীর দরিদ্রতম অঞ্চলগুলি যেমন ইউলেনবার্গ (সাইলেসিয়ার), লসিজ, আর্জ, ফিক্টেলজবার্গ, থুরিঙ্গিয়ান

বন, হার্জ প্রভৃতি অধিক ঘন বসতিতে পূর্ণ, যদিও তাদের প্রধান খাদ্য হ'ল আলু। এটাও নিশ্চিত যে যক্ষ্মারোগে আক্রান্তদের যৌন আবেগ বিশেষভাবে তীব্র; এবং শারীরিক অবস্থার অবনতির সময় যখন সন্তান উৎপাদন অসম্ভব মনে হয় তখনই অধিক সন্তানের জন্ম দেয়।

(১) সংখ্যা দিয়ে মানের ক্ষতিপূরণ করাটাই প্রকৃতির নিয়ম। (২) হার্বার্ট স্পেনসার, লাইগু প্রভৃতির উদ্ধৃত বাক্য থেকেও এর সমর্থন মেলে। বড় ও শক্তিশালী পশু যথা হাতী, সিংহ ও উট প্রভৃতি, আমাদের গৃহপালিত পশু যেমন ঘোড়া, গাধা ও গরু প্রভৃতি জগতে কম সন্তানই আনয়ন করে। অন্যত্র নিম্নশ্রেণীর পশুরা বিপরীত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। যেমন সব রকমের পোকামাকড়, অধিকাংশ মৎস্য, নিম্ন স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে খরগোশ, ইঁদুর প্রভৃতি। অন্যদিকে ডারউইন এটা প্রতিষ্ঠিত করেন যে কতকগুলি পশু তাদের প্রজননশক্তি হারিয়ে ফেলে যখন তাদের বশীভূত করে গৃহপালিত করা হয়। হাতী একটা দৃষ্টান্ত। এতে প্রমাণিত হয় যে নতুন জীবন ধারণের পরিবেশ ও পরিবর্তিত জীবন যাপনের পদ্ধতি প্রজনন ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করে দেয়।

এটা বিস্ময়ের বিষয় যে ডারউইনবাদীরাই জনাধিক্যের আতঙ্কের অংশীদার এবং তাদের পাণ্ডিত্যের ওপরই আমাদের আধুনিক ম্যালথাসবাদীরা ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক ডারউইনপন্থীরা যখন তাদের তত্ত্বগুলি মানব জাতির প্রতি প্রয়োগ করেন তখন তাঁদের ভাগ্য সব সময়ই বিরূপ হয়, কারণ তাঁরা সেরা হাতুড়ে পদ্ধতির শরণাপন্ন হন এবং বিস্মৃত হন যে মানুষ যদিও উচ্চ পর্যায়ের জীব এবং প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, যা অন্য পশুরা পারে না—নিজের স্বার্থে প্রকৃতির নিয়মকে ভাল ভাবে কাজে লাগাতে জানে।

অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের তত্ত্বমতে নতুন জীবনের বীজ প্রাণধারণের বর্তমান উপায়ের চাইতে অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান থাকতে পারে। এই তত্ত্ব মানুষের বেলায়ও প্রয়োগ করা যেত যদি মানুষ মস্তিষ্কচালনা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাতাস, জমি ও জলকে ন্যায্যভাবে ব্যবহারের পরিবর্তে তৃণভোজী পশুর মত চরতে থাকত বা বানরের মত অবাধ যৌনকার্যে নিরত থাকত, অর্থাৎ সে যদি বানর হয়ে যেত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, মানুষ বাদ দিলে বানররাই একমাত্র জীব যাদের যৌন আবেগ কোন নির্দিষ্ট সময়ের দ্বারা সীমিত নয়, এটা একটা অকাট্য প্রমাণ যে, এই উভয় জাতির মধ্যে একটা নিকট সম্পর্ক আছে। কিন্তু যদিও তারা নিকট সম্পর্কিত, তারা অভিন্ন নয় এবং তাদের একই পর্যায়ে স্থাপন করা চলে না বা একই মানদণ্ডে বিচার করাও চলে না।

এটা সত্য যে মালিকানা ও উৎপাদনের বর্তমান সম্পর্কের অধীনে ব্যক্তি মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং এখনও করতে হয়। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে অনেকেই ব্যর্থ, জীবনধারণের উপায়ের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এটা নয়। এর কারণ হ'ল—বর্তমান সামাজিক অবস্থায়—এমন একটা জগতে বেঁচে থাকার উপায় থেকে মানুষ বঞ্চিত যেখানে এক বিরাট প্রাচুর্য বিদ্যমান। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করাও অন্যায় হবে যে যখন আজ পর্যন্ত এই ধরণের অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে, কাজেই এটা পরিবর্তনের অতীত এবং কখনও তার পরিবর্তন হবে না। এখানেই ডারউইনবাদীরা স্থানচ্যুত হন। কারণ তাঁরা প্রাকৃতিক ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব অনুশীলন করেন কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন তাঁরা করেন না। সুতরাং গভীরভাবে বিবেচনা করেই তাঁরা বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের পথের পথিক হয়ে যান। এই জন্যই তাঁরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন।

মানুষের সহজাত যৌন উন্মাদনা সারা বছরব্যাপীই থাকে; এটা সবচাইতে শক্তিশালী উন্মাদনা এবং স্বাস্থ্য খারাপ না হওয়া পর্যন্ত তার তৃপ্তি খোঁজে। এই প্রেরণা সাধারণতঃ তীব্র হয় সুস্থ এবং স্বাভাবিক সুঠাম শরীরে, ঠিক যেমন স্বাভাবিক ক্ষিদে এবং হজম সুস্থ পাকস্থলীর লক্ষণ এবং সুস্থ শরীরের মৌলিক পূর্বসর্ত। কিন্তু যৌন প্রেরণায় পরিতৃপ্তি এবং গর্ভসঞ্চার এক কথা নয়। মানব জাতির প্রজনন সম্পর্কে বহুবিধ তত্ত্ব প্রচারিত আছে। মোটের ওপর, আমরা এই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। তার প্রধান কারণ হ'ল, বহু শতাব্দী ধরে মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশের সূত্র অনুসন্ধানে, মানুষের সন্তান উৎপাদন ও বিকাশ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে মানুষকে বিরত রেখেছে বোধশূন্যহীন নিষেধের বেড়া। অবস্থা শুধু ক্রমশঃ পাল্টাচ্ছে এবং আরও পাল্টাতে বাধ্য।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন যে উচ্চতর মানসিক বিকাশ এবং কঠোর মানসিক পরিশ্রম, এক কথায়, উন্নততর স্নায়বিক ক্রিয়াশীলতা যৌন আকাঙ্ক্ষা দমিত করে এবং প্রজননশক্তি দুর্বল করে। এই মতের যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁরা দেখেন যে গড়ে অবস্থাপন্ন শ্রেণীর সন্তান সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং তা শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণের ফল নয়। নিঃসন্দেহভাবে তীব্র মানসিক পরিশ্রম যৌন আবেগ দমন করে, কিন্তু আমাদের সম্পদশালী শ্রেণীর অধিকাংশ এই ধরণের কাজ করে বলা হলে তা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যৌন আকাঙ্ক্ষা দমনে অত্যধিক কায়িক পরিশ্রমের একটা প্রভাব আছে। কিন্তু, সব রকমের অত্যধিক পরিশ্রমই ক্ষতিকর এবং তা বর্জনীয়।

অন্যেরা দাবি করেন যে নারীর জীবনধারা বিশেষতঃ খাদ্যতালিকা ও তার সাথে কতিপয় প্রাকৃতিক অবস্থা মিলিতভাবে তার গর্ভধারণের ও প্রসবের শক্তি নির্দ্ধারণ করে দেয়। পশুর বেলায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে অন্যান্য সব জিনিষের চাইতে খাদ্যই প্রজনন ক্রিয়ার কার্যকারিতাকে বেশি প্রভাবিত করে। এটাই বস্তুতঃ প্রধান নিয়ামক শক্তি হতে পারে। কোন কোন প্রাণীর জীবকোষের ওপর খাদ্যের প্রভাব বিস্ময়করভাবে প্রদর্শিত হয়েছে মৌমাছির বেলায়। বিশেষ খাদ্য প্রদানের দ্বারা ইচ্ছামত রাণীর জন্মদান চলে। মৌমাছিরা তাহলে তাদের যৌনবিকাশের জ্ঞানে মানুষের চাইতে অগ্রগামী। খুব সম্ভবতঃ গত দু' হাজার বছর ধরে তাদের মধ্যে এটা প্রবেশ করানো হয়নি যে যৌন ব্যাপারে আলোচনা "অশ্লীল" ও "নীতিবিগর্হিত"।

এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে উৎকৃষ্ট ও ভাল সার দেওয়া জমিতে গাছ খুব বিপুলভাবে বাড়ে কিন্তু ফল দেয়না। এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই যে মানুষের বেলায়ও পুরুষের শুক্রকীট গঠনে ও নারীর ডিম্ব ফলপ্রসু করণে খাদ্যের প্রভাব আছে। কাজেই মানুষের প্রজনন ক্ষমতার অনেকখানি নির্ভর করে তাদের খাদ্যের প্রকৃতির ওপর। এ

ব্যাপারে অন্য কিছু বিষয়েরও ভূমিকা আছে যদিও তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু জানা যায়নি।

ভবিষ্যতে জনসংখ্যার প্রশ্নে অত্যন্ত নিষ্পত্তিমূলক গুরুত্বের বিষয় হবে বিনা ব্যত্যয়ে আমাদের সকল নারীর উচ্চতর ও অধিকতর স্বাধীন অবস্থায় অবস্থান। ব্যতিক্রম বাদ দিলে ভগবানের দান হিসেবে অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে, জীবনের সর্বোত্তম বছরগুলি গর্ভবতী থাকতে বা কোলে একটি শিশু নিয়ে বুকের দুধ দিয়ে কাটাবার ইচ্ছে বুদ্ধিমতী ও তেজী মহিলাদের নেই। ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গর্ভবতী নারী ও জননীদের যত উন্নত ব্যবস্থাই করুক না কেন অধিক সংখ্যক সন্তান না পাওয়ার প্রবণতা (এমনকি এখনও যা অধিকাংশ নারীর মধ্যে আছে) না কমে বরং বাড়বে। আমাদের মতে এর অর্থ এই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া সমাজের চাইতে জনসংখ্যা খুব সম্ভবতঃ অনেক ধীরে বাড়বে।

ভবিষ্যতে মানব জাতির বৃদ্ধি নিয়ে আমাদের ম্যালথাসীয়দের মাথা ঠোকার সত্যই কোন হেতু নেই। আজ পর্যন্ত কোন জাতি লোকসংখ্যা হ্রাসের জন্য ধ্বংস হয়েছে বলে জানা যায়নি, জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তো নয়ই। সর্বশেষ বিশ্লেষণে বলা যায় যে সমাজ ক্ষতিকর মিতাচার ও অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলবে, সেই সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবে। এই বিষয়েও ভবিষ্যৎ কার্ল মার্ক্সের যাথার্থ প্রতিপাদন করবে। প্রত্যেক অর্থনৈতিক বিকাশের সময়কালে, তার নিজস্ব একটা বিশেষ জন্ম-মৃত্যু বিধি থাকে, সমাজতন্ত্রের অধীনেও মার্ক্সের এই অভিমত সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

এইচ ফার্ড 'বংশের কৃত্রিম সীমাবদ্ধতা' গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন—"ম্যালথাসবাদের তীব্র বিরোধিতা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের একটা বদমাইসি মাত্র। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হলে জনগণের দারিদ্র্য বাড়বে এবং এর ফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। জনাধিক্য যদি রোধ করা হয় তাহলে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির অবসান হবে এবং সমস্ত চাকচিক্যসহ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্র চিরকালের জন্য কবরস্থ হবে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে উৎখাতের জন্য অন্যান্য অস্ত্রের মধ্যে আরও একটি অস্ত্র আমাদের বাড়ল—তা হ'ল ম্যালথাসবাদ।"

অধ্যাপক এডলফ ওয়াগনার জনাধিক্যের আতংকে পীড়িত ব্যক্তিদের একজন। তাঁর দাবি হল, বিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্রমিকদের বিয়ে করা ও বাসস্থান নির্বাচনের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত। তিনি অভিযোগ করেন যে মধ্যবিত্তদের তুলনায় শ্রমিকরা অতি অল্প বয়সেই বিয়ে করে। এই একই মতাবলম্বী অনেকের মত তিনিও এই সত্য অগ্রাহ্য করেন যে মধ্যবিত্তেরা নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী বিয়ে করার অবস্থায় যখন আসেন, তখন তাঁদের বয়েস হয়ে যায় অনেক। কিন্তু তারা তাদের এই মিতাচারের ক্ষতিপূরণ করে গণিকাসক্ত হয়ে। শ্রমিকদের বিয়ের ক্ষেত্রে যদি বাধা সৃষ্টি করা হয় তারাও একই পথে ধাবিত হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এর পরিণতি সম্পর্কে কোন অনুযোগ থাকা উচিত নয় এবং "ধর্ম ও নৈতিকতা গেল গেল" বলে চীৎকারও যেন না ওঠে। যদি পুরুষ ও নারী (কারণ নারীরও পুরুষের মতই অনুভূতি) স্বাভাবিক যৌন কামনা চরিতার্থ করতে অবৈধভাবে মিলিত হয় এবং সহর ও পল্লী বীজের মত অবৈধ সন্তানে ভরে দেয় তাহলেও রাগ করা উচিত নয়। ওয়াগনার অ্যান্ড কোম্পানির মতবাদ বুর্জোয়া স্বার্থের ও আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের বিরোধী। কারণ এর জন্য প্রয়োজন হয় যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কাজের লোক যাতে একটা শ্রমিক বাহিনীকে প্রতিযোগিতার জন্য দুনিয়ার বাজারে নিক্ষেপ করা যায়। বর্তমান যুগের পাপ পঙ্কিলতা মামুলি প্রস্তাবগুলিতে দূর করা যাবে না, যে প্রস্তাবের উৎসস্থান হ'ল অদূরদর্শী বৈষয়িকতাবাদ ও পশ্চাদপদতা। বিংশ শতাব্দীর এই প্রথমভাগে কোন শ্রেণীর বা রাষ্ট্রশক্তির এমন শক্তি নেই যে সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে পিছু টানে ধরে রাখতে পারে বা তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে। এই জাতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বিকাশের জোয়ার এত শক্তিশালী যে তা সমস্ত বাধাই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পেছনের দিকে নয়, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই আজকের রণধ্বনি। যে এখনও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশকে ঠেকিয়ে রাখাতে বিশ্বাস করে, সে নির্বোধ মাত্র।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানবজাতি সর্বপ্রথম যথার্থ স্বাধীন হবে এবং স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী জীবনধারণ করবে। মানবজাতি তখন তার নিজের বিকাশকে সচেতনভাবে চালিত করবে। পূর্ববর্তী যুগসমূহে মানুষ উৎপাদন ও বণ্টন এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে। এবং তা করেছে কোন্ নিয়মে তারা শাসিত হচ্ছে সেটা না জেনেই অর্থাৎ অচেতনভাবে। নতুন সমাজে স্বীয় বিকাশের নিয়মধারা সম্পর্কিত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে মানবজাতি কাজ করবেন সচেতনভাবে এবং পরিকল্পনা-মাফিক।

সমাজতন্ত্র হচ্ছে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিজ্ঞান।

[ভাষান্তর—মৃদুল দে]

[অগাস্ট বেবেল ছিলেন জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একজন সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় নেতা। ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের ভাষায়, অগাস্ট বেবেল ছিলেন জার্মান পার্টির সবচেয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মননের এবং অগাস্ট বেবেল এমন একজন ব্যক্তি সবসময়ে ও যে কোন অবস্থায় যাঁর ওপর নির্ভর করা যায়, কোনকিছুই তাঁকে বিপথগামী করতে পারে না। ১৮৪০ সালে তাঁর জন্ম ও ১৯১৩ সালে তাঁর মৃত্যু। প্রায় এক শতাব্দী আগে জনসংখ্যা সম্পর্কে বুর্জোয়া নীতিবাগীশদের যে তত্ত্ব বেবেল খণ্ডন করেছেন, আজ সেই অসার তত্ত্বই নয়া-ম্যালথাসবাদীরা বুর্জোয়াদের প্রবক্তা হিসেবে হাজির করছে। মানুষের এত দুঃখ দুর্দশা ও দারিদ্র্যের জন্য বুর্জোয়ারা দায়ী করছে একমাত্র জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে। কিন্তু আসলে তার জন্য দায়ী শ্রেণীবিভক্ত সমাজের লাগামহীন শোষণব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্য। বেবেল সমাজতান্ত্রিক সমাজ দেখে যেতে পারেননি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনসংখ্যার এই সমস্যাকে সমাধান করা হয়েছে। ম্যালথাসবাদীদের প্রচারকে আরও অসার করার মতো তথ্যপ্রমাণ ও দৃষ্টান্ত বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা রেখেছে। পরবর্তী সংখ্যায় তা আলোচিত হবে।

—অনুবাদক]

রাজশেখর কিম্বা পরশুরাম : একটি ধ্রুপদী ব্যক্তিত্ব

গৌতম ঘোষদস্তিদার

এখন এ-কথা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় যে, রাজশেখর বসু গত শতকের এক উজ্জ্বল চরিত্র—প্রজ্ঞায়, প্রতিভায়, ব্যক্তিত্বে, হাস্য-পরিহাসে তাঁর মত ঋজু পুরুষ ওই শতকে আর খুব কমই জন্মেছেন। বেঙ্গল কেমিকেলের বৈজ্ঞানিক কর্মশালা থেকে এক প্রতিভাবান রসায়নবীদ হঠাৎ যে-ভাবে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ ক'রে সকলকে সচকিত ক'রে তুলে-ছিলেন, সেটা ছিল অনেকটাই অভাবনীয়। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি সাহিত্যজগতে একটি বিশেষ স্থান ক'রে নিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। এমনকি, বৈজ্ঞানিক রাজশেখরের সাহিত্যিক রূপে আকস্মিক আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের মত পাঠককেও বিস্মিত ক'রে তুলেছিল, তিনি রাজশেখরের প্রতিভাকে স্বাগত জানিয়ে-ছিলেন। এবং পরবর্তীকালে প্রমাণিত হ'য়েছিল যে তিনি 'খাঁটি খনিজ সোনা' চিনতে একটুও ভুল করেন নি।

বাংলাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথ নামে সূর্যটি ঈষৎ স্তিমিত হ'য়ে এলেও পাশাপাশি উজ্জ্বল তারকার অভাব ছিল না। ছোট গল্পের জগতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী এবং শরৎচন্দ্র তো আসর জাঁকিয়ে আছেনই, উপরন্তু জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ তৎকালীন তরুণ লেখকগণ ক্রমশই স্বপ্রতিভায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ক'রছেন। রবীন্দ্রানুগত্য এবং রবীন্দ্রবিরোধিতার পরস্পর বিরোধী পথে বাংলাসাহিত্য পূর্ণতার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্য আন্দোলনের এই দুই বিপরীত জলোচ্ছ্বাসে রাজশেখর বসু ওরফে পরশু-রাম একটুও তলিয়ে না গিয়ে, একটি স্থির বাতিস্তম্ভের মত বাংলাসাহিত্যের অন্তস্থলে সুদৃঢ় শিকড় চালিয়ে দিয়ে-ছিলেন। জীবনকে—জীবনের স্থিতি কিম্বা ভঙ্গুরতাকে ঔপনিবেশিক বা ফ্রয়েডীয়—কোন চোখেই না দেখে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে দেখতে এবং দেখাতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তার রহস্যের চাবিকাঠি ছিল এক অনাবিল হাস্যরস মহিমায় প্রোথিত। তিনি একরূপ স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, অনুসূয়, সংযত হাস্যরস ধারায় বাংলাসাহিত্যকে সঞ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

আমরা আগে যে-ক'জন গল্পকারের উল্লেখ ক'রেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই জীবনকে নানা ভাবগম্ভীর দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। শুধুমাত্র প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ছাড়া হাস্য-রসের সাহিত্যিক প্রয়াস আর ক'রো মধ্যে তেমন লক্ষ্যগোচর হয় নি। অবশ্য, সমকালে না হ'লেও বাংলা সাহিত্যে হাস্য-রসের প্রবর্তন ঘটেছিল আরো আগে। ঈশ্বর গুপ্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, এমনকি বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হাস্যরসের প্রবাহকে আরো গতিশীল করেছিলেন। তাই রাজশেখর বা পরশুরামের রচনা একেবারে ঐতিহ্যহীন এবং আকস্মিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত, লোকরহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত, রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, হিং-টিং-ছট, জুতা আবিষ্কার ইত্যাদি দুর্লভ হাস্যরসের সাহিত্য পরশুরামের আগেই লেখা হ'য়ে গেছে। তবে বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সকলের রচনাই বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আঘাতধর্মী।

কিন্তু পরশুরামের অবলম্বন ছিল একমাত্র বিশুদ্ধ হাস্য-রস। তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের রচনায় যতটুকু রুদ্ধতা এবং সীমাবদ্ধতা ছিল তার অনায়াস অপসারণ ঘটেছে রাজশেখরের হাতে। বস্তুত, তাঁর গল্পগুলির আড়ালে সমাজ সমালোচনার কটাক্ষ থাকলেও তাঁর হাস্যরস-রসিকতা কখনোই বিদ্রূপাত্মক 'স্যাটায়ার'-এ পরিণত হয় নি। যদিও তাঁর রচনায় ভণ্ড গুরু, ধূর্ত ব্যবসায়ী, নারীলোলুপ যুবক, ন্যাকা যুবতী, সুযোগ-সন্ধানী ডাক্তার ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে নরনারী তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হ'লেও, তিনি কখনোই কিন্তু তাদের মানবিক মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেন নি। তাঁর 'পরশুরাম' ছদ্মনাম গ্রহণে এরকম মনে হ'তেই পারে যে, তিনি বোধহয় বিভিন্ন সামাজিক অসংগতির ওপর কুঠারাঘাত হানার প্রেরণায় ওইরূপ নামগ্রহণ ক'রে-ছিলেন। কিন্তু ঘটনা আদৌ সেরকম নয়। তাঁর নিজের ভাষায় এই পরশুরাম হ'ল 'একজন স্যাকরা'। পৌরাণিক পরশুরামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।......এই নামের পিছনে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নেই। পরে আরো লিখবো জানলে ও-নাম হয়তো নিতাম না'।

১৯২২ সালে, ৪২ বছর বয়সে (একজন লেখকের গুণাগুণ যে-বয়সে স্পষ্ট নির্ধারিত হয়ে যায়) তিনি লেখেন জীবনের প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'—এই প্রথম গল্পেই তিনি দারুণ হৈ-চৈ ফেলে দিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। গল্পটি প'ড়ে অনেকে ধারণা ক'রেছিলেন যে তা কোন আইনজীবীর রচনা। কেননা, একটি লিমিটেড কোম্পানী গড়ে তোলার যে কূটকৌশল তিনি এখানে বর্ণনা ক'রেছেন, তা আইনবিদ্যা জানা না থাকলে অসম্ভব। আবার এই গল্পেই হাস্যচ্ছলে বৈজ্ঞানিক রাজশেখরের কুমড়োর সাথে কসটিক পটাশের

রাসায়নিক সংমিশ্রণে ভেজিটেবিল স্‌' তৈরীর আজব পরিকল্পনা আমাদের অনাবিল হাস্যরসের সন্ধান দিয়ে যায়। এবং সেই সাথে অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতি তিনি কীরকম ক্রুদ্ধ ছিলেন, এই গল্পটি তারও প্রমাণ। তবে সমাজ সংস্কার বা সমালোচকের তিক্ততা তাঁর রচনায় কখনোই প্রকট নয়। কেননা তাঁর সামাজিক ক্রোধ এবং ঘৃণা তাঁর চরিত্রেরই অন্তর্গত বিষয়. তাই তার প্রকাশ এত স্বতোস্ফূর্ত। তাঁর চরিত্রে কোন অন্ধ সংস্কার ছিল না, তাই তিনি সাদাকে সাদা, কালোকে কালো রূপে দেখতে পেয়েছিলেন। এবং এই সংস্কারহীনতার কারণেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো এত জীবন্ত। সেজন্যেই শিহরণ সেন, লালিমা পাল (পুং), দোদুল দে. বিগলিত ব্যানার্জী, গন্ডোরিরাম বাটপারিয়া, পেলব রায়, অকিঞ্চিৎ কর. ইত্যাদি চরিত্র এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ আজো আমাদের পুলকিত করে। তাঁর শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, কচিসংসদ, গড্ডালিকা. চিকিৎসা-সংকট, বিরিঞ্চি বাবা, কজ্জলী, ধুস্তরীমায়া, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি অসংখ্য উজ্জ্বল ছোটগল্প রাজশেখরের অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কৌতুকরস সৃষ্টির দুর্লভ শক্তি, বুদ্ধির শাণিত উজ্জ্বলতা এবং ব্যঙ্গরস পরিবেশনে এখনো আমাদের অত্যন্ত আকর্ষণের বিষয় হ'য়ে আছে। হাস্যরসকে ধ্রুপদী পর্যায়ে উন্নীত করার সমস্ত গৌরব তাঁর প্রাপ্য।

পরশুরামের প্রতিভা যে কতটা বৈচিত্র্যধর্মী, তা বোঝা যায় তাঁর অন্যান্য গম্ভীর গ্রন্থের পরিচয় নিলে। বাংলা বানান সমস্যা সমাধানের তিনি ছিলেন এক উত্তম নায়ক। অশুদ্ধ শব্দ এবং শব্দের অপপ্রয়োগ এবং ভাষার স্বেচ্ছাচার তাঁকে পীড়িত করেছিল। তাই শব্দচিন্তা এবং পরিভাষা প্রণয়নে তিনি একক প্রচেষ্টায় অনেকদূর এগিয়ে ছিলেন। তবে শব্দের এবং বানানের শুদ্ধতা রক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকলেও তিনি কখনোই পান্ডিত্যের অন্ধ অহংকার দ্বারা পরিচালিত হননি। মাতৃভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা অপেক্ষাও বিদেশী ভাষা থেকে শক্তি সঞ্চয় করার দিকেও তাঁর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিদেশী শব্দ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, 'অপ্রয়োজনে আহার করলে অজীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না'। অন্ধ সংস্কার নয়, তাঁর কাছে এই প্রয়োজনটাই ছিল বড় কথা।

১৯৩০ সালে 'চলন্তিকা' প্রকাশের সাথে-সাথেই রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার প্রমুখ শব্দ-বিশারদেরা তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করলেন। এই কিম্বদন্তীপ্রতিম অভিধানে বাংলা বানান এবং শব্দের ব্যবহার, সাধু-চলিত ক্রিয়াপদ, তৎসম শব্দের বানানরীতি, ব্যকরণের দুরূহ তত্ত্ব ইত্যাদির একটি বিশেষ আদর্শ স্থির করতে চেয়েছিলেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি তাঁর অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ ক'রে বাংলা ভাষার অশেষ উপকার ক'রেছেন। তাঁর 'চলন্তিকা' এখনো আমাদের কাছে একটি পরম নির্ভরযোগ্য হ্যান্ডবুক।

বুদ্ধদেব বসুর বিশেষ অনুরোধে তিনি বাংলা ছন্দ বিষয়েও আগ্রহী হ'য়েছিলেন। তবে তাঁর মহত্তম কাজ বাংলা পরিভাষাকে একটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা। এছাড়াও রামায়ণ, মহাভারতের সরস চলতি গদ্যানুবাদ ক'রে তিনি অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে হাস্যরসের কারবারী মানুষটি কীভাবে শব্দ চর্চা, ছন্দ চর্চা, অনুবাদ ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়েও একজন কিম্বদন্তীর নায়ক হ'য়ে উঠেছিলেন। আসলে, তাঁর ব্যক্তিত্বে দু'টি স্পষ্ট ভাগ ছিল— পরশুরাম এবং রাজশেখর। প্রথমজন যেখানে হাসির স্রোতে আমাদের একেবারে ভাসিয়ে দেন, তিনিই আবার দ্বিতীয়জন হ'য়ে আমাদের জ্ঞান পিপাসার সহায়ক হন, যিনি আমাদের স্রোতে ভাসান তিনিই আবার শৃঙ্খলিত করেন। বস্তুত পক্ষে, প্রজ্ঞা এবং আনন্দের সহাবস্থানে রাজশেখর এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, এক কিম্বদন্তীর পুরুষ।

তারুণ্যের বিজয় উৎসব বাগমুণ্ডিতে

জি. এম. আবুবকর

গত ১৮ই এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল বাগমুণ্ডিতে অনুষ্ঠিত হোল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত যুব উৎসব '৮০।

এতদঞ্চলে এর পূর্বে কখনো এমন বৈচিত্র্যেভরা বর্ণময় আনন্দ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়নি। উৎসব প্রাঙ্গণ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল পলাশ কুসুম শাল পিয়াল বৃক্ষশোভিত পাথরডি গ্রাম। তার পিছনে বিস্তীর্ণ উদার অযোধ্যা পাহাড় নৈসর্গিক দৃশ্যপট হয়ে দাঁড়িয়ে। এই প্রখর গ্রীষ্মের দিনেও এখানে এলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মায়ায় মন আপনা থেকে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যুব উৎসবের খেলাধূলার আঙ্গিনা হিসেবে ছাতাটাড়ের বি এস এ ময়দানকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর জন্য বি-ডি-ও-অফিসের পিছনের খোলা মাঠে অনুষ্ঠান মঞ্চ ও প্রদর্শনী মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল।

খেলাধূলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে পুরুষ বিভাগে ছিল ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ দৌড়, উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফন, বর্শা, লৌহ গোলক ও তীর নিক্ষেপ এবং সাইকেল রেস। মহিলা বিভাগে ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন, বর্শা ও লৌহ গোলক নিক্ষেপ এবং মিউজিক্যাল চেয়ার। অনুর্দ্ধ চোদ্দ বছর বয়সী বালকদের জন্য ১০০ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন ও ক্রিকেট বল নিক্ষেপ এবং বালিকাদের ৭৫ মিঃ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন ও মাটির কলসী মাথায় করে ভারসাম্যের দৌড়। এছাড়া সকলের জন্য মজাদার 'যেমন খুশী সাজো'। আর ছিল পুরুষদের আটটি দলের লাঠিখেলা। একটি প্রদর্শনী ম্যাচ ছিল 'ছুর' খেলার। এই গ্রামীণ খেলাটির স্থানবিশেষে নাম 'দাঁড়িয়া বান্ধা'।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কয়েকটির হিট ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৮শে মার্চ। ওইদিন বিকেলে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টি নামে। ফলে মাঝপথে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। উৎসবে সমস্ত খেলাধূলার মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৫৪৬ জন। পুরুষদের তীর ছোঁড়ায় ও বালকদের ১০০ মিঃ দৌড়ে শতাধিক করে প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে।

১৮ই এপ্রিল অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল সাতটায় সাইকেল রেস দিয়ে। ওই সময় মাঠে উপস্থিত ছিলেন ল্যান্ড রিফর্মস্ কমিশনার ও অন্যান্য অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ। সাইকেল রেস ছিল যুব উৎসবের অন্যতম আকর্ষণীয় খেলা। ২৩টি যুবক উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে জাইরার মোড় পর্যন্ত কালীমাটি গামী ২০ কিলো মিটার কংক্রীটের রাস্তায় সাইকেলে জোর ছুটেছেন। রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে তাদের দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠেছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন।

এদিকে খেলার মাঠে শুরু হয়েছে পুরুষ ও মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সেখানেও ক্রীড়ামোদী দর্শকের ভিড়। সমস্ত খেলাধূলা বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে শেষ হয়েছে ফলে প্রখর রৌদ্রের তাপ খেলোয়াড়দের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

'বৈকালিকী বৈঠকে' ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। খুবই পরিচিত কবিতা, বড়োদের জন্য সুকান্তের 'প্রিয়তমাসু' আর ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন'। 'সান্ধ্যবাসরে' ঝুমুর সংগীত প্রতিযোগিতায় ৬৫ জন শিল্পী অংশ নিয়েছেন। শিল্পীদের অনেকেই রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, দিনু তাঁতী, ভব প্রীতানন্দ, বিনন্দা সিং এর পদ গেয়েছেন। প্রতিযোগিতায় বয়সের কোন বিধিনিষেধ ছিল না। তাই ১০ বছরের কনিষ্ঠ শিল্পীর পরে ষাটোর্দ্ধ প্রবীণ শিল্পীকেও সংগীত পরিবেশন করতে দেখা গেছে। কণ্ঠ মাধুর্যের সৌকর্যে উভয়েরই গান উপভোগ্য হয়েছে। ঝুমুরের অনুষঙ্গ মাদল বাঁশি। শিল্পীদের অনেকে হারমোনিয়াম ব্যবহার করেছেন। অনেকে মাদলের পরিবর্তে তবলা ব্যবহার করেছেন। অনেকে কোন যন্ত্রানুসঙ্গ ছাড়াই গান পরিবেশন করেছেন।

'নৈশ আসরে' আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্থানীয় সাঁওতালী নাচের দলগুলি অংশ নিয়েছে।

প্রথমদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সংগীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র (শার্ঙ্গদেব), কলকাতার প্রখ্যাত লোক সংগীত শিল্পী দীনেন্দ্র চৌধুরী। তিনি ঝুমুরগানের আকর্ষণে বাগমুণ্ডির যুব উৎসবে এসেছেন। আর ছিলেন পুরুলিয়ার প্রবীণ বিদগ্ধ ব্যক্তি, 'সমবায়ের কথা'র সম্পাদক ও আকাশবাণী সংবাদদাতা অশোক চৌধুরী, 'ছত্রাক' পত্রিকার প্রতিনিধি নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। এবং ছো-নৃত্য ও ঝুমুর গানের প্রবীণ রসিক সমজদার ও পৃষ্ঠপোষক, ভবানীপুর গ্রামের ভ্রাতৃদ্বয় শিবজেন্দ্র সিংহদেব ও ব্রজেন্দ্র সিংহদেব।

১৯শে এপ্রিল সকালে খেলার মাঠে ছোটদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চোদ্দবছর বয়সী ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়েছে। বৈকালিক অনুষ্ঠানে ছিল নির্বাচিত ঝুমুরগানের অনুষ্ঠান

'ঝুমুরিয়া'। এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকের ঝুমুর—দাঁড়, ভাদরিয়া, বৈঠকী, পালা, দেহতত্ত্ব, ঢয়া, ঝিঙাফুলী, ডমকোচ, খেমটা, উদাসা, কীর্ত্তনা, লগনসাহী প্রভৃতি। সুরবৈচিত্র্যে ও মাধুর্যে সমৃদ্ধ লোকসংগীতের এই ধারাটি মানভূমের গ্রামের মানুষেরা বুকে করে ধরে রেখেছেন। কীর্তনের মতো ঝুমুরগানে আছে রাধা কৃষ্ণের প্রেমকথা। সংগীত সমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্র অভিমত প্রকাশ করেছেন, ঝুমুরের ইতিহাস কীর্তনের চেয়েও পুরানো। মানভূমের মানুষের কাছে এ সংগীতের মর্যাদা জাতীয় সংগীতের মতো।

অনুষ্ঠানে সুভাষ ভকত গেয়েছেন ভাদরিয়া আর ডমকোচ। 'কাচ মরকত নবীন জড়িত/সুকোমল তনু শ্যামল/ভুরু দুটি আঁকা, ঈষৎ বাঁকা/বাঁকা আঁখি দুটি ঢলঢল/দেখে যা সখী ভরিয়া আঁখি/নাগর রূপে বন করিয়াছে আলো।' অপূর্ব গেয়েছেন তরুন গায়ক সুভাষ। অনুষ্ঠানে আকাশবাণীর প্রতিনিধি সোমনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বেতারের জন্য গানটি টেপরেকর্ডে তুলে নিয়েছেন। শ্রোতারা পরপর অনুরোধ করে গেছেন অন্য একজন নবীন শিল্পী অবনীপ্রসাদ সিংহের একাধিক গান শোনার জন্য। এছাড়া সংগীত পরিবেশন করলেন খুদুডি গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ শিল্পী সুচাঁদ মাহাতো। এই শিল্পীর নাচনীনাচে ও ঝুমুরগানের অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি যন্ত্রানুসঙ্গ ছাড়াই ধরলেন দুর্যোধন দাসের পদ একটি দরবারী ঝুমুর—'কে না যায় যমুনার জলে/কে না চায় কালার কদমতলে গো/তবে কেন মন্দ বলে আমায় পরস্পর।' শিল্পীর আর সেই গানের গলা নেই। তবু অস্তমিত সূর্যের দিগন্তভালে ছড়িয়ে থাকা রক্তিমাভার মতো তাঁর কণ্ঠে আছে ছন্দ, লয় আর বৈঠকী ঢঙ। এই অনুষ্ঠানে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সংগীত পরিবেশন করলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছো-নৃত্য শিল্পী গম্ভীর সিং। 'ঝুমুরিয়া' অনুষ্ঠানটি বিদগ্ধজনদের প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছিল।

এর পরের অনুষ্ঠান ছিল আলোচনাচক্র। বিষয়—পুরুলিয়া জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার স্থান। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় বিদগ্ধ ব্যক্তি বিরিঞ্চি মোহন দে ও নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ্যেশ্বর মিত্র। শ্রীমিত্র তাঁর আলোচনায় ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুরুলিয়ার লোক-সংস্কৃতির স্থান নিয়ে তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

আলোচনাচক্রের পর গুণীজন সম্বর্দ্ধনা সভায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছো-নৃত্য শিল্পী চড়িদার গম্ভীর সিং মুড়াকে ও ঝুমুরগান ও নাচনীনাচের প্রবীণ অশিতিপর বৃদ্ধ শিল্পী সুচাঁদ মাহাতোকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হলো। যুব উৎসব কমিটি ও বাগমুণ্ডির অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এঁদের দুজনকে স্মারক হিসেবে দুটি সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত উষ্ণীষ পরিয়ে দিয়েছেন। গম্ভীর সিং তাঁর নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, তাঁর বাল্যকাল দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। ছোটবেলায় তিনি গরু-বাগালী করতেন আর নদীর ধারে বালির উপর একা একা নাচতেন। এইভাবে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তবে তাঁর রক্তে ছিল নাচের ছন্দ। সেকালের প্রখ্যাত ছো-নৃত্য শিল্পী জিপা সিং তাঁরই পিতা। গম্ভীর সিং এবং তাঁর দল স্বদেশে বিদেশে শত শত অনুষ্ঠানে ছো-নৃত্য পরিবেশন করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছেন। ছো-নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তাঁর অবদান অপরিমেয়।

সুচাঁদ মাহাতো প্রথমে নিজের সম্পর্কে মুখ খুলতে চাননি। পরে সকলের অনুরোধে রাজী হয়ে যা বলেছেন তা সকল শিল্পীজীবনেরই মর্মকথা। তিনি সারাটি জীবন অবিরামভাবে নৃত্য গীতের মাধ্যমে রূপ ও রসের সৃষ্টি করে এসেছেন। আজ জীবনের সায়াহ্নকালে উপস্থিত হয়ে তাঁকে যে এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে এনে সম্মান জানানো হলো এজন্য তিনি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে সবাই গুরুত্ব দিয়ে একটি কথা বলেছেন যে, এই ধরনের গুণীজন সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করে যে সমস্ত লোকশিল্পীরা জীবনভর কোন একটি শিল্পের জন্য সারাটা জীবন ব্যয়িত করলেন তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করাকে সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের আশু কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা উচিত।

ছো-নৃত্যের আসর বসলো রাত্রি দশটায়। আসরে লোকে লোকারণ্য। দূর দূর গ্রাম থেকে লোক এসেছে সারারাত ধরে ছো-নাচ দেখার জন্য। পুলিশ আর ভলান্টিয়াররা ভিড় সামলাতে হিমশিম খেয়েছে। উপচে পড়া ভিড় মাঝে মাঝে মঞ্চের সামনে নাচের জন্য নির্দ্ধারিত জায়গায় ঢুকে পড়ছে। অনেকে খালিগায়ে বিপদের সহচর টাঙি কিম্বা লাঠি হাতে নিয়ে বনের পথ ভেঙে উপস্থিত হয়েছে আসরে। আঠারোটি দলের প্রতিযোগিতামূলক নৃত্য। ছো-নৃত্যের প্রত্যেকটি পালা রামায়ণ মহাভারতের কোন একটি বীর রসাত্মক কাহিনী অবলম্বনে পারকল্পিত। প্রত্যেক নৃত্যশিল্পী তাঁর নির্দিষ্ট চরিত্রের মুখোশ এঁটে দলগত নৃত্য পরিবেশন করবেন।

আসরে একজন বিদেশিনী অতিথি উপস্থিত ছিলেন। মিস্ সুসান হকস্—তিনি ইংলণ্ড থেকে এসেছেন ছো-নৃত্য কলার উপর গবেষণা করতে। বাগমুণ্ডির যুব উৎসবের সংবাদ পেয়ে উৎসাহ অনুসন্ধিৎসু নিয়ে হাজির হয়েছেন আসরে। এই অল্পবয়সী তরুণী সারারাত জেগে ছো-নাচ দেখেছেন, তাঁর দামী ক্যামেরায় মুহুর্মুহু ছবি তুলেছেন আর নোট লিখেছেন।

প্রথম নৃত্য পরিবেশন করলেন অযোধ্যা পাহাড়ের কৃত্তিবাস মাহাতোর দল গণেশ বন্দনা দিয়ে। ছো-নৃত্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রত্যেকদল নৃত্য শুরু করার আগে গণেশ বন্দনা করেন। বিচারকরা সময়াভাবের জন্য কেবল প্রথমদলকে গণেশ বন্দনার সুযোগ দিয়েছেন। ধমসা, ঢোল আর সায়নার (শানাই) আওয়াজে মেলা প্রাঙ্গণ গমগম করতে লাগলো। কৃত্তিবাস মাহাতোর দলের গণেশ বন্দনার পর ছাতাটাড়ের বিবেকানন্দ ক্লাবের কিরাত অর্জ্জুন পালা, কড়েং এর চরণ মাহাতোর দলের গো-সিংগা বধ, বুকাডির দলের সাত্যকী ভূরীসর্বা বধ। রেলার ধনঞ্জ সিং মুড়ার দলের অভিমন্যু বধ (প্রথমস্থান), বুড়দার তরুণ সংঘের রক্তবীর্য অসুর বধ (দ্বিতীয়), সিন্ধির খুল্লু মাহাতোর দলের শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ (তৃতীয়) নৃত্য পরিবেশন খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ছো-নাচ যখন শেষ হলো তখন ভোরের পাখিরা গান গাইছে, পূর্বাকাশে রক্তিম সূর্য উঁকি দিয়েছে।

উৎসবের শেষদিনে সকাল আটটায় আটটি দলের লাঠি-খেলা হয়েছে। লাঠিখেলার সঙ্গে ছিল ঢোল আর সানাইয়ের

বাজনা। এই বাজনা না থাকলে খেলায় মেজাজই আসেনা। লাঠির পরে ছিল তিনদলের গ্রামীণ 'ছৌ' খেলা। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল পুরস্কার বিতরণী উৎসব। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সুবোধ বসু রায়, প্রবীণ অতিথি রাজ্যেশ্বর মিত্র এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মিস্ সুসান হক্স্। যুব উৎসবের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে মানপত্র ও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পুরস্কার বিতরণী উৎসবে।

পুরস্কার বিতরণের পর ছিল 'বিচিত্রা' নামাঙ্কিত অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, গণসংগীত, নৃত্য-গীতি, আধুনিক গান, ইত্যাদি পরিবেশন করেন। প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী দীনেন্দ্র চৌধুরীও সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের উদ্দীপিত করেন।

যুবউৎসবের শেষ অনুষ্ঠান ছিল গম্ভীর সিং এর দলের আমন্ত্রিত ছো-নাচ, কিরাত-অর্জ্জুন ও অভিমন্যুবধ পালা। এ অনুষ্ঠানটিও অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল।

যুবউৎসব উপলক্ষে অযোধ্যা পাহাড়ের চারটি গ্রামে সাঁওতাল মেয়েদের দেয়াল চিত্রাঙ্কণের একটি অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে যুব-উৎসব কমিটির সংগে যৌথ উদ্যোক্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন অযোধ্যা পাহাড়ের লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস কর্তৃপক্ষ। পুনিয়াশাসন, সাহারজুড়ি, বাদা, বাগানডি—এই চারটি গ্রামের ৯৭ জন গ্রাম্য রমণী তাঁদের মাটির বাড়ির দেয়াল রঙের আলপনায় ভরিয়ে তুলেছিলেন। এইসব চিত্র আঁকতে মেয়েরা বাইরের কোন দোকানের রঙ ব্যবহার করেননি। ঘাস পুড়িয়ে কালো রঙ, ছাই থেকে ছাই-রঙ, পাহাড়ের বিভিন্ন বর্ণের মাটি যোগাড় করে নানান রঙ ব্যবহার করেছেন তাঁরা। বেশীরভাগ দেয়ালেই একপ্রকার সহজ আলপনার মতো গোল ফুল। কোথাও লতা পাতা গাছ ফুল মনোলোভা রঙে আঁকা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার একটি দেয়াল ছাড়া কোন দেয়ালে জীবজন্তু বা মানুষের চিত্র দেখা যায়নি। বাগানডি গ্রামের মেয়েরা প্রায় সকলেই অনবদ্য এঁকেছেন। চোখ জুড়ানো ভালো লাগার মতো এঁকেছেন রঙ্গী কর্মকার (প্রথম), মঙ্গলা মুড়াইন (দ্বিতীয়), রবন সর্দ্দারী, শান্তি কর্মকার, বেহুলা মাঝুয়ার, সোমারী লোহার, বুধনী হেমব্রম, ঘাসনী মুর্মু ও শান্তি মাঝুয়ার। গ্রামের আদিবাসী মেয়েদের দেয়াল অলঙ্করণের মতো অনাদৃত লোক শিল্পকে তুলে ধরে যুবউৎসব কমিটি যে একটি ভালো কাজ করেছেন তা সংস্কৃতিবান প্রতিটি মানুষ একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

যুবউৎসবে মেলা প্রাঙ্গণে পুরুলিয়ার পত্রপত্রিকার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটির আয়োজন করতে মানভূম সংস্কৃতি মুখপত্র 'ছত্রাক' পত্রিকাগোষ্ঠী তাঁদের দরাজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্টলে শ'খানেক মূল্যবান স্যুভেনীর অজস্র পত্রপত্রিকা, লিট্‌ল ম্যাগাজিন, ম্যাপ, দলিল-পত্র ছিল। পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে বেশী সংখ্যায় ছিল মুক্তি, সমবায়ের কথা, মালভূমি, রু, মজদুর দর্পণ, শিখর ভূমি, ডহর, টুকলু, কংশাবতী, পুরুলিয়া প্রভাকর, কেতকী, পুরুলিয়া গেজেট, জয়যাত্রা ইত্যাদি। 'ছত্রাক' পত্রিকার জন্ম থেকে প্রত্যেকটি সংখ্যা। এছাড়া ছত্রাকের মূল্যবান সংখ্যা-গুলোর প্রচ্ছদের বর্দ্ধিত কলেবরে সুদৃশ্য রঙিন চিত্র যা দেখে দর্শককে মানভূম সংস্কৃতিতে পত্রিকাটির অবদানের কথা বিস্ময়ের সংগে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পত্রপত্রিকার স্টলের পাশেই ছিল মুখোশ ও মৃৎশিল্পের প্রদর্শনীর স্টল। স্টলে ঢুকতেই চোখে পড়ে রামচন্দ্র কুমারের মৃন্ময়ী সাঁওতালী মেয়ে। অনেকে প্রথম দর্শনে একে জীবন্ত মানব প্রতিমা জ্ঞানে ভ্রম করেছেন। মৃৎশিল্পের মধ্যে অধিক সংখ্যায় ছিল ষাঁড়, ময়ূর, গরু, ভালুক ইত্যাদি। মুখোশ শিল্পের প্রদর্শনীতে চড়িদার মুখোশ শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারত খুঁজে যেন এক একটি চরিত্রকে শিল্পীরা হাজির করেছেন। শিব, কার্তিক, অভিমন্যু, গয়াসুর, কালিঙ্গাসুর, নরসিংহ দৈত্য, কিরাত-কিরাতী, গো-শিঙ্গার ভিড় বেশী। সারা পুরুলিয়ার ছো-নৃত্য শিল্পীদের মুখোশ সরবরাহ করেন এই চড়িদার মুখোশ শিল্পীরা। প্রতিটির মূল্য পাঁচ টাকা থেকে শুরু করে দু'শ আড়াইশ। কাপড়ের সংগে কাগজ মিশিয়ে অপূর্ব কৌশলে এইসব মুখোশ তৈরী হয়, তারপর দেওয়া হয় বাহারী রঙের ছোপ, করা হয় নানান অলঙ্করণ।

বাগমুণ্ডিতে অনুষ্ঠিত যুবউৎসব '৮০ যুব মানসে ও সামগ্রিক জনমনে অভাবনীয় সাড়া জাগিয়েছে। সকল শ্রেণীর মানুষ উৎসবে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের আকৃষ্ট করতে বিচক্ষণতার সংগে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। একদিকে মানভূমের চিরায়ত লোক সংস্কৃতিকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে বাংলার প্রচলিত সংস্কৃতিকেও পাশাপাশি স্থান দেওয়া হয়েছে। বিদগ্ধ চিন্তাশীল মানুষের জন্য আলোচনচক্র, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, পত্রপত্রিকার প্রদর্শনী, অন্যদিকে যৌবনদীপ্ত তরুণদের জন্য বিস্তর খেলাধুলার আয়োজন উৎসবের দিনগুলোকে মুখর করে তুলেছে। উৎসব পরিচালনা করতে স্থানীয় ক্লাবগুলি, পঞ্চায়েত সংগঠন, সরকারী কর্মচারীরা স্থানীয় নাগরিকরা এবং লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ও ছত্রাক পত্রিকা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিবেশনার মধ্যেও ছিল অভিনবত্ব, রুচিশীলতা ও মনোহারীত্ব। উৎসব সমাপ্তিতে প্রতিটি মানুষ কামনা করেছেন এমন আনন্দ-মুখর উৎসবের দিন তাঁদের কাছে যেন প্রতিবছরই ফিরে ফিরে আসে।

অরাজনৈতিক সেই লোকটার গল্প

শুভাশীষ চৌধুরী

মিছিলটা নিঃশব্দতার মলিন শোকাহত কন্‌কনে বাতাস সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো। রাশি রাশি সুতীক্ষ্ণ চোখগুলো কি এক জিজ্ঞাসায় সামনে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে মিছিল প্রবাহিত নদ-নদীর মত এসে মূল মহা সমুদ্রের উত্তাল স্রোতের সাথে ক্রমাগত একাকার হ'য়ে যাচ্ছে। এ মিছিলের শেষ কোথায় বোঝা যায় না। শুরুটাও ঠিক মত ধরা যায় না। কোন কোন জায়গায় দু সারি লাইন ঠিক মতো নেই। সেখানে দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন আকৃতির মানুষ এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন সম্প্রদায়। শুধু এগিয়ে যাওয়াটাই মূল লক্ষ্য। মুখ বরাবর, সামনের দিকে। এই ভাবে আমরা, অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবেরা দানবীয় কালো, অন্ধকার রাতটার সাথে জীবন্ত প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলাম। ওপরের হাজার হাজার মূক নক্ষত্রমণ্ডল, নীচের বিস্তীর্ণ শিশির সিক্ত প্রান্ত ভূমিকে মনে হচ্ছে আলোর সাথে যুদ্ধ-জয়ী কোনো বীরপুঙ্গবের পরিশ্রান্ত স্বেদ বিন্দু।

নজরুল হঠাৎ ব'লে ওঠে আমরা তো থানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি? এদিক দিয়ে যাওয়ার কি দরকার ছিল? কথা ও খুব আস্তে বলে। কারণ এটাতো একটা শোক মিছিল। ওর কথার পাল্টা কোন উত্তর আসে না। আমি নিমাইয়ের পকেটে হাত দিয়ে একটা বিড়ি বের করি। দম নেওয়া দরকার। দেড় ঘণ্টার ওপর শুধু হেঁটেই চলেছি। নিমাই অন্ধকারে আমায় ঠাওর ক'রে ব'লে ওঠে—আচ্ছা এতো লোক আমাদের মিছিলে এলো ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। শহরের বাড়ি ঘর কি সব ফাঁকা? আমি বিড়ির ধোঁয়ায় আমেজ এনে বলি মিছিলে আবার আমাদের তোমাদের কি? একজন মানুষ হঠাৎই খুন হ'লো। খুনটা কি জলভাত? সাড়া শব্দ নেই। পাল্টা কথাও আসে না। নিমাই মোটা কাঁথার মত চাদরটি খুলে কোমরে লেপ্টে রাখে। চাদরটায় আধোয়া-জনিত একটা বিট-কেল গন্ধ বের হয়। শীতের হুল ক্রমাগত ফুটে চলে শিরা-উপশিরায়—মিছিলটা এগিয়ে চলে। নিঃঝুম থমথমে সারিবদ্ধ মিছিল।

আমায় হঠাৎই পেছন থেকে কে যেন চিমটি কেটে তার পাশুটে কণ্ঠ শুনিয়ে ব'লে ওঠে—আচ্ছা ওনার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরাও নাকি এই মিছিলে আছে? আমি প্রতি উত্তরে বলি—এ সময় কথা বলা ঠিক নয়। মিছিলটাতো এক জায়গায় শেষ হবেই। তখন সব জানা যাবে। পাল্টা চিমটি আসে—ব'লে ওঠে—না ঘটনাটা কিন্তু খুবই আশ্চর্যের। একজন রাজনৈতিক ঝুট ঝামেলা মুক্ত মানুষও খুন হ'লো। ধর্মঘটের দিনেও তো ও বলেছিল কারখানায় না গেলে খাবো কি? চাকরী চলে গেলে কে দেখবে? তাকেই কিনা আমরা আজ কাঁধে নিয়ে চলেছি। বাঁ পাশ থেকে একজন বুড়ো কফ্-গলায় ঘর্ঘর ক'রে বলে—কেন কাঁধে নেওয়াটা কি পাপ? লোকটাতো শেষ পর্যন্ত প্রতি-বাদ ক'রেছিলো। ওর কথাগুলো ঠিক মতো কানে আসে না। দাঁতবিহীন ঘন-কফে কেমন যেন জড়িয়ে যায়। কেউ ওর কথা শুনছে কিনা সে খেয়াল ওর থাকে না। বা এসময় কথা বলা ঠিক নয় তাও ও বোঝে না। ধর্মঘট করার প্রশ্নে লোকটার মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীর নগ্নরূপ দেখে ওর মানবিক বোধ জেগে ওঠে।—তেতে থাকা উত্তেজনায় বুড়ো কথাগুলো বলে—ওর হাতের বিক্ষিপ্ত কাটা ছেঁড়া জায়গাগুলো দেখিয়ে ও বলে আমাকেও ওরা রেহাই দেয় নি।

সুজন মাংকি ক্যাপের মাঝখান থেকে ঠোঁট নেড়ে জবাব দেয়—আসলে কমরেড অজিত ওর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অজিতের উপর হামলাটা আসায় লোকটা আর চুপ থাকতে পারে নি। লোকটা স্বভাব চরিত্রে এক নম্বর ভীতু। তাছাড়া কোনদিন উঠোন-লেপ্টানো পরিসর ছেড়ে বাইরে বের হয় না।

মিছিলটা কখন থামবে বোঝা যাচ্ছে না। সবাই আমরা সকাল বেলায় এসেছি। কথা ছিল তিন শিফ্টে দায়ীত্বপূর্ণ কয়েকজন কমরেডের ওপর আলাদা আলাদা ভাবে দায়ীত্ব দেওয়া থাকবে। সেই ভাবেই দায়ীত্ব ভাগ করা হ'য়েছিল গতকালের সভায়। আমি, সাগর, অজিত, নজরুল ছিলাম ফার্স্ট সিফ্টে। গণ্ডগোল যে হ'তে পারে তা আমরা আগেই বুঝেছিলাম। কারণ গতবার যারা আমাদের ধর্মঘটে যোগ দেয়নি তার বেশীর ভাগ অংশই এবার আমাদের সাথে আছে। স্বাভাবিক ভাবেই মালিক এবার অন্য ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তবে সুবিধা ছিল আমাদের অন্য ইউনিয়নের নীচু তলার শ্রমিকরা প্রকাশ্যেই ব'লে ছিল রাজনৈতিকভাবে আপনাদের সমর্থন করি না তবে যে দাবী নিয়ে ধর্মঘট করা হ'চ্ছে আমরা তা সমর্থন করি। আর এই জায়গাতেই ছিল আমাদের আসল ঐক্য। আমরা ধর্মঘটের দিন কারখানায় এসে সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। উপস্থিতির হার শতকরা দশ জনও নয়। গেটে নজরুল, সাগর, অজিতের এক সাথে থাকবার

কথাও নয়। ওদের উপর আক্রমণ হ'তে পারে আমরা সবাই তা জানতাম। ওরা যে কেন হঠাৎ ওখানে একসাথে জড়ো হ'য়ে বক্তৃতা শুরু করেছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশগুলো প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা পালন ক'রতে পারে নি। গুণ্ডারা এ্যাকশন্ ক'রেছে ওরা দূরে ব'সে নীল আকাশে হাই তুলেছিল।

সাগর যে কোথা থেকে আমার পাশ ধ'রে ধ'রে হাঁটছিল তা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। ওর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমি ব'ললাম—কমরেড তোমার কি খুব কষ্ট হ'চ্ছে? ও দাঁত বের করে হেসে উঠলো। বললো—কি ব্যাপাররে শালা একেবারে ইউনিয়নের মিটিংয়ের ঢংয়ে কথা। '৬২ সালের মার মনে নাইরে হারামজাদা! বলেই ও আমার পিঠে ওর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কপালের এক গোত্তা দিল। আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

......এতক্ষণে একটা আওয়াজ কানে এসে পেঁাছালো। মনে হ'ল অজিতের গলা। ও চীৎকার ক'রে ব'লছে—আপনারা সবাই এখানে ব'সে পড়ুন। বিরাট ফাঁকা মাঠ আছে। ব'সবার কোন অসুবিধা হবে না।

ও যে কথাগুলো ব'লছে তার অর্ধেক কথা বোঝা যাচ্ছে না।

নজরুল আমায় ব'লে, এই শীতে হাত পা সব কাঠের মতো হ'য়ে গেল। আচ্ছা শীতটা কি এবার একটু আগে পড়েছে? আমি ব'ললাম,—হ'তে পারে। থাকতে তো হবেই। নজরুল বলে তা লোকটার নাম কি ছিল? আমি তো জানি উনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড় বংশের ছেলে। আমিষ খেতেন না। বুড়ো মনে হয় সজাগই ছিল। শীত ওকে পরাস্ত ক'রতে পারে নি। ব'লে ওঠে—ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আসছে কোথা থেকে? লোকটা আমাদের মত একজন শ্রমিক। এই গঙ্গার ধারে পাটকলের শ্রমিক। তাকে গুণ্ডারা খুন ক'রেছে। যারা ধর্মঘট ভাঙ্গতে এসেছিল তারা খুন করেছে। ও এখন আমাদের একজন। আমি ঐ লোকটাকে একটা বিশেষ কারণে ভাল মত চিনি। ওর নাম দীনদয়াল আচার্য। মাপা ছকে বেড়ে ওঠা নিরীহ মানুষ। অন্যায় করতেন না—অন্যায় দেখলে কিছু ব'লতেন না। গত ধর্মঘটে পুলিশ যখন আমায় পিটিয়ে কেটে পড়লো তখন আমি ওকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে একটু সাহায্য করতে বলেছিলাম। সেই সময় তিনি আমায় একটা রিক্সা ডেকে দিতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎই আমি আসছি বলে চলে গেলেন। পরে হাসপাতাল থেকে ফিরে ওকে দারুণ গালিগালাজ করে ছিলাম। অজিত না থাকলে হয়তো পিটিয়েও দিতাম। যাই হোক মাঠটা অজস্র রকম মানুষের ভীড়ে কানায় কানায় ফুলে ফেঁপে উঠলো। শিশির সিক্ত ঘাসে আমরা সবাই হাত পা গুটিয়ে ব'সে পড়লাম। পিছন থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে বলে উঠলো হুকুম দিন—শালাদের পিঠের চামড়া তুলে দেবো। কয়েকজন ওর কথাকে সমর্থন জানানোর জন্য হাততালি দিয়ে উঠলো। বিভিন্ন জনের বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে মনে হ'চ্ছিল আমাদের দানবীয় চুল্লিটা যেন সাময়িক ভাবে এখানে উঠিয়ে আনা হ'য়েছে। শীতের তীব্র কাঁটা কারো গায়ে বিঁধতে পারছে না। বারুদে ডোবানো হাজার হাজার পরিচিত দেখা-অদেখা কালো কালো অবয়ব মাঠের এদিক সেদিক ছটফট্ ক'রছে। ঘৃণা, ক্রোধ সঞ্চিত অভিশপ্ত জীবনের অবসান চায় সবাই। এই লগ্নেই।

অজিত একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে ওর বক্তৃতা আরম্ভ ক'রলো। অজিত আমি কারখানায় একই বিভাগে কাজ করি। দুজনেই ফাজলামি-ইয়ার্কী খুব করি; কিন্তু এখন ও আমার সাথে ঠাট্টা মস্করা করা—বন্ধু অজিত নয়। ও এখন বিরাট একটা দলের প্রতিনিধি। সমস্ত মানুষের মেজাজ আজ ওর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

ও শুরু করে—কমরেড আজ আমি এই রাতে আপনাদের বেশী কথা বলবো না। দীনদয়াল বাবুকে ওরা খুন করেছে। আমরা এতক্ষণ মিছিল ক'রলাম। আমাদের যখন গুণ্ডারা আক্রমণ করে তখন তিনি প্রতিবাদ ক'রেছিলেন। উনি ওদের বলেছিলেন কারখানায় যাদের ঢোকার ইচ্ছা ছিল তারা তো ঢুকেই গ্যাছে। আমরা জানি তিনিও কারখানায় ঢোকার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। উনি সে কথাও ওদের ব'লেছিলেন। কিন্তু গুণ্ডারা যখন আমাদের উপর আক্রমণ ক'রলো সাগরের মাথা ফাটিয়ে দিলো তখন তিনি আর চুপ ক'রে থাকতে পারেন নি। এটাই আমাদের আনন্দ এবং গর্ব। এ সময় সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। পিছন থেকে শ্লোগান উঠল শহীদের রক্ত, হবে নাকো ব্যর্থ। অজিত রেশ টেনে ব'লে চলে আমরা আগামীকাল আবার ধর্মঘট করবো। আমরা দোষী গুণ্ডাদের শাস্তি চাই। মালিকদের বাধ্য করবো যাতে তাঁর স্ত্রী ঐ কারখানায় চাকরী পায়। তবুও যদি দাবী না মানা হয় তবে ধর্মঘট চলবে। সবাই সমস্বরে বলে ওঠে—হ্যাঁ এটাই ঠিক। তাই ক'রতে হবে আমাদের। মাঠের দক্ষিণ দিক থেকে এক মহিলা কমরেড বলে ওঠে ওনার স্ত্রীকে বলবেন ওর হাজার হাজার অভিভাবক ওদের পরিবারকে চোখের মণির মত আগলিয়ে রাখবে। যে যায় সে আসে না; কিন্তু তার কাজ ইতিহাস হ'য়ে থাকে। আমরা বহু চেষ্টা করেও ওনার স্ত্রীর চেহারাটা অন্ধকারে দেখতে পেলাম না। সম্ভবতঃ কোলের দুটো বাচ্চা নিয়ে উনি এখন খুব কাঁদছেন। হয়তো অফিস থেকে গিয়েই শুদ্ধ কাপড়ে গঙ্গাজলে আচমন ক'রে তিনি পুজোয় বসতেন। সংসারের বাঁধা জালটায় বসে বৌয়ের সাথে গল্প ক'রতেন। হয়তো রোজই তিনি তাই ক'রতেন। কেউ কোন খোঁজ নিত না। খোঁজ করার মতো কোন কিছুই তিনি হয়তো কখনো করতেন না। পাশ কাটিয়ে চলতেন। কিন্তু আজ, সামান্য একটু প্রতিবাদ। বুঝিবা প্রতিবাদও নয় নিছক রাজী করানোর আস্থা নিয়ে ভালোমানুষী। ভিতর থেকে উগ্‌লে বেরোনো মানবতার টান। শুধু সেই কারণেই তিনি পৃথিবীতে আর থাকতে পারলেন না।

কফ-গলায় ঘর্ঘর আওয়াজে বুড়ো বলে ওঠে—কাল যে অচীন ছিল আজ সে আমাদের মনের বাড়তি শক্তি হ'য়ে উঠলো!

সেদিন সূর্য

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

গতরাত্রেই বলব সে কি,
আকাশভরা চন্দ্র
গ্রামশহরের মাথায় মাথায়
জ্বলতেছিল চন্দ্র।

ভোর হয়েছে ভেরের মত
উত্তরণের দীপ্তি
তিমির ছেঁড়া অন্ধকারেও
যাবজ্জীবন দীপ্তি—

সকাল হতেই জীবনযাপন
চয় মশালের মন্ত্র
অবাক আলোয় ঝরতে থাকে
বীজ বপনের মন্ত্র:

হাঁটতে হাঁটতে আটকে গেলাম
সামনে দেখি সূর্য......
মাঠের পরে মাঠ চলেছে
চতুর্দিকেই সূর্য।

মায়ের মুখ

আদিত্য মুখোপাধ্যায়

এইমেঘ আকাশ বাতাস ভালোবাসা স্ফটিক খচিত প্রিয় মুখ
এই মুখ বর্ষার অনন্ত ভিজে মুখ
রাশভারী আমার মায়ের মুখ সোহাগ মেশানো,
মাটির অমেয় স্বাদ পড়ন্ত বেলার ঘ্রাণ
চাষার মাতানো গান শালিখের সিক্ত প্রাণ
স্বচ্ছ বাঙলার মুখ এইখানে এই গাঁয়েতে বিছানো।

এইখানে বৃক্ষলতা তাল-তরু সারি স্থবির স্থপতি
আমার মায়ের প্রজা মা আমার সবার নৃপতি
রোজ রোজ পদ্ম ফোটে মায়ের চরণতলে পুত হয় দীঘির শরীর,
ঘরময় মাতৃপদচিহ্ন আঁকা মনময় প্রেমের বিন্দুক
মাঠময় অসীম তালুক তার সাজানো সিন্দুক
দিকচক্রবালে এক বন-রেখ গন্ডী আঁকা সীমানা খড়ির।

মহুল ফুলের ভিজে ঘ্রাণ বাউল গানের প্রিয় প্রাণ
ডাহুক-ডাহুকী প্রেম দান গাঁয়ের বধূর অভিমান
এইসব নিয়ে আমার মায়ের মুখ সোহাগী মায়ের মুখ,
মায়ের গেরুয়া শাড়ী পথময় সোনালী স্বপন
লাল সিঁথি পাকা শস্য অনুরাগী হিমেল নয়ন
আমার মায়ের স্বাদ এইখানে এইখানে আমার মায়ের মুখ।

মেহগনি ও বণিক সভ্যতা

রণজিৎ সিংহ

বাড়ির দক্ষিণ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে মেহগনি। তার প্রকাণ্ড গুঁড়ি আর ছড়ানো ডালপালায় উপছে পড়ছে বাঁচা। চিকন সবুজ পাতায় ঝরছে খুশি।

ফাল্গুনে বহুদূর পর্যন্ত তার ফুলের সুগন্ধ বুক ভরে টেনে আমরা টের পাই এ সেই মেহগনি। বৈশাখে জৈষ্ঠে মহা-পরাক্রমশালী সূর্যের আঁচে ঝলসে আমরা তার ছায়ায় দাঁড়াই। আর বলি: তুমি বাঁচো চিরদিন।

শোনা যায় ফড়ে আর মালিকে চলছে দরকষাকষি। মালিক চায় ১২ হাজার। ফড়ে ৭ পর্যন্ত উঠে আবার আড়ে আড়ে দৈর্ঘ প্রস্থ বেড় জরিপ করে। আর অঙ্ক কষে তক্তার হিসেবে ঠিক কতয় পড়তা।

লুট

বিদ্রোহেন্দ্রনাথ চন্দ

ঢাকনাখোলা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে
থরে থরে সাজানো বিশাল সম্পদ
উদাম পড়ে আছে

লুটেরাদের হাত ঢোকে ঝাঁপির ভিতরে।
প্রতিযোগিতা,
রক্তারক্তি।
শূন্য হাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি
নিঃস্ব পৃথিবীর বুকে।

সাপেরা বাসা বাঁধে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে।

বাংলা সিনেমা—তরুণ মনে তার প্রতিক্রিয়া

হীরালাল শীল

তরুণ মনে সিনেমার প্রতিক্রিয়া কেমন, কতখানি, তা নিয়ে আলোচনা করার আগে একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক। সিনেমার জন্ম-লগ্নটা একটু তুলে ধরা যাক না।

বাংলা সিনেমার বয়স ষাট বছর পূর্ণ হ'ল ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে। প্যারিসের গ্রাণ্ডকাফেতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর যখন প্রথম 'চলমান ছবি' প্রদর্শিত হ'ল, তার মাস দু'য়েকের মধ্যেই তা বাঙালীর কল্পনার ভিতকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। ১৯০০ থেকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নানা সময়ে বাংলাদেশে চলমান ছবি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আলাপ-আলোচনা চলেছিল। তারই ফলে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রূপালী পর্দায় প্রথম বাংলা ফিচার ফিল্মের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাংলা চলচ্চিত্রের জনক-স্থানীয়দের মধ্যে জ্যোতিষচন্দ্র সরকার, হীরালাল সেন, দেবী ঘোষালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁদের হাতেই এদেশের ছায়াছবির হাতেখড়ি। তবে প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি জন্ম নিয়েছিল জে. এফ. ম্যাডানের হাতে। ১৯১৮ সালে ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'বিল্বমঙ্গল' তৈরী করে।

ক্রমশঃ বাংলা ছবি ৪২ বছর ধরে এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব পথে—গতিতে ছন্দে। যে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিশুর জন্ম হয়েছে দাদাসাহেব ফালকের হাতে, তার শিক্ষক বলা যায় বাংলা ছবির কারিগরদের। শিশুকে চলতে শিখিয়েছেন তাঁরাই।

দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বোস প্রমুখ প্রখ্যাত পরিচালকদের হাতে পড়ে সেই শিশু বড় হয়ে উঠেছে। সে আজ কিশোর, কিংবা যুবক নয়, সে প্রৌঢ়-পরিণত। আজ সে নিজেই একটি চরিত্র—তার ভাষা আলাদা, বিভিন্ন পরিচালক চলচ্চিত্রকে মাধ্যম করে সমাজের বিভিন্ন দিকের চিত্রকে তুলে ধরেন। সুখের কথা, আমাদের কোন পরিচালকের অভাব যেমন কোনদিন ছিল না, আজও নেই। কিন্তু সিনেমার জন্ম-লগ্নে যে ধরনের ছবি তৈরী হয়েছে, আর আজকাল যে ধরনের ছবি তৈরী হচ্ছে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য কি আমাদের চোখে পড়ছে না? অবশ্য, পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ, যুগের ধর্মকে তো অস্বীকার করা যায় না। সে যুগে সেটাই সত্য ছিল, তার পেছনে ছিল আন্তরিকতা—নিষ্ঠা। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে যে ধরনের ছবি তৈরী হচ্ছে, তার পেছনে কতটুকু আন্তরিকতা, নিষ্ঠা বর্তমান সে ব্যাপারে চিন্তা করলে হতাশ হতে হয়, বিগত দুই দশক ধরে যে সব বাংলা ছবি (নামোল্লেখের প্রয়োজন নেই) আমাদের দেখানো হ'ল, সেগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ ছবিই অত্যন্ত নিম্নমানের, কি উপস্থাপনার দিক থেকে, কি আঙ্গিকের দিক থেকে, কি বক্তব্যের দিক থেকে। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, পূর্ণেন্দু পত্রীর কথা বাদ দিলে আমরা এমন কোন পরিচালকের নাম কি খুঁজে পাব, যাঁদের চলচ্চিত্র থেকে আমরা কিছু পেয়েছি? অথচ দেশে বাঙালী পরিচালকের তো অভাব নেই, ছবির সংখ্যাও তো পরিমাণের দিক থেকে কম দেখছি না, তবে গুণের অভাব কেন? কেন এই সব পরিচালক পরিণত মনস্তাত্ত্বিকের ভাবনা-চিন্তা-সৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন না? কেন একবার ভেবে দেখেন না, 'অযান্ত্রিকে'র মতো আর একটা কিছু করা যেতে পারে কিনা? চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? ভাবতে কষ্ট লাগে বর্তমানে পরিচালকদের স্বাধীনতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রযোজকদের মর্জির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এর ফলে বাঙলা সিনেমার যে কি অপূরণীয় ক্ষতি হতে চলেছে, তা একবার তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি? ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে সিনেমাকে মানের দিক থেকে খাটো করা কখনওই উচিত নয়। সেই কারণেই বর্তমানে সিনেমার অশ্লীলতার পরিমাণটাই বেশি চোখে পড়ে।

ঋত্বিক ঘটক তাঁর ছবিগুলিতে যে মহত্তর সত্য ও জীবনের নতুনতর অর্থের সন্ধান করে গেছেন সারা জীবন, যে রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়েও তাঁর চরিত্রদের হারতে দেখান নি কখনও; এখনকার পরিচালকদের ছবিগুলিতে সেই সব আর খুঁজে পাই না কেন? কেন 'কিছু একটা করা'র নামে সস্তা চটুল ছবি দেখানো হয়?

শুধু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই নয়, গত কয়েক দশকের প্রায় শ'তিনেক বাংলা ছবির তালিকার দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাব যে, শিল্পগত মানের দিক থেকে বাংলা সিনেমা কতটা নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। একই রীতি, একই ধরনের সংলাপ, একই চরিত্রচিত্রণের পুনরাবৃত্তিতে বাঙালী দর্শক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন—"চারপাশের মানুষগুলোর জীবনের সাথে নাড়ীর যোগ রেখে ছবি করতে হয়। তা না হলে ছবি করার কোন মানেই হয় না।" দুঃখের বিষয়, জীবনের সঙ্গে নাড়ীর যোগ দূরের ব্যাপার বাঙালী পরিচালকরা আমাদের চারপাশের মানুষগুলোকেই জানেন না। পৃথিবীর সর্বত্র সিনেমা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আছে, তর্ক-বিতর্ক আছে,

[শেষাংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়]

লোক চিত্রকলা

ভাছু ত্রিবেদীর তুলিতে—

পরিবর্ত শক্তি-উৎস

বাতাস/হাওয়া-কল—আদিম মানুষ ভয় পেত হাওয়াকে। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে, মানুষ অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির মত হাওয়া অর্থাৎ বাতাসকেও তার কাজে লাগাতে শিখল। যে বাতাসকে মানুষ কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভয় করত আস্তে আস্তে সেই বাতাসকে মানুষ তার দৈহিক শক্তির পরিবর্ত শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত করতে শিখল।

আজ থেকে অনেক দিন আগেই মানুষ দেখেছিল যে, চার পাঁচটা পাখার সমন্বয়ে যদি একটা চক্র তৈরী করা যায়, আর সেই চক্রকে যদি বাতাসের সামনে রাখা যায় তাহলে সেই চক্রটি ঘোরে। বাতাসের জোরে বওয়া আস্তে বওয়ার উপর নির্ভর করে চক্রের ঘোরার গতি। মানুষ এটুকুও বুঝেছিল যে চক্রের মূল অক্ষদণ্ডর সাথে যদি কুয়োর দড়িটাকে একটু কায়দা করে সংযুক্ত করতে পারলে কুয়ো থেকে আর টেনে টেনে জল তুলতে হয় না। এবং সুতরাং বাতাসকে কাজে লাগিয়ে মানুষ পানীয় জল ও কৃষিকার্যের জল সংগ্রহর কাজটাকে সহজ করে তুলল, একই ব্যবস্থায় মানুষ আরও অনেক কাজই করতে শিখেছিল যার ফলে তার দৈহিক শক্তির ব্যবহার অনেকটা কমে গেল। কি কি কাজ? যব অথবা গম ভাঙানো, আখ মাড়াই, ধান কোটা, খড় কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যাপকভাবে বাতাসকে কাজে লাগানো হত। বাতাসকে কাজে লাগিয়ে কাঠ চেরাইয়ের মত দুরূহ কাজও মানুষ করেছিল। পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই এই ধরণের কাজে বাতাসকে মানুষ বড় বড় চক্রাকার এক ধরণের যন্ত্র যার চলতি নাম হাওয়া-কল, তার মাধ্যমে নিজের কাজে লাগাত। প্রতিমুহূর্তে উন্নতি-অগ্রগতির অন্বেষণে নিরত মানুষ, হাওয়া-কলকে বাতিল করে দিল সেদিন যেদিন আরও সুবিধার সন্ধান সে পেয়ে গেল। বাষ্প-চালিত, বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রাদি হাতের মুঠোয় আসায় হাওয়া-কল নামক বস্তুটি সম্ভবতঃ হারিয়ে গেল। তারপর যেদিন খনিজ তৈল (পেট্রোলজাত তৈলাদি) তার কব্জাগত হল সেদিন তো একেবারে সবাই ভুলেই গেল বাতাস পরিচালিত হাওয়া-কলের কথা।

কিন্তু আজ টান পড়েছে কয়লার ভাঁড়ারে, তেলের অবস্থাও সুবিধার নয়। তার উপর ক্রমাগত দাম বাড়ার ফলে সবাই আবার নতুন করে ভাবছে হাওয়া-কল বা wind-mill এর কথা। তবে পুরোনো আমলের হাওয়া-কলের থেকে আজকের হাওয়া-কলের চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। আজ যারাই হাওয়া-কল নিয়ে চিন্তা করছেন তারা ভাবছেন কিভাবে হাওয়া-কলকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্র জেনারেটর-এর সঙ্গে সংযুক্ত করে আরও বেশী বেশী করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাওয়া-কল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী এগিয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসা (NASA) নামক সংগঠনটি এমন একটি হাওয়া-কল প্রস্তুত করেছে যার সাহায্যে ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ঘণ্টায় ২৩ মাইল বেগে হাওয়া বইলে তার সাহায্যে ২০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে ওদেশেরই অন্য একটি প্রস্তুতকারক সংস্থা। আমেরিকান এনার্জি অল্টারনেটিভ নামক একটি সংস্থা এমন একটি হাওয়া-কল তৈরী করেছে যার সহায়তায় ১·৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। (ছবি-১) ওদেশের আরেকটি সংস্থা ইন্ডিপেণ্ডেন্ট পাওয়ার ডেভেলপস একটি হাওয়া-কল তৈরী করেছে; এর সাহায্যে ১৮ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। (ছবি-২) অন্যান্য দেশগুলিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ফ্রান্সের একটি সংস্থার তৈরী "এ্যারো-ওয়াট" (ছবি-৩) নামক হাওয়া-কলের সাহায্যে ৪·১ কিলো-ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ডেমেনিকো স্পেরাণ্ডিও নামক একটি ইটালীয় সংস্থার তৈরী হাওয়া-কলের সাহায্যে ১ মেগাওয়াগ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। সুইজারল্যাণ্ডের ইলেকট্রো গ্যাম্ব সংস্থা ইলেক্ট্রোজেনারেটর (ছবি-৪) নামে এক ধরণের হাওয়া-কল তৈরী করেছে যার সাহায্যে ৫০ ওয়াট থেকে ৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার "ডানলাইট" (ছবি-৫) ইলেক্ট্রিক্যাল কোম্পানী যে হাওয়া-কল তৈরী করেছে তার উৎপাদন ক্ষমতা ১ মেগা-ওয়াট থেকে ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

ছবি—১

ছবি—২

ছবি—৩

ছবি—৪

ছবি—৫

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে সারা পৃথিবী জুড়েই হাওয়া-কল নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। তবে সবারই উদ্দেশ্য এক—বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এই কাজে কোন সংস্থা অথবা কোন প্রতিষ্ঠান কিছুটা হয়তো এগিয়ে গেছে কেউ বা একটু পিছিয়ে চলছে। তবে এই শক্তি সংকটের যুগে সবাই আবার বাতাসকে কাজে লাগাবার চিন্তা করছেন এটাই আশার কথা। আর এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক দিক হল—ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে গ্রামীণ সভ্যতার উন্নয়নে হাওয়া-কলের মত যন্ত্র সত্যি সত্যি মানুষের উপকারে আসবে।

—অমিতাভ রায়

[শিল্প-সংস্কৃতি : ৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে, কেবল বাংলা চলচ্চিত্রে তার কোন তাপ-উত্তাপ নেই।

আসলে, সিনেমা তৈরীর পেছনে দরকার সততা, তা আমাদের কতটা আছে? রোজ একটি করে আর্ট ফিল্‌ম হোক, এতটা আমরা নিশ্চয়ই কেউ আশা করি না। কিন্তু ভালো কমার্শিয়াল ছবির জন্যও যা যা প্রয়োজন—সুলিখিত কাহিনী, সু-অভিনয়, সুগ্রথিত চিত্রনাট্য, বাস্তববোধ, জীবনচেতনা, আঙ্গিকের বুদ্ধিসম্মত প্রয়োগ, এই সবের একান্ত অভাবই আমাদের যন্ত্রণা দেয়।

মানলাম, বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে যথেষ্ট সংখ্যক পুঁজির অভাব, এমনকি ভালো ল্যাবরেটরি ও স্টুডিও পশ্চিমবঙ্গে নেই, কিন্তু তাই বলে সব রকম প্রচেষ্টা হাল্‌কা প্রমোদ-উপকরণের স্রোতে ভেসে যাবে কেন? প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন প্রায় চোখে পড়ে—"মুমূর্ষু বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প বাঁচুক—ভালো ছবি তৈরী হোক। ভালো ছবির জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং এখনই।" এই 'এখন' কবে আসবে গালে হাত দিয়ে না ভেবে, কিংবা চায়ের কাপে তুফান না তুলে যদি আমরা রুচিসম্মত মানুষেরা রুচীহীন চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়া চলচ্চিত্র শিল্পকে টেনে তুলি, তবে কি আমরা বাংলা সিনেমাকে নতুন জীবন দান করতে পারব না?

কলকাতায় এশীয় টেব্‌ল টেনিসের আসর

মে মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম এশীয় টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতা। ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত তেত্রিশতম বিশ্ব টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতার পর এই দ্বিতীয়বার কলকাতার নেতাজী ইন্‌ডোর স্টেডিয়াম এই ধরনের বড়সড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক আসরে পরিণত হল। কল্লোলিনী কলকাতার ইদানিংকার ইতিহাসে এই প্রতিযোগিতা সংগঠনের বিশালতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎকর্ষে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রইল। অনুকূল পরিস্থিতি, ক্রীড়ারসিক দর্শকদের সাগ্রহ উপস্থিতি এবং ক্রীড়া সংগঠকদের পরিশ্রমের যোগফলে আরও একবার প্রমাণিত হল কলকাতাই এই ধরনের প্রতিযোগিতা সংগঠনের দাবিদার হতে পারে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্রগুলির মধ্যে। অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার সংগঠকেরা রাজ্যসরকারের পূর্ণ সহযোগিতায় একটি মর্যাদাপূর্ণ ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা দর্শকদের কাছে উপহার দিতে পেরেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৯ মে তারিখে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সময়োচিত ভাষণে তিনি এই ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠানের সার্থকতা ও তাৎপর্যের কথা তুলে ধরলেন। প্রতিযোগী দেশগুলির মার্চপাস্ট এবং সি. এল.-টির চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই দিনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল বহুলাংশে। আলোকোজ্জ্বল স্টেডিয়ামের বিভিন্ন দিকের দর্শকের করতালি ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল কলকাতার ক্রীড়ামোদী দর্শকদের সহজাত প্রবণতা ও মানসিকতা। এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন এবং উপস্থিতি সংগঠকদের ভবিষ্যতে আরও বর্ণোজ্জ্বল ক্রীড়ানুষ্ঠান সংগঠনে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করবে। ১০ মে থেকে শুরু হল দলগত প্রতিযোগিতার খেলা। চলল ১৩ মে পর্যন্ত। ১৪ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত (১৭ মে বাদে) হল ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার খেলা। আট দিনের সুখস্মৃতি ক্রীড়ারসিক দর্শকদের আলোড়িত করে রাখল কানায় কানায়। দুটি প্রতিযোগিতাতেই জয়জয়কার হল সমাজতান্ত্রিক চীনের। আরও একবার প্রমাণিত হল রাষ্ট্রের কল্যাণব্রতী দৃষ্টিভঙ্গী, শারীরিক পটুতা ও নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন একটা দেশের সাফল্যকে কিভাবে সুনিশ্চিত করে।

এই প্রতিযোগিতায় মোট বাইশটি দেশ অংশ নিয়েছিল। সেগুলি হলঃ ভারত, চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, তাইল্যান্ড, লাওস, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, হংকং, ব্রহ্মদেশ, সিংগাপুর, ইরাণ, সৌদী আরব, ইয়েমেন (এ. আর), শ্রীলংকা, ইয়েমেন (পি. ডি. আর), সিরিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ এবং বাহারিন। প্যালেস্টিন থেকে এই প্রথম একজন প্রতিনিধি এশীয় টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে এসেছিলেন। এছাড়া অনুপস্থিত ছিলেন কাম্পুচিয়া, সংযুক্ত আরবশাহী, কাতার, কুয়েত—এই চারটি দেশের প্রতিনিধি এবং খেলোয়াড়েরা। আতিথ্য, পরিবহণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুখস্মৃতি নিয়েই যে এই সমস্ত দেশের খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিরা দেশে ফিরেছেন, সেকথা তারা যাবার আগে বারবারই বলে গেছেন। চীন দলগত ও ব্যক্তিগত—দুটি প্রতিযোগিতাতেই শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। বাছাই তালিকার শীর্ষস্থানেও ছিল এই চীন। পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতায় চীনের পরের স্থান ছিল জাপানের, মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় চীনের পরের স্থান ছিল উত্তর কোরিয়ার। ১৯৭৭ সালের কুয়ালালামপুরের চতুর্থ এশীয় টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষ ও মহিলা দুটি বিভাগেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল উত্তর কোরিয়া। জাপানের খেলা এবার দর্শকদের পুরোপুরি হতাশ করেছে। উত্তর কোরিয়ার ক্রীড়াপদ্ধতিতেও খুব একটা উন্নতির ছাপ ফুটে উঠতে দেখা যায় নি। ১৯৭৫-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপের নিরিখেই একথা-গুলো মনে আসছে। পুরুষ বিভাগে বিশ্বের দু'নম্বর চীনের গুয়ো হুয়া, ১৮ বছরের কিশোর সাইকে জাপানের গোটা এবং উত্তর কোরিয়ার জো ইয়ং হো ক্রীড়াশৈলীর সুস্পষ্ট পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন। মহিলা বিভাগে হংকঙের হুই সো হুং, জাপানের এমিকো কান্ডা, চীনের লিউ ইয়ং এবং উত্তর কোরিয়ার লি সং সুক ছিলেন শ্রেষ্ঠ 'চার খেলোয়াড়'। ৭৫ ও ৭৭ সালের মহিলা বিভাগের বিজয়িনী পাক-ইয়ং সুন বরং দর্শকদের প্রত্যাশার ওপর সুবিচার করেন নি। ভারতের মনমিত সিং ও নন্দিনী কুলকার্ণীর খেলায় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির ছাপ ছিল। বালক বিভাগের রাণার্স সুজয় ঘোড়পাড়ে আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্পষ্ট পরিচয় রাখতে পেরেছে। তুলনায় ভারতের চন্দ্রশেখর এবং ইন্দু পুরীর খেলায় শারীরিক অক্ষমতার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আটটি দেশের বিরুদ্ধে একতরফা খেলে চীন সরাসরি ৫-০ ম্যাচে জিতেছে। দলগত প্রতিযোগিতার 'এ' গ্রুপে চীনের সাথে ছিল ভারত, উত্তর কোরিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া, তাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া। উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়রাই যা চীনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ কিছুটা গড়ে তুলেছিলেন। তা না হলে, চীন না খেলেই জিতে গেল, এরকম কথা বললেও অত্যুক্তি হত না। ভারত চতুর্থ স্থান দখল করে কিছুটা এগিয়েছে বলা চলে।

এর আগে এশীয় প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে ভারতের স্থান ছিল ষষ্ঠ। চীন ও জাপান ভারতের বিরুদ্ধে সহজে জিতলেও উত্তর কোরিয়াকে ভারত ভাল মতই বেগ দিতে পেরেছে বলা চলে। উত্তর কোরীয় প্রশিক্ষকের নির্দেশনায় ভারত যে বেশ কিছুটা এগোতে পেরেছে, এটা তার একটা বড় প্রমাণ। বিশেষ করে মনমিত সিং উত্তর কোরিয়ার দুই বাছাই খেলোয়াড় জো ইয়ং হো এবং হং সুন চোলকে যথাক্রমে ২১-১৮, ১০-২১ ও ২১-১৪ এবং ২৪-২২ ও ২১-১৭ পয়েন্টে হারিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় চীন জয়ের পথে একমাত্র উত্তর কোরিয়া ছাড়া অন্য সবকটি দেশ—ভারত, জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও অস্ট্রেলিয়াকে সরাসরি (৩-০ ম্যাচে) হারিয়েছে। ভারত মহিলা বিভাগে ষষ্ঠ স্থান পায়। এর আগের এশীয় প্রতিযোগিতায় ভারতের স্থান ছিল চতুর্থ। পুরুষ সিঙ্গলস্, ডাবলস্, মহিলা সিঙ্গলস্, ডাবলস্, এবং মিক্সড্ ডাবলস্ এই পাঁচটি বিভাগেই শীর্ষে ছিল চীন। বালক ও বালিকাদের সিঙ্গলস্ জিতেছে যথাক্রমে হংকং এবং জাপান। পুরুষদের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইন্যালে পর-পর তিনটি গেম জিতে ঝিহাও সাইকেকে পরাজিত করলেন। চীনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে ফাইন্যালের দুজনেই এলেন একই দেশ থেকে। মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে জয়ী হলেন চীনের আট নম্বর বাছাই খেলোয়াড় কি বাউজিয়াং। তিনি হারালেন স্বদেশেরই অ-বাছাই খেলোয়াড় লিউ ইয়াংকে ৩-১ ম্যাচে। পুরুষদের ডাবলসে চীনের গুয়ো ইয়ে হুয়া ও জাই সাইকে ৩-১ ম্যাচে স্বদেশের অ-বাছাই শি ঝিহাও ও সাই ঝেন হুয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হলেন। মহিলাদের ডাবলসে শীর্ষ বাছাই জুড়ি উত্তর কোরিয়ার পাক ইয়াং ওক এবং হংগিল সুনকে হারিয়ে চীনের ঝ্যাং ডাইং এবং লিউ ইয়াং জয়ী হলেন। মিক্সড ডাবলসে স্বদেশের শীর্ষ বাছাই জুড়ি গুয়ো ইয়ে হুয়া ও লিউ জুটিকে সরাসরি ৩-০ ম্যাচে হারিয়ে অ-বাছাই জুড়ি জি সাইকে এবং ঝ্যাং ডাইং জুটি জয়ী হলেন। বালকদের বিভাগে ভারতের সুজয় ঘোড়পাড়ে ফাইন্যালে হারল হংকঙের ল কামটুঙের কাছে। স্বদেশের দিসকা হোসিনোকে হারিয়ে বালিকা সিঙ্গলস্ জিতেছে জাপানের ফুকিমা ওকামোটো।

মোট ৮৩ জন আম্পায়ার এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলাগুলি পরিচালনা করেছিলেন। এর মধ্যে দুজন ছিলেন বিদেশী। পুরুষ আম্পায়ার মিঃ ওং এসেছিলেন সিঙ্গাপুর থেকে, প্রতিযোগিতায় একমাত্র মহিলা আম্পায়ার ছিলেন হংকঙের ফু চ্যাং লিং। ভারতীয় সংবাদসংস্থা ও পত্রপত্রিকার প্রতিনিধি ছাড়াও মোট ১২ জন বিদেশী সাংবাদিক এই উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন। চীনের সিনহুয়া নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধি ছিলেন ৪ জন। এছাড়া ইরাণ, জাপান, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের সাংবাদিকরাও ছিলেন। খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন অভ্যর্থনা উপ-সমিতির নির্দেশনায় ৬০ জন তরুণ-তরুণী এ্যাটাশে বা সহায়কেরা। স্টেডিয়ামের মধ্যেই মিনি হাসপাতালে সবরকমের আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন সমাগত খেলোয়াড়েরা। বিভিন্ন দিনে মেডিক্যাল ইউনিট নানাভাবে খেলোয়াড়দের পরিচর্যা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড় ও প্রতিনিধিরা একবাক্যে সংগঠকদের নিপুনতা, নিষ্ঠা এবং কলকাতার দর্শকদের সমঝদারি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করে গেছেন।

ময়দানী বিশৃংখলা : প্রতিকার কোন পথে

সাম্প্রতিককালে ময়দানের ফুটবলকে কেন্দ্র করে দর্শক-অশান্তি এবং উচ্ছৃংখল আচরণের প্রশ্নটি বিশেষ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু আইন-শৃংখলার প্রশ্নই এর সঙ্গে জড়িত নেই। সামাজিক মূল্যবোধের অপহ্নব এবং যুবমানসের বিপথ-চারী প্রবণতা এই ধরনের গন্ডগোলকে কেন্দ্র করে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই প্রশ্নটি নিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। এটা সুখের কথা, সুস্থ চিন্তা-সম্পন্ন মানুষ এই ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনাসভা এবং পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় মূল্যায়ন—ইত্যাদির মাধ্যমে এই সমস্যাটি সকলের সামনে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। রাজ্যসরকার এই প্রশ্নটি নিয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল শিশির মঞ্চে এই প্রসঙ্গে একটি আলোচনাসভারও আয়োজন করেছিলেন। ৭ জুন, ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু এই ধরনের গন্ডগোলের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার ওপর জোর দিয়ে বলেছিলেন : রেফারি, বড় ক্লাব, খেলোয়াড়, সংবাদপত্র ও পুলিসের দায়িত্ব এই প্রবণতা রোধে সবচেয়ে বেশী।

মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছিলেন : ফুটবলের মত জনপ্রিয়তম খেলার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মুষ্টিমেয় দর্শকের উচ্ছৃংখল এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করতেই হবে। এই অরাজকতাকে সমূলে উৎখাত করার জন্য তিনি বড় ক্লাবগুলি এবং সেই সঙ্গে কলকাতার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আই. এফ. এ-র কাছে সময়োচিত আবেদনও জানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত হোল : ক্লাবগুলি এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বসে কি করে শৃংখলার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হয়। খেলোয়াড়দের দায়িত্বের কথাও তিনি এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। রেফারীদের সংগঠনকেও তিনি মাঠের শৃংখলা-রক্ষার প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কেননা এ ব্যাপারে তারা তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। পুলিসকে আইন-শৃংখলার প্রশ্নটি শক্তহাতে মোকাবিলা করতেই হবে। কিন্তু গন্ডগোল হলে তার প্রতিক্রিয়া যেভাবে সর্বত্রচারী হয়ে পড়ে, তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তিনি সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন : উত্তেজনা প্রশমনে তাদের বিরাট ভূমিকা আছে। লেখার স্বাধীনতা থাকলেও তার অপব্যবহারও কোন ক্রমেই সমর্থন-যোগ্য নয়। উত্তেজনা বাড়তে পারে এমন কিছু প্রকাশ করা ঠিক নয়। এই আলোচনায় রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি শ্রী স্নেহাংশুকান্ত আচার্য এবং আই. এফ. এ-র তৎকালীন সম্পাদক শ্রী অশোক ঘোষও অংশগ্রহণ করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে পরিস্থিতির উপযুক্ত মোকাবিলায় পথনির্দেশ করেছিলেন।

এর পরবর্তীকালে দায়িত্বশীল যুবসংগঠন এবং ছাত্রসংস্থাগুলি পথসভা এবং আলোচনাচক্রের মাধ্যমে এই অরাজকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলে। তবে সমস্যার গুরুত্ব ও জটীলতার বিচারে এই প্রয়াসগুলি যথোচিত সার্থকতার রূপ নিতে পারে নি, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

ময়দানী বিশৃঙ্খলার প্রশ্নটি গত ফেডারেশন কাপের খেলার সূত্রে বড় হয়ে দেখা দিলেও, কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে ধারাবাহিক অশান্তির পরিবেশটি গত কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে, তার পটভূমি অন্বেষণে আমাদের কতকগুলি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কতকগুলি প্রশ্ন এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একথা অনস্বীকার্য, কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশটি মহানগরী কলকাতাকে ঘিরে থাকে বছরের প্রায় অর্ধেকটা সময় জুড়ে, তার পেছনে বহু লোকের ক্রীড়ামনস্কতা যেমন কাজ করে, তেমনই বহু ধরনের অবাঞ্ছিত প্রবণতা এবং স্বার্থবাহী কার্যকলাপও একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। এই সমস্ত প্রবণতা ও কার্যকলাপের জটীলতা আপাতভাবে তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য না হলেও গভীরে এদের উপস্থিতি একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে।

প্রথমেই বড় ক্লাবগুলির কার্যাবিধির দিকে চোখ ফেরানো যাক। তিনটি বড় ক্লাব তাদের সুবিপুল সমর্থকদের কল্যাণে বছরের পর বছর ধরে উত্তরোত্তর বিরাট অঙ্কের বাজেট অবলম্বন করে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রথম সোপানের কাজ করে যাচ্ছে। সমর্থকদের পৃষ্ঠপোষকতা তাদের মানসিক আবেগের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাকে মূলধন করছে বড় ক্লাবগুলি সুনিপুণভাবে। ধনিক স্বার্থ অনুপ্রবেশ করছে এই রাস্তা ধরেই। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে নিকৃষ্ট ধরনের বাণিজ্যিক ফড়িয়াবৃত্তি। বিপুল টাকার লেনদেনে যে খেলার শুরু, ক্রমশ তা রূপ নিচ্ছে শিবির ভাগের নোংরামিতে। যে অবক্ষয়ের চেহারা সমাজের সর্বস্তরে শিকড় গাড়ছে অন্য অনন্য নির্দেশে, তারই একটা রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে খেলার মাঠে। বিপথগামী যুবশক্তি প্রতিটি বিকেলে তাই ময়দান অঞ্চল ছাড়িয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিকৃত দলবাজির আগুন নিয়ে সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠছে। এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, সর্বগ্রাসী মূল্যবোধের অপহ্নবে এদের আর ভূমিকা কতটুকু। কিন্তু যেটা আশংকার কথা, এই যুবশক্তি বৃহত্তর ভাঙনের খেলায় খেলার মাঠের ট্রেনিংকে কাজে লাগাচ্ছে, সামাজিক পরিবেশে অশান্তি ডেকে আনছে, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক কর্মের অংশীদার হচ্ছে। তাই প্রয়োজন বড় ক্লাবের বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের অনুগৃহীতজন ও পরিষদবর্গের অচলায়তন ভাঙা। এ ব্যাপারে জনমত গঠন করার অবকাশ আছে। তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

খেলা যেহেতু পরিচালিত হয় রেফারির নির্দেশে, সেহেতু খেলা পরিচালনার মানও যাতে উন্নত হয়, তার জন্য চেষ্টা করাটাও জরুরি। একটি অমূল্য ভুলেই, মনে রাখা উচিত, নব্বই মিনিটের খেলার ফলাফল নির্ধারিত হতে পারে যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ায় জ্বলে ওঠে অশান্তির আগুন। তখনই এসে পড়ে আইন-শৃংখলার প্রশ্ন, সামাজিক পরিবেশ হয়ে ওঠে বিষিয়ে। তাই উপযুক্ত নির্বাচন, পরিচালনার মুনশিয়ানা, রেফারিদের সঠিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা—সবকিছুই শান্তিরক্ষার গ্যারান্টি হয়ে দাঁড়ায়। খেলায় জয়-পরাজয় আছেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আসল কথা—এসব যেমন সত্যি, তেমনই একথাও মনে রাখা উচিত মানসিক উত্তাপ সৃষ্টির সমস্ত রকমের উৎসমুখ বন্ধ করে রাখার চেষ্টা সব সময়েই করতে হবে। সেইজন্যই প্রয়োজন খেলা পরিচালনার মান উন্নয়ন, রেফারিদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু ব্যবস্থার কার্যকরণ।

এবার আসা যাক খেলোয়াড়দের দায়িত্ববোধের প্রসঙ্গে। যেহেতু তাঁদেরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে কিশোর ও তরুণদর্শকদের মানসিক আবেগের কেন্দ্রগুলি, সেহেতু আচরণে তাঁদের আদর্শস্থানীয় হতে হবে। উত্তেজনায় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে, কিন্তু কোন সময়েই তাঁদের ভব্যতার সীমারেখা অতিক্রম করা ঠিক নয়। তাঁদের সামান্য একটু ক্রোধের প্রকাশ হাজার হাজার দর্শকের ক্রোধকে উস্কে দিতে সক্ষম, এটা মনে রাখা উচিত। মনে রাখা উচিত, তাঁদের পেছনে ব্যয়িত হচ্ছে বহু মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ, সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা তাঁরা করতে পারেন না। গ্যালারির অভিনন্দনকে পুঁজি করে তাঁদের উচিত উন্নততর ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করা, উত্তেজনার শরিক হওয়া নয়। সাম্প্রতিককালের কিছু নামজাদা খেলোয়াড় তাঁদের আচরণে এই ধরনের প্রবৃত্তিরই স্বাক্ষর রেখেছেন। তাতে তাঁদের ক্রীড়াদক্ষতারও অপহ্নব ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের কথায় বলা যায়, তারাই পারেন এই দর্শক-অশান্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলায় সবচেয়ে সার্থক ভূমিকা পালনে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তারা সে দায়িত্ব অনেকক্ষেত্রে পালন করছেন না, উপরন্তু একটা মোহ ও কল্পনার পরিবেশ তৈরি করে উত্তেজনা সৃষ্টির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই সমস্ত পত্রিকার খুব একটা সদর্থক ভূমিকা নেই, বরং বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর তাড়নায় এবং সুচিন্তিত জনবিরোধী পরিকল্পনার মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে করতে ক্রীড়াক্ষেত্রেও তারা থাবা বাড়াচ্ছেন ধীরে ধীরে। এদের ভূমিকা সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। শুভবুদ্ধির উদ্বোধনে দরকার হলে এদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। দায়িত্বশীল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি এ ব্যাপারে তাদের যোগ্য ভূমিকা পালন করুক, এটা সবাই চান।

সবশেষে, আইনশৃংখলা রক্ষার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে আরক্ষা বাহিনীকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, সংযমের সঙ্গে। যেখানে হাজার হাজার মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, পশ্চিমবাংলার সুমহান ক্রীড়া-ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে কঠোরতার ব্যাপারটিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে কোন মূল্যে মানুষের সমর্থনকে পাথেয় করে ময়দানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুন্ন করার ক্ষেত্রে আরক্ষা বাহিনীর দায়িত্বই সর্বাধিক।

—দেবাশীষ দত্ত

ঐক্য বাক্য মাণিক্য। তপন চক্রবর্তী
ক্রান্তিক প্রকাশন, ১১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। সাত টাকা।

তপন চক্রবর্তী প্রগতি শিবিরের তরুণতম লেখকদের অন্যতম। তার গল্প কবিতা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের বাহক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে। 'ঐক্য বাক্য মাণিক্য' গল্প সংকলনে নন্দন, সত্যযুগ, ক্রান্তিক, গল্প সংকলন প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ১৪টি গল্পকে গ্রথিত করা হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত এই গল্পগুলির রচনাকাল সত্তর দশকের প্রথম আটটি বছর। সত্তর দশকের রক্তাক্ত চত্বরে গল্পগুলি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাই অত্যন্ত স্বভাবিকভাবেই এই সব গল্পে বারবার মেহনতী মানুষের সংগ্রাম আন্দোলন, দমন পীড়ন, খুন-সন্ত্রাস, গুলিবাজী নির্যাতন, জোতদারের কুটিল চক্রান্ত, হিংস্র আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও অকুতোভয়ে সংগ্রামকে বিকশিত করার জন্য দাঁতে দাঁত কষে এগিয়ে যাওয়ার ছবি ঘুরে ফিরে এসেছে। লেখককে ধন্যবাদ 'ব্রা-সর্বস্ব' সাহিত্য সৃষ্টির চটুল মাদকতা অস্বীকার করে তিনি গণ-আন্দোলন সংগ্রামকেই তার সাহিত্যের বিষয়ভুক্ত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তাই কলপাড়ের মানদা মাসীর তাৎক্ষণিক বুদ্ধির দীপ্তি, নিবারণের অনুভূতির নবজন্ম, রামরাবণের সংগ্রামের ময়দানে লুটিয়ে পড়া শব, সাংবাদিক অরুণের শৃংখল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা প্রক্রিয়া, রেল ধর্মঘটের দিনে ভিখিরী মেয়ের হলদে দাঁতের হাসি, অবনীবাবুর প্রমোশন নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা, বন্যাত্রাণে জাত পাতের প্রশ্ন তুলে জোতদারের আখের গোছানোর হীন প্রচেষ্টা, চটকলে মজুর ধর্মঘট ভাঙতে দেখে বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার জন্য কুসুমের মনের অতলে তলিয়ে যাওয়া, ভেড়ির মালিকের নিষ্ঠুর লুণ্ঠন, ট্রেনের মধ্যে গরীব মানুষের একাত্ম অনুভব করার কথা, আবু হোসেনের গল্প প্রভৃতি টুকরো টুকরো ছবি তার গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ছবির মত চোখের সামনে তুলে ধরে।

সংকলনের গল্পগুলির বিষয়বস্তু অত্যন্ত গভীর। টুকরো টুকরো ছবির মাধ্যমে লেখক লড়াকু মানুষের জীবনজয়ের চিত্রটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই সংগ্রামে কখনও কখনও ভুল হয় (কমরেড), কখনও বিশ্বাসহীনতা দেখা দেয় (অবনীবাবুর প্রমোশন), কখনও হঠাৎ স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে (নখদর্পন, খবর, মাছরাঙা) আবার কখনও মানুষ অপরূপ উপলব্ধির স্পর্শে নবরূপে উদ্ভাসিত হয় (ঐক্য বাক্য বাণিক্য, কুসুমের মন, গতকালও আজ প্রভৃতি)। লেখক আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন গল্পের নায়ক নায়িকাদের বিশ্বাস যোগ্য করে তুলতে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পারেন নি। গল্পগুলি পড়তে পড়তে প্রায়ই মনে হয়েছে লেখক বিষয় বস্তু সংগ্রহে যতটা ব্যস্ত, ভাষা বিন্যাস, শব্দ চয়ন, সংলাপ নির্মাণ, এক-কথায় রচনা শৈলীর প্রতি ততটা মনোযোগী নন। অনুশীলনের অভাব অধিকাংশ গল্পে প্রকট হয়ে উঠেছে। হলদে দাঁতের হাসি ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের একটি চমৎকার চিত্র বিধৃত করেছে। কিন্তু ঐ হলদে দাঁতের হাসিতে এসে থামলেই যেন গল্পটি আরও বেশী ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠত। সেসব গল্পে রূপকের মাধ্যম অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু রূপক গল্পে যে তীব্র ভাষার গতি প্রয়োজন তা একদম নেই, ফলে গল্পটি একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। অবনীবাবুর প্রমোশন গল্পটি একটি মনস্তত্ত্ব নির্ভর গল্প। এই গল্প একই সংগঠনের মধ্যে থাকা সত্বেও সংগঠকে সংগঠকে যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, ভুল বোঝাবুঝি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার নেপথ্য কারণ তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন লেখক। কিন্তু বাণীকণ্ঠ, অবনীবাবু সুরমা দের মনস্তত্ত্ব ধরার মত কলমের জোর তপনবাবুর নেই। কুসুমের মন গল্পটাই মহিলাদের আত্ম মর্যাদা বোধ ও ধর্মঘট ভাঙ্গা দালালদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কুসুমের মত বাপ মা হারা মেয়ের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মত মানসিক জোর সংগ্রহ করার জন্য যে পূর্ব প্রস্তুতি দরকার তার সামান্যতম চিত্রও নেই। ফলে ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য 'ভালো ছেলে অশোক' দালালি করে চটকলে ঢুকছে দেখেই কুসুমের মন বিষাক্ত হয়ে গেল দেখলে ব্যাপারটা খুবই সরলীকরণ মনে হতে পারে। সংকলনের অনেক গল্পেই এ রকম অসংগতি চোখে পড়ে। বিষয়ের গভীরতা থাকলেই যে কলমের জোরে তাকে বিস্ময় করে তোলা যায় তার জন্য চাই দীর্ঘ অনুশীলন। লেখক সেই অনুশীলনের ক্ষেত্রে চরম অবহেলা দেখিয়েছেন বলে মনে হলো। গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি পড়ে নীচু ক্লাসে ছাত্রের সিঁড়ি ভাঙ্গা অংকে যেনতেন প্রকারেণ শেষ উত্তর শূন্য করার ঝোঁকের কথা মনে পড়েছে বারবার। কে না জানে সিঁড়ি ভাঙ্গা অংকে সাধারণত মুখ্য উত্তর এলেও অসংখ্য ক্ষেত্রে অন্য উত্তরও আসে, তাতে অংক ভুল হয় না। লেখক প্রায় সব গল্পেই শেষ কালে একটি সংগ্রাম বা বিদ্রোহ বা বিক্ষোভকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। যেসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে এই চিত্র এসে পড়ে সেখানে বলার কিছু নেই, কিন্তু যেখানে জোর করে আনতে হয় আপত্তি ওঠে সেখানেই। টুকরো টুকরো ছবিতে মানুষের জীবনের নানা রকম চিত্র তুলে ধরে সংগ্রামের কথা না বলেও পাঠকের মনে রেখাপাত করা যায়। তার জন্য চাই দক্ষতা। আমরা আশা করব লেখক সেই দক্ষতা অদূর ভবিষ্যতেই অর্জন করবেন। বর্তমান সংকলনে সেই প্রতিশ্রুতি খুব উজ্জ্বল ভাবেই ফুটে উঠেছে।

গল্প সংকলনের ছাপা এতো পীড়াদায়ক হলে পাঠকের ধৈর্য ধরে রাখা খুবই কষ্টকর হয়। এতো অসংখ্য ছাপার ভুল কেন? এই অবহেলা নতুন লেখকদের সুনাম অর্জনে বাধার কারণ হতে পারে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে প্রকাশক এদিকে দৃষ্টি দেবেন। প্রচ্ছদ সাধারণ মানের। ছাপার জগতে সংকটের দিনে একশ চার পাতার বই সাতটাকায় পাওয়া গেলে আপত্তি করার কোন কারণ নেই।

—সরল বিশ্বাস

বিভাগীয় সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলা

সাগরদিঘী ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এই ব্লকের ব্লক যুব উৎসব (১৩ থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত) মার্চ মাসের ১৬ তারিখে শেষ হয়। একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সভাপতি। এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল ২৫টি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান এবং ৫টি প্রদর্শনী। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল শিশুদের বসে আঁকো, অঙ্ক দৌড়, আবৃত্তি, যেমন খুশী সাজো, নাটক, নানা ধরণের সঙ্গীত, আলোচনা চক্র, বিতর্ক ইত্যাদি। খেলাধুলার

বামনগোলা ব্লক যুব উৎসবে বালিকাদের যোগাসন প্রদর্শনী

মধ্যে ছিল ভলিবল, খো-খো, ডিসকাস, দৌড়, কবাডি, তীর নিক্ষেপ ও লৌহগোলক নিক্ষেপ। সর্বমোট ১০৯৪ জন নানা ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ১৭ই মার্চ সকাল ৯টায় জেলা পরিষদের সভাধিপতির সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় জন প্রতিনিধি পঞ্চায়েত সভাপতি, বিডিও ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বেলডাঙ্গা-১ ব্লক যুব-করণের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২১ থেকে ২৩শে মার্চ। উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সভাপতি মহঃ নৌসাদ আলি। নানা ধরণের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী চলে তিনদিন ধরে। ২৩শে মার্চ সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শরীর শিক্ষা আধিকারিক অধীর ঘোষ। এ ছাড়া আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ধরণের অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিমদিনাজপুর জেলা

রায়গঞ্জ ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে ও পরিচালনায় ৪ঠা মে ব্লক স্তরে সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতার চারটি বিভাগে ৩৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সাহিত্যিক ডাঃ বৃন্দাবন বাগচীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী ব্রততী ঘোষরায় ১৫ জন কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেন। এবারকার এই প্রতিযোগিতায় গ্রামীণ প্রতিযোগীদের সংখ্যাধিক্য একটি বিশেষ আনন্দসংবাদ বলা যেতে পারে। এই ব্লকের পরিচালনায় ১৬ ও ১৮ মে যুব উৎসবের আয়োজন করা

গাইঘাটা ব্লক যুব উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন রণজিৎ মিত্র, এম. এল. এ

হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন যুব-উৎসব কমিটির সভাপতি প্রাণনাথ দাস। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে ৫৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। আদিবাসী যুবকদের জন্য বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। যুব-উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন সত্যব্রত ঘোষ। বিভিন্ন বিভাগের কৃতী ৬৩ জনকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র উপহার দেওয়া হয়।

বর্ধমান জেলা

আউসগ্রাম-১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ২১, ২২ ও ২৩ শে মার্চ যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুব উৎসব কমিটির সভাপতি কালিদাস মাঝি উৎসবের উদ্বোধন করেন। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৪০০ জন। আদিবাসী যুবকদের জন্য তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা নির্দিষ্ট ছিল। কৃতী প্রতিযোগীদের শ্রীযুক্ত মাঝি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

রায়গঞ্জ ব্লক যুব উৎসবে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় জনৈক আদিবাসী প্রতিযোগী

আউসগ্রাম ২নং ব্লক যুব অফিস যুব উৎসব চলে ২৯ থেকে ৩১শে মার্চ। উৎসবের সূচনা করেন পঞ্চায়েত সভাপতি জানে আলম্। বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৩১ জন ও ৭৯ জন। সরকারী প্রচেষ্টায় এ ধরনের অনুষ্ঠান এখানে প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ায় জনমনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহবুব জাহেদী।

কালনা ২ নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে আয়োজিত যুব উৎসব অনুষ্ঠানের ২৯শে মার্চ উদ্বোধন করেন পঃ বঃ সরকারের পশুপালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতামূলক নানা ধরনের অনুষ্ঠানসূচীতে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে সফল ১০৭ জনকে পুরস্কৃত করেন বর্ধমান জেলাপরিষদের সভাধিপতি মেহবুব জাহেদী।

কালনা ২ ব্লক যুব উৎসবে প্রদর্শনী মণ্ডপ

নদীয়া জেলা ঃ

রানাঘাট ২ নং ব্লক যুব-করণ আয়োজিত ১৩ থেকে ১৫ই মার্চ ব্যাপী যে যুব উৎসব অনুষ্ঠান চলে তার উদ্বোধন করেন রানাঘাট (পশ্চিম) কেন্দ্রের বিধানসভার সদস্য গৌর চন্দ্র কুণ্ডু। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়সূচীর মধ্যে ছিল বিভিন্ন মিটারের দৌড়, দীর্ঘ ও উচ্চ লম্ফন, ডিসকাস থ্রো ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে আবৃত্তি, সঙ্গীত, লোকনৃত্য, ব্রতচারী

নবদ্বীপ ব্লক যুব উৎসবে দৌড় প্রতিযোগিতা

অতিপ্রদর্শন, বিতর্ক, একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। বিষয়সূচীভেদে ২ থেকে ৭ হাজার পর্যন্ত জনসমাগম হয়। ১৫ই মার্চ স্থানীয় রানাঘাট (পূর্ব) কেন্দ্রের বিধান সভার সদস্য সতীশচন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দার্জিলিং জেলা ঃ

মিরিক ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক অফিসের উদ্যোগ ও ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় মারমা প্রেমসুন্দর স্মারক পাঠশালা প্রাঙ্গণে ১০ ও ১১ই মে যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয় ও যুব সংগঠনের প্রায় তিন শত ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পাহাড়ী ওম্ফু নাচ, নেপালী নৃত্য ও লোকনৃত্য ও লোকগীতি, কবিতা ও শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন রকমারি পাহাড়ী ফুলের প্রদর্শনী, হাতের কাজ এবং শিশুদের চিত্রাঙ্কন খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দূর-দূরান্ত থেকে আগত চা-বাগানের কর্মীদের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় এক প্রবীণ (৯৬) সমাজসেবী। পুরস্কার বিতরণ করেন মারমা চা-বাগানের ম্যানেজার এল. বি. দেওয়ান। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মিরিক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সি. বি. রাই ও মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক।

রায়গঞ্জ ব্লক যুব উৎসবে উচ্চ লম্ফনরত জনৈক প্রতিযোগী

কার্শিয়াঙ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত পাহাড়ী এলাকা বেষ্টিত কার্শিয়াঙ শহরে এন, ভি, ট্রেনিং সেণ্টার ময়দানে গত ১৪ ও ১৫ জুন '৮০ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে হাজার হাজার পাহাড়ী লোকের সমাগমে কার্শিয়াঙ ব্লক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি জগতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অসংখ্য যুব ছাত্রের মধ্যে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চা বৃদ্ধিই এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৪ জুন সকাল দশটায় অসংখ্য ছাত্র যুব উপস্থিতি কার্শিয়াঙ সদরের মহকুমা শাসক ডি. পি. ব্যানার্জি প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং ভারত স্কাউটস এণ্ড গাইডের কার্শিয়াঙ শাখার পরিচালনায় বর্ণাঢ্য মার্চ পাস্টের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সহ-মহকুমা শাসক ও যুব উৎসব কমিটির সভাপতি আর. মুৎসুদ্দি এবং স্বাগত ভাষণ দেন ব্লক যুব আধিকারিক ও যুব উৎসব কমিটির সম্পাদক ও আহ্বায়ক এস. দেওয়ান।

১৪ জুন বিকাল ৪টায় যুব উৎসবের শিক্ষামূলক অঙ্গ হিসাবে বর্তমান আসাম সমস্যা ও পার্বত্য বিকাশ প্রকল্পের ওপর এক "আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত" হয়। আলোচনা চক্রে সভাপতিত্ব করেন দার্জিলিঙ জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী শিবকুমার রাই। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সহ-মহকুমা শাসক আর. মুৎসুদ্দি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অসিত রাই। তুলসী ভণ্ডারাই ও আরো অনেকে।

১৫ জুন সকাল দশটায় স্থানীয় সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ যুব ছাত্রদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতামূলক "সাহিত্য বাসরের" আসর বসে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে সাহিত্য বাসরের শুভ সূচনা করেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পি. কে. রায়। সভাপতিত্ব করেন সহ-মহকুমা শাসক আর. মুৎসুদ্দি ও প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন ডাউহিল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি এস. প্রধান।

১৫ জুন দুপুর দুটায় নেপালী একক ও যৌথভাবে নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠান সব থেকে বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উৎসব প্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য কার্শিয়াঙ ব্লকের বহু দূরদূরান্ত বস্তী থেকে তরুণ তরুণীরা এসে এই উৎসব প্রাঙ্গণকে মুখরিত করে রেখেছিল। রাত্রি ৯টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। উভয়দিনে পুরস্কার বিতরণ করেন মহকুমা শাসক ডি. পি. ব্যানার্জি। এই যুব উৎসব প্রসঙ্গে দেওয়ান জানান যে, সব বিভাগ মিলিয়ে প্রায় চারশত প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে ৯৭ জন প্রতিযোগীকে আকর্ষণীয় পুরস্কারসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানপত্র দেওয়া হয়।

পাঠকের ভাবনা

নাটক প্রকাশ করুন

অপসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান মাধ্যম নাটক। আবার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়বার সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম এই নাটক। অথচ অপসংস্কৃতি মূলক নাটকের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সুস্থ সংস্কৃতির নাটকের সংখ্যা খুব কম।

'যুবমানস' পত্রিকা একটি সুস্থ সংস্কৃতির বলিষ্ঠ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সেই জন্য আমাদের অনুরোধ 'যুবমানসের' প্রতি সংখ্যায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের সাথে সাথে একটি করে সুস্থ সংস্কৃতির ও প্রগতিশীল নাটক প্রকাশ করুন।

—দিলীপ কুমার মাজী
গ্রাম-চাউলা
পোঃ-ঘাটাল
মেদিনীপুর

প্রচার ব্যাপক হোক

যুবমানসের মার্চ-এপ্রিল '৮০ সংখ্যা পড়ে অনুপ্রাণিত হ'লাম। বিশেষতঃ প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত সমকাল চিন্তিত এবং রাজনীতি-সচেতন।

তবুও বলতে হয়, 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর মত 'যুবমানস' পত্রিকার ব্যাপক প্রচার নেই। কারণ জানিনা। আজকের হতাশ-গ্রস্থ বিভ্রান্ত যুবকসম্প্রদায় যথেচ্ছ রুচিতে পড়তে বাধ্য হচ্ছে বাজারী পত্রিকাগুলোর উপহারঃ বস্তাপচা সাহিত্যের প্রভাব।

যুবমানসের প্রচার ব্যাপক হ'লে বিভ্রান্ত পাঠকদের কাছে 'যুবমানস' আদর্শ সামিল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

—স্বপন নাগ
১১৮, পি. কে. গুহ রোড। কলকাতা-২৮

মাসিক যুবমানসের আমি নিয়মিত পাঠক। আর সেই অধিকারে এই পত্রটি পাঠাচ্ছি 'পাঠকের ভাবনা' বিভাগে। যুবমানসের গত মে সংখ্যায় প্রকাশিত একগুচ্ছ কবিতা পড়ে ভাল লাগল। আর একটি মূল্যবান লেখা 'রবীন্দ্রনাথঃ বিভেদপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে'। লেখাটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

'যুবমানস' যে ক্রমেই উন্নত হচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সাথে সাথে একটা অনুরোধ, এত সুন্দর একটি পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন।

—পাঁচুগোপাল হাজরা
১০০৮/১৫, কল্যাণগড় (হাবড়া)
২৪-পরগনা।

নিয়মিত প্রকাশ প্রয়োজন

আমি 'যুবমানস' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। পত্রিকাটি বেশ উপভোগ্য। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই। বর্তমানের এই পত্রিকার ব্যাপক প্রচারের ফলে যুব-ছাত্র সমাজ বেশ উপকৃত হয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান কয়েকটি সংখ্যা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। পত্রিকার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা বিভাগ সত্যিই মূল্যবান।

তথাপি এই পত্রিকার অনিয়মিত প্রকাশনায় পাঠক সমাজ সত্যিই হতাশ-গ্রস্থ। এই পত্রিকার প্রকাশ যদি নিয়মিত না হয় এবং পাঠক সমাজের হাতে যদি নিয়মিত না পৌঁছায়, তাহ'লে এই পত্রিকা হয়ত পাঠক সমাজের মানস লোকের অজান্তেই থেকে যাবে। ব্যর্থ হবে যুব মনের চাহিদা মেটাতে।

আপনারা পত্রিকাতে 'পাঠকের ভাবনা' বিভাগ সংযোজন করেছেন, তাই উৎসাহিত হয়ে এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করে আমার এই আবেদন।

—তুষার কান্তি সামন্ত
গড়-কোটালপুর। বাঁকুড়া।

পাঠকদের কাছে নিবেদন

গত সংখ্যায় গৌতম ঘোষ দস্তিদারের লেখা 'দুটি মেলা তিনটি উৎসব' রিপোর্টদুটিতে কিছু ছাপার অস্বস্তিকর ভুল থেকে গেছে। ২৪ পৃষ্ঠায় 'কোপিয়াত্তম' নয় 'কোডিয়াত্তম', 'আমপু' নয় 'থামপু', 'চিতেগু চিন্তি' নয় 'চিত্তেকু চিন্তে' গহণ নয় 'গ্রহণ' পড়তে হবে। এছাড়া গৌতম ঘোষের তেলেগু ছবি 'মা ভূমি'-এর আগে সর্বপ্রাথা শব্দটি বাদ যাবে। 'ঘটশ্রাদ্ধ' ছবিটির নাম 'ধর্ব শ্রাদ্ধ' হ'য়ে গেছে এবং এই ছবির একটি চরিত্র 'নানী'-এর স্থলে হয়েছে 'মানী'। 'চালক' নয় হবে 'বালক'। সৈয়দ মীর্জার ছবি দুটির সঠিক নাম—'অরবিন্দ দেশাই কী অজব দস্তানা' এবং 'আলবার্ট পিন্টো কো গোঁস্যা কিউ আতা হ্যায়'।

'সলিল চৌধুরীর গান আমাদের সঞ্চারিত করে' জায়গায় পড়তে হবে সঞ্জীবিত করে।

এই অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

—সঃ মঃ যুবমানস

বাগমুণ্ডি ব্লক যুব উৎসব '৮০ তে ছো-নৃত্য

সিটুর রাজ্য সম্মেলনে যুব কল্যাণ বিভাগের প্রদর্শনী স্টলে ছাত্র-যুবদের ভীড়

গাইঘাটা ব্লক যুব উৎসবে ছবি আঁকতে ব্যস্ত শিশু শিল্পীরা

হাড়োয়া ব্লক যুব উৎসবে আদিবাসী সংঘের আদিবাসী বালক বালিকাদের নাচের দৃশ্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
অগাস্ট, '৮০

সূচিপত্র

প্রচ্ছদঃ অশোক মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঁচিশ পয়সা

সম্পাদকীয়

প্রায় দুই শত বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি যেদিনে মুছিয়া গেল, সেদিন ভারতের অফিস আদালত হইতে 'ইউ-নিয়ন জ্যাক'কে বিদায় করিয়া ত্রি-বর্ণ পতাকা স্থান দখল করিল। দেশের বুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যেদিন আনুষ্ঠানিক অবসান হইল সেই ১৫ই আগস্ট প্রত্যেক ভারত-বাসীর নিকট যে একান্ত পবিত্র—একথা নূতন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

এই স্বাধীনতার জন্য কত ভারতীয় সিপাই-সান্ত্রী ইংরেজের তোপের মুখে বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কত সন্ন্যাসী ত্রিশূল তুলিয়া বিদ্রোহের আহ্বান জানাইয়াছেন, কত ছাত্র স্কুল-কলেজের মায়া কাটাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, কত বিদ্রোহী যৌবন অতুলনীয় আত্ম-ত্যাগের সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অসংখ্য শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত স্বাধীনতার যুদ্ধে কতভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া দেশের স্বাধীনতা পাওয়ার পথকে আরও কত সহজ করিয়া দিয়াছেন—তাহার একটু ক্ষুদ্র অংশও মনে পড়িলে গর্বে কাহার না বুকখানি ফুলিয়া ওঠে?

দেশ বলিতে তাঁহারা কোন অবাস্তব দেবী মূর্তির কল্পনা করেন নাই, তাঁহারা দেশের মানুষকেই বুঝিয়াছিলেন। স্বভাবতই স্বাধীনতা দিবসে সমীক্ষা করা হয় স্বাধীনতার স্বাদ মানুষের ভাগ্যে কতটুকু জুটিয়াছে। 'ক্ষুধার রাজ্য' হইতে কি মানুষ মুক্তি পাইয়াছে? যুবকের বেকারত্বের যন্ত্রণার জ্বালার কি কিছুটা অন্তত উপশম হইয়াছে? নিরক্ষরতার আঁধার কি দেশ হইতে অপসারিত হইয়াছে? গ্রামে জোতদারী-মহাজনী শোষণের কব্জা কি আল্‌গা হইয়াছে? মালিক-মজুতদারের অত্যাচার কি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, আঞ্চলিকতা, অস্পৃশ্যতার মত মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ কি হ্রাস পাইয়াছে? বিদেশী পুঁজির অক্টোপাস্ হইতে কি জাতীয় অর্থনীতি মুক্তি পাইয়াছে? শ্রদ্ধার সাথে অগণিত স্বাধীনতা যোদ্ধার স্মৃতি তর্পণ যেমন আজকের দিনে প্রয়োজন—সেই সঙ্গে জনজীবনে এই ধরণের প্রশ্নগুলির মীমাংসা এই ৩৩ বৎসরে কতখানি হইয়াছে তাহাও গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। উপলব্ধি করিতে হইবে এই জাতীয় সমস্যার যদি কোন সঙ্গত সমাধান না হয় মানুষের নিকট স্বাধীনতার তাৎপর্য, তাহার মর্ম একান্ত-ভাবেই ফিকে হইয়া যাইতে পারে।

একই সঙ্গে সুতীক্ষ্ন নজর রাখিতে হইবে যেন দেশের কোন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রতি-ক্রিয়াশীল ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি দেশের ঐক্য এবং সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া স্বাধীনতার মূল শিকড়কে আল্‌গা করিয়া দিতে না পারে।

ইহা তো ধ্রুব সত্য যে আমাদের এই বিশাল দেশে নানা বর্ণের, নানা ভাষার, নানা কৃষ্টির, নানা ধর্মের মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছেন। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিবেশ হইতে শুরু করিয়া আচার-ব্যবহারের মধ্যে পর্যন্ত বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে আমরা একই দেশের অধিবাসী। চিন্তা-চেতনায় আমরা এক। একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, বিবিধের মধ্যে মিলন—ইহাই তো আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এই সত্যকে যেমন আমাদের প্রত্যেকের সঠিক ভাবে বুঝিতে হইবে, ততোধিক বলিষ্ঠ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে দেশের কর্ণধারদের।

এই ৬৫ কোটি মানুষের দেশের শাসন ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল তাহাদের প্রায় তিন যুগের শাসন কালে জাতীয় সংহতির সুতা কি শক্তিশালী হইল না দুর্বল হইল, তাহা ভাবিয়া দেখিব না? অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা যতটুকু বাড়িয়াছে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে তাহার সামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টন কি আদৌ হইয়াছে? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্যগুলির মধ্যে যুক্তি-নির্ভর সম্পদ বিতরণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে সুষম অর্থ বিনিয়োগ, রাজ্যের মানুষের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলিকে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও ক্ষমতা প্রদান—এই সবই তো বিভিন্ন এলাকার বিকাশ সাধনে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়গুলি কি সুবিচার পাইয়াছে?

জাতীয় ভাষা, মূল সাংস্কৃতিক ধারার সহিত লয় রাখিয়া আঞ্চলিক প্রধান ভাষাগুলি ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি সমূহ উন্নতির কোন সঙ্গতিপূর্ণ সুযোগ কি পাইয়াছে? পাইলে ইহার আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি হইতে পারিত কি না সে বিতর্কের মধ্যে না যাইয়াও কসম করিয়া বলা যাইতে পারে বর্তমান বেদনাদায়ক ও নিষ্ঠুর বৈষম্য জাতীয় সংহতিকে এই ভাবে চ্যালেঞ্জ জানাইতে পারিত না। এই বৈষম্যের গর্ভেই জন্ম লাভ করে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ। তাহা হইতে সৃষ্টি হয় আঞ্চলিকতাবাদ। ইহারই প্রকাশ ঘটে 'ভূমি পুত্রদের জন্য সংরক্ষিত সুযোগ' এর দাবীতে। আর এই ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী দাবীকে কার্যকরী করিবার জন্য তৈরী হয় শিবসেনা, লাচিত সেনা, আমরা বাঙ্গালী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রমুখ সংগঠনগুলি। তৈরী হয় 'আসু'র মত বিবেক বর্জিত বাহিনী।

ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দর্পণে মানুষ যখন এই সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রকৃত পথের সন্ধান পায়, কাতারে কাতারে মানুষ সমবেত হইতে থাকে সেই পথের ধারে—তখনই ভীত-শঙ্কিত কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠী বহুদিন ধরিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চিত হওয়া মানুষের ক্ষোভকে বিপথে চালিত করিবার জন্য মানুষকে বিশেষ করিয়া সংবেদনশীল যুব-ছাত্র সমাজকে সর্বনাশা পথে ঠেলিয়া দিতে উদ্যত হয়। ত্রিপুরা-উপজাতি যুব সমিতি, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর খণ্ড, গোর্খা খণ্ড ও ঝাড়খণ্ডওয়ালারা সেই বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের শিকার। আর এই সুযোগ বুঝিয়া ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাঁহার নিজস্ব এজেন্টদের সাহায্যে তাহার খল উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়াছে। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সম্প্রতিক ঘটনা সমূহ ইহারই জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার আহ্বানে দেশপ্রেমিক মানুষ বিশেষ করিয়া যুব ও ছাত্র সমাজের যোগ্যতার সহিত সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এত গভীরভাবে দেখা দিয়াছে। বহু কষ্টার্জিত ও লক্ষ শহীদের রক্তাক্ত পথে আগত এই স্বাধীনতা ও জাতীয় সংহতিকে যে কোন মূল্যে রক্ষা ও শক্তিশালী করিতে হইবে। দেশের অখণ্ড সত্তার মধ্যেই জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানের বৈজ্ঞানিক পথে সমস্ত মানুষকে সমবেত করিতে হইবে। সেই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়াই এ বৎসরের স্বাধীনতা দিবস পালিত হউক যুব মনের নিকট এই আমাদের আবেদন।

এবারের স্বাধীনতা দিবস

প্রমোদ দাশগুপ্ত

সম্পাদক, সি. পি. আই (এম), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

ভারত স্বাধীন হবার তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলো। এবারে দেশের জনগণ চৌত্রিশতম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন। বর্তমান বছরের একটা বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। এই বছরেই পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের চারটি ঐতিহাসিক ঘটনার পঞ্চাশতম বার্ষিকী। এই চারটি ঘটনা হলোঃ গাড়োয়ান বিদ্রোহ, চট্টগ্রাম বিদ্রোহ, সোলাপুর বিদ্রোহ এবং গাড়োয়ালী বিদ্রোহ। এই সমস্ত বিদ্রোহ ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। এই সমস্ত বিদ্রোহ ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জঙ্গীরূপ—এই সমস্ত বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্বাক্ষর বহন করছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে নিছক অহিংস পথে জয়যুক্ত হয় নি তারই স্বাক্ষর বহন করছে এই সমস্ত বিদ্রোহ। এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের স্মরণ করতে হবে সেই সমস্ত অমর শহীদকে যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়নের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের এই কঠোর আত্মত্যাগ, কারা নির্যাতন, কষ্টস্বীকার ভারতের দেশপ্রেমিক জনগণ কোন দিন ভুলতে পারেন না। তাঁদের এই আত্মত্যাগের কাহিনী প্রতি মুহূর্তে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলো। এই তেত্রিশ বছরের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব এই সময়ে একদিকে যেমন একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের শোষণ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের জনগণ বিরাট বিরাট গণ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের শোষণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হবার পর এমন একটি বছর অতিক্রান্ত হয় নি, যে বছরে ঘাটতি বাজেট পেশ হয় নি বা জনগণের উপর নতুন করে করের বোঝা চাপে নি। ঘাটতি বাজেট পেশ এবং করের বোঝা বৃদ্ধি ধনবাদী শাসন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি। এই ব্যবস্থার ফলে প্রতি বছর ঘটছে মুদ্রাস্ফীতি। বিগত তেত্রিশ বছরের হিসেব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে টাকার মূল্য কমতে কমতে বর্তমানে ২৭ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। এত অল্প সময়ে এই ধরনের অর্থের মূল্যহ্রাস আর কোন দেশে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এই অর্থনৈতিক সংকট ক্রমবর্ধমান। আর অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেই এই সংকট প্রসারিত। সম্প্রতি লোকসভায় প্রদত্ত বিবরণ থেকে দেখা যায় ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা হলো দেড় কোটি। যে সমস্ত যুবক-যুবতী কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লেখান তাঁরা সকলেই শিক্ষিত যুবক-যুবতী। যাঁরা শিক্ষিত নন, তাঁদের এক বড় অংশই বেকার। রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের চাইতে অন্তত দশগুণ হবে অরেজিস্ট্রিকৃত বেকার। এ থেকেই দেশের অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতা বোঝা যায়। এই অর্থনৈতিক সংকট আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যে, দেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ নির্ভর করছে বিদেশী ঋণের উপর। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্য থেকে জানা যায়, দেশের বর্তমান বিদেশী ঋণের পরিমাণ হলো তের হাজার কোটি টাকা। ক্রমবর্ধমান এই অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন ক্ষমতা বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর নেই, থাকতে পারে না।

ইতিহাসের নিয়ম হলো, ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি শাসক ও শোষক শ্রেণী যখন জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে ব্যর্থ হয়, যখন বিভিন্ন সমস্যা বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে এবং সংকট ও সমস্যার গভীরতা বাড়তে থাকে তখন বুর্জোয়ারা এই সংকটের সমস্ত বোঝাই জনগণের উপর

চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে। ইতিহাসের আরো শিক্ষা হলো, ধনবাদী শাসকেরা একটা স্তরে মুখে জনকল্যাণের বুলি আওড়ালেও প্রকৃতপক্ষে তাদের একটিই লক্ষ্য থাকে—শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীশাসন বজায় রাখা। স্বাধীন ভারতের তেত্রিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব ভারতের বুর্জোয়া শাসকেরা এই পথ ধরেই চলেছে।

অর্থনৈতিক সংকট যত বৃদ্ধি পাবে শাসকশ্রেণী নিজেদের শ্রেণীশাসন ও শোষণ বজায় রাখার জন্য তত বেশি বেশি করে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। ভারতের বুর্জোয়া-জমিদার শাসন ব্যবস্থায় একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের দাবি ছিল গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান। দাবি ছিলঃ বাক স্বাধীনতা, সংবাদপ্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের সংবিধানে যে সমস্ত মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ হয় সেগুলি এই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে উত্থাপিত দাবিসমূহেরই প্রতিফলন। তবে এটাও বাস্তব সত্য যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে যে সমস্ত দাবি উত্থাপিত হয় তার সবটার স্বীকৃতি ভারতের সংবিধানে নেই। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের অধিকার সমূহ যখন সংবিধান প্রণীত হয় তখনই উপেক্ষা করা হয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। সংবিধান রচনার সময় যে সমস্ত অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হয় তার অনেকগুলিই এই তেত্রিশ বছরে কেড়ে নেওয়া হয়। মাত্র তেত্রিশ বছরে ভারতের সংবিধানের ৪৫ বার সংশোধন করা হয়। এই ধরনের সংবিধানের ব্যাপক সংশোধন আর কোন দেশে হয় নি। আর অধিকাংশ সংশোধনই গেছে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহের বিরুদ্ধে, নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে। এই সমস্ত সংশোধনের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়—কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়।

এবারে ভারতের জনগণ যখন চৌত্রিশতম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের বুঝতে হবে এবং ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। কেন্দ্রে সাত মাস হলো, ইন্দিরা কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়েছে। এই সাত মাসে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তাতে স্বৈরতন্ত্রের বিপদ ঘনীভূত হয়েছে। ৯টি নির্বাচিত রাজ্য বিধানসভা বাতিল, প্রেস কমিশন বাতিল, পি. ডি. আইন প্রবর্তন, ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে অর্ডিন্যান্স জারি ইত্যাদি ঘটনা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপজ্জনক ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশিষ্ট আইনজীবী ভি. এস. তারকুণ্ডে বলেছেনঃ বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি চলছে তা অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার প্রাক্-মুহূর্তের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর দেশের অর্থনৈতিক সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। আর এই সংকট যত বেশি বেশি করে বৃদ্ধি পাবে সরকারও তত বেশি বেশি করে স্বৈরতন্ত্রের পথে পা বাড়াবে। আজ দেশের জনগণের সামনে এই বিপদ নতুন করে দেখা দিয়েছে, এই বিপদ ক্রমবর্ধমান।

একদিকে যেমন স্বৈরতন্ত্রের বিপদ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে ভারতের জনগণের সামনে আর একটি বিপদ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিপদ হলো বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপদ, ভারতকে টুকরো টুকরো করার চক্রান্ত। প্রায় এক বছর হতে চললো আসামে "বিদেশী বিতাড়নে"র নামে চলছে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এই তথাকথিত আন্দোলনের নামে সেখানে সহস্রাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন; আহত হয়েছেন কয়েকশ' নরনারী। কয়েক কোটি টাকার বিষয় সম্পত্তি, ধন সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। বহু মানুষকে আসাম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। আসাম সমস্যা সমাধানের জন্য দু' দুবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখনও কার্যকর কিছুই হয় নি।

আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পিছনে যে বিদেশী শক্তি অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা রয়েছে তা আজ সুপ্রমাণিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সংগঠিত করে আজ দেশকে টুকরো টুকরো করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আজ জাতীয় সংহতি বিপন্ন করে তুলতে উদ্যত। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তারা আজ এক বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এদেরই চক্রান্তে ত্রিপুরায় নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল। আজ স্বাধীনতা দিবসে দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষকে এই ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির স্বপক্ষে ব্যাপক গণ-আন্দোলন সংগঠিত করে তুলতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার তেত্রিশ বছর পরে একদিকে যেমন স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্র করছে, অন্যদিকে দেশের সামনে আর একটি বিকল্প চিত্রও রয়েছে। সেই চিত্র হলো বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতির চিত্র। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার জনগণ বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে সামনে রেখে নতুন নতুন বিজয় অর্জন করে চলেছেন। কেরালায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সরকার। এই সমস্ত সরকার নিজ নিজ রাজ্যের জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। এই সমস্ত সরকার স্বৈরতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশব্যাপী এই শক্তির প্রসার ঘটাতে হবে।

এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের সংকল্প হোকঃ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে হবে; জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে; বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের প্রসার ঘটাতে হবে।

কলঙ্কিত ১৫ই আগস্ট

মাখন পাল
সম্পাদক, আর. এস. পি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

ভারতের ৬৫ কোটি মানুষের মধ্যে ২০ কোটি মানুষকে 'ফালতু' বলে ঘোষণা করা হয়েছে; ইংরেজী ভাষায় বলা হয় —'Redundant'। এরা কোথায় থাকে, কী খায় এবং কোথায় যায় তার খবর রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার কেউই রাখেন না, অথবা খবর রাখার প্রয়োজনও মনে করেন না। সারা ভারতের হিসাবে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন মানুষ আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ থেকে ৭২ জন কর্মক্ষম মানুষ বেকারির জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে; এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই শতকরা ৭২ থেকে ৭৩ জন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। সরকারী মতে চার জনের পরিবার যদি গড়ে মাসে ১০০ টাকা আয় করে, তবে তাকে ধরা হয় দারিদ্র্যসীমার উপরের স্তরে—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বৃটিশ সরকারের সঙ্গে ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষের মাধ্যমে অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হল তার মধ্যে এই খণ্ডিত ভারতের অবস্থার এটাই হল হাল-ফিল চিত্র। এই হিসাব কিন্তু কোনও মার্কসবাদী বা বামপন্থী দলের সূত্রে প্রাপ্ত নয়। খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব। আবার এই চিত্রও ঠিক আজকের চিত্র নয়—দু-তিন বৎসর আগেকার চিত্র। অনুমান করতে অসুবিধা হবে না যে, বিগত দু-তিন বছরে এই চিত্র আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। অন্য কথা বাদ দিলেও গ্রামাঞ্চলে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং ক্ষুদ্র চাষীর জমি-জমা যেভাবে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তাতে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা গণনার বাইরে চলে গিয়েছে—যাদের সারা বছরে ৬ থেকে ৮ মাস কোনও কাজই থাকে না। শহরাঞ্চলেও মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, ক্ষুদে দোকানদার প্রভৃতি গরীব মানুষের যা-কিছু ধনসম্পত্তি সবই ধনী ও বড় বড় ব্যবসায়ীর হাতে গিয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পাঁচশালা যোজনার পর যোজনাপ্রণেতাদের পক্ষ থেকেই ফলশ্রুতি হিসেবে বলা হয়েছে —"ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরীব হয়েছে আরও গরীব।" তারপর অনেকগুলি পুরো এবং আধা-পরিকল্পনার কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। মনোপলি কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষে ৭৫টি পরিবার, আরও সূক্ষ্ম হিসেবে ১০টি পরিবার বর্তমান ভারতবর্ষের মালিক। টাকা-পয়সা, ধনসম্পত্তি —সব কিছুরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মালিকানা এরা পেয়ে গেছে। আপোষে-পাওয়া স্বাধীনতার এটাই হলো নীট ফল। পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত) ঔপনিবেশিক পরাধীন দেশের ধনিক শ্রেণী যদি পরাধীনতার অবসানের পর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে তবে যে এমন দুরবস্থাই জনজীবনকে বিড়ম্বিত করে তুলবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন সর্বহারার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কমরেড লেনিন। এই কারণেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের হাতে যখন ক্ষমতা অর্পিত হলো তখন তাদের অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আমরা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে পারি নি। ভারতবর্ষে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জনজীবন যে বিপর্যস্ত হবে সে কথা আমরা তখনই ঘোষণা করেছিলাম এবং ভারতের জনগণের জীবনে এই স্বাধীনতা যে অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয় সে কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করি নি। কিন্তু সেদিন ভারতের জনগণ নানাবিধ বিভ্রান্তির কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকার ফলে আমাদের কণ্ঠ তাদের মনে সাড়া জাগাতে

পারে নি। দীর্ঘ ৩৩ বছরের ধনবাদী শাসনের অভিজ্ঞতার আলোকে আজ অবশ্য মেহনতী মানুষের সকল অংশের কাছ থেকেই উপরোক্ত ঘোষণার স্বীকৃতি পেতে অসুবিধা হবে না।

ধনবাদী শাসনে এমন অবস্থা যে ঘটবে তা তো অন্ততঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী কোনও মানুষের কাছেই অজানা থাকার কথা ছিল না। আজ তো বিংশ শতাব্দীর শেষ যামের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। ধনবাদের সূর্য অস্তাচলের

পানে একেবারেই হেলে পড়েছে। কমরেড লেনিন এই যুগকে বলেছিলেন মুমূর্ষু ধনবাদের যুগ। সুতরাং ধনবাদী শাসনের রূপ কী দাঁড়াবে, বিশেষ করে অনুন্নত ধনবাদী দেশে, তা দুর্বোধ্য ছিল না। কারণ, ধনতন্ত্রের প্রথম আবির্ভাবের কালে ফরাসী বিপ্লবের আমলে ধনিক শ্রেণীকেও আমরা দেখেছি। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আওয়াজ তুলে যারা ক্ষমতায় বসেছিল তারা সেদিন সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু 'সাম্যের' নামে আইনের চোখে সব সমান এই লম্বা-চওড়া উক্তি করলেও কার্যতঃ আইনের পুরোপুরি সুযোগ পেয়েছিল ধনিক শ্রেণী ও তার স্তাবকের দল। 'স্বাধীনতা'র স্লোগানকে রূপান্তরিত করল খেটে-খাওয়া মানুষকে শোষণের স্বাধীনতায়। আর 'মৈত্রী', তা তো সীমিত ছিল শোষক শ্রেণীর মধ্যে। আর আজ তো মুমূর্ষু ধনবাদের যুগ। এ যুগে যে মানুষ দুরবস্থার শেষ স্তরে পৌঁছুবে সে কথা ভাবতে বেশী বুদ্ধি খরচ করার প্রয়োজন পড়ে না। এই কারণেই আমরা দেখেছি, যে অর্থ-নৈতিক বনিয়াদের উপর খেটে-খাওয়া মানুষের সুস্থ জীবন ও জীবিকার বনিয়াদ গড়ে ওঠে। যে মৌলিক অর্থনীতি গ্রহণের ফলে মানুষ মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারে ভারতের শাসক ধনিক শ্রেণী সে পথ গ্রহণ করল না। ভারতের অর্থনীতিকে দাঁড় করানো হল তিনটি খুঁটির উপর—(১) বিদেশী মূলধন আমদানি, (২) জনগণের উপর নানাবিধ পরোক্ষ করের বোঝা চাপানো, (৩) মুদ্রাস্ফীতি বা অঢেল কাগুজে নোট ছাপানো। বিদেশী মূলধন আমদানির ফলে ঋণের বোঝা এখন দশ-বারো হাজার কোটি টাকার উপরে উঠে গেছে। পরিশোধ করার মত ক্ষমতা ভারতের আর নেই। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশটি সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে। পরোক্ষ করের ফলে প্রত্যেকটি জিনিষ, বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম আকাশ ফুঁড়ে উপরে উঠে গেছে। আর অঢেল মুদ্রা-স্ফীতির ফলে টাকার মূল্য সরকারী হিসেবে ২২ পয়সায় নেমে গেছে বললেও বস্তুতঃ দশ/বারো পয়সার বেশী নয়। মেহনতী মানুষের প্রাণ রাখতে প্রাণান্তকর অবস্থা। স্থিরী-কৃত আয়ের মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। কলঙ্কিত ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা মেহনতী মানুষকে আনাচে-আঘাটে মৃত্যুর স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু দেয় নি।

অথচ ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, ভারতের সংগ্রামী জনগণ উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে ভারতবর্ষে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না; আর খেটে-খাওয়া মানুষকেও এমন দুরবস্থায় পড়তে হতো না। দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা না করেও আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো যে জন-গণের স্বার্থে বিদেশী শাসনের অবসান ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতের যুবশক্তি অকাতরে ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন ডালি দিয়েছে, শ্রমিক-কৃষক-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষেরা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বছরের পর বছর অবিচারে ও বিনা বিচারে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে; কত মা সন্তানহারা হয়েছে, স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। সর্বোপরি ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্টের বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানকে কি আমরা ভুলতে পারি? আসমুদ্র হিমাচল হিংসা-অহিংসার গণ্ডী অতিক্রম করে সেদিন "ইংরেজ, ভারত ছাড়ো" স্লোগানে ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিল। উপযুক্ত বিপ্লবী নেতৃত্ব পেলে ঐ গণ অভ্যুত্থানই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হত। ১৯৪৭ সালের কলঙ্কিত ১৫ই আগস্টে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না। আগস্ট বিপ্লবের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতো শ্রমিক-কৃষক রাজ।

কিন্তু তা হল না। না হওয়ার প্রধান কারণ ছিল, সেদিন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আপোষ-বিরোধী নেতৃত্বের আহ্বানে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় নি। আপোষপন্থী ধনিক শ্রেণীর গালভরা বুলি বিভিন্ন মহলকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল। এমন কি, বামপন্থী ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী বলে পরিচিত কোনও কোনও দল ঔপনিবেশিক ধনিক শ্রেণী সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের যে সাবধান বাণী তাকেও উপেক্ষা করেছিল। ফলে, ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধে সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ত্রিপুরী কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বৃটিশ শাসকদের প্রতি 'চরমপত্র' দানের যে প্রস্তাব এনেছিলেন তা পরাজিত হল। নেতাজী বার বার যে-কথাটা বলেছিলেন—'শত্রুর বিপদ, আমাদের সুযোগ' (Enemy's difficulty, is our opportunity) সে-কথায় অনেকেই কর্ণপাত করলেন না। অথচ আপোষপন্থী ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেদিন যদি যুদ্ধের সুযোগে জনগণকে প্রস্তুত করা হতো এবং সঠিক সময়ে সংগ্রাম শুরু করা যেত তবে ভারতের পক্ষে সত্যিকারের জনস্বার্থবাহী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন মোটেই অসম্ভব হতো না। যুদ্ধের কারণে বিপর্যস্ত খেটে-খাওয়া মানুষ যে কী পরিমাণ ব্রিটিশ শাসনবিরোধী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ হিসেবে সহজেই ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জনগণ এমন অস্থির হয়ে উঠেছিল যে, যে মহাত্মা গান্ধী নেতাজীর আপোষবিরোধী কর্মসূচীকে বিরোধিতা করে বলেছিলেন—এসময়ে আন্দোলন করা যাবে না। কারণ, আমি আন্দোলন আরম্ভ করতে পারি, কিন্তু আন্দোলনকে থামাতে পারব না। (I can call a move-ment, but I cannot call it off), সেই মহাত্মা গান্ধীকে ১৯৪২ সালের ৭ই আগস্ট আন্দোলনের ডাক দিতে হলো। স্লোগান তুলতে হলোঃ ইংরেজ ভারত ছাড়ো। জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এমন কথাও প্রস্তাবে সন্নিবেশিত করা হলোঃ জমি হবে কিষাণের, কারখানা মজুরের, শান্তি সকলের তরে। কিন্তু স্লোগানেই তা সীমিত ছিল; নেতৃত্বের কোনও ব্যবস্থা করা হলো না, কোনও কর্মসূচী দেওয়া হলো না। ব্রিটিশ শাসন-শোষণে পর্যুদস্ত জনগণ সেই স্লোগানকে সম্বল করেই আসমুদ্র-হিমাচল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নেতৃত্ব-বিহীন হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই অস্তি-চিমুর-বালিয়া-সাতারা-বিহার, এমনকি আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের (তৎকালীন অখণ্ড বাংলা প্রদেশ) মেদিনীপুরেও ব্রিটিশ শাসনের বিকল্প সমান্তরাল সরকার (parallel government) প্রতিষ্ঠিত করেছিল। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে সারা ভারতেই জনগণের এই সরকার, তথা 'মজুর-কিষাণরাজ' প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু নেতৃত্ববিহীন আন্দোলন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেল। সহস্র শহীদের আত্মদান তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারল না। ভারতের কৃষক বিদ্রোহের আমল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে একটি সত্যে উপনীত হতে হয়, তা হলোঃ জনগণ নয়, জনগণের

সংগ্রামস্পৃহার অভাব নয়, উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবই বারবার গণ-অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

সুচতুর কংগ্রেসী ধনিক নেতৃত্বের অভিসন্ধি কিন্তু জয়যুক্ত হয়েছে। তারা জানত যে, ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের সঙ্গে আপোষ করতে হলেও জনগণকে সঙ্গে পেতে হবে; আন্দোলনের পথ ধরে চলতে হবে। গান্ধীজী অবশ্যই এই সত্যটি স্বীকার করেই বলতেন : আমার আন্দোলন আপোষের জন্যই (My struggle is only for a compromise)। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ অথচ রূপায়ণের কোনও কর্মসূচী না দেওয়ার মধ্যেই তাঁর এই মনোভাব সুস্পষ্ট। আর সেজন্যই আন্দোলন চলাকালেই কারাপ্রাচীরের অন্তরাল থেকে তিনি ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের সঙ্গে আপোষ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। এই আপোষের প্রয়োজনে তিনি যে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবকে একদিন 'নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস' (breath of life) বলে অভিহিত করেছিলেন সেই প্রস্তাবের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত হলেন। এদিকে আন্দোলন ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠে চলেছে। জনগণের অভ্যুত্থান ছাড়াও বায়ুসেনা, পুলিশ বাহিনী, কারারক্ষী বাহিনীর বিদ্রোহ এবং সর্বশেষে নৌ-বিদ্রোহ এবং আরও পরে, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে গণ-আন্দোলনের তীব্রতা বেড়েই চলতে থাকল। একদিকে ব্রিটিশ শাসনকর্তারা ভীত হয়ে উঠলেন, অপর দিকে অখণ্ড ভারতের ধনিক শ্রেণীর দুইটি প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ—গণ-বিপ্লবের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ফলে, আপোষের পথ সুগম হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে কলঙ্কিত ১৫ই আগষ্টে দেশ দ্বিখণ্ডনের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সূচনা এখানেই। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় ভারতীয় ধনিক শ্রেণী অধিষ্ঠিত হলো।

তারপর ৩৩ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মে বিশ্বজোড়া ধনবাদের সহগামী হিসেবে ভারতের ধনিক শ্রেণীও সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তর লাভ করেছে। ভারতের ধনিক শ্রেণীর সব কয়টি গোষ্ঠী দ্বিধা-ত্রিধা-বহুধা বিচ্ছিন্ন। ধনিক শ্রেণীর শাসকগোষ্ঠী ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ফ্যাসিবাদী কায়দায় শাসন চালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। পরবর্তী কালে সেই গোষ্ঠীর হাত থেকেও অপর গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। রাজনৈতিক সংকটে বিদীর্ণ সেই গোষ্ঠীও শাসনক্ষমতায় টিকে থাকতে পারল না। আজ আবার ফিরে এসেছে ইন্দিরা-নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই)-এর শাসন। সংকট কিন্তু বিন্দুমাত্র কমে নি। ধনিক শ্রেণী সংকটের সমস্ত বোঝা খেটে-খাওয়া মানুষের কাঁধে চাপিয়ে আত্মরক্ষার পথ খুঁজছে। স্বৈরতন্ত্রের পথে বিচরণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এবার আর ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জরুরী অবস্থার প্রবর্তনের প্রয়োজন পড়বে না। ইতিমধ্যেই ফ্যাসীবাদের জন্য গণ-ভিত্তি তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে; এবং সে পথে ধনিক শ্রেণীর আত্মরক্ষা সম্ভব হবে যদি বামপন্থী শক্তি, বিশেষ করে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শক্তি, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণকে শ্রেণীসচেতন ও বিপ্লবসচেতন করার পদ্ধতি গ্রহণ না করে। অর্থনীতিবাদ এবং সংস্কারবাদের গড্ডালিকা প্রবাহে যদি বামপন্থী শক্তি গা ভাসিয়ে না দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংগ্রামের পথে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করে তবেই এই মারাত্মক স্থিতির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। কারণ, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না—প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী বিপ্লবী রোজা লুক্সেমবুর্গের সেই কথা—ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটে সর্বহারা শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনে ব্যর্থতার শাস্তি হিসেবে (Fascism comes as a punishment for the failure of the proletariat in accomplishing the socialist revolution.)

সারা দুনিয়ার ধনবাদী সংকটের তীব্রতা অনুধাবন করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, '৮০'-এর দশক বিপ্লবের দশক। কমরেড লেনিন এই যুগকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ বলে অভিহিত করে গেছেন। আমাদের সামনে আজ তত্ত্বগত ও বাস্তবসম্মত বিচারে সেই সত্যেরই পুনরাবির্ভাব ঘটতে চলেছে। কিন্তু তত্ত্ব ও ব্যবহারের সমন্বয় (Unity of theory and practice) ছাড়া বিপ্লব সংঘটিত হয় না। কমরেড লেনিন বলেছিলেন—বিপ্লবী দল ছাড়া বিপ্লব হয় না। আরও বলেছেন—রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব হয় না। কিন্তু ধনবাদী শাসনে পর্যুদস্ত ভারতের এই খেটে-খাওয়া জনগণকে সচেতন করবে কে? স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা অর্থনৈতিক চেতনা লাভ করতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা অনুপ্রবিষ্ট করতে হয় বাইরে থেকে। সেই দায়িত্ব পালন করতে পারে আদর্শানুরাগী, অনুভূতি প্রবণ সচেতন যুবশক্তি।

ভারতের যুবশক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার জন্য সেই কারণেই অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশকে প্লাবিত করে যাতে যুবশক্তি বিপ্লবের কথা চিন্তার সুযোগ না পায়, অপসংস্কৃতির পঙ্কিল আবর্তে তারা নিমজ্জিত হয়ে যায়; এবং খেটে-খাওয়া জনগণের মধ্যে 'বিপ্লবের বীজাণু অনুপ্রবিষ্ট করার' (inject the bacillii of revolution among the masses) মহান ঐতিহাসিক কর্তব্য থেকে তারা বিচ্যুত হয়। অথচ সময় এবং সুযোগ এসে গেছে। শত্রুর বিপদের সুযোগ গ্রহণের শুভলগ্ন উপস্থিত। ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নবজাতকের প্রাণচাঞ্চল্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রতিক্রিয়াশীল দেশীয় ধনিক শ্রেণী এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলি তাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের যুবশক্তি যদি শ্রেণীসংগ্রামের নীতিকে হাতিয়ার করে বিপ্লবের পথ ধরে এগিয়ে চলার দুঃসাহস দেখাতে পারে তবে এ অবস্থারও পরিবর্তন হবে। সারা ভারতের বিপ্লবের সূচনা হবে এই অঞ্চল থেকেই। এবং দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে ধনিক রাজের অবসান এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন হবে। সারা দুনিয়ার, বিশেষ করে ভারতের ধনিক শ্রেণীর এই চরম সংকটের সুযোগে নব ইতিহাস সৃষ্টির শুভ সম্ভাবনাও প্রতীক্ষা করছে। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের যুবশক্তি কি সেই স্বর্ণসম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রস্তুতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে না?

আমার চোখে স্বাধীনতা

অশোক ঘোষ
সম্পাদক, ফরওয়ার্ড ব্লক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পর আজ তেত্রিশ বছর অতিক্রম করেছে। তেত্রিশ বছরের পূর্ণতা নিয়ে যে রাষ্ট্র কাঠামো ভারত নামক রাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে —"স্বাধীনতা" শব্দের মূল্যায়ন, তার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিক্ষেপ, তার অর্থনীতির ক্রমবিকাশ সবকিছুর প্রেক্ষিতেই আমাকে বিচার করতে হবে। সেই বিচার অবশ্যই হবে আমার দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে, যে দৃষ্টিকোণ

স্বভাবতই আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ধ্যান ধারণার উপর নির্ভরশীল।

তাই আমার চোখে ভারতের স্বাধীনতাকে বিচার করতে গেলেই তার নিয়ামক মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াবে—'স্বাধীনতা' শব্দটি আমার কাছে কিসের দ্যোতক, কোন্ অর্থ সে বহন করে। "স্বাধীনতা" শব্দটিই এমন ব্যাপক এবং এত অর্থপ্রযুক্ত যে তার অর্থ যুগে যুগে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভিন্ন অর্থকে বহন করে।

'স্বাধীনতা' শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞা বা কেতাবী বিশ্লেষণ আমার কাছে এই প্রসঙ্গে তাই নিয়ামক মাপকাঠি নয়। আমি এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রদত্ত সংজ্ঞাকে অভ্রান্ত বলে মনে করে তাকেই আমার বিচারের মাপকাঠি করে নিয়েছি শুধুমাত্র এই প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই নয় আমার সমগ্র রাজনৈতিক জীবনেও বটে।

ভারতের সাম্রাজ্যবাদের অবস্থিতিকালে যখন দেশবাসী ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়েই স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণ এবং স্বচ্ছ কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মুক্তি সংগ্রামের নায়করা, বিশেষ করে মহাত্মা-গান্ধী সমেত দক্ষিণপন্থী নেতারা কেউই রাখেন নি। রাখতে পারতেন না এমন নয়, কিন্তু তাঁরা যে শ্রেণীর স্বার্থে ভারতীয় জনগণের ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণাকে কাজে লাগিয়ে শনৈঃ শনৈঃ এগোচ্ছিলেন, স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা তাঁদের ভাণ্ডারে ছিল, সেই ব্যাখ্যা তাঁদের সেই পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে দিত। তাই স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা কুহেলীভরা মানসিকতা জনগণের মনকে ছেয়ে থাকুক তাই তাঁরা চেয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই যত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, দক্ষিণপন্থীদের আপোষমুখী চরিত্র তত বেশী প্রকট হয়েছে এবং অনিবার্য হয়ে উঠেছে বামপন্থীদের সঙ্গে তাদের প্রকাশ্য সংঘাত। সেই সংঘাতবহুল ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তে বামপন্থা ও বামপন্থী ঐক্যের পতাকাকে যিনি দক্ষিণপন্থা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তুলে ধরেছিলেন সেই মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রই ভারতীয় জনগণের সামনে স্বাধীনতার স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেছিলেন—"যাহারা মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত করিবে কিন্তু সমাজের পূর্বাবস্থা বজায় রাখিবে, তাহারা ভ্রান্ত।" তিনি আরও বললেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি—সকলের জন্য স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানেই সাম্য এবং সাম্য মানেই ভ্রাতৃত্ব। ইহা শুধু রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নহে—ইহা অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ এবং সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির বর্জনকেও সূচিত করে।"

স্বাধীনতার এই সংজ্ঞাকে সামনে রেখেই তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজনৈতিক দলিলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার সামগ্রিক পূর্ণতাকে স্বাধীনোত্তর ভারতের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

জাতির দুর্ভাগ্য যে নেতাজী যে বামপন্থী পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন—তা

গৌরব অর্জন করতে পারল না। ফলে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটে গেল, সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ভারতীয় বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিকানা পেল আপোষ ও চুক্তির মাধ্যমে।

আজকের ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলেই আমাদের শুরু করতে হবেই সেই '৪৭ সাল থেকে, কারণ আজ ভারতে যা কিছু বিকশিত হয়েছে যা কিছু পরিণতি লাভ করেছে বা করছে তার বীজ উপ্ত হয়েছিল সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহূর্তে। সেই '৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা খাওয়া, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত ভারতীয় জনতার সামনে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাটিকেই স্বাধীনতার মুকুট পরিয়ে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হোল যাতে সাধারণ জনগণ তো মোহগ্রস্ত হলেনই, মোহগ্রস্ত হলেন তখনকার বামপন্থী দলগুলিও। ফরওয়ার্ড ব্লক সেদিন নেতাজীর মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছিল ঘটনাপ্রবাহকে, ঘোষণা করেছিল তার তীব্র প্রতিবাদ—'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়।' ফরওয়ার্ড ব্লকের সামনে জ্বল জ্বল করছে নেতাজীর সেই মহাবাণী—স্বাধীনতা মানে সাম্য, স্বাধীনতা মানে "All power to the Indian people". তাই যে ক্ষমতা হস্তান্তর ভারতের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের হাত থেকে ভারতীয় বুর্জোয়া হাতে সঁপে দেওয়ার বন্দোবস্ত মাত্র, যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পরিবর্তে একটি শ্রেণীর হাতে শোষণের অবাধ অধিকারকে তুলে দেয়—তাকে যত উচ্চকণ্ঠেই স্বাধীনতা নামকরণ করা হোক না কেন, ফরওয়ার্ড ব্লক তাকে স্বাধীনতা বলে মেনে নিতে পারে নি।

তা ছাড়াও আর একটি সর্বনাশের বীজ সেদিন রোপণ করেছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা। সেটি হোল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বহু পুরাতন এবং ঘৃণিত কৌশল 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব'। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের যুগে ইংরেজ বহুবার বহু রকমে তার এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে চেয়েছে বহু জাতি এবং বহু ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষে। কিন্তু ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার আকুতি এবং সংগ্রামের চেতনা বার বার তাকে বাহত করেছে। কিন্তু '৪৭ সালে সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতিকে শুধু মেনেই নেওয়া হোল না, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হোল, আবাহন জানানো হোল তার অনিবার্য পরিণতিকে দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে।

বুর্জোয়া সংবাদপত্রের সাড়ম্বর প্রচার এবং সরকারী জৌলুস আর আলোর ঝলকানিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সেই প্রতিবাদ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মোর্চায় সংগঠিত করতে ব্যর্থ হলেও ভারতের ইতিহাসে সেই প্রতিবাদ চিহ্নিত হয়ে আছে প্রতিদিন তার সত্যতা আরও গভীর হয়ে ফুটে উঠছে।

গত তেত্রিশ বছরের তথাকথিত এই স্বাধীনতায় জনগণ কি পেয়েছে? কি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রগতি হয়েছে এই ভারত রাষ্ট্রে?

তেত্রিশ বছরে একেবারেই কিছুই হয় নি যাঁরা বলেন তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত নই। তেত্রিশ বছরের মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি লিখিত সংবিধান এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা বর্ণাঢ্য প্রথা, দেশে একটি বা দুটি নয় পাঁচটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বহু নতুন কারখানা-শিল্প এবং শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। আর গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যা আগের অনেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে চুরে, remould করেছে। ফলে ভারত আজ একটি উন্নতিশীল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবেই গড়ে ওঠে নি, ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশ আজ একচেটিয়া স্তরে উন্নীত হয়েছে এই তিন দশকে।

বুর্জোয়া অর্থনীতির এই বিকাশের কাজে রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে শ্রেণীস্বার্থে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের নামে জাতীয় অর্থনীতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে শিল্প মালিক এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পুঁজি বৃদ্ধির কাজে। কাজেই এই তেত্রিশ বছরে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিকীকরণ সম্ভব হয়েছে, তার সিংহভাগ লাভ করেছে দেশের একচেটিয়া পরিবারগুলো। এই বুর্জোয়া অর্থ-নীতির দ্রুত ও অসম বিকাশ অনিবার্যভাবেই সংকট সৃষ্টি করে চলেছে এবং ক্রমশঃ সেই সংকটগুলো ঘনীভূত হচ্ছে। একদিকে যেমন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার অঙ্ক ক্রমশঃ হিমালয়ের মাথা স্পর্শ করতে চলেছে অপর দিকে বেকার বাহিনীতে দেশ ছেয়ে গেছে, মূল্যবৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান গতিকে কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না, মুদ্রাস্ফীতি ক্রমশঃই বাড়ছে, টাকার প্রকৃত মূল্য দ্রুতগতিতে শূন্যের দিকে নেমে চলেছে। এগুলি হল গত তেত্রিশ বছরের বুর্জোয়া অর্থনীতির অনিবার্য পরিণতি। ধনবাদী সমাজব্যবস্থাকে অটুট রেখে এই সমস্যার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। মুনাফা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা যতদিন বলবৎ থাকবে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। প্রথম অবস্থায় এই সংকটের গতি কম ছিল ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীই কিছুটা 'ছাড়' দিয়ে বৃদ্ধির হারকে সংযত করতে পারছিল। কিন্তু যতই বুর্জোয়া অর্থনীতি পরিণতির দিকে যাচ্ছে মূল্যবৃদ্ধির গতিতে ত্বরণ বাড়ছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখার কোন চেক্ ভালব বুর্জোয়া অর্থনীতিতে নেই।

১৯৮০ সালে দাঁড়িয়ে তাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে সঙ্কটের মোকাবিলা আজ আর বুর্জোয়া রাষ্ট্র করতে পারছে না। জনগণের ওপর এই সংকটের চাপানো বোঝা আজ তার ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী শঙ্কিত। জনগণের এই ব্যবস্থাকে ঘাড়ের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলার মানসিকতা যতই তীব্র হচ্ছে ততই শোষক শ্রেণীর ভয় বাড়ছে যে ঐ বিক্ষুব্ধ মানুষেরা যাতে শ্রেণী সংগ্রামের শিবিরে সংগঠিত হতে না পারে। তাদের এই ভয়, জনগণের সচেতনতা সম্পর্কে তাদের এই আতংক—আজকে শোষক শ্রেণীকে তার গণতন্ত্রের মুখোশ পরে থাকার স্বস্তি দিচ্ছে। দমবন্ধ হওয়া মানুষের মতোই তারা ক্রমাগত সংবিধান ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত বিধিকে লঙ্ঘন করে চলেছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র আর তার বহু প্রচারিত সংসদীয় গণতন্ত্র জনগণকে ক্যামোফেজ করতে পারছে না, তার অসারতা ক্রমেই জনগণের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা নিজেরই সৃষ্ট সমস্যার ফ্র্যাঙ্কেন-স্টিনের তাড়ায় পিছু হটতে হটতে প্রায় দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ফেলেছে। তাই তারা তাদের পুরানো গুরু বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীর দেওয়া দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতি শেষ অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে। '৪৭ সালে যে দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং তার পরিণতি দেশভাগকে স্বীকৃতি দিয়ে যে ভারতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন তাদের রাজনৈতিক মুখপাত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আজ সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের

[শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়]

স্বাধীনতার ৩৩ বছর

বিশ্বনাথ মুখার্জী

সম্পাদক, সি. পি. আই. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ

এই ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৩৩ বছর পূর্ণ হলো।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিল তারা উচ্চশ্রেণীর লোক অথবা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উচ্চশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী। তাদের লক্ষ্য ছিল বৃটীশ শাসনকে হটিয়ে এদেশের উচ্চশ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা নিয়ে আসা।

তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যখন এদেশে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল যার প্রভাবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীও বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল তখন গণবিপ্লবের পথে একে নেতৃত্ব না দিয়ে তারা বরং নিন্দা করেছিলেন, পেছনে টেনে রেখেছিলেন যাতে মেহনতী মানুষের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে না যায়; আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিক্ষোভকে বৃটিশ শাসকদের ওপর চাপ হিসাবে ব্যবহারও করেছিলেন যাতে তারা আপোষের ভেতর দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

বৃটীশ শাসকরাও বুঝেছিল এদেশে তাদের শাসন আর রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং মন্দের ভাল হিসাবে এদেশের উচ্চ-শ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা ছাড়তে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে পাল্টা চাপ হিসাবে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও তারা বাধিয়ে দিতে পেরেছিল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ব্যবহার করে।

ফলে ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত যখন স্বাধীন হলো তখন দ্বিখণ্ডিতও হলো—ভারত এবং পাকিস্থান এই পরস্পর-বিরোধী দুই রাষ্ট্রে। পরে পাকিস্থানও দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

বৃটিশ ভারতের বেশীর ভাগটাই থাকল স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে। আধুনিক শিল্পে এবং রাজনীতিতে এই অংশই ছিল অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। এবং এখানে রাষ্ট্রক্ষমতা এলো জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। তাই এই ৩৩ বছরে ভারত রাষ্ট্রে আধুনিক শিল্পের বেশ কিছুটা বিস্তার ঘটেছে এবং স্বনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে ভারী শিল্পও বেশ কিছুটা গড়ে উঠেছে প্রধানত রাষ্ট্রায়াত্ব অংশে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বেশীরভাগ সমাজবাদী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়তে পেরেছেন, বেশীরভাগ সদ্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে মিলে জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীও গড়তে পেরেছেন।

সেই সঙ্গে যেহেতু তারা ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্ব তাই মুখে সমাজবাদের কথা বলেও কার্যতঃ পুঁজিবাদী পথেই তারা দেশকে রেখেছেন, পুঁজিবাদী বিকাশই তারা ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের মত বিশাল, জন-বহুল, দরিদ্র দেশে পুঁজিবাদী পথে দ্রুত ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হতেই পারে না এবং যেটুকু বিকাশ হয় তারও ফল প্রধানত ধনীরাই ভোগ করার সুযোগ পায়, অবাধ মুনাফাকারী বলে, ধনীরা আরও আরও স্ফীত হয়, একচেটিয়া পুঁজি বিপুল শক্তি পায় এবং অপর দিকে বেকারী বাড়ে, দারিদ্র্য বাড়ে, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, অর্থসংকট গভীর এবং তীব্র হয়ে ওঠে এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত হয়—গত ৩৩ বছরে এই হলো আমাদের দেশের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

শুধু অর্থসংকট তীব্র ও অসহ্য হয়ে উঠছে তাই নয়, অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক সংকটও দেখা দিয়েছে এবং বিক্ষুব্ধ

জনগণকে দমন করার প্রয়োজনে শাসকশ্রেণী জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকেও সংকুচিত করছে বারে বারে, স্বৈরাচারী প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, গণতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে।

সেই সংগে নৈতিক অধঃপতনও ঘটছে দ্রুত গতিতে—ঘুষ দুর্নীতি সীমাহীন হচ্ছে, চুরি ডাকাতি রাহাজানি, সমাজের দুর্বল অংশের ওপর নৃশংস অত্যাচার, নারীধর্ষণ প্রভৃতি পাপে দেশ ভরে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, বহু ভাষাভাষী বহু জাতি ও উপজাতির বাসভূমি এই ভারতে স্বায়ত্বশাসন ও উন্নয়নের ন্যায়সঙ্গত দাবির পাশাপাশি সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী, বিভেদকামী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে তা বীভৎস আকার ধারণ করেছে এবং সারা ভারতেই তা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

তেত্রিশ বছরের বুর্জোয়া শাসনে সত্যই আজ ভারত সর্বাঙ্গীণ সংকটাপন্ন। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে এই ভয়ঙ্কর সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বুর্জোয়া শ্রেণীর একচেটিয়া শাসনের অবসান করা, জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠা করা, পুঁজিবাদী পথ থেকে দেশকে সরিয়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া।

ইতিহাসের এই জরুরী আহ্বানে সাড়া দেওয়াই আজ প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক, প্রগতিবাদী মানুষের পবিত্র কর্তব্য।

আমার চোখে স্বাধীনতা : ৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

অন্তিম সঙ্কট মুহূর্তে শোষণ-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখার শেষ অস্ত্র হিসেবে তাঁর উত্তরসূরীরা সেই দ্বিজাতি-তত্ত্বের নীতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে সারা দেশটাকেই টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছে। সেদিন তাদের পাশে এই কাজে সাহায্যকারীরা ছিল এটলী-মাউন্টব্যাটেনের দল, আজ আবার তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীরা। উগ্র আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ প্রচার করে আজ বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতের জাতীয় সংহতিকে ধ্বংস করতে চাইছে, নিজেদের টিকে থাকার শেষ কৌশল হিসেবে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, ভারতের প্রতিটি রাজ্যে।

কিন্তু এই সংকট, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করে– বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রসারিত করা, অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারানো—এ সবই তো স্বাভাবিক-বুর্জোয়া অর্থনীতিক বিকাশের অনিবার্য পরিণতি যা আমাদের তেত্রিশ বছরের তথাকথিত স্বাধীন দেশের বর্তমান চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবেই।

এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন সহজ দাওয়াই নেই। বুর্জোয়া সংসদীয় গণতান্ত্রিক পথে এই সমস্যা ও পরিণতি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না কারণ এগুলি তো তারই সৃষ্টি। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ হোল ভারতীয় জনগণের নেতাজীর নির্দেশিত প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা। এই প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে কোন পথে? নেতাজী সেই পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে আপোষ করে বা সেই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার রক্ষাকবচ সংসদীয় গণতন্ত্রকে অনুশীলন করে সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রকৃত স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় শোষক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির ফাঁদ থেকে জনগণকে রক্ষা করা। নেতাজীর নির্দেশিত পুঁজিবাদের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামের পথই বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে পাল্টে নতুন সমাজব্যবস্থা আনতে পারে যে ব্যবস্থায় জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্জিত হওয়া সম্ভব। তাই ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালায় যে বাম ঐক্যের বীজ উপ্ত হয়েছে তাকে প্রসারিত করতে হবে সারা ভারতে। প্রসারিত করতে হবে শুধু মাত্র নির্বাচনে নয়, সকল শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে। সুস্পষ্ট ইতিবাচক রণধ্বনি তুলতে হবে বর্তমানের শোষণভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে।

আমাদের স্বাধীনতা দিবস

গণেশ ঘোষ

১৯০ বছরের অবর্ণনীয় অত্যাচার, নিষ্ঠুরতম নির্যাতন এবং অমানুষিক শোষণে সমগ্র ভারতবর্ষকে এবং ভারতের সমগ্র মানুষকে প্রায় একেবারে নিঃস্ব এবং রিক্ত করে ফেলবার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতের ৩৫ কোটি নরনারীর একান্ত কামনার এবং সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার "স্বাধীনতা দিবস" এসে দেখা দিল। এই অতি-প্রত্যাশিত দিনটিকেই

স্বাগত জানাবার প্রত্যাশায় প্রায় ১৯০ বছর ধরে (১৭৬৩-১৯৪৬) ভারতের বহু কোটি মানুষ নিজেদের বুকের রক্ত নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছে এবং আরও বহু কোটি মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট এবং নির্যাতন হাসি মুখে স্বীকার করে নিয়েছে।

কিন্তু এই দিনটিকে, ১৫ই আগষ্ট, ভারতের স্বাধীনতার দিবস ব'লে দেশে বিদেশে ব্যাপক ভাবে প্রচার করা সত্ত্বেও এবং সমগ্র ভারতবর্ষে এই দিনটি "স্বাধীনতা দিবস" বলে প্রতি-পালিত হোলেও বাস্তব পরিস্থিতির সতর্ক বিবেচনায় একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে এই দিনটিতেও ভারতের জনসাধারণ যথার্থভাবে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পায় নি। ১৫ই আগষ্টের পরে, আরও প্রায় তিন বৎসর কাল শেষে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব অপসারিত হয় এবং ভারতে সার্ব্বজনীনভাবে ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ঐ দিনে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং ওই দিনেই ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে সগৌরবে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং ভারতের জনগণের প্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু ভারতের ধনিক জমিদার কায়েমীস্বার্থের প্রতি-নিধিগণের সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আপোষের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে স্বাধীনতা লাভের পরেও ভারতের ব্যাপকতম জনসাধারণের অবস্থার পূর্বাপেক্ষা বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি; বরং এ কথা বলাই বাস্তব এবং সঠিক হবে যে বহু ক্ষেত্রেই পূর্বাপেক্ষা জনগণের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের তেত্রিশ বছর পরেও তাই আজকালও অপরিসীম দুঃখকষ্টে জর্জরিত এবং সীমাহীন শোষণে আরও নিঃস্ব জনসাধারণের মুখ থেকে ট্রামে বাসে, পথে ঘাটে, মাঠে ময়দানে, কলে কারখানায় বহু সময়েই এই হতাশাজনক অবস্থার অভিব্যক্তি এই বলে শোনা যায় যে, "এর চাইতে ইংরেজের আমল ভাল ছিল।" জাতীয় মর্যাদার পক্ষে এর চাইতে লজ্জা ও অবমাননকর আর কি হোতে পারে আমাদের জানা নেই।

কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের কথা এ সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অর্থাৎ বর্তমানের শাসকগণের পক্ষ থেকে এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করবার এবং জনগণের দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য দূর করবার জন্য কোনরূপ বাস্তব এবং কার্যকর প্রচেষ্টা করা হচ্ছে না। বরং সঠিকভাবে এবং সত্য কথায় বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয় যে জাতীয় নেতৃত্ব সর্বতো-ভাবে এবং সর্ব প্রচেষ্টায় দেশের কায়েমী স্বার্থের সর্ব প্রকারের স্বার্থরক্ষা করবার এবং দবীপূরণ করবার ব্যবস্থাই করছেন এবং তার জন্য দেশের ব্যাপকতম জনগণের সর্ব প্রকারের স্বার্থ এমন কি তাদের বেঁচে থাকবার জন্য সর্বাপেক্ষা নিম্নতম প্রয়োজনও অতি নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা ও বর্জন করছেন। দেশের ধনিক শ্রেণীর শোষণের মাত্রা সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে; ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে স্বাধীনতার পর গত ৩৩ বছরেই ভারতের প্রায় সব সম্পদের মালিকানা এবং কর্তৃত্ব

গিয়ে জমা হয়েছে দেশের মাত্র ৭৫টি পরিবারের হাতে এবং দেশের শতকরা ৬৯ জন মানুষ অর্থাৎ ৬৬ কোটির মধ্যে সাড়ে পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে গিয়ে পড়েছে; তাদের মাসে গড়ে ২০ টাকা খরচ করবার সামর্থও নেই; অর্থাৎ তারা তিন দিনের ছয় বেলার মধ্যে একবারও পেটভরে খেতে পারে না। এই পরিস্থিতি কি ভীষণ ও ভয়াবহ তা যাঁরা শহর অঞ্চলে বাস করেন তাঁদের পক্ষে বোঝা কঠিন; গ্রামে গিয়ে কিছুটা ঘুরলেই এই দারিদ্র্যের ভয়াবহ অবস্থা কিছুটা বোঝা যাবে।

ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব অর্থাৎ ভারতের বর্তমান শাসকেরা যে নীতি, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আজ ৩৩ বছর দেশ শাসন করে চলেছেন তার ফলে একদিকে যেমন সীমাহীন দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে অপর দিকে অবার ঠিক তেমনিভাবেই অতি স্বল্প সংখ্যক বিত্তবানের হাতে (ধনিকের) সীমাহীন ধনসম্পদের পাহাড় জমা হচ্ছে; অর্থাৎ অতি ধনিকের সংখ্যা কমে কমে তৈরী হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি। পূর্বেই বলা হয়েছে ভারতের মাত্র ৭৫টি পরিবারের হাতেই ভারতের প্রায় সমস্ত ধনসম্পদের মালিকানা গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বোধ হয় এই সংখ্যা আরও কমে গিয়েছে এবং ভারতের মাত্র ২৫টি পরিবারই এখন ভারতের সব সম্পদের মালিক। এর সমস্ত কৃতিত্বই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীরই প্রাপ্য।

ভারতের এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ভারতে পুঁজি নিয়োগ করে দেশের ভিতর কলকারখানা গড়ে তুলতে অনিচ্ছুক; অনেক অধিক মুনাফা অর্জনের লোভে এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন অতি অনগ্রসর দেশে পুঁজি রপ্তানী ক'রে সেই সব দেশে কলকারখানা গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করছে; অথচ ভারতে এই পুঁজি নিযুক্ত হলে দেশের ভিতরেই অনেক কলকারখানা গ'ড়ে উঠত, দেশের লক্ষ লক্ষ অনশনগ্রস্ত বেকার মানুষ অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেত এবং সেই সঙ্গে অন্য দেশের উপর ভারতের নির্ভরতাও বহু পরিমানে হ্রাস পেত।

ভারতের কায়েমীস্বার্থের নির্দেশে দেশের শাসকেরা যে নীতি নিয়ে দেশ পরিচালনা করছেন তার ফলে স্বাধীনতা লাভের ৩৩ বছর পরেও দেশের বেকারের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি; এর ভেতর কিন্তু গ্রামের বেকারদের ধরা হয় নি। কারণ গ্রাম অঞ্চলে বেকারদের নাম লেখাবার কোন ব্যবস্থা আজ অবধি আমাদের দেশে হয় নি। সুতরাং এই অবস্থায় গ্রামের বেকারদের সম্ভাব্য সংখ্যা যোগ করলে ভারতে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৫ কোটি। এই বেকারেরা যে নিজেদের স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে কিভাবে বেঁচে আছে তা' কল্পনা করাও কঠিন।

এখানে আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা একান্তভাবেই প্রয়োজন নতুবা আমাদের "স্বাধীনতা দিবসের" মাহাত্ম্যই বহু পরিমাণে হ্রাস করা হবে। দেশ বিভাগের পর (১৯৪৭) একমাত্র পূর্ববাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) থেকেই এক কোটিরও অধিক মানুষ নিরুপায় হয়ে এবং প্রাণ রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে বাড়ী ঘর সবকিছু ফেলে রেখে প্রায় এক বস্ত্রে এবং প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমাদের ভারতবর্ষে অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু লক্ষ মানুষ আজও ভারত ইউনিয়নে যথাযোগ্য পুনর্বাসন পায় নি; বহু সহস্র মানুষ আজও সরকার পরিচালিত বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে সরকারের এবং জনসাধারণের দয়া এবং ভিক্ষার উপর নির্ভর করেই কোন রকমে জীবনধারণ করে আছে। এই সমস্ত ত্রাণ শিবিরে এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে কয়েকটি স্থানে এই সকল পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু নরনারী যেভাবে বেঁচে আছে তাকে নিশ্চয়ই মানুষের মত বলা যায় না। অথচ দেশবিভাগের পর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যে বহু লক্ষ অমুসলমান পাঞ্জাবের অধিবাসী ভারত ইউনিয়ানে চলে এসেছে তারা প্রত্যেকেই পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির জন্য যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। তারা কেউই ভারত ইউনিয়ানে এসে ত্রাণ শিবিরে বাস করছে না কিম্বা পথের ভিখারীও হয় নি। দিল্লীর আশেপাশের অঞ্চলে কিছুটা চোখ মেলে ঘুরলেই এই কথার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পূর্ব বাংলার এই কয়েক লক্ষ হতভাগ্য উদ্বাস্তু আমাদের "স্বাধীনতা দিবসেরই" নিষ্করুণ অবদান। আমাদের ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাকে এরা কিভাবে দেখে, আমাদের "স্বাধীনতা দিবসে" এদের কি মনে হয় আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন।

কিন্তু এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা দুঃখ এবং ক্ষোভের কথা, এই বাস্তব পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমাদের শাসকেরা মাঝে মাঝেই ঘোষণা করে বলেন যে দেশের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে, এখন আর কোন উদ্বাস্তু সমস্যা নাই। যাদের এখনও পুনর্বাসন হয় নি তাদের যথাযোগ্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে আমাদের শাসকগণের অনিচ্ছা কেন সে রহস্য আজও জানা যায় নি।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ নিঃসন্দেহে (রাজনৈতিক) স্বাধীনতা লাভ করেছে; কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভারতবর্ষ ত্যাগের ফলে আমাদের যে স্বাধীনতা এসেছে তার মাঙ্গলিক অবদানটুকু ভারতবর্ষের শতকরা ৯৫ জন মানুষের ভাগ্যে আসে নি। ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের ১৯০ বছর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের এবং প্রাণদানের বিনিময়ে শেষ অবধি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে তার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছে ভারতের জমিদার ও ধনিকেরাই। তারাই এবং তাদের নির্দেশে তাদের "গোমস্তারাই" ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসকগণের পরিত্যক্ত সিংহাসন দখল করে তাদের পন্থায় এবং তাদের ধরনেই ভারতের ব্যাপকতম জনসাধারণকে নির্মম ও নিষ্করুণভাবে শাসন ও শোষণ করে চলেছে। তাদের ধারণা এবং সুনিশ্চিত বিশ্বাস ইংরেজদের শূন্য আসনে বসবার একমাত্র অধিকারী তারাই এবং তাদের পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই ভারতের জনগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর ব্যবস্থা বলে সকলকে মেনে নিতে হবে।

তাদের শাসন ও অমানুষিক শোষণের ফলে যাতে জনসাধারণের মধ্যে সহজে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জমা হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের পক্ষ থেকে (শাসকগণের) প্রায় প্রথম থেকেই চেষ্টা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে রাখবার জন্য। ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের আবাদী অধিবেশনে ঘোষণা করা হল যে ভারতের লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা; অর্থাৎ জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা হল যে শাসকগণের চেষ্টা হবে ঠিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা না হলেও সেই ধরনেরই সমাজ গঠন

করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ঐ শাসননীতির ফলে দেশের দরিদ্রেরা আরও অধিক দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে এবং মুষ্টিমেয় ধনিকের ধনসম্পদ সীমাহীন পরিমাণে বেড়ে চলেছে। ফলে দেশের মধ্যে বিক্ষোভ জমা হতে আরম্ভ হল। এই অবস্থা লক্ষ্য করে জনগণকে নূতন করে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে শাসকগণের পক্ষ থেকে বলা হল, তখন বোধহয় ১৯৭১ সাল, যে এবার শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে "গরিবী হঠানো" অর্থাৎ দেশ থেকে একেবারে দারিদ্র্য দূর করা। এবং এই ঘোষণারই কিছু বছর পরে বাস্তবে দেখা গেল ওই শাসন নীতির ফলে দেশে দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৯ ভাগ এবং দেশের মাত্র ২৫টি ধনী পরিবারের হাতেই দেশের সমস্ত সম্পদের কর্তৃত্ব এবং মালিকানা গিয়ে জমা হয়েছে।

এ পর্যন্ত যা' বলা হয়েছে তা হল দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, স্বাধীনতার পরিণতি। এর ভেতর থেকে ভবিষ্যতের আশার আলো খুঁজে পাওয়া অথবা দেখতে পাওয়া খুবই কঠিন। এই গভীর দুর্দশাময় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতির মধ্যে তাই অনেকেই খুব স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করেন, এই স্বাধীনতার জন্যই কি অগণিত শহীদগণ নিঃশব্দে প্রাণ উৎসর্গ করে গিয়েছেন ? এই প্রশ্নের একটিই মাত্র উত্তর আছে, না, নিশ্চয়ই তা' নয়। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘাযতীন প্রমুখ আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় শহীদগণ অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলেন নি, কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁরা কেউই চান নি যে তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আসবে সেই পরিস্থিতিতে দেশের শতকরা ৬৯ জন মানুষ দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে থাকবে এবং মাত্র ২৫টি পরিবার সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে। তাঁদের কামনা ছিল ইংরেজ দস্যুরা বিতাড়িত হবার পর দেশের মানুষ অন্ততঃ দুইবেলা দুইমুঠো পেটভরে খেতে পাবে। (ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত এ কি সম্ভব?)

পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখলে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, ভারতের মুক্তিকামী (শোষণ থেকে, অত্যাচার থেকে মুক্তিকামী) জনগণের হতাশা বোধ করবার কিছু নেই; ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাহত হবার যথার্থ কোন কারণ নেই। পৃথিবীর বহু দেশেই প্রায় এইরূপ অবস্থাই ঘটেছে।

ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, প্রধানতঃ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, জনগণের মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব যে সব দেশে ধনিক শ্রেণীর হাতে ছিল, এবং প্রায় সব দেশেই তাই ছিল, সেই সব দেশেই সুনিশ্চিতভাবে গণসংগ্রামের জয়লাভের পর সেই জয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছে ধনিকেরাই; ফলে দেশের ব্যাপকতম জনসাধারণ পূর্বের ন্যায়ই শোষিত নিপীড়িত নির্যাতিত অবস্থায় থেকে গিয়েছে। ফরাসী দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে যে ঐতিহাসিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সংগ্রামে অগণিত সাধারণ মানুষের প্রাণদানের বিনিময়ে সফল বিপ্লবের পর যে ব্যবস্থা সৃষ্টি হল সেই ব্যবস্থায় শতকরা ৮০ জন মানুষই পূর্বেও যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইটালীতেও মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পর ইটালীর ব্যাপকতম জনগণ পূর্বের ন্যায়ই শোষিত নির্যাতিত রয়ে গিয়েছে এবং আরও বহু দেশেই।

সুতরাং আমাদের দেশেও স্বাধীনতালাভের পর যা' ঘটেছে তা' অস্বাভাবিক কিম্বা অদ্ভুত কিছুই নয়। এবং যা' ঘটেছে তাই-ই শেষ কথা নয় অথবা চিরস্থায়ী কিছুই নয়। যা' ঘটেছে তা' অতি স্বল্প সংখ্যক ধনিক জমিদারের অপসৃষ্টি। শেষ-কথা বলবে দেশের জনসাধারণ, ভারতের মুক্তিকামী নরনারী যাদের অন্তরের একান্ত কামনা ভারতে একটি শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। আমাদের দেশের জনসাধারণের এই আন্তরিক কামনার ভিতর অস্বাভাবিক অথবা অবাস্তব কিছুই নেই। রুশ দেশে যা সম্ভব হয়েছে, চীন দেশে যা সম্ভব হয়েছে ভারতের জনসাধারণের পক্ষে তা' সম্ভব হবে না মনে করবার কোন কারণই নেই। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে রুশ এবং চীন দেশে যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ওই উভয় দেশেই শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ওই দুইটি দেশেরই অবস্থা ছিল ভারত অপেক্ষা অনেক অনগ্রসর, অনেক অনুন্নত এবং অনেক পশ্চাৎ-অপসারিত।

ভারতের বর্তমান অবস্থা দেখে মুক্তিকামী জনগণের পক্ষে সত্য সত্যই হতাশ হবার কিছুই নেই। এক সময়ে ইংরেজরাও ভারতের জনমনে আতঙ্ক ও হতাশা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে প্রচার করত যে ইংরেজরা অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি; তাদের সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না; তাদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা অসম্ভব। কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত এক দিন ভারত থেকে দূরে হয়ে চলে যেতে বাধ্য হল।

ভারতে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দেশের ব্যাপকতম জনগণের প্রকৃত কামনা এবং সুদৃঢ় সংকল্প। কিন্তু কেবলমাত্র ইচ্ছা থাকলেই এই ব্যবস্থা আপনা থেকেই আসবে না, তার জন্য প্রয়োজন জনগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা। তাই, দ্বিতীয় শর্ত হল এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপকতম জনগণের নিরবচ্ছিন্ন এবং সুদৃঢ় প্রচেষ্টা অর্থাৎ সংগ্রাম। এবং জনগণের এই প্রচেষ্টা যতে সুসংহত হয় এবং সামরিক পদ্ধতিতে ও সুদৃঢ়ভাবে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় তার জন্য একান্তভাবেই প্রয়োজন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর একটি শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় নেতৃত্ব ও সেই নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত জনগণ। সংগ্রামী জনগণ সংগঠিত না হলে তাদের লক্ষ্য স্পষ্ট হয় না, সংকল্প দৃঢ় হয় না, এবং তাদের সংগ্রাম সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায় না।

আমাদের "স্বাধীনতা দিবস" (১৫ই আগষ্ট) আমাদের গৌরবের দিন, আমাদের গর্বের দিন। এই দিনটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুগণের বিরুদ্ধে আমাদের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ সাফল্যের নিদর্শন।

কিন্তু এ তো আমাদের অতীত কালের ইতিহাস। আমাদের বর্তমানও আশু ভবিষ্যতের লক্ষ্য ও দায়িত্ব হচ্ছে দেশ থেকে শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন চিরতরে নির্বাসিত করবার জন্য দেশব্যাপী গণমুক্তির সংগ্রাম সংগঠিত করা, গণমুক্তির সংগ্রাম আরম্ভ করা ও এই সংগ্রাম সফল করে তোলা।

তাই যারা গণমুক্তি প্রত্যাশী অর্থাৎ শোষণহীন সমাজ

[শেষাংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

আগষ্ট বিপ্লব ও আজ

সুকুমার দাস

ঐতিহাসিক আগষ্ট বিপ্লবের অর্ধলক্ষ শহীদের কথাই শুধু নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত জানা অজানা আরও অসংখ্য বিপ্লবীর কথা কোন প্রসঙ্গে স্মরণ করতে গেলেই আজকের দিনে কেন যেন বারবার মনের মধ্যে একটা বড় প্রশ্ন প্রথমেই উঁকি মারে। কবিতার কয়েকটি ছত্রে অতি সহজেই যাকে প্রকাশ করা যায়।

"বীরের এ রক্ত স্রোত,
মাতার এ অশ্রু ধারা
এর যত মূল্য সে কি
ধরার ধুলোয় হবে হারা?"

মনের কোণে উঁকি মারে বোধ হয় এই জন্য যে, এরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেদিন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃংখল মোচনের জন্য শাসক ও শোষক ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সে উদ্দেশ্য কি দেশ স্বাধীন হবার ত্রিশ বছর পরেও এতটুকু সিদ্ধ হয়েছে? এতে কোন সন্দেহই নেই যে, সেদিনের সেই দুঃসাহসী রক্তঝরা সংগ্রামের পেছনে ছিল তাঁদের দুটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা। প্রথম ভারতের স্বাধীনতা অর্জন, পরে সেই স্বাধীন ভারতে সুন্দর এক শোষণহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও, শাসকের পরিবর্তন হলেও, তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণের ব্যাপারটা আজও শুধু স্বপ্নই রয়ে গেছে। অদূর ভবিষ্যতেও যে তাঁদের ইপ্সীত লক্ষ্যে আমরা পোঁছোতে পারবো, তারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনার আলো দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না, কারণ দেশের মানুষ আজও পিষ্ট হচ্ছে দুঃসহ দারিদ্র্যে, আর সেই পেষণ চলছে অবাধগতিতে এ দেশেরই মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনী পরিবারের নির্মম শোষণের যাঁতাকলে। এদের নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী এ সমাজ ব্যবস্থাই সমাজের সর্বস্তরে আজ প্রকট করে দিচ্ছে সর্বগ্রাসী এক শোচনীয় অবক্ষয়ের।

আজ, একদিকে পুঁজিবাদের এই বহুমুখী শোষণ, অপর দিকে দেশের দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করছে আর এক সর্বনাশা প্রবণতা, যে প্রবণতা বিচ্ছিন্নতাবাদের।

বিচ্ছিন্নতাবাদী এ অপপ্রয়াস আজ দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে এক মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যে অখন্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে ঐ সব বিপ্লবীরা সেদিন একমাত্র ভারতবাসী পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন-পণ করে দেশমুক্তির লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন, খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের সে সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। আজ সেই খণ্ডিত ভারতও আবার বিচিত্র সব বিচ্ছিন্নতাবাদী ঢেউয়ের আঘাতে আরও খন্ড বিখন্ড হবার মুখোমুখী। এ এক সাংঘাতিক পরিস্থিতি! এই পরিস্থিতিতেই আজ স্মরণ করতে হচ্ছে আগষ্ট বিপ্লবকে —যে বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্তভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। সেই বিপ্লবের কাহিনীকে আজ আবার তুলে ধরতে হবে দেশের বর্তমান যুব সমাজের কাছে। তুলে ধরতে হবে শুধু এই জন্য যে, কিছু কায়েমী স্বার্থবাদীর দল আর কিছু বিদেশী চক্রের কারসাজিতে আজ দেশেরই কিছুসংখ্যক যুব-ছাত্র এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। আড়াল থেকে এই সব চক্রের উস্কানী এরা ধরতেও পারছে না। এরা বুঝতেই পারছে না যে ওদের অঞ্চলের অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য, ওদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষাকে মূলধন করে অদৃশ্য এক অশুভ শক্তি তাদের নিজেদের আরও বড় এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে আন্দোলনকারীদের আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণ তো হবেই না, বরং সর্বনাশ হবে সারা দেশের। যদি তাই হয়, তবে তো আগষ্ট বিপ্লবের শহীদদেরই শুধু নয়, দেশের জন্য অসংখ্য বিপ্লবীর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভারতের যুব সমাজের কাছে সত্যিই তা হবে চরম লজ্জার! আগষ্ট বিপ্লব সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে এ কথাটা মনে হলো বলেই আজকের যুব সমাজকে একটু সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি। আগষ্ট বিপ্লব সেদিন দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল তাদের মূল বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। আর বিদেশী চক্রের চক্রান্তে আজকের এ বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস সেই ঐক্যের মূলেই কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়েছে।

সেদিনের আগষ্ট বিপ্লবের মূলেও ছিল অত্যাচার, বৈষম্য ও উপেক্ষা। বহুদিন ধরে ইংরেজ সরকারের সীমাহীন উপেক্ষা ও অত্যাচার ভারতবাসীর অন্তরে পুঞ্জীভূত করেছিল প্রবল অসন্তোষ। অবশ্য এর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত হয়েছে নানা বৈপ্লবিক কর্মকান্ড। এবং ইংরেজ সরকারও প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে সে সব কর্ম প্রচেষ্টাকে দমন করে স্বীয় শাসনকে নিরঙ্কুশ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এত দমন পীড়নেও ঐ সব প্রচেষ্টা একেবারে থেমে থাকেনি কোনদিনই, সে কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। বল প্রয়োগে একদিকে তা কখনও সাময়িক স্তিমিত হলেও, অন্যদিকে সে বিদ্রোহের আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠেছে প্রায় তখনই। অবশ্য কংগ্রেস এসব বৈপ্লবিক প্রয়াসকে কোনদিন কার্যকরী বলে মনে করেনি। বরং তাঁরা একে হঠকারী প্রচেষ্টা বলে দূরে সরিয়ে রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন। ইংরেজ সরকারের এত অত্যাচার ও দমন পীড়নের পরও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইংরেজ রাজনীতিকদের সদিচ্ছা ও ন্যায় বিচারের ওপরেই ছিলেন অধিকতর আস্থাবান। তাঁরা মনে করতেন সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে আবেদন নিবেদনের নীতিই হবে বেশী কার্যকরী। তাই তাঁরা অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে বারবার হাজির হতেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের কিছুদিন আগে থেকেই কংগ্রেসের এ ক্লীব নীতির বিরুদ্ধে তাঁদেরই একাংশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এরা প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে চাইছিলেন। কিন্তু

কংগ্রেসের অপোষ প্রিয় নরম পন্থীরা এদের এ দাবীকে বারবার সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ওরা এদের চরমপন্থী বলে আখ্যাত করে তাঁদের দেশের যুবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চরমপন্থীদের মুখপাত্র হিসাবে তখন সম্মুখ সারিতে এগিয়ে এসেছেন বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়; অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের মতো দেশ নেতারা। চরমপন্থীদের ইচ্ছাকে তখন রোখে সাধ্য কার? তাঁরা দেশের যুবশক্তিকে বোঝালেন, "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার" এবং তা' আদায় করে নিতে হবে শত্রুকে চরম আঘাত হেনে। অপরাপর দেশের মুক্তি আন্দোলন এই শিক্ষাই দেয় যে, সাম্রাজ্যবাদ শক্তির প্রভুত্ব থেকে কোন দেশই আবেদন নিবেদনে রেহাই পায় নি। বিপ্লবই মুক্তির একমাত্র পথ। এই প্রেরণায় জেগে উঠলো মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব। সেখানকার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠলো নানা বৈপ্লবিক সংস্থা। এদের কর্মতৎপরতায় ভীত সন্ত্রস্ত ইংরেজ সরকার কিন্তু এদের চরম শাস্তি দিয়ে স্তব্ধ করার কোন কসুরই করলো না। দিকে দিকে বিপ্লবী কণ্ঠে ধ্বনিত হলো মৃত্যুর মহান জয়গান। সেই জয়গানেই সুর মেলালেন বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে, চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, সূর্য সেন, বিনয় বাদল ও দীনেশের মত আরোও অসংখ্য নির্ভীক বিপ্লবীদল। আগষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এদেরও পরে এবং এদেরই মহান আত্মাহুতির মহান অনুপ্রেরণায়।

সেদিনটি ছিল ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট। যেদিন সারা দেশ জুড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শক্তিকে ভারতের মাটি থেকে চিরতরে উৎখাত করবার জন্য শুরু হয়েছিল বিপ্লবীদের এক মরণপণ সংগ্রাম। আগের দিন, অর্থাৎ ৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ হয় "ইংরেজকে এখনই ভারত ছাড়তে হবে", এবং এই দাবীতেই সারা দেশে আন্দোলন শুরু করা হবে। এ প্রস্তাব পাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাইতে উপস্থিত সকল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করলো এবং সে কাজটি তারা করলো অনায়াসেই। কারণ ঐ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশকরেও কোন নেতা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার প্রয়োজনে আত্মগোপন করে থাকার কোন চেষ্টাই করলেন না। গ্রেপ্তারের পরে তাঁরা স্থান পেলেন কোন প্রাসাদে, না হয় কান দুর্গে।

কিন্তু দেশের যুবশক্তি নেতৃত্বের জন্য এক মুহূর্তও বসে রইলো না। এ প্রস্তাব পাশ হওয়ার সংবাদ এবং নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা দেশজুড়ে তাঁরা শুরু করলেন প্রচণ্ড আন্দোলন, "ইংরেজ ভারত ছাড়ো" এবং "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" এই ধ্বনি তুলে তাঁরা ইংরেজ শাসনের চিহ্নগুলিকে সমূলে উপড়ে ফেলতে চাইলেন। আন্দোলনের প্রাবল্যে প্রথমে পিছু হটলো ইংরেজ সরকার কিন্তু অচিরেই নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে তারা বিপ্লবীদের ওপর চালালো অমানুষিক দমন পীড়ন। ইংরেজ সরকার বুঝেছিল যে, এ আন্দোলন যে ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করছে, তাতে একে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে ফেলতে না পারলে ভারতে তাদের শাসনের দিন অচিরেই ফুরিয়ে যাবে। তাই প্রচণ্ড পশুশক্তি নিয়ে, পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে তারা এ আন্দোলন দমনে বিপ্লবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওরা মনে করেছিল, বেয়নেট ও গুলিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আন্দোলনকারীরা দমে যাবে। কিন্তু ওদের এ ধারণা করাটাই হলো মস্ত বড়ো ভুল। বলপ্রয়োগে এ আন্দোলন দমন করতে যাওয়ার ফল হলো উল্টো। মার খেয়ে বিদ্রোহীরা গান্ধীজীর নির্দেশিত অহিংসার গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে মারমুখী ও সহিংস হয়ে উঠলেন। শুরু হলো সহিংস প্রত্যাঘাত, মারের বদলে মার। আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠলো তাদের সহিংস কর্মপ্রচেষ্টায়। তাঁরা উপড়ে ফেললেন রেল লাইন আর টেলিফোনের খুঁটি। কেটে দিলেন টেলিফোনের তার, ভেঙ্গে ফেললেন সড়ক ও পুল। জোর করে দখল করতে লাগলেন একের পর এক থানা। নেতৃত্বহীন অসহযোগ আন্দোলন তখন আর নিছক আন্দোলন নয়, তা রূপান্তরিত হয়ে গেল এক রক্তাক্ত বিপ্লবে। ক্ষিপ্ত ইংরেজ সরকারও বিপ্লবীদের প্রতি চালালো বেয়নেট, গুলি, এমনকি ওপর থেকে মেসিনগান দেগেও বোমা ফেলেও ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলো। এরই ফলে নিহত হলেন শত শত বিপ্লবী। সিন্ধু প্রদেশের হিমু কালানি এ বিপ্লবে প্রথম শহীদ হয়ে দেশের বিপ্লবীদের আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করলেন।

দিল্লীতে ১১ই এবং ১২ই আগষ্ট চললো পুলিশের বারবার গুলি। এতে নিহত হলেন ছিয়াত্তর জন। একইভাবে নাম না জানা অসংখ্য শহীদের সাথে নিহত হলেন বিহারের উমাকান্ত প্রসাদ, রামানন্দ সিং, সতীশ প্রসাদ ঝা, বাংলায় মাতঙ্গিনী হাজরা, রামচন্দ্র বেরা, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, বৈদ্যনাথ সেন এবং আসামে ভোগেশ্বরী, বালুরাম, কনকলতা ও মুকুন্দ। এ আন্দোলন তখন হয়ে উঠেছে দুর্বার। সকলেরই এক লক্ষ্য, চূর্ণ করো ইংরেজ শাসনের বনিয়াদ। ইংরেজের রক্তচক্ষুকে অবহেলাভরে উপেক্ষা করে ভারতের নানা রাজ্যে গঠিত হ'লো স্বাধীন জাতীয় সরকার। মেদিনীপুরের তমলুক, উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলা এবং মহারাষ্ট্রের সাতারা হলো যে স্বাধীন সরকারের শক্ত ঘাঁটি। বস্তুতঃপক্ষে এ কয়েকটি অঞ্চলে সেই সময়ে ব্রিটিশ শাসন বলে কোন চিহ্নই ছিল না। সেখানে সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ হচ্ছিলো বিপ্লবী সংগঠন দ্বারা।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক আগষ্ট বিপ্লবে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এক বছর নয়, ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪-এর ৮ই আগষ্ট পর্যন্ত তমলুকের ঐ স্বাধীন জাতীয় সরকার মাথা উঁচু করে ব্রিটিশ সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছিল। এই সময়ে ইংরেজ শাসকদের কোন ক্ষমতাই ছিল না এর চৌহদ্দির মধ্যে কোন রকমে প্রবেশ করে। ঐ সরকার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে একদিন ঐ অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি তুলে এগিয়ে চললো মিছিল করে তমলুক থানা দখল করতে। ওদের ভয় দেখাতে পুলিশ প্রথমে চালালো কয়েক রাউণ্ড গুলি। কিন্তু ফল এতে কিছুই হ'ল না। জনতা এগিয়ে চললো আরও তেজে এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে। উপায় না দেখে এবার ডাকা হলো মিলিটারী। তারা এসেই ঐ মিছিলের ওপর চালালো বেপরোয়া গুলি। মিছিলের পুরোভাগে পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছিলেন রামচন্দ্র বেরা। গুলির আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে ঐভাবে পড়ে যেতে দেখে ঐ পতাকাটি তুলে নিতে এগিয়ে এলো

তেরো বছরের নির্ভীক বালক লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। মৃত্যু তাকেও কোলে টেনে নিল সেই মুহূর্তেই। জনতা বুঝি একটু চঞ্চল হ'লো। কিন্তু ওদের বিভ্রান্ত হবার কোন সুযোগ না দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে পতাকাটিকে তখনই তুলে নিলেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। মিছিল যেন আবার প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু বেশী এগোতে হ'ল না তাদের; নিমেষের মধ্যে মিলিটারীর একটা গুলি মাথা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো মাতঙ্গিনী হাজরার। প্রাণহীন দেহ তাঁর লুটিয়ে পড়লো সেখানেই। কিন্তু সকলে অবাক হয়ে দেখলো বৃদ্ধা মাতা মাতঙ্গিনী মরে গিয়েও শক্ত করে আগের মতোই তখনও ধরে রেখেছেন সেই পতাকাটিকে। গুলি তবুও থামলো না। ওখানেই নিহত হলেন পুরীমাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, জীবনচন্দ্র বেরা, তাছাড়া আরও একচল্লিশ জন। কিন্তু এতেও ভয়ে স্থান ত্যাগ করলো না জনতা। সারা রাত তাঁরা থানা ঘিরে বসে রইলেন। পরদিন সকালবেলা জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি হলো অনেকগুণ। এবার আর তাঁদের ঠেকান ইংরেজ সরকারের পক্ষে সম্ভব হ'লো না। ওঁরা দখল করে নিলেন থানা এবং আগুন লাগিয়ে দিলেন অত্যাচারী দারোগার বাড়ীতে। রক্তঝরা অসম সাহসিক এ ঘটনাটির জন্যই আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপুর সৃষ্টি করলো এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আর সেখানকার বৃদ্ধা মাতা মাতঙ্গিনী হাজরা ঐভাবে শহীদ হয়ে দেশবাসীর কাছে হয়ে রইলেন চির-নমস্যা।

অতীতের বহু বিপ্লব প্রয়াসের মতো একদিন এ আগষ্ট বিপ্লবও দমিত হ'লো। কিন্তু তা একেবারেই ব্যর্থ হ'লো না। এ বিপ্লবে অর্ধলক্ষ মানুষ শহীদের মৃত্যু বরণ করে দেশের মানুষের মনে জাগিয়ে গেল এক দুরন্ত সংগ্রামী চেতনা। সে চেতনা এ আন্দোলনের পরেও—কাজ করে যাচ্ছিলো অবিরাম-ভাবে, একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে। ইংরেজ সরকার গর্বভরে সেদিন তাদের দেশে প্রচার করেছিলো যে দমন পীড়নেই পিছু হঠেছে সন্ত্রাসবাদীরা। কিন্তু সেটা আত্মপ্রসাদ লাভ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ আন্দোলন দমন করতে ইংরেজ সরকার তাদের প্রবল পাশব শক্তিকেই সেদিন শুধু প্রয়োগ করেনি, সাথে সাথে অবলম্বন করেছিলো বহু নিন্দনীয় নির্যাতনের কৌশল। এমনকি, ভারতীয় মহিলাদের ওপরও এরা সেদিন অমানুষিক অত্যাচার চালাতে কসুর করেনি। কিন্তু তবুও এ বিপ্লব শুধু ওদের ঐ দমন পীড়নের কাঠিন্যেই দমিত হয়নি। এ বিপ্লব ক্রমশঃ স্তব্ধ হ'তে বাধ্য হয়েছিল আরও নানা কারণে। প্রথমতঃ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশবাসীর এ সহিংস জাগরণকে কোনদিনই সমর্থন করেন নি। দ্বিতীয়তঃ এ বিপ্লব চলছিল নেতৃত্বহীন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বল্গাহীন গতিতে। আর এরই মধ্যে বন্দী অবস্থায় স্বয়ং গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে হানলেন আর এক মোক্ষম অস্ত্র। হঠাৎ আগাখাঁ প্রাসাদে তিনি একুশ দিনের অনশন করে বসলেন। শুধু তাই নয়, দেশের অনেক রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দলও সেদিন এ বিপ্লবের সঠিক মূল্যায়ন করে একে যথা-যোগ্য মর্যাদাদান ও উৎসাহ যোগাতে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থ হয়েছিলেন গান্ধীজীও এ আন্দোলন শুরু করার সঠিক সময় নির্ধারণে। তিনি জনগণের বিপ্লবী মানসিকতাকে অনুধাবন করে যখন অনন্যোপায় হয়ে এ "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ করলেন, তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। ইংরেজ সরকার তখন আর প্রাক বিশ্ব যুদ্ধের প্রবল সংকটে নেই। সেইজন্য দূরদর্শী সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালেই জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের প্রদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইংরেজ সরকারকে দেশত্যাগের জন্য ছ'মাসের নোটিশ দিয়ে চরমপত্র দেওয়া হোক এবং ঐ সময়ের মধ্যে তারা ভারত ত্যাগ না করলে এবং ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা না করলে, নোটিশের সময় উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও তদানীন্তন কংগ্রেস হাইকমান্ড সুভাষচন্দ্রের সে প্রস্তাব সময়োপযোগী তো মনে করলেনই না বরং সংকট মুহূর্তে ইংরেজ সরকারকে ঐভাবে ব্যতিব্যস্ত করা বিশ্বের কাছে নিন্দনীয় হবে বলেও মন্তব্য করলেন। কিন্তু সংকটাক্রান্ত ইংরেজের দুর্বল মুহূর্তে আঘাত হানবার ওটাই ছিল মাহেন্দ্র-ক্ষণ। তখন এ প্রস্তাব কানে না তুললেও গান্ধীজী কিন্তু ঐ প্রস্তাবই পাশ করলেন তার মাত্র তিন বছর পরে বোম্বাইয়ের অধিবেশনে। এই তিন বছরে তাদের হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করে ইংরেজ সরকার কিন্তু তখন অনেক বলে বলীয়ান। তাই বলপ্রয়োগে এ আন্দোলন দমন করতে তারা সমর্থও হলো।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা মতো যদি দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের প্রাক্কালেই এই "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ করা হতো, তবে হয়তো দেশের ইতিহাসও আজ অন্যভাবে লেখা হয়ে যেত। অপমানকর আপোষী স্বাধীনতার ফাঁস চিরদিনের জন্য ভারতবাসীর গলায় পরতেও হ'তো না। সে ফাঁস আজ পদে পদে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের পথে বাধার সৃষ্টি করছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ দেশ ছেড়েছে, তেত্রিশ বছর, কিন্তু আজও কি ভারত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়েছে? পেয়েছে কি ভারত আজও কমনওয়েলথের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে? বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজও এদেশে ইংরেজ পুঁজি কি খাটছে না? তদানীন্তন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের গতিবিধি অনুধাবন করেই সুভাষচন্দ্র সেদিন সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, কংগ্রেস অনুসৃত এ ক্লীব আপোষের পথে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও, পূর্ণ স্বাধীনতা সে পাবে না। বিদেশী শাসক আপোষের মাধ্যমে ভারতকে খণ্ডিত ক'রে যে স্বাধীনতা দেবে, তার মূলেই তারা কৌশলে রেখে যাবে জাতি-বৈরীতার এক সর্বনাশা বীজ। সে জাতি-বৈরীতার বীজই আজ মহীরুহ হয়ে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ আন্দোলন দেশের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই ডেকে আনবে না। তদানীন্তন কংগ্রেসের চালচলনে ব্যথিত হয়েই অন-ন্যোপায় সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে শত্রু পরিবেষ্ঠিত হয়ে এ দেশে থেকে তাঁর উদ্দেশ্য কোনমতেই সিদ্ধ হবে না। তাই দেশ ত্যাগ করে তিনি বার্লিন, টোকিও হয়ে সিঙ্গাপুরে এসে প্রতিষ্ঠা করলেন আজাদ হিন্দ সরকার। আর সেই সরকারের ফৌজ নিয়েই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ব্রিটিশ ও আমে-রিকার মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে। যুদ্ধ করতে করতে আজাদী সেনারা এগিয়ে এলেন ভারতের মণিপুরে। সেখানে তারা উড়িয়ে দিলেন স্বাধীন ভারতের পতাকা। কিন্তু কোহিমায় এসেই নানা প্রতিকূলতায় রুদ্ধ হলো তাঁদের অগ্রগতি। ব্যর্থ হলো ওদের অভিযান। কিন্তু ব্যর্থ হলো না ওদের প্রচন্ড

আক্রমণের প্রতিক্রিয়া, যা' আলগা করে দিয়ে গেল ইংরেজ-শাসনের শক্ত বুনিয়াদ। একদিকে দেশের অভ্যন্তরে এই আগষ্ট বিপ্লব ও অন্যান্য বিপ্লবের ঢেউ, অপরদিকে নেতাজীর সুযোগ্য পরিচালনায় দেশের বাইরে থেকে আজাদী সেনাদের মরণপণ সংগ্রাম—এ দু'য়ে মিলে নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করলো ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম কাল। প্রকৃতপক্ষে দেশের মানুষের ঐ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করেছিল ক্যাবিনেট মিশন ও মাউন্টব্যাটেনের মিশনকে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষের আলোচনায় বসতে। অতএব, ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে এসব সশস্ত্র সংগ্রামীদের অবদান অতুলনীয়। কিন্তু লজ্জার কথা তবুও কংগ্রেস সরকার এসব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও বিপ্লবীদের কীর্তি গাঁথাকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই অতি কৌশলে আড়ালে করবার—অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে। হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন তুলে তারা আজ এদের অবদানকে মুছে ফেলার এক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু তো স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য একমাত্র গান্ধীজীর অবদানকেই স্বীকার করতে চেয়েছেন। আর তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তো দেশের শহীদদের সঙ্গে করে-চলেছেন একের পর এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা। দিল্লীর লাল-কেল্লার প্রাঙ্গণে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জানাবার উদ্দেশ্যে তিনি "কালাধারে" ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বিকৃত ইতিহাস লিখে রেখেছিলেন, তাতে তিনি ভারতের কোন বিপ্লবীর নাম তো রাখেনই নি, এমনকি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের নামটি পর্যন্ত তা' থেকে তিনি বাদ দেবার মত দুঃসাহস দেখিয়েছেন। সেদিনও পার্লামেন্ট ভবনের সামনে প্রদর্শিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের চিত্র প্রদর্শনীতে তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের কোন ছবিকে স্থান দেননি। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি এর চেয়ে চরম বেইমানী আর কি হতে পারে?

এতে আর আশ্চর্য হবার কিছু থাকতে পারে না যে, যে সরকার দেশের জন্য নিহত শহীদদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেন, যে সরকার নির্লজ্জের মতো সহজেই অস্বীকার করতে পারেন শহীদের রক্তের ঋণ, সে সরকার তাঁদের দেখা সুন্দর শোষণ-হীন সমাজ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অনীহা প্রকাশ করবেনই। আরও আশ্চর্যের যে, এ বঞ্চনা ও তাচ্ছিল্য কেবলমাত্র ভারতের বিপ্লবীদের প্রতিই এরা করে চলেন নি, এরা প্রতিনিয়ত নিজেদের স্বার্থে গান্ধীজীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও অনেক ক্ষেত্রে কোন মূল্যই দেননি। দিলে, গান্ধীজীর ১৯৪২-এর ৮ই আগষ্টেরই এ. আই. সি. সি. অধিবেশনে দেয়া 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মূল প্রস্তাবটির প্রতি সম্মান দেখিয়েও তা' রূপদানের উদ্যোগ তাঁরা গ্রহণ করতেন। অথচ সেদিনের প্রস্তাবে তিনি শুধু ভারত থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান চাননি সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রস্তাবেই তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ শাসন অবসানের পর ভারতে শ্রমিক-কৃষকের রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে। সে উদ্যোগ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পুঁজিবাদের প্রসারই কেবল ঘটছে। এরই ফলে দিনের পর দিন দেশে নানা সঙ্কটই শুধু বাড়ছে। আর এ সঙ্কটে জনসাধারণ সরকারের কাছ থেকে শোষণ ও বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু পাচ্ছে না।

ইতিহাসের শিক্ষায় পরিশেষে বলি যে, যে কোন শোষণ, বঞ্চনা, উপেক্ষারই একটা শেষ থাকে। এ সবের বিরুদ্ধে মানুষের মনের পুঞ্জীভূত অভিযোগকে ছল চাতুরী ও বলপ্রয়োগে বেশীদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। দেশের চারিদিকে আজ বিচ্ছিন্নতাবাদের যে ঢেউ বইছে, তার মূলে কায়েমী স্বার্থ-বাদী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাত থাকলেও, এ ব্যাপারে শাসক শ্রেণীর দীর্ঘদিনের ক্ষমাহীন উপেক্ষা ও চরম অব-হেলাকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আসলে এর বিরুদ্ধেই ওদের কারো কারো "বিদেশী বিতাড়নের" আন্দোলন আবার কারো কারো একেবারে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের আন্দোলন। এগুলিও আন্দোলন। তবে আগষ্ট বিপ্লবের আন্দোলনের চেয়ে এর চেহারাটা একটু (?) আলাদা। আগষ্ট বিপ্লবে সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'বিদেশী' ইংরেজদের ভারত ছাড়া করতে চেয়েছিলেন। আর আজ এসব আন্দোলন-কারীরা এ দেশেরই মানুষকে বিদেশী আখ্যা দিয়ে দেশছাড়া করতে চাইছে। সেদিন আগষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল দেশের অখণ্ডতা রক্ষার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে, আর আজ এই সব আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে দেশটাকে আরও খণ্ড-বিখণ্ড করতে।

[আমাদের স্বাধীনতা দিবস : ১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ব্যবস্থা কামনা করেন তাদের উদ্যোগ এবং উৎসাহ নিয়ে জন-গণকে তাদের নিজস্ব শ্রেণী সংগঠনে, অর্থাৎ খেটেখাওয়া মানুষকে তাদের ইউনিয়ানে, কৃষকগণকে তাদের সমিতিতে, মধ্যবিত্তগণকে তাদের বিভিন্ন সমিতি অথবা সংগঠনে, ছাত্র যুব ও নারীগণকে তাদের নিজস্ব সংগঠনে সংগঠিত করবার দায়িত্ব নিতে হবে। সংগ্রামের পদ্ধতির কথা বলে গেছেন কার্ল মার্ক্স; সংগ্রামের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন লেনিন, স্ট্যালিন, এবং আমাদের দেশের ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘাযতীন, সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ শহীদগণ। দুর্দমনীয় এবং আপোষহীন সংগ্রাম ব্যতীত বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয় এবং গণমুক্তিও সম্ভব নয়।

"স্বাধীনতা দিবসে" আমাদের অন্যতম সঙ্কল্প এবং শপথ হোক গণমুক্তির জন্য আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতিতে সর্বত্র যথা-যোগ্য গণ-সংগঠন তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করা।

আলোচনা

কর্মচারী চয়ন আয়োগ : কি ভাবে নিয়োগ হয়

রণজিৎ কিশোর চক্রবর্তী ঠাকুর

[তীব্র বেকার সমস্যায় জর্জরিত ভারতবর্ষে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। হাজার হাজার যুবক পকেটে মূল্যবান ডিগ্রী ডিপ্লোমা থাকা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না। ফলে নেমে আসছে এক চরম হতাশা। ক্রোধ-ক্ষোভ, ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটছে নানাভাবে। যুব সমাজের এই জটিল সমস্যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

সবচেয়ে বিস্ময়কর, অনেক যুবক-যুবতী—মূলত গ্রামাঞ্চলের যুবক-যুবতী—শিক্ষাক্রম সমাপ্তির পর কিভাবে চাকুরীর জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় তাও উপযুক্ত নির্দেশকের অভাবে বুঝতে পারেন না। ফলে অত্যন্ত সীমিত যে সুযোগটুকু রয়েছে তাও তারা ব্যবহার করতে পারেন না। বর্তমান নিবন্ধটি তাদের যথেষ্ট উপকারে আসতে পারে বিবেচনা করে আমরা যুবমানসে প্রকাশ করলাম। নিবন্ধের লেখক রণজিৎ কিশোর চক্রবর্তী ঠাকুর কেন্দ্রীয় সরকারের স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পূর্বাঞ্চলের রিজিওনাল ডাইরেক্টর।]

—সঃ মঃ যুবমানস

কেন্দ্রীয় সরকারের গত ৪ঠা নভেম্বরের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মচারী চয়ন আয়োগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ১৯৭৬ সালে এর রীতিনিবদ্ধ অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছিল। প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৭৮-এ। এই আয়োগ-এর পাঁচটি আঞ্চলিক শাখা আছে। (১) পূর্বাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—কলকাতা) (২) দক্ষিণাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—মাদ্রাজ), (৩) পশ্চিমাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—বোম্বাই), (৪) উত্তরাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—দিল্লী) এবং (৫) মধ্যাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—এলাহাবাদ)। এই শাখাগুলির প্রত্যেকটি এক এক জন আঞ্চলাধিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্বাঞ্চলীয় শাখা আটটি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত উপরাজ্য নিয়ে গঠিত। পশ্চিমে উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণে আন্দামান এবং সুদূর উত্তর-পূর্বে অরুণাচল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মনোনয়ন করাই এই আয়োগের কাজ। এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরাই কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যা গরিষ্ঠ কর্মচারী। প্রায় ৫২ শতাংশ (যেখানে "যুক্তরাষ্ট্রীয় গণ কৃত্যক আয়োগ" মাত্র তিন শতাংশের মনোনয়ন করেন)। অবশিষ্ট চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রায়োগিক (Technical) নিয়োজিত হন [সরকারের] বিভাগগুলির নিজস্ব নির্ধারণে। মাসিক ২৬০ টাকা থেকে ৯০০ টাকা পর্যন্ত এই তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের বেতনের পরিধি। প্রায়োগিক (Technical) শব্দটির কোনও ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা [উপরিলিখিত] সরকারী সিদ্ধান্তে দেওয়া হয় নি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ডাক্তারী শাস্ত্রে স্নাতক উপাধি বিশিষ্ট কর্মচারী এই আয়োগের মনোনয়ন বিষয়ীভূত নয়। Senior Geological Assistant অথবা Senior Zoological Assistant (৫৫০—৯০০ বেতন ক্রম) অথবা আবহাওয়া বিভাগের Senior Observer (পদার্থ বিদ্যায় এম. এসসি যোগ্যতা বিশিষ্ট) ও অ-প্রায়োগিক (non-technical) পদ বলে পরিগণিত এবং এই আয়োগ-এর আওতাভুক্ত।

(২) শিক্ষিত বেকার যুবকদের এই আয়োগ মারফৎ কর্ম-সংস্থানের প্রভূত সুযোগ রয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী সংস্থানের জন্য যেরূপ প্রভাব ও পৃষ্ট-পোষক প্রয়োজন এক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু এই আয়োগের ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, ভারত সরকারের কোনও অফিসে কেরানীর চাকুরী সংগ্রহ করতে মাত্র একবার দরখাস্ত পেশ করতে হয়; এমনকি কোনও Interview ও দরকার নেই। পূর্বে আয়কর বিভাগে কেরানী চাকুরী প্রার্থীকে এবং শুল্ক বিভাগে অনুরূপ চাকুরীর জন্য পৃথক পৃথক দরখাস্ত করতে হত এবং এ ব্যবস্থায় একই দিনে দুটি পরীক্ষায় বসতে হ'ত। প্রতি পরীক্ষার পৃথক ফি, পরীক্ষা দিতে যাতায়াত খরচ খুব বেশী ছিল। এই সব অসুবিধা এবং বাড়তি ব্যয় কমানোই এই আয়োগ-এর উদ্দেশ্য।

কেরানী পদ সমূহের জন্য আয়োগ নির্ধারিত সুযোগ সুবিধার কথা বলা হ'ল। অনুরূপভাবে, আয়কর বিভাগের অবর আধিকারিক (Junior Officer) যেমন—Income Tax Inspector, Central Excise Inspector, Preventive Officer (শুল্ক বিভাগ) প্রভৃতি পদের জন্য প্রার্থীকে একবার দরখাস্ত দিতে, Interview-র জন্য একবারই উপস্থিত হ'তে হবে এবং একটি মাত্র একক যুগ্ম প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিতে হবে। কারণ, এই পদগুলির বেতনক্রম, নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক/উপাধি প্রভৃতি একরূপ। কার্যক্রম পৃথক হলেও—চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্যই কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের পরিদর্শক অথবা শুল্ক বিভাগের নিরোধক আধিকারিক (Preventive Officer) পদের চাইতে আয়কর বিভাগের পরিদর্শকের শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা কম। কার্যতঃ

কর্মবিন্যাসের সময় কর্মপ্রার্থীর পরীক্ষার ফল ও নানারূপ কর্মক্ষমতার বিষয়ও পরিগণনা/বিবেচনা করা হয়।

(৩) এই আয়োগ বছরে পাঁচটি পরীক্ষা গ্রহণ করে; যথা—(১) কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষা (২) সমীক্ষক/অবর হিসাব রক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা (৩) আয়কর পরিদর্শক পরীক্ষা (৪) রেখাক্ষর বিশারদ পরীক্ষা (৫) পুলিশ বিভাগের সহ-পরিদর্শক পরীক্ষা।

কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষা এবং রেখাক্ষর বিশারদ পরীক্ষা একই লিখিত পরীক্ষা হ'লেও রেখাক্ষর বিশারদ পদের জন্য প্রার্থীকে ৩টি স্তরে (মিনিটে ৮০ শব্দের, ১০০ এবং ১২০ শব্দের) ব্যবহারিক পরীক্ষা (Test) দিতে হবে। তিন স্তরের Stenographer পদের বেতনক্রম পৃথক পৃথক হওয়ায় পৃথক Test গৃহীত হয়। কেরানী পর্যায়ের বিষয়গত ধরনের (Objective Type) একটি লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয়। ইংরাজী ভাষা, সাধারণ জ্ঞান, প্রাত্যহিক বিজ্ঞান, সহজ গণিত নিয়ে একটি পত্র (Paper)। কোনও রচনা বা সংক্ষিপ্তসার লিখতে হয় না। প্রার্থীকে শুধুমাত্র চারটি বিকল্পের মধ্য থেকে ঠিক বিষয়কে চিহ্নিত করতে হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে কেরানী পদের জন্য প্রার্থীকে Type Test এবং Stenographer পদের জন্য Stenography Test দিতে হয়। ভারত সরকারের প্রতিটি কেরানীকে চাকরীতে যোগদানের পূর্বে অন্ততঃ মিনিটে ৩০টা শব্দ টাইপ করার ক্ষমতা থাকা দরকার। এই পরীক্ষা শুধুমাত্র যোগ্যতা বিধায়ক—সুতরাং প্রাপ্ত নম্বর যোগ দেওয়া হয় না। কিন্তু Stenography Test-এর নম্বর লিখিত পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে একত্রে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতার জন্য বিবেচিত হয়। সমীক্ষক (Auditor) পদের পরীক্ষায় ৩টি পত্র (Paper)। ১ম টি বস্তুগত বিষয়গত সাধারণ পাঠ এবং এতে কৃতকার্য হ'লে প্রার্থীর অন্য দুটি উত্তর পত্র করা হয়। একই দিনে প্রার্থী ৩টি পত্র পরীক্ষা দিবে, ১ম পত্র সাধারণ জ্ঞান, ২য় পত্র সাধারণ ইংরাজী এবং ৩য় পত্র গণিত (স্কুলফাইনাল মানের)। এই আয়োগ প্রার্থীর পছন্দ ও যোগ্যতানুযায়ী মনোনয়ন দিলে কৃতকার্য প্রার্থীকে যেকোন বিভাগে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়। আয়কর পরিদর্শক পরীক্ষাও অনুরূপ। সমীক্ষক পরীক্ষার মত এতেও ৩টি পত্রে পরীক্ষা হয়। প্রথম পত্রটি বিষয়গত এবং অপনয়নার্থে প্রযুক্ত। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে প্রার্থীকে Interview-এ ডাকা হয়, উত্তীর্ণ হ'লে প্রার্থীর পছন্দ ও যোগ্যতামত আয়োগ-এর সুপারিশক্রমে প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়। পুলিশ বিভাগের Sub-Inspector পদের পরীক্ষায়ও তিনটি পত্র—সাধারণ ইংরাজী, সাধারণ জ্ঞান এবং দিল্লী পুলিসের (Delhi Police Establishment) সাধারণ হিন্দী এবং রচনা। পরীক্ষার মান আয়কর পরিদর্শকের পরীক্ষার মত। Interview-ও অবশ্যই দিতে হবে। আয়োগ প্রতিটি পরীক্ষা রুটিন মাফিক বৎসরে একবার নির্ধারণ করে। কখনও বা কোনও আঞ্চলিক শাখায় কর্মচারী হ্রাস নিবন্ধন বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। অবশ্যই স্বীকার্য যে, অঞ্চলগুলির অবান্তর বিভাগে শিক্ষাগত মানের অসাম্য আছে এবং সেজন্য কৃতকার্যতার ন্যূনতম ধারা উঁচু নীচু হওয়া উচিত। যেমন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর (Reserved Category) প্রার্থীদের জন্য করা হয়। আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে প্রথম পরীক্ষায় প্রার্থীরা ভালো ফল করে না—তাই বিশেষ পরীক্ষা (Special Test) গ্রহণ করতে হয়। যদিও পরীক্ষাগুলি সর্বভারতীয়, তবুও আসামে তা অল্পবিস্তর রাজ্যভিত্তিক এবং প্রকৃত প্রস্তাবে খণ্ড অঞ্চল ভিত্তিক; কারণ প্রতিটি রাজ্য ও উপরাজ্যের জনগণের আকাঙ্খার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা দরকার। রাজ্য বিশেষে বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও যখন কৃতকার্য প্রার্থীর অভাব হয় তখনই কেবল আমরা ভিন্নরাজ্যের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিই।

(৪) কর্মচারী মনোনয়নের জন্য অন্য আরও সংগঠন রয়েছে যেমন—Banking Service Recruitment Board, State PSC, UPSC এবং Railway Service Commission। যাতে বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কোন পরীক্ষার দিনক্ষণ নির্ধারণে সংঘাত উপস্থিত না হয় এজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। তবে সব সময়ই যে এই অসুবিধা পরিহার করা যায় এমন নয়। ভারত সরকারের অধীনে বিশেষ শ্রেণীর চাকুরীর ক্ষেত্রে [হয়ত] পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয় না। ১৯৭৯ সালের সমীক্ষক পরীক্ষায় এই আয়োগ নির্ধারিত ৭ই অক্টোবর তারিখটি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করে এবং ঐ আয়োগ কর্তৃপক্ষের সুপারিশে কেরানী পরীক্ষা ১৪ই অক্টোবর স্থানান্তরিত করা হয়। পরীক্ষাপত্র সর্বদাই কেন্দ্রীয়ভাবে দিল্লীতে পরীক্ষিত এবং তারজন্য পরীক্ষান্তে সমস্ত উত্তর পত্রই পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে সরাসরি দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত পরীক্ষাকালে, বিশেষতঃ কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষার সময় সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বহুবিধ লোকের প্রয়োজন হয়—পরীক্ষার নজরদার, পর্যবেক্ষক এবং পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আমরা প্রভূত সহযোগিতা লাভ করি। এমনকি Stenography Test-এর সময় অনুচ্ছেদ বিশেষের dictation প্রয়োজনে বিভিন্ন কলেজ এবং সরকারী অফিসের আধিকারিকগণের সাহায্য পাই এবং তাঁরা পরীক্ষার মান ও ঐক্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকেন।

গত দু বছরে এই আয়োগ-এর কার্যকারিতা এতটা সন্তোষজনক হয়েছে যে Delhi Municipal Board এবং Delhi State Transport Corporation ও তাদের কর্মচারী মনোনয়নের ভার আমাদের উপর দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে Controller and Auditor General-এর অফিস সমূহ আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু ঐ অফিসের কর্তৃত্বও এই আয়োগের উপর কর্মচারী চয়নের ভার ন্যস্ত করেছে। এবং আয়োগ ও তা গ্রহণ করেছে। এগুলি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যাপার/পরীক্ষা।

এবারের সীমিত পরীক্ষার কথা বলতে হচ্ছে। এগুলি নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণীর পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক টাইপ পরীক্ষা (ঘ-বিভাগ থেকে গ-বিভাগে উত্তরণের জন্য) প্রভৃতি। দিনে দিনে এই আয়োগ-এর কাজের পরিমাণ বাড়ছে এবং ১৯৭৯ সালে আমাদের কতিপয় বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। এছাড়াও ভারত সরকারের আবহাওয়া অফিসগুলির জন্য Senior Observer পদের মনোনয়নের জন্যও একটি বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

(৫) পরীক্ষা এবং Interview-এর মাঝামাঝি Profi-

ciency Test নামে এক ধরনের সমীক্ষা আছে। গ্রন্থাগারিক (Junior Librarian, Assistant Librarian প্রভৃতি) পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি। আমরা এক ঘণ্টার একটি Proficiency Test-এর অবতারণা করেছি। প্রার্থীকে Proficiency Test-এ হাজির হয়ে একই দিনে Interview-তেও উপস্থিত হতে হয়। Proficiency Test-এর উত্তরপত্র রাজ্য সরকারের রাজ্য P. S. C. প্রভৃতির আধিকারিকদের দিয়ে পরীক্ষা করান হয়। কোন বিশেষ কাজের জন্য পদ সংখ্যা খুব কম (দশেরও কম) হ'লে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না এবং সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র Interview এবং Proficiency Test-এর উপর ভিত্তি করে মনোনয়ন করা হয়। সমস্ত ব্যাপারেই আমরা ভারত সরকারের "রোজগার সমাচার" এবং Employment News এবং রাজ্য কর্ম-সংস্থানের বিজ্ঞপ্তি মারফৎ দরখাস্ত আহ্বান করি। যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত পদের সংখ্যা খুবই কম সেই সমস্ত পদকে বিবিক্ত (Isolated) পদ বলা হয়। তফসিলী ও আদিবাসী প্রার্থীদের Interview-এর সময় আমরা সংসদে তফসিলী/আদিবাসী সদস্য রাখার ব্যবস্থা করি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগে/সংস্থার ঐরূপ সদস্য পাওয়া যায় না। যেমন—দূরদর্শন ও আকাশবাণীর Transmission Executive পদ, আকাশবাণীর Farm Radio Reporter পদ, ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব জরিপ বিভাগের Senior Zoological Assistant পদ, জাতীয় মানচিত্র সংস্থা (National Atlas Organisation) এবং Cartographer Geographer পদ এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদ প্রভৃতি। সাধারণতঃ রাজ্যগুলির রাজধানীতেই Interview নেওয়ার ব্যবস্থা হয়, কারণ এতেই অধিকাংশ প্রার্থীর সুবিধা। Interview দিতে আসার এবং ফিরে যাওয়ার জন্য তপসিলী/আদিবাসী কর্ম প্রার্থীদের রেল/বাস ভাড়া দেওয়া হয়।

(৬) কেরানী পর্যায়ের/রেখাক্ষর বিশারদের চাকুরী প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষা পাশ; এবং অন্যান্য পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে কোনও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। আয়কর পরিদর্শকের চাকুরীর জন্য যে কোন ধারার স্নাতন/উপাধি হচ্ছে ন্যূনতম যোগ্যতা। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উপাধিধারী হওয়া কেরানী পর্যায়ের পদের পরীক্ষা প্রদানের অযোগ্যতা হিসাবে গণ্য হয় না। বস্তুতঃ ঐ পরীক্ষায় স্নাতকের সংখ্যা ন্যূন হয়। অথবা শুধুমাত্র কেরানীপর্যায়ের পরীক্ষাই বিষয়গত (Objective) প্রশ্নপত্র দ্বারা এবং অন্যান্য উচ্চস্তরের পরীক্ষাগুলির শুধুমাত্র প্রথম পত্র বিষয়গত এবং অন্য/অবশিষ্ট দু'টি পত্র গতানুগতিক এবং উদ্দেশ্য মূলক (Subjective)। আমাদের ধারণা, একজন ভাবী অধিকারিকের প্রকাশ ক্ষমতা অবশ্যই পরীক্ষিত হওয়া দরকার; তাই আমরা গতানুগতিক/ধারানুযায়ী প্রশ্নপত্র দ্বারা আয়কর পরিদর্শকের মত অবর অধিকারিকের পরীক্ষা গ্রহণ করি।

(৭) এই আয়োগ-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার অফিস ৫নং এস্‌প্লানেড রো (পশ্চিম); কলকাতায় অবস্থিত। এটি টাউন হলের ঠিক পিছন দিকে। এসম্পর্কে যে কোন জ্ঞাতব্য থাকলে আয়োগ-এর উপরি উল্লিখিত ঠিকানাস্থ অফিসে (ছুটির দিন ছাড়া) যে কোন কাজের দিনে জানা যাবে।

মেহমান

হীরালাল চক্রবর্তী

আকাশের কোণে কালো পাথরের মত একখণ্ড মেঘ দেখতে পায় আজীজ। রকম দেখেই সে বুঝেছিল একটা কিছু ঘটবে। জাত চাষা সে। মিঞাদের খিদমত করে দিন গেলেও জন্ম ওর চাষীর ঘরে। মেঘের রং ঢং বোঝে বৈকি।

শেয়ালের হাঁ—এর মত মেঘের টুকরোটা যে সর্বনেশে মাতাল ঝড় নিয়ে ঝাঁপ দেবে না এমন নিশ্চয়তা কি। ঝরঝরে গাড়িটা শেষ আয়ু নিয়ে ঝোড়ো চড় সামাল দেবে কেমন করে ভাবছিল আজীজ। মাঝখান থেকে ওর গরু দুটোর দুর্গতির একশেষ হবে। ওর গরু? হঠাৎ বুকের মধ্যেটা চিন্‌চিন্‌ করে আজীজের। নামেই বটে ওর গরু আসল দড়ির টান এনায়েৎ মিঞার হাতে। তা শুধু কি গরু? ভিটেমাটি জমিজমা মায় সে নিজে বাঁধা মিঞার হাতে। মিঞারা এ গাঁয়ের আল্লা। এনায়েৎ মিঞা মস্ত জোতদার মহাজন। ব্যবহারে অমায়িক। কথা ভারি মিষ্টি। হাসি ছাড়া কথা নেই। কোরানের বোল ছাড়া বাক্যি ফোটে না।

আজীজ বাপের কাছ থেকে গোলামীর মৌরসীপাট্টা নিয়ে মিঞাদের সেবা করে বেহেস্তের পথ সুগম করছে। এনায়েৎ বলে, হাঁরে বাপজান তুরা আমার গোলামী করবি ক্যানে? আল্লা হাত দেছে এই পিথিবীতে খেদমতের জন্য। খোদার দোয়ায় বেহেস্তের পথ সাফ করার লেগে। আমিও তো গোলাম। নাকি?

কাঁধে হাত রেখে এনায়েৎ দাড়ি নাচিয়ে হাসে। তুই তো আমার মুনীশ নারে আজীজ। তুই আমার বাপজান। আল্লার মর্জি মন দে কাজ করে যা।

আজীজ আর কি বলবে। ঋণের মত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মন আল্লা আর মিঞার দোয়ার ফারাকটা ধরতে পারে না।

আজ সকালেই এনায়েৎ মিঞা বলছিল ক'জন মেহমানের কথা। সদর থেকে আসবে তারা। আসবে শেষ ট্রেনে। আজীজ পরম বিশ্বাসী লোক। এক জেতের লোক। সে ছাড়া এমন গোপন কাজ কে করবে। তা মিঞার বাড়িতে মেহমানের আনা গোনার তো শেষ নেই। দিনে দুপুরে এমন কি গভীর রাত্রেও দোর বন্ধ করে তাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে সে দেখেছে। বর্গা নিয়ে সেদিনও দারোগাবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার। এখন ধান রোয়ার মরশুম। বেশ একটা গরম হাওয়া গাঁয়ের মধ্যে। আজীজের রক্তও গরম হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। সে লুকিয়ে একদিন সমিতির মিটিং-এ এসেছিল, শুনতে। তার মনে হয় কথাখান ঠিক বটে। আজীজদেরও একখণ্ড জমি ছিল, হাল-বলদ ছিল। তা সে জমি কোনদিন সে ভোগ দখল করতে পারে নি। বাপের আমলেই জমিটুকু মিঞার গ্রাসে গেছে। এখন হালের বলদ দিয়ে ও গরু টানে। বাবুদের খিদমত খাটে। এই জমি হারান'র কথাই হচ্ছিল সেই মিটিং-এ. একজন এসব বুঝিয়ে বলছিলেন। রক্তও তেতে উঠেছিল। কিন্তু ক্ষণিকের মত। ও দুর্বল স্বভাবের মানুষ। বুকের মধ্যে জ্বলত বটে কিন্তু বিহিত খুঁজে পেত না। মনে হ'ত মিঞারা ওকে ঠকাচ্ছে। পিতৃপুরুষের বোঝা ওর ঘাড়ে দিয়ে গোলাম করে রেখেছে। ঐ ভাবনা পর্যন্ত। কিছু করার মত সাহস ওর নেই। গোলামী করতে করতে মনটাও ওর দুর্বল হয়ে গেছে।

আজীজ জানত চাষাদের টিট করবার জন্যই পরামর্শ চলত দিনরাত। আজীজ থাকত প্রহরীর মত দরজায় দাঁড়িয়ে।

ঝড় আসবে আজীজ ধরেই নিয়েছে। আড়াই ক্রোশ তিন ক্রোশ পথ ইস্টিশান। ঘোর আঁধার নামতেই এনায়েতের তাড়ায় সে বেরিয়ে পড়েছিল। হ্যারিকেন ধরানো নিষেধ। এ যে বড় গোপন কাজ। কাক পক্ষীকেও জানানো চলে না। চাষারা মাঠে নামার আগেই তাদের টের পাইয়ে দিতে হবে এনায়েৎ মিঞার জমি বড় শক্ত ঠাঁই। বর্গার জোরে জমি দখল করা সোজা নয়। উচ্ছেদ যাদের করেছে কিছুতেই মাঠে নামতে দেবে না সে। তার জন্য যদি দুচারটাকে খুন করতেও হয় সে করবে। গাঁয়ের কিছু চাষী আছে তার দিকে। কিন্তু বেশির ভাগই নেই। বড় এক কাট্টা চাষীরা। ওদের সঙ্গে লড়তে গেলে গায়ের জোরে হবে না। চাই কিছু পাকাখুনের দল। যারা দরকার হলেই এনায়েতের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিঞার মেহমান ওরাই। তাদেরই আনতে হবে নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে। এমন কাজে বিশ্বস্ত লোক চাই আজীজের মত। অনুগত পোষমানা খিদমতগার আজীজ।

মেহমানরা আসবে শেষ ট্রেনে। রাত আটটায়। তাদের নিয়ে ফিরতে আঁধারই হবে সেরা আলো। আজীজ ভেবে দেখল আজ বৃষ্টি হলে কাল ভোরেই চাষীরা মাঠে নামবে। আজই মেহমানরা গাঁয়ে আসছে। হয়ত আজ রাত্রেই মিঞাসাহেব ওদের চাষীপাড়ায় ঝাঁপিয়েপড়ার হুকুম দেবে। অতর্কিতে লেলিয়ে দিতে মিঞার জুড়ি নেই। এমন পাথর অনড় ভুষো কালির মত রাতই চাই দাঙার স্যাঙাৎ হিসেবে।

আজীজ আজকাল ভাবে। বোঝেও। এনায়েৎ মিঞার মসজিদের গোপন শলায় অনেকদিন ধরেই একটা মতলব চলছিল। এরমানকে লোপাট করে দেবার জন্য একটা সিদ্ধান্তও হয়েছে। এরমান সমিতির পাণ্ডা। সেও এনায়েতের বর্গাদার।

শুধু নিজের নয় গাঁয়ের সব বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করিয়েছে সে। এনায়েতের মত মানুষকে সে স্পষ্ট বলেছে ফেরেপবাজ। মাঠগর্তের ধান লোপাটী ধেড়ে ইঁদুর। এ সবই জানে আজীজ।

কি বুকের পাটা এরমানের। আজীজ সেদিন ভয়ংকর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, মুগ্ধ বিস্ময়ে এরমানকে নয়া চোখে দেখেছিল। হ্যাঁ মিঞাকে জবাব দেবার মত মানুষ আছে বটে গাঁয়ে। এই সেদিনও এমন করে কথা বলতে সাহস পেত কেউ? আজ এরমান রুখে দাঁড়িয়েছে, সায় দিচ্ছে আরো পাঁচজনা। আজীজ ভাবে দিনকাল বদলেছে বটে।

মিঞারাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারা আরো ভয়ংকর আরো হিংস্র হয়ে উঠছে। জিভ টেনে ছিঁড়তে চাইছে এরমানদের। গাঁখানাকে সেই আগের মত আঁধারে ডুবিয়ে দেবার জন্য কত না কসরৎ তাদের। দুজন চাষীর বুক ফেঁড়ে দিয়ে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছে মিঞারা। পুলিশ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে মিঞাদের সঙ্গে বিবাদ করে গাঁয়ে বাস করা সহজ নয়।

এনায়েৎ তবু হিমসিম খায়। তাদের ফরমান বরবাদ করে দিচ্ছে চাষীরা। এমন দোর্দণ্ড মিঞাদের কলা দেখাচ্ছে আজীজেরই কাছের মানুষেরা। আজীজের বুকেও খুসির খই ফোটে। মন নিজের অজান্তেই বাহবা দিয়ে ওঠে। কিন্তু তা বড় সাবধানে। বড় হিসেব করে। তার যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাঁধা মিঞাদের খুঁটিতে। তার খুসি বুকের মধ্যেই ঘোরে। নিঃশব্দে সন্তর্পণে।

আজীজ অবাক হয় মিষ্টিমুখো 'বাপজান' বলনেওয়ালা এনায়েতের রাগ দেখে। মসজিদের শালিশীতে পোষ না মানা চাষার বেচাল দেখে খাপ্পা সে। মকবুলকে জুতো ছুঁড়ে মারে রাগের ঝোঁকে। বলে, লে বর্গা রেকর্ড করেছিস তো দোজখেই যা। দারোগাবাবুর জুত্তি না খেলে তুদের দিল ঠান্ডা হয় না। কেমন করে মাঠে নামিস তাই দেখব!

আজীজ এসব দেখেছে। বুঝেছে একটু দেরীতে। মিঞাদের সঙ্গে বিবাদ বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু বিবাদ লেগেই আছে। থাকবেও। এ যে ধানের বিবাদ। ধান তো নয় প্রাণ। আজীজও বোঝে ধানের চেয়ে বড় কিছু নেই। একদিন এনায়েৎ মিঞা মসজিদে বোঝাচ্ছিল সকলকে, গোল করে কে ঘাড় ভাঙ্গে কার। আরে লেতারা তুদের ক্ষ্যাপায়! বর্গা রেকর্ড কি? তুরা সব আমার জেত ভাই, তুদের ছাড়া কি জমি আমার এমনি এমনি ফসল দিবে! আল্লার কসম লাইন দিতে যাবি না। আজ এই দিন আছে কাল থাকবে না। তুরা যেমন চাষ দিচ্ছিস দেকে মানা করে। কিন্তু বেওয়াকুফের মত ঐ লেতাদের কথা শুনে গোল করিস না।

এসব আজীজ শুনেছে। 'বেওয়াকুফের' মতই চাষীরা লাইন দিয়ে নাম রেকর্ড করিয়েছে। আর মিঞা রাগে দাড়ির চুল টেনে ছিঁড়েছে। আজীজেরও বড় ইচ্ছা হত নাম রেকর্ড করায়। কিন্তু সে তো গোলাম। তার তো জমি নেই। চাষও নেই। খত লিখিয়ে কবেই সে জমিটুকু হজম করেছে মিঞা। মাঝে-মধ্যে অন্য চাষীর হয়ে সে মাঠ চষে দেয়। বেগার খেটে দেয়। কিন্তু বর্গাদার তো সে নয়। এনায়েৎ মিঞার পার্শ্বচর অনুগত ভৃত্য। তবু হঠাৎ কখনো তার চোখেও আগুন ঝলসে ওঠে। কুঁকড়ে থাকা বশীভূত মনটা জ্বলে ওঠে। ঘরে তার বিবি। ছোটখাট একটি হুরী। নয়তো এনায়েতের কোলকাতার কলেজে পড়া ছেলে বিলাতের চোখে পড়বার কথা নয়। তেঁতুল-গাছের নীচে দাঁড়িয়ে প্রায়ই সে পানী চেয়ে খায়। চোখ তার ছুকছুক করে। আসল কথা পানী নয় শাকিলার জন্যই সে আসে। একদিন আজীজের হাতের কাস্তেটা কেঁপে উঠেছিল। শহুরে বাবুর চোখ দুটো উপড়ে নিতে ইচ্ছা হয়েছিল। শাকিলা ওর হাত চেপে ধরেছিল। সেদিন আজীজ ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল নিজের রাগ দেখে। সেও রাগতে জানে! ঘৃণায় সারা বুকটা জ্বলে ওঠে তারও?

আজো সেই আজীজই আছে। ঝড়জল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বৃষ্টির দেখা নেই। শুধু ঝড়ের ইঙ্গিত। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে আকাশের সীমানায়। আকাশের পটে আক্রোশ যেন ওৎ পেতে আছে।

শেষ ট্রেন এল। চলে গেল। ইস্টিশনের ক্ষীণ আলোর দিকে তাকাল আজীজ। ট্রেন থেকে লোকজন খুব বেশী নামল না। দুচার জন যারা নামল তারা সব চাকুরে বাবু। শহরে চাকরী করতে যান। ফার্স্ট ট্রেনে ওঠেন লাস্ট ট্রেনে নামেন। তারা ইস্টিশানের ওপাশ দিয়ে ঘুরে লোকালয়ের দিকে চলে গেলেন। বিড়িতে শেষ টান মেরে আজীজ প্রায় হতাশভাবে অদূরের ক্ষীণ আলোর মধ্যে মেহমানদের পাত্তা নিতে চোখ দুটোকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। এমন সময় যেন জনাকয়েক লোককে ঢালুর দিকে গড়িয়ে নামতে দেখা গেল। ঢালুটা উঠে এসেছে পীচ রাস্তার ওপর। কালো কারের মত রাস্তাটা চলে গিয়েছে দুধারের ধানক্ষেতের বুক চিরে সিধে আরো পাঁচ-ক্রোশ সাহেব ঘাটা অব্দি। দুতিন ক্রোশের মধ্যেই আজীজদের গাঁ গ্রাম। শুধু ধু ধু ধান ক্ষেত। পথের দুধারে বাবলা জারুলের গাছ। একটা সরু ক্ষেতিখাল বেড় দিয়ে রেখেছে গাঁখানাকে।

আজীজ তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। সেই ক'জন মূর্তি উঠে আসছে গড়ান বেয়ে। মেহমান! পথের পাশে ঝাঁকড়া মাথা বাবলাগাছের নীচে গরুর খুরের শব্দ হল। শোঁ শোঁ শব্দে শেয়ালের মুখের হাওয়া গোঙাচ্ছে। সাপের জিভের মত লিক-লিকে বিদ্যুৎ কালো আকাশখানাকে এমাথা ওমাথা ফালা করে ঝলসে উঠল। ভয়ঙ্কর গর্জনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে মেহমানরা এসে দাঁড়াল।

—এনায়েৎ মিঞার লোক নাকি?

—জী।

আকাশের খেয়াল ভাল ঠ্যাকে না। জোরসে।

গাড়ি চলেছে। ঘন দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আজীজের চোখ যেন সার্চলাইট হয়ে ওঠে।

একজন মেহমানের প্রশ্ন—নাম কি?

—জী, আজীজ—

—ক'দ্দিনের লোক?

- সেই ছাওয়াল থেকে মিঞাদের গোলামী করি।

হঠাৎ ঝলকানীতে কয়েকজোড়া চোখ গেঁথে গেল কালো মিশমিশে বলিষ্ঠ আজীজের দেহে। একটানা বাতাসের গোঙানীর সঙ্গে গাড়ির চাকার আর্তনাদ মিশে এক ভয়ঙ্কর বীভৎস শব্দ আছড়ে পড়ে নিস্তব্ধ অন্ধকারে।

আজীজের মনের মধ্যেও শুরু হয়েছে একই বিক্ষিপ্ত চিন্তার আনাগোনা। এরা কেন এসেছে? মাঠের চাষ নিয়ে গোল বাঁধাবে বলে? আবার একটা খুনোখুনির লেগে? এনায়েতের

লোভের আগুনে গাঁখানা আবার জ্বলবে! ওর বুকেও বঞ্চনার আক্ষেপ রয়েছে। কিন্তু সাহস নেই। বড় ভয় করে। বিলাত সাহেব সেদিন চোখের ওপরই দুটো বন্দুক সাফ করছিল। আজীজ সেদিনই বুঝতে পেরেছিল ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবার জন্য গাঁখানা থমকে রয়েছে। শাকিলাকে বলতে সে বলেছিল, তুমার ত সব নেছে মিয়া। খত নিখে দেছ! গতর খাটিয়ে করে নেবে। সবাই তা মানবে ক্যানে? তারাও কোমর বেঁদেছে।

—হাঃ। আমি মিঞাদের নেমক খেছি রে।

—কার নেমক কে খায় মিঞা। শাকিলা বলেছিল, মিঞারা তুমার জমি কেড়ে নেলে। খত নেকালে বান্দা হবার লেগে। তুমার জমির ধান খেয়ে ভাবলে হুজুরের নেমক খাচ্ছ।

এসব কথা আবার মনে পড়ছে আজীজের। বোশেখের মাঠের মত শুকনা বুকটা কড়কড় করে। কিন্তু বিশাল দেহ হলেও মন তার পিতৃপুরুষের ছাঁচে ঢালা। কণ্ঠস্বর আনুগত্যের সংস্কারে চাপা পড়ে থাকে। তবু বুকে তপ্ত মাঠের জ্বালা ঘুরে বেড়ায়। ওদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছা হয়। হঠাৎ এনায়েতের মুখখানা মনে পড়লে সব কেমন গুলিয়ে যায়। বরং শাকিলার মন শক্ত। ওর বাপ একজন তেজী চাষা। কয়েক শো মানুষ আছে তার পেছনে। আছে সমিতি। গাঁয়ে তার বাপজান জমি চষে বুক ফুলিয়ে। নিজেকে বড় একা বিচ্ছিন্ন মনে হয় আজীজের। শুধু হুকুমের গোলাম সে! মাথা নামিয়ে শুধু হুকুম তামিল করা।

হঠাৎ আজীজের ভাবনায় ছেদ পড়ল। একজন কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল,—হেই মিয়া গাঁয়ে ফুর্তিটুর্তির জিনিস আছে তো?

আজীজ ঠিক বুঝতে পারল না। কথাটা ভেঙ্গে বলতে সে বলে, হাঁ বাবু হুই খাল ধারে তেনারা—

কথাটা বোধহয় মনঃপুত হল না মেহমানদের। তাদের আলাপচারীতে মনে হল একটু উঁচুদরের জিনিস চায় তারা। আজীজ গরুর লেজে মোচড় দেয়। দুটো গরু গতি বাড়িয়ে দেয়। ঝপঝপিয়ে ছোটে গাড়িটা।

আবার প্রশ্ন—ইদিক্কার অবস্থা কেমন হে মিয়া?

—সব ঠিক আছে বাবু। উ শালারা নাঠি সড়কি ছাড়া কিছু বোঝেনা। অজীজ দম টেনে বলে, আপনেরা শহরের মিস্তিরীরা পাকা মানুষী। ভয়ে উরা ন্যাজ গুটিয়ে পালাবে।

মিস্তিরী বলায় মেহমানরা বুঝি খুসি হয়। তারা শব্দ করে হাসল। ওদের আলাপ শুনতে লাগল আজীজ কান তুলে। কি করে চাষীপাড়ায় আক্রমণ চালাবে তারই কৌশল আঁটছে ওরা। বিলাত সাহেব একটা ছক করে দিয়েছে। সেই ছকের ওপরই আলোচনা হচ্ছে।

হঠাৎ হ্যাঁচকা টান লাগে গাড়িতে। দুর্বল গরুদুটো বেসামাল হয়ে পড়ে। আজীজ বলে, আর এট্টু বাপ—আর এট্টু।

আজীজের পাচনটা ওপরে উঠেও ঝট করে নেমে যায়। গরুদুটোকে মারতে অবশ্য তোলে নি। হঠাৎ যে কথাটা তার কানে এল তাতেই ওর শরীরটা যেন ঝাঁকানী খেয়ে হাত ওপরে উঠে গেল। রক্ত যেন টগবগিয়ে উঠল দেহের মধ্যে। মেহমান বলছে, হেই গাড়োয়ান গাঁয়ে ডগডগে চাষী বউ আছে তো? এ কাজে নিরামিষ ফিরতে রাজী লই বাবা!

কে জানে আজীজের হঠাৎ মনে হ'ল শাকিলার কথাটা। শাকিলা গোলামের বিবি হলেও চাষী ঘরের বউ। শাকিলা সুন্দরী। হঠাৎ ওর অনেকদিন আগের একটা ছবি মনে পড়ে। ধান ক্ষেতে এনায়েতের ভাড়া করা গুণ্ডারা বাচ্চু সেখের বিবিকে নিয়ে উৎসব করেছিল। আজ অনেক কাল পরেও সে দৃশ্য মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি সে। সেদিন এর বিচার করার মত মনুষ ছিল না গাঁয়ে। চাষীপাড়ার অনেকেই তখন গাঁ ছাড়া। কারো কারো মাথায় হুলিয়ার খাঁড়া। বাচ্চু সেখের বিবিকে দশ বারোটা শেয়াল খুবলে খেয়েছিল বলে তেমন সাড়া মেলে নি গাঁয়ে। বাচ্চু সেখ তার পনেরো দিন পরে পুলিশের গুলি খেয়ে মারা গিয়েছিল। প্রতিশোধের সুযোগ তার মেলে নি।

আজো আজীজ সেদিনের কথা ভাবলে চমকে যায়। হঠাৎ তার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন সেদিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশংকায় শিউরে ওঠে। দিন বদলেছে। গাঁয়ের অনেকেই ফিরে এসেছে। মোটামুটি একটা শান্তি ছিল গাঁয়ে। গাঁছাড়া যারা হয়েছিল গাঁয়ে ফিরে তারাই শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখত। সমিতি আরো বড় হ'ল। এনায়েৎ মিঞা ভালই দমে গিয়েছিল। তাকে কেউ জুলুম হুজ্জুতও করে নি। যে যার জমিতে শান্ত-ভাবেই চাষ আবাদ করছিল। আবার এনায়েৎ মিঞা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গাঁয়ে আবার অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইছে? বুকটায় রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। পাচনটা উঠেও নেমে যায়। দাঁতের নীচে ঠোঁট কেটে বসে যায়। গরুর লেজ মুচড়ে দিয়ে তাড়াদেয়—হেই-হেট্-হেই—

দমকা শাসানী ঠেলে গাড়ি ছোটে ক্যাঁচ-কোঁচ-ক্যাঁচ-কোঁচ। হাওয়াটায় ক্রমেই জোর বাড়ছে। দূরাগত একটা বুক কাঁপানো শব্দে আজীজ ধরে নেয় ঝড় আসছে। মনে মনে সে তৈরী হয় মোকাবিলার জন্য। গরুদুটোকে আর তাড়া লাগায় না। মন সে ঠিক করে নিয়েছে গাড়ি এনায়েতের বাড়ির দিকে যাবে না। যাবে চাষীপাড়ার দিকে। মনকে শক্ত করেই সে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে ঝট করে।

মেহমানদের ওদের হাতে তুলে দিতে পারলেই তার কাজ শেষ। না। শেষ নয়। আজীজের মনের ঘোর থাওয়া অস্বস্তিটা থেকেই যাবে যতক্ষণ না নীচু মাথাটা উঁচু করে এনায়েতের সামনে দাঁড়াতে পারছে। বুক ফুলিয়ে বলতে পারছে,—মিঞা আজ আর আমি একা লই। গোলামী অনেক করেছি আর লয়। জমিখান ফেরৎ চাই।

মনটা হালকা লাগে। ঝড়ের ঝাপটা খেয়ে গাড়িটা আর্ত-নাদ করে ওঠে। কিন্তু মন তার উড়ে চলে দুরন্ত ঘোষণা নিয়েঃ হুঁশিয়ার ভাইসব। যন্তর এয়েছে সদর থেকে। হুঁশিয়ার!

এনায়েতের হিংস্র কুটীল মুখখানা যেন অন্ধকারে ভেসে ওঠে। অন্ধকারেও ধক ধক জ্বলছে চোখ দুটো। আজীজের বুকেও আজ আগুন লেগেছে। হাড়ে হাড়ে ছড়াচ্ছে সে আগুন। দীর্ঘ বঞ্চনার পর শাকিলার বাপের মতই সে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে, তুমার চোকের ভয় করি না মিঞা। দ্যাও—এত্টা কালের হিসাব দ্যাও। নাইলে ছাড়ান নাই।

ঝড়ের বেগ বেড়েছে। ছোবল মারছে গাড়িটার গায়ে। মেহমানরা বলল, হেই মিয়া ঝড় যে এসে পড়ল।

—ঝড় এখুনো এসে নাই বাবু।

আজীজ নিজের মনেও ভাবে এ ঝড় কিছুই নয়। যে ঝড় তার চাই তা আসবে আগামী কাল।

ভাঙুক এখন সুখের ডানা

স্বপন নাগ

ঝড়ের রাতে যাচ্ছে ছিঁড়ে রং বেরং এর স্বপন কোথাও
কোথাও আবার আসছে দারুণ এক সমুদ্র-ডাক
সেই ডাকে কেউ ভয় পেওনা
ভয় পেওনা ঝড়ের দাপট কিংবা কেনো
সমুদ্রেরই মাতাল নাচন......
ঝড়ের ডাকে কাঁদছ তুমি মুখ লুকিয়েঃ
বুকের মধ্যে রাখছ পুষে বিষের দানা,
আমি তবু হাসছি উদার-উদাস-উদম
ঝড় আসছে আসুক না ঝড়!
ভাঙুক না ঘর নৌকোর ছৈ পাখির ডানা
হারাক্ দূরের পরিজনের নিদেন হাঁক.
হারাক্ মানসঃ নরম স্বপ্ন দেখার মতন!

ঝড় একদিন থামবেই, সেদিন বাঁধব ঘরে
সুখের বাসা, আঁকব নতুন তুলি দিয়ে.
ডাকবে আলোর বন্যা ভীষণ: এখন শোনো
সাগর ডাকে, ঝড়ের দাপট ভয় পেওনা!
ভাঙুক এখন কাঁচের মতন বাঁধ সুখের স্বপ্নগুলো
হোক উধাও.. ...

এখনো মানুষ আমি

শীতল গঙ্গোপাধ্যায়

পাতা-ঝরা বিষণ্ন শব্দ বুকে নিয়ে
হেঁটে গেছি একা একা পূর্বে-পশ্চিমে - বহু দূরে-
নিকানো উঠোন 'পরে সজনের টুপ্ টাপ্ ছন্দ ছাড়িয়ে
কখনো হাল্কা মেঘ ভেসে ওঠে মনের আকাশে
কখনো বৃষ্টি পড়ে বজ্র-বিদ্যুৎ সাথে নিয়ে—
ছোট ছোট ঘাস আর অপরাজিতার নীল বুকে
তবুও মানুষ আমি
আমারও ঘর আছে--ঘরেতে অরণ্য আছে......
অরণ্যে শ্বাপদ খেলা করে।

এখন অনেক বেলা—সকাল হয়েছে শেষ করে
এখন পায়ের নীচে মাটি কাঁপে থর থর করে
এখনও বুকের মাঝে গোপন গভীর নিরবতা
আদিম শব্দের পায়ে কেঁদে কেঁদে মাথা খুঁড়ে মরে
তবুও মানুষ আমি,
আমারও ঘরে আছে অরণ্য......শ্বাপদ......
শ্বাপদের পায়ে পায়ে রক্ত, ছোট নুড়ি রক্তে রাঙা
রক্তের লাল রঙে ব্যথিত প্রত্যুষ
সূর্যের আগমনী গায়।

আছো কোথায়, বন্ধু?

শুভংকর রায়

রাত্রি গভীর হোক আরও—
যেতে যেতে আটকে থাক এই চাঁদ
উচ্ছ্বসিত অরণ্যের তুঙ্গ মগডালে।

তারপর সারারাত
খেলা হোক লুকোচুরি
গাছ-গাছ আর কেবলই গাছের ভীড়ে
বাঘ সিংহ বুনোহাতি আর শেয়ালের
আর নেকড়ের আর খরগোসের সাথে -

আমিও ছুটব, ছুটে ছুটে যাব
ছিঁড়ে ফেলে এই মন: কেবলই খেয়ালে
সেই সব স্মৃতি পথ দিয়ে
ছুটতে ছুটতে আর নাচতে নাচতে
পরিত্যক্ত সেই সব গাছের কোটরে
ঝোপঝাড় নদী খাল বনে, গুহার আঁধারে
আছো কোথায়, বন্ধু.
আমার আজন্ম মানবতা!

এসো খেলি স্বচ্ছতোয়া চাঁদে
এসো খেলি হিংস্রতার ভীড়ে
এসো খেলি এই সেই অরণ্য গভীরে।

ঝড়

দেবাশিস প্রধান

ঝড়ের সাথে প্রলয় আসে
দুর্দিন ঐ ঘাসে ঘাসে...
সবখানেতেই ঝড়.
মাঝ নদীতে ভাসছে দ্যাখো
অবিন্যস্ত খড়!

নদীর বুকে উথাল পাথাল
বুকের মাঝে আরক্ত খাল
জোয়ার ভাঁটার অভিমানে তৈরী করে খাঁজ
সুখের ঘরে সৌচি কাঁটা
কি যন্ত্রণায় নীল করো তুই
বাজিব কত বাজ!

একদিন প্রতিদিন : এইসব হৃদয় ও রুধিরের ধারা

মৃণাল সেনের সাম্প্রতিকতম ছবি 'একদিন প্রতিদিন'-এ আছে সেই অমোঘ শক্তি, যার অপর নাম প্রগাঢ় উন্মোচন, যা ভ্রষ্ট আদমের মত আর্তনাদে আমাদের দগ্ধ করায়, সারাক্ষণ এক প্রবল উৎকণ্ঠায় ডুবিয়ে রেখে অবশেষে ঠেলে দেয় এক অতল, অনিবার্য খাদের দিকে। বস্তুত, এই ছবি আক্ষরিক অর্থেই একটি বিস্ফোরণ, যে বিস্ফোরণ আমাদের ছবি দেখার ইতিহাসে (যার মধ্যে এই প্রতিবেদক অবশ্যই তার দেখা কিছু সাহেব-সুবোদের তৈরী ছবির প্রসঙ্গ দায়িত্ব নিয়েই মনে ক'রতে চায়।) একটি বিপন্ন বিস্ময়, একটি উজ্জ্বল উদ্ধার। এমনকি ছবিটি দেখতে দেখতে কখনো এরকমও মনে হ'য়েছে, মৃণাল সেনের পূর্ববর্তী ছবিগুলির ঐতিহ্যও এখানে খড়কুটোর মত উড়ে গেছে—এই ছবির দমকা বাতাসে নয়, বিবর্ণ উজ্জ্বলতায়। ছবিটি দেখে আমরা বিমূঢ় হ'য়ে যাই, আঁতকে উঠি—এই নিষ্ঠুর জীবনের ভিস্যুয়াল পর্যবেক্ষণ, এই অপলক অবলোকন আমাদের মধ্যবিত্ত ভঙ্গুর স্বাতন্ত্র্যবোধে সজোরে লাথি মারে। আর অস্তিত্বে লাথি পড়লেও আঁতকে উঠবে না, সে কোন্ উন্মাদ ?

একটি সামান্য কাহিনী (অমলেন্দু চক্রবর্তী) সূত্র অবলম্বনে মৃণাল সেন এই অসামান্য ছবিটি তুলেছেন। একটি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের একদিনের একটি আকস্মিক ঘটনা অবলম্বনে প্রতিদিনের দিন যাপনের যে পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত ক'রেছেন, তা বড় বেশি নিষ্ঠুর, বড় বেশি স্বার্থপরতায় ভরা। উত্তর কলকাতার একটি সংকীর্ণ, স্যাঁতসেতে, ফাঁকা গলির মধ্য দিয়ে একটি অস্পষ্ট রিকসার এগিয়ে আসা দিয়ে ছবি শুরু হয়। সেই গলিতে বল খেলতে গিয়ে একটি ছেলের মাথা ফাটে, ডাক্তারখানা থেকে মাথায় ৩টে সেলাই নিয়ে ছেলেটি বাড়ি ফেরে। এবং তখন ক্যামেরা প্যান ক'রে দেখানো হয় বাড়িটিকে, যে বাড়িটি এই ছবির মূল চরিত্র। তাঁর ছবির স্বভাবসিদ্ধতা অনুযায়ী মৃণাল সেন নেপথ্য ভাষণের সাহায্যে আমাদের সাথে এই বাড়িটির পরিচয় করিয়ে দিতে থাকেন। আমরা ক্রমশ জেনে যাই ১৮৫৭ সালে, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর বছরে, বাবু শ্রীযুক্ত নবীন মল্লিকের হাতে এই বাড়ি তৈরী হয়। তারপর স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, সি. এম. ডি. এ-এর হাত ঘুরে স্বাধীনোত্তর কালেও তা অবিকল, অপরিবর্তিত। অর্থাৎ, সিপাহী বিদ্রোহের উদ্দীপনা, রক্তাক্ত স্বাধীনতা আন্দোলন, এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও আমরা সেই একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি, একই গ্লানিময় জীবনে বন্দী হ'য়ে আছি। বস্তুত, এই ১৬ ঘরের মধ্যে ১১টি পরিবারের শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকা তো এই ঘৃণময় সমাজেরই একটি নিষ্ঠুর চিত্রকল্প। বাড়ির পর আমরা মৃণালের কয়েকটি অনবদ্য কাট্ সটের মাধ্যমে চিনে ফেলি এই বাড়ির কয়েকজন বাসিন্দার স্বভাবচরিত্র—যার মধ্যে ডিক্টেটর-সদৃশ বাড়িওয়ালা, যিনি ভাড়াটেদের জল, আলো মেপে দেন, একটি বিশেষ সংযোজন।

তারপর ক্যামেরা এই বাড়ির একটি বিশেষ পরিবারকে ক্লোজ-আপে এনে ফেলে। আমাদের পরিচয় হয় হৃষিকেশ সেনগুপ্তের সাথে, অবসর প্রাপ্ত এই মানুষটির ৬ জনের সংসারে একমাত্র উপার্জনশীল তাঁর বড় মেয়ে চীনু—যার আয়ের উপর এই ৬টি প্রাণীর বেঁচে থাকা নির্ভর ক'রে আছে। এবং একদিন হঠাৎ ৭টা বেজে যায়, সেই মেয়ে বাড়ি ফেরে না। ৭টা-৮টা-৯টা রাত বাড়ে—বড়ে-চীনু ফেরে না—ফেরে না—ফেরে না—উৎকণ্ঠা বেড়ে চলে। মেজ বোন মীনু দিদির অফিসে অহেতুক ফোন করে এসে জানায় দিদি অফিসে নেই। তারপরও রাত বাড়ে নিজস্ব নিয়মে, হৃষিকেশের চোখের সামনে দিয়ে হেলেদুলে শেষ ট্রাম চ'লে যায়, রেডিওতে একসময় সারাদিনের অনুষ্ঠানও শেষ হয়, তবু চীনু ফেরে না. বাড়ির সকলে জেনে যায় এতরাত ক'রেও মেয়েটা বাড়ি ফিরলো না। শুরু হ'য়ে যায় তৎপরতা—থানা, হাসপাতাল, মর্গ খোঁজা শেষ ক'রে একসময় সকলে ফিরে আসে। চীনু ফেরে না। আর নিষ্ঠুর পরিচালক তখন কী ভয়ংকরভাবে দর্শকের হৃদপিণ্ড নিয়ে তুচ্ছ বলের মত লোফালুফি শুরু ক'রে দেন! বাড়িময় শুরু হ'য়ে যায় অশ্লীল ফিসফাস, গভীর কুমীর কান্না। অবশেষে একসময় সব যেন থিতিয়ে আসে, বাড়িটা তলিয়ে যায়, অসীম নির্জনতায়। ঘরের মধ্যে হৃষিকেশের পরিবার পাথরের মত ব'সে থাকে একাএকা, অসহায়। আর তখন সারা ঘরে ঘড়ির, নিশ্বাসের, নির্জনতার শব্দ কী ভয়ংকর হ'য়ে ওঠে! এবং সেই হিম নৈঃশব্দই ছবিকে পৌঁছে দেয় শেষ অনিবার্যতায়। হঠাৎ, হঠাৎই সেই অস্বস্তিকর নীরবতা টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায় মীনুর আকস্মিক আক্রমণে—সে মাকে অভিযুক্ত করে স্বার্থপরতা এবং কর্তব্যহীনতার অভিযোগে। এই পর্যায়ের তীক্ষ্ম এবং স্থিরলক্ষ্য সংলাপে মধ্যবিত্ত সমাজের ভঙ্গুর মূল্যবোধগুলি খানখান্ হ'য়ে ভেঙে পড়ে, মীনুর সংলাপে স্বার্থপর সামাজিক ব্যবস্থার একটি নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে এই দৃশ্যের আয়নায়। বলা যায়, এইটিই ছবির প্রাণদৃশ্য। আশংকা, উৎকণ্ঠা, মায়ামমতা তছনছ ক'রে বেরিয়ে আসে অনিবার্য দাঁত-নখ। শুধু

পরম অসহায়তার মধ্যে তখন বসে থাকেন হৃষিকেশ, আর কী করুণ তাঁর সেই বসে থাকা!

এবং তারপর প্রায় শেষরাতে নিষ্পাপ মুখে চীনু ফিরে আসে। চীনু ফিরে আসে তখন, যখন তার আর না-ফেরা বিষয়ে সকলেই স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছে গেছে, যখন তার মৃতদেহ ফিরলেই সকলে অস্বস্তি থেকে, মধ্যবিত্তের ঠুনকো লজ্জাবোধ থেকে অন্তত বাঁচতো, এবং সেই ফেরার কাছে এই ফেরা তো বস্তুতই খুববেশী মূল্যহীন। মৃণাল এখানে মুখ্যত পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অসহায়ত্বের ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেও, তাকে দেখাতে চেয়েছেন এই সামাজিক ব্যবস্থার সমগ্রতার মধ্য দিয়ে—সেজন্যেই চীনুর প্রেমিকের '৭৬ সালে পুলিশের গুলিতে খুন হওয়ায় সংবাদ নিছক সংবাদকে ছাপিয়ে আমাদের আরো অনেকদূর নিয়ে যায়। আসলে, নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটি তাঁর কাছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বায়বীয় ঘটনা নয়। কেননা মৃণাল নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন শিল্পীকে আজ প্রতিনিয়ত ঘটনার চাপে খানিকটা সামাজিক নৃতাত্ত্বিকের, রাজনৈতিক প্রবক্তার ভূমিকা গ্রহণ ক'রতেই হবে। এবং মৃণালের সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে বলেই তাঁর ক্যামেরায় নারীর এই শোচনীয় বন্ধন দেখে আমরা লজ্জিত হই, পারিপার্শ্বিকতার সাথে তাকে ওতপ্রোত দেখি ব'লেই তথাকথিত সমাজসেবিকা মহিলাদের তন্তুজ-বন্ধন-মুক্তি আন্দোলনের তুলনায় তা অনেক মহান হ'য়ে ওঠে, এ-কথা লেখাই বাহুল্য।

তো, চীনু বাড়ি ফিরে আসে। নিষ্পাপ তার চোখমুখ। সে আকুলভাবে জানাতে চায় নিজের কথা। কেউ শোনে না, শুনতে চায় না, কথা বলে না, বিশ্বাস করে না। এবং এখানে মৃণাল একটি অদ্ভুত ফিল্মেটিক্ কাজ দেখিয়েছেন। হঠাৎ চীনুর ফেরার সাড়া পেয়ে একে একে সারা বাড়ির আলোগুলো জ্বলে ওঠে। ক্যামেরা নীচ থেকে পুরো বাড়িটাকে ধরে। চারদিকে তখন অসংখ্য সন্দিগ্ধ, অশ্লীল চোখমুখগুলি ঘিরে আবহসঙ্গীতে যেন রণদামামা বেজে ওঠে। দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ান ব্যাঘ্রমনস্ক বাড়িওয়ালা, ক্যামেরা-কৌশলে হঠাৎ যাকে ধুতি, গেঞ্জি পরা হিটলার বলে ভ্রম হয়। তিন মুহূর্তে তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ক্যামেরা সিঁড়ি দিয়ে বীরদর্পে তাকে নীচে নামিয়ে আনে, একেবারে হৃষিকেশের দরজায়। তিনি নেমে আসেন পুরুষ শাসিত সমাজের, খয়াখর্বুটে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের, কাগজে একনায়কত্বের প্রতিনিধি হিসেবে। আর নেমে এসে হৃষিকেশকে শাসান 'ভদ্রলোকের বাড়িতে' একটি মেয়ের রাত ক'রে বাড়ি ফেরার ব্যাপারে কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রে। এবং সেই সাথে তাঁকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশও দেওয়া হয়। এই দৃশ্যে তখন হঠাৎ চীনুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে 'আপনারা বিশ্বাস করুন'—এই অসহায় অসম্পূর্ণ আর্তি যখন আমাদের গভীর বেদনার দিকে টেনে নিয়ে যায়, তখন, ঠিক তখনই সেই কান্নাকে অসীম ক্রোধে পরিণত ক'রে উল্কার মতো ছুটে আসে চীনুর ভাই তপু। সে হঠাৎ দুরন্ত রাগে বাড়িওয়ালার কলার চেপে ধ'রে চেঁচিয়ে ওঠে, ফেটে পড়ে—'অমন ভদ্রতার মুখে লাথি মারি'—শোনা যায় তার মুখে এই অনিবার্য সংলাপ। এবং আমরা তখন মুহূর্তে তপুর হাত ধ'রে পেঁছে যাই সেই স্থির লক্ষ্যে, যেখানে আমাদের পেঁছুবার কথা আছে। সেজনাই সেই ভয়াল হতাশার রাত যখন শেষ হয়, তখন দেখা যায় আগের রাতে যেই মা ভয়ে, লজ্জায় কুঁকড়ে ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই মা-ই পুনরায় অনায়াস সাহসে ভোরবেলা বাইরে এসে দাঁড়ান। আসলে, আমাদের হতাশা, ভয়, লজ্জা, গ্লানির আড়ালে যে একধরণের সাহসও গোপন থাকে, তা স্পষ্ট ক'রে দেখাতে চেয়েছেন মৃণাল সেন। এবং সে দেখানো স্থির, শৈল্পিক, অব্যর্থ।

মৃণালের এই ছবিতে রাজনৈতিকতার তাগিদে মিটিং, মিছিল, পুলিস, মনুমেন্ট ইত্যাদি অনেকানেক অনুষঙ্গ, যা অক্লেশে ব্যবহৃত হতে হতে খুব বেশি ক্লিশে হ'য়ে গেছে, না থাকলেও এই ছবি মোটেই রাজনীতি বর্জিত নয়। তবে তা অনেকটাই দার্শনিকতা, শৈল্পিকতায় মণ্ডিত। বস্তুত, এখানে রাজনীতি থাকলেও রাজনৈতিক চেঁচামেচি নেই। এখানে তা আমাদের দেখে নিতে হয় নিজস্ব চৈতনা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। আর এ-কথা কে না জানে যে, প্রাত্যহিক দেখা থেকে শিল্পের দেখা, যা নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের মত, অনেক বেশি শক্তিশালী, অমোঘ। বস্তুত, শিল্পীর যেমন দায় থাকে জনগণকে এন্টারটেন করার, অনুরূপভাবে দর্শকেরও তো দায় থেকেই যায় শিল্পীকে বোঝার। শিল্প তো আর পোস্টার, শ্লোগানের বিকল্প নয়। তাই শ্লোগানই এখানে মৃণালের হাতে শিল্প।

এবং সেই শিল্পকে সামগ্রিকভাবে সার্থক ক'রে তোলার জন্য যাঁরা সর্বতোভাবে দায়ী, তাঁরা হ'লেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেন, শ্রীলা মজুমদার, উমানাথ ভট্টাচার্য, অরুণ মুখোপাধ্যায়, মমতাশংকর প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই কী অসাধারণ দৃপ্ততায়, অভিনয় হীন অভিনয়ে ছবির চরিত্রের রক্তমাংসের সাথে ওতপ্রোত হ'য়ে গেছেন! তাছাড়া সঙ্গীত (বি. ভি. কারন্থ), ক্যামেরা (কে. কে. মহাজন), চিত্রনাট্য (মৃণাল সেন), সম্পাদনা (গঙ্গাধর নস্কর)—সবকিছু মিলে ছবিটিকে সার্থকতার দিকে পেঁছে দিয়েছে। সর্বোপরি, ছবিটিতে রঙের ব্যবহার একটি দুর্লভ উপহার। একটি কালো জীবনের কাহিনী রঙের সহায়তায় আরো প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে।

তবে এসব সত্ত্বেও কয়েকটি ছোটখাটো দুর্বলতা আমাদের ঈষৎ পীড়িত করে। যেমন, ১। বুড়ি ঠাকুমাকে দিয়ে 'মেয়ে জন্ম বড় কষ্টের' ইত্যাদি শরৎচন্দ্রীয় সংলাপ একেবারেই প্রয়োজন হীন, বাহুল্য মনে হয়। আমরা তো সে কথা আগেই টের পেয়ে গেছি ঘটনার সহায়তায়—তাহ'লে এই অতিরিক্ত সংলাপ কেন? নাকি মৃণাল দর্শকের বুদ্ধির প্রতি ততোটা আস্থাশীল নন? ২। রঙের কাজ এত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও ছোট ছেলেটির সকালবেলার ব্যান্ডেজের লাল রক্ত রাতেও কেন একটুও কালো হয় না? ৩। স্কুটারে ওই অন্তবিহীনপথ কিসের জন্য এলাকার মধ্যে থানা কত যোজন দূরে থাকে? এটাতো গতি এবং উত্তেজনা বোঝাতে বাংলা ছবির পুরনো ফরমুলা। ৪। শেষ ট্রামের অতক্ষণ দাঁড়াবার প্রয়োজন কি শুধুমাত্র হৃষিকেশের উৎকণ্ঠা বেশি সময় নিয়ে দেখাবার কারণে? ৫। মৃণাল কি মীনুর ভূমিকাহীন অভিযোগের জন্যে খুব বেশি ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন? ৬। হাসপাতালে মৃতা মেয়েটি কার বোন সেই সংবাদে আমাদের প্রয়োজন কতটুকু? ঠিক যেমন প্রয়োজন হীন রাস্তায় জল-বিয়োগের দৃশ্যটি। মৃণাল কেন ভুলে যান যে, তিনি কোন কলকাতা-বিষয়ক ডকু-

[শেষাংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়]

নিশাকালের স্বরধ্বনি/শ্যামল সেন

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪, কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭। পাঁচ টাকা

সময়কে একজন কবি কীভাবে দেখেছেন তা বোঝা যায় জীবনকে তিনি কীভাবে দেখেছেন তা থেকে। শুধু ন্যুব্জ পৃষ্ঠ বৃদ্ধ সময় নয়—দ্বান্দিক গতিবেগে তীব্র সময়ই শ্যামল সেনের কবিতার অধিষ্ঠাতা আবেগ। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধরত জীবন, জীবনের কাছে পরাভূত মৃত্যু বা মৃত্যুতেও মহৎ জীবন—শ্যামল সেন ছুঁয়ে আছেন। কথাগুলো মনে পড়ছে কবির বর্তমান কাব্যগ্রন্থ "নিশাকালের স্বরধ্বনি" বইটি হাতে পেয়ে। আরো বলতে ইচ্ছে করছে, তার কারণ, "মরুবৃত্তে সময়ের ক্রোধ" এবং "নিশাকালের স্বরধ্বনি" এ দুয়ের মধ্যে সময়ের যে ফারাক—তাতে শ্যামলবাবুর বোধ, বিশ্বাস এবং তাঁর কবিত্বের উত্তরণকে উপলব্ধি করে।

"নিশাকালের বিরুদ্ধে প্রতিদিন যারা যুদ্ধরত" তাদেরই স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে এ কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকটা কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। কাজেই কাব্যগ্রন্থে নিয়মমাফিক কোন 'মুখবন্ধ' বা 'প্রস্তাবনা'-র তথাকথিত কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। সংকলনের আটত্রিশটা কবিতাই সে দায়িত্ব পালন করেছে। আমার মনে হয় কবি নিজেও তা সচেতনভাবে জানেন। আর জানেন বলেই "অকাল-বৈশাখীর কবিতা" দিয়ে যা শুরু হয়েছে, "এখন উদ্ধার সতর্ক শাসনে" তা শেষ হয়েছে। একটু ভুল বললাম, বিষয় ও আবেগগত ঐক্যের নির্দিষ্ট উপলব্ধিতে এসে থেমেছে—জীবনের টানে। কারণ—"স্মৃতি নয়, এখনও ভয়ংকর উজ্জ্বল সেইদিন,/চোখের উপর উঁচিয়ে রেখেছে তার ধারালো সঙিন" ['এখন উদ্ধার সতর্ক শাসনে']

কবিতাগুলো লেখা হয়েছে পঁচাত্তর থেকে আটাত্তর—এই চার বছরে। সত্তর দশকের শেষার্দ্ধ যাকে বলতে পারি। যখন শাসকগোষ্ঠীর হিংস্রনখর থাবায় দেশ বধ্যভূমিতে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও যে সময় বার্ধক্যের নয়, তারুণ্যের বিচক্ষণতার নয় উন্দাপনার, শীতল প্রজ্ঞার নয় আগ্নেয় উপলব্ধির—সেই সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবি বলেন, "লঘুরসে কলম ধরার বাসনা ছিলনা কোনদিন,/আজো নেই/এই সমৃদ্ধির আহ্লাদে দিনকানা সোনার দেশে/এই কালরাত্রিতে" [অকাল-বৈশাখীর কবিতা] কারণ সমাজ সচেতন পর্যবেক্ষক শ্যামলবাবু জানেন—"কী যেন দেবার কথা ছিল, এখনও আছে/হাজার দুয়ারী এই বুকের দরজা খুলে/বসে থাকি, বেলা অবেলায়..." ['বিষদাঁত']

বস্তুতঃ এই হাজার দুয়ারী বুক নিয়েই তিনি খুঁটে খুঁটে তুলেছেন সেই সময় সমাজ এবং সামাজিককতাকে। 'চতুরঙ্গ' কবিতায় তাই বিদ্রূপের বাঁশি বাজিয়েছেন 'আত্মপর', 'সৎসাহিত্য' কখন বা 'নীতিরাজ' বা 'অনুশাসন' কে লক্ষ্য করে এক এক রাগিনীতে। কিংবা যখন 'গরমিল' দেখেন "বিদ্যে বোঝাই মানুষগুলি/মাথায় নিয়ে পায়ের ধুলি/আস্থা রাখে আপোষে" অথবা "এইভাবে যুদ্ধের সাজসজ্জা ভাসিয়ে দিয়ে/সজ্জন ধার্মিক যিনি/শান্তিজলে গা ধুয়ে/পরকালের ধ্যানে বসেন" ['অস্ত্রের নিজস্ব খেলা'] এবং সমাজতান্ত্রিক 'প্রগতির তালিমারা দেশের বেহায়াপনায় কবির স্যাটায়ার যখন ফেটে পড়ে "লেনিন আপনি কোথা, কন্দুর/ডাকি শোকসভা—দ্বিতীয় মৃত্যুর"। তখন আর হাসি আসে না। সেই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্য-স্রোতের মাঝে দু'ফোঁটা সাদা অশ্রু চিক্‌চিক্ করে ওঠে। কবির ব্যথিত হৃদয় পাঠককে সচেতন করে। ধাক্কা মারে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

আসলে শ্যামলবাবু সমাজসচেতন পর্যবেক্ষক। চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও মনে, প্রকাশে ও প্রেরণায় তিনি দুর্গত জনের মুখপাত্র। তাই তিনি জানেন জীবন মানে ভেঙে পড়া নয়,—ভেঙে বেরিয়ে আসা। আর সেই জীবনের তাড়নাই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ। সেই প্রাণস্পন্দনকে ফুটিয়ে তুলতে কবিতা হ'ল তাঁর হাতিয়ার। এখানেই তিনি মানিক-সুকান্তের উত্তর-সূরী। জনগণের কবি—জনজাগরণের কবি। তাই তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে ওঠে—হাজার প্রতিকূলতার ভেতরেও। কারণ তাঁর তো জানা আছে "জীবনের দাম দিয়ে/রণবাদ্য বাজিয়ে/একে একে রাত সরে/দিন আসে ঘরে ঘরে" ['দিন আসে']। তাই সেই প্রয়োজনের আয়োজনটুকু করতেও তিনি পিছপা নন—"তিরিশের ক্রুদ্ধ যৌবন নিয়ে সাধ্য ছিল কমরেড/আপনার সাথী হবো/দামাল ছেলের মতো ছুটে যাবো মাঠ মিল খেতে/রোদ জলে হেমন্তের বীজ বুনে দিতে"। এইভাবে—অবশেষে কবির প্রত্যয় দৃঢ় কংক্রীটের রূপ ধারণ করেছে। হোক না তা নিশাকালে—হোক না তা যতই অন্ধতমস। কারণ—"নবযুগের পাণ্ডারা/বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে থাকুন আপনারা।/যারা জাগায়—জেগেই আছেন;/বুক চিতিয়ে লড়বে যারা/নবযুগের স্রষ্টা তারা,/চিরকালটা এগিয়ে থাকেন"।

শেষ করার আগে যে কথাগুলি বলা একান্ত প্রয়োজন তা হ'ল—শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে আরও একটু ভাবনা চিন্তা প্রয়োজন। হিরণ মিত্রের প্রচ্ছদে পদানত জীবনের মনচিত্র সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে। পাঁচ টাকা মূল্যকে স্মরণ রেখেই বলছি প্রত্যেক সৎ পাঠককেই গ্রন্থটি আকর্ষণ করবে। এবং শেষতঃ কবির কথাতেই বলতে হয়—"শান্তিকামী ছলনার জাতীয় আগস্ট থেকে/নভেম্বর কত দূর" ?

—দুর্গা ঘোষাল

চন্দন বসুর তুলিতে—

পরিবর্ত শক্তি উৎস

ভূ-তাপ শক্তি/জিওথার্মাল এনার্জি—বৈজ্ঞানিকদের মতে,—পৃথিবীর কেন্দ্রে একধরণের তরল আছে; ভূ-ত্বকের গভীরতা ৩২ কিলোমিটার, ৩২ কিলোমিটার নীচের এই তরল পদার্থের নাম ম্যাগ্‌মা। ম্যাগ্‌মা সবসময় প্রচণ্ড গরম অবস্থায় থাকে। ভূ-ত্বকের মধ্যে কোন জায়গায় ফাটল দেখা দিলে সেই ফাটল দিয়ে ম্যাগ্‌মা পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে আসে। পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রচণ্ড চাপ। এই চাপে ম্যাগ্‌মা যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলা হয় অগ্ন্যুৎপাত। আর যে সমস্ত জায়গায় অগ্ন্যুৎপাত হয় তাদের বলে আগ্নেয়গিরি। (প্রাকৃতিক নিয়মে ভূ-ত্বকের ফাটলের বহিঃর্মুখ সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলে থাকে বলেই বাংলায় অগ্ন্যুৎপাত কেন্দ্রের নাম আগ্নেয়গিরি) ভূ-ত্বকের ফাটল বন্ধ হয়ে গেলে অগ্ন্যুৎপাতও বন্ধ হয়ে যায়। ভূ-ত্বকের ৩২ কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে জল ছাড়াও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থাকে। মানুষ জল ও খনিজ পদার্থ ভূ-ত্বকের মধ্যে থেকে বিভিন্ন ভাবে আহরণ করে। আবার জলের ক্ষেত্রে কখনও কখনও দেখা যায় কোন কোন জায়গায় প্রাকৃতিকভাবেই জল ভূ-পৃষ্ঠের উপর চলে আসছে। স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসা জল সধারণতঃ গরম হয়; এবং জল বেরিয়ে আসার জায়গাগুলির নাম উষ্ণ-প্রস্রবণ. উষ্ণ প্রস্রবণ সৃষ্টির পিছনেও ম্যাগ্‌মার যথেষ্ট অবদান আছে. ভূ-ত্বকের কোন জায়গায় হয়তো জলের অবস্থান এত গভীরে যে ম্যাগ্‌মার তাপে জল আপনা থেকেই উত্তপ্ত হয়ে যায়। এখন যদি সেই জায়গায় ভূ-ত্বকে কোন ফাটল সৃষ্টি হয় তবে সেই ফাটল দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। ভূ-কেন্দ্রর প্রচণ্ড চাপই এই নির্গমনের কারণ। সৃষ্টি হয় উষ্ণ প্রস্রবণের।

ভূ-তাপ শক্তি অর্থাৎ জিওথার্মাল এনার্জির ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক এই নিয়মটি পালন করা হয়। ভূ-ত্বকে একটি নল বসিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ টিউব-ওয়েলের মতই। তফাৎ শুধু গভীরতায়। ভূ-ত্বকের গড় গভীরতা ৩২ কিলোমিটার হলেও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে তার চেয়ে অনেক গভীরতাতেই ম্যাগ্‌মা পাওয়া যায়। ভূ-তাত্ত্বিকেরা সেই জায়গাগুলি নির্ণয় করে দেন। ভূ-ত্বকে নল অনুপ্রবেশ করানোর অর্থ হল ভূ-ত্বকে একটি ফাটল সৃষ্টি করে ম্যাগ্‌মার কাছাকাছি পেঁছানো। ম্যাগ্‌মা এতই গরম যে ভূ-ত্বকের মধ্যে অনেকদূর পর্যন্ত তার তাপ পাওয়া যায়। প্রথমে যে নলটি বসানো হয় তার ঠিক কেন্দ্রে আরেকটি অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসের নল বসানো হয়। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো একই কেন্দ্র বরাবর দুটি নল ভূ-পৃষ্ঠে উলম্ব অবস্থায় বসানো হল। সাধারণতঃ এই নলগুলিকে ভূ-ত্বকে ২৭০০ মিটার পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করালেই চলে।

এখন বাইরের নলটি দিয়ে ঠাণ্ডা জল ভূ-কেন্দ্রের দিকে পাঠানো হয়। ভূ-কেন্দ্রের প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে সেই জল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। বাষ্পের সাধারণ গতি ঊর্ধ্বমুখী। প্রচণ্ড চাপে ঐ বাষ্প ভেতরের নল দিয়ে ভূ-ত্বকের বাইরে বেরিয়ে আসে। ভূ-ত্বকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এই বাষ্পের পরিমাণ সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪০০০০ থেকে ৮০০০০ পাউণ্ড। তবে ২ লক্ষ পাউণ্ড প্রতি ঘণ্টায় চাপ এইভাবে নির্গত বাষ্পর থেকে পাওয়া গেছে।

প্রচণ্ড চাপে নির্গত এই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘোরানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর টারবাইন ঘোরানো গেলে তার সংগে জেনারেটর সংযুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কঠিন কাজ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর সানফ্রান্সিসকোর উত্তরে জেয়ার্স নামক জায়গায় ১২ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে, যেখানে ভূ-তাপ শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। জেয়ার্সের জিওথার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের দ্বিতীয় ইউনিটের নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ১৪ মেগাওয়াট; এটি ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিট ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নং ইউনিটের প্রতিটির নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ৫৫ মেগাওয়াট।

শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয় ইটালী, নিউজিল্যাণ্ড, মেক্সিকো, জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আইসল্যাণ্ডেও বর্তমানে জিওথার্মাল এনার্জি অর্থাৎ ভূ-তাপ শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আগ্নেয়গিরি এলাকার বহু জায়গায় বাইরে থেকে জল আর অনুপ্রবেশ করাতে হয় না। ভূ-ত্বকের ভিতরের জল বেরোবার জায়গা পেয়ে প্রচণ্ড তাপের ফলে বাষ্পে পরিণত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

জোয়ার-ভাঁটা থেকে সংগৃহীত শক্তি/টাইডাল এনার্জি সমুদ্র ও নদীর জোয়ার-ভাঁটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এক বিশেষ ধরণের টারবাইন জোয়ার-ভাঁটা সমৃদ্ধ নদী অথবা সমুদ্রে সংস্থাপন করা হয়। সেই টারবাইনের সঙ্গে সংযুক্ত জেনারেটর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ফ্রান্স এই ধরণের বিদ্যুৎ উৎপাদনে পথিকৃৎ।

হাইড্রলিক গ্যাস—১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এই পদ্ধতিটি মন্টগোলফায়ার আবিষ্কার করেন। পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ। নদী বা সাগরের জলকে যান্ত্রিক উপায়ে নীচু জায়গা থেকে উপরে

[শেষাংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়]

বিভাগীয় সংবাদ

বীরভূম জেলা :

ইলামবাজার ব্লক যুব-করণ—গত ২২শে মার্চ থেকে চার দিন ব্যাপী যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ইলামবাজার ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় ইলামবাজার প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্লক যুব উৎসব পালিত হয়। মূল উৎসবের আগে ১৫ই মার্চ ১৯৮০ যুব উৎসবের অঙ্গ হিসাবে নানা ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের সঙ্গে পঃ বঃ সরকারের মৎস্য প্রদর্শনীর স্টল খোলা হয়েছিল। এছাড়া কুটীর শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বয়স্ক শিক্ষার প্রদর্শনীও ছিল। উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী। সকালে ১০ কি. মি. দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়ে উৎসব আরম্ভ হয়। ব্রতচারী নাচ, প্রদর্শনী কবাডি খেলা, নাটক ইত্যাদি সকাল থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত জনসমাবেশে মুখরিত হয়েছিল।

২৩শে মার্চ প্রদর্শনী ভলিবল খেলা, জিমন্যাসটিক প্রদর্শন, হাবু গান, সাপুড়ে গান, ফকির গান, ভাদু গান, সাঁওতাল নৃত্য, বাউল গান, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৪শে মার্চ মেয়েদের প্রদর্শনী কবাডি প্রতিযোগিতা, যোগাসন প্রদর্শন, গীতিনাট্য, তথ্য বিভাগ কর্তৃক ছায়াচিত্র প্রদর্শন। খ্যাতনামা শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তীর বিচিত্র নুষ্ঠান প্রায় ৪০০০ হাজার নরনারীকে আনন্দ দিয়েছে।

২৫শে মার্চ ছিল বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, যেমন খুশী সাজো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি। সন্ধ্যা ৮টায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। সভায় জেলার অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা পি. সি. সেন সভাপতি ও ভারতকুমার মদন ঘোষ প্রধান অতিথি ছিলেন। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানলাভকারীদের একটি মেডেল ও মানপত্র দেওয়া হয়। স্থানীয় বি. ডি. ও. নন্দদুলাল অধিকারী সভার উদ্বোধন করেন। ব্লক যুব আধিকারিক মদনমোহন সিংহ সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন। সভার শেষে "ভারতকুমার" মদন ঘোষ এবং "সারা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী" মলয় সরকার এবং বীরভূম জেলার কৃতী দেহগঠন সংস্থা কর্তৃক দেহ সৌষ্ঠের প্রদর্শনী এবং মুর্শিদাবাদের উমা দত্ত ও কাকলী মিত্র কর্তৃক যোগাসন ও একক জিমন্যাসটিক প্রদর্শন অনুষ্ঠান প্রায় দু হাজার নরনারীকে মুগ্ধ করে এবং যুব উৎসবের সমাপ্তি হয়।

যুব উৎসবের দিনগুলিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যুব উৎসব প্রাঙ্গণে আসেন—তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ব্রজমোহন মুখার্জি।

যুব উৎসবের মাধ্যমে প্রদর্শনীগুলি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা এনেছিল। প্রতিদিনকার জনসমাগম দেখে মনে হতো যেন মেলা বসেছে। মেলার মতই নাগরদোলা, দোকান ইত্যাদি সবের আয়োজন ছিল।

বাঁকুড়া জেলা :

ছাতনা ব্লক যুব-করণ—সম্প্রতি ছাতনা চণ্ডিদাস বিদ্যাপীঠে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ ছাতনা ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে ও ছাতনা ব্লক যুব উৎসব কমিটির ব্যবস্থাপনায় ব্লক পর্যায়ে এই প্রথম যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পাঁচদিন ব্যাপী এই যুব উৎসবের সূচনা হয় ১৯শে মার্চ '৮০ সকাল ৮টায় এবং পরিসমাপ্তি ঘটে ২৩শে মার্চ '৮০ সন্ধ্যা ৭টায়। যুব উৎসবের দিনগুলিতে ব্লকের ৩৩টি গ্রামীণ যুব সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় পাঁচশত প্রার্থী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, আবৃত্তি, বিতর্ক ও একাংক নাটক প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। খেলাধুলার অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত ছেলেদের বিভাগে ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ ও ৮০০ মিঃ দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, বর্শা নিক্ষেপ ও ডিসকাস থ্রো প্রতিযোগিতা এবং মেয়েদের বিভাগে ১০০ মিঃ দৌড়, লং জাম্প, শট পুট, ডিসকাস থ্রো ও বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতা উৎসবের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। ব্লকের ৮টি যুব নাট্যগোষ্ঠী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২৩শে মার্চ '৮০ যুব উৎসবের শেষ দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগী ও যুব নাট্যগোষ্ঠীকে ৮০টি পুরস্কার ও অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া হয়। স্থানীয় বিধানসভা সদস্য সুভাষ গোস্বামী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন। যুব উৎসব আয়োজনে ব্লকের যুব-ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। যুব উৎসবে প্রতিদিনই সমাজের বিভিন্ন স্তরের সহস্রাধিক দর্শকের সমাবেশ ঘটে। ব্লকের যুব ও ছাত্রসমাজের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গঠনমূলক মনোভাব বিকাশে ও প্রসারে যুব উৎসব আয়োজনের এই প্রয়াস সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়।

সোনামুখী ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ও রামপুর মিতালী সংঘের সহায়তায় ১৫ই মার্চ ১৯৮০, শনিবার সোনামুখী পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি গোবর্দ্ধন দাস মহাশয় রামপুর খেলার মাঠে এক অনাড়ম্বর অথচ ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্বোধনী সঙ্গীতের সাথেসাথে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে "যুব উৎসব '৮০"-এর উদ্বোধন করেন।

পতাকাত্তোলনের সময় সমস্ত প্রতিযোগী, উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বেদীর চারিদিকে বৃত্তাকারভাবে দাঁড়িয়ে এই পরিবেশের সমৃদ্ধি আরও বাড়িয়ে তোলেন।

পতাকাত্তোলনের পর নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী চারিটি বিভাগের [বালক "বড়", বালক "ছোট", বালিকা "বড়", বালিকা "ছোট"] "খেলাধুলা প্রতিযোগিতা" (হিট্) শুরু হয়। প্রতিযোগীর সংখ্যা আশাতীত হওয়ায় বিচারকমণ্ডলী প্রতিযোগীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে তাল রেখে ও

প্রয়োজনীয় বিরতির মাধ্যমে "খেলাধুলা-প্রতিযোগিতা" বিকাল ২-০০ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে থাকেন। আনন্দের বিষয় গ্রীষ্মের দাবদাহ সত্ত্বেও প্রতিযোগী ও বিচারকদের মধ্যে কোন রকম উৎসাহের ঘাটতি দেখা যায়নি।

বিকালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও যথারীতি নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী রামপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুরু হয়। সাংস্কৃতিক বিভাগেও প্রতিযোগীর সংখ্যা আশানুরূপ হওয়ায় বিচারক-মণ্ডলী রাত্রি ৭-৩০ মিনিটের আগে ঐদিনকার প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারেনি।

পরের দিন ১৬ই মার্চ '৮০ সকাল ৮-৩০ মিনিটে খেলাধুলার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আগের দিনের তুলনায় এদিন আরও বেশী উৎসাহী দর্শক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি খেলার মাঠে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেন। প্রতিটি খেলার চূড়ান্ত ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে জানানো হয়।

ঐদিন বিকালে (২-৩০) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে শুরু করা হয়। ঐদিনকার অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরই পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় সহযোগিতায় খুব অল্পসময়ের মধ্যেই আয়োজন সম্পূর্ণ হয়।

বাঁকুড়া জেলার জেলাপরিষদের সভাধিপতি রঞ্জিতকুমার মণ্ডল মহাশয় বিশেষ অসুবিধার জন্য এই পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরহিত্য করতে না পারায় পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি গোবর্দ্ধন দাস এই সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের অধ্যক্ষ রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পুরস্কার বিতরণের পর ব্লক যুব আধিকারিক; "যুব উৎসব" কমিটির সভাপতি, প্রধান অতিথি ও পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতি পর পর "যুব উৎসবের" উদ্দেশ্য সহ "যুব কল্যাণ" বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচী আলোচনার মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

এছাড়া তাঁরা বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে যুবকদের কি কি করণীয়, সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

ইন্দাস ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব করণের উদ্যোগে ও স্থানীয় যুব সংস্থা সমূহের সহযোগিতায় গত ২২শে মার্চ '৮০ ইন্দাস উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন ব্লক যুব আধিকারিক অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়। এর পর শুরু হয় নির্বাচিত অনুষ্ঠানসূচী। ক্রীড়ানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন বিভাগের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অ্যাথলেটিকসের অন্যান্য বিষয়সূচী। ঐদিন বিকেলে শুরু হয় সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুইটি বিভাগেই প্রভূত জনসমাগম হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ ক্রীড়ানুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু করা হয়। বিকেলে আরম্ভ হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত গীত, স্বরচিত কবিতা ও যেমন খুশী সাজা। রাত্রি ৭টা নাগাদ প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে। ঐদিন পুরস্কার বিতরণী সভারও আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পাঁচুগোপাল আদিত্য ও প্রধান অতিথি ছিলেন রামানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সলিল কুমার ঘোষ। প্রধান অতিথি মহাশয় পুরস্কার ও মানপত্র বিতরণ করেন। এ ছাড়া এই সভায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বি. ডি. ও. ও অন্যান্য বিশেষ অতিথিবর্গ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিশেষ সাহায্য করেন। পরিশেষে প্রধান অতিথি মহাশয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বি. ডি. ও. ইত্যাদি যুব উৎসবের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিযোগী ও সমবেত জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করেন।

নদীয়া জেলা ঃ

রানাঘাট-২—গত ৩১-৩-৮০ তারিখে দত্তপুলিয়া ইয়ং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশন -এর সহযোগিতায় রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ের পরিচালনায় দত্তপুলিয়া ফুটবল ময়দানে বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় এক মনোরম পরিবেশে দত্তপুলিয়া ইউনিয়ন একাডেমির প্রধান শিক্ষক কুমুদবন্ধু চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন নদীয়া জেলা শারীর শিক্ষা আধিকারক গোপেশ্বর মুখার্জী মহাশয়। বন্দুক থেকে গোলা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পায়রা উড়িয়ে পতাকা উত্তোলন এবং যোগদানকারী সংস্থাগুলি নিজ নিজ পতাকা সহ মাঠ পরিক্রমাই ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় বিষয়।

সকাল ৯টায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী খো খো ট্রেনিং শুরু হয় এবং ১১টায় শেষ হয়, ইতিমধ্যে সকাল ৯-৩০ মিঃ ১৫০০ মিঃ দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খো-খো ট্রেনিং শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে দুই ঘণ্টা ব্যাপী কবাডি ট্রেনিং শুরু হয়। এই দুই ট্রেনিংয়ে বিভিন্ন সংস্থার প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা নেয়। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন নদীয়া জেলা কবাডি প্রশিক্ষক শান্তিময় দত্ত এবং খো খো প্রশিক্ষক দিলীপ চক্রবর্তী। বেলা ১টায় ছোটদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং ২টায় বড়দের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ৩টায় লোক সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রভূত জনসমাগম হয়।

অনুষ্ঠানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল ব্যক্তিগত লাঠিখেলা প্রতিযোগিতা ও দলগত দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা। প্রায় ২০০০ হাজার দর্শক এই প্রতিযোগিতা উত্তেজনার মধ্যে উপভোগ করেন।

ঐদিনকার শেষ ও চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান লোকনৃত্যের প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন সবপেয়েছির আসরের ভাইবোনেদের লোকনৃত্যের প্রতিযোগিতা দর্শক মণ্ডলীর মন ভরিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা ৬টায় দত্তপুলিয়া ইউঃ একাডেমির প্রধান শিক্ষক মহাশয় তথা সভাপতি মহাশয় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করে ঐদিনের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ের প্রচেষ্টায় গত ২১-৫-৮০ থেকে ৪-৬-৮০ তারিখ পর্যন্ত দত্তপুলিয়া ইয়ং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এবং নদীয়া জেলার শরীর শিক্ষা এ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় ১৪ দিন ব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির দত্তপুলিয়া ইয়ং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে দত্তপুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অধীন গ্রামগুলি থেকে ৫৩ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য নাম লেখায়। ২১শে মে বিকাল ৪ ঘটিকার সময় নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা আধিকারিক মহাশয়ের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া

শুরু হয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য কাঞ্চন ব্যানার্জী এন. আই. এস. এবং শংকর ব্যানার্জী এন. আই. এস.। শিক্ষার্থীগণ বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে সব কিছু শেখানো এবং শেখা সম্ভব নয়। তথাপি শিক্ষার্থীবৃন্দ যে বেশ কিছু কলাকৌশল রপ্ত করেছেন তার প্রমাণ মেলে ৪-৬-৮০ তারিখে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে। সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ৪ ঘটিকায়। উক্ত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রানাঘাট ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সভাপতি সত্যভূষণ চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা আধিকারিক গোপেশ্বর মুখার্জী। সভাপতি ও প্রধান অতিথিদের সামনে শিক্ষার্থীগণ তাঁদের শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রদর্শনী দেখান এবং যে শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছেন ফুটবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তা প্রমাণ করেন। ফলে অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত উপস্থিত প্রায় ২০০০ হাজার দর্শক প্রতিযোগিতামূলক খেলাটি উপভোগ করেন। পরিশেষে শিক্ষার্থীদের পুষ্প স্তবক সহ মানপত্র প্রদান করা হয়।

কৃষ্ণনগর-১নং ব্লক তথ্য কেন্দ্র উদ্বোধন—স্থানীয় যুব সম্প্রদায়ের জন্য গত ১২ই জুন '৮০ কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুব-করণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অর্থানুকুল্যে 'ব্লক তথ্য কেন্দ্রের' উদ্বোধন করা হয়।

এই কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন সুবল মার্ডি, মহকুমা শাসক, সদর (দক্ষিণ) এবং কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুনীলকুমার ঘোষ মহাশয় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অনেকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধান সভার সদস্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জেলা শরীর সংগঠক বিনয়ভূষণ দে, সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক অতুল চন্দ্র টিকাদার, সমাজ-শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক মণি চক্রবর্তী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে যুব সমাজকে "তথ্য কেন্দ্রের" সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগের সাদর আহ্বান জানান।

এই তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, স্ব-নির্ভর কর্ম প্রকল্প, ক্রীড়া ও বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্যাদি, ভ্রমণ সংক্রান্ত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য-পুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সাম্প্রতিক তথ্যাদি সংগ্রহের সুযোগ সুবিধা লাভ করবে স্থানীয় যুব সম্প্রদায়।

বর্ধমান জেলা :

মেমারী ব্লক যুব-করণ—১৯৮০ সাল ২২শে মার্চ মেমারী ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে মেমারী সন্তোষ মঞ্চে এক বিরাট যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধান সভা সদস্য বিনয়কৃষ্ণ কোঙার। এই অনুষ্ঠান চলে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত। যুব উৎসবের খেলাধুলার আয়োজন করা হয় স্থানীয় মেমারী ভিঃ এমঃ হাইস্কুল হোটপুকুর ময়দানে। নাটক এবং প্রদর্শনী হয় মেমারী সন্তোষ মঞ্চে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধান সভা সদস্য বিনয়কৃষ্ণ কোঙার পচা গলা সমাজ ব্যবস্থা ও ক্ষয়িষ্ণু যৌবনের উত্তরণের ক্ষেত্রে নতুন পথের আলোক বর্তিকা নিয়ে বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করেন—যত দুর্যোগই আসুক তা কাটবেই। এটা ইতিহাসের নিয়ম; তিনি বলেন, অমৃতের সন্তান মানুষ—সেই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল হচ্ছে যৌবন।

অত্যন্ত রুচিশীল এই প্রদর্শনীটিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদর্শনী, ১নং ব্লক যুব-করণে সীবন শিক্ষা কেন্দ্র, পঞ্চগ্রাম সমবায় কুটির শিল্প, আমাদপুর স্কুলের ছাত্রদের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর স্টলগুলি। এই উৎসবে ২১টি বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন গড়ে ৫৫ জন প্রতিযোগী। প্রতিযোগীদের মধ্যে ১১২ জন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কার এবং প্রসংশা পত্র দেওয়া হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাপতি মেহবুব জাহেদী।

মালদহ জেলা :

পুরাতন মালদা ব্লক যুব-করণ—গত ২৬শে জুলাই, ১৯৮০ মঙ্গলবাড়ী প্রাইমারী স্কুলে ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে দুটি বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়েছিল। (১) মেয়েদের সীকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (২) ছেলেদের পাম্পসেট মেরামত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তারমধ্যে ছেলেদের পাম্পসেট মেরামত প্রশিক্ষণে ৫০ জন সফল ছাত্রকে এবং মেয়েদের সীবন প্রশিক্ষণে ২৬ জন সফল ছাত্রীকে প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় যুব নেতা অজয় খাঁ। প্রধান অতিথি হিসাবে বিধান সভার সদস্য শুভেন্দু চৌধুরী বলেন, এই বৃত্তিমুখী শিক্ষার ফলে যদি কিছু ছেলে-মেয়ে সরকারী চাকুরীর মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই কিছু রোজগারের জন্য সচেষ্ট হন তবেই এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আয়োজন সার্থক হয়ে উঠবে। ফলে সরকার আরও অধিক সংখ্যায় এই বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করতে উৎসাহী হবেন। সবশেষে তিনি প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন।

পুরাতন মালদা ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে বৃত্তিমুখী পাম্পসেট মেরামত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষণরত ছাত্ররা।

পাঠকের ভাবনা

খেলাধুলা ও দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা বিষয়ে দু'টি নিয়মিত বিভাগ

আপনার পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী পাঠ করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। কিন্তু নিয়মিত পাঠক হিসাবে এই পত্রিকাকে আরও সুন্দর করবার জন্য আমি কয়েকটি কথা বিনীতভাবে জানাতে চাই।

প্রথমত বলতে পারি প্রত্যেক পত্রিকার কিছু নিয়মিত বিভাগ আছে। এই পত্রিকার ক্ষেত্রে সেটা না করা গেলেও যেটা করা যেতে পারে সেটা হল খেলাধুলা বিভাগ। এই বিভাগের মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে ব্যাডমিন্টন, যথা প্রকাশ পাড়ুকোন সম্পর্কে বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ খেলা সম্বন্ধে, বা আন্তর্জাতিক কোন ফুটবল, হকি, ক্রিকেট বা অ্যাথলেটিক খেলোয়াড় সম্পর্কে লেখা প্রকাশ করা যেতে পারে। তাহলে পত্রিকাটির যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, তেমনি যুবকদের কাছে পত্রিকাটি সম্পর্কে আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে। তবে খেলাধুলা সম্পর্কে কি প্রকাশ করা যেতে পারে না পারে সেটা সম্পাদক মহাশয়ের বিবেচ্য বিষয়। আমার কথা হল খেলাধুলা বিভাগের মাধ্যমে খেলাধুলা সম্পর্কে নিয়মিত কিছু এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করুন অর্থাৎ খেলাধুলাকে এই পত্রিকার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করুন।

দ্বিতীয়ত আর একটি কথা বলতে চাই সেটা হল "দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক" সমস্যাবলী সম্পর্কে নিয়মিত কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করা যেটা এই পত্রিকা এড়িয়ে গেছে। যেমন ধরুন আসাম সমস্যা সম্পর্কে এ পর্যন্ত মাত্র একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন ফেব্রুয়ারী '৮০ সংখ্যায় (আসামের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে—অনিল বিশ্বাস)। যাই হোক আসাম সম্পর্কে আরো কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করুন কারণ আসাম সমস্যা জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং এ সমস্যা সম্পর্কে যুবকদের ভালভাবে জানানো দরকার। সেই রকম আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কেও কিছু লেখা প্রকাশ করুন।

সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যদি সম্ভব হয় তবে দু'টি বিভাগকে নিয়মিত করুন। আমার মনে হয় যুবমানস পত্রিকাটি তবেই যুব মানসে গভীরভাবে রেখাপাত করবে।

—অমরেন্দ্রনাথ পাল
সুভাষনগর, বনগ্রাম
২৪-পরগনা

লিটিল ম্যাগাজিন ও ছোট গল্প

॥ ১ ॥

আমি একজন মাসিক যুবমানসের পাঠক। মে-সংখ্যা পড়লাম। ঋতীশ চক্রবর্তীর "লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলন: এক পরম সত্য", আলোচনাটি অত্যন্ত প্রশংসার অধিকার রাখে। লেখক-লেখিকার কাছে আমার আবেদন লিটিল ম্যাগাজিনের জীবন ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখা যুবমানসের পাতায় তুলে ধরুন। এ ছাড়া মাননীয় সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে আমার আবেদন এই বলিষ্ঠ পত্রিকাতে দু'টি করে গল্পের স্থান দেওয়া হোক।

গৌরাঙ্গ দাশ
গ্রাঃ মহিষা, ডাঃ কুমড়া কাশীপুর
২৪ পরগনা

॥ ২ ॥

গ্রাহক হওয়ার পর প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়েই আগাগোড়া পড়ে ফেললাম। "লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলন—এক বাস্তব সত্য" লেখাটি চমৎকার। তবে লেখক একটা সমস্যার কথা তুলে ধরেননি। সেটা হলো বিক্রি করার অসুবিধা এবং পত্রিকার প্রচার বা উদ্দেশ্যর কথা সাধারণ লোককে জানানো। কারণ "লিটিল ম্যাগাজিন" পড়বার মত পাঠক সমাজ এখনও পশ্চিমবঙ্গে তৈরী হয়নি। খুব কম লোককে দেখেছি যাঁরা খোঁজ খবর করে লিটিল ম্যাগাজিন পড়তে চান। অথচ লিটিল ম্যাগাজিন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ। যুবমানস পত্রিকার উন্নতি হবে আশা রাখি।

দেবাশীষ বর্ধন
৫৮ মিলন পার্ক, গড়িয়া
কলকাতা-৮০

অলচিকি হরফ—সরকারী স্বীকৃতি

আমি আপনার পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। বামফ্রন্ট সরকার এই পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তরুণ যুব-সমাজের "স্বপ্নকে" বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আরও বলতে হচ্ছে যে, মাননীয় বামফ্রন্ট সরকার সাঁওতালী ভাষার হরফ "অলচিকি"-কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেন, যা পূর্বের সরকার কল্পনাও করেননি। পশ্চিমবাংলার ২৫ লক্ষ সাঁওতাল ভাই-বোনদের ঐতিহ্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিলেন বামফ্রন্ট সরকার। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে পশ্চিম-বাংলার বামফ্রন্ট সরকার সাঁওতালী ভাষার হরফকে স্বীকৃতি দিলেন। এজন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আশা করি ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য তাঁরা আরও অনেক

কাজ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "যুবমানস" পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা করি।

তপনকুমার উপাধ্যায়
সম্পাদক, বসিরান মিলন সংঘ
রায়গঞ্জ/পঃ দিনাজপুর

সুস্থ জীবনরুচী ও প্রকাশনা

অবহেলিত যুব সমাজকে সুস্থ ও গতিশীল সাংস্কৃতিক এবং তাঁদের সাহিত্য চেতনাকে পরিস্ফুটনের জন্য, আপনারা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ 'যুব মানস' পত্রিকার প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছেন। এবং গ্রাম বাংলার অবহেলিত প্রতিভা সংগ্রহে মনযোগ দিয়েছেন—এজন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবু বলছি 'যুব মানস' পূর্ণাংগ নয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যখন এর প্রকাশনা তখন সাহিত্যের সব কটি শাখার অর্থাৎ অঞ্চলভিত্তিক লোক সংস্কৃতি, রম্যরচনা, ছড়া, ধারাবাহিক জীবনমুখী উপন্যাস ইত্যাদির সংযোজন থাকা ভালো। অবশ্য কট্টর পাঠক হিসাবে এটা আমার অনুরোধ। সবশ্রেণীর পাঠকের পাঠস্পৃহা যাতে মিটে যায় তার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলছি। সেই সংগে অনুরোধ করছি মাসিক 'যুবমানস' যাতে ঠিক সময়ে অর্থাৎ মাসে মাসে প্রকাশিত হয় তার জন্য উদ্যোগ নিতে। দেরীতে পত্রিকা (যুবমানস) হাতে পেলে উৎসাহে ভাটা পড়তে পারে। শিথিলতাও আসে। জানিনা মফস্বলের একজন সাধারণ পাঠকের হৃদয়াকৃতি 'যুবমানসে' ছায়া ফেলবে কিনা? ছায়া ফেলুক এটা সর্বান্তকরণে চাই।

এ. কালাম
কান্দুরী এড়োয়ালী
মুর্শিদাবাদ

ভাই-এর ভাবনা

লেখক, সাহিত্যিক বা কবি কোনো ভাবেই আমি সাহিত্য জগৎ বা ম্যাগাজিন জগতে পরিচিত নই। বলা বাহুল্য অত্যন্ত আশার সংগে আমার এই রচনাটি পাঠালাম। প্রথম কোনো পত্রিকায় রচনা পাঠাবার এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার সম্মুখীন হতে গিয়ে দেখলাম একাদশ শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে আমার উৎসাহ হয়ত কিঞ্চিৎ অধিক। প্রথমেই এত বড় এক পত্রিকার দিকে হাত বাড়ানো। আমার মন দুঃসাহসিক বললেও বিবেক এক অদম্য আকর্ষণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু আশা করি নয় নিঃসন্দেহে বলতে পারি আপনাদের হাত-ও এই অখ্যাত কবির দিকে এগিয়ে আসবে। উৎসাহের মাত্রা, আকর্ষণের প্রভাব তাতে নিশ্চয়ই আরো বেড়ে যাবে এবং অসংকোচে বলতে পারি দুঃসাহসিকতার হীনতা ক্রমশঃ কমে যেতে বাধ্য হবে। অতএব শুধুমাত্র আপনাদের মিলিত হাত ধরার জন্য আমার হাত আগেই বাড়িয়ে অপেক্ষায় রইলাম। নিশ্চই বিফল হবো না। অন্ততঃ এই কৈশোর উন্দামে মত্ত যুবক মন তাই বলছে।

আপনাদের এক ছোট্ট কবিবন্ধু বা ভাই—

প্রবীর কুমার দাস
পি-১১, ব্যাঙ্ক গার্ডেনস্
পোঃ বাঁশদ্রোণী, ২৪ পরগনা

[শিল্প-সংস্কৃতি : ২৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মেন্টারী তুলছেন না! এমনকি বাড়িওয়ালার চরিত্র বোঝাতেও তা ততো প্রয়োজনীয় নয়। অবশ্য দৃশ্য দুটি অতিনাটকীয়তা বর্জিত হওয়ায় শৈল্পিক। তবে, এইসব অনাবশ্যক ছিদ্রান্বেষণ ক'রেও বলতে হয়, শেষ পর্যন্ত মৃণাল যে চীনুর দেরী ক'রে বাড়ি ফেরার কারণ দর্শাতে তেলেভাজা প্রিয় দর্শকের দাবী মেটাতে একটি গোল গল্পের অবতারণা করেন নি, সেজন্যে তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। এবং এভাবেই, এইসব হৃদয় ও মূধিবের ধারা সহ মৃণাল সেন তাঁর সাম্প্রতিক ছবিটি তৈরী করেছেন যা অনায়াসে তাঁর এতদ্‌কালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবি ব'লে বিবেচিত হবে, টালিগঞ্জের কাছে তো বটেই।

—গৌতম ঘোষদস্তিদার

[বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা : ৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তোলা হয়। এবারে উপরের জলকে নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে টারবাইনের উপর দিয়ে চালিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে তার সাথে সংযুক্ত জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, পদ্ধতিটির উৎপাদনক্ষমতা খুব কম।

গোবর-গ্যাস প্ল্যান্ট/বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট

গরুমহিষ প্রভৃতি গবাদি পশুর মলকে কাজে লাগিয়ে তার থেকে গ্যাস তৈরী করে আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরেই রান্নার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারে প্রচলন হয়েছে। তবে ব্যবস্থাটি কুসংস্কারের প্রভাবে জনপ্রিয় হয় নি। গোবর-গ্যাস থেকে বিদ্যুৎও উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু কুসংস্কার এই বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রধান অন্তরায়। এ ছাড়া দারিদ্র্য জনিত কারণে গোবর-গ্যাস প্ল্যান্ট চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় গবাদি পশুর মালিকের সংখ্যাও কম। অতএব গোবর গ্যাস পরিবর্ত শক্তির উৎস হয়েও কাজে আসছে না, গোবর গ্যাসের মত একই পদ্ধতিতে মানুষের মল থেকেও গ্যাস উৎপন্ন করে কাজে লাগানো যায়। এই ধরণের প্ল্যান্টের নাম বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট।

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য বহু ধরণের শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা বর্তমানে গবেষণাধীন অবস্থায় আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা সডাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০ %
১৫০০-এর উর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০ %
৫০০০-এর উর্ধ্বে	৪০ %

১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান।

বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

লাভপুর ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে টেলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণরত।

রাইনা ব্লক যুব উৎসবে তরুণ সংঘ মঞ্চস্থ নাটক 'কাক দ্বীপের এক মা'।

গাইঘাটা ব্লক যুব উৎসবে ছবি আঁকতে ব্যস্ত শিশু শিল্পীরা

হাড়োয়া ব্লক যুব উৎসবে আদিবাসী সংঘের আদিবাসী বালক বালিকাদের নাচের দৃশ্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
অগাস্ট, '৮০

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : অশোক মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—কান্তি বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য—পঁচিশ পয়সা

সম্পাদকীয়

প্রায় দুই শত বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি যেদিনে মুছিয়া গেল, সেদিন ভারতের অফিস আদালত হইতে 'ইউ-নিয়ন জ্যাক'কে বিদায় করিয়া ত্রি-বর্ণ পতাকা স্থান দখল করিল। দেশের বুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যেদিন আনুষ্ঠানিক অবসান হইল সেই ১৫ই আগস্ট প্রত্যেক ভারত-বাসীর নিকট যে একান্ত পবিত্র—একথা নূতন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

এই স্বাধীনতার জন্য কত ভারতীয় সিপাই-সান্ত্রী ইংরেজের তোপের মুখে বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কত সন্ন্যাসী ত্রিশূলে তুলিয়া বিদ্রোহের আহ্বান জানাইয়াছেন, কত ছাত্র স্কুল-কলেজের মায়া কাটাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, কত বিদ্রোহী যৌবন অতুলনীয় আত্ম-ত্যাগের সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অসংখ্য শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত স্বাধীনতার যুদ্ধে কতভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া দেশের স্বাধীনতা পাওয়ার পথকে আরও কত সহজ করিয়া দিয়াছেন—তাহার একটু ক্ষুদ্র অংশও মনে পড়িলে গর্বে কাহার না বুকখানি ফুলিয়া ওঠে?

দেশ বলিতে তাঁহারা কোন অবাস্তব দেবী মূর্তির কল্পনা করেন নাই, তাঁহারা দেশের মানুষকেই বুঝিয়াছিলেন। স্বভাবতই স্বাধীনতা দিবসে সমীক্ষা করা হয় স্বাধীনতার স্বাদ মানুষের ভাগ্যে কতটুকু জুটিয়াছে। 'ক্ষুধার রাজ্য' হইতে কি মানুষ মুক্তি পাইয়াছে? যুবকের বেকারত্বের যন্ত্রণার জ্বালার কি কিছুটা অন্তত উপশম হইয়াছে? নিরক্ষরতার আঁধার কি দেশ হইতে অপসারিত হইয়াছে? গ্রামে জোতদারী-মহাজনী শোষণের বজ্রা কি আলগা হইয়াছে? মালিক-মজুতদারের অত্যাচার কি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, আঞ্চলিকতা, অস্পৃশ্যতার মত মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ কি হ্রাস পাইয়াছে? বিদেশী পুঁজির অক্টোপাস্ হইতে কি জাতীয় অর্থনীতি মুক্তি পাইয়াছে? শ্রদ্ধার সাথে অগণিত স্বাধীনতা যোদ্ধার স্মৃতি তর্পণ যেমন আজকের দিনে প্রয়োজন—সেই সঙ্গে জনজীবনে এই ধরণের প্রশ্নগুলির মীমাংসা এই ৩৩ বৎসরে কতখানি হইয়াছে তাহাও গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। উপলব্ধি করিতে হইবে এই জাতীয় সমস্যার যদি কোন সঙ্গত সমাধান না হয় মানুষের নিকট স্বাধীনতার তাৎপর্য, তাহার মর্ম একান্ত-ভাবেই ফিকে হইয়া যাইতে পারে।

একই সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হইবে যেন দেশের কোন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রতি-ক্রিয়াশীল ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি দেশের ঐক্য এবং সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া স্বাধীনতার মূল শিকড়কে আলগা করিয়া দিতে না পারে।

ইহা তো ধ্রুব সত্য যে আমাদের এই বিশাল দেশে নানা বর্ণের, নানা ভাষার, নানা কৃষ্টির, নানা ধর্মের মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছেন। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পরিবেশ হইতে শুরু করিয়া আচার-ব্যবহারের মধ্যে পর্যন্ত বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে আমরা একই দেশের অধিবাসী। চিন্তা-চেতনায় আমরা এক। একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, বিবিধের মধ্যে মিলন—ইহাই তো আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এই সত্যকে যেমন আমাদের প্রত্যেকের সঠিক ভাবে বুঝিতে হইবে, ততোধিক বলিষ্ঠ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে দেশের কর্ণধারদের।

এই ৬৫ কোটি মানুষের দেশের শাসন ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল তাহাদের প্রায় তিন যুগের শাসন কালে জাতীয় সংহতির সূতা কি শক্তিশালী হইল না দুর্বল হইল, তাহা ভাবিয়া দেখিব না? অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা যতটুকু বাড়িয়াছে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে তাহার সামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টন কি আদৌ হইয়াছে? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্যগুলির মধ্যে যুক্তি-নির্ভর সম্পদ বিতরণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে সুষম অর্থ বিনিয়োগ, রাজ্যের মানুষের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটাইতে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলিকে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও ক্ষমতা প্রদান—এই সবই তো বিভিন্ন এলাকার বিকাশ সাধনে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়গুলি কি সুবিচার পাইয়াছে?

জাতীয় ভাষা, মূল সাংস্কৃতিক ধারার সহিত লয় রাখিয়া আঞ্চলিক প্রধান ভাষাগুলি ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি সমূহ উন্নতির কোন সঙ্গতিপূর্ণ সুযোগ কি পাইয়াছে? পাইলে ইহার আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি হইতে পারিত কি না সে বিতর্কের মধ্যে না যাইয়াও কসম করিয়া বলা যাইতে পারে বর্তমান বেদনাদায়ক ও নিষ্ঠুর বৈষম্য জাতীয় সংহতিকে এই ভাবে চ্যালেঞ্জ জানাইতে পারিত না। এই বৈষম্যের গর্ভেই জন্ম লাভ করে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ। তাহা হইতে সৃষ্টি হয় আঞ্চলিকতাবাদ। ইহারই প্রকাশ ঘটে 'ভূমি পুত্রদের জন্য সংরক্ষিত সুযোগ' এর দাবীতে। আর এই ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী দাবীকে কার্যকরী করিবার জন্য তৈরী হয় শিবসেনা, লাচিত সেনা, আমরা বাঙ্গালী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রমুখ সংগঠনগুলি। তৈরী হয় 'আসু'র মত বিবেক বর্জিত বাহিনী।

ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দর্পণে মানুষ যখন এই সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রকৃত পথের সন্ধান পায়, কাতারে কাতারে মানুষ সমবেত হইতে থাকে সেই পথের ধারে—তখনই ভীত-শঙ্কিত কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠী বহুদিন ধরিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চিত হওয়া মানুষের ক্ষোভকে বিপথে চালিত করিবার জন্য মানুষকে বিশেষ সংবেদনশীল যুব-ছাত্র সমাজকে সর্বনাশা পথে ঠেলিয়া দিতে উদ্যত হয়। ত্রিপুরা-উপজাতি যুব সমিতি, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর খণ্ড, গোর্খা খণ্ড ও ঝাড়খণ্ডওয়ালারা সেই বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের শিকার। আর এই সুযোগ বুঝিয়া ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাহার নিজস্ব এজেন্টদের সাহায্যে তাহার খল উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইয়াছে। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনা সমূহ ইহারই জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার আহ্বানে দেশপ্রেমিক মানুষ বিশেষ করিয়া যুব ও ছাত্র সমাজের যোগ্যতার সহিত সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এত গভীরভাবে দেখা দিয়াছে। বহু কষ্টার্জিত ও লক্ষ শহীদের রক্তাক্ত পথে আগত এই স্বাধীনতা ও জাতীয় সংহতিকে যে কোন মূল্যে রক্ষা ও শক্তিশালী করিতে হইবে। দেশের অখণ্ড সত্তার মধ্যেই জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানের বৈজ্ঞানিক পথে সমস্ত মানুষকে সমবেত করিতে হইবে। সেই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়াই এ বৎসরের স্বাধীনতা দিবস পালিত হউক যুব মনের নিকট এই আমাদের আবেদন।

এবারের স্বাধীনতা দিবস

প্রমোদ দাশগুপ্ত
সম্পাদক, সি. পি. আই (এম), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

ভারত স্বাধীন হবার তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলো। এবারে দেশের জনগণ চৌত্রিশতম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন। বর্তমান বছরের একটা বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। এই বছরেই পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের চারটি ঐতিহাসিক ঘটনার পঞ্চাশতম বার্ষিকী। এই চারটি ঘটনা হলোঃ গাড়োয়াল বিদ্রোহ, চট্টগ্রাম বিদ্রোহ, সোলাপুর বিদ্রোহ এবং গাড়োয়ালী বিদ্রোহ। এই সমস্ত বিদ্রোহ ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। এই সমস্ত বিদ্রোহ ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জঙ্গীরূপ—এই সমস্ত বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্বাক্ষর বহন করছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে নিছক অহিংস পথে জয়যুক্ত হয় নি তারই স্বাক্ষর বহন করছে এই সমস্ত বিদ্রোহ। এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের স্মরণ করতে হবে সেই সমস্ত অমর শহীদকে যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়নের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের এই কঠোর আত্মত্যাগ, কারা নির্যাতন, কষ্টস্বীকার ভারতের দেশপ্রেমিক জনগণ কোন দিন ভুলতে পারেন না। তাঁদের এই আত্মত্যাগের কাহিনী প্রতি মুহূর্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলো। এই তেত্রিশ বছরের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব এই সময়ে একদিকে যেমন একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের শোষণ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের জনগণ বিরাট বিরাট গণ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের শোষণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হবার পর এমন একটি বছর অতিক্রান্ত হয় নি, যে বছরে ঘাটতি বাজেট পেশ হয় নি বা জনগণের উপর নতুন করে করের বোঝা চাপে নি। ঘাটতি বাজেট পেশ এবং করের বোঝা বৃদ্ধি ধনবাদী শাসন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি। এই ব্যবস্থার ফলে প্রতি বছর ঘটছে মুদ্রাস্ফীতি। বিগত তেত্রিশ বছরের হিসেব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে টাকার মূল্য কমতে কমতে বর্তমানে ২৭ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। এত অল্প সময়ে এই ধরনের অর্থের মূল্যহ্রাস আর কোন দেশে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এই অর্থনৈতিক সংকট ক্রমবর্ধমান। আর অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেই এই সংকট প্রসারিত। সম্প্রতি লোকসভায় প্রদত্ত বিবরণ থেকে দেখা যায় ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা হলো দেড় কোটি। যে সমস্ত যুবক-যুবতী কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লেখান তাঁরা সকলেই শিক্ষিত যুবক-যুবতী। যাঁরা শিক্ষিত নন, তাঁদের এক বড় অংশই বেকার। রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের চাইতে অন্তত দশগুণ হবে অরেজিস্ট্রিকৃত বেকার। এ থেকেই দেশের অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতা বোঝা যায়। এই অর্থনৈতিক সংকট আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যে, দেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ নির্ভর করছে বিদেশী ঋণের উপর। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্য থেকে জানা যায়, দেশের বর্তমান বিদেশী ঋণের পরিমাণ হলো তের হাজার কোটি টাকা। ক্রমবর্ধমান এই অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন ক্ষমতা বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর নেই, থাকতে পারে না।

ইতিহাসের নিয়ম হলো, ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি শাসক ও শোষক শ্রেণী যখন জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে ব্যর্থ হয়, যখন বিভিন্ন সমস্যা বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে এবং সংকট ও সমস্যার গভীরতা বাড়তে থাকে তখন বুর্জোয়ারা এই সংকটের সমস্ত বোঝাই জনগণের উপর

চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে। ইতিহাসের আরো শিক্ষা হলো, ধনবাদী শাসকেরা একটা স্তরে মুখে জনকল্যাণের বুলি আওড়ালেও প্রকৃতপক্ষে তাদের একটিই লক্ষ্য থাকে—শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীশাসন বজায় রাখা। স্বাধীন ভারতের তেত্রিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব ভারতের বুর্জোয়া শাসকেরা এই পথ ধরেই চলেছে।

অর্থনৈতিক সংকট যত বৃদ্ধি পাবে শাসকশ্রেণী নিজেদের শ্রেণীশাসন ও শোষণ বজায় রাখার জন্য তত বেশি বেশি করে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। ভারতের বুর্জোয়া-জমিদার শাসন ব্যবস্থায় একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের দাবি ছিল গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান। দাবি ছিলঃ বাক স্বাধীনতা, সংবাদপ্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের সংবিধানে যে সমস্ত মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ হয় সেগুলি এই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে উত্থাপিত দাবিসমূহেরই প্রতিফলন। তবে এটাও বাস্তব সত্য যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে যে সমস্ত দাবি উত্থাপিত হয় তার সবটার স্বীকৃতি ভারতের সংবিধানে নেই। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের অধিকার সমূহ যখন সংবিধান প্রণীত হয় তখনই উপেক্ষা করা হয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। সংবিধান রচনার সময় যে সমস্ত অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হয় তার অনেকগুলিই এই তেত্রিশ বছরে কেড়ে নেওয়া হয়। মাত্র তেত্রিশ বছরে ভারতের সংবিধানের ৪৫ বার সংশোধন করা হয়। এই ধরনের সংবিধানের ব্যাপক সংশোধন আর কোন দেশে হয় নি। আর অধিকাংশ সংশোধনই গেছে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহের বিরুদ্ধে, নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে। এই সমস্ত সংশোধনের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়—কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়।

এবারে ভারতের জনগণ যখন চৌত্রিশতম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের বুঝতে হবে এবং ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। কেন্দ্রে সাত মাস হলো, ইন্দিরা কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়েছে। এই সাত মাসে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তাতে স্বৈরতন্ত্রের বিপদ ঘনীভূত হয়েছে। ৯টি নির্বাচিত রাজ্য বিধানসভা বাতিল, প্রেস কমিশন বাতিল, পি. ডি. আইন প্রবর্তন, ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে অর্ডিন্যান্স জারি ইত্যাদি ঘটনা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপজ্জনক ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশিষ্ট আইনজীবী ভি. এস. তারকুণ্ডে বলেছেনঃ বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি চলছে তা অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার প্রাক্-মুহূর্তের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর দেশের অর্থনৈতিক সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। আর এই সংকট যত বেশি বেশি করে বৃদ্ধি পাবে সরকারও তত বেশি বেশি করে স্বৈরতন্ত্রের পথে পা বাড়াবে। আজ দেশের জনগণের সামনে এই বিপদ নতুন করে দেখা দিয়েছে, এই বিপদ ক্রমবর্ধমান।

একদিকে যেমন স্বৈরতন্ত্রের বিপদ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে ভারতের জনগণের সামনে আর একটি বিপদ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিপদ হলো বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপদ, ভারতকে টুকরো টুকরো করার চক্রান্ত। প্রায় এক বছর হতে চললো আসামে "বিদেশী বিতাড়নে"র নামে চলছে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এই তথাকথিত আন্দোলনের নামে সেখানে সহস্রাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন; আহত হয়েছেন কয়েকশ' নরনারী। কয়েক কোটি টাকার বিষয় সম্পত্তি, ধন সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। বহু মানুষকে আসাম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। আসাম সমস্যা সমাধানের জন্য দু'দুবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখনও কার্যকর কিছুই হয় নি।

আসামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পিছনে যে বিদেশী শক্তি অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা রয়েছে তা আজ সুপ্রমাণিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সংগঠিত করে আজ দেশকে টুকরো টুকরো করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আজ জাতীয় সংহতি বিপন্ন করে তুলতে উদ্যত। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তারা আজ এক বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এদেরই চক্রান্তে ত্রিপুরায় নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল। আজ স্বাধীনতা দিবসে দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষকে এই ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির স্বপক্ষে ব্যাপক গণ-আন্দোলন সংগঠিত করে তুলতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার তেত্রিশ বছর পরে একদিকে যেমন স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্র করছে, অন্যদিকে দেশের সামনে আর একটি বিকল্প চিত্রও রয়েছে। সেই চিত্র হলো বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতির চিত্র। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার জনগণ বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে সামনে রেখে নতুন নতুন বিজয় অর্জন করে চলেছেন। কেরালায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সরকার। এই সমস্ত সরকার নিজ নিজ রাজ্যের জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। এই সমস্ত সরকার স্বৈরতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশব্যাপী এই শক্তির প্রসার ঘটাতে হবে।

এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের সংকল্প হোকঃ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে হবে; জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে; বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের প্রসার ঘটাতে হবে।

কলঙ্কিত ১৫ই আগস্ট

মাখন পাল

সম্পাদক, আর. এস. পি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

ভারতের ৬৫ কোটি মানুষের মধ্যে ২০ কোটি মানুষকে 'ফালতু' বলে ঘোষণা করা হয়েছে; ইংরেজী ভাষায় বলা হয় —'Redundant'। এরা কোথায় থাকে, কী খায় এবং কোথায় যায় তার খবর রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার কেউই রাখেন না, অথবা খবর রাখার প্রয়োজনও মনে করেন না। সারা ভারতের হিসাবে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন মানুষ আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ থেকে ৭২ জন কর্মক্ষম মানুষ বেকারির জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে; এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই শতকরা ৭২ থেকে ৭৩ জন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। সরকারী মতে চার জনের পরিবার যদি গড়ে মাসে ১০০ টাকা আয় করে, তবে তাকে ধরা হয় দারিদ্র্যসীমার উপরের স্তরে—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বৃটিশ সরকারের সঙ্গে ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষের মাধ্যমে অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হল তার মধ্যে এই খণ্ডিত ভারতের অবস্থার এটাই হল হাল্‌ফিল চিত্র। এই হিসাব কিন্তু কোনও মার্কসবাদী বা বামপন্থী দলের সূত্রে প্রাপ্ত নয়। খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব। আবার এই চিত্রও ঠিক আজকের চিত্র নয়—দু-তিন বৎসর আগেকার চিত্র। অনুমান করতে অসুবিধা হবে না যে, বিগত দু তিন বছরে এই চিত্র আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। অন্য কথা বাদ দিলেও গ্রামাঞ্চলে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং ক্ষুদ্র চাষীর জমি-জমা যেভাবে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তাতে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা গণনার বাইরে চলে গিয়েছে—যাদের সারা বছরে ৬ থেকে ৮ মাস কোনও কাজই থাকে না। শহরাঞ্চলেও মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, ক্ষুদে দোকানদার প্রভৃতি গরীব মানুষের যা-কিছু ধনসম্পত্তি সবই ধনী ও বড় বড় ব্যবসায়ীর হাতে গিয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পাঁচশালা যোজনার পর যোজনাপ্রণেতাদের পক্ষ থেকেই ফলশ্রুতি হিসেবে বলা হয়েছে —"ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরীব হয়েছে আরও গরীব।" তারপর অনেকগুলি পুরো এবং আধা-পরিকল্পনার কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। মনোপলি কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষে ৭৫টি পরিবার, আরও সূক্ষ্ম হিসেবে ১৩টি পরিবার বর্তমান ভারতবর্ষের মালিক। টাকা-পয়সা, ধনসম্পত্তি —সব কিছুরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মালিকানা এরা পেয়ে গেছে। আপোষে-পাওয়া স্বাধীনতার এটাই হলো নীট ফল। পশ্চাৎপদ বা অনুন্নত) ঔপনিবেশিক পরাধীন দেশের ধনিক শ্রেণী যদি পরাধীনতার অবসানের পর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে তবে যে এমন দুরবস্থাই জনজীবনকে বিড়ম্বিত করে তুলবে সেই ভাবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন সর্বহারার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কমরেড লেনিন। এই কারণেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের হাতে যখন ক্ষমতা অর্পিত হলো তখন তাদের অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আমরা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে পারি নি। ভারতবর্ষে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জনজীবন যে বিপর্যস্ত হবে সে কথা আমরা তখনই ঘোষণা করেছিলাম এবং ভারতের জনগণের জীবনে এই স্বাধীনতা যে অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয় সে কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করি নি। কিন্তু সেদিন ভারতের জনগণ নানাবিধ বিভ্রান্তির কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকার ফলে আমাদের কণ্ঠ তাদের মনে সাড়া জাগাতে

পারে নি। দীর্ঘ ৩৩ বছরের ধনবাদী শাসনের অভিজ্ঞতার আলোকে আজ অবশ্য মেহনতী মানুষের সকল অংশের কাছ থেকেই উপরোক্ত ঘোষণার স্বীকৃতি পেতে অসুবিধা হবে না।

ধনবাদী শাসনে এমন অবস্থা যে ঘটবে তা তো অন্ততঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী কোনও মানুষের কাছেই অজানা থাকার কথা ছিল না। আজ তো বিংশ শতাব্দীর শেষ যামের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। ধনবাদের সূর্য অস্তাচলের

পদে একেবারেই হেরে পড়েছে। কমরেড লেনিন এই যুগকে বলেছিলেন মুমূর্ষু ধনবাদের যুগ। সুতরাং ধনবাদী শাসনের রূপ কী দাঁড়াবে, বিশেষ করে অনুন্নত ধনবাদী দেশে, তা দুর্বোধ্য ছিল না। কারণ, ধনতন্ত্রের প্রথম আবির্ভাবের কালে ফরাসী বিপ্লবের আমলে ধনিক শ্রেণীকেও আমরা দেখেছি। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আওয়াজ তুলে যারা ক্ষমতায় বসেছিল তারা সেদিন সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু 'সাম্যের' নামে আইনের চোখে সব সমান এই লম্বা-চওড়া উক্তি করলেও কার্যতঃ আইনের পুরোপুরি সুযোগ পেয়েছিল ধনিক শ্রেণী ও তার স্তাবকের দল। 'স্বাধীনতা'র স্লোগানকে রূপান্তরিত করল খেটে-খাওয়া মানুষকে শোষণের স্বাধীনতায়। আর 'মৈত্রী', তা তো সীমিত ছিল শোষক শ্রেণীর মধ্যে। আর আজ তো মুমূর্ষু ধনবাদের যুগ। এ যুগে যে মানুষ দুরবস্থার শেষ স্তরে পৌঁছুবে সে কথা ভাবতে বেশী বুদ্ধি খরচ করার প্রয়োজন পড়ে না। এই কারণেই আমরা দেখেছি, যে অর্থ-নৈতিক বনিয়াদের উপর খেটে-খাওয়া মানুষের সুস্থ জীবন ও জীবিকার বনিয়াদ গড়ে ওঠে। যে মৌলিক অর্থনীতি গ্রহণের ফলে মানুষ মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারে ভারতের শাসক ধনিক শ্রেণী সে পথ গ্রহণ করল না। ভারতের অর্থনীতিকে দাঁড় করানো হল তিনটি খুঁটির উপর—(১) বিদেশী মূলধন আমদানি, (২) জনগণের উপর নানাবিধ পরোক্ষ করের বোঝা চাপানো, (৩) মুদ্রাস্ফীতি বা অঢেল কাগজে নোট ছাপানো। বিদেশী মূলধন আমদানির ফলে ঋণের বোঝা এখন দশ-বারো হাজার কোটি টাকার উপরে উঠে গেছে। পরিশোধ করার মত ক্ষমতা ভারতের আর নেই। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশটি সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে। পরোক্ষ করের ফলে প্রত্যেকটি জিনিষ, বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম আকাশ ফুঁড়ে উপরে উঠে গেছে। আর অঢেল মুদ্রা-স্ফীতির ফলে টাকার মূল্য সরকারী হিসেবে ২২ পয়সায় নেমে গেছে বললেও বস্তুতঃ দশ/বারো পয়সার বেশী নয়। মেহনতী মানুষের প্রাণ রাখতে প্রাণান্তকর অবস্থা। স্থিরী-কৃত আয়ের মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। কলঙ্কিত ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা মেহনতী মানুষকে আনালে-আঘাটে মৃত্যুর স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু দেয় নি।

অথচ ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, ভারতের সংগ্রামী জনগণ উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে ভারতবর্ষে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না; আর খেটে-খাওয়া মানুষকেও এমন দুরবস্থায় পড়তে হতো না। দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা না করেও আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো যে জন-গণের স্বার্থে বিদেশী শাসনের অবসান ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতের যুবশক্তি অকাতরে ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন ডালি দিয়েছে, শ্রমিক-কৃষক-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষেরা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বছরের পর বছর অবিচারে ও বিনা বিচারে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে; কত মা সন্তানহারা হয়েছে, স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। সর্বোপরি ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্টের বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানকে কি আমরা ভুলতে পারি? আসমুদ্র হিমাচল হিংসা-অহিংসার গণ্ডী অতিক্রম করে সেদিন "ইংরেজ, ভারত ছাড়ো" স্লোগানে ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিল। উপযুক্ত বিপ্লবী নেতৃত্ব পেলে ঐ গণ অভ্যুত্থানই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হত। ১৯৪৭ সালের কলঙ্কিত ১৫ই আগষ্টে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না। আগষ্ট বিপ্লবের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতো শ্রমিক-কৃষক রাজ।

কিন্তু তা হল না। না হওয়ার প্রধান কারণ ছিল, সেদিন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আপোষ-বিরোধী নেতৃত্বের আহ্বানে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় নি। আপোষপন্থী ধনিক শ্রেণীর গালভরা বুলি বিভিন্ন মহলকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল। এমন কি, বামপন্থী ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী বলে পরিচিত কোনও কোনও দল ঔপনিবেশিক ধনিক শ্রেণী সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের যে সাবধান বাণী তাকেও উপেক্ষা করেছিল। ফলে, ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধে সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ত্রিপুরী কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বৃটিশ শাসকদের প্রতি 'চরমপত্র' দানের যে প্রস্তাব এনেছিলেন তা পরাজিত হল। নেতাজী বার বার যে-কথাটা বলেছিলেন—'শত্রুর বিপদ, আমাদের সুযোগ' (Enemy's difficulty, is our opportunity) সে-কথায় অনেকেই কর্ণপাত করলেন না। অথচ আপোষপন্থী ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেদিন যদি যুদ্ধের সুযোগে জনগণকে প্রস্তুত করা হতো এবং সঠিক সময়ে সংগ্রাম শুরু করা যেত তবে ভারতের পক্ষে সত্যিকারের জনস্বার্থবাহী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন মোটেই অসম্ভব হতো না। যুদ্ধের কারণে বিপর্যস্ত খেটে-খাওয়া মানুষ যে কী পরিমাণ ব্রিটিশ শাসনবিরোধী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ হিসেবে সহজেই ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্টের গণ-অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জনগণ এমন অস্থির হয়ে উঠেছিল যে, যে মহাত্মা গান্ধী নেতাজীর আপোষবিরোধী কর্মসূচীকে বিরোধিতা করে বলেছিলেন—এসময়ে আন্দোলন করা যাবে না। কারণ, আমি আন্দোলন আরম্ভ করতে পারি, কিন্তু আন্দোলনকে থামাতে পারব না। (I can call a move-ment, but I cannot call it off), সেই মহাত্মা গান্ধীকে ১৯৪২ সালের ৭ই আগষ্ট আন্দোলনের ডাক দিতে হলো। স্লোগান তুলতে হলোঃ ইংরেজ ভারত ছাড়ো। জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এমন কথাও প্রস্তাবে সন্নিবেশিত করা হলোঃ জমি হবে কিষাণের, কারখানা মজুরের, শান্তি সকলের তরে। কিন্তু স্লোগানেই তা সীমিত ছিল; নেতৃত্বের কোনও ব্যবস্থা করা হলো না, কোনও কর্মসূচী দেওয়া হলো না। ব্রিটিশ শাসন-শোষণে পর্যুদস্ত জনগণ সেই স্লোগানকে সম্বল করেই আসমুদ্র-হিমাচল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নেতৃত্ব-বিহীন হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই অস্তি-চিমুর-বালিয়া-সাতারা-বিহার, এমনকি আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের (তৎকালীন অখণ্ড বাংলা প্রদেশ) মেদিনীপুরেও ব্রিটিশ শাসনের বিকল্প সমান্তরাল সরকার (parallel government) প্রতিষ্ঠিত করেছিল। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে সারা ভারতেই জনগণের এই সরকার, তথা 'মজুর-কিষাণরাজ' প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু নেতৃত্ববিহীন আন্দোলন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেল। সহস্র শহীদের আত্মদান তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারল না। ভারতের কৃষক বিদ্রোহের আমল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে একটি সত্যে উপনীত হতে হয়, তা হলোঃ জনগণ নয়, জনগণের

সংগ্রামপন্থার অভাব নয়, উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবই বারবার গণ-অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

সুচতুর কংগ্রেসী ধনিক নেতৃত্বের অভিসন্ধি কিন্তু জয়যুক্ত হয়েছে। তারা জানত যে, ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের সঙ্গে আপোষ করতে হলেও জনগণকে সঙ্গে পেতে হবে; আন্দোলনের পথ ধরে চলতে হবে। গান্ধীজী অবশ্যই এই সত্যটি স্বীকার করেই বলতেন : আমার আন্দোলন আপোষের জন্যই (My struggle is only for a compromise)। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ অথচ রূপায়ণের কোনও কর্মসূচী না দেওয়ার মধ্যেই তাঁর এই মনোভাব সুস্পষ্ট। আর সেজন্যই আন্দোলন চলাকালেই কারাপ্রাচীরের অন্তরাল থেকে তিনি ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের সঙ্গে আপোষ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। এই আপোষের প্রয়োজনে তিনি যে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবকে একদিন 'নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস' (breath of life) বলে অভিহিত করেছিলেন সেই প্রস্তাবের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত হলেন। এদিকে আন্দোলন ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠে চলেছে। জনগণের অভ্যুত্থান ছাড়াও বায়ুসেনা, পুলিশ বাহিনী, কারারক্ষী বাহিনীর বিদ্রোহ এবং সর্বশেষে নৌ-বিদ্রোহ এবং আরও পরে, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে গণ-আন্দোলনের তীব্রতা বেড়েই চলতে থাকল। একদিকে ব্রিটিশ শাসনকর্তারা ভীত হয়ে উঠলেন, অপর দিকে অখণ্ড ভারতের ধনিক শ্রেণীর দুইটি প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ—গণ-বিপ্লবের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ফলে, আপোষের পথ সুগম হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে কলঙ্কিত ১৫ই আগষ্টে দেশ দ্বিখণ্ডনের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সূচনা এখানেই। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় ভারতীয় ধনিক শ্রেণী অধিষ্ঠিত হলো।

তারপর ৩৩ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মে বিশ্বজোড়া ধনবাদের সহগামী হিসেবে ভারতের ধনিক শ্রেণীও সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তর লাভ করেছে। ভারতের ধনিক শ্রেণীর সব কয়টি গোষ্ঠী দ্বিধা-ত্রিধা-বহুধা বিচ্ছিন্ন। ধনিক শ্রেণীর শাসকগোষ্ঠী ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ফ্যাসিবাদী কায়দায় শাসন চালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। পরবর্তী কালে সেই গোষ্ঠীর হাত থেকেও অপর গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। রাজনৈতিক সংকটে বিদীর্ণ সেই গোষ্ঠীও শাসনক্ষমতায় টিকে থাকতে পারল না। আজ আবার ফিরে এসেছে ইন্দিরা-নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই)-এর শাসন। সংকট কিন্তু বিন্দুমাত্র কমে নি। ধনিক শ্রেণী সংকটের সমস্ত বোঝা খেটে-খাওয়া মানুষের কাঁধে চাপিয়ে আত্মরক্ষার পথ খুঁজছে। স্বৈরতন্ত্রের পথে বিচরণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এবার আর ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জরুরী অবস্থার প্রবর্তনের প্রয়োজন পড়বে না। ইতিমধ্যেই ফ্যাসীবাদের জন্য গণ-ভিত্তি তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে; এবং সে পথে ধনিক শ্রেণীর আত্মরক্ষা সম্ভব হবে যদি বামপন্থী শক্তি, বিশেষ করে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শক্তি, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণকে শ্রেণীসচেতন ও বিপ্লবসচেতন করার পদ্ধতি গ্রহণ না করে। অর্থনীতিবাদ এবং সংস্কারবাদের গড্ডালিকা প্রবাহে যদি বামপন্থী শক্তি গা ভাসিয়ে না দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংগ্রামের পথে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করে তবেই এই মারাত্মক পরিস্থিতির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। কারণ, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না—প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী বিপ্লবী রোজা লুক্সেমবুর্গের সেই কথা—ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটে সর্বহারা শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনে ব্যর্থতার শাস্তি হিসেবে (Fascism comes as a punishment for the failure of the proletariat in accomplishing the socialist revolution.)

সারা দুনিয়ার ধনবাদী সংকটের তীব্রতা অনুধাবন করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, '৮০'-এর দশক বিপ্লবের দশক। কমরেড লেনিন এই যুগকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ বলে অভিহিত করে গেছেন। আমাদের সামনে আজ তত্ত্বগত ও বাস্তবসম্মত বিচারে সেই সত্যেরই পুনরাবির্ভাব ঘটতে চলেছে। কিন্তু তত্ত্ব ও ব্যবহারের সমন্বয় (Unity of theory and practice) ছাড়া বিপ্লব সংঘটিত হয় না। কমরেড লেনিন বলেছিলেন—বিপ্লবী দল ছাড়া বিপ্লব হয় না। আরও বলেছেন—রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব হয় না। কিন্তু ধনবাদী শাসনে পর্যুদস্ত ভারতের এই খেটে-খাওয়া জনগণকে সচেতন করবে কে? স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা অর্থনৈতিক চেতনা লাভ করতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা অনুপ্রবিষ্ট করতে হয় বাইরে থেকে। সেই দায়িত্ব পালন করতে পারে আদর্শানুরাগী, অনুভূতি প্রবণ সচেতন যুবশক্তি।

ভারতের যুবশক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্য সেই কারণেই অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশকে প্লাবিত করে যাতে যুবশক্তি বিপ্লবের কথা চিন্তার সুযোগ না পায়, অপসংস্কৃতির পঙ্কিল আবর্তে তারা নিমজ্জিত হয়ে যায়; এবং খেটে-খাওয়া জনগণের মধ্যে 'বিপ্লবের বীজাণু অনুপ্রবিষ্ট করার' (inject the bacillii of revolution among the masses) মহান ঐতিহাসিক কর্তব্য থেকে তারা বিচ্যুত হয়। অথচ সময় এবং সুযোগ এসে গেছে। শত্রুর বিপদের সুযোগ গ্রহণের শুভলগ্ন উপস্থিত। ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নবজাতকের প্রাণচাঞ্চল্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রতিক্রিয়াশীল দেশীয় ধনিক শ্রেণী এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলি তাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের যুবশক্তি যদি শ্রেণীসংগ্রামের নীতিকে হাতিয়ার করে বিপ্লবের পথ ধরে এগিয়ে চলার দুঃসাহস দেখাতে পারে তবে এ অবস্থারও পরিবর্তন হবে। সারা ভারতের বিপ্লবের সূচনা হবে এই অঞ্চল থেকেই। এবং দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে ধনিক রাজের অবসান এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন হবে। সারা দুনিয়ার, বিশেষ করে ভারতের ধনিক শ্রেণীর এই চরম সংকটের সুযোগে নব ইতিহাস সৃষ্টির শুভ সম্ভাবনাও প্রতীক্ষা করছে। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের যুবশক্তি কি সেই স্বর্ণসম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রস্তুতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে না?

আমার চোখে স্বাধীনতা

অশোক ঘোষ

সম্পাদক, ফরওয়ার্ড ব্লক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পর আজ তেত্রিশ বছর অতিক্রম করেছে। তেত্রিশ বছরের পূর্ণতা নিয়ে যে রাষ্ট্র কাঠামো ভারত নামক রাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে —"স্বাধীনতা" শব্দের মূল্যায়ন, তার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিক্ষেপ, তার অর্থনীতির ক্রমবিকাশ সবকিছুর প্রেক্ষিতেই আমাকে বিচার করতে হবে। সেই বিচার অবশ্যই হবে আমার দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে, যে দৃষ্টিকোণ

স্বভাবতই আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ধ্যান ধারণার উপর নির্ভরশীল।

তাই আমার চোখে ভারতের স্বাধীনতাকে বিচার করতে গেলেই তার নিয়ামক মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াবে—'স্বাধীনতা' শব্দটি আমার কাছে কিসের দ্যোতক, কোন্ অর্থ সে বহন করে। "স্বাধীনতা" শব্দটিই এমন ব্যাপক এবং এত অর্থপ্রসূ যে তার অর্থ যুগে যুগে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভিন্ন অর্থকে বহন করে।

'স্বাধীনতা' শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞা বা কেতাবী বিশ্লেষণ আমার কাছে এই প্রসঙ্গে তাই নিয়ামক মাপকাঠি নয়। আমি এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রদত্ত সংজ্ঞাকে অভ্রান্ত বলে মনে করে তাকেই আমার বিচারের মাপকাঠি করে নিয়েছি শুধুমাত্র এই প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই নয় আমার সমগ্র রাজনৈতিক জীবনেও বটে।

ভারতের সাম্রাজ্যবাদের অবস্থিতিকালে যখন দেশবাসী ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়েই স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণ এবং স্বচ্ছ কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মুক্তি সংগ্রামের নায়করা, বিশেষ করে মহাত্মা-গান্ধী সমেত দক্ষিণপন্থী নেতারা কেউই রাখেন নি। রাখতে পারতেন না এমন নয়, কিন্তু তাঁরা যে শ্রেণীর স্বার্থে ভারতীয় জনগণের ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণাকে কাজে লাগিয়ে শনৈঃ শনৈঃ এগোচ্ছিলেন, স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা তাঁদের ভাণ্ডারে ছিল, সেই ব্যাখ্যা তাঁদের সেই পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে দিত। তাই স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা কুহেলীভরা মানসিকতা জনগণের মনকে ছেয়ে থাকুক তাই তাঁরা চেয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই যত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, দক্ষিণপন্থীদের আপোষমুখী চরিত্র তত বেশী প্রকট হয়েছে এবং অনিবার্য হয়ে উঠেছে বামপন্থীদের সঙ্গে তাদের প্রকাশ্য সংঘাত। সেই সংঘাতবহুল ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তে বামপন্থা ও বামপন্থী ঐক্যের পতাকাকে যিনি দক্ষিণপন্থা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তুলে ধরেছিলেন সেই মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রই ভারতীয় জনগণের সামনে স্বাধীনতার স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেছিলেন—"যাহারা মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত করিবে কিন্তু সমাজের পূর্বাবস্থা বজায় রাখিবে, তাহারা ভ্রান্ত।" তিনি আরও বললেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি—সকলের জন্য স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানেই সাম্য এবং সাম্য মানেই ভ্রাতৃত্ব। ইহা শুধু রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নহে—ইহা অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ এবং সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির বর্জনকেও সূচিত করে।"

স্বাধীনতার এই সংজ্ঞাকে সামনে রেখেই তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজনৈতিক দলিলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার সামগ্রিক পূর্ণতাকে স্বাধীনোত্তর ভারতের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

জাতির দুর্ভাগ্য যে নেতাজী যে বামপন্থী পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন—তা জয়ের

গৌরব অর্জন করতে পারল না। ফলে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটে গেল, সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ভারতীয় বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিকানা পেল আপোষ ও চুক্তির মাধ্যমে।

আজকের ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলেই আমাদের শুরু করতে হবেই সেই '৪৭ সাল থেকে, কারণ আজ ভারতে যা কিছু বিকশিত হয়েছে যা কিছু পরিণতি লাভ করেছে বা করছে তার বীজ উপ্ত হয়েছিল সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহূর্তে। সেই '৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা খাওয়া, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত ভারতীয় জনতার সামনে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাটিকেই স্বাধীনতার মুকুট পরিয়ে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হোল যাতে সাধারণ জনগণ তো মোহগ্রস্ত হলেনই, মোহগ্রস্ত হলেন তখনকার বামপন্থী দলগুলিও। ফরওয়ার্ড ব্লক সেদিন নেতাজীর মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছিল ঘটনাপ্রবাহকে, ঘোষণা করেছিল তার তীব্র প্রতিবাদ—'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়।' ফরওয়ার্ড ব্লকের সামনে জ্বল জ্বল করছে নেতাজীর সেই মহাবাণী—স্বাধীনতা মানে সাম্য, স্বাধীনতা মানে "All power to the Indian people". তাই যে ক্ষমতা হস্তান্তর ভারতের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের হাত থেকে ভারতীয় বুর্জোয়া হাতে সঁপে দেওয়ার বন্দোবস্ত মাত্র, যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পরিবর্তে একটি শ্রেণীর হাতে শোষণের অবাধ অধিকারকে তুলে দেয়—তাকে যত উচ্চকণ্ঠেই স্বাধীনতা নামকরণ করা হোক না কেন, ফরওয়ার্ড ব্লক তাকে স্বাধীনতা বলে মেনে নিতে পারে নি।

তা ছাড়াও আর একটি সর্বনাশের বীজ সেদিন রোপণ করেছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা। সেটি হোল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বহু পুরাতন এবং ঘৃণিত কৌশল 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব'। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের যুগে ইংরেজ বহুবার বহু রকমে তার এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে চেয়েছে বহু জাতি এবং বহু ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষে। কিন্তু ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার আকুতি এবং সংগ্রামের চেতনা বার বার তাকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু '৪৭ সালে সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতিকে শুধু মেনেই নেওয়া হোল না, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হোল, আবাহন জানানো হোল তার অনিবার্য পরিণতিকে দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে।

বুর্জোয়া সংবাদপত্রের সাড়ম্বর প্রচার এবং সরকারী জৌলুস আর আলোর ঝলকানিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সেই প্রতিবাদ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মোর্চায় সংগঠিত করতে ব্যর্থ হলেও ভারতের ইতিহাসে সেই প্রতিবাদ চিহ্নিত হয়ে আছে প্রতিদিন তার সত্যতা আরও গভীর হয়ে ফুটে উঠছে।

গত তেত্রিশ বছরের তথাকথিত এই স্বাধীনতায় জনগণ কি পেয়েছে? কি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রগতি হয়েছে এই ভারত রাষ্ট্রে?

তেত্রিশ বছরে একেবারেই কিছুই হয় নি যাঁরা বলেন তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত নই। তেত্রিশ বছরের মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি লিখিত সংবিধান এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা বর্ণাঢ্য প্রথা, দেশে একটি বা দুটি নয় পাঁচটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বহু নতুন কারখানা-শিল্প এবং শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। আর গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যা আগের অনেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে চুরে, remould করেছে। ফলে ভারত আজ একটি উন্নতিশীল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবেই গড়ে ওঠে নি, ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশ আজ একচেটিয়া স্তরে উন্নীত হয়েছে এই তিন দশকে।

বুর্জোয়া অর্থনীতির এই বিকাশের কাজে রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে শ্রেণীস্বার্থে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের নামে জাতীয় অর্থনীতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে শিল্প মালিক এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পুঁজি বৃদ্ধির কাজে। কাজেই এই তেত্রিশ বছরে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিকীকরণ সম্ভব হয়েছে, তার সিংহভাগ লাভ করেছে দেশের একচেটিয়া পরিবারগুলো। এই বুর্জোয়া অর্থনীতির দ্রুত ও অসম বিকাশ অনিবার্যভাবেই সংকট সৃষ্টি করে চলেছে এবং ক্রমশঃ সেই সংকটগুলো ঘনীভূত হচ্ছে। একদিকে যেমন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার অঙ্ক ক্রমশঃ হিমালয়ের মাথা স্পর্শ করতে চলেছে অপর দিকে বেকার বাহিনীতে দেশ ছেয়ে গেছে, মূল্যবৃদ্ধি ক্রমবর্দ্ধমান গতিকে কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না, মুদ্রাস্ফীতি ক্রমশঃই বাড়ছে, টাকার প্রকৃত মূল্য দ্রুতগতিতে শূন্যের দিকে নেমে চলেছে। এগুলি হল গত তেত্রিশ বছরের বুর্জোয়া অর্থনীতির অনিবার্য পরিণতি। ধনবাদী সমাজব্যবস্থাকে অটুট রেখে এই সমস্যার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। মুনাফা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা যতদিন বলবৎ থাকবে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। প্রথম অবস্থায় এই সংকটের গতি কম ছিল ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীই কিছুটা 'ছাড়' দিয়ে বৃদ্ধির হারকে সংযত করতে পারছিল। কিন্তু যতই বুর্জোয়া অর্থনীতি পরিণতির দিকে যাচ্ছে মূল্যবৃদ্ধির গতিতে ত্বরণ বাড়ছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখার কোন চেক্ ভালব বুর্জোয়া অর্থনীতিতে নেই।

১৯৮০ সালে দাঁড়িয়ে তাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে সংকটের মোকাবিলা আজ আর বুর্জোয়া রাষ্ট্র করতে পারছে না। জনগণের ওপর এই সংকটের চাপানো বোঝা আজ তার ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী শঙ্কিত। জনগণের এই ব্যবস্থাকে ঘাড়ের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলার মানসিকতা যতই তীব্র হচ্ছে ততই শোষক শ্রেণীর ভয় বাড়ছে যে ঐ বিক্ষুব্ধ মানুষেরা যাতে শ্রেণী সংগ্রামের শিবিরে সংগঠিত হতে না পারে। তাদের এই ভয়, জনগণের সচেতনতা সম্পর্কে তাদের এই আতঙ্ক—আজকে শোষক শ্রেণীকে তার গণতন্ত্রের মুখোশ পরে থাকার স্বস্তি দিচ্ছে। দমবন্ধ হওয়া মানুষের মতোই তারা ক্রমাগত সংবিধান ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত বিধিকে লঙ্ঘন করে চলেছে। বুর্জোয়ারা গণতন্ত্র আর তার বহু প্রচারিত সংসদীয় গণতন্ত্র জনগণকে ক্যামোফেজ করতে পারছে না, তার অসারতা ক্রমেই জনগণের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা নিজেরই সৃষ্ট সমস্যার ফ্রাঙ্কেনস্টিনের তাড়ায় পিছু হটতে হটতে প্রায় দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ফেলেছে। তাই তারা তাদের পুরনো গুরু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দেওয়া দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতি শেষ অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে। '৪৭ সালে যে দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং তার পরিণতি দেশভাগকে স্বীকৃতি দিয়ে যে ভারতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন তাদের রাজনৈতিক মুখপাত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আজ সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের

[শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়]

স্বাধীনতার ৩৩ বছর

বিশ্বনাথ মুখার্জী

সম্পাদক, সি. পি. আই. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ

এই ১৫ই আগষ্ট আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৩৩ বছর পূর্ণ হলো।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিল তারা উচ্চশ্রেণীর লোক অথবা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উচ্চশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী। তাদের লক্ষ্য ছিল বৃটীশ শাসনকে হটিয়ে এদেশের উচ্চশ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা নিয়ে আসা।

তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যখন এদেশে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল যার প্রভাবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীও বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল তখন গণবিপ্লবের পথে একে নেতৃত্ব না দিয়ে তারা বরং নিন্দা করেছিলেন, পেছনে টেনে রেখেছিলেন যাতে মেহনতী মানুষের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে না যায়; আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিক্ষোভকে বৃটিশ শাসকদের ওপর চাপ হিসাবে ব্যবহারও করেছিলেন যাতে তারা আপোষের ভেতর দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

বৃটীশ শাসকরাও বুঝেছিল এদেশে তাদের শাসন আর রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং মন্দের ভাল হিসাবে এদেশের উচ্চ-শ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা ছাড়তে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে পাল্টা চাপ হিসাবে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও তারা বাধিয়ে দিতে পেরেছিল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ব্যবহার করে।

ফলে ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত যখন স্বাধীন হলো তখন দ্বিখণ্ডিতও হলো—ভারত এবং পাকিস্থান এই পরস্পর-বিরোধী দুই রাষ্ট্রে। পরে পাকিস্থানও দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

বৃটিশ ভারতের বেশীর ভাগটাই থাকল স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে। আধুনিক শিল্পে এবং রাজনীতিতে এই অংশই ছিল অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। এবং এখানে রাষ্ট্রক্ষমতা এলো জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। তাই এই ৩৩ বছরে ভারত রাষ্ট্রে আধুনিক শিল্পের বেশ কিছুটা বিস্তার ঘটেছে এবং স্বনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে ভারী শিল্পও বেশ কিছুটা গড়ে উঠেছে প্রধানত রাষ্ট্রায়াত্ব অংশে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বেশীরভাগ সমাজবাদী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়তে পেরেছেন, বেশীরভাগ সদ্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে মিলে জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীও গড়তে পেরেছেন।

সেই সঙ্গে যেহেতু তারা ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্ব তাই মুখে সমাজবাদের কথা বলেও কার্যতঃ পুঁজিবাদী পথেই তারা দেশকে রেখেছেন, পুঁজিবাদী বিকাশই তারা ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের মত বিশাল, জনবহুল, দারিদ্র দেশে পুঁজিবাদী পথে দ্রুত ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হতেই পারে না এবং যেটুকু বিকাশ হয় তারও ফল প্রধানত ধনীরাই ভোগ করার সুযোগ পায়, অবাধ মুনাফাকারী বলে, ধনীরা আরও আরও স্ফীত হয়, একচেটিয়া পুঁজি বিপুল শক্তি পায় এবং অপর দিকে বেকারী বাড়ে, দারিদ্র্য বাড়ে, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, অর্থসংকট গভীর এবং তীব্র হয়ে ওঠে এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত হয়—গত ৩৩ বছরে এই হলো আমাদের দেশের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

শুধু অর্থসংকট তীব্র ও অসহ্য হয়ে উঠছে তাই নয়, অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক সংকটও দেখা দিয়েছে এবং বিক্ষুব্ধ

জনগণকে দমন করার প্রয়োজনে শাসকশ্রেণী জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকেও সংকুচিত করছে বারে বারে, স্বৈরাচারী প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, গণতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে।

সেই সঙ্গে নৈতিক অধঃপতনও ঘটছে দ্রুত গতিতে—ঘুষ দুর্নীতি সীমাহীন হচ্ছে, চুরি ডাকাতি রাহাজানি, সমাজের দুর্বল অংশের ওপর নৃশংস অত্যাচার, নারীধর্ষণ প্রভৃতি পাপে দেশ ভরে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, বহু ভাষাভাষী বহু জাতি ও উপজাতির বাসভূমি এই ভারতে স্বায়ত্বশাসন ও উন্নয়নের ন্যায়সঙ্গত দাবির পাশাপাশি সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী, বিভেদকামী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, উত্তর-পূর্ব ভারতে তা বীভৎস আকার ধারণ করেছে এবং সারা ভারতেই তা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

তেত্রিশ বছরের বুর্জোয়া শাসনে সত্যই আজ ভারত সর্বাঙ্গীণ সংকটাপন্ন। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে এই ভয়ঙ্কর সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বুর্জোয়া শ্রেণীর একচেটিয়া শাসনের অবসান করা, জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠা করা, পুঁজিবাদী পথ থেকে দেশকে সরিয়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া।

ইতিহাসের এই জরুরী আহবানে সাড়া দেওয়াই আজ প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক, প্রগতিবাদী মানুষের পবিত্র কর্তব্য।

আমার চোখে স্বাধীনতা : ৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

অন্তিম সঙ্কট মুহূর্তে শোষণ-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার শেষ অস্ত্র হিসেবে তাঁর উত্তরসূরীরা সেই দ্বিজাতি-তত্ত্বের নীতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে সারা দেশটাকেই টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছে। সেদিন তাদের পাশে এই কাজে সাহায্যকারীরা ছিল এটলী-মাউন্টব্যাটেনের দল, আজ আবার তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীরা। উগ্র আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ প্রচার করে আজ বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতের জাতীয় সংহতিকে ধ্বংস করতে চাইছে, নিজেদের টিকে থাকার শেষ কৌশল হিসেবে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, ভারতের প্রতিটি রাজ্যে।

কিন্তু এই সঙ্কট, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করে—বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রসারিত করা, অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারানো—এ সবই তো স্বাভাবিক - বুর্জোয়া অর্থনীতিক বিকাশের অনিবার্য পরিণতি যা আমাদের তেত্রিশ বছরের তথাকথিত স্বাধীন দেশের বর্তমান চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবেই।

এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন সহজ দাওয়াই নেই। বুর্জোয়া সংসদীয় গণতান্ত্রিক পথে এই সমস্যা ও পরিণতি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না কারণ এগুলি তো তারই সৃষ্টি। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ হোল ভারতীয় জনগণের নেতাজীর নির্দেশিত প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা। এই প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে কোন পথে? নেতাজী সেই পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে আপোষ করে বা সেই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার রক্ষাকবচ সংসদীয় গণতন্ত্রকে অনুশীলন করে সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রকৃত স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় শোষক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির ফাঁদ থেকে জনগণকে রক্ষা করা। নেতাজীর নির্দেশিত পুঁজিবাদের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামের পথই বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে পাল্টে নতুন সমাজব্যবস্থা আনতে পারে যে ব্যবস্থায় জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্জিত হওয়া সম্ভব। তাই ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালায় যে বাম ঐক্যের বীজ উপ্ত হয়েছে তাকে প্রসারিত করতে হবে সারা ভারতে। প্রসারিত করতে হবে শুধু মাত্র নির্বাচনে নয়, সকল শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে। সুস্পষ্ট ইতিবাচক রণধ্বনি তুলতে হবে বর্তমানের শোষণভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে।

আমাদের স্বাধীনতা দিবস

গণেশ ঘোষ

১৯০ বছরের অবর্ণনীয় অত্যাচার, নিষ্ঠুরতম নির্যাতন এবং অমানুষিক শোষণে সমগ্র ভারতবর্ষকে এবং ভারতের সমগ্র মানুষকে প্রায় একেবারে নিঃস্ব এবং রিক্ত করে ফেলবার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতের ৩৫ কোটি নরনারীর একান্ত কামনার এবং সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার "স্বাধীনতা দিবস" এসে দেখা দিল। এই অতি-প্রত্যাশিত দিনটিকেই
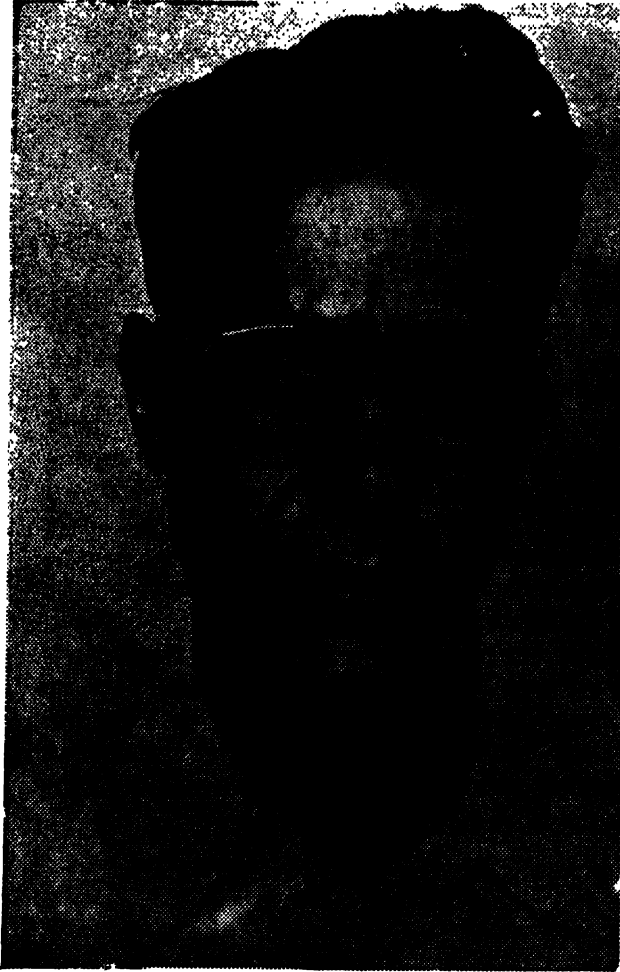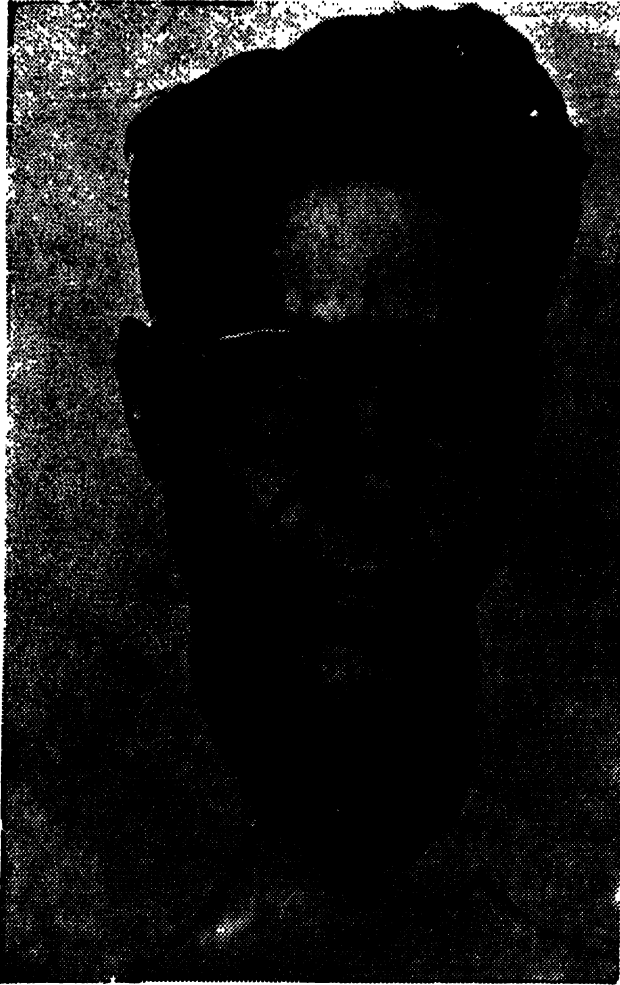
স্বাগত জানাবার প্রত্যাশায় প্রায় ১৯০ বছর ধরে (১৭৬৩-১৯৪৬) ভারতের বহু কোটি মানুষ নিজেদের বুকের রক্ত নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছে এবং আরও বহু কোটি মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট এবং নির্যাতন হাসি মুখে স্বীকার করে নিয়েছে।

কিন্তু এই দিনটিকে, ১৫ই আগস্ট, ভারতের স্বাধীনতার দিবস ব'লে দেশে বিদেশে ব্যাপক ভাবে প্রচার করা সত্ত্বেও এবং সমগ্র ভারতবর্ষে এই দিনটি "স্বাধীনতা দিবস" বলে প্রতি-পালিত হোলেও বাস্তব পরিস্থিতির সতর্ক বিবেচনায় একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে এই দিনটিতেও ভারতের জনসাধারণ যথার্থভাবে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পায় নি। ১৫ই আগস্টের পরে, আরও প্রায় তিন বৎসর কাল শেষে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব অপসারিত হয় এবং ভারতে সার্ব্বজনীনভাবে ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ঐ দিনে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং ওই দিনেই ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে সগৌরবে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং ভারতের জনগণের প্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু ভারতের ধনিক জমিদার কায়েমীস্বার্থের প্রতিনিধিগণের সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আপোষের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে স্বাধীনতা লাভের পরেও ভারতের ব্যাপকতম জনসাধারণের অবস্থার পূর্বাপেক্ষা বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি; বরং এ কথা বলাই বাস্তব এবং সঠিক হবে যে বহু ক্ষেত্রেই পূর্বাপেক্ষা জনগণের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের তেত্রিশ বছর পরেও তাই আজকালও অপরিসীম দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত এবং সীমাহীন শোষণে আরও নিঃস্ব জনসাধারণের মুখ থেকে ট্রামে বাসে, পথে ঘাটে, মাঠে ময়দানে, কলে কারখানায় বহু সময়েই এই হতাশাজনক অবস্থার অভিব্যক্তি এই বলে শোনা যায় যে, "এর চাইতে ইংরেজের আমল ভাল ছিল।" জাতীয় মর্যাদার পক্ষে এর চাইতে লজ্জা ও অবমাননকর আর কি হোতে পারে আমাদের জানা নেই।

কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের কথা এ সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অর্থাৎ বর্তমানের শাসকগণের পক্ষ থেকে এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করবার এবং জনগণের দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য দূর করবার জন্য কোনরূপ বাস্তব এবং কার্যকর প্রচেষ্টা করা হচ্ছে না। বরং সঠিকভাবে এবং সত্য কথায় বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয় যে জাতীয় নেতৃত্ব সর্বতোভাবে এবং সর্ব প্রচেষ্টায় দেশের কায়েমী স্বার্থের সর্ব প্রকারের স্বার্থরক্ষা করবার এবং দাবীপূরণ করবার ব্যবস্থাই করছেন এবং তার জন্য দেশের ব্যাপকতম জনগণের সর্ব প্রকারের স্বার্থ এমন কি তাদের বেঁচে থাকবার জন্য সর্বাপেক্ষা নিম্নতম প্রয়োজনও অতি নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষা ও বর্জন করছেন। দেশের ধনিক শ্রেণীর শোষণের মাত্রা সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে; ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে স্বাধীনতার পর গত ৩৩ বছরেই ভারতের প্রায় সব সম্পদের মালিকানা এবং কর্তৃত্ব

গিয়ে জমা হয়েছে দেশের মাত্র ৭৫টি পরিবারের হাতে এবং দেশের শতকরা ৬৯ জন মানুষ অর্থাৎ ৬৬ কোটির মধ্যে সাড়ে পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে গিয়ে পড়েছে; তাদের মাসে গড়ে ২০ টাকা খরচ করবার সামর্থও নেই; অর্থাৎ তারা তিন দিনের ছয় বেলায় মধ্যে একবারও পেটভরে খেতে পারে না। এই পরিস্থিতি কি ভীষণ ও ভয়াবহ তা যাঁরা শহর অঞ্চলে বাস করেন তাঁদের পক্ষে বোঝা কঠিন; গ্রামে গিয়ে কিছুটা ঘুরলেই এই দারিদ্র্যের ভয়াবহ অবস্থা কিছুটা বোঝা যাবে।

ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব অর্থাৎ ভারতের বর্তমান শাসকেরা যে নীতি, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আজ ৩৩ বছর দেশ শাসন করে চলেছেন তার ফলে একদিকে যেমন সীমাহীন দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে অপর দিকে অবার ঠিক তেমনিভাবেই অতি স্বল্প সংখ্যক বিত্তবানের হাতে (ধনিকের) সীমাহীন ধনসম্পদের পাহাড় জমা হচ্ছে; অর্থাৎ অতি ধনিকের সংখ্যা কমে কমে তৈরী হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি। পূর্বেই বলা হয়েছে ভারতের মাত্র ৭৫টি পরিবারের হাতেই ভারতের প্রায় সমস্ত ধনসম্পদের মালিকানা গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বোধ হয় এই সংখ্যা আরও কমে গিয়েছে এবং ভারতের মাত্র ২৫টি পরিবারই এখন ভারতের সব সম্পদের মালিক। এর সমস্ত কৃতিত্বই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীরই প্রাপ্য।

ভারতের এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ভারতে পুঁজি নিয়োগ করে দেশের ভিতর কলকারখানা গড়ে তুলতে অনিচ্ছুক; অনেক অধিক মুনাফা অর্জনের লোভে এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন অতি অনগ্রসর দেশে পুঁজি রপ্তানী ক'রে সেই সব দেশে কলকারখানা গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করছে; অথচ ভারতে এই পুঁজি নিযুক্ত হলে দেশের ভিতরেই অনেক কলকারখানা গ'ড়ে উঠত, দেশের লক্ষ লক্ষ অনশনগ্রস্ত বেকার মানুষ অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেত এবং সেই সঙ্গে অন্য দেশের উপর ভারতের নির্ভরতাও বহু পরিমানে হ্রাস পেত।

ভারতের কায়েমীস্বার্থের নির্দেশে দেশের শাসকেরা যে নীতি নিয়ে দেশ পরিচালনা করছেন তার ফলে স্বাধীনতা লাভের ৩৩ বছর পরেও দেশের বেকারের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি; এর ভেতর কিন্তু গ্রামের বেকারদের ধরা হয় নি। কারণ গ্রাম অঞ্চলে বেকারদের নাম লেখাবার কোন ব্যবস্থা আজ অবধি আমাদের দেশে হয় নি। সুতরাং এই অবস্থায় গ্রামের বেকারদের সম্ভাব্য সংখ্যা যোগ করলে ভারতে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৫ কোটি। এই বেকারেরা যে নিজেদের স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে কিভাবে বেঁচে আছে তা কল্পনা করাও কঠিন।

এখানে আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা একান্তভাবেই প্রয়োজন নতুবা আমাদের "স্বাধীনতা দিবসের" মাহাত্ম্যই বহু পরিমাণে হ্রাস করা হবে। দেশ বিভাগের পর (১৯৪৭) একমাত্র পূর্ববাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) থেকেই এক কোটিরও অধিক মানুষ নিরুপায় হয়ে এবং প্রাণ রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে বাড়ী ঘর সবকিছু ফেলে রেখে প্রায় এক বস্ত্রে এবং প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমাদের ভারতবর্ষে অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু লক্ষ মানুষ আজও ভারত ইউনিয়নে যথাযোগ্য পুনর্বাসন পায় নি; বহু সহস্র মানুষ আজও সরকার পরিচালিত বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে সরকারের এবং জনসাধারণের দয়া এবং ভিক্ষার উপর নির্ভর করেই কোন রকমে জীবনধারণ করে আছে। এই সমস্ত ত্রাণ শিবিরে এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে কয়েকটি স্থানে এই সকল পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু নরনারী যেভাবে বেঁচে আছে তাকে নিশ্চয়ই মানুষের মত বলা যায় না। অথচ দেশবিভাগের পর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যে বহু লক্ষ অমুসলমান পাঞ্জাবের অধিবাসী ভারত ইউনিয়ানে চলে এসেছে তারা প্রত্যেকেই পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির জন্য যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। তারা কেউই ভারত ইউনিয়ানে এসে ত্রাণ শিবিরে বাস করছে না কিম্বা পথের ভিখারীও হয় নি। দিল্লীর আশেপাশের অঞ্চলে কিছুটা চোখ মেলে ঘুরলেই এই কথার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পূর্ব বাংলার এই কয়েক লক্ষ হতভাগ্য উদ্বাস্তু আমাদের "স্বাধীনতা দিবসেরই" নিষ্করুণ অবদান। আমাদের ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাকে এরা কিভাবে দেখে, আমাদের "স্বাধীনতা দিবসে" এদের কি মনে হয় আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন।

কিন্তু এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা দুঃখ এবং ক্ষোভের কথা. এই বাস্তব পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমাদের শাসকেরা মাঝে মাঝেই ঘোষণা করে বলেন যে দেশের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে, এখন আর কোন উদ্বাস্তু সমস্যা নাই। যাদের এখনও পুনর্বাসন হয় নি তাদের যথাযোগ্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে আমাদের শাসকগণের অনিচ্ছা কেন সে রহস্য আজও জানা যায় নি।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ নিঃসন্দেহে (রাজনৈতিক) স্বাধীনতা লাভ করেছে; কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভারতবর্ষ ত্যাগের ফলে আমাদের যে স্বাধীনতা এসেছে তার মাঙ্গলিক অবদানটুকু ভারতবর্ষের শতকরা ৯৫ জন মানুষের ভাগ্যে আসে নি। ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের ১৯০ বছর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের এবং প্রাণদানের বিনিময়ে শেষ অবধি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে তার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছে ভারতের জমিদার ও ধনিকেরাই। তারাই এবং তাদের নির্দেশে তাদের "গোমস্তারাই" ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসকগণের পরিত্যক্ত সিংহাসন দখল করে তাদের পন্থায় এবং তাদের ধরনেই ভারতের ব্যাপকতম জনসাধারণকে নির্মম ও নিষ্করুণভাবে শাসন ও শোষণ করে চলেছে। তাদের ধারণা এবং সুনিশ্চিত বিশ্বাস ইংরেজদের শূন্য আসনে বসবার একমাত্র অধিকারী তারাই এবং তাদের পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই ভারতের জনগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর ব্যবস্থা বলে সকলকে মেনে নিতে হবে।

তাদের শাসন ও অমানুষিক শোষণের ফলে যাতে জনসাধারণের মধ্যে সহজে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জমা হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের পক্ষ থেকে (শাসকগণের) প্রায় প্রথম থেকেই চেষ্টা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে রাখবার জন্য। ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের আবাদী অধিবেশনে ঘোষণা করা হল যে ভারতের লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা; অর্থাৎ জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা হল যে শাসকগণের চেষ্টা হবে ঠিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা না হলেও সেই ধরনেরই সমাজ গঠন

করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ঐ শাসননীতির ফলে দেশের দরিদ্রেরা আরও অধিক দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে এবং মুষ্টিমেয় ধনিকের ধনসম্পদ সীমাহীন পরিমাণে বেড়ে চলেছে। ফলে দেশের মধ্যে বিক্ষোভ জমা হতে আরম্ভ হল। এই অবস্থা লক্ষ্য করে জনগণকে নূতন করে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে শাসকগণের পক্ষ থেকে বলা হল, তখন বোধহয় ১৯৭১ সাল, যে এবার শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে "গরিবী হঠানো" অর্থাৎ দেশ থেকে একেবারে দারিদ্র্য দূর করা। এবং এই ঘোষণারই কিছু বছর পরে বাস্তবে দেখা গেল ওই শাসন নীতির ফলে দেশে দরিদ্র্য ও নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৯ ভাগ এবং দেশের মাত্র ২৫টি ধনী পরিবারের হাতেই দেশের সমস্ত সম্পদের কর্তৃত্ব এবং মালিকানা গিয়ে জমা হয়েছে।

এ পর্যন্ত যা' বলা হয়েছে তা হল দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, স্বাধীনতার পরিণতি। এর ভেতর থেকে ভবিষ্যতের আশার আলো খুঁজে পাওয়া অথবা দেখতে পাওয়া খুবই কঠিন। এই গভীর দুর্দশাময় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতির মধ্যে তাই অনেকেই খুব স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করেন, এই স্বাধীনতার জন্যই কি অগণিত শহীদগণ নিঃশব্দে প্রাণ উৎসর্গ করে গিয়েছেন ? এই প্রশ্নের একটিই মাত্র উত্তর আছে, না, নিশ্চয়ই তা' নয়। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘাযতীন প্রমুখ আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় শহীদগণ অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলেন নি, কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁরা কেউই চান নি যে তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আসবে সেই পরিস্থিতিতে দেশের শতকরা ৬৯ জন মানুষ দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে থাকবে এবং মাত্র ২৫টি পরিবার সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে। তাঁদের কামনা ছিল ইংরেজ দস্যুরা বিতাড়িত হবার পর দেশের মানুষ অন্ততঃ দুইবেলা দুইমুঠো পেটভরে খেতে পাবে। (ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত এ কি সম্ভব?)

পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখলে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, ভারতের মুক্তিকামী (শোষণ থেকে, অত্যাচার থেকে মুক্তিকামী) জনগণের হতাশা বোধ করবার কিছু নেই; ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাহত হবার যথার্থ কোন কারণ নেই। পৃথিবীর বহু দেশেই প্রায় এইরূপ অবস্থাই ঘটেছে।

ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, প্রধানতঃ সামন্ত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে, জনগণের মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব যে সব দেশে ধনিক শ্রেণীর হাতে ছিল, এবং প্রায় সব দেশেই তাই ছিল, সেই সব দেশেই সুনিশ্চিতভাবে গণসংগ্রামের জয়লাভের পর সেই জয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছে ধনিকেরাই; ফলে দেশের ব্যাপকতম জনসাধারণ পূর্বের ন্যায়ই শোষিত নিপীড়িত নির্যাতিত অবস্থায় থেকে গিয়েছে। ফরাসী দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে যে ঐতিহাসিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সংগ্রামে অগণিত সাধারণ মানুষের প্রাণদানের বিনিময়ে সফল বিপ্লবের পর যে ব্যবস্থা সৃষ্টি হল সেই ব্যবস্থায় শতকরা ৮০ জন মানুষই পূর্বেও যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইটালীতেও মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পর ইটালীর ব্যাপকতম জনগণ পূর্বের ন্যায়ই শোষিত নির্যাতিত রয়ে গিয়েছে এবং আরও বহু দেশেই।

সুতরাং আমাদের দেশেও স্বাধীনতালাভের পর যা' ঘটেছে তা' অস্বাভাবিক কিম্বা অদ্ভুত কিছুই নয়। এবং যা' ঘটেছে তাই-ই শেষ কথা নয় অথবা চিরস্থায়ী কিছুই নয়। যা' ঘটেছে তা' অতি স্বল্প সংখ্যক ধনিক জমিদারের অপসৃষ্টি। শেষ-কথা বলবে দেশের জনসাধারণ, ভারতের মুক্তিকামী নরনারী যাদের অন্তরের একান্ত কামনা ভারতে একটি শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক্। আমাদের দেশের জনসাধারণের এই আন্তরিক কামনার ভিতর অস্বাভাবিক অথবা অবাস্তব কিছুই নেই। রুশ দেশে যা সম্ভব হয়েছে, চীন দেশে যা' সম্ভব হয়েছে ভারতের জন-সাধারণের পক্ষে তা' সম্ভব হবে না মনে করবার কোন কারণই নেই। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে রুশ এবং চীন দেশে যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ওই উভয় দেশেই শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ওই দুইটি দেশেরই অবস্থা ছিল ভারত অপেক্ষা অনেক অনগ্রসর, অনেক অনুন্নত এবং অনেক পশ্চাৎ-অপসারিত।

ভারতের বর্তমান অবস্থা দেখে মুক্তিকামী জনগণের পক্ষে সত্য সত্যই হতাশ হবার কিছুই নেই। এক সময়ে ইংরেজরাও ভারতের জনমনে আতঙ্ক ও হতাশা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরি-কল্পিতভাবে প্রচার করত যে ইংরেজরা অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি; তাদের সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না; তাদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা অসম্ভব। কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত এক দিন ভারত থেকে দূর হয়ে চলে যেতে বাধ্য হল।

ভারতে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দেশের ব্যাপকতম জনগণের প্রকৃত কামনা এবং সুদৃঢ় সঙ্কল্প। কিন্তু কেবলমাত্র ইচ্ছা থাকলেই এই ব্যবস্থা আপনা থেকেই আসবে না, তার জন্য প্রয়োজন জন-গণের আন্তরিক প্রচেষ্টা। তাই, দ্বিতীয় শর্ত হল এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপকতম জনগণের নিরবচ্ছিন্ন এবং সুদৃঢ় প্রচেষ্টা অর্থাৎ সংগ্রাম। এবং জনগণের এই প্রচেষ্টা যাতে সুসংহত হয় এবং সামরিক পদ্ধতিতে ও সুদৃঢ়ভাবে শত্রু-পক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় তার জন্য একান্তভাবেই প্রয়োজন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর একটি শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় নেতৃত্ব ও সেই নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত জনগণ। সংগ্রামী জনগণ সংগঠিত না হলে তাদের লক্ষ্য স্পষ্ট হয় না, সঙ্কল্প দৃঢ় হয় না, এবং তাদের সংগ্রাম সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায় না।

আমাদের "স্বাধীনতা দিবস" (১৫ই আগষ্ট) আমাদের গৌরবের দিন, আমাদের গর্বের দিন। এই দিনটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুগণের বিরুদ্ধে আমাদের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ সাফল্যের নিদর্শন।

কিন্তু এ তো আমাদের অতীত কালের ইতিহাস। আমাদের বর্তমানও আশু ভবিষ্যতের লক্ষ্য ও দায়িত্ব হচ্ছে দেশ থেকে শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন চিরতরে নির্বাসিত করবার জন্য দেশব্যাপী গণমুক্তির সংগ্রাম সংগঠিত করা, গণমুক্তির সংগ্রাম আরম্ভ করা ও এই সংগ্রাম সফল করে তোলা।

তাই যারা গণমুক্তি প্রত্যাশী অর্থাৎ শোষণহীন সমাজ

[শেষাংশ ১৮ পৃষ্ঠায়]

আগষ্ট বিপ্লব ও আজ

সুকুমার দাস

ঐতিহাসিক আগষ্ট বিপ্লবের অর্ধলক্ষ শহীদের কথাই শুধু নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত জানা অজানা আরও অসংখ্য বিপ্লবীর কথা কোন প্রসংগে স্মরণ করতে গেলেই আজকের দিনে কেন যেন বারবার মনের মধ্যে একটা বড় প্রশ্ন প্রথমেই উঁকি মারে। কবিতার কয়েকটি ছত্রে অতি সহজেই যাকে প্রকাশ করা যায়।

"বীরের এ রক্ত স্রোত,
মাতার এ অশ্রু ধারা
এর যত মূল্য সে কি
ধরার ধূলোয় হ'বে হারা ?"

মনের কোণে উঁকি মারে বোধ হয় এই জন্য যে, এরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেদিন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃংখল মোচনের জন্য শাসক ও শোষক ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সে উদ্দেশ্য কি দেশ স্বাধীন হ'বার তেত্রিশ বছর পরেও এতটুকু সিদ্ধ হয়েছে? এতে কোন সন্দেহই নেই যে, সেদিনের সেই দুঃসাহসী রক্তঝরা সংগ্রামের পেছনে ছিল তাঁদের দু'টি মাত্র আকাঙ্ক্ষা। প্রথম ভারতের স্বাধীনতা অর্জন, পরে সেই স্বাধীন ভারতে সুন্দর এক শোষণহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও, শাসকের পরিবর্তন হলেও, তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণের ব্যাপারটা আজও শুধু স্বপ্নই রয়ে গেছে। অদূর ভবিষ্যতেও যে তাঁদের ইপ্সীত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছোতে পারবো, তারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনার আলো দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না, কারণ দেশের মানুষ আজও পিষ্ট হচ্ছে দুঃসহ দারিদ্র্যে, আর সেই পেষণ চলছে অবাধগতিতে এ দেশেরই মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনী পরিবারের নির্মম শোষণের যাঁতাকলে। এদের নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী এ সমাজ ব্যবস্থাই সমাজের সর্বস্তরে আজ প্রকট করে দিচ্ছে সর্বগ্রাসী এক শোচনীয় অবক্ষয়ের।

আজ, একদিকে পুঁজিবাদের এই বহুমুখী শোষণ, অপর দিকে দেশের দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করছে আর এক সর্বনাশা প্রবণতা, যে প্রবণতা বিচ্ছিন্নতাবাদের।

বিচ্ছিন্নতাবাদী এ অপপ্রয়াস আজ দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে এক মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যে অখন্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে ঐ সব বিপ্লবীরা সেদিন একমাত্র ভারতবাসী পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন-পণ করে দেশমুক্তির লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন, খন্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের সে সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। আজ সেই খন্ডিত ভারতও আবার বিচিত্র সব বিচ্ছিন্নতাবাদী ঢেউয়ের আঘাতে আরও খন্ড বিখন্ড হবার মুখোমুখী। এ এক সাংঘাতিক পরিস্থিতি! এই পরিস্থিতিতেই আজ স্মরণ করতে হচ্ছে আগষ্ট বিপ্লবকে —যে বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্তভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। সেই বিপ্লবের কাহিনীকে আজ আবার তুলে ধরতে হবে দেশের বর্তমান যুব সমাজের কাছে। তুলে ধরতে হবে শুধু এই জন্য যে, কিছু কায়েমী স্বার্থবাদীর দল আর কিছু বিদেশী চক্রের কারসাজিতে আজ দেশেরই কিছুসংখ্যক যুব-ছাত্র এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। আড়াল থেকে এই সব চক্রের উস্কানী এরা ধরতেও পারছে না। এরা বুঝতেই পারছে না যে ওদের অঞ্চলের অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য, ওদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষাকে মূলধন করে অদৃশ্য এক অশুভ শক্তি তাদের নিজেদের আরও বড় এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে আন্দোলনকারীদের আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণ তো হবেই না, এবং সর্বনাশ হবে সারা দেশের। যদি তাই হয়, তবে তো আগষ্ট বিপ্লবের শহীদদেরই শুধু নয়, দেশের জন্য অসংখ্য বিপ্লবীর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভারতের যুব সমাজের কাছে সত্যিই তা হবে চরম লজ্জার! আগষ্ট বিপ্লব সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে এ' কথা'টা মনে হলো বলেই আজকের যুব সমাজকে একটু সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি। আগষ্ট বিপ্লব সেদিন দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল তাদের মূল বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। আর বিদেশী চক্রের চক্রান্তে আজকের এ বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস সেই ঐক্যের মূলেই কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়েছে।

সেদিনের আগষ্ট বিপ্লবের মূলেও ছিল অত্যাচার, বৈষম্য ও উপেক্ষা। বহুদিন ধরে ইংরেজ সরকারের সীমাহীন উপেক্ষা ও অত্যাচার ভারতবাসীর অন্তরে পুঞ্জীভূত করেছিল প্রবল অসন্তোষ। অবশ্য এর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত হয়েছে নানা বৈপ্লবিক কর্মকান্ড। এবং ইংরেজ সরকারও প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে সে সব কর্ম প্রচেষ্টাকে দমন করে স্বীয় শাসনকে নিরঙ্কুশ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এত দমন পীড়নেও ঐ সব প্রচেষ্টা একেবারে থেমে থাকেনি কোনদিনই, সে কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। বল প্রয়োগে একদিকে তা কখনও সাময়িক স্তিমিত হলেও, অন্যদিকে সে বিদ্রোহের আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠেছে প্রায় তখনই। অবশ্য কংগ্রেস এসব বৈপ্লবিক প্রয়াসকে কোনদিন কার্যকরী বলে মনে করেননি। বরং তাঁরা একে হঠকারী প্রচেষ্টা বলে দূরে সরিয়ে রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন। ইংরেজ সরকারের এত অত্যাচার ও দমন পীড়নের পরও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইংরেজ রাজনীতিকদের সদিচ্ছা ও ন্যায় বিচারের ওপরেই ছিলেন অধিকতর আস্থাবান। তাঁরা মনে করতেন সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে আবেদন নিবেদনের নীতিই হবে বেশী কার্যকরী। তাই তাঁরা অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে বারবার হাজির হতেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের কিছুদিন আগে থেকেই কংগ্রেসের এ ক্লীব নীতির বিরুদ্ধে তাঁদেরই একাংশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এরা প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে চাইছিলেন। কিন্তু

কংগ্রেসের আপোষ প্রিয় নরম পন্থীরা এদের এ' দাবীকে বারবার সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ওরা এদের চরমপন্থী বলে আখ্যাত করে তাঁদের দেশের যুবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চরম-পন্থীদের মুখপাত্র হিসাবে তখন সম্মুখ সারিতে এগিয়ে এসেছেন বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের মতো দেশ নেতারা। চরমপন্থীদের ইচ্ছাকে তখন রোখে সাধ্য কার? তাঁরা দেশের যুবশক্তিকে বোঝালেন, "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার" এবং তা' আদায় করে নিতে হবে শত্রুকে চরম আঘাত হেনে। অপরাপর দেশের মুক্তি আন্দোলন এই শিক্ষাই দেয় যে, সাম্রাজ্যবাদ শক্তির প্রভুত্ব থেকে কোন দেশই আবেদন নিবেদনে রেহাই পায় নি। বিপ্লবই মুক্তির একমাত্র পথ। এই প্রেরণায় জেগে উঠলো মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব। সেখানকার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠলো নানা বৈপ্লবিক সংস্থা। এদের কর্মতৎপরতায় ভীত সন্ত্রস্ত ইংরেজ সরকার কিন্তু এদের চরম শাস্তি দিয়ে স্তব্ধ করার কোন কসুরই করলো না। দিকে দিকে বিপ্লবী কণ্ঠে ধ্বনিত হলো মৃত্যুর মহান জয়গান। সেই জয়গানেই সুর মেলালেন বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্কে, চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, সূর্য সেন, বিনয় বাদল ও দীনেশের মত আরোও অসংখ্য নির্ভীক বিপ্লবীদল। আগষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এদেরও পরে এবং এদেরই মহান আত্মাহুতির মহান অনুপ্রেরণায়।

সেদিনটি ছিল ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট। যেদিন সারা দেশ জুড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শক্তিকে ভারতের মাটি থেকে চিরতরে উৎখাত করবার জন্য শুরু হয়েছিল বিপ্লবীদের এক মরণপণ সংগ্রাম। আগের দিন, অর্থাৎ ৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ হয় "ইংরেজকে এখনই ভারত ছাড়তে হবে", এবং এই দাবীতেই সারা দেশে আন্দোলন শুরু করা হবে। এ প্রস্তাব পাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাইতে উপস্থিত সকল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করলো এবং সে কাজটি তারা করলো অনায়াসেই। কারণ ঐ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশকরেও কোন নেতা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার প্রয়োজনে আত্মগোপন করে থাকার কোন চেষ্টাই করলেন না। গ্রেপ্তারের পরে তাঁরা স্থান পেলেন কোন প্রাসাদে, না হয় কান দুর্গে।

কিন্তু দেশের যুবশক্তি নেতৃত্বের জন্য এক মুহূর্তও বসে রইলো না। এ প্রস্তাব পাশ হওয়ার সংবাদ এবং নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা দেশজুড়ে তাঁরা শুরু করলেন প্রচন্ড আন্দোলন, "ইংরেজ ভারত ছাড়ো" এবং "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" এই ধ্বনি তুলে তাঁরা ইংরেজ শাসনের চিহ্নগুলিকে সমূলে উপড়ে ফেলতে চাইলেন। আন্দোলনের প্রাবল্যে প্রথমে পিছু হটলো ইংরেজ সরকার কিন্তু অচিরেই নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে তারা বিপ্লবীদের ওপর চালালো অমানুবিক দমন পীড়ন। ইংরেজ সরকার বুঝেছিল যে, এ আন্দোলন যে ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করছে, তাতে একে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে ফেলতে না পারলে ভারতে তাদের শাসনের দিন অচিরেই ফুরিয়ে যাবে। তাই প্রচন্ড পশুশক্তি নিয়ে, পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে তারা এ আন্দোলন দমনে বিপ্লবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওরা মনে করেছিল, বেয়নেট ও গুলিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আন্দোলনকারীরা দমে যাবে। কিন্তু ওদের এ ধারণা কয়াটাই হলো মস্ত বড়ো ভুল। বলপ্রয়োগে এ আন্দোলন দমন করতে যাওয়ার ফল হলো উল্টো। মার খেয়ে বিদ্রোহীরা গান্ধীজীর নির্দেশিত অহিংসার গন্ডী ছেড়ে বেরিয়ে মারমুখী ও সহিংস হয়ে উঠলেন। শুরু হলো সহিংস প্রত্যাঘাত, মারের বদলে মার। আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠলো তাদের সহিংস কর্ম-প্রচেষ্টায়। তাঁরা উপড়ে ফেললেন রেল লাইন আর টেলিফোনের খুঁটি। কেটে দিলেন টেলিফোনের তার, ভেঙ্গে ফেললেন সড়ক ও পুল। জোর করে দখল করতে লাগলেন একের পর এক থানা। নেতৃত্বহীন অসহযোগ আন্দোলন তখন আর নিছক আন্দোলন নয়, তা রূপান্তরিত হয়ে গেল এক রক্তাক্ত বিপ্লবে। ক্ষিপ্ত ইংরেজ সরকারও বিপ্লবীদের প্রতি চালালো বেয়নেট, গুলি, এমনকি ওপর থেকে মেসিনগান দেগেও বোমা ফেলেও ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলো। এরই ফলে নিহত হলেন শত শত বিপ্লবী। সিন্ধু প্রদেশের হিমু কালানি এ বিপ্লবে প্রথম শহীদ হয়ে দেশের বিপ্লবীদের আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করলেন।

দিল্লীতে ১১ই এবং ১২ই আগষ্ট চললো পুলিশের বারবার গুলি। এতে নিহত হলেন ছিয়াত্তর জন। একইভাবে নাম না জানা অসংখ্য শহীদের সাথে নিহত হলেন বিহারের উমাকান্ত প্রসাদ, রামানন্দ সিং, সতীশ প্রসাদ ঝা, বাংলায় মাতঙ্গিনী হাজরা, রামচন্দ্র বেরা, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, বৈদ্যনাথ সেন এবং আসামে ভোগেশ্বরী, বালুরাম, কনকলতা ও মুকুন্দ। এ আন্দোলন তখন হয়ে উঠেছে দুর্বার। সকলেরই এক লক্ষ্য, চূর্ণ করো ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ। ইংরেজের রক্ত-চক্ষুকে অবহেলাভরে উপেক্ষা করে ভারতের নানা রাজ্যে গঠিত হ'লো স্বাধীন জাতীয় সরকার। মেদিনীপুরের তমলুক, উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলা এবং মহারাষ্ট্রের সাতারা হলো যে স্বাধীন সরকারের শক্ত ঘাঁটি। বস্তুতঃপক্ষে এ ক'য়েকটি অঞ্চলে সেই সময়ে ব্রিটিশ শাসন বলে কোন চিহ্নই ছিল না। সেখানে সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ হচ্ছিলো বিপ্লবী সংগঠন দ্বারা।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক আগষ্ট বিপ্লবে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এক বছর নয়, ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪-এর ৮ই আগষ্ট পর্যন্ত তমলুকের ঐ স্বাধীন জাতীয় সরকার মাথা উঁচু করে ব্রিটিশ সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছিল। এই সময়ে ইংরেজ শাসকদের কোন ক্ষমতাই ছিল না এর চৌহদ্দির মধ্যে কোন রকমে প্রবেশ করে। ঐ সরকার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে একদিন ঐ অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি তুলে এগিয়ে চললো মিছিল করে তমলুক থানা দখল করতে। ওদের ভয় দেখাতে পুলিশ প্রথমে চালালো কয়েক রাউন্ড গুলি। কিন্তু ফল এতে কিছুই হ'ল না। জনতা এগিয়ে চললো আরও তেজে এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে। উপায় না দেখে এবার ডাকা হলো মিলিটারী। তারা এসেই ঐ মিছিলের ওপর চালালো বেপরোয়া গুলি। মিছিলের পুরোভাগে পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছিলেন রামচন্দ্র বেরা। গুলির আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে ঐভাবে পড়ে যেতে দেখে ঐ পতাকাটি তুলে নিতে এগিয়ে এলো

তেরো বছরের নির্ভীক বালক লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। মৃত্যু তাকেও কোলে টেনে নিল সেই মুহূর্তেই। জনতা বুঝি একটু চঞ্চল হ'লো। কিন্তু ওদের বিভ্রান্ত হবার কোন সুযোগ না দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে পতাকাটিকে তখনই তুলে নিলেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। মিছিল যেন আবার প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু বেশী এগোতে হ'ল না তাদের; নিমেষের মধ্যে মিলিটারীর একটা গুলি মাথা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো মাতঙ্গিনী হাজরার। প্রাণহীন দেহ তাঁর লুটিয়ে পড়লো সেখানেই। কিন্তু সকলে অবাক হয়ে দেখলো বৃদ্ধা মাতা মাতঙ্গিনী মরে গিয়েও শক্ত করে আগের মতোই তখনও ধরে রেখেছেন সেই পতাকাটিকে। গুলি তবুও থামলো না। ওখানেই নিহত হলেন পুরীমাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, জীবনচন্দ্র বেরা, তাছাড়া আরও একচল্লিশ জন। কিন্তু এতেও ভয়ে স্থান ত্যাগ করলো না জনতা। সারা রাত তাঁরা থানা ঘিরে বসে রইলেন। পরদিন সকালবেলা জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি হলো অনেকগুণ। এবার আর তাঁদের ঠেকান ইংরেজ সরকারের পক্ষে সম্ভব হ'লো না। ওঁরা দখল করে নিলেন থানা এবং আগুন লাগিয়ে দিলেন অত্যাচারী দারোগার বাড়ীতে। রক্তঝরা অসম সাহসিক এ ঘটনাটির জন্যই আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপুর সৃষ্টি করলো এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আর সেখানকার বৃদ্ধা মাতা মাতঙ্গিনী হাজরা ঐভাবে শহীদ হয়ে দেশবাসীর কাছে হয়ে রইলেন চির-নমস্যা।

অতীতের বহু বিপ্লব প্রয়াসের মতো একদিন এ আগষ্ট বিপ্লবও দমিত হ'লো। কিন্তু তা' একেবারেই ব্যর্থ হ'লো না। এ বিপ্লবে অর্ধলক্ষ মানুষ শহীদের মৃত্যু বরণ করে দেশের মানুষের মনে জাগিয়ে গেল এক দুরন্ত সংগ্রামী চেতনা। সে চেতনা এ আন্দোলনের পরেও কাজ করে যাচ্ছিলো অবিরাম-ভাবে, একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে। ইংরেজ সরকার গর্বভরে সেদিন তাদের দেশে প্রচার করেছিলো যে দমন পীড়নেই পিছু হঠেছে সন্ত্রাসবাদীরা। কিন্তু সেটা আত্মপ্রসাদ লাভ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ আন্দোলন দমন করতে ইংরেজ সরকার তাদের প্রবল পাশব শক্তিকেই সেদিন শুধু প্রয়োগ করেনি, সাথে সাথে অবলম্বন করেছিলো বহু নিন্দনীয় নির্যাতনের কৌশল। এমনকি, ভারতীয় মহিলাদের ওপরও এরা সেদিন অমানুষিক অত্যাচার চালাতে কসুর করেনি। কিন্তু তবুও এ বিপ্লব শুধু ওদের ঐ দমন পীড়নের কাঠিন্যেই দমিত হয়নি। এ বিপ্লব ক্রমশঃ স্তব্ধ হ'তে বাধ্য হয়েছিল আরও নানা কারণে। প্রথমতঃ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশবাসীর এ সহিংস জাগরণকে কোনদিনই সমর্থন করেন নি। দ্বিতীয়তঃ এ বিপ্লব চলছিল নেতৃত্বহীন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বল্গাহীন গতিতে। আর এরই মধ্যে বন্দী অবস্থায় স্বয়ং গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে হানলেন আর এক মোক্ষম অস্ত্র। হঠাৎ আগাখাঁ প্রাসাদে তিনি একুশ দিনের অনশন করে বসলেন। শুধু তাই নয়, দেশের অনেক রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দলও সেদিন এ বিপ্লবের সঠিক মূল্যায়ন করে একে যথা-যোগ্য মর্যাদাদান ও উৎসাহ যোগাতে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থ হয়েছিলেন গান্ধীজীও এ আন্দোলন শুরু করার সঠিক সময় নির্ধারণে। তিনি জনগণের বিপ্লবী মানসিকতাকে অনুধাবন করে যখন অনন্যোপায় হয়ে এ "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ করলেন, তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। ইংরেজ সরকার তখন আর প্রাক বিশ্ব যুদ্ধের প্রবল সংকটে নেই। সেইজন্য দূরদর্শী সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালেই জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের প্রদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইংরেজ সরকারকে দেশত্যাগের জন্য ছ'মাসের নোটিশ দিয়ে চরমপত্র দেওয়া হোক এবং ঐ সময়ের মধ্যে তারা ভারত ত্যাগ না করলে এবং ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা না করলে, নোটিশের সময় উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও তদানীন্তন কংগ্রেস হাইকমাণ্ড সুভাষচন্দ্রের সে প্রস্তাব সময়োপযোগী তো মনে করলেনই না বরং সংকট মুহূর্তে ইংরেজ সরকারকে ঐভাবে ব্যতিব্যস্ত করা বিশ্বের কাছে নিন্দনীয় হবে বলেও মন্তব্য করলেন। কিন্তু সঙ্কটাক্রান্ত ইংরেজের দুর্বল মুহূর্তে আঘাত হানবার ওটাই ছিল মাহেন্দ্র-ক্ষণ। তখন এ প্রস্তাব কানে না তুললেও গান্ধীজী কিন্তু ঐ প্রস্তাবই পাশ করলেন তার মাত্র তিন বছর পরে বোম্বাইয়ের অধিবেশনে। এই তিন বছরে তাদের হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করে ইংরেজ সরকার কিন্তু তখন অনেক বলে বলীয়ান। তাই বলপ্রয়োগে এ আন্দোলন দমন করতে তারা সমর্থও হলো।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা মতো যদি দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের প্রাক্কালেই এই "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ করা হতো, তবে হয়তো দেশের ইতিহাসও আজ অন্যভাবে লেখা হয়ে যেত। অপমানকর আপোষী স্বাধীনতার ফাঁস চিরদিনের জন্য ভারতবাসীর গলায় পরতেও হ'তো না। সে ফাঁস আজ পদে পদে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের পথে বাধার সৃষ্টি করছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ দেশ ছেড়েছে, তেত্রিশ বছর, কিন্তু আজও কি ভারত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়েছে? পেয়েছে কি ভারত আজও কমনওয়েলথের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে? বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজও এদেশে ইংরেজ পুঁজি কি খাটছে না? তদানীন্তন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের গতিবিধি অনুধাবন করেই সুভাষচন্দ্র সেদিন সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, কংগ্রেস অনুসৃত এ ক্লীব আপোষের পথে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও, পূর্ণ স্বাধীনতা সে পাবে না। বিদেশী শাসক আপোষের মাধ্যমে ভারতকে খণ্ডিত ক'রে যে স্বাধীনতা দেবে, তার মূলেই তারা কৌশলে রেখে যাবে জাতি-বৈরীতার এক সর্বনাশা বীজ। সে জাতি-বৈরীতার বীজই আজ মহীরুহ হয়ে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ আন্দোলন দেশের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই ডেকে আনবে না। তদানীন্তন কংগ্রেসের চালচলনে ব্যথিত হয়েই অন-ন্যোপায় সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে শত্রু পরিবেষ্ঠিত হয়ে এ দেশে থেকে তাঁর উদ্দেশ্য কোনমতেই সিদ্ধ হবে না। তাই দেশ ত্যাগ করে তিনি বার্লিন, টোকিও হয়ে সিঙ্গাপুরে এসে প্রতিষ্ঠা করলেন আজাদ হিন্দ সরকার। আর সেই সরকারের ফৌজ নিয়েই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ব্রিটিশ ও আমে-রিকার মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে। যুদ্ধ করতে করতে আজাদী সেনারা এগিয়ে এলেন ভারতের মণিপুরে। সেখানে তারা উড়িয়ে দিলেন স্বাধীন ভারতের পতাকা। কিন্তু কোহিমায় এসেই নানা প্রতিকূলতায় রুদ্ধ হলো তাঁদের অগ্রগতি। ব্যর্থ হলো ওদের অভিযান। কিন্তু ব্যর্থ হলো না ওদের প্রচণ্ড

আক্রমণের প্রতিক্রিয়া, যা আলগা করে দিয়ে গেল ইংরেজ-শাসনের শক্ত বুনিয়াদ। একদিকে দেশের অভ্যন্তরে এই আগস্ট বিপ্লব ও অন্যান্য বিপ্লবের ঢেউ, অপরদিকে নেতাজীর সুযোগ্য পরিচালনায় দেশের বাইরে থেকে আজাদী সেনাদের মরণপণ সংগ্রাম—এ দুয়ে মিলে নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করলো ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম কাল। প্রকৃতপক্ষে দেশের মানুষের ঐ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করেছিল ক্যাবিনেট মিশন ও মাউন্টব্যাটেনের মিশনকে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষের আলোচনায় বসতে। অতএব, ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে এসব সশস্ত্র সংগ্রামীদের অবদান অতুলনীয়। কিন্তু লজ্জার কথা তবুও কংগ্রেস সরকার এসব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও বিপ্লবীদের কীর্তি গাঁথাকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই অতি কৌশলে আড়ালে করবার—অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে। হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন তুলে তারা আজ এদের অবদানকে মুছে ফেলার এক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু তো স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য একমাত্র গান্ধীজীর অবদানকেই স্বীকার করতে চেয়েছেন। আর তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তো দেশের শহীদদের সঙ্গে করে-চলেছেন একের পর এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা। দিল্লীর লাল-কেল্লার প্রাঙ্গণে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জানাবার উদ্দেশ্যে তিনি "কালাধারে" ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বিকৃত ইতিহাস লিখে রেখেছিলেন, তাতে তিনি ভারতের কোন বিপ্লবীর নাম তো রাখেনই নি, এমনকি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের নামটি পর্যন্ত তা থেকে তিনি বাদ দেবার মত দুঃসাহস দেখিয়েছেন। সেদিনও পার্লামেন্ট ভবনের সামনে প্রদর্শিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের চিত্র প্রদর্শনীতে তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের কোন ছবিকে স্থান দেননি। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি এর চেয়ে চরম বেইমানী আর কি হতে পারে?

এতে আর আশ্চর্য হবার কিছু থাকতে পারে না যে, যে সরকার দেশের জন্য নিহত শহীদদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেন, যে সরকার নির্লজ্জের মতো সহজেই অস্বীকার করতে পারেন শহীদের রক্তের ঋণ, সে সরকার তাঁদের দেখা সুন্দর শোষণ-হীন সমাজ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অনীহা প্রকাশ করবেনই। আরও আশ্চর্যের যে, এ বঞ্চনা ও তাচ্ছিল্য কেবলমাত্র ভারতের বিপ্লবীদের প্রতিই এরা করে চলেন নি, এরা প্রতিনিয়ত নিজেদের স্বার্থে গান্ধীজীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও অনেক ক্ষেত্রে কোন মূল্যই দেননি। দিলে, গান্ধীজীর ১৯৪২-এর ৮ই আগস্টেরই এ. আই. সি. সি. অধিবেশনে দেয়া 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মূল প্রস্তাবটির প্রতি সম্মান দেখিয়েও তা রূপদানের উদ্যোগ তাঁরা গ্রহণ করতেন। অথচ সেদিনের প্রস্তাবে তিনি শুধু ভারত থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান চাননি সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রস্তাবেই তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ শাসন অবসানের পর ভারতে শ্রমিক-কৃষকের রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে। সে উদ্যোগ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পুঁজিবাদের প্রসারই কেবল ঘটছে। এরই ফলে দিনের পর দিন দেশে নানা সঙ্কটই শুধু বাড়ছে। আর এ সঙ্কটে জনসাধারণ সরকারের কাছ থেকে শোষণ ও বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু পাচ্ছে না।

ইতিহাসের শিক্ষায় পরিশেষে বলি যে, যে কোন শোষণ, বঞ্চনা, উপেক্ষারই একটা শেষ থাকে। এ সবের বিরুদ্ধে মানুষের মনের পুঞ্জীভূত অভিযোগকে ছল চাতুরী ও বলপ্রয়োগে বেশীদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। দেশের চারিদিকে আজ বিচ্ছিন্নতাবাদের যে ঢেউ বইছে, তার মূলে কায়েমী স্বার্থ-বাদী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাত থাকলেও, এ ব্যাপারে শাসক শ্রেণীর দীর্ঘদিনের ক্ষমাহীন উপেক্ষা ও চরম অব-হেলাকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আসলে এর বিরুদ্ধেই ওদের কারো কারো "বিদেশী বিতাড়নের" আন্দোলন আবার কারো কারো একেবারে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের আন্দোলন। এগুলিও আন্দোলন। তবে আগস্ট বিপ্লবের আন্দোলনের চেয়ে এর চেহারাটা একটু (?) আলাদা। আগস্ট বিপ্লবে সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'বিদেশী' ইংরেজদের ভারত ছাড়া করতে চেয়েছিলেন। আর আজ এসব আন্দোলন-কারীরা এ দেশেরই মানুষকে বিদেশী আখ্যা দিয়ে দেশছাড়া করতে চাইছে। সেদিন আগস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল দেশের অখণ্ডতা রক্ষার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে, আর আজ এই সব আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে দেশটাকে আরও খণ্ড-বিখণ্ড করতে।

[আমাদের স্বাধীনতা দিবস : ১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ব্যবস্থা কামনা করেন তাদের উদ্যোগ এবং উৎসাহ নিয়ে জন-গণকে তাদের নিজস্ব শ্রেণী সংগঠনে, অর্থাৎ খেটেখাওয়া মানুষকে তাদের ইউনিয়নে, কৃষকগণকে তাদের সমিতিতে, মধ্যবিত্তগণকে তাদের বিভিন্ন সমিতি অথবা সংগঠনে, ছাত্র যুব ও নারীগণকে তাদের নিজস্ব সংগঠনে সংগঠিত করবার দায়িত্ব নিতে হবে। সংগ্রামের পদ্ধতির কথা বলে গেছেন কার্ল মার্ক্স; সংগ্রামের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন লেনিন, স্ট্যালিন, এবং আমাদের দেশের ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘাযতীন, সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ শহীদগণ। দুর্দমনীয় এবং আপোষহীন সংগ্রাম ব্যতীত বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয় এবং গণমুক্তিও সম্ভব নয়।

"স্বাধীনতা দিবসে" আমাদের অন্যতম সঙ্কল্প এবং শপথ হোক, গণমুক্তির জন্য আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতিতে সর্বত্র যথা-যোগ্য গণ-সংগঠন তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করা।

কর্মচারী চয়ন আয়োগ : কি ভাবে নিয়োগ হয়

রণজিৎ কিশোর চক্রবর্তী ঠাকুর

[তীব্র বেকার সমস্যায় জর্জরিত ভারতবর্ষে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। হাজার হাজার যুবক পকেটে মূল্যবান ডিগ্রী ডিপ্লোমা থাকা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না। ফলে নেমে আসছে এক চরম হতাশা। ক্রোধ-ক্ষোভ, ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটছে নানাভাবে। যুব সমাজের এই জটিল সমস্যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

সবচেয়ে বিস্ময়কর, অনেক যুবক-যুবতী—মূলত গ্রামাঞ্চলের যুবক-যুবতী—শিক্ষাক্রম সমাপ্তির পর কিভাবে চাকুরীর জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় তাও উপযুক্ত নির্দেশকের অভাবে বুঝতে পারেন না। ফলে অত্যন্ত সীমিত যে সুযোগটুকু রয়েছে তাও তারা ব্যবহার করতে পারেন না। বর্তমান নিবন্ধটি তাদের যথেষ্ট উপকারে আসতে পারে বিবেচনা করে আমরা যুবমানসে প্রকাশ করলাম। নিবন্ধের লেখক রণজিৎ কিশোর চক্রবর্তী ঠাকুর কেন্দ্রীয় সরকারের স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পূর্বাঞ্চলের রিজিওনাল ডাইরেক্টর।]

—সঃ মঃ যুবমানস

কেন্দ্রীয় সরকারের গত ৪ঠা নভেম্বরের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মচারী চয়ন আয়োগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ১৯৭৬ সালে এর রীতিনিবদ্ধ অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছিল। প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৭৮-এ। এই আয়োগ-এর পাঁচটি আঞ্চলিক শাখা আছে। (১) পূর্বাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—কলকাতা) (২) দক্ষিণাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—মাদ্রাজ), (৩) পশ্চিমাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—বোম্বাই), (৪) উত্তরাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র -দিল্লী) এবং (৫) মধ্যাঞ্চলীয় (কার্যকেন্দ্র—এলাহাবাদ)। এই শাখাগুলির প্রত্যেকটি এক এক জন আঞ্চলাধিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্বাঞ্চলীয় শাখা আটটি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত উপরাজ্য নিয়ে গঠিত। পশ্চিমে উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণে আন্দামান এবং সুদূর উত্তর-পূর্বে অরুণাচল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মনোনয়ন করাই এই আয়োগের কাজ। এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরাই কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যা গরিষ্ঠ কর্মচারী। প্রায় ৫২ শতাংশ (যেখানে "যুক্তরাষ্ট্রীয় গণ কৃত্যক আয়োগ" মাত্র তিন শতাংশের মনোনয়ন করেন)। অবশিষ্ট চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রায়োগিক (Technical) নিয়োজিত হন [সরকারের] বিভাগগুলির নিজস্ব নির্ধারণে। মাসিক ২৬০- টাকা থেকে ৯০০- টাকা পর্যন্ত এই তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের বেতনের পরিধি। প্রায়োগিক (Technical) শব্দটির কোনও ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা [উপরিলিখিত] সরকারী সিদ্ধান্তে দেওয়া হয় নি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ডাক্তারী শাস্ত্রে স্নাতক উপাধি বিশিষ্ট কর্মচারী এই আয়োগের মনোনয়ন বিষয়ীভূত নয়। Senior Geological Assistant অথবা Senior Zoological Assistant (৫৫০—৯০০ বেতন ক্রম) অথবা আবহাওয়া বিভাগের Senior Observer (পদার্থ বিদ্যায় এম. এস্‌সি যোগ্যতা বিশিষ্ট) ও অ-প্রায়োগিক (non-technical) পদ বলে পরিগণিত এবং এই আয়োগ-এর আওতাভুক্ত।

(২) শিক্ষিত বেকার যুবকদের এই আয়োগ মারফৎ কর্মসংস্থানের প্রভূত সুযোগ রয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী সংস্থানের জন্য যেরূপ প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষক প্রয়োজন এক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু এই আয়োগের ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, ভারত সরকারের কোনও অফিসে কেরানীর চাকুরী সংগ্রহ করতে মাত্র একবার দরখাস্ত পেশ করতে হয়; এমনকি কোনও Interview ও দরকার নেই। পূর্বে আয়কর বিভাগে কেরানী চাকুরী প্রার্থীকে এবং শুল্ক বিভাগে অনুরূপ চাকুরীর জন্য পৃথক পৃথক দরখাস্ত করতে হত এবং এ ব্যবস্থায় একই দিনে দুটি পরীক্ষায় বসতে হ'ত। প্রতি পরীক্ষার পৃথক ফি, পরীক্ষা দিতে যাতায়াত খরচ খুব বেশী ছিল। এই সব অসুবিধা এবং বাড়তি ব্যয় কমানোই এই আয়োগ-এর উদ্দেশ্য।

কেরানী পদ সমূহের জন্য আয়োগ নির্ধারিত সুযোগ সুবিধার কথা বলা হ'ল। অনুরূপভাবে, আয়কর বিভাগের অবর আধিকারিক (Junior Officer) যেমন -Income Tax Inspector, Central Excise Inspector, Preventive Officer (শুল্ক বিভাগ) প্রভৃতি পদের জন্য প্রার্থীকে একবার দরখাস্ত দিতে, Interview-র জন্য একবারই উপস্থিত হ'তে হবে এবং একটি মাত্র একক যুগ্ম প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিতে হবে। কারণ, এই পদগুলির বেতনক্রম, নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক/উপাধি প্রভৃতি একরূপ। কার্যক্রম পৃথক হলেও—চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্যই কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের পরিদর্শক অথবা শুল্ক বিভাগের নিরোধক আধিকারিক (Preventive Officer) পদের চাইতে আয়কর বিভাগের পরিদর্শকের শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা কম। কার্যতঃ

কর্মবিন্যাসের সময় কর্মপ্রার্থীর পরীক্ষার ফল ও নানারূপ কর্মক্ষমতার বিষয়ও পরিগণনা/বিবেচনা করা হয়।

(৩) এই আয়োগ বছরে পাঁচটি পরীক্ষা গ্রহণ করে; যথা—(১) কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষা (২) সমীক্ষক/অবর হিসাব রক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা (৩) আয়কর পরিদর্শক পরীক্ষা (৪) রেখাক্ষর বিশারদ পরীক্ষা (৫) পুলিশ বিভাগের সহ-পরিদর্শক পরীক্ষা।

কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষা এবং রেখাক্ষর বিশারদ পরীক্ষা একই লিখিত পরীক্ষা হ'লেও রেখাক্ষর বিশারদ পদের জন্য প্রার্থীকে ৩টি স্তরে (মিনিটে ৮০ শব্দের, ১০০ এবং ১২০ শব্দের) ব্যবহারিক পরীক্ষা (Test) দিতে হবে। তিন স্তরের Stenographer পদের বেতনক্রম পৃথক পৃথক হওয়ায় পৃথক Test গৃহীত হয়। কেরানী পর্যায়ের বিষয়গত ধরনের (Objective Type) একটি লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয়। ইংরাজী ভাষা, সাধারণ জ্ঞান, প্রাত্যহিক বিজ্ঞান, সহজ গণিত নিয়ে একটি পত্র (Paper)। কোনও রচনা বা সংক্ষিপ্তসার লিখতে হয় না। প্রার্থীকে শুধুমাত্র চারটি বিকল্পের মধ্য থেকে ঠিক বিষয়কে চিহ্নিত করতে হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে কেরানী পদের জন্য প্রার্থীকে Type Test এবং Stenographer পদের জন্য Stenography Test দিতে হয়। ভারত সরকারের প্রতিটি কেরানীকে চাকরীতে যোগদানের পূর্বে অন্ততঃ মিনিটে ৩০টা শব্দ টাইপ করার ক্ষমতা থাকা দরকার। এই পরীক্ষা শুধুমাত্র যোগ্যতা বিধায়ক—সুতরাং প্রাপ্ত নম্বর যোগ দেওয়া হয় না। কিন্তু Stenography Test-এর নম্বর লিখিত পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে একত্রে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতার জন্য বিবেচিত হয়। সমীক্ষক (Auditor) পদের পরীক্ষায় ৩টি পত্র (Paper)। ১ম টি বস্তুগত বিষয়গত সাধারণ পাঠ এবং এতে কৃতকার্য হ'লে প্রার্থীর অন্য দু'টি উত্তর পত্র করা হয়। একই দিনে প্রার্থী ৩টি পত্র পরীক্ষা দিবে, ১ম পত্র সাধারণ জ্ঞান, ২য় পত্র সাধারণ ইংরাজী এবং ৩য় পত্র গণিত (স্কুলফাইনাল মানের)। এই আয়োগ প্রার্থীর পছন্দ ও যোগ্যতানুযায়ী মনোনয়ন দিলে কৃতকার্য প্রার্থীকে যেকোন বিভাগে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়। আয়কর পরিদর্শক পরীক্ষাও অনুরূপ। সমীক্ষক পরীক্ষার মত এতেও ৩টি পত্রে পরীক্ষা হয়। প্রথম পত্রটি বিষয়গত এবং অপনয়নার্থে প্রযুক্ত। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে প্রার্থীকে Interview-এ ডাকা হয়, উত্তীর্ণ হ'লে প্রার্থীর পছন্দ ও যোগ্যতামত আয়োগ-এর সুপারিশক্রমে প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়। পুলিশ বিভাগের Sub-Inspector পদের পরীক্ষায়ও তিনটি পত্র—সাধারণ ইংরাজী, সাধারণ জ্ঞান এবং দিল্লী পুলিসের (Delhi Police Establishment) সাধারণ হিন্দী এবং রচনা। পরীক্ষার মান আয়কর পরিদর্শকের পরীক্ষার মত। Interview-ও অবশ্যই দিতে হবে। আয়োগ প্রতিটি পরীক্ষা রুটিন মাফিক বৎসরে একবার নির্ধারণ করে। কখনও বা কোনও আঞ্চলিক শাখায় কর্মচারী হ্রাস নিবন্ধন বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। অবশ্যই স্বীকার্য যে, অঞ্চলগুলির অকান্তর বিভাগে শিক্ষাগত মানের অসাম্য আছে এবং সেজন্য কৃতকার্যতার ন্যূনতম ধারা উঁচু নীচু হওয়া উচিত। যেমন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর (Reserved Category) প্রার্থীদের জন্য করা হয়। আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে প্রথম পরীক্ষায় প্রার্থীরা ভালো ফল করে না—তাই বিশেষ পরীক্ষা (Special Test) গ্রহণ করতে হয়। যদিও পরীক্ষাগুলি সর্বভারতীয়, তবুও আসামে তা অল্পবিস্তর রাজ্যভিত্তিক এবং প্রকৃত প্রস্তাবে খণ্ড অঞ্চল ভিত্তিক; কারণ প্রতিটি রাজ্য ও উপরাজ্যের জনগণের আকাঙ্খার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা দরকার। রাজ্য বিশেষে বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও যখন কৃতকার্য প্রার্থীর অভাব হয় তখনই কেবল আমরা ভিন্নরাজ্যের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিই।

(৪) কর্মচারী মনোনয়নের জন্য অন্য আরও সংগঠন রয়েছে যেমন—Banking Service Recruitment Board, State PSC, UPSC এবং Railway Service Commission। যাতে বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কোন পরীক্ষার দিনক্ষণ নির্ধারণে সংঘাত উপস্থিত না হয় এজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। তবে সব সময়ই যে এই অসুবিধা পরিহার করা যায় এমন নয়। ভারত সরকারের অধীনে বিশেষ শ্রেণীর চাকুরীর ক্ষেত্রে [হয়ত] পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা সম্ভবপর হয় না। ১৯৭৯ সালের সমীক্ষক পরীক্ষায় এই আয়োগ নির্ধারিত ৭ই অক্টোবর তারিখটি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করে এবং ঐ আয়োগ কর্তৃপক্ষের সুপারিশে কেরানী পরীক্ষা ১৪ই অক্টোবর স্থানান্তরিত করা হয়। পরীক্ষাপত্র সর্বদাই কেন্দ্রীয়ভাবে দিল্লীতে পরীক্ষিত এবং তারজন্য পরীক্ষান্তে সমস্ত উত্তর পত্রই পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে সরাসরি দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত পরীক্ষাকালে, বিশেষতঃ কেরানী পর্যায়ের পরীক্ষার সময় সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বহুবিধ লোকের প্রয়োজন হয়--পরীক্ষার নজরদার, পর্যবেক্ষক এবং পরিচালনার জন্য সংশিল্লষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আমরা প্রভূত সহযোগিতা লাভ করি। এমনকি Stenography Test-এর সময় অনুচ্ছেদ বিশেষের dictation প্রয়োজনে বিভিন্ন কলেজ এবং সরকারী অফিসের আধিকারিকগণের সাহায্য পাই এবং তাঁরা পরীক্ষার মান ও ঐক্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকেন।

গত দু'বছরে এই আয়োগ-এর কার্যকারিতা এতটা সন্তোষজনক হয়েছে যে Delhi Municipal Board এবং Delhi State Transport Corporation ও তাদের কর্মচারী মনোনয়নের ভার আমাদের উপর দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে Controller and Auditor General-এর অফিস সমূহ আমাদের আয়ত্তাহীন নহে। কিন্তু ঐ অফিসের কর্তৃত্বও এই আয়োগের উপর কর্মচারী চয়নের ভার ন্যস্ত করেছে। এবং আয়োগ ও তা গ্রহণ করেছে। এগুলি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যাপার/পরীক্ষা।

এবারের সীমিত পরীক্ষার কথা বলতে হচ্ছে। এগুলি নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণীর পদোন্নতির জন্য বিভাগীয় পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক টাইপ পরীক্ষা (ঘ-বিভাগ থেকে গ-বিভাগে উত্তরণের জন্য) প্রভৃতি। দিনে দিনে এই আয়োগ-এর কাজের পরিমাণ বাড়ছে এবং ১৯৭৯ সালে আমাদের কতিপয় বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। এছাড়াও ভারত সরকারের আবহাওয়া অফিসগুলির জন্য Senior Observer পদের মনোনয়নের জন্যও একটি বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

(৫) পরীক্ষা এবং Interview-এর মাঝামাঝি Profi-

ciency Test নামে এক ধরনের সমীক্ষা আছে। গ্রন্থাগারিক (Junior Librarian, Assistant Librarian প্রভৃতি) পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি। আমরা এক ঘন্টার একটি Proficiency Test-এর অবতারণা করেছি। প্রার্থীকে Proficiency Test-এ হাজির হয়ে একই দিনে Interview-তেও উপস্থিত হতে হয়। Proficiency Test-এর উত্তরপত্র রাজ্য সরকারের রাজ্য P. S. C. প্রভৃতির আধিকারিকদের দিয়ে পরীক্ষা করান হয়। কোন বিশেষ কাজের জন্য পদ সংখ্যা খুব কম (দশেরও কম) হ'লে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না এবং সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র Interview এবং Proficiency Test-এর উপর ভিত্তি করে মনোনয়ন করা হয়। সমস্ত ব্যাপারেই আমরা ভারত সরকারের "রোজগার সমাচার" এবং Employment News এবং রাজ্য কর্ম-সংস্থানের বিজ্ঞপ্তি মারফৎ দরখাস্ত আহ্বান করি। যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত পদের সংখ্যা খুবই কম সেই সমস্ত পদকে বিবিক্ত (Isolated) পদ বলা হয়। তফসিলী ও আদিবাসী প্রার্থী-দের Interview-এর সময় আমরা সংসদে তফসিলী/আদি-বাসী সদস্য রাখার ব্যবস্থা করি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগে/সংস্থার ঐরূপ সদস্য পাওয়া যায় না। যেমন—দূর-দর্শন ও আকাশবাণীর Transmission Executive পদ, আকাশবাণীর Farm Radio Reporter পদ, ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব জারিপ বিভাগের Senior Zoological Assistant পদ, জাতীয় মানচিত্র সংস্থা (National Atlas Organisation) এবং Cartographer, Geographer পদ এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদ প্রভৃতি। সাধারণতঃ রাজ্যগুলির রাজধানীতেই Interview নেওয়ার ব্যবস্থা হয়, কারণ এতেই অধিকাংশ প্রার্থীর সুবিধা। Interview দিতে আসার এবং ফিরে যাওয়ার জন্য তপসিলী/আদিবাসী কর্ম প্রার্থীদের রেল/বাস ভাড়া দেওয়া হয়।

(৬) কেরানী পর্যায়ের/রেখাঙ্কর বিশারদের চাকুরী প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষা পাশ; এবং অন্যান্য পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে কোনও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। আয়কর পরিদর্শকের চাকুরীর জন্য যে কোন ধারার স্নাতন/উপাধি হচ্ছে ন্যূনতম যোগ্যতা। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উপাধিধারী হওয়া কেরানী পর্যায়ের পদের পরীক্ষা প্রদানের অযোগ্যতা হিসাবে গণ্য হয় না। বস্তুতঃ ঐ পরীক্ষায় স্নাতকের সংখ্যা ন্যূন হয়। অথবা শুধুমাত্র কেরানীপর্যায়ের পরীক্ষাই বিষয়গত (Objective) প্রশ্নপত্র দ্বারা এবং অন্যান্য উচ্চস্তরের পরীক্ষাগুলির শুধু-মাত্র প্রথম পত্র বিষয়গত এবং অন্য/অবশিষ্ট দু'টি পত্র গতানু-গতিক এবং উদ্দেশ্য মূলক (Subjective)। আমাদের ধারণা, একজন ভাবী অধিকারিকের প্রকাশ ক্ষমতা অবশ্যই পরীক্ষিত হওয়া দরকার; তাই আমরা গতানুগতিক/ধারানুযায়ী প্রশ্নপত্র দ্বারা আয়কর পরিদর্শকের মত অবর অধিকারিকের পরীক্ষা গ্রহণ করি।

(৭) এই আয়োগ-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার অফিস ৫নং এস্প্লানেড রো (পশ্চিম); কলকাতায় অবস্থিত। এটি টাউন হলের ঠিক পিছন দিকে। এসম্পর্কে যে কোন জ্ঞাতব্য থাকলে আয়োগ-এর উপরি উল্লিখিত ঠিকানাস্থ অফিসে (ছুটির দিন ছাড়া) যে কোন কাজের দিনে জানা যাবে।

গল্প

মেহমান

পান্নালাল চক্রবর্তী

আকাশের কোণে কালো পাথরের মত একখণ্ড মেঘ দেখতে পায় আজীজ। রকম দেখেই সে বুঝেছিল একটা কিছু ঘটবে। জাত চাষা সে। মিঞাদের খিদমত করে দিন গেলেও জন্ম ওর চাষীর ঘরে। মেঘের রং ঢং বোঝে বৈকি।

শেয়ালের হাঁ—এর মত মেঘের টুকরোটা যে সর্বনেশে মাতাল ঝড় নিয়ে ঝাঁপ দেবে না এমন নিশ্চয়তা কি। ঝরঝরে গাড়িটা শেষ আয়ু নিয়ে ঝোড়ো চড় সামাল দেবে কেমন করে ভাবছিল আজীজ। মাঝখান থেকে ওর গরু দুটোর দুর্গতির একশেষ হবে। ওর গরু? হঠাৎ বুকের মধ্যেটা চিন্‌চিন্ করে আজীজের। নামেই বটে ওর গরু আসল দড়ির টান এনায়েৎ মিঞার হাতে। তা শুধু কি গরু? ভিটেমাটি জমিজমা মায় সে নিজে বাঁধা মিঞার হাতে। মিঞারা এ গাঁয়ের আল্লা। এনায়েৎ মিঞা মস্ত জোতদার মহাজন। ব্যবহারে অমায়িক। কথা ভারি মিষ্টি। হাসি ছাড়া কথা নেই। কোরানের বোল ছাড়া বাক্যি ফোটে না।

আজীজ বাপের কাছ থেকে গোলামীর মৌরসীপাট্টা নিয়ে মিঞাদের সেবা করে বেহেস্তের পথ সুগম করছে। এনায়েৎ বলে, হাঁরে বাপজান তুরা আমার গোলামী করবি ক্যানে? আল্লা হাত দেছে এই পিথিবীতে খেদমতের জন্য। খোদার দোয়ায় বেহেস্তের পথ সাফ করার লেগে। আমিও তো গোলাম। নাকি?

কাঁধে হাত রেখে এনায়েৎ দাড়ি নাচিয়ে হাসে। তুই তো আমার মুনীশ নারে আজীজ। তুই আমার বাপজান। আল্লার মর্জি মন দে কাজ করে যা।

আজীজ আর কি বলবে। ঋণের মত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মন আল্লা আর মিঞার দোয়ার ফারাকটা ধরতে পারে না।

আজ সকালেই এনায়েৎ মিঞা বলছিল ক'জন মেহমানের কথা। সদর থেকে আসবে তারা। আসবে শেষ ট্রেনে। আজীজ পরম বিশ্বাসী লোক। এক জেতের লোক। সে ছাড়া এমন গোপন কাজ কে করবে। তা মিঞার বাড়িতে মেহমানের আনা গোনার তো শেষ নেই। দিনে দুপুরে এমন কি গভীর রাত্রেও দোর বন্ধ করে তাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে সে দেখেছে। বর্গা নিয়ে সেদিনও দারোগাবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার। এখন ধান রোয়ার মরশুম। বেশ একটা গরম হাওয়া গাঁয়ের মধ্যে। আজীজের রক্তও গরম হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। সে লুকিয়ে এক-দিন সমিতির মিটিং-এ এসেছিল, শুনতে। তার মনে হয় কথাগুলো ঠিক বটে। আজীজদেরও একখণ্ড জমি ছিল, হাল-বলদ ছিল। তা সে জমি কোনদিন সে ভোগ দখল করতে পারে নি। বাপের আমলেই জমিটুকু মিঞার গ্রাসে গেছে। এখন হালের বলদ দিয়ে ও গরু টানে। বাবুদের খিদমত খাটে। এই জমি হারান'র কথাই হচ্ছিল সেই মিটিং-এ. একজন এসব বুঝিয়ে বলছিলেন। রক্তও তেতে উঠেছিল। কিন্তু ক্ষণিকের মত। ও দুর্বল স্বভাবের মানুষ। বুকের মধ্যে জ্বলত বটে কিন্তু বিহিত খুঁজে পেত না। মনে হ'ত মিঞারা ওকে ঠকাচ্ছে। পিতৃপুরুষের বোঝা ওর ঘাড়ে দিয়ে গোলাম করে রেখেছে। ঐ ভাবনা পর্যন্ত। কিছু করার মত সাহস ওর নেই। গোলামী করতে করতে মনটাও ওর দুর্বল হয়ে গেছে।

আজীজ জানত চাষাদের টিট করবার জন্যই পরামর্শ চলত দিনরাত। আজীজ থাকত প্রহরীর মত দরজায় দাঁড়িয়ে।

ঝড় আসবে আজীজ ধরেই নিয়েছে। আড়াই ক্রোশ তিন ক্রোশ পথ ইস্টিশান। ঘোর আঁধার নামতেই এনায়েতের তাড়ায় সে বেরিয়ে পড়েছিল। হ্যারিকেন ধরানো নিষেধ। এ যে বড় গোপন কাজ। কাক পক্ষীকেও জানানো চলে না। চাষারা মাঠে নামার আগেই তাদের টের পাইয়ে দিতে হবে এনায়েৎ মিঞার জমি বড় শক্ত ঠাঁই। বর্গার জোরে জমি দখল করা সোজা নয়। উচ্ছেদ যাদের করেছে কিছুতেই মাঠে নামতে দেবে না সে। তার জন্য যদি দু'চারটাকে খুন করতেও হয় সে করবে। গাঁয়ের কিছু চাষী আছে তার দিকে। কিন্তু বেশির ভাগই নেই। বড় এক কাট্টা চাষীরা। ওদের সঙ্গে লড়তে গেলে গায়ের জোরে হবে না। চাই কিছু পাকাখুনের দল। যারা দরকার হলেই এনায়েতের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিঞার মেহমান ওরাই। তাদেরই আনতে হবে নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে। এমন কাজে বিশ্বস্ত লোক চাই আজীজের মত। অনুগত পোষমানা খিদমত-গার আজীজ।

মেহমানরা আসবে শেষ ট্রেনে। রাত আটটায়। তাদের নিয়ে ফিরতে আঁধারই হবে সেরা আলো। আজীজ ভেবে দেখল আজ বৃষ্টি হলে কাল ভোরেই চাষীরা মাঠে নামবে। আজই মেহ-মানরা গাঁয়ে আসছে। হয়ত আজ রাত্রেই মিঞাসাহেব ওদের চাষীপাড়ায় ঝাঁপিয়েপড়ার হুকুম দেবে। অতর্কিতে লেলিয়ে দিতে মিঞার জুড়ি নেই। এমন পাথর অনড় ভূষো কালির মত রাতই চাই দাঙার স্যাঙাৎ হিসেবে।

আজীজ আজকাল ভাবে। বোঝেও। এনায়েৎ মিঞার মসজিদের গোপন শলায় অনেকদিন ধরেই একটা মতলব চলছিল। এরমানকে লোপাট করে দেবার জন্য একটা সিদ্ধান্তও হয়েছে। এরমান সমিতির পাণ্ডা। সেও এনায়েতের বর্গাদার।

শুধু নিজের নয় গাঁয়ের সব বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করিয়েছে সে। এনায়েতের মত মানুষকে সে স্পষ্ট বলেছে ফেরেপবাজ। মঠগর্তের ধান লোপাটী ধেড়ে ইঁদুর। এ সবই জানে আজীজ।

কি বুকের পাটা এরমানের। আজীজ সেদিন ভয়ংকর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, মুগ্ধ বিস্ময়ে এরমানকে নয়া চোখে দেখেছিল। হ্যাঁ মিঞাকে জবাব দেবার মত মানুষ আছে বটে গাঁয়ে। এই সেদিনও এমন করে কথা বলতে সাহস পেত কেউ? আজ এরমান রুখে দাঁড়িয়েছে, সায় দিচ্ছে আরো পাঁচজনা। আজীজ ভাবে দিনকাল বদলেছে বটে।

মিঞারাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারা আরো ভয়ংকর আরো হিংস্র হয়ে উঠছে। জিভ টেনে ছিঁড়তে চাইছে এরমানদের। গাঁখানাকে সেই আগের মত আঁধারে ডুবিয়ে দেবার জন্য কত না কসরৎ তাদের। দুজন চাষীর বুক ফেঁড়ে দিয়ে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছে মিঞারা। পুলিশ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে মিঞাদের সঙ্গে বিবাদ করে গাঁয়ে বাস করা সহজ নয়।

এনায়েৎ তবু হিমসিম খায়। তাদের ফরমান বরবাদ করে দিচ্ছে চাষীরা। এমন দোর্দণ্ড মিঞাদের কলা দেখাচ্ছে আজীজেরই কাছের মানুষেরা। আজীজের বুকেও খুসির খই ফোটে। মন নিজের অজান্তেই বাহবা দিয়ে ওঠে। কিন্তু তা বড় সাবধানে। বড় হিসেব করে। তার যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাঁধা মিঞাদের খুঁটিতে। তার খুসি বুকের মধ্যেই ঘোরে। নিঃশব্দে সন্তর্পণে।

আজীজ অবাক হয় মিষ্টিমুখো 'বাপজান' বলনেওয়ালা এনায়েতের রাগ দেখে। মসজিদের শালিশীতে পোষ না মানা চাষার বেচাল দেখে খাপ্পা সে। মকবুলকে জুতো ছুঁড়ে মারে রাগের ঝোঁকে। বলে, লে বর্গা রেকর্ড করেছিস তো দোজখেই যা। দারোগাবাবুর জুত্তি না খেলে তুদের দিল ঠান্ডা হয় না। কেমন করে মাঠে নামিস তাই দেখব!

আজীজ এসব দেখেছে। বুঝেছে একটু দেরীতে। মিঞাদের সঙ্গে বিবাদ বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু বিবাদ লেগেই আছে। থাকবেও। এ যে ধানের বিবাদ। ধান তো নয় প্রাণ। আজীজও বোঝে ধানের চেয়ে বড় কিছু নেই। একদিন এনায়েৎ মিঞা মসজিদে বোঝাচ্ছিল সকলকে, গোল করে কে ঘাড় ভাঙে কার। আরে লেতারা তুদের ক্ষ্যাপায়! বর্গা রেকর্ড কি? তুরা সব আমার জেত ভাই, তুদের ছাড়া কি জমি আমার এমনি এমনি ফসল দিবে! আল্লার কসম লাইন দিতে যাবি না। আজ এই দিন আছে কাল থাকবে না। তুরা যেমন চাষ দিচ্ছিস দে. কে মানা করে। কিন্তু বেওয়াকুফের মত ঐ লেতাদের কথা শুনে গোল করিস না।

এসব আজীজ শুনেছে। 'বেওয়াকুফের' মতই চাষীরা লাইন দিয়ে নাম রেকর্ড করিয়েছে। আর মিঞা রাগে দাড়ির চুল টেনে ছিঁড়েছে। আজীজেরও বড় ইচ্ছা হত নাম রেকর্ড করায়। কিন্তু সে তো গোলাম। তার তো জমি নেই। চাষও নেই। খত লিখিয়ে কবেই সে জমিটুকু হজম করেছে মিঞা। মাঝে-মধ্যে অন্য চাষীর হয়ে সে মাঠ চষে দেয়। বেগার খেটে দেয়। কিন্তু বর্গাদার তো সে নয়। এনায়েৎ মিঞার পার্শ্বচর অনুগত ভৃত্য। তবু হঠাৎ কখনো তার চোখেও আগুন ঝলসে ওঠে। কুঁকড়ে থাকা বশীভূত মনটা জ্বলে ওঠে। ঘরে তার বিবি। ছোটখাট একটি হুরী। নয়তো এনায়েতের কোলকাতার কলেজে পড়া ছেলে বিলাতের চোখে পড়বার কথা নয়। তেঁতুল-গাছের নীচে দাঁড়িয়ে প্রায়ই সে পানী চেয়ে খায়। চোখ তার ছুকছুক করে। আসল কথা পানী নয় শাকিলার জন্যই সে আসে। একদিন আজীজের হাতের কাস্তেটা কেঁপে উঠেছিল। শহুরে বাবুর চোখ দুটো উপড়ে নিতে ইচ্ছা হয়েছিল। শাকিলা ওর হাত চেপে ধরেছিল। সেদিন আজীজ ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল নিজের রাগ দেখে। সেও রাগতে জানে! ঘৃণায় সারা বুকটা জ্বলে ওঠে তারও?

আজো সেই আজীজই আছে। ঝড়জল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বৃষ্টির দেখা নেই। শুধু ঝড়ের ইঙ্গিত। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে আকাশের সীমানায়। আকাশের পটে আক্রোশ যেন ওৎ পেতে আছে।

শেষ ট্রেন এল। চলে গেল। ইস্টিশনের ক্ষীণ আলোর দিকে তাকাল আজীজ। ট্রেন থেকে লোকজন খুব বেশী নামল না। দুচার জন যারা নামল তারা সব চাকুরে বাবু। শহরে চাকরী করতে যান। ফার্স্ট ট্রেনে ওঠেন লাস্ট ট্রেনে নামেন। তারা ইস্টিশানের ওপাশ দিয়ে ঘুরে লোকালয়ের দিকে চলে গেলেন। বিড়িতে শেষ টান মেরে আজীজ প্রায় হতাশভাবে অদূরের ক্ষীণ আলোর মধ্যে মেহমানদের পাত্তা নিতে চোখ দুটোকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। এমন সময় যেন জনাকয়েক লোককে ঢালুর দিকে গড়িয়ে নামতে দেখা গেল। ঢালুটা উঠে এসেছে পীচ রাস্তার ওপর। কালো কারের মত রাস্তাটা চলে গিয়েছে দুধারের ধানক্ষেতের বুক চিরে সিধে আরো পাঁচ-ক্রোশ সাহেব ঘাটা অব্দি। দুতিন ক্রোশের মধ্যেই আজীজদের গাঁ গ্রাম। শুধু ধু ধু ধান ক্ষেত। পথের দুধারে বাবলা জারুলের গাছ। একটা সরু ক্ষেতিখাল বেড় দিয়ে রেখেছে গাঁখানাকে।

আজীজ তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। সেই কজন মূর্তি উঠে আসছে গড়ান বেয়ে। মেহমান! পথের পাশে ঝাঁকড়া মাথা বাবলাগাছের নীচে গরুর খুরের শব্দ হল। শোঁ শোঁ শব্দে শেয়ালের মুখের হাওয়া গোঙাচ্ছে। সাপের জিভের মত লিক-লিকে বিদ্যুৎ কালো আকাশখানাকে এমাথা ওমাথা ফালা করে ঝলসে উঠল। ভয়ঙ্কর গর্জনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে মেহমানরা এসে দাঁড়াল।

—এনায়েৎ মিঞার লোক নাকি?

—জী।

আকাশের খেয়াল ভাল ঠ্যাকে না। জোরসে।

গাড়ি চলেছে। ঘন দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আজীজের চোখ যেন সার্চলাইট হয়ে ওঠে।

একজন মেহমানের প্রশ্ন—নাম কি?

—জী, আজীজ—

—কদ্দিনের লোক?

—সেই ছাওয়াল থেকে মিঞাদের গোলামী করি।

হটাৎ ঝলকানীতে কয়েকজোড়া চোখ গেঁথে গেল কালো মিশমিশে বলিষ্ঠ আজীজের দেহে। একটানা বাতাসের গোঙানীর সঙ্গে গাড়ির চাকার আর্তনাদ মিশে এক ভয়ঙ্কর বীভৎস শব্দ আছড়ে পড়ে নিস্তব্ধ অন্ধকারে।

আজীজের মনের মধ্যেও শুরু হয়েছে একই বিক্ষিপ্ত চিন্তার আনাগোনা। এরা কেন এসেছে? মাঠের চাষ নিয়ে গোল বাঁধাবে বলে? আবার একটা খুনোখুনির লেগে? এনায়েতের

লোভের আগুনে গাঁখানা আবার জ্বলবে! ওর বুকেও বঞ্চনার আক্ষেপ রয়েছে। কিন্তু সাহস নেই। বড় ভয় করে। বিলাত সাহেব সেদিন চোখের ওপরই দু'টো বন্দুক সাফ করছিল। আজীজ সেদিনই বুঝতে পেরেছিল ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবার জন্য গাঁখানা থমকে রয়েছে। শাকিলাকে বলতে সে বলেছিল, তুমার ত সব নেছে মিয়া। খত নিখে দেছ! গতর খাটিয়ে করে নেবেখ সবাই তা মানবে ক্যানে? তারাও কোমর বেঁধেছে।

—হাঃ। আমি মিঞাদের নেমক খেছি রে।

—কার নেমক কে খায় মিঞা। শাকিলা বলেছিল, মিঞারা তুমার জমি কেড়ে নেলে। খত নেকালে বান্দা হবার লেগে। তুমার জমির ধান খেয়ে ভাবলে হুজুরের নেমক খাচ্ছ।

এসব কথা আবার মনে পড়ছে আজীজের। বোশেখের মাঠের মত শুকনা বুকটা কড়কড় করে। কিন্তু বিশাল দেহ হলেও মন তার পিতৃপুরুষের ছাঁচে ঢালা। কণ্ঠস্বর আনুগত্যের সংস্কারে চাপা পড়ে থাকে। তবু বুকে তপ্ত মাঠের জ্বালা ঘুরে বেড়ায়। ওদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছা হয়। হঠাৎ এনায়েতের মুখখানা মনে পড়লে সব কেমন গুলিয়ে যায়। বরং শাকিলার মন শক্ত। ওর বাপ একজন তেজী চাষা। কয়েক শো মানুষ আছে তার পেছনে। আছে সমিতি। গাঁয়ে তার বাপজান জমি চষে বুক ফুলিয়ে। নিজেকে বড় একা বিচ্ছিন্ন মনে হয় আজীজের। শুধু হুকুমের গোলাম সে! মাথা নামিয়ে শুধু হুকুম তামিল করা।

হঠাৎ আজীজের ভাবনায় ছেদ পড়ল। একজন কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল,—হেই মিয়া গাঁয়ে ফুর্তিটুর্তির জিনিস আছে তো?

আজীজ ঠিক বুঝতে পারল না। কথাটা ভেঙ্গে বলতে সে বলে, হাঁ বাবু হুই খাল ধারে তেনারা—

কথাটা বোধহয় মনঃপূত হল না মেহমানদের। তাদের আলাপচারীতে মনে হল একটু উঁচুদরের জিনিস চায় তারা। আজীজ গরুর লেজে মোচড় দেয়। দু'টো গরু গতি বাড়িয়ে দেয়। ঝপঝাপিয়ে ছোটে গাড়িটা।

আবার প্রশ্ন—ইদিক্কার অবস্থা কেমন হে মিয়া?

—সব ঠিক আছে বাবু। উ শালারা নাঠি সড়কি ছাড়া কিছু বোঝেনা। অজীজ দম টেনে বলে, আপনেরা শহরের মিস্তিরীরা পাকা মান্‌ষী। ভয়ে উরা ন্যাজ গুটিয়ে পালাবে।

মিস্তিরী বলায় মেহমানরা বুঝি খুসি হয়। তারা শব্দ করে হাসল। ওদের আলাপ শুনতে লাগল আজীজ কান তুলে। কি করে চাষীপাড়ায় আক্রমণ চালাবে তারই কৌশল আঁটছে ওরা। বিলাত সাহেব একটা ছক করে দিয়েছে। সেই ছকের ওপরই আলোচনা হচ্ছে।

হঠাৎ হ্যাঁচকা টান লাগে গাড়িতে। দুর্বল গরুদু'টো বেসামাল হয়ে পড়ে। আজীজ বলে, আর এট্টু বাপ—আর এট্টু।

আজীজের পাচনটা ওপরে উঠেও ঝট করে নেমে যায়। গরুদু'টোকে মারতে অবশ্য তোলে নি। হঠাৎ যে কথাটা তার কানে এল তাতেই ওর শরীরটা যেন ঝাঁকানী খেয়ে হাত ওপরে উঠে গেল। রক্ত যেন টগবগিয়ে উঠল দেহের মধ্যে। মেহমান বলছে, হেই গাড়োয়ান গাঁয়ে ডগডগে চাষী বউ আছে তো? এ কাজে নিরামিষ ফিরতে রাজী লই বাবা!

কে জানে আজীজের হঠাৎ মনে হ'ল শাকিলার কথাটা। শাকিলা গোলামের বিবি হলেও চাষী ঘরের বউ। শাকিলা সুন্দরী। হঠাৎ ওর অনেকদিন আগের একটা ছবি মনে পড়ে। ধান ক্ষেতে এনায়েতের ভাড়া করা গুণ্ডারা বাচ্চু সেখের বিবিকে নিয়ে উৎসব করেছিল। আজ অনেক কাল পরেও সে দৃশ্য মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি সে। সেদিন এর বিচার করার মত মনুষ ছিল না গাঁয়ে। চাষীপাড়ার অনেকেই তখন গাঁ ছাড়া। কারো কারো মাথায় হুলিয়ার খাঁড়া। বাচ্চু সেখেরা বিবিকে দশ বারোটা শেয়াল খুবলে খেয়েছিল বলে তেমন সাড়া মেলে নি গাঁয়ে। বাচ্চু সেখ তার পনেরো দিন পরে পুলিশের গুলি খেয়ে মারা গিয়েছিল। প্রতিশোধের সুযোগ তার মেলে নি।

আজো আজীজ সেদিনের কথা ভাবলে চমকে যায়। হঠাৎ তার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন সেদিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশংকায় শিউরে ওঠে। দিন বদলেছে। গাঁয়ের অনেকেই ফিরে এসেছে। মোটামুটি একটা শান্তি ছিল গাঁয়ে। গাঁছাড়া যারা হয়েছিল গাঁয়ে ফিরে তারাই শান্তি শৃংখলা বজায় রাখত। সমিতি আরো বড় হ'ল। এনায়েৎ মিঞা ভালই দমে গিয়েছিল। তাকে কেউ জুলুম হুজ্জুতও করে নি। যে যার জমিতে শান্ত-ভাবেই চাষ আবাদ করছিল। আবার এনায়েৎ মিঞা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গাঁয়ে আবার অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইছে? বুকটায় রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। পাচনটা উঠেও নেমে যায়। দাঁতের নীচে ঠোঁট কেটে বসে যায়। গরুর লেজ মুচড়ে দিয়ে তাড়াদেয়—হেই-হেট্-হেই—

দমকা শাসানী ঠেলে গাড়ি ছোটে ক্যাঁচ-কোঁচ-ক্যাঁচ-কোঁচ। হাওয়াটায় ক্রমেই জোর বাড়ছে। দূরাগত একটা বুক কাঁপানো শব্দে আজীজ ধরে নেয় ঝড় আসছে। মনে মনে সে তৈরী হয় মোকাবিলার জন্য। গরুদু'টোকে আর তাড়া লাগায় না। মন সে ঠিক করে নিয়েছে গাড়ি এনায়েতের বাড়ির দিকে যাবে না। যাবে চাষীপাড়ার দিকে। মনকে শক্ত করেই সে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে ঝট করে।

মেহমানদের ওদের হাতে তুলে দিতে পারলেই তার কাজ শেষ। না। শেষ নয়। আজীজের মনের ঘোর খাওয়া অস্বস্তিটা থেকেই যাবে যতক্ষণ না নীচু মাথাটা উঁচু করে এনায়েতের সামনে দাঁড়াতে পারছে। বুক ফুলিয়ে বলতে পারছে,—মিঞা আজ আর আমি একা লই। গোলামী অনেক করেছি আর লয়। জমিখান ফেরৎ চাই।

মনটা হালকা লাগে। ঝড়ের ঝাপটা খেয়ে গাড়িটা আর্ত-নাদ করে ওঠে। কিন্তু মন তার উড়ে চলে দুরন্ত ঘোষণা নিয়েঃ হুঁশিয়ার ভাইসব। যন্তর এয়েছে সদর থেকে। হুঁশিয়ার!

এনায়েতের হিংস্র কুটীল মুখখানা যেন অন্ধকারে ভেসে ওঠে। অন্ধকারেও ধক ধক জ্বলছে চোখ দু'টা। আজীজের বুকেও আজ আগুন লেগেছে। হাড়ে হাড়ে ছড়াচ্ছে সে আগুন। দীর্ঘ বঞ্চনার পর শাকিলার বাপের মতই সে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে, তুমার চোকের ভয় করি না মিঞা। দ্যাও—এত্টা কালের হিসাব দ্যাও। নাইলে ছাড়ান নাই।

ঝড়ের বেগ বেড়েছে। ছোবল মারছে গাড়িটার গায়ে। মেহমানরা বলল, হেই মিয়া ঝড় যে এসে পড়ল।

—ঝড় এখুনো এসে নাই বাবু।

আজীজ নিজের মনেও ভাবে এ ঝড় কিছুই নয়। যে ঝড় তার চাই তা আসবে আগামী কাল।

ভাঙুক এখন সুখের ডানা

স্বপন নাগ

ঝড়ের রাতে যাচ্ছে ছিঁড়ে রং-বেরং-এর স্বপ্ন কোথাও
কোথাও আবার আসছে দামাল এক সমুদ্র-ডাক
সেই ডাকে কেউ ভয় পেওনা—
ভয় পেওনা ঝড়ের দাপট কিংবা কোনো
সমুদ্রেরই মাতাল নাচন.....
ঝড়ের ডাকে কাঁদছ তুমি মুখ লুকিয়েঃ
বুকের মধ্যে রাখছ পুষে বিষের দানা,
আমি তবু হাসছি উদার-উদাস-উদম
ঝড় আসছে আসুক না ঝড়!
ভাঙুক না ঘর নৌকোর ছৈ পাখির ডানা
হারাক্ দূরের পরিজনের নিদেন হাঁক,
হারাক্ মানসঃ নরম স্বপ্ন দেখার মতন!
ঝড় একদিন থামবেই, সেদিন বাঁধব ঘরে
সুখের বাসর, আঁকব নতুন তুলি দিয়ে,
ডাকবে আলোর বন্যা ভীষণ; এখন শোনো
সাগর ডাকে, ঝড়ের দাপট- ভয় পেওনা!
ভাঙুক এখন কাঁচের মতন ব্যর্থ সুখের স্বপ্নগুলো
হোক উধাও.........

এখনো মানুষ আমি

শীতল গঙ্গোপাধ্যায়

পাতা-ঝরা বিষণ্ণ শব্দ বুকে নিয়ে
হেঁটে গেছি একা একা পূর্বে-পশ্চিমে—বহু দূরে
নিকানো উঠোন 'পরে সজনের টুপ্ টাপ্ ছন্দ ছাড়িয়ে
কখনো হাল্কা মেঘ ভেসে ওঠে মনের আকাশে
কখনো বৃষ্টি পড়ে বজ্র-বিদ্যুৎ সাথে নিয়ে -
ছোট ছোট ঘাস আর অপরাজিতার নীল বুকে
তবুও মানুষ আমি
আমারও ঘর আছে--ঘরেতে অরণ্য আছে......
অরণ্যে শ্বাপদ খেলা করে।

এখন অনেক বেলা—সকাল হয়েছে শেষ কবে
এখন পায়ের নীচে মাটি কাঁপে থর থর করে
এখনও বুকের মাঝে গোপন গভীর নিরবতা
আদিম শব্দের পায়ে কেঁদে কেঁদে মাথা খুঁড়ে
তবুও মানুষ আমি,
আমারও ঘরে আছে অরণ্য......শ্বাপদ......
শ্বাপদের পায়ে পায়ে রক্ত, ছোট নুড়ি রক্তের
রক্তের লাল রঙে ব্যথিত প্রত্যুষ
সূর্যের আগমনী গায়।

আছো কোথায়, বন্ধু?

শুভংকর রায়

রাত্রি গভীর হোক আরও—
যেতে যেতে আটকে যাক এই চাঁদ
উচ্ছ্বসিত অরণ্যের তুঙ্গ মগডালে।

তারপর সারারাত
খেলা হোক লুকোচুরি
গাছ-গাছ আর কেবলই গাছের ভীড়ে
বাঘ সিংহ...বুনোহাতি আর শেয়ালের
আর নেকড়ের আর খরগোসের সাথে—

আমিও ছুটব, ছুটে ছুটে যাব
ছিঁড়ে ফেলে এই মন: কেবলই খেয়ালে
সেই সব স্মৃতি পথ দিয়ে
ছুটতে ছুটতে আর নাচতে নাচতে
পরিত্যক্ত সেই সব গাছের কোটরে
ঝোপঝাড় নদী খাল বনে, গুহার আঁধারে
আছো কোথায়, বন্ধু,
আমার আত্মা মানবতা?

এসো খেলি স্বচ্ছতোয়া চাঁদে
এসো খেলি হিংস্রতার ভীড়ে
এসো খেলি এই সেই অরণ্য গভীরে।

ঝড়

দেবাশিস প্রধান

ঝড়ের সাথে প্রলয় আসে
দুর্দিন ঐ ঘাসে ঘাসে...
সবখানেতেই ঝড়,
মাঝ নদীতে ভাসছে দ্যাখো
অবিন্যস্ত খড়!

নদীর বুকে উথাল পাথাল
বুকের মাঝে আরক্ত খাল
জোয়ার ভাঁটার অভিমানে তৈরী করে খাজ
সুখের ঘরে বৈঁচি কাঁটা
কি যন্ত্রণায় নীল করে তুই
বাজাবি কত বাজ!

একদিন প্রতিদিন : এইসব হৃদয় ও রুধিরের ধারা

মৃণাল সেনের সাম্প্রতিকতম ছবি 'একদিন প্রতিদিন'-এ আছে সেই অমোঘ শক্তি, যার অপর নাম প্রগাঢ় উন্মোচন, যা ভ্রষ্ট আদমের মত আর্তনাদে আমাদের দগ্ধ করায়, সারাক্ষণ এক প্রবল উৎকণ্ঠায় ডুবিয়ে রেখে অবশেষে ঠেলে দেয় এক অতল, অনিবার্য খাদের দিকে। বস্তুত, এই ছবি আক্ষরিক অর্থেই একটি বিস্ফোরণ, যে বিস্ফোরণ আমাদের ছবি দেখার ইতিহাসে (যার মধ্যে এই প্রতিবেদক অবশ্যই তার দেখা কিছু সাহেব-সুবোদের তৈরী ছবির প্রসঙ্গ দায়িত্ব নিয়েই মনে ক'রতে চায়।) একটি বিপন্ন বিস্ময়, একটি উজ্জ্বল উদ্ধার। এমনকি ছবিটি দেখতে দেখতে কখনো এরকমও মনে হ'য়েছে, মৃণাল সেনের পূর্ববর্তী ছবিগুলির ঐতিহ্যও এখানে খড়কুটোর মত উড়ে গেছে—এই ছবির দমকা বাতাসে নয়, বিবর্ণ উজ্জ্বলতায়। ছবিটি দেখে আমরা বিমূঢ় হ'য়ে যাই, আঁতকে উঠি—এই নিষ্ঠুর জীবনের ভিসুয়াল পর্যবেক্ষণ, এই অপলক অবলোকন আমাদের মধ্যবিত্ত ভঙ্গুর স্বাতন্ত্র্যবোধে সজোরে লাথি মারে। আর অস্তিত্বে লাথি পড়লেও আঁতকে উঠবে না, সে কোন্ উন্মাদ ?

একটি সামান্য কাহিনী (অমলেন্দু চক্রবর্তী) সূত্র অবলম্বনে মৃণাল সেন এই অসামান্য ছবিটি তুলেছেন। একটি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের একদিনের একটি আকস্মিক ঘটনা অবলম্বনে প্রতিদিনের দিন যাপনের যে পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত ক'রেছেন, তা বড় বেশি নিষ্ঠুর, বড় বেশি স্বার্থপরতায় ভরা। উত্তর কলকাতার একটি সংকীর্ণ, স্যাঁতসেতে, ফাঁকা গলির মধ্য দিয়ে একটি অস্পষ্ট রিকসার এগিয়ে আসা দিয়ে ছবি শুরু হয়। সেই গলিতে বল খেলতে গিয়ে একটি ছেলের মাথা ফাটে, ডাক্তারখানা থেকে মাথায় ৩টে সেলাই নিয়ে ছেলেটি বাড়ি ফেরে। এবং তখন ক্যামেরা প্যান ক'রে দেখানো হয় বাড়িটিকে, যে বাড়িটি এই ছবির মূল চরিত্র। তাঁর ছবির স্বভাবসিদ্ধতা অনুযায়ী মৃণাল সেন নেপথ্য ভাষণের সাহায্যে আমাদের সাথে এই বাড়িটির পরিচয় করিয়ে দিতে থাকেন। আমরা ক্রমশ জেনে যাই ১৮৫৭ সালে, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর বছরে, বাবু শ্রীযুক্ত নবীন মল্লিকের হাতে এই বাড়ি তৈরী হয়। তারপর স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, সি. এম. ডি. এ-এর হাত ঘুরে স্বাধীনোত্তর কালেও তা অবিকল, অপরিবর্তিত। অর্থাৎ, সিপাহী বিদ্রোহের উদ্দীপনা, রক্তাক্ত স্বাধীনতা আন্দোলন, এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও আমরা সেই একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি, একই গ্লানিময় জীবনে বন্দী হ'য়ে আছি। বস্তুত, এই ১৬ ঘরের মধ্যে ১১টি পরিবারের শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকা তো এই ঘৃণময় সমাজেরই একটি নিষ্ঠুর চিত্রকল্প। বাড়ির পর আমরা মৃণালের কয়েকটি অনবদ্য কাট্ সটের মাধ্যমে চিনে ফেলি এই বাড়ির কয়েকজন বাসিন্দার স্বভাবচরিত্র—যার মধ্যে ডিক্টেটর-সদৃশ বাড়িওয়ালা, যিনি ভাড়াটেদের জল, আলো মেপে দেন, একটি বিশেষ সংযোজন।

তারপর ক্যামেরা এই বাড়ির একটি বিশেষ পরিবারকে ক্লোজ-আপে এনে ফেলে। আমাদের পরিচয় হয় হৃষিকেশ সেনগুপ্তের সাথে, অবসর প্রাপ্ত এই মানুষটির ৬ জনের সংসারে একমাত্র উপার্জনশীল তাঁর বড় মেয়ে চীনু—যার আয়ের উপর এই ৬টি প্রাণীর বেঁচে থাকা নির্ভর ক'রে আছে। এবং একদিন হঠাৎ ৭টা বেজে যায়, সেই মেয়ে বাড়ি ফেরে না। ৭টা-৮টা-৯টা রাত বাড়ে -বড়ে-চীনু ফেরে না—ফেরে না—ফেরে না—উৎকণ্ঠা বেড়ে চলে। মেজ বোন মীনু দিদির অফিসে অহেতুক ফোন করে এসে জানায় দিদি অফিসে নেই। তারপরও রাত বাড়ে নিজস্ব নিয়মে, হৃষিকেশের চোখের সামনে দিয়ে হেলেদুলে শেষ ট্রাম চ'লে যায়, রেডিওতে একসময় সারাদিনের অনুষ্ঠানও শেষ হয়, তবু চীনু ফেরে না. বাড়ির সকলে জেনে যায় এতরাত ক'রেও মেয়েটা বাড়ি ফিরলো না। শুরু হ'য়ে যায় তৎপরতা—থানা, হাসপাতাল, মর্গ খোঁজা শেষ ক'রে একসময় সকলে ফিরে আসে। চীনু ফেরে না। আর নিষ্ঠুর পরিচালক তখন কী ভয়ংকরভাবে দর্শকের হৃদপিণ্ড নিয়ে তুচ্ছ বলের মত লোফালুফি শুরু ক'রে দেন! বাড়িময় শুরু হ'য়ে যায় অশ্লীল ফিসফাস, গভীর কুমীর কান্না। অবশেষে একসময় সব যেন থিতিয়ে আসে. বাড়িটা তলিয়ে যায়, অসীম নির্জনতায়। ঘরের মধ্যে হৃষিকেশের পরিবার পাথরের মত ব'সে থাকে একাএকা, অসহায়। আর তখন সারা ঘরে ঘড়ির, নিশ্বাসের, নির্জনতার শব্দ কী ভয়ংকর হ'য়ে ওঠে! এবং সেই হিম নৈঃশব্দই ছবিকে পৌঁছে দেয় শেষ অনিবার্যতায়। হঠাৎ, হঠাৎই সেই অস্বস্তিকর নীরবতা টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায় মীনুর আকস্মিক আক্রমণে—সে মাকে অভিযুক্ত করে স্বার্থপরতা এবং কর্তব্যহীনতার অভিযোগে। এই পর্যায়ের তীক্ষ্ম এবং স্থিরলক্ষ্য সংলাপে মধ্যবিত্ত সমাজের ভঙ্গুর মূল্যবোধগুলি খানখান হ'য়ে ভেঙে পড়ে, মীনুর সংলাপে স্বার্থপর সামাজিক ব্যবস্থার একটি নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে এই দৃশ্যের আয়নায়। বলা যায়, এইটিই ছবির প্রাণদৃশ্য। আশংকা, উৎকণ্ঠা, মায়ামমতা তছনছ ক'রে বেরিয়ে আসে অনিবার্য দাঁত-নখ। শুধু

পরম অসহায়তার মধ্যে তখন বসে থাকেন হৃষিকেশ, আর কী করুণ তাঁর সেই বসে থাকা!

এবং তারপর প্রায় শেষরাতে নিষ্পাপ মুখে চীনু ফিরে আসে। চীনু ফিরে আসে তখন, যখন তার আর না-ফেরা বিষয়ে সকলেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে, যখন তার মৃতদেহ ফিরলেই সকলে অস্বস্তি থেকে, মধ্যবিত্তের ঠুনকো লজ্জাবোধ থেকে অন্তত বাঁচতো, এবং সেই ফেরার কাছে এই ফেরা তো বস্তুতই খুববেশী মূল্যহীন। মৃণাল এখানে মুখ্যত পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অসহায়ত্বের ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেও, তাকে দেখাতে চেয়েছেন এই সামাজিক ব্যবস্থার সমগ্রতার মধ্য দিয়ে—সেজন্যেই চীনুর প্রেমিকের '৭৬ সালে পুলিশের গুলিতে খুন হওয়ায় সংবাদ নিছক সংবাদকে ছাপিয়ে আমাদের আরো অনেকদূর নিয়ে যায়। আসলে, নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটি তাঁর কাছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বায়বীয় ঘটনা নয়। কেননা মৃণাল নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে বিশ্বাস করেন শিল্পীকে আজ প্রতিনিয়ত ঘটনার চাপে খানিকটা সামাজিক নৃতাত্ত্বিকের, রাজনৈতিক প্রবক্তার ভূমিকা গ্রহণ করতেই হবে। এবং মৃণালের সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে বলেই তাঁর ক্যামেরায় নারীর এই শোচনীয় বন্ধন দেখে আমরা লজ্জিত হই, পারিপার্শ্বিকতার সাথে তাকে ওতপ্রোত দেখি ব'লেই তথাকথিত সমাজসেবিকা মহিলাদের তন্তুজ-বন্ধন-মুক্তি আন্দোলনের তুলনায় তা অনেক মহান হ'য়ে ওঠে, এ-কথা লেখ'ই বাহুল্য।

তো, চীনু বাড়ি ফিরে আসে। নিষ্পাপ তার চোখমুখ। সে আকুলভাবে জানাতে চায় নিজের কথা। কেউ শোনে না, শুনতে চায় না, কথা বলে না, বিশ্বাস করে না। এবং এখানে মৃণাল একটি অদ্ভুত ফিল্মেটিক্ কাজ দেখিয়েছেন। হঠাৎ চীনুর ফেরার সাড়া পেয়ে একে একে সারা বাড়ির আলোগুলো জ্বলে ওঠে। ক্যামেরা নীচ থেকে পুরো বাড়িটাকে ধরে। চারদিকে তখন অসংখ্য সন্দিগ্ধ, অশ্লীল চোখমুখগুলি ঘিরে আবহসঙ্গীতে যেন রণদামামা বেজে ওঠে। দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ান ব্যাঘ্রমনস্ক বাড়িওয়ালা, ক্যামেরা-কৌশলে হঠাৎ যাকে ধুতি, গেঞ্জি পরা হিটলার বলে ভ্রম হয়। তিনি মুহূর্তে তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ক্যামেরা সিঁড়ি দিয়ে বীর-দর্পে তাকে নীচে নামিয়ে আনে, একেবারে হৃষিকেশের দরজায়। তিনি নেমে আসেন পুরুষ শাসিত সমাজের, খর্যা-খর্বুটে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের, কাগুজে একনায়কত্বের প্রতিনিধি হিসেবে। আর নেমে এসে হৃষিকেশকে শাসান 'ভদ্রলোকের বাড়িতে' একটি মেয়ের রাত ক'রে বাড়ি ফেরার ব্যাপারে কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রে। এবং সেই সাথে তাঁকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশও দেওয়া হয়। এই দৃশ্যে তখন হঠাৎ চীনুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে 'আপনারা বিশ্বাস করুন'—এই অসহায় অসম্পূর্ণ আর্তি যখন আমাদের গভীর বেদনার দিকে টেনে নিয়ে যায়, তখন, ঠিক তখনই সেই কান্নাকে অসীম ক্রোধে পরিণত ক'রে উল্কার মতো ছুটে আসে চীনুর ভাই তপু। সে হঠাৎ দুরন্ত রাগে বাড়িওয়ালার কলার চেপে ধ'রে চেঁচিয়ে ওঠে, ফেটে পড়ে—'অমন ভদ্রতার মুখে লাথি মারি'—শোনা যায় তার মুখে এই অনিবার্য সংলাপ। এবং আমরা তখন মুহূর্তে তপুর হাত ধ'রে পৌঁছে যাই সেই স্থির লক্ষ্যে, যেখানে আমাদের পৌঁছুবার কথা আছে। সেজন্যই সেই ভয়াল হতাশার রাত যখন শেষ হয়, তখন দেখা যায় আগের রাতে যেই মা ভয়ে, লজ্জায় কুঁকড়ে ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই মা-ই পুনরায় অনায়াস সাহসে ভোরবেলা বাইরে এসে দাঁড়ান। আসলে, আমাদের হতাশা, ভয়, লজ্জা, গ্লানির আড়ালে যে একধরণের সাহসও গোপন থাকে, তা স্পষ্ট ক'রে দেখাতে চেয়েছেন মৃণাল সেন। এবং সে দেখানো স্থির, শৈল্পিক, অব্যর্থ।

মৃণালের এই ছবিতে রাজনৈতিকতার তাগিদে মিটিং, মিছিল, পুলিস, মনুমেন্ট ইত্যাদি অনেকানেক অনুষঙ্গ, যা অক্লেশে ব্যবহৃত হতে হতে খুব বেশি ক্লিশে হ'য়ে গেছে, না থাকলেও এই ছবি মোটেই রাজনীতি বর্জিত নয়। তবে তা অনেকটাই দার্শনিকতা, শৈল্পিকতায় মণ্ডিত। বস্তুত, এখানে রাজনীতি থাকলেও রাজনৈতিক চেঁচামেচি নেই। এখানে তা আমাদের দেখে নিতে হয় নিজস্ব চৈতনা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। আর এ-কথা কে না জানে যে, প্রাত্যহিক দেখা থেকে শিল্পের দেখা, যা নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের মত, অনেক বেশি শক্তিশালী, অমোঘ। বস্তুত, শিল্পীর যেমন দায় থাকে জনগণকে এন্টার-টেন করার, অনুরূপভাবে দর্শকেরও তো দায় থেকেই যায় শিল্পীকে বোঝার। শিল্প তো আর পোস্টার, শ্লোগানের বিকল্প নয়। তাই শ্লোগানই এখানে মৃণালের হাতে শিল্প।

এবং সেই শিল্পকে সামগ্রিকভাবে সার্থক ক'রে তোলার জন্য যাঁরা সর্বতোভাবে দায়ী, তাঁরা হ'লেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেন, শ্রীলা মজুমদার, উমানাথ ভট্টাচার্য, অরুণ মুখোপাধ্যায়, মমতাশংকর প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই কী অসাধারণ দৃপ্ততায়, অভিনয় হীন অভিনয়ে ছবির চরিত্রের রক্তমাংসের সাথে ওতপ্রোত হ'য়ে গেছেন! তাছাড়া সঙ্গীত (বি. ভি. কারন্থ), ক্যামেরা (কে. কে. মহাজন), চিত্রনাট্য (মৃণাল সেন), সম্পাদনা (গঙ্গাধর নস্কর)—সবকিছু মিলে ছবিটিকে সার্থকতার দিকে পৌঁছে দিয়েছে। সর্বোপরি, ছবিটিতে রঙের ব্যবহার একটি দুর্লভ উপহার। একটি কালো জীবনের কাহিনী রঙের সহায়তায় আরো প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে।

তবে এসব সত্ত্বেও কয়েকটি ছোটখাটো দুর্বলতা আমাদের ঈষৎ পীড়িত করে। যেমন, ১। বুড়ি ঠাকুমাকে দিয়ে 'মেয়ে জন্ম বড় কষ্টের' ইত্যাদি শরৎচন্দ্রীয় সংলাপ একেবারেই প্রয়োজন হীন, বাহুল্য মনে হয়। আমরা তো সে কথা আগেই টের পেয়ে গেছি ঘটনার সহায়তায়—তাহ'লে এই অতিরিক্ত সংলাপ কেন? নাকি মৃণাল দর্শকের বুদ্ধির প্রতি ততোটা আস্থাশীল নন? ২। রঙের কাজ এত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও ছোট ছেলেটির সকালবেলার ব্যান্ডেজের লাল রক্ত রাতেও কেন একটুও কালো হয় না? ৩। স্কুটারে ওই অন্তহীনপথ কিসের জন্য—এলাকার মধ্যে থানা কত যোজন দূরে থাকে? এটাতো গতি এবং উত্তেজনা বোঝাতে বাংলা ছবির পুরনো ফরমুলা। ৪। শেষ ট্রামের অতক্ষণ দাঁড়াবার প্রয়োজন কি শুধুমাত্র হৃষিকেশের উৎকণ্ঠা বেশি সময় নিয়ে দেখাবার কারণে? ৫। মৃণাল কি মীনুর ভূমিকাহীন অভিযোগের জন্যে খুব বেশি ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন? ৬। হাসপাতালে মৃতা মেয়েটি কার বোন সেই সংবাদে আমাদের প্রয়োজন কতটুকু? ঠিক যেমন প্রয়োজন হীন রাস্তায় জল-বিয়োগের দৃশ্যটি। মৃণাল কেন ভুলে যান যে, তিনি কোন কলকাতা-বিষয়ক ডকু-

[শেষাংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়]

নিশাকালের স্বরধ্বনি/শ্যামল সেন

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪, কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭। পাঁচ টাকা

সময়কে একজন কবি কীভাবে দেখেছেন তা বোঝা যায় জীবনকে তিনি কীভাবে দেখেছেন তা থেকে। শুধু ন্যুব্জ পৃষ্ঠ বৃদ্ধ সময় নয়—দ্বান্দিক গতিবেগে তীব্র সময়ই শ্যামল সেনের কবিতার অধিষ্ঠাতা আবেগ। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধরত জীবন, জীবনের কাছে পরাভূত মৃত্যু বা মৃত্যুতেও মহৎ জীবন—শ্যামল সেন ছুঁয়ে আছেন। কথাগুলো মনে পড়ছে কবির বর্তমান কাব্যগ্রন্থ "নিশাকালের স্বরধ্বনি" বইটি হাতে পেয়ে। আরো বলতে ইচ্ছে করছে, তার কারণ, "মরুবৃত্তে সময়ের ক্রোধ" এবং "নিশাকালের স্বরধ্বনি" এ দুয়ের মধ্যে সময়ের যে ফারাক—তাতে শ্যামলবাবুর বোধ, বিশ্বাস এবং তাঁর কবিত্বের উত্তরণকে উপলব্ধি করে।

"নিশাকালের বিরুদ্ধে প্রতিদিন যারা যুদ্ধরত" তাদেরই স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে এ কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকটা কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। কাজেই কাব্যগ্রন্থে নিয়মমাফিক কোন 'মুখবন্ধ' বা 'প্রস্তাবনা'-র তথাকথিত কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। সংকলনের আটত্রিশটা কবিতাই সে দায়িত্ব পালন করেছে। আমার মনে হয় কবি নিজেও তা সচেতনভাবে জানেন। আর জানেন বলেই "অকাল-বৈশাখীর কবিতা" দিয়ে যা শুরু হয়েছে, "এখন উদ্ধার সতর্ক শাসনে" তা শেষ হয়েছে। একটু ভুল বললাম, বিষয় ও আবেগগত ঐক্যের নির্দিষ্ট উপলব্ধিতে এসে থেমেছে—জীবনের টানে। কারণ—"স্মৃতি নয়, এখনও ভয়ংকর উজ্জ্বল সেইদিন,/চোখের উপর উঁচিয়ে রেখেছে তার ধারালো সঙিন" ['এখন উদ্ধার সতর্ক শাসনে']

কবিতাগুলো লেখা হয়েছে পঁচাত্তর থেকে আটাত্তর—এই চার বছরে। সত্তর দশকের শেষার্ধ যাকে বলতে পারি। যখন শাসকগোষ্ঠীর হিংস্রনখর থাবায় দেশ বধ্যভূমিতে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও যে সময় বার্ধক্যের নয়, তারুণ্যের বিচক্ষণতার নয় উন্দীপনার, শীতল প্রজ্ঞার নয় আগ্নেয় উপলব্ধির—সেই সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবি বলেন, "লঘুরসে কলম ধরার বাসনা ছিলনা কোনদিন,/আজো নেই/এই সমৃদ্ধির আহ্লাদে দিনকানা সোনার দেশে/এই কালরাত্রিতে" [অকাল-বৈশাখীর কবিতা] কারণ সমাজ সচেতন পর্যবেক্ষক শ্যামলবাবু জানেন—"কী যেন দেবার কথা ছিল, এখনও আছে/হাজার দুয়ারী এই বুকের দরজা খুলে/বসে থাকি, বেলা অবেলায়..." ['বিষদাঁত']

বস্তুতঃ এই হাজার দুয়ারী বুক নিয়েই তিনি খুঁটে খুঁটে তুলেছেন সেই সময় সমাজ এবং সামাজিককতাকে। 'চতুরঙ্গ' কবিতায় তাই বিদ্রূপের বাঁশি বাজিয়েছেন 'আত্মপর', 'সৎসাহিত্য' কখন বা 'নীতিরাজ' বা 'অনুশাসন' কে লক্ষ্য করে এক এক রাগিনীতে। কিংবা যখন 'গরমিল' দেখেন "বিদ্যে বোঝাই মানুষগুলি/মাথায় নিয়ে পায়ের ধুলি/আস্থা রাখে আপোষে" অথবা "এইভাবে যুদ্ধের সাজসজ্জা ভাসিয়ে দিয়ে/সজ্জন ধার্মিক যিনি/শান্তিজলে গা ধুয়ে/পরকালের ধ্যানে বসেন" ['অস্ত্রের নিজস্ব খেলা'] এবং সমাজতান্ত্রিক 'প্রগতির তালিমারা দেশে'র বেহায়াপনায় কবির স্যাটয়ার যখন ফেটে পড়ে "লেনিন আপনি কোথা, কন্দুর/ডাকি শোকসভা—দ্বিতীয় মৃত্যুর"। তখন আর হাসি আসে না। সেই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্য-স্রোতের মাঝে দু'ফোঁটা সাদা অশ্রু চিক্‌চিক্ করে ওঠে। কবির ব্যথিত হৃদয় পাঠককে সচেতন করে। ধাক্কা মারে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

আসলে শ্যামলবাবু সমাজসচেতন পর্যবেক্ষক। চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও মনে, প্রকাশে ও প্রেরণায় তিনি দুর্গত জনের মুখপাত্র। তাই তিনি জানেন জীবন মানে ভেঙে পড়া নয়,—ভেঙে বেরিয়ে আসা। আর সেই জীবনের তাড়নাই হ'ল সাহিত্যের প্রাণ। সেই প্রাণস্পন্দনকে ফুটিয়ে তুলতে কবিতা হ'ল তাঁর হাতিয়ার। এখানেই তিনি মানিক-সুকান্তের উত্তর-সূরী। জনগণের কবি—জনজাগরণের কবি। তাই তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে ওঠে—হাজার প্রতিকূলতার ভেতরেও। কারণ তাঁর তো জানা আছে "জীবনের দাম দিয়ে/রণবাদ্য বাজিয়ে/একে একে রাত সরে/দিন আসে ঘরে ঘরে" ['দিন আসে']। তাই সেই প্রয়োজনের আয়োজনটুকু করতেও তিনি পিছপা নন—"তিরিশের ক্রুদ্ধ যৌবন নিয়ে সাধ্য ছিল কমরেড/আপনার সাথী হবো/দামাল ছেলের মতো ছুটে যাবো মাঠ মিল খেতে/রোদ জলে হেমন্তের বীজ বুনে দিতে"। এইভাবে—অবশেষে কবির প্রত্যয় দৃঢ় কংক্রীটের রূপ ধারণ করেছে। হোক না তা নিশাকালে—হোক না তা যতই অন্ধতমময়। কারণ—"নবযুগের পান্ডারা/বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে থাকুন আপনারা।/যারা জাগায়—জেগেই আছেন;/বুক চিতিয়ে লড়বে যারা/নবযুগের স্রষ্টা তারা,/চিরকালটা এগিয়ে থাকেন"।

শেষ করার আগে যে কথাগুলি বলা একান্ত প্রয়োজন তা হ'ল—শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে আরও একটু ভাবনা চিন্তা প্রয়োজন। হিরণ মিত্রের প্রচ্ছদে পদানত জীবনের মনোচিত্র সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে। পাঁচ টাকা মূল্যকে স্মরণ রেখেই বলছি প্রত্যেক সৎ পাঠককেই গ্রন্থটি আকর্ষণ করবে। এবং শেষতঃ, কবির কথাতেই বলতে হয়—"শান্তিকামী ছলনার জাতীয় আগষ্ট থেকে/নভেম্বর কত দূর" ?

—দুর্গা ঘোষাল

চন্দন বসুর তুলিতে—

পরিবর্ত শক্তি উৎস

ভূ-তাপ শক্তি/জিওথার্মাল এনার্জি—বৈজ্ঞানিকদের মতে,—পৃথিবীর কেন্দ্রে একধরণের তরল আছে; ভূ-ত্বকের গভীরতা ৩২ কিলোমিটার, ৩২ কিলোমিটার নীচের এই তরল পদার্থের নাম ম্যাগ্‌মা। ম্যাগ্‌মা সবসময় প্রচণ্ড গরম অবস্থায় থাকে। ভূ-ত্বকের মধ্যে কোন জায়গায় ফাটল দেখা দিলে সেই ফাটল দিয়ে ম্যাগ্‌মা পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে আসে। পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রচণ্ড চাপ। এই চাপে ম্যাগ্‌মা যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলা হয় অগ্ন্যুৎপাত। আর যে সমস্ত জায়গায় অগ্ন্যুৎপাত হয় তাদের বলে আগ্নেয়গিরি। (প্রাকৃতিক নিয়মে ভূ-ত্বকের ফাটলের বহিঃর্মুখ সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলে থাকে বলেই বাংলায় অগ্ন্যুৎপাত কেন্দ্রের নাম আগ্নেয়গিরি) ভূ-ত্বকের ফাটল বন্ধ হয়ে গেলে অগ্ন্যুৎপাতও বন্ধ হয়ে যায়। ভূ-ত্বকের ৩২ কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে জল ছাড়াও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থাকে। মানুষ জল ও খনিজ পদার্থ ভূ-ত্বকের মধ্যে থেকে বিভিন্ন ভাবে আহরণ করে। আবার জলের ক্ষেত্রে কখনও কখনও দেখা যায় কোন কোন জায়গায় প্রাকৃতিকভাবেই জল ভূ-পৃষ্ঠের উপর চলে আসছে। স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসা জল সধারণতঃ গরম হয়; এবং জল বেরিয়ে আসার জায়গাগুলির নাম উষ্ণ-প্রস্রবণ. উষ্ণ প্রস্রবণ সৃষ্টির পিছনেও ম্যাগ্‌মার যথেষ্ট অবদান আছে. ভূ-ত্বকের কোন জায়গায় হয়তো জলের অবস্থান এত গভীরে যে ম্যাগ্‌মার তাপে জল আপনা থেকেই উত্তপ্ত হয়ে যায়। এখন যদি সেই জায়গায় ভূ-ত্বকে কোন ফাটল সৃষ্টি হয় তবে সেই ফাটল দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। ভূ-কেন্দ্রর প্রচণ্ড চাপই এই নির্গমনের কারণ। সৃষ্টি হয় উষ্ণ প্রস্রবণের।

ভূ-তাপ শক্তি অর্থাৎ জিওথার্মাল এনার্জির ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক এই নিয়মটি পালন করা হয়। ভূ-ত্বকে একটি নল বসিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ টিউব-ওয়েলের মতই। তফাৎ শুধু গভীরতায়। ভূ-ত্বকের গড় গভীরতা ৩২ কিলোমিটার হলেও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে তার চেয়ে অনেক গভীরতাতেই ম্যাগ্‌মা পাওয়া যায়। ভূ-তাত্ত্বিকেরা সেই জায়গাগুলি নির্ণয় করে দেন। ভূ-ত্বকে নল অনুপ্রবেশ করানোর অর্থ হল ভূ-ত্বকে একটি ফাটল সৃষ্টি করে ম্যাগ্‌মার কাছাকাছি পৌঁছানো। ম্যাগ্‌মা এতই গরম যে ভূ-ত্বকের মধ্যে অনেকদূরে পর্যন্ত তার তাপ পাওয়া যায়। প্রথমে যে নলটি বসানো হয় তার ঠিক কেন্দ্রে আরেকটি অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসের নল বসানো হয়। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো একই কেন্দ্র বরাবর দুটি নল ভূ-পৃষ্ঠে উলম্ব অবস্থায় বসানো হল। সাধারণতঃ এই নলগুলিকে ভূ-ত্বকে ২৭০০ মিটার পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করালেই চলে।

এখন বাইরের নলটি দিয়ে ঠাণ্ডা জল ভূ-কেন্দ্রের দিকে পাঠানো হয়। ভূ-কেন্দ্রের প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে সেই জল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। বাষ্পের সাধারণ গতি ঊর্ধমুখী। প্রচণ্ড চাপে ঐ বাষ্প ভেতরের নল দিয়ে ভূ-ত্বকের বাইরে বেরিয়ে আসে। ভূ-ত্বকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এই বাষ্পের পরিমাণ সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪০০০০ থেকে ৮০০০০ পাউণ্ড। তবে ২ লক্ষ পাউণ্ড প্রতি ঘণ্টায় চাপ এইভাবে নির্গত বাষ্পর থেকে পাওয়া গেছে।

প্রচণ্ড চাপে নির্গত এই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘোরানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর টারবাইন ঘোরানো গেলে তার সঙ্গে জেনারেটর সংযুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কঠিন কাজ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোর উত্তরে জেয়ার্স নামক জায়গায় ১২ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে, যেখানে ভূ-তাপ শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। জেয়ার্সের জিওথার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের দ্বিতীয় ইউনিটের নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ১৪ মেগাওয়াট; এটি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিট ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছে। জেয়ার্সের ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নং ইউনিটের প্রতিটির নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ৫৫ মেগাওয়াট।

শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয় ইটালী, নিউজিল্যাণ্ড মেক্সিকো, জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আইসল্যাণ্ডেও বর্তমানে জিওথার্মাল এনার্জি অর্থাৎ ভূ-তাপ শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আগ্নেয়গিরি এলাকার বহু জায়গায় বাইরে থেকে জল আর অনুপ্রবেশ করাতে হয় না। ভূ-ত্বকের ভিতরের জল বেরোবার জায়গা পেয়ে প্রচণ্ড তাপের ফলে বাষ্পে পরিণত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

জোয়ার-ভাঁটা থেকে সংগৃহীত শক্তি/টাইডাল এনার্জি সমুদ্র ও নদীর জোয়ার-ভাঁটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এক বিশেষ ধরণের টারবাইন জোয়ার-ভাঁটা সমৃদ্ধ নদী অথবা সমুদ্রে সংস্থাপন করা হয়। সেই টারবাইনের সঙ্গে সংযুক্ত জেনারেটর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ফ্রান্স এই ধরণের বিদ্যুৎ উৎপাদনে পথিকৃৎ।

হাইড্রলিক গ্যাস—১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতিটি মন্টগোলফায়ার আবিষ্কার করেন। পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ। নদী বা সাগরের জলকে যান্ত্রিক উপায়ে নীচু জায়গা থেকে উপরে

[শেষাংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়]

বিভাগীয় সংবাদ

বীরভূম জেলা ঃ

ইলামবাজার ব্লক যুব-করণ—গত ২২শে মার্চ থেকে চার-দিন ব্যাপী যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ইলামবাজার ব্লক যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় ইলামবাজার প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্লক যুব উৎসব পালিত হয়। মূল উৎসবের আগে ১৫ই মার্চ ১৯৮০ যুব উৎসবের অঙ্গ হিসাবে নানা ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের সঙ্গে পঃ বঃ সরকারের মৎস্য প্রদর্শনীর স্টল খোলা হয়েছিল। এছাড়া কুটীর শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বয়স্ক শিক্ষার প্রদর্শনীও ছিল। উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী। সকালে ১০ কি. মি. দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়ে উৎসব আরম্ভ হয়। ব্রতচারী নাচ, প্রদর্শনী কবাডি খেলা, নাটক ইত্যাদি সকাল থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত জনসমাবেশে মুখরিত হয়েছিল।

২৩শে মার্চ প্রদর্শনী ভলিবল খেলা, জিমন্যাস্টিক প্রদর্শন, হাবু গান, সাপুড়ে গান, ফকির গান ভদু গান সাঁওতাল নৃত্য, বাউল গান, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৪শে মার্চ মেয়েদের প্রদর্শনী কবাডি প্রতিযোগিতা, যোগাসন প্রদর্শন, গীতিনাট্য, তথ্য বিভাগ কর্তৃক ছায়াচিত্র প্রদর্শন। খ্যাতনামা শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তীর বিচিত্রানুষ্ঠান প্রায় ৪০০০ হাজার নরনারীকে আনন্দ দিয়েছে।

২৫শে মার্চ ছিল বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, যেমন খুশী সাজো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি। সন্ধ্যা ৮টায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। সভায় জেলার অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা পি. সি. সেন সভাপতি ও ভারতকুমার মদন ঘোষ প্রধান অতিথি ছিলেন। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানলাভকারীদের একটি মেডেল ও মানপত্র দেওয়া হয়। স্থানীয় বি. ডি. ও. নন্দদুলাল অধিকারী সভার উদ্বোধন করেন। ব্লক যুব আধিকারিক মদনমোহন সিংহ সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন। সভার শেষে "ভারতকুমার" মদন ঘোষ এবং "সারা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী" মলয় সরকার এবং বীরভূম জেলার কৃতী দেহগঠন সংস্থা কর্তৃক দেহ সৌষ্ঠের প্রদর্শনী এবং মুর্শিদাবাদের উমা দত্ত ও কাকলী মিত্র কর্তৃক যোগাসন ও একক জিমন্যাসটিক প্রদর্শন অনুষ্ঠান প্রায় দু হাজার নরনারীকে মুগ্ধ করে এবং যুব উৎসবের সমাপ্তি হয়।

যুব উৎসবের দিনগুলিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যুব উৎসব প্রাঙ্গণে আসেন—তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ব্রজমোহন মুখার্জি।

যুব উৎসবের মাধ্যমে প্রদর্শনীগুলি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা এনেছিল। প্রতিদিনকার জনসমাগম দেখে মনে হ'তো যেন মেলা বসেছে। মেলার মতই নাগরদোলা, দোকান ইত্যাদি সবের আয়োজন ছিল।

বাঁকুড়া জেলা ঃ

ছাতনা ব্লক যুব-করণ—সম্প্রতি ছাতনা চণ্ডিদাস বিদ্যাপীঠে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ ছাতনা ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে ও ছাতনা ব্লক যুব উৎসব কমিটির ব্যবস্থাপনায় ব্লক পর্যায়ে এই প্রথম যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পাঁচদিন ব্যাপী এই যুব উৎসবের সূচনা হয় ১৯শে মার্চ '৮০ সকাল ৮টায় এবং পরিসমাপ্তি ঘটে ২৩শে মার্চ '৮০ সন্ধ্যা ৭টায়। যুব উৎসবের দিনগুলিতে ব্লকের ৩৩টি গ্রামীণ যুব সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় পাঁচশত প্রার্থী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, আবৃত্তি, বিতর্ক ও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। খেলাধূলার অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত ছেলেদের বিভাগে ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ ও ৮০০ মিঃ দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, বর্শা নিক্ষেপ ও ডিসকাস থ্রো প্রতিযোগিতা এবং মেয়েদের বিভাগে ১০০ মিঃ দৌড়, লং জাম্প, শট পুট, ডিসকাস থ্রো ও বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা উৎসবের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। ব্লকের ৮টি যুব নাট্যগোষ্ঠী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২৩শে মার্চ '৮০ যুব উৎসবের শেষ দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগী ও যুব নাট্যগোষ্ঠীকে ৮০টি পুরস্কার ও অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া হয়। স্থানীয় বিধানসভা সদস্য সুভাষ গোস্বামী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন। যুব উৎসব আয়োজনে ব্লকের যুব-ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। যুব উৎসবে প্রতিদিনই সমাজের বিভিন্ন স্তরের সহস্রাধিক দর্শকের সমাবেশ ঘটে। ব্লকের যুব ও ছাত্রসমাজের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গঠনমূলক মনোভাব বিকাশে ও প্রসারে যুব উৎসব আয়োজনের এই প্রয়াস সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়।

সোনামুখী ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে ও রামপুর মিতালী সংঘের সহায়তায় ১৫ই মার্চ ১৯৮০, শনিবার সোনামুখী পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি গোবর্দ্ধন দাস মহাশয় রামপুর খেলার মাঠে এক অনাড়ম্বর অথচ ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্বোধনী সংগীতের সাথেসাথে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে "যুব উৎসব '৮০"-এর উদ্বোধন করেন।

পতাকাত্তোলনের সময় সমস্ত প্রতিযোগী, উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বেদীর চারিদিকে বৃত্তাকারভাবে দাঁড়িয়ে এই পরিবেশের সমৃদ্ধি আরও বাড়িয়ে তোলেন।

পতাকাত্তোলনের পর নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী চারিটি বিভাগের [বালক "বড়", বালক "ছোট", বালিকা "বড়", বালিকা "ছোট"] "খেলাধূলা প্রতিযোগিতা" (হিট্) শুরু হয়। প্রতিযোগীর সংখ্যা আশাতীত হওয়ায় বিচারকমণ্ডলী প্রতিযোগীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে তাল রেখে ও

প্রয়োজনীয় বিরতির মাধ্যমে "খেলাধূলা-প্রতিযোগিতা" বিকাল ২-০০ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে থাকেন। আনন্দের বিষয় গ্রীষ্মের দাবদাহ সত্ত্বেও প্রতিযোগী ও বিচারকদের মধ্যে কোন রকম উৎসাহের ঘাটতি দেখা যায়নি।

বিকালের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও যথারীতি নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী রামপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুরু হয়। সাংস্কৃতিক বিভাগেও প্রতিযোগীর সংখ্যা আশানুরূপ হওয়ায় বিচারক-মণ্ডলী রাত্রি ৭-৩০ মিনিটের আগে ঐদিনকার প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারেনি।

পরের দিন ১৬ই মার্চ '৮০ সকাল ৮-৩০ মিনিটে খেলাধূলার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আগের দিনের তুলনায় এদিন আরও বেশী উৎসাহী দর্শক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি খেলার মাঠে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেন। প্রতিটি খেলার চূড়ান্ত ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে জানানো হয়।

ঐদিন বিকালে (২-৩০) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে শুরু করা হয়। ঐদিনকার অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরই পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় সহযোগিতায় খুব অল্পসময়ের মধ্যেই আয়োজন সম্পূর্ণ হয়।

বাঁকুড়া জেলার জেলাপরিষদের সভাধিপতি রঞ্জিতকুমার মণ্ডল মহাশয় বিশেষ অসুবিধার জন্য এই পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করতে না পারায় পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি গোবর্ধন দাস এই সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের অধ্যক্ষ রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পুরস্কার বিতরণের পর ব্লক যুব আধিকারিক; "যুব উৎসব" কমিটির সভাপতি, প্রধান অতিথি ও পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতি পর পর "যুব উৎসবের" উদ্দেশ্য সহ "যুব কল্যাণ" বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচী আলোচনার মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

এছাড়া তাঁরা বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে যুবকদের কি কি করণীয়, সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

ইন্দাস ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব করণের উদ্যোগে ও স্থানীয় যুব সংস্থা সমূহের সহযোগিতায় গত ২২শে মার্চ '৮০ ইন্দাস উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন ব্লক যুব আধিকারিক অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়। এর পর শুরু হয় নির্বাচিত অনুষ্ঠানসূচী। ক্রীড়ানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন বিভাগের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অ্যাথলেটিকসের অন্যান্য বিষয়সূচী। ঐদিন বিকেলে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুইটি বিভাগেই প্রভূত জনসমাগম হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ ক্রীড়ানুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু করা হয়। বিকেলে আরম্ভ হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত গীত, স্বরচিত কবিতা ও যেমন খুশী সাজা। রাত্রি ৭টা নাগাদ প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে। ঐদিন পুরস্কার বিতরণী সভারও আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পাঁচুগোপাল আদিত্য ও প্রধান অতিথি ছিলেন রামানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সলিল কুমার ঘোষ। প্রধান অতিথি মহাশয় পুরস্কার ও মানপত্র বিতরণ করেন। এ ছাড়া এই সভায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বি. ডি. ও. ও অন্যান্য বিশেষ অতিথিবর্গ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বিশেষ সাহায্য করেন। পরিশেষে প্রধান অতিথি মহাশয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বি. ডি. ও. ইত্যাদি যুব উৎসবের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিযোগী ও সমবেত জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করেন।

নদীয়া জেলা :

রানাঘাট-২—গত ৩১-৩-৮০ তারিখে দত্তপুলিয়া ইয়ং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশন -এর সহযোগিতায় রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ের পরিচালনায় দত্তপুলিয়া ফুটবল ময়দানে বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় এক মনোরম পরিবেশে দত্তপুলিয়া ইউনিয়ন একাডেমির প্রধান শিক্ষক কুমুদবন্ধু চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন নদীয়া জেলা শারীর শিক্ষা আধিকারক গোপেশ্বর মুখার্জী মহাশয়। বন্দুক থেকে গোলা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পায়রা উড়িয়ে পতাকা উত্তোলন এবং যোগদানকারী সংস্থাগুলি নিজ নিজ পতাকা সহ মাঠ পরিক্রমাই ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় বিষয়।

সকাল ৯টায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী খো খো ট্রেনিং শুরু হয় এবং ১১টায় শেষ হয়, ইতিমধ্যে সকাল ৯-৩০ মিঃ ১৫০০ মিঃ দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খো-খো ট্রেনিং শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে দুই ঘণ্টা ব্যাপী কবাডি ট্রেনিং শুরু হয়। এই দুই ট্রেনিংয়ে বিভিন্ন সংস্থার প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা নেয়। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন নদীয়া জেলা কবাডি প্রশিক্ষক শান্তিময় দত্ত এবং খো খো প্রশিক্ষক দিলীপ চক্রবর্তী। বেলা ১টায় ছোটদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং ২টায় বড়দের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ৩টায় লোক সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রভূত জনসমাগম হয়।

অনুষ্ঠানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল ব্যক্তিগত লাঠিখেলা প্রতিযোগিতা ও দলগত দাঁড় টানাটানি প্রতিযোগিতা। প্রায় ২০০০ হাজার দর্শক এই প্রতিযোগিতা উত্তেজনার মধ্যে উপভোগ করেন।

ঐদিনকার শেষ ও চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান লোকনৃত্যের প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন সবপেয়েছির আসরের ভাইবোনেদের লোকনৃত্যের প্রতিযোগিতা দর্শক মণ্ডলীর মন ভরিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা ৬টায় দত্তপুলিয়া ইউঃ একাডেমির প্রধান শিক্ষক মহাশয় তথা সভাপতি মহাশয় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করে ঐদিনের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ের প্রচেষ্টায় গত ২১-৫-৮০ থেকে ৪-৬-৮০ তারিখ পর্যন্ত দত্তপুলিয়া ইয়ং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এবং নদীয়া জেলার শরীর শিক্ষা এ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় ১৪ দিন ব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির দত্তপুলিয়া ইয়ং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে দত্তপুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অধীন গ্রামগুলি থেকে ৫৩ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য নাম লেখায়। ২১শে মে বিকাল ৪ ঘটিকার সময় নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা আধিকারিক মহাশয়ের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া

শুরু হয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য কাঞ্চন ব্যানার্জী এন. আই. এস. এবং শংকর ব্যানার্জী এন. আই. এস.। শিক্ষার্থীগণ বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে সব কিছু শেখানো এবং শেখা সম্ভব নয়। তথাপি শিক্ষার্থীবৃন্দ যে বেশ কিছু কলাকৌশল রপ্ত করেছেন তার প্রমাণ মেলে ৪-৬-৮০ তারিখে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে। সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ৪ ঘটিকায়। উক্ত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রানাঘাট ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সভাপতি সত্যভূষণ চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন নদীয়া জেলার শারীর শিক্ষা আধিকারিক যোগেশ্বর মুখার্জী। সভাপতি ও প্রধান অতিথিদের সামনে শিক্ষার্থীগণ তাঁদের শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রদর্শনী দেখান এবং যে শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছেন ফুটবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তা প্রমাণ করেন। ফলে অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত উপস্থিত প্রায় ২০০০ হাজার দর্শক প্রতিযোগিতামূলক খেলাটি উপভোগ করেন। পরিশেষে শিক্ষার্থীদের পুষ্প স্তবক সহ মানপত্র প্রদান করা হয়।

কৃষ্ণনগর-১নং ব্লক তথ্য কেন্দ্র উদ্বোধন—স্থানীয় যুব সম্প্রদায়ের জন্য গত ১২ই জুন '৮০ কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুব-করণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের অর্থানুকুল্যে 'ব্লক তথ্য কেন্দ্রের' উদ্বোধন করা হয়।

এই কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন সুবল মার্ডি, মহকুমা শাসক, সদর (দক্ষিণ) এবং কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুনীলকুমার ঘোষ মহাশয় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অনেকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধান সভার সদস্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জেলা শরীর সংগঠক বিনয়ভূষণ দে, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অতুল চন্দ্র টিকাদার, সমাজ-শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক মণি চক্রবর্তী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপরোক্ত ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে যুব সমাজকে "তথ্য কেন্দ্রের" সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগের সাদর আহ্বান জানান।

এই তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, স্ব-নির্ভর কর্ম প্রকল্প, ক্রীড়া ও বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্যাদি, ভ্রমণ সংক্রান্ত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সাম্প্রতিক তথ্যাদি সংগ্রহের সুযোগ সুবিধা লাভ করবে স্থানীয় যুব সম্প্রদায়।

বর্ধমান জেলা:

মেমারী ব্লক যুব-করণ—১৯৮০ সাল ২২শে মার্চ মেমারী ১নং ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে মেমারী সন্তোষ মঞ্চে এক বিরাট যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধান সভা সদস্য বিনয়কৃষ্ণ কোঙার। এই অনুষ্ঠান চলে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত। যুব উৎসবের খেলাধুলার আয়োজন করা হয় স্থানীয় মেমারী ভিঃ এমঃ হাইস্কুল হেটেপুকুর ময়দানে। নাটক এবং প্রদর্শনী হয় মেমারী সন্তোষ মঞ্চে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধান সভা সদস্য বিনয়কৃষ্ণ কোঙার পচা গলা সমাজ ব্যবস্থা ও কায়েমী যৌবনের উত্তরণের ক্ষেত্রে নতুন পথের আলোক বর্তিকা নিয়ে বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করেন—যত দুর্যোগই আসুক তা কাটবেই। এটা ইতিহাসের নিয়ম; তিনি বলেন, অমৃতের সন্তান মানুষ—সেই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল হচ্ছে যৌবন।

অত্যন্ত রুচিশীল এই প্রদর্শনীটিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদর্শনী, ১নং ব্লক যুব-করণে সীবন শিক্ষা কেন্দ্র, পঞ্চগ্রাম সমবায় কুটির শিল্প, আমাদপুর স্কুলের ছাত্রদের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর স্টলগুলি। এই উৎসবে ২১টি বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন গড়ে ৫৫ জন প্রতিযোগী। প্রতিযোগীদের মধ্যে ১১২ জন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কার এবং প্রসংশা পত্র দেওয়া হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাপতি মেহবুব জাহেদী।

মালদহ জেলা:

পুরাতন মালদা ব্লক যুব-করণ—গত ২৬শে জুলাই, ১৯৮০ মঙ্গলবাড়ী প্রাইমারী স্কুলে ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে দুটি বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়েছিল। (১) মেয়েদের সীবন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (২) ছেলেদের পাম্পসেট মেরামত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তারমধ্যে ছেলেদের পাম্পসেট মেরামত প্রশিক্ষণে ৫০ জন সফল ছাত্রকে এবং মেয়েদের সীবন প্রশিক্ষণে ২৬ জন সফল ছাত্রীকে প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় যুব নেতা অজয় খাঁ, প্রধান অতিথি হিসাবে বিধান সভার সদস্য শুভেন্দু চৌধুরী বলেন, এই বৃত্তিমুখী শিক্ষার ফলে যদি কিছু ছেলে-মেয়ে সরকারী চাকুরীর মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই কিছু রোজগারের জন্য সচেষ্ট হন তবেই এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আয়োজন সার্থক হয়ে উঠবে। ফলে সরকার আরও অধিক সংখ্যায় এই বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করতে উৎসাহী হবেন। সবশেষে তিনি প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন।

পুরাতন মালদা ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে বৃত্তিমুখী পাম্পসেট মেরামত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষণরত ছাত্ররা।

পাঠকের ভাবনা

খেলাধুলো ও দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা বিষয়ে দু'টি নিয়মিত বিভাগ

আপনার পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী পাঠ করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। কিন্তু নিয়মিত পাঠক হিসাবে এই পত্রিকাকে আরও সুন্দর করবার জন্য আমি কয়েকটি কথা বিনীতভাবে জানাতে চাই।

প্রথমত বলতে পারি প্রত্যেক পত্রিকায় কিছু নিয়মিত বিভাগ আছে। এই পত্রিকার ক্ষেত্রে সেটা না করা গেলেও যেটা করা যেতে পারে সেটা হল খেলাধুলো বিভাগ। এই বিভাগের মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে ব্যাডমিন্টন, যথা প্রকাশ পাড়ুকোন সম্পর্কে বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ খেলা সম্বন্ধে, বা আন্তর্জাতিক কোন ফুটবল, হকি, ক্রিকেট বা অ্যাথলেটিক খেলোয়াড় সম্পর্কে লেখা প্রকাশ করা যেতে পারে। তাহলে পত্রিকাটির যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, তেমনি যুবকদের কাছে পত্রিকাটি সম্পর্কে আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে। তবে খেলাধুলো সম্পর্কে কি প্রকাশ করা যেতে পারে না পারে সেটা সম্পাদক মহাশয়ের বিবেচ্য বিষয়। আমার কথা হল খেলাধুলো বিভাগের মাধ্যমে খেলাধুলো সম্পর্কে নিয়মিত কিছু এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করুন অর্থাৎ খেলাধুলাকে এই পত্রিকার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করুন।

দ্বিতীয়ত আর একটি কথা বলতে চাই সেটা হল "দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক" সমস্যাবলী সম্পর্কে নিয়মিত কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করা যেটা এই পত্রিকা এড়িয়ে গেছে। যেমন ধরুন আসাম সমস্যা সম্পর্কে এ পর্যন্ত মাত্র একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন ফেব্রুয়ারী '৮০ সংখ্যায় (আসামের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে—অনিল বিশ্বাস)। যাই হোক আসাম সম্পর্কে আরো কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করুন কারণ আসাম সমস্যা জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং এ সমস্যা সম্পর্কে যুবকদের ভালভাবে জানানো দরকার। সেই রকম আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কেও কিছু লেখা প্রকাশ করুন।

সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যদি সম্ভব হয় তবে দু'টি বিভাগকে নিয়মিত করুন। আমার মনে হয় যুবমানস পত্রিকাটি তবেই যুব মানসে গভীরভাবে রেখাপাত করবে।

—অমরেন্দ্রনাথ পাল
সুভাষনগর, বনগ্রাম
২৪-পরগনা

লিটিল ম্যাগাজিন ও ছোট গল্প

॥ ১ ॥

আমি একজন মাসিক যুবমানসের পাঠক। মে-সংখ্যা পড়লাম। শুভাশীষ চক্রবর্তীর "লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলন: এক পরম সত্য", আলোচনাটি অত্যন্ত প্রশংসার অধিকার রাখে। লেখক-লেখিকার কাছে আমার আবেদন লিটিল ম্যাগাজিনের জীবন ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখা যুবমানসের পাতায় তুলে ধরুন। এ ছাড়া মাননীয় সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে আমার আবেদন এই বলিষ্ঠ পত্রিকাতে দু'টি করে গল্পের স্থান দেওয়া হোক।

গৌরাঙ্গ দাশ
গ্রাঃ মহিষা, ডাঃ কুমড়া কাশীপুর
২৪ পরগনা

॥ ২ ॥

গ্রাহক হওয়ার পর প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়েই আগাগোড়া পড়ে ফেললাম। "লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলন—এক বাস্তব সত্য" লেখাটি চমৎকার। তবে লেখক একটা সমস্যার কথা তুলে ধরেননি। সেটা হলো বিক্রি করার অসুবিধা এবং পত্রিকার প্রচার বা উদ্দেশ্যের কথা সাধারণ লোককে জানানো। কারণ "লিটিল ম্যাগাজিন" পড়বার মত পাঠক সমাজ এখনও পশ্চিমবঙ্গে তৈরী হয়নি। খুব কম লোককে দেখেছি যাঁরা খোঁজ খবর করে লিটিল ম্যাগাজিন পড়তে চান। অথচ লিটিল ম্যাগাজিন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ। যুবমানস পত্রিকার উন্নতি হবে আশা রাখি।

দেবাশীষ বর্ধন
৫৮ মিলন পার্ক, গড়িয়া
কলকাতা-৮০

অলচিকি হরফ—সরকারী স্বীকৃতি

আমি আপনার পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। বামফ্রন্ট সরকার এই পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তরুণ যুবসমাজের "স্বপ্নকে" বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আরও বলতে হচ্ছে যে, মাননীয় বামফ্রন্ট সরকার সাঁওতালী ভাষার হরফ "অলচিকি"-কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেন, যা পূর্বের সরকার কল্পনাও করেননি। পশ্চিমবাংলার ২৫ লক্ষ সাঁওতাল ভাই-বোনদের ঐতিহ্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিলেন বামফ্রন্ট সরকার। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার সাঁওতালী ভাষার হরফকে স্বীকৃতি দিলেন। এজন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আশা করি ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য তাঁরা আরও অনেক

কাজ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "যুবমানস" পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা করি।

তপনকুমার উপাধ্যায়
সম্পাদক, বসিরান মিলন সংঘ
রায়গঞ্জ/পঃ দিনাজপুর

দ্বন্দ্ব বিজ্ঞপ্তী ও প্রকাশনা

অবহেলিত যুব সমাজকে সুস্থ ও গতিশীল সাংস্কৃতিক এবং তাঁদের সাহিত্য চেতনাকে পরিস্ফুটনের জন্য,. আপনারা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ 'যুব মানস' পত্রিকার প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছেন। এবং গ্রাম বাংলার অবহেলিত প্রতিভা সংগ্রহে মনযোগ দিয়েছেন—এজন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবু বলছি 'যুব মানস' পূর্ণাংগ নয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যখন এর প্রকাশনা তখন সাহিত্যের সব কটি শাখার অর্থাৎ অঞ্চলভিত্তিক লোক সংস্কৃতি, রম্যরচনা, ছড়া, ধারাবাহিক জীবনমুখী উপন্যাস ইত্যাদির সংযোজন থাকা ভালো। অবশ্য কট্টর পাঠক হিসাবে এটা আমার অনুরোধ। সবশ্রেণীর পাঠকের পাঠস্পৃহা যাতে মিটে যায় তার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলছি। সেই সংগে অনুরোধ করছি মাসিক 'যুবমানস' যাতে ঠিক সময়ে অর্থাৎ মাসে মাসে প্রকাশিত হয় তার জন্য উদ্যোগ নিতে। দেরীতে পত্রিকা (যুবমানস) হাতে পেলে উৎসাহে ভাটা পড়তে পারে। শিথিলতাও আসে। জানিনা মফস্বলের একজন সাধারণ পাঠকের হৃদয়াকৃতি 'যুবমানসে' ছায়া ফেলবে কিনা? ছায়া ফেলুক এটা সর্বান্তকরণে চাই।

এ. কালাম
কান্দুরী.এড়োয়ালী
মুর্শিদাবাদ

ভাই-এর ভাবনা

লেখক, সাহিত্যিক বা কবি কোনো ভাবেই আমি সাহিত্য জগৎ বা ম্যাগাজিন জগতে পরিচিত নই। বলা বাহুল্য অত্যন্ত আশার সংগে আমার এই রচনাটি পাঠালাম। প্রথম কোনো পত্রিকায় রচনা পাঠাবার এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার সম্মুখীন হতে গিয়ে দেখলাম একাদশ শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে আমার উৎসাহ হয়ত কিঞ্চিৎ অধিক। প্রথমেই এত বড় এক পত্রিকার দিকে হাত বাড়ানো। আমার মন দুঃসাহসিক বললেও বিবেক এক অদম্য আকর্ষণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু আশা করি নয় নিঃসন্দেহে বলতে পারি আপনাদের হাত-ও এই অখ্যাত কবির দিকে এগিয়ে আসবে। উৎসাহের মাত্রা, আকর্ষণের প্রভাব তাতে নিশ্চয়ই আরো বেড়ে যাবে এবং অসঙ্কোচে বলতে পারি দুঃসাহসিকতার হীনতা ক্রমশঃ কমে যেতে বাধ্য হবে। অতএব শুধুমাত্র আপনাদের মিলিত হাত ধরার জন্য আমার হাত আগেই বাড়িয়ে অপেক্ষায় রইলাম। নিশ্চই বিফল হবো না। অন্ততঃ এই কৈশোর উদ্দামে মত্ত যুবক মন তাই বলছে।

আপনাদের এক ছোট্ট কবিবন্ধু বা ভাই—

প্রবীর কুমার দাস
পি-১১, ব্যাঙ্ক গার্ডেনস
পোঃ বাঁশদ্রোণী, ২৪ পরগনা

[শিল্প-সংস্কৃতি : ২৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মেন্টারী ভুলছেন না! এমনকি বাড়িওয়ালার চরিত্র বোঝাতেও তা ততো প্রয়োজনীয় নয়। অবশ্য দৃশ্য দুটি অতিনাটকীয়তা বর্জিত হওয়ায় শৈল্পিক। তবে, এইসব অনাবশ্যক ছিদ্রান্বেষণ ক'রেও বলতে হয়, শেষ পর্যন্ত মৃণাল যে চীনুর দেরী ক'রে বাড়ি ফেরার কারণ দর্শাতে তেলেভাজা প্রিয় দর্শকের দাবী মেটাতে একটি গোল গল্পের অবতারণা করেন নি, সেজন্যে তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। এবং এভাবেই, এইসব হৃদয় ও বুদ্ধিবের ধারা সহ মৃণাল সেন তাঁর সাম্প্রতিক ছবিটি তৈরী করেছেন যা অনায়াসে তাঁর এতদ্‌কালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবি ব'লে বিবেচিত হবে, টালিগঞ্জের কাছে তো বটেই।

—গৌতম ঘোষদস্তিদার

[বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা : ৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তোলা হয়। এবারে উপরের জলকে নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে টারবাইনের উপর দিয়ে চালিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে তার সাথে সংযুক্ত জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, পদ্ধতিটির উৎপাদনক্ষমতা খুব কম।

গোবর-গ্যাস প্ল্যান্ট/বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট

গরু,মহিষ প্রভৃতি গবাদি পশুর মলকে কাজে লাগিয়ে তার থেকে গ্যাস তৈরী করে আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরেই রান্নার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারে প্রচলন হয়েছে। তবে ব্যবস্থাটি কুসংস্কারের প্রভাবে জনপ্রিয় হয় নি। গোবর-গ্যাস থেকে বিদ্যুৎও উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু কুসংস্কার এই বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রধান অন্তরায়। এ ছাড়া দারিদ্র্য জনিত কারণে গোবর-গ্যাস প্ল্যান্ট চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় গবাদি পশুর মালিকের সংখ্যাও কম। অতএব গোবর গ্যাস পরিবর্ত শক্তির উৎস হয়েও কাজে আসছে না, গোবর গ্যাসের মত একই পদ্ধতিতে মানুষের মল থেকেও গ্যাস উৎপন্ন করে কাজে লাগানো যায়। এই ধরণের প্ল্যান্টের নাম বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট।

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য বহু ধরণের শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচেষ্টা বর্তমানে গবেষণাধীন অবস্থায় আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

গ্রাহক হতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা সডাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হ'লে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০ %
১৫০০-এর উর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০ %
৫০০০-এর উর্ধ্বে	৪০ %

১০টা সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান।

বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিকগুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

লাভপুর ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে টেলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণরত।

রাইনা ব্লক যুব উৎসবে তরুণ সংঘ মঞ্চস্থ নাটক 'কাক দ্বীপের এক মা'।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
নভেম্বর, '৮০

নভেম্বর বিপ্লব

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : কান্তি বিশ্বাস

প্রচ্ছদ : বিজন চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—পঁচিশ পয়সা

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

আলোচনা

প্রতিবেদন

গল্প

কবিতা

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

শিল্প-সংস্কৃতি

খেলাধূলা

বিভাগীয় সংবাদ

দীনেশ মজুমদারের জীবনাবসান

রাজ্য বিধানসভায় বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা দীনেশ মজুমদার গত ২৮শে অক্টোবর এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র সাতচল্লিশ বছর।

প্রয়াত শ্রীমজুমদারের জন্ম ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার গালিমপুর গ্রামে, ১৯৩৩ সালের ১লা জুন। দেশ বিভাগের পর তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে ১৯৪৮ সালে নদীয়া জেলার রাণাঘাটের রূপশ্রী ক্যাম্পে চলে আসেন। এই সময় উদ্বাস্তু আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে উদ্বাস্তু আন্দোলন পরিচালনার সময় তিনি গ্রেপ্তার হন।

রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। যুব আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দিতে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিষদীয় রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালে প্রথম যাদবপুর কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৭২ এবং '৭৭ সালেও ঐ একই কেন্দ্র থেকে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে হেলসিঙ্কিতে এবং ১৯৭৮ সালে কিউবায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব উৎসবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি লুসাকায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেন। দেশে ফেরার পথে তিনি লন্ডন, বার্লিন, রোম এবং কায়রো ভ্রমণ করেন।

তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে অসংখ্য গণতান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে আমরাও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি।

—সঃ মঃ যুবমানস

মধু গোস্বামী-র সংযোজন—

সহজ সুরে যে ডেকেছে
সেই পেয়েছে সাড়া,
চোখ রাঙিয়ে যে এসেছে
সেই খেয়েছে তাড়া।
বাঁচার লড়াই যে করেছে
সেই পেয়েছে পাশে,
মৃত্যু তাকে হানুক ছোবল
জীবন ভালবাসে!

সম্পাদকীয়

ভাবতে অবাক লাগে তেষট্টি বছর আগের একটি দেশের একটি ঘটনা—কী সীমাহীন তার গুরুত্ব, কী গভীর তার তাৎপর্য। শত শত বছর ধরে পৃথিবীর বুকে তো কত ঘটনাই ঘটে চলেছে। কত রাজা-উজীরের পরিবর্তন হয়েছে। কত রাজবংশের উত্থান-পতন হয়েছে। ঘটা করে কত রাজা-রাণীর অভিষেক হয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনার কথা কে কখন শুনেছে যে ৬২ বছর ধরে গোটা দুনিয়ার সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ শ্রদ্ধার সাথে একটি ঘটনাকে বছরে অন্ততঃ একবার স্মরণ করেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে বছরে অন্ততঃ একবার শপথ গ্রহণ করেন দেশে এক সুখী ও সমৃদ্ধিশালী শাসনব্যবস্থা কায়েম করার।

১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় নভেম্বর মাসে (ঐ দেশের পঞ্জিকা অনুসারে অক্টোবর মাসে) তখনকার সাধারণ মানুষের কাছে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হোল। প্রচন্ড প্রতাপশালী শাসনকর্তা জারশাহীর পতন ঘটল। কোন রাজবংশের কোন সৌভাগ্যবান রাজপুত্রের হাতে এই বিরাট দেশের শাসনভার গেল না। দেশ শাসনের দায়িত্ব এমন কি কোন ব্যক্তির হাতেও পড়ল না। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল যৌথভাবে একটি শ্রেণী। যে শ্রেণী হোল শ্রমিক-শ্রেণী—গতর-খাটা মানুষের শ্রেণী।

জার্মান দেশের দার্শনিক পন্ডিত কার্ল মার্কস ১৮৪৮ সালে ধনিকশ্রেণীর মৃত্যু পরোয়ানা ও শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দলিল "কমিউনিষ্ট ইশতেহার" প্রকাশ করেন। তাতে তিনি গভীর বিশ্বাস নিয়ে ঘোষণা করেন যে ধনিকশ্রেণীর কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণী একদিন দেশকে পরিচালিত করার ক্ষমতা—রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। অর্থাৎ মেহনতকরা শক্ত হাতে শ্রমিক-শ্রেণী শেষ পর্যন্ত দেশের রাজা হয়ে রাজদন্ড হাতে নেবেন। তখনকার দিনের এই অকল্পনীয় কথা শুনে রাজনীতির পন্ডিত থেকে শুরু করে সকলে মার্ক্স সাহেবকে বদ্ধ পাগল বলে উপহাস করেছিলেন। পাগলা গারদ তাঁর যথাযোগ্য স্থান বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

কিন্তু মাত্র ২৩ বছর পর ১৮৭১ সালে ফরাসী দেশে শ্রমিকশ্রেণী শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে দেশের একটি অংশের পরিচালন ক্ষমতা কেড়ে নেয়—এরই নাম প্যারি কমিউন। যদিও এটা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আবার হাতছাড়া হয়। মার্ক্স সাহেব যে উন্মাদ নয়—এ রকম ঘটনা যে ঘটতে পারে—এই খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সারা বিশ্বে এই ঘটনা আলোড়ন তুলল।

প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাজনৈতিক আকাশে যে চমক সৃষ্টি হয়েছিল তার ৪৬ বছর পর রাশিয়ায় তা বাস্তবে রূপ নিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই সার্থক বিপ্লব বিশ্বের মানুষের কাছে প্রমাণ কবল মার্ক্স সত্যদ্রষ্টা রাজনৈতিক দার্শনিক। মহান নভেম্বর বিপ্লব শোষণ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন নয়—এই বিপ্লব গোটা শোষণ ব্যবস্থার অবসান করে শোষকগোষ্ঠীকে সমূলে উৎখাত করে মেনহতী শ্রেণীর একনায়কত্বে এক নতুন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করল। মানুষের দ্বারা মানুষের উপর শোষণ চিরদিনের জন্য বন্ধ হোল। কল-কারখানার শ্রমিকের মেহনতে যে পণ্য উৎপন্ন হবে তার ন্যায্য অংশ থেকে তারা চিরবঞ্চিত থেকে সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে আর মালিকশ্রেণী—উৎপাদনের সাথে যাদের কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই—তারা মুনাফার পাহাড় গড়ে বিলাসিতা ও ব্যভিচারের উৎকট আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে—এ ব্যবস্থা বন্ধ হোল। যে ক্ষেতমজুরের ঘামে ক্ষেতে ফসল তৈরী হবে জোতদার-জমিদারশ্রেণী মান্ধাতার আমলের ভূমিব্যবস্থার জোরে তার সবটুকু প্রায় আত্মসাৎ করতে থাকবে—এ প্রথাকে লুপ্ত করে দেয়া হোল। এক কথায়—উৎপাদন সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে নূতন করে স্থাপন করা হোল। উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তি মালিকানা চুরমার করে দিয়ে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হোল। ফলে দেশে উৎপন্ন সম্পদ মানুষের মধ্যে সুষম বণ্টনের বনিয়াদ তৈরী করল। জীবনের সনাতনী যন্ত্রণা থেকে মানুষ মুক্তি পেল। যুব-জীবনে বেকারিত্বের অভিশাপের সম্ভাবনা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল। চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের ব্যবস্থা সকল মানুষের জন্য সুনিশ্চিত হোল। মানুষ নূতন জীবনের স্বাদ পেল—তার জীবনের অর্থ খুঁজে পেল।

এই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে সকল মানুষের সৃজনীশক্তির সুষ্ঠু বিকাশের সুযোগ আসলো। মুনাফা সৃষ্টির জন্য নয়—দেশের মানুষের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সমস্ত সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি চালু হোল। সমস্ত বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অগ্রগতি প্রবল গতিতে এগিয়ে চলল।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে হৃদ্‌কম্প শুরু হোল। ধনিকশ্রেণী শিহরিয়ে উঠল। নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে সমস্ত প্রকার চেষ্টা শুরু করল।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ এই নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে আলোকিত হয়ে—নিজ দেশে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। বাকী অংশে এই মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষ শক্তিশালী হচ্ছেন, সংগঠিত হচ্ছেন, লক্ষ্যকে স্থির রেখে, আদর্শে অবিচল থেকে এই ব্যবস্থা কায়েমের দিকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে সকল পুঁজিবাদী দেশে এখন এক চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছে। অস্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকারের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। মানুষের দুর্ভোগ একনাগাড়ে বেড়ে চলেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এক অস্থির পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে এই দেশগুলি চলছে।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও এই সমস্যাগুলি অনিবার্য কারণেই বর্তমান। সমস্ত দিকে অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়ছে। কাজের সুযোগ আরও বেশী সংকুচিত হচ্ছে। বেকারিত্বের তীব্রতা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। দেশের যাবতীয় সমস্যার সঠিক সমাধানের পথ থেকে মানুষের বিশেষ করে লড়াকু যুবসমাজের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, সাংস্কৃতিক জগতে ক্লীবতা, অশ্লীলতা, যৌনতা এবং জীবন-বিমুখতার জোয়ার সৃষ্টি করার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা হচ্ছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা, জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, কু-সংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, আত্ম-কেন্দ্রিকতার মত বিষাক্ত ব্যাধিগুলির প্রসারের দ্বারা যুবমনকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এর সুযোগ গ্রহণ করছে। কতকগুলি সংগত ক্ষোভকে সামনে রেখে বিচ্ছিন্নতাকামী ঝোঁককে সুনিপুণভাবে চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হচ্ছে—দেশের ঐক্য ও সংহতিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আক্রমণ হানার বিভিন্ন প্রকার লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হচ্ছে। সংসদীয় ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে এক ব্যক্তির হাতে দেশ শাসন করার যাবতীয় ক্ষমতাকে সমর্পণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য ভাড়াটে আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের জড়ো করে তাদের দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কড়চা গাওয়ার মঞ্চ তৈরী করা হচ্ছে।

এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্বের লক্ষ-কোটি মানুষের সাথে আমরাও ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবকে স্মরণ করছি। দেশের মানুষ বিশেষতঃ যুবসমাজকে তাই আমরা আহ্বান করব—আসুন দেশের বিদ্যমান সমস্যার কারণ এবং সামগ্রিক অবস্থার এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কাজে আমরা আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করি। নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের দেশের মাটিতে তাকে প্রয়োগ করার কৌশল আয়ত্ব করার ব্রতে আমরা দীক্ষাগ্রহণ করি। দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ যা পেরেছেন—আমরা যা পারি নি—সেই না পারার গ্লানি থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য এই নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে বজ্রকণ্ঠে ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ গ্রহণ করি।

নবীনের জিজ্ঞাসা : প্রবীণের উত্তর

সৌমিত্র লাহিড়ী

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী এবার উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার জনগণ নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে উৎসব মুখর হয়ে উঠবেন, সমাজতন্ত্র নির্মাণ কার্য দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করবেন আর শোষণের শৃংখলে আবদ্ধ পুঁজিবাদী দুনিয়ার মেহনতী জনগণ নিজ নিজ দেশের বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করবেন।

১৯১৭ সালের ৭ থেকে ১৭ নভেম্বরের রক্তঝরা দশটা দিন কাঁপিয়ে দিয়েছিল সারা দুনিয়া। নভেম্বর বিপ্লবের বিজয় অভিযান দেখে শংকিত হয়েছিল দেশে দেশে শোষক শাসক আর অত্যাচারীর দল। কিন্তু বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে, মেহনতী জনগণের কাছে, সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শোষণ শাসনে জর্জরিত পরাধীন দেশের সংগ্রামরত জনগণের কাছে, এই বিপ্লব এক নব যুগের সূচনা করেছিল, বহন করে এনেছিল আগামী দিনের ঊষার আলো। মানব জাতির ইতিহাসে নভেম্বর বিপ্লব-ই একমাত্র বিপ্লব নয়। রুশ দেশের বিপ্লবের আগেও বহু বড় বড় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। বহু রক্ত ঘাম আর অশ্রুর পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে এসেছিল সে সব বিপ্লব। যেমন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলন্ডের বিপ্লব, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব মানব সমাজে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু মানব ইতিহাসের সমস্ত সংঘটিত বিপ্লবের সঙ্গে নভেম্বর বিপ্লবের পার্থক্য ছিল বিরাট। কি সেই মৌলিক পার্থক্য?

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী বহনকারী ফরাসী বিপ্লবও মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ করতে পারেনি। সেই বিপ্লবেও শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটেনি। নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বে সংঘটিত সমস্ত বিপ্লব—ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রগতির কথা বলা হলেও, মানব জীবনের কিছু কিছু সমস্যার মোকাবিলা করলেও সেই সব বিপ্লব শোষণের অবসান ঘটায় নি। নভেম্বর বিপ্লবই পৃথিবীর বুকে মানব জাতির ইতিহাসে প্রথম বিপ্লব যা শোষণের অবসান ঘটিয়েছে, নতুন যুগের সূচনা করেছে।

একদল শোষকের জায়গায় আর একদল শোষককে বসানো, এক রকম শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তে আর এক রকম শোষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল না। নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের সকল রকম ব্যবস্থার অবসান করা, সমস্ত শোষকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করা, উৎপাদনের উপায়-সমূহে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা, রাষ্ট্র কর্তৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর এক নায়কত্ব কায়েম করা, সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে যারা সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী সেই শ্রমিকশ্রেণীর শাসন-কর্তৃত্ব সংস্থাপিত করা, বুর্জোয়া শ্রেণীর গণতন্ত্রের অর্থাৎ সমাজের শতকরা দশভাগ মানুষের গণতন্ত্রের অবসান করা এবং মেহনতী মানুষের গণতন্ত্র অর্থাৎ সমাজের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা।

নভেম্বর বিপ্লব আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কঠোর পাহারা ও নিষ্ঠুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ, অনেক তথ্য এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণ কার্যের অগ্রগতির সংবাদ আসতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অসংখ্য সৈনিক নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে নতুন পথ নির্দেশ খুঁজে পান। এক নতুন ধরনের সংগ্রাম জন্মলাভ করে। যদিও বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার বিকৃত তথ্যই প্রচার করত, নভেম্বর বিপ্লবের লাল ফৌজদের দস্যু বলে চিহ্নিত করত, বলশেভিক জুজুর ভয় দেখাত এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের আতঙ্ক ছড়াত, তবুও তারই মধ্যে অনেকে খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির পথ। চোরা পথে বিপদের বিপুল ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবীরা সংগ্রহ করতেন সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের বই, মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের চিরায়ত গ্রন্থাবলী।

যাদের হাত ধরে ভারতের জনগণ মুক্তির নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেছিলেন, যারা তখন কৈশোরের স্বপ্নময় জগৎ ছেড়ে যৌবনের প্রাণোচ্ছ্বলতায় স্বাধীনতার সংগ্রামে খুঁজে ফিরছিলেন বিকল্প পথ, তাঁদেরই কয়েকজনকে নভেম্বর বিপ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, বক্তব্য শুনতে চেয়েছিলাম। সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী, প্রবীন জননেতা ত্রিদিব চৌধুরী আমাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, নবপ্রজন্মের কাছে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করেছেন।

আমাদের প্রশ্নাবলী

সবার কাছেই আমরা একই প্রশ্ন উপস্থিত করেছিলাম। সেই প্রশ্নগুলি হলো—

১। নভেম্বর বিপ্লবের কথা কবে কখন কোথায় কার কাছে প্রথম শুনলেন। আজকের নয়, তখনকার প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

২। নভেম্বর বিপ্লবের সঙ্গে অতীতের অন্যান্য বিপ্লবের কি মৌল পার্থক্য আপনার চোখে ধরা পড়েছিল?

৩। নভেম্বর বিপ্লবোত্তর চিন্তাধারাটি কিভাবে আপনি গ্রহণ করলেন?

৪। নভেম্বর বিপ্লবোত্তর আশা-প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে?

৫। নভেম্বর বিপ্লব প্রসঙ্গে আপনার কোন ব্যক্তিগত স্মৃতি আছে কি?

৬। নভেম্বর বিপ্লব কি আর অতীতের মত যুব সমাজের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে না?

৭। নভেম্বর বিপ্লব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কি প্রভাব বিস্তার করেছে?

৮। বর্তমান যুব সমাজের কাছে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আপনার বক্তব্য কি?

বিনয় চৌধুরী

"আমরা তখন নতুন পথ খুঁজছি। ভাবছি স্বাধীনতার পর কি হবে, সমাজ কেমন হবে, কিভাবে গড়ে তুলব আমাদের দেশ। তখন

যৌবনের তেজ, রক্তে দোলা দিত স্বাধীনতার সংগ্রাম, মিছিল মিটিং দেখতাম, আকর্ষণ অনুভব করতাম, কখনও মিশে যেতাম জনতার ভীড়ে। কিন্তু ঐ প্রশ্ন—স্বাধীনতার পর কি হবে? পথ কি? এমন সময় নতুন আইডিয়ার সন্ধান পেলাম, নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলাম"—চিন্তার অতল স্রোত থেকে উঠে এসে বললেন বর্তমান ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জননেতা বিনয় চৌধুরী।

প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে মহাকরণে সময় দিতে পারেন না। জটিল দপ্তরের দায়-দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। পর পর কয়েকদিন সময় দিয়েও অন্য কাজে আটকে গেছেন। কখনও বা দর্শনার্থীর ভীড়ে কথা বলতেও পারেন নি। তারই মধ্যে এক ফাঁকে একদিন সব প্রশ্নের জবাব দিলেন।

নভেম্বর বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন কিশোর। যখন সেই যুগান্তকারী বিপ্লবের সংবাদ, তথ্য ও ঘটনাবলী বুঝতে পেরেছেন তখনও তাঁর বয়স বেশী নয়, সবে যৌবনে পা দিয়েছেন। ফলে দীর্ঘকালের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে মনে করতে হচ্ছে যৌবনের কথা। স্মৃতি বড় প্রতারক। বড় দ্রুত হারিয়ে যায়। খুব সামান্য অংশই সে বহন করতে পারে। তবু মানুষের মনে এমন কিছু কিছু ঘটনা গেঁথে থাকে যা চিরকালের সম্পদ। নভেম্বর বিপ্লবের সেই দোলা লাগানো ঘটনাবলীরও অনেকটাই শ্রদ্ধেয় নেতার স্মৃতিপটে অম্লান রয়েছে। তাঁর কথা থেকেই বলিঃ আমার বয়স এখন সত্তর। সব কথা তাই মনে রাখা মুশকিল। প্রায় পঞ্চাশ বাহান্ন বছর আগেকার কথা। তাই এখন আর মনে করতে পারছি না কবে কোথায় কখন কার কাছে প্রথম নভেম্বর বিপ্লবের কথা শুনেছিলাম। তবে নভেম্বর বিপ্লবের কথা প্রথম শুনেই খুব অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলাম এমন নয়। ধীরে ধীরে তার আদর্শ, তার সাফল্য আমি এবং তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠন যুগান্তর দলের অন্যান্য অনেকে বুঝতে পেরেছিলাম।

আত্মশক্তির সংবাদ

মনে পড়ছে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কথা, বটুকেশ্বর ও ভগত সিংদের সেন্ট্রাল অ্যাসেমব্লিতে বোমা ফেলার কথা। এসব জানতে পেরে উজ্জীবিত হয়েছিলাম। এ সময়ে 'আত্মশক্তি' পত্রিকাতে নিয়মিত সংবাদ পড়তাম, জানতে পারতাম অনেক ঘটনা। রোমাঞ্চ লাগত। তখন আর কত বয়স? বিশের দশকের শেষ দিককার কথা।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ

বিপ্লবী নেতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একটা ছাত্র সম্মেলনে পরিচয় হয়। ভূপেনদার কাছ থেকে ক্রমশঃ জানতে পারি রুশ বিপ্লবের কথা।

হুগলীর শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হয়েছি। সরোজও (সরোজ মুখার্জি) ভর্তি হয়। সে আমার ছাত্রজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তখন আমরা যুগান্তর দলে ছিলাম। ছাত্রজীবনে বিপ্লব ও বিপ্লবী আদর্শ দ্রুত আকর্ষণ করে। আমাকেও করেছিল। ভূপেনদার প্রেরণা তো ছিলই। নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলাম বিপ্লবের কথা। বুঝতে চেষ্টা করলাম। জানতে পারলাম শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করেছে।

তখন কি বই পড়েছিলাম?

• ডঃ দত্তর সঙ্গে আলাপের পর পড়তে থাকি William Rhys-এর Russian Revolution জন রীডের দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিন, স্তালিনের লেনিনিজম, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, মার্কস এঙ্গেলস্-এর কিছু কিছু বই। এ ছাড়াও আরও অনেক বই পড়েছি। সব নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

বই সংগ্রহ

হ্যাঁ বেশ জটিল কাজ ছিল। বই পাওয়ার ব্যাপারে বর্মন পাবলিশিং হাউস খুব সাহায্য করেছিল। ওখানে অনেক বই পেতাম। তবে অন্যভাবেও ব্রিটিশ শাসকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে সংগ্রহ করতাম, পড়তাম আর নব আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতাম।

১৯৩১ সাল। হালিম সাহেব (প্রয়াত আবদুল হালিম), সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখার্জি ও আমি পরিচিত হয়েছি। সরোজ, হালিম সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল।

রোমান্স ছাড়তে পারছিলাম না

ইয়ং ম্যান হিসাবে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। প্রশ্ন ও নানা জিজ্ঞাসা, মনকে দোলা দিচ্ছে। সত্যি কথা বলতে, সন্ত্রাসবাদের রোমান্স ছাড়তে পারছি না, আবার মনে প্রাণে সেই পথই আমার বিপ্লবী জীবনের পথ ভাবতে পারছি না। দ্বন্দ্ব নিরসনে ছুটলাম আমাদের দলের নেতা বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর কাছে। জানতে চাইলাম পার্টির কর্মসূচী কি, ভবিষ্যতের রূপরেখা কি?

না, তিনি সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। যুগান্তর দল থেকে বেরিয়ে গেলাম। কয়েকজন মিলে তৈরী করলাম ইন্ডিয়ান সোশিয়ালিস্ট রেভলিউশনারী পার্টি। ১৯৩২ সাল। পরে তারও পরিবর্তন হল। তৈরী হলো ইন্ডিয়ান প্রলেতারিয়ান রেভল্যুশান পার্টি। বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলার যুবকদের অনেকের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী দলের মতপার্থক্য দেখা দিল। তারা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে যোগাযোগ হল মার্কসবাদীদের সঙ্গে। আগেই বলেছি আমরা নতুন পার্টি গড়ে তুললাম। সরোজ অবশ্য প্রথম থেকেই হালিমদের সঙ্গে ছিল।

জেলে কাটল পাঁচ বছর

১৯৩৩ সাল। আমি, হরেকেষ্ট (প্রখ্যাত কৃষক নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার) প্রমুখ গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। সেবার সাজা হল না। কিন্তু বীরভূম ষড়যন্ত্র মমলায় আবার গ্রেপ্তার হলাম। সাজা হল সাড়ে চার বছর। জেলের মধ্যে মারামারি করার দরুন সাজা বেড়ে হল পাঁচ বছর।

দীর্ঘ দ্বন্দ্ব সংঘাত অতিক্রম করে এবং মার্কসবাদের বইপত্র পড়ে আমি নভেম্বর বিপ্লবের প্রকৃত তাৎপর্য ধরতে পারি।

সমাজের সর্বনিম্নস্তরের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে

নভেম্বর বিপ্লবের সঙ্গে অতীতের অন্যান্য বিপ্লবের মৌল পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট। সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দেখে আমি উজ্জীবিত হয়েছিলাম। শ্রমিকশ্রেণী মেহনতী মানুষ শাসন ক্ষমতা লাভ করেছে। জমিদার ও ধনিকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছে। সোভিয়েত রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করে পরিকল্পনা মাফিক দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে, শোষণহীন সমাজ কায়েম করছে। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটানোই নভেম্বর বিপ্লবের মৌল পার্থক্য অন্যান্য বিপ্লবের থেকে।

সবকিছু বিচার করে বিপ্লব কতদূর ভাবতে হবে

প্রথমের দিকে, অস্বীকার করব না, রোমান্টিক ভাব ছিল। নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় বিপ্লবের প্রসঙ্গে

আশা প্রত্যাশাও জাগে। কিন্তু তত্ত্ব যত আয়ত্ত করেছি, বুঝতে পেরেছি ভারতীয় রাজনীতির জটিলতা অনেক। অসম বিকাশ। জাতপাতের সমস্যা, ধর্মের প্রভাব, বিশাল দেশ, সংগ্রামের নানা দোলাচলতা সব কিছু বিচার করে বিপ্লব কতদূর ভাবতে হবে। নিজেদের আরও প্রস্তুত করতে হবে। আরও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসীবাদের পরাজয় ও লাল ফৌজের বিরাট সাফল্য, দেশে দেশে মুক্তি সংগ্রামের বিপুল অগ্রগতি এবং সর্বোপরি মার্কসবাদ লেনিনবাদ অধ্যয়ন ও রপ্ত করার মধ্য দিয়ে এ স্থির বিশ্বাস অর্জন করেছি যে, নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই ভারতীয় বিপ্লবের প্রত্যাশিত সাফল্য আসতে পারে। দীর্ঘ সংগ্রাম করার অভিজ্ঞতার দর্পণে বলতে পারি যুব সমাজের হতাশার কোন কারণ নেই। পথ অভ্রান্ত, তাকে আয়ত্ত করতে হবে। নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে, এবং প্রয়োগ করতে হবে।

আকর্ষণ ক্ষমতা কমেছে?

এ কথা ঠিক, বিভ্রান্তি বেড়েছে। আমরা যাদের দেখে উজ্জীবিত হয়েছিলাম সেই লেনিনের দেশে সংশোধনবাদী বিভ্রান্তি আছে। চীনের বিচ্যুতি এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নানারকম মতপার্থক্য ও অনৈক্য বর্তমান কালের যুব সমাজের মধ্যে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি করছে। হয়ত আগের মত চট করে আকর্ষণও করতে পারছে না। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা তাদের কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল কথা তুলে ধরতে পারলে, সঠিকভাবে ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে পারলে যুব সমাজ আকৃষ্ট হবেই। তাই যুব সমাজের কাছে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ সঠিকভাবে তুলে ধরা দরকার। যুব সংগঠনগুলি এ ব্যাপারে খুবই তৎপর। তাই এখনও অসংখ্য যুবক নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে নতুন ভারত গড়ার সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়ে আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করার কাজ আমাদের আরও যত্ন সহকারে করতে হবে।

নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শের বিজয় সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ আজও বিপুল প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। নভেম্বর বিপ্লব যে ঔপনিবেশিক বিপ্লবের যুগের সূচনা করেছিল, সেই যুগের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অব্যাহত ধারাই বয়ে চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এক বিপ্লব তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশেই ঘোষিত হয়েছে স্বাধীনতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অভ্যুদয় আর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শের বিজয় সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দাবানলকে নিভিয়ে দিতে পারবে না

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে দুঃখজনক বিরোধ এবং মতপার্থক্য এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতার প্রশ্নে সম্প্রতি কিছু কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যাশিত সাহায্য ও সমর্থন সব সময় মেলেনি, বড় বড় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভূমিকায়ও কোথাও কোথাও দোদুল্যমানতা রয়েছে। সবই সত্যি। কিন্তু ইতিহাসের গতি কে রুখবে। আদর্শের ভাস্বরতা বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে ম্লান হওয়ার নয়। বিরোধ ও এমন কি সংঘর্ষ থাকা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উপস্থিতি ও সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিকাশধারা এ কথাই প্রমাণ করছে যে সাম্রাজ্যবাদীদের আজ আর এমন ক্ষমতা নেই যা দিয়ে তারা জাতীয় মুক্তি অভিযানের দাবানলকে নিভিয়ে দিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ দ্রুত পিছু হটছে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামও ক্রমশঃ দেশে দেশে বিপুল শক্তি অর্জন করছে।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের যুবকদের কাছে আমার বক্তব্য জানতে চান? আমি তাদের একথাই বলতে চাই যে, নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ চির অম্লান। এই বিপ্লবের তত্ত্ব আয়ত্ত করুন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল সিদ্ধান্তগুলি আত্মস্থ করুন।

জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস বুঝে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগ শিখতে হবে

আজ আমাদের দেশের সামনে এক জটিল অবস্থা। জাতপাতের সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিভিন্ন প্রান্তে জনজীবনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মেহনতী জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ভারতের জনগণের প্রকৃত মুক্তি অর্জন করতে হলে, বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে ভারতীয় জনগণের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝতে হবে, আমাদের অতীত ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র বুঝতে হবে, তার অধিক মার্কসবাদী মূল্যায়ন করতে শিখতে হবে এবং সংগ্রাম বিকশিত করার কায়দা কৌশল রপ্ত করে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। যুব সমাজ অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী, তাদের স্বপ্ন বিরাট। সেই স্বপ্ন সফল করার শপথ নিতে হবে। নভেম্বর বিপ্লবের চির অম্লান আদর্শ ঊর্ধ্বে তোলার মধ্য দিয়েই হতাশা অতিক্রম করার এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাতলে অবিচল থাকার দায়িত্ব নিতে হবে।

ত্রিদিব চৌধুরী

প্রবীন জননেতা ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বেশী সময় লাগেনি। একদিন সকালে সোজা চলে গেলাম তাঁদের পার্টি কমিউনে। ১৯৫২ সাল থেকে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের নিরবচ্ছিন্ন বিজয়ী ত্রিদিববাবু কলকাতায় সাধারণত এখানেই থাকেন। বহরমপুরে ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে হাতে খড়ি। কংগ্রেসের ভেতরে ছিলেন অন্যান্য বিপ্লবীদের মতই। ছাত্রজীবন থেকেই কংগ্রেসের আপোষমুখী অহিংস নীতির প্রতি বিশ্বাস ছিল না, ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। আর. এস. পি. গঠিত হওয়ার পর থেকে নিজ মত ও পথে নিষ্ঠাবান থেকে শ্রমজীবী মানুষের জন্য লড়াই সংগ্রাম করছেন। এখন তিনি আর. এস. পি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক। সত্তর অতিক্রান্ত ত্রিদিববাবু আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলে গেলেনঃ

আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রথম ১৯১৯-২০ সালে নভেম্বর বিপ্লবের কথা শুনি। আমার আত্মীয় তখনকার দিনে দেশে বুর্জোয়া খবরের কাগজে নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে যে সমস্ত বিকৃত এবং বিরূপ সংবাদ প্রকাশিত হত প্রধানত তারই উপর নির্ভর করে আমার কাছে গল্প করত। তখন খুব একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া আমার মনে দেখা দেয়নি।

নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে আমি কিছুটা ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই আর একটু বেশী বয়সে। কলেজে প্রথম

বার্ষিক ক্লাসে পড়ার সময় জন রীডের দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিন (ইং) এবং জর্মান বুর্জোয়া লেখক Rene Fullop Mueller-এর Lenin and Gandhi এবং Mind and Face of Bolsevikism -এর মাধ্যমে ১৯২৮-২৯ সালে নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে পারি।

2Mueller বলসেভিক বিপ্লব সম্পর্কে খুব সহানুভূতিসম্পন্ন না হলেও ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর বইগুলি অনেকখানি তথ্যানুগ ছিল এবং নভেম্বর বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাকে আকৃষ্ট করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কর্মী

আমি সে সময় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন সংস্থা "অনুশীলন সমিতি"র সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস গণ আন্দোলন আমাদের সেভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। অন্যদিকে পুরনো বিপ্লবী আন্দোলনের পিছনে ব্যাপক গণ সমর্থনের অভাবের দরুন তারও সাফল্য সম্পর্কে আমাদের মনে তখন সংশয় দেখা দিতে আরম্ভ করে।

নভেম্বর বিপ্লব শ্রেণী বিপ্লব

এই বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনবাদ উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীর রাজত্ব কায়েম করার জন্য। পৃথিবীর বুকে সংঘটিত অন্যান্য বিপ্লবের সঙ্গে এই মৌলিক তফাৎটাই আমার চোখে ধরা পড়েছিল।

এম. এন. রায়ের প্রভাব

জারতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য আমাদেরকে স্বভাবতই শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী সংগ্রাম এবং নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করে এবং সেই আদর্শের পিছনে যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা আছে তার দ্বারাও আমরা প্রভাবিত হই। এম. এন. রায়ের ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ আমাদের এ সময়ে এদিকে কিছুটা প্রভাবিত করে। বিশেষ করে তাঁর ও অবনী মুখার্জির লিখিত India in transition আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

তখন মার্কসবাদী সাহিত্য এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পাঠান সংবাদ পত্রিকা 'IMPRECOR' প্রভৃতি গোপন পথে এদেশে আসত। খুব নিয়মিত ছিল না। মাঝে মাঝেই কোথায় যেন আটকে যেত। আমরা এসব বইপুঁথি এবং পত্রপত্রিকা থেকেই নভেম্বর বিপ্লব ও সমাজবাদী রুশ সম্পর্কে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত হই।

ভাবাদর্শগত সংগ্রাম তখনই শুরু হয়

কিছু ভাবাদর্শগত সংগ্রাম তখনই শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত দোটানায় ছিলাম। পুরনো সংগঠন এবং জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের আকর্ষণ আমাদের মনে বেশ প্রবল ছিল। আবার নভেম্বর বিপ্লব ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী আদর্শও আমাদের মনকে খুবই আলোড়িত করেছিল। যার ফলে আমরা পুরনো বিপ্লবী আন্দোলন নতুনভাবে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলাম।

রূপান্তরের দিকে পুরনো বিপ্লবী আন্দোলন

এ সময়ে ভারতবর্ষে স্বতন্ত্রভাবে Workers and Peasant's Party -র মাধ্যমে কমিউনিষ্ট সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। এই সময়ে বলা চলে পুরোনো বিপ্লবী আন্দোলন একটা রূপান্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

দু'টি রাজনৈতিক প্রবণতা

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন, চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টা, প্রভৃতির প্রভাবে ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত পুরোনো ধরনের সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আবার ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা জেলে এবং বন্দীশালায় সমবেত হয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এ সময়েই মোটামুটিভাবে মার্কসবাদী বিপ্লবীদের ভেতরে দুটি রাজনৈতিক প্রবণতা ক্রমশঃ সংগঠিত রূপ নেয়। যথাঃ (১) বিপ্লবীদের একাংশ সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হল। (২) অপর অংশ সোভিয়েটের স্তালিনবাদী নীতির বিপক্ষে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংগঠনের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হতে চেষ্টা করল।

তবে এই দুই ধারাই যে আদর্শগতভাবে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ ও চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অতীতের মত বিপ্লবীদের মনকে আলোড়িত করে না

নভেম্বর বিপ্লব ৬৩ বছর আগে ঘটেছে। আজকের প্রজন্মের কাছে নভেম্বর বিপ্লবের কথা একটা ঐতিহাসিক ঘটনার বেশী কিছু নয়। নভেম্বর বিপ্লবের পরে প্রথম দুই দশকে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ এবং চিন্তাধারা যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপ্লবীদের মনকে আলোড়িত করত এখন আর সেটা করে না।

অনেক দূরে সরে এসেছে

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে চীন, পূর্ব ইয়োরোপ, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে স্তালিনের সময় থেকে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব নানান কারণে আমলাতন্ত্র ভিত্তিক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠেছে। যার ফলে আমার ধারণা বর্তমান সোভিয়েত কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব নভেম্বর বিপ্লবের লেনিনবাদী চিন্তা ও আদর্শ থেকে অনেক দূর সরে এসেছে।

......তবুও ঐতিহাসিক প্রভাব অনস্বীকার্য

তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের মতাদর্শগত সংগ্রাম চীনে প্রলেতারিয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ব্যর্থতা, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের ভেতরে মাওবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে কিছুটা পদক্ষেপ—এসব কারণের জন্য নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব কিছুটা দুর্বল হয়ে এসেছে। সেইজন্য নভেম্বর বিপ্লব অতীতের মত এখনকার যুব সমাজের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমসাময়িক যুগের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনে নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের

[শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়]

দুই ভিন্ন মতাদর্শ বিকাশের দুই ভিন্ন রাস্তা—

দীনেশ রায়

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে (রুশ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অক্টোবর) দুনিয়ার অন্যতম এক বৃহৎ কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে অনগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী দেশে এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে সমগ্র বিশ্ব কেঁপে উঠল। মার্কিন সাংবাদিক জন রীড সে সময় রাশিয়ায় উক্ত ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে রীড ঐ সময়কার ঘটনাবলী "যে দশ দিন বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল" শিরোনামায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। জন রীডের এই বিখ্যাত পুস্তকখানি বহু ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তা পড়েন। এই পুস্তকের ভূমিকা লিখেছিলেন লেনিন স্বয়ং।

ঘটনাটি কী? ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে লেনিনের পরিচালনায় রুশদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)র নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্র এবং পুঁজিপতিদের অন্তবর্তী সরকার (কেরেনেস্কী সরকার)কে উচ্ছেদ করে এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙ্গে দিয়ে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সূচনা করে। নভেম্বর বিপ্লব বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিলোপ ঘটিয়ে রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। দেশের সর্বহারা শ্রেণী শাসকশ্রেণীর মর্যাদা পায় এবং এইভাবে সংকট-মুক্ত, শোষণ-মুক্ত এবং বেকারী-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের গোড়াপত্তন হয়।

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিতন্ত্রের বিশ্বফ্রন্ট, যাকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকগণ দুর্ভেদ্য বলে মনে করতেন, তাতে বিরাট ফাটল ধরে। বিশ্বভূখণ্ডের ছয় ভাগের এক ভাগ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে। এইভাবে নতুন এক যুগের সূচনা হয়। দুনিয়া দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায়—পুঁজিবাদী শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শিবির। দুই শিবিরের দুই ভিন্ন মতাদর্শ এবং বিকাশের দুই ভিন্ন রাস্তা। দুই শিবিরের কথা লেনিন এবং পরবর্তীকালে স্তালিন তাঁদের একাধিক রচনায় উল্লেখ করেছেন।

লেনিন তাঁর ঐতিহাসিক রচনা "সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর"-এ বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদকে যদি এক কথায় ব্যাখ্যা করতে হয় তা হলে বলতে হবে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তর। লেনিন বলেছেনঃ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরই শুধু নয়, পুঁজিবাদের শেষ স্তরই শুধু নয় সাম্রাজ্যবাদ হল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ এবং সর্বহারা বিপ্লবের পূর্বক্ষণ।

রাশিয়ায় ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব লেনিনের উপরোক্ত তত্ত্বের সঠিকতা কাজের মধ্যে দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব আজিকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সঠিক। নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের ঐতিহাসিক বিজয়ের প্রভাবে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুরু হয় তার আঘাতে পুরোনো ধাঁচের সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কার্যত ভেঙ্গে পড়েছে। বিশ্বভূখণ্ডের তিনভাগের এক ভাগ এখন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তি বাড়ছে এবং সাম্রাজ্যবাদের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থা দুর্বল হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও প্রতি-আক্রমণের সে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সাহায্যদানের আবরণে সাম্রাজ্যবাদীরা এই সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় অনুপ্রবেশের জন্যে মরীয়া প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একেই বলা হয় "নয়া-উপনিবেশবাদী" অভিযান। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশ এইভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী অভিযানের শিকার হয়েছে। ভারতবর্ষ নয়া-উপনিবেশবাদী দেশ নয়; তবে আমাদের দেশ বিপদমুক্ত, একথা বলা চলে না।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতি

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি রাশিয়ায় তাদের পরস্পরকে স্বেচ্ছায় মেনে নেয় নি। শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল; অর্থনৈতিক অবরোধ থেকে আরম্ভ করে হস্তক্ষেপের যুদ্ধ পর্যন্ত সব কিছুরই আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯১৮ সালে বিশ্বের ১২টি সাম্রাজ্যবাদী দেশ ক্ষমতাচ্যুত রুশদেশের ভেতরের প্রতি-বিপ্লবীদের সহায়তায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে সাড়া দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ শিশু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন ও সাম্রাজ্যবাদীরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে হস্তক্ষেপের যুদ্ধ প্রত্যাহার করে নেয়। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

হস্তক্ষেপের যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার কমিউনিজমে পৌঁছানোর ধাপ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের কর্মসূচি রচনা করে। কিন্তু লেনিন সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের কর্মকাণ্ড দেখে যাওয়ার সুযোগ পান নি। ১৯২৪ সালে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের এই মহান রণনীতিবিদ্ এর জীবনাবসান ঘটে। "কমিউনিজমের অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৈদ্যুতিকরণ" এটা লেনিনেরই কথা। লেনিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব পড়ে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও শিষ্য স্তালিনের ওপর। নানান প্রতিকূল অবস্থা ও বাধা অতিক্রম করে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কাজটি সহজ সরল ছিল না। যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং অন্যান্য কারণে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের মান প্রাক্-১৯১৩ সালের স্তরে নেমে গিয়েছিল।

তাছাড়া স্তালিন ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে সংশোধনবাদ, সুবিধাবাদ, দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ, বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক ও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের বিরুদ্ধে লাগাতার মতাদর্শগত লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। যে

সমস্ত প্রশ্নে মতপার্থক্য ছিল সেগুলির মধ্যে আছেঃ একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব কী না, কৃষকসমাজ সম্পর্কে নীতি, ট্রট্স্কীর বিরতিহীন বিপ্লবের তত্ত্ব ইত্যাদি।

স্তালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির লেনিনবাদী নীতি ও কার্যক্রমই বিজয়ী হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতী মানুষ সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের রাস্তায় এগিয়ে যান।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ মোটামুটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা চালু করা হল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা অনুযায়ী স্থির হল ১৯২৮-৩৩ সালের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে মূলধনী লগ্নী হিসাবে খাটানো হবে ৬,৪৬০ কোটি রুবল; এর মধ্যে শিল্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি বিকাশের জন্য খাটানো হবে ১,৯৫০ কোটি রুবল, যানবাহন ব্যবস্থার জন্য খাটানো হবে ১,০০০ কোটি রুবল এবং কৃষিকার্যে খাটানো হবে ২,৩২০ কোটি রুবল।

প্রথম যোজনার লক্ষ্য ছিল—অনগ্রসর কৃষিপ্রধান সোভিয়েত ইউনিয়নকে অগ্রসর শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা, কৃষির যৌথ-করণ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা, বেকারী বিলোপ করা এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা।

১৯৩৩ সাল আরম্ভ হওয়ার সময় স্পষ্ট দেখা গেল, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী যোজনা তখনই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই, চার বছর তিন মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের যুক্ত অধিবেশনে রিপোর্ট প্রসংগে স্তালিন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার ফলাফল পর্যালোচনা করেন। রিপোর্ট-এ পরিষ্কার দেখা গেল প্রথম যোজনা সম্পাদনের কল্যাণে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান সাফল্য অর্জন করেছেঃ

(ক) সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। কারণ দেশের মোট উৎপাদনে শিল্পোৎপাদনের অনুপাত বেড়ে শতকরা ৭০ ভাগ দাঁড়িয়েছে।

(খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিল্প ব্যাপারে পুঁজিবাদী শক্তির উচ্ছেদসাধন করেছে এবং শিল্পক্ষেত্রে একমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(গ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষিক্ষেত্র থেকে শ্রেণী হিসাবে ধনী কৃষকদের উৎখাত করেছে এবং কৃষিতে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(ঘ) যৌথ কৃষিব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য ও অনটনের অবসান ঘটিয়েছে এবং কোটি কোটি গরিব কৃষক স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহের স্তরে উঠেছে।

(ঙ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শিল্পে বেকার সমস্যা বিলুপ্ত করেছে এবং আট ঘণ্টা রোজ বজায় রেখেও অনেকগুলি শাখাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দিনে সাত ঘণ্টা রোজ ও অস্বাস্থ্যকর উপ-জীবীকার ক্ষেত্রে দিনে ছয় ঘণ্টা রোজের প্রথা প্রবর্তন করেছে।

(চ) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বশাখায় সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ফলে মানুষের হাতে মানুষের শোষণ দূরীভূত হয়েছে।

এই ধরনের অগ্রগতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার কর্মসূচী ছিল প্রথম যোজনার চাইতেও বিশালতর। ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার কাল শেষ হওয়ার আগেই প্রাক্-যুদ্ধ কালের তুলনায় শিল্পোৎপাদন প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়। মূলধন সংবর্ধনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালে সকল শাখায় মোট ১৩,৩০০ কোটি রুবল লগ্নীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেকটি শাখাকে সম্পূর্ণরূপে শিল্পসজ্জায় সজ্জিত করা সুনিশ্চিত হয়। দ্বিতীয় যোজনায় প্রধানত কৃষিকার্যের যান্ত্রিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হয়। যানবাহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের পদ্ধতিকে যান্ত্রিকীকরণের মধ্যে পুনর্গঠনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা রচনা করা হয়। সেই সাথে শ্রমিক-কৃষকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেরও ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করার জন্য সোভিয়েতের জনসাধারণকে প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু দেশ, জাতি ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার বৃহত্তর স্বার্থে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ও হাসি-মুখে এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি শক্তিশালী শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে গড়ে না উঠত তা হলে ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে সে বিশ্বের জনসাধারণকে ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হোত না। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনসাধারণের ঐতিহাসিক বিজয় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও দুর্ভেদ্যতা আর একবার সুপ্রমাণিত করে। শোষণ-মুক্ত, সংকট-মুক্ত, দারিদ্র্য-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতিও হয়েছে। অনেকগুলি ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতির কথা স্তালিনের রিপোর্ট, ভাষণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন প্রস্তাবে পাওয়া যাবে। এই ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলি না হলে অগ্রগতির গতিবেগ আরও দ্রুত হত। তবে নতুন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এখানে বড় কথা হল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এগিয়ে গেছে এবং এখন বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন এক মহতী শক্তি যাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করার ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্ত-র্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত অনৈক্য দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এই অনৈক্যকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সচেষ্ট আছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে এই অনৈক্য মিটিয়ে ফেলার জন্য কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সৌভাগ্যক্রমে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর বিশ্বভূখণ্ডের ছয় ভাগের একভাগ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সাধারণ সংকটের আবর্তে পড়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশ্ব-ভূখণ্ডের তিনভাগের একভাগ নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে ওঠার পটভূমিতে বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট আরও গভীর হয়।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে ক্রম-বর্ধিত হারে উদ্বৃত্ত মূল্য অর্পণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়গুলিতে বেসরকারী মালিকানার দরুন নৈরাজ্য ও অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যবস্থায় সত্যিকারের কোন পরিকল্পনা সম্ভব নয়। যেহেতু কোন পরিকল্পনা নেই ও থাকতে পারেও না, এবং যেহেতু সমগ্র ব্যবস্থাই বাজারের ওঠা-নামার ওপর নির্ভর-শীল, সেহেতু জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠিত করা যায় না। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের তাগিদে পুঁজিপতিরা ক্রমবর্ধিত হারে অটোমেশান, যান্ত্রিকীকরণ ও শ্রমিকসংখ্যা হ্রাসের এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যান্য যন্ত্র চালু করে। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে

যেমন অসংখ্য শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে বেকারবাহিনীর কলেবর স্ফীত করে, অপরদিকে তেমনি জনগণের ক্রয় ক্ষমতার তুলনায় বেশি উৎপাদন হয়, এবং ফলে "অতি-উৎপাদনের" সংকট দেখা দেয়। অতি-উৎপাদনের সংকটের মোকাবিলার জন্য আবার উৎপাদন হ্রাস করতে হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর কালে ১০ বছর অন্তর অন্তর এই ধরনের সংকট দেখা দিত।

শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আত্মপ্রকাশের পটভূমিতে পুঁজিবাদ স্থায়ী সাধারণ সংকটের মধ্যে পড়েছে। স্থায়ী ও সাধারণ সংকটের অর্থ এ নয় যে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সংকট একই হারে বেড়ে চলবে। সাধারণ সংকটের অর্থ হলঃ মাঝে মাঝেই মন্দা দেখা দেবে, উৎপাদনের হার হ্রাস পাবে, বেকারী বাড়বে, মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়বে। পুঁজিপতিরা এই সংকট কিছুটা কাটিয়ে উঠবে এবং আংশিক স্থিতিশীলতা আসবে। কিন্তু সংকট থেকেই যাবে। পুঁজিবাদ এই সংকট থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম নয়।

পুঁজিবাদী লগ্নীর চরিত্র এমনই যে, এই লগ্নী যত বাড়বে, ততই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে একদিকে যেমন আরও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হবে অপরদিকে তেমনি অগণিত শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রকৃত আয় হ্রাস পাবে, তাদের দারিদ্র্য ও দুস্থতা বাড়বে। এটা পুঁজিবাদী লগ্নীর অমোঘ নিয়ম যা আজিকার পরিস্থিতিতেও প্রযোজ্য।

বিশ্ব পুঁজিবাদের সর্ববৃহৎ ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা কি? ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২·৩ ভাগ মাত্র। এটা বিশ্বব্যাংক প্রচারিত হিসাব। আমেরিকার জনসমষ্টির শতকরা ১·৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক জাতীয় আয়ের শতকরা ৩২ ভাগ এবং কোম্পানি শেয়ারের শতকরা ৮২ ভাগ ভোগ করে। এই দেশের ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যের প্রান্তসীমার নিচে বাস করেন, এবং এঁদের মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষকে "চরম দুস্থ" বলা যায়। ১ কোটি ৯৫ লক্ষ শ্রমিকের জন্য কোন সামাজিক বীমা-ব্যবস্থা নেই, এবং ১ কোটি ৭৬ লক্ষ শ্রমিককে কোন বেকারী সাহায্য দেওয়া হয় নি। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক বেকার।

বৃটেনে মুদ্রাস্ফীতি এখন তুঙ্গে। এই মুদ্রাস্ফীতি শ্রমিকদের প্রকৃত আয় হ্রাস করে দিচ্ছে। ১৯৭৯ সালে বৃটেনে বেকারের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৮০ হাজার। বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্‌রা বলছেন, ১৯৮২ সালের প্রথমার্ধে বেকারবাহিনীর কলেবর স্ফীত হয়ে ২৯ লক্ষ ৯০ হাজারে দাঁড়াবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের কাজ রীতিমত অগ্রসর লাভ করছিল এবং শিল্পব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ ঘটছিল, তখন, ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এক অভূতপূর্ব আকারের মারাত্মক বিশ্বব্যাপী সংকট ফেটে পড়ে এবং পরবর্তী তিন বছরে সেই সংকট তীব্রতর হয়ে ওঠে। শিল্পসংকটের সঙ্গে কৃষিসংকটও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। তিন বছর ধরে (১৯৩০-৩৩) অর্থনৈতিক সংকট চলার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদন ১৯২৯ সালের শতকরা ৬৫ ভাগ, বৃটেনে শতকরা ৮৬ ভাগ, জার্মানীতে শতকরা ৬৬ ভাগ ও ফ্রান্সে শতকরা ৭৭ ভাগে নেমে যায়। কিন্তু আলোচ্য সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়, ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৩ সালে শতকরা ২০১ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

"পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে অনেক বেশি উন্নত এর থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয়ে গেল, সমাজতন্ত্রের দেশটিই হল সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র অর্থনৈতিক সংকট-মুক্ত দেশ" [সি-পি-এস-ইউ (বি)-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস]।

১৯২৯ সালে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম সংকট এবং পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতির পটভূমিতেই বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্ কীনস্ তাঁর দাওয়াই হাজির করেন। কীনস্-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোন গলদ নেই। তবে এই ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য নতুন দাওয়াই প্রয়োজন। নতুন দাওয়াই হলঃ রাষ্ট্রীয় লগ্নী বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো। অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির বিকাশে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রাণকর্তা হিসাবে ফ্যাসিবাদী জার্মানী ও ইতালিসহ সবগুলি উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই কীনস্‌কে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু কীনস্-এর দাওয়াই পুঁজিবাদের রোগ সারাতে পারে নি এবং পারবেও না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎখাত ছাড়া অর্থনৈতিক সংকট থেকে সমাজের পরিত্রাণ নেই।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংকট বলতে যা বোঝায় তার কোন স্থান নেই। উৎপাদনের উপায়গুলিতে বেসরকারী মালিকানা, সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নৈরাশ্য ও অরাজকতা, পরিকল্পনার অভাব, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লালসা প্রভৃতি থেকেই অর্থনৈতিক সংকট আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানাই সংকট সৃষ্টির বিরুদ্ধে বড় গ্যারান্টী। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সুসংবদ্ধ ও সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক যোজনায় শুধুমাত্র লক্ষ্যই নির্দিষ্ট করা হয় না, এই লক্ষ্য যাতে বাস্তবায়িত হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। এখানেই সমাজতান্ত্রিক যোজনার সঙ্গে তথাকথিত পুঁজিবাদী যোজনার (যেমন ভারতে) মৌল পার্থক্য। সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণ এ বিষয়ে সচেতন যে, তাঁরা যে দ্রব্য উৎপন্ন করছেন তা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কাজে লাগানো হবে, পুঁজিপতিদের মুনাফার অঙ্ক স্ফীত করার জন্য নয়। সেকারণেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনসাধারণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রেরণা পান।

এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, গণসাধারণতন্ত্রী চীনে ১৯৪৯ সাল থেকেই মূল্যস্থিতি বজায় আছে। চীন সরকার সম্প্রতি কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের দর বাড়িয়ে দিয়েছেন, উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রেরণাদানের জন্য। উৎপন্ন ফসলও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্র ক্রয় করছে। গণসাধারণতন্ত্রী চীনে ১৯৪৯ সালে কৃষকদের ওপর করের বোঝা ছিল শতকরা ৩২ ভাগ, এখন সেই বোঝা শতকরা ৪ ভাগ মাত্র। চীনের রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান উৎস হল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত। ভারতে রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান উৎস হল পরোক্ষ কর। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলি লোকসানে চলে।

আগেই বলা হয়েছে, বিশ্বভূখণ্ডের তিনভাগের একভাগ নিয়ে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠিত। এখন বিশ্বের মোট শিল্পোৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ শতকরা ৪০ ভাগ। এই অংশ যে অনুপাতে বাড়বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন সেই অনুপাতে হ্রাস পাবে।

পুঁজিবাদী বিশ্ব যখন কঠিনতম অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকটে ডুবে আছে, তখন তাদের পক্ষে সামান্যতম পরি-

বৃদ্ধির হারও রক্ষা করে চলা সম্ভব হচ্ছে না, যখন বেকারীর মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, যখন সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী মুদ্রাস্ফীতির কবলে ধুঁকছে, তখন পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির হার দ্রুত বেড়ে চলেছে ও মূল্যস্থিতি রক্ষিত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোন বেকারী নেই, দারিদ্র্য নেই, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতে এখন সরকারী হিসাব অনুযায়ীই ২ কোটির ওপর বেকার রয়েছেন, দারিদ্র্যের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৩৩ কোটি অতিক্রম করে গেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অগ্রগতি

১৯১৩ সালে জারতন্ত্রের শাসনকালে যেখানে বিশ্বের মোট শিল্পোৎপাদনের মাত্র ৪ শতাংশ উৎপন্ন হোত সেখানে ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন একাই ২০ শতাংশ উৎপন্ন করেছে। ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে ৩৪ শতাংশ বেশি তেল এবং ২৬ শতাংশ বেশি কয়লা উৎপাদন করেছে।

১৯৮০ সালের প্রথম ৬ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩৬·২০ কোটি টন কয়লা, ৫·৪৭ কোটি টন অপরিশোধিত লোহ, ৭·৫৯ কোটি টন ইস্পাত এবং ৯২ লক্ষ টন ইস্পাত টিউব উৎপন্ন করেছে। শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের গড় মজুরী ৩·৬ শতাংশ বেড়েছে। সামাজিক ভোগের তহবিল থেকে সুযোগ-সুবিধাদানের পরিমাণ ৫,৬০০ কোটি রুবল অতিক্রম করেছে।

গণসাধারণতন্ত্রী চীন

১৯৭৭-৭৯ সালের মধ্যে ১ কোটি ৯৩ লক্ষেরও বেশি যুবক এবং অন্যান্যদের রাষ্ট্রের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে।

গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সরকার ১৯৭৮ সালের অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই পরিসংখ্যানগুলি প্রচার করেছেঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন—৩০,৪৭,৫০,০০০ টন (১৯৭৭ সালের তুলনায় ৭·৮ শতাংশ বেশি); শিল্পোৎপাদনের মোট মূল্য ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে যথাক্রমে ১৪·৩ শতাংশ এবং ১৩·৫ শতাংশ বেড়েছে; ১৯৭৭ সালে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২,০৪,৬০,০০০ টন; ১৯৭৮ সালে এটা বেড়ে হয়েছে ৩,১৭,৮০,০০০ টন, অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৫৫·৩ শতাংশ; কয়লা উৎপাদন—৬১·৮০ কোটি টন (১৯৭৭ সালের তুলনায় ২৮ শতাংশ বেশি); অপরিশোধিত তেল—৮·৭০ কোটি টন (১৯৭৭ সালের তুলনায় ১৯·৫ শতাংশ বেশি); খুচরো বিক্রয় ১৬ শতাংশ বেড়েছে (জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি চিহ্ন); যৌথ সংস্থাগুলি থেকে কৃষকদের আয় ১৭·৭ শতাংশ বেড়েছে; দেশের শতকরা ৬০ জন শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে; জাতীয় রাজস্ব সংগ্রহ ৪৪·৪ শতাংশ বেড়েছে (কর না চাপিয়ে)।

চীনে ১৯৪৯ এবং ১৯৭৯ সালের মধ্যে শিল্পোৎপাদন বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে বেড়েছে। ভারতে এই বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ মাত্র।

চীন ও ভারত

এখানে কোন তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা অর্থহীন। কারণ চীনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর ভারত ১৯৪৭ সাল থেকে বিকাশের পুঁজিবাদী রাস্তা গ্রহণ করেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সবাই পরিচিত। বেকারী বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, দারিদ্র্যের প্রান্তসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, দেশের আয় ও সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার নগণ্য। পুঁজিবাদী রাস্তার এই পরিণতি হতে বাধ্য।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী পালনকালে আমাদের দুই ভিন্ন মতাদর্শ ও দুই ভিন্ন রাস্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ করতে হবে এবং তার থেকে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

[নবীনের জিজ্ঞাসা : প্রবীণের উত্তর/৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আজও নভেম্বর বিপ্লবের সেই মূল আদর্শ এবং নীতির সঙ্গে বিশেষ করে লেনিনের বিপ্লবী চিন্তাধারা এবং নীতির সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী রকম আছে।

আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের যুব সমাজকে সেই মহান আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার আহ্বান জানাই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা তুলে ধরতে পারলেই যুব সমাজ আমাদের দেশেও যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

হতাশার স্থান নেই

আপনারা—নভেম্বর বিপ্লবের আশা প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে জিজ্ঞাসা করেছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে হতাশাকে কখনও প্রশ্রয় দিই নি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তুলেছে। আজকের যুব সমাজকেও সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে।

*প্রবীণ জননেতা আবদুর রাজ্জাক খানের সাক্ষাৎকার অংশটি পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে।

জনশিক্ষার প্রসার ঃ সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে

সুকুমার দাস

যে কোন দেশে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা ভিন্ন মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না, তার মধ্যে যে ক্ষমতা অন্তর্নিহিত রয়েছে তার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার সামগ্রিক প্রসার ভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছুতেই কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। জনসাধারণের সকল অংশ যদি শিক্ষিত না হয়, রাষ্ট্র ও সমাজের নতুন ধ্যানধারণার সঙ্গে যদি তারা পরিচিত না হয়, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি যদি তারা গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে দেশের কোনরূপ উন্নয়ন কর্মসূচীই সফল হতে পারে না। তাই কেবল বিদ্যায়তনের সাধারণ শিক্ষা নয়, সামগ্রিকভাবে জনশিক্ষার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যায়তনে শিক্ষার সুযোগ থেকে নানাভাবে বঞ্চিত বিস্তীর্ণ জনসমাজের মধ্যে শিক্ষার বাণী পৌঁছে দিতে হবে। এবং, যারা বিদ্যায়তনে পাঠের সুযোগ পেয়েছে তাদেরও পরবর্তী জীবনে নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ রাখতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে আজও কি সাধারণ শিক্ষা, আর কি জনশিক্ষা, কোন দিকেও উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। তাই, স্বাধীনতার তেত্রিশ বৎসর পরেও দেশের শতকরা ৬৬ জন মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে।

যেসব মানুষ এখন দেশে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, তারাও যে শিক্ষা পাচ্ছে তা-ও সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, চরিত্র গঠনের দিক থেকে অসম্পূর্ণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্করহিত। তাই দেখা যায়, এই শিক্ষা গ্রহণের পরে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই সমাজের কোন কাজে নিজেদের নিয়োগ করতে পারে না। ইংরেজ শাসনের সুরুতে কেরানী তৈরীর জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল আজও মোটামুটি তাই চলছে। যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে তা ওপর ওপর। মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় নি। বর্তমান যুগের উপযোগী ভারতের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় নি। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে, তা বয়স্ক শিক্ষাই হোক, আর গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই হোক, যা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় এত সামান্য যে উল্লেখের মধ্যেই পড়ে না।

এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। নতুন ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনসমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় তা ভাবতে হবে। এবং, এই ব্যাপারে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে। তবে মনে রাখা দরকার, সমাজতান্ত্রিক দেশে যা সম্ভব হয়েছে, ভারতের মত পুঁজিবাদী দেশে তা সম্ভব নয়। এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুঁজিবাদীরা নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করার চেষ্টা করবে। এতদিন পরেও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যে মূলত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত একটি 'elitist system' রয়ে গেছে, গ্রামের দরিদ্র কৃষক, কারখানার শ্রমিক, শহরের বস্তীবাসীদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার বাইরে থেকে গেছে, তার কারণ এই। বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে যেখানে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে সেখানেও নয়। কারণ, এই সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করা যাবে না, বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠী সংবিধান-প্রদত্ত বিশেষ অধিকারের বলে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রাখবে, এবং সর্বোপরি শিক্ষাকে সংবিধান সংশোধনের দ্বারা রাজ্য তালিকার পরিবর্তে কেন্দ্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়েছে। তথাপি, এর মধ্যেও যতটুকু করা সম্ভব, তা করতে হবে। এবং, ভবিষ্যতের শিক্ষানীতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এদিক থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক।

অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ক'টি কাজের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল নিরক্ষরতা দূরীকরণ। প্রাক-বিপ্লব জারশাসিত রাশিয়ায় দেশের শতকরা মাত্র ২৫ জন লোক শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এই হার আরও কম—শতকরা মাত্র ২০। শতকরা ৮০ জন লোককে অশিক্ষিত রেখে নতুন সমাজ গড়া যায় না। তাই লেনিন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। ১৭ই অক্টোবর, ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক শিক্ষাবিভাগগুলির দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে লেনিন বলেন, "আমাদের দেশে নিরক্ষরতার মত একটা জিনিস যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ রাজনৈতিক শিক্ষার কথা বলাটা বাড়াবাড়ি। এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা নয়, এটা এমন একটা অবস্থা যা ছাড়া রাজনীতি নিয়ে কথা বলা নিরর্থক। নিরক্ষর ব্যক্তি পড়ে রাজনীতির বাইরে। আগে তাকে অ-আ-ক-খ শিখতে হবে। সেটা ছাড়া কোন রাজনীতি হতে পারে না। সেটা ছাড়া হয় গুজব, জল্পনাকল্পনা, রূপকথা আর বদ্ধধারণা, কিন্তু রাজনীতি নয়।" এই কারণে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় যেমন প্রচুর বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিপ্লবের সময় গ্রামের জমিদারদের কাছ থেকে যে সব বই ছিনিয়ে নেয়া হয় তা সকলের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারে রাখা হয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় প্রথম দিকে কাগজের অভাব, ছাপাখানার অভাব, বই-এর অভাব, তথাপি সমবেত চেষ্টায় এই সমস্যার মোকাবিলা করা হয়। কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন এবং লাল ফৌজকেও এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে যুক্ত করা হয়।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপর এই জোর দেয়া হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত পোল্যান্ডের পুনর্গঠন পরিকল্পনায় অন্যতম প্রধান গুরুত্ব লাভ করে এই নিরক্ষরতা দূরীকরণ। ভিয়েতনামে মুক্তিসংগ্রাম চলার সময়েই হো-চি-মিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ শুরু করেন এবং এই কাজে তারা অনেকটা সফলও হন।

কেবল শিক্ষার প্রসার নয়, লেনিন আর একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেন। তা হল সমগ্র জনসমাজকে নতুন রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যারা জারের আমলে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, বড় হয়েছে তারা বুর্জোয়া ধ্যানধারণায় পুষ্ট। নতুন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। শিক্ষক-

সমাজের অধিকাংশই নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বিরুদ্ধে অন্য বুদ্ধিজীবীরাও। এদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য সর্বস্তরে ব্যাপক রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই লেনিন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলেছেন। চীনেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য তাই ছিল। কিন্তু তা বিপথগামী হয়েছে।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় দেশের উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে শ্রমিক কৃষককে উৎসাহিত করার জন্য, কৃষিতে যৌথ খামার ব্যবস্থা, এবং ভোগ্যপণ্য বন্টনে সমবায় সমিতির ব্যবহারের জন্যও ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন হয়েছে। এটাও জনশিক্ষা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংবাদপত্রকেও ব্যবহার করা হয়েছে এই কাজে।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশেই যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় তাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বত্র বাধ্যতামূলক। শিক্ষার অধিকার সংবিধানস্বীকৃত অন্যতম নাগরিক অধিকার।

শিক্ষানীতি নির্ধারণে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের ভূমিকা সমাজতান্ত্রিক দেশে স্বীকৃত। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নতুন শিক্ষা নীতি স্থির করার জন্য যে কমিশন গঠন করা হয় তাতে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক ছাড়াও শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিদের নেয়া হয়। এই কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে সর্বস্তরে তার ওপর জাতীয় বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর কেন্দ্রীয় আইনসভায় ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ সালে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করে নতুন শিক্ষা নীতির প্রবর্তন করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশের শিক্ষানীতি যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত জার্মানী, পোল্যান্ডে প্রথম থেকেই বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের মনে যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে সচেতন করা হয়, শান্তির পক্ষে তাদের মনকে গড়ে তোলা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বহু জাতিগোষ্ঠীর বাস। জারের আমলে এদের মধ্যে শিক্ষার কোন প্রসারই হয় নি। অধিকাংশ ভাষাগোষ্ঠীর পৃথক ভাষা থাকলেও অনেকেরই পৃথক কোন লিপি ছিল না। সমাজতন্ত্রের আমলে এদের পৃথক লিপি গড়ে তোলা হয়েছে, এদের মধ্যে শিক্ষার সামগ্রিক প্রসার হয়েছে এবং এদের পৃথক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হয়েছে।

স্কুল কলেজের শিক্ষার পরেও শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষাকে 'Continuing Process' হিসাবে গণ্য করা হয়। সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে কারখানায়, অফিসে, কৃষিখামারে সর্বত্র সাপ্তাহিক, সান্ধ্য ক্লাশের মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন ধ্যানধারণা, রাষ্ট্রের গৃহীত নতুন নীতি ও উৎপাদনক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া ডাকযোগে শিক্ষাব্যবস্থা বা Correspondence Course-ও আছে। পোল্যান্ডে শিক্ষানীতি নির্ধারণ, শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় পোলিশ টিচার্স ইউনিয়নের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই এক রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পুঁজিবাদী দেশের মত নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান নেই। এবং সব প্রতিষ্ঠানই সমাজের সম্পত্তি। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এ সব দেশে নেই। যুগোস্লাভিয়ায় বিদ্যায়তনগুলি স্ব-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান (Self managing institution) রূপে পরিচালিত। স্ব-পরিচালনার বুনিয়াদী সংস্থা রূপে যে বিদ্যায়তন পরিষদ রয়েছে তা প্রধানত শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।

সমাজতান্ত্রিক দেশে সর্বস্তরের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেয়া হয়। সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের স্বার্থ এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ যদি ভারতে জনশিক্ষার প্রসার করতে হয় তাহলে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপরে। বয়স্ক নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করার অভিযানে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, শিক্ষক সংগঠনের সামগ্রিক অংশগ্রহণ চাই। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ব্যাপক করতে হবে। বিদ্যায়তনের শিক্ষা শেষ হবার পরেও সবাই যাতে নিয়মিত শিক্ষার মধ্যে থাকে তার জন্য কল-কারখানা, অফিস কাছারী, গ্রামগঞ্জ সর্বত্র কর্মে নিযুক্ত লোকেদের জন্য সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে। ব্যাপকভাবে সর্বত্র করেসপন্ডেন্স কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বত্র বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী, বেসরকারী, মিশনারি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সংস্থার যে বহুমুখী কর্তৃত্ব আছে, তার অবসান ঘটিয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী পরিচালনায় নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্তমানকালের উপযোগী করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার পরিচালনায় পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীদের হাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

নভেম্বর বিপ্লবের দর্পণে বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

পৃথিবীতে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক কাল থেকে বহু বিদ্রোহ বিপ্লব ঘটে গেছে, সেগুলির দ্বারা শোষণের ভিত্তি বারবার কম্পিত হয়েছে কিন্তু শোষণের অবসান ঘটে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। একদল শোষকের পরিবর্তে আরেক দল শোষকের আবির্ভাব ঘটেছে। প্যারি কমিউন কিছুদিনের জন্য ক্ষমতা দখল করলেও আবশ্যিক প্রস্তুতির অভাবে স্থায়ী হতে পারে নি। প্যারি কমিউনের দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কার্ল মার্কস ভবিষ্যৎ শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক গতিপথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। রুশ বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন সেই শিক্ষার আলোকে ধাপে ধাপে ১৯০৫ সালের অভ্যুত্থান, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব এবং পরিণতিতে নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম সফল বিপ্লবের বিজয় বৈজয়ন্তী রচনা করলেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার গোড়াপত্তন করলেন। প্রতিবিপ্লবী সোশ্যাল রেভোলিউশনারী ও ট্রটস্কিপন্থী প্রমুখদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন সাম্রাজ্যবাদী দুর্গদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও পৃথিবীতে একক একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব। আর সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে বিশ্ববিপ্লবের উৎসমুখ এবং দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার দৃঢ় ভিত্তি।

লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে এই বিপ্লব এবং পরবর্তী সমাজ-তান্ত্রিক নির্মাণ-কার্য শুধু পুঁজিবাদী দেশে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র করান তাই নয়, উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনেও নতুন এক দৃষ্টিকোণ এনে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটিও ওত-প্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে যায়। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্তর ক্ষমতা হস্তান্তরের স্তর থেকে প্রায় বিপ্লবের স্তরে রূপান্তরিত হয়। রুশ বিপ্লবের বহু কৌণিক সুদূরপ্রসারী প্রভাব তাই দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়াচক্রকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তাই চক্রান্তের পর চক্রান্ত, একের পর এক গৃহযুদ্ধ, বহির্যুদ্ধ নবজাত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে মুকাবিলা করতে হয়। লেনিনের সুযোগ্য সহযোগী স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও মহান জনগণ দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ও সীমাহীন আত্মত্যাগের পথে সেই চক্রান্তগুলি ব্যর্থ করে দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অমোঘ জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন। ইতিহাসের কঠিনতম লড়াই হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার। নবজন্মের অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে সমৃদ্ধ বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার জনগণ স্তালিনের নেতৃত্বে মৃত্যুপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছিলেন তাই নয়, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূমি থেকে পুঁজিবাদ উৎখাত করতে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। আজ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে সমাজ-তান্ত্রিক শিবির রচিত হয়েছে। মহান চীনের বিপ্লব, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মুক্তি, সর্বশেষ ভিয়েতনামের অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় সমগ্র বিশ্বে ভারসাম্য পাল্টে দিয়ে সাম্রাজ্য-বাদকে কোণঠাসা করে দিয়েছে, দেশে দেশে শোষক শ্রেণীকে কাঠ-গড়ায় দাঁড় করেছে।

এই সমস্ত পরিবর্তনের কার্যকরী সূত্রপাত ঘটেছিল নভেম্বর বিপ্লবের দিনগুলি থেকে। রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব দেশে দেশে মুক্তি-সংগ্রামের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিল। এই বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কমরেড স্তালিন বলেছেন: "অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় সূচিত করে মানবজাতির ইতিহাসের একটি মূলগত পরিবর্তন, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক একটি আমূল পরিবর্তন, বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি একটি আমূল পরিবর্তন, সংগ্রামের পদ্ধতি এবং সংগঠনের ধরনসমূহে, জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যগুলির রীতিনীতিতে, সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক শোষিত জনগণের সংস্কৃতিতে ও মতাদর্শে আমূল পরিবর্তন।"

॥ দুই ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বব্যাপী আঘাত এবং রুশ দেশের প্রথম সর্বহারার বিপ্লব সমগ্র ভারত তথা এশিয়াভূমিকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল এবং মুক্তি আন্দোলনের মতাদর্শে সংযোজিত হল নতুন চেতনা। মুক্তি আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর ভূমিকার অবশ্যম্ভাবীতার প্রতি রাজনৈতিক দৃষ্টি এনে দিল। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির শিক্ষায় বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে এক গুণগত পরিবর্তন দেখা দিল এবং ক্রমশ সংগঠনের রূপ নিতে থাকল। বিশের দশকের শুরুর এই দিনগুলির অবস্থা বর্ণনা করে শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন: "দেশের অবস্থা এখন খুবই গরম। তাপের ওপর চড়ালে জল যেমন টগবগ করে ফোটে, দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষও সেই রকম টগবগ করে ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ আজও ভোলেন নি। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইলেন না কিছুতেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন-সংস্কার কাজে লাগাতে চাইতেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পৌঁছেছে। মজুর শ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব যে এদেশে একদল বিপ্লবী মার্কসবাদে দীক্ষিত কর্মী গড়ে তুলছিল শুধু তাই নয়, বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যেও তাৎপর্যপূর্ণ ছাপ ফেলেছিল। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে লালা লাজপত রায় বলেন: "সামরিকতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের যমজ সন্তান; এরা তিনের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে তিন। এদের ছায়া, এদের ফল, এদের বল্কল—সব কিছুই বিষাক্ত। একমাত্র সম্প্রতি এর পাল্টা শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই

পাল্টা শক্তি হচ্ছে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী।" সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শ্যেনদৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে প্রবাসে ও দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর কমিউনিস্টরা পার্টি গড়ে তুললেন ধীরে ধীরে। শুরু হল সম্পূর্ণ নতুন এক গণজাগরণের সাধনা, ভারতবর্ষের ভিত বদলের সংগ্রাম।

ভিত বদলের সংগ্রাম যখন বিপ্লবী সর্বহারা মানুষেরা শুরু করে, শোষণের জগদ্দল পাথর সরানোর লড়াই যখন চতুর্দিকে কাঁপন তোলে তখন উপরিতলে অর্থাৎ চিন্তা, চেতনা, সংস্কৃতিতেও নতুন সংগ্রাম জন্ম নেয়। শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের এক বিশিষ্ট অংশ কখনও বৈজ্ঞানিক চেতনায়, কখনও মানবিকতাবোধে সভ্যতার পিলসুজ এইসব নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। কায়েমীস্বার্থের প্রস্তর দুর্গে আছড়ে পড়ে গণজাগরণের ঢেউ, আবহাওয়ায় নব বসন্তের আগমনী বার্তা। হেমন্তের ঝরা-পাতার বিষণ্ণতা ও গর্ভস্থ বসন্তের আগমনী গান তখন শিল্পী, সাহিত্যিকদের কণ্ঠে। বিশের দশকেই শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগুলির মুখপত্র প্রকাশ হতে থাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে। বাংলাদেশে 'গণবাণী', বোম্বাইতে 'ক্রান্তি', পাঞ্জাবে 'কীর্তি', সংযুক্ত প্রদেশে 'ক্রান্তিকারী' ইত্যাদি পত্রিকা নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে মেহনতী মানুষের মধ্যে প্রচারকার্য শুরু করে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর প্রচণ্ড দমন-পীড়ন আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় পত্রপত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এর পরে তিরিশের দশকে বাংলা দেশে আবার বহু পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। যেমন, সাপ্তাহিক 'চাষীমজুর' (১৯৩২), সম্পাদক—বৈদ্যনাথ মুখার্জী, 'দিনমজুর' (১৯৩৩), মার্কসবাদী (১৯৩৩), সম্পাদক—অবনী চৌধুরী, 'মার্কসপন্থী' (১৯৩৩), সম্পাদক—আবদুল হালিম, 'গণশক্তি' (১৯৩৪), সম্পাদক—সরোজ মুখার্জী, 'জঙ্গীমজদুর' (হিন্দী), সম্পাদক—সোমনাথ লাহিড়ী, 'মাসিক গণশক্তি' (১৯৩৭), সম্পাদক—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, বঙ্কিম মুখার্জী, সোমনাথ লাহিড়ী, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী প্রমুখ, 'আগে চলো' (১৯৩৮), সম্পাদক—আবদুল হালিম। বলাবাহুল্য সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজ নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে প্রকাশিত এইসব পত্র-পত্রিকার প্রচার সহ্য করে নি। বারবার এইসব পত্রিকার উপর আক্রমণ নেমে এসেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামে বৈপ্লবিক আদর্শের মুখপত্র প্রকাশ অব্যাহতই থেকেছে।

শুধু মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ পত্রপত্রিকা নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের টানাপোড়েনে ও শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের আন্দোলনের অভিঘাতে জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকার চরিত্রেও রূপান্তর আসে। তৎকালীন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সুযোগ্য সম্পাদনায় যেমন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে পালন করেছিল তেমন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সংবাদাদি প্রচারেও সহায়তা করেছিল। কিন্তু অচিরেই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে অপসারণ করে প্রতিক্রিয়ার শিবিরের নেতৃত্ব গ্রহণ করে আর সেই নোংরা চরিত্র আজও বহন করে চলেছে। তাছাড়া সংবাদপত্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'সাপ্তাহিক যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা', 'সাপ্তাহিক স্বাধীনতা' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা। মার্কসবাদী বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের উদ্যোগে এই সময় 'নবযুগ', 'লাঙ্গল' ও 'ধূমকেতু' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে এক গণজাগরণের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে 'দৈনিক স্বাধীনতা' শ্রমজীবী মানুষের 'সত্যযুগ' পত্রিকাও সাধারণ মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে গণ-তান্ত্রিক সাংবাদিকতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করে। এ ছাড়াও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্ররূপে বিভিন্ন সময় 'স্বাধীনতা', 'মতামত' ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে পত্রপত্রিকাগুলিও ক্রমশ শ্রেণী চরিত্রে বিপরীত কোটিতে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী চরিত্রের ইতিবাচকতা হারিয়ে আন্দোলন সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত মালিকানার পত্রপত্রিকাগুলি বহুল প্রচারের সৌভাগ্য নিয়েও জনস্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে থাকে।

॥ তিন ॥

সমাজ বিপ্লব তো শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনে না, শিল্পসাহিত্যের জগতেও নিয়ে আসে পালাবদলের জোয়ার। সাহিত্য শিল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য সব সময়ই সামাজিক মানুষের শুভাশুভ বিচার বিশ্লেষণ করা। মানবতাবাদী লেখকেরা সমাজ সংসারের সমস্ত মানুষের মঙ্গল বিধান করতে গিয়ে এমন এক ধরনের চেতনার শিকার হয়ে পড়েন যেখানে সুর-অসুরের, শোষক-শোষিতের ভেদাভেদ থাকে না। ফলে তাঁর দ্বারা কায়েমীস্বার্থের শরীরে আঁচড়টিও লাগে না। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লব ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন লেখকদের সামনেও এ প্রশ্ন নিয়ে এল—সকল মানুষের শুভ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে হতে পারে না। অসম সমাজ-ব্যবস্থার অবসান ঘটানর মধ্যেই ব্যাপকতর মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর সেই কাজের আহ্বান দুনিয়াব্যাপী রেখেছে নভেম্বর বিপ্লব। সেই বিপ্লবের দুরন্ত আহ্বানে যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্র আলোড়িত তখন সাহিত্যের জগত তো দূরে থাকতে পারে না! পারেও নি। বাংলাদেশে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবী সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটতে থাকে। আর এই সাহিত্যের অগ্রচারী স্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি প্রত্যক্ষভাবে নভেম্বর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নজরুল তখন সেনাবাহিনীতে কর্মরত। তাঁর তৎকালীন সহকর্মী জমাদার শম্ভু রায় লিখেছেন : "তিনি অর্গানে একটা মার্চিং গৎ বাজানর পর নজরুল সেইদিন যেসব গান গাইলেন ও প্রবন্ধ পড়লেন তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গানবাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এবং ঠিক মনে নেই, সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়।"

সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেই নজরুল কবিতায় এই বিপ্লবের জয়ধ্বনি ঘোষণা করলেন :

> তোরা সব জয়ধ্বনি কর
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
> ওই নূতনের কেতন ওড়ে
> কাল-বোশেখীর ঝড়
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' গ্রন্থে লিখেছেন : "এই কবিতা রাশিয়ার বিপ্লববাদকে অভ্যর্থনা করে লেখা। তখন ভারতে বা বাংলায় কোন নতুনের কেতন আর দেখা যাচ্ছে না, দিক-দেশ স্তিমিত হয়ে পড়েছে—একমাত্র আশার আলো জেলেছে নতুন মানবতাবাদ, অধিকারের সমত্ববোধ। এই আন্দোলনের সূত্রপাত সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে, ভারতবর্ষে নয়, রাশিয়ায়।" নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের 'শ্রমিকের গান', 'কৃষাণের গান' প্রভৃতি কবিতা

এবং 'সাম্যবাদী'র কবিতাগুলি মার্কসবাদে বিশ্বাস ও নভেম্বর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সঙ্গীত অনুবাদ করেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর রক্ত-পতাকা উত্তোলনের অকুণ্ঠ আহবান তিনিই প্রথম জানিয়েছেন দেশ-বাসীর সামনে :

> ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।...
> দুলাও মোদের রক্ত পতাকা
> ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান
> ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।

নজরুলের সেনা-জীবনকালীন রচিত উপন্যাস 'ব্যথার দান'-এ লাল-ফৌজের ভূমিকার উল্লেখ আছে।

সে সময় 'গণবাণী', 'লাঙ্গল', 'ধূমকেতু', 'অরণি' প্রভৃতি পত্রিকায় নজরুল ছাড়াও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখের রচনায় নবচেতনার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যতীন্দ্রনাথের চাষার বেগার, লোহার ব্যথা, বারনারী প্রভৃতি কবিতা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় অবশ্য ইতিপূর্বেই (অর্থাৎ ১৯০৫ সালের) রুশ বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত 'লেনিন' নামের কবিতাটি আমরা কখনই বিস্মৃত হতে পারি না। লেনিনের মৃত্যুর পরও যখন বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলি কুৎসা করে চলেছে তখন পূর্ব বাংলার এই কবি শুধু লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাই নয় বিপ্লবের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছেন :

> "বারংবার মৃত্যুবার্তা রটায়েছে বিশ্বদূত
> হয় নি সে কাল অঙ্কে লীন
> এইবার মরেছে লেনিন।
> রুশের গগনসূর্য অস্তমিত আজ
> জনগণ অধিরাজ
> জীবন্মৃত জাতি চিত্তে জ্বালাইবে দীপ্ত হুতাশন
> সত্য কি মরেছে লেনিন?"

তিরিশ ও চল্লিশের যুগে কল্লোল—কালিকলম—সংহতি প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠী আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যের আঙ্গিকগত সমৃদ্ধি যেমন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তেমন দেখা দিয়েছিল সাধারণ অন্ত্যজ জীবনযাত্রার মানুষের প্রতি গভীর প্রীতি ও আগ্রহ। বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, অশোকবিজয় রাহা, বিষ্ণু দে দিনেশ দাস, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অরুণ মিত্র প্রমুখের মধ্যে কম-বেশী নভেম্বর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত গণচেতনা স্বতোৎসারিত হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে দু-এক জনকে বাদ দিলে বেশীর ভাগই ভারতের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীদের সংগ্রাম, গণ-নাট্য আন্দোলন এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংগ্রামের পায়ে পা মিলিয়ে এ'রা কবিতা লিখেছেন এবং তার বেশীর ভাগই নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষপাতী। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের '৭ই নভেম্বর', 'সোভিয়েট ভূমি', 'বিপ্লব' প্রভৃতি কবিতা বাংলা কবিতার জগতে দিক্‌চিহ্নস্বরূপ। সুকান্তের 'মধ্যবিত্ত', '৪২', 'কৃষকের গান', 'বোধন', 'বিদ্রোহের গান', 'দিন বদলের পালা', 'একুশে নভেম্বর' প্রভৃতি বহু কবিতায় উন্নত কাব্য-শৈলীতে রচিত হয়েছে বিপ্লবের জয়গাথা। সুকান্ত লিখেছেনঃ

> "কিছু না হলেও আবার আমরা
> রক্ত দিতে তো পারি
> পতাকায় পতাকায় ফের মিল আনবে ফেব্রুয়ারী
> এ নভেম্বরে সংকেত পাই তারি।"

> "দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে
> বসে থাকবার বেলা নেই মোটে
> রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে পূর্বকোণ।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক, অগ্নিকোণ, চিরকুট; জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীর গলি, একটি প্রেমের কবিতা, নবজীবনের গান; মঙ্গলাচরণের মেঘ বৃষ্টি ঝড়; অরুণ মিত্রের কাঁটাতার; রাম বসুর তোমাকে, যখন যন্ত্রণা; কৃষ্ণ ধর, সিদ্ধেশ্বর সেন, গোলাম কুদ্দুসের কবিতা প্রভৃতি বাংলা প্রগতি সাহিত্যের রাজপথ নির্মাণ করে দিয়েছে। যে পথ ধরে আজও অসংখ্য কবি-সৈনিক পথ হেঁটে চলেছেন কণ্ঠে রয়েছে তাঁদের অত্যাচারিত নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের জীবনের জয়গান। স্বাধীনতাপরবর্তী অপশাসন ও স্বৈর-শাসনের দিনগুলিতে যেসব কবি অগ্নিশপথে বিপ্লবের জয়ধ্বনি প্রচার করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কনক মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাস, দুর্গাদাস সরকার, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্যামসুন্দর দে, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সাধন গুহ, সনাতন কবিয়াল, গোপীনাথ দে, অমল চক্রবর্তী, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, দীপংকর চক্রবর্তী, জিয়াদ আলি, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী দাসগুপ্ত, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, নিমাই মান্না, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর রায়, সাগর চক্রবর্তী প্রমুখ নবীন ও প্রবীণ কবিরা।

॥ চার ॥

বিশের দশক থেকে বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবজাত গণচেতনা লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বোধ করি ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের। বিপ্লবী সাহিত্যের আদর্শ শুধু এদেশে নয় সম্ভবতঃ বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সঞ্চারিত হয়েছিল এই মহাকাব্যের মাধ্যমে। 'মা' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ এদেশের রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী-দের চিন্তাক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই উপন্যাসের অনুবাদে বিমল সেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও পুষ্পময়ী বসুর অবদান অপরিসীম।

বিশের দশকে মণীন্দ্রলাল বসু রচিত 'অরুণ' গল্পে রুশ বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের ভূমিকা চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের উল্লেখ আছে। রুশ বিপ্লবজাত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সম্পর্কে ভারত-বাসীর বিশেষ করে বাঙ্গালীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উচ্ছ্বসিত ভাষায় বললেন: "আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর আর সব জায়গায় ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সবচেয়ে বড়োকরে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্য-কর, দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার।...এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা।...অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে

তারাই একমাত্র।" রাশিয়া ভ্রমণের আগেই রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং শোষিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতিমূলক জীবন-চিত্র অঙ্কন করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, নারায়ণ ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রমুখ সেকালের কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় অবজ্ঞাত, অবহেলিত জীবনযাত্রার মানুষদের নিয়ে গল্প, উপন্যাস রচনার প্রবণতা। অনতিপরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, রমেশ সেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, নবেন্দু ঘোষ, গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সোমেন চন্দ, ননী ভৌমিক, অসীম রায়, সুশীল জানা, সতীনাথ ভাদুড়ী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণময় মান্না প্রমুখ কথা-সাহিত্যিক প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীদের সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রেখে সমকালীন সংগ্রাম আন্দোলনের উদ্দাম জোয়ারের তালে তালে অসংখ্য সৃষ্টিসম্ভার উজাড় করে দিয়েছেন। এই সৃষ্টির জন্য বাংলা সাহিত্য গর্বিত এবং বলা চলে এই সৃষ্টি-ধারাই বাংলা সাহিত্যের ধ্রুবপথ রচনা করে দিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য আজও অম্লানভাবে বাংলা কথা-সাহিত্যে গণচেতনার ধারার পরিপোষকতা করে চলেছে। এই পথ ধরেই এসেছিলেন সমরেশ বসু, কিন্তু আজ তিনি প্রতিক্রিয়ার শিবিরে হারিয়ে গেছেন। সংগ্রামী জীবন দর্শনের ধারাটি কথা-সাহিত্যে অব্যাহতভাবে আজও যাঁরা বহন করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কৃষ্ণ চক্রবর্তী, তপোবিজয় ঘোষ, চিত্ত ঘোষাল, সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মণি মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, কালিদাস রক্ষিত, মিহির আচার্য, দেবদত্ত রায়, রামশঙ্কর চৌধুরী, হীরালাল চক্রবর্তী প্রমুখ।

গণনাট্য আন্দোলনের ধারায় নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব সর্বাপেক্ষা কার্যকরী রূপ পায় নাটক ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। নাটকের ক্ষেত্রে নতুন দিনের বাণী বহন করে এনেছিলেন মন্মথ রায়, শচীন সেন-গুপ্ত, বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, শম্ভু মিত্র, বিনয় ঘোষ প্রমুখ। এঁদের সৃষ্ট নাটক বাংলা নাটকের গতিধারা সম্পূর্ণ বদলে দিল। রঙ্গমঞ্চে ও প্রধানত রঙ্গমঞ্চের বাইরে মাঠে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে বাংলার প্রগতি-মূলক ও গণনাট্য এই সব নাট্যকারের সৃষ্টিকে নির্ভর করেই ছড়িয়ে পড়ে। এই ধারা বহন করেই অন্যান্য শক্তিমান নট ও নাট্যকাররা এসেছেন যাঁদের মধ্যে রয়েছেন উৎপল দত্ত, বীরু মুখোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, জ্যোছন দস্তিদার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, হীরেন ভট্টাচার্য, চিররঞ্জন দাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির সেন, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজীব গোস্বামী, বাসুদেব বসু, শ্যামাকান্ত দাস, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দেবাশিষ মজুমদার, বিদ্যুৎ নাগ, শুভংকর চক্রবর্তী, শশাংক গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

এদেশে সাধারণ মানুষের শোষণমুক্তির সংগ্রাম আজও চলছে এবং চলবে যতদিন পর্যন্ত না আরব্ধ লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হয়। আর সমস্ত বাধা বিপত্তি অপসারণ করে সংগ্রামী মানুষের বিজয় ঐতিহাসিক কারণেই অনিবার্য। সেই সংগ্রামের সাথীরূপে সাহিত্যের একটি প্রবল ধারা উত্তরোত্তর বেগবান হয়ে প্রবাহিত হতেই থাকবে। মাটির বুকে যেমন গাছ ও তার ফুল-ফলের জীবনরস নিহিত থাকে, তেমনি মানুষের সংগ্রামের মধ্যে জীবনমুখী সাহিত্যের উৎস। সেই উৎসমূল থেকে নিয়ত প্রাণরস আহরণ করে বিপ্লবী সাহিত্য তার স্থান করে নেবেই এই সমাজে।

ভারতীয় শিল্পে শোষণের হার

গোপাল ত্রিবেদী

কার্ল মার্ক্স তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিট্যাল'-এর প্রথম খণ্ডে পণ্যের মূল্যকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—উৎপাদিত উপকরণের মূল্য, শ্রমের মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্য। মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে সব মূল্যই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিযুক্ত শ্রমিকের কার্যকালের দ্বারা নির্ধারিত হয়। পণ্য তৈরী করতে দু' রকমের উপকরণ লাগে—উৎপাদিত উপকরণ ও মানুষের শ্রম। উৎপাদিত উপকরণের মূল্য, যেটা তৈরী করতে যে পরিমাণ শ্রম লেগেছিল তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদিত উপকরণের শ্রমমূল্যের সঙ্গে আরও শ্রম সংযোজিত হয়ে নূতন পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়।

শ্রম সংযোজনের জন্য শ্রমিক তার শ্রমের মূল্য মজুরী হিসাবে পায়। আর বাদবাকী শ্রমমূল্য শিল্পপতি উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে সংগ্রহ করে। অর্থাৎ শ্রমিক যতটা সময় কাজ করে ততটা শ্রমমূল্য সৃষ্টি করে; কিন্তু সৃষ্ট শ্রমমূল্যের এক অংশ শ্রমিক শ্রমের মূল্য হিসাবে পায়, আর বাকী অংশ যে শিল্পপতি শ্রমিককে নিয়োগ করে তার হাতে উদ্বৃত্ত হিসাবে থাকে। সেইজন্য মার্ক্স উদ্বৃত্ত মূল্য ও শ্রমের মূল্যের অনুপাতকে শ্রমিক-শোষণের হার বলে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রমিক যদি দিনে আট ঘণ্টা কাজ করে এবং সে যে মজুরী পায় তার পরিমাণ যদি পাঁচ ঘণ্টা কাজের সমান হয়, তা হলে তিন ঘণ্টার কাজ উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে শ্রমিক-শোষণের হার দাঁড়ায় $\frac{৩}{৫} \times ১০০ = ৬০$ শতাংশ।

মার্ক্সের সংজ্ঞা অনুসারে শ্রমিক-শোষণের হার নির্ণয় করতে হলে পণ্যের মোট মূল্য ও তার ভাগ তিনটি শ্রমিকের কার্যকালের পরিমাপে প্রকাশ করা দরকার। কিন্তু শিল্পোৎপাদনের যে হিসাব আমরা পাই তাতে পণ্যের শ্রমমূল্য জানা যায় না, সব মূল্যই টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। সেইজন্য মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুসারে শ্রমিক-শোষণের হার প্রচলিত হিসাব থেকে নির্ণয় করা যায় না। তবু শিল্পোৎপাদনের যেসব হিসাব টাকার অঙ্কে পাওয়া যায় তা থেকে শ্রমিক-শোষণের হার সম্বন্ধে একটি স্থূল ধারণা করতে কোন অসুবিধা হয় না। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় শিল্পে শ্রমিক-শোষণের হার সম্বন্ধে একটি স্থূল হিসাব উপস্থিত করার চেষ্টা করছি।

ভারতের শিল্পোৎপাদন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই সকল তথ্য 'সেন্সাস্ অব্ ম্যানুফ্যাক্চারিং ইন্-ডাস্ট্রিজ'এর কল্যাণে পরিবেশিত হয়েছে। ১৯৫৯ সাল থেকে 'এনুয়াল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ' এই সকল তথ্য প্রকাশ করে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই ত্রিশটি বছরের মধ্যে দু' বছরের কোন তথ্য পাওয়া যায় না, কারণ ১৯৬৭ ও ১৯৭২ সালের জন্য 'এনুয়াল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ'এর পক্ষ থেকে কোন তথ্য প্রকাশিত হয় নি।

'সেন্সাস্ অব্ ম্যানুফ্যাক্চারিং ইন্ডাস্ট্রিজ'এর তথ্যে ২৯টি প্রধান শিল্পে বিদ্যুৎশক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহারকারী ও ২০ জন বা তার বেশী শ্রমিক নিয়োগকারী সব কারখানাকে ধরা হয়েছে। 'এনুয়াল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ'এর তথ্যে বিদ্যুৎশক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহারকারী যে সব কারখানায় ৫০ জন বা তার বেশী শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছে এবং বিদ্যুৎশক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহার করে না এমন যে সব কারখানায় ১০০ জন বা তার বেশী শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছে, তাদের উৎপাদন সংক্রান্ত হিসাব পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভারতের বড় বড় সব কারখানার একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

এই সকল কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য থেকে যে সকল উৎপাদিত উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মোট মূল্য বাদ দিলে কারখানায় সংযোজিত মূল্যের পরিমাণ জানা যায়। কারখানায় সংযোজিত মূল্যের দু'টি ভাগ আছে—শ্রমিকের মজুরী এবং উদ্বৃত্ত মূল্য। শ্রমিককে বেতন, ভাতা, বোনাস এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে তার মোট পরিমাণকে শ্রমিকের মজুরী বলে ধরা হচ্ছে। কারখানায় সংযোজিত মূল্য থেকে শ্রমিকের মজুরী বাদ দিলে যা পড়ে থাকে তাকে স্থূল অর্থে উদ্বৃত্ত মূল্য বলা যেতে পারে। এইভাবে পাওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যকে শ্রমিকের মজুরী দিয়ে ভাগ করে সেই ভাগফলকে একশ' দিয়ে গুণ করলে শ্রমিক-শোষণের শতকরা হার পাওয়া যায়। এইভাবে পাওয়া হিসাবটি আমরা উপস্থিত করছি। [২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

ভারতীয় শিল্পে শ্রমিক-শোষণের হার সম্পর্কে আটাশ বছরের যে হিসাব আমরা উপস্থিত করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে শোষণের গড় হার ৭৭ শতাংশ। আটাশ বছরের গড় হার ৭৭ শতাংশ হ'লেও বছরে বছরে এই হার অনেকখানি উঠানামা করেছে। সংযোজিত লেখচিত্রে এই অবস্থাটি পরিষ্কারভাবে দেখান হ'ল।

স্থূল দৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে তা হ'ল (১) ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত শোষণের হার পরবর্তী কালের তুলনায় অনেক বেশী উঠানামা করেছিল, (২) ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত শোষণের হার গড় হারের উপরে মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল, এবং (৩) ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে শোষণের হার বছর দুই খানিকটা কমতে থাকলেও ১৯৬৮-৬৯ সালের পর থেকে আবার দ্রুত বাড়তে থাকে।

মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে শ্রমিক-শোষণের হার নির্ভর করে শ্রমিকের কার্যকালের উপর এবং তার জীবনযাপনের জন্য সেই কার্যকালের কতখানি দরকার তার উপর। এগুলি আবার নির্ভর করে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কিত শ্রেণী সংগ্রামের উপর, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার উপর এবং উৎপাদনে যন্ত্র ব্যবহারের উপর। আমরা এখানে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের সাথে শোষণের কি সম্পর্ক ভারতীয় শিল্পে দেখা যায় তা নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ করছি।

ভারতীয় শিল্পে মূল্য-গঠন এবং শোষণের হার, ১৯৪৬—১৯৭৫

বৎসর	উৎপাদিত উপকরণের মূল্য (কোটি টাকায়)	শ্রমিকের মজুরী (কোটি টাকায়)	উদ্বৃত্ত মূল্য (কোটি টাকায়)	পণ্যের মোট মূল্য (কোটি টাকায়)	শোষণের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৯৪৬	৩৯১	১০২	১০৯	৬০৩	১০৭
১৯৪৭	৫০১	১০৬	১০৬	৭৪৩	৭৮
১৯৪৮	৬০৬	১৬৬	১৫২	৯৫৪	৯২
১৯৪৯	৭০৩	১৭৭	৯৬	৯৭৬	৫৪
১৯৫০	৭৪৪	১৭২	১১২	১০২৮	৬৫
১৯৫১	৯৬০	১৮৯	১৫৭	১৩০৬	৮৩
১৯৫২	৮৬৯	২০১	১১৪	১১৮৪	৫৭
১৯৫৩	৭৮৯	২০৫	১২৯	১১২৩	৬৪
১৯৫৪	৯১৫	২১৯	১৫৪	১২৮৮	৭০
১৯৫৫	৯৮৬	২৩১	১৮৯	১৪০৬	৮২
১৯৫৬	১১৪৫	২৫৬	২১৩	১৬১৪	৮৩
১৯৫৭	১২৫৬	২৭০	১৯৮	১৭২৪	৭৩
১৯৫৮	১২২২	২৬৮	২২২	১৭১১	৮৩
১৯৫৯	১৭৯১	৪৩৮	৩৭৫	২৬০৪	৮৬
১৯৬০	২২৮৬	৪৮২	৩৮২	৩১৫০	৭৯
১৯৬১	২৭০৫	৫৩৬	৪৫২	৩৬৯৩	৮৪
১৯৬২	৩০৬১	৬২৮	৪৮৭	৪১৭৬	৭৮
১৯৬৩	৩৫০৪	৭০২	৫৯৩	৪৭৯৯	৮৪
১৯৬৪	৪১২৪	৮৩০	৬৭৩	৫৬২৭	৮১
১৯৬৫	৪৭৯২	৯৭০	৭৩০	৬৪৯২	৭৫
১৯৬৬	৫৪১৬	১০৭২	৭৬০	৭২৪৮	৭১
১৯৬৭	—	—	—	—	—
১৯৬৮	৬৫৭৭	১৩০৮	৭৮৮	৮৬৭৩	৬০
১৯৬৯	৭৫১৭	১৪৬২	৯৭৭	৯৯৯৬	৬৭
১৯৭০	৮৫৩৭	১৬৫৯	১১৫০	১১৩৪৬	৬৯
১৯৭১	৯৯৪৩	১৮২২	১৩০১	১৩০৬৬	৭১
১৯৭২	—	—	—	—	—
১৯৭৩	১১৮৯৪	২২৬৩	১৮৩৬	১৫৯৯৩	৮১
১৯৭৪	১৬২৭১	২৭৮৮	২৭০৪	২১৭৬৩	৯৭
১৯৭৫	১৯২৩৬	৩১৬০	২৬০৯	২৫০০৫	৮৩

সূত্রঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম স্তম্ভের তথ্যগুলি 'সেন্সাস্ অব্ ম্যানুফ্যাক্চারিং ইন্ডাস্ট্রিজ' এবং 'এনুয়্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ' থেকে নেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট তথ্যগুলি হিসাব করে বার করা হয়েছে।

শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রত্যক্ষ পরিণতি হিসাবে দেখা যায় শ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং মালিকরা কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়। সুতরাং শ্রমিক-মালিক বিরোধের পরিমাপক হিসাবে দু'টি বিষয়কে গ্রহণ করা যায়—বিরোধে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা এবং বিরোধের ফলে কর্মচ্যুত শ্রম-দিনের সংখ্যা। শ্রমিক-মালিক বিরোধে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি মাপা যায়। আর গড়ে একজন শ্রমিক আন্দোলনের ফলে যতদিন কর্মচ্যুত হয় তার দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনের

ভারতীয় শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ, ১৯৪৬—১৯৭৫

বৎসর	বিরোধে অংশ-গ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা ('০০০)	কর্মচ্যুত শ্রম-দিবসের সংখ্যা ('০০০০)	কর্মচ্যুত শ্রমদিবসের শ্রমিক প্রতি গড়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯৪৬	১৯৬২	১২৭২	৬·৪৮
১৯৪৭	১৮৪১	১৬৫৬	৯·০০
১৯৪৮	১০৫৯	৭৮৪	৭·৪০
১৯৪৯	৬৮৫	৬৬০	৯·৬৩
১৯৫০	৭২০	১২৮১	১৭·৭৯
১৯৫১	৬৯১	৩৮২	৫·৫২
১৯৫২	৮০৯	৩৩৪	৪·১২
১৯৫৩	৪৬৭	৩৩৮	৭·২৫
১৯৫৪	৪৭৭	৩৩৭	৭·০৭
১৯৫৫	৫২৮	৫৭০	১০·৮০
১৯৫৬	৭১৫	৬৯৯	৯·৭৮
১৯৫৭	৮৮৯	৬৪৩	৭·২৩
১৯৫৮	৯২৯	৭৮০	৮·৪০
১৯৫৯	৬৯৪	৫৬৩	৮·১২
১৯৬০	৯৮৬	৬৫৪	৬·৬৩
১৯৬১	৫১২	৪৯২	৯·৬১
১৯৬২	৭০৫	৬১২	৮·৬৮
১৯৬৩	৫৬৩	৩২৭	৫·৮০
১৯৬৪	১০০৩	৭৭২	৭·৭০
১৯৬৫	৯৯১	৬৪৭	৬·৫৩
১৯৬৬	১৪১০	১৩৮৫	৯·৮২
১৯৬৭	১৪৯০	১৭১৫	১১·৫১
১৯৬৮	১৬৬৯	১৭২৪	১০·৩৩
১৯৬৯	১৮২৭	১৯০৫	১০·৪৩
১৯৭০	১৮২৮	২০৫৬	১১·২৫
১৯৭১	১৬১৫	১৬৫৫	১০·২৪
১৯৭২	১৭৩৭	২০৫৪	১১·৮৩
১৯৭৩	২৫৪৬	২০৬৩	৮·১০
১৯৭৪	২৮৫৫	৪০২৬	১৪·১০
১৯৭৫	১১৪৩	২১৯০	১৯·১৫

সূত্রঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভের তথ্যগুলি 'ইন্ডিয়ান্ লেবার ইয়ারবুক্', 'ইন্ডিয়ান্ লেবার গেজেট্' এবং 'ইন্ডিয়ান্ লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তৃতীয় স্তম্ভের সংখ্যাকে দ্বিতীয় স্তম্ভের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে চতুর্থ স্তম্ভের সংখ্যাগুলি পাওয়া গেছে।

তীব্রতা মাপা যায়। আমরা এখানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য উপস্থিত করছি।

রাশি বিজ্ঞানে অনুসৃত পদ্ধতিতে শ্রমিক-শোষণের হারের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি নজরে পড়ে তা হ'লঃ (১) শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তির সঙ্গে তীব্রতার সম্পর্ক খুবই দুর্বল, এবং (২) তার ফলে সামগ্রিকভাবে শোষণের হারের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ এক কথায় শোষণের হার উঠানামার বিশ্লেষণে শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা খুবই দুর্বল। এটা ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে। অবশ্য শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে শোষণের হারের, দুর্বল হলেও, একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ শ্রমিকরা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে ধর্মঘটকে প্রলম্বিত করে শোষণের হার কিঞ্চিৎ পরিমাণে কমাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের ব্যাপ্তির সঙ্গে শোষণের হারের একটি ক্ষীণ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ হ'ল, শোষণ যত বাড়ছে তত অধিক সংখ্যায় শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। তবে অধিক সংখ্যায় শ্রমিককে আন্দোলনে সামিল করার ব্যাপারে অনেক দুর্বলতা থাকায় এই সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ।

পরিশেষে বর্তমান প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। আমরা এখানে শ্রমিক-শোষণের হারকে প্রভাবিত করতে পারে এমন আরও যে সব বিষয় আছে (যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক ইত্যাদি) সেগুলির সঙ্গে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করি নি। তাছাড়া, শোষণের হারের শিল্পগত ও আঞ্চলিক তারতম্যও বিশ্লেষণ করি নি। তাই যে চিত্রটি আমাদের সামনে ধরা পড়েছে তা খুবই স্থূল এবং বিচার সাপেক্ষ।*

* প্রবন্ধটি রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজে 'সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অরগানিজেশন'-এর কলকাতা অফিসের গ্রন্থাগারিক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের টিচার ফেলো শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভগৎ যে সাহায্য করেছেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা স্বীকার করছি।

আলোচনা

প্রাথমিক স্তরে প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী ও সহজ পাঠ

তাজ মহম্মদ

দীর্ঘদিন পরে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা আলাপ আলোচনার পর যখন প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী নতুনভাবে প্রণয়ন করতে যাচ্ছে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার, ঠিক সেই মুহূর্তে নানারকম আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছে। কিছু কিছু সাহিত্যিক ও দৈনিক সংবাদপত্র তীব্রভাবে আক্রমণ করছে এই নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নে রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'কে সামনে রেখে, এবং অবশ্যই তারা একটা নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সচেতনভাবে আক্রমণ হানার চেষ্টা করছেন। যা হোক সমাজ বিকাশের ধারাকে রুখে দেওয়ার মত ইতিহাস আজও তৈরী হয় নি। তবুও কিছু প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতেই পারে।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

সমাজ বিকাশের সাথে সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। এই পরিবর্তন যদি যথাযথভাবে না হয় তাহলে সমাজজীবন নানারকম প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়নের রীতি দেশে দেশে প্রচলিত। আমাদের দেশে ১৯৫০ সালে যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রাথমিক স্তরে চালু হয়েছিল তা আজও পশ্চিমবঙ্গে অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত। পাঠক্রম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে উপলব্ধি করা হচ্ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ বিশেষ করে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ উল্লেখযোগ্য। ২৫ বছর পর সমাজ সভ্যতার বিকাশের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও বাস্তবানুগ করার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার করছে তাকে নিশ্চয় সাধুবাদ জানানো উচিত।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তন কোন গোপন ঘটনা নয়

কিছু কিছু সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও দৈনিক সংবাদপত্র ফলাও করে লিখতে শুরু করলেন যে, এই সরকার নাকি গোপনভাবে এই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের কাজ সারছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁরা ধরে ফেললেন ভাবটা এই রকমই। কিন্তু এ'রা কি সত্যি কথা বলছেন? আদৌ নয়। ঐসব বুদ্ধিজীবীরা এবং সংবাদপত্রগুলো খবর না রাখতে পারেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও ছাত্র আন্দোলনের সাথে যাঁরা যুক্ত তাঁরা জানেন, খবর রাখেন। সুদীর্ঘ ২৫ বছর পর ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ বিনয় ভবনের অধ্যক্ষকে সভাপতি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ ১৪৩৫-ইডিএন(পি) তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর-এর এক আদেশনামায় পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি সিলেবাস কমিটি গঠন করে। যে কোন কারণেই হোক সেই কমিটি ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারে নি। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই কমিটিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কার্যকরীভাবে এই সিলেবাস কমিটি কাজ শুরু করে। এছাড়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়েরও ব্যবস্থা করা হয়। সার্বিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এবং এই কমিটির অধিবেশনগুলিতে ব্যাপক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সিলেবাসকে আধুনিকীকরণ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগপোযোগী করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়াও কিছুদিন আগে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এ্যাডুকেশনাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT)এর পরিচালনাধীনে ওরিয়েন্টেশন কার্যসূচী শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে ঐ সব বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্রগুলি নেহাতই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্যই এরকম বিরূপ মন্তব্য ও অভিযোগ উত্থাপন করছেন।

সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও সাংবাদিকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে

যখন নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী চালু হতে যাচ্ছে ঠিক তখনই কিছু সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ কিছু কিছু দৈনিক সংবাদপত্রের সাথে সুর মিলিয়ে গেল গেল রব তুলেছেন। ভাবাবেগের আতিশয্যে এবং বিশেষ কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এত হৈচৈ করছেন। ভাবটা এমনই যে রবীন্দ্রোত্তর কালে রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার ইজারা নিয়েছেন একমাত্র তাঁরাই। অথচ পশ্চিমবঙ্গে যখন অশান্ত রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল, চারিদিকে হঠকারী রাজনীতির ধারক বাহকরা রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে নষ্ট করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে আঘাত হানছিল, তখন কিন্তু ঐ সব বুদ্ধিজীবীর দল এগিয়ে আসেন নি সামান্যতম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। এ'রা ভাবাবেগে বিভোর হয়ে রাজ্যে যখন গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখন আন্দোলন করার হুমকি দিলেন। আশ্চর্যের কথা, তাঁরা একবার দাবি করলেন না, একটা শিক্ষামূলক আলোচনার, যখন সরকার উদাত্তভাবে মূল্যবান অভিমত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। আমাদের কাছে এটা খুব দুঃখজনক যে, 'সহজ পাঠ' সংক্রান্ত বিতর্কে বিরোধীরা এবং ঐ সব সাহিত্যিক সমালোচকরা শিশুবিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা পরিহার করে শিশুসাহিত্য হিসাবে 'সহজ পাঠে'র মূল্যায়ন করে বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা ও

ভাষানীতিকে আক্রমণ করলেন, তাঁরা 'সহজ পাঠ'কে সামনে রেখে পরিবেশকে দূষিত করে মানুষকে উত্তেজিত করার জন্য বামফ্রন্ট বিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলছেন। রবীন্দ্রনাথের নাম এবং 'সহজ পাঠে'র মত একটা শিশুপাঠ্য আদরণীয় বইকে নিয়ে জল ঘোলা করে তাঁরা চুপ করবেন না এটা সহজেই অনুমেয়। এই ঘোলা জলের সুযোগ নিয়ে তাঁরা সমগ্র পাঠক্রমের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার চেষ্টা করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তব ভিত্তিতে পরিবর্তনের যে সুপারিশ গৃহীত হয়েছে সেই পরিবর্তনের বিরোধী এ'রা। কিন্তু বাস্তবভিত্তিক, হাতে কলমে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলা যায় না। তাতে ওদের মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আসলে এ'রা মৌলিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পরিস্থিতি স্বীকার করে শিক্ষা ব্যবস্থা রূপান্তরের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছেন। বাঁধ ভেঙে দিতে চেয়েছেন, এ'রা অচলায়তনকে ধরে রাখতে চান, আসলে পরিবর্তনেই এ'দের বাধা। সেইজন্য এ'রা 'সহজ পাঠ'কে সামনে রেখে কৌশলে রবীন্দ্র-প্রীতির নামে আপত্তি করতে চাইছেন। তাঁদের এটাও মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে যে, এই 'সহজ পাঠ' ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হলেও দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম অবশ্য পাঠ্য হিসাবে প্রণয়ন করেছিলেন।

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী ও 'সহজ পাঠ'

সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম কখনই চিরকাল এক রকম থাকতে পারে না। সে কারণে এটা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে 'সহজ পাঠ' কতখানি গ্রহণযোগ্য তা আলোচনা সাপেক্ষ, কিন্তু এটা ভাবা নিতান্তই অন্যায় যে 'সহজ পাঠ' রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে তা চিরকালই পাঠ্যসূচীতে থাকবে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানেন তাঁরা বুঝবেন যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কোনদিন অনড় মানসিকতার মানুষ ছিলেন না। যিনি নিজে সারা-জীবনে প্রকৃত সত্যের সন্ধানে নতুন নতুন ভাবে সবকিছুকে গড়তে চেয়েছিলেন, সে কারণে রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনা কেমন ছিল আর আধুনিক যুগ ও জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিভাবে একে গ্রহণ করা যায় এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই 'সহজ পাঠ'কে গ্রহণ করতে হবে। আবহমানকালের বাঙলাভাষীদের জন্য বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ-পরিচয়ে'র পরেও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'সহজ পাঠ' শান্তি-নিকেতনের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৯২৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠ' রচনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণপরিচয়' বর্জন করার জন্য নয়। ভাষা শিক্ষার পরে পড়ুয়াদের ভাব ও ছন্দের জগতে প্রবেশের পথকে উপযুক্ত করার জন্য এবং বাস্তব প্রয়োজনেই। সেজন্য প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাষা, ভাব ও ছন্দের সমন্বয়-সাধনকল্পে যে শিশুপাঠ্য পুস্তক রচিত হবে তা রবীন্দ্রনাথ বিরোধী তো নয়ই বরং তা রবীন্দ্রচেতনার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষার প্রথম স্তরে শিশুদের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনে যে দিকগুলোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত তা হ'ল—অক্ষর পরিচয়, মুদ্রিত অক্ষর, লিপিশিক্ষা অভ্যাস করানো, শব্দের সাথে পরিচয়, শব্দ গঠন, উচ্চারণ রীতি, অযুক্তাক্ষর শব্দ ও যুক্তাক্ষর শব্দ গঠন, বাক্য গঠন, বাক্য প্রয়োগের ব্যাকরণরীতি ও প্রয়োগের দক্ষতা কিভাবে দেওয়া যায়, শব্দ ও অর্থের সমন্বয় সাধনই বা কিভাবে করা যায়। এ ছাড়াও ভাষাশিক্ষা বিজ্ঞানীদের সুস্পষ্ট সূত্রগুলি অনুধাবন করানো প্রয়োজন।

শিশুরা যাতে প্রচলিত ছড়া ও গাথার সাথেও এ স্তরে পরিচিত হতে পারে সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার। সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত বা নজরুলের শিশুপাঠ্য কবিতা ও ছড়ার সাথেও শিশু-দের পরিচিত করা আর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়ার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। শব্দ, বাক্য ও অনুষঙ্গগুলি বাস্তব পরিবেশ অনুযায়ী শিশুদের সুস্পষ্ট মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ ছাড়াও এ পুস্তকটি এমন হওয়া উচিত যা শিশু-দের কাছে আকর্ষণীয় হবে ও অনুশীলনে শিশুদের উৎসাহ যোগাতে সাহায্য করবে।

নতুন পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য

(১) এই পাঠক্রমে আধুনিকতম চিন্তাধারা গ্রথিত হয়েছে। সেইজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর এবং সমাজের সর্বতোমুখী বিকাশের সহায়করূপে দেখা হয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, ক্রান্তিকারী সমাজের উপযুক্ত নাগরিকতাবোধের সৃষ্টি, জীবনব্যাপী শিক্ষণের প্রেরণা ও কর্মদক্ষতার উন্মেষকে লক্ষ্য হিসাবে ধরে নেওয়া।

(২) বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিশেষ করে কোঠারী কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি পাঠক্রম রচনায় গ্রহণ করা হয়েছিল।

(৩) শিক্ষাকে জীবনমুখী ও প্রয়োগধর্মী করার উদ্দেশ্যে শিশুর নিজ নিজ পরিবেশের উন্নতিকল্পে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন বিষয়ের লব্ধ অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণের জন্য "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-মূলক কাজ" শীর্ষক কর্মমুখী পর্যবেক্ষণধর্মী একটি নতুন পাঠক্রম সংযোজিত হয়েছে।

(৪) পাঠক্রমকে প্রয়োগসাধ্য, ব্যবহারধর্মী ও পরিবেশ অনুসারে প্রাসঙ্গিক ও নমনীয় করার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(৫) যুগোপযোগী কর্মক্ষম নাগরিক গড়ে তোলার জন্য উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অনুসন্ধিৎসা, আবিষ্কারধর্মিতা ও পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(৬) প্রত্যেক বিষয়ের পাঠক্রমে বিষয়টি শিখনের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির সাধারণ ইঙ্গিত সন্নিবেশিত হয়েছে।

(প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস কমিটির প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে।)

যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার শিশুসাহিত্য হিসাবে 'সহজ পাঠ'কে মূল্যায়ন করতে বসেন নি সে কারণে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষানুরাগীদের কাছে আবেদন শিশুসাহিত্যের যে নিজস্ব বিজ্ঞান আছে তার নিরিখেই যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী চালু হ'তে যাচ্ছে তাকে এবং রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'কে বিচার করতে হবে—কোন ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নয়।

শিশুসাহিত্য না শিশুশিক্ষা?

কেতকী বিশ্বাস

'সহজপাঠে'র কথা মনে হলেই যে ছবিটি স্বাভাবিকভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি এরকম—৫ থেকে ৭ বৎসরের একটি শিশু চোখ বন্ধ করে দুলে দুলে পড়ছে,—"রাম বনে ফুল পাড়ে, গায়ে তার লাল শাল," বা "উস্রি নদীর ঝরণা দেখতে যাব দিনটা বড় বিশ্রি......সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র যাবে আমাদের সঙ্গে উস্রির ঝরণায়,"—ইত্যাদি ইত্যাদি। চিত্রকল্প মনোরম সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি ওই শিশুকে 'সহজপাঠ' থেকে একটা গল্প বলতে বলুন, সে তৎক্ষণাৎ গড় গড় করে মুখস্থ বলে যাবে। আসল তফাৎটা এখানেই।

'সহজপাঠ' শিশুসাহিত্য হিসাবে অতুলনীয়। ছন্দমাধুর্যে, ধ্বনি-বিন্যাসে, ভাবের সহজ এবং সপ্রতিভ অভিব্যক্তিতে 'সহজপাঠ' শিশু-মনকে অভিভূত করে। শিশুমনের কল্পনার উন্মেষ ও সম্প্রসারণে 'সহজপাঠ' অদ্বিতীয়। স্মরণপ্রক্রিয়াকেও 'সহজপাঠ' সাহায্য করে। কিন্তু শিশুসাহিত্য এবং শিশুশিক্ষা এক জিনিস নয়। যে 'চিন্তা' রবীন্দ্রনাথকে 'সহজপাঠ' প্রণয়নে অভিলাষী করেছিল, সেই চিন্তাই পরিলক্ষিত হয় বর্তমান সিলেবাস কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীতে। উভয়ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যটা একই—শিশুকে সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে তার পাঠ্যবিষয়ে আকৃষ্ট করা, এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সাবলীল করা। লক্ষ্য এক হলেও 'সহজপাঠ' সার্থক শিশুশিক্ষার বই হয়ে ওঠে নি, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করতে পারেন নি। 'সহজপাঠে' শিশুর মনকে সক্রিয় করে তোলার কোন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। সেদিক থেকে বর্তমান সিলেবাস কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে স্বীকার করতেই হবে। যাঁরা 'পিতৃদ্রোহিতা'র প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা ভেবে দেখবেন পিতার অনুসৃত পথে পুত্রের অধিক অগ্রগতিকে 'পিতৃদ্রোহিতা' বলা যায় কি না!

আমার মনে হয় সমালোচকরা 'সহজপাঠে'র ব্যাপারটাকে আলাদা করে দেখছেন। কিন্তু তারা যদি কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীর পিছনে সঠিক চিন্তাকে অনুধাবন করতে প্রয়াসী হতেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচীটা ভাল করে পড়তেন তাহলে হয়তো আসরে নামতেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁরা জিনিসটাকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণ হিসাবে নিচ্ছেন এবং সেইভাবেই প্রচার করছেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল, যে কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীর সমর্থক যারা, (যেমন আমি) রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় তাদের এতটুকু ঘাটতি নেই। রবীন্দ্র-নাথকে স্বীকার করতে কোনরকম ভাবাবেগের প্রয়োজন হয় না। আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের স্থান তথাকথিত ভাবাবেগ, অন্ধতা বা চক্ষুলজ্জার ঊর্ধ্বে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এখন আসল কথায় আসা যাক। শিশুসাহিত্য ও শিশুশিক্ষা এক জিনিস নয়। শিশুসাহিত্য শিশুর মনকে যে অনির্বচনীয়, অব্যক্ত ভাল লাগার রাজ্যে নিয়ে যায়, শিশুশিক্ষা সেই রাজ্যকে কায়েম করতে সহযোগিতা করে, শিশুর অন্তর্নিহিত (inherent) সুপ্ত (dormant) শক্তি ও গুণের বিকাশ ঘটিয়ে। শিশুসাহিত্য শিশুর কল্পনাকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সাহায্য করে। সৌন্দর্য ও রুচি-বোধ জাগ্রত করে। শিশুশিক্ষা তাকে পরিচিত করে পার্থিব পরি-বেশের সঙ্গে। ব্যবহারিক জীবনে শিশুকে অভ্যস্ত করে তোলে এবং সময়োপযোগী মানসিক গঠনে সহযোগিতা করে। এদিক থেকে শিশুশিক্ষায় কোনরকম বিশেষীকরণ বা বিষয়ের পৃথকীকরণ না থাকাই সঙ্গত।

যাইহোক শিশুশিক্ষার বিষয়টাকে আমরা দু'ভাবে নিতে পারি। সাঙ্গীকরণ (adjustment) [দৈহিক, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক] এবং নিয়ন্ত্রণ (direction) [ভিতর এবং সাধারণভাবে], এই দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর মানসিক গঠন অনুযায়ী বেড়ে উঠতে সাহায্য করা বা তার ভিতরকার সুপ্ত গুণাবলীর সম্যক্ বিকাশ ঘটানই শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে সব থেকে আগে প্রয়োজন শিশুর সক্রিয়তা (দৈহিক এবং মানসিক)। শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় শিশুর কোন ভূমিকা আছে অতীতে স্বীকার করা হত না। কিন্তু শিক্ষাগ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে ইউ রোপের বিভিন্ন অংশে এই বিষয়ে শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ রুশোই (Jean Jacques Rousseau) স্পষ্টভাবে শিশু-কেন্দ্রিক (child-centric) শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবেন। শিশুকে শিশু হিসাবে দেখবার স্বপক্ষে ছিলেন তিনি। (Child is a child, before a man, or child is not a miniature adult.) পেস্টালোজিও (Johann Heinrich Pestalozzi) বলেন শিশুরা চারাগাছের মত। অধিক যত্নের ফলে যেমন পাতিলেবু গাছে কমলা ফলে না তেমনি শিক্ষার প্রকারভেদে শিশুর গুণগত পরি-বর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। অরবিন্দও বলে গেছেন শিক্ষক শিশুর সাহায্যকারী মাত্র, "হুকুমনামার সহায়" নয়। (Teacher is the helper and guide, not a task-master) রবীন্দ্রনাথ নিজেও শিক্ষার কথা ভেবেছেন বারে বারে। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের সাঙ্গীকরণ বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথাও আমরা জানি।

এইখানে একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া প্রয়োজন। শিশুর আনন্দের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। একজন পরিপূর্ণ মানুষের আনন্দের উপকরণ যোগাতে সমগ্র নন্দনতত্ত্ব নিঃশেষিত হতে পারে কিন্তু শিশুর আনন্দ অতি সামান্যই। শিশুরা এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নূতন, এই পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কেই তার অপরিসীম কৌতূহল, আর সেই কৌতূহল নিবৃত্তেই তার সব থেকে বেশি আনন্দ। এই সময় তার মানসিক গঠন যেমন সরল থাকে তেমনি তার আনন্দ বেদনাও (শিশু বলতে ৫—৮ বৎসরের মধ্যে)। ব্যাপারটা মূর্ত হয়ে ওঠে যদি আমরা শিশুদের খেলার উপকরণগুলি খেয়াল করে দেখি।

শিশুশিক্ষার পাঠ্যসূচী হবে শিশুর মনে প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে কৌতূহল উদ্দীপক এবং সরলভাবে সেই কৌতূহল নিবৃত্তকরণের সহায়ক। এক কথায় শিশুশিক্ষার পরিবেশ, পরিমণ্ডল ও পাঠ্যসূচী এমন হওয়া উচিত যাতে করে শিশু প্রশ্ন করতে শেখে, চিন্তা করতে শেখে এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে

নিজের প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করতে পারে। পাঠ্যসূচীর বিষয়-বস্তু বর্ণনামূলক হওয়া যুক্তিযুক্ত।

এবার আসা যাক ভাষাশিক্ষা প্রসঙ্গে, শিশুর ভাষা প্রধানতঃ কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নয়। এই শিশুর জগৎ, জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি এবং নিজেকে চিনবার ভাষা, শিশুর আত্মবিকাশের ভাষা। শিশুর ভাষাশিক্ষা এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে করে সে নিজের কথা নিজের মত করে বলতে পারে। তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কল্পনার কথা সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারে। এদিক বিচার করলে 'সহজপাঠ' শিশুর ভাষাশিক্ষার সহায়ক নয়। 'সহজ-পাঠে'র ভাষা প্রধানতঃ ভাবের ভাষা। এই ভাষা শিশুর মনকে আচ্ছন্ন করে বা দোলা দেয়, কিন্তু এই ভাষাকে শিশু তার নিজের করে ভাবতে পারে না। তাই সহজপাঠের গল্প থেকে কোন প্রশ্ন করলে সে সহজপাঠের ভাষাতেই উত্তর দেয়।

'সহজপাঠ' শিশুকে সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়াতেও সাহায্য করে না। কারণ সহজপাঠের গল্পগুলি প্রধানতঃ কল্পনাশ্রয়ী। অবাস্তব বলা যায় কিনা জানি না কিন্তু এর বাস্তবতার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতার অনেক পার্থক্য। কোন শিশু যদি প্রশ্ন করে—সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র কে?' 'সংসারবাবুর বাসা কোথায়?' 'বেণী বৈরাগী কেমন লোক?' 'পেঁচার ডাক কেমন?' আমরা সদুত্তর দিতে পারি না।

শিশুপাঠ্য বইগুলিতে চিত্রমালার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। ছবির সাহায্যেই শিশুকে তাড়াতাড়ি শেখানো যায়। কিন্তু দেখতে হবে ছবিগুলি যেন সরল, বস্তুমূলক হয়। ছবিগুলি দেখেই যেন সে চিনতে পারে বা তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে পারে। অথবা যে জিনিস সে দেখেনি সে সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারে। কিন্তু 'সহজপাঠে'র চিত্রগুলিকে আমরা এই পর্যায়ে ফেলতে পারি না। সবসময় চিত্রগুলিকে দেখে তারা চিনে উঠতেও পারে না যে কোন্ জিনিসের ছবি। যার ফলে তারা যখন ছবিগুলিতে রং করে (শিক্ষকের কথা অনুসারে) তখন প্রায়শঃ দেখা যায় যে রং দিয়ে তারা এক-একটা কিম্ভূতকিমাকার তৈরি করছে। সেদিন কোন একটা দৈনিকে একটা চিঠি পড়ছিলাম। ভদ্রলোক লিখেছেন যে যদি 'সহজপাঠ'কে অপসারণ করতে হয় তো রামায়ণ মহাভারতের গল্প-গুলিকেও অপসারণ করতে হয়। (যদিও আমি নিশ্চিত নই, 'সহজ-পাঠে'র শিশুদের রামায়ণ মহাভারতের গল্প পাঠ্য আছে কিনা!) যাইহোক মহাভারত বা রামায়ণের গল্পগুলি মূলতঃ রূপকধর্মী। মহাকাব্য হিসাবে এই গল্পগুলি মনুষ্যসমাজের চিরন্তন সত্যকেই মূর্ত করে। এই গল্পগুলি শিশুর চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, শিশুকে উৎসাহিত করে, মহৎ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করে। এই-ভাবেই শিক্ষণপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ (as direction) হিসাবে কাজ করে।

অবশেষে আমি আমার শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতবর্গ ও সুধীজনকে অনুরোধ করব যে তাঁরা শুধুমাত্র আবেগের দ্বারা যেন পরিচালিত না হন। শিশুশিক্ষার ব্যাপারটা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানভিত্তিক হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। কালোকে কালো, সাদাকে সাদা, রাতকে রাত, দিনকে দিন, ক্ষেতমজুরকে ক্ষেতমজুর, বর্গাদারকে বর্গাদার, মহা-জনকে মহাজন, সুদখোরকে সুদখোর হিসাবে চিনতে দেওয়া বা সাহায্য করাটা কোন অপরাধ হতে পারে না। বর্তমান শিশুরা যদি আগামী সভ্যতার ধারক ও বাহক হয় তবে, শুরুটা শুরু থেকেই হওয়া ভাল নয় কি? 'জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা' বলতে আমার মনে হয় এই জিনিসটাকে বোঝানো হয়েছে।

তারার গ্রহণ

অধ্যাপক সত্য চৌধুরী

১৯৮০ সালের ৬ই অক্টোবর ভারতবর্ষের আকাশে তারার গ্রহণের একটি বিরল ঘটনা ঘটেছে। সূর্যকে আড়াল করার ফলে চাঁদের ছায়ায় পৃথিবীর স্পর্শিত অঞ্চলে যেমন সূর্যগ্রহণ হয় ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় একই নিয়মে এসএও ১৮৭৩৫৮ নামক একটি অনুজ্জ্বল তারাকে ইউনোমিয়া নামের একটি গ্রহাণু অল্প কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীর কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। ফলে তারাটিতে গ্রহণ লাগে। এই তারার গ্রহণ সম্পর্কে রয়াল গ্রিনিচ অবজারভেটরি অনেক জটিল গাণিতিক হিসাব নিকাশ করে একটা পূর্বাভাস দিয়েছিল। সেই পূর্বাভাস অনুসারে গ্রহণের আবছা চলমান ছায়াঞ্চল সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিট ২১ সেকেন্ডে বোম্বাইয়ের কাছে ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করার কথা। ছায়াঞ্চলের পরিসর আনুমানিক ৪০ মাইল। এই ছায়া মধ্যভারত অতিক্রম করে বিহার ছুঁয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছানোর কথা ছিল সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে। ছায়ার গতিপথে ছিল বোম্বাই, ঔরঙ্গাবাদ, নাগপুর, রায়পুর, হাজারিবাগ, রাঁচী, মালদহ, গৌহাটি, ডিব্রুগড় প্রভৃতি শহর, পরে ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে ছায়াঞ্চলের চীনের মাটিতে প্রবেশ করার পূর্বাভাস ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শহরগুলিতে সূর্যাস্ত অপেক্ষাকৃত দেরীতে হয় বলে পূর্বাঞ্চল থেকে এই ছায়া পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশী। অন্ধকার এবং নির্মেঘ আকাশ এ ধরনের গ্রহণ পর্যবেক্ষণের আবশ্যক শর্ত।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে সেদিন মালদহে ছিল সৌরজগতের এই বিরল ঘটনাটি পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ।

বাঙ্গালোর জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রের ইউরেনাস গ্রহের বলয় আবিষ্কারক প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একদল গবেষক এই গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য মালদহ কলেজ মাঠে একটি অস্থায়ী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বসিয়েছিলেন। এই গবেষকদলে ছিলেন বাঙ্গালোরের মিঃ চন্দ্রমোহন, কলকাতার পজিশনাল অ্যাসট্রোনমি সেন্টার ও কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্সের এ কে ভাটনগর, স্বপন শূর প্রমুখ। তাঁরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গাজোলের আদিনা মসজিদ, মালদহ কলেজ এবং ফরাক্কা থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। মালদহ কলেজ ছিল মূল কেন্দ্র। সেখানে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি বৃহদাকার টেলিসকোপ বসানো হয়েছিল।

গ্রহাণু

বোড-টিসিয়াস সূত্র অনুসারে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে সূর্য থেকে ২৭ কোটি মাইল দূরে একটি গ্রহের অবস্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বহুকাল আগেই করা হয়েছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থানটি ফাঁকা বলেই মনে হ'ত। অবশেষে ১৮০১ সালে সিসিলির বৈজ্ঞানিক পিয়াজী মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে একটি গ্রহের সন্ধান পান। মাপজোক করে দেখা গেল গ্রহটি অতিশয় ক্ষুদ্র, ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল। রোমক দেবতার নাম অনুসারে গ্রহটির নাম দেওয়া হ'ল সিরিস। পরে গভীরতর অনুসন্ধান চালিয়ে সিরিসের কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে আরও অনেক ছোট ছোট গ্রহ আবিষ্কার হতে লাগল। আচরণে গ্রহের মত হলেও আয়তনে এরা খুব ক্ষুদ্র—তাই এদের নাম হ'ল **গ্রহাণু** বা **গ্রহকণা**। সংখ্যায় এরা হাজার হাজার, হাজার ত্রিশেক হতে পারে। গ্রহাণুপুঞ্জ হ'ল এদের সম্মিলিত নাম। সবচেয়ে বড় ৪টির নাম—সিরিস, ভেস্টা, জুনো ও পালাস। বাকী গ্রহাণুগুলির ব্যাস ১০০ মাইল থেকে শুরু করে ১ মাইল পর্যন্ত। অনেকের ব্যাস আরও কম। এখনো পর্যন্ত ২ হাজার গ্রহাণুর মোটামুটি পরিচয় পাওয়া গেছে।

গ্রহাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, কারো কারো কক্ষপথ খুব বেশী উপবৃত্তাকার। উপবৃত্তাকার পথে ঘোরার ফলেই ঈরস নামক ১৬ মাইল ব্যাসের গ্রহাণুটি কখনো কখনো পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে। গ্রহাণুদের নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই। কেউ গোলাকার, কেউ শঙ্কু আকৃতির, আবার কেউ বা নোড়ার মত। কোন বড় গ্রহ বা উপগ্রহের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে গ্রহাণু কক্ষচ্যুত হয়ে সেই গ্রহ বা উপগ্রহের গায়ে আছড়ে পড়তে পারে। মঙ্গল বা চাঁদের দেহস্থিত খাদগুলি গ্রহাণুদের আঘাতের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। পৃথিবীর বুকেও বহু গ্রহাণু আছড়ে পড়েছে। আমেরিকার আরিজোনা খাদ (বর্তুলাকার মুখের ব্যাস ১ মাইল) এবং ভারতবর্ষে পুণার নিকটবর্তী লোনার খাদ (মুখের ব্যাস ৬০০ ফুট) পৃথিবীর বুকে নেমে আসা গ্রহাণুদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইউনোমিয়া

গত ৬ই অক্টোবর এস এ ও ১৮৭৩৫৮ তারার গ্রহণ সৃষ্টিকারী গ্রহাণুটির নাম ইউনোমিয়া। ১৯৫১ সালে এই গ্রহাণুটি আবিষ্কৃত হয়। গ্রহ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা পরিমাপক এককের হিসাবে ইউনোমিয়ার উজ্জ্বলতা ৭·৪, এর আকৃতি গোলাকার নয়, সম্ভবতঃ নোড়ার মত। ইউনোমিয়ার সঠিক ব্যাস এখনো অজ্ঞাত। অবশ্য উজ্জ্বলতা থেকে গ্রহের আয়তন নির্ণয়ের একটা পদ্ধতি আছে—তবে পদ্ধতিটা নির্ভরযোগ্য ও নিখুঁত নয়। স্থূল হিসাবে ইউনোমিয়ার ব্যাস ১৬০ থেকে ১৭০ মাইলের মধ্যে হতে পারে বলে অনেকে আন্দাজ করেন। সারা বিশ্বের জ্যোতির্পদার্থবিদদের মধ্যে এই গ্রহাণুটির সঠিক ব্যাস মাপার জন্য গভীর আগ্রহ আছে। ৬ই অক্টোবর এর ব্যাস মাপার দুর্লভ সুযোগটি উপস্থিত হয়েছিল। ইউনোমিয়ার আড়ালে এস এ ও ১৮৭৩৫৮ তারার অন্তর্ধান এবং পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করা এবং গ্রহণের সময়টুকু নিখুঁতভাবে নির্ণয় করাই ছিল সেদিন গবেষকদের প্রধান কাজ। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই একটি গ্রহাণুর আয়তন ও আকৃতি সঠিকভাবে জানা সম্ভব। এই ধরনের গ্রহণ পর্যবেক্ষণের সুযোগ খুব কম পাওয়া যায়। তারার গ্রহণ পর্যবেক্ষণের ফলাফল থেকে শুধু গ্রহাণুর আয়তন আকৃতিই নয়, সৌরজগতের গঠন সম্পর্কেও বহু মূল্যবান তথ্য জানা সম্ভব।

পর্যবেক্ষণের ফলাফল

ইউনোমিয়ার আয়তন ১৬০/১৭০ মাইল ধরে নিয়ে রয়াল গ্রিনিচ অবজারভেটরি গ্রহণের আনুমানিক সময় এবং গ্রহণের এলাকা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু ইউনোমিয়ার ব্যাস সম্পর্কে উজ্জ্বলতা থেকে নিরূপিত হিসাবটি যদি একেবারেই বেঠিক হয় এবং ব্যাস যদি ৪৫/৪৬ মাইলের কম হয় তাহলে তারার গ্রহণের ছায়ার পক্ষে পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছানর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বরং গ্রহণের ফলে যে ছায়াশঙ্কু সৃষ্টি হয় তার শীর্ষবিন্দুটির পৃথিবীপৃষ্ঠের বহু উপর দিয়ে আকাশ পথে চলে যাওয়ার কথা। ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় পর্যবেক্ষণের সময় শক্তিশালী টেলিস্কোপের চোখে পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন ছায়া ধরা পড়ে নি। গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ডঃ ভট্টাচার্য মালদহ কলেজ প্রাঙ্গণে টেলিস্কোপের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাথমিকভাবে এই সিদ্ধান্তই করলেন যে, ইউনোমিয়ার ব্যাস কোনমতেই ৪৫/৪৬ মাইলের বেশী নয়। তাহলে ইউনোমিয়ার সঠিক ব্যাস কত? প্রশ্নটি বৈজ্ঞানিকদের সামনে এখনো খোলা থাকলো।

গল্প

মইশাল বন্ধু

কল্যাণ দে

মাঠের শেষে নদী।

নদীর নাম বালাসন। নদী পেরিয়ে তরাই-এর নিবিড় অরণ্য। শাল, শিশুগাছের শাখায় শাখায় কাঁধে কাঁধ হাতে হাত।

বৈশাখের শীর্ণ নদী। বালির আসন পেতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে যেন ধ্যানমগ্ন। নদীর এপারে বিস্তীর্ণ মাঠের ধারে তারাবাড়ি গ্রাম। তারাবাড়ি থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেইট প্রায় আড়াই মাইল পথ; কখনো কাঁচা কখনো পীচ ঢালা।

তারাবাড়ি গ্রামের জোতদার প্রহ্লাদ সিংহ। তাঁরই বাড়ির মইশাল দীনকাটু সিংহ।

দীনকাটু'র ত্রি-সংসারে কেউ নেই। জন্মেছিল ধুপগুড়ির কমলাই নদীর ধারের কোনো এক গাঁয়ে। ছোটবেলায় বাপ-মাকে হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল প্রহ্লাদ সিংহের বাড়ি। সেই থেকে এখানে আছে। ওর বয়স এখন চব্বিশ। ঐ তরাই-এর নিবিড় অরণ্যের পুরানো শালগাছের মতই পুরুষ্ঠু ওর শরীর। মোষ আর গরুর দেখাশোনা ওই করে বরাবর।

জোতদার বাড়ির দোতলা বাড়ির একতলার বারান্দায় এক ছোট্ট ঘরে ওর একলার সংসার। ধোকুরার বিছানায় ময়লা কিছু কাঁথা। একটা কাঠের বাক্স। একটা খাটো ধুতি, একটা পিরান, একটা গামছা, ভাঙা আয়না, কমদামী চিরুনী—এই তার সম্বল। আর আছে একটা আড় বাঁশের বাঁশী।

বৈশাখ মাসের সকাল।

এক টুকরো মেঘ পাকা করমচার মত সূর্যটাকে হনুমানের মত বগলদাবা করে ফেলেছে।

ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেছে একটু। গোয়ালঘরে পবনা, আন্ধারু প্রিয় দু'টি মোষ ডাকছে।

চোখ কচলে নিয়ে দীনকাটু হেঁকে উঠল, রইস রে রইস মুই যাছো।

জবাব এল, অ্যাঁ—এ—এ—এ।

তাড়াতাড়ি কুয়োয় গিয়ে মুখ-চোখ ধুয়ে নিয়ে গোয়ালঘরে চলে এল। কালো কুচকুচে কালবৈশাখী মেঘের মত দু'টি তাজা মোষ ওকে দেখে খুশীতে ডেকে উঠল।

দেবী প্রতিমার গায়ে চকচক্ করা গর্জন তেলের মত চকচকে গায়ে হাত বুলিয়ে পবনার চোখে চোখ রেখে এক স্বর্গীয় ভাষার কথা বলতে লাগল দীনকাটু।

পবনাকে আদর করছে দেখে আন্ধারুর মনে হিংসে জাগল। সে শিং দিয়ে আলতো করে দীনকাটুর পিঠে খোঁচা মারল। দীনকাটু পবনাকে বলে উঠল, দ্যাখোছিস্ সতীনের আগ? মুই কাক্ বেহা করিম? তোক্ না আন্ধারুক্? হেসে বলে ফেলল সে, না হায় গে, না হায়। মুই দোনোজনাকে বেহা করিম। কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দমকা বাতাস দীর্ঘশ্বাসের মত। সে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির অ্যালবাম উল্টে গেল। বেরিয়ে এল কিছু ছবি।

বালাসন নদীর ওপারে রাজবংশীদের গ্রাম। সে গ্রামের এক গরীব চাষীর মেয়ে টিয়া।

টিয়ার শরীরে সবুজ ঘাসের চিকন আস্তরণ। চোখের কোণে তরাই-এর অরণ্যের নিবিড় প্রশান্তি। বুকের মধ্যে পাংখাবাড়ির পাহাড়ী চুড়া। কেমন যেন হাড়িয়ার নেশার মত নেশা লাগায় টিয়া।

মোষ চরাতে গিয়ে জঙ্গলের ভেতর হঠাৎ একদিন দীনকাটু চীৎকার শুনতে পেল। কায় ছন্ মোক্ বাঁচান—বাঁচান। হাতের লাঠিটা নিয়ে বাইশ বসন্তের জোয়ান মোষের মত শক্তিধর দীনকাটু ছুটে গেল চীৎকারের উৎসস্থলে।

একটি কিশোরী মেয়েকে ঘিরে ধরেছে এক ঝাঁক মৌমাছি। কি করবে এক মুহূর্তে ভেবে নিয়ে ছুটে গিয়ে কিশোরীকে কাঁধে তুলে চোঁ—চোঁ—ধাঁ—এক দৌড়। বালাসনের জলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলে নামার আগে নামিয়ে দিল কিশোরীকে। দু' একটা মৌমাছি তখনো এসেছিল পেছন পেছন ধাওয়া করে। তা দেখিয়ে কিশোরী চীৎকার করে উঠল, অ্যালহায় ও যায় নি গে যায় নি। সকালবেলার সূর্য উঠল যুবকের মুখে। সে বলে উঠল, ধ্যাৎ, হাতাস খাছিস ক্যান্! মুই তো ছু। এবারে রঙ লাগল কিশোরীর মুখের আকাশে। বলল, কায় তুই? তুই কি মরদ?

এতক্ষণে সামলে নিল দীনকাটু। একটা মেয়ের সাথে আগে তো সে কখনো এমন করে কথা বলে নি। তাই লজ্জা পেল। মাথা নীচু করে পা বাড়াল সে মোষের খোঁজে।

ভয় তখনো কাটে নি। কিশোরীর গলায় নামল সন্ধ্যাবেলার বাঁশ বাগানের ভয়ার্ত ভাব। চেঁচিয়ে বলে ফেলল, তোমহা কায় মুই জানোনা। দোহাই লাগে বাপ পঞ্চানন ঠাকুরের। মোক্ ছাড়িয়া তোমহা চলিয়া যান্ না।

কি খেয়াল চাপল দীনকাটুর মাথায়। কপট গাম্ভীর্যে বলে বসল, মোর কাম ছেগে পরের বেটি। মুই যাছো। মোর নাম দীনকাটু সিংহ। থাকে ছু তারাবাড়ির গিরির ঘর।

—মুই পাথরঘাটার সর্প সিংহের বেটি টিয়াশ্বরী। জঙ্গলৎ আইচ্চিনু খড়ি লুড়াবার। মোর দেহাৎ মাছির বিষ। মোক্ কি ঘর নেগায় দিবার পারিস?

—ঘরৎ গেলে মানুসি কি কবে?

—কায় কি কবে হাতাস খাছিস ক্যান্? আয় দেখি, কোন্ঠে ছে তোর ভইস।

—ক্যানে, ভইস দিয়া তোর কি হবে গে গাভুর মাইয়া?

—মুই ভইসের পিঠৎ চাড় ঘরৎ যাম। সেথা মোর ভেল্লা কাম পড়িয়াছে। মা মোর আন্ধা, দেখির না পায়। বাপ্ গেইছে হালবাড়ি হাল জোতিবার। ছোটো ভাইডা গেছে বাপের তানে পান্থা ধরি।

দূর থেকে ডেকে ওঠে পবনা, আন্ধারু।

—হুইযে পরের বেটি ডাকাছে মোর পবনা, আন্ধারু।

—বা, বা, ক্যামন সোন্দর নাম রাখেছিস্ তোর ভইসের নাম। বলেই এক দৌড়। দৌড়ে গিয়ে পবনার শরীরে হাত বোলাল টিয়া।

এক লাফে চড়ে বসল পবনার পিঠে। পবনাও হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে নুতন সওয়ারী নিয়ে চলল নদীর ধার ধরে।

—হেই টিয়া, ভইস লেগাইস্ না? ঘরৎ যাইয়া ছেকিবা হবে।

বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জিব ভ্যাংচিয়ে টিয়া জবাব দিল, তুই কচু খাইস ঘরৎ যাইয়া। মুই যাছু ঘর।

কি আর করে দীনকাটু। সে-ও গিয়ে লাফিয়ে উঠল আন্ধারুর পিঠে।

আগে পিছে চলল দু'টি মোষ নদীর ধারের পাতলা কাশ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। দূরে শোনা গেল ভাওয়াইয়া গান।

ধিক, ধিক, ধিক মইশাল রে
মইশাল ধিক গাবুরালী
এ হ্যানো সুন্দর নারী,
ক্যামনে যাইবেন ছাড়ি। মইশাল রে॥

* * * *

ভার বান্ধ ভাড়াটি বান্ধ হে
মইশাল বান্ধ মাথার কেশ
আজি বা ক্যানে দেখং মইশাল
ছাড়িলেন আমার দ্যাশ। মইশাল রে॥

—ও মইশাল, শুনেছিস্ গাহান?

—তোর কোনো লাজ শরম লাই রে টিয়া। তোর বাপো মা ক্যান্ দেয় না বেহা এতডা গাভুর বয়সৎ!

খিলখিল করে বালাসন নদীর মত চঞ্চল স্বরে হেসে উঠে টিয়া বলে বসে, মুই তরাই-এর মাইয়া। জঙ্গলের লাখান মোর মন, হেই—এ—ত্ত বড়—অ—; লাজ? লদীর কি কোনো লাজ ছে? অয় কেমন করি বয়আ যাছে কোন্ সে দূরের নাম না জানা দ্যাশের তানে কায় জানে!

—তুই তো ভালয় কাথা কবার পারিস!

—করার পারিম্ নি! খগেন দা যে কলেজ পড়ে। অয় মোক এ গিলা শিখাইছে।

—খগেন রায়? হামার রাজবংশী ভাষাৎ যায় নেডিওৎ গাহান গাছে?

বাড়ির কাছাকাছি এসে টিয়া হঠাৎ মোষ থেকে নেমে পড়ল। চোখের কোণে পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে বলে গেল, ফের দেখা হবে লদীর পার জঙ্গলৎ, আসিস্ দেই?

চলে গেল টিয়া।

জীবনের কোন্ নিভৃত মন্দিরে বেজে উঠল যৌবনের ঘণ্টা। কিসের এক নেশার টানে মনটাকে জড়িয়ে নিয়ে দীনকাটু ফিরল জোতদার বাড়ি।

দিন যায়। সময়ের শ্লেটে নানান দাগ কেটে বছর ঘোরে। বালাসন নদীর ধারে জঙ্গলের নিভৃত কোণে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে দুটি হৃদয় সরব হয়ে উঠে। সৃষ্টির প্রথম দিনের মানব-মানবী যেন ফিরে পেয়েছে সে বন। বাতাস ওদের কথা বহন করে নিয়ে যায়। পাহাড় প্রতিধ্বনি করে তা ফিরিয়ে দেয়। দিন যায়। দিন যায়।

প্রকৃতির কোলে মোষ ছেড়ে দিয়ে টিয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে দীনকাটু। তার বাঁশের বাঁশীতে শোনা যায় ভাওয়াইয়া গানের সুর।

গাও তোলো, গাও তোলো
মইশাল বন্ধু রে॥

গাও তোলো, গাও তোলোরে মইশাল
গাও তোলোরে ডাঙিয়া
ওরে কোন্ বা চোরায় নিয়া যায় মোক
চুরি করিয়া রে।
মইষ চরান্ মোর মইশাল বন্ধু
কোন্ বা চরের মাঝে
ওরে এলাও ক্যানে ঘাণ্টির ড্যাং
মুই না শোনং ক্যান রে॥
মইষ দোয়ান মোর মইশাল বন্ধু
গামছা মাথায় দিয়া
ওরে মোর নারীটার মনটায় কয়
মুই পরু ধরুং যায়া রে॥

টিয়ার চোখ বেয়ে নামে পাহাড়ী ঝোরার জল। টিয়া কেঁদে ওঠে।

—কান্দিস ক্যানে টিয়া! চমকে ওঠে বলে দীনকাটু।

—তুই এমন ক্যানে দীনকাটু? তোর বাঁশী শ্যামের লাগান। মোর মন পাগল করি দেয়। মুই ঘরৎ রবার পারু না।

দীনকাটু গভীর আবেগে টিয়াকে কাছে টেনে নেয়। বুড়ো বট-গাছে ডেকে ওঠে কোকিল।

টিয়ার অন্ধ মা ওর কথাবার্তায় লক্ষ্য করে নুতন সুর। ওর খগেনদাও আর খুঁজে পায় না কিশোরী মেয়ের সেই আগের জিজ্ঞাসা-ভরা প্রশ্নের রেশ।

—হ্যাঁরে টিয়া, কি হইছে তোর? এমন করির কি ভাবেছিস? দিন দিন তোর এত কিসের টান খড়ি লুড়াবার? নুকাইস ক্যান?

—না খগেন দা। মোর কোনো নি হায়।

—লাজ করেছিস ক্যান? কাকো কি মন ধরিছে?

—কিযে কহছিস তুই! তোক্ ছাড়ির কাকো না চাহু মুই। তুই যে মোর দাদার দাদা।

—হ্যাঁ বুঝেছু। রঙ লাগিছে তোর মনৎ।

টিয়া আর চেপে রাখতে পারে না। এসব বোধহয় চেপে রাখাও যায় না। এ যে পাহাড়ের ভেতরের জমা জলের স্রোত। বাইরে বেরুবার জন্য সদাই চঞ্চল।

সব খুলে বলে সে। সেদিনের সেই মৌমাছি থেকে বেঁচে আসা, জঙ্গলের নিভৃতে মোষের পিঠে চড়ে ঘর বাঁধবার অভিসার। বালা-সনের উন্মুক্ত বুকে জলবিহার, দীনকাটুর বাঁশী শুনে উতলা হয়ে যাওয়া, কিছুই বাকী রাখল না। পরিশেষে কান্নাভেজা গলায় বলে ফেলে, জানিস খগেন দা, অয় মোক্ বেহা করির চায়। অয় পরের ঘরের মইশাল। মোক্ বেহা করিলে যে অর পণ দিবার নাগিবে। বাপক তুই তো চিনিস। বাপ কি মোর পণ ছাড়ির মোর বেহা দিবে? অয় কোন্ ঠে পাবে এত্‌লা টেকা! চোখে টিয়ার বর্ষার বৃষ্টি।

—তুই ভাবিস ক্যানে টিয়া। তুই মোর বইন, তোর খুশীর লাগির, তোর ঘর সংসারের তানে মোর কি কোনোই দায়িত্ব নাই? কত নাগিবে?

—দুইশো টেকা নাগিবে। তুই, তুই দিবো খগেন দা? টিয়ার চোখে মুখে লাউ-এর আকশিতে ধরা কণ্ডির অবলম্বনের আশ্বাস পাবার আগ্রহ।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ। মুই দিম। যা কয়া আয়নে যায়া।

টিয়ার পায়ে বনের ছন্দ জাগল। গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে দৌড়ে চলল টিয়া।

বাঁশ বাগানের মধ্য দিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে নদীর ধারের কাশবনের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'ল তাদের সেই পরিচিত বটগাছের নীচে।

আপন মনে মগ্ন হয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে দীনকাটু। বাঁশীর সুর এমন করে কাঁদছে যে টিয়া ঠিক থাকতে পারল না। ভরা বর্ষার বালাসন নদীর কূলের শালগাছে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দীনকাটুর বুকে। এক হাতে বাঁশীটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। কান্নাঝরা গলায় বলে উঠল, তুই মোক্ খুউব ভালবাসিস না হায় রে দীনকাটু?

চোখের ভেতর স্বপ্ন—অথচ মুখের ভাষা যেন দূরের ঐ সাদা পাহাড়টার মতই দূরের, এমন স্বরে জবাব দিল দীনকাটু, ভালবাসার কি কোনো দাম ছে রে টিয়া? এ পিথিমিৎ যার টেকা ছে, অর সব ছে। দ্যাখিস না ক্যানে গিরির বেটা ভুবনক। কলেজৎ গিয়া বাঙালী চেংড়ি ক ভালবাসি বেহা করিছে। ওমার টেকা ছে তার তানে ওকিলের বেটি বেহা করির পারিছে। মুই? মুই তো গিরির বাড়ির মইশাল। বাপ নাই, মাও নাই। ঘর নাই, বাড়ি নাই। জমি নাই, জোত নাই। টেকা নাই—কোনোই নাই।

এবার টিয়া বলল, তুই ভাবেছিস ক্যানে? তোর মোর বেহা ঠিক হবে দেখে লিস।

—কেমোন করির?

—তোক্ ভাবির নি লাগে। মুই সব ঠিক করি ফেলাই ছু। খগেন দা টেকা দিবে।

এবার দীনকাটুর আগ্রহের বীজ চারা গাছের মত দুলে উঠল। বলল, ঠিক কহছিস তো টিয়া? কোন্‌দিনা যাম তোর বাপের লগৎ? আজি?

লজ্জার রঙ লাগল টিয়ার মুখে। জলদি করার কি কাম? যাইস না ক্যানে একদিন।

—ইডা কি কহছিস! দেরী ক্যানে? মুই অ্যালহায় যাম্।

—তোর খুশী।

টিয়া ছুটে চলল বাড়ির দিকে। ওর চোখে একটা ছোট্ট ঘর। মাথায় সিঁদুর। হাতে শাখা। হঠাৎ—বাপ্‌গে বাপ্—চীৎকার। পড়ে গেল টিয়া।

দূর থেকে দীনকাটু চেঁচিয়ে উঠল, কি হইছে রে টিয়া?

—মোক্ সাপে কাটিছে দীনকাটু। মোক্ সাপে কাটি—

—কি কহলো? সাপ? উন্মত্তের মত তীব্র বেগে ছুট্ লাগাল দীনকাটু। দৌড়ে গিয়ে দেখল একটা গোখরা সাপ জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

হায় বাপ্, কি হবে গে!

হঠাৎ একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে ভীষণ আক্রোশে সাপটাকে মারতে লাগল দীনকাটু। পেশীতে ওর জিঘাংসার স্রোত। নিরীহ সাপ পারবে কেন! সে তো এমনি কামড়ায় নি! শরীরে পড়েছিল চাপ তাই ফুসে উঠে ছোবল মেরেছিল।

সাপটাকে মেরেও শান্তি পেল না দীনকাটু।

এদিকে বিষ ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে। যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল টিয়া।

রাগের দেবী হুঁশ ফিরিয়ে দিলেন দীনকাটুকে। দ্রুত গামছা ছিঁড়ে টিয়ার হাটুতে বাঁধ দিল সে। কাঁধে নিয়ে এতদিনে সমস্ত লাজলজ্জা ত্যাগ করে ছুটে চলল টিয়াদের বাড়ি। টিয়াকে ওর বাপের কাছে পৌঁছে দিয়েই দীনকাটু ছুটল ওঝার বাড়ি।

এদিকে সর্প সিংহের চীৎকারে জেগে উঠল পাড়া। সবাই এল ছুটে। ছুটে এল খগেন রায়।

খগেন রায় এসে অর্ধ-চৈতন্য টিয়াকে জিজ্ঞেস করল, কোন্‌ঠে তোক্ কামড়াইছে রে টিয়া?

—কায়? খগেন দা?

—হ্যাঁ রে টিয়া, মুই।

—অয় কোন্‌ঠে গেইসে? মুই আর বাঁচিমনি খগেনদা। মরার আগৎ অর কোলৎ মাথা রাখি মরির পালে শান্তি পানু হয়। অক ডাকা না ক্যানে?

—অয় ওঝা আনির গেইসে। আসিবে অ্যালহায়।

টিয়ার বাপ, মা, ভাই সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ল। পাড়া-পড়শীরাও শোকে স্থির চিত্রের মত ইজেলে লগ্ন হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর ওঝা নিয়ে যখন দীনকাটু এল টিয়া তখন শেকড়-কাটা গাছের মত নেতিয়ে পড়েছে।

দীনকাটু প্রিয়জনকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে টিয়ার মত নরম শরীরটাকে কোলে নিয়ে হু-হু করে কালবৈশাখীর ঝড়ের বেগে কেঁদে উঠল।

পৃথিবীর নীলাকাশে যেখানে প্রতিনিয়ত পাখি ডানা মেলে, সে আকাশের নীলিমায় হঠাৎ কালো মেঘ এসে সমস্ত নীল রঙকে ব্লটিং কাগজ দিয়ে যেন চুষে নিল।

দীনকাটুর কোলে মাথা রেখে সবুজ রঙের টিয়ে পাখি যেন বিষের নীল রঙে রাঙা হয়ে ভালবাসার সবুজ দ্বীপের ঘাসে শেষ আশ্রয় নিল।

—দীনকাটু। অ—দীনকাটু। কোন্‌ঠে গেইল রে?

জোতদার প্রহ্লাদ সিংহের ডাকে দীনকাটুর তন্ময়তা ভাঙল। সে দ্রুত মোষগুলি নিয়ে গোয়াল ঘর ছেড়ে বাইরে এল।

—অ্যালহায় ও যাইসনি?

—যাছু গিরি।

পবনা, আন্ধারুকে নিয়ে দীনকাটু চলল বালাসন নদীর পারে। যেখানে বটগাছের নীচে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে আছে তার ভালবাসা। সেখানে গিয়ে মোষ ছেড়ে দিয়ে বাঁশীতে বাজাবে সুর—যে সুর বাতাসের দেয়াল ভাঙতে ভাঙতে অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরিয়ে দেবে—

জীবন, জীবন, জীবন বন্ধু রে
তুই মোক্ ছাড়িয়া গেইলে
আদর করিবে কায়
ও জীবন বন্ধু রে॥

বাজার বড় মন্দা

অমল চক্রবর্তী

বাজার বড়ই মন্দা।
বণিকের দাঁতের ধার বেড়ে চলে,
ছাপোষা মানুষ মগজ গুলে খেতে খেতে
হাঁ-মুখে এখন হাওয়া খায়,
হায়ের ফাঁকে ফাঁকে ত্রিভঙ্গ দাঁতের সারি
যেন ধ্রুপদী কত্থক।

বাজার বড়ই মন্দা।
বণিকী সভ্যতা সোনার গাড়ুতে জল ভরে মলত্যাগ করে,
উচ্ছন্ন মানুষ কুকুরকে শ্রেণীশত্রু ভেবে
আস্তাকুঁড়ের কুরুক্ষেত্রে গদা ঘোরায়,
পরণে দু'আঙুল নেংটি
বাকিটা স্বর্গীয় ঈশ্বর নিয়েছে।

বাজার বড়ই মন্দা।
জাহাজ তাই কুমারী মেয়ের মত বন্দরে ভেড়ে,
ক'মাস পরে গর্ভভারে হেলেদুলে চলে যায়
জামাতার আদর খেয়ে বাপের দেশে,
গর্ভে তার কোটি কোটি মানুষের দলিত পিণ্ড।
ফেরীঘাটে অন্ধকারে দেশজ যুবতী শোয় মাত্র পাঁচ টাকায়।

বাজার বড়ই মন্দা।
বণিকের রাজদণ্ড প্রহরীর হাতে
লৌহদণ্ড বংশদণ্ড হয়ে উঁচিয়ে থাকে।
পোড়াবিত্ত মানুষ, চৈতন্য এদেশী দেবতা,
তাই ট্রেনে বাসে ট্রামে পথে ঘুরে ঘুরে ঘরে ফেরে রাতে,
ক্লান্ত উপবাসী তবু অভ্যস্ত ভালবাসা সংসার বাড়ায়।

বাজার বড়ই মন্দা।
গলতে গলতে এক রুপাইয়া মাত্র উনিশ পয়সা।
ওয়েজ ফ্রিজ? কিংবা প্রফিট ফ্রিজ?
প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন? চুলোয় যাক।
বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জিন্দাবাদ!
মেট্রোতে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা ঘামছে
'রতির্নিবেদনম' ছবিতে,
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংস্কৃতির ঐক্য চাই—বন্ধুগণ......
অবশেষে সন্ধ্যা নামে কাকের কলহে।

বাজার বড়ই মন্দা।
যার আদর্শ আছে ট্যাঁকে পয়সা নেই,
যার পয়সা আছে মগজে কুৎসিৎ লোভের ঘা,
শিশুর সামনে চিতায়-চাপানো ভবিষ্যৎ,
তাজা যৌবনের সামনে মসৃণ অনন্ত গহ্বর,
বৃদ্ধের সামনে শাদা দেয়াল, পেছনে ধূসর স্মৃতি,
নারীর সামনে রন্ধন ও গর্ভধারণ,
পুরুষের সামনে আস্ফালন ও পতন।
আবার ভোর আসে
পুঁজির বেশ্যাগারে সারারাত কাটিয়ে রক্তিম চোখে।

বাজার বড়ই মন্দা।
মন্দ মন্দ গতিতে পাল তুলে চলেছে ইস্টিমার, গাধাবোটের সারি,
জনগণ রয়েছে তাতে।
একটা পাখির শিসে
একটা সদ্যোজাত শিশুর কান্নায়
একটা কিশোরের অবাক চোখে
এক বৃদ্ধার ভ্রুকুঞ্চিত বলীরেখায়
একজন কমিউনিস্টের উদ্ধত কপালে
যে চিহ্ন রয়েছে কে তার অর্থ বলে দেবে?
বণিকের রাজদণ্ড ফিরে যাবে রাজদণ্ড হয়ে
স্ফীতোদর সভ্যতার শেষ বিনাশে?

তাই যেন হয়।
এ বাজার বড় দুঃসময়।

হে প্রভু, উদয় হও

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

হৈ হৈ শব্দ তুলে আসরে নামলো বিদূষক,
কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টা রমরমিয়ে আসর জমালো—
তারপর দুঃখ নিয়ে বসে রইলো বিমূঢ় দর্শক,
বিদূষক চলে গেছে, লাইটম্যান আলোও নেভালো।

যুবমানস ॥ ২২
মস্কোয় অলিম্পিক, হকিতে জিতেছে যেন কে,
ইচ্ছে না থাকলেও মঞ্চ থেকে সরে যেতে হয়—
গোঁড়ালির অসহ্য ব্যথা, চোখেতেও বাধো বাধো ঠেকে,
মধ্যবিত্ত মহোদয়, ময়না কি নতুন কথা কয়?

নাহয় দুঃখসুখ একান্তই নিজস্ব ব্যাপার,
নাহয় নিজস্ব কোনো ব্যাপারেই দুরন্ত অনীহা—
তবুও জ্বর বাড়লে গায়ে তুলি শীতের র‍্যাপার,
হে প্রভু, উদয় হও, কেড়ে নাও জীবনের স্পৃহা।

ফুল দেবে মরণকে—স্থলপদ্ম

মইনুল হাসান

কাউকে ফুল দ্যায় নি সে
জন্মের সময়ে ডেকেছে শঙ্খচিল
অশান্ত প্রকৃতির কানফাটা হাহাকার
ঘুরিয়ে দিয়ে যায় গতি
তীব্র ঘৃণাতে ফেটে পড়ে ইতিহাস
মিথ্যার ফুলঝুরি—শুধু মিথ্যা ফানুস
(তাই) যৌবনের উদ্দীপ্তবাহু
খুঁজে নিল মাঠে ময়দানে—জীবন

ফুটন্ত টকটকে লাল গোলাপ
লজ্জায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়
কালো ফুটপাত আরও লাল দেখে
সেখানে খুঁজেছে জীবন—স্থলপদ্ম
রক্তিম পূবাকাশ তাই খুঁজছে সকাল
চেতনাতে তৈরী হয়ে যায় ইতিহাস
ফুল দেবে মরণকে—স্থলপদ্ম

ফুল দেবে মরণকে—স্থলপদ্ম

যোজন সাগর দিতে পাড়ি…

অনির্বাণ দত্ত

পাহাড় কি পেরোনো যায় লাফিয়ে—
সাগরে হারানো যায় দাপিয়ে?
যেতে হয় পায়ে হেঁটে
বাধা ভেঙ্গে ঢেউ কেটে হাঁফিয়ে!
ঝড়ো হাওয়া নীলাকাশ কাঁপিয়ে।

উঁচু চুড়ো ছুঁতে পারে শামুকও
যতবার বুকে হেঁটে থামুকও
মাঝপথে কাঁটা-ক্ষতে নামুকও
তুষারের ঝড় কি বা খর রোদ-বৃষ্টি
সঠিক লক্ষ্যে তার দৃষ্টি।

পিঁপড়েরা তাই বুঝি আস্তেই
শানায় দাঁতের খুদে কাস্তেই?
হাজার লক্ষ দিন বাঁচতেই
মিলে মিশে হাঁটে এক সারি—
যোজন সাগর দিতে পাড়ি?

হে নভেম্বর

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

হাতে নিয়েছি ঢাল
হাতে নিয়েছি অসি
'রে শত্তুর রে শত্তুর'
চতুর্দিক চষি
ভাইকে দিই দুয়ো আমি
মাকে করি ভাগ
আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে
অন্ধ বুনো রাগ।

কে আমায় শত্রু চেনায়
আমায় চেনায় কে—
হে নভেম্বর, নভেম্বর হে
তুমি ছাড়া আর কে!

রাজা যায়, রাজ্যে আসে
ভিন্ন সাজে রাজা
পারিষদরা হেঁকে বলে
বাজা, ঢোলক বাজা।
যুদ্ধে মরি যুদ্ধে মারি
রই যে-কে-সেই প্রজা
নভেম্বর হে বলতে শেখাও
আমিই আমার রাজা।

হাতে নিয়েছি ঢাল
হাতে নিয়েছি অসি
আমার অসির ঘায়ে লুটায়
মোরাদাবাদে ভাই
নির্বিচারে খুন করেছি
আসাম ত্রিপুরায়
শত্রুকে ঠিক মিত্র দেখায়
চোখে রঙীন ঠুলি
হে নভেম্বর, নভেম্বর হে
দাও এ ঠুলি খুলি।

শব্দ তুলে রাখি

অচিন চক্রবর্তী

শুধু ভালবাসায় খাদ মেশাবো না
বলেই কিছু শব্দ আমি সরিয়েছি গোপন দেরাজে।

এখন সময় বড় বাজে,
সমস্ত বিপণন দিনক্ষণ ভর্তি করে শুধু
ভোজবাজি হয়ে যাচ্ছে নিরন্তর, সত্য সাঁই বাবা
যেন বা হাজির অঞ্চলে। চালে-ডালে
কেরোসিনে-চিনিতে-বিদ্যুতে কিংবা শিশু-খাদ্যে প্রস্ফুট প্রভাব;
দলেমুচড়ে ডাস্টবিনে গড়াগড়ি সমস্ত স্বপন।
উপজাত কুয়াশায় পরিব্যাপ্ত জীবনযৌবন।

তবু মন
সাঁতরে পেরুতে চায় সময়ের সর্বনাশা গাঙ
হাতে হাত ধরে, মরুভূমি
যেমন পেরয় রাহী হৃদয়ে হৃদয় জুড়ে দিয়ে
বুকে বুক রেখে, অন্ধকার
তেমনি পেরিয়ে যাব বেমালুম প্রত্যয়ে নিবিড়
বিশ্বাসের শিখা জেবলে পরিপার্শ্ব তুষার গলিয়ে।

দুরন্ত সে অভিযাত্রায়
নিটোল উষ্ণতা চাই বলেই এখন
শব্দ বাছাই করি, ছন্দ যাচাই করি, আর
শুধু ভালোবাসায় খাদ মেশাবো না
বলেই কিছু শব্দ তুলে রাখি গোপন দেরাজে॥

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

সাইবারনেটিক্‌স্‌

গণিত, বলবিদ্যা আর শরীরতত্ত্ব—বিজ্ঞানের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যে কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত হতে পেরেছে তার নাম—সাইবারনেটিক্‌স্‌ (Cybernatics)। আরও সহজে বলা যায় প্রাণী ও যন্ত্রের ভিতর যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার নাম সাইবারনেটিক্‌স্‌।

সাইবারনেটিক্‌স্‌ কথাটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় এর অর্থ ছিল "নিয়ন্ত্রক" (Steersman) অথবা আরও সাধারণভাবে কথাটি একটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। আর আজকের বিজ্ঞান সাইবারনেটিক্‌স্‌ বলতে কি বোঝায় তা আগেই বলেছি।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাঁদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। সে কথা থাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরের ভ্যান্ডার বিল্ট হলে (Vander Bilt Hall) মাসে একবার কিছু বৈজ্ঞানিক খাওয়াদাওয়া করতে একত্রিত হতেন। বিজ্ঞানের সব শাখারই কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির এই একত্রিত ভোজপর্ব ছিল বৈজ্ঞানিক আলোচনার এক বিচিত্র স্থান। প্রতিটি ভোজ-সভার পর কোন একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা হত। এরকম একটি ভোজসভায় ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইনস্টিটিউট অফ্‌ টেকনোলোজির (পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারীং বিশ্ববিদ্যালয়) অঙ্কের প্রখ্যাত অধ্যাপক এন. ওয়াইনার (N. Wiener) ও দুজন প্রখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ ডঃ রোজেনব্লুয়েথ (Dr. Rosenblueth) এবং ডঃ ওয়াল্টার ক্যানন্‌ (Dr. Walter Cannon) আলোচনা করছিলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল এমন সমস্ত সমস্যা নিয়ে যেখানে একই সঙ্গে গণিত ও শরীরতত্ত্ব জড়িত। কি রকম?

একটা যুদ্ধ চলছে। একজন পাইলট একটা এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল যে সামনে একটা অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ (বিমান বিধ্বংসী কামান) থেকে গুলী ছোঁড়া হচ্ছে। পাইলট দ্রুততার সাথে প্লেন আরও উঁচুতে উঠিয়ে নিল এবং তার যাত্রাপথ বদল করল। এই যে কাণ্ডটা ঘটল তার জন্য পাইলটের বুদ্ধি-বিবেচনা ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভর করা যায় না। যদি পাইলট ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত না নিত তবে বিমানটি ধ্বংস হতে পারত। কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যে প্রতিক্রিয়া হয় তার একটি যন্ত্রায়িত রূপ দেওয়া গেলে মানুষের উপর আর নির্ভর করতে হয় না। এইরকম একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঐ তিন বিজ্ঞানী অনুভব করলেন ঐ রকম একটি যন্ত্রায়িত ব্যবস্থার কথা।

এইবার কাজকর্ম শুরু হল এবং অবশেষে বলবিদ্যা, গণিত ও শরীরবিদ্যাকে এক জায়গায় হাজির করা গেল। আবিষ্কৃত হল সাইবারনেটিক্‌স্‌।

বৈজ্ঞানিকদের মতে,—"বৈজ্ঞানিক বিপ্লব জন্ম দিয়েছে অ্যাটম বোম-এর আর সাইবারনেটিক্‌স্‌ এনেছে নতুন এক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব।"

চলচ্চিত্রে রুশ বিপ্লবঃ আইজেনস্টাইনের দুটি ছবি

দেবাশীষ দত্ত

একদা যে আশ্চর্য প্রতিভাধর নিজের মধ্যে একটি যুগকে সৃষ্টি ও বহন করে তার স্মৃতি ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন যুগান্তরের দর্শক সমাজে, সেই চলচ্চিত্র গুরু আইজেনস্টাইন সোভিয়েৎ চলচ্চিত্রের প্রাণপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত। রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে নির্মিত আইজেনস্টাইনের দুটি নির্বাক ছবি 'স্ট্রাইক' (১৯২৪) ও 'অক্টোবর' (১৯২৭) দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। দুটি ছবিতেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের সুরটি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 'স্ট্রাইক' আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার শিল্পগত সমস্যার প্রতিফলন দেখা যায় ছবিটিতে। চলচ্চিত্রের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি এই ছবির মাধ্যমে অসামান্য নিপুণতায় প্রকাশিত হয়েছে। আইজেনস্টাইনই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের শিল্পগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছিলেন। তার পরিচয় এই ছবির সর্বত্র। তিনটি অংশে বিভক্ত এই ছবিটিতে একটি কেন্দ্রীয় সুরের অনুরণন লক্ষ্য করা যায়।

একটি কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে 'স্ট্রাইক'-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। শ্রমিকরা কারখানা মালিকের অনুচর এবং গোয়েন্দাদের সতর্ক দৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটের প্রস্তুতি চালাচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একটি শ্রমিকের আত্মহত্যা ধর্মঘটকে ত্বরান্বিত করে। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করার পর সর্বপ্রথম অবকাশের অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু ক্রমে দুঃখ-দুর্দশা চরমে ওঠে। শ্রমিকদের শেষ সম্বলটুকুও খাদ্যসংগ্রহের জন্য ব্যয়িত হয়ে যায়। প্রলোভন ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়ে পুলিশ ধর্মঘটের নেতাদের আলাদা করে দিতে চায়। গুন্ডাদের আক্রমণের দ্বারা শ্রমিকদের প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়। একটি ক্ষিপ্ত ষাঁড়কে পুলিশী অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে ছবিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ছবির এই বিষয়বস্তু ও ঘটনা-প্রবাহ মোটামুটি সরল এবং সমসাময়িক। ছবিটির মূল বৈশিষ্ট্য তার ডকুমেন্টারি-সুলভ বিন্যাসে। 'পটেমকিন'-এর মত 'স্ট্রাইক'ও কোন ছবির একটি বিশেষ অংশ হিসেবে পরিচালকের কল্পনায় এসেছিল। পরে 'পটেমকিন'-এর মত এটিও পূর্ণাংগ ছবির রূপ পায়। বস্তুত, 'টুয়ার্ড ডিক্টেটরশিপ' নামের একটি ছবির অংশ হিসেবে এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। ছবির সমাপ্তিতে আপাত-হতাশার যে সুরটি ফুটে উঠেছে, তা থেকে এটা বোঝা যায়।

শোনা যায়, আইজেনস্টাইন প্রকৃত কারখানার পরিবেশে 'স্ট্রাইক' নাটক অভিনয় করার বাসনা পোষণ করেছিলেন। ক্রমে অভিনয়-মঞ্চ (এবং সার্কাসের অংগন) ছেড়ে পুরোপুরিভাবে চলচ্চিত্রে আত্ম-নিয়োগ করেন। এই ছবিটিতে তাঁর জীবনের এই দুটি বিশেষ দিকের ছায়াপাত ঘটেছে। একদিকে বাস্তব উপাদানের আশ্রয়ে বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি ও পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, অন্যদিকে সার্কাসের লঘু সুরের সাথে তাল রেখে 'ডিটেল'-এর কাজে কখনো কখনো অতি-রঞ্জনের ঝোঁক এসেছে। প্রচারমূলক পোস্টারের ব্যবহার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তরুণ আইজেনস্টাইন এইভাবেই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের ভাষাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। এক নতুন পরীক্ষায় ব্রতী আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের প্রচলিত ধারা, প্রকাশশৈলী ও বিন্যাসকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন এবং সে প্রয়াসে তিনি সর্বাংশে সফল হয়েছিলেন। কারখানার বাস্তব পরিবেশ ছবিটিকে অশেষ মূল্য দিয়েছে। দৃশ্য গ্রহণের অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য ও অভিনয়ের শক্তিশালী প্রকাশভঙ্গী ছবিটির গুরুত্ব বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।

১৯২৭ সালে রুশ চলচ্চিত্র-শিল্প অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী পালন করে দুটি অসামান্য চলচ্চিত্র— পুডভকিনের 'দি এন্ড অফ্ সেন্ট পিটার্সবার্গ' এবং আইজেনস্টাইনের 'অক্টোবর' প্রযোজনার মাধ্যমে। শেষোক্ত চিত্রটির মাধ্যমে নির্বাসিত লেনিনের গোপন প্রত্যাবর্তন এবং বলশেভিকদের ক্ষমতাদখলের মধ্যবর্তী চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলি বিবৃত হয়েছে। আইজেনস্টাইনের অসামান্য শিল্পদৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির বিশ্বস্ত পরিচয় পাওয়া যায় ছবিটিতে। একটা যুগের ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য আইজেনস্টাইন প্রতিরোধ ও সংগ্রামের পর্যায়ের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন, তাদের যথার্থ ভূমিকাটুকু চিনে নিতে দর্শকদের এতটুকু অসুবিধা হয় না। কয়েকটি শক্তিশালী দৃশ্যকল্পের ব্যবহার ছবিটিকে আশ্চর্য সমৃদ্ধি দিয়েছে। প্রধান দৃশ্যগুলির সম্পাদনা নিঃসন্দেহে আইজেনস্টাইনের শিল্পক্ষমতার পরিচায়ক। কয়েকটি ইংগিতময় মন্তাজের ব্যবহার অপূর্ব। জটিলতা এবং অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে সেগুলি দর্শকচিত্তকে আলোড়িত করে। স্বকীয় চিন্তার কল্যাণে তিনি রুশ চলচ্চিত্রে একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মারী সিটনের উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

Eisenstein had become captive of his own thought processes and his extra-ordinary vision of what the art of film could become.

আজ যদিও আইজেনস্টাইনের ছবি চলচ্চিত্রের ভিত্তিগত ব্যাকরণের ভূমিকা নিয়েছে, তবুও 'অক্টোবর'-এর শিল্পসৌন্দর্য পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

বিভিন্ন দৃশ্যের সংগঠনে চিন্তাশীল আইজেনস্টাইনের কারিগরী নিরীক্ষার পরিচয় বর্তমান। দৃশ্যগ্রহণের কাজে এডুয়ার্ড টিসের যথেষ্ট পারংগমতার পরিচয় বর্তমান। কয়েকটি 'কাটিং'-এর কাজ অপূর্ব। এই ছবির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে একজন শিল্পানুগত পরিচালকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগী। এই দৃষ্টিভংগী থেকে জন্ম নিয়েছে কয়েকটি স্মরণীয় আবেগ-মুহূর্ত যা অনেক সময়ে জটিল রূপ নিলেও দর্শকচেতনাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। অপূর্ব দৃশ্য গ্রহণের কাজ এবং ডকুমেন্টারি-সুলভ গুণ ছবিটিকে বস্তুনিষ্ঠ করে তুলেছে। কিন্তু আইজেন-স্টাইনের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগী, মূল্যায়ন এবং বিন্যাস এই ছবির সমৃদ্ধির মূলে।

সমাজতান্ত্রিক দেশে খেলাধূলা

অশোক বসু

পৃথিবীর দেশে দেশে মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী উদ্যাপিত হচ্ছে। এই ৬৩ বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যের বিপুল সাফল্য সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের জনগণের মনে আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

সমাজতন্ত্র মানব জীবনের সমস্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের সমস্যা যেমন সমাধান করা সম্ভব হয়েছে তেমনি সৃজনধর্মী দিকগুলির উৎসমুখও উন্মোচিত হয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির খেলাধূলা ও শরীর চর্চার সাফল্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনা সুরু করার আগেই এ কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের চিত্র এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। পৃথিবীর বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সবচেয়ে জনবহুল সমাজতান্ত্রিক দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সাফল্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। মাত্র দুটি দেশের কথা বলা হলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই দুটি দেশের মত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও খেলাধূলায় যে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে তার মূল কারণ হলো তারাও খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় সমগুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

গণ-শরীরচর্চা ও গণ-খেলাধূলো

৫ কোটি ৫০ লক্ষ লোক শারিরীক পটুতা বজায় রাখার কর্মসূচীর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। এই উদ্দেশ্যে বাজেটে প্রতি বছর পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। কি বিপুল পরিমাণ অর্থ এই খাতে ব্যয় করা হয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৯৭৮ সালের বাজেট থেকে। কেবলমাত্র এই একটি বছরেই "জনস্বাস্থ্য ও শচীরচর্চার" কর্মসূচীর জন্য ১,২৬,০০০ লক্ষ রুবল বরাদ্দ করা হয়। এই বছর সোভিয়েত জনসংখ্যার পরিমাণ ছিলো ২,৬০০ লক্ষ। এই দুটি তুলনামূলক সংখ্যা থেকেই প্রমাণিত হবে শরীরচর্চা খাতে মাথাপিছু ব্যয়ের বহর।

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশে, স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরেও, শরীর শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ হ'ল ৪ পয়সা মাত্র। নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের খসড়া বয়ানে এ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হয়েছে "পৃথিবীতে ক্রীড়াখাতে সম্ভবতঃ এর চেয়ে কম খরচ কেউ করে না।"

শিশুকাল থেকেই

সোভিয়েতে শিশুকাল থেকেই শরীরচর্চা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারটিকে সুনিশ্চিত করা হয়। বিদ্যালয়গুলিতে গণ-খেলাধূলো ও শরীরচর্চাকে উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যালয়গুলিতে শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। গণিত, পদার্থবিদ্যা বা অন্যান্য বিষয়ের মত শরীরচর্চায় প্রাপ্ত নম্বর ছাত্রছাত্রীদের রিপোর্টে ও স্কুল স্নাতকদের ডিপ্লোমায় স্থান লাভ করে।

যে সব শিক্ষার্থী বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে খেলাধূলো শিখতে চায় তাদের জন্য বিশেষ জুনিয়র ক্রীড়া স্কুলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এ ধরনের ৫,৯৫৬টি স্কুলে ৯ থেকে ১৮ বছরের প্রায় ২০ লক্ষ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করে।

স্কুলপর্যায়ে প্রথমে খ্যাতি অর্জন করে পরে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন এরকম ক্রীড়াকুশলীদের মধ্যে যেমন আছেন ইগরতের, ভার্নোসিয়ান, তামারা প্রেস, নেলিকিন ইত্যাদি। আবার স্কুলের ছাত্রছাত্রী থাকা অবস্থাতেই ওলিম্পিক ও বিশ্বখেতাব জয় করেছেন এমনও বহু সোভিয়েত ছাত্রছাত্রী আছেন। এদের মধ্যে আছেন সাঁতারু মারিনা কোসভায়া (মন্ট্রিল ওলিম্পিক বিজয়ী) ও জিমনাষ্ট মাশা ফিলাতোভা ইত্যাদি।

খেলাধূলোর জন্য

একেবারে স্থানীয় মাঠ থেকে শুরু করে বিশ্ববিখ্যাত বিশাল বিশাল ক্রীড়াসমাহার। খেলাধূলোয় সুযোগ-সুবিধার একটি ব্যাপক ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে। একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলোঃ

১১৪ লক্ষ দর্শকের আসন সম্বলিত বৃহদাকার ষ্টেডিয়াম ৩,৮৮২টি; জিমনাশিয়াম ৬,৬০০টি; সন্তরণক্ষেত্র ১,৪৩৫টি; বন্দুক ছোঁড়ার কেন্দ্র ৬,৬০০টি; ফুটবল মাঠ ১,০০,০০০টি।

প্রশিক্ষণ

সোভিয়েত ক্রীড়া আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন প্রায় ৩ লক্ষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পেশাদার প্রশিক্ষক ও ৬০ লক্ষেরও বেশী স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষক।

খেলাধূলোর খরচ

এদেশে খেলার জায়গা, প্রশিক্ষণ, খেলার জিনিসপত্র বা জামাকাপড়ের খাতে ক্রীড়াবিদ্‌দের কোনও খরচ করতে হয় না। ক্রীড়াসমিতির সভ্য হিসাবে তাকে বছরে মাত্র ৩০ কোপেক চাঁদা দিতে হয়। যা নাকি এক প্যাকেট সিগারেটের দামের সমতুল্য। রাষ্ট্রীয় ও গণ-সংগঠনগুলি, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ প্রধানত প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়াসভার খরচ বহন করে।

শীর্ষস্থানীয় কোনো প্রতিযোগিতায় যখন কোনো ক্রীড়াবিদ্ তার ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করে তখন সেই প্রতিযোগিতার সমস্ত খরচ ও ক্রীড়াবিদ্‌দের যাতায়াতের ও অন্যান্য খরচ বহন করে হয় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটি নয়তো কেন্দ্রীয় সমিতি।

পরিচালন ব্যবস্থার শীর্ষে

সমগ্র ক্রীড়া আন্দোলনকে পরিচালনাকারী রাষ্ট্রীয় সংগঠন হলো সোভিয়েত ক্রীড়া কমিটি।

ক্রীড়া কমিটির দায়িত্বের মধ্যে রয়েছেঃ খেলাধূলোর বৈষয়িক ও

কারিগরী ভিত্তির উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্মধারার সংগঠন, ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ক গবেষণার সমন্বয় সাধন, জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলির আয়োজন, ক্রীড়াকর্মীদের প্রশিক্ষণ, খেলাধুলোর সাজসরঞ্জামের উৎপাদন ও বিতরণের সমন্বয় সাধন ও নতুন নতুন ক্রীড়াঙ্গন নির্মাণ। সমস্ত মন্ত্রীদপ্তর ও সরকারী এজেন্সীসমূহকে সোভিয়েত ক্রীড়া কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ মেনে চলতে হয়।

এই কমিটির আবার বিভিন্ন উপবিভাগ ও ক্রীড়াবিষয়ক বোর্ড আছে। যেমন, ফুটবল, এ্যাথলেটিকস্, জলক্রীড়া ইত্যাদি। এই সমস্ত বোর্ডের সাথে ৪৭ ধরনের খেলাধুলোর বিশেষজ্ঞরা যুক্ত আছেন।

ট্রেড ইউনিউয়ন নেতৃস্থানীয় ক্রীড়াসংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করে

সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সেই গোড়ার আমল থেকেই ক্রীড়া আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করে তোলার কাজে সব সময় সাহায্য করে আসছে। অসংখ্য ছোট ছোট ক্রীড়া ক্লাবকে ঐক্যবদ্ধ করে ঐচ্ছিক ক্রীড়াসমিতি গঠনে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এক সময় অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। ১৫টি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেকটিতে ট্রেড ইউনিয়নের ঐচ্ছিক ক্রীড়া সংগঠন আছে। এই সংগঠনগুলি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে এই পাঁচ বছরে ২০ হাজার শীর্ষস্থানীয় এ্যাথলেটের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এদের মধ্যে অনেকেই ইউরোপীয়, বিশ্ব ও ওলিম্পিক খেতাব জয় করার গৌরব অর্জন করেন। সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ক্রীড়াবিদ্‌দের জন্য ৩৫,০০০ ক্রীড়াঙ্গণ তৈরী করে দিয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের দশম পঞ্চবার্ষিকী কালে (১৯৭৬-১৯৮০) নতুন যে ৫৭২টি স্টেডিয়াম, ৪৩৬টি সন্তরণ ক্ষেত্র, ২,২৯২টি জিমনাসিয়াম ও ৫০০টি জলক্রীড়াকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে তার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ৬০০ লক্ষ রুবল বরাদ্দ করেছে।

সারা সোভিয়েত জুড়ে রয়েছে প্রাথমিক সংগঠনগুলি

সোভিয়েত ক্রীড়া ও শরীরচর্চা আন্দোলনের প্রাথমিক সংগঠন-গুলির সদস্য সংখ্যা কোথাও এক ডজন আবার কোথাও বা বেশ কয়েক হাজার। এ-জাতীয় ক্রীড়া ক্লাবের সংখ্যা হলো ২ লক্ষ ২০ হাজার। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে জনসংখ্যার অনুপাতে এই সমস্ত প্রাথমিক সংগঠনগুলির অবস্থান গ্রামাঞ্চলে ও শহরে সমানুপাতিক। ৬২ শতাংশ ও ৩৮ শতাংশ। সোভিয়েতে বসবাসকারী গ্রামাঞ্চলে ও শহরের জনসংখ্যার অনুপাতও শহরে ৬২ শতাংশ, গ্রামে ৩৮ শতাংশ।

খেলাধুলোয় সোভিয়েত নারী

শরীরচর্চা ও খেলাধুলাসমেত সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার সোভিয়েতে শুধু কথার কথা নয়—এই সমানাধিকার সত্যিকারেরই সুরক্ষিত। অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শ্রম ও স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে আছে মায়েদের কাজ করার উপযুক্ত অবস্থা, শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, শিশুদের মায়েদের মাইনেসহ ছুটি ও কাজের সময় কমিয়ে আনার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এর ফলে নারীদের প্রকৃত সমানাধিকারের ব্যবস্থাটি সুরক্ষিত হয়েছে।

সোভিয়েত জীবনধারার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হলো নারী-ক্রীড়া। নারীক্রীড়া হয়ে উঠেছে নারীমুক্তির একটি কার্যকরী মাধ্যম। সোভিয়েত ক্রীড়াসমিতি ও ক্লাবগুলির বিভিন্ন বিভাগে ২ কোটি নারী নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। প্রশিক্ষক, কোচ ও ক্রীড়া-সংগঠনের নেতাদের মধ্যেও বহু নারী আছেন। ২১তম ওলিম্পিকে যোগদানকারী সোভিয়েত প্রতিনিধিদলে বহুসংখ্যক নারী প্রতিযোগী ছিলেন ও এই ওলিম্পিকে সেই নারী প্রতিযোগীরা ৪০টি স্বর্ণপদক জয় করার গৌরব অর্জন করেন।

জনপ্রিয় খেলা

খেলায় অংশগ্রহণের বিচারে জনপ্রিয় খেলাগুলির শীর্ষে রয়েছে জিমনাস্টিক। তারপর ট্রাক ও ফিল্ড। জনপ্রিয় খেলাগুলি এবং যে পরিমাণ দর্শক এই সমস্ত খেলাগুলি দেখে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলোঃ

জিমনাস্টিক (৭০ লক্ষ), ট্রাক ও ফিল্ড (৬০ লক্ষ), ভলিবল (৫০ লক্ষ), ফুটবল (৪০ লক্ষ), বাস্কেটবল (৪০ লক্ষ), বন্দুক ছোঁড়া (৩০ লক্ষ), হ্যান্ডবল (৮ লক্ষ), অসিক্রীড়া (৫০ হাজার), অশ্বক্রীড়া (২৫ হাজার), পালতোলা নৌকা চালনা (২০ হাজার), আধুনিক পেন্টাথলন (৪ হাজার)। এছাড়া শীতকালীন স্কী (৪০ লক্ষ), দাবা (৩০ লক্ষ)।

উল্লেখ্য যে একেবারে আঞ্চলিক খেলাগুলি বাদ দিলে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬০ রকমেরও বেশী খেলাধুলোর প্রচলন আছে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত খেলাধুলো

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১০০টিরও বেশি জাতি ও অধিজাতি আছে। যাদের প্রত্যেকেরই একটি বা তার বেশী ঐতিহ্যশালী খেলা আছে যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক খেলাগুলিকে সর্ববিধ উপায়ে উৎসাহ দেওয়া হয়।

ওলিম্পিকে কৃতিত্ব প্রদর্শন

সোভিয়েত ক্রীড়াবিদ্‌রা সর্বপ্রথম ১৯৫২ সালে হেলসিংকি ওলিম্পিকে যোগদান করেই মার্কিন প্রতিযোগীদের সামনে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেন। ১৯৫২'র ওলিম্পিকে সোভিয়েত প্রতি-যোগীরা ২২টি সোনা, ৩০টি রুপা ও ১৯টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। ১৯৭৬-এর মন্ট্রিল ওলিম্পিকে বেড়ে এই পদকের সংখ্যা দাঁড়ায় সোনা ৪৭, রুপা ৪৩ এবং ব্রোঞ্জ ৩৫টি।

গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিকে সোভিয়েত ক্রীড়াবিদ্‌রা যত পদক জিতেছেন তার মোট সংখ্যা ৬৮৩টি। এর মধ্যে সোনা ২৫৮টি, রুপা ২২১টি ও ব্রোঞ্জ ২০৪টি। লক্ষণীয় যে এই একই সময় মার্কিন ক্রীড়াবিদ্‌দের প্রাপ্ত পদকের সংখ্যা মোট ৬০৬টি। তার মধ্যে সোনা ২৫৪টি।

চীন

সাধারণতন্ত্রের জন্মলগ্ন থেকেই গণ-শরীর চর্চা ও খেলাধুলোর ওপর জোর দেওয়া হলো

বলা যেতে পারে চীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিনটি থেকে গণ-শরীরচর্চা, গণ-খেলাধুলো ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শরীরচর্চা ও খেলাধুলোর উন্নয়নের জন্য ১৯৫২ সালে চীন সাধারণতন্ত্র শরীরচর্চা ও ক্রীড়া কমিশন গঠন করা হয়। অঞ্চলে, প্রদেশে ও পৌর এলাকাগুলিতে ঐ একইভাবে আঞ্চলিক, প্রাদেশিক ও পৌর কমিশন গঠন করা হয়।

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ৪০টি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও ৩,০০০টি অবসরকালীন ক্রীড়া বিদ্যালয় রয়েছে।

ক্রীড়াসংগঠন ও সংস্থাসমূহ

ক্রীড়াকে গণমুখী করে তোলার জন্য সারা চীন ক্রীড়া ফেডারেশনের একটি সদর দপ্তর আছে বেজিংএ। সারা দেশে এই ফেডারেশনের শাখা আছে।

ট্রাক-ফিল্ড, সাঁতার, জিমনাস্টিক, বাস্কেটবল, ভলিবল, ফুটবল, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ভারোত্তলন, সাইক্লিং, জলক্রীড়া, কুস্তি ইত্যাদি বিভাগীয় খেলাধুলোর উৎকর্ষ সাধন ও এগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ৩০টি জাতীয় সংস্থা আছে।

১৯৫৩ সালের পর থেকে ৮টি বৃহৎ গণ-শরীরচর্চাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বেজিং, তিয়ানজিন, উহান, সেনিয়াং, জিয়ান, চেংদু, সাংহাই ও গুয়ানঘেউতে এই কেন্দ্রগুলির অবস্থান।

খেলাধুলোর জন্য

বড় ও মাঝারি ধরনের শহরগুলিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ সরঞ্জামসহ ষ্টেডিয়াম ও জিমনাশিয়াম তৈরী করা হয়েছে। বৃহদাকার ষ্টেডিয়ামগুলির মধ্যে বেজিং ওয়ার্কার্স ষ্টেডিয়ামে দর্শক আসন সংখ্যা এক লক্ষ। মাঝারি ধরনের ষ্টেডিয়ামগুলিতে ১৮,০০০ দর্শকের আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন বেজিং ক্যাপিটাল ষ্টেডিয়াম, সাংহাই ষ্টেডিয়াম ইত্যাদি।

এছাড়া বেজিং-এ খেলাধুলো সংক্রান্ত গবেষণার জন্য একটি বিশালকায় গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

খেলাধুলোকে গণমুখী করে তোলো

খেলাধুলোকে গণমুখী করে তোলায় চীনের আগ্রহের সীমা নেই। অন্যদিকে খেলাধুলোয় গণ-অংশগ্রহণই হলো আজকের চীনের বৈশিষ্ট্য। চীনের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশই হ'ল শিশু ও যুব। এদের মধ্যে খেলাধুলোর সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কলেজে, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুটি করে পিরিয়ডে শরীর-শিক্ষণ আবশ্যিক করা হয়েছে।

সারাদেশব্যাপী শরীর চর্চা ও খেলাধুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় শরীর চর্চা ও ক্রীড়া কমিশন কতকগুলি মান নির্ধারণ করেছেন। মান অনুযায়ী বয়সভেদে শিশু, তরুণ ও যুবকদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। শিশু বিভাগ ১০ থেকে ১২। জুনিয়র (১) বিভাগ ১৩ থেকে ১৫। জুনিয়র (২) বিভাগ ১৬ থেকে ১৭। সিনিয়র বিভাগ ১৮ থেকে ৩০। সফল অংশগ্রহণকারীদের রাষ্ট্রীয় সার্টিফিকেট ও ব্যাজ দেওয়া হয়।

বলের খেলা

টেবিল টেনিস, বাস্কেটবল ও ভলিবল হলো চীনে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। কেবলমাত্র জিলিন প্রদেশেই ১০ হাজার ফুটবল টীম রয়েছে আর তাদের অধীনে রয়েছে ১,১০০ ফুটবল মাঠ। আবার একইভাবে গুয়াংদর প্রদেশ "ভলিবল খেলোয়াড়দের বাসগৃহ" বলে খ্যাত। এখানে কয়েক হাজার ভলিবল টীম রয়েছে। এখানে ভলিবল খেলোয়াড়দের নিজেদের তৈরী করা কোর্টের সংখ্যাই হলো ২,১০০টি।

আর একটি জনপ্রিয় খেলা

সাঁতার চীনে খুবই জনপ্রিয়। ১৯৭৮ সালে শীতকালীন সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১ লক্ষ সন্তরণবিদ্ অংশগ্রহণ করে।

ঐতিহ্যপূর্ণ জাতীয় ক্রীড়া

উয়সু একটি জনপ্রিয় খেলা। এই খেলাটি সামরিক ট্রেনিং-এর সাথে বেশ কিছুটা সঙ্গতিপূর্ণ। বিভিন্ন প্রদেশে সেই সমস্ত প্রদেশবাসীর নিজস্ব কিছু কিছু প্রাচীন জনপ্রিয় খেলা আছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই খেলাগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই খেলাগুলির মধ্যে অন্যতম হলোঃ অন্তর্মোঙ্গোলিয়ার মল্লক্রীড়া, অশ্বচালনা ও তীর নিক্ষেপ। জিনঝিয়া, তিব্বত, কুইনঘাই-এ অশ্বচালনা। ইয়ানথিয়ান ও জিহুযাংবান্নায় যথাক্রমে সাঁতার ও ড্রাগন নৌকা দৌড় ইত্যাদি।

অতীতে খেলাধুলোর মান ছিলো অত্যন্ত নীচুতে। সেখান থেকে শুরু করে......

এছাড়া অতিপ্রাচীন "গো" এবং "দাবা"—সরকারীভাবে স্বীকৃত প্রতিযোগিতামূলক খেলা।

খেলায় গণঅংশগ্রহণ খেলার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পুরাতন চীনে ক্রীড়ার মান ছিলো অত্যন্ত নীচু। কিছু কিছু খেলার প্রচলনই ছিলোনা চীনে। এই অবস্থা থেকে শুরু।

১৯৩২ সালের দশম ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় চীনের প্রতিযোগী ছিলেন মাত্র একজন। ১৯৩৬ সালে একাদশ ওলিম্পিকে চীনের পক্ষে একজন মাত্র মহিলা প্রতিযোগী ওলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদান করেন।

খেলাধুলোয় সন্দেহাতীত অগ্রগতি

১৯৪৯-এ চীন সাধারণতন্ত্রের জন্ম ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করলো। এ সময় থেকেই চীনের ক্রীড়াবিদ্‌রা বিশ্বরেকর্ড স্থাপন ও বিশ্বখেতাব অর্জন করতে শুরু করে। ১৯৫৬ সালে চীনের প্রতিযোগী ভারোত্তলন-এ ব্যান্টামওয়েট বিভাগে ক্লিন ও জার্কে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। ঐ একই প্রতিযোগী পরবর্তী সময়ে ভারোত্তলন-এর দুটি বিভাগেই—ব্যান্টামওয়েট ও ফেদারওয়েট-এ—ক্লিন ও জার্কে নয় নয়বার নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চীনা ভারোত্তলকরা ৯টি বিভাগে ১৯টি বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন।

জেন ফেনগুগুই চীনের প্রথম মহিলা প্রতিযোগী যিনি ১৯৫৭ সালে উচ্চ লম্ফনে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন।

১৯৫৯ সালে, ২৫তম বিশ্ব টেবিল টেনিসে চীন সর্বপ্রথম পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগে খেতাব অর্জন করে। তার পরবর্তী সময়ে টেবিল টেনিসে চীনের জয়যাত্রা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিভাগেই।

১৯৭৮ সালে, ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত ৮ম এশিয়ান গেমসে চীনা অ্যাথলেটরা ৫৬টি সোনার পদক জয় করেন। অবশ্যই এই সংখ্যাটি পূর্ববর্তী ওলিম্পিকে প্রাপ্ত পদকের চেয়ে ২৩টি বেশি।

এছাড়া জিমন্যাস্টিক, ডাইভিং, ফেন্সিং, বন্দুক ছোঁড়া, ট্রাক ও ফিল্ড, ব্যাডমিন্টন এবং বাস্কেটবলে চমৎকার ফলাফল ক্রীড়াজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

খেলাধুলোয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ও চীনের দ্রুত সাফল্যের কারণ অবশ্যই ধনবাদী দুনিয়ার তুলনায় উন্নত ও শ্রেষ্ঠতর সমাজব্যবস্থা। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগ, গণ-অংশগ্রহণ ও গণকার্যক্রমের মধ্যেই রয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠিটি।

বিভাগীয় সংবাদ

২৪-পরগণা :

বারাসাত ব্লক যুব-করণ ২নং-এর উদ্যোগে ৩০শে আগস্ট, ১৯৮০ তারিখে মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো 'সূর্যগ্রহণ, ১৯৮০'। এই আলোচনাচক্রে ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে এই আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান জয়দীপ চৌধুরী, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী শ্যামলী ভদ্র এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম এ. পি. সি. বিদ্যায়তনের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান পুলককান্তি মিত্র। মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী অলকা পাল পুরস্কার বিতরণ করেন।

কাকদ্বীপ ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ১১টি বিদ্যালয় এতে অংশগ্রহণ করে। ৬ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়। আলোচনা চক্রের উদ্‌বোধন করেন স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীহৃষিকেশ মাইতি, পুরস্কার বিতরণ করেন কাকদ্বীপ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীতারাশংকর মাইতি। প্রধান অতিথি ছিলেন সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক মহাশয়।

নদীয়া :

হাঁসখালি ব্লক যুব-করণ—২২শে আগস্ট, বগুলো। হাঁসখালি যুব তথ্যকেন্দ্রের শুভ উদ্‌বোধন হলো। উদ্‌বোধন করলেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। তিনি তাঁর অভিভাষণে বললেন : হাঁসখালি ব্লক যুব-করণের ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগমন স্থানীয় যুবসমাজে ক্রমবর্ধিত, শ্রদ্ধিত ও অভিনন্দিত হচ্ছে। আমরা এর বৃহত্তর সাফল্য কামনা করি।

গত ২২শে আগস্ট হাঁসখালি ব্লক যুব তথ্য কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। এই অনুষ্ঠানে তিনি বৃত্তিমূলক কর্মশিক্ষণ কেন্দ্রের জনৈকা শিক্ষার্থিনীর হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস।

ঐদিন ১৯৭৯-৮০ সালের বৃত্তিমূলক কর্মশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে টেলারিং ও রেডিও শাখায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের প্রশংসালিপি দিয়ে সম্বর্ধিত করেন শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। মোট ৬৫ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের প্রশংসালিপি দেওয়া হয়।

কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগ, বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা (কলিকাতা)-এর যৌথ উদ্যোগে এবং কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় গত ৬.৯.৮০ তারিখে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে 'ব্লক বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা'-১৯৮০ অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণনগর-১ ব্লকের বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের মোট ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। শক্তিনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মহুয়া চ্যাটার্জী, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র তন্ময় রায় এবং কৃষ্ণনগর লেডী কারমাইকেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী করবী বসাক যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই ৩ জন বিজয়ী প্রতিযোগী আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর '৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'নদীয়া জেলা বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতায়' অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করবে।

ঐ দিনের অনুষ্ঠানে মাননীয় শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুবেশচন্দ্র সরকার, কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রানাঘাট-২ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ের পরিচালনায় ১১ই আগস্ট সোমবার ১৯৮০ রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ে ব্লক যুব 'তথ্যকেন্দ্র'র উদ্‌বোধন করা হয়। তথ্যকেন্দ্রের মূল আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞান, ক্রীড়া, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও কর্ম-সংস্থানসমন্বিত প্রায় একশত পুস্তক-পুস্তিকা এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কোন এক অনুরাগীর হাতে পুস্তক তুলে দিয়ে তথ্যকেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন রানাঘাট ২নং ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীকার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রানাঘাট ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় এবং বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রানাঘাট মহকুমার তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক। সভাপতি ও উদ্‌বোধক মহাশয় তথ্যকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা উপস্থিত শ্রোতৃ-

মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যুব সংস্থা, বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত প্রতিনিধির তরফ থেকে প্রায় ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এই মর্মে আরও অনেকেই বক্তব্য রাখেন।

যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে, নেহরু যুবক কেন্দ্র (বর্ধমান) ও বিড়লা কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ সহযোগিতায় এবং রানাঘাট-২ ব্লক যুব-করণের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় গত ৪ঠা আগস্ট বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সূর্যগ্রহণ-৮০। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বি-ডি-ও শ্রীকার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। ১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

পশ্চিম দিনাজপুরঃ

রায়গঞ্জ ব্লক যুব-করণ—বিগত বছরগুলির মত এ বছরও যুব-কল্যাণ বিভাগের (পঃ বঃ সরকার) রায়গঞ্জ ব্লক যুব-করণের ও কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার উদ্যোগে বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ তারিখে রায়গঞ্জ মোহনবাটী হাই স্কুলে রায়গঞ্জ ব্লক লেভেল ছাত্র-বিজ্ঞান আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল—সূর্যগ্রহণ-১৯৮০। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন মোহনবাটী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকালিপদ সরকার। এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্রে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ যথাক্রমে সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য, অমিয় ভট্টাচার্য ও দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের কৃতী ছাত্রদের নাম নীচে উল্লেখ করা হলঃ পার্থ ঘোষ, করোনেশন হাই স্কুল—১ম স্থান। পার্থ-প্রতিম কুণ্ডু, দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র—২য় স্থান। অমিত দাস, মোহনবাটী হাই স্কুল—৩য় স্থান। মিলন মুখার্জী, রামপুর এস. সি. হাই স্কুল—সান্ত্বনা পুরস্কার। তপন ব্রহ্ম, মহারাজা জগদীশনাথ হাই স্কুল—সান্ত্বনা পুরস্কার। অনিমেষ সাহা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন—সান্ত্বনা পুরস্কার।

রায়গঞ্জ ব্লক ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনা-চক্রে বক্তব্য রাখছে শ্রীমান অসিত দাস

উপরোক্ত প্রথম তিন জন ছাত্র জেলা বিজ্ঞান আলো অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে।

যুবকল্যাণ বিভাগ ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে ও রায়গঞ্জ ব্লক যুব-করণের ব্যবস্থাপনায় 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনাচক্র' অনুষ্ঠিত হয় বিগত ১৩.৯.৮০ তারিখে রায়গঞ্জ সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রে।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী মোট ২১ জন ছাত্র এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যাচক্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ও কৃতী ছাত্রদের হাতে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ ব্লকের বি. ডি. ও. শ্রীসত্যব্রত ঘোষ। প্রতিযোগিতার কৃতী ছাত্রদের নাম নিম্নরূপঃ পার্থ ঘোষ, রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল—১ম। জয়ন্তকুমার সরকার, পার্বতীসুন্দরী (কালিয়াগঞ্জ) স্কুল—২য়। পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, এস. ডি. পি. ইউ বিদ্যাচক্র, রায়গঞ্জ—৩য়। অমিত দাস, মোহনবাটী হাই স্কুল—৩য়। সৌম্যকান্তি গুহ, সরলাসুন্দরী স্কুল, কালিয়াগঞ্জ—৪র্থ। বিশ্বজিৎ দাস, ইসলামপুর হাই স্কুল—৫ম। তাপস কুণ্ডু, হিলি রামনাথ হাই স্কুল-৬ষ্ঠ।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনা-চক্রে প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীমান পার্থ ঘোষ পুরস্কার গ্রহণ করছে রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায়ের হাত থেকে

উপরোক্ত ছাত্রদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীরা রাজ্য ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেছেন, যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭.৯.৮০ তারিখে কলকাতায়। অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপকগণ ডঃ সুপ্রকাশ আচার্য, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়) এবং শ্রীধ্রুবদেব-নারায়ণ সিং (বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়)।

কোচবিহার ঃ

দিনহাটা ব্লক যুব-করণ—এই বৎসর দিনহাটা ব্লক যুব-করণের পক্ষ থেকে ২৫টি গ্রামীণ ক্লাবকে খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম—ফুটবল, ভলিবল, পিটিস্, জার্সি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি এই অফিসের পক্ষ থেকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয় ওকড়াবাড়ী অঞ্চলে। এই শিবিরেও ৩০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি নিগমনগরে এই যুব-করণের উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয় একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট। এতে ৮টি গ্রামীণ ফুটবল সংস্থা অংশগ্রহণ করে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে এই করণের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ১টি ট্রাক্টর, ৪টি মাইকের দোকান এবং একটি স্টেসনারী দোকানের ব্যবস্থা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের ব্লকভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র গত ৬ই সেপ্টেম্বর এই যুব-করণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমুকুলচন্দ্র দেবনাথ, সভাপতি, দিনহাটা ১নং পঞ্চায়েত সমিতি। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তম সাহা, সোনিদেবী জৈন উচ্চ বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নীলাম্বর সরকার এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে অতীশ রায়, নিগমানন্দ সারস্বত বিদ্যালয়। এই তিন জন এর পর জেলা বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করবে।

পুরুলিয়া ঃ

বাগমুণ্ডি ব্লক যুব-করণ—গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বাগমুণ্ডি ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে "সূর্যগ্রহণ-১৯৮০"—এই বিষয়ের উপর বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতামূলক এই আলোচনাচক্রে অংশ নিয়েছিল স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগ্রত করতে এই ধরনের আলোচনাচক্রের আয়োজন আদিবাসী অধ্যুষিত অনুন্নত এলাকায় এই প্রথম। সেমিনারে আগ্রহী শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীরা। চার জন সফল প্রতিযোগীকে অভিজ্ঞানপত্র ও পুরস্কারস্বরূপ বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সুবোধ বসুরায়। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় করমহাপাত্র। বিজ্ঞান আলোচনাচক্রকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল।

দার্জিলিং ঃ

কার্শিয়াং ও মিরিক ব্লক যুব-করণ—গত ৩০.৮.৮০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় কার্শিয়াং ও মিরিক ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় কার্শিয়াং পুষ্পরাণী রায় মেমোরিয়াল হাই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান প্রতিভা অন্বেষণের জন্য এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিলো "১৯৮০ সালের সূর্যগ্রহণ"। এই আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই অঞ্চলের বিজ্ঞানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। আলোচনাচক্রে প্রথম হয় কার্শিয়াং রামকৃষ্ণ হাই স্কুল ফর গার্লস্ স্কুলের ছাত্রী কুমারী কবিতা লামা, দ্বিতীয় হয় সেন্ট যোসেফ গার্লস্ হাই স্কুলের ছাত্রী কুমারী পেমা দুমা দুকপা, তৃতীয় হয় পুষ্পরানী রায় মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ছাত্র বালীকুমার দাস। এছাড়া আরো দুজনকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম তিন জন জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কার্শিয়াং ব্লকের বি. ডি. ও. শ্রী এন. জি. দুকপা ও প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে পুষ্পরানী মেমোরিয়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী এ. কে গুপ্ত ও স্থানীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রী বি. পি. গুরুং। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থানীয় ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান।

মিরিক ব্লকের যুব আধিকারিক ও কার্শিয়াং ব্লকের ভারপ্রাপ্ত যুব আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান জানান যে, চলতি বৎসরের জন্য গত ২৭শে আগস্ট কার্শিয়াং ব্লকের ২৫টি ক্লাবকে মোট ছয় হাজার টাকা ও মিরিক ব্লকের মোট ১৬টি যুব সংস্থাকে ছয় হাজার টাকা হিসাবে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কার্শিয়াং ব্লকের আরো ১৯টি ক্লাবকে পাঁচ হাজার টাকার ক্রীড়া সরঞ্জামাদি অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছে এবং মিরিক ব্লকের যুব সংস্থাগুলির জন্য পাঁচ হাজার টাকার ক্রীড়া সরঞ্জামাদি যুবকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুর হয়েছে। এই সমস্ত আর্থিক অনুদান লাভ করায় যুব সংস্থাগুলি খেলাধুলার প্রতি নতুনভাবে উৎসাহিত হয়।

মালদহ ঃ

পুরাতন মালদহ ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতা—গত ৩০শে আগস্ট ১৯৮০ শনিবার মঙ্গলবাড়ী জি. কে. জুনিয়ার বিদ্যালয়ে যুবকল্যাণ বিভাগ ও বি-আই-টি-এম'এর যৌথ উদ্যোগে পুরাতন মালদহ ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ব্লকের ৫টি বিদ্যালয়ের ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে স্থানীয় বিধায়ক শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীদিব্যেন মুখার্জী। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী কাজল সরকার, সূর্যকান্ত বর্মণ ও রমেন ব্যানার্জী মহাশয়।

পুরস্কার বিতরণী সভায় শ্রীচৌধুরী বলেন এই রকম প্রতিযোগিতার ফলে গ্রাম-বাংলার মানুষের বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, এবং শ্রীদিব্যেন মুখার্জী বি-ডি-ও মহাশয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন তাঁরা যেন প্রতি বৎসর ছাত্রদের এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। সর্বশেষে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীচৌধুরী মহাশয়।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লক যুব-করণ ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংস্থা, কলিকাতা, যৌথ উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১০.৯.৭৯ তারিখ বুধবার বেলা ২টায় একটি বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'সূর্যগ্রহণ ১৯৮০'। হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকের অন্তর্গত ৪টি বিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী গীতা রায় এবং পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমলয়কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅবনীকুমার মণ্ডল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৩ জন ছাত্র-ছাত্রী আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমলয়কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় এবং যুব-করণের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

এজেন্সি নিতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা। ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০০০১।

এজেন্সি নিতে হলে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর উর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০-এর উর্ধ্বে	৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র
নভেম্বর, '৮০

নভেম্বর বিপ্লব

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : কান্তি বিশ্বাস

প্রচ্ছদ : বিজন চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ অধিকারের পক্ষে শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন), কলিকাতা-৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—পঁচিশ পয়সা

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

আলোচনা

প্রতিবেদন

গল্প

কবিতা

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

শিল্প-সংস্কৃতি

খেলাধুলা

বিভাগীয় সংবাদ

দীনেশ মজুমদারের জীবনাবসান

রাজ্য বিধানসভায় বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা দীনেশ মজুমদার গত ২৮শে অক্টোবর এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র সাতচল্লিশ বছর।

প্রয়াত শ্রীমজুমদারের জন্ম ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার গালিমপুর গ্রামে, ১৯৩৩ সালের ১লা জুন। দেশ বিভাগের পর তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে ১৯৪৮ সালে নদীয়া জেলার রাণাঘাটের রূপশ্রী ক্যাম্পে চলে আসেন। এই সময় উদ্বাস্তু আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে উদ্বাস্তু আন্দোলন পরিচালনার সময় তিনি গ্রেপ্তার হন।

রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। যুব আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দিতে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিষদীয় রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালে প্রথম যাদবপুর কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৭২ এবং '৭৭ সালেও ঐ একই কেন্দ্র থেকে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে হেলসিঙ্কিতে এবং ১৯৭৮ সালে কিউবায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব উৎসবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি লুসাকায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেন। দেশে ফেরার পথে তিনি লন্ডন, বার্লিন, রোম এবং কায়রো ভ্রমণ করেন।

তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে অসংখ্য গণতান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে আমরাও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি।

—সঃ মঃ যুবমানস

মধু গোস্বামী-র সংযোজন—

সহজ সুরে যে ডেকেছে
সেই পেয়েছে সাড়া,
চোখ রাঙিয়ে যে এসেছে
সেই খেয়েছে তাড়া।
বাঁচার লড়াই যে করেছে
সেই পেয়েছে পাশে,
মৃত্যু তাকে হানুক ছোবল
জীবন ভালবাসে!

সম্পাদকীয়

ভাবতে অবাক লাগে তেষট্টি বছর আগের একটি দেশের একটি ঘটনা—কী সীমাহীন তার গুরুত্ব, কী গভীর তার তাৎপর্য। শত শত বছর ধরে পৃথিবীর বুকে তো কত ঘটনাই ঘটে চলেছে। কত রাজা-উজীরের পরিবর্তন হয়েছে। কত রাজবংশের উত্থান-পতন হয়েছে। ঘটা করে কত রাজা-রাণীর অভিষেক হয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনার কথা কে কখন শুনেছে যে ৬২ বছর ধরে গোটা দুনিয়ার সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ শ্রদ্ধার সাথে একটি ঘটনাকে বছরে অন্ততঃ একবার স্মরণ করেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে বছরে অন্ততঃ একবার শপথ গ্রহণ করেন দেশে এক সুখী ও সমৃদ্ধিশালী শাসনব্যবস্থা কায়েম করার।

১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় নভেম্বর মাসে (ঐ দেশের পঞ্জিকা অনুসারে অক্টোবর মাসে) তখনকার সাধারণ মানুষের কাছে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হোল। প্রচন্ড প্রতাপশালী শাসনকর্তা জারশাহীর পতন ঘটল। কোন রাজবংশের কোন সৌভাগ্যবান রাজপুত্রের হাতে এই বিরাট দেশের শাসনভার গেল না। দেশ শাসনের দায়িত্ব এমন কি কোন ব্যক্তির হাতেও পড়ল না। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল যৌথভাবে একটি শ্রেণী। যে শ্রেণী হোল শ্রমিকশ্রেণী—গতর-খাটা মানুষের শ্রেণী।

জার্মান দেশের দার্শনিক পন্ডিত কার্ল মার্কস ১৮৪৮ সালে ধনিকশ্রেণীর মৃত্যু পরোয়ানা ও শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দলিল "কমিউনিষ্ট ইশতেহার" প্রকাশ করেন। তাতে তিনি গভীর বিশ্বাস নিয়ে ঘোষণা করেন যে ধনিকশ্রেণীর কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণী একদিন দেশকে পরিচালিত করার ক্ষমতা—রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। অর্থাৎ মেহনতকরা শক্ত হাতে শ্রমিকশ্রেণী শেষ পর্যন্ত দেশের রাজা হয়ে রাজদন্ড হাতে নেবেন। তখনকার দিনের এই অকল্পনীয় কথা শুনে রাজনীতির পন্ডিত থেকে শুরু করে সকলে মার্ক্স সাহেবকে বদ্ধ পাগল বলে উপহাস করেছিলেন। পাগলা গারদ তাঁর যথাযোগ্য স্থান বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

কিন্তু মাত্র ২৩ বছর পর ১৮৭১ সালে ফরাসী দেশে শ্রমিকশ্রেণী শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে দেশের একটি অংশের পরিচালন ক্ষমতা কেড়ে নেয়—এরই নাম প্যারি কমিউন। যদিও এটা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আবার হাতছাড়া হয়। মার্ক্স সাহেব যে উন্মাদ নয় -এ রকম ঘটনা যে ঘটতে পারে—এই খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সারা বিশ্বে এই ঘটনা আলোড়ন তুলল।

প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাজনৈতিক আকাশে যে চমক সৃষ্টি হয়েছিল তার ৪৬ বছর পর রাশিয়ায় তা বাস্তবে রূপ নিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই সার্থক বিপ্লব বিশ্বের মানুষের কাছে প্রমাণ করল মার্ক্স সত্যদ্রষ্টা রাজনৈতিক দার্শনিক। মহান নভেম্বর বিপ্লব শোষণ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন নয়—এই বিপ্লব গোটা শোষণ ব্যবস্থার অবসান করে শোষকগোষ্ঠীকে সমূলে উৎখাত করে মেনহতী শ্রেণীর একনায়কত্বে এক নতুন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করল। মানুষের দ্বারা মানুষের উপর শোষণ চিরদিনের জন্য বন্ধ হোল। কল-কারখানার শ্রমিকের মেহনতে যে পণ্য উৎপন্ন হবে তার ন্যায্য অংশ থেকে তারা চিরবঞ্চিত থেকে সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে আর মালিকশ্রেণী -উৎপাদনের সাথে যাদের কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই—তারা মুনাফার পাহাড় গড়ে বিলাসিতা ও ব্যভিচারের উৎকট আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে—এ ব্যবস্থা বন্ধ হোল। যে ক্ষেতমজুরের ঘামে ক্ষেতে ফসল তৈরী হবে জোতদার-জমিদারশ্রেণী মান্ধাতার আমলের ভূমিব্যবস্থার জোরে তার সবটুকু প্রায় আত্মসাৎ করতে থাকবে—এ প্রথাকে লুপ্ত করে দেয়া হোল। এক কথায়—উৎপাদন সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে নূতন করে স্থাপন করা হোল। উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তি মালিকানা চুরমার করে দিয়ে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হোল। ফলে দেশে উৎপন্ন সম্পদ মানুষের মধ্যে সুষম বন্টনের বনিয়াদ তৈরী করল। জীবনের সনাতনী যন্ত্রণা থেকে মানুষ মুক্তি পেল। যুব-জীবনে বেকারিত্বের অভিশাপের সম্ভাবনা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল। চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের ব্যবস্থা সকল মানুষের জন্য সুনিশ্চিত হোল। মানুষ নূতন জীবনের স্বাদ পেল—তার জীবনের অর্থ খুঁজে পেল।

এই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে সকল মানুষের সৃজনীশক্তির সুষ্ঠু বিকাশের সুযোগ আসলো। মুনাফা সৃষ্টির জন্য নয়—দেশের মানুষের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সমস্ত সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি চালু হোল। সমস্ত বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অগ্রগতি প্রবল গতিতে এগিয়ে চলল।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে হৃদ্‌কম্প শুরু হোল। ধনিকশ্রেণী শিহরিয়ে উঠল। নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে সমস্ত প্রকার চেষ্টা শুরু করল।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ এই নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে আলোকিত হয়ে—নিজ দেশে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। বাকী অংশে এই মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষ শক্তিশালী হচ্ছেন, সংগঠিত হচ্ছেন, লক্ষ্যকে স্থির রেখে, আদর্শে অবিচল থেকে এই ব্যবস্থা কায়েমের দিকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে সকল পুঁজিবাদী দেশে এখন এক চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছে। অস্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকারের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। মানুষের দুর্ভোগ একনাগাড়ে বেড়ে চলেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এক অস্থির পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে এই দেশগুলি চলছে।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও এই সমস্যাগুলি অনিবার্য কারণেই বর্তমান। সমস্ত দিকে অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়ছে। কাজের সুযোগ আরও বেশী সংকুচিত হচ্ছে। বেকারিত্বের তীব্রতা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। দেশের যাবতীয় সমস্যার সঠিক সমাধানের পথ থেকে মানুষের বিশেষ করে লড়াকু যুবসমাজের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, সাংস্কৃতিক জগতে ক্লীবতা, অশ্লীলতা, যৌনতা এবং জীবন-বিমুখতার জোয়ার সৃষ্টি করার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা হচ্ছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা, জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, কু-সংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, আত্ম-কেন্দ্রিকতার মত বিষাক্ত ব্যাধিগুলির প্রসারের দ্বারা যুবমনকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এর সুযোগ গ্রহণ করছে। কতকগুলি সংগত ক্ষোভকে সামনে রেখে বিচ্ছিন্নতাকামী ঝোঁককে সুনিপুণভাবে চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হচ্ছে—দেশের ঐক্য ও সংহতিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আক্রমণ হানার বিভিন্ন প্রকার লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হচ্ছে। সংসদীয় ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে এক ব্যক্তির হাতে দেশ শাসন করার যাবতীয় ক্ষমতাকে সমর্পণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য ভাড়াটে আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের জড়ো করে তাদের দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কড়চা গাওয়ার মঞ্চ তৈরী করা হচ্ছে।

এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্বের লক্ষ-কোটি মানুষের সাথে আমরাও ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবকে স্মরণ করছি। দেশের মানুষ বিশেষতঃ যুবসমাজকে তাই আমরা আহ্বান করব—আসুন দেশের বিদ্যমান সমস্যার কারণ এবং সামগ্রিক অবস্থার এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কাজে আমরা আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করি। নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের দেশের মাটিতে তাকে প্রয়োগ করার কৌশল আয়ত্ব করার ব্রতে আমরা দীক্ষাগ্রহণ করি। দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ যা পেরেছেন—আমরা যা পারি নি—সেই না পারার গ্লানি থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য এই নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে বজ্রকণ্ঠে ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ গ্রহণ করি।

নবীনের জিজ্ঞাসা : প্রবীণের উত্তর

সৌমিত্র লাহিড়ী

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী এবার উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়া সহ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার জনগণ নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে উৎসব মুখর হয়ে উঠবেন, সমাজতন্ত্র নির্মাণ কার্য দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করবেন আর শোষণের শৃংখলে আবদ্ধ পুঁজিবাদী দুনিয়ার মেহনতী জনগণ নিজ নিজ দেশের বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করবেন।

১৯১৭ সালের ৭ থেকে ১৭ নভেম্বরের রক্তঝরা দশটা দিন কাঁপিয়ে দিয়েছিল সারা দুনিয়া। নভেম্বর বিপ্লবের বিজয় অভিযান দেখে শংকিত হয়েছিল দেশে দেশে শোষক শাসক আর অত্যাচারীর দল। কিন্তু বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে, মেহনতী জনগণের কাছে, সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শোষণ শাসনে জর্জরিত পরাধীন দেশের সংগ্রামরত জনগণের কাছে, এই বিপ্লব এক নব যুগের সূচনা করেছিল, বহন করে এনেছিল আগামী দিনের উষার আলো। মানব জাতির ইতিহাসে নভেম্বর বিপ্লব-ই একমাত্র বিপ্লব নয়। রুশ দেশের বিপ্লবের আগেও বহু বড় বড় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। বহু রক্ত ঘাম আর অশ্রুর পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে এসেছিল সে সব বিপ্লব। যেমন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের বিপ্লব, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব মানব সমাজে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু মানব ইতিহাসের সমস্ত সংঘটিত বিপ্লবের সংগে নভেম্বর বিপ্লবের পার্থক্য ছিল বিরাট। কি সেই মৌলিক পার্থক্য?

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী বহনকারী ফরাসী বিপ্লবও মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ করতে পারেনি। সেই বিপ্লবেও শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটেনি। নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বে সংঘটিত সমস্ত বিপ্লব—ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রগতির কথা বলা হলেও, মানব জীবনের কিছু কিছু সমস্যার মোকাবিলা করলেও সেই সব বিপ্লব শোষণের অবসান ঘটায় নি। নভেম্বর বিপ্লবই পৃথিবীর বুকে মানব জাতির ইতিহাসে প্রথম বিপ্লব যা শোষণের অবসান ঘটিয়েছে, নতুন যুগের সূচনা করেছে।

একদল শোষকের জায়গায় আর একদল শোষককে বসানো, এক রকম শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তে আর এক রকম শোষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল না। নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের সকল রকম ব্যবস্থার অবসান করা, সমস্ত শোষকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করা, উৎপাদনের উপায়-সমূহে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা, রাষ্ট্র কর্তৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর এক নায়কত্ব কায়েম করা, সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে যারা সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী সেই শ্রমিকশ্রেণীর শাসন-কর্তৃত্ব সংস্থাপিত করা, বুর্জোয়া শ্রেণীর গণতন্ত্রের অর্থাৎ সমাজের শতকরা দশভাগ মানুষের গণতন্ত্রের অবসান করা এবং মেহনতী মানুষের গণতন্ত্র অর্থাৎ সমাজের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা।

নভেম্বর বিপ্লব আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কঠোর পাহারা ও নিষ্ঠুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ, অনেক তথ্য এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণ কার্যের অগ্রগতির সংবাদ আসতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অসংখ্য সৈনিক নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে নতুন পথ নির্দেশ খুঁজে পান। এক নতুন ধরনের সংগ্রাম জন্মলাভ করে। যদিও বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার বিকৃত তথ্যই প্রচার করত, নভেম্বর বিপ্লবের লাল ফৌজদের দস্যু বলে চিহ্নিত করত, বলশেভিক জুজুর ভয় দেখাত এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের আতঙ্ক ছড়াত, তবুও তারই মধ্যে অনেকে খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির পথ। চোরা পথে বিপদের বিপুল ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবীরা সংগ্রহ করতেন সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের বই, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের চিরায়ত গ্রন্থাবলী।

যাদের হাত ধরে ভারতের জনগণ মুক্তির নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেছিলেন, যারা তখন কৈশোরের স্বপ্নময় জগৎ ছেড়ে যৌবনের প্রাণোচ্ছ্বলতায় স্বাধীনতার সংগ্রামে খুঁজে ফিরছিলেন বিকল্প পথ, তাঁদেরই কয়েকজনকে নভেম্বর বিপ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, বক্তব্য শুনতে চেয়েছিলাম। সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী, প্রবীন জননেতা ত্রিদিব চৌধুরী আমাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, নবপ্রজন্মের কাছে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করেছেন।

আমাদের প্রশ্নাবলী

সবার কাছেই আমরা একই প্রশ্ন উপস্থিত করেছিলাম। সেই প্রশ্নগুলি হলো—

১। নভেম্বর বিপ্লবের কথা কবে কখন কোথায় কার কাছে প্রথম শুনলেন। আজকের নয়, তখনকার প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

২। নভেম্বর বিপ্লবের সংগে অতীতের অন্যান্য বিপ্লবের কি মৌল পার্থক্য আপনার চোখে ধরা পড়েছিল?

৩। নভেম্বর বিপ্লবোত্তর চিন্তাধারাটি কিভাবে আপনি গ্রহণ করলেন?

৪। নভেম্বর বিপ্লবোত্তর আশা-প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে?

৫। নভেম্বর বিপ্লব প্রসংগে আপনার কোন ব্যক্তিগত স্মৃতি আছে কি?

৬। নভেম্বর বিপ্লব কি আর অতীতের মত যুব সমাজের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে না?

৭। নভেম্বর বিপ্লব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কি প্রভাব বিস্তার করেছে?

৮। বর্তমান যুব সমাজের কাছে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আপনার বক্তব্য কি?

বিনয় চৌধুরী

"আমরা তখন নতুন পথ খুঁজছি। ভাবছি স্বাধীনতার পর কি হবে, সমাজ কেমন হবে, কিভাবে গড়ে তুলব আমাদের দেশ। তখন

যৌবনের তেজ, রক্তে দোলা দিত স্বাধীনতার সংগ্রাম, মিছিল মিটিং দেখতাম, আকর্ষণ অনুভব করতাম, কখনও মিশে যেতাম জনতার ভীড়ে। কিন্তু ঐ প্রশ্ন—স্বাধীনতার পর কি হবে? পথ কি? এমন সময় নতুন আইডিয়ার সন্ধান পেলাম, নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলাম"—চিন্তার অতল স্রোত থেকে উঠে এসে বললেন বর্তমান ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জননেতা বিনয় চৌধুরী।

প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে মহাকরণে সময় দিতে পারেন না। জটিল দপ্তরের দায়-দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। পর পর কয়েকদিন সময় দিয়েও অন্য কাজে আটকে গেছেন। কখনও বা দর্শনার্থীর ভীড়ে কথা বলতেও পারেন নি। তারই মধ্যে এক ফাঁকে একদিন সব প্রশ্নের জবাব দিলেন।

নভেম্বর বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন কিশোর। যখন সেই যুগান্তকারী বিপ্লবের সংবাদ, তথ্য ও ঘটনাবলী বুঝতে পেরেছেন তখনও তাঁর বয়স বেশী নয়, সবে যৌবনে পা দিয়েছেন। ফলে দীর্ঘকালের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে মনে করতে হচ্ছে যৌবনের কথা। স্মৃতি বড় প্রতারক। বড় দ্রুত হারিয়ে যায়। খুব সামান্য অংশই সে বহন করতে পারে। তবু মানুষের মনে এমন কিছু কিছু ঘটনা গেঁথে থাকে যা চিরকালের সম্পদ। নভেম্বর বিপ্লবের সেই দোলা লাগানো ঘটনাবলীরও অনেকটাই শ্রদ্ধেয় নেতার স্মৃতিপটে অম্লান রয়েছে। তাঁর কথা থেকেই বলিঃ আমার বয়স এখন সত্তর। সব কথা তাই মনে রাখা মুশকিল। প্রায় পঞ্চাশ বাহান্ন বছর আগেকার কথা। তাই এখন আর মনে করতে পারছি না কবে কোথায় কখন কার কাছে প্রথম নভেম্বর বিপ্লবের কথা শুনেছিলাম। তবে নভেম্বর বিপ্লবের কথা প্রথম শুনেই খুব অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলাম এমন নয়। ধীরে ধীরে তার আদর্শ, তার সাফল্য আমি এবং তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠন যুগান্তর দলের অন্যান্য অনেকে বুঝতে পেরেছিলাম।

আত্মশক্তির সংবাদ

মনে পড়ছে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কথা, বটুকেশ্বর ও ভগত সিংদের সেন্ট্রাল অ্যাসেমব্লিতে বোমা ফেলার কথা। এসব জানতে পেরে উজ্জীবিত হয়েছিলাম। এ সময়ে 'আত্মশক্তি' পত্রিকাতে নিয়মিত সংবাদ পড়তাম, জানতে পারতাম অনেক ঘটনা। রোমাঞ্চ লাগত। তখন আর কত বয়স? বিশের দশকের শেষ দিককার কথা।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ

বিপ্লবী নেতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একটা ছাত্র সম্মেলনে পরিচয় হয়। ভূপেনদার কাছ থেকে ক্রমশঃ জানতে পারি রুশ বিপ্লবের কথা।

হুগলীর শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হয়েছি। সরোজও (সরোজ মুখার্জি) ভর্তি হয়। সে আমার ছাত্রজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তখন আমরা যুগান্তর দলে ছিলাম। ছাত্রজীবনে বিপ্লব ও বিপ্লবী আদর্শ দ্রুত আকর্ষণ করে। আমাকেও করেছিল। ভূপেনদার প্রেরণা তো ছিলই। নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলাম বিপ্লবের কথা। বুঝতে চেষ্টা করলাম। জানতে পারলাম শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করেছে।

তখন কি বই পড়েছিলাম?

ডঃ দত্তর সঙ্গে আলাপের পর পড়তে থাকি William Rhys-এর Russian Revolution জন রীডের দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিন, স্তালিনের লেনিনিজম, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, মার্কস এঙ্গেলস্-এর কিছু কিছু বই। এ ছাড়াও আরও অনেক বই পড়েছি। সব নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

বই সংগ্রহ

হ্যাঁ বেশ জটিল কাজ ছিল। বই পাওয়ার ব্যাপারে বর্মন পাবলিশিং হাউস খুব সাহায্য করেছিল। ওখানে অনেক বই পেতাম। তবে অন্যভাবেও ব্রিটিশ শাসকদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে সংগ্রহ করতাম, পড়তাম আর নব আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতাম।

১৯৩১ সাল। হালিম সাহেব (প্রয়াত আবদুল হালিম), সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখার্জি ও আমি পরিচিত হয়েছি। সরোজ, হালিম সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল।

রোমান্স ছাড়তে পারছিলাম না

ইয়ং ম্যান হিসাবে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। প্রশ্ন, ও নানা জিজ্ঞাসা, মনকে দোলা দিচ্ছে। সত্যি কথা বলতে, সন্ত্রাসবাদের রোমান্স ছাড়তে পারছি না, আবার মনে প্রাণে সেই পথই আমার বিপ্লবী জীবনের পথ ভাবতে পারছি না। দ্বন্দ্ব নিরসনে ছুটলাম আমাদের দলের নেতা বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর কাছে। জানতে চাইলাম পার্টির কর্মসূচী কি, ভবিষ্যতের রূপরেখা কি?

না, তিনি সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। যুগান্তর দল থেকে বেরিয়ে গেলাম। কয়েকজন মিলে তৈরী করলাম ইন্ডিয়ান সোশিয়ালিস্ট রেভলিউশনারী পার্টি। ১৯৩২ সাল। পরে তারও পরিবর্তন হল। তৈরী হলো ইন্ডিয়ান প্রলেতারিয়ান রেভল্যুশান পার্টি। বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলার যুবকদের অনেকের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী দলের মতপার্থক্য দেখা দিল। তারা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে যোগাযোগ হল মার্কসবাদীদের সঙ্গে। আগেই বলেছি আমরা নতুন পার্টি গড়ে তুললাম। সরোজ অবশ্য প্রথম থেকেই হালিমদের সঙ্গে ছিল।

জেলে কাটল পাঁচ বছর

১৯৩৩ সাল। আমি, হরেকেষ্ট (প্রখ্যাত কৃষক নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার) প্রমুখ গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। সেবার সাজা হল না। কিন্তু বীরভূম ষড়যন্ত্র মমলায় আবার গ্রেপ্তার হলাম। সাজা হল সাড়ে চার বছর। জেলের মধ্যে মারামারি করার দরুন সাজা বেড়ে হল পাঁচ বছর।

দীর্ঘ দ্বন্দ্ব সংঘাত অতিক্রম করে এবং মার্কসবাদের বইপত্র পড়ে আমি নভেম্বর বিপ্লবের প্রকৃত তাৎপর্য ধরতে পারি।

সমাজের সর্বনিম্নস্তরের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে

নভেম্বর বিপ্লবের সঙ্গে অতীতের অন্যান্য বিপ্লবের মৌল পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট। সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দেখে আমি উজ্জীবিত হয়েছিলাম। শ্রমিকশ্রেণী মেহনতী মানুষ শাসন ক্ষমতা লাভ করেছে। জমিদার ও ধনিকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছে। সোভিয়েত রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করে পরিকল্পনা মাফিক দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে, শোষণহীন সমাজ কায়েম করছে। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটানোই নভেম্বর বিপ্লবের মৌল পার্থক্য অন্যান্য বিপ্লবের থেকে।

সবকিছু বিচার করে বিপ্লব কতদূর ভাবতে হবে

প্রথমের দিকে, অস্বীকার করব না, রোমান্টিক ভাব ছিল। নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় বিপ্লবের প্রসঙ্গে

আশা প্রত্যাশাও জাগে। কিন্তু তত্ত্ব যত আয়ত্ত করেছি, বুঝতে পেরেছি ভারতীয় রাজনীতির জটিলতা অনেক। অসম বিকাশ। জাতপাতের সমস্যা, ধর্মের প্রভাব, বিশাল দেশ, সংগ্রামের নানা দোলাচলতা সব কিছু বিচার করে বিপ্লব কতদূরে ভাবতে হবে। নিজেদের আরও প্রস্তুত করতে হবে। আরও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফাসীবাদের পরাজয় ও লাল ফৌজের বিরাট সাফল্য, দেশে দেশে মুক্তি সংগ্রামের বিপুল অগ্রগতি এবং সর্বোপরি মার্কসবাদ লেনিনবাদ অধ্যয়ন ও রপ্ত করার মধ্য দিয়ে এ স্থির বিশ্বাস অর্জন করেছি যে, নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই ভারতীয় বিপ্লবের প্রত্যাশিত সাফল্য আসতে পারে। দীর্ঘ সংগ্রাম করার অভিজ্ঞতার দর্পণে বলতে পারি যুব সমাজের হতাশার কোন কারণ নেই। পথ অভ্রান্ত, তাকে আয়ত্ত করতে হবে। নিষ্ঠার সংগে অনুসরণ করতে হবে, এবং প্রয়োগ করতে হবে।

আকর্ষণ ক্ষমতা কমেছে?

এ কথা ঠিক, বিভ্রান্তি বেড়েছে। আমরা যাদের দেখে উজ্জীবিত হয়েছিলাম সেই লেনিনের দেশে সংশোধনবাদী বিভ্রান্তি আছে। চীনের বিচ্যুতি এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নানারকম মতপার্থক্য ও অনৈক্য বর্তমান কালের যুব সমাজের মধ্যে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি করছে। হয়ত আগের মত চট করে আকর্ষণও করতে পারছে না। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা তাদের কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল কথা তুলে ধরতে পারলে, সঠিকভাবে ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে পারলে যুব সমাজ আকৃষ্ট হবেই। তাই যুব সমাজের কাছে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ সঠিকভাবে তুলে ধরা দরকার। যুব সংগঠনগুলি এ ব্যাপারে খুবই তৎপর। তাই এখনও অসংখ্য যুবক নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে নতুন ভারত গড়ার সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়ে আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করার কাজ আমাদের আরও যত্ন সহকারে করতে হবে।

নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শের বিজয় সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ আজও বিপুল প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। নভেম্বর বিপ্লব যে ঔপনিবেশিক বিপ্লবের যুগের সূচনা করেছিল, সেই যুগের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অব্যাহত ধারাই বয়ে চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এক বিপ্লব তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশেই ঘোষিত হয়েছে স্বাধীনতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অভ্যুদয় আর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শের বিজয় সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দাবানলকে নিভিয়ে দিতে পারবে না

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে দুঃখজনক বিরোধ এবং মতপার্থক্য এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতার প্রশ্নে সম্প্রতি কিছু কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যাশিত সাহায্য ও সমর্থন সব সময় মেলেনি, বড় বড় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভূমিকায়ও কোথাও কোথাও দোদুল্যমানতা রয়েছে। সবই সত্যি। কিন্তু ইতিহাসের গতি কে রুখবে। আদর্শের ভাস্বরতা বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে ম্লান হওয়ার নয়। বিরোধ ও এমন কি সংঘর্ষ থাকা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উপস্থিতি ও সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিকাশধারা এ কথাই প্রমাণ করছে যে সাম্রাজ্যবাদীদের আজ আর এমন ক্ষমতা নেই যা দিয়ে তারা জাতীয় মুক্তি অভিযানের দাবানলকে নিভিয়ে দিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ দ্রুত পিছু হটছে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামও ক্রমশঃ দেশে দেশে বিপুল শক্তি অর্জন করছে।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের যুবকদের কাছে আমার বক্তব্য জানতে চান? আমি তাদের একথাই বলতে চাই যে, নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ চির অম্লান। এই বিপ্লবের তত্ত্ব আয়ত্ত করুন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল সিদ্ধান্তগুলি আত্মস্থ করুন।

জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস বুঝে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগ শিখতে হবে

আজ আমাদের দেশের সামনে এক জটিল অবস্থা। জাতপাতের সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিভিন্ন প্রান্তে জনজীবনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মেহনতী জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ভারতের জনগণের প্রকৃত মুক্তি অর্জন করতে হলে, বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে ভারতীয় জনগণের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝতে হবে, আমাদের অতীত ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র বুঝতে হবে, তার অধিক মার্কসবাদী মূল্যায়ন করতে শিখতে হবে এবং সংগ্রাম বিকশিত করার কায়দা কৌশল রপ্ত করে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। যুব সমাজ অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী, তাদের স্বপ্ন বিরাট। সেই স্বপ্ন সফল করার শপথ নিতে হবে। নভেম্বর বিপ্লবের চির অম্লান আদর্শ উর্ধ্বে তোলার মধ্য দিয়েই হতাশা অতিক্রম করার এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাতলে অবিচল থাকার দায়িত্ব নিতে হবে।

ত্রিদিব চৌধুরী

প্রবীন জননেতা ত্রিদিব চৌধুরীর সংগে যোগাযোগ করতে বেশী সময় লাগেনি। একদিন সকালে সোজা চলে গেলাম তাঁদের পার্টি কমিউনে। ১৯৫২ সাল থেকে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের নিরবচ্ছিন্ন বিজয়ী ত্রিদিববাবু কলকাতায় সাধারণত এখানেই থাকেন। বহরমপুরে ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে হাতে খড়ি। কংগ্রেসের ভেতরে ছিলেন অন্যান্য বিপ্লবীদের মতই। ছাত্রজীবন থেকেই কংগ্রেসের আপোষমুখী অহিংস নীতির প্রতি বিশ্বাস ছিল না, ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। আর. এস. পি. গঠিত হওয়ার পর থেকে নিজ মত ও পথে নিষ্ঠাবান থেকে শ্রমজীবী মানুষের জন্য লড়াই সংগ্রাম করছেন। এখন তিনি আর. এস. পি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক। সত্তর অতিক্রান্ত ত্রিদিববাবু আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলে গেলেনঃ

আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রথম ১৯১৯-২০ সালে নভেম্বর বিপ্লবের কথা শুনি। আমার আত্মীয় তখনকার দিনে দেশে বুর্জোয়া খবরের কাগজে নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে যে সমস্ত বিকৃত এবং বিরূপ সংবাদ প্রকাশিত হত প্রধানত তারই উপর নির্ভর করে আমার কাছে গল্প করত। তখন খুব একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া আমার মনে দেখা দেয়নি।

নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে আমি কিছুটা ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই আর একটু বেশী বয়সে। কলেজে প্রথম

বার্ষিক ক্লাসে পড়ার সময় জন রীডের দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিন (ইং) এবং জর্মান বুর্জোয়া লেখক Rene Fullop Mueller-এর Lenin and Gandhi এবং Mind and Face of Bolsevikism -এর মাধ্যমে ১৯২৮-২৯ সালে নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে পারি।

2Mueller বলসেভিক বিপ্লব সম্পর্কে খুব সহানুভূতিসম্পন্ন না হলেও ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর বইগুলি অনেকখানি তথ্যানুগ ছিল এবং নভেম্বর বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাকে আকৃষ্ট করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কর্মী

আমি সে সময় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন সংস্থা "অনুশীলন সমিতি"র সংগে যুক্ত ছিলাম। গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস গণ আন্দোলন আমাদের সেভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। অন্যদিকে পুরনো বিপ্লবী আন্দোলনের পিছনে ব্যাপক গণ সমর্থনের অভাবের দরুন তারও সাফল্য সম্পর্কে আমাদের মনে তখন সংশয় দেখা দিতে আরম্ভ করে।

নভেম্বর বিপ্লব শ্রেণী বিপ্লব

এই বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনবাদ উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীর রাজত্ব কায়েম করার জন্য। পৃথিবীর বুকে সংঘটিত অন্যান্য বিপ্লবের সংগে এই মৌলিক তফাৎটাই আমার চোখে ধরা পড়েছিল।

এম. এন. রায়ের প্রভাব

জারতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য আমাদেরকে স্বভাবতই শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী সংগ্রাম এবং নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করে এবং সেই আদর্শের পিছনে যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা আছে তার দ্বারাও আমরা প্রভাবিত হই। এম. এন. রায়ের ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ আমাদের এ সময়ে এদিকে কিছুটা প্রভাবিত করে। বিশেষ করে তাঁর ও অবনী মুখার্জির লিখিত India in transition আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

তখন মার্কসবাদী সাহিত্য এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পাঠান সংবাদ পত্রিকা 'IMPRECOR' প্রভৃতি গোপন পথে এদেশে আসত। খুব নিয়মিত ছিল না। মাঝে মাঝেই কোথায় যেন আটকে যেত। আমরা এসব বইপুঁথি এবং পত্রপত্রিকা থেকেই নভেম্বর বিপ্লব ও সমাজবাদী রুশ সম্পর্কে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সংগে অল্পবিস্তর পরিচিত হই।

ভাবাদর্শগত সংগ্রাম তখনই শুরু হয়

কিছু ভাবাদর্শগত সংগ্রাম তখনই শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত দোটানায় ছিলাম। পুরনো সংগঠন এবং জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের আকর্ষণ আমাদের মনে বেশ প্রবল ছিল। আবার নভেম্বর বিপ্লব ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী আদর্শও আমাদের মনকে খুবই আলোড়িত করেছিল। যার ফলে আমরা পুরনো বিপ্লবী আন্দোলন নতুনভাবে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলাম।

রূপান্তরের দিকে পুরনো বিপ্লবী আন্দোলন

এ সময়ে ভারতবর্ষে স্বতন্ত্রভাবে Workers and Peasant's Party -র মাধ্যমে কমিউনিষ্ট সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। এই সময়ে বলা চলে পুরোনো বিপ্লবী আন্দোলন একটা রূপান্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

দুটি রাজনৈতিক প্রবণতা

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন, চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টা, প্রভৃতির প্রভাবে ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত পুরোনো ধরনের সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আবার ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা জেলে এবং বন্দীশালায় সমবেত হয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এ সময়েই মোটামুটিভাবে মার্কসবাদী বিপ্লবীদের ভেতরে দুটি রাজনৈতিক প্রবণতা ক্রমশঃ সংগঠিত রূপ নেয়। যথাঃ (১) বিপ্লবীদের একাংশ সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংগঠনের সংগে যুক্ত হল। (২) অপর অংশ সোভিয়েটের স্তালিনবাদী নীতির বিপক্ষে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংগঠনের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হতে চেষ্টা করল।

তবে এই দুই ধারাই যে আদর্শগতভাবে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ ও চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অতীতের মত বিপ্লবীদের মনকে আলোড়িত করে না

নভেম্বর বিপ্লব ৬৩ বছর আগে ঘটেছে। আজকের প্রজন্মের কাছে নভেম্বর বিপ্লবের কথা একটা ঐতিহাসিক ঘটনার বেশী কিছু নয়। নভেম্বর বিপ্লবের পরে প্রথম দুই দশকে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ এবং চিন্তাধারা যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপ্লবীদের মনকে আলোড়িত করত এখন আর সেটা করে না।

অনেক দূরে সরে এসেছে

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে চীন, পূর্ব ইয়োরোপ, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে স্তালিনের সময় থেকে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব নানান কারণে আমলাতন্ত্র ভিত্তিক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠেছে। যার ফলে আমার ধারণা বর্তমান সোভিয়েত কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব নভেম্বর বিপ্লবের লেনিনবাদী চিন্তা ও আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে।

......তবুও ঐতিহাসিক প্রভাব অনস্বীকার্য

তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের মতাদর্শগত সংগ্রাম চীনে প্রলেতারিয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ব্যর্থতা, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের ভেতরে মাওবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে কিছুটা পদক্ষেপ—এসব কারণের জন্য নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব কিছুটা দুর্বল হয়ে এসেছে। সেইজন্য নভেম্বর বিপ্লব অতীতের মত এখনকার যুব সমাজের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমসাময়িক যুগের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনে নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের

[শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়]

দুই ভিন্ন মতাদর্শ বিকাশের দুই ভিন্ন রাস্তা—

দীনেশ রায়

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে (রুশ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অক্টোবর) দুনিয়ার অন্যতম এক বৃহৎ কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে অনগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী দেশে এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে সমগ্র বিশ্ব কেঁপে উঠল। মার্কিন সাংবাদিক জন রীড সে সময় রাশিয়ায় উক্ত ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে রীড ঐ সময়কার ঘটনাবলী "যে দশ দিন বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল" শিরোনামায় লিপিবন্ধ করেছিলেন। জন রীডের এই বিখ্যাত পুস্তকখানি বহু ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তা পড়েন। এই পুস্তকের ভূমিকা লিখেছিলেন লেনিন স্বয়ং।

ঘটনাটি কী? ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে লেনিনের পরিচালনায় রুশদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)র নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্র এবং পুঁজিপতিদের অন্তবর্তী সরকার (কেরেনেস্কী সরকার)কে উচ্ছেদ করে এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে দিয়ে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সূচনা করে। নভেম্বর বিপ্লব বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিলোপ ঘটিয়ে রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। দেশের সর্বহারা শ্রেণী শাসকশ্রেণীর মর্যাদা পায় এবং এইভাবে সংকট-মুক্ত, শোষণ-মুক্ত এবং বেকারী-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের গোড়াপত্তন হয়।

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিতন্ত্রের বিশ্বফ্রন্ট, যাকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকগণ দুর্ভেদ্য বলে মনে করতেন, তাতে বিরাট ফাটল ধরে। বিশ্বভূখণ্ডের ছয় ভাগের এক ভাগ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে। এইভাবে নতুন এক যুগের সূচনা হয়। দুনিয়া দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায়—পুঁজিবাদী শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শিবির। দুই শিবিরের দুই ভিন্ন মতাদর্শ এবং বিকাশের দুই ভিন্ন রাস্তা। দুই শিবিরের কথা লেনিন এবং পরবর্তীকালে স্তালিন তাঁদের একাধিক রচনায় উল্লেখ করেছেন।

লেনিন তাঁর ঐতিহাসিক রচনা "সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর"-এ বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদকে যদি এক কথায় ব্যাখ্যা করতে হয় তা হলে বলতে হবে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তর। লেনিন বলেছেনঃ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরই শুধু নয়, পুঁজিবাদের শেষ স্তরই শুধু নয় সাম্রাজ্যবাদ হল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ এবং সর্বহারা বিপ্লবের পূর্বক্ষণ।

রাশিয়ায় ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব লেনিনের উপরোক্ত তত্ত্বের সঠিকতা কাজের মধ্যে দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব আজিকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সঠিক। নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের ঐতিহাসিক বিজয়ের প্রভাবে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুরু হয় তার আঘাতে পুরোনো ধাঁচের সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। বিশ্বভূখণ্ডের তিনভাগের এক ভাগ এখন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তি বাড়ছে এবং সাম্রাজ্যবাদের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থা দুর্বল হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও প্রতি-আক্রমণের সে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সাহায্যদানের আবরণে সাম্রাজ্যবাদীরা এই সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় অনুপ্রবেশের জন্যে মরীয়া প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একেই বলা হয় "নয়া-উপনিবেশবাদী" অভিযান। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশ এইভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী অভিযানের শিকার হয়েছে। ভারতবর্ষ নয়া-উপনিবেশবাদী দেশ নয়; তবে আমাদের দেশ বিপদমুক্ত, একথা বলা চলে না।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতি

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি রাশিয়ায় তাদের পরস্পরকে স্বেচ্ছায় মেনে নেয় নি। শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল; অর্থনৈতিক অবরোধ থেকে আরম্ভ করে হস্তক্ষেপের যুদ্ধ পর্যন্ত সব কিছুরই আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯১৮ সালে বিশ্বের ১২টি সাম্রাজ্যবাদী দেশ ক্ষমতাচ্যুত রুশদেশের ভেতরের প্রতি-বিপ্লবীদের সহায়তায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে সাড়া দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ শিশু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন ও সাম্রাজ্যবাদীরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে হস্তক্ষেপের যুদ্ধ প্রত্যাহার করে নেয়। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

হস্তক্ষেপের যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার কমিউনিজমে পৌঁছানোর ধাপ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের কর্মসূচি রচনা করে। কিন্তু লেনিন সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের কর্মকাণ্ড দেখে যাওয়ার সুযোগ পান নি। ১৯২৪ সালে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের এই মহান রণনীতিবিদ্ এর জীবনাবসান ঘটে। "কমিউনিজমের অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৈদ্যুতিকরণ" এটা লেনিনেরই কথা। লেনিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব পড়ে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও শিষ্য স্তালিনের ওপর। নানান প্রতিকূল অবস্থা ও বাধা অতিক্রম করে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কাজটি সহজ সরল ছিল না। যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং অন্যান্য কারণে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের মান প্রাক্-১৯১৩ সালের স্তরে নেমে গিয়েছিল।

তাছাড়া স্তালিন ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে সংশোধনবাদ, সুবিধাবাদ, দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ, বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক ও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের বিরুদ্ধে লাগাতার মতাদর্শগত লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। যে

সমস্ত প্রশ্নে মতপার্থক্য ছিল সেগুলির মধ্যে আছেঃ একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব কী না, কৃষকসমাজ সম্পর্কে নীতি, ট্রট্স্কীর বিরতিহীন বিপ্লবের তত্ত্ব ইত্যাদি।

স্তালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির লেনিনবাদী নীতি ও কার্যক্রমই বিজয়ী হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতী মানুষ সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের রাস্তায় এগিয়ে যান।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ মোটামুটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা চালু করা হল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা অনুযায়ী স্থির হল ১৯২৮-৩৩ সালের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে মূলধনী লগ্নী হিসাবে খাটানো হবে ৬,৪৬০ কোটি রুবল; এর মধ্যে শিল্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি বিকাশের জন্য খাটানো হবে ১,৯৫০ কোটি রুবল, যানবাহন ব্যবস্থার জন্য খাটানো হবে ১,০০০ কোটি রুবল এবং কৃষিকার্যে খাটানো হবে ২,৩২০ কোটি রুবল।

প্রথম যোজনার লক্ষ্য ছিল—অনগ্রসর কৃষিপ্রধান সোভিয়েত ইউনিয়নকে অগ্রসর শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা, কৃষির যৌথ-করণ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা, বেকারী বিলোপ করা এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা।

১৯৩৩ সাল আরম্ভ হওয়ার সময় স্পষ্ট দেখা গেল, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী যোজনা তখনই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই, চার বছর তিন মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের যুক্ত অধিবেশনে রিপোর্ট প্রসঙ্গে স্তালিন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার ফলাফল পর্যালোচনা করেন। রিপোর্ট-এ পরিষ্কার দেখা গেল প্রথম যোজনা সম্পাদনের কল্যাণে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান সাফল্য অর্জন করেছেঃ

(ক) সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। কারণ দেশের মোট উৎপাদনে শিল্পোৎপাদনের অনুপাত বেড়ে শতকরা ৭০ ভাগ দাঁড়িয়েছে।

(খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিল্প ব্যাপারে পুঁজিবাদী শক্তির উচ্ছেদসাধন করেছে এবং শিল্পক্ষেত্রে একমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(গ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষিক্ষেত্র থেকে শ্রেণী হিসাবে ধনী কৃষকদের উৎখাত করেছে এবং কৃষিতে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(ঘ) যৌথ কৃষিব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য ও অনটনের অবসান ঘটিয়েছে এবং কোটি কোটি গরিব কৃষক স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহের স্তরে উঠেছে।

(ঙ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শিল্পে বেকার সমস্যা বিলুপ্ত করেছে এবং আট ঘণ্টা রোজ বজায় রেখেও অনেকগুলি শাখাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দিনে সাত ঘণ্টা রোজ ও অস্বাস্থ্যকর উপ-জীবীকার ক্ষেত্রে দিনে ছয় ঘণ্টা রোজের প্রথা প্রবর্তন করেছে।

(চ) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বশাখায় সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ফলে মানুষের হাতে মানুষের শোষণ দূরীভূত হয়েছে।

এই ধরনের অগ্রগতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার কর্মসূচী ছিল প্রথম যোজনার চাইতেও বিশালতর। ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার কাল শেষ হওয়ার আগেই প্রাক্-যুদ্ধ কালের তুলনায় শিল্পোৎপাদন প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়। মূলধন সংবর্ধনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালে সকল শাখায় মোট ১৩,৩০০ কোটি রুবল লগ্নীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেকটি শাখাকে সম্পূর্ণরূপে শিল্পসজ্জায় সজ্জিত করা সুনিশ্চিত হয়। দ্বিতীয় যোজনার প্রধানত কৃষিকার্যের যান্ত্রিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হয়। যানবাহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের পদ্ধতিকে যান্ত্রিকীকরণের মধ্যে পুনর্গঠনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা রচনা করা হয়। সেই সাথে শ্রমিক-কৃষকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেরও ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করার জন্য সোভিয়েতের জনসাধারণকে প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু দেশ, জাতি ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার বৃহত্তর স্বার্থে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ও হাসি-মুখে এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি শক্তিশালী শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে গড়ে না উঠত তা হলে ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে সে বিশ্বের জনসাধারণকে ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হোত না। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনসাধারণের ঐতিহাসিক বিজয় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও দুর্ভেদ্যতা আর একবার সুপ্রমাণিত করে। শোষণ-মুক্ত, সংকট-মুক্ত, দারিদ্র্য-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতিও হয়েছে। অনেকগুলি ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতির কথা স্তালিনের রিপোর্ট, ভাষণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন প্রস্তাবে পাওয়া যাবে। এই ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলি না হলে অগ্রগতির গতিবেগ আরও দ্রুত হত। তবে নতুন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এখানে বড় কথা হল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এগিয়ে গেছে এবং এখন বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন এক মহতী শক্তি যাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করার ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্ত-র্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত অনৈক্য দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এই অনৈক্যকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সচেষ্ট আছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে এই অনৈক্য মিটিয়ে ফেলার জন্য কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সৌভাগ্যক্রমে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর বিশ্বভূখণ্ডের ছয় ভাগের একভাগ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সাধারণ সংকটের আবর্তে পড়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশ্ব-ভূখণ্ডের তিনভাগের একভাগ নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে ওঠার পটভূমিতে বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট আরও গভীর হয়।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে ক্রম-বর্ধিত হারে উদ্বৃত্ত মূল্য অর্পণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়গুলিতে বেসরকারী মালিকানার দরুন নৈরাজ্য ও অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যবস্থায় সত্যিকারের কোন পরিকল্পনা সম্ভব নয়। যেহেতু কোন পরিকল্পনা নেই ও থাকতে পারেও না, এবং যেহেতু সমগ্র ব্যবস্থাই বাজারের ওঠা-নামার ওপর নির্ভর-শীল, সেহেতু জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠিত করা যায় না। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের তাগিদে পুঁজিপতিরা ক্রমবর্ধিত হারে অটোমেশান, যান্ত্রিকীকরণ ও শ্রমিকসংখ্যা হ্রাসের এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যান্য যন্ত্র চালু করে। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে

যেমন অসংখ্য শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে বেকারবাহিনীর কলেবর স্ফীত করে, অপরদিকে তেমনি জনগণের ক্রয় ক্ষমতার তুলনায় বেশি উৎপাদন হয়, এবং ফলে "অতি-উৎপাদনের" সংকট দেখা দেয়। অতি-উৎপাদনের সংকটের মোকাবিলার জন্য আবার উৎপাদন হ্রাস করতে হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর কালে ১০ বছর অন্তর অন্তর এই ধরনের সংকট দেখা দিত।

শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আত্মপ্রকাশের পটভূমিতে পুঁজিবাদ স্থায়ী সাধারণ সংকটের মধ্যে পড়েছে। স্থায়ী ও সাধারণ সংকটের অর্থ এ নয় যে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সংকট একই হারে বেড়ে চলবে। সাধারণ সংকটের অর্থ হলঃ মাঝে মাঝেই মন্দা দেখা দেবে, উৎপাদনের হার হ্রাস পাবে, বেকারী বাড়বে, মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়বে। পুঁজিপতিরা এই সংকট কিছুটা কাটিয়ে উঠবে এবং আংশিক স্থিতিশীলতা আসবে। কিন্তু সংকট থেকেই যাবে। পুঁজিবাদ এই সংকট থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম নয়।

পুঁজিবাদী লগ্নীর চরিত্র এমনই যে, এই লগ্নী যত বাড়বে, ততই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে একদিকে যেমন আরও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হবে, অপরদিকে তেমনি অগণিত শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রকৃত আয় হ্রাস পাবে, তাদের দারিদ্র্য ও দুস্থতা বাড়বে। এটা পুঁজিবাদী লগ্নীর অমোঘ নিয়ম যা আজিকার পরিস্থিতিতেও প্রযোজ্য।

বিশ্ব পুঁজিবাদের সর্ববৃহৎ ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা কি? ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২·৩ ভাগ মাত্র। এটা বিশ্বব্যাংক প্রচারিত হিসাব। আমেরিকার জনসমষ্টির শতকরা ১·৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক জাতীয় আয়ের শতকরা ৩২ ভাগ এবং কোম্পানি শেয়ারের শতকরা ৮২ ভাগ ভোগ করে। এই দেশের ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যের প্রান্তসীমার নিচে বাস করেন, এবং এঁদের মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষকে "চরম দুস্থ" বলা যায়। ১ কোটি ৯৫ লক্ষ শ্রমিকের জন্য কোন সামাজিক বীমা-ব্যবস্থা নেই, এবং ১ কোটি ৭৬ লক্ষ শ্রমিককে কোন বেকারী সাহায্য দেওয়া হয় নি। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক বেকার।

বৃটেনে মুদ্রাস্ফীতি এখন তুঙ্গে। এই মুদ্রাস্ফীতি শ্রমিকদের প্রকৃত আয় হ্রাস করে দিচ্ছে। ১৯৭৯ সালে বৃটেনে বেকারের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৮০ হাজার। বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্‌রা বলছেন, ১৯৮২ সালের প্রথমার্ধে বেকারবাহিনীর কলেবর স্ফীত হয়ে ২৯ লক্ষ ৯০ হাজারে দাঁড়াবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের কাজ রীতিমত অগ্রসর লাভ করছিল এবং শিল্পব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ ঘটছিল, তখন, ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এক অভূতপূর্ব আকারের মারাত্মক বিশ্বব্যাপী সংকট ফেটে পড়ে এবং পরবর্তী তিন বছরে সেই সংকট তীব্রতর হয়ে ওঠে। শিল্পসংকটের সঙ্গে কৃষিসংকটও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। তিন বছর ধরে (১৯৩০-৩৩) অর্থনৈতিক সংকট চলার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদন ১৯২৯ সালের শতকরা ৬৫ ভাগ, বৃটেনে শতকরা ৮৬ ভাগ, জার্মানীতে শতকরা ৬৬ ভাগ ও ফ্রান্সে শতকরা ৭৭ ভাগে নেমে যায়। কিন্তু আলোচ্য সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়, ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৩ সালে শতকরা ২০১ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

"পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে অনেক বেশি উন্নত এর থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয়ে গেল, সমাজতন্ত্রের দেশটিই হল সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র অর্থনৈতিক সংকট-মুক্ত দেশ" [সি-পি-এস-ইউ (বি)-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস]।

১৯২৯ সালে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম সংকট এবং পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতির পটভূমিতেই বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্ কীনস্ তাঁর দাওয়াই হাজির করেন। কীনস্-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোন গলদ নেই। তবে এই ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য নতুন দাওয়াই প্রয়োজন। নতুন দাওয়াই হলঃ রাষ্ট্রীয় লগ্নী বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো। অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির বিকাশে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রাণকর্তা হিসাবে ফ্যাসিবাদী জার্মানী ও ইতালিসহ সবগুলি উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই কীনস্‌কে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু কীনস্-এর দাওয়াই পুঁজিবাদের রোগ সারাতে পারে নি এবং পারবেও না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎখাত ছাড়া অর্থনৈতিক সংকট থেকে সমাজের পরিত্রাণ নেই।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংকট বলতে যা বোঝায় তার কোন স্থান নেই। উৎপাদনের উপায়গুলিতে বেসরকারী মালিকানা, সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নৈরাশ্য ও অরাজকতা, পরিকল্পনার অভাব, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লালসা প্রভৃতি থেকেই অর্থনৈতিক সংকট আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানাই সংকট সৃষ্টির বিরুদ্ধে বড় গ্যারান্টী। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সুসংবদ্ধ ও সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক যোজনায় শুধুমাত্র লক্ষ্যই নির্দিষ্ট করা হয় না, এই লক্ষ্য যাতে বাস্তবায়িত হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। এখানেই সমাজতান্ত্রিক যোজনার সঙ্গে তথাকথিত পুঁজিবাদী যোজনার (যেমন ভারতে) মৌল পার্থক্য। সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণ এ বিষয়ে সচেতন যে, তাঁরা যে দ্রব্য উৎপন্ন করছেন তা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কাজে লাগানো হবে, পুঁজিপতিদের মুনাফার অঙ্ক স্ফীত করার জন্য নয়। সেকারণেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনসাধারণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রেরণা পান।

এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, গণসাধারণতন্ত্রী চীনে ১৯৪৯ সাল থেকেই মূল্যস্থিতি বজায় আছে। চীন সরকার সম্প্রতি কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের দর বাড়িয়ে দিয়েছেন, উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রেরণাদানের জন্য। উৎপন্ন ফসলও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্র ক্রয় করছে। গণসাধারণতন্ত্রী চীনে ১৯৪৯ সালে কৃষকদের ওপর করের বোঝা ছিল শতকরা ৩২ ভাগ, এখন সেই বোঝা শতকরা ৪ ভাগ মাত্র। চীনের রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান উৎস হল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত। ভারতে রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান উৎস হল পরোক্ষ কর। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলি লোকসানে চলে।

আগেই বলা হয়েছে, বিশ্বভূখণ্ডের তিনভাগের একভাগ নিয়ে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠিত। এখন বিশ্বের মোট শিল্পোৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ শতকরা ৪০ ভাগ। এই অংশ যে অনুপাতে বাড়বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন সেই অনুপাতে হ্রাস পাবে।

পুঁজিবাদী বিশ্ব যখন কঠিনতম অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকটে ডুবে আছে, তখন তাদের পক্ষে সামান্যতম পরি-

বৃদ্ধির হারও রক্ষা করে চলা সম্ভব হচ্ছে না, যখন বেকারীর মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, যখন সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী মুদ্রাস্ফীতির কবলে ধুঁকছে, তখন পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির হার দ্রুত বেড়ে চলেছে ও মূল্যস্থিতি রক্ষিত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোন বেকারী নেই, দারিদ্র্য নেই, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতে এখন সরকারী হিসাব অনুযায়ীই ২ কোটির ওপর বেকার রয়েছেন, দারিদ্র্যের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৩৩ কোটি অতিক্রম করে গেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অগ্রগতি

১৯১৩ সালে জারতন্ত্রের শাসনকালে যেখানে বিশ্বের মোট শিল্পোৎপাদনের মাত্র ৪ শতাংশ উৎপন্ন হোত সেখানে ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন একাই ২০ শতাংশ উৎপন্ন করেছে। ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে ৩৪ শতাংশ বেশি তেল এবং ২৬ শতাংশ বেশি কয়লা উৎপাদন করেছে।

১৯৮০ সালের প্রথম ৬ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩৬·২০ কোটি টন কয়লা, ৫·৪৭ কোটি টন অপরিশোধিত লৌহ, ৭·৫৯ কোটি টন ইস্পাত এবং ৯২ লক্ষ টন ইস্পাত টিউব উৎপন্ন করেছে। শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের গড় মজুরী ৩·৬ শতাংশ বেড়েছে। সামাজিক ভোগের তহবিল থেকে সুযোগ-সুবিধাদানের পরিমাণ ৫,৬০০ কোটি রুবল অতিক্রম করেছে।

গণসাধারণতন্ত্রী চীন

১৯৭৭-৭৯ সালের মধ্যে ১ কোটি ৯৩ লক্ষেরও বেশি যুবক এবং অন্যান্যদের রাষ্ট্রের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে।

গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সরকার ১৯৭৮ সালের অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই পরিসংখ্যানগুলি প্রচার করেছেঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন—৩০,৪৭,৫০,০০০ টন (১৯৭৭ সালের তুলনায় ৭·৮ শতাংশ বেশি); শিল্পোৎপাদনের মোট মূল্য ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে যথাক্রমে ১৪·৩ শতাংশ এবং ১৩·৫ শতাংশ বেড়েছে; ১৯৭৭ সালে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২,০৪,৬০,০০০ টন; ১৯৭৮ সালে এটা বেড়ে হয়েছে ৩,১৭,৮০,০০০ টন, অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৫৫·৩ শতাংশ; কয়লা উৎপাদন—৬১·৮০ কোটি টন (১৯৭৭ সালের তুলনায় ২৮ শতাংশ বেশি); অপরিশোধিত তেল—৮·৭০ কোটি টন (১৯৭৭ সালের তুলনায় ১১·৫ শতাংশ বেশি); খুচরো বিক্রয় ১৬ শতাংশ বেড়েছে (জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি চিহ্ন); যৌথ সংস্থাগুলি থেকে কৃষকদের আয় ১৭·৭ শতাংশ বেড়েছে; দেশের শতকরা ৬০ জন শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে; জাতীয় রাজস্ব সংগ্রহ ৪৪·৪ শতাংশ বেড়েছে (কর না চাপিয়ে)।

চীনে ১৯৪৯ এবং ১৯৭৯ সালের মধ্যে শিল্পোৎপাদন বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে বেড়েছে। ভারতে এই বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ মাত্র।

চীন ও ভারত

এখানে কোন তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা অর্থহীন। কারণ চীনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর ভারত ১৯৪৭ সাল থেকে বিকাশের পুঁজিবাদী রাস্তা গ্রহণ করেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সবাই পরিচিত। বেকারী বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, দারিদ্র্যের প্রান্তসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, দেশের আয় ও সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার নগণ্য। পুঁজিবাদী রাস্তার এই পরিণতি হতে বাধ্য।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী পালনকালে আমাদের দুই ভিন্ন মতাদর্শ ও দুই ভিন্ন রাস্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ করতে হবে এবং তার থেকে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

[নবীনের জিজ্ঞাসা : প্রবীণের উত্তর/৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আজও নভেম্বর বিপ্লবের সেই মূল আদর্শ এবং নীতির সঙ্গে বিশেষ করে লেনিনের বিপ্লবী চিন্তাধারা এবং নীতির সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী রকম আছে।

আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আজকের যুব সমাজকে সেই মহান আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার আহ্বান জানাই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা তুলে ধরতে পারলেই যুব সমাজ আমাদের দেশেও যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

হতাশার স্থান নেই

আপনারা—নভেম্বর বিপ্লবের আশা প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে জিজ্ঞাসা করেছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে হতাশাকে কখনও প্রশ্রয় দিই নি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তুলেছে। আজকের যুব সমাজকেও সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে।

---

*প্রবীণ জননেতা আবদুর রাজ্জাক খানের সাক্ষাৎকার অংশটি পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে।

জনশিক্ষার প্রসার ঃ সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে

সুকুমার দাস

যে কোন দেশে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা ভিন্ন মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না, তার মধ্যে যে ক্ষমতা অন্তর্নিহিত রয়েছে তার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার সামগ্রিক প্রসার ভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছুতেই কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। জনসাধারণের সকল অংশ যদি শিক্ষিত না হয়, রাষ্ট্র ও সমাজের নতুন ধ্যানধারণার সঙ্গে যদি তারা পরিচিত না হয়, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি যদি তারা গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে দেশের কোনরূপ উন্নয়ন কর্মসূচীই সফল হতে পারে না। তাই কেবল বিদ্যায়তনের সাধারণ শিক্ষা নয়, সামগ্রিকভাবে জনশিক্ষার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যায়তনে শিক্ষার সুযোগ থেকে নানাভাবে বঞ্চিত বিস্তীর্ণ জনসমাজের মধ্যে শিক্ষার বাণী পৌঁছে দিতে হবে। এবং, যারা বিদ্যায়তনে পাঠের সুযোগ পেয়েছে তাদেরও পরবর্তী জীবনে নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ রাখতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে আজও কি সাধারণ শিক্ষা, আর কি জনশিক্ষা, কোন দিকেও উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। তাই, স্বাধীনতার তেত্রিশ বৎসর পরেও দেশের শতকরা ৬৬ জন মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে।

যেসব মানুষ এখন দেশে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, তারাও যে শিক্ষা পাচ্ছে তা-ও সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, চরিত্র গঠনের দিক থেকে অসম্পূর্ণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্করহিত। তাই দেখা যায়, এই শিক্ষা গ্রহণের পরে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই সমাজের কোন কাজে নিজেদের নিয়োগ করতে পারে না। ইংরেজ শাসনের সুরুতে কেরানী তৈরীর জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল আজও মোটামুটি তাই চলছে। যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে তা ওপর ওপর। মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় নি। বর্তমান যুগের উপযোগী ভারতের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় নি। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে, তা বয়স্ক শিক্ষাই হোক, আর গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই হোক, যা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় এত সামান্য যে উল্লেখের মধ্যেই পড়ে না।

এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। নতুন ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনসমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় তা ভাবতে হবে। এবং, এই ব্যাপারে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে। তবে মনে রাখা দরকার, সমাজতান্ত্রিক দেশে যা সম্ভব হয়েছে, ভারতের মত পুঁজিবাদী দেশে তা সম্ভব নয়। এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুঁজিবাদীরা নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করার চেষ্টা করবে। এতদিন পরেও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যে মূলত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত একটি 'elitist system' রয়ে গেছে, গ্রামের দরিদ্র কৃষক, কারখানার শ্রমিক, শহরের বস্তীবাসীদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার বাইরে থেকে গেছে, তার কারণ এই। বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে যেখানে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে সেখানেও নয়। কারণ, এই সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করা যাবে না, বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠী সংবিধানপ্রদত্ত বিশেষ অধিকারের বলে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রাখবে, এবং সর্বোপরি শিক্ষাকে সংবিধান সংশোধনের দ্বারা রাজ্য তালিকার পরিবর্তে কেন্দ্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়েছে। তথাপি, এর মধ্যেও যতটুকু করা সম্ভব, তা করতে হবে। এবং, ভবিষ্যতের শিক্ষানীতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এদিক থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক।

অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ক'টি কাজের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল নিরক্ষরতা দূরীকরণ। প্রাক-বিপ্লব জারশাসিত রাশিয়ায় দেশের শতকরা মাত্র ২৫ জন লোক শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এই হার আরও কম—শতকরা মাত্র ২০। শতকরা ৮০ জন লোককে অশিক্ষিত রেখে নতুন সমাজ গড়া যায় না। তাই লেনিন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। ১৭ই অক্টোবর, ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক শিক্ষাবিভাগগুলির দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে লেনিন বলেন, "আমাদের দেশে নিরক্ষরতার মত একটা জিনিস যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ রাজনৈতিক শিক্ষার কথা বলাটা বাড়াবাড়ি। এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা নয়, এটা এমন একটা অবস্থা যা ছাড়া রাজনীতি নিয়ে কথা বলা নিরর্থক। নিরক্ষর ব্যক্তি পড়ে রাজনীতির বাইরে। আগে তাকে অ-আ-ক-খ শিখতে হবে। সেটা ছাড়া কোন রাজনীতি হতে পারে না। সেটা ছাড়া হয় গুজব, জল্পনাকল্পনা, রূপকথা আর বদ্ধধারণা, কিন্তু রাজনীতি নয়।" এই কারণে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় যেমন প্রচুর বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিপ্লবের সময় গ্রামের জমিদারদের কাছ থেকে যে সব বই ছিনিয়ে নেয়া হয় তা সকলের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারে রাখা হয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় প্রথম দিকে কাগজের অভাব, ছাপাখানার অভাব, বই-এর অভাব, তথাপি সমবেত চেষ্টায় এই সমস্যার মোকাবিলা করা হয়। কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন এবং লাল ফৌজকেও এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে যুক্ত করা হয়।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপর এই জোর দেয়া হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত পোল্যান্ডের পুনর্গঠন পরিকল্পনায় অন্যতম প্রধান গুরুত্ব লাভ করে এই নিরক্ষরতা দূরীকরণ। ভিয়েতনামে মুক্তিসংগ্রাম চলার সময়েই হো-চি-মিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ শুরু করেন এবং এই কাজে তারা অনেকটা সফলও হন।

কেবল শিক্ষার প্রসার নয়, লেনিন আর একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেন। তা হল সমগ্র জনসমাজকে নতুন রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যারা জারের আমলে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, বড় হয়েছে তারা বুর্জোয়া ধ্যানধারণায় পুষ্ট। নতুন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। শিক্ষক-

সমাজের অধিকাংশই নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বিরুদ্ধে অন্য বুদ্ধিজীবীরাও। এদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য সর্বস্তরে ব্যাপক রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই লেনিন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলেছেন। চীনেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য তাই ছিল। কিন্তু তা বিপথগামী হয়েছে।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় দেশের উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে শ্রমিক কৃষককে উৎসাহিত করার জন্য, কৃষিতে যৌথ খামার ব্যবস্থা, এবং ভোগ্যপণ্য বন্টনে সমবায় সমিতির ব্যবহারের জন্যও ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন হয়েছে। এটাও জনশিক্ষা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংবাদপত্রকেও ব্যবহার করা হয়েছে এই কাজে।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশেই যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় তাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বত্র বাধ্যতামূলক। শিক্ষার অধিকার সংবিধানস্বীকৃত অন্যতম নাগরিক অধিকার।

শিক্ষানীতি নির্ধারণে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের ভূমিকা সমাজতান্ত্রিক দেশে স্বীকৃত। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নতুন শিক্ষা নীতি স্থির করার জন্য যে কমিশন গঠন করা হয় তাতে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক ছাড়াও শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিদের নেয়া হয়। এই কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে সর্বস্তরে তার ওপর জাতীয় বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর কেন্দ্রীয় আইনসভায় ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ সালে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করে নতুন শিক্ষা নীতির প্রবর্তন করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশের শিক্ষানীতি যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত জার্মানী, পোল্যান্ডে প্রথম থেকেই বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের মনে যুদ্ধের বভীষিকা সম্পর্কে সচেতন করা হয়, শান্তির পক্ষে তাদের মনকে গড়ে তোলা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বহু জাতিগোষ্ঠীর বাস। জারের আমলে এদের মধ্যে শিক্ষার কোন প্রসারই হয় নি। অধিকাংশ ভাষাগোষ্ঠীর পৃথক ভাষা থাকলেও অনেকেরই পৃথক কোন লিপি ছিল না। সমাজতন্ত্রের আমলে এদের পৃথক লিপি গড়ে তোলা হয়েছে, এদের মধ্যে শিক্ষার সামগ্রিক প্রসার হয়েছে এবং এদের পৃথক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হয়েছে।

স্কুল কলেজের শিক্ষার পরেও শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষাকে 'Continuing Process' হিসাবে গণ্য করা হয়। সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে কারখানায়, অফিসে, কৃষিখামারে সর্বত্র সাপ্তাহিক, সান্ধ্য ক্লাশের মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন ধ্যানধারণা, রাষ্ট্রের গৃহীত নতুন নীতি ও উৎপাদনক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া ডাকযোগে শিক্ষাব্যবস্থা বা Correspondence Course-ও আছে। পোল্যান্ডে শিক্ষানীতি নির্ধারণ, শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় পোলিশ টিচার্স ইউনিয়নের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই এক রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পুঁজিবাদী দেশের মত নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান নেই। এবং সব প্রতিষ্ঠানই সমাজের সম্পত্তি। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এ সব দেশে নেই। যুগোস্লাভিয়ায় বিদ্যায়তনগুলি স্ব-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান (Self managing institution) রূপে পরিচালিত। স্ব-পরিচালনার বুনিয়াদী সংস্থা রূপে যে বিদ্যায়তন পরিষদ রয়েছে তা প্রধানত শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত।

সমাজতান্ত্রিক দেশে সর্বস্তরের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেয়া হয়। সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের স্বার্থ এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ যদি ভারতে জনশিক্ষার প্রসার করতে হয় তাহলে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপরে। বয়স্ক নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করার অভিযানে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, শিক্ষক সংগঠনের সামগ্রিক অংশগ্রহণ চাই। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ব্যাপক করতে হবে। বিদ্যায়তনের শিক্ষা শেষ হবার পরেও সবাই যাতে নিয়মিত শিক্ষার মধ্যে থাকে তার জন্য কল-কারখানা, অফিস কাছারী, গ্রামগঞ্জ সর্বত্র কর্মে নিযুক্ত লোকেদের জন্য সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে। ব্যাপকভাবে সর্বত্র করেসপন্ডেন্স কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বত্র বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী, বেসরকারী, মিশনারি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সংস্থার যে বহুমুখী কর্তৃত্ব আছে, তার অবসান ঘটিয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী পরিচালনায় নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্তমানকালের উপযোগী করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার পরিচালনায় পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীদের হাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

নভেম্বর বিপ্লবের দর্পণে বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

পৃথিবীতে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক কাল থেকে বহু বিদ্রোহ বিপ্লব ঘটে গেছে, সেগুলির দ্বারা শোষণের ভিত্তি বারবার কম্পিত হয়েছে কিন্তু শোষণের অবসান ঘটে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। একদল শোষকের পরিবর্তে আরেক দল শোষকের আবির্ভাব ঘটেছে। প্যারি কমিউন কিছুদিনের জন্য ক্ষমতা দখল করলেও আবশ্যিক প্রস্তুতির অভাবে স্থায়ী হতে পারে নি। প্যারি কমিউনের দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কার্ল মার্কস ভবিষ্যৎ শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক গতিপথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। রুশ বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন সেই শিক্ষার আলোকে ধাপে ধাপে ১৯০৫ সালের অভ্যুত্থান, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব এবং পরিণতিতে নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম সফল বিপ্লবের বিজয় বৈজয়ন্তী রচনা করলেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার গোড়াপত্তন করলেন। প্রতিবিপ্লবী সোশ্যাল রেভোলিউশনারী ও ট্রটস্কিপন্থী প্রমুখদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন সাম্রাজ্যবাদী দুর্গদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও পৃথিবীতে একক একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব। আর সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে বিশ্ববিপ্লবের উৎসমুখ এবং দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার দৃঢ় ভিত্তি।

লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে এই বিপ্লব এবং পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কার্য শুধু পুঁজিবাদী দেশে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র করান তাই নয়, উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনেও নতুন এক দৃষ্টিকোণ এনে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটিও ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে যায়। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্তর ক্ষমতা হস্তান্তরের স্তর থেকে প্রায় বিপ্লবের স্তরে রূপান্তরিত হয়। রুশ বিপ্লবের বহু কৌণিক সুদূরপ্রসারী প্রভাব তাই দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়াচক্রকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তাই চক্রান্তের পর চক্রান্ত, একের পর এক গৃহযুদ্ধ, বহির্যুদ্ধ নবজাত সমাজতান্ত্রিক রুশিয়াকে মুকাবিলা করতে হয়। লেনিনের সুযোগ্য সহযোগী স্তালিনের নেতৃত্বে রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও মহান জনগণ দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ও সীমাহীন আত্মত্যাগের পথে সেই চক্রান্তগুলি ব্যর্থ করে দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অমোঘ জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন। ইতিহাসের কঠিনতম লড়াই হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার। নবজন্মের অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে সমৃদ্ধ বিপ্লবোত্তর রুশিয়ার জনগণ স্তালিনের নেতৃত্বে মৃত্যুপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছিলেন তাই নয়, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূমি থেকে পুঁজিবাদ উৎখাত করতে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। আজ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শিবির রচিত হয়েছে। মহান চীনের বিপ্লব, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মুক্তি, সর্বশেষ ভিয়েতনামের অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় সমগ্র বিশ্বে ভারসাম্য পাল্টে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে কোণঠাসা করে দিয়েছে, দেশে দেশে শোষক শ্রেণীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করেছে।

এই সমস্ত পরিবর্তনের কার্যকরী সূত্রপাত ঘটেছিল নভেম্বর বিপ্লবের দিনগুলি থেকে। রুশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব দেশে দেশে মুক্তি-সংগ্রামের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিল। এই বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কমরেড স্তালিন বলেছেন: "অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় সূচিত করে মানবজাতির ইতিহাসের একটি মূলগত পরিবর্তন, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক নিয়তিতে একটি আমূল পরিবর্তন, বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনে একটি আমূল পরিবর্তন, সংগ্রামের পদ্ধতি এবং সংগঠনের ধরনসমূহে, জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যগুলির রীতিনীতিতে, সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক শোষিত জনগণের সংস্কৃতিতে ও মতাদর্শে আমূল পরিবর্তন।"

॥ দুই ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বব্যাপী আঘাত এবং রুশ দেশের প্রথম সর্বহারার বিপ্লব সমগ্র ভারত তথা এশিয়াভূমিকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল এবং মুক্তি আন্দোলনের মতাদর্শে সংযোজিত হল নতুন চেতনা। মুক্তি আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর ভূমিকার অবশ্যম্ভাবীতার প্রতি রাজনৈতিক দৃষ্টি এনে দিল। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির শিক্ষায় বাংলার শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে এক গুণগত পরিবর্তন দেখা দিল এবং ক্রমশ সংগঠনের রূপ নিতে থাকল। বিশের দশকের শুরুর এই দিনগুলির অবস্থা বর্ণনা করে শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন: "দেশের অবস্থা এখন খুবই গরম। তাপের ওপর চড়ালে জল যেমন টগবগ করে ফোটে, দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষও সেই রকম টগবগ করে ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ আজও ভোলেন নি। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইলেন না কিছুতেই। আবার বড় বড় নেতারা এই শাসন-সংস্কার কাজে লাগাতে চাইতেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পৌঁছেছে। মজুর শ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব যে এদেশে একদল বিপ্লবী মার্কসবাদে দীক্ষিত কর্মী গড়ে তুলছিল শুধু তাই নয়, বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যেও তাৎপর্যপূর্ণ ছাপ ফেলেছিল। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে লালা লাজপত রায় বলেন: "সামরিকতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের যমজ সন্তান; এরা তিনের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে তিন। এদের ছায়া, এদের ফল, এদের বল্কল—সব কিছুই বিষাক্ত। একমাত্র সম্প্রতি এর পাল্টা শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই

পাল্টা শক্তি হচ্ছে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী।" সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শ্যেনদৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে প্রবাসে ও দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর কমিউনিস্টরা পার্টি গড়ে তুললেন ধীরে ধীরে। শুরু হল সম্পূর্ণ নতুন এক গণজাগরণের সাধনা, ভারতবর্ষের ভিত বদলের সংগ্রাম।

ভিত বদলের সংগ্রাম যখন বিপ্লবী সর্বহারা মানুষেরা শুরু করে, শোষণের জগদ্দল পাথর সরানোর লড়াই যখন চতুর্দিকে কাঁপন তোলে তখন উপরিতলে অর্থাৎ চিন্তা, চেতনা, সংস্কৃতিতেও নতুন সংগ্রাম জন্ম নেয়। শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের এক বিশিষ্ট অংশ কখনও বৈজ্ঞানিক চেতনায়, কখনও মানবিকতাবোধে সভ্যতার পিলসুজ এইসব নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। কায়েমীস্বার্থের প্রস্তর দুর্গে আছড়ে পড়ে গণজাগরণের ঢেউ, আবহাওয়ায় নব বসন্তের আগমনী বার্তা। হেমন্তের ঝরা-পাতার বিষন্নতা ও গর্ভস্থ বসন্তের আগমনী গান তখন শিল্পী, সাহিত্যিকদের কণ্ঠে। বিশের দশকেই শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগুলির মুখপত্র প্রকাশ হতে থাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে। বাংলাদেশে 'গণবাণী', বোম্বাইতে 'ক্রান্তি', পাঞ্জাবে 'কীর্তি', সংযুক্ত প্রদেশে 'ক্রান্তিকারী' ইত্যাদি পত্রিকা নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে মেহনতী মানুষের মধ্যে প্রচারকার্য শুরু করে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্ফর আহ্মদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর প্রচণ্ড দমন-পীড়ন আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় পত্রপত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এর পরে তিরিশের দশকে বাংলা দেশে আবার বহু পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। যেমন, সাপ্তাহিক 'চাষীমজুর' (১৯৩২), সম্পাদক—বৈদ্যনাথ মুখার্জী, 'দিনমজুর' (১৯৩৩), মার্কসবাদী (১৯৩৩), সম্পাদক—অবনী চৌধুরী, 'মার্কসপন্থী' (১৯৩৩), সম্পাদক—আবদুল হালিম, 'গণশক্তি' (১৯৩৪), সম্পাদক—সরোজ মুখার্জী, 'জঙ্গীমজদুর' (হিন্দী), সম্পাদক—সোমনাথ লাহিড়ী, 'মাসিক গণশক্তি' (১৯৩৭), সম্পাদক—মুজফ্ফর আহ্মদ, বঙ্কিম মুখার্জী, সোমনাথ লাহিড়ী, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী প্রমুখ, 'আগে চলো' (১৯৩৮), সম্পাদক—আবদুল হালিম। বলাবাহুল্য সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজ নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে প্রকাশিত এইসব পত্র-পত্রিকার প্রচার সহ্য করে নি। বারবার এইসব পত্রিকার উপর আক্রমণ নেমে এসেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামে বৈপ্লবিক আদর্শের মুখপত্র প্রকাশ অব্যাহতই থেকেছে।

শুধু মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ পত্রপত্রিকা নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের টানাপোড়েনে ও শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের আন্দোলনের অভিঘাতে জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকার চরিত্রেও রূপান্তর আসে। তৎকালীন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সুযোগ্য সম্পাদনায় যেমন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে পালন করেছিল তেমন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সংবাদাদি প্রচারেও সহায়তা করেছিল। কিন্তু অচিরেই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে অপসারণ করে প্রতিক্রিয়ার শিবিরের নেতৃত্ব গ্রহণ করে আর সেই নোংরা চরিত্র আজও বহন করে চলেছে। তাছাড়া সংবাদপত্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সংগে সংগে মধ্যবিত্ত বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'সাপ্তাহিক যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা', 'সাপ্তাহিক স্বাধীনতা' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা। মার্কসবাদী বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের উদ্যোগে এই সময় 'নবযুগ', 'লাঙ্গল' ও 'ধূমকেতু' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে এক গণজাগরণের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে 'দৈনিক স্বাধীনতা' শ্রমজীবী মানুষের 'সত্যযুগ' পত্রিকাও সাধারণ মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে গণ-তান্ত্রিক সাংবাদিকতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করে। এ ছাড়াও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্ররূপে বিভিন্ন সময় 'স্বাধীনতা', 'মতামত' ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতায় সংগে সংগে পত্রপত্রিকাগুলিও ক্রমশ শ্রেণী চরিত্রে বিপরীত কোটিতে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী চরিত্রের ইতিবাচকতা হারিয়ে আন্দোলন সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত মালিকানার পত্রপত্রিকাগুলি বহুল প্রচারের সৌভাগ্য নিয়েও জনস্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে থাকে।

॥ তিন ॥

সমাজ বিপ্লব তো শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনে না, শিল্পসাহিত্যের জগতেও নিয়ে আসে পালাবদলের জোয়ার। সাহিত্য শিল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য সব সময়ই সামাজিক মানুষের শুভাশুভ বিচার বিশ্লেষণ করা। মানবতাবাদী লেখকেরা সমাজ সংসারের সমস্ত মানুষের মঙ্গল বিধান করতে গিয়ে এমন এক ধরনের চেতনার শিকার হয়ে পড়েন যেখানে সুর-অসুরের, শোষক-শোষিতের ভেদাভেদ থাকে না। ফলে তাঁর দ্বারা কায়েমীস্বার্থের শরীরে আঁচড়টিও লাগে না। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লব ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন লেখকদের সামনেও এ প্রশ্ন নিয়ে এল—সকল মানুষের শুভ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে হতে পারে না। অসম সমাজ-ব্যবস্থার অবসান ঘটানর মধ্যেই ব্যাপকতর মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর সেই কাজের আহ্বান দুনিয়াব্যাপী রেখেছে নভেম্বর বিপ্লব। সেই বিপ্লবের দুরন্ত আহ্বানে যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্র আলোড়িত তখন সাহিত্যের জগত তো দূরে থাকতে পারে না! পারেও নি। বাংলাদেশে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠার প্রায় সংগে সংগেই বিপ্লবী সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটতে থাকে। আর এই সাহিত্যের অগ্রচারী স্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি প্রত্যক্ষভাবে নভেম্বর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নজরুল তখন সেনাবাহিনীতে কর্মরত। তাঁর তৎকালীন সহকর্মী জমাদার শম্ভু রায় লিখেছেন : "তিনি অর্গানে একটা মার্চিং গৎ বাজানর পর নজরুল সেইদিন যেসব গান গাইলেন ও প্রবন্ধ পড়লেন তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গানবাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এবং ঠিক মনে নেই, সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়।"

সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেই নজরুল কবিতায় এই বিপ্লবের জয়ধ্বনি ঘোষণা করলেন :

> তোরা সব জয়ধ্বনি কর
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
> ওই নূতনের কেতন ওড়ে
> কাল-বোশেখীর ঝড়
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' গ্রন্থে লিখেছেন : "এই কবিতা রাশিয়ার বিপ্লববাদকে অভ্যর্থনা করে লেখা। তখন ভারতে বা বাংলায় কোন নতুনের কেতন আর দেখা যাচ্ছে না, দিক-দেশ স্তিমিত হয়ে পড়েছে—একমাত্র আশার আলো জেলেছে নতুন মানবতাবাদ, অধিকারের সমত্ববোধ। এই আন্দোলনের সূত্রপাত সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে, ভারতবর্ষে নয়, রাশিয়ায়।" নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের 'শ্রমিকের গান', 'কৃষাণের গান' প্রভৃতি কবিতা

এবং 'সাম্যবাদী'র কবিতাগুলি মার্কসবাদে বিশ্বাস ও নভেম্বর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সংগীত অনুবাদ করেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর রক্ত-পতাকা উত্তোলনের অকুণ্ঠ আহ্বান তিনিই প্রথম জানিয়েছেন দেশ-বাসীর সামনে :

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।...
দুলাও মোদের রক্ত পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।

নজরুলের সেনা-জীবনকালীন রচিত উপন্যাস 'ব্যথার দান'-এ লাল-ফৌজের ভূমিকার উল্লেখ আছে।

সে সময় 'গণবাণী', 'লাঙ্গল', 'ধূমকেতু', 'অরণি' প্রভৃতি পত্রিকায় নজরুল ছাড়াও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখের রচনায় নবচেতনার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যতীন্দ্র নাথের চাষার বেগার, লোহার ব্যথা, বারনারী প্রভৃতি কবিতা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় অবশ্য ইতিপূর্বেই (অর্থাৎ ১৯০৫ সালের) রুশ বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত 'লেনিন' নামের কবিতাটি আমরা কখনই বিস্মৃত হতে পারি না। লেনিনের মৃত্যুর পরও যখন বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলি কুৎসা করে চলেছে তখন পূর্ব বাংলার এই কবি শুধু লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাই নয় বিপ্লবের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছেন :

"বারংবার মৃত্যুবার্তা রটায়েছে বিশ্বদূত
হয় নি সে কাল অঙ্কে লীন
এইবার মরেছে লেনিন।
রুশের গগনসূর্য অস্তমিত আজ
জনগণ অধিরাজ
জীবন্মৃত জাতি চিত্তে জ্বালাইবে দীপ্ত হুতাশন
সত্য কি মরেছে লেনিন?"

তিরিশ ও চল্লিশের যুগে কল্লোল—কালিকলম—সংহতি প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠী আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যের আঙ্গিকগত সমুন্নতি যেমন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তেমন দেখা দিয়েছিল সাধারণ অন্ত্যজ জীবনযাত্রার মানুষের প্রতি গভীর প্রীতি ও আগ্রহ। বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, অশোকবিজয় রাহা, বিষ্ণু দে, দিনেশ দাস, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অরুণ মিত্র প্রমুখের মধ্যে কম-বেশী নভেম্বর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত গণচেতনা স্বতোৎসারিত হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে দু-এক জনকে বাদ দিলে বেশীর ভাগই ভারতের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীদের সংগ্রাম, গণ-নাট্য আন্দোলন এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংগ্রামের পায়ে পা মিলিয়ে এ'রা কবিতা লিখেছেন এবং তার বেশীর ভাগই নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষপাতী। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের '৭ই নভেম্বর', 'সোভিয়েট ভূমি', 'বিপ্লব' প্রভৃতি কবিতা বাংলা কবিতার জগতে দিক্‌চিহ্নস্বরূপ। সুকান্তের 'মধ্যবিত্ত', '৪২', 'কৃষকের গান', 'বোধন', 'বিদ্রোহের গান', 'দিন বদলের পালা', 'একুশে নভেম্বর' প্রভৃতি বহু কবিতায় উন্নত কাব্য-শৈলীতে রচিত হয়েছে বিপ্লবের জয়গাথা। সুকান্ত লিখেছেনঃ

"কিছু না হলেও আবার আমরা
রক্ত দিতে তো পারি
পতাকায় পতাকায় ফের মিল আনবে ফেব্রুয়ারী
এ নভেম্বরে সংকেত পাই তারি।"

বা

"দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে পূর্বকোণ।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক, অগ্নিকোণ, চিরকুট; জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীর গলি, একটি প্রেমের কবিতা, নবজীবনের গান; মঙ্গলাচরণের মেঘ বৃষ্টি ঝড়; অরুণ মিত্রের কাঁটাতার; রাম বসুর তোমাকে, যখন যন্ত্রণা; কৃষ্ণ ধর, সিদ্ধেশ্বর সেন, গোলাম কুদ্দুসের কবিতা প্রভৃতি বাংলা প্রগতি সাহিত্যের রাজপথ নির্মাণ করে দিয়েছে। যে পথ ধরে আজও অসংখ্য কবি-সৈনিক পথ হেঁটে চলেছেন কণ্ঠে রয়েছে তাঁদের অত্যাচারিত নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের জীবনের জয়গান। স্বাধীনতাপরবর্তী অপশাসন ও স্বৈর-শাসনের দিনগুলিতে যেসব কবি অগ্নিশপথে বিপ্লবের জয়ধ্বনি প্রচার করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কনক মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাস, দুর্গাদাস সরকার, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্যামসুন্দর দে, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সাধন গুহ, সনাতন কবিয়াল, গোপীনাথ দে, অমল চক্রবর্তী, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, দীপংকর চক্রবর্তী, জিয়াদ আলি, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী দাসগুপ্ত, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, নিমাই মান্না, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর রায়, সাগর চক্রবর্তী প্রমুখ নবীন ও প্রবীণ কবিরা।

॥ চার ॥

বিশের দশক থেকে বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবজাত গণচেতনা লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বোধ করি ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের। বিপ্লবী সাহিত্যের আদর্শ শুধু এদেশে নয় সম্ভবতঃ বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সঞ্চারিত হয়েছিল এই মহাকাব্যের মাধ্যমে। 'মা' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ এদেশের রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী-দের চিন্তাক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই উপন্যাসের অনুবাদে বিমল সেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও পুষ্পময়ী বসু'র অবদান অপরিসীম।

বিশের দশকে মণীন্দ্রলাল বসু রচিত 'অরুণ' গল্পে রুশ বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের ভূমিকা চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের উল্লেখ আছে। রুশ বিপ্লবজাত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সম্পর্কে ভারত-বাসীর বিশেষ করে বাঙ্গালীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উচ্ছ্বসিত ভাষায় বললেন : "আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর আর সব জায়গায় ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সবচেয়ে বড়োকরে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্য-কর, দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার।...এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা।...অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে

তারাই একমাত্র।" রাশিয়া ভ্রমণের আগেই রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং শোষিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতিমূলক জীবন-চিত্র অঙ্কন করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, নারায়ণ ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রমুখ সেকালের কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় অবজ্ঞাত, অবহেলিত জীবনযাত্রার মানুষদের নিয়ে গল্প, উপন্যাস রচনার প্রবণতা। অনতিপরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, রমেশ সেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, নবেন্দু ঘোষ, গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সোমেন চন্দ, ননী ভৌমিক, অসীম রায়, সুশীল জানা, সতীনাথ ভাদুড়ী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণময় মান্না প্রমুখ কথা-সাহিত্যিক প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীদের সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রেখে সমকালীন সংগ্রাম আন্দোলনের উদ্দাম জোয়ারের তালে তালে অসংখ্য সৃষ্টিসম্ভার উজাড় করে দিয়েছেন। এই সৃষ্টির জন্য বাংলা সাহিত্য গর্বিত এবং বলা চলে এই সৃষ্টি-ধারাই বাংলা সাহিত্যের ধ্রুবপথ রচনা করে দিয়েছে। মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সাহিত্য আজও অম্লানভাবে বাংলা কথা-সাহিত্যে গণচেতনার ধারার পরিপোষকতা করে চলেছে। এই পথ ধরেই এসেছিলেন সমরেশ বসু, কিন্তু আজ তিনি প্রতিক্রিয়ার শিবিরে হারিয়ে গেছেন। সংগ্রামী জীবন দর্শনের ধারাটি কথা-সাহিত্যে অব্যাহতভাবে আজও যাঁরা বহন করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কৃষ্ণ চক্রবর্তী, তপোবিজয় ঘোষ, চিত্ত ঘোষাল, সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মণি মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, কালিদাস রক্ষিত, মিহির আচার্য, দেবদত্ত রায়, রামশঙ্কর চৌধুরী, হীরালাল চক্রবর্তী প্রমুখ।

গণনাট্য আন্দোলনের ধারায় নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব সর্বাপেক্ষা কার্যকরী রূপ পায় নাটক ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। নাটকের ক্ষেত্রে নতুন দিনের বাণী বহন করে এনেছিলেন মন্মথ রায়, শচীন সেন-গুপ্ত, বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, শম্ভু মিত্র, বিনয় ঘোষ প্রমুখ। এঁদের সৃষ্ট নাটক বাংলা নাটকের গতিধারা সম্পূর্ণ বদলে দিল। রঙ্গমঞ্চে ও প্রধানত রঙ্গমঞ্চের বাইরে মাঠে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে বাংলার প্রগতি-মূলক ও গণনাট্য এই সব নাট্যকারের সৃষ্টিকে নির্ভর করেই ছড়িয়ে পড়ে। এই ধারা বহন করেই অন্যান্য শক্তিমান নট ও নাট্যকাররা এসেছেন যাঁদের মধ্যে রয়েছেন উৎপল দত্ত, বীরু মুখোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, জ্যোছন দস্তিদার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, হীরেন ভট্টাচার্য, চিররঞ্জন দাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির সেন, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজীব গোস্বামী, বাসুদেব বসু, শ্যামাকান্ত দাস, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দেবাশিষ মজুমদার, বিদ্যুৎ নাগ, শুভংকর চক্রবর্তী, শশাংক গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

এদেশে সাধারণ মানুষের শোষণমুক্তির সংগ্রাম আজও চলছে এবং চলবে যতদিন পর্যন্ত না আরব্ধ লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হয়। আর সমস্ত বাধা বিপত্তি অপসারণ করে সংগ্রামী মানুষের বিজয় ঐতিহাসিক কারণেই অনিবার্য। সেই সংগ্রামের সাথীরূপে সাহিত্যের একটি প্রবল ধারা উত্তরোত্তর বেগবান হয়ে প্রবাহিত হতেই থাকবে। মাটির বুকে যেমন গাছ ও তার ফুল-ফলের জীবনরস নিহিত থাকে, তেমনি মানুষের সংগ্রামের মধ্যে জীবনমুখী সাহিত্যের উৎস। সেই উৎসমূল থেকে নিয়ত প্রাণরস আহরণ করে বিপ্লবী সাহিত্য তার স্থান করে নেবেই এই সমাজে।

ভারতীয় শিল্পে শোষণের হার

গোপাল ত্রিবেদী

কার্ল মার্ক্স তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিট্যাল'-এর প্রথম খণ্ডে পণ্যের মূল্যকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—উৎপাদিত উপকরণের মূল্য, শ্রমের মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্য। মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে সব মূল্যই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিযুক্ত শ্রমিকের কার্যকালের দ্বারা নির্ধারিত হয়। পণ্য তৈরী করতে দু' রকমের উপকরণ লাগে—উৎপাদিত উপকরণ ও মানুষের শ্রম। উৎপাদিত উপকরণের মূল্য, সেটা তৈরী করতে যে পরিমাণ শ্রম লেগেছিল তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদিত উপকরণের শ্রমমূল্যের সঙ্গে আরও শ্রম সংযোজিত হয়ে নূতন পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়।

শ্রম সংযোজনের জন্য শ্রমিক তার শ্রমের মূল্য মজুরী হিসাবে পায়। আর বাদবাকী শ্রমমূল্য শিল্পপতি উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে সংগ্রহ করে। অর্থাৎ শ্রমিক যতটা সময় কাজ করে ততটা শ্রমমূল্য সৃষ্টি করে; কিন্তু সৃষ্ট শ্রমমূল্যের এক অংশ শ্রমিক শ্রমের মূল্য হিসাবে পায়, আর বাকী অংশ যে শিল্পপতি শ্রমিককে নিয়োগ করে তার হাতে উদ্বৃত্ত হিসাবে থাকে। সেইজন্য মার্ক্স উদ্বৃত্ত মূল্য ও শ্রমের মূল্যের অনুপাতকে শ্রমিক-শোষণের হার বলে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রমিক যদি দিনে আট ঘণ্টা কাজ করে এবং সে যে মজুরী পায় তার পরিমাণ যদি পাঁচ ঘণ্টা কাজের সমান হয়, তা হলে তিন ঘণ্টার কাজ উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে শ্রমিক-শোষণের হার দাঁড়ায় $\frac{৩}{৫}$×১০০=৬০ শতাংশ।

মার্ক্সের সংজ্ঞা অনুসারে শ্রমিক-শোষণের হার নির্ণয় করতে হলে পণ্যের মোট মূল্য ও তার ভাগ তিনটি শ্রমিকের কার্যকালের পরিমাপে প্রকাশ করা দরকার। কিন্তু শিল্পোৎপাদনের যে হিসাব আমরা পাই তাতে পণ্যের শ্রমমূল্য জানা যায় না, সব মূল্যই টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। সেইজন্য মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুসারে শ্রমিক-শোষণের হার প্রচলিত হিসাব থেকে নির্ণয় করা যায় না। তবু শিল্পোৎপাদনের যেসব হিসাব টাকার অঙ্কে পাওয়া যায় তা থেকে শ্রমিক-শোষণের হার সম্বন্ধে একটি স্থূল ধারণা করতে কোন অসুবিধা হয় না। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় শিল্পে শ্রমিক-শোষণের হার সম্বন্ধে একটি স্থূল হিসাব উপস্থিত করার চেষ্টা করছি।

ভারতের শিল্পোৎপাদন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই সকল তথ্য 'সেন্সাস্ অব্ ম্যানুফ্যাক্চারিং ইন্-ডাস্ট্রিজ'এর কল্যাণে পরিবেশিত হয়েছে। ১৯৫৯ সাল থেকে 'এনুয়াল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ' এই সকল তথ্য প্রকাশ করে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই ত্রিশটি বছরের মধ্যে দু' বছরের কোন তথ্য পাওয়া যায় না, কারণ ১৯৬৭ ও ১৯৭২ সালের জন্য 'এনুয়াল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ'এর পক্ষ থেকে কোন তথ্য প্রকাশিত হয় নি।

'সেন্সাস্ অব্ ম্যানুফ্যাক্চারিং ইন্ডাস্ট্রিজ'এর তথ্যে ২৯টি প্রধান শিল্পে বিদ্যুৎশক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহারকারী ও ২০ জন বা তার বেশী শ্রমিক নিয়োগকারী সব কারখানাকে ধরা হয়েছে। 'এনুয়াল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ'এর তথ্যে বিদ্যুৎশক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহারকারী যে সব কারখানায় ৫০ জন বা তার বেশী শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছে এবং বিদ্যুৎশক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহার করে না এমন যে সব কারখানায় ১০০ জন বা তার বেশী শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছে, তাদের উৎপাদন সংক্রান্ত হিসাব পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভারতের বড় বড় সব কারখানার একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।

এই সকল কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য থেকে যে সকল উৎপাদিত উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মোট মূল্য বাদ দিলে কারখানায় সংযোজিত মূল্যের পরিমাণ জানা যায়। কারখানায় সংযোজিত মূল্যের দু'টি ভাগ আছে—শ্রমিকের মজুরী এবং উদ্বৃত্ত মূল্য। শ্রমিককে বেতন, ভাতা, বোনাস এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে তার মোট পরিমাণকে শ্রমিকের মজুরী বলে ধরা হচ্ছে। কারখানায় সংযোজিত মূল্য থেকে শ্রমিকের মজুরী বাদ দিলে যা পড়ে থাকে তাকে স্থূল অর্থে উদ্বৃত্ত মূল্য বলা যেতে পারে। এইভাবে পাওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যকে শ্রমিকের মজুরী দিয়ে ভাগ করে সেই ভাগফলকে একশ' দিয়ে গুণ করলে শ্রমিক-শোষণের শতকরা হার পাওয়া যায়। এইভাবে পাওয়া হিসাবটি আমরা উপস্থিত করছি। [২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

ভারতীয় শিল্পে শ্রমিক-শোষণের হার সম্পর্কে আটাশ বছরের যে হিসাব আমরা উপস্থিত করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে শোষণের গড় হার ৭৭ শতাংশ। আটাশ বছরের গড় হার ৭৭ শতাংশ হ'লেও বছরে বছরে এই হার অনেকখানি উঠানামা করেছে। সংযোজিত লেখচিত্রে এই অবস্থাটি পরিষ্কারভাবে দেখান হ'ল।

স্থূল দৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে তা হ'ল (১) ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত শোষণের হার পরবর্তী কালের তুলনায় অনেক বেশী উঠানামা করেছিল, (২) ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত শোষণের হার গড় হারের উপরে মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল, এবং (৩) ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে শোষণের হার বছর দুই খানিকটা কমতে থাকলেও ১৯৬৮-৬৯ সালের পর থেকে আবার দ্রুত বাড়তে থাকে।

মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে শ্রমিক-শোষণের হার নির্ভর করে শ্রমিকের কার্যকালের উপর এবং তার জীবনযাপনের জন্য সেই কার্যকালের কতখানি দরকার তার উপর। এগুলি আবার নির্ভর করে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কিত শ্রেণী সংগ্রামের উপর, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার উপর এবং উৎপাদনে যন্ত্র ব্যবহারের উপর। আমরা এখানে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের সাথে শোষণের কি সম্পর্ক ভারতীয় শিল্পে দেখা যায় তা নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ করছি।

ভারতীয় শিল্পে মূল্য-গঠন এবং শোষণের হার, ১৯৪৬—১৯৭৫

বৎসর	উৎপাদিত উপকরণের মূল্য (কোটি টাকায়)	শ্রমিকের মজুরী (কোটি টাকায়)	উদ্বৃত্ত মূল্য (কোটি টাকায়)	পণ্যের মোট মূল্য (কোটি টাকায়)	শোষণের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৯৪৬	৩৯১	১০২	১০৯	৬০৩	১০৭
১৯৪৭	৫০১	১০৬	১০৬	৭৪৩	৭৮
১৯৪৮	৬৩৬	১৬৬	১৫২	৯৫৪	৯২
১৯৪৯	৭০৩	১৭৭	৯৬	৯৭৬	৫৪
১৯৫০	৭৪৪	১৭২	১১২	১০২৮	৬৫
১৯৫১	৯৬০	১৮৯	১৫৭	১৩০৬	৮৩
১৯৫২	৮৬৯	২০১	১১৪	১১৮৪	৫৭
১৯৫৩	৭৮৯	২০৫	১২৯	১১২৩	৬৪
১৯৫৪	৯১৫	২১৯	১৫৪	১২৮৮	৭০
১৯৫৫	৯৮৬	২৩১	১৮৯	১৪০৬	৮২
১৯৫৬	১১৪৫	২৫৬	২১৩	১৬১৪	৮৩
১৯৫৭	১২৫৬	২৭০	১৯৮	১৭২৪	৭৩
১৯৫৮	১২২২	২৬৮	২২২	১৭১১	৮৩
১৯৫৯	১৭৯১	৪৩৮	৩৭৫	২৬০৪	৮৬
১৯৬০	২২৮৬	৪৮২	৩৮২	৩১৫০	৭৯
১৯৬১	২৭০৫	৫৩৬	৪৫২	৩৬৯৩	৮৪
১৯৬২	৩০৬১	৬২৮	৪৮৭	৪১৭৬	৭৮
১৯৬৩	৩৫০৪	৭০২	৫৯৩	৪৭৯৯	৮৪
১৯৬৪	৪১২৪	৮৩০	৬৭৩	৫৬২৭	৮১
১৯৬৫	৪৭৯২	৯৭০	৭৩০	৬৪৯২	৭৫
১৯৬৬	৫৪১৬	১০৭২	৭৬০	৭২৪৮	৭১
১৯৬৭	—	—	—	—	—
১৯৬৮	৬৫৭৭	১৩০৮	৭৮৮	৮৬৭৩	৬০
১৯৬৯	৭৫১৭	১৪৬২	৯৭৭	৯৯৯৬	৬৭
১৯৭০	৮৫৩৭	১৬৫৯	১১৫০	১১৩৪৬	৬৯
১৯৭১	৯৯৪৩	১৮২২	১৩০১	১৩০৬৬	৭১
১৯৭২	—	—	—	—	—
১৯৭৩	১১৮৯৪	২২৬৩	১৮৩৬	১৫৯৯৩	৮১
১৯৭৪	১৬২৭১	২৭৮৮	২৭০৪	২১৭৬৩	৯৭
১৯৭৫	১৯২৩৬	৩১৬০	২৬০৯	২৫০০৫	৮৩

সূত্রঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম স্তম্ভের তথ্যগুলি 'সেন্সাস্ অব্ ম্যানুফ্যাক্চারিং ইন্ডাস্ট্রিজ' এবং 'এনুয়্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ' থেকে নেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট তথ্যগুলি হিসাব করে বার করা হয়েছে।

শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রত্যক্ষ পরিণতি হিসাবে দেখা যায় শ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং মালিকরা কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়। সুতরাং শ্রমিক-মালিক বিরোধের পরিমাপক হিসাবে দু'টি বিষয়কে গ্রহণ করা যায়—বিরোধে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা এবং বিরোধের ফলে কর্মচ্যুত শ্রম-দিনের সংখ্যা। শ্রমিক-মালিক বিরোধে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি মাপা যায়। আর গড়ে একজন শ্রমিক আন্দোলনের ফলে যতদিন কর্মচ্যুত হয় তার দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা মাপা যায়। আমরা এখানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য উপস্থিত করছি।

ভারতীয় শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ, ১৯৪৬—১৯৭৫

বৎসর	বিরোধে অংশ-গ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা ('০০০)	কর্মচ্যুত শ্রম-দিবসের সংখ্যা ('০০০০)	কর্মচ্যুত শ্রমদিবসের শ্রমিক প্রতি গড়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯৪৬	১৯৬২	১২৭২	৬·৪৮
১৯৪৭	১৮৪১	১৬৫৬	৯·০০
১৯৪৮	১০৫৯	৭৮৪	৭·৪০
১৯৪৯	৬৮৫	৬৬০	৯·৬৩
১৯৫০	৭২০	১২৮১	১৭·৭৯
১৯৫১	৬৯১	৩৮২	৫·৫২
১৯৫২	৮০৯	৩৩৪	৪·১২
১৯৫৩	৪৬৭	৩৩৮	৭·২৫
১৯৫৪	৪৭৭	৩৩৭	৭·০৭
১৯৫৫	৫২৮	৫৭০	১০·৮০
১৯৫৬	৭১৫	৬৯৯	৯·৭৮
১৯৫৭	৮৮৯	৬৪৩	৭·২৩
১৯৫৮	৯২৯	৭৮০	৮·৪০
১৯৫৯	৬৯৪	৫৬৩	৮·১২
১৯৬০	৯৮৬	৬৫৪	৬·৬৩
১৯৬১	৫১২	৪৯২	৯·৬১
১৯৬২	৭০৫	৬১২	৮·৬৮
১৯৬৩	৫৬৩	৩২৭	৫·৮০
১৯৬৪	১০০৩	৭৭২	৭·৭০
১৯৬৫	৯৯১	৬৪৭	৬·৫৩
১৯৬৬	১৪১০	১৩৮৫	৯·৮২
১৯৬৭	১৪৯০	১৭১৫	১১·৫১
১৯৬৮	১৬৬৯	১৭২৪	১০·৩৩
১৯৬৯	১৮২৭	১৯০৫	১০·৪৩
১৯৭০	১৮২৮	২০৫৬	১১·২৫
১৯৭১	১৬১৫	১৬৫৫	১০·২৪
১৯৭২	১৭৩৭	২০৫৪	১১·৮৩
১৯৭৩	২৫৪৬	২০৬৩	৮·১০
১৯৭৪	২৮৫৫	৪০২৬	১৪·১০
১৯৭৫	১১৪৩	২১৯০	১৯·১৫

সূত্রঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভের তথ্যগুলি 'ইন্ডিয়ান্ লেবার ইয়ারবুক্', 'ইন্ডিয়ান্ লেবার গেজেট্' এবং 'ইন্ডিয়ান্ লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তৃতীয় স্তম্ভের সংখ্যাকে দ্বিতীয় স্তম্ভের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে চতুর্থ স্তম্ভের সংখ্যাগুলি পাওয়া গেছে।

রাশি বিজ্ঞানে অনুসৃত পদ্ধতিতে শ্রমিক-শোষণের হারের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি নজরে পড়ে তা হ'লঃ (১) শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তির সঙ্গে তীব্রতার সম্পর্ক খুবই দুর্বল, এবং (২) তার ফলে সামগ্রিকভাবে শোষণের হারের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ এক কথায় শোষণের হার উঠানামার বিশ্লেষণে শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা খুবই দুর্বল। এটা ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে। অবশ্য শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে শোষণের হারের, দুর্বল হলেও, একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ শ্রমিকরা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে ধর্মঘটকে প্রলম্বিত করে শোষণের হার কিঞ্চিৎ পরিমাণে কমাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের ব্যাপ্তির সঙ্গে শোষণের হারের একটি ক্ষীণ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ হ'ল, শোষণ যত বাড়ছে তত অধিক সংখ্যায় শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। তবে অধিক সংখ্যায় শ্রমিককে আন্দোলনে সামিল করার ব্যাপারে অনেক দুর্বলতা থাকায় এই সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ।

পরিশেষে বর্তমান প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। আমরা এখানে শ্রমিক-শোষণের হারকে প্রভাবিত করতে পারে এমন আরও যে সব বিষয় আছে (যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক ইত্যাদি) সেগুলির সঙ্গে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করি নি। তাছাড়া, শোষণের হারের শিল্পগত ও আঞ্চলিক তারতম্যও বিশ্লেষণ করি নি। তাই যে চিত্রটি আমাদের সামনে ধরা পড়েছে তা খুবই স্থূল এবং বিচার সাপেক্ষ।*

* প্রবন্ধটি রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজে 'সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অরগানিজেশন'-এর কলকাতা অফিসের গ্রন্থাগারিক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের টিচার ফেলো শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভগৎ যে সাহায্য করেছেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা স্বীকার করছি।

প্রাথমিক স্তরে প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী ও সহজ পাঠ

তাজ মহম্মদ

দীর্ঘদিন পরে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা আলাপ আলোচনার পর যখন প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী নতুনভাবে প্রণয়ন করতে যাচ্ছে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার, ঠিক সেই মুহূর্তে নানারকম আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছে। কিছু কিছু সাহিত্যিক ও দৈনিক সংবাদপত্র তীব্রভাবে আক্রমণ করছে এই নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নে রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'কে সামনে রেখে, এবং অবশ্যই তারা একটা নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সচেতনভাবে আক্রমণ হানার চেষ্টা করছেন। যা হোক সমাজ বিকাশের ধারাকে রুখে দেওয়ার মত ইতিহাস আজও তৈরী হয় নি। তবুও কিছু প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতেই পারে।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

সমাজ বিকাশের সাথে সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সংগে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। এই পরিবর্তন যদি যথাযথভাবে না হয় তাহলে সমাজজীবন নানারকম প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়নের রীতি দেশে দেশে প্রচলিত। আমাদের দেশে ১৯৫০ সালে যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রাথমিক স্তরে চালু হয়েছিল তা আজও পশ্চিমবংগে অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে প্রচলিত। পাঠক্রম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে উপলব্ধি করা হচ্ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ বিশেষ করে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ উল্লেখযোগ্য। ২৫ বছর পর সমাজ সভ্যতার বিকাশের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও বাস্তবানুগ করার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার করছে তাকে নিশ্চয় সাধুবাদ জানানো উচিত।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তন কোন গোপন ঘটনা নয়

কিছু কিছু সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও দৈনিক সংবাদপত্র ফলাও করে লিখতে শুরু করলেন যে, এই সরকার নাকি গোপনভাবে এই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের কাজ সারছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁরা ধরে ফেললেন ভাবটা এই রকমই। কিন্তু এ'রা কি সত্যি কথা বলছেন? আদৌ নয়। ঐসব বুদ্ধিজীবীরা এবং সংবাদপত্রগুলো খবর না রাখতে পারেন, কিন্তু পশ্চিমবংগের শিক্ষা ও ছাত্র আন্দোলনের সাথে যাঁরা যুক্ত তাঁরা জানেন, খবর রাখেন। সুদীর্ঘ ২৫ বছর পর ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ বিনয় ভবনের অধ্যক্ষকে সভাপতি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ ১৪০৫-ইডিএন (পি) তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর-এর এক আদেশ-নামায় পশ্চিমবংগে প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি সিলেবাস কমিটি গঠন করে। যে কোন কারণেই হোক সেই কমিটি ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারে নি। পশ্চিমবংগে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই কমিটিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কার্যকরীভাবে এই সিলেবাস কমিটি কাজ শুরু করে। এছাড়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়েরও ব্যবস্থা করা হয়। সার্বিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এবং এই কমিটির অধিবেশনগুলিতে ব্যাপক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সিলেবাসকে আধুনিকীকরণ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগপোযোগী করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়াও কিছুদিন আগে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নিয়ে পশ্চিমবংগের বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এ্যাডুকেশনাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT)এর পরিচালনাধীনে ওরিয়েন্টেশন কার্যসূচী শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে ঐ সব বুদ্ধিজীবী ও সংবাদ-পত্রগুলি নেহাতই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্যই এরকম বিরূপ মন্তব্য ও অভিযোগ উত্থাপন করছেন।

সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও সাংবাদিকদের সমালোচনা প্রসংগে

যখন নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী চালু হতে যাচ্ছে ঠিক তখনই কিছু সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ কিছু কিছু দৈনিক সংবাদপত্রের সাথে সুর মিলিয়ে গেল গেল রব তুলেছেন। ভাবাবেগের আতিশয্যে এবং বিশেষ কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এত হৈচৈ করছেন। ভাবটা এমনই যে রবীন্দ্রোত্তর কালে রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার ইজারা নিয়েছেন একমাত্র তাঁরাই। অথচ পশ্চিমবংগে যখন অশান্ত রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল, চারিদিকে হঠকারী রাজনীতির ধারক বাহকরা রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে নষ্ট করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে আঘাত হানছিল, তখন কিন্তু ঐ সব বুদ্ধি-জীবীর দল এগিয়ে আসেন নি সামান্যতম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। এ'রা ভাবাবেগে বিভোর হয়ে রাজ্যে যখন গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখন আন্দোলন করার হুমকি দিলেন। আশ্চর্যের কথা, তাঁরা একবার দাবি করলেন না, একটা শিক্ষামূলক আলোচনার, যখন সরকার উদাত্তভাবে মূল্যবান অভিমত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। আমাদের কাছে এটা খুব দুঃখজনক যে, 'সহজ পাঠ' সংক্রান্ত বিতর্কে বিরোধীরা এবং ঐ সব সাহিত্যিক সমালোচকরা শিশুবিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা পরিহার করে শিশুসাহিত্য হিসাবে 'সহজ পাঠে'র মূল্যায়ন করে বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা ও

ভাষানীতিকে আক্রমণ করলেন, তাঁরা 'সহজ পাঠ'কে সামনে রেখে পরিবেশকে দূষিত করে মানুষকে উত্তেজিত করার জন্য বামফ্রন্ট বিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলছেন। রবীন্দ্রনাথের নাম এবং 'সহজ পাঠ'র মত একটা শিশুপাঠ্য আদরণীয় বইকে নিয়ে জল ঘোলা করে তাঁরা চুপ করবেন না এটা সহজেই অনুমেয়। এই ঘোলা জলের সুযোগ নিয়ে তাঁরা সমগ্র পাঠক্রমের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার চেষ্টা করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তব ভিত্তিতে পরিবর্তনের যে সুপারিশ গৃহীত হয়েছে সেই পরিবর্তনের বিরোধী এ'রা। কিন্তু বাস্তবভিত্তিক, হাতে কলমে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলা যায় না। তাতে ওদের মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আসলে এ'রা মৌলিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পরিস্থিতি স্বীকার করে শিক্ষা ব্যবস্থা রূপান্তরের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছেন। বাঁধ ভেঙে দিতে চেয়েছেন, এ'রা অচলায়তনকে ধরে রাখতে চান, আসলে পরিবর্তনেই এ'দের বাধা। সেইজন্য এ'রা 'সহজ পাঠ'কে সামনে রেখে কৌশলে রবীন্দ্র-প্রীতির নামে আপত্তি করতে চাইছেন। তাঁদের এটাও মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে যে, এই 'সহজ পাঠ' ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হলেও দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম অবশ্য পাঠ্য হিসাবে প্রণয়ন করেছিলেন।

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী ও 'সহজ পাঠ'

সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম কখনই চিরকাল এক রকম থাকতে পারে না। সে কারণে এটা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে 'সহজ পাঠ' কতখানি গ্রহণযোগ্য তা আলোচনা সাপেক্ষ, কিন্তু এটা ভাবা নিতান্তই অন্যায় যে 'সহজ পাঠ' রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে তা চিরকালই পাঠ্যসূচীতে থাকবে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানেন তাঁরা বুঝবেন যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কোনদিন অনড় মানসিকতার মানুষ ছিলেন না। যিনি নিজে সারা-জীবনে প্রকৃত সত্যের সন্ধানে নতুন নতুন ভাবে সবকিছুকে গড়তে চেয়েছিলেন, সে কারণে রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনা কেমন ছিল আর আধুনিক যুগ ও জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিভাবে একে গ্রহণ করা যায় এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই 'সহজ পাঠ'কে গ্রহণ করতে হবে। আবহমানকালের বাঙলাভাষীদের জন্য বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ-পরিচয়ে'র পরেও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'সহজ পাঠ' শান্তি-নিকেতনের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৯২৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠ' রচনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণপরিচয়' বর্জন করার জন্য নয়। ভাষা শিক্ষার পরে পড়ুয়াদের ভাব ও ছন্দের জগতে প্রবেশের পথকে উপযুক্ত করার জন্য এবং বাস্তব প্রয়োজনেই। সেজন্য প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাষা, ভাব ও ছন্দের সমন্বয়-সাধনকল্পে যে শিশুপাঠ্য পুস্তক রচিত হবে তা রবীন্দ্রনাথ বিরোধী তো-নয়ই বরং তা রবীন্দ্রচেতনার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষার প্রথম স্তরে শিশুদের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনে যে দিকগুলোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত তা হ'ল—অক্ষর পরিচয়, মুদ্রিত অক্ষর, লিপিশিক্ষা অভ্যাস করানো, শব্দের সাথে পরিচয়, শব্দ গঠন, উচ্চারণ রীতি, অযুক্তাক্ষর শব্দ ও যুক্তাক্ষর শব্দ গঠন, বাক্য গঠন, বাক্য প্রয়োগের ব্যাকরণরীতি ও প্রয়োগের দক্ষতা কিভাবে দেওয়া যায়, শব্দ ও অর্থের সমন্বয় সাধনই বা কিভাবে করা যায়। এ ছাড়াও ভাষাশিক্ষা বিজ্ঞানীদের সুস্পষ্ট সূত্রগুলি অনুধাবন করানো প্রয়োজন।

শিশুরা যাতে প্রচলিত ছড়া ও গাথার সাথেও এ স্তরে পরিচিত হতে পারে সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার। সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত বা নজরুলের শিশুপাঠ্য কবিতা ও ছড়ার সাথেও শিশু-দের পরিচিত করা আর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়ার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। শব্দ, বাক্য ও অনুষঙ্গগুলি বাস্তব পরিবেশ অনুযায়ী শিশুদের সুস্পষ্ট মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ ছাড়াও এ পুস্তকটি এমন হওয়া উচিত যা শিশু-দের কাছে আকর্ষণীয় হবে ও অনুশীলনে শিশুদের উৎসাহ যোগাতে সাহায্য করবে।

নতুন পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য

(১) এই পাঠক্রমে আধুনিকতম চিন্তাধারা গ্রথিত হয়েছে। সেইজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর এবং সমাজের সর্বতোমুখী বিকাশের সহায়করূপে দেখা হয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, ক্রান্তিকারী সমাজের উপযুক্ত নাগরিকতাবোধের সৃষ্টি, জীবনব্যাপী শিক্ষণের প্রেরণা ও কর্মদক্ষতার উন্মেষকে লক্ষ্য হিসাবে ধরে নেওয়া।

(২) বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিশেষ করে কোঠারী কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি পাঠক্রম রচনায় গ্রহণ করা

(৩) শিক্ষাকে জীবনমুখী ও প্রয়োগধর্মী করার উদ্দেশ্যে শিশুর নিজ নিজ পরিবেশের উন্নতিকল্পে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন বিষয়ের লব্ধ অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণের জন্য "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-মূলক কাজ" শীর্ষক কর্মমুখী পর্যবেক্ষণধর্মী একটি নতুন পাঠক্রম সংযোজিত হয়েছে।

(৪) পাঠক্রমকে প্রয়োগসাধ্য, ব্যবহারধর্মী ও পরিবেশ অনুসারে প্রাসঙ্গিক ও নমনীয় করার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(৫) যুগোপযোগী কর্মক্ষম নাগরিক গড়ে তোলার জন্য উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অনুসন্ধিৎসা, আবিষ্কারধর্মিতা ও পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(৬) প্রত্যেক বিষয়ের পাঠক্রমে বিষয়টি শিখনের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির সাধারণ ইঙ্গিত সন্নিবেশিত হয়েছে।

(প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস কমিটির প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে।)

যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার শিশুসাহিত্য হিসাবে 'সহজ পাঠ'কে মূল্যায়ন করতে বসেন নি সে কারণে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষানুরাগীদের কাছে আবেদন শিশুসাহিত্যের যে নিজস্ব বিজ্ঞান আছে তার নিরিখেই যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী চালু হ'তে যাচ্ছে তাকে এবং রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'কে বিচার করতে হবে—কোন ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নয়।

শিশুসাহিত্য না শিশুশিক্ষা?

কেতকী বিশ্বাস

'সহজপাঠে'র কথা মনে হলেই যে ছবিটি স্বাভাবিকভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি এরকম—৫ থেকে ৭ বৎসরের একটি শিশু চোখ বন্ধ করে দুলে দুলে পড়ছে,—"রাম বনে ফুল পাড়ে, গায়ে তার লাল শাল," বা "উস্রি নদীর ঝরণা দেখতে যাব দিনটা বড় বিশ্রি......সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র যাবে আমাদের সঙ্গে উস্রির ঝরণায়,"—ইত্যাদি ইত্যাদি। চিত্রকল্প মনোরম সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি ওই শিশুকে 'সহজপাঠ' থেকে একটা গল্প বলতে বলুন, সে তৎক্ষণাৎ গড় গড় করে মুখস্থ বলে যাবে। আসল তফাৎটা এখানেই।

'সহজপাঠ' শিশুসাহিত্য হিসাবে অতুলনীয়। ছন্দমাধুর্যে, ধ্বনি-বিন্যাসে, ভাবের সহজ এবং সপ্রতিভ অভিব্যক্তিতে 'সহজপাঠ' শিশু-মনকে অভিভূত করে। শিশুমনের কল্পনার উন্মেষ ও সম্প্রসারণে 'সহজপাঠ' অদ্বিতীয়। স্মরণপ্রক্রিয়াকেও 'সহজপাঠ' সাহায্য করে। কিন্তু শিশুসাহিত্য এবং শিশুশিক্ষা এক জিনিস নয়। যে 'চিন্তা' রবীন্দ্রনাথকে 'সহজপাঠ' প্রণয়নে অভিলাষী করেছিল, সেই চিন্তাই পরিলক্ষিত হয় বর্তমান সিলেবাস কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীতে। উভয়ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যটা একই—শিশুকে সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে তার পাঠ্যবিষয়ে আকৃষ্ট করা, এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সাবলীল করা। লক্ষ্য এক হলেও 'সহজপাঠ' সার্থক শিশুশিক্ষার বই হয়ে ওঠে নি, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করতে পারেন নি। 'সহজপাঠে' শিশুর মনকে সক্রিয় করে তোলার কোন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। সেদিক থেকে বর্তমান সিলেবাস কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচী আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে স্বীকার করতেই হবে। যাঁরা 'পিতৃদ্রোহিতা'র প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা ভেবে দেখবেন পিতার অনুসৃত পথে পুত্রের অধিক অগ্রগতিকে 'পিতৃদ্রোহিতা' বলা যায় কি না!

আমার মনে হয় সমালোচকরা 'সহজপাঠে'র ব্যাপারটাকে আলাদা করে দেখছেন। কিন্তু তারা যদি কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীর পিছনে সঠিক চিন্তাকে অনুধাবন করতে প্রয়াসী হতেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচীটা ভাল করে পড়তেন তাহলে হয়তো আসরে নামতেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁরা জিনিসটাকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণ হিসাবে নিচ্ছেন এবং সেইভাবেই প্রচার করছেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল, যে কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীর সমর্থক যারা, (যেমন আমি) রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় তাদের এতটুকু ঘাটতি নেই। রবীন্দ্র-নাথকে স্বীকার করতে কোনরকম ভাবাবেগের প্রয়োজন হয় না। আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের স্থান তথাকথিত ভাবাবেগ, অন্ধতা বা চক্ষুলজ্জার ঊর্ধ্বে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এখন আসল কথায় আসা যাক। শিশুসাহিত্য ও শিশুশিক্ষা এক জিনিস নয়। শিশুসাহিত্য শিশুর মনকে যে অনির্বচনীয়, অব্যক্ত ভাল লাগার রাজ্যে নিয়ে যায়, শিশুশিক্ষা সেই রাজ্যকে কায়েম করতে সহযোগিতা করে, শিশুর অন্তর্নিহিত (inherent) সুপ্ত (dormant) শক্তি ও গুণের বিকাশ ঘটিয়ে। শিশুসাহিত্য শিশুর কল্পনাকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সাহায্য করে। সৌন্দর্য ও রুচি-বোধ জাগ্রত করে। শিশুশিক্ষা তাকে পরিচিত করে পার্থিব পরি-বেশের সঙ্গে। ব্যবহারিক জীবনে শিশুকে অভ্যস্ত করে তোলে এবং সময়োপযোগী মানসিক গঠনে সহযোগিতা করে। এদিক থেকে শিশুশিক্ষায় কোনরকম বিশেষীকরণ বা বিষয়ের পৃথকীকরণ না থাকাই সঙ্গত।

যাইহোক শিশুশিক্ষার বিষয়টাকে আমরা দু'ভাবে নিতে পারি। সাঙ্গীকরণ (adjustment) [দৈহিক, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক] এবং নিয়ন্ত্রণ (direction) [ভিতর এবং সাধারণভাবে], এই দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর মানসিক গঠন অনুযায়ী বেড়ে উঠতে সাহায্য করা বা তার ভিতরকার সুপ্ত গুণাবলীর সম্যক্ বিকাশ ঘটানই শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে সব থেকে আগে প্রয়োজন শিশুর সক্রিয়তা (দৈহিক এবং মানসিক)। শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় শিশুর কোন ভূমিকা আছে অতীতে স্বীকার করা হত না। কিন্তু শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে ইউ রোপের বিভিন্ন অংশে এই বিষয়ে শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ রুশো (Jean Jacques Rousseau) স্পষ্টভাবে শিশু-কেন্দ্রিক (child-centric) শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবেন। শিশুকে শিশু হিসাবে দেখবার স্বপক্ষে ছিলেন তিনি। (Child is a child, before a man, or child is not a miniature adult.) পেস্টালোজিও (Johann Heinrich Pestalozzi) বলেন শিশুরা চারাগাছের মত। অধিক যত্নের ফলে যেমন পাতিলেবু গাছে কমলা ফলে না তেমনি শিক্ষার প্রকারভেদে শিশুর গুণগত পরি-বর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। অরবিন্দও বলে গেছেন শিক্ষক শিশুর সাহায্যকারী মাত্র, "হুকুমনামার সহায়" নয়। (Teacher is the helper and guide, not a task-master) রবীন্দ্রনাথ নিজেও শিক্ষার কথা ভেবেছেন বারে বারে। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের সাঙ্গীকরণ বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথাও আমরা জানি।

এইখানে একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া প্রয়োজন। শিশুর আনন্দের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। একজন পরিপূর্ণ মানুষের আনন্দের উপকরণ যোগাতে সমগ্র নন্দনতত্ত্ব নিঃশেষিত হতে পারে কিন্তু শিশুর আনন্দ অতি সামান্যই। শিশুরা এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নূতন, এই পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কেই তার অপরিসীম কৌতূহল, আর সেই কৌতূহল নিবৃত্তেই তার সব থেকে বেশি আনন্দ। এই সময় তার মানসিক গঠন যেমন সরল থাকে তেমনি তার আনন্দ বেদনাও (শিশু বলতে ৫—৮ বৎসরের মধ্যে)। ব্যাপারটা মূর্ত হয়ে ওঠে যদি আমরা শিশুদের খেলার উপকরণগুলি খেয়াল করে দেখি।

শিশুশিক্ষার পাঠ্যসূচী হবে শিশুর মনে প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে কৌতূহল উদ্দীপক এবং সরলভাবে সেই কৌতূহল নিবৃত্তকরণের সহায়ক। এক কথায় শিশুশিক্ষার পরিবেশ, পরিমণ্ডল ও পাঠ্যসূচী এমন হওয়া উচিত যাতে করে শিশু প্রশ্ন করতে শেখে, চিন্তা করতে শেখে এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে

নিজের প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করতে পারে। পাঠ্যসূচীর বিষয়-বস্তু বর্ণনামূলক হওয়া যুক্তিযুক্ত।

এবার আসা যাক ভাষাশিক্ষা প্রসঙ্গে, শিশুর ভাষা প্রধানতঃ কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নয়। এই শিশুর জগৎ, জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি এবং নিজেকে চিনবার ভাষা, শিশুর আত্মবিকাশের ভাষা। শিশুর ভাষাশিক্ষা এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে করে সে নিজের কথা নিজের মত করে বলতে পারে। তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কল্পনার কথা সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারে। এদিক বিচার করলে 'সহজপাঠ' শিশুর ভাষাশিক্ষার সহায়ক নয়। 'সহজ-পাঠে'র ভাষা প্রধানতঃ ভাবের ভাষা। এই ভাষা শিশুর মনকে আচ্ছন্ন করে বা দোলা দেয়, কিন্তু এই ভাষাকে শিশু তার নিজের করে ভাবতে পারে না। তাই সহজপাঠের গল্প থেকে কোন প্রশ্ন করলে সে সহজপাঠের ভাষাতেই উত্তর দেয়।

'সহজপাঠ' শিশুকে সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়াতেও সাহায্য করে না। কারণ সহজপাঠের গল্পগুলি প্রধানতঃ কল্পনাশ্রয়ী। অবাস্তব বলা যায় কিনা জানি না কিন্তু এর বাস্তবতার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতার অনেক পার্থক্য। কোন শিশু যদি প্রশ্ন করে—সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র কে?' 'সংসারবাবুর বাসা কোথায়?' 'বেণী বৈরাগী কেমন লোক?' 'পেঁচার ডাক কেমন?' আমরা সদুত্তর দিতে পারি না।

শিশুপাঠ্য বইগুলিতে চিত্রমালার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। ছবির সাহায্যেই শিশুকে তাড়াতাড়ি শেখানো যায়। কিন্তু দেখতে হবে ছবিগুলি যেন সরল, বস্তুমূলক হয়। ছবিগুলি দেখেই যেন সে চিনতে পারে বা তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে পারে। অথবা যে জিনিস সে দেখেনি সে সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারে। কিন্তু 'সহজপাঠে'র চিত্রগুলিকে আমরা এই পর্যায়ে ফেলতে পারি না। সবসময় চিত্রগুলিকে দেখে তারা চিনে উঠতেও পারে না যে কোন্ জিনিসের ছবি। যার ফলে তারা যখন ছবিগুলিতে রং করে (শিক্ষকের কথা অনুসারে) তখন প্রায়শঃ দেখা যায় যে রং দিয়ে তারা এক-একটা কিম্ভূতকিমাকার তৈরি করছে। সেদিন কোন একটা দৈনিকে একটা চিঠি পড়ছিলাম। ভদ্রলোক লিখেছেন যে যদি 'সহজপাঠ'কে অপসারণ করতে হয় তো রামায়ণ মহাভারতের গল্প-গুলিকেও অপসারণ করতে হয়। (যদিও আমি নিশ্চিত নই, 'সহজ-পাঠে'র শিশুদের রামায়ণ মহাভারতের গল্প পাঠ্য আছে কিনা!) যাইহোক মহাভারত বা রামায়ণের গল্পগুলি মূলতঃ রূপকধর্মী। মহাকাব্য হিসাবে এই গল্পগুলি মনুষ্যসমাজের চিরন্তন সত্যকেই মূর্ত করে। এই গল্পগুলি শিশুর চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, শিশুকে উৎসাহিত করে, মহৎ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করে। এই-ভাবেই শিক্ষণপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ (as direction) হিসাবে কাজ করে।

অবশেষে আমি আমার শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতবর্গ ও সুধীজনকে অনুরোধ করব যে তাঁরা শুধুমাত্র আবেগের দ্বারা যেন পরিচালিত না হন। শিশুশিক্ষার ব্যাপারটা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানভিত্তিক হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। কালোকে কালো, সাদাকে সাদা, রাতকে রাত, দিনকে দিন, ক্ষেতমজুরকে ক্ষেতমজুর, বর্গাদারকে বর্গাদার, মহা-জনকে মহাজন, সুদখোরকে সুদখোর হিসাবে চিনতে দেওয়া বা সাহায্য করাটা কোন অপরাধ হতে পারে না। বর্তমান শিশুরা যদি আগামী সভ্যতার ধারক ও বাহক হয় তবে, শুরুটা শুরু থেকেই হওয়া ভাল নয় কি? 'জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা' বলতে আমার মনে হয় এই জিনিসটাকে বোঝানো হয়েছে।

তারার গ্রহণ

অধ্যাপক সত্য চৌধুরী

১৯৮০ সালের ৬ই অক্টোবর ভারতবর্ষের আকাশে তারার গ্রহণের একটি বিরল ঘটনা ঘটেছে। সূর্যকে আড়াল করার ফলে চাঁদের ছায়ায় পৃথিবীর স্পর্শিত অঞ্চলে যেমন সূর্যগ্রহণ হয় ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় একই নিয়মে এসএও ১৮৭৩৫৮ নামক একটি অনুজ্জ্বল তারাকে ইউনোমিয়া নামের একটি গ্রহাণু অল্প কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীর কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। ফলে তারাটিতে গ্রহণ লাগে। এই তারার গ্রহণ সম্পর্কে রয়াল গ্রিনিচ অবজারভেটরি অনেক জটিল গাণিতিক হিসাব নিকাশ করে একটা পূর্বাভাস দিয়েছিল। সেই পূর্বাভাস অনুসারে গ্রহণের আবছা চলমান ছায়াঞ্চল সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিট ২১ সেকেন্ডে বোম্বাইয়ের কাছে ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করার কথা। ছায়াঞ্চলের পরিসর আনুমানিক ৪০ মাইল। এই ছায়া মধ্যভারত অতিক্রম করে বিহার ছুঁয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছানোর কথা ছিল সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে। ছায়ার গতিপথে ছিল বোম্বাই, ঔরঙ্গাবাদ, নাগপুর, রায়পুর, হাজারিবাগ, রাঁচী, মালদহ, গৌহাটি, ডিব্রুগড় প্রভৃতি শহর, পরে ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে ছায়াঞ্চলের চীনের মাটিতে প্রবেশ করার পূর্বাভাস ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শহরগুলিতে সূর্যাস্ত অপেক্ষাকৃত দেরীতে হয় বলে পূর্বাঞ্চল থেকে এই ছায়া পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশী। অন্ধকার এবং নির্মেঘ আকাশ এ ধরনের গ্রহণ পর্যবেক্ষণের আবশ্যক শর্ত।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে সেদিন মালদহে ছিল সৌরজগতের এই বিরল ঘটনাটি পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ।

বাঙ্গালোর জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রের ইউরেনাস গ্রহের বলয় আবিষ্কারক প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একদল গবেষক এই গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য মালদহ কলেজ মাঠে একটি অস্থায়ী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বসিয়েছিলেন। এই গবেষকদলে ছিলেন বাঙ্গালোরের মিঃ চন্দ্রমোহন, কলকাতার পজিশনাল অ্যাসট্রোনমি সেন্টার ও কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্সের এ কে ভাটনগর, স্বপন শুর প্রমুখ। তাঁরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গাজোলের আদিনা মসজিদ, মালদহ কলেজ এবং ফরাক্কা থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। মালদহ কলেজ ছিল মূল কেন্দ্র। সেখানে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি বৃহদাকার টেলিসকোপ বসানো হয়েছিল।

গ্রহাণু

বোড-টিসিয়াস সূত্র অনুসারে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে সূর্য থেকে ২৭ কোটি মাইল দূরে একটি গ্রহের অবস্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বহুকাল আগেই করা হয়েছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থানটি ফাঁকা বলেই মনে হ'ত। অবশেষে ১৮০১ সালে সিসিলির বৈজ্ঞানিক পিয়াজী মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে একটি গ্রহের সন্ধান পান। মাপজোক করে দেখা গেল গ্রহটি অতিশয় ক্ষুদ্র, ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল। রোমক দেবতার নাম অনুসারে গ্রহটির নাম দেওয়া হ'ল সিরিস। পরে গভীরতর অনুসন্ধান চালিয়ে সিরিসের কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে আরও অনেক ছোট ছোট গ্রহ আবিষ্কার হতে লাগল। আচরণে গ্রহের মত হলেও আয়তনে এরা খুব ক্ষুদ্র—তাই এদের নাম হ'ল **গ্রহাণু** বা **গ্রহকণা**। সংখ্যায় এরা হাজার হাজার, হাজার ত্রিশেক হতে পারে। গ্রহাণুপুঞ্জ হ'ল এদের সম্মিলিত নাম। সবচেয়ে বড় ৪টির নাম—সিরিস, ভেস্টা, জুনো ও পালাস। বাকী গ্রহাণুগুলির ব্যাস ১০০ মাইল থেকে শুরু করে ১ মাইল পর্যন্ত। অনেকের ব্যাস আরও কম। এখনো পর্যন্ত ২ হাজার গ্রহাণুর মোটামুটি পরিচয় পাওয়া গেছে।

গ্রহাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, কারো কারো কক্ষপথ খুব বেশী উপবৃত্তাকার। উপবৃত্তাকার পথে ঘোরার ফলেই ঈরস নামক ১৬ মাইল ব্যাসের গ্রহাণুটি কখনো কখনো পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে। গ্রহাণুদের নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই। কেউ গোলাকার, কেউ শঙ্কু আকৃতির, আবার কেউ বা নোড়ার মত। কোন বড় গ্রহ বা উপগ্রহের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে গ্রহাণু কক্ষচ্যুত হয়ে সেই গ্রহ বা উপগ্রহের গায়ে আছড়ে পড়তে পারে। মঙ্গল বা চাঁদের দেহস্থিত খাদগুলি গ্রহাণুদের আঘাতের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। পৃথিবীর বুকেও বহু গ্রহাণু আছড়ে পড়েছে। আমেরিকার আরিজোনা খাদ (বর্তুলাকার মুখের ব্যাস ১ মাইল) এবং ভারতবর্ষে পুণার নিকটবর্তী লোনার খাদ (মুখের ব্যাস ৬০০ ফুট) পৃথিবীর বুকে নেমে আসা গ্রহাণুদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইউনোমিয়া

গত ৬ই অক্টোবর এস এ ও ১৮৭৩৫৮ তারার গ্রহণ সৃষ্টিকারী গ্রহাণুটির নাম ইউনোমিয়া। ১৯৫১ সালে এই গ্রহাণুটি আবিষ্কৃত হয়। গ্রহ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা পরিমাপক এককের হিসাবে ইউনোমিয়ার উজ্জ্বলতা ৭·৪, এর আকৃতি গোলাকার নয়, সম্ভবতঃ নোড়ার মত। ইউনোমিয়ার সঠিক ব্যাস এখনো অজ্ঞাত। অবশ্য উজ্জ্বলতা থেকে গ্রহের আয়তন নির্ণয়ের একটা পদ্ধতি আছে—তবে পদ্ধতিটা নির্ভরযোগ্য ও নিখুঁত নয়। স্থূল হিসাবে ইউনোমিয়ার ব্যাস ১৬০ থেকে ১৭০ মাইলের মধ্যে হতে পারে বলে অনেকে আন্দাজ করেন। সারা বিশ্বের জ্যোতির্পদার্থবিদদের মধ্যে এই গ্রহাণুটির সঠিক ব্যাস মাপার জন্য গভীর আগ্রহ আছে। ৬ই অক্টোবর এর ব্যাস মাপার দুর্লভ সুযোগটি উপস্থিত হয়েছিল। ইউনোমিয়ার আড়ালে এস এ ও ১৮৭৩৫৮ তারার অন্তর্ধান এবং পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করা এবং গ্রহণের সময়টুকু নিখুঁতভাবে নির্ণয় করাই ছিল সেদিন গবেষকদের প্রধান কাজ। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই একটি গ্রহাণুর আয়তন ও আকৃতি সঠিকভাবে জানা সম্ভব। এই ধরনের গ্রহণ পর্যবেক্ষণের সুযোগ খুব কম পাওয়া যায়। তারার গ্রহণ পর্যবেক্ষণের ফলাফল থেকে শুধু গ্রহাণুর আয়তন আকৃতিই নয়, সৌরজগতের গঠন সম্পর্কেও বহু মূল্যবান তথ্য জানা সম্ভব।

পর্যবেক্ষণের ফলাফল

ইউনোমিয়ার আয়তন ১৬০/১৭০ মাইল ধরে নিয়ে রয়াল গ্রিনিচ অবজারভেটরি গ্রহণের আনুমানিক সময় এবং গ্রহণের এলাকা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু ইউনোমিয়ার ব্যাস সম্পর্কে উজ্জ্বলতা থেকে নিরূপিত হিসাবটি যদি একেবারেই বেঠিক হয় এবং ব্যাস যদি ৪৫/৪৬ মাইলের কম হয় তাহলে তারার গ্রহণের ছায়ার পক্ষে পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছানর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বরং গ্রহণের ফলে যে ছায়াশংকু সৃষ্টি হয় তার শীর্ষবিন্দুটির পৃথিবীপৃষ্ঠের বহু উপর দিয়ে আকাশ পথে চলে যাওয়ার কথা। ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় পর্যবেক্ষণের সময় শক্তিশালী টেলিস্কোপের চোখে পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন ছায়া ধরা পড়ে নি। গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ডঃ ভট্টাচার্য মালদহ কলেজ প্রাঙ্গণে টেলিস্কোপের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাথমিকভাবে এই সিদ্ধান্তই করলেন যে, ইউনোমিয়ার ব্যাস কোনমতেই ৪৫/৪৬ মাইলের বেশী নয়। তাহলে ইউনোমিয়ার সঠিক ব্যাস কত? প্রশ্নটি বৈজ্ঞানিকদের সামনে এখনো খোলা থাকলো।

মইশাল বন্ধু

কল্যাণ দে

মাঠের শেষে নদী।

নদীর নাম বালাসন। নদী পেরিয়ে তরাই-এর নিবিড় অরণ্য। শাল, শিশুগাছের শাখায় শাখায় কাঁধে কাঁধ হাতে হাত।

বৈশাখের শীর্ণ নদী। বালির আসন পেতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে যেন ধ্যানমগ্ন। নদীর এপারে বিস্তীর্ণ মাঠের ধারে তারাবাড়ি গ্রাম। তারাবাড়ি থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেইট প্রায় আড়াই মাইল পথ; কখনো কাঁচা কখনো পীচ ঢালা।

তারাবাড়ি গ্রামের জোতদার প্রহ্লাদ সিংহ। তাঁরই বাড়ির মইশাল দীনকাটু সিংহ।

দীনকাটুর ত্রি-সংসারে কেউ নেই। জন্মেছিল ধূপগুড়ির কমলাই নদীর ধারের কোনো এক গাঁয়ে। ছোটবেলায় বাপ-মাকে হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল প্রহ্লাদ সিংহের বাড়ি। সেই থেকে এখানে আছে। ওর বয়স এখন চব্বিশ। ঐ তরাই-এর নিবিড় অরণ্যের পুরানো শালগাছের মতই পুরুষ্ঠু ওর শরীর। মোষ আর গরুর দেখাশোনা ওই করে বরাবর।

জোতদার বাড়ির দোতলা বাড়ির একতলার বারান্দায় এক ছোট্ট ঘরে ওর একলার সংসার। ধোকরার বিছানায় ময়লা কিছু কাঁথা। একটা কাঠের বাক্স। একটা খাটো ধুতি, একটা পিরান, একটা গামছা, ভাঙা আয়না, কমদামী চিরুনী—এই তার সম্বল। আর আছে একটা আড় বাঁশের বাঁশী।

বৈশাখ মাসের সকাল।

এক টুকরো মেঘ পাকা করমচার মত সূর্যটাকে হনুমানের মত বগলদাবা করে ফেলেছে।

ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেছে একটু। গোয়ালঘরে পবনা, আন্ধারু প্রিয় দু'টি মোষ ডাকছে।

চোখ কচলে নিয়ে দীনকাটু হে'কে উঠল, রইস রে রইস মুই যাছো।

জবাব এল, অ্যাঁ—এ—এ—এ।

তাড়াতাড়ি কুয়োয় গিয়ে মুখ-চোখ ধুয়ে নিয়ে গোয়ালঘরে চলে এল। কালো কুচকুচে কালবৈশাখী মেঘের মত দু'টি তাজা মোষ ওকে দেখে খুশীতে ডেকে উঠল।

দেবী প্রতিমার গায়ে চকচক করা গর্জন তেলের মত চকচকে গায়ে হাত বুলিয়ে পবনার চোখে চোখ রেখে এক স্বর্গীয় ভাষায় কথা বলতে লাগল দীনকাটু।

পবনাকে আদর করছে দেখে আন্ধারুর মনে হিংসে জাগল। সে শিং দিয়ে আলতো করে দীনকাটুর পিঠে খোঁচা মারল। দীনকাটু পবনাকে বলে উঠল, দ্যাখেছিস্ সতীনের আগ? মুই কাক্ বেহা করিম? তোক্ না আন্ধারুক্? হেসে বলে ফেলল সে, না হায় গে, না হায়। মুই দোনোজনাকে বেহা করিম। কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দমকা বাতাস দীর্ঘশ্বাসের মত। সে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির অ্যালবাম উল্টে গেল। বেরিয়ে এল কিছু ছবি।

বালাসন নদীর ওপারে রাজবংশীদের গ্রাম। সে গ্রামের এক গরীব চাষীর মেয়ে টিয়া।

টিয়ার শরীরে সবুজ ঘাসের চিকন আস্তরণ। চোখের কোণে তরাই-এর অরণ্যের নিবিড় প্রশান্তি। বুকের মধ্যে পাংখাবাড়ির পাহাড়ী চূড়া। কেমন যেন হাড়িয়ার নেশার মত নেশা লাগায় টিয়া।

মোষ চরাতে গিয়ে জঙ্গলের ভেতর হঠাৎ একদিন দীনকাটু চীৎকার শুনতে পেল। কায় ছন্ মোক্ বাঁচান—বাঁচান। হাতের লাঠিটা নিয়ে বাইশ বসন্তের জোয়ান মোষের মত শক্তিধর দীনকাটু ছুটে গেল চীৎকারের উৎসস্থলে।

একটি কিশোরী মেয়েকে ঘিরে ধরেছে এক ঝাঁক মৌমাছি। কি করবে এক মুহূর্তে ভেবে নিয়ে ছুটে গিয়ে কিশোরীকে কাঁধে তুলে চোঁ—চোঁ—ধাঁ—এক দৌড়। বালাসনের জলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলে নামার আগে নামিয়ে দিল কিশোরীকে। দু' একটা মৌমাছি তখনো এসেছিল পেছন পেছন ধাওয়া করে। তা দেখিয়ে কিশোরী চীৎকার করে উঠল, অ্যালহায় ও যায় নি গে যায় নি। সকালবেলার সূর্য উঠল যুবকের মুখে। সে বলে উঠল, ধ্যাৎ, হাতাস খাছিস ক্যান্। মুই তো ছু। এবারে রঙ লাগল কিশোরীর মুখের আকাশে। বলল, কায় তুই? তুই কি মরদ?

এতক্ষণে সামলে নিল দীনকাটু। একটা মেয়ের সাথে আগে তো সে কখনো এমন করে কথা বলে নি। তাই লজ্জা পেল। মাথা নীচু করে পা বাড়াল সে মোষের খোঁজে।

ভয় তখনো কাটে নি। কিশোরীর গলায় নামল সন্ধ্যাবেলার বাঁশ বাগানের ভয়ার্ত ভাব। চেঁচিয়ে বলে ফেলল, তোমহা কায় মুই জানোনা। দোহাই লাগে বাপ পঞ্চানন ঠাকুরের। মোক্ ছাড়িয়া তোমহা চলিয়া যান্ না।

কি খেয়াল চাপল দীনকাটুর মাথায়। কপট গাম্ভীর্যে বলে বসল, মোর কাম ছেগে পরের বেটি। মুই যাছো। মোর নাম দীনকাটু সিংহ। থাকে ছু তারাবাড়ির গিরির ঘর।

—মুই পাথরঘাটার সর্প সিংহের বেটি টিয়াশ্বরী। জঙ্গলৎ আইচ্চিনু খড়ি লুড়াবার। মোর দেহাৎ মাছির বিষ। মোক্ কি ঘর নেগায় দিবার পারিস?

—ঘরৎ গেলে মানসি কি কবে?

—কায় কি কবে হাতাস খাছিস ক্যান্? আর দেখি, কোন্ঠে ছে তোর ভইস।

—ক্যানে, ভইস দিয়া তোর কি হবে গে গাভুর মাইয়া?

—মুই ভইসের পিঠৎ চড়ি ঘরৎ যাম। সেথা মোর জেল্লা কাম পড়িয়াছে। মা মোর আন্ধা, দেখির না পায়। বাপ্ গেইছে হালবাড়ি হাল জোতিবার। ছোটো ভাইডা গেছে বাপের তানে পান্থা ধরি।

দূরে থেকে ডেকে ওঠে পবনা, আন্ধারু।

—হুইবে পরের বেটি ডাকাছে মোর পবনা, আন্ধারু।

—বা, বা, ক্যামন সোন্দর নাম রাখেছিস্ তোর ভইসের নাম। বলেই এক দৌড়। দৌড়ে গিয়ে পবনার শরীরে হাত বোলাল টিয়া।

এক লাফে চড়ে বসল পবনার পিঠে। পবনাও হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে নুতন সওয়ারী নিয়ে চলল নদীর ধার ধরে।

—হেই টিয়া, ভইস লেগাইস্ না? ঘরৎ যাইয়া ছেকিবা হবে।

বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জিব ভ্যাংচিয়ে টিয়া জবাব দিল, তুই কচু খাইস ঘরৎ যাইয়া। মুই যাছু ঘর।

কি আর করে দীনকাটু। সে-ও গিয়ে লাফিয়ে উঠল আন্ধারুর পিঠে।

আগে পিছে চলল দু'টি মোষ নদীর ধারের পাতলা কাশ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। দূরে শোনা গেল ভাওয়াইয়া গান।

ধিক, ধিক, ধিক মইশাল রে
মইশাল ধিক গাবুরালী
এ হ্যানো সুন্দর নারী,
ক্যামনে যাইবেন ছাড়ি। মইশাল রে॥

* * * *

ভার বান্ধ ভাড়টি বান্ধ হে
মইশাল বান্ধ মাথার কেশ
আজি বা ক্যানে দেখং মইশাল
ছাড়িলেন আমার দ্যাশ। মইশাল রে॥

—ও মইশাল, শুনেছিস্ গাহান?

—তোর কোনো লাজ শরম লাই রে টিয়া। তোর বাপো মা ক্যান্ দেয় না বেহা এতডা গাভুর বয়সৎ!

খিলখিল করে বালাসন নদীর মত চঞ্চল স্বরে হেসে উঠে টিয়া বলে বসে, মুই তরাই-এর মাইয়া। জঙ্গলের লাখান মোর মন, হেই—এ—ত্ত বড়—অ—; লাজ? নদীর কি কোনো লাজ ছে? অয় কেমন করি বয়আ যাছে কোন্ সে দূরের নাম না জানা দ্যাশের তানে কায় জানে!

—তুই তো ভালয় কাথা কবার পারিস!

—করার পারিম্ নি! খগেন দা যে কলেজ পড়ে। অয় মোক এ গিলা শিখাইছে।

—খগেন রায়? হামার রাজবংশী ভাষাৎ যায় নেডিওৎ গাহান গাছে?

বাড়ির কাছাকাছি এসে টিয়া হঠাৎ মোষ থেকে নেমে পড়ল। চোখের কোণে পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে বলে গেল, ফের দেখা হবে নদীর পার জঙ্গলৎ, আসিস্ দেই?

চলে গেল টিয়া।

জীবনের কোন্ নিভৃত মন্দিরে বেজে উঠল যৌবনের ঘণ্টা। কিসের এক নেশার টানে মনটাকে জড়িয়ে নিয়ে দীনকাটু ফিরল জোতদার বাড়ি।

দিন যায়। সময়ের শ্লেটে নানান দাগ কেটে বছর ঘোরে। বালাসন নদীর ধারে জঙ্গলের নিভৃত কোণে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে দুটি হৃদয় সরব হয়ে উঠে। সৃষ্টির প্রথম দিনের মানব-মানবী যেন ফিরে পেয়েছে সে বন। বাতাস ওদের কথা বহন করে নিয়ে যায়। পাহাড় প্রতিধ্বনি করে তা ফিরিয়ে দেয়। দিন যায়। দিন যায়।

প্রকৃতির কোলে মোষ ছেড়ে দিয়ে টিয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে দীনকাটু। তার বাঁশের বাঁশীতে শোনা যায় ভাওয়াইয়া গানের সুর।

গাও তোলো, গাও তোলো
মইশাল বন্ধু রে॥

গাও তোলো, গাও তোলোরে মইশাল
গাও তোলোরে ডাঙিয়া
ওরে কোন্ বা চোরায় নিয়া যায় মোক
চুরি করিয়া রে।
মইষ চরান্ মোর মইশাল বন্ধু
কোন্ বা চরের মাঝে
ওরে এলাও ক্যানে ঘান্টির ড্যাং
মুই না শোনং ক্যান রে॥
মইষ দোয়ান মোর মইশাল বন্ধু
গামছা মাথায় দিয়া
ওরে মোর নারীটার মনটায় কয়
মুই পরু ধরুং যায়া রে॥

টিয়ার চোখ বেয়ে নামে পাহাড়ী ঝোরার জল। টিয়া কেঁদে ওঠে।

—কান্দিস ক্যানে টিয়া! চমকে ওঠে বলে দীনকাটু।

—তুই এমন ক্যানে দীনকাটু? তোর বাঁশী শ্যামের লাগান। মোর মন পাগল করি দেয়। মুই ঘরৎ রবার পারু না।

দীনকাটু গভীর আবেগে টিয়াকে কাছে টেনে নেয়। বুড়ো বট-গাছে ডেকে ওঠে কোকিল।

টিয়ার অন্ধ মা ওর কথাবার্তায় লক্ষ্য করে নূতন সুর। ওর খগেনদাও আর খুঁজে পায় না কিশোরী মেয়ের সেই আগের জিজ্ঞাসা-ভরা প্রশ্নের রেশ।

—হ্যাঁরে টিয়া, কি হইছে তোর? এমন করির কি ভাবেছিস? দিন দিন তোর এত কিসের টান খড়ি লুড়াবার? নুকাইস ক্যান?

—না খগেন দা। মোর কোনো নি হায়।

—লাজ করেছিস ক্যান? কাকো কি মন ধরিছে?

—কিযে কহছিস তুই! তোক্ ছাড়ির কাকো না চাহু মুই। তুই যে মোর দাদার দাদা।

—হ্যাঁ বুঝেছু। রঙ লাগিছে তোর মনৎ।

টিয়া আর চেপে রাখতে পারে না। এসব বোধহয় চেপে রাখাও যায় না। এ যে পাহাড়ের ভেতরের জমা জলের স্রোত। বাইরে বেরুবার জন্য সদাই চঞ্চল।

সব খুলে বলে সে। সেদিনের সেই মৌমাছি থেকে বেঁচে আসা, জঙ্গলের নিভৃতে মোষের পিঠে চড়ে ঘর বাঁধবার অভিসার। বালাসনের উন্মুক্ত বুকে জলবিহার, দীনকাটুর বাঁশী শুনে উতলা হয়ে যাওয়া, কিছুই বাকী রাখল না। পরিশেষে কান্নাভেজা গলায় বলে ফেলে, জানিস খগেন দা, অয় মোক্ বেহা করির চায়। অয় পরের ঘরের মইশাল। মোক্ বেহা করিলে যে অর পণ দিবার নাগিবে। বাপক তুই তো চিনিস। বাপ কি মোর পণ ছাড়ির মোর বেহা দিবে? অয় কোন্ ঠে পাবে এত্‌লা টেকা! চোখে টিয়ার বর্ষার বৃষ্টি।

—তুই ভাবিস ক্যানে টিয়া। তুই মোর বইন, তোর খুশীর লাগির, তোর ঘর সংসারের তানে মোর কি কোনোই দায়িত্ব নাই? কত নাগিবে?

—দুইশো টেকা নাগিবে। তুই, তুই দিবো খগেন দা? টিয়ার চোখে মুখে লাউ-এর আকশিতে ধরা কঞ্চির অবলম্বনের আশ্বাস পাবার আগ্রহ।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ। মুই দিম। যা কয়া আয়নে যায়া।

টিয়ার পায়ে বনের ছন্দ জাগল। গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে দৌড়ে চলল টিয়া।

বাঁশ বাগানের মধ্য দিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে নদীর ধারের কাশবনের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'ল তাদের সেই পরিচিত বটগাছের নীচে।

আপন মনে মগ্ন হয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে দীনকাটু। বাঁশীর সুর এমন করে কাঁদছে যে টিয়া ঠিক থাকতে পারল না। ভরা বর্ষার বালাসন নদীর কূলের শালগাছে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দীনকাটুর বুকে। এক হাতে বাঁশীটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। কান্নাঝরা গলায় বলে উঠল, তুই মোক্ খুউব ভাল-বাসিস না হায় রে দীনকাটু?

চোখের ভেতর স্বপ্ন—অথচ মুখের ভাষা যেন দূরের ঐ সাদা পাহাড়টার মতই দূরের, এমন স্বরে জবাব দিল দীনকাটু, ভালবাসার কি কোনো দাম ছে রে টিয়া? এ পিথ্থিমিৎ যার টেকা ছে, অর সব ছে। দ্যাখিস না ক্যানে গিরির বেটা ভুবনক। কলেজৎ পিয়া বাঙালী চেংড়ি ক ভালবাসি বেহা করিছে। ওমার টেকা ছে তার তানে ওকিলের বেটি বেহা করির পারিছে। মুই? মুই তো গিরির বাড়ির মইশাল। বাপ নাই, মাও নাই। ঘর নাই, বাড়ি নাই। জমি নাই, জোত নাই। টেকা নাই—কোনোই নাই।

এবার টিয়া বলল, তুই ভাবেছিস ক্যানে? তোর মোর বেহা ঠিক হবে দেখে লিস।

—কেমোন করির?

—তোক্ ভাবির নি লাগে। মুই সব ঠিক করি ফেলাই ছু। খগেন দা টেকা দিবে।

এবার দীনকাটুর আগ্রহের বীজ চারা গাছের মত দুলে উঠল। বলল, ঠিক কহছিস তো টিয়া? কোন্‌দিনা যাম তোর বাপের লগৎ? আজি?

লজ্জার রঙ লাগল টিয়ার মুখে। জলদি করার কি কাম? যাইস না ক্যানে একদিন।

—ইডা কি কহছিস! দেরী ক্যানে? মুই অ্যালহায় যাম্।

—তোর খুশী।

টিয়া ছুটে চলল বাড়ির দিকে। ওর চোখে একটা ছোট্ট ঘর। মাথায় সিঁদুর। হাতে শাখা। হঠাৎ—বাপ্‌গে বাপ্—চীৎকার। পড়ে গেল টিয়া।

দূর থেকে দীনকাটু চেঁচিয়ে উঠল, কি হইছে রে টিয়া?

—মোক্ সাপে কাটিছে দীনকাটু। মোক্ সাপে কাটি—

—কি কহলো? সাপ? উন্মত্তের মত তীব্র বেগে ছুট্ লাগাল দীনকাটু। দৌড়ে গিয়ে দেখল একটা গোখরা সাপ জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

হায় বাপ্, কি হবে গে!

হঠাৎ একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে ভীষণ আক্রোশে সাপটাকে মারতে লাগল দীনকাটু। পেশীতে ওর জিঘাংসার স্রোত। নিরীহ সাপ পারবে কেন! সে তো এমনি কামড়ায় নি! শরীরে পড়েছিল চাপ তাই ফুঁসে উঠে ছোবল মেরেছিল।

সাপটাকে মেরেও শান্তি পেল না দীনকাটু।

এদিকে বিষ ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে। যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল টিয়া।

রাগের দেখী হুঁশ ফিরিয়ে দিলেন দীনকাটুকে। দ্রুত গামছা ছিঁড়ে টিয়ার হাটুতে বান্ধ দিল সে। কাঁধে নিয়ে এতদিনে সমস্ত লাজলজ্জা ত্যাগ করে ছুটে চলল টিয়াদের বাড়ি। টিয়াকে ওর বাপের কাছে পৌঁছে দিয়েই দীনকাটু ছুটল ওঝার বাড়ি।

এদিকে সর্প সিংহের চীৎকারে জেগে উঠল পাড়া। সবাই এল ছুটে। ছুটে এল খগেন রায়।

খগেন রায় এসে অর্দ্ধ-চৈতন্য টিয়াকে জিজ্ঞেস করল, কোন্‌ঠে তোক্ কামড়াইছে রে টিয়া?

—কায়? খগেন দা?

—হ্যাঁ রে টিয়া, মুই।

—অর কোন্‌ঠে গেইসে? মুই আর বাঁচিমনি খগেনদা। মরার আগৎ অর কোলৎ মাথা রাখি মরির পালে শান্তি পানু হয়। অক ডাকা না ক্যানে?

—অয় ওঝা আনির গেইসে। আসিবে অ্যালহায়।

টিয়ার বাপ, মা, ভাই সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ল। পাড়া-পড়শীরাও শোকে স্থির চিত্রের মত ইজেলে লগ্ন হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর ওঝা নিয়ে যখন দীনকাটু এল টিয়া তখন শেকড়-কাটা গাছের মত নেতিয়ে পড়েছে।

দীনকাটু প্রিয়জনকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে টিয়ার-মত নরম শরীরটাকে কোলে নিয়ে হু-হু করে কালবৈশাখীর ঝড়ের বেগে কেঁদে উঠল।

পৃথিবীর নীলাকাশে যেখানে প্রতিনিয়ত পাখি ডানা মেলে, সে আকাশের নীলিমায় হঠাৎ কালো মেঘ এসে সমস্ত নীল রঙকে ব্লটিং কাগজ দিয়ে যেন চুষে নিল।

দীনকাটুর কোলে মাথা রেখে সবুজ রঙের টিয়ে পাখি যেন বিষের নীল রঙে রাঙা হয়ে ভালবাসার সবুজ দ্বীপের ঘাসে শেষ আশ্রয় নিল।

—দীনকাটু। অ—দীনকাটু। কোন্‌ঠে গেইল রে?

জোতদার প্রহ্লাদ সিংহের ডাকে দীনকাটুর তন্ময়তা ভাঙল। সে দ্রুত মোষগুলি নিয়ে গোয়াল ঘর ছেড়ে বাইরে এল।

—অ্যালহায় ও যাইসনি?

—যাছু গিরি।

পবুনা, আন্ধারুকে নিয়ে দীনকাটু চলল বালাসন নদীর পারে। যেখানে বটগাছের নীচে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে আছে তার ভাল-বাসা। সেখানে গিয়ে মোষ ছেড়ে দিয়ে বাঁশীতে বাজাবে সুর—যে সুর বাতাসের দেয়াল ভাঙতে ভাঙতে অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরিয়ে দেবে—

জীবন, জীবন, জীবন বন্ধু রে
তুই মোক্ ছাড়িয়া গেইলে
আদর করিবে কায়
ও জীবন বন্ধু রে॥

বাজার বড় মন্দা

অমল চক্রবর্তী

বাজার বড়ই মন্দা।
বণিকের দাঁতের ধার বেড়ে চলে,
ছাপোষা মানুষ মগজ গুলে খেতে খেতে
হাঁ-মুখে এখন হাওয়া খায়,
হায়ের ফাঁকে ফাঁকে ত্রিভঙ্গ দাঁতের সারি
যেন ধ্রুপদী কত্থক।

বাজার বড়ই মন্দা।
বণিকী সভ্যতা সোনার গাড়ুতে জল ভরে মলত্যাগ করে,
উচ্ছন্ন মানুষ কুকুরকে শ্রেণীশত্রু ভেবে
আস্তাকুঁড়ের কুরুক্ষেত্রে গদা ঘোরায়,
পরণে দু'আঙুল নেংটি
বাকিটা স্বর্গীয় ঈশ্বর নিয়েছে।

বাজার বড়ই মন্দা।
জাহাজ তাই কুমারী মেয়ের মত বন্দরে ভেড়ে,
ক'মাস পরে গর্ভভারে হেলেদুলে চলে যায়
জামাতার আদর খেয়ে বাপের দেশে,
গর্ভে তার কোটি কোটি মানুষের দলিত পিন্ড।
ফেরীঘাটে অন্ধকারে দেশজ যুবতী শোয় মাত্র পাঁচ টাকায়।

বাজার বড়ই মন্দা।
বণিকের রাজদন্ড প্রহরীর হাতে
লৌহদন্ড বংশদন্ড হয়ে উঁচিয়ে থাকে।
পোড়াবিত্ত মানুষ, চৈতন্য এদেশী দেবতা,
তাই ট্রেনে বাসে ট্রামে পথে ঘুরে ঘুরে ঘরে ফেরে রাতে,
ক্লান্ত উপবাসী তবু অভ্যস্ত ভালবাসা সংসার বাড়ায়।

বাজার বড়ই মন্দা।
গলতে গলতে এক রুপাইয়া মাত্র উনিশ পয়সা।
ওয়েজ ফ্রিজ? কিংবা প্রফিট ফ্রিজ?
প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন? চুলোয় যাক।
বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জিন্দাবাদ!
মেট্রোতে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা ঘামছে
'রতির্নিবেদনম' ছবিতে,
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংস্কৃতির ঐক্য চাই—বন্ধুগণ.....
অবশেষে সন্ধ্যা নামে কাকের কলহে।

বাজার বড়ই মন্দা।
যার আদর্শ আছে ট্যাঁকে পয়সা নেই,
যার পয়সা আছে মগজে কুৎসিৎ লোভের ঘা,
শিশুর সামনে চিতায়-চাপানো ভবিষ্যৎ,
তাজা যৌবনের সামনে মসৃণ অনন্ত গহ্বর,
বৃদ্ধের সামনে শাদা দেয়াল, পেছনে ধূসর স্মৃতি,
নারীর সামনে রন্ধন ও গর্ভধারণ,
পুরুষের সামনে আস্ফালন ও পতন।
আবার ভোর আসে
পুঁজির বেশ্যাগারে সারারাত কাটিয়ে রক্তিম চোখে।

বাজার বড়ই মন্দা।
মন্দ মন্দ গতিতে পাল তুলে চলেছে ইস্টিমার, গাধাবোটের সারি,
জনগণ রয়েছে তাতে।
একটা পাখির শিসে
একটা সদ্যোজাত শিশুর কান্নায়
একটা কিশোরের অবাক চোখে
এক বৃদ্ধার ভ্রূকুঞ্চিত বলীরেখায়
একজন কমিউনিস্টের উদ্ধত কপালে
যে চিহ্ন রয়েছে কে তার অর্থ বলে দেবে?
বণিকের রাজদন্ড ফিরে যাবে রাজদন্ড হয়ে
স্ফীতোদর সভ্যতার শেষ বিনাশে?

তাই যেন হয়।
এ বাজার বড় দুঃসময়।

হে প্রভু, উদয় হও

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

হৈ হৈ শব্দ তুলে আসরে নামলো বিদূষক,
কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টা রমরমিয়ে আসর জমালো—
তারপর দুঃখ নিয়ে বসে রইলো বিমূঢ় দর্শক,
বিদূষক চলে গেছে, লাইটম্যান আলোও নেভালো।

যুবমানস ।। ২২
মস্কোয় অলিম্পিক্, হকিতে জিতেছে যেন কে,
ইচ্ছে না থাকলেও মঞ্চ থেকে সরে যেতে হয়—
গোঁড়ালির অসহ্য ব্যথা, চোখেতেও বাধো বাধো ঠেকে,
মধ্যবিত্ত মহোদয়, ময়না কি নতুন কথা কয়?

নাহয় দুঃখসুখ একান্তই নিজস্ব ব্যাপার,
নাহয় নিজস্ব কোনো ব্যাপারেই দুরন্ত অনীহা—
তবুও জ্বর বাড়লে গায়ে তুলি শীতের র‍্যাপার,
হে প্রভু, উদয় হও, কেড়ে নাও জীবনের স্পৃহা।

ফুল দেবে মরণকে—স্থলপদ্ম

মইনুল হাসান

কাউকে ফুল দ্যায় নি সে
জন্মের সময়ে ডেকেছে শঙ্খচিল
অশান্ত প্রকৃতির কানফাটা হাহাকার
ঘুরিয়ে দিয়ে যায় গতি
তীব্র ঘৃণাতে ফেটে পড়ে ইতিহাস
মিথ্যার ফুলঝুরি—শুধু মিথ্যা ফানুস
(তাই) যৌবনের উদ্দীপ্তবাহু
খুঁজে নিল মাঠে ময়দানে—জীবন

ফুটন্ত টকটকে লাল গোলাপ
লজ্জায় ভেঙে ভেঙে যায়
কালো ফুটপাত আরও লাল দেখে
সেখানে খুঁজেছে জীবন—স্থলপদ্ম
রক্তিম পূবাকাশ তাই খুঁজছে সকাল
চেতনাতে তৈরী হয়ে যায় ইতিহাস
ফুল দেবে মরণকে—স্থলপদ্ম

ফুল দেবে মরণকে—স্থলপদ্ম

যোজন সাগর দিতে পাড়ি...

অনির্বাণ দত্ত

পাহাড় কি পেরোনো যায় লাফিয়ে—
সাগরে হারানো যায় দাপিয়ে?
যেতে হয় পায়ে হেঁটে
বাধা ভেঙে ঢেউ কেটে হাঁফিয়ে!
ঝড়ো হাওয়া নীলাকাশ কাঁপিয়ে।

উঁচু চুড়ো ছুঁতে পারে শামুকও
যতবার বুকে হেঁটে থামুকও
মাঝপথে কাঁটা-ক্ষতে নামুকও
তুষারের ঝড় কি বা খর রোদ-বৃষ্টি
সঠিক লক্ষ্যে তার দৃষ্টি।

পিঁপড়েরা তাই বুঝি আস্তেই
শানায় দাঁতের খুদে কাস্তেই?
হাজার লক্ষ দিন বাঁচতেই
মিলে মিশে হাঁটে এক সারি—
যোজন সাগর দিতে পাড়ি?

হে নভেম্বর

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

হাতে নিয়েছি ঢাল
হাতে নিয়েছি অসি
'রে শত্তুর রে শত্তুর'
চতুর্দিক চষি
ভাইকে দিই দুয়ো আমি
মাকে করি ভাগ
আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে
অন্ধ বুনো রাগ।

কে আমায় শত্রু চেনায়
আমায় চেনায় কে—
হে নভেম্বর, নভেম্বর হে
তুমি ছাড়া আর কে!

রাজা যায়, রাজ্যে আসে
ভিন্ন সাজে রাজা
পারিষদরা হেঁকে বলে
বাজা, ঢোলক বাজা।
যুদ্ধে মরি যুদ্ধে মারি
রই যে-কে-সেই প্রজা
নভেম্বর হে বলতে শেখাও
আমিই আমার রাজা।

হাতে নিয়েছি ঢাল
হাতে নিয়েছি অসি
আমার অসির ঘায়ে লুটায়
মোরাদাবাদে ভাই
নির্বিচারে খুন করেছি
আসাম ত্রিপুরায়
শত্রুকে ঠিক মিত্র দেখায়
চোখে রঙীন ঠুলি
হে নভেম্বর, নভেম্বর হে
দাও এ ঠুলি খুলি।

শব্দ তুলে রাখি

অচিন চক্রবর্তী

শুধু ভালবাসায় খাদ মেশাবো না
বলেই কিছু শব্দ আমি সরিয়েছি গোপন দেরাজে।

এখন সময় বড় বাজে,
সমস্ত বিপণন দিনক্ষণ ভর্তি করে শুধু
ভোজবাজি হয়ে যাচ্ছে নিরন্তর, সত্য সাঁই বাবা
যেন বা হাজির অঞ্চলে। চালে-ডালে
কেরোসিনে-চিনিতে-বিদ্যুতে কিংবা শিশু-খাদ্যে প্রস্ফুট প্রভাব;
দলেমুচড়ে ডাস্টবিনে গড়াগড়ি সমস্ত স্বপন।
উপজাত কুয়াশায় পরিব্যাপ্ত জীবনযৌবন।

তবু মন
সাঁতরে পেরুতে চায় সময়ের সর্বনাশা গাঙ
হাতে হাত ধরে, মরুভূমি
যেমন পেরয় রাহী হৃদয়ে হৃদয় জুড়ে দিয়ে
বুকে বুক রেখে, অন্ধকার
তেমনি পেরিয়ে যাব বেমালুম প্রত্যয়ে নিবিড়
বিশ্বাসের শিখা জেলে পরিপার্শ্ব তুষার গলিয়ে।

দুরন্ত সে অভিযাত্রায়
নিটোল উষ্ণতা চাই বলেই এখন
শব্দ বাছাই করি, ছন্দ যাচাই করি, আর
শুধু ভালোবাসায় খাদ মেশাবো না
বলেই কিছু শব্দ তুলে রাখি গোপন দেরাজে॥

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

সাইবারনেটিক্‌স্‌

গণিত, বলবিদ্যা আর শরীরতত্ত্ব—বিজ্ঞানের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যে কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত হতে পেরেছে তার নাম—সাইবারনেটিক্‌স্‌ (Cybernatics)। আরও সহজে বলা যায় প্রাণী ও যন্ত্রের ভিতর যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার নাম সাইবারনেটিক্‌স্‌।

সাইবারনেটিক্‌স্‌ কথাটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় এর অর্থ ছিল "নিয়ন্ত্রক" (Steersman) অথবা আরও সাধারণভাবে কথাটি একটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। আর আজকের বিজ্ঞান সাইবারনেটিক্‌স্‌ বলতে কি বোঝায় তা আগেই বলেছি।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাঁদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। সে কথা থাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরের ভ্যান্ডার বিল্ট হলে (Vander Bilt Hall) মাসে একবার কিছু বৈজ্ঞানিক খাওয়াদাওয়া করতে একত্রিত হতেন। বিজ্ঞানের সব শাখারই কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির এই একত্রিত ভোজপর্ব ছিল বৈজ্ঞানিক আলোচনার এক বিচিত্র স্থান। প্রতিটি ভোজ-সভার পর কোন একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা হত। এরকম একটি ভোজসভায় ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইনস্টিটিউট অফ্‌ টেকনোলোজির (পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারীং বিশ্ববিদ্যালয়) অঙ্কের প্রখ্যাত অধ্যাপক এন. ওয়াইনার (N. Wiener) ও দুজন প্রখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ ডঃ রোজেনব্লুয়েথ (Dr. Rosenblueth) এবং ডঃ ওয়াল্টার ক্যাননৃ (Dr. Walter Cannon) আলোচনা করছিলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল এমন সমস্ত সমস্যা নিয়ে যেখানে একই সঙ্গে গণিত ও শরীরতত্ত্ব জড়িত। কি রকম?

একটা যুদ্ধ চলছে। একজন পাইলট একটা এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল যে সামনে একটা অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ (বিমান বিধ্বংসী কামান) থেকে গুলী ছোঁড়া হচ্ছে। পাইলট দ্রুততার সাথে প্লেন আরও উঁচুতে উঠিয়ে নিল এবং তার যাত্রাপথ বদল করল। এই যে কাণ্ডটা ঘটল তার জন্য পাইলটের বুদ্ধি-বিবেচনা ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভর করা যায় না। যদি পাইলট ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত না নিত তবে বিমানটি ধ্বংস হতে পারত। কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যে প্রতিক্রিয়া হয় তার একটি যন্ত্রায়িত রূপ দেওয়া গেলে মানুষের উপর আর নির্ভর করতে হয় না। এইরকম একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঐ তিন বিজ্ঞানী অনুভব করলেন ঐ রকম একটি যন্ত্রায়িত ব্যবস্থার কথা।

এইবার কাজকর্ম শুরু হল এবং অবশেষে বলবিদ্যা, গণিত ও শরীরবিদ্যাকে এক জায়গায় হাজির করা গেল। আবিষ্কৃত হল সাইবারনেটিক্‌স্‌।

বৈজ্ঞানিকদের মতে,—"বৈজ্ঞানিক বিপ্লব জন্ম দিয়েছে অ্যাটম বোম-এর আর সাইবারনেটিক্‌স্‌ এনেছে নতুন এক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব।"

চলচ্চিত্রে রুশ বিপ্লবঃ আইজেনস্টাইনের দুটি ছবি

দেবাশীষ দত্ত

একদা যে আশ্চর্য প্রতিভাধর নিজের মধ্যে একটি যুগকে সৃষ্টি ও বহন করে তার স্মৃতি ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন যুগান্তরের দর্শক সমাজে, সেই চলচ্চিত্র গুরু আইজেনস্টাইন সোভিয়েৎ চলচ্চিত্রের প্রাণপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত। রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে নির্মিত আইজেনস্টাইনের দুটি নির্বাক ছবি 'স্ট্রাইক' (১৯২৪) ও 'অক্টোবর' (১৯২৭) দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। দুটি ছবিতেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের সুরটি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 'স্ট্রাইক' আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার শিল্পগত সমস্যার প্রতিফলন দেখা যায় ছবিটিতে। চলচ্চিত্রের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি এই ছবির মাধ্যমে অসামান্য নিপুণতায় প্রকাশিত হয়েছে। আইজেনস্টাইনই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের শিল্পগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছিলেন। তার পরিচয় এই ছবির সর্বত্র। তিনটি অংশে বিভক্ত এই ছবিটিতে একটি কেন্দ্রীয় সুরের অনুরণন লক্ষ্য করা যায়।

একটি কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে 'স্ট্রাইক'-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। শ্রমিকরা কারখানা মালিকের অনুচর এবং গোয়েন্দাদের সতর্ক দৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটের প্রস্তুতি চালাচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একটি শ্রমিকের আত্মহত্যা ধর্মঘটকে ত্বরান্বিত করে। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করার পর সর্বপ্রথম অবকাশের অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু ক্রমে দুঃখ-দুর্দশা চরমে ওঠে। শ্রমিকদের শেষ সম্বলটুকুও খাদ্যসংগ্রহের জন্য ব্যয়িত হয়ে যায়। প্রলোভন ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়ে পুলিশ ধর্মঘটের নেতাদের আলাদা করে দিতে চায়। গুণ্ডাদের আক্রমণের দ্বারা শ্রমিকদের প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়। একটি ক্ষিপ্ত ষাঁড়কে পুলিশী অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে ছবিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ছবির এই বিষয়বস্তু ও ঘটনা-প্রবাহ মোটামুটি সরল এবং সমসাময়িক। ছবিটির মূল বৈশিষ্ট্য তার ডকুমেন্টারি-সুলভ বিন্যাসে। 'পটেমকিন'-এর মত 'স্ট্রাইক'ও কোন ছবির একটি বিশেষ অংশ হিসেবে পরিচালকের কল্পনায় এসেছিল। পরে 'পটেমকিন'-এর মত এটিও পূর্ণাংগ ছবির রূপ পায়। বস্তুত, 'টুয়ার্ড ডিক্টেটরশিপ' নামের একটি ছবির অংশ হিসেবে এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। ছবির সমাপ্তিতে আপাত-হতাশার যে সুরটি ফুটে উঠেছে, তা থেকে এটা বোঝা যায়।

শোনা যায়, আইজেনস্টাইন প্রকৃত কারখানার পরিবেশে 'স্ট্রাইক' নাটক অভিনয় করার বাসনা পোষণ করেছিলেন। ক্রমে অভিনয়-মঞ্চ (এবং সার্কাসের অঙ্গন) ছেড়ে পুরোপুরিভাবে চলচ্চিত্রে আত্ম-নিয়োগ করেন। এই ছবিটিতে তাঁর জীবনের এই দুটি বিশেষ দিকের ছায়াপাত ঘটেছে। একদিকে বাস্তব উপাদানের আশ্রয়ে বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি ও পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, অন্যদিকে সার্কাসের লঘু সুরের সাথে তাল রেখে 'ডিটেল'-এর কাজে কখনো কখনো অতি-রঞ্জনের ঝোঁক এসেছে। প্রচারমূলক পোস্টারের ব্যবহার এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তরুণ আইজেনস্টাইন এইভাবেই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের ভাষাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। এক নতুন পরীক্ষায় ব্রতী আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের প্রচলিত ধারা, প্রকাশশৈলী ও বিন্যাসকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন এবং সে প্রয়াসে তিনি সর্বাংশে সফল হয়েছিলেন। কারখানার বাস্তব পরিবেশ ছবিটিকে অশেষ মূল্য দিয়েছে। দৃশ্য গ্রহণের অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য ও অভিনয়ের শক্তিশালী প্রকাশভঙ্গী ছবিটির গুরুত্ব বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।

১৯২৭ সালে রুশ চলচ্চিত্র-শিল্প অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী পালন করে দুটি অসামান্য চলচ্চিত্র—পুডভকিনের 'দি এন্ড অফ্ সেন্ট পিটার্সবার্গ' এবং আইজেনস্টাইনের 'অক্টোবর' প্রযোজনার মাধ্যমে। শেষোক্ত চিত্রটির মাধ্যমে নির্বাসিত লেনিনের গোপন প্রত্যাবর্তন এবং বলশেভিকদের ক্ষমতাদখলের মধ্যবর্তী চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলি বিবৃত হয়েছে। আইজেনস্টাইনের অসামান্য শিল্পদৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির বিশ্বস্ত পরিচয় পাওয়া যায় ছবিটিতে। একটা যুগের ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য আইজেনস্টাইন প্রতিরোধ ও সংগ্রামের পর্যায়ের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন, তাদের যথার্থ ভূমিকাটুকু চিনে নিতে দর্শকদের এতটুকু অসুবিধা হয় না। কয়েকটি শক্তিশালী দৃশ্যকল্পের ব্যবহার ছবিটিকে আশ্চর্য সমৃদ্ধি দিয়েছে। প্রধান দৃশ্যগুলির সম্পাদনা নিঃসন্দেহে আইজেনস্টাইনের শিল্পক্ষমতার পরিচায়ক। কয়েকটি ইংগিতময় মন্তাজের ব্যবহার অপূর্ব। জটিলতা এবং অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে সেগুলি দর্শকচিত্তকে আলোড়িত করে। স্বকীয় চিন্তার কল্যাণে তিনি রুশ চলচ্চিত্রে একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মারী সিটনের উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

Eisenstein had become captive of his own thought processes and his extra-ordinary vision of what the art of film could become.

আজ যদিও আইজেনস্টাইনের ছবি চলচ্চিত্রের ভিত্তিগত ব্যাকরণের ভূমিকা নিয়েছে, তবুও 'অক্টোবর'-এর শিল্পসৌন্দর্য পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

বিভিন্ন দৃশ্যের সংগঠনে চিন্তাশীল আইজেনস্টাইনের কারিগরী নিরীক্ষার পরিচয় বর্তমান। দৃশ্যগ্রহণের কাজে এডুয়ার্ড টিসের যথেষ্ট পারংগমতার পরিচয় বর্তমান। কয়েকটি 'কাটিং'-এর কাজ অপূর্ব। এই ছবির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে একজন শিল্পানুগত পরিচালকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগী। এই দৃষ্টিভংগী থেকে জন্ম নিয়েছে কয়েকটি স্মরণীয় আবেগ-মুহূর্ত যা অনেক সময়ে জটিল রূপ নিলেও দর্শকচেতনাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। অপূর্ব দৃশ্য গ্রহণের কাজ এবং ডকুমেন্টারি-সুলভ গুণ ছবিটিকে বস্তুনিষ্ঠ করে তুলেছে। কিন্তু আইজেন-স্টাইনের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগী, মূল্যায়ন এবং বিন্যাস এই ছবির সমৃদ্ধির মূলে।

সমাজতান্ত্রিক দেশে খেলাধুলা

অশোক বসু

পৃথিবীর দেশে দেশে মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৬৩তম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই ৬৩ বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যের বিপুল সাফল্য সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের জনগণের মনে আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

সমাজতন্ত্র মানব জীবনের সমস্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের সমস্যা যেমন সমাধান করা সম্ভব হয়েছে তেমনি সৃজনধর্মী দিকগুলির উৎসমুখও উন্মোচিত হয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির খেলাধুলা ও শরীর চর্চার সাফল্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনা সুরু করার আগেই এ কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের চিত্র এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। পৃথিবীর বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সবচেয়ে জনবহুল সমাজতান্ত্রিক দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সাফল্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। মাত্র দুটি দেশের কথা বলা হলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই দুটি দেশের মত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও খেলাধুলায় যে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে তার মূল কারণ হলো তারাও খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় সমগুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

গণ-শরীরচর্চা ও গণ-খেলাধুলো

৫ কোটি ৫০ লক্ষ লোক শারিরীক পটুতা বজায় রাখার কর্মসূচীর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। এই উদ্দেশ্যে বাজেটে প্রতি বছর পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। কি বিপুল পরিমাণ অর্থ এই খাতে ব্যয় করা হয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৯৭৮ সালের বাজেট থেকে। কেবলমাত্র এই একটি বছরেই "জনস্বাস্থ্য ও শরীরচর্চার" কর্মসূচীর জন্য ১,২৬,০০০ লক্ষ রুবল বরাদ্দ করা হয়। এই বছর সোভিয়েত জনসংখ্যার পরিমাণ ছিলো ২,৬০০ লক্ষ। এই দুটি তুলনামূলক সংখ্যা থেকেই প্রমাণিত হবে শরীরচর্চা খাতে মাথাপিছু ব্যয়ের বহর।

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশে, স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরেও, শরীর শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ হ'ল ৪ পয়সা মাত্র। নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের খসড়া বয়ানে এ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হয়েছে "পৃথিবীতে ক্রীড়াখাতে সম্ভবতঃ এর চেয়ে কম খরচ কেউ করে না।"

শিশুকাল থেকেই

সোভিয়েতে শিশুকাল থেকেই শরীরচর্চা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারটিকে সুনিশ্চিত করা হয়। বিদ্যালয়গুলিতে গণ-খেলাধুলো ও শরীরচর্চাকে উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যালয়গুলিতে শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। গণিত, পদার্থবিদ্যা বা অন্যান্য বিষয়ের মত শরীরচর্চায় প্রাপ্ত নম্বর ছাত্রছাত্রীদের রিপোর্টে ও স্কুল স্নাতকদের ডিপ্লোমায় স্থান লাভ করে।

যে সব শিক্ষার্থী বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে খেলাধুলো শিখতে চায় তাদের জন্য বিশেষ জুনিয়র ক্রীড়া স্কুলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এ ধরনের ৫,৯৫৬টি স্কুলে ৯ থেকে ১৮ বছরের প্রায় ২০ লক্ষ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করে।

স্কুলপর্যায়ে প্রথমে খ্যাতি অর্জন করে পরে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন এরকম ক্রীড়াকুশলীদের মধ্যে যেমন আছেন ইগরতের, ভার্নেসিয়ান, তামারা প্রেস, নেলিকিন ইত্যাদি। আবার স্কুলের ছাত্রছাত্রী থাকা অবস্থাতেই ওলিম্পিক ও বিশ্বখেতাব জয় করেছেন এমনও বহু সোভিয়েত ছাত্রছাত্রী আছেন। এদের মধ্যে আছেন সাঁতারু মারিনা কোসভায়া (মন্ট্রিল ওলিম্পিক বিজয়ী) ও জিমন্যাস্ট মাশা ফিলাতোভা ইত্যাদি।

খেলাধুলোর জন্য

একেবারে স্থানীয় মাঠ থেকে শুরু করে বিশ্ববিখ্যাত বিশাল বিশাল ক্রীড়াসমাহার। খেলাধুলোয় সুযোগ-সুবিধার একটি ব্যাপক ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে। একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলোঃ

১১৪ লক্ষ দর্শকের আসন সম্বলিত বৃহদাকার ষ্টেডিয়াম ৩,৮৮২টি; জিমনাশিয়াম ৬,৬০০টি; সন্তরণক্ষেত্র ১,৪৩৫টি; বন্দুক ছোঁড়ার কেন্দ্র ৬,৬০০টি; ফুটবল মাঠ ১,০০,০০০টি।

প্রশিক্ষণ

সোভিয়েত ক্রীড়া আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন প্রায় ৩ লক্ষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পেশাদার প্রশিক্ষক ও ৬০ লক্ষেরও বেশী স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষক।

খেলাধুলোর খরচ

এদেশে খেলার জায়গা, প্রশিক্ষণ, খেলার জিনিসপত্র বা জামা কাপড়ের খাতে ক্রীড়াবিদ্‌দের কোনও খরচ করতে হয় না। ক্রীড়াসমিতির সভ্য হিসাবে তাকে বছরে মাত্র ৩০ কোপেক চাঁদা দিতে হয়। যা নাকি এক প্যাকেট সিগারেটের দামের সমতুল্য। রাষ্ট্রীয় ও গণসংগঠনগুলি, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ প্রধানত প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়াসভার খরচ বহন করে।

শীর্ষস্থানীয় কোনো প্রতিযোগিতায় যখন কোনো ক্রীড়াবিদ্ তার ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করে তখন সেই প্রতিযোগিতার সমস্ত খরচ ও ক্রীড়াবিদ্‌দের যাতায়াতের ও অন্যান্য খরচ বহন করে হয় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটি নয়তো কেন্দ্রীয় সমিতি।

পরিচালন ব্যবস্থার শীর্ষে

সমগ্র ক্রীড়া আন্দোলনকে পরিচালনাকারী রাষ্ট্রীয় সংগঠন হলো সোভিয়েত ক্রীড়া কমিটি।

ক্রীড়া কমিটির দায়িত্বের মধ্যে রয়েছেঃ খেলাধুলোর বৈষয়িক ও

কারিগরী ভিত্তির উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্মধারার সংগঠন, ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ক গবেষণার সমন্বয় সাধন, জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলির আয়োজন, ক্রীড়াকর্মীদের প্রশিক্ষণ, খেলাধুলোর সাজসরঞ্জামের উৎপাদন ও বিতরণের সমন্বয় সাধন ও নতুন নতুন ক্রীড়াঙ্গন নির্মাণ। সমস্ত মন্ত্রীদপ্তর ও সরকারী এজেন্সীসমূহকে সোভিয়েত ক্রীড়া কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ মেনে চলতে হয়।

এই কমিটির আবার বিভিন্ন উপবিভাগ ও ক্রীড়াবিষয়ক বোর্ড আছে। যেমন, ফুটবল, এ্যাথলেটিকস্, জলক্রীড়া ইত্যাদি। এই সমস্ত বোর্ডের সাথে ৪৭ ধরনের খেলাধুলোর বিশেষজ্ঞরা যুক্ত আছেন।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃস্থানীয় ক্রীড়াসংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করে

সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সেই গোড়ার আমল থেকেই ক্রীড়া আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করে তোলার কাজে সব সময় সাহায্য করে আসছে। অসংখ্য ছোট ছোট ক্রীড়া ক্লাবকে ঐক্যবদ্ধ করে ঐচ্ছিক ক্রীড়াসমিতি গঠনে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এক সময় অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। ১৫টি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেকটিতে ট্রেড ইউনিয়নের ঐচ্ছিক ক্রীড়া সংগঠন আছে। এই সংগঠনগুলি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে এই পাঁচ বছরে ২০ হাজার শীর্ষস্থানীয় এ্যাথলেটের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এদের মধ্যে অনেকেই ইউরোপীয়, বিশ্ব ও ওলিম্পিক খেতাব জয় করার গৌরব অর্জন করেন। সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ক্রীড়াবিদ্‌দের জন্য ৩৫,০০০ ক্রীড়াঙ্গণ তৈরী করে দিয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের দশম পঞ্চবার্ষিকী কালে (১৯৭৬-১৯৮০) নতুন যে ৫৭২টি স্টেডিয়াম, ৪৩৬টি সন্তরণ ক্ষেত্র, ২,২৯২টি জিমনাসিয়াম ও ৫০০টি জলক্রীড়াকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে তার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ৬০০ লক্ষ রুবল বরাদ্দ করেছে।

সারা সোভিয়েত জুড়ে রয়েছে প্রাথমিক সংগঠনগুলি

সোভিয়েত ক্রীড়া ও শরীরচর্চা আন্দোলনের প্রাথমিক সংগঠন-গুলির সদস্য সংখ্যা কোথাও এক ডজন আবার কোথাও বা বেশ কয়েক হাজার। এ-জাতীয় ক্রীড়া ক্লাবের সংখ্যা হলো ২ লক্ষ ২০ হাজার। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে জনসংখ্যার অনুপাতে এই সমস্ত প্রাথমিক সংগঠনগুলির অবস্থান গ্রামাঞ্চলে ও শহরে সমানুপাতিক। ৬২ শতাংশ ও ৩৮ শতাংশ। সোভিয়েতে বসবাসকারী গ্রামাঞ্চলে ও শহরের জনসংখ্যার অনুপাতও শহরে ৬২ শতাংশ, গ্রামে ৩৮ শতাংশ।

খেলাধুলোয় সোভিয়েত নারী

শরীরচর্চা ও খেলাধুলোসমেত সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার সোভিয়েতে শুধু কথার কথা নয়—এই সমানাধিকার সত্যিকারেরই সুরক্ষিত। অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শ্রম ও স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে আছে মায়েদের কাজ করার উপযুক্ত অবস্থা, শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, শিশুদের মায়েদের মাইনেসহ ছুটি ও কাজের সময় কমিয়ে আনার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এর ফলে নারীদের প্রকৃত সমানাধিকারের ব্যবস্থাটি সুরক্ষিত হয়েছে।

সোভিয়েত জীবনধারার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হলো নারী-ক্রীড়া। নারীক্রীড়া হয়ে উঠেছে নারীমুক্তির একটি কার্যকরী মাধ্যম। সোভিয়েত ক্রীড়াসমিতি ও ক্লাবগুলির বিভিন্ন বিভাগে ২ কোটি নারী নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। প্রশিক্ষক, কোচ ও ক্রীড়া-সংগঠনের নেতাদের মধ্যেও বহু নারী আছেন। ২১তম ওলিম্পিকে যোগদানকারী সোভিয়েত প্রতিনিধিদলে বহুসংখ্যক নারী প্রতিযোগী ছিলেন ও এই ওলিম্পিকে সেই নারী প্রতিযোগীরা ৪০টি স্বর্ণপদক জয় করার গৌরব অর্জন করেন।

জনপ্রিয় খেলা

খেলায় অংশগ্রহণের বিচারে জনপ্রিয় খেলাগুলির শীর্ষে রয়েছে জিমনাস্টিক। তারপর ট্রাক ও ফিল্ড। জনপ্রিয় খেলাগুলি এবং যে পরিমাণ দর্শক এই সমস্ত খেলাগুলি দেখে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলোঃ

জিমনাস্টিক (৭০ লক্ষ), ট্রাক ও ফিল্ড (৬০ লক্ষ), ভলিবল (৫০ লক্ষ), ফুটবল (৪০ লক্ষ), বাস্কেটবল (৪০ লক্ষ), বন্দুক ছোঁড়া (৩০ লক্ষ), হ্যান্ডবল (৮ লক্ষ), অসিক্রীড়া (৫০ হাজার), অশ্বক্রীড়া (২৫ হাজার), পালতোলা নৌকা চালনা (২০ হাজার), আধুনিক পেন্টাথলন (৪ হাজার)। এছাড়া শীতকালীন স্কী (৪০ লক্ষ), দাবা (৩০ লক্ষ)।

উল্লেখ্য যে একেবারে আঞ্চলিক খেলাগুলি বাদ দিলে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬০ রকমেরও বেশী খেলাধুলোর প্রচলন আছে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত খেলাধুলো

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১০০টিরও বেশি জাতি ও অধিজাতি আছে। যাদের প্রত্যেকেরই একটি বা তার বেশী ঐতিহ্যশালী খেলা আছে যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্য প্রজাতন্ত্রগুলিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক খেলাগুলিকে সর্ববিধ উপায়ে উৎসাহ দেওয়া হয়।

ওলিম্পিকে কৃতিত্ব প্রদর্শন

সোভিয়েত ক্রীড়াবিদ্‌রা সর্বপ্রথম ১৯৫২ সালে হেলসিংকি ওলিম্পিকে যোগদান করেই মার্কিন প্রতিযোগীদের সামনে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেন। ১৯৫২'র ওলিম্পিকে সোভিয়েত প্রতি-যোগীরা ২২টি সোনা, ৩০টি রুপা ও ১৯টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। ১৯৭৬-এর মন্ট্রিল ওলিম্পিকে বেড়ে এই পদকের সংখ্যা দাঁড়ায় সোনা ৪৭, রুপা ৪৩ এবং ব্রোঞ্জ ৩৫টি।

গ্রীষ্মকালীন ওলিম্পিকে সোভিয়েত ক্রীড়াবিদ্‌রা যত পদক জিতেছেন তার মোট সংখ্যা ৬৮৩টি। এর মধ্যে সোনা ২৫৮টি, রুপা ২২১টি ও ব্রোঞ্জ ২০৪টি। লক্ষণীয় যে এই একই সময় মার্কিন ক্রীড়াবিদ্‌দের প্রাপ্ত পদকের সংখ্যা মোট ৬০৬টি। তার মধ্যে সোনা ২৫৪টি।

চীন

সাধারণতন্ত্রের জন্মলগ্ন থেকেই গণ-শরীর চর্চা ও খেলাধুলোর ওপর জোর দেওয়া হলো

বলা যেতে পারে চীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিনটি থেকে গণ-শরীরচর্চা, গণ-খেলাধুলো ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শরীরচর্চা ও খেলাধুলোর উন্নয়নের জন্য ১৯৫২ সালে চীন সাধারণতন্ত্র শরীরচর্চা ও ক্রীড়া কমিশন গঠন করা হয়। অঞ্চলে, প্রদেশে ও পৌর এলাকাগুলিতে ঐ একইভাবে আঞ্চলিক, প্রাদেশিক ও পৌর কমিশন গঠন করা হয়।

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ৪০টি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও ৩,০০০টি অবসরকালীন ক্রীড়া বিদ্যালয় রয়েছে।

ক্রীড়াসংগঠন ও সংস্থাসমূহ

ক্রীড়াকে গণমুখী করে তোলার জন্য সারা চীন ক্রীড়া ফেডারেশনের একটি সদর দপ্তর আছে বেজিংএ। সারা দেশে এই ফেডারেশনের শাখা আছে।

ট্রাক-ফিল্ড, সাঁতার, জিমনাষ্টিক, বাস্কেটবল, ভলিবল, ফুটবল, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ভারোত্তলন, সাইক্লিং, জলক্রীড়া, কুস্তি ইত্যাদি বিভাগীয় খেলাধুলোর উৎকর্ষ সাধন ও এগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ৩০টি জাতীয় সংস্থা আছে।

১৯৫৩ সালের পর থেকে ৮টি বৃহৎ গণ-শরীরচর্চাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বেজিং, তিয়ানজিন, উহান, সেনিয়াং, জিয়ান, চেংদু, সাংহাই ও গুয়ানঝেউতে এই কেন্দ্রগুলির অবস্থান।

খেলাধুলোর জন্য

বড় ও মাঝারি ধরনের শহরগুলিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ সরঞ্জামসহ ষ্টেডিয়াম ও জিমনাশিয়াম তৈরী করা হয়েছে। বৃহদাকার ষ্টেডিয়ামগুলির মধ্যে বেজিং ওয়ার্কার্স ষ্টেডিয়ামে দর্শক আসন সংখ্যা এক লক্ষ। মাঝারি ধরনের ষ্টেডিয়ামগুলিতে ১৮,০০০ দর্শকের আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন বেজিং ক্যাপিটাল ষ্টেডিয়াম, সাংহাই ষ্টেডিয়াম ইত্যাদি।

এছাড়া বেজিং-এ খেলাধুলো সংক্রান্ত গবেষণার জন্য একটি বিশালকায় গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

খেলাধুলোকে গণমুখী করে তোলো

খেলাধুলোকে গণমুখী করে তোলায় চীনের আগ্রহের সীমা নেই। অন্যদিকে খেলাধুলোয় গণ-অংশগ্রহণই হলো আজকের চীনের বৈশিষ্ট্য। চীনের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশই হ'ল শিশু ও যুব। এদের মধ্যে খেলাধুলোর সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কলেজে, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুটি করে পিরিয়ডে শরীর-শিক্ষণ আবশ্যিক করা হয়েছে।

সারাদেশব্যাপী শরীর চর্চা ও খেলাধুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় শরীর চর্চা ও ক্রীড়া কমিশন কতকগুলি মান নির্ধারণ করেছেন। মান অনুযায়ী বয়সভেদে শিশু, তরুণ ও যুবকদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। শিশু বিভাগ ১০ থেকে ১২। জুনিয়র (১) বিভাগ ১৩ থেকে ১৫। জুনিয়র (২) বিভাগ ১৬ থেকে ১৭। সিনিয়র বিভাগ ১৮ থেকে ৩০। সফল অংশগ্রহণকারীদের রাষ্ট্রীয় সার্টিফিকেট ও ব্যাজ দেওয়া হয়।

বলের খেলা

টেবিল টেনিস, বাস্কেটবল ও ভলিবল হলো চীনে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। কেবলমাত্র জিলিন প্রদেশেই ১০ হাজার ফুটবল টীম রয়েছে আর তাদের অধীনে রয়েছে ১,১০০ ফুটবল মাঠ। আবার একইভাবে গুয়াংদং প্রদেশ "ভলিবল খেলোয়াড়দের বাসগৃহ" বলে খ্যাত। এখানে কয়েক হাজার ভলিবল টীম রয়েছে। এখানে ভলিবল খেলোয়াড়দের নিজেদের তৈরী করা কোর্টের সংখ্যাই হলো ২,১০০টি।

আর একটি জনপ্রিয় খেলা

সাঁতার চীনে খুবই জনপ্রিয়। ১৯৭৮ সালে শীতকালীন সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১ লক্ষ সন্তরণবিদ্ অংশগ্রহণ করে।

ঐতিহ্যপূর্ণ জাতীয় ক্রীড়া

উরসু একটি জনপ্রিয় খেলা। এই খেলাটি সামরিক ট্রেনিং-এর সাথে বেশ কিছুটা সঙ্গতিপূর্ণ। বিভিন্ন প্রদেশে সেই সমস্ত প্রদেশবাসীর নিজস্ব কিছু কিছু প্রাচীন জনপ্রিয় খেলা আছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই খেলাগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই খেলাগুলির মধ্যে অন্যতম হলোঃ অন্তর্মোঙ্গোলিয়ার মল্লক্রীড়া, অশ্বচালনা ও তীর নিক্ষেপ। জিনজিয়া, তিব্বত, কুইনঘাই-এ অশ্বচালনা। ইয়ানথিয়ান ও জিহুয়াংবান্নায় যথাক্রমে সাঁতার ও ড্রাগন নৌকা দৌড় ইত্যাদি।

অতীতে খেলাধুলোর মান ছিলো অত্যন্ত নীচুতে।
সেখান থেকে শুরু করে.....

এছাড়া অতিপ্রাচীন "গো" এবং "দাবা"--সরকারীভাবে স্বীকৃত প্রতিযোগিতামূলক খেলা।

খেলায় গণঅংশগ্রহণ খেলার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পুরাতন চীনে ক্রীড়ার মান ছিলো অত্যন্ত নীচু। কিছু কিছু খেলার প্রচলনই ছিলোনা চীনে। এই অবস্থা থেকে শুরু।

১৯৩২ সালের দশম ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় চীনের প্রতিযোগী ছিলেন মাত্র একজন। ১৯৩৬ সালে একাদশ ওলিম্পিকে চীনের পক্ষে একজন মাত্র মহিলা প্রতিযোগী ওলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদান করেন।

খেলাধুলোয় সন্দেহাতীত অগ্রগতি

১৯৪৯-এ চীন সাধারণতন্ত্রের জন্ম ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করলো। এ সময় থেকেই চীনের ক্রীড়াবিদ্‌রা বিশ্বরেকর্ড স্থাপন ও বিশ্বখেতাব অর্জন করতে শুরু করে। ১৯৫৬ সালে চীনের প্রতিযোগী ভারোত্তলন-এ ব্যান্টামওয়েট বিভাগে ক্লিন ও জার্কে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। ঐ একই প্রতিযোগী পরবর্তী সময়ে ভারোত্তলন-এর দুটি বিভাগেই—ব্যান্টামওয়েট ও ফেদারওয়েট-এ—ক্লিন ও জার্কে নয় নয়বার নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চীনা ভারোত্তলকরা ৯টি বিভাগে ১৯টি বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন।

জেন ফেনগুওই চীনের প্রথম মহিলা প্রতিযোগী যিনি ১৯৫৭ সালে উচ্চ লম্ফনে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন।

১৯৫৯ সালে, ২৫তম বিশ্ব টেবিল টেনিসে চীন সর্বপ্রথম পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগে খেতাব অর্জন করে। তার পরবর্তী সময়ে টেবিল টেনিসে চীনের জয়যাত্রা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় বিভাগেই।

১৯৭৮ সালে, ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত ৮ম এশিয়ান গেমসে চীনা অ্যাথলেটরা ৫৬টি সোনার পদক জয় করেন। অবশ্যই এই সংখ্যাটি পূর্ববর্তী ওলিম্পিকে প্রাপ্ত পদকের চেয়ে ২৩টি বেশি।

এছাড়া জিমন্যাস্টিক, ডাইভিং, ফেন্সিং, বন্দুক ছোঁড়া, ট্রাক ও ফিল্ড, ব্যাডমিন্টন এবং বাস্কেটবলে চমৎকার ফলাফল ক্রীড়াজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

খেলাধুলোয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ও চীনের দ্রুত সাফল্যের কারণ অবশ্যই ধনবাদী দুনিয়ার তুলনায় উন্নত ও শ্রেষ্ঠতর সমাজব্যবস্থা। খেলাধুলার ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগ, গণ-অংশগ্রহণ ও গণকার্যক্রমের মধ্যেই রয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠিটি।

বিভাগীয় সংবাদ

২৪-পরগণা ঃ

বারাসাত ব্লক যুব-করণ ২নং-এর উদ্যোগে ৩০শে আগস্ট, ১৯৮০ তারিখে মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো 'সূর্যগ্রহণ, ১৯৮০'। এই আলোচনাচক্রে ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে এই আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান জয়দীপ চৌধুরী, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী শ্যামলী ভদ্র এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে মধ্যমগ্রাম এ. পি. সি. বিদ্যায়তনের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান পুলককান্তি মিত্র। মধ্যমগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী অলকা পাল পুরস্কার বিতরণ করেন।

কাকদ্বীপ ব্লক যুব-করণ—এই ব্লক যুব-করণের উদ্যোগে এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ১১টি বিদ্যালয় এতে অংশগ্রহণ করে। ৬ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়। আলোচনা চক্রের উদ্‌বোধন করেন স্থানীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীহৃষিকেশ মাইতি, পুরস্কার বিতরণ করেন কাকদ্বীপ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীতারাশংকর মাইতি। প্রধান অতিথি ছিলেন সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক মহাশয়।

নদীয়া ঃ

হাঁসখালি ব্লক যুব-করণ—২২শে আগস্ট, বগুলা। হাঁসখালি যুব

গত ২২শে আগস্ট হাঁসখালি ব্লক যুব তথ্য কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। এই অনুষ্ঠানে তিনি বৃত্তিমূলক কর্মশিক্ষণ কেন্দ্রের জনৈকা শিক্ষার্থিনীর হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন

তথ্যকেন্দ্রের শুভ উদ্‌বোধন হলো। উদ্‌বোধন করলেন সংসদ সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। তিনি তাঁর অভিভাষণে বললেন ঃ হাঁসখালি ব্লক যুব-করণের ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগমন স্থানীয় যুবসমাজে ক্রমবর্ধিত, প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হচ্ছে। আমরা এর বৃহত্তর সাফল্য কামনা করি।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস।

ঐদিন ১৯৭৯-৮০ সালের বৃত্তিমূলক কর্মশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে টেলারিং ও রেডিও শাখায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের প্রশংসালিপি দিয়ে সম্বর্ধিত করেন শ্রীমতী বিভা ঘোষগোস্বামী। মোট ৬৫ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদের প্রশংসালিপি দেওয়া হয়।

কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগ, বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা (কলিকাতা)-এর যৌথ উদ্যোগে এবং কৃষ্ণনগর-১ ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় গত ৬.৯.৮০ তারিখে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে 'ব্লক বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা'-১৯৮০ অনুষ্ঠিত হয়।

এই প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণনগর-১ ব্লকের বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের মোট ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। শক্তিনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মহুয়া চ্যাটার্জী, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র তন্ময় রায় এবং কৃষ্ণনগর লেডী কারমাইকেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী করবী বসাক যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই ৩ জন বিজয়ী প্রতিযোগী আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর '৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'নদীয়া জেলা বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতায়' অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করবে।

ঐ দিনের অনুষ্ঠানে মাননীয় শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুবেশচন্দ্র সরকার, কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রানাঘাট-২ ব্লক যুব-করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ের পরিচালনায় ১১ই আগস্ট সোমবার ১৯৮০ রানাঘাট ২নং ব্লক যুব কার্যালয়ে ব্লক যুব 'তথ্যকেন্দ্র'র উদ্‌বোধন করা হয়। তথ্যকেন্দ্রের মূল আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞান, ক্রীড়া, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও কর্ম-সংস্থানসমন্বিত প্রায় একশত পুস্তক-পুস্তিকা এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কোন এক অনুরাগীর হাতে পুস্তক তুলে দিয়ে তথ্যকেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন রানাঘাট ২নং ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীকার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রানাঘাট ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় এবং বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রানাঘাট মহকুমার তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক। সভাপতি ও উদ্‌বোধক মহাশয় তথ্যকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা উপস্থিত শ্রোতৃ-

মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যুব সংস্থা, বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত প্রতিনিধির তরফ থেকে প্রায় ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এই মর্মে আরও অনেকেই বক্তব্য রাখেন।

যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে, নেহরু যুবক কেন্দ্র (বর্ধমান) ও বিড়লা কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ সহযোগিতায় এবং রানাঘাট-২ ব্লক যুব-করণের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় গত ৪ঠা আগস্ট বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক বিজ্ঞান আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সূর্যগ্রহণ-৮০। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বি-ডি-ও শ্রীকার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। ১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

পশ্চিম দিনাজপুরঃ

রায়গঞ্জ ব্লক যুব-করণ—বিগত বছরগুলির মত এ বছরও যুব-কল্যাণ বিভাগের (পঃ বঃ সরকার) রায়গঞ্জ ব্লক যুব-করণের ও কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার উদ্যোগে বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ তারিখে রায়গঞ্জ মোহনবাটী হাই স্কুলে রায়গঞ্জ ব্লক লেভেল ছাত্র-বিজ্ঞান আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল—সূর্যগ্রহণ-১৯৮০। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন মোহনবাটী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকালিপদ সরকার। এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্রে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ যথাক্রমে সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য, অমিয় ভট্টাচার্য ও দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের কৃতী ছাত্রদের নাম নীচে উল্লেখ করা হলঃ পার্থ ঘোষ, করোনেশন হাই স্কুল—১ম স্থান। পার্থ-প্রতিম কুণ্ডু, দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র—২য় স্থান। অমিত দাস, মোহনবাটী হাই স্কুল—৩য় স্থান। মিলন মুখার্জী, রামপুর এস. সি. হাই স্কুল—সান্ত্বনা পুরস্কার। তপন ব্রহ্ম, মহারাজা জগদীশনাথ হাই স্কুল—সান্ত্বনা পুরস্কার। অনিমেষ সাহা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন—সান্ত্বনা পুরস্কার।

রায়গঞ্জ ব্লক ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনা-চক্রে বক্তব্য রাখছে শ্রীমান অসিত দাস

উপরোক্ত প্রথম তিন জন ছাত্র জেলা বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে।

যুবকল্যাণ বিভাগ ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে ও রায়গঞ্জ ব্লক যুব-করণের ব্যবস্থাপনায় 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনাচক্র' অনুষ্ঠিত হয় বিগত ১৩.৯.৮০ তারিখে রায়গঞ্জ সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রে।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী মোট ২১ জন ছাত্র এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যাচক্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ও কৃতী ছাত্রদের হাতে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ ব্লকের বি. ডি. ও. শ্রীসত্যব্রত ঘোষ। প্রতিযোগিতার কৃতী ছাত্রদের নাম নিম্নরূপঃ পার্থ ঘোষ, রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল—১ম। জয়ন্তকুমার সরকার, পার্বতীসুন্দরী (কালিয়াগঞ্জ) স্কুল—২য়। পার্থপ্রতিম কুণ্ডু. এস. ডি. পি. ইউ বিদ্যাচক্র, রায়গঞ্জ—৩য়। অমিত দাস, মোহনবাটী হাই স্কুল—৩য়। সৌম্যকান্তি গুহ, সরলাসুন্দরী স্কুল, কালিয়াগঞ্জ—৪র্থ। বিশ্বজিৎ দাস, ইসলামপুর হাই স্কুল—৫ম। তাপস কুণ্ডু, হিলি রামনাথ হাই স্কুল-৬ষ্ঠ।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনা-চক্রে প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীমান পার্থ ঘোষ পুরস্কার গ্রহণ করছে রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায়ের হাত থেকে

উপরোক্ত ছাত্রদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীরা রাজ্য ছাত্র বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেছেন, যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭.৯.৮০ তারিখে কলকাতায়। অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপকগণ ডঃ সুপ্রকাশ আচার্য, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়) এবং শ্রীধ্রুবদেব-নারায়ণ সিং (বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়)।

কোচবিহার :

দিনহাটা ব্লক যুব-করণ—এই বৎসর দিনহাটা ব্লক যুব-করণের পক্ষ থেকে ২৫টি গ্রামীণ ক্লাবকে খেলাধুলোর সাজ-সরঞ্জাম—ফুটবল, ভলিবল, পিটিস্‌, জার্সি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি এই অফিসের পক্ষ থেকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয় ওকড়াবাড়ী অঞ্চলে। এই শিবিরেও ৩০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি নিগমনগরে এই যুব-করণের উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয় একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট। এতে ৮টি গ্রামীণ ফুটবল সংস্থা অংশগ্রহণ করে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্পে এই করণের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ১টি ট্রাক্টর, ৪টি মাইকের দোকান এবং একটি স্টেসনারী দোকানের ব্যবস্থা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের ব্লকভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র গত ৬ই সেপ্টেম্বর এই যুব-করণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমুকুলচন্দ্র দেবনাথ, সভাপতি, দিনহাটা ১নং পঞ্চায়েত সমিতি। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তম সাহা, সোনিদেবী জৈন উচ্চ বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নীলাম্বর সরকার এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে অতীশ রায়, নিগমানন্দ সারস্বত বিদ্যালয়। এই তিন জন এর পর জেলা বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করবে।

পুরুলিয়া :

বাগমুণ্ডি ব্লক যুব-করণ—গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বাগমুণ্ডি ব্লক যুব অফিসের উদ্যোগে "সূর্যগ্রহণ-১৯৮০"—এই বিষয়ের উপর বিজ্ঞান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতামূলক এই আলোচনাচক্রে অংশ নিয়েছিল স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগ্রত করতে এই ধরনের আলোচনাচক্রের আয়োজন আদিবাসী অধ্যুষিত অনুন্নত এলাকায় এই প্রথম। সেমিনারে আগ্রহী শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীরা। চার জন সফল প্রতিযোগীকে অভিজ্ঞানপত্র ও পুরস্কারস্বরূপ বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সুবোধ বসুরায়। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় করমহাপাত্র। বিজ্ঞান আলোচনাচক্রকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল।

দার্জিলিং :

কার্শিয়াং ও মিরিক ব্লক যুব-করণ—গত ৩০.৮.৮০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় কার্শিয়াং ও মিরিক ব্লক যুব-করণের পরিচালনায় কার্শিয়াং পুষ্পরাণী রায় মেমোরিয়াল হাই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান প্রতিভা অন্বেষণের জন্য এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিলো "১৯৮০ সালের সূর্যগ্রহণ"। এই আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই অঞ্চলের বিজ্ঞানানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। আলোচনাচক্রে প্রথম হয় কার্শিয়াং রামকৃষ্ণ হাই স্কুল ফর গার্লস্‌ স্কুলের ছাত্রী কুমারী কবিতা লামা, দ্বিতীয় হয় সেন্ট যোসেফ গার্লস্‌ হাই স্কুলের ছাত্রী কুমারী পেমা দুমা দুকপা, তৃতীয় হয় পুষ্পরানী রায় মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ছাত্র বাণীকুমার দাস। এছাড়া আরো দুজনকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম তিন জন জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কার্শিয়াং ব্লকের বি. ডি. ও. শ্রী এন. জি. দুকপা ও প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে পুষ্পরানী মেমোরিয়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী এ. কে গুপ্ত ও স্থানীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রী বি. পি. গুরুং। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থানীয় ব্লক যুব আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান।

মিরিক ব্লকের যুব আধিকারিক ও কার্শিয়াং ব্লকের ভারপ্রাপ্ত যুব আধিকারিক শ্রীসিদ্দিক দেওয়ান জানান যে, চলতি বৎসরের জন্য গত ২৭শে আগস্ট কার্শিয়াং ব্লকের ২৫টি ক্লাবকে মোট ছয় হাজার টাকা ও মিরিক ব্লকের মোট ১৬টি যুব সংস্থাকে ছয় হাজার টাকা হিসাবে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কার্শিয়াং ব্লকের আরো ১৯টি ক্লাবকে পাঁচ হাজার টাকার ক্রীড়া সরঞ্জামাদি অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছে এবং মিরিক ব্লকের যুব সংস্থাগুলির জন্য পাঁচ হাজার টাকার ক্রীড়া সরঞ্জামাদি যুবকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুর হয়েছে। এই সমস্ত আর্থিক অনুদান লাভ করায় যুব সংস্থাগুলি খেলাধুলোর প্রতি নতুনভাবে উৎসাহিত হয়।

মালদহ :

পুরাতন মালদহ ব্লক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতা—গত ৩০শে আগস্ট ১৯৮০ শনিবার মঙ্গলবাড়ী জি. কে. জুনিয়ার বিদ্যালয়ে যুবকল্যাণ বিভাগ ও বি-আই-টি-এম'এর যৌথ উদ্যোগে পুরাতন মালদহ ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ব্লকের ৫টি বিদ্যালয়ের ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে স্থানীয় বিধায়ক শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীদিব্যেন্দু মুখার্জী। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী কাজল সরদার, সূর্যকান্ত বর্মণ ও রমেন ব্যানার্জী মহাশয়।

পুরস্কার বিতরণী সভায় শ্রীচৌধুরী বলেন এই রকম প্রতিযোগিতার ফলে গ্রাম-বাংলার মানুষের বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, এবং শ্রীদিব্যেন্দু মুখার্জী বি-ডি-ও মহাশয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন তাঁরা যেন প্রতি বৎসর ছাত্রদের এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। সর্বশেষে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীচৌধুরী মহাশয়।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লক যুব-করণ ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংস্থা, কলিকাতা, যৌথ উদ্যোগে হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১০.৯.৭৯ তারিখ বুধবার বেলা ২টায় একটি বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'সূর্যগ্রহণ ১৯৮০'। হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকের অন্তর্গত ৪টি বিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী গীতা রায় এবং পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমলয়কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅবনীকুমার মণ্ডল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৩ জন ছাত্র-ছাত্রী আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমলয়কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় এবং যুব-করণের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র

এজেন্সি নিতে হ'লে

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ৩ টাকা। ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক ১·৫০। প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা।

শুধু মনিঅর্ডারেই বা নগদে চাঁদার টাকা জমা দেওয়া চলে। টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ) কলিকাতা-৭০০ ০০১।

এজেন্সি নিতে হলে

কমপক্ষে ১০টি পত্রিকা নিলে এজেন্ট হওয়া যাবে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

পত্রিকার সংখ্যা	কমিশনের হার
১৫০০ পর্যন্ত	২০%
১৫০০-এর উর্ধ্বে এবং ৫০০০ পর্যন্ত	৩০%
৫০০০-এর উর্ধ্বে	৪০%

১০টি সংখ্যার নীচে কোন কমিশন দেওয়া হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

উপ-অধিকর্তা, যুবকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩২/১ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০ ০০১।

লেখা পাঠাতে হ'লে

ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় মার্জিন রেখে লেখা পাঠাতে হবে। মোটামুটি পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দাবি করা চলবে না।

কোনক্রমেই অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপির বাড়তি কপি রেখে লেখা পাঠান। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোনও লেখাই ৩০০০ শব্দের বেশি হ'লে তা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

যুবকল্যাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে আশা করা যায় লেখকেরা তত্ত্বগত বিষয়ের চেয়ে বাস্তব দিক-গুলির উপর বেশি জোর দেবেন।

পাঠকদের প্রতি

যুবমানস পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প, খাম, পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব চিঠির উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

Reg. No. 32875/78 Postal Reg. No. WB/CC-15

মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান আলোচনা চক্র—'৮০-তে প্রথম স্থানাধিকারী মেরী ইম্যাক্যুলেট স্কুলের ছাত্র শ্রীমান সত্যজিৎ সেনকে পুরস্কার গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। পুরস্কার বিতরণ করেন কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী অপরাজিতা দাশগুপ্তা।